গ্রন্থাবলী-সিরিজ

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস গ্রন্থাবলী

(প্রথম ভাগ)

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত

রাজ সংস্করণ

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী-বৈদ্যুতিক-রোটারী-মেসিনে"
শ্রীশশিভূষণ দত্ত মুদ্রিত

[মূল্য ২৲ দুই টাকা

সূচী

১। রাজসিংহ

২। বিষবৃক্ষ

৪। যুগলাঙ্গুরীয়

৩। মৃণালিনী

৫। রজনী

রাজসিংহ

[চতুর্থ সংস্করণ হইতে মুদ্রিত]

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

চতুর্থ সংস্করণের বিজ্ঞাপন

'রাজসিংহে'র পূর্ব্ব তিন সংস্করণে যে ঐতিহাসিক ঘটনাটি অবলম্বন করা হইয়াছিল, তাহা একটা অতি গুরুতর ঐতিহাসিক ঘটনার একটি ক্ষুদ্র অংশমাত্র। মোগল-সাম্রাজ্যের প্রধান কথা,—হিন্দুদিগের সঙ্গে মোগলের বিবাদ। মোগলের প্রতিদ্বন্দ্বী হিন্দুদিগের মধ্যে প্রধান রাজপুত ও মহারাষ্ট্রীয়। মহারাষ্ট্রীয়-র কথা সকলেই জানে। রাজপুতগণের বীর্য্য অ...তর হইলেও, এ দেশে তেমন সুপরিচিত নহে। তাহা সুপরিচিত করিবার যথার্থ উপায় ইতিহাস। কিন্তু ইতিহাস লিখিবার পক্ষে অনেক বিঘ্ন। প্রকৃত ঐতিহাসিক ঘটনা কি, তাহা স্থির করা দুঃসাধ্য। মুসলমান ইতিহাস-লেখকেরা অত্যন্ত স্বজাতিপক্ষপাতী, হিন্দুদ্বেষক; হিন্দুদিগের গৌরবের কথা প্রায় লুকাইয়া থাকেন—বিশেষতঃ মুসলমান-দিগের চিরশত্রু রাজপুতদিগের কথা। রাজপুত-ইতিহাসের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা যায় না—স্বজাতি-পক্ষপাত নাই, এমন নহে। মনুষী নামে এক জন বিনিসীয় চিকিৎসক মোগলদিগের সময়ে ভারতবর্ষে বাস করিয়াছিলেন। তিনিও মোগল-সাম্রাজ্যের ইতিহাস লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। কক্রনামা এক জন পাদ্রি তাহা প্রকাশিত করিয়াছিলেন। কিন্তু এই তিন জাতির ইতিহাসে পরস্পরের সহিত অনৈক্য আছে। ইহাদের মধ্যে কাহার কথা সত্য, কাহার কথা মিথ্যা, তাহার মীমাংসা দুঃসাধ্য। অন্ততঃ এ কার্য্য বিশেষ পরিশ্রম-সাপেক্ষ।

ইতিহাসের উদ্দেশ্য কখন কখন উপন্যাসে সুসিদ্ধ হইতে পারে। উপন্যাসলেখক সর্ব্বত্র সত্যের শৃঙ্খলে বদ্ধ নহেন। ইচ্ছামত, অভীষ্টসিদ্ধি-জন্য কল্পনার আশ্রয় লইতে পারেন। তবে সকল স্থানে উপন্যাস ইতিহাসের আসনে বসিতে পারে না। কিন্তু এই গ্রন্থে আমার যে উদ্দেশ্য তাহাতে এই নিষেধবাক্য খাটে না। এক্ষণে বুঝাইতেছি, এই উদ্দেশ্য কি।

"ভারত-কলঙ্ক" নামক প্রবন্ধে আমি বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি—ভারতবর্ষের অধঃপতনের কারণ কি কি। হিন্দুদিগের বাহুবলের অভাব সে সকল কারণের মধ্যে নহে। এই উনবিংশ শতাব্দীতে হিন্দুদিগের বাহুবলের কোন চিহ্ন দেখা যায় না। ব্যায়ামের অভাবে মনুষ্যের সর্ব্বাঙ্গ দুর্ব্বল হয়। জাতি সম্বন্ধেও সে কথা খাটে। ইংরেজ-সাম্রাজ্যে হিন্দুর বাহুবল লুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে কখনও লুপ্ত হয় নাই। হিন্দুদিগের বাহুবলই আমার প্রতিপাদ্য। উদাহরণস্বরূপ আমি রাজ-সিংহকে লইয়াছি। মহারাষ্ট্রীয় অপেক্ষাও রাজপুত বাহুবলে বলবান্ ছিলেন বলিয়া আমার বিশ্বাস। তবে রাজকীয় অন্যান্য গুণে তাঁহারা নিকৃষ্ট ছিলেন।

যখন বাহুবলমাত্র আমার প্রতিপাদ্য, তখন উপন্যাসের আশ্রয় লওয়া যাইতে পারে। উপন্যাসে সে কথা পাঠকের হৃদয়ঙ্গম করিতে গেলে, 'রাজ-সিংহে'র পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্করণে যে ক্ষুদ্র ঘটনাটি অবলম্বন করা গিয়াছিল, তদ্দ্বারা অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না

রাজসিংহের সঙ্গে মোগল বাদশাহের যে মহাযুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা সমস্তই উপন্যাসভুক্ত করিতে হয়। তাহা করিতে প্রয়াস পাইয়াছি বলিয়া গ্রন্থের কলেবর এত বাড়িয়াছে। বিশেষতঃ উপন্যাসের ঔপন্যাসিকতা রক্ষা করিবার জন্য কল্পনা-প্রসূত অনেক বিষয়ই গ্রন্থমধ্যে সন্নিবেশিত করিতে হইয়াছে।

স্থূল ঘটনা, অর্থাৎ যুদ্ধাদির ফল, ইতিহাসে যেমন আছে, প্রায় তেমনই রাখিয়াছি। কোন যুদ্ধ বা তাহার ফল কল্পনাপ্রসূত নহে। তবে যুদ্ধের প্রকরণ যাহা ইতিহাসে নাই, তাহা গড়িয়া দিতে হইয়াছে।

ঔরঙ্গজেব, রাজসিংহ, জেব-উন্নিসা, উদিপুরী, ইঁহারা ঐতিহাসিক ব্যক্তি। ইঁহাদের চরিত্রও ইতিহাসে যেরূপ আছে, সেইরূপ রাখা গিয়াছে। তবে ইঁহাদের সম্বন্ধে যে সকল ঘটনা লিখিত হইয়াছে, সকলই ঐতিহাসিক নহে। উপন্যাসে সকল কথা ঐতিহাসিক হইবার প্রয়োজন নাই।

ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে কোন্‌টি প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে, তাহার পক্ষে বিচার আবশ্যক। আমি সে বিচার বড় করি নাই। দুই একটা উদাহরণ দিলে বুঝা যাইবে। রূপনগরের রাজকন্যা সম্বন্ধে যে স্থূল ঘটনা বিবৃত হইয়াছে, তাহা টডের গ্রন্থে আছে, কিন্তু অর্মের গ্রন্থে নাই। আর উদিপুরী সম্বন্ধে যে ঘটনা বিবৃত হইয়াছে, তাহা অর্মের গ্রন্থে আছে, কিন্তু টডের গ্রন্থে নাই। আমি উভয় ঘটনাই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। রন্ধ্র মধ্যে ঔরঙ্গজেব যে অবস্থায় পতিত হওয়ার কথা লিখিয়াছি, অর্ম ঐরূপ লেখেন। কিন্তু টডের গ্রন্থে শাহজাদা সম্বন্ধে ঐ ঘটনা ঘটিয়াছিল বলিয়া লিখিত হইয়াছে। আমি এখানে অর্মের অনুবর্ত্তী হইয়াছি। এইরূপ অনেক আছে।

কথিত আছে, নৃত্যগীত কেহ না করিতে পারে, এমন আদেশ ঔরঙ্গজেব প্রচার করিয়াছিলেন, তাঁহার নিজের অন্তঃপুরেই সে আদেশের অবমাননা ঘটিয়াছিল, এ উপন্যাসে এইরূপ লিখিয়াছি। আমার স্থির বিশ্বাস, ঐতিহাসিক সত্য আমার দিকে। ঔরঙ্গজেব নিজে মদ্যপান করিতেন না, কিন্তু ইঁহার পিতা ও পিতামহ, খুল্লতাত এবং সহোদর প্রভৃতি অতিশয় মদ্যপ ছিলেন। তাঁহার পৌরাঙ্গনাগণও যে মদ্যপায়িনী ছিল, তাহারও ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। কেহ যদি এ বিষয়ে সন্দেহ করেন, তবে সে সন্দেহ ভঞ্জন করিতে প্রস্তুত আছি।

পরিশেষে বক্তব্য যে, আমি পূর্ব্বে কখন ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখি নাই। 'দুর্গেশনন্দিনী', 'চন্দ্রশেখর' বা 'সীতারাম'কে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যাইতে পারে না। এই প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিলাম। এ পর্য্যন্ত ঐতিহাসিক উপন্যাস প্রণয়নে কোন লেখকই সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। আমি যে পারি নাই, তাহা বলা বাহুল্য।

ভাষা সম্বন্ধেও একটা কথা বলা প্রয়োজনীয়। এখন লেখকেরা বা ভাষাসমালোচকেরা দুই ভাগে বিভক্ত। এক সম্প্রদায়ের মত যে, বাঙ্গালা ব্যাকরণ সর্ব্বত্র সংস্কৃতানুযায়ী হওয়া উচিত। দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের মত—তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই সংস্কৃতে সুপণ্ডিত—যে, যাহা পূর্ব্ব হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহা সংস্কৃত ব্যাকরণবিরুদ্ধ হইলেও চলিতে পারে। আমি নিজে এই দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের মতের পক্ষপাতী, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে এবং সকল স্থানে তাঁহাদের অনুমোদনে প্রস্তুত নহি। আমি যদিও ইতিপূর্ব্বে সম্বোধনে "ভগবন্", "প্রভো", "স্বামিন্", "রাজকুমারি", "পিতঃ" প্রভৃতি লিখিয়াছি, এক্ষণে এ সকল বাঙ্গালা ভাষায় অপ্রযোজ্য বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছি। আমি "তথা" এবং "তথায়" উভয় রূপই ব্যবহার করিয়াছি। "সসৈন্যে" এবং "সসৈন্য" দুই-ই লিখিয়াছি, একটু অর্থ-প্রভেদে। কিন্তু "গোপিনী", "সশরীরে উপস্থিত" এইরূপ প্রয়োগ পরিত্যাগ করিয়াছি। কারণনির্দ্দেশের এ স্থান নহে। সময়ান্তরে তাহা করিব, ইচ্ছা আছে।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

5730

রাজসিংহ

প্রথম খণ্ড

চিত্রে চরণ

প্রথম পরিচ্ছেদ

তস্‌বীরওয়ালী

রাজস্থানের পার্ব্বত্য প্রদেশে রূপনগর নামে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। রাজ্য ক্ষুদ্র হউক, বৃহৎ হউক, তার একটা রাজা থাকিবে। রূপনগরেরও রাজা ছিল। কিন্তু রাজ্য ক্ষুদ্র হইলে রাজার নামটি বৃহৎ হওয়ায় আপত্তি নাই—রূপনগরের রাজার নাম বিক্রমসিংহ। বিক্রমসিংহের আরও সবিশেষ পরিচয় পশ্চাৎ দিতে হইবে।

সম্প্রতি তাঁহার অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিতে আমাদিগের ইচ্ছা। ক্ষুদ্র রাজ্য, ক্ষুদ্র রাজধানী, ক্ষুদ্র পুরী, তন্মধ্যে একটি ঘর বড় সুশোভিত। গালিচার অনুকরণে শ্বেত-কৃষ্ণ-প্রস্তররঞ্জিত হর্ম্ম্যতল; শ্বেত-প্রস্তরনির্ম্মিত নানা বর্ণের রত্নরাজিতে রঞ্জিত কক্ষপ্রাচীর। তখন তাজমহল ও ময়ূরতক্তের অনুকরণই প্রসিদ্ধ; সেই অনুকরণে ঘরের দেওয়ালে সাদা পাতরের অসম্ভব পক্ষীসকল অসম্ভব রকমে, অসম্ভব লতার উপর বসিয়া, অসম্ভব জাতীয় ফুলের উপর পুচ্ছ রাখিয়া, অসম্ভব জাতীয় ফল-ভোজন করিতেছে। বড় পুরু গালিচা পাতা, তাহার উপর এক-পাল স্ত্রীলোক, দশ জন কি পনর জন। নানা রঙের বস্ত্রের বাহার; নানাবিধ রত্নের অলঙ্কারের বাহার; নানাবিধ উজ্জ্বল কোমল বর্ণের কমনীয় দেহরাজি;—কেহ মল্লিকাবর্ণ, কেহ পদ্মরক্ত, কেহ চম্পকাঙ্গী, কেহ নবদূর্ব্বাদলশ্যামা—খনিজ রত্নরাশিকে উপহসিত করিতেছে। কেহ তাম্বুল চর্ব্বণ করিতেছে, কেহ আলবোলাতে তামাকু টানিতেছে—কেহ বা নাকের বড় বড় মতিদার নথ দুলাইয়া ভীমসিংহের পদ্মিনী রাণীর উপাখ্যান বলিতেছেন, কেহ বা কাণের হীরক-জড়িত কর্ণভূষা দুলাইয়া পরনিন্দায় মজ্‌লিস জাঁকাইতেছেন। অধিকাংশই যুবতী; হাসিটিট্‌কারির কিছু ঘটা পড়িয়া গিয়াছে—একটু রঙ্গ জমিয়া গিয়াছে।

যুবতীগণের হাসিবার কারণ,—এক প্রাচীনা কতকগুলি চিত্র বেচিতে আসিয়া তাঁহাদের হাতে পড়িয়াছিল। হস্তিদন্তনির্ম্মিত ফলকে লিখিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপূর্ব্ব চিত্রগুলি; প্রাচীনা বিক্রয়াভিলাষে এক একখানি চিত্র বস্ত্রাবরণমধ্য হইতে বাহির করিতেছিল; যুবতীগণ বিচিত্র ব্যক্তির পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতেছিল।

প্রাচীনা প্রথম চিত্রখানি বাহির করিল, এক কামিনী জিজ্ঞাসা করিল, "এ কাহার তস্‌বীর আয়ি?"

প্রাচীনা বলিল, "এ শাহজহাঁ বাদশাহের তস্‌বীর।"

যুবতী বলিল, "দূর মাগী, এ দাড়ি যে আমি চিনি। এ আমার ঠাকুরদাদার দাড়ি।"

আর এক জন বলিল, "সে কি লো? ঠাকুরদাদার নাম দিয়া ঢাকিস্ কেন? ও যে তোর বরের দাড়ি।" পরে আর সকলের দিকে ফিরিয়া রসবতী বলিল, "ঐ দাড়িতে এক দিন একটা বিছা লুকাইয়াছিল—সই আমার ঝাড়ু দিয়া সেই বিছাটা মারিল।"

তখন হাসির বড় একটা গোল পড়িয়া গেল। চিত্রবিক্রেত্রী তখন আর একখানা ছবি দেখাইল। বলিল, "এখানা জাহাঁগীর বাদশাহের ছবি।"

দেখিয়া রসিকা যুবতী বলিল, "ইহার দাম কত?"

প্রাচীনা বড় দাম হাঁকিল।

রসিকা পুনরপি জিজ্ঞাসা করিল, "এ ত গেল ছবির দাম, আসল মানুষটা নূরজাহাঁ বেগম কতকে কিনিয়াছিল?"

তখন প্রাচীনাও একটু রসিকতা করিল, বলিল, "বিনামূল্যে।"

রসিকা বলিল, "যদি আসলটার এই দশা, তবে নকলটা ঘরের কড়ি কিছু দিয়া আমাদিগকে দিয়া যাও।"

আবার একটা হাসির গোল পড়িয়া গেল। প্রাচীনা বিরক্ত হইয়া চিত্রগুলি ঢাকিল। বলিল, "হাসিতে মা তস্বীর কেনা যায় না। রাজকুমারী আসুন, তবে আমি তস্বীর দেখাইব। আর তাঁরই জন্ম এ সকল আনিয়াছি।"

তখন সাত জন সাত দিক্ হইতে বলিল, "ওগো আমি রাজকুমারী। ও আমি বুড়ী। আমি রাজকুমারী।" বৃদ্ধা ফাঁপরে পড়িয়া চারিদিকে চাহিতে লাগিল। আবার আর একটা হাসির গোল পড়িয়া গেল।

অকস্মাৎ হাসির ধূম কম পড়িয়া গেল—গোলমাল একটু থামিল—কেবল তাকাতাকি, আঁচাআঁচি এবং বৃষ্টির পর মন্দ বিদ্যুতের মত ওষ্ঠপ্রান্তে একটু ভাঙ্গা-ভাঙ্গা হাসি। চিত্রবাদিনী ইহার কারণ সন্ধান করিবার জন্ম পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন, তাঁহার পিছনে কে একখানি দেবীপ্রতিমা দাঁড় করাইয়া দিয়াছে।

বৃদ্ধা অনিমেষলোচনে সেই সর্ব্বশোভাময়ী ধবলপ্রস্তরনির্ম্মিতপ্রায় প্রতিমাপানে চাহিয়া রহিল—কি সুন্দর! বুড়ী বয়োদোষে একটু চোখে খাট, তত পরিষ্কার দেখিতে পায় না—তাহা না হইলে দেখিতে পাইত যে, এ ত প্রস্তরের বর্ণ নহে, নির্জ্জীবের এমন সুন্দর বর্ণ হয় না। পাতর দূরে থাকুক, কুসুমেও এ চারুবর্ণ পাওয়া যায় না। দেখিতে দেখিতে বৃদ্ধা দেখিল যে, প্রতিমা মৃদু মৃদু হাসিতেছে। পুতুল কি হাসে? বুড়ী তখন মনে মনে ভাবিতে লাগিল, বুঝি পুতুল নয়—ঐ অতিদীর্ঘ, কৃষ্ণতার, চঞ্চল, সজল, বৃহচ্চক্ষুর্দ্বয় তাহার দিকে চাহিয়া হাসিতেছে।

বুড়ী অবাক হইল—এর ওর তার মুখপানে চাহিতে লাগিল—কিছু ভাবিয়া ঠিক পাইল না। বিকলচিত্তে রসিকা রমণী-মণ্ডলীর মুখপানে চাহিয়া বৃদ্ধা হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল. "হাঁ গা, তোমরা বল না গা?"

এক সুন্দরী হাসি রাখিতে পারিল না—রসের উৎস উছলিয়া উঠিল—হাসির ফোয়ারার মুখ আপনি ছুটিয়া গেল—যুবতী হাসিতে হাসিতে লুটাইয়া পড়িল। সে হাসি দেখিয়া বিস্ময়বিহ্বলা বৃদ্ধা কাঁদিয়া ফেলিল।

তখন সেই প্রতিমা কথা কহিল। অতি মধুরস্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—"আয়ি, কাঁদিস্, কেন গো?"

তখন বুড়ী বুঝিল যে, এটা গড়া পুতুল নহে—আদত মানুষ—রাজমহিষী বা রাজকুমারী হইবে। বুড়ী তখন সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিল। এ প্রণাম রাজকুলকে নহে—এ প্রণাম সৌন্দর্য্যকে। বুড়ী যে সৌন্দর্য্য দেখিল, তাহা দেখিয়া প্রণত হইতে হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

চিত্রদলন

এই ভুবনমোহিনী সুন্দরী, যারে দেখিয়া চিত্রবিক্রেত্রী প্রণত হইল, রূপনগরের রাজার কন্যা চঞ্চলকুমারী। যাহারা এতক্ষণ বৃদ্ধাকে লইয়া রঙ্গ করিতেছিল, তাহারা তাঁহার সখীজন এবং দাসী। চঞ্চলকুমারী সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া সেই রঙ্গ দেখিয়া নীরবে হাস্য করিতেছিলেন। এক্ষণে প্রাচীনাকে মধুরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে গা?"

সখীগণ পরিচয় দিতে ব্যস্ত হইল। "উনি তস্বীর বেচিতে আসিয়াছেন।"

চঞ্চলকুমারী বলিল, "তা তোমরা এত হাসিতেছিলে কেন?"

কেহ কেহ কিছু কিছু অপ্রতিভ হইল। যিনি সহচরীকে ঝাড়ুদারি রসিকতাটা করিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, "আমাদের দোষ কি? আয়ী বুড়ী যত সেকেলে বাদশাহের তস্বীর আনিয়া দেখাইতেছিল—তাই আমরা হাসিতেছিলাম—আমাদের রাজা-রাজড়ার ঘরে শাহজহাঁ বাদশাহ কি জাহাঁগীর বাদশাহের তস্বীর কি নাই?"

বৃদ্ধা কহিল, "থাক্‌বে না কেন মা? একখানা থাকিলে কি আর একখানা নিতে নাই? আপনারা নিবেন না, তবে আমরা কাঙ্গাল গরীব প্রতিপালন হইব কি প্রকারে?"

রাজকুমারী তখন প্রাচীনার তস্বীর সকল দেখিতে চাহিলেন। প্রাচীনা একে একে তস্বীরগুলি রাজকুমারীকে দেখাইতে লাগিল। আকবর বাদশাহ, জাহাঁগীর, শাহজহাঁ, নুরজহাঁ, নুরমহালের চিত্র দেখাইল। রাজকুমারী হাসিয়া হাসিয়া সকলগুলি ফিরাইয়া দিলেন—বলিলেন, ইহারা

আমাদের কুটুম্ব, ঘরে ঘরে তস্বীর আছে, হিন্দু-রাজার তস্বীর আছে?"

"অভাব কি?" বলিয়া প্রাচীনা রাজা মানসিংহ, রাজা বীরবল, রাজা জয়সিংহ প্রভৃতির চিত্র দেখাইল। রাজপুত্রী তাহাও ফিরাইয়া দিলেন; বলিলেন, "এও লইব না। এ সকল হিন্দু নয়, ইহারা মুসলমানের চাকর।"

প্রাচীনা তখন হাসিয়া বলিল, "মা, কে কার চাকর, তা আমি ত জানি না। আমার যা আছে দেখাই, পসন্দ করিয়া লও।"

প্রাচীনা চিত্র দেখাইতে লাগিল। রাজকুমারী পসন্দ করিয়া রাণা প্রতাপ, রাণা অমরসিংহ, রাণা কর্ণ, যশোবন্ত সিংহ প্রভৃতি কয়েকখানি চিত্র ক্রয় করিলেন। একখানি বৃদ্ধা ঢাকিয়া রাখিল—দেখাইল না।

রাজকুমারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওখানি ঢাকিয়া রাখিলে যে?" বৃদ্ধা কথা কহে না। রাজকুমারী পুনঃপি জিজ্ঞাসা করিলেন।

বৃদ্ধা ভীতা হইয়া করযোড়ে কহিল, "আমার অপরাধ লইবেন না—অসাবধানে ঘটিয়াছে—অন্য তস্বীরের সঙ্গে আসিয়াছে।"

রাজকুমারী বলিলেন, "অত ভয় পাইতেছ কেন? এমন কাহার তস্বীর যে, দেখাইতে ভয় পাইতেছ?"

বুড়ী। দেখিয়া কাজ নাই। আপনার ঘরের দুষমনের ছবি।

রাজকুমারী। কার তস্বীর?

বুড়ী। (সভয়ে) রাণা রাজসিংহের।

রাজকুমারী হাসিয়া বলিলেন, "বীরপুরুষ স্ত্রীজাতির কখনও শত্রু নহে। আমি ও তসবীর লইব।"

তখন বৃদ্ধা রাজসিংহের চিত্র তাঁহার হস্তে দিল। চিত্র হাতে লইয়া রাজকুমারী অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন; দেখিতে দেখিতে তাঁহার মুখ প্রফুল্ল হইল; লোচন বিস্ফারিত হইল। এক জন সখী তাঁহার ভাব দেখিয়া চিত্র দেখিতে চাহিল। রাজকুমারী তাহার হস্তে চিত্র দিয়া বলিলেন, "দেখ! দেখিবার যোগ্য বটে।"

সখীগণের হাতে হাতে সে চিত্র ফিরিতে লাগিল। রাজসিংহ যুবা পুরুষ নহেন—তথাপি তাঁহার চিত্র দেখিয়া সকলে প্রশংসা করিতে লাগিল।

বৃদ্ধা সুযোগ পাইয়া এই চিত্রখানিতে দ্বিগুণ মুনাফা করিল। তার পর লোভ পাইয়া বলিল, "ঠাকুরাণি, যদি বীরের তস্বীর লইতে হয়, তবে আর একখানি দিতেছি। ইহার মত পৃথিবীতে বীর কে?"

এই বলিয়া বৃদ্ধা আর একখানি চিত্র বাহির করিয়া রাজপুত্রীর হাতে দিল।

রাজকুমারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কাহার চেহারা?"

বৃদ্ধা। বাদশাহ আলমগীরের।

রাজকুমারী। কিনিব।

এই বলিয়া এক জন পরিচারিকাকে রাজপুত্রী ক্রীত চিত্রগুলির মূল্য আনিয়া বৃদ্ধাকে বিদায় করিয়া দিতে বলিলেন। পরিচারিকা মূল্য আনিতে গেল, ইত্যবসরে রাজপুত্রী সখীগণকে বলিলেন, "এসো একটু আমোদ করা যাক।"

রজপ্রিয়া বয়স্যাগণ বলিল, "কি আমোদ! বল।"

রাজপুত্রী বলিলেন, "আমি এই আলমগীর বাদশাহের চিত্রখানি মাটীতে রাখিতেছি। সবাই ইহার মুখে এক একটি বাঁ পায়ের নাথি মার। কার নাথিতে উহার নাক ভাঙ্গে দেখি।"

ভয়ে সখীগণের মুখ শুকাইয়া গেল। এক জন বলিল, "অমন কথা মুখে আনিও না, কুমারীজী! কাকপক্ষীতে শুনিলেও রূপনগরের গড়ের একখানি পাতর থাকিবে না।"

হাসিয়া রাজপুত্রী চিত্রখানি মাটীতে রাখিলেন, বলিলেন, "কে নাথি মারিবি—মার!"

কেহ অগ্রসর হইল না। নির্ম্মলনাম্নী এক জন বয়স্যা আসিয়া রাজকুমারীর মুখ টিপিয়া ধরিল। হাসিতে হাসিতে বলিল, "অমন কথা আর বলিও না।"

চঞ্চলকুমারী ধীরে ধীরে অলঙ্কারশোভিত বাম চরণখানি ঔরঙ্গজেবের চিত্রের উপরে সংস্থাপিত করিলেন—চিত্রের শোভা বুঝি বাড়িয়া গেল। চঞ্চলকুমারী একটু হেলিলেন—মড় মড় শব্দ হইল—ঔরঙ্গজেব বাদশাহের প্রতিমূর্ত্তি রাজপুত-কুমারীর চরণতলে ভাঙ্গিয়া গেল। "কি সর্ব্বনাশ! কি করিলে!" বলিয়া সখীগণ শিহরিল।

রাজপুতকুমারী হাসিয়া বলিলেন, "যেমন ছেলেরা পুতুল খেলিয়া সংসারের সাধ মিটায়, আমি তেমনই মোগল বাদশাহের মুখে নাথি মারার সাধ মিটাইলাম।" তার পর নির্ম্মলের মুখ চাহিয়া বলিলেন, "সখী নির্ম্মল! ছেলেদের সাধ মিটে; সময়ে তাহাদের সত্যের ঘরসংসার হয়। আমার কি সাধ মিটিবে না? আমি কি কখন জীবন্ত ঔরঙ্গজেবের মুখে এইরূপ—"

নির্ম্মল রাজকুমারীর মুখ চাপিয়া ধরিলেন, কথাটা সমাপ্ত হইল না—কিন্তু সকলেই তাহার অর্থ বুঝিল। প্রাচীনার হৃদয় কম্পিত হইতে লাগিল—এমন প্রাণসংহারক কথাবার্ত্তা যেখানে হয়, সেখান হইতে কতক্ষণে নিষ্কৃতি পাইবে? এই সময়ে তাহার বিক্রীত তস্বীরের মূল্য আসিয়া পৌঁছিল। প্রাপ্তিমাত্র প্রাচীনা ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

সে ঘরের বাহিরে আসিলে, নির্ম্মল তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়া আসিল। আসিয়া তাহার হাতে একটি আস্‌রফি দিয়া বলিল, "আয়ি বুড়ী, দেখিও, যাহা শুনিলে, কাহারও সাক্ষাতে মুখে আনিও না। রাজকুমারীর মুখের আটক নাই—এখনও উঁহার ছেলে বয়স।"

বুড়ী আস্‌রফিটি লইয়া বলিল, "তা এ কি আর বল্‌তে হয় মা! আমি তোমাদের দাসী—আমি কি আর এ সকল কথা মুখে আনি?"

নির্ম্মল সন্তুষ্ট হইয়া ফিরিয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চিত্রবিচারণ

পরদিন চঞ্চলকুমারী ক্রীত চিত্রগুলি একা বসিয়া মনোযোগের সহিত দেখিতেছিলেন। নির্ম্মলকুমারী আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া চঞ্চল বলিল, "নির্ম্মল! ইহার মধ্যে কাহাকেও তোমার বিবাহ করিতে ইচ্ছা করে?"

নির্ম্মল বলিল, "যাহাকে আমার বিবাহ করিতে ইচ্ছা করে, তাহার চিত্র ত তুমি পা দিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছ।"

চঞ্চল। ঔরঙ্গজেবকে?

নির্ম্মল। আশ্চর্য্য হইলে যে?

চঞ্চল। বদ্‌জাতের ধাড়ি যে! অমন পাষণ্ড যে আর পৃথিবীতে জন্মে নাই!

নির্ম্মল। বদ্‌জাতকে বশ করিতেই আমার আনন্দ। তোমার মনে নাই, আমি বাঘ পুষিতাম? আমি এক দিন না এক দিন ঔরঙ্গজেবকে বিবাহ করিব, ইচ্ছা আছে।

চঞ্চল। মুসলমান যে?

নির্ম্মল। আমার হাতে পড়িলে ঔরঙ্গজেবও হিন্দু হইবে।

চঞ্চল। তুমি মর।

নির্ম্মল। কিছুমাত্র আপত্তি নাই—কিন্তু ঐ একখানা কার ছবি তুমি পাঁচবার করিয়া দেখিতেছ, সে খবরটা লইয়া তবে মরিব।

চঞ্চলকুমারী তখন আর পাঁচখানা চিত্রের মধ্যে ক্ষিপ্রহস্তে করস্থ চিত্রখানি মিশাইয়া দিয়া বলিল, "কোন্ ছবি আবার পাঁচবার করিয়া দেখিতেছিলাম? মানুষে মানুষের একটা কলঙ্ক দিতে পারিলেই কি হয়? কোন্ ছবিখানা পাঁচবার করিয়া দেখিতেছিলাম?"

নির্ম্মল হাসিয়া বলিল, "একখানা তস্বীর দেখিতেছিলে, তার আর কলঙ্ক কি? রাজকুমারী, তুমি রাগ করিলে বলিয়া আমার কাছে ধরা পড়িলে। কার এমন কপাল প্রসন্ন, তস্বীরগুলা দেখিলে আমি খুঁজিয়া বাহির করিতে পারি।"

চঞ্চলকুমারী। আকব্বর শাহের।

নির্ম্মল। আকব্বরের নামে রাজপুতনী ঝাড়ু মারে। তা জানই।

এই বলিয়া নির্ম্মলকুমারী তস্বীরের গোছা হাতে লইয়া খুঁজিতে লাগিল। বলিল, "তুমি যেখানি দেখিতেছিলে, তাহার উল্টা পিঠে একটা কালো দাগ আছে দেখিয়াছি।" সেই চিহ্ন ধরিয়া নির্ম্মলকুমারী একখানি ছবি বাহির করিয়া চঞ্চলকুমারীর হাতে দিল। বলিল, "এইখানি।"

চঞ্চলকুমারী রাগ করিয়া ছবিখানা ফেলিয়া দিল। বলিল, "তোর আর কিছু কাজ নেই, তাই তুই লোককে জ্বালাতন করিতে আরম্ভ করেছিস্। তুই দূর হ।"

নির্ম্মল। দূর হব না। তা, রাজকুমার! এ বুড়ার ছবিতে দেখিবার তুমি এত কি পেয়েছ?

চঞ্চল। বুড়ো! তোর কি চোখ গিয়াছে না কি?

নির্ম্মল চঞ্চলকে জ্বালাইতেছিল, চঞ্চলের রাগ দেখিয়া টিপি টিপি হাসিতে লাগিল। নির্ম্মল বড় সুন্দরী, মধুর সরস হাসিতে তাহার সৌন্দর্য্য বড় খুলিল। নির্ম্মল হাসিয়া বলিল, "তা ছবিতে বুড়া না দেখাক্—লোকে বলে, মহারাণা রাজসিংহের বয়স অনেক হয়েছে। তাঁর দুই পুত্র উপযুক্ত হইয়াছে।"

চঞ্চল। ওকি রাজসিংহের ছবি? তা অত কে জানে সখি?

নির্ম্মল। কাল কিনেছ—আজ কিছু জান না সখি? তা মানুষটার বয়সও হয়েছে, এমন যে খুব সুপুরুষ, তাও নয়। তবে দেখিতেছিলে কি?

চঞ্চল। গৌরী সমুঝে ভস্মভার,
পিয়ারী সমুঝে কালা।
শচী সমুঝে সহস্রলোচন,
বীর সমুঝে বীরবালা॥
গঙ্গাগর্জ্জন শম্ভুজটপর,
ধরণী বৈঠত বাসুকিফণ্‌মে।
পবন হোয়ত আগুন-সখা,
বার ভজত যুবতী মন্‌মে॥

নির্ম্মল। এখন, তুমি দেখিতেছি, আপনি মরিবার জন্য ফাঁদ পাতিলে। রাজসিংহকে ভজিলে, রাজসিংহকে কি কখন পাইতে পারিবে?

চঞ্চল। পাইবার জন্য কি ভজে? তুমি কি পাইবার জন্য ঔরঙ্গজেব বাদশাহকে ভজিয়াছ?

নির্ম্মল। আমি ঔরঙ্গজেবকে ভজিয়াছি, যেমন বেড়াল ইন্দুর ভজে। আমি যদি ঔরঙ্গজেবকে না পাই, তা নয় আমার বেড়ালখেলাটা এ জন্মের মত রহিয়া গেল। তোমারও কি তাই?

চঞ্চল। আমারও না হয়, সংসারের খেলাটা এ জন্মের মত রহিয়া গেল।

নির্ম্মল। বল কি রাজকুমার! ছবি দেখিয়া কি এত হয়?

চঞ্চল। কিসে কি হয়, তা তুমি আমি কি জানি? কি হইয়াছে, তাই কি জানি?

আমরাও তাই বলি। চঞ্চলকুমারীর কি হইয়াছে, তা ত বলিতে পারি না। শুধু ছবি দেখিয়া কি হয়, তা ত জানি না। অনুরাগ ত মানুষে মানুষে, ছবিতে মানুষে হইতে পারে কি? পারে, যদি তুমি ছবিছাড়াটুকু আপনি ধ্যান করিয়া লইতে পার। পারে, যদি আগে হইতে মনে মনে তুমি কিছু গড়িয়া রাখিয়া থাক, তার পর ছবিখানাকে (বা স্বপ্নটাকে) সেই মনগড়া জিনিষের ছবি বা স্বপ্ন মনে কর। চঞ্চলকুমারীর কি তাই কিছু হইয়াছিল? তা আঠার বছরের মেয়ের মন আমি কেমন করিয়া বুঝিব বা বুঝাইব?

চঞ্চলকুমারীর মন যাই হোক্, মনের আগুনে এখন ফুঁ দিয়া সে ভাল করে নাই। কেন না, সম্মুখে বড় বিপদ। কিন্তু সে সকল বিপদের কথা বলিতে আমাদের এখনও অনেক বিলম্ব আছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বুড়ী বড় সতর্ক

যে বুড়ী ছবি বেচিয়াছিল, সে ফিরিয়া বাড়ী আসিল। তাহার বাড়ী আগ্রা। সে চিত্রগুলি দেশে দেশে বিক্রয় করে। বুড়ী রূপনগর হইতে আগ্রা গেল। সেখানে গিয়া দেখিল, তাহার পুত্র আসিয়াছে। তাহার পুত্র দিল্লীতে দোকান করে।

কুক্ষণে বুড়ী রূপনগরে চিত্র বিক্রয় করিতে গিয়াছিল। চঞ্চলকুমারীর সাহসের কাণ্ড যাহা দেখিয়া আসিয়াছিল, তাহা কাহারও কাছে বলিতে না পাইয়া বুড়ীর মন অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। যদি চঞ্চলকুমারী তাহাকে পুরস্কার দিয়া কথা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া না দিত, তবে বোধ হয় বুড়ীর মন এত ব্যস্ত না হইলেও হইতে পারিত। কিন্তু যখন সে কথা প্রকাশ করিবার জন্য বিশেষ নিষেধ হইয়াছে, তখন বুড়ীর মন কাজে কাজেই কথাটি বলিবার জন্য বড়ই আকুল হইয়া উঠিল। বুড়ী কি করে, একে সত্য করিয়া আসিয়াছে, তাহাতে হাত পাতিয়া মোহর লইয়া নিমক খাইয়াছে, কথা প্রকাশ পাইলেও দুরন্ত বাদশাহের হস্তে চঞ্চলকুমারীর বিশেষ অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা, তাহাও বুঝিতেছে। হঠাৎ কথা কাহারও সাক্ষাতে বলিতে পারিল না। কিন্তু বুড়ীর আর দিবসে আহার হয় না—রাত্রিতে নিদ্রা হয় না। শেষ আপনা আপনি শপথ করিল যে, এ কথা কাহারও সাক্ষাতে বলিবে না। তাহার পরেই তাহার পুত্র আহার করিতে বসিল—বুড়ী ছেলের সান্‌কির উপর একটু রসাল কাবাব তুলিয়া দিয়া বলিল, "খা! বাবাজান! খা, খা লেও, য়ৈসা কাবাব রূপনগরসে আনেকে বক্ত এক রোজ বানা থা, ওঁর কভী নেহিন্ বনা।"

ছেলে খাইতে খাইতে বলিল, "আম্মাজী! রূপনগরকা যো কেস্‌সা আপ ফরমায়েঙ্গে বোলীথা।"

মা বলিল, "চুপ রহ, বাত্ মুহ্‌মে মৎ লেও বাপ্‌জান্! মেয়নে কেয়া বোলীথা? খেয়ালমে বোলীথী শায়েদ্।"

বুড়ী এখন ভুলিয়া গিয়াছিল যে, পূর্ব্বে এক সময়ে চঞ্চলকুমারীর কথাটা তাহার উদরমধ্যে অত্যন্ত দংশন আরম্ভ করায়, তিনি পুত্রের সাক্ষাতে একটু উঃ আঃ করিয়াছিলেন। এবারকার উত্তর

শুনিয়া ছেলে বলিল, "চুপ রহেকে কাহে মাজী? ঐসা কিয়া বাত্ হোগী?"

মা। শুন্‌নেকা মাফিক্ বাত্ নেহিন্ বাপজান্!

ছেলে। তব্ রহনে দিজিয়ে।

মা। ঔর কুছ্ নেহিন্, রূপনগরওয়ালী কুমারীন্‌কী বাত।

ছেলে। বহ্ কুমারীন্ বড়া খুবসুরত? য়েহ ঐসা পুষিদা বাত।

মা। সো নেহিন্—বাঁদীকি বড়া দেমাগ। ইয়া আল্লা! মেয়নে কেয়া বোলচুকা!

ছেলে। কাঁহা রূপনগর গড়, কাঁহা ওঁহাকা রাজকুমারীন্‌কী দেমাগ—ইয়ে বাত্ আপ্‌কা বোলনাই কিয়া জরুর—হামারা শুননাই কিয়া জরুর?

মা। স্রেফ দেমাগ বাপজান্! লৌণ্ডীনে বাদশাহে আলম্‌কো নেহিন্ মান্‌তী!

ছেলে। বাদশাহে আলম্‌কো গালি দেই হোগী?

মা। গালি—বাপ্‌জান্! উস্‌সেভী জবর কুছ্।

ছেলে। উস্‌সেভী জবর! কিয়া হো সক্‌তা? বাদ্‌শাহ আলম্‌কো ঔর মার সক্‌তা নেহিন্।

মা। উস্‌সেভী জবর।

ছেলে। মার্‌সেভী জবর?

মা। বাপ্‌জান্ ঔর পুছিও মৎ—মেয়নে উস্‌কী নিমক খাইন্।

ছেলে। নিমক খায়ে হো! কিস্‌তরে মা?

মা। আস্‌রফি দিন।

ছেলে। কাহে মাজী?

মা। উস্‌কী গুনাহ্‌কে বাত্ কিসিকা পাস বোল্‌না মনাসেব নেহিন্, এস্ লিয়ে।

ছেলে। আচ্ছা বাত্ হৈ। মুঝ্‌কো একঠো আস্‌রফি বখ্‌শিশ্ ফর্‌মাইয়ে।

মা। কাহে রে বেটা?

ছেলে। নেহিন্ ত মুঝ্‌কো বোল দিজিয়ে বাত্‌ঠো কিয়া হৈ?

মা। বাত্ ঔর কিয়া, বাদশাহকা তস্‌বীর—তোবা! তোবা! বাৎঠো আবহী নিকলীথী।

ছেলে। তস্‌বীর ভাঙ্গডালা?

মা। আরে বেটা, লাথ্‌সে ভাঙ্গডালা! তোবা! মেয়নে নেমকহারামী কর চুকা!

ছেলে। নিমকহারামী কিয়া হৈ ইসমে,—তোম্ মা, মেয়নে বেটা! হামারা বোল্‌নেসে নিমকহারামী কিয়া হৈ?

মা। দেখিও বাপজান্, কিস্‌ইকো বলিও মৎ।

ছেলে। আপ্ খাতেরজমা রহিয়ে—কিস্‌ইক পাস নেহিন্ বোলেঙ্গে।

তখন বুড়ী বিলক্ষণ রসরঞ্জিত করিয়া চিত্র দলনের ব্যাপারটা সমস্ত বলিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

দরিয়া বিবি

বুড়ীর পুত্রের নাম খিজির সেখ। সে তস্‌বীর আঁকিত। দিল্লীতে তাহার দোকান। মা'র কাছে দুই দিন থাকিয়া সে দিল্লী গেল। দিল্লীতে তাহার এক বিবি ছিল। সেই দোকানেই থাকিত। বিবির নাম ফতেমা। খিজির, মা'র কাছে রূপনগরের কথা যাহা শুনিয়াছিল, তাহা সমস্তই ফতেমার কাছে বলিল। সমস্ত কথা বলিয়া, খিজির ফতেমাকে বলিল যে, "তুমি এখনই দরিয়া বিবির কাছে যাও। এই সংবাদ বেগম সাহেবাকে বেচিয়া আসিতে বলিও। কিছু পাওয়া যাইবে।"

দরিয়া বিবি পাশের বাড়ীতেই বাস করে, ঘরের পিছন দিয়া যাওয়া যায়। অতএব ফতেমা বিবি, বেপরদা না হইয়াও দরিয়া বিবির গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

খিজির বা ফতেমার বিশেষ পরিচয় দিবার প্রয়োজন হয় নাই। কিন্তু দরিয়া বিবির বিশেষ পরিচয় চাহি। দরিয়া বিবির আসল নাম দবীর-উন্নিসা কি এমনি একটা কিছু; কিন্তু সে নাম ধরিয়া কেহ ডাকিত না—দরিয়া বিবি বলিয়াই ডাকিত। তার বাপ-মা ছিল না, কেবল জ্যেষ্ঠা ভগিনী আর একটা বুড়ী ফুফু কি খালা কি এমনই একটা কি ছিল। বাড়ীতে পুরুষ মানুষ কেহ বাস করিত না। দরিয়া বিবির বয়স সতের বৎসরের বেশী নহে—তাহাতে আবার কিছু খর্ব্বাকার, পনের বছরের বেশী দেখাইত না। দরিয়া বিবি বড় সুন্দরী, ফুটন্ত ফুলের মত, সর্ব্বদা প্রফুল্ল।

দরিয়া বিবির ভগিনী অতি উত্তম সুর্‌মা ও আতর প্রস্তুত করিতে পারিত। তাহাই বিক্রয় করিয়া তাহাদের দিনপাত হইত। আপনারা একা বা দোলা করিয়া বড় মানুষের বাড়ী গিয়া বেচিয়া আসিত। দুঃখী মানুষ, রাত্রি হইলে পদব্রজেও যাইত। বাদশাহের অন্তঃপুরে কাহারও যাইবার অধিকার ছিল না—বাহিরের স্ত্রীলোকেরও না—

কিন্তু দরিয়া বিবির সেখানে যাইবারও উপায় ছিল। তাহা পরে বলিতেছি।

ফতেমা আসিয়া দরিয়া বিবিকে চঞ্চলকুমারীর সংবাদ বলিল এবং বলিয়া দিল যে, ঐ সংবাদ বিক্রয় করিয়া অর্থ আনিতে হইবে।

দরিয়া বিবি বলিল, "রঙমহালের ভিতর প্রবেশ করিতে হইবে—পরওয়ানাখানা কোথায়?"

ফতেমা বলিল, "তোমারই কাছে আছে।" দরিয়াবিবি তখন পেটেরা খুলিয়া একখানা কাগজ বাহির করিল। তাহা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিয়া বলিল, "এইখানা বটে।"

দরিয়া বিবি তখন কিছু সুর্মা লইয়া ও পরওয়ানা লইয়া বাহির হইল।

দ্বিতীয় খণ্ড

নন্দনে নরক

প্রথম পরিচ্ছেদ

অদৃষ্ট-গণনা

জ্যোৎস্নালোকে, শ্বেত-সৈকত-পুলিনমধ্য-বাহিনী নীল-সলিলা যমুনার উপকূলে নগরী-গণপ্রধানা মহানগরী দিল্লী প্রদীপ্ত মণিখণ্ডবৎ জ্বলিতেছে—সহস্র সহস্র মর্মরাদি-প্রস্তর-নির্মিত মিনার, গুম্বজ, বুরুজ ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া চন্দ্রালোকের রশ্মিরাশি প্রতিফলিত করিতেছে, অতিদূরে কুতবমিনারের বৃহচ্চূড়া ধূমময় উচ্চস্তম্ভবৎ দেখা যাইতেছিল। নিকটে জুম্মা মসজিদের চারি মিনার নীলাকাশ ভেদ করিয়া চন্দ্রালোকে উঠিয়াছে. রাজপথে রাজপথে পণ্যবীথিকা, বিপণিতে বিপণিতে শত শত দীপমালা, পুষ্প-বিক্রেতার পুষ্পরাশির গন্ধ, নাগরিক-জনপরিহিত পুষ্পরাজির গন্ধ, আতর-গোলাপের সুগন্ধ, গৃহে-গৃহে সঙ্গীত-ধ্বনি, বহুজাতীয় বাদ্যের নিক্কণ, নাগরিগণের কখন উচ্চ কখন মধুর হাসি, অলঙ্কার-শিঞ্জিত, —এই সমস্ত একত্র হইয়া নরকে নন্দনকাননের ছায়ার ন্যায় অদ্ভুত প্রকার মোহ জন্মাইতেছে। ফুলের ছড়াছড়ি, আতর-গোলাপের ছড়াছড়ি, নর্ত্তকীর নূপুরনিক্কণ, গায়িকার কণ্ঠে সপ্তস্বরের আরোহণ-অবরোহণ, বাদ্যের ঘটা, কমনীয় কামিনী-করতল-কলিত তালের চট্-চটা; মদ্যের প্রবাহ, বিলোল কটাক্ষবহ্নি-প্রবাহ, খিচুড়ি-পোলাওয়ের রাশি রাশি; বিকট, কপট, মধুর, চতুর—চতুর্ব্বিধ হাসি; পথে পথে অশ্বের পদ-ধ্বনি, দোলার বাহকের বীভৎস ধ্বনি, হস্তীর গলঘণ্টার ধ্বনি, একার ঝন্‌ঝনি—শকটের ঘ্যান্‌ঘ্যানানি।

নগরের মধ্যে বড় গুল্‌জার চাঁদনী চৌক। সেখানে রাজপুত বা তুর্কী অশ্বারূঢ় হইয়া স্থানে স্থানে পাহারা দিতেছে। জগতে যাহা কিছু মূল্যবান, তাহা দোকান সকলে থরে থরে সাজান আছে। কোথাও নর্ত্তকী রাস্তায় লোক জমাইয়া সারঙ্গের সুরে নাচিতেছে, গাহিতেছে; কোথাও বাজিকর বাজি করিতেছে; প্রত্যেকের নিকট শত শত দর্শক ঘেরিয়া দাঁড়াইয়া দর্শন করিতেছে। সকলের অপেক্ষা জনতা 'জ্যোতিষী'দিগের কাছে। মোগল বাদশাহদিগের সময়ে জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের যেরূপ আদর ছিল, এমন বোধ হয় আর কখনও হয় নাই। হিন্দু-মুসলমানে তাহাদের তুল্য আদর করিতেন। মোগল বাদ্‌শাহেরা জ্যোতিষ-শাস্ত্রের অতিশয় বশীভূত ছিলেন, তাঁহাদিগের গণনা না জানিয়া অনেক সময় অতি গুরুতর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন না। যে সকল ঘটনা এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে, তাহার কিছু পরে, ঔরঙ্গজেবের কনিষ্ঠ পুত্র আকবর রাজবিদ্রোহী হইয়াছিলেন। পঞ্চাশ হাজার রাজপুত সেনা তাঁহার সহায় ছিল; ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে অল্প সেনাই ছিল। কিন্তু জ্যোতির্ব্বিদের গণনার উপর নির্ভর করিয়া আকবর সৈন্যযাত্রায় বিলম্ব করিলেন। ইতিমধ্যে ঔরঙ্গজেব কৌশল করিয়া তাঁহার চেষ্টা নিষ্ফল করিলেন।

দিল্লীর চাঁদনী চৌকে, জ্যোতিষিগণ রাজপথে আসন পাতিয়া পুথি-পাঁজি লইয়া মাথায় উষ্ণীষ

বাঁধিয়া বসিয়া আছেন। শত শত স্ত্রী-পুরুষ আপন আপন অদৃষ্ট গণাইবার জন্য তাঁহাদের কাছে গিয়া বসিয়া আছে, পরদানশীন বিবিরাও মুড়িঝুড়ি দিয়া যাইতেও সঙ্কোচ করে নাই। এক জন জ্যোতিষীর আসনের চারিপাশে বড় জনতা। তাহার বাহিরে একজন অবগুণ্ঠনবতী যুবতী ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। জ্যোতিষীর কাছে যাইবার ইচ্ছা, কিন্তু সাহস করিয়া জনতা ঠেলিয়া প্রবেশ করিতে পারিতেছে না, ইতস্ততঃ দেখিতেছে। এমন সময় সেই স্থান দিয়া এক জন অশ্বারোহী পুরুষ যাইতেছিল।

অশ্বারোহী যুবা পুরুষ। দেখিয়া আহেলে-বিলায়ত মোগল বলিয়া বোধ হয়। তিনি অত্যন্ত সুশ্রী, মোগলের ভিতরও এরূপ সুশ্রী পুরুষ দুর্লভ। তাঁহার বেশভূষায় অতিশয় পারিপাট্য দেখিয়া এক জন বিশেষ সম্ভ্রান্ত লোক বলিয়া বোধ হয়। অশ্বও সম্ভ্রান্তবংশীয়।

জনতার জন্য অশ্বারোহী অতি মন্দভাবে অশ্ব-চালনা করিতেছিলেন। যে যুবতী ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতেছিল, সে তাঁহাকে দেখিতে পাইল। দেখিয়াই নিকটে আসিয়া ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া থামাইল। বলিল, "খাঁ সাহেব—মবারক সাহেব—মবারক!"

মবারক—অশ্বারোহীর ঐ নাম—জিজ্ঞাসা করিল, "কে তুমি?"

যুবতী বলিল, "ইয়া আল্লা! আর কি চিনিতেও পার না?"

মবারক বলিল, "দরিয়া?"

দরিয়া বলিল, "জী!"

মবা। তুমি এখানে কেন?

দরিয়া। কেন, আমি ত সকল জায়গায় যাই। তোমার ত নিষেধ নাই। তুমি বারণ কর কি?

মবা। আমি কেন বারণ করিব? তুমি আমার কে?

তার পর মৃদুতর স্বরে মবারক বলিল, "কিছু চাই কি?"

দরিয়া কাণে আঙ্গুল দিয়া বলিল, "তৌবা! তোমার টাকা আমার হারাম। আমরা আতর বেচিয়া খাইতে জানি।"

মবা। তবে আমাকে পাকড়া করিলে কেন?

দরিয়া। নাম, তবে বলিব।

মবারক ঘোড়া হইতে নামিল। বলিল, "এখন বল।"

দরিয়া বলিল, "এই ভিড়ের ভিতর এক জন জ্যোতিষী বসিয়া আছেন। ইনি নূতন আসিয়াছেন, ইঁহার মত জ্যোতির্ব্বিদ্ কখন না কি আসেন নাই। ইঁহার কাছে তোমাকে তোমার কেস্মত গণাইতে হইবে।"

মবা। আমার কেস্মত জানিয়া তোমার কি হইবে? তোমার গণাও।

দরিয়া। আমার কেস্মত আমি জানিতে চাহি না। না গণাইয়াই তাহা জানিতে পারিয়াছি। তোমার কেস্মত জানাই আমার দরকার।

এই বলিয়া দরিয়া মবারকের হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইবার উপক্রম করিল। মবারক বলিল,—"আমার ঘোড়া ধরে কে?"

গোটাকতক ছেলে রাজপথে দাঁড়াইয়া লাড্ডু খাইতেছিল। মবারক বলিল, "তোমরা কেহ এক লহমা আমার ঘোড়াটা ধরিয়া রাখ। আমি আসিয়া তোমাদের আরও লাড্ডু দিব।"

এই বলিবামাত্র দুই তিনটা ছেলে আসিয়া ঘোড়া ধরিল। একটা প্রায় নগ্ন—ঘোড়ার উপর চড়িয়া বসিল। মবারক তাহাকে মারিতে গেলেন। কিন্তু তাহার প্রয়োজন হইল না—ঘোড়া একবার পিছনের পা উঁচু করিয়া তাহাকে ফেলিয়া দিল। তাহাকে ভূমিশয্যাগত দেখিয়া অপর বালকেরা তাহার হাতের লাড্ডু কাড়িয়া লইয়া ভোজন করিল। তখন মবারক নিশ্চিন্ত হইয়া অদৃষ্ট গণাইতে গেলেন।

মবারককে দেখিয়া অপর লোক সকল পথ ছাড়িয়া দিল। দরিয়া বিবি তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গেল। জ্যোতিষীর কাছে মবারক হাত পাতিয়া দিলেন। জ্যোতিষী অনেক দেখিয়া শুনিয়া বলিল, "আপনি গিয়া বিবাহ করুন।" পশ্চাৎ হইতে ভিড়ের ভিতর লুকাইয়া দরিয়া বিবি বলিল, "করিয়াছে।"

জ্যোতিষী বলিল, "কে ও কথা বলিল?"

মবারক বলিলেন, "ও একটা পাগলী। আপনি বলিতে পারেন, আমার কি রকম বিবাহ হইবে?"

জ্যোতিষী বলিল, "আপনি কোন রাজপুত্রীকে বিবাহ করুন।"

মবারক বলিল, "তাহা হইলে কি হইবে?"

জ্যোতিষী উত্তর করিল, "তাহা হইলে আপনার খুব পদবৃদ্ধি হইবে।"

ভিড়ের ভিতর হইতে দরিয়া বিবি বলিল, "আর মৃত্যু?"

জ্যোতিষী বলিল, "কে ও?"

মবা। পাগলী।

জ্যোতিষী। পাগলী নয়। ও, বোধ হয়, মনুষ্য নয়। আমি আর আপনার হাত দেখিব না।

মবারক কিছু বুঝিতে পারিলেন না। জ্যোতিষীকে কিছু দিয়া ভিড়ের ভিতর দরিয়ার অন্বেষণ করিলেন। কিছুতেই আর তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। তখন কিছু বিমনভাবে অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক দুর্গাভিমুখে চলিলেন। বলা বাহুল্য, বালকেরা কিছু লাড্ডু পাইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জেব-উন্নিসা

দরিয়ার সংবাদবিক্রয়ের কি হইল? সংবাদ-বিক্রয় আবার কি? কাহাকেই বা বিক্রয় করিবে? সে কথাটা বুঝাইবার জন্য মোগল-সম্রাটের অবরোধের কিছু পরিচয় দিতে হইবে।

ভারতবর্ষীয় মহিলারা রাজ্যশাসনে সুদক্ষ বলিয়া বিখ্যাত। পশ্চিমে কদাচিৎ একটা জেনোবিয়া, ইসাবেলা, এলিজাবেথ বা ক্যাথারাইন পাওয়া যায়। কিন্তু ভারতবর্ষের অনেক রাজকুলজারাই রাজ্যশাসনে সুদক্ষ। মোগল-সম্রাটদিগের কন্যাগণ এ বিষয়ে বড় বিখ্যাত। কিন্তু যে পরিমাণে তাহারা রাজনীতিবিশারদ, সেই পরিমাণে তাহারা ইন্দ্রিয়পরবশ ও ভোগবিলাসপরায়ণ ছিল। ঔরঙ্গজেবের দুই ভগিনী, জাঁহানারা ও রৌশনারা। জাঁহানারা শাহজাঁহার বাদশাহীর প্রধান সহায়। শাহজাঁহা তাঁহার পরামর্শ ব্যতীত কোন রাজকার্য্য করিতেন না। তাঁহার পরামর্শের অনুবর্ত্তী হইয়া কার্য্যে সফল ও যশস্বী হইতেন। তিনি পিতার বিশেষ হিতৈষিণী ছিলেন। কিন্তু তিনি যে পরিমাণে এ সকল গুণবিশিষ্টা ছিলেন, ততোধিক পরিমাণে ইন্দ্রিয়পরায়ণা ছিলেন। ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তির জন্য অসংখ্য লোক তাঁহার অনুগৃহীত পাত্র ছিল। সেই সকল লোকের মধ্যে য়ুরোপীয় পর্য্যটকেরা এমন ব্যক্তির নাম করেন যে, তাহা লিখিয়া লেখনী কলুষিত করিতে পারিলাম না।

রৌশনারা পিতৃদ্বেষিণী, ঔরঙ্গজেবের পক্ষপাতিনী ছিলেন। তিনিও জাঁহানারার মত রাজনীতিবিশারদ এবং সুদক্ষ ছিলেন এবং ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে জাঁহানারার ন্যায় বিচারশূন্য, বাধাশূন্য এবং তৃপ্তিশূন্য ছিলেন। যখন পিতাকে পদচ্যুত ও অবরুদ্ধ করিয়া তাঁহার রাজ্য অপহরণে ঔরঙ্গজেব প্রবৃত্ত, তখন রৌশনারা তাঁহার প্রধান সহায়। ঔরঙ্গজেবও রৌশনারার বড় বাধ্য ছিলেন। ঔরঙ্গজেবের বাদশাহীতে রৌশনারা দ্বিতীয় বাদশাহ ছিলেন।

কিন্তু রৌশনারার দুরদৃষ্টক্রমে তাঁহার এক জন মহাশক্তিশালিনী প্রতিদ্বন্দ্বিনী তাঁহার বিরুদ্ধে মাথা তুলিল। ঔরঙ্গজেবের তিন কন্যা। কনিষ্ঠা দুইটির সঙ্গে বন্দী ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয়ের তিনি বিবাহ দিলেন। জ্যেষ্ঠা জেব উন্নিসা* বিবাহ করিলেন না। পিতৃষ্বসাদিগের ন্যায় বসন্তের ভ্রমরের মত পুষ্পে পুষ্পে মধুপান করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

পিসী-ভাইঝি উভয়ে অনেক স্থলেই মদন-মন্দিরে প্রতিযোগিনী হইয়া দাঁড়াইতেন। সুতরাং ভাইঝি পিসীকে বিনষ্ট করিবার সঙ্কল্প করিলেন। পিসীর মহিমা তিনি পিতৃসমীপে বিবৃত করিতে লাগিলেন। ফল এই দাঁড়াইল যে, রৌশনারা পৃথিবী হইতে অদৃশ্যা হইলেন, জেব উন্নিসা তাঁহার পদমর্য্যাদা ও তাঁহার পদানতগণকে পাইলেন।

পদমর্য্যাদার কথা বলিলাম, তাহার একটু তাৎপর্য্য আছে। বাদশাহের অন্তঃপুরে খোজা ভিন্ন কোন পুরুষ প্রবেশ করিত না, অন্ততঃ করিবার নিয়ম ছিল না। অন্তঃপুরে পাহারার কাজের জন্য একটা স্ত্রীসেনা নিযুক্ত ছিল। যেমন হিন্দুরাজগণ যবনীগণকে প্রতীহারে নিযুক্ত করিতেন, মোগল-বাদশাহেরাও তাই করিতেন। তাতার-জাতীয়া সুন্দরীগণ মোগলসম্রাটের অবরোধে প্রহরিণী ছিলেন। এই স্ত্রীসৈন্যের এক জন নায়িকা ছিলেন; তিনি সেনাপতির স্থানীয়া। তাঁহার পদ উচ্চপদ বলিয়া গণ্য এবং বেতন ও সম্মান তদনুযায়ী। এই পদে রৌশনারা নিযুক্ত ছিলেন। তিনি সহসা অপার্থিব অন্ধকারে অন্তর্হিত হইলে জেব-উন্নিসা তাঁহার পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। যিনি এই পদে নিযুক্ত হইতেন, তিনি রাজান্তঃপুরের সর্ব্ববিষয়ে

---

*মুসলমান-ইতিহাসে ইনি জেব-উন্নিসা বা জেব-উন্নিসা নামে পরিচিতা। পাদ্রী কক্র বলেন, ইঁহার নাম ফকথর-উন্নিসা।

কর্ত্রী হইতেন। সুতরাং জেব-উন্নিসা রঙ্মহালের † সর্ব্বকর্ত্রী ছিলেন। সকলেই তাঁহার অধীন; প্রতিহারিগণ, খোজারা, বাঁদীরা, দৌবারিকগণ, বাহকগণ, পাচকগণ সকলেই তাঁহার অধীন। অতএব তিনি যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে মহালমধ্যে আসিতে দিতে পারিতেন।

দুই শ্রেণীর লোক তাঁহার কৃপায় অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিত, এক প্রণয়ভাজন ব্যক্তিগণ—অপর যাহারা তাঁহার কাছে সংবাদ বেচিত।

বলিয়াছি, জেব-উন্নিসা এক জন প্রধান Politician. মোগল-সাম্রাজ্যরূপ জাহাজের হাল এক প্রকার তাঁহার হাতে। তিনি মোগল-সাম্রাজ্যের "নিয়ামক নক্ষত্র" বলিয়াও বর্ণিত হইয়াছেন। জানা আছে, Politician সম্প্রদায়ের একটা বড় প্রয়োজন—সংবাদ। কোথায় কি হইতেছে, গোপনে সব জানা চাই। দুর্মুখের মুনিব রামচন্দ্র হইতে বিষমার্ক পর্য্যন্ত সকলেই ইহার প্রমাণ। জেব-উন্নিসা এ কথাটা বিলক্ষণ বুঝিতেন। চারিদিক্ হইতে তিনি সংবাদ সংগ্রহ করিতেন। সংবাদ সংগ্রহের জন্য তাঁর কতকগুলি লোক নিযুক্ত ছিল। তার মধ্যে তস্‌বীরওয়ালা খিজির এক জন। তার মা নানা দেশে তস্‌বীর বেচিতে যাইত। খিজির তাহার নিকট হইতে সংবাদ সংগ্রহ করিতেন। দরিয়া বিবির ভগিনীও আতর ও সুর্‌মা বিক্রয়ের উপলক্ষে দিল্লীর ভিতর ভ্রমণ করিয়া অনেক সংবাদ সংগ্রহ করিত। এই সকল সংবাদ দরিয়া জেব-উন্নিসার কাছে দিয়া আসিত। জেব উন্নিসা প্রতিবার কিছু কিছু পুরস্কার দিতেন। ইহাই সংবাদবিক্রয়। সংবাদ-বিক্রয়ার্থ দরিয়া মহালমধ্যে প্রবেশ করিতে বাধা না পায়, তজ্জন্য জেব-উন্নিসা তাহাকে একটা পরওয়ানা দিয়াছিলেন। পরওয়ানার মর্ম্ম এই, "দরিয়া বিবি সুর্‌মা বিক্রয়ের জন্য রঙ্মহালে প্রবেশ করিতে পারে।"

কিন্তু দরিয়া বিবি রঙ্মহালে প্রবেশকালে হঠাৎ বিঘ্ন প্রাপ্ত হইল। দেখিল, মবারক খাঁ রঙ্মহাল মধ্যে প্রবেশ করিল। দরিয়া তখন প্রবেশ করিল না—একটু বিলম্ব করিয়া প্রবেশ করিল।

দরিয়া প্রবেশ করিয়া দেখিল, যেখানে জেব-উন্নিসার বিলাসগৃহ, মবারক সেইখানে গেল। দরিয়া একটা বৃক্ষবাটিকার ছায়ার মধ্যে লুকাইয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

† বাদশাহের অন্তঃপুরকে রঙমহাল বা মহাল বলে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ঐশ্বর্য্য-নরক

দিল্লী মহানগরীর সারভূত দিল্লীর দুর্গ; দুর্গের সারভূত রাজপ্রাসাদমালা। এই রাজপ্রাসাদমালার ভিতর অল্প ভূমিমধ্যে যত ধনরাশি, রত্নরাশি, রূপরাশি এবং পাপরাশি ছিল, সমস্ত ভারতবর্ষে তাহা ছিল না। রাজপ্রাসাদমালার সারভূত অন্তঃপুর বা রঙ্মহাল। ইহা কুবের ও কন্দর্পের রাজ্য—চন্দ্র-সূর্য্য তথায় প্রবেশ করেন না; যম গোপনে ভিন্ন তথায় যান না; বায়ুরও গতিরোধ। তথায় গৃহসকল বিচিত্র; গৃহসজ্জা বিচিত্র; অন্তঃপুরবাসিনী সকল বিচিত্র। এমন রত্ন-খচিত, ধবলপ্রস্তর-নির্ম্মিত কক্ষরাজি কোথাও নাই—এমন নন্দনকাননিন্দিনী উদ্যানমালা আর কোথাও নাই; এমন উর্ব্বশী-মেনকা-রম্ভার গর্ব্বখর্ব্বকারিণী সুন্দরীর সারি আর কোথাও নাই; এত ভোগবিলাস জগতে আর কোথাও নাই। এত মহাপাপ আর কোথাও নাই।

ইহার মধ্যে জেব-উন্নিসার বিলাসগৃহ আমাদের উদ্দেশ্য।

অতি মনোহর বিলাসগৃহ। শ্বেতকৃষ্ণ প্রস্তরের হর্ম্ম্যতল। শ্বেতমর্ম্মরনির্ম্মিত কক্ষপ্রাচীর; পাতরে রত্নের লতা, রত্নের পাতা, রত্নের ফুল, রত্নের ফল, রত্নের পাখী, রত্নের ভ্রমর। কিয়দ্দূর ঊর্দ্ধে সর্ব্বত্র দর্পণমণ্ডিত। তাহার ধারে ধারে সোনার কামদার বীট। ঊর্দ্ধে রূপার তারের চন্দ্রাতপ, তাহাতে মতির ছোট ঝালর; এবং সদ্য-নিচিত পুষ্পরাশির বড় ঝালর। হর্ম্ম্যতলে নববর্ষাসমাগমোদ্গত কোমল তৃণরাজি অপেক্ষাও সুকোমল গালিচা পাতা; তাহার উপর গজদন্তনির্ম্মিত রত্নালঙ্কৃত পালঙ্ক। তাহার উপর জরির কামদার বিছানায় জরির কামদার মখমলের বালিস। শয্যার উপর বিবিধ পাত্রে রাশি রাশি সুগন্ধি পুষ্প; পাত্রে পাত্রে আতর গোলাপ; সুগন্ধি, যত্নপ্রস্তুত তাম্বূলের রাশি। আর পৃথক্ সুবর্ণ-পাত্রে সুপের মদ্য। সকলের মধ্যে পুষ্পরাশিকে, রত্নরাশিকে ম্লান করিয়া প্রৌঢ়া সুন্দরী জেব-উন্নিসা পানপাত্রহস্তে বাতায়নপথে নিশীথ-নক্ষত্র-শোভা নিরীক্ষণ করিতে করিতে মৃদুপবনে পুষ্পমণ্ডিত মস্তক শীতল করিতেছিলেন, এমন সময়ে মবারক খাঁ তথায় উপস্থিত।

মবারক জেব-উন্নিসার নিকট গিয়া বসিলেন এবং তাম্বুলাদি প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া চরিতার্থ হইলেন।

জেব-উন্নিসা বলিল, "না খুঁজিতে যে আসে, সেই ভালবাসে।"

মবারক বলিল, "না ডাকিতে আসিয়াছি, বেয়াদবী হইয়াছে। কিন্তু ভিক্ষুক না ডাকিতেই আসিয়া থাকে।"

জেব-উন্নিসা। তোমার কি ভিক্ষা প্রাণাধিক।

মবারক। ভিক্ষা এই যে, যেন মোল্লার হুকুমে ঐ শব্দে আমার অধিকার হয়।

জেব-উন্নিসা হাসিয়া বলিল, "ঐ সেই পুরাতন কথা। বাদশাহজাদীরা কখন বিবাহ করে?"

মবা। তোমার কনিষ্ঠা ভগিনীগণ ত বিবাহ করিয়াছে?

জেব। তাহারা শাহজাদা বিবাহ করিয়াছে। বাদশাহজাদীরা শাহজাদা ভিন্ন বিবাহ করে না। বাদশাহজাদীরা দুই-শতী মন্‌সবদারকে কি বিবাহ করিতে পারে?

মবা। তুমি মালেকে মুলুক। তুমি বাদশাহকে যাহা বলিবে, তিনি তাহাই করিবেন, ইহা সর্ব্বলোক জানে।

জেব। যাহা অনুচিত, তাহাতে আমি বাদশাহকে অনুরোধ করিব না।

মবা। আর এই কি উচিত, শাহজাদী?

জেব। এই কি?

মবা। এই মহাপাপ?

জেব। কে মহাপাপ করিতেছে?

মবারক মাথা হেঁট করিল। শেষে বলিল, "তুমি কি বুঝিতেছ না?"

জেব-উন্নিসা। যদি ইহা পাপ বলিয়া বোধ হয়, আর আসিও না।

মবারক সকাতরে বলিল, "আমার যদি সে সাধ্য থাকিত, তবে আমি আর-আসিতাম না। কিন্তু আমি ঐ রূপরাশিতে বিক্রীত।"

জেব। যদি বিক্রীত—যদি তুমি আমার কেনা—তবে যা বলি, তাই কর। চুপ করিয়া থাক।

মবা। যদি আমি একাই ঐ পাপের দায়ী হইতাম, না হয় চুপ করিয়া থাকিতাম। কিন্তু আমি তোমাকে আপনার অধিক ভালবাসি।

জেব-উন্নিসা উচ্চহাসি হাসিল। বলিল, "বাদশাহজাদীর পাপ!"

মবারক বলিল, "পাপপুণ্য আল্লার হুকুম।"

জেব। আল্লা এ সকল হুকুম ছোটলোকের জন্য করিয়াছেন—কাফেরের জন্য। আমি কি হিন্দুদের বামুনের মেয়ে, না রাজপুতের মেয়ে যে, এক স্বামী করিয়া, চিরকাল দাসীত্ব করিয়া, শেষ আগুনে পুড়িয়া মরিব? আল্লা যদি আমার জন্য সেই বিধি করিতেন, তবে আমাকে কখনও বাদশাহজাদী করিতেন না।

মবারক একেবারে আকাশ হইতে পড়িল—এরূপ কদর্য্য কথা সে কখনও শুনে নাই। সেই পাপস্রোতোময়ী দিল্লীতেও কখনও শুনে নাই। অন্য কেহ এ কথা তাহার সম্মুখে বলিলে সে বলিত, "তুমি বজ্রহত হইয়া মর।" কিন্তু জেব-উন্নিসার রূপের সমুদ্রে সে ডুবিয়া গিয়াছিল—তাহার আর দিগ্বিদিক্ জ্ঞান ছিল না। সে কেবল বিস্মিত হইয়া রহিল।

জেব-উন্নিসা বলিতে লাগিল, "ও কথা যাক্। অন্য কথা আছে। ও কথা যেন আর কখনও না শুনি। শুনি যদি—"

মবারক। আমাকে ভয় দেখাইবার কি প্রয়োজন? আমি জানি, তুমি যাহার উপর অপ্রসন্ন হইবে, এক দণ্ড তাহার কাঁধে মাথা থাকিবে না। কিন্তু ইহাও বোধ হয় তুমি জান যে, মবারক মৃত্যুকে ভয় করে না।

জেব-উন্নিসা। মরণের অপেক্ষা আর কি দণ্ড নাই?

মবা। আছে—তোমার বিচ্ছেদ।

জেব-উন্নিসা। বার বার অসঙ্গত কথা বলিলে তাহাই ঘটিতে পারে।

মবারক বুঝিলেন যে, একটা ঘটিলে দুইটাই ঘটিবে। তিনি যদি পাপিষ্ঠা বলিয়া জেব-উন্নিসাকে পরিত্যাগ করেন, তবে তাঁহাকে নিশ্চিত নিহত হইতে হইবে। জেব-উন্নিসা মোগলরাজ্যে সর্ব্বেসর্ব্বা, খোদ ঔরঙ্গজেব তাঁহার আজ্ঞাকারী। কিন্তু সে জন্য মবারক দুঃখিত নহেন। তাঁহার দুঃখ এই যে, তিনি বাদশাহজাদীর রূপে মুগ্ধ, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবার কিছুমাত্র সাধ্য নাই; এই পাপপঙ্ক হইতে উদ্ধৃত হইবার তাঁহার শক্তি নাই।

অতএব মবারক বিনীতভাবে বলিল, "আপনি ইচ্ছাক্রমে যতটুকু দয়া করিবেন, তাহাতেই আমার জীবন পবিত্র। আমি যে আরও দুরাকাঙ্ক্ষা রাখি—তাহা দরিদ্রের ধর্ম্ম বলিয়া জানিবেন। কোন্ দরিদ্র না দুনিয়ার বাদশাহী কামনা করে?"

তখন প্রসন্ন হইয়া শাহজাদী মবারককে আসব পুরস্কার করিলেন। মধুর প্রণয়সম্ভাষণের পর তাঁহাকে আতর ও পান দিয়া বিদায় করিলেন।

মবারক রঙ্‌মহাল হইতে নির্গত হইবার পূর্ব্বেই দরিয়া বিবি আসিয়া তাঁহাকে ধৃত করিল। অন্যের অশ্রাব্য স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন, রাজপুত্রীর সঙ্গে বিবাহ স্থির হইল?" মবারক বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুই কে?"

দরিয়া। সেই দরিয়া।

মবা। দুষমন্! সয়তান! তুই এখানে কেন?

দরিয়া। জান না, আমি সংবাদ বেচি?

মবারক শিহরিল। দরিয়া বিবি বলিল, "রাজপুত্রীর সঙ্গে বিবাহ কি হইবে?"

মবা। রাজপুত্রী কে?

দরিয়া। শাহজাদী জেব-উন্নিসা বেগম সাহেব। শাহজাদী কি রাজপুত্রী নহে?

মবা। আমি তোকে এইখানে খুন করিব।

দরিয়া। তবে আমি হাল্লা করি।

মবা। আচ্ছা, না হয়, খুন না-ই করিলাম। তুই কার কাছে খবর বেচিতে আসিয়াছিস্, বল্।

দরিয়া। বলিব বলিয়াই দাঁড়াইয়া আছি। হজরৎ জেব-উন্নিসা বেগমের কাছে।

মবা। কি খবর বেচিবি?

দরিয়া। যে আজ তুমি বাজারে জ্যোতিষীর কাছে আপনার কেস্মৎ জানিতে গিয়াছিলে, তাতে জ্যোতিষী তোমাকে শাহজাদী বিবাহ করিতে বলিয়াছে। তাহা হইলে তোমার তরক্কী হইবে।

মবা। দরিয়া বিবি! আমি তোমার কাছে কি অপরাধ করিয়াছি যে, তুমি আমার উপর এই দৌরাত্ম্য করিতে প্রস্তুত?

দরিয়া। কি করিয়াছ? তুমি আমার কি না করিয়াছ? তুমি যাহা করিয়াছ, তার অপেক্ষা স্ত্রীলোকের অনিষ্ট কি আছে?

মবা। কেন পিয়ারি! আমার মত কত আছে।

দরিয়া। এমন পাপিষ্ঠ আর নাই।

মবা। আমি পাপিষ্ঠ নই। কিন্তু এখানে দাঁড়াইয়া এত কথা চলিতে পারে না। স্থানান্তরে তুমি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও। আমি সব বুঝাইয়া দিব।

এই বলিয়া মবারক আবার জেব-উন্নিসার কাছে ফিরিয়া গেল। জেব-উন্নিসাকে বলিল, "আমি পুনর্ব্বার আসিয়াছি, এ বে-আদবী মাফ করিতে হইতেছে। বলিতে আসিয়াছি যে, দরিয়া বিবি হাজির আছে—এখনই আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবে। সে পাগল। সে আপনার কাছে আমার কোন নিন্দাবাদ করিলে আমার উত্তর না লইয়া আমার প্রতি আপনি কোপ করিবেন না।"

জেব-উন্নিসা বলিলেন, "তোমার উপর কোপ করিবার আমার সাধ্য নাই। যদি তোমার উপর কখন রাগ করি, তবে আমিই দুঃখ পাইব। তোমার নিন্দা আমি কানে শুনি না।"

"এ দাসের উপর এইরূপ অনুগ্রহ চিরকাল রাখিবেন," এই বলিয়া মবারক পুনর্ব্বার বিদায় গ্রহণ করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সংবাদ বিক্রয়

যে তাতারী যুবতী অসি-চর্ম্ম হস্তে লইয়া জেব-উন্নিসার গৃহের দ্বারে প্রহরায় নিযুক্ত, সে দরিয়াকে দেখিয়া বলিল, "এত রাত্রে কেন?"

দরিয়া বিবি বলিল, "তা কি পাহারাওয়ালীকে বলিব? তুই খবর দে।"

তাতারী বলিল, "তুই বেরো—আমি খবর দিব না।"

দরিয়া বলিল, "রাগ কর কেন দোস্ত? তোমার নজরের তেজতেই কাবুল পাঞ্জাব ফতে হয়। তার উপর আবার হাতে ঢাল-তরবার—তুমি রাগিলে কি আর চলে?—এই আমার পরওয়ানা দেখ—আর এত্তেলা কর।"

প্রহরিণী রক্তাধরে একটু মধুর হাসি হাসিয়া বলিল, "তোমাকেও চিনি, তোমার পরওয়ানাও চিনি। তা এত রাত্রিতে কি আর হজরৎ বেগম সাহেবা সুর্ম্মা কিনিবে? তুমি কাল সকালে এসো। এখন প্রসন্ন থাকে, খসুমের কাছে যাও—আর না থাকে যদি—"

দরিয়া। তুই জাহান্নামে যা। তোর ঢাল তরবার জাহান্নামে যাক্—তোর ওড়না-পায়জামা জাহান্নামে যাক্—তুই কি মনে করিস্, আমি রাত দুপুরের কাজ না থাকিলে, রাত দুপুরে এয়েছি?

তখন তাতারী চুপি চুপি বলিল, "হজরত বেগম সাহেবা এস্ বকত কুছ মস্‌গুলে হোয়েঙ্গী।"

দরিয়া বলিল, "আরে বাঁদী, তা কি আমি জানি না? তুই মজা করিবি? হাঁ কর।"

তখন দরিয়া ওড়নার ভিতর হইতে এক শিশি সরাব বাহির করিল। প্রহরিণী হাঁ করিল—দরিয়া শিশি ভোর তার মুখে ঢালিয়া দিল। তাতারী শুষ্ক নদীর মত এক নিশ্বাসে তাহা শুষিয়া লইল। বলিল, "বিসমেল্লা! তোফা সরবৎ! আচ্ছা, তুমি খাড়া থাক, আমি এত্তালা করিতেছি।"

প্রহরিণী কক্ষের ভিতর গিয়া দেখিল, জেব-উন্নিসা হাসিতে হাসিতে ফুলের একটা কুকুর গড়িতেছেন,—মবারকের মত তাহার মুখটা হইয়াছে—আর বাদশাহদিগের সেরপেঁচ কল্গার মত তার লেজটা হইয়াছে। জেব-উন্নিসা প্রহরিণীকে দেখিয়া বলিল, "নাচনেওয়ালী লোগ্‌কো বোলাও।"

রঙ্‌মহালের সকল বেগমদিগের আমোদের জন্য এক এক সম্প্রদায় নর্ত্তকী নিযুক্ত ছিল, ঘরে ঘরে নৃত্যগীত হইত। জেব-উন্নিসার প্রমোদার্থ এক দল নর্ত্তকী ছিল।

প্রহরিণী পুনশ্চ কুর্ণিশ করিয়া বলিল, "যো হুকুম। দরিয়া বিবি হাজির, আমি তাড়াইয়া দিয়াছিলাম—মানা শুনিতেছে না।"

জেব। কিছু বখ্‌শিশও দিয়াছে?

প্রহরিণী সুন্দরী লজ্জিতা হইয়া ওড়নায় আকর্ণ মুখ ঢাকিল। তখন জেব-উন্নিসা বলিল, "আচ্ছা, নাচনেওয়ালী থাক্—দরিয়াকে পাঠাইয়া দে।"

দরিয়া আসিয়া কুর্ণিশ করিল। তার পর ফুলের কুকুরটি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। দেখিয়া বেগম সাহেবা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন হয়েছে দরিয়া?"

দরিয়া ফের কুর্ণিশ করিয়া বলিল, "ঠিক মন্‌সবদার মবারক খাঁ সাহেবের মত হইয়াছে।"

জেব। ঠিক! তুই নিবি?

দরিয়া। কোন্‌টা দিবেন? কুকুরটা না মানুষটা?

জেব-উন্নিসা ভ্রূভঙ্গ করিল। পরে রাগ সামলাইয়া হাসিয়া বলিল, "যেটা তোর খুসী।"

দরিয়া। তবে কুকুরটা হজরৎ বেগম সাহেবার থাক, আমি মানুষটা নিব।

জেব। কুকুরটা এখন হাতে আছে—মানুষটা এখন হাতে নাই। এখন কুকুরটাই নে।

এই বলিয়া জেব-উন্নিসা আসব-সেবন-প্রফুল্লচিত্তে যে ফুলে কুকুর গড়িয়াছিল, সেই ফুলগুলা দরিয়াকে ফেলিয়া দিতে লাগিলেন। দরিয়া তাহা কুড়াইয়া লইয়া ওড়নায় তুলিল—নহিলে বে-আদবী হইবে। তার পর সে বলিল, "আমি হুজুরের কৃপায় কুকুর মানুষ দুই পাইলাম।"

জেব। কিসে?

দ। মানুষটা আমার।

জেব। কিসে?

দ। আমার সঙ্গে সাদি হয়েছে।

জেব। নেকাল্ হিয়াসে।

জেব-উন্নিসা কতকগুলা ফুল ফেলিয়া সবলে দরিয়াকে প্রহার করিল।

দরিয়া যোড় হাত করিয়া বলিল, "মোল্লা গোওয়া সব জীবিত আছে। না হয় তাহাদের জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান।"

জেব-উন্নিসা ভ্রূভঙ্গ করিয়া বলিল, "আমার হুকুমে তাহারা শূলে যাইবে।"

দরিয়া কাঁপিল। এই ব্যাঘ্রী-তুল্যা মোগল-কুমারীরা সব পারে, তা সে জানিত। বলিল, শাহাজাদি! আমি দুঃখী মানুষ, খবর বেচিতে আসিয়াছি—আমার সে কথার প্রয়োজন নাই।

জেব। কি খবর বল্।

দরিয়া। দুইটা আছে। একটা এই মবারক খাঁ সম্বন্ধে। আজ্ঞা না পাইলে বলিতে সাহস হয় না।

জেব। বল্।

দরিয়া। ইনি আজ রাত্রে চৌকে গণেশ জ্যোতিষীর কাছে আপনার কেস্‌মৎ গণাইতে গিয়াছিলেন।

জেব। জ্যোতিষী কি বলিল?

দরিয়া। শাহজাদী বিবাহ কর। তাহা হইলে তোমার তরক্কী হইবে।

জেব। মিছা কথা। মন্‌সবদার কখন জ্যোতিষীর কাছে গেল?

দরিয়া। এখানে আসিবার আগেই।

জেব। কে এখানে আসিয়াছিল?

দরিয়া একটু ভয় খাইল। কিন্তু তখনই আবার সাহস করিয়া তসলীম দিয়া বলিল, "মবারক খাঁ সাহেব।"

জেব। তুই কেমন করিয়া জানিলি?

দরিয়া। আমি আসিতে দেখিয়াছি।

জেব। যে এ সকল কথা বলে, আমি তাহাকে শূলে দিই।

দরিয়া শিহরিল। বলিল, "বেগম সাহেবার হুজুরে ভিন্ন এ সকল কথা আমি মুখে আনি না।"

জেব। আনিলে জল্লাদের হাতে তোর জিব কাটাইয়া ফেলিব। তোর দোসরা খবর কি বল্।

দরিয়া। দোসরা খবর রূপনগরের।

দরিয়া তখন চঞ্চলকুমারীর তস্বীর ভাঙ্গার কাহিনীটা আদ্যোপান্ত শুনাইল। শুনিয়া জেব-উন্নিসা বলিলেন, "এ খবর আচ্ছা। কিছু বখশিশ পাইবি।"

তখন রঙমহালের খাজনাখানার উপর বখশিশের পরওয়ানা হইল। পাইয়া দরিয়া পলাইল।

তাতারী প্রতিহারী তাহাকে ধরিল। তরবারীখানা দরিয়ার কাঁধের উপর রাখিয়া বলিল, "পলাও কোথা সখি ?"

দ। কাজ হইয়াছে—ঘর যাইব।

প্রতিহারী। টাকা পাইয়াছ—আমায় কিছু দিবে না ?

দ। আমার টাকার বড় দরকার, একটা গীত শুনাইয়া যাই। সারেঙ্গ আন।

প্রতিহারীর সারেঙ্গ ছিল—মধ্যে মধ্যে বাজাইত। রঙমহালে গীতবাদ্যের বড় ধুম। সকল বেগমের এক এক সম্প্রদায় নর্ত্তকী ছিল; যে অপরিণীতা গণিকাদিগের ছিল না, তাহারা আপনা আপনি সে কার্য্য সম্পন্ন করিত। রঙমহালে রাত্রিতে সুর লাগিয়াই ছিল। দরিয়া তাতারীর সারেঙ্গ লইয়া গান করিতে বসিল। সে অতিশয় সুকণ্ঠ, সঙ্গীতে বড় পটু, অতি মধুর গায়িল। জেব-উন্নিসা ভিতর হইতে জিজ্ঞাসা করিল, "কে গায় ?"

প্রতিহারী বলিল, "দরিয়া বিবি।"

হুকুম হইল, "উহাকে পাঠাইয়া দাও।"

দরিয়া আবার জেব-উন্নিসার নিকটে গিয়া কুর্ণিস করিল। জেব-উন্নিসা বলিলেন, "গা। ঐ বীণ আছে।"

বীণ লইয়া দরিয়া গায়িল। গায়িল অতি মধুর। শাহজাদী অনেক অপ্সরোনিন্দিত সঙ্গীত-বিদ্যাপটু গায়ক-গায়িকার গান শুনিয়াছিলেন, কিন্তু এমন গান কখন শুনেন নাই। দরিয়ার গীত সমাপ্ত হইলে, জেব-উন্নিসা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি মবারকের কাছে কখন গায়িয়াছিলে ?"

দরিয়া। আমার এই গীত শুনিয়াই তিনি আমাকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

জেব-উন্নিসা একটা ফুলের তোড়া ফেলিয়া দরিয়াকে এমন জোরে মারিলেন যে, দরিয়ার কর্ণভূষায় লাগিয়া কান কাটিয়া রক্ত পড়িল। তখন জেব-উন্নিসা তাহাকে আরও কিছু অর্থ দিয়া বিদায় করিলেন। বলিলেন, "আর আসিস্ না।"

দরিয়া তস্লীম দিয়া বিদায় হইল। মনে মনে বলিল, "আবার আসিব—আবার জ্বালাইব—আবার মার খাইব—আবার টাকা নিব, তোমার সর্ব্বনাশ করিব।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

উদিপুরী বেগম

ঔরঙ্গজেব জগৎ-প্রথিত বাদশাহ। তিনি জগৎ-প্রথিত সাম্রাজ্যের অধিকারী হইয়াছিলেন। নিজেও বুদ্ধিমান্, কর্ম্মদক্ষ, পরিশ্রমী এবং অন্যান্য রাজগুণে গুণবান্ ছিলেন। এই সকল অসাধারণ গুণ থাকিতেও সেই জগৎ-প্রথিতনামা রাজাধিরাজ আপনার জগৎপ্রথিত সাম্রাজ্য একপ্রকার ধ্বংস করিয়া মানব-লীলা সংবরণ করিলেন।

ইহার একমাত্র কারণ, ঔরঙ্গজেব মহাপাপিষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার ন্যায় ধূর্ত্ত, কপটাচারী, পাপে সঙ্কোচশূন্য, স্বার্থপর, পরপীড়ক, প্রজাপীড়ক, দুই এক জন মাত্র পাওয়া যায়। এই কপটাচারী সম্রাট্ জিতেন্দ্রিয়তার ভাণ করিতেন—কিন্তু অন্তঃপুর অসংখ্য সুন্দরীরাজিতে মধুমক্ষিকা-পরিপূর্ণ মধুচক্রের ন্যায় দিবারাত্র আনন্দধ্বনিতে ধ্বনিত হইত।

তাঁহার মহিষীও অসংখ্য—আর সরার বিধানের সঙ্গে সম্বন্ধশূন্যা বেতনভোগিনী বিলাসিনীও অসংখ্য। এই পাপিষ্ঠাদিগের সঙ্গে এই গ্রন্থের সম্বন্ধ বড় অল্প। কিন্তু কোন কোন মহিষীর সঙ্গে এই উপাখ্যানের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে।

মোগল বাদশাহেরা যাহাকে প্রথম বিবাহ করিতেন, তিনিই প্রধানা মহিষী হইতেন। হিন্দুদ্বেষী ঔরঙ্গজেবের দুর্ভাগ্যক্রমে এক জন হিন্দুকন্যা তাঁহার প্রধানা মহিষী। আকব্বর বাদশাহ রাজপুত রাজগণের কন্যা বিবাহ করার প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। সেই নিয়ম অনুসারে সকল বাদশাহেরই হিন্দুমহিষী ছিল। ঔরঙ্গজেবের প্রধানা মহিষী যোধপুরী বেগম।

যোধপুরী বেগম প্রধানা মহিষী হইলেও, প্রেয়সী মহিষী ছিলেন না। যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রেয়সী, সে এক জন খৃষ্টিয়ানী, উদিপুরী নামে ইতিহাসে পরিচিতা। উদয়পুরের সঙ্গে ইহার কোন সম্বন্ধ ছিল

বলিয়া ইহার নাম উদিপুরী নহে। আসিয়াখণ্ডের দূরপশ্চিমপ্রান্তস্থিত যে জর্জিয়া এখন রুষিয়ারাজ্যভুক্ত, তাহাই ইহার জন্মভূমি। বাল্যকালে এক জন দাস-ব্যবসায়ী ইহাকে বিক্রয়ার্থে ভারতবর্ষে আনে, ঔরঙ্গজেবের অগ্রজ দারা ইহাকে ক্রয় করেন। বালিকা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে অদ্বিতীয় রূপলাবণ্যবতী হইয়া উঠিল। তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়া দারা তাহার অত্যন্ত বশীভূত হইলেন। বলিয়াছি, উদিপুরী মুসলমান ছিল না, খৃষ্টিয়ান। প্রবাদ আছে যে, দারাও শেষে খৃষ্টিয়ান হইয়াছিলেন।

দারাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া, তবে ঔরঙ্গজেব সিংহাসনে বসিতে পাইয়াছিলেন। দারাকে পরাস্ত করিয়া, ঔরঙ্গজেব প্রথমে তাঁহাকে বন্দী করিয়া পরে বধ করেন। দারাকে বধ করিয়া নরাধম ঔরঙ্গজেব এক আশ্চর্য্য প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিল। উড়িয়াদিগের কলঙ্ক আছে যে, বড় ভাই মরিলে ছোট ভাই বিধবা ভ্রাতৃজায়াকে বিবাহ করিয়া, তাহার শোকাপনোদন করে। এই শ্রেণীর এক জন উড়িয়াকে আমি একদা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "তোমরা এমন দুষ্কর্ম কেন কর?" সে ঝটিতি উত্তর করিল, "আজ্ঞে, ঘরের বৌ কি পরকে দিব?" ভারতেশ্বর ঔরঙ্গজেবও বোধ হয়, সেইরূপ বিচার করিলেন। তিনি কোরাণের বচন উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করিলেন যে, ইসলাম ধর্ম্মানুসারে তিনি অগ্রজপত্নী বিবাহ করিতে বাধ্য। অতএব দারার দুইটি প্রাধানা মহিষীকে স্বীয় অর্দ্ধাঙ্গের ভাগিনী হইতে আহুত করিলেন। একটি রাজপুতকন্যা, আর এক জন এই উদিপুরী মহাশয়া। রাজপুতকন্যা এই আজ্ঞা পাইয়া যাহা করিল, হিন্দুকন্যামাত্রেই সেই অবস্থায় তাহা করিবে, কিন্তু আর কোন জাতীয়া কন্যা তাহা পারিবে না—সে বিষ খাইয়া মরিল। খৃষ্টিয়ানীটা সানন্দে ঔরঙ্গজেবের কণ্ঠলগ্না হইল। ইতিহাস এই গণিকার নাম কীর্ত্তিত করিয়া জন্ম সার্থক করিয়াছেন, আর যে ধর্ম্মরক্ষার জন্য বিষপান করিল, তাহার নাম লিখিতে ঘৃণা বোধ করিয়াছেন; ইতিহাসের মূল্য এই।

উদিপুরীর যেমন অতুল্য রূপ, তেমনি অতুল্য মদ্যাসক্তি। দিল্লীর বাদশাহেরা মুসলমান হইয়াও অত্যন্ত মদ্যাসক্ত ছিলেন। তাঁহাদিগের পৌরবর্গ এ বিষয়ে তাঁহাদিগের দৃষ্টান্তানুগামী হইতেন। রঙমহালেও এ রঙের ছড়াছড়ি। এই নরকমধ্যেও উদিপুরী নাম জাহির করিয়া তুলিয়াছিল।

জেব-উন্নিসা হঠাৎ উদিপুরীর শয়নগৃহে প্রবেশ করিতে পারিল না। কেন না, ভারতেশ্বরের প্রিয়তমা মহিষী মদ্যপানে প্রায় বিলুপ্তচেতনা, বসনভূষণ কিছু বিপর্য্যস্ত, বাঁদীরা সজ্জা পুনর্বিন্যস্ত করিল; ডাকিয়া সচেতন ও সাবধান করিয়া দিল। জেব-উন্নিসা আসিয়া দেখিল, উদিপুরীর বামহস্তে সট্‌কা, নয়ন অর্দ্ধনিমীলিত, অধর-বান্ধুলীর উপর মাছি উড়িতেছে, ঝটিকাবিচ্ছিন্ন ভূপাতত বৃষ্টিনিষিক্ত পুষ্পরাশির মত উদিপুরী বিছানায় পড়িয়া আছে।

জেব-উন্নিসা আসিয়া কুর্ণিশ করিয়া বলিল, "মা! আপনার মেজাজ উত্তম ত?"

উদিপুরী অর্দ্ধজাগ্রতের স্বরে, রসনার জড়তা সহিত বলিল,—"এত রাত্রে কেন?"

জে। একটা বড় খবর আছে।

উ। কি? মারহাট্টা ডাকু মরেছে?

জে। তারও অপেক্ষা খোস খবর।

এই বলিয়া জেব-উন্নিসা গুছাইয়া, বাড়াইয়া, রং চালিয়া দিয়া, চঞ্চলকুমারীর সেই তসবীর ভাঙ্গার গল্পটা করিলেন। উদিপুরী জিজ্ঞাসা করিল, "এ আর খোসখবর কি?"

জেব-উন্নিসা বলিল, "এই মহিষের মত বাঁদীগুলা হজরতের তামাকু সাজে, আমি তাহা দেখিতে পারি না। রূপনগরের সেই সুন্দরী রাজকুমারী আসিয়া হজরতের তামাকু সাজিবে, বাদশাহের কাছে এই ভিক্ষা চাহিও।"

উদিপুরী না বুঝিয়া, নেশার ঝোঁকে বলিল, "বহুৎ আচ্ছা।"

ইহার কিছু পরে রাজকার্য্যপরিশ্রমক্লান্ত বাদশাহ শ্রমাপনয়ন জন্য উদিপুরীর মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। উদিপুরী নেশার ঝোঁকে চঞ্চলকুমারীর কথা জেব-উন্নিসার কাছে যেমন শুনিয়াছিল, তেমনই বলিল। সে আসিয়া আমার তামাকু সাজিবে, এ প্রার্থনাও জানাইল। বলিবামাত্র ঔরঙ্গজেব শপথ করিয়া স্বীকার করিলেন। কেন না, ক্রোধে অস্থির হইয়াছিলেন।

—

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

যোধপুরী বেগম

পর দিন রাজাজ্ঞা প্রচারিত হইল। রূপনগরের ক্ষুদ্র রাজার উপর এক আদেশপত্র জারি হইল। যে অদ্বিতীয় কুটিলতা-ভয়ে জয়সিংহ ও যশোবন্ত-

সিংহ প্রভৃতি সেনাপতিগণ ও আজিমশাহ প্রভৃতি শাহজাদাগণ সর্ব্বদা শশব্যস্ত—যে অভেদ্য কুটিলতা-জালে বদ্ধ হইয়া চতুরাগ্রগণ্য শিবাজীও দিল্লীতে কারাবদ্ধ হইয়াছিলেন—এই আজ্ঞাপত্র সেই কুটিলতাপ্রসূত। তাহাতে লিখিত হইল যে, "বাদশাহ রূপনগরের রাজকুমারীর অপূর্ব্ব রূপলাবণ্য-বৃত্তান্ত শ্রবণে মুগ্ধ হইয়াছেন। আর রূপনগরের রাও সাহেবের সৎস্বভাব ও রাজভক্তিতে বাদশাহ প্রীত হইয়াছেন। অতএব বাদশাহ রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করিয়া তাঁহার সেই রাজভক্তি পুরস্কৃত করিতে ইচ্ছা করেন। রাজা কন্যাকে দিল্লীতে পাঠাইবার উদ্যোগ করিতে থাকুন; শীঘ্র রাজসৈন্য আসিয়া কন্যাকে দিল্লীতে লইয়া যাইবে।"

এই সংবাদ রূপনগরে আসিবামাত্র মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। রূপনগরে আর আনন্দের সীমা রহিল না। যোধপুর, অম্বর প্রভৃতি বড় বড় রাজপুতরাজগণ মোগল-বাদশাহকে কন্যা দান করা অতি গুরুতর সৌভাগ্যের বিষয় বলিয়া বিবেচনা করিতেন। সে স্থলে রূপনগরের ক্ষুদ্রজীবী রাজার অদৃষ্টে এই শুভ ফল বড়ই আনন্দের বিষয় বলিয়া সিদ্ধ হইল। বাদশাহের বাদশাহ—যাঁহার সমকক্ষ মনুষ্যলোকে কেহ নাই—তিনি জামাতা হইবেন—চঞ্চলকুমারী পৃথিবীশ্বরী হইবেন—ইহার অপেক্ষা আর সৌভাগ্যের বিষয় কি আছে? রাজা, রাজরাণী, পৌরজন, রূপনগরের প্রজাবর্গ আনন্দে মাতিয়া উঠিল। রাণী দেবমন্দিরে পূজা পাঠাইয়া দিলেন। রাজা এই সুযোগে কোন্ ভূম্যধিকারীর কোন্ কোন্ গ্রাম কাড়িয়া লইবেন, তাহার ফর্দ্দ করিতে লাগিলেন।

কেবল চঞ্চলকুমারীর সখীগণ নিরানন্দ। তাহারা জানিত যে, এ সম্বন্ধে মোগলদ্বেষিণী চঞ্চলকুমারীর সুখ নাই।

সংবাদটা অবশ্য দিল্লীতেও প্রচার পাইল। বাদশাহী রঙমহালে প্রচারিত হইল। যোধপুরী বেগম শুনিয়া বড় নিরানন্দ হইলেন। তিনি হিন্দুর মেয়ে, মুসলমানের ঘরে পড়িয়া ভারতেশ্বরী হইয়াও তাঁহার সুখ ছিল না। তিনি ঔরঙ্গজেবের পুরী-মধ্যেও আপনার হিন্দুয়ানী রাখিতেন। হিন্দু-পরিচারিকা দ্বারা তিনি সেবিতা হইতেন, হিন্দুর পাক ভিন্ন ভোজন করিতেন না—এমন কি, ঔরঙ্গজেবের পুরীমধ্যে হিন্দু-দেবতার মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া পূজা করিতেন। বিখ্যাত দেবদ্বেষী ঔরঙ্গজেব যে এতটা সহ্য করিতেন, ইহাতেই বুঝা যায় যে, ঔরঙ্গজেব তাঁহাকেও একটু অনুগ্রহ করিতেন।

যোধপুরী বেগম এ সংবাদ শুনিলেন। বাদশাহের সাক্ষাৎ পাইলে বিনীতভাবে বলিলেন,—"জাঁহাপনা! যাঁহার আজ্ঞায় প্রতিদিন রাজরাজেশ্বরগণ রাজ্যচ্যুত হইতেছে—এক সামান্য বালিকা কি তাঁহার ক্রোধের যোগ্য?"

রাজেন্দ্র হাসিলেন—কিন্তু কিছু বলিলেন না। সেখানে কিছুই হইল না।

তখন যোধপুর-রাজকন্যা মনে মনে বলিলেন, "হে ভগবান্! আমাকে বিধবা কর। এ রাক্ষস আর অধিক দিন বাঁচিলে হিন্দুনাম লোপ হইবে।"

দেবী নামে তাঁহার এক জন পরিচারিকা ছিল। সে যোধপুর হইতে তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিল, কিন্তু অনেক দিন দেশছাড়া, এখন অধিক বয়সে আর সে মুসলমানের পুরীর মধ্যে থাকিতে চাহে না। অনেক দিন হইতে সে বিদায় চাহিতেছিল, কিন্তু সে বড় বিশ্বাসী বলিয়া যোধপুরী তাহাকে ছাড়েন নাই। যোধপুরী আজ তাহাকে নিভৃতে লইয়া গিয়া বলিলেন, "তুমি অনেকদিন হইতে যাইতে চাহিতেছ, আজ তোমাকে ছাড়িয়া দিব। কিন্তু তোমাকে আমার একটি কাজ করিতে হইবে। কাজটি বড় শক্ত, বড় পরিশ্রমের কাজ, বড় সাহসের কাজ, আর বড় বিশ্বাসের কাজ। তাহার খরচপত্র দিব, বখ্‌শিশ দিব, আর চিরকালের জন্য মুক্তি দিব। করিবে?"

দেবী বলিল, "আজ্ঞা করুন।"

যোধপুরী বলিলেন, "রূপনগরের রাজকুমারীর সংবাদ শুনিয়াছ? তাঁর কাছে যাইতে হইবে, চিঠিপত্র দিব না, যাহা বলিবে, আমার নাম করিয়া বলিবে, আর আমার এই পাঞ্জা দেখাইবে, তিনি বিশ্বাস করিবেন। ঘোড়ায় চড়িতে পার, ঘোড়ায় যাইবে। ঘোড়া কিনিবার খরচ দিতেছি।"

দেবী। কি বলিতে হইবে?

বেগম। রাজকুমারীকে বলিবে, 'হিন্দুর কন্যা হইয়া মুসলমানের ঘরে না আসেন। আমরা আসিয়া নিত্য মরণ কামনা করিতেছি। বলিবে যে, তসবীর ভাঙ্গার কথাটা বাদশাহ শুনিয়াছেন। তাঁকে সাজা দিবার জন্যই আনিতেছেন। প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, রূপনগরওয়ালীকে দিয়া উদিপুরীর তামাকু সাজাইবেন। বলিও, বরং বিষ খাইও, তথাপি দিল্লীতে আসিও না। আরও বলিও, ভয় নাই, দিল্লীর সিংহাসন টলিতেছে। দক্ষিণে মারহাট্টা

মোগলের হাড় ভাঙ্গিয়া দিতেছে। রাজপুতেরা একত্র হইতেছে। জেজিয়ার জ্বালায় সমস্ত রাজপুতানা জ্বলিয়া উঠিয়াছে। রাজপুতানায় গোহত্যা হইতেছে। কোন্ রাজপুত ইহা সহিবে? সব রাজপুত একত্র হইতেছে। উদয়পুরের রাণা বীরপুরুষ। মোগল-তাতারের মধ্যে তাঁর মত কেহ নাই। তিনি যদি রাজপুতগণের অধিনায়ক হইয়া অস্ত্র ধারণ করেন—যদি একদিকে শিবাজী, আর দিকে রাজসিংহ অস্ত্র ধরেন, তবে দিল্লীর সিংহাসন কয় দিন টিকিবে?

দেবী। এমন কথা বলিও না, মা! দিল্লীর তক্ত তোমার ছেলের জন্য আছে। আপনার ছেলের সিংহাসন ভাঙ্গিবার পরামর্শ আপনি দিতেছ?

বেগম। আমি এমন ভরসা করি না যে, আমার ছেলে এ তক্তে বসিবে। যত দিন রাক্ষসী জেব-উন্নিসা আর ডাকিনী উদিপুরী বাঁচিবে, তত দিন সে ভরসা করি না। একবার সে ভরসা করিয়া রৌশনারার কাছে বড় মার খাইয়াছিলাম।* আজিও মুখে-চোখে সে দাগ-জখমের চিহ্ন আছে।

এইটুকু বলিয়া যোধপুরকুমারী একটু কাঁদিলেন। তার পর বলিলেন, "সে সব কথায় কাজ নাই। তুমি আমার সকল মতলব বুঝিবে না—বুঝিয়াই বা কি হইবে? যাহা বলি, তাই করিও। রাজকুমারীকে রাজসিংহের শরণ লইতে বলিও। রাজসিংহ রাজকুমারীকে প্রত্যাখ্যান করিবেন না। বলিও, আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি যে, তিনি রাণার মহিষী হউন। মহিষী হইলে যেন প্রতিজ্ঞা করেন যে, উদিপুরী তাঁর তামাকু সাজিবে—রৌশনারা তাঁকে পাখার বাতাস করিবে।"

দেবী। এ-ও কি হয় মা?

বেগম। সে কথার বিচার তুমি করিও না। আমি যা বলিলাম, তা পারিবে কি না?

দেবী। আমি সব পারি।

বেগম তখন দেবীকে প্রয়োজনীয় অর্থ ও পুরস্কার এবং পাঞ্জা দিয়া বিদায় করিলেন।

——

* কথাটা ঐতিহাসিক। রৌশনারা যোধপুরীর নাক মুখ ছিঁড়িয়া দিয়াছিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

খোদা শাহজাদী গড়েন কেন?

আবার জেব-উন্নিসার বিলাস-মন্দিরে মবারক রাত্রিকালে উপস্থিত। এবার মবারক গালিচার উপর জানু পাতিয়া উপবিষ্ট—যুক্তকর, ঊর্দ্ধমুখ। জেব-উন্নিসা সেই রত্নখচিত পালঙ্কে, মুক্তাপ্রবালের ঝালরযুক্ত শয্যায়, জরির কামদার বালিসের উপর হেলিয়া সুবর্ণের আলবোলায়, রত্নখচিত নলে, তামাকু সেবন করিতেছিল। পাশ্চাত্য মহাত্মগণের কৃপায় তামাকু তখন ভারতবর্ষে আসিয়াছে।

জেব-উন্নিসা বলিতেছেন, "সব ঠিক বলিবে?"

মবারক যুক্তকরে বলিল, "আজ্ঞা করিলেই বলিব।"

জেব। তুমি দরিয়াকে বিবাহ করিয়াছ?

মবা। যখন স্বদেশে থাকিতাম, তখন করিয়াছিলাম।

জেব। তাই অনুগ্রহ করিয়া আমাকে নেকা করিতে চাহিয়াছিলে?

মবা। আমি অনেক দিন হইল, উহাকে তালাক দিয়া পরিত্যাগ করিয়াছি।

জেব। কেন পরিত্যাগ করিয়াছ?

মবা। সে পাগল। অবশ্য তাহা আপনি বুঝিয়া থাকিবেন।

জেব। পাগল বলিয়া ত আমার কখন বোধ হয় নাই।

মবা। সে আপনার কার্য্যসিদ্ধির জন্য হুজুরে হাজির হয়। কাজের সময় আমিও তাহাকে কখন পাগল দেখি নাই। কিন্তু অন্য সময়ে সে পাগল। আপনি তাহাকে খান্‌কা কোন দিন আনাইয়া দেখিবেন।

জেব। তুমি তাহাকে পাঠাইয়া দিতে পারিবে? বলিও যে, আমার কিছু ভাল সুরমার প্রয়োজন আছে।

মবা। আমি কাল প্রভাতে এখান হইতে দূরদেশে কিছু দিনের জন্য যাইব।

জেব। দূরদেশে যাইবে? কৈ, সে কথা ত আমাকে কিছুই বল নাই?

মবা। আজ সে কথা নিবেদন করিব ইচ্ছা ছিল।

জেব। কোথায় যাইবে?

মবা। রাজপুতানায় রূপনগর নামে গড় আছে সেখানকার রাও সাহেবের কন্যাকে মহিষী করিবার

অভিপ্রায় শাহান্ শাহের মরজি মবারকে হইয়াছে। কাল তাঁহাকে আনিবার জন্য রূপনগরে ফৌজ যাইবে। আমাকে ফৌজের সঙ্গে যাইতে হইবে।

জেব। সে বিষয়ে আমার কিছু বলিবার আছে। কিন্তু আগে আর একটা কথার উত্তর দাও। তুমি গণেশ জ্যোতিষীর কাছে ভাগ্য গণাইতে গিয়াছিলে?

মবা। গিয়াছিলাম।

জেব। কেন গিয়াছিলে?

মবা। সবাই যায়, এই জন্য গিয়াছিলাম, এ কথা বলিলেই সঙ্গত উত্তর হয়; কিন্তু তা ছাড়া আরও কারণ ছিল। দরিয়া আমাকে জোর করিয়া টানিয়া লইয়া গিয়াছিল।

জেব। হঁ।

এই বলিয়া জেব-উন্নিসা কিছু কাল পুষ্পরাশি লইয়া ক্রীড়া করিল। তার পর বলিল, "তুমি গেলে কেন?"

মবারক ঘটনাটা যথাযথ বিবৃত করিলেন। জেব-উন্নিসা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "জ্যোতিষী কি বলিয়াছিল যে, তুমি শাহজাদী বিবাহ কর,—তাহা হইলে তোমার শ্রীবৃদ্ধি হইবে?"

মবা। হিন্দুরা শাহজাদী বলে না। জ্যোতিষী রাজপুত্রী বলিয়াছিল।

জেব। শাহজাদী কি রাজপুত্রী নয়?

মবা। নয় কেন?

জেব। তাই কি তুমি সে দিন বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছিলে?

মবা। আমি কেবল ধর্ম্ম ভাবিয়া সে কথা বলিয়াছিলাম। আপনার স্মরণ থাকিতে পারে, আমি গণনার পূর্ব্ব হইতে এ কথা বলিতেছি।

জেব। কৈ, আমার ত স্মরণ হয় না। তা যাক্—সে সকল কথাতে আর কাজ নাই। তোমাকে এত কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, তাতে তুমি গোসা করিও না। তোমার গোসায় আমার বড় দুঃখ হইবে। তুমি আমার প্রাণাধিক—তোমাকে যতক্ষণ দেখি, ততক্ষণ আমি সুখে থাকি। তুমি পালঙ্কের উপর আসিয়া বসো—আমি তোমাকে আতর মাখাই।

জেব-উন্নিসা তখন মবারককে পালঙ্কের উপর বসাইয়া স্বহস্তে আতর মাখাইতে লাগিল। তার পর বলিল, "এখন সেই রূপনগরের কথাটা বলিব। জানি না, রূপনগরীর পিতা তাহাকে ছাড়িয়া দিবে কি না। ছাড়িয়া না দেয়, তবে কাড়িয়া লইয়া আসিবে।"

মবারক বলিল, "এরূপ আদেশ ত বাদশাহের নিকট আমরা পাই নাই।"

জেব। এ স্থলে আমাকেই না হয় বাদশাহ মনে করিলে? যদি বাদশাহের এরূপ অভিপ্রায় না হইবে, তবে ফৌজ যাইতেছে কেন?

মবা। পথে বিঘ্ন-নিবারণ জন্য।

জেব। আলমগীর বাদশাহের ফৌজ যে কাজে যাইবে, সে কাজে তাহারা নিষ্ফল হইবে? তোমরা যে প্রকারে পার, রূপনগরীকে লইয়া আসিবে। বাদশাহ যদি তাহাতে নাখোস হন, তবে আমি আছি।

মবা। আমার পক্ষে সেই হুকুমই যথেষ্ট। তবে, আপনার এরূপ অভিপ্রায় কেন হইতেছে, জানিতে পারিলে আমার বাহুতে আরও বল হয়।

জেব-উন্নিসা বলিল, "সেই কথাটাই আমি বলিতে চাহিয়াছিলাম। এই রূপনগরওয়ালীকে আমার কৌশলেই তলব হইয়াছে।"

মবা। মৎলব কি?

জেব। মৎলব এই যে, উদিপুরীর রূপের বড়াই আর সহ্য হয় না। শুনিলাম, রূপনগরওয়ালী আরও খুবসুরৎ। যদি হয়, তবে উদিপুরীর বদলে সেই-ই বাদশাহের উপর প্রভুত্ব করিবে। আমি তাহাকে আনিতেছি, ইহা জানিলে, রূপনগরওয়ালী আমার বশীভূত থাকিবে। তা হ'লেই আমার একাধিপত্যের যে একটু কণ্টক আছে, তাহা দূর হইবে। তা তুমি যাইতেছ, ভালই হইতেছে। যদি দেখ যে, সে উদিপুরীর অপেক্ষা সুন্দরী—

মবা। আমি হজরৎ বেগম সাহেবাকে কখনও দেখি নাই।

জেব। দেখ ত দেখাইতে পারি—এই পরদার আড়ালে লুকাইতে হইবে।

মবা। ছি!

জেব-উন্নিসা হাসিয়া উঠিল; বলিল, "দিল্লীতে তোমার মত কয়টা বানর আছে? তা যাক্—আমি তোমায় যা বলি, শুন। উদিপুরীকে না দেখ, আমি তাহার তস্বীর দেখাইতেছি। কিন্তু রূপনগরীকে দেখিও। যদি তাহাকে উদিপুরীর অপেক্ষা সুন্দরী দেখ, তবে তাহাকে জানাইবে যে, আমারই অনুগ্রহে সে বাদশাহের বেগম হইতেছে। আর যদি দেখ, সেটা দেখিতে তেমন নয়—"

জেব-উন্নিসা একটু ভাবিল। মবারক জিজ্ঞাসা করিল, "যদি দেখি, দেখিতে ভাল নহে, তবে কি করিব ?"

জেব। তুমি বড় বিবাহ ভালবাস; তুমি আপনি বিবাহ করিও। বাদশাহ যাহাতে অনুমতি দেন, তাহা আমি করিব।

মবা। অধমের প্রতি কি আপনার একটু ভালবাসাও নাই ?

জেব। বাদশাহজাদীদের আবার ভালবাসা!

মবা। আল্লা তবে বাদশাহজাদীদিগকে কি জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন ?

জেব। সুখের জন্য! ভালবাসা দুঃখ মাত্র।

মবারক আর শুনিতে ইচ্ছা করিল না। কথা চাপা দিয়া কহিল, "যিনি বাদশাহের বেগম হইবেন, তাঁহাকে আমি দেখিব কি প্রকারে ?"

জেব। কোন কল-কৌশলে।

মবা। শুনিলে বাদশাহ কি বলিবেন ?

জেব। সে দায়-দোষ আমার।

মবা। আপনি যা বলিবেন, তাই করিব। কিন্তু এ গরীবকে একটু ভালবাসিতে হইবে।

জেব। বলিলাম না যে তুমি আমার প্রাণাধিক ?

মবা। ভালবাসিয়া বলিয়াছেন কি ?

জেব। বলিয়াছি, ভালবাসা গরীব-দুঃখীর দুঃখ। শাহজাদীরা দুঃখ স্বীকার করে না।

মর্ম্মাহত হইয়া মবারক বিদায় লইয়া চলিয়া গেল।

তৃতীয় খণ্ড

বিবাহে বিকল্প

প্রথম পরিচ্ছেদ

বক ও হংসীর কথা

নির্ম্মল ধীরে ধীরে রাজকুমারীর কাছে গিয়া বসিলেন। দেখিলেন, রাজকুমারী একা বসিয়া কাঁদিতেছেন। সে দিন যে চিত্রগুলি ক্রীত হইয়াছিল, তাহার একখানি রাজকুমারীর হাতে দেখিলেন। নির্ম্মলকে দেখিয়া চঞ্চল চিত্রখানি উল্টাইয়া রাখিলেন—কাহার চিত্র, নির্ম্মলের তাহা বুঝিতে বাকি রহিল না। নির্ম্মল কাছে গিয়া বসিয়া বলিল, "এখন উপায় ?"

চঞ্চল। উপায় যাই হউক—আমি মোগলের দাসী কখনই হইব না।

নির্ম্মল। তোমার অমত, তা ত জানি, কিন্তু আলমগীর বাদশাহের হুকুম, রাজার কি সাধ্য যে অন্যথা করেন! উপায় নাই, সখি!—সুতরাং তোমাকে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হবে। আর স্বীকার করা ত সৌভাগ্যের বিষয়। যোধপুর বল, অম্বর বল, রাজা, বাদশাহ, ওমরাহ, নবাব, সুবা যাহা বল, পৃথিবীতে এত বড় লোক কে আছে যে, তাহার কন্যা দিল্লীর তক্তে বসিতে বাসনা করে না ? পৃথিবীশ্বরী হইতে তোমার এত অসাধ কেন ?

চঞ্চল রাগ করিয়া বলিল, "তুই এখান হইতে উঠিয়া যা।"

নির্ম্মল দেখিল, ও পথে কিছুই হইবে না। তবে আর কোন পথে রাজকুমারীর কিছু উপকার যদি করিতে পারে, তাহার সন্ধান করিতে লাগিল। বলিল, "আমি যেন উঠিয়া গেলাম—কিন্তু যাঁহার দ্বারা প্রতিপালিত হইতেছি, আমাকে তাঁহার হিত খুঁজিতে হয়। তুমি যদি দিল্লী না যাও, তবে তোমার বাপের দশা কি হইবে, তাহা কি একবার ভাবিয়াছ ?"

চঞ্চল। ভাবিয়াছি। আমি যদি না যাই, তবে আমার পিতার কাঁধে মাথা থাকিবে না—রূপনগরের গড়ের একখানি পাতর থাকিবে না, তা ভাবিয়াছি—আমি পিতৃহত্যা করিব না। বাদশাহের ফৌজ আসিলেই আমি তাহাদিগের সঙ্গে দিল্লী যাত্রা করিব। ইহা স্থির করিয়াছি।

নির্ম্মল প্রসন্ন হইল। বলিল, "আমিও সেই পরামর্শ দিতেছিলাম।"

রাজকুমারী আবার ভ্রূভঙ্গী করিলেন—বলিলেন, "তুই কি মনে করেছিস্ যে, আমি দিল্লীতে গিয়া মুসলমান বানরের শয্যায় শয়ন করিব? হংসী কি বকের সেবা করে?"

নির্ম্মল কিছুই বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তবে কি করিবে?"

চঞ্চল কুমারী হস্তের একটি অঙ্গুরীয় নির্ম্মলকে দেখাইল; বলিল, "দিল্লীর পথে বিষ খাইব।" নির্ম্মল জানিত, ঐ অঙ্গুরীয়তে বিষ আছে।

নির্ম্মল বলিল, "আর কি কোন উপায় নাই?"

চঞ্চল বলিল, "আর উপায় কি সখি! কে এমন বীর পৃথিবীতে আছে যে, আমার উদ্ধার করিয়া দিল্লীশ্বরের সহিত শত্রুতা করিবে? রাজপুতনার কুলাঙ্গার সকলই মোগলের দাস—আর কি সংগ্রাম আছে, না প্রতাপ আছে?"

নির্ম্মল। কি বল রাজকুমারি! সংগ্রাম কি প্রতাপ যদি থাকিত, তবে তাহারাই বা তোমার জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিয়া দিল্লীর বাদশাহের সঙ্গে বিবাদ করিবে কেন? পরের জন্য কেহ সহজে সর্ব্বস্ব পণ করে না। প্রতাপ নাই, সংগ্রাম নাই, রাজসিংহ আছে—কিন্তু তোমার জন্য রাজসিংহ সর্ব্বস্ব পণ করিবে কেন—বিশেষ তুমি মাড়বারের ঘরাণা।

চঞ্চল। সে কি? বাহুতে বল থাকিলে কোন্ রাজপুত শরণাগতকে রক্ষা করে নাই? আমি তাই ভাবিতেছিলাম নির্ম্মল! আমি এ বিপদে সেই সংগ্রাম, প্রতাপের বংশ-তিলকেরই শরণ লইব—তিনি কি আমায় রক্ষা করিবেন না?

বলিতে বলিতে চঞ্চলদেবী ঢাকা ছবিখানি উল্টাইলেন—নির্ম্মল দেখিল, সে রাজসিংহের মূর্ত্তি। চিত্র দেখিয়া রাজকুমারী বলিতে লাগিলেন, "দেখ, সখি, এ রাজকান্তি দেখিয়া তোমার কি বিশ্বাস হয় না যে, ইনি অগতির গতি, অনাথার রক্ষক? আমি যদি ইঁহার শরণ লই, ইনি কি রক্ষা করিবেন না?"

নির্ম্মলকুমারী অতি স্থিরবুদ্ধিশালিনী—চঞ্চলের সহোদরাধিকা। নির্ম্মল অনেক ভাবিল। শেষে চঞ্চলের প্রতি স্থির দৃষ্টি করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "রাজকুমারী! যে বীর তোমাকে এ বিপদ হইতে রক্ষা করিবে, তাহাকে তুমি কি দিবে?"

রাজকুমারী বুঝিলেন। কাতর অথচ অবিকম্পিতকণ্ঠে বলিলেন, "কি দিব সখি! আমার কি আর দিবার আছে? আমি যে অবলা।"

নির্ম্মল। তোমার তুমিই আছ।

চঞ্চল অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "দূর হ!"

নির্ম্মল। তা রাজার ঘরে এমন হইয়া থাকে। তুমি যদি রুক্মিণী হইতে পার, যদুপতি আসিয়া অবশ্য উদ্ধার করিতে পারেন।

চঞ্চলকুমারী মুখাবনত করিল। যেমন সূর্য্যোদয়কালে মেঘমালার উপর আলোর তরঙ্গের পর উজ্জ্বলতর তরঙ্গ আসিয়া পলকে পলকে নূতন সৌন্দর্য্য উন্মেষিত করে, চঞ্চলকুমারীর মুখে তেমনই পলকে পলকে সুখের, লজ্জার, সৌন্দর্য্যের নব-নবোন্মেষ হইতে লাগিল। বলিল, "তাঁহাকে পাইব, আমি কি এমন ভাগ্য করিয়াছি? আমি বিকাইতে চাহিলে তিনি কি কিনিবেন?"

নির্ম্মল। সে কথার বিচারক তিনি—আমরা নই। রাজসিংহের বাহুতে শুনিয়াছি বল আছে; তাঁর কাছে কি দূত পাঠান যায় না? গোপনে—কেহ না জানিতে পারে, এরূপ দূত কি তাঁহার কাছে পাঠান যায় না?

চঞ্চল ভাবিল। বলিল, "তুমি আমার গুরুদেবকে ডাকিতে পাঠাও। আমায় আর কে তেমন ভালবাসে? কিন্তু তাঁহাকে সকল কথা বুঝাইয়া বলিয়া আমার কাছে আনিও। সকল কথা বলিতে আমার লজ্জা করিবে।"

এমন সময় সখাজন সংবাদ লইয়া আসিল যে, এক জন মতিওয়ালী মতি বেচিতে আসিয়াছে। রাজকুমারী বলিলেন, "এখন আমার মতি কিনিবার সময় নহে। ফিরাইয়া দাও।" পুরবাসিনী বলিল, "আমরা ফিরাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু সে কিছুতেই ফিরিল না। বোধ হইল যেন তার কি বিশেষ দরকার আছে।" তখন অগত্যা চঞ্চলকুমারী তাকে ডাকিলেন।

মতিওয়ালী আসিয়া কতকগুলা ঝুটা মতি দেখাইল। রাজকুমারী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "এই ঝুটা মতি দেখাইবার জন্য তুমি এত জিদ করিতেছিলে?"

মতিওয়ালী বলিল, "না। আমার আরও দেখাইবার জিনিষ আছে। কিন্তু তাহা আপনি একটু পৃথিদা না হইলে দেখাইতে পারি না।"

চঞ্চলকুমারী বলিল, "আমি একা তোমার সঙ্গে কথা কহিতে পারিব না কিন্তু, এক জন সখী থাকিবে। নির্ম্মল থাক, আর সকলে বাহিরে যাও।"

তখন আর সকলে বাহিরে গেল। দেবী—সে মতিওয়ালী দেবী ভিন্ন আর কেহ নয়—যোধপুরী বেগমের পাঞ্জা দেখাইল। দেখিয়া পড়িয়া চঞ্চল-

কুমারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ পাঞ্জা তুমি কোথায় পাইলে ?"

দেবী। যোধপুরী বেগম আমাকে দিয়াছেন।

চঞ্চল। তুমি তাঁর কে ?

দেবী। আমি তাঁর বাঁদী।

চঞ্চল। কেনই বা এ পাঞ্জা লইয়া এখানে আসিয়াছ ?

দেবী তখন সকল কথা বুঝাইয়া বলিল।

শুনিয়া নির্ম্মল ও চঞ্চল পরস্পরের মুখপানে চাহিতে লাগিলেন।

চঞ্চল দেবীকে পুরস্কৃত করিয়া বিদায় দিলেন।

দেবী যাইবার সময় যোধপুরীর পাঞ্জাখানি লইয়া গেল না। ইচ্ছাপূর্ব্বক রাখিয়া গেল। মনে করিল, কোথায় ফেলিয়া দিব—কে কুড়াইয়া নিবে। এই ভাবিয়া দেবী চঞ্চলকুমারীর নিকট পাঞ্জা ফেলিয়া গেল। সে গেলে পর চঞ্চলকুমারী বলিলেন,—"নির্ম্মল উহাকে ডাক, সে পাঞ্জাখানা ফেলিয়া গিয়াছে।"

নির্ম্মল। ফেলিয়া যায় নাই—বোধ হইল, যেন ইচ্ছাপূর্ব্বক রাখিয়া গিয়াছে।

চঞ্চল। আমি নিয়া কি করিব ?

নির্ম্মল। এখন রাখ, কোন সময়ে না কোন সময়ে যোধপুরীকে ফেরৎ দিতে পারিবে।

চঞ্চল। তা যাই হোক, বেগমের কথায় আমার বড় সাহস বাড়িল। আমরা দুইটি বালিকায় কি পরামর্শ করিতেছিলাম—তা ভাল কি মন্দ—ঘটিবে কি না ঘটিবে, কিছুই বুঝিতে পারিতেছিলাম না। এখন সাহস হইয়াছে। রাজসিংহের আশ্রয় গ্রহণ করাই ভাল।

নির্ম্মল। সে ত অনেক কাল জানি।

এই বলিয়া নির্ম্মল হাসিল। চঞ্চলও মাথা হেঁট করিয়া হাসিল।

নির্ম্মল উঠিয়া গেল। কিন্তু তাহার মনে কিছু মাত্র ভরসা হইল না, সে কাঁদিতে কাঁদিতে গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অনন্ত মিশ্র

অনন্ত মিশ্র চঞ্চলকুমারীর পিতৃকুলপুরোহিত। কন্যানির্ব্বিশেষে চঞ্চলকুমারীকে ভালবাসিতেন। তিনি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত। সকলে তাঁহাকে ভক্তি করিত। [illegible] নাম করিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইবামাত্র তিনি অন্তঃপুরে আসিলেন—কুলপুরোহিতের অবারিত দ্বার। পথিমধ্যে নির্ম্মল তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিল, এবং সকল কথা বুঝাইয়া [illegible] ছাড়িয়া দিল।

বিভূতি-চন্দন-[illegible], প্রশস্তললাট, দীর্ঘকায়, রুদ্রাক্ষশোভিত, হাস্যবদন সেই ব্রাহ্মণ চঞ্চলকুমারীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। নির্ম্মল দেখিয়াছিল যে, চঞ্চল কাঁদিতেছে, কিন্তু আর কাহারও কাছে চঞ্চল কাঁদিবার মেয়ে নহে। গুরুদেব দেখিলেন, চঞ্চল স্থিরমূর্ত্তি। বলিলেন, "মা লক্ষ্মী—আমাকে স্মরণ করিয়াছ কেন ?"

চঞ্চল। আমাকে বাঁচাইবার জন্য। আর কেহই নাই যে, আমায় বাঁচায়।

অনন্ত মিশ্র হাসিয়া বলিলেন, "বুঝেছি, রুক্মিণীর বিয়ে, তাই পুরোহিত-বুড়াকেই দ্বারকায় যেতে হবে। তা দেখ দেখি মা, লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে কিছু আছে কি না—পথ-খরচা জুটিলেই আমি উদয়পুরে যাত্রা করিব।"

চঞ্চল একটি জরির থলি বাহির করিয়া দিল। তাহাতে আসরফি ভরা। পুরোহিত পাঁচটি আসরফি লইয়া অবশিষ্ট ফিরাইয়া দিলেন—বলিলেন, "পথে অন্ন খাইতে হইবে—আসরফি খাইতে পারিব না। একটি কথা বলি, পারিবে কি ?"

চঞ্চল বলিলেন, "আমাকে আগুনে ঝাঁপ দিতে বলিলেও, আমি এ বিপদ হইতে উদ্ধার হইবার জন্য তাও পারি। কি, আজ্ঞা করুন।"

মিশ্র। রাণা রাজসিংহকে একখানি পত্র লিখিয়া দিতে পারিবে ?

চঞ্চল ভাবিল। বলিল, "আমি বালিকা—পুরস্ত্রী, তাঁহার কাছে অপরিচিতা—কি প্রকারে পত্র লিখি ? কিন্তু আমি তাঁহার কাছে যে ভিক্ষা চাহিতেছি, তাহাতে লজ্জারই বা স্থান কই ? লিখিব।"

মিশ্র। আমি লিখাইয়া দিব, না আপনি লিখিবে ?

চঞ্চল। আপনি বলিয়া দিন।

নির্ম্মল সেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে বলিল, "তা হইবে না। এ বামুনে বুদ্ধির কাজ নয়—এ মেয়েলি বুদ্ধির কাজ। আমরা পত্র লিখিব। আপনি প্রস্তুত হইয়া আসুন।"

মিশ্র ঠাকুর চলিয়া গেলেন, কিন্তু গৃহে গেলেন না; রাজা বিক্রমসিংহের নিকট দর্শন দিলেন।

বলিলেন, "আমি দেশপর্য্যটনে গমন করিব, মহারাজকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিয়াছি।"

কি জন্য কোথায় যাইবেন, রাজা তাহা জানিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ তাহা কিছুই প্রকাশ করিয়া বলিলেন না। তথাপি তিনি যে উদয়পুর পর্য্যন্ত যাইবেন, তাহা স্বীকার করিলেন এবং রাণার নিকট পরিচিত হইবার জন্য একখানি লিপির জন্য প্রার্থনা করিলেন। রাজাও পত্র দিলেন।

অনন্ত মিশ্র রাজার নিকট হইতে পত্র সংগ্রহ করিয়া চঞ্চলকুমারীর নিকট পুনরাগমন করিলেন। ততক্ষণ চঞ্চল ও নির্ম্মল দুই জনে দুই বুদ্ধি একত্র করিয়া একখানি পত্র সমাপন করিয়াছিল। পত্র শেষ করিয়া রাজনন্দিনী একটি কৌটা হইতে অপূর্ব্ব শোভাবিশিষ্ট মুকুতা-বলয় বাহির করিয়া ব্রাহ্মণের হস্তে দিয়া বলিলেন, "রাণা পত্র পড়িলে, আমার প্রতিনিধিস্বরূপ আপনি এই রাখি বাঁধিয়া দিবেন। রাজপুতকুলের যিনি চূড়া, তিনি কখন রাজপুতকন্যার প্রেরিত রাখি অগ্রাহ্য করিবেন না।"

মিশ্র ঠাকুর স্বীকৃত হইলেন। রাজকুমারী তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বিদায় করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মিশ্র ঠাকুরের নারায়ণ স্মরণ

পরিধেয় বস্ত্র, ছত্র, যষ্টি, চন্দনকাষ্ঠ প্রভৃতি নিতান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য এবং একমাত্র ভৃত্য সঙ্গে লইয়া, অনন্ত মিশ্র গৃহিণীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া উদয়পুর যাত্রা করিলেন। গৃহিণী বড় পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিল, "কেন যাইবে?" মিশ্র ঠাকুর বলিলেন, "রাণার কাছে কিছু বৃত্তি পাইব।" গৃহিণী তৎক্ষণাৎ শান্ত হইলেন; বিরহ-যন্ত্রণা আর তাঁহাকে দাহ করিতে পারিল না, অর্থলাভের আশাস্বরূপ শীতলবারি-প্রবাহে সে প্রচণ্ড বিচ্ছেদবহ্নি যার কত ফোঁস-ফোঁস করিয়া নিবিয়া গেল, মিশ্র ঠাকুর ভৃত্য সঙ্গে যাত্রা করিলেন। তিনি মনে করিলে অনেক লোক সঙ্গে লইতে পারিতেন। কিন্তু অধিক লোক থাকিলে কাণাকাণি হয়, এ জন্য লইলেন না।

পথ অতি দুর্গম—বিশেষ পার্ব্বত্য পথ বন্ধুর এবং অনেক স্থানে আশ্রয়শূন্য। একাহারী ব্রাহ্মণ যে দিন যেখানে আশ্রয় পাইতেন, সে দিন সেখানে আতিথ্য-স্বীকার করিতেন; দিনমানে পথ অতিবাহন করিতেন। পথে কিছু দস্যুভয় ছিল—ব্রাহ্মণের নিকট রত্নবলয় আছে বলিয়া ব্রাহ্মণ কদাপি একাকী পথ চলিতেন না। সঙ্গী জুটিলে চলিতেন। সঙ্গীছাড়া হইলেই আশ্রয় খুঁজিতেন। এক দিন রাত্রে এক দেবালয়ে আতিথ্য স্বীকার করিয়া পরদিন গমনকালে তাঁহাকে সঙ্গী খুঁজিতে হইল না। চারি জন বণিক্ ঐ দেবালয়ে অতিথিশালায় শয়ন করিয়াছিল, প্রভাতে উঠিয়া তাহারাও পার্ব্বত্যপথে আরোহণ করিল। ব্রাহ্মণকে দেখিয়া তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কোথা যাইবে?" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আমি উদয়পুর যাইব।" বণিকেরা বলিল, "আমরাও উদয়পুর যাইব। ভাল হইয়াছে, একত্রে যাই চল।" ব্রাহ্মণ আনন্দিত হইয়া তাহাদিগের সঙ্গী হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "উদয়পুর আর কতদূর?" বণিকেরা বলিল, "নিকট, আজ সন্ধ্যার মধ্যে উদয়পুর পৌঁছিতে পারিব। এ সকল স্থান রাণার রাজ্য।"

এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে তাহারা চলিতেছিল। পার্ব্বত্যপথ অতিশয় দুরারোহণীয় এবং দুরবরোহ, সচরাচর বসতিশূন্য। কিন্তু এই দুর্গম পথ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল—এখন সমতল ভূমিতে অবরোহণ করিতে হইবে। পথিকেরা এক অনির্ব্বচনীয় শোভাময় অধিত্যকায় প্রবেশ করিল। দুই পার্শ্বে অনতি-উচ্চ পর্ব্বতদ্বয় হরিত বৃক্ষাদিশোভিত হইয়া আকাশে মাথা তুলিয়াছে, উভয়ের মধ্যে কলনাদিনী ক্ষুদ্রা প্রবাহিণী নীলকাচ-প্রতিম সফেন জল-প্রবাহে উপলদল ধৌত করিয়া বনান্তর অভিমুখে চলিতেছে। তটিনীর ধার দিয়া মনুষ্যগম্য পথের রেখা পড়িয়াছে। সেখানে নামিলে আর কোন দিক হইতে কেহ পথিককে দেখিতে পায় না, কেবল পর্ব্বতদ্বয়ের উপর হইতে দেখা যায়।

সেই নিভৃত স্থানে অবরোহণ করিয়া, এক জন বণিক্ ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমার ঠাঁই টাকা-কড়ি কি আছে?"

ব্রাহ্মণ প্রশ্ন শুনিয়া চমকিত ও ভীত হইলেন। ভাবিলেন, বুঝি এখানে দস্যুর বিশেষ ভয়, তাই সতর্ক করিবার জন্য বণিকেরা জিজ্ঞাসা করিতেছে। দুর্ব্বলের অবলম্বন মিথ্যা কথা। ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আমি ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ, আমার কাছে কি থাকিবে?"

বণিক্ বলিল, "যাহা কিছু থাকে, আমাদের নিকট দাও। নহিলে এখানে রাখিতে পারিবে না।"

ব্রাহ্মণ ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। একবার মনে করিলেন, রত্ন-বলয় রক্ষার্থ বণিকদিগকে দিই। আবার ভাবিলেন, ইহারা অপরিচিত, ইহাদিগকেই বা বিশ্বাস কি? এই ভাবিয়া ইতস্ততঃ করিয়া ব্রাহ্মণ পূর্ব্ববৎ বলিলেন, "আমি ভিক্ষুক, আমার কাছে কি থাকিবে?"

বিপৎকালে যে ইতস্ততঃ করে, সেই মারা যায়। ব্রাহ্মণকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া ছদ্মবেশী বণিকেরা বুঝিল যে, অবশ্য ব্রাহ্মণের কাছে বিশেষ কিছু আছে। এক জন তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণের ঘাড় ধরিয়া ফেলিয়া দিয়া, তাঁহার বুকে হাঁটু দিয়া বসিল—এবং তাঁহার মুখে হাত দিয়া চাপিয়া ধরিল। মিশ্র ঠাকুরের ভৃত্যটি তৎক্ষণাৎ কোন্ দিকে পলায়ন করিল, কেহ দেখিতে পাইল না। মিশ্র ঠাকুর বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে না পারিয়া নারায়ণ-স্মরণ করিতে লাগিলেন। আর এক জন তাঁহার গাঁটরি কাড়িয়া লইয়া খুলিয়া দেখিতে লাগিল। তাহার ভিতর হইতে চঞ্চলকুমারী-প্রেরিত বলয়, দুইখানি পত্র এবং আসরফি পাওয়া গেল। দস্যু তাহা হস্তগত করিয়া সঙ্গীকে বলিল, "আর ব্রহ্মহত্যা করিয়া কাজ নাই। উহার যাহা ছিল, তাহা পাইয়াছি। এখন উহাকে ছাড়িয়া দে।"

আর এক জন দস্যু বলিল, "ছাড়িয়া দেওয়া হইবে না, ব্রাহ্মণ তাহা হইলে এখনই একটা গোলযোগ করিবে। আজকাল রাণা রাজসিংহের বড় দৌরাত্ম্য—তাঁহার শাসনে বীরপুরুষে আর অন্ন করিয়া খাইতে পারে না। উহাকে এক গাছে বাঁধিয়া রাখিয়া যাই।"

এই বলিয়া দস্যুগণ মিশ্র ঠাকুরের হস্ত, পদ এবং মুখ তাঁহার পরিধেয় বস্ত্রে দৃঢ়তর বাঁধিয়া পর্ব্বতের সানুদেশস্থিত একটি ক্ষুদ্র বৃক্ষের কাণ্ডের সহিত বাঁধিল। পরে চঞ্চলকুমারী-দত্ত রত্নবলয় ও পত্র প্রভৃতি লইয়া ক্ষুদ্র নদীর তীরবর্ত্তী পথ অবলম্বন করিয়া পর্ব্বতান্তরালে অদৃশ্য হইল। সেই সময়ে পর্ব্বতের উপর দাঁড়াইয়া এক জন অশ্বারোহী তাহাদিগকে দেখিল। তাহারা অশ্বারোহীকে দেখিতে পাইল না, পলায়নে ব্যস্ত।

দস্যুগণ পার্ব্বতীয়া প্রবাহিনীর তটবর্ত্তী বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া অতি দুর্গম ও মনুষ্যসমাগমশূন্য পথে চলিল। এইরূপ কিছু দূর গিয়া এক নিভৃত গুহামধ্যে প্রবেশ করিল। গুহার ভিতর খাদ্যদ্রব্য, শয্যা, পাকের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সকল প্রস্তুত ছিল। দেখিয়া বোধ হয়, দস্যুগণ কখন কখন এই গুহামধ্যে লুকাইয়া বাস করে। এমন কি, কলসীপূর্ণ জল পর্য্যন্ত ছিল। দস্যুগণ সেইখানে উপস্থিত হইয়া তামাকু সাজিয়া খাইতে লাগিল এবং এক জন পাকের উদ্‌যোগ করিতে লাগিল। এক জন বলিল, "মাণিকলাল, রসুই পরে হইবে। প্রথমে মালের কি ব্যবস্থা হইবে, তাহার মীমাংসা করা যাউক।"

মাণিকলাল বলিল, "মালের কথাই আগে হউক।"

তখন আসরফি কয়টি চারি ভাগ করিল। এক এক জন এক এক ভাগ লইল। রত্নবলয় বিক্রয় না হইলে ভাগ হইতে পারে না—তাহা সম্প্রতি অবিভক্ত রহিল। পত্র দুইখানি কি করা যাইবে, তাহার মীমাংসা হইতে লাগিল। দলপতি বলিলেন, "কাগজে আর কি হইবে—উহা পোড়াইয়া ফেল।" এই বলিয়া পত্র দুইখানি সে মাণিকলালকে অগ্নিদেবকে সমর্পণ করিবার জন্য দিল।

মাণিকলাল কিছু কিছু লিখিতে পড়িতে জানিত। সে পত্র দুইখানি আদ্যোপান্ত পড়িয়া আনন্দিত হইল। বলিল, "এ পত্র নষ্ট করা হইবে না। ইহাতে রোজগার হইতে পারে।"

"কি? কি?" বলিয়া আর তিন জন গোলযোগ করিয়া উঠিল। মাণিকলাল তখন চঞ্চলকুমারীর পত্রের বৃত্তান্ত তাহাদিগকে সবিস্তারে বুঝাইয়া দিল। শুনিয়া চোরেরা বড় আনন্দিত হইল।

মাণিকলাল বলিল, "দেখ, এই পত্র রাণাকে দিলে কিছু পুরস্কার পাইব।"

দলপতি বলিল, "নির্ব্বোধ! রাণা যখন জিজ্ঞাসা করিবে, তোমরা এ পত্র কোথায় পাইলে, তখন কি উত্তর দিবে? তখন কি বলিবে যে, আমরা রাহাজানি করিয়া পাইয়াছি? রাণার কাছে পুরস্কারের মধ্যে প্রাণদণ্ড হইবে। তাহা নহে—এ পত্র লইয়া গিয়া বাদশাহকে দিব—বাদশাহের কাছে এরূপ সন্ধান দিতে পারিলে অনেক পুরস্কার পাওয়া যায়, আমি জানি। আর ইহাতে—"

দলপতি কথা সমাপ্ত করিতে অবকাশ পাইল না। কথা মুখে থাকিতে থাকিতে তাহার মস্তক স্কন্ধ হইতে বিচ্যুত হইয়া ভূতলে পড়িল।

—

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মাণিকলাল

অশ্বারোহী পর্ব্বতের উপর হইতে দেখিলেন, চারি জনে এক জনকে বাঁধিয়া রাখিয়া চলিয়া গেল। আগে কি হইয়াছে, তাহা তিনি দেখেন নাই, তখন তিনি পৌছেন নাই। অশ্বারোহী নিঃশব্দে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন, উহারা কোন্ পথে যায়। তাহারা যখন নদীর বাঁক ফিরিয়া পর্ব্বতান্তরালে অদৃশ্য হইল, তখন অশ্বারোহী অশ্ব হইতে নামিলেন। পরে অশ্বের গায়ে হাত বুলাইয়া বলিলেন, "বিজয়! এখানে থাকিও—আমি আসিতেছি—কোন শব্দ করিও না।" অশ্ব স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল; তাহার আরোহী পাদচারে অতি দ্রুতবেগে পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিলেন। পর্ব্বত যে বড় উচ্চ নহে, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

অশ্বারোহী পদব্রজে মিশ্র ঠাকুরের কাছে আসিয়া তাঁহাকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিলেন। মুক্ত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে, অল্প কথায় বলুন।" মিশ্র বলিলেন, "চারি জনের সঙ্গে আমি একত্র আসিতেছিলাম। তাহাদের চিনি না—পথের আলাপ; তাহারা বলে, আমরা বণিক্. এইখানে আসিয়া তাহারা মারিয়া ধরিয়া আমার যাহা কিছু ছিল, কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে।"

প্রশ্নকর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি কি লইয়া গিয়াছে?"

ব্রাহ্মণ বলিল, "একগাছি মুক্তার বালা, কয়টি আসরফি, দুইখানি পত্র।"

প্রশ্নকর্ত্তা বলিলেন, "আপনি এইখানে থাকুন, উহারা কোন্ দিকে গেল আমি দেখিয়া আসি।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আপনি যাইবেন কি প্রকারে? তাহারা চারি জন, আপনি একা।"

আগন্তুক বলিলেন, "দেখিতেছেন না, আমি রাজপুত সৈনিক?"

অনন্ত মিশ্র দেখিলেন, এই ব্যক্তি যুদ্ধব্যবসায়ী বটে। তাহার কোমরে তরবারি এবং পিস্তল, হস্তে বর্শা। তিনি ভয়ে আর কথা কহিলেন না।

রাজপুত যে পথে দস্যুগণকে যাইতে দেখিয়াছিলেন, সেই পথে অতি সাবধানে তাহাদিগের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু বনমধ্যে আসিয়া আর পথ পাইলেন না, অথবা দস্যুদিগের কোন নিদর্শন পাইলেন না।

তখন রাজপুত আবার পর্ব্বতের শিখরদেশে আরোহণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ দৃষ্টি করিতে করিতে দেখিলেন যে, দূরে বনের ভিতর প্রচ্ছন্ন থাকিয়া চারি জনে যাইতেছে। সেইখানে কিছুক্ষণ অবস্থিতি করিয়া দেখিতে লাগিলেন, ইহারা কোথায় যায়; দেখিলেন, কিছু পরে উহারা একটা পাহাড়ের তলদেশে গেল, তাহার পর উহাদের আর দেখা গেল না। তখন রাজপুত সিদ্ধান্ত করিলেন যে, উহারা হয় ঐখানে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছে—বৃক্ষাদির জন্য দেখা যাইতেছে না; নয় ঐ পর্ব্বততলে গুহা আছে, তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে।

রাজপুত বৃক্ষাদি চিহ্ন দ্বারা সেই স্থানে যাইবার পথ বিলক্ষণ করিয়া নিরূপণ করিলেন। পরে অবতরণ করিয়া বনমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক সেই সকল চিহ্নলক্ষিত পথে চলিলেন। এইরূপে বিবিধ কৌশলে তিনি পূর্ব্বলক্ষিত স্থানে আসিয়া দেখিলেন, পর্ব্বততলে একটি গুহা আছে, গুহামধ্যে মনুষ্যের কথাবার্ত্তা শুনিতে পাইলেন।

এই পর্য্যন্ত আসিয়া রাজপুত কিছু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন, উহারা চারি জন—তিনি একা, এক্ষণে গুহামধ্যে প্রবেশ করা উচিত কি না? যদি গুহাদ্বার রোধ করিয়া উহারা চারি জনে তাঁহার সঙ্গে সংগ্রাম করে, তবে তাঁহার বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু এ কথা রাজপুতের মনে বড় অধিকক্ষণ স্থান পাইল না—মৃত্যুভয় আবার ভয় কি? মৃত্যুভয়ে রাজপুত কোন কার্য্য হইতে বিরত হয় না। কিন্তু দ্বিতীয় কথা এই যে, তিনি গুহামধ্যে প্রবেশ করিলেই তাঁহার হস্তে দুই এক জন অবশ্য মরিবে; যদি উহারা সেই দস্যুদল না হয়, তবে নিরপরাধের হত্যা হইবে।

এই ভাবিয়া রাজপুত সন্দেহ-ভঞ্জনার্থ অতি ধীরে ধীরে গুহাদ্বারের নিকট আসিয়া দাঁড়াইয়া অভ্যন্তরস্থ ব্যক্তিগণের কথাবার্ত্তা কর্ণপাত করিয়া শুনিতে লাগিলেন। দস্যুরা তখন অপহৃত সম্পত্তি বিভাগের কথা কহিতেছিল। শুনিয়া রাজপুতের নিশ্চয় প্রতীতি হইল যে, উহারা দস্যু বটে। রাজপুত তখন গুহামধ্যে প্রবেশ করাই স্থির করিলেন।

ধীরে ধীরে বর্শা বনমধ্যে লুকাইলেন। পরে অসি নিষ্কোষিত করিয়া দক্ষিণ হস্তে দৃঢ়মুষ্টিতে ধারণ করিলেন। বাম হস্তে পিস্তল লইলেন। দস্যুরা যখন চঞ্চলকুমারীর পত্র পাইয়া অর্থলাভের আকাঙ্ক্ষায় বিমুগ্ধ হইয়া, অন্যমনস্ক ছিল, সেই সময়

রাজপুত অতি সাবধানে পাদবিক্ষেপ করিতে করিতে গুহামধ্যে প্রবেশ করিলেন। দলপতি গুহাদ্বারের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া বসিয়া ছিল। প্রবেশ করিয়া রাজপুত দৃঢ়মুষ্টিধৃত তরবারি দ্বারা দলপতির মস্তকে আঘাত করিলেন। তাঁহার হস্তে এত বল যে, এক আঘাতেই মস্তক দ্বিখণ্ড হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল।

সেই মুহূর্তেই দ্বিতীয় এক জন দস্যু, যে দলপতির কাছে বসিয়াছিল, তাহার দিকে ফিরিয়া রাজপুত তাহার মস্তকে এরূপ কঠিন পদাঘাত করিলেন যে, সে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িল। রাজপুত অন্য দুই জনের উপর দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন যে, এক জন গুহাপ্রান্তে থাকিয়া তাঁহাকে প্রহার করিবার জন্য এক খণ্ড বৃহৎ প্রস্তর তুলিতেছে। রাজপুত তাহাকে লক্ষ্য করিয়া পিস্তল উঠাইলেন; সে আহত হইয়া ভূতলে পড়িয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিল। অবশিষ্ট মাণিকলাল, বেগতিক দেখিয়া গুহাদ্বারপথে বেগে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। রাজপুতও বেগে তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া গুহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। এই সময়ে রাজপুত যে বর্শা বনমধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা মাণিকলালের পায়ে ঠেকিল। মাণিকলাল তৎক্ষণাৎ তাহা তুলিয়া লইয়া দক্ষিণ হস্তে ধারণ করিয়া রাজপুতের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "মহারাজ, আমি আপনাকে চিনি, ক্ষান্ত হউন, নহিলে এই বর্শায় বিদ্ধ করিব।"

রাজপুত হাসিয়া বলিলেন, "তুমি যদি আমাকে বর্শা মারিতে পারিতে, তাহা হইলে আমি উহা বাম হস্তে ধরিতাম। কিন্তু তুমি উহা মারিতে পারিবে না—এই দেখ।"—এই কথা বলিতে না বলিতে রাজপুত তাঁহার হাতের খালি পিস্তল দস্যুর দক্ষিণ হস্তের মুষ্টি লক্ষ্য করিয়া ছুড়িয়া মারিলেন। দারুণ প্রহারে তাহার হাতের বর্শা খসিয়া পড়িল। রাজপুত তাহা তুলিয়া লইয়া মাণিকলালের চুল ধরিলেন, এবং অসি উত্তোলন করিয়া তাহার মস্তকচ্ছেদনে উদ্যত হইলেন।

মাণিকলাল তখন কাতরস্বরে বলিল, "মহারাজাধিরাজ! আমার জীবন দান করুন—রক্ষা করুন—আমি শরণাগত।"

রাজপুত তাহার কেশ ত্যাগ করিলেন, তরবারি নামাইলেন। বলিলেন, "তুই মরিতে এত ভীত কেন?"

মাণিকলাল বলিল, "আমি মরিতে ভীত নহি। কিন্তু আমার একটি সাত বৎসরের কন্যা আছে; সে মাতৃহীন, তাহার আর কেহ নাই—কেবল আমি। আমি প্রাতে তাহাকে আহার করাইয়া বাহির হইয়াছি, আবার সন্ধ্যাকালে গিয়া আহার দিব, তবে সে খাইবে; আমি তাহাকে রাখিয়া মরিতে পারিতেছি না। আমি মরিলে সে মরিবে। আমাকে মারিতে হয়, আগে তাহাকে মারুন।"

দস্যু কাঁদিতে লাগিল, পরে চক্ষুর জল মুছিয়া বলিতে লাগিল, "মহারাজাধিরাজ! আমি আপনার পাদস্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি, আর কখনও দস্যুতা করিব না। চিরকাল আপনার দাসত্ব করিব, আর যদি জীবন থাকে, এক দিন না এক দিন এ ক্ষুদ্র ভৃত্য হইতে উপকার হইবে।"

রাজপুত বলিলেন, "তুমি আমাকে চেন?"

দস্যু বলিল, "মহারাণা রাজসিংহকে কে না চিনে?"

তখন রাজসিংহ বলিলেন,—"আমি তোমার জীবন দান করিলাম। কিন্তু তুমি ব্রাহ্মণের ব্রহ্মস্ব হরণ করিয়াছ, আমি যদি তোমাকে কোন প্রকার দণ্ড না দিই, তবে আমি রাজধর্ম্মে পতিত হইব।"

মাণিকলাল বিনীতভাবে বলিল, "মহারাজাধিরাজ! এ পাপে আমি নূতন ব্রতী। অনুগ্রহ করিয়া আমার প্রতি লঘুদণ্ডেরই বিধান করুন। আমি আপনার সম্মুখেই শাস্তি লইতেছি।"

এই বলিয়া দস্যু কটিদেশ হইতে ক্ষুদ্র ছুরিকা নির্গত করিয়া, অবলীলাক্রমে আপনার তর্জ্জনী অঙ্গুলী ছেদন করিতে উদ্যত হইল। ছুরিতে মাংস কাটিয়া অস্থি কাটিল না। তখন মাণিকলাল এক শিলাখণ্ডের উপর হস্ত রাখিয়া এক অঙ্গুলীর উপর ছুরিকা বসাইয়া আর এক খণ্ড প্রস্তরের দ্বারা তাহাতে ঘা মারিল। আঙ্গুল কাটিয়া মাটিতে পড়িল। দস্যু বলিল, "মহারাজ! এই দণ্ড মঞ্জুর করুন।"

রাজসিংহ দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, দস্যু ভ্রূক্ষেপও করিতেছে না। বলিলেন, "ইহাই যথেষ্ট। তোমার নাম কি?"

দস্যু বলিল, "এ অধমের নাম মাণিকলাল সিংহ। আমি রাজপুতকুলের কলঙ্ক।"

রাজসিংহ বলিলেন,—"মাণিকলাল, আজি হইতে তুমি আমার কার্য্যে নিযুক্ত হইলে, এক্ষণে তুমি অশ্বারোহী সৈন্যভুক্ত হইলে—তোমার কন্যা লইয়া—উদয়পুরে যাও, তোমাকে ভূমি দিব, বাস করিও।"

মাণিকলাল তখন রাণার পদধূলি গ্রহণ করিল এবং রাণাকে ক্ষণকাল অবস্থিত করাইয়া গুহামধ্যে প্রবেশ করিয়া তথা হইতে অপহৃত মুক্তাবলয়, পত্র দুইখানি এবং আসরফি চারি ভাগ আনিয়া দিল। বলিল,—"ব্রাহ্মণের যাহা আমরা কাড়িয়া লইয়াছিলাম, তাহা শ্রীচরণে অর্পণ করিতেছি। পত্র দুইখানি আপনারই জন্য। দাস যে উহা পাঠ করিয়াছে, সে অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।"

রাণা পত্র হস্তে লইয়া দেখিলেন, তাঁহারই নামাঙ্কিত শিরোনামা। বলিলেন, "মাণিকলাল—পত্র পড়িবার এ স্থান নহে। আমার সঙ্গে আইস—তোমরা পথ জানো, পথ দেখাও।"

মাণিকলাল পথ দেখাইয়া চলিল। রাণা দেখিলেন যে, দস্যু একবারও তাহার ক্ষত বা আহত হস্তের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছে না—বা তৎসম্বন্ধে একটি কথাও বলিতেছে না—বা একবার মুখ বিকৃত করিতেছে না। রাণা শীঘ্রই বন হইতে বেগবতী ক্ষীণা তটিনীতীরে এক সুরম্য নিভৃত স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

চঞ্চলকুমারীর পত্র

তথায় উপলঘাতিনী কলনাদিনী তটিনীর সঙ্গে সুমন্দ মধুর বায়ু এবং স্বরলহরীবিকীর্ণকারী কুঞ্জবিহঙ্গমগণ ধ্বনি মিশাইতেছে। তথায় স্তবকে স্তবকে বন্য-কুসুম সকল প্রস্ফুটিত হইয়া পার্ব্বতীয় বৃক্ষরাজি আলোকময় করিতেছে। তথায় রূপ উছলিতেছে, শব্দ তরঙ্গায়িত হইতেছে, গন্ধ মাতিয়া উঠিতেছে এবং মন প্রকৃতির বশীভূত হইতেছে। সেইখানে রাজসিংহ এক বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডের উপর উপবেশন করিয়া পত্র দুইখানি পড়িতে প্রবৃত্ত হইলেন।

প্রথম রাজা বিক্রমসিংহের পত্র পড়িলেন। পড়িয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন—মনে করিলেন, ব্রাহ্মণকে কিছু দিলেই পত্রের উদ্দেশ্য সফল হইবে। তার পর চঞ্চলকুমারীর পত্র পড়িতে লাগিলেন। পত্র এইরূপ—

"রাজন্—আপনি রাজপুতকুলের চূড়া—হিন্দুর শিরোভূষণ। আমি অপরিচিতা হীনমতি বালিকা—নিতান্ত বিপন্না না হইলে কখনই আপনাকে পত্র লিখিতে সাহস করিতাম না। নিতান্ত বিপন্না বুঝিয়াই আমার এ দুঃসাহস মার্জ্জনা করিবেন।

"যিনি এই পত্র লইয়া যাইতেছেন, তিনি আমার গুরুদেব। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে জানিতে পারিবেন—আমি রাজপুতকন্যা। রূপনগর অতি ক্ষুদ্র রাজ্য, তথাপি বিক্রমসিংহ সোলাঙ্কি রাজপুত—রাজকন্যা বলিয়া আমি মধ্যদেশাধিপতির কাছে গণ্যা না হই—রাজপুতকন্যা বলিয়া দয়ার পাত্রী। কেন না, আপনি রাজপুতপতি—রাজপুত-কুল-তিলক।

"অনুগ্রহ করিয়া আমার বিপদ শ্রবণ করুন। আমার দুরদৃষ্টক্রমে দিল্লীর বাদশাহ আমার পাণিগ্রহণ করিতে মানস করিয়াছেন। অনতিবিলম্বে তাঁহার সৈন্য আমাকে দিল্লী লইয়া যাইবার জন্য আসিবে। আমি রাজপুতকন্যা, ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভবা—কি প্রকারে তাহাদের দাসী হইব? রাজহংসী কেমন করিয়া বকসহচরা হইব? হিমালয়নন্দিনী হইয়া কি প্রকারে পঙ্কিল তড়াগে মিশাইব? রাজকুমারী হইয়া কি প্রকারে তুরকী-বর্ব্বরের আজ্ঞাকারিণী হইব? আমি স্থির করিয়াছি, এ বিবাহের অগ্রে বিষভোজনে প্রাণত্যাগ করিব।

"মহারাজাধিরাজ! আমাকে অহঙ্কৃতা মনে করিবেন না। আমি জানি যে, আমি ক্ষুদ্র ভূম্যধিকারীর কন্যা—যোধপুর, অম্বর প্রভৃতি দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপশালী রাজাধিরাজগণও দিল্লীর বাদশাহকে কন্যাদান করা কলঙ্ক মনে করেন না—কলঙ্ক মনে করা দূরে থাক্, বরং গৌরব মনে করেন। আমি সে সব ঘরের কাছে কোন্ ছার! আমার এ অহঙ্কার কেন, এ কথা আপনি জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। কিন্তু মহারাজ! সূর্য্যদেব অস্ত গেলে খদ্যোত কি জ্বলে না? শিশিরভরে নলিনী মুদ্রিত হইলে ক্ষুদ্র কুন্দকুসুম কি বিকসিত হয় না? যোধপুর, অম্বর কুলধ্বংস করিলে, রূপনগরে কি কুলরক্ষা হইতে পারে না? মহারাজ, ভাটমুখে শুনিয়াছি যে,—বনবাসী রাণা প্রতাপের সহিত মহারাজ মানসিংহ ভোজন করিতে আসিলে, মহারাণা ভোজন করেন নাই, বলিয়াছিলেন, যে তুর্ককে ভগিনী দিয়াছে, তাহার সহিত ভোজন করিব না। সেই মহাবীরের বংশধরকে কি আমায় বুঝাইতে হইবে যে, এই সম্বন্ধ রাজপুত-কুলকামিনীর পক্ষে ইহলোকে-পরলোকে ঘৃণাস্পদ? মহারাজ! আজিও আপনার বংশে তুর্ক বিবাহ করিতে পারিল না কেন? আপনারা বীর্য্যবান্ মহাবলপরাক্রান্ত বংশ বটে,

কিন্তু তাই বলিয়া নহে। মহাবলপরাক্রান্ত রুমের বাদশাহ কিংবা পারস্যের শাহ দিল্লীর বাদশাহকে কন্যাদান গৌরব মনে করেন। তবে উদয়পুরেশ্বর কেবল তাঁহাকে কন্যাদান করেন না কেন? তিনি রাজপুত বলিয়া। আমিও সেই রাজপুত। মহারাজ! প্রাণত্যাগ করিব, তবু কুল রাখিব, প্রতিজ্ঞা করিয়াছি।

"প্রয়োজন হইলে প্রাণবিসর্জ্জন করিব, প্রতিজ্ঞা করিয়াছি; কিন্তু তথাপি এই অষ্টাদশ বৎসর বয়সে এ অভিনব জীবন রাখিতে বাসনা হয়। কিন্তু কে এ বিপদে এ জীবন রক্ষা করিবে? আমার পিতার ত কথাই নাই; তাঁহার এমন কি সাধ্য যে, আলম্গীরের সঙ্গে বিবাদ করেন? আর যত রাজপুত রাজা—ছোট হউন, বড় হউন, সকলেই বাদশাহের ভৃত্য—সকলেই বাদশাহের ভয়ে কম্পিতকলেবর। কেবল আপনি—রাজপুতকুলের একা প্রদীপ—কেবল আপনিই স্বাধীন, কেবল উদয়পুরেশ্বরই বাদশাহের সমকক্ষ। হিন্দুকুলে আর কেহ নাই—যে এই বিপন্না বালিকাকে রক্ষা করে। আমি আপনার শরণ লইলাম—আপনি কি আমাকে রক্ষা করিবেন না?

"কত বড় গুরুতর কার্য্যে আমি আপনাকে অনুরোধ করিতেছি, তাহা আমি না জানি, এমন নহে। আমি কেবল বালিকা-বুদ্ধির বশীভূতা হইয়া লিখিতেছি, এমন নহে। দিল্লীশ্বরের সহিত বিবাদ সহজ নহে, জানি। এ পৃথিবীতে আর কেহই নাই যে, তাঁহার সঙ্গে বিবাদ করিয়া তিষ্ঠিতে পারে। কিন্তু মহারাজ, মনে করিয়া দেখুন, মহারাণা সংগ্রামসিংহ বাবরশাহকে প্রায় রাজ্যচ্যুত করিয়াছিলেন। মহারাণা প্রতাপসিংহ আকবরশাহকেও মধ্যদেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন। আপনি সেই সিংহাসনে আসীন—আপনি সেই সংগ্রামের, সেই প্রতাপের বংশধর—আপনি কি তাঁহাদিগের অপেক্ষা হীনবল? শুনিয়াছি না কি মহারাষ্ট্রে এক পার্ব্বতীয় দস্যু আলমগীরকেই পরাভূত করিয়াছে—সে আলমগীর কি রাজস্থানের রাজেন্দ্রের কাছে গণ্য?

"আপনি বলিতে পারেন, আমার বাহুতে বল আছে, কিন্তু থাকিলেও আমি তোমার জন্য কেন এত কষ্ট করিব? আমি কেন অপরিচিতা মুখরা কামিনীর জন্য প্রাণিহত্যা করিব? ভীষণ সমরে অবতীর্ণ হইব? মহারাজ! সর্ব্বস্ব পণ করিয়া শরণাগতকে রক্ষা করা কি রাজধর্ম্ম নহে? সর্ব্বস্ব পণ করিয়া কুলকামিনীর রক্ষা কি রাজপুতের ধর্ম্ম নহে?"

এই পর্য্যন্ত পত্রখানি রাজকন্যার হাতের লেখা, বাকি যেটুকু, সেটুকু তাঁহার হাতের নহে। নির্ম্মলকুমারী লিখিয়া দিয়াছিল; রাজকন্যা তাহা জানিতেন কিনা, আমরা বলিতে পারি না। সে কথা এই—

"মহারাজ! আর একটি কথা বলিতে লজ্জা করে, কিন্তু না বলিলেও নহে। আমি এই বিপদে পড়িয়া পণ করিয়াছি যে, যে বীর আমাকে মোগলহস্ত হইতে রক্ষা করিবেন, তিনি যদি রাজপুত হয়েন, আর যদি আমাকে যথাশাস্ত্র গ্রহণ করেন, তবে আমি তাঁহার দাসী হইব। হে বীরশ্রেষ্ঠ! যুদ্ধে স্ত্রীলাভ বীরের ধর্ম্ম। সমগ্র ক্ষত্রকুলের সহিত যুদ্ধ করিয়া পাণ্ডব দ্রৌপদী লাভ করিয়াছিলেন। কাশীরাজ্যে সমবেত রাজমণ্ডলী-সমক্ষে আপন বীর্য্য প্রকাশ করিয়া ভীষ্মদেব রাজকন্যাগণকে লইয়া আসিয়াছিলেন। হে রাজন! রুক্মিণীর বিবাহ মনে পড়ে না? আপনি এই পৃথিবীতে আজিও অদ্বিতীয় বীর—আপনি কি বীরধর্ম্মে পরাঙ্মুখ হইবেন?

"তবে আমি যে আপনার মহিষী হইবার কামনা করি, ইহা দুরাকাঙ্ক্ষা বটে। যদি আমি আপনার গ্রহণযোগ্যা না হই, তাহা হইলে আপনার সঙ্গে অন্তবিধ সম্বন্ধ স্থাপন করিবারও কি ভরসা করিতে পারি না? অন্ততঃ যাহাতে সেরূপ অনুগ্রহও আমার অপ্রাপ্য না হয়, এই অভিপ্রায় করিয়া গুরুদেব-হস্তে রাখির বন্ধন পাঠাইলাম। তিনি রাখি বাঁধিয়া দিবেন—তার পর আপনার রাজধর্ম্ম আপনার হাতে; আমার প্রাণ আমার হাতে। যদি দিল্লী যাইতে হয়, দিল্লীর পথে বিষ ভোজন করিব।"

পত্র পাঠ করিয়া রাজসিংহ কিছুক্ষণ চিন্তামগ্ন হইলেন। পরে মাথা তুলিয়া মাণিকলালকে বলিলেন, "মাণিকলাল, এ পত্রের কথা তুমি ছাড়া আর কে জানে?"

মাণিকলাল। যাহারা জানিত, মহারাজ গুহামধ্যে তাহাদিগকে বধ করিয়া আসিয়াছেন।

রাজা। উত্তম। তুমি গৃহে যাও। উদয়পুরে আসিয়া আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও। এ পত্রের কথা কাহারও সাক্ষাতে প্রকাশ করিও না।

এই বলিয়া রাজসিংহ, নিকটে যে কয়টি স্বর্ণমুদ্রা ছিল, তাহা মাণিকলালকে দিলেন। মাণিকলাল প্রণাম করিয়া বিদায় হইল।

—

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মাতাজীকি জয়

রাণা অনন্ত মিশ্রকে তাঁহার প্রতীক্ষা করিতে বলিয়া গিয়াছিলেন, অনন্ত মিশ্রও তাঁহার অপেক্ষা করিতেছিলেন—কিন্তু তাঁহার চিত্ত স্থির ছিল না। অশ্বারোহীর যোদ্ধৃবেশ এবং তীব্র দৃষ্টিতে তিনি কিছু কাতর হইয়াছিলেন। একবার ঘোরতর বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া ভাগ্যক্রমে প্রাণে রক্ষা পাইয়াছেন—কিন্তু আর সব হারাইয়াছেন—চঞ্চলকুমারীর আশা-ভরসা হারাইয়াছেন—আর কি বলিয়া তাঁহার কাছে মুখ দেখাইবেন! ব্রাহ্মণ এইরূপ ভাবিতেছিলেন, এমন সময়ে দেখিলেন, পর্ব্বতের উপর দুই তিন জন লোক দাঁড়াইয়া কি পরামর্শ করিতেছে। ব্রাহ্মণ ভীত হইলেন; মনে করিলেন, আবার নূতন দস্যু-সম্প্রদায় আসিয়া উপস্থিত হইল না কি? সে বার নিকটে যাহা হয় কিছু ছিল, তাহা পাইয়া দস্যুরা তাঁহার প্রাণবধে বিরত হইয়াছিল—এবার যদি ইহারা তাঁহাকে ধরে, তবে কি দিয়া প্রাণ রাখিবেন? এইরূপ ভাবিতেছিলেন, এমন সময়ে দেখিলেন যে, পর্ব্বতারূঢ় ব্যক্তিরা হস্ত প্রসারণ করিয়া তাঁহাকে দেখাইতেছে এবং পরস্পর কি বলিতেছে। ইহা দেখিবামাত্র ব্রাহ্মণের যে কিছু সাহস ছিল, তাহা গেল। ব্রাহ্মণ পলায়নের উদ্যোগে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সেই সময়ে পর্ব্বতবিহারী-দিগের মধ্যে একজন পর্ব্বত অবতরণ করিতে আরম্ভ করিল—দেখিয়া ব্রাহ্মণ ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

তখন "ধর্ ধর্" করিয়া তিন চারি জন তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল—ব্রাহ্মণও ছুটিল—অজ্ঞান, মুক্তকচ্ছ, তথাপি 'নারায়ণ নারায়ণ' স্মরণ করিতে করিতে ব্রাহ্মণ তীরবৎ বেগে পলাইল। যাহারা তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়াছিল, তাহারা তাঁহাকে শেষ আর না দেখিতে পাইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইল।

তাহারা অপর কেহই নহে—মহারাণার ভৃত্য-বর্গ। মহারাণার সহিত এ স্থলে কি প্রকারে আমা-দিগের সাক্ষাৎ হইল, তাহা এক্ষণে বুঝাইতে হইতেছে। রাজপুতগণের শিকারে বড় আনন্দ। অদ্য মহারাণা শত অশ্বারোহী এবং ভৃত্যগণসমভি-ব্যাহারে মৃগয়ায় বাহির হইয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহারা শিকারে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া উদয়পুরাভিমুখে যাইতেছিলেন। রাজসিংহ সর্ব্বদা প্রহরিগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া, রাজা হইয়া থাকিতে ভাল-বাসিতেন না। কখন কখন অনুচরগণকে দূরে রাখিয়া একাকী অশ্বারোহণ করিয়া ছদ্মবেশে প্রজা-দিগের অবস্থা দেখিয়া শুনিয়া বেড়াইতেন। সেই জন্য তাঁহার রাজ্যে প্রজা অত্যন্ত সুখী হইয়া উঠিয়াছিল; স্বচক্ষে সকল দেখিতেন; স্বহস্তে সকল দুঃখ নিবারণ করিতেন।

অদ্য মৃগয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে তিনি অনু-চরবর্গকে পশ্চাতে আসিতে বলিয়া দিয়া, বিজয়-নামা দ্রুতগামী অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া একাকী অগ্রসর হইয়াছিলেন। এই অবস্থায় অনন্ত মিশ্রের সহিত সাক্ষাৎ হইলে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা কথিত হইয়াছে, রাজা দস্যুকৃত অত্যাচার শুনিয়া স্বহস্তে ব্রহ্মস্ব উদ্ধারের জন্য ছুটিয়াছিলেন। যাহা দুঃসাধ্য এবং বিপৎপূর্ণ, তাহাতেই তাঁহার আমোদ ছিল।

এ দিকে অনেক বেলা হইল দেখিয়া কতিপয় রাজভৃত্য দ্রুতপদে তাঁহার অনুসন্ধানে চলিল। নীচে অবতরণকালে দেখিল, রাণার অশ্ব দাঁড়াইয়া রহিয়াছে—ইহাতে তাহারা বিস্মিত এবং চিন্তিত হইল। আশঙ্কা করিল যে, রাণার কোন বিপদ ঘটিয়াছে, নিম্নে শিলাখণ্ডোপরি অনন্ত ঠাকুর বসিয়া আছেন দেখিয়া তাহারা বিবেচনা করিল যে, এই ব্যক্তি অবশ্য কিছু জানিবে। সেই জন্য তাহারা হস্তপ্রসারণ করিয়া সে দিকে দেখাইয়া দিতেছিল, তাঁহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিবার জন্য তাহারা নামিতেছিল, এমন সময়ে ঠাকুরজী নারায়ণ স্মরণ পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। তখন তাহারা ভাবিল, তবে এই ব্যক্তি অপরাধী—এই ভাবিয়া তাহারা পশ্চাদ্ধাবিত হইল। ব্রাহ্মণ এক গহ্বরমধ্যে লুকাইয়া প্রাণ রক্ষা করিলেন।

এদিকে মহারাণা চঞ্চলকুমারীর পত্রপাঠ সমাপ্ত ও মাণিকলালকে বিদায় করিয়া অনন্ত মিশ্রের তল্লাসে গেলেন। দেখিলেন, সেখানে ব্রাহ্মণ নাই—তৎপরিবর্ত্তে তাঁহার ভৃত্যবর্গ এবং তাঁহার সম-ভিব্যাহারী অশ্বারোহিগণ আসিয়া অধিত্যকার তলদেশ ব্যাপ্ত করিয়াছে। রাণাকে দেখিতে পাইয়া সকলে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। বিজয় প্রভুকে দেখিতে পাইয়া, তিন লম্ফে অবতরণ করিয়া তাঁহার কাছে দাঁড়াইল। রাণা তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। তাঁহার বস্ত্র রুধিরাক্ত দেখিয়া সকলেই বুঝিল যে, একটা কিছু ক্ষুদ্র ব্যাপার হইয়া গিয়াছে; কিন্তু রাজপুতগণের ইহা নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার—কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিল না।

রাণা কহিলেন, "এইখানে এক ব্রাহ্মণ বসিয়াছিল, সে কোথায় গেল—কেহ দেখিয়াছিলে ?"

যাহারা উঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়াছিল, তাহারা বলিল, "মহারাজ ! সে ব্যক্তি পলাইয়াছে।"

রাণা। শীঘ্র তাহার সন্ধান করিয়া লইয়া আইস।

ভৃত্যগণ তখন সবিশেষ কথা বুঝিয়া নিবেদন করিল যে, "আমরা অনেক সন্ধান করিয়াছি, কিন্তু পাই নাই।"

অশ্বারোহিগণমধ্যে রাণার পুত্রদ্বয়, তাঁহার জ্ঞাতি ও অমাত্যবর্গ প্রভৃতি ছিল। রাজা পুত্রদ্বয় ও অমাত্যবর্গকে নির্জ্জনে লইয়া গিয়া কথাবার্ত্তা বলিলেন। পরে ফিরিয়া আসিয়া আর সকলকে বলিলেন,—

"প্রিয়জনবর্গ। আজি অধিক বেলা হইয়াছে। তোমাদিগের সকলের ক্ষুধা তৃষ্ণা পাইয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু আজ উদয়পুরে গিয়া ক্ষুধাতৃষ্ণা নিবারণ আর আমাদিগের অদৃষ্টে নাই, এই পার্ব্বত্যপথে আবার আমাদিগকে ফিরিয়া যাইতে হইবে। একটি ক্ষুদ্র লড়াই জুটিয়াছে—লড়াইয়ে যাহার সাধ থাকে, আমার সঙ্গে আইস ; আমি এই পর্ব্বত পুনরারোহণ করিব। যাহার সাধ না থাকে, উদয়পুরে ফিরিয়া যাও।"

এই বলিয়া রাণা পর্ব্বত আরোহণে প্রবৃত্ত হইলেন। অমনি "জয় মহারাণাকি জয়, জয় মাতাজীকি জয়!" বলিয়া সেই শত অশ্বারোহী তাঁহার পশ্চাতে পর্ব্বত আরোহণে প্রবৃত্ত হইল। উপরে উঠিয়া "হর! হর!" শব্দে রূপনগরের পথে ধাবিত হইল। অশ্বখুরের আঘাতে অধিত্যকায় ঘোরতর প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

নিরাশা

এ দিকে অনন্ত মিশ্র রূপনগর হইতে যাত্রা করার পরেই রূপনগরে মহাধুম পড়িয়া গেল। মোগল বাদশাহের দুই সহস্র অশ্বারোহী সেনা রূপনগরের গড়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা চঞ্চলকুমারীকে লইতে আসিয়াছে।

নির্ম্মলের মুখ শুকাইল ; দ্রুতবেগে সে চঞ্চলকুমারীর কাছে গিয়া বলিল, "কি হইবে সখি ?"

চঞ্চলকুমারী মৃদু হাসি হাসিয়া বলিলেন, "কিসের কি হইবে ?"

নির্ম্মল। তোমাকে ত লইতে আসিয়াছে। কিন্তু এই ত ঠাকুরজী উদয়পুরে গিয়াছেন—এখনও তাঁর পৌঁছিবার বিলম্ব আছে। রাজসিংহের উত্তর আসিতে না আসিতেই তোমায় লইয়া যাইবে—কি হইবে সখি ?

চঞ্চল। তার আর উপায় নাই—কেবল আমার সেই শেষ উপায় আছে। দিল্লীর পথে বিষভোজনে প্রাণত্যাগ—সে বিষয়ে আমি চিত্ত স্থির করিয়াছি। সুতরাং আমার আর উদ্বেগ নাই। একবার কেবল আমি পিতাকে অনুরোধ করিব—যদি মোগলসেনাপতি সাত দিনের অবসর দেন।

চঞ্চলকুমারী সময়মত পিতৃপদে নিবেদন করিলেন যে, "আমি জন্মের মত রূপনগর হইতে চলিলাম। আমি আর কখন যে আপনাদিগের শ্রীচরণ দর্শন করিতে পাইব, আর কখন যে বাল্যসখীগণের সঙ্গে আমোদ করিতে পাইব, এমন সম্ভাবনা নাই। আমি আর সাত দিনের অবসর ভিক্ষা করি—সাত দিন মোগলসেনা এইখানে অবস্থিতি করুক, আর সাত দিন আমি আপনাদিগকে দেখিয়া শুনিয়া জন্মের মত বিদায় হইব।"

রাজা একটু কাঁদিলেন, বলিলেন, "দেখি, সেনাপতিকে অনুরোধ করিব, কিন্তু তিনি অপেক্ষা করিবেন কি না, বলিতে পারি না।"

রাজা অঙ্গীকার মত মোগলসেনাপতির কাছে নিবেদন জানাইলেন। সেনাপতি ভাবিয়া দেখিলেন, বাদশাহ কোন সময় নিরূপিত করিয়া দেন নাই—বলিয়া দেন নাই যে, এত দিনের মধ্যে ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু সাত দিন বিলম্ব করিতে তাঁহার সাহস হইল না ; ভবিষ্যৎ বেগমের অনুরোধ একেবারে অগ্রাহ্য করিতেও পারিলেন না। আর পাঁচ দিন অবস্থিতি করিতে স্বীকৃত হইলেন। চঞ্চলকুমারীর বড় একটা ভরসা জন্মিল না।

এ দিকে উদয়পুর হইতে কোন সংবাদ আসিল না—মিশ্র ঠাকুর ফিরিলেন না—তখন চঞ্চলকুমারী ঊর্দ্ধমুখে যুক্তকরে বলিল, "হে অনাথনাথ দেবাদিদেব! অবলাকে বধ করিও না।"

রজনীতে নির্ম্মল আসিয়া তাঁহার কাছে শয়ন করিল। সমস্ত রাত্রি দুই জনে দুই জনকে বক্ষে রাখিয়া রোদন করিয়া কাটাইল। নির্ম্মল বলিল, "আমি তোমার সঙ্গে যাইব।" কয়দিন ধরিয়া সে এই কথাই বলিতেছিল। চঞ্চল বলিল, "তুমি

আমার সঙ্গে কোথায় যাইবে? আমি মরিতে যাইতেছি।" নির্ম্মল বলিল, "আমিও মরিব। তুমি আমায় ফেলিয়া গেলেই কি আমি বাঁচিব?" চঞ্চল বলিল, "ছি! অমন কথা বলিও না—আমার দুঃখের উপর কেন দুঃখ বাড়াও?" নির্ম্মল বলিল, "তুমি আমাকে লইয়া যাও বা না যাও, আমি নিশ্চয় তোমার সঙ্গে যাইব—কেহ রাখিতে পারিবে না।" দুই জনে কাঁদিয়া রাত্রি কাটাইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মেহেরজান

যে কয়দিন মোগল সৈনিকেরা রূপনগরে শিবির-সংস্থাপন করিয়া রহিলেন, সে কয় দিন বড় আমোদ প্রমোদে কাটিল। মোগলসৈন্যের সঙ্গে সঙ্গে নর্ত্তকীর দল ছুটিত; যখন যুদ্ধ না হইত, তখন তাম্বুর ভিতর নাচগানের ধূম পড়িত। সৈনিকদিগের রূপনগরে আসা কেবল আনন্দ করিতে আসা। সুতরাং রাত্রিতে তাম্বুতে নৃত্যগীতের বড় ধূম।

নর্ত্তকীদিগের মধ্যে সহসা এক জনের নাম অত্যন্ত খ্যাতিলাভ করিল। দিল্লীতে কেহ কখন মেহেরজানের নাম শুনে নাই—কিন্তু যাহাদের নাম প্রসিদ্ধ, তাহারাও রূপনগরে আসিয়া মেহেরজানের তুল্য যশস্বিনী হইতে পারিল না। মেহেরজান আবার নর্ত্তকী হইয়াও সচ্চরিত্রা, এ জন্য সে আরও যশস্বিনী হইল।

মোগলসেনাপতি সৈয়দ হাসান আলি তাহার সঙ্গীত শুনিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু মেহেরজান প্রথমে স্বীকৃত হইল না। বলিল, "আমি অনেক লোকের সাক্ষাতে নৃত্যগীত করিতে পারি না।" সৈয়দ হাসান আলি স্বীকার করিলেন যে, বন্ধুবর্গ কেহ উপস্থিত থাকিবে না। নর্ত্তকী আসিয়া তাঁহাকে নৃত্যগীত শুনাইল। তিনি অতিশয় প্রীত হইয়া নর্ত্তকীকে অর্থ দিয়া পুরস্কৃত করিলেন। কিন্তু নর্ত্তকী তাহা লইল না, বলিল, "আমি অর্থ চাহি না। যদি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে আমি যে পুরস্কার চাই, তাহাই দিবেন। নহিলে কোন পুরস্কার চাহি না।"

সৈয়দ হাসান আলি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি পুরস্কার চাও?"

মেহেরজান বলিল, "আমি আপনার অশ্বারোহী সৈন্যভুক্ত হইবার ইচ্ছা করি।"

হাসান আলি অবাক্—হতবুদ্ধি হইয়া মেহেরজানের সুন্দর সহাস্য মুখখানির প্রতি চাহিয়া রহিলেন। মেহেরজান তাঁহাকে নিরুত্তর দেখিয়া বলিল, "আমি ঘোড়া, হাতিয়ার, পোষাকের দাম দিব।"

হাসান আলি বলিল, "স্ত্রীলোক অশ্বারোহী সৈনিক?"

মেহেরজান বলিল, "ক্ষতি কি? যুদ্ধ ত হইবে না, যুদ্ধ হইলেও পলাইব না।"

হাসান আলি। লোকে কি বলিবে?

মেহেরজান। আপনি আর আমি জানিলাম, অন্য কেহ জানিবে না।

হাসান আলি। তুমি এ কামনা কেন কর?

মেহেরজান। যে জন্যই হউক—বাদশাহের ইহাতে ক্ষতি নাই।

হাসান আলি প্রথমে কিছুতেই স্বীকৃত হইল না; কিন্তু মেহেরজানও কিছুতেই ছাড়িল না। শেষে হাসান আলি স্বীকৃত হইল। মেহেরজানের প্রার্থনা মঞ্জুর হইল।

মেহেরজান সেই দরিয়া বিবি।

নবম পরিচ্ছেদ

প্রভুভক্তি

এই সময়ে একবার মাণিকলালের কথা পাড়িতে হইল। মাণিকলাল রাণার নিকট হইতে বিদায় লইয়া প্রথমে আবার সেই পর্ব্বতগুহায় ফিরিয়া গেল। আর সে দস্যুতা করিবে, এমন বাসনা ছিল না; কিন্তু পূর্ব্ববন্ধুগণ মরিল কি বাঁচিল, তাহা দেখিবে না কেন? যদি কেহ একেবারে না মরিয়া থাকে, তবে তাহার শুশ্রূষা করিয়া বাঁচাইতে হইবে। এই সকল ভাবিতে ভাবিতে মাণিকলাল গুহাপ্রবেশ করিল।

দেখিল, দুইজন মরিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। যে কেবল মূর্চ্ছিত হইয়াছিল, সে সংজ্ঞালাভ করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। মাণিকলাল তখন বিষণ্ণচিত্তে বন হইতে একরাশি কাষ্ঠ ভাঙ্গিয়া আনিল—তদ্দ্বারা দুইটি চিতা রচনা করিয়া, দুইটি মৃতদেহ তদুপরি স্থাপন করিল। গুহা হইতে প্রস্তর ও লৌহ বাহির করিয়া অগ্ন্যুৎপাদন পূর্ব্বক চিতায় আগুন দিল। এইরূপে সঙ্গীদিগের অন্তিমকার্য্য করিয়া সে

স্থান হইতে চলিয়া গেল। পরে মনে করিল যে, যে ব্রাহ্মণকে পীড়ন করিয়াছিলাম, তাহার কি অবস্থা হইয়াছে, দেখিয়া আসি। যেখানে অনন্ত মিশ্রকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, সেখানে আসিয়া দেখিল যে, সেখানে ব্রাহ্মণ নাই। দেখিল, স্বচ্ছসলিলা পার্ব্বত্য নদীর জল একটু সমল হইয়াছে—এবং অনেক স্থানে বৃক্ষ-শাখা, লতা, গুল্ম, তৃণাদি ছিন্ন-ভিন্ন হইয়াছে। এই সকল চিহ্নে মাণিকলাল মনে করিল যে, এখানে বোধ হয়, অনেক লোক আসিয়াছিল। তার পর দেখিল, পাহাড়ের প্রস্তরময় অঙ্গেও কতকগুলি অশ্বের পদচিহ্ন লক্ষ্য করা যায়, বিশেষ অশ্বের খুরে যেখানে লতা-গুল্ম কাটিয়া গিয়াছে, সেখানে অর্দ্ধগোলাকৃত চিহ্ন সকল স্পষ্ট। মাণিকলাল মনোযোগপূর্ব্বক বহুক্ষণ ধরিয়া নিরীক্ষণ করিয়া বুঝিল যে, এখানে অনেকগুলি অশ্বারোহী আসিয়াছিল।

চতুর মাণিকলাল তাহার পর দেখিতে লাগিল, অশ্বারোহিগণ কোন্ দিক্ হইতে আসিয়াছে—কোন্ দিকে গিয়াছে। দেখিল, কতকগুলি চিহ্নের সম্মুখ দক্ষিণে—কতকগুলির সম্মুখ উত্তরে। কতকদূরমাত্র দক্ষিণে গিয়া চিহ্ন সকল আবার উত্তরমুখ হইয়াছে। ইহাতে বুঝিল, অশ্বারোহিগণ উত্তর হইতে এই পর্য্যন্ত আসিয়া আবার উত্তরাংশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে।

এই সকল সিদ্ধান্ত করিয়া মাণিকলাল গৃহে গেল। সে স্থান হইতে মাণিকলালের গৃহ দুই তিন ক্রোশ। তথায় রন্ধন করিয়া আহারাদি সমাপনান্তে কন্যাটিকে ক্রোড়ে লইল। তখন মাণিকলাল ঘরে চাবি দিয়া কন্যা-ক্রোড়ে নিষ্ক্রান্ত হইল।

মাণিকলালের কেহ ছিল না—কেবল এক পিসীর ননদের জায়ের খুল্লতাতপুত্রী ছিল। সৌজন্যবশতঃই হউক, আর আত্মীয়তার সাধ মিটাইবার জন্যই হউক—মাণিকলাল তাহাকে পিসী বলিয়া ডাকিত।

মাণিকলাল কন্যা লইয়া সেই পিসীর বাড়ী গেল। ডাকিল, "পিসী গা!"

পিসী বলিল, "কি বাছা মাণিকলাল! কি মনে করিয়া?"

মাণিকলাল বলিল, "আমার এই মেয়েটি রাখিতে পার পিসী?"

পিসী। কতক্ষণের জন্য?

মাণিক। এই দু'মাস দু'মাসের জন্য।

পিসী। সে কি বাছা! আমি গরীব মানুষ, মেয়েকে খাওয়াব কোথা হইতে?

মাণিক। কেন পিসীমা, তুমি কিসের গরীব, তুমি কি নাতনীকে দু'মাস খাওয়াইতে পার না?

পিসী। সে কি কথা। দু'মাস একটা মেয়ে পুষিতে যে এক মোহর পড়ে।

মাণিক। আচ্ছা, আমি সে এক মোহর দিতেছি—তুমি মেয়েটিকে দু'মাস রাখ। আমি উদয়পুরে যাইব—সেখানে আমি রাজসরকারে বড় চাকরী পাইয়াছি।

এই বলিয়া মাণিকলাল, রাণার প্রদত্ত আসরফির মধ্যে একটা পিসীর সম্মুখে ফেলিয়া দিল; এবং কন্যাকে তাহার কাছে ছাড়িয়া দিয়া, বলিল, "যা! তোর দিদির কোলে গিয়া ব'স।"

পিসীঠাকুরাণী কিছু লোভে পড়িলেন। মনে বিলক্ষণ জানিতেন যে, এক মোহরে ঐ শিশুর এক বৎসর গ্রাসাচ্ছাদন চলিতে পারে—মাণিকলাল কেবল দুই মাসের করার করিতেছে—অতএব কিছু লাভের সম্ভাবনা। তার পর, মাণিক রাজসরকারে চাকরী স্বীকার করিয়াছে—চাহি কি বড়মানুষ হইতে পারে, তা হইলে কি পিসীকে তখন কিছু দিবে না? মানুষটা হাতে থাকা ভাল।

পিসী তখন মোহরটি কুড়াইয়া লইয়া বলিল, "তার আশ্চর্য্য কি বাছা, তোমার মেয়ে মানুষ করিব, সে কি বড় ভারী কাজ? তুমি নিশ্চিন্ত থাক। আয় রে জান্, আয়।" বলিয়া পিসী কন্যাকে কোলে তুলিয়া লইল।

কন্যা সম্বন্ধে এইরূপ বন্দোবস্ত হইলে, মাণিকলাল নিশ্চিন্তচিত্তে গ্রাম হইতে নির্গত হইল। কাহাকেও কিছু না বলিয়া রূপনগরে যাইবার পার্ব্বত্য-পথে আরোহণ করিল।

মাণিকলাল এইরূপ বিচার করিতেছিল—"ঐ অধিত্যকায় অনেকগুলি অশ্বারোহী আসিয়াছিল কেন? ঐখানে রাণাও একাকী ভ্রমিতেছিলেন—কিন্তু উদয়পুর হইতে এত দূর রাণা একাকী আসিবার সম্ভাবনা নাই। অতএব উহারা রাণার সমভিব্যাহারী অশ্বারোহী। তার পর দেখা গেল, উহারা উত্তর হইতে আসিয়াছে—উদয়পুর অভিমুখে যাইতেছিল—বোধ হয়, রাণা মৃগয়া বা বনবিহারে গিয়া থাকিবেন, উদয়পুর ফিরিয়া যাইতেছিলেন। তার পর দেখিলাম, উহারা উদয়পুর যায় নাই। উত্তরমুখেই ফিরিয়াছে কেন? উত্তরে ত রূপনগর বটে! বোধ হয়, চঞ্চলকুমারীর পত্র পাইয়া রাণা

অশ্বারোহী সৈন্য সমভিব্যাহারে তাঁহার নিমন্ত্রণ রাখিতে গিয়াছেন। তাহা যদি না গিয়া থাকেন, তবে তাঁহার রাজপুতপতি নাম মিথ্যা। আমি তাঁহার ভৃত্য—আমি তাঁহার কাছে যাইব—কিন্তু তাঁহারা অশ্বারোহণে গিয়াছেন—আমার পদব্রজে যাইতে অনেক বিলম্ব হইবে। তবে এক ভরসা, পার্ব্বত্য-পথে অশ্ব তত দ্রুত যায় না এবং মাণিকলাল পদব্রজে বড় দ্রুতগামী।" মাণিকলাল দিবারাত্র পথ চলিতে লাগিল। যথাকালে সে রূপনগরে পৌঁছিল। পৌঁছিয়া দেখিল যে, রূপনগরে দুই সহস্র মোগল অশ্বারোহী আসিয়া শিবির করিয়াছে, কিন্তু রাজপুতসেনার কোন চিহ্ন দেখা যায় না। আরও শুনিল, পরদিন প্রভাতে মোগলেরা রাজকুমারীকে লইয়া যাইবে।

মাণিকলাল বুদ্ধিতে একটি ক্ষুদ্র সেনাপতি। রাজপুতগণের কোন সন্ধান না পাইয়া, কিছুই দুঃখিত হইল না। মনে মনে বলিল, "মোগল পারিবে না—কিন্তু আমি প্রভুর সন্ধান করিয়া লইব।"

একজন নাগরিককে মাণিকলাল বলিল, "আমাকে দিল্লী যাইবার পথ দেখাইয়া দিতে পার? আমি কিছু বখ্‌শিস্ দিব।" নাগরিক সম্মত হইয়া কিছু দূর অগ্রসর হইয়া তাহাকে পথ দেখাইয়া দিল। মাণিকলাল তাহাকে পুরস্কৃত করিয়া বিদায় করিল। পরে দিল্লীর পথে, চারিদিক্ ভাল করিয়া দেখিতে দেখিতে চলিল। মাণিকলাল স্থির করিয়াছিল যে, রাজপুত অশ্বারোহিগণ অবশ্য দিল্লীর পথে কোথাও লুকাইয়া আছে। প্রথমতঃ কিছু দূর পর্য্যন্ত মাণিকলাল রাজপুতসেনার কোন চিহ্ন পাইল না। পরে এক স্থানে দেখিল, পথ অতি সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিল। দুই পার্শ্বে দুইটি পাহাড় উঠিয়া প্রায় অর্দ্ধক্রোশ সমান্তরাল হইয়া চলিয়াছে—মধ্যে কেবল সঙ্কীর্ণ পথ। দক্ষিণদিকের পর্ব্বত অতি উচ্চ—এবং দুরারোহণীয়—তাহার শিখরদেশ প্রায় পথের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছে। বামদিকে পর্ব্বত অতি ধীরে ধীরে উঠিয়াছে। আরোহণের সুবিধা এবং পর্ব্বতও অনুচ্চ। এক স্থানে ঐ বামদিকে একটি রন্ধ্র বাহির হইয়াছে, তাহা দিয়া একটু সূক্ষ্ম পথ আছে।

নেপোলিয়ন প্রভৃতি অনেক দস্যু সুদক্ষ সেনাপতি ছিলেন। রাজা হইলে লোকে আর দস্যু বলে না। মাণিকলাল রাজা নহে—সুতরাং আমরা তাহাকে দস্যু বলিতে বাধ্য। কিন্তু রাজদস্যুদিগের ন্যায় এই ক্ষুদ্র দস্যুরও সেনাপতির চক্ষু ছিল। পর্ব্বত-নিরুদ্ধ সঙ্কীর্ণ পথ দেখিয়া সে মনে করিল, রাণা যদি আসিয়া থাকেন, তবে এইখানেই আছেন। যখন মোগলসৈন্য এই সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া যাইবে—এই পর্ব্বত-শিখর হইতে রাজপুত অশ্ব বজ্রের ন্যায় তাহাদিগের মস্তকে পড়িতে পারিবে। দক্ষিণদিকের পর্ব্বত দুরারোহণীয়; অশ্বারোহিগণের আরোহণ ও অবতরণের অনুপযুক্ত; অতএব সেখানে রাজপুতসেনা থাকিবে না—কিন্তু বামের পর্ব্বত হইতে তাহাদিগের অবতরণের বড় সুখ। মাণিকলাল তদুপরি আরোহণ করিল। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে।

উঠিয়া কোথাও কাহাকেও দেখিতে পাইল না। মনে করিল, খুঁজিয়া দেখি; কিন্তু আবার ভাবিল, রাজা ভিন্ন আর কোন রাজপুত্র আমাকে চিনে না, আমাকে মোগলের চর বলিয়া হঠাৎ কোন অদৃশ্য রাজপুত মারিয়া ফেলিতে পারে। এই ভাবিয়া সে আর অগ্রসর না হইয়া, সেই স্থানে দাঁড়াইয়া বলিল, "মহারাণার জয় হউক।"

এই শব্দ উচ্চারিত হইবামাত্র চারি পাঁচ জন শস্ত্রধারী রাজপুত অদৃশ্য স্থান হইতে গাত্রোত্থান করিয়া দাঁড়াইল এবং তরবারিহস্তে মাণিকলালকে কাটিতে আসিতে উদ্যত হইল।

এক জন বলিল, "মারিও না।" মাণিকলাল দেখিল স্বয়ং রাণা।

রাণা বলিলেন, "মারিও না। এ আমাদিগের স্বজন।" যোদ্ধৃগণ তখনই আবার লুক্কায়িত হইল।

রাণা মাণিককে নিকটে আসিতে বলিলেন, সে নিকটে আসিল। এক নিভৃত স্থলে তাহাকে বসিতে বলিয়া স্বয়ং সেইখানে বসিলেন। রাজা তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এখানে কেন আসিয়াছ?"

মাণিকলাল বলিল, "প্রভু যেখানে, ভৃত্য সেইখানে যাইবে। বিশেষ যখন আপনি এরূপ বিপজ্জনক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন যদি ভৃত্য কোনও কার্য্যে লাগে, এই ভরসায় আসিয়াছি। মোগলেরা দুই সহস্র—মহারাজের সঙ্গে একশত। আমি কি প্রকারে নিশ্চিন্ত থাকিব? আপনি আমাকে জীবন দান করিয়াছেন—এক দিনেই কি তাহা ভুলিব?"

রাণা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি যে এখানে আসিয়াছি, তুমি কি প্রকারে জানিলে?"

মাণিকলাল তখন আদ্যোপান্ত সকল বলিল। শুনিয়া রাণা সন্তুষ্ট হইলেন। বলিলেন, "আসিয়াছ, ভালই করিয়াছ—আমি তোমার মত সুচতুর লোক এক জন খুঁজিতেছিলাম। আমি যাহা বলি—পারিবে?"

মাণিকলাল বলিল, "মনুষ্যের যাহা সাধ্য, তাহা করিব।"

রাণা বলিলেন, "আমরা একশত যোদ্ধামাত্র; মোগলের সঙ্গে দুই হাজার—আমরা রণ করিয়া প্রাণত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু জয়ী হইতে পারিব না। যুদ্ধ করিয়া রাজকন্যার উদ্ধার করিতে পারিব না। রাজকন্যাকে আগে বাঁচাইয়া পরে যুদ্ধ করিতে হইবে। রাজকন্যা যুদ্ধক্ষেত্রে থাকিলে তিনি আহত হইতে পারেন, তাঁহার রক্ষা প্রথমে চাই।"

মাণিকলাল বলিল, "আমি ক্ষুদ্র জীব, আমি সে সকল কি প্রকারে বুঝিব, আমাকে কি করিতে হইবে, তাহাই আজ্ঞা করুন।"

রাণা বলিলেন, "তোমাকে মোগল অশ্বারোহীর বেশ ধরিয়া কল্য মোগলসেনার সঙ্গে আসিতে হইবে। রাজকুমারীর শিবিকার সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে থাকিতে হইবে এবং যাহা যাহা বলিতেছি, তাহা করিতে হইবে।" রাণা তাহাকে সবিস্তার উপদেশ দিলেন। মাণিকলাল শুনিয়া বলিল, "মহারাজের জয় হউক। আমি কার্য্য সিদ্ধ করিব, আমাকে অনুগ্রহ করিয়া একটি ঘোড়া বখ্‌শিস্ করুন।"

রাণা। আমরা একশত যোদ্ধা, একশত ঘোড়া, আর ঘোড়া নাই যে, তোমায় দিই। অন্য কাহারও ঘোড়া দিতে পারিব না। আমার ঘোড়া লইতে পার।

মাণিক। তাহা প্রাণ থাকিতে লইব না, আমাকে প্রয়োজনীয় হাতিয়ার দিন।

রাণা। কোথায় পাইব? যাহা আছে, তাহাতে আমাদের কুলায় না। কাহাকে নিরস্ত্র করিয়া তোমাকে হাতিয়ার দিব? আমার হাতিয়ার লইতে পার।

মাণিক। তাহা হইতে পারে না, আমাকে পোষাক দিতে আজ্ঞা হউক।

রাণা। এখানে যাহা পরিয়া আসিয়াছি, তাহা ভিন্ন আর পোষাক নাই। আমি কিছুই দিব না।

মাণিক। মহারাজ! তবে অনুমতি দিউন, আমি যে প্রকারে হউক, এ সকল সংগ্রহ করিয়া লই।

রাণা হাসিলেন। বলিলেন, "চুরি করিবে?"

মাণিকলাল জিহ্বা কাটিল। বলিল, "আমি শপথ করিয়াছি যে, আর সে কার্য্য করিব না।"

রাণা। তবে কি করিবে?

মাণিক। ঠকাইয়া লইব।

রাজা হাসিলেন। বলিলেন, "যুদ্ধকালে সকলেই চোর—সকলেই বঞ্চক। আমিও বাদশাহের বেগম চুরি করিতে আসিয়াছি—চোরের মত লুকাইয়া আছি। তুমি যে প্রকারে পার, এ সকল সংগ্রহ করিও।"

মাণিকলাল প্রফুল্লচিত্তে প্রণাম করিয়া বিদায় হইল।

দশম পরিচ্ছেদ

রসিকা পানওয়ালী

মাণিকলাল তখনই রূপনগরে ফিরিয়া আসিল। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। রূপনগরের বাজারে গিয়া মাণিকলাল দেখিল যে, বাজার অত্যন্ত শোভাময়। দোকানের শত শত প্রদীপের শোভায় বাজার আলোকময় হইয়াছে—নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য উজ্জ্বলবর্ণে রসনা আকুল করিতেছে; পুষ্প, পুষ্পমালা থরে থরে নয়ন রঞ্জিত এবং ঘ্রাণে মন মুগ্ধ করিতেছে। মাণিকের উদ্দেশ্য, অশ্ব ও অস্ত্র সংগ্রহ করা, কিন্তু তাই বলিয়া আপন উদরকে বঞ্চনা করা মাণিকলালের অভিপ্রায় ছিল না। মাণিক গিয়া কিছু মিঠাই কিনিয়া খাইতে আরম্ভ করিল। সের পাঁচ ছয় ভোজন করিয়া মাণিক দেড় সের জল খাইল এবং দোকানদারকে উচিত মূল্য দান করিয়া তাম্বুলান্বেষণে গেল।

দেখিল, একটা পানের দোকানে বড় জাঁক। দেখিল, দোকানে বহুসংখ্যক দীপ বিচিত্র কাচমধ্য হইতে স্নিগ্ধ জ্যোতি বিকীর্ণ করিতেছে। দেওয়ালে নানাবর্ণের কাগজ মোড়া—নানাপ্রকার বাহারের ছবি লটকান—তবে চিত্রগুলি একটু বেশীমাত্রায় রঙ্গদার, আধুনিক ভাষায় "obscene," প্রাচীন ভাষায় "আদিরসাশ্রিত।" মধ্যস্থানে কোমল গালিচায় বসিয়া দোকানের অধিকারিণী তাম্বুলবিক্রেত্রী—বয়সে ত্রিশের উপর, কিন্তু কুরূপা নহে। বর্ণ গৌর, চক্ষু বড় বড়, চাহনি বড় চঞ্চল, হাসি বড় রঙ্গদার—সে হাসি অধিকাংশ দন্তশ্রেণীমধ্যে সর্ব্বদাই খেলিতেছে—

হাসির সঙ্গে সর্বালঙ্কার দুলিতেছে—অলঙ্কার কতক রূপা, কতক সোনা—কিন্তু সুগঠন এবং সুশোভন। মাণিকলাল দেখিয়া শুনিয়া পান চাহিল।

পানওয়ালী স্বয়ং পান বেচে না—সম্মুখে এক জন দাসীতে পান সাজিতেছে ও বেচিতেছে—পানওয়ালী কেবল পয়সা কুড়াইতেছে—এবং মিষ্ট হাসিতেছে।

দাসী এক জন পান সাজিয়া দিল; মাণিকলাল ডবল দাম দিল। আবার পান চাহিল। যতক্ষণ পান সাজা হইতেছিল, ততক্ষণ মাণিক পানওয়ালীর সঙ্গে হাসিয়া হাসিয়া দুই একটা মিষ্ট কথা কহিতে লাগিল; পানওয়ালীর রূপের প্রশংসা করিলে পাছে সে কিছু মন্দ ভাবে, এ জন্য প্রথমে তাহার দোকান-সজ্জা ও অলঙ্কারগুলির প্রশংসা করিতে লাগিল। পানওয়ালীও একটু ভিজিল। পানওয়ালী মিঠে পানের সঙ্গে মিঠে কথা বেচিতে আরম্ভ করিল। মাণিকলাল তখন দোকানে উঠিয়া বসিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে পানওয়ালীর হুঁকা কাড়িয়া লইয়া টানিতে আরম্ভ করিল। এ দিকে মাণিকলাল পান খাইয়া দোকানের মসলা ফুরাইয়া দিল। দাসী মসলা আনিতে অন্য দোকানে গেল। সেই অবসরে মাণিকলাল পানওয়ালীকে বলিল, "মহারাজিয়া! তুমি বড় চতুরা। আমি একটি চতুরা স্ত্রীলোক খুঁজিতেছিলাম, আমার একটি দুষমন্ আছে—তাহাকে একটু জব্দ করিব ইচ্ছা। কি করিতে হইবে, তাহা তোমাকে বুঝাইয়া বলিতেছি। তুমি যদি আমার সহায়তা কর, তবে এক আসরফি পুরস্কার করিব।"

পান। কি করিতে হইবে?

মাণিক চুপি চুপি কি বলিল। পানওয়ালী বড় রঙ্গপ্রিয়—তৎক্ষণাৎ সম্মত হইল। বলিল, "আসরফির প্রয়োজন নাই—রঙ্গই আমার পুরস্কার।"

মাণিকলাল তখন দোয়াত, কলম, কাগজ চাহিল। দাসী তখন নিকটস্থ বেণিয়ার দোকান হইতে আনিয়া দিল। মাণিক পানওয়ালীর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া এই পত্র লিখিল, "হে প্রাণনাথ! তুমি যখন নগরভ্রমণে আসিয়াছিলে, আমি তোমাকে দেখিয়া অতিশয় মুগ্ধ হইয়াছিলাম। তোমার একবার দেখা না পাইলে আমার প্রাণ যাইবে। শুনিতেছি, তোমরা কাল চলিয়া যাইবে—অতএব আজ একবার অবশ্য অবশ্য আমায় দেখা দিবে। নহিলে আমি গলায় ছুরি দিব। যে পত্র লইয়া যাইতেছে—তাহার সঙ্গে আসিও, সে পথ দেখাইয়া লইয়া আসিবে।"

পত্র লেখা হইলে মাণিকলাল শিরোনামা দিল, "মহম্মদ খাঁ।"

পানওয়ালী জিজ্ঞাসা করিল, "কে ও ব্যক্তি?"

মাণিক। এক জন মোগল সওয়ার।

বাস্তবিক, মাণিকলাল মোগলদিগের মধ্যে এক জনকেও চিনিত না। কাহারও নাম জানে না। সে মনে ভাবিল, দুই হাজার মোগলের মধ্যে অবশ্য এক জন 'মহম্মদ' আছেই আছে—আর সকল মোগলই 'খাঁ।' অতএব সাহস করিয়া "মহম্মদ খাঁ" লিখিল; লেখা হইলে মাণিকলাল বলিল, "তাহাকে এইখানে আনিব?"

পানওয়ালী বলিল, "এ ঘরে হইবে না। আর একটা ঘর ভাড়া লইতে হইবে।"

তখনই দুই জনে বাজারে গিয়া আর একটা ঘর ভাড়া লইল। পানওয়ালী মোগলের অভ্যর্থনা জন্য তাহা সজ্জিতকরণে প্রবৃত্ত হইল—মাণিকলাল পত্র লইয়া মুসলমানশিবিরে উপস্থিত হইল। শিবির-মধ্যে মহা গোলযোগ—কোন শৃঙ্খলা নাই—নিয়ম নাই। তাহার ভিতরে বাজার বসিয়া গিয়াছে—রঙ্গ-তামাসা রোশনাইয়ের ধুম লাগিয়াছে। মাণিকলাল মোগল দেখিলেই জিজ্ঞাসা করে, "মহম্মদ খাঁ কে মহাশয়? তাঁহার নামে পত্র আছে।" কেহ উত্তর দেয় না—কেহ গালি দেয়; কেহ বলে, "চিনি না"—কেহ বলে, "খুঁজিয়া লও।" শেষ এক জন মোগল বলিল, "মহম্মদ খাঁকে চিনি না, কিন্তু আমার নাম নূর মহম্মদ খাঁ। পত্র দেখি, দেখিলে বুঝিতে পারিব, পত্র আমার কি না।"

মাণিকলাল সানন্দচিত্তে তাহার হস্তে পত্র দিল—মনে জানে, মোগল যেই হোক, ফাঁদে পড়িবে। মোগলও ভাবিল—পত্র যারই হউক, আমি কেন এই সুবিধাতে বিবিটাকে দেখিয়া আসি না। প্রকাশ্যে বলিল, "হাঁ, পত্র আমারই বটে। চল, আমি তোমার সঙ্গে যাইতেছি।" এই বলিয়া মোগল তাম্বু-মধ্যে প্রবেশ করিয়া চুল আঁচড়াইয়া, গন্ধদ্রব্য মাখিয়া, পোষাক পরিয়া বাহির হইল। বাহির হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ওরে ভৃত্য, সে স্থান কত দূর?"

মাণিকলাল যোড়হাত করিয়া বলিল, "হুজুর, অনেক দূর। ঘোড়ায় গেলে ভাল হইত।"

"বহুৎ আচ্ছা" বলিয়া খাঁ সাহেব ঘোড়া বাহির করিয়া চড়িতে যান, এমন সময় মাণিকলাল আবার

যোড়হাত করিয়া বলিল, "হুজুর! বড় ঘরের কথা – হাতিয়ারবন্দ হইয়া গেলেই ভাল হয়।"

নূতন নাগর ভাবিলেন, "সে ভাল কথা—জন্দী জোয়ান আমি; হাতিয়ার ছাড়া কেন যাইব?" তখন অঙ্গে হাতিয়ার বাঁধিয়া তিনি অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন।

নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপনীত হইয়া মাণিকলাল বলিল, "এই স্থানে উতারিতে হইবে; আমি আপনার ঘোড়া ধরিতেছি, আপনি গৃহমধ্যে প্রবেশ করুন।"

খাঁ সাহেব নামিলেন—মাণিকলাল ঘোড়া ধরিয়া রহিল। খাঁ বাহাদুর সশস্ত্রে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতেছিলেন, পরে মনে পড়িল যে, হাতিয়ারবন্দ হইয়া রমণী সম্ভাষণে যাওয়া ভাল দেখায় না। ফিরিয়া আসিয়া মাণিকলালের কাছে অস্ত্রগুলিও রাখিয়া গেলেন। মাণিকলালের আরও সুবিধা হইল।

গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া খাঁ সাহেব দেখিলেন যে, তক্তপোষের উপর উত্তম শয্যা, তাহার উপর সুন্দরী বসিয়া আছে—আতর-গোলাপের সৌগন্ধে ঘর আমোদিত হইয়াছে, চারিদিকে ফুল বিকীর্ণ হইয়াছে এবং সম্মুখে আলবোলায় সুগন্ধ তামাকু প্রস্তুত আছে। খাঁ সাহেব জুতা খুলিয়া তক্তপোষে বসিলেন, বিবিকে মিষ্টবচনে সম্ভাষণ করিলেন—পরে পোষাকটি খুলিয়া রাখিয়া ফুলের পাখা হাতে লইয়া বাতাস খাইতে আরম্ভ করিলেন এবং আলবোলার নল মুখে করিয়া সুখের আবেশে টান দিতে লাগিলেন। বিবিও তাঁহাকে দুই চারিটা গাঢ় প্রণয়ের কথা বলিয়া একেবারে মোহিত করিল।

তামাকু ধরিতে না ধরিতে মাণিকলাল আসিয়া দ্বারে ঘা মারিল। বিবি বলিল, "কে ও?"

মাণিকলাল বিকৃতস্বরে বলিল, "আমি।"

তখন চতুরা রমণী অতি ভীতকণ্ঠে খাঁ সাহেবকে বলিল, "সর্ব্বনাশ হয়েছে—আমার স্বামী আসিয়াছেন—মনে করিয়াছিলাম, তিনি আজ আর আসিবেন না। তুমি এই তক্তপোষের নীচে একবার লুকাও। আমি উঁহাকে বিদায় করিয়া দিতেছি।"

মোগল বলিল, "সে কি? মরদ হইয়া ভয়ে লুকাইব? যে হয় আসুক না; এখনই কোতল করিব।"

পানওয়ালী জিব কাটিয়া বলিল, "সে কি? সর্ব্বনাশ! আমার স্বামীকে মারিয়া ফেলিয়া আমার অন্নবস্ত্রের পথ বন্ধ করিবে? এই কি তোমাকে ভালবাসার ফল? শীঘ্র তক্তপোষের নীচে যাও। আমি এখনই উঁহাকে বিদায় করিয়া দিতেছি।"

এ দিকে মাণিকলাল পুনঃ পুনঃ দ্বারে করাঘাত করিতেছিল; অগত্যা খাঁ সাহেব তক্তপোষের নীচে গেলেন। মোটা শরীর, বড় সহজে প্রবেশ করে না, ছাল-চামড়া দুই এক জায়গায় ছিঁড়িয়া গেল—কি করে—প্রেমের জন্য অনেক সহিতে হয়। সে স্থূল মাংসপিণ্ড তক্তপোষতলে বিন্যস্ত হইলে পর পানওয়ালী আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল।

ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলে পানওয়ালী পূর্ব্ব শিক্ষামত বলিল, "তুমি আবার এলে যে? আজ আর আসিবে না বলিয়াছিলে যে?"

মাণিকলাল পূর্ব্বমত বিকৃতস্বরে বলিল, "চাবিটা ফেলিয়া গিয়াছি"

পানওয়ালী চাবি খোঁজার ছল করিয়া খাঁ সাহেবের পরিত্যক্ত পোষাকটিকে হস্তে লইল। পোষাক লইয়া দুই জনে বাহিরে চলিয়া আসিয়া শিকল টানিয়া বাহির হইতে চাবি দিল। খাঁ সাহেব তখন তক্তপোষের নীচে মুষিকদিগের দংশন-যন্ত্রণা সহ্য করিতেছিলেন।

তাঁহাকে গৃহপিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া, মাণিকলাল তাঁহার পোষাক পরিল। পরে তাঁহার হাতিয়ারে হাতিয়ারবন্দ হইয়া, তাঁহার অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া মুসলমানশিবিরে তাঁহার স্থান লইতে চলিল।

চতুর্থ খণ্ড

রন্ধ্রে যুদ্ধ

প্রথম পরিচ্ছেদ

চঞ্চলের বিদায়

প্রভাতে মোগল-সৈন্য সাজিল। রূপনগরের গড়ের সিংহদ্বার হইতে উষ্ণীষকবচ-শোভিত, গুম্ফ-শ্মশ্রুসমন্বিত, অস্ত্রসজ্জাভীষণ অশ্বারোহীদল সারি দিল। পাঁচ পাঁচ জন অশ্বারোহীর এক এক সারি, সারির পিছু সারি, তার পর আবার সারি, সারি সারি সারি সারি অশ্বারোহীর সারি চলিতেছে। ভ্রমরশ্রেণী-সমাকুল ফুল্লকমলতুল্য তাহাদের বদনমণ্ডল সকল শোভিতেছিল। তাহাদের অশ্বশ্রেণী গ্রীবাভঙ্গে সুন্দর, বল্গারোধে অধীর, মন্দগমনে ক্রীড়াশীল; অশ্বশ্রেণী শরীরভরে হেলিতেছে, দুলিতেছে এবং নাচিয়া নাচিয়া চলিবার উপক্রম করিতেছে।

চঞ্চলকুমারী প্রভাতে উঠিয়া স্নান করিয়া রত্নালঙ্কারে ভূষিতা হইলেন। নির্ম্মল অলঙ্কার পরাইল। চঞ্চল বলিল, "ফুলের মালা পরাও সখি—আমি চিতারোহণে যাইতেছি।" প্রবলবেগে প্রবহমান অশ্রুজল চক্ষুমধ্যে ফেরত পাঠাইয়া নির্ম্মল বলিল, "রত্নালঙ্কার পরাই সখি, তুমি উদয়পুরেশ্বরী হইতে যাইতেছ।" চঞ্চল বলিল, "পরাও! পরাও! নির্ম্মল! কুৎসিত হইয়া কেন মরিব? রাজার মেয়ে আমি; রাজার মেয়ের মত সুন্দর হইয়া মরিব। সৌন্দর্য্যের মত কোন্ রাজত্ব? রাজ্য কি বিনা সৌন্দর্য্যে শোভা পায়? পরাও।" নির্ম্মল অলঙ্কার পরাইল; সে কুসুমিত-তরুবিনিন্দিত কান্তি দেখিয়া কাঁদিল। কিছু বলিল না। চঞ্চল তখন নির্ম্মলের গলা ধরিয়া কাঁদিল।

চঞ্চল তার পর বলিল, "নির্ম্মল! আর তোমায় দেখিব না। কেন বিধাতা এমন বিড়ম্বনা করিলেন? দেখ, ক্ষুদ্র কাঁটার গাছ যেখানে জন্মে, সেইখানে থাকে; আমি কেন রূপনগরে থাকিতে পাইলাম না?"

নির্ম্মল বলিল, "আমায় আবার দেখিবে। তুমি যেখানে থাক, আমার সঙ্গে আবার দেখা হইবে। আমায় না দেখিলে তোমার মরা হইবে না; তোমায় না দেখিলে আমার মরা হইবে না।"

চঞ্চল। আমি দিল্লীর পথে মরিব।

নির্ম্মল। দিল্লীর পথে তবে আমায় দেখিবে।

চঞ্চল। সে কি নির্ম্মল? কি প্রকারে তুমি যাইবে?

নির্ম্মল কিছু বলিল না, চঞ্চলের গলা ধরিয়া কাঁদিল।

চঞ্চলকুমারী বেশভূষা সমাপন করিয়া মহাদেবের মন্দিরে গেলেন। নিত্যব্রত শিবপূজা ভক্তিভাবে করিলেন। পূজান্তে বলিলেন, "দেবদেব মহাদেব! মরিতে চলিলাম, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, বালিকার মরণে তোমার এত তুষ্টি কেন প্রভু? আমি বাঁচিলে কি, তোমার সৃষ্টি চলিত না? যদি এতই মনে ছিল, কেন আমাকে রাজার মেয়ে করিয়া সংসারে পাঠাইয়াছিলে?"

মহাদেবের বন্দনা করিয়া চঞ্চলকুমারী মাতৃচরণ বন্দনা করিতে গেলেন। মাতাকে প্রণাম করিয়া চঞ্চল কতই কাঁদিল। পিতার চরণে গিয়া প্রণাম করিল। পিতাকে প্রণাম করিয়া চঞ্চল কতই কাঁদিল। তার পর একে একে সখীজনের কাছে চঞ্চল বিদায় গ্রহণ করিল। সকলে কাঁদিয়া গণ্ডগোল করিল। চঞ্চল কাহাকে অলঙ্কার, কাহাকে খেলনা, কাহাকে অর্থ দিয়া পুরস্কৃত করিলেন। কাহাকে বলিলেন, "কাঁদিও না—আমি আবার আসিব।" কাহাকে বলিলেন, "কাঁদিও না—দেখিতেছ না, আমি পৃথিবীশ্বরী হইতে যাইতেছি?" কাহাকেও বলিলেন, "কাঁদিও না—কাঁদিলে যদি দুঃখ যাইত, তবে আমি কাঁদিয়া রূপনগরের পাহাড় ভাসাইতাম।"

সকলের কাছে বিদায় গ্রহণ করিয়া চঞ্চলকুমারী দোলারোহণে চলিলেন। এক সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য দোলার অগ্রে স্থাপিত হইয়াছে, এক সহস্র পশ্চাতে। রজতমণ্ডিত, রত্নখচিত সে শিবিকা, বিচিত্র সুবর্ণখচিত বস্ত্রে আবৃত হইয়াছে; আশা, সোঁটা লইয়া চোপদার বাগ্‌জালে গ্রাম্য দর্শকবর্গকে

আনন্দিত করিতেছে। চঞ্চলকুমারী শিবিকায় আরোহণ করিলেন, দুর্গমধ্য হইতে শঙ্খ নিনাদিত হইল, কুসুম ও লাজাবলীতে শিবিকা পরিপূর্ণ হইল; সেনাপতি চলিবার আজ্ঞা দিলেন; তখন অকস্মাৎ মুক্তপথ তড়াগের জলের ন্যায় সেই অশ্বারোহিশ্রেণী প্রবাহিত হইল; বল্গা দংশিত করিয়া, নাচিতে নাচিতে অশ্বশ্রেণী চলিল—অশ্বারোহীদিগের অস্ত্রের ঝঞ্চনা বাজিল।

অশ্বারোহিগণ প্রভাতবায়ুপ্রফুল্ল হইয়া কেহ কেহ গান করিতেছিল। শিবিকার পশ্চাতে যে অশ্বারোহিগণ ছিল, তাহার মধ্যে অগ্রবর্ত্তী এক জন গায়িতেছিল—

> "শরম্ ভরম্‌সে পিয়ারী,
> সোমরত বংশীধারী,
> ঝুংত লোচনসে বারি।
> ন সমঝে গোপকুমারী,
> যেহিন্ বৈঠত মুরারি,
> বিহারত রাহ তুমারি।"

রাজকুমারীর কর্ণে সে গীত প্রবেশ করিল। তিনি ভাবিলেন, "হায়! যদি সওয়ারের গীত সত্য হইত!" রাজকুমারী তখন রাজসিংহকে ভাবিতেছিলেন। তিনি জানিতেন না যে, আঙ্গুলকাটা মাণিকলাল তাঁহার পশ্চাতে এই গীত গায়িতেছিল। মাণিকলাল যত্ন করিয়া শিবিকার পশ্চাতে স্থান গ্রহণ করিয়াছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নির্ম্মলকুমারীর অগাধ জলে ঝাঁপ

এ দিকে নির্ম্মলকুমারীর বড় গোলমাল বাধিল; চঞ্চল ত রত্নখচিত শিবিকারোহণে চলিয়া গেল—আগে পিছে দুই সহস্র কুমার-প্রতিম অশ্বারোহী আল্লার মহিমার শব্দে রূপনগরের পাহাড় ধ্বনিত করিয়া চলিল। কিন্তু নির্ম্মলের কান্না ত থামে না। একা—একা—একা, শত পৌরজনের মধ্যে চঞ্চল অভাবে নির্ম্মল বড়ই একা! নির্ম্মল উচ্চ গৃহচূড়ার উপর উঠিয়া দেখিতে লাগিল—দেখিতে লাগিল, পাদক্রোশ পরিমিত অজগর সর্পের ন্যায় সেই অশ্বারোহী সৈনিকশ্রেণী পার্ব্বত্যপথে বিসর্পিত হইয়া উঠিতেছে, নামিতেছে—প্রভাতসূর্য্যকিরণে তাহাদিগের উর্দ্ধোত্থিত বর্শাফলক-সকল জ্বলিতেছে। কতক্ষণ নির্ম্মল চাহিয়া রহিল। চক্ষু জ্বালা করিতে লাগিল। তখন নির্ম্মল চক্ষু মুছিয়া ছাদের উপর হইতে নামিল। নির্ম্মল একটা কিছু ভাবিয়া ছাদের উপর হইতে নামিয়াছিল। নামিয়া প্রথমে অলঙ্কার-সকল খুলিয়া কোথায় লুকাইয়া রাখিল, কেহ দেখিতে পাইল না। সঞ্চিত অর্থমধ্যে কতিপয় মুদ্রা নির্ম্মল গোপনে সংগ্রহ করিল। কেবল তাহাই লইয়া নির্ম্মল একাকিনী রাজপুরী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। পরে দৃঢ়পদে অশ্বারোহী সেনা যে পথে গিয়াছে, সেই পথে একাকিনী তাহাদের অনুবর্ত্তিনী হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রণপণ্ডিত মবারক

বৃহৎ অজগর সর্পের ন্যায় ফিরিতে ফিরিতে, ঘুরিতে ঘুরিতে, সেই অশ্বারোহী সেনা পার্ব্বত্যপথে চলিল। যে রন্ধ্রপথের পার্শ্বস্থ পর্ব্বতের উপর আরোহণ করিয়া মাণিকলাল রাজসিংহের সঙ্গে দেখা করিয়া আসিয়াছিল, বিবরে প্রবিশ্যমান মহোরগের ন্যায় সেই অশ্বারোহিশ্রেণী সেই রন্ধ্রপথে প্রবেশ করিল। অশ্বসকলের অসংখ্য পদবিক্ষেপ-ধ্বনি পর্ব্বতের গায়ে ধ্বনিত হইতে লাগিল। এমন কি, সেই স্থির শব্দহীন বিজন প্রদেশে আরোহীদিগের অস্ত্রের মৃদু শব্দ একত্র সমুত্থিত হইয়া রোমহর্ষণ প্রতিধ্বনি উৎপত্তির কারণ হইতে লাগিল। মাঝে মাঝে অশ্বগণের হ্রেষা রব—আর সৈনিকের ডাকহাঁক। পর্ব্বততলে যে সকল লতাগুল্ম ছিল, শব্দাঘাতে তাহার পাতা-সকল কাঁপিতে লাগিল। ক্ষুদ্র বন্য পশু, পক্ষী, কীট, যাহারা সে বিজন প্রদেশে নির্ভয়ে বাস করিত, তাহারা সকলে দ্রুত পলায়ন করিল। এইরূপে সমুদয় অশ্বারোহীর সারি সেই রন্ধ্রপথে প্রবেশ করিল। তখন হঠাৎ গুম্ করিয়া একটা বিকট শব্দ হইল। যেখানে শব্দ হইল, সে প্রদেশের অশ্বারোহীরা ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। দেখিল, পর্ব্বতশিখরদেশ হইতে বৃহৎ শিলাখণ্ড পর্ব্বতচ্যুত হইয়া সৈন্যমধ্যে পড়িয়াছে। চাপে একজন অশ্বারোহী মরিয়াছে, আর এক জন আহত হইয়াছে।

দেখিতে দেখিতে, ব্যাপার কি, তাহা কেহ বুঝিতে না বুঝিতে, আবার সৈন্যমধ্যে শিলাখণ্ড

পড়িল—এক, দুই, তিন, চারি, ক্রমে দশ, পঁচিশ—তখনি একেবারে শত শত ছোট বড় শিলাবৃষ্টি হইতে লাগিল—বহুসংখ্যক অশ্ব ও অশ্বারোহী কেহ হত, কেহ আহত হইয়া, পথের উপর পড়িয়া সঙ্কীর্ণ পথ একেবারে রুদ্ধ করিয়া ফেলিল। অশ্বসকল আরোহী লইয়া পলায়নের জন্য বেগবান্ হইল—কিন্তু অগ্রে পশ্চাতে পথ সৈনিকের ঠেসাঠেসিতে অবরুদ্ধ—অশ্বের উপর অশ্ব, আরোহীর উপর আরোহী চাপিয়া পড়িতে লাগিল—সৈনিকেরা পরস্পর অস্ত্রাঘাত করিয়া পথ করিতে লাগিল—শৃঙ্খলা একেবারে ভগ্ন হইয়া গেল, সৈন্যমধ্যে মহা কোলাহল পড়িয়া গেল।

"কাহার লোগ হুঁসিয়ার! বাঁ রাস্তা।" মাণিকলাল হাঁকিল। যেখানে রাজকুমারী শিবিকায় এবং পশ্চাতে মাণিকলাল, তাহার সম্মুখেই এই গোলযোগ উপস্থিত। বাহকেরা আপনাদের প্রাণ লইয়া ব্যতিব্যস্ত—অশ্বসকল পাছু হটিয়া তাহাদের উপর চাপিয়া পড়িতেছে। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, এই পার্ব্বত্য পথের বামদিক্ দিয়া একটি অতি সঙ্কীর্ণ রন্ধ্রপথ বাহির হইয়া গিয়াছে, তাহাতে একেবারে একটিমাত্র অশ্বারোহী প্রবেশ করিতে পারে। তাহারই কাছে যখন সেনামধ্যস্থিত শিবিকা পৌঁছিয়াছিল, তখনই এই হুলস্থুল উপস্থিত হইয়াছিল। ইহাই রাজসিংহের বন্দোবস্ত। সুশিক্ষিত মাণিকলাল প্রাণভয়ে ভীত বাহকদিগকে ঐ পথ দেখাইয়া দিল। মাণিকলালের কথা শুনিবামাত্র বাহকেরা আপনাদিগের ও রাজকুমারীর প্রাণরক্ষার্থ ঝটিতি শিবিকা লইয়া সেই পথে প্রবেশ করিল।

সঙ্গে সঙ্গে অশ্ব লইয়া মাণিকলালও তন্মধ্যে প্রবেশ করিল। নিকটস্থ সৈনিকেরা দেখিল যে, প্রাণ বাঁচাইবার এই এক পথ; তখন আর এক জন অশ্বারোহী মাণিকলালের পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেই পথে প্রবেশ করিতে গেল। সেই সময়ে উপর হইতে একটা অতি বৃহৎ শিলাখণ্ড গড়াইতে গড়াইতে, শব্দে পার্ব্বত্য প্রদেশ কাঁপাইতে কাঁপাইতে, আসিয়া সেই রন্ধ্রমুখে পড়িয়া স্থিতিলাভ করিল। তাহার চাপে দ্বিতীয় অশ্বারোহী অশ্বসমেত চূর্ণ হইয়া গেল। রন্ধ্রমুখ একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। আর কেহ সেই পথে প্রবেশ করিতে পারিল না। একা মাণিকলাল শিবিকাসঙ্গে যথেপ্সিত পথে চলিল।

সেনাপতি হাসান আলি খাঁ মন্‌সবদার তখন সৈন্যের সর্ব্বপশ্চাতে ছিলেন। প্রবেশপথ-মুখে স্বয়ং দাঁড়াইয়া সঙ্কীর্ণ দ্বারে সেনার প্রবেশের তত্ত্বাবধান করিতেছিলেন। পরে সমুদয় সেনা প্রবিষ্ট হইলে স্বয়ং ধীরে ধীরে সর্ব্বপশ্চাতে আসিতেছিলেন। দেখিলেন, সহসা সৈনিকশ্রেণী মহা গোলযোগ করিয়া পিছু হটিতেছে। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কেহ কিছু ভাল বুঝাইয়া বলিতে পারে না। তখন তিনি সৈনিকগণকে ভৎর্সনা করিয়া ফিরাইতে লাগিলেন এবং স্বয়ং সর্ব্বাগ্রগামী হইয়া ব্যাপার কি দেখিতে চলিলেন।

কিন্তু ততক্ষণ সেনা থাকে না। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, এই পর্ব্বতের দক্ষিণপার্শ্বস্থ পর্ব্বত অতি উচ্চ এবং দুরারোহণীয়—তাহার শিখরদেশ প্রায় পথের উপর ঝুলিয়া পড়িয়া পথ অন্ধকার করিয়াছে। রাজপুতেরা তাহার প্রদেশান্তরে অনুসন্ধান করিয়া পথ বাহির করিয়া পঞ্চাশ জন তাহার উপর উঠিয়া অদৃশ্যভাবে অবস্থান করিতেছিল। এক এক জন অপরের চল্লিশ পঞ্চাশ হাত দূরে স্থান গ্রহণ করিয়া, সমস্ত রাত্রি ধরিয়া শিলাখণ্ড সংগ্রহ করিয়া আপন আপন সম্মুখে একটি একটি ঢিপি সাজাইয়া রাখিয়াছিল। এক্ষণে পলকে পলকে পঞ্চাশ জন পঞ্চাশ খণ্ড শিলা নিম্নস্থ আরোহীদিগের উপর বৃষ্টি করিতেছিল। এক একবারে পঞ্চাশটি অশ্ব বা আরোহী আহত বা নিহত হইতেছিল। কে মারিতেছিল, তাহা তাহারা দেখিতে পায় না। দেখিতে পাইলেও দুরারোহণীয় পর্ব্বতশিখরস্থ শত্রুগণের প্রতি কোনরূপেই আঘাত সম্ভব নহে—অতএব মোগলেরা পলায়ন ভিন্ন অন্য কোন চেষ্টাই করিতেছিল না। যে সহস্রসংখ্যক অশ্বারোহী শিবিকার অগ্রভাগে ছিল, তাহার মধ্যে হত ও আহতের অবশিষ্ট পলায়ন পূর্ব্বক রন্ধ্রমুখে নির্গত হইয়া প্রাণরক্ষা করিল।

পঞ্চাশ জন রাজপুত দক্ষিণপার্শ্বের উচ্চ পর্ব্বত হইতে শিলাবৃষ্টি করিতেছিল—আর পঞ্চাশজন স্বয়ং রাজসিংহের সহিত বামদিকের অনুচ্চ পর্ব্বত-শিখরে লুক্কায়িত ছিল, তাহারা এতক্ষণ কিছুই করিতেছিল না। কিন্তু এক্ষণে তাহাদের কার্য্য করিবার সময় উপস্থিত হইল। যেখানে শিলাবৃষ্টি নিবন্ধন ঘোরতর বিপত্তি, সেখানে মবারক অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি প্রথমে সৈন্যগণকে সুশৃঙ্খলের সহিত পার্ব্বত্য পথ হইতে বহিষ্কৃত করিবার জন্য যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু যখন দেখিলেন, ক্ষুদ্রতর রন্ধ্রপথে রাজকুমারীর শিবিকা চলিয়া গেল, একজন মাত্র অশ্বারোহী তাহার সঙ্গে গেল, অমনি অর্গলের ন্যায় বৃহৎ শিলাখণ্ড সে পথ বন্ধ করিল—তখন তাঁহার মনে সন্দেহ

উপস্থিত হইল যে, এ ব্যাপার আর কিছুই নহে—কোন দুরাত্মা রাজকুমারীকে অপহরণ করিবার মানসে এই উদ্যম করিয়াছে। তখন তিনি ডাকিয়া নিকটস্থ সৈনিকগণকে বলিলেন—"প্রাণ যায়, সেও স্বীকার, শত সওয়ার দোলার পিছু পিছু যাও—ঘোড়া ছাড়িয়া পাঁওদলে এই পাথর টপকাইয়া যাও—চল, আমি যাইতেছি।" মবারক অগ্রে ঘোড়া হইতে লাফাইয়া পড়িয়া পথরোধক শিলাখণ্ডের উপর উঠিলেন এবং তাহার উপর হইতে লাফাইয়া নীচে পড়িলেন। তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইয়া শত সওয়ার তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে সেই রন্ধ্রপথে প্রবেশ করিল।

রাজসিংহ পর্ব্বতশিখর হইতে এ সকল দেখিতে লাগিলেন। যতক্ষণ মোগলেরা ক্ষুদ্র পথে একে একে প্রবেশ করিতেছিল, ততক্ষণ কাহাকেও কিছু বলিলেন না। পরে তাহারা রন্ধ্রপথমধ্যে নিবদ্ধ হইলে, পঞ্চাশৎ অশ্বারোহী রাজপুত লইয়া বজ্রের ছায় উর্দ্ধ হইতে তাহাদের উপর পড়িয়া তাহাদিগকে নিহত করিতে লাগিলেন। সহসা উপর হইতে আক্রান্ত হইয়া মোগলেরা বিশৃঙ্খল হইয়া গেল। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ এই ভয়ঙ্কর রণে প্রাণত্যাগ করিল। রাজপুতেরা উপর হইতে ছুটিয়া আসিয়া অশ্ব সহিত মোগল সওয়ারগণের উপর পড়িল। নীচে যাহারা ছিল, তাহারা চাপেই মরিল। পাঁচ সাত দশ জন মাত্র এড়াইল। মবারক তাহাদের লইয়া ফিরিলেন। রাজপুতেরা তাহাদের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল না।

মবারকের সঙ্গে মোগল সওয়ারের বেশধারী মাণিকলালও বাহির হইয়া আসিল। আসিয়াই এক জন মৃত সওয়ারের অশ্বে আরোহণ করিয়াই সেই শৃঙ্খলাশূন্য মোগলসেনার মধ্যে কোথায় লুকাইল, কেহ তাহা দেখিতে পাইল না।

যে মুখে মোগলেরা সেই পার্ব্বত্যপথে প্রবেশ করিয়াছিল, মাণিকলাল সেই পথে নির্গত হইল। যাহারা তাহাকে দেখিল, তাহারা ভাবিল, সে পলাইতেছে। মাণিকলাল গলি হইতে বাহির হইয়া তীরবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া রূপনগরের গড়ের দিকে চলিল।

মবারক প্রস্তরখণ্ড পুনরুল্লঙ্ঘন করিয়া ফিরিয়া আসিয়া আজ্ঞা দিলেন, "এই পাহাড়ে চড়িতে কষ্ট নাই; সকলেই ঘোড়া লইয়া এই পাহাড়ের উপরে উঠ। দস্যু অল্পসংখ্যক। তাহাদের সমূলে নিপাত করিব।" তখন পাঁচ শত মোগলসেনা "দীন্! দীন্!" শব্দ করিয়া অশ্ব সহিত বামদিকের সেই পর্ব্বতশিখরে আরোহণ করিতে লাগিল। মবারক অধিনায়ক। মোগলদিগের সঙ্গে দুইটা তোপ ছিল। একটা ঠেলিয়া তুলিয়া পাহাড়ে উঠাইতে লাগিল। আর একটা ছোট তোপ, সেটাকে মোগলেরা টানিয়া, শিকলে বাঁধিয়া হাতী লাগাইয়া যে বৃহৎ শিলাখণ্ডের দ্বারা পার্ব্বত্য রন্ধ্র বন্ধ হইয়াছিল, তাহার উপর উঠাইয়া স্থাপিত করিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

জয়শীলা চঞ্চলকুমারী

তখন "দীন্! দীন্!" শব্দে পঞ্চশত মোগল অশ্বারোহী কালান্তক যমের ন্যায় পর্ব্বতে আরোহণ করিল। পর্ব্বত অনুচ্চ, ইহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে—শিখর-দেশে উঠিতে তাহাদের বড় কালবিলম্ব হইল না। কিন্তু পর্ব্বতশিখরে উঠিয়া দেখিল যে, কেহ ত পর্ব্বতোপরি নাই। যে রন্ধ্রপথমধ্যে প্রবেশ করিয়া তিনি নিজে পরাভূত হইয়া ফিরিয়া আসিতেছিলেন, এখন মবারক বুঝিলেন যে, সমুদায় দস্যু—মবারকের বিবেচনায় তাহারা রাজপুত দস্যু ভিন্ন আর কিছুই নহে—সেই রন্ধ্রপথে আছে। তাহার দ্বিতীয় মুখ রোধ করিয়া তাহাদিগের বিনাশসাধন করিবেন, মবারক এইরূপ মনে মনে স্থির করিলেন। হাসান আলি অপর মুখে কামান পাতিয়া বসিয়া আছেন, এই ভাবিয়া তিনি সেই রন্ধ্রের ধারে ধারে সৈন্য লইয়া চলিলেন। ক্রমে পথ প্রশস্ত হইয়া আসিল; তখন মবারক পাহাড়ের ধারে আসিয়া দেখিলেন—চল্লিশ জনের অনধিক রাজপুত শিবিকাসঙ্গে রুধিরাক্ত-কলেবরে সেই পথে চলিতেছে। মবারক বুঝিলেন যে, অবশ্য ইহারা নির্গমপথ জানে; ইহাদের উপর দৃষ্টি রাখিয়া ধীরে ধীরে চলিলে রন্ধ্রদ্বারে উপস্থিত হইব। তাহা হইলে যেরূপ পথে রাজপুতেরা পর্ব্বত হইতে নামিয়াছিল, সেইরূপ অন্য পথ দেখিতে পাইব। রাজপুতেরা যে আগে উপরে ছিল, পরে নামিয়াছে, তাহার সহস্র চিহ্ন দেখা যাইতেছিল। মবারক রাজপুতদিগের উপর দৃষ্টি রাখিয়া ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলেন। কিছু পরে দেখিলেন, পাহাড় ঢালু হইয়া আসিতেছে, সম্মুখে নির্গমের পথ। মবারক অশ্বসকল তীরবেগে চালাইয়া পর্ব্বততলে নামিয়া রন্ধ্রমুখ বন্ধ করিলেন। রাজপুতেরা রন্ধ্রের বাঁক ফিরিয়া যাইতেছিল—

সুতরাং তাহারা আগে রন্ধ্রমুখে পৌঁছিতে পারিল না। মোগলেরা আগে পথরোধ করিয়া রন্ধ্রমুখে কামান বসাইল এবং আগতপ্রায় রাজপুতগণকে উপহাস করিবার জন্য তাহার বজ্রনাদ একবার শুনাইল—"দীন্! দীন্!" শব্দের সঙ্গে পর্ব্বতে সেই ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইল। শুনিয়া উত্তরস্বরূপ রন্ধ্রের অপরমুখে হাসান আলিও কামানের আওয়াজ করিলেন। আবার পর্ব্বতে পর্ব্বতে প্রতিধ্বনি বিকট ডাক ডাকিল। রাজপুতগণ শিহরিল—তাহাদের কামান ছিল না।

রাজসিংহ দেখিলেন, আর কোনমতেই রক্ষা নাই। তাঁহার সৈন্যের বিশগুণ সেনা পথের দুই মুখ বন্ধ করিয়াছে—পথান্তর নাই—কেবল যম-মন্দিরের পথ খোলা। রাজসিংহ স্থির করিলেন, সেই পথে যাইবেন। তখন সৈনিকগণকে একত্র করিয়া বলিতে লাগিলেন—"ভাই বন্ধু, যে কেহ সঙ্গে থাক, আজি সরলান্তঃকরণে আমি তোমাদের কাছে ক্ষমা চাহিতেছি। আমারই দোষে এ বিপদ ঘটিয়াছে—পর্ব্বত হইতে নামিয়াই এ দোষ করিয়াছি। এখন এই গলির দুই মুখ বন্ধ—দুই মুখেই কামান শুনিতেছি, দুই মুখে আমাদের বিশগুণ মোগল দাঁড়াইয়া আছে—সন্দেহ নাই। অতএব আমাদিগের বাঁচিবার ভরসা নাই। নাই—তাহাতেই বা ক্ষতি কি? রাজপুত হইয়া কে মরিতে কাতর? সকলেই মরিব—এক জনও বাঁচিব না—কিন্তু মারিয়া মরিব, যে মরিবার আগে দুই জন মোগল না মারিয়া মরিবে—সে রাজপুত নহে। রাজপুতেরা শুন—এ পথে ঘোড়া ছোটে না—সবাই ঘোড়া ছাড়িয়া দাও। এসো, আমরা তরবারি হাতে লাফাইয়া গিয়া তোপের উপর পড়ি। তোপ ত আমাদেরই হইবে—তার পর দেখা যাইবে, কত মোগল মারিয়া মরিতে পারি।"

তখন রাজপুতগণ, অশ্ব হইতে লাফাইয়া পড়িয়া একত্র অসি নিষ্কোষিত করিয়া "মহারাণা কি জয়" বলিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মুখকান্তি দেখিয়া রাজসিংহ বুঝিলেন যে, প্রাণরক্ষা না হউক—একটি রাজপুতও হটিবে না। সন্তুষ্টচিত্তে রাণা আজ্ঞা দিলেন,—"দুই দুই করিয়া সারি দাও।" অশ্বপৃষ্ঠে সবে একে একে যাইতেছিল—পদব্রজে দুইয়ে দুইয়ে রাজপুত চলিল—রাণা সর্ব্বাগ্রে চলিলেন। আজ আসন্ন মৃত্যু দেখিয়া তিনি প্রফুল্লচিত্ত।

এমন সময়ে সহসা পর্ব্বতরন্ধ্র কম্পিত করিয়া পর্ব্বতে প্রতিধ্বনি তুলিয়া, রাজপুতসেনা শব্দ করিল—"মাতাজীকি জয়! কালীমায়ীকি জয়!"

অত্যন্ত হর্ষসূচক ঘোর রব শুনিয়া রাজসিংহ পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন, ব্যাপার কি? দেখিলেন, দুই পার্শ্বে রাজপুতসেনা সারি দিয়াছে—মধ্যে বিশাললোচনা, সহাস্যবদনা, কোন দেবী আসিতেছেন। হয় কোন দেবী মনুষ্যমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন—নয় কোন মানবীকে বিধাতা দেবীমূর্ত্তিতে গঠিয়াছেন—রাজপুতেরা মনে করিল, চিতোরাধিষ্ঠাত্রী রাজপুত-কুলরক্ষিণী ভগবতী এ সঙ্কটে রাজপুতকে রক্ষা করিতে স্বয়ং রণে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাই তাহারা জয়ধ্বনি করিতেছিল।

রাজসিংহ দেখিলেন—এ ত মানবী, কিন্তু সামান্যা মানবী নহে। ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ, দোলা কোথায়?"

এক জন পিছু হইতে বলিল, "দোলা এই দিকে আছে।"

রাণা বলিলেন, "দেখ, দোলা খালি কি না?"

সৈনিক বলিল, "দোলা খালি। কুমারীজী মহারাজের সামনে।"

চঞ্চলকুমারী তখন রাজসিংহকে প্রণাম করিলেন। রাণা জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজকুমারী, আপনি এখানে কেন?"

চঞ্চল বলিলেন, "মহারাজ! আপনাকে প্রণাম করিতে আসিয়াছি। প্রণাম করিয়াছি—এখন একটি ভিক্ষা চাহি। আমি মুখরা—স্ত্রীলোকের শোভা যে লজ্জা, তাহা আমাতে নাই, ক্ষমা করিবেন। ভিক্ষা যাহা চাহি—তাহাতে নিরাশ করিবেন না।"

চঞ্চলকুমারী হাস্য ত্যাগ করিয়া জোড়হাত করিয়া কাতরস্বরে এই কথা বলিলেন। রাজসিংহ বলিলেন—"তোমারই জন্য এতদূর আসিয়াছি—তোমাকে অদেয় কিছুই নাই—কি চাও রূপনগরের কন্যে?"

চঞ্চলকুমারী আবার জোড়হাত করিয়া বলিল, "আমি চঞ্চলমতি বালিকা বলিয়া আপনাকে আসিতে লিখিয়াছিলাম, কিন্তু আমি নিজের মন আপনি বুঝিতে পারি নাই। আমি এখন মোগল-সম্রাটের ঐশ্বর্য্যের কথা শুনিয়া বড় মুগ্ধ হইয়াছি। আপনি অনুমতি করুন—আমি দিল্লী যাইব।"

রাজসিংহ বিস্মিত ও প্রীত হইলেন। বলিলেন, "তোমার দিল্লী যাইতে হয় যাও—আমার আপত্তি

নাই। কিন্তু আপাততঃ তুমি যাইতে পাইবে না; যদি এখন তোমাকে ছাড়িয়া দিই, মোগল মনে করিবে যে, প্রাণভয়ে ভীত হইয়া তোমাকে ছাড়িয়া দিলাম। আগে যুদ্ধ শেষ হউক—তার পর তুমি যাইও। আর তোমার মনের কথা যে বুঝি নাই, তাহা মনে করিও না, আমি জীবিত থাকিতে তোমাকে দিল্লী যাইতে হইবে না। যোয়ান্ সব—আগে চল।"

তখন চঞ্চলকুমারী মৃদু হাসিয়া, মর্ম্মভেদী মৃদু কটাক্ষ করিয়া, দক্ষিণহস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলীস্থিত হীরকাঙ্গুরীয় বামহস্তের অঙ্গুলীদ্বয়ের দ্বারা ফিরাইয়া রাজসিংহকে দেখাইতে দেখাইতে বলিলেন, "মহারাজ! এই আঙটিতে বিষ আছে। দিল্লীতে না যাইতে দিলে আমি বিষ খাইব।"

রাজসিংহ তখন হাসিলেন—বলিলেন, "অনেকক্ষণ বুঝিয়াছি রাজকুমারী—রমণীকুলে তুমি ধন্যা। কিন্তু তুমি যাহা ভাবিতেছ, তাহা হইবে না। আজ রাজপুতের বাঁচা হইবে না, আজ রাজপুতকে মরিতেই হইবে—নহিলে রাজপুতনামে বড় কলঙ্ক হইবে। আমরা যতক্ষণ না মরি, ততক্ষণ তুমি বন্দী। আমরা মরিলে তুমি যেখানে ইচ্ছা সেইখানে যাইও।"

চঞ্চলকুমারী হাসিল—অতিশয় প্রণয়প্রফুল্ল, ভক্তি-প্রমোদিত, সাক্ষাৎ মহাদেবের অনিবার্য্য এক কটাক্ষবাণ রাজসিংহের উপর ত্যাগ করিল। মনে মনে বলিতে লাগিল, "বীরচূড়ামণি! আজি হইতে তোমার দাসী হইলাম। যদি তোমার দাসী না হই, তবে চঞ্চল কখনই প্রাণ রাখিবে না।" প্রকাশ্যে বলিল—"মহারাজ, দিল্লীশ্বর যাহাকে মহিষী করিতে অভিলাষ করিয়াছেন, সে কাহারও বন্দী নহে। এই আমি মোগল-সৈন্য-সম্মুখে চলিলাম—কাহার সাধ্য রাখে দেখি?"

এই বলিয়া চঞ্চলকুমারী—জীবন্ত দেবীমূর্ত্তি—রাজসিংহকে পাশ করিয়া রন্ধ্রমুখে চলিল। তাহাকে স্পর্শ করে, কাহার সাধ্য? এ জন্য কেহ তাঁহার গতিরোধ করিতে পারিল না। হাসিতে হাসিতে হেলিতে দুলিতে সেই স্বর্ণমুক্তাময়ী প্রতিমা রন্ধ্রমুখে চলিয়া গেল।

একাকিনী চঞ্চলকুমারী সেই প্রজ্জ্বলিত বহ্নিতুল্য রুষ্ট সশস্ত্র পঞ্চশত মোগল অশ্বারোহীর সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। যেখানে সেই পথরোধকারী কামান—মনুষ্য-নির্ম্মিত বজ্র, অগ্নি উদ্গীর্ণ করিবার জন্য হাঁ করিয়া আছে—তাহার সম্মুখে, রত্নমণ্ডিতা লোকাতীতা সুন্দরী দাঁড়াইল। দেখিয়া বিস্মিত মোগলসেনা মনে করিল—পর্ব্বতনিবাসিনী পরী আসিয়াছে।

মনুষ্যভাষায় কথা কহিয়া চঞ্চলকুমারী সে ভ্রম ভাঙ্গিল। বলিল, "এ সেনার সেনাপতি কে?"

মবারক স্বয়ং রন্ধ্রমুখে রাজপুতগণের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন—তিনি বলিলেন, "ইহারা এখন অধমের অধীন। আপনি কে?"

চঞ্চলকুমারী বলিলেন, "আমি সামান্যা স্ত্রী। আপনার কাছে কিছু ভিক্ষা আছে—যদি অনুগ্রহ শুনেন, তবেই বলিতে পারি।"

মবারক বলিলেন, "তবে রন্ধ্রমধ্যে আগু হউন।" চঞ্চলকুমারী রন্ধ্রমধ্যে অগ্রসর হইলেন—মবারক পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেলেন।

যেখানে কথা অন্যে শুনিতে পায় না, এমন স্থানে আসিয়া চঞ্চলকুমারী বলিতে লাগিলেন, "আমি রূপনগরের রাজকন্যা। বাদশাহ আমাকে বিবাহ করিবার অভিলাষে আমাকে লইতে এই সেনা পাঠাইয়াছেন—এই কথা বিশ্বাস করেন কি?"

মবারক। আপনাকে দেখিয়াই সে বিশ্বাস হয়।

চঞ্চল। আমি মোগলকে বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক—ধর্ম্মে পতিত হইব মনে করি। কিন্তু পিতা ক্ষীণবল—তিনি আমাকে আপনাদিগের সঙ্গে পাঠাইয়াছেন। তাঁহা হইতে কোন ভরসা নাই বলিয়া আমি রাজসিংহের কাছে দূত প্রেরণ করিয়াছিলাম—আমার কপালক্রমে তিনি পঞ্চাশজন মাত্র সিপাহী লইয়া আসিয়াছেন। তাহাদের বলবীর্য্য ত দেখিলেন?

মবারক চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন, "সে কি—পঞ্চাশ জন সিপাহী এত মোগল মারিল?"

চঞ্চল। বিচিত্র নহে—হলদীঘাটে ঐ রকম কি একটা হইয়াছিল শুনিয়াছি। কিন্তু সে যাহাই হউক,—রাজসিংহ এক্ষণে আপনার নিকট পরাস্ত। তাঁহাকে পরাস্ত দেখিয়াই আমি আসিয়া ধরা দিতেছি। আমাকে দিল্লী লইয়া চলুন—যুদ্ধে আর প্রয়োজন নাই।

মবারক বলিলেন, "বুঝিয়াছি, নিজের সুখ ত্যাগ করিয়া আপনি রাজপুতের প্রাণরক্ষা করিতে চাহেন। তাঁহাদেরও কি সেই ইচ্ছা?"

চ। সেও কি সম্ভবে? আমাকে আপনারা লইয়া চলিলেও, তাহারা যুদ্ধ ছাড়িবে না। আমার অনুরোধ, আমার সঙ্গে একমত হইয়া আপনি তাহাদের প্রাণরক্ষা করুন।

ম। তাহা পারি, কিন্তু দস্যুর দণ্ড অবশ্য দিতে হইবে। আমি তাহাদের বন্দী করিব।

চ। সব পারিবেন—সেইটি পারিবেন না। তাহাদিগকে প্রাণে মারিতে পারিবেন, কিন্তু বাঁধিতে পারিবেন না। তাঁহারা সকলেই মরিতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়াছেন—মরিবেন।

ম। তাহা বিশ্বাস করি। কিন্তু আপনি দিল্লী যাইবেন, ইহা স্থির?

চ। আপনাদিগের সঙ্গে আপাততঃ যাওয়াই স্থির। দিল্লী পর্য্যন্ত পৌঁছিব কি না সন্দেহ।

ম। সে কি?

চ। আপনারা যুদ্ধ করিয়া মরিতে জানেন, আমরা স্ত্রীলোক, আমরা কি শুধু শুধু মরিতে জানি না?

ম। আমাদের শত্রু আছে, তাই মরি। ভুবনে কি আপনার শত্রু আছে?

চ। আমি নিজে—

ম। আমাদের শত্রুর অনেক প্রকার অস্ত্র আছে—আপনার?

চ। বিষ।

ম। কোথায় আছে?

বলিয়া মবারক চঞ্চলকুমারীর মুখপানে চাহিলেন। বুঝি অন্য কেহ হইলে তাহার মনে মনে হইত, নয়ন ছাড়া আর কোথায়ও বিষ আছে কি? কিন্তু মবারক সে ইতর-প্রকৃতির মনুষ্য ছিলেন না। তিনি রাজসিংহের ন্যায় যথার্থ বীরপুরুষ। তিনি বলিলেন, "মা, আত্মঘাতিনী কেন হইবেন? আপনি যদি যাইতে না চাহেন, তবে আমাদের সাধ্য কি আপনাকে লইয়া যাই? স্বয়ং দিল্লীশ্বর উপস্থিত থাকিলেও আপনার উপর বল প্রকাশ করিতে পারিতেন না—আমরা কোন্ ছার! আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন—কিন্তু এ রাজপুতেরা বাদশাহের সেনা আক্রমণ করিয়াছে—আমি মোগল সেনাপতি হইয়া কি প্রকারে উহাদের ক্ষমা করি?"

চ। ক্ষমা করিয়া কাজ নাই—যুদ্ধ করুন।

এই সময়ে রাজপুতগণ লইয়া রাজসিংহ সেইখানে উপস্থিত হইলেন—তখন চঞ্চলকুমারী বলিতে লাগিলেন, "যুদ্ধ করুন—রাজপুতের মেয়েরাও মরিতে জানে।"

মোগল সেনাপতির সঙ্গে লজ্জাহীনা চঞ্চল কি কথা কহিতেছে, শুনিবার জন্য রাজসিংহ এই সময়ে চঞ্চলের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। চঞ্চল তখন তাঁহার কাছে হাত পাতিয়া হাসিয়া বলিলেন, "মহারাজাধিরাজ, আপনার কোমরে যে তরবারি ঝুলিতেছে, রাজপ্রসাদস্বরূপ দাসীকে উহা দিতে আজ্ঞা হউক।"

রাজসিংহ হাসিয়া বলিলেন, "বুঝিয়াছি, তুমি সত্য সত্যই ভৈরবী।"

এই বলিয়া রাজসিংহ কটি হইতে অসি নির্মুক্ত করিয়া চঞ্চলকুমারীর হাতে দিলেন।

দেখিয়া মোগল ঈষৎ হাসিল। চঞ্চলকুমারীর কথার কোন উত্তর করিল না। কেবল রাজসিংহের মুখপানে চাহিয়া বলিল,—"উদয়পুরের বীরেরা কত দিন হইতে স্ত্রীলোকের বাহুবলে রক্ষিত?"

রাজসিংহের দীপ্ত চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল। তিনি বলিলেন, "যত দিন হইতে মোগল বাদশাহ অবলাদিগের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছেন, তত দিন হইতে রাজপুতকন্যাদিগের বাহুতে বল হইয়াছে।"

তখন রাজসিংহ সিংহের ন্যায় গ্রীবাভঙ্গের সহিত স্বজনবর্গের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "রাজপুতেরা বাগ্‌যুদ্ধে অপটু। ক্ষুদ্র সৈনিকদিগের সঙ্গে বাগ্‌যুদ্ধের আমার সময়ও নাই, বৃথা কালহরণে প্রয়োজন নাই—পিপীলিকার মত এই মোগলদিগকে মারিয়া ফেল।"

এতক্ষণ বর্ষণোন্মুখ মেঘের ন্যায় উভয় সৈন্য স্তম্ভিত হইয়া ছিল—প্রভুর আজ্ঞা ব্যতীত কেহই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে পারিতেছিল না। এক্ষণে রাণার আজ্ঞা পাইয়া "মাতাজীকি জয়" শব্দে রাজপুতেরা জলপ্রবাহবৎ মোগল-সেনার উপরে পড়িল। এ দিকে মবারকের আজ্ঞা পাইয়া মোগলেরা "আল্লা-হো—আকবর!" শব্দ করিয়া তাহাদের প্রতিরোধ করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু সহসা উভয় সেনাই নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইল। সেই রণক্ষেত্রে উভয় সেনার মধ্যে অসি উত্তোলন করিয়া—স্থিরমূর্ত্তি চঞ্চলকুমারী দাঁড়াইয়া—সরিতেছেন না।

চঞ্চলকুমারী উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, "যতক্ষণ না এক পক্ষ নিবৃত্ত হয়, ততক্ষণ আমি এখান হইতে নড়িব না। অগ্রে আমাকে না মারিয়া কেহ অস্ত্রচালনা করিতে পারিবে না।"

রাজসিংহ রুষ্ট হইয়া বলিলেন, "তোমার এ অকর্ত্তব্য। যুদ্ধে তুমি রাজপুতকুলে কলঙ্ক লেপিতেছ কেন? লোকে বলিবে—আজ স্ত্রীলোকের সাহায্যে রাজসিংহ প্রাণরক্ষা করিল।"

চ। মহারাজ, আপনাকে মরিতে কে নিষেধ করিতেছে? আমি কেবল আগে মরিতে চাহি-

তেছি। যে অনর্থের মূল, তাহার আগে মরিবার অধিকার আছে।

চঞ্চল নড়িল না—মোগলেরা বন্দুক উঠাইয়াছিল—নামাইল। মবারক চঞ্চলকুমারীর কার্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। তখন উভয় সেনা-সমক্ষে মবারক ডাকিয়া বলিলেন,—"মোগল-বাদশাহ স্ত্রীলোকের সহিত যুদ্ধ করেন না—অতএব বলি, আমরা এই সুন্দরীর নিকট পরাভব স্বীকার করিয়া যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া যাই। রাণা রাজসিংহের সঙ্গে যুদ্ধে জয়-পরাজয়ের মীমাংসা, ভরসা করি, ক্ষেত্রান্তরে হইবে। আমি রাণাকে অনুরোধ করিয়া যাইতেছি যে, সে বার যেন স্ত্রীলোক সঙ্গে করিয়া না আইসেন।"

চঞ্চলকুমারী মবারকের জন্য চিন্তিত হইলেন। মবারক তখন তাঁহার নিকটে—অশ্বে আরোহণ করিতেছেন মাত্র। চঞ্চলকুমারী তাঁহাকে বলিলেন, "সাহেব, আমাকে ফেলিয়া যাইতেছেন কেন? আমাকে লইয়া যাইবার জন্য আপনাদের দিল্লীশ্বর পাঠাইয়া দিয়াছেন। আমাকে যদি লইয়া না যান, তবে বাদশাহ কি বলিবেন?"

মবারক বলিলেন, "বাদশাহের বড় আর এক জন আছেন। উত্তর তাঁহার কাছে দিব।"

চঞ্চল। সে ত পরলোকে, কিন্তু ইহলোকে?

মবারক। মবারক আলি ইহলোকে কাহাকেও ভয় করে না। ঈশ্বর আপনাকে কুশলে রাখুন—আমি বিদায় হইলাম।

এই বলিয়া মবারক অশ্বে আরোহণ করিলেন। তাঁহার সৈন্যকে ফিরিতে আদেশ করিতেছিলেন। এমন সময়ে পশ্চাতে একেবারে সহস্র বন্দুকের শব্দ শুনিতে পাইলেন। একেবারে শত মোগল যোদ্ধা ধরাশায়ী হইল। মবারক দেখিলেন, ঘোর বিপদ্।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

হরণ ও অপহরণে দক্ষ মাণিকলাল

মাণিকলাল পার্ব্বত্যপথ হইতে নির্গত হইয়াই ঘোড়া ছুটাইয়া একেবারে রূপনগরের গড়ে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। রূপনগরের রাজার কিছু সিপাহী ছিল, তাহারা বেতনভোগী চাকর নহে, জমী করিত, ডাক-হাঁক করিলে ঢাল, খাঁড়া, লাঠি-সোঁটা লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইত; এবং সকলেরই এক একটি ঘোড়া ছিল। মোগল-সেনা আসিলে রূপনগরের রাজা তাহাদিগকে ডাক-হাঁক করিয়াছিলেন। প্রকাশ্যে তাহাদিগকে ডাকিবার কারণ—মোগলসৈন্যের সম্মান ও খবরদারিতে তাহাদিগকে নিযুক্ত করা। গোপন অভিপ্রায়—যদি মোগলসেনা হঠাৎ কোন উপদ্রব উপস্থিত করে, তবে তাহার নিবারণ। ডাকিবামাত্র রাজপুতেরা ঢাল, খাঁড়া, ঘোড়া লইয়া গড়ে উপস্থিত হইল—রাজা তাহাদিগকে অস্ত্রাগার হইতে অস্ত্র দিয়া সাজাইলেন, তাহারা নানাবিধ পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিয়া মোগলসৈন্যদিগের সহিত হাস্য-পরিহাস ও রঙ্গরসে কয় দিবস কাটাইল। তাহার পর ঐ দিবস প্রভাতে মোগলসেনা শিবির ভঙ্গ করিয়া রাজকুমারীকে লইয়া যাওয়াতে রূপনগরের সৈনিকেরাও গৃহে প্রত্যাগমন করিতে আজ্ঞা পাইল। তখন তাহারা অস্ত্র সজ্জিত করিল এবং অস্ত্রসকল রাজ-অস্ত্রাগারে ফিরাইয়া দিবার জন্য লইয়া আসিল। রাজা স্বয়ং তাহাদিগকে একত্র করিয়া স্নেহসূচক বাক্যে বিদায় দিতেছিলেন, এমন সময়ে আঙ্গুলকাটা মাণিকলাল ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে অশ্বসহিত সেখানে উপস্থিত হইল।

মাণিকলালের সেই মোগল-সৈনিকের বেশ। এক জন মোগলসৈনিক অতি ব্যস্ত হইয়া গড়ে ফিরিয়া আসিয়াছে দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি সংবাদ?"

মাণিকলাল অভিবাদন করিয়া বলিল, "মহারাজ, বড় গণ্ডগোল বাধিয়াছে, পাঁচ হাজার দস্যু আসিয়া রাজকুমারীকে ঘেরিয়াছে। জুনাব হাসান আলি খাঁ বাহাদুর আমাকে আপনার নিকট পাঠাইলেন—তিনি প্রাণপণে যুদ্ধ করিতেছেন, কিন্তু আর কিছু সৈন্য ব্যতীত রক্ষা পাইতে পারিবেন না। আপনার নিকট সৈন্য সাহায্য চাহিয়াছেন।

রাজা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "সৌভাগ্যক্রমে আমার সৈন্য সজ্জিতই আছে।" সৈনিকগণকে বলিলেন. "তোমাদের ঘোড়া তৈয়ার, হাতিয়ার হাতে, তোমরা সওয়ার হইয়া এখনই যুদ্ধে চল। আমি স্বয়ং তোমাদিগকে লইয়া যাইতেছি।"

মাণিকলাল বলিল, "যদি এ দাসের অপরাধ মাপ হয়, তবে আমি নিবেদন করি যে, ইহাদিগকে লইয়া আমি অগ্রসর হই। মহারাজ আর কিছু সেনা সংগ্রহ করিয়া লইয়া আসুন। দস্যুর সংখ্যায় প্রায় পাঁচ হাজার। আর কিছু সেনাবল ব্যতীত মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই।"

সুলবুদ্ধি রাজা তাহাতেই সম্মত হইলেন। সহস্র সৈনিক লইয়া মাণিকলাল অগ্রসর হইল, রাজা আরও সৈন্যসংগ্রহের চেষ্টায় গড়ে রহিলেন। মাণিক সেই রূপনগরের সেনা লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রাভিমুখে চলিল।

পথে যাইতে যাইতে মাণিকলাল একটি ছোট রকম লাভ করিল। পথের ধারে একটি বৃক্ষের ছায়ায় একটি স্ত্রীলোক পড়িয়া আছে—বোধ হয় যেন পীড়িতা। অশ্বারোহী সৈন্য প্রধাবিত দেখিয়া সে উঠিয়া বসিল—দাঁড়াইবার চেষ্টা করিল—বোধ হয় পলাইবার ইচ্ছা, কিন্তু পারিল না। বল নাই, ইহা দেখিয়া মাণিকলাল ঘোড়া হইতে নামিয়া তাহার নিকটে গেল। গিয়া দেখিল, স্ত্রীলোকটি অতিশয় সুন্দরী। জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে গা এখানে এ প্রকারে পড়িয়া আছ?"

যুবতী জিজ্ঞাসা করিল, "আপনারা কাহার ফৌজ?"

মাণিকলাল বলিল, "আমি রাণা রাজসিংহের ভৃত্য।"

যুবতী বলিল, "আমি রূপনগরের রাজকুমারীর দাসী।"

মাণিক। তবে এখানে এ অবস্থায় কেন?

যুবতী। রাজকুমারীকে দিল্লী লইয়া যাইতেছে। আমি সঙ্গে যাইতে চাহিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি আমাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে রাজি হয়েন নাই। ফেলিয়া আসিয়াছেন। আমি তাই হাঁটিয়া তাঁহার কাছে যাইতেছিলাম।

মাণিকলাল বলিল, "তাই পথশ্রান্ত হইয়া পড়িয়া আছ?"

নির্ম্মলকুমারী বলিল, "অনেক পথ হাঁটিয়াছি—আর পারিতেছি না।"

পথ এমন বেশী নয়, তবে নির্ম্মল কখনও পথ হাঁটে নাই, তার পক্ষে অনেক বটে।

মাণিক। তবে এখন কি করিবে?

নির্ম্মল। কি করিব—এইখানে মরিব।

মাণিক। ছি। মরিবে কেন? রাজকুমারীর কাছে চল না কেন?

নির্ম্মল। যাইব কি প্রকারে? হাঁটিতে পারিতেছি না, দেখিতেছ না?

মাণিক। কেন, ঘোড়ায় চল না?

নির্ম্মল হাসিল; বলিল, "ঘোড়ায়?"

মাণিক। ঘোড়ায়! ক্ষতি কি?

নির্ম্মল। আমি কি সওয়ার?

মাণিক। হও না।

নির্ম্মল। আপত্তি নাই। তবে একটা প্রতিবন্ধক আছে—ঘোড়ায় চড়িতে জানি না।

মাণিক। তার জন্য কি আটকায়? আমার ঘোড়ায় চড় না?

নির্ম্মল। তোমার ঘোড়া কলের, না মাটীর?

মাণিক। আমি ধরিয়া থাকিব?

নির্ম্মল লজ্জারহিতা হইয়া রসিকতা করিতেছিল, —এবার মুখ ফিরাইল। তার পর ভ্রূকুটি করিল। রাগ করিয়া বলিল, "আপনি আপনার কাজে যান, আমি আমার গাছতলায় পড়িয়া থাকি। রাজকুমারীর সাক্ষাতে আমার কাজ নাই।"

মাণিকলাল দেখিল, মেয়েটি বড় সুন্দরী। লোভ সামলাইতে পারিল না। বলিল "হাঁ গা! তোমার বিবাহ হইয়াছে?"

রহস্যপরায়ণা নির্ম্মল মাণিকলালের রকম দেখিয়া হাসিল। বলিল, "না।"

মাণিক। তুমি কি জাতি?

নির্ম্মল। আমি রাজপুতের মেয়ে।

মাণিক। আমিও রাজপুতের ছেলে। আমারও স্ত্রী নাই, আমার একটি ছোট মেয়ে আছে, তার একটি মা খুঁজি। তুমি তার মা হইবে? আমায় বিবাহ করিবে? তা হইলে আমার সঙ্গে একত্র ঘোড়ায় চড়ায় কোন আপত্তি হয় না।

নির্ম্মল। শপথ কর।

মাণিক। কি শপথ করিব?

নির্ম্মল তরবারি ছুঁইয়া শপথ কর যে, আমাকে বিবাহ করিবে।

মাণিকলাল তরবারি স্পর্শ করিয়া শপথ করিল যে, "যদি আজিকার যুদ্ধে বাঁচি, তবে তোমাকে বিবাহ করিব।"

নির্ম্মল বলিল, "তবে চল, ঘোড়ায় চড়ি।"

মাণিকলাল তখন সহর্ষ-চিত্তে নির্ম্মলকে অশ্বপৃষ্ঠে উঠাইয়া সাবধানে তাহাকে ধরিয়া অশ্বচালনা করিতে লাগিল।

বোধ হয়, কোর্টশিপটা পাঠকের বড় ভাল লাগিল না। আমি কি করিব! ভালবাসাবাসির কথা একটাও নাই—বহুকাল সঞ্চিত প্রণয়ের কথা কিছু নাই—"হে প্রাণ!" "হে প্রাণাধিক!" সে সব কিছুই নাই—ধিক!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ফলভোগী রাণা

যুদ্ধক্ষেত্রের নিকটবর্ত্তী এক নিভৃত স্থানে নির্ম্মলকে নামাইয়া দিয়া, তাহাকে সেইখানে বসিয়া থাকিতে উপদেশ দিয়া, মাণিকলাল, যেখানে রাজসিংহের সঙ্গে মবারকের যুদ্ধ হইতেছিল, একেবারে সেই-খানে মবারকের পশ্চাতে উপস্থিত হইল।

মাণিকলাল দেখিয়া যায় নাই যে, তৎপ্রদেশে যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু রন্ধ্রপথে রাজসিংহ প্রবেশ করিয়াছেন; হঠাৎ তাহার শঙ্কা হইয়াছিল যে, মোগলেরা রন্ধ্রের এই মুখ বন্ধ করিয়া রাজ-সিংহকে বিনষ্ট করিবে। সেই জন্যই সে রূপনগরে সৈন্যসংগ্রহার্থ গিয়াছিল এবং সেই জন্যই সে প্রথমেই এই দিকে রূপনগরের সেনা লইয়া উপস্থিত হইল। আসিয়াই বুঝিল যে, রাজপুতগণের নাভিশ্বাস উপস্থিত বলিলেই হয়—মৃত্যুর আর বিলম্ব নাই। তখন, মাণিকলাল মবারকের সেনার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া বলিল, "ঐ সকল দস্যু! উহাদিগকে মারিয়া ফেল।"

সৈনিকেরা কেহ কেহ বলিল, "উহারা যে মুসলমান।"

মাণিকলাল বলিল, "মুসলমান কি লুঠেরা হয় না? হিন্দুই কি যত দুষ্ক্রিয়াকারী? মার।"

মাণিকলালের আজ্ঞায় একেবারে হাজার বন্দুকের শব্দ হইল।

মবারক ফিরিয়া দেখিলেন, কোথা হইতে সহস্র অশ্বারোহী আসিয়া তাঁহাকে পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ করিতেছে। মোগলেরা ভীত হইয়া আর যুদ্ধ করিল না। যে যে দিকে পারিল, সে সেই দিকে পলায়ন করিল। মবারক রাখিতে পারিলেন না। তখন রাজপুতেরা "মাতাজীকি জয়!" বলিয়া তাহাদের পশ্চাদ্ধাবিত হইল।

মবারকের সেনা ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া পর্ব্বতারোহণ করিয়া পলায়ন করিতে লাগিল, রূপনগরের সেনা তাহাদিগের পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া পর্ব্বতারোহণ করিতে লাগিল। মবারক সেনা ফিরাইতে গিয়া সহসা অশ্বসমেত অদৃশ্য হইলেন।

এই অবসরে মাণিকলাল বিস্মিত রাজসিংহের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিলেন। রাণা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি এ কাণ্ড মাণিকলাল? কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। তুমি কিছু জান?"

মাণিকলাল হাসিয়া বলিল, "জানি। যখন আমি দেখিলাম যে, মহারাজ রন্ধ্রপথে নামিয়াছেন, তখনই বুঝিলাম যে, সর্ব্বনাশ হইয়াছে। প্রভুর রক্ষার্থ আমাকে আবার একটি নূতন জুয়াচুরি করিতে হইয়াছে।"

এই বলিয়া মাণিকলাল যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সংক্ষেপে রাণাকে শুনাইল। আপ্যায়িত হইয়া রাণা মাণিকলালকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "মাণিক-লাল! তুমি যথার্থ প্রভুভক্ত। তুমি যে কার্য্য করিয়াছ, যদি কখন উদয়পুর ফিরিয়া যাই, তবে তাহার পুরস্কার করিব। কিন্তু তুমি আমাকে বড় সাধে বঞ্চিত করিলে, আজ মুসলমানকে দেখাইতাম যে, রাজপুত কেমন করিয়া মরে।"

মাণিকলাল বলিল, "মহারাজ! মোগলকে সে শিক্ষা দিবার জন্য মহারাজের অনেক ভৃত্য আছে। সেটা রাজকার্য্যের মধ্যে গণনীয় নহে। এখন উদয়পুরের পথ খোলসা। রাজধানী ত্যাগ করিয়া পর্ব্বতে পর্ব্বতে পরিভ্রমণ করা কর্ত্তব্য নহে। এক্ষণে রাজকুমারীকে লইয়া স্বদেশযাত্রা করুন।"

রাজসিংহ বলিলেন, "আমার কতকগুলি সঙ্গী এখনও ওদিকে পাহাড়ের উপরে আছে—তাহাদের নামাইয়া লইয়া যাইতে হইবে।"

মাণিকলাল বলিল, "আমি তাহাদিগকে লইয়া যাইব। আপনি অগ্রসর হউন। পথে আমাদিগের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে।"

রাণা সম্মত হইয়া, চঞ্চলকুমারীর সহিত উদয়-পুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

স্নেহশালিনী পিসী

রাণাকে বিদায় দিয়া মাণিকলাল রূপনগরের সেনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ পর্ব্বতারোহণ করিল। পলায়নপরায়ণ মোগলসেনা তৎকর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া যে যেখানে পাইল, পলায়ন করিল। তখন মাণিক-লাল রূপনগরের সৈনিকদিগকে বলিলেন, "শত্রুদল পলায়ন করিয়াছে—আর কেন বৃথা পরিশ্রম করিতেছ? কার্য্যসিদ্ধি হইয়াছে, রূপনগরে ফিরিয়া যাও।" সৈনিকেরাও দেখিল—তাও বটে, সম্মুখশত্রু আর কেহ নাই। মাণিকলাল যে একটা কারসাজি করিয়াছে, ইহাও তাহারা বুঝিতে পারিল। হঠাৎ যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহার আর উপায় নাই

দেখিয়া, তাহারা লুঠপাটে প্রবৃত্ত হইল এবং যথেষ্ট ধনসম্পত্তি অপহরণ করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে হাসিতে হাসিতে, বাদশাহের জয়ধ্বনি তুলিয়া রণজয়গর্ব্বে গৃহাভিমুখে ফিরিল। দণ্ডকালমধ্যে পার্ব্বত্যপথ জনশূন্য হইল—কেবল হত ও আহত মনুষ্য ও অশ্বসকল পড়িয়া রহিল দেখিয়া, উচ্চ পর্ব্বতের উপরে প্রস্তর সঞ্চালনে যে সকল রাজপুত নিযুক্ত ছিল, তাহারা নামিল এবং কোথাও কাহাকেও না দেখিয়া, রাণা অবশিষ্ট সৈন্য সহিত অবশ্য উদয়পুরে যাত্রা করিয়াছেন বিবেচনা করিয়া, তাহারাও তাঁহার সন্ধানে সেই পথে চলিল। পথিমধ্যে রাজসিংহের সহিত সাক্ষাৎ হইল। সকলে একত্রে উদয়পুরে চলিলেন।

সকলে জুটিল—কেবল মাণিকলাল নহে। মাণিকলাল নির্ম্মলকে লইয়া বিব্রত। সকলকে গুছাইয়া পাঠাইয়া দিয়া, নির্ম্মলের কাছে আসিয়া জুটিল। তাহাকে কিছু ভোজন করাইয়া, গ্রাম হইতে বাহক ও দোলা লইয়া আসিল। দোলায় নির্ম্মলকে তুলিয়া, যে পথে রাণা গিয়াছেন, সে পথে না গিয়া ভিন্ন পথে চলিল।—বমাল সমেত ধরা পড়ে, এমন ইচ্ছা রাখে না।

মাণিকলাল নির্ম্মলকে লইয়া পিসীর বাড়ী উপস্থিত হইল। পিসীমাকে ডাকিয়া বলিল, "পিসী-মা, একটা বউ এনেছি।" বধূ দেখিয়া পিসী-মা কিছু বিষণ্ণ হইলেন—মনে করিলেন, লাভের যে আশা করিয়াছিলাম, বধূ বুঝি তাহার ব্যাঘাত করিবে। কি করে, দুইটা আসরফি নগদ লইয়াছে—এক দিন অন্ন না দিয়া বহুকে তাড়াইয়া দিতে পারিবে না। সুতরাং বলিল, "বেশ বউ।"

মাণিকলাল বলিল, "পিসী, বহুর সঙ্গে আমার আজিও বিবাহ হয় নাই।"

পিসীমা বুঝিলেন, তবে এটা উপপত্নী। যো পাইয়া বলিলেন, "তবে আমার বাড়ীতে—"

মাণিকলাল। তার ভাবনা কি? বিয়ে দাও না? আজই বিবাহ হইক।

নির্ম্মল লজ্জায় অধোবদন হইল।

পিসীমা আবার যো পাইলেন; বলিলেন, "সে ত সুখের কথা—তোমার বিবাহ দিব না ত কার বিবাহ দিব? তা বিবাহের ত কিছু খরচ চাই?"

মাণিকলাল বলিল, "তার ভাবনা কি?"

পাঠকের জানা থাকিতে পারে, যুদ্ধ হইলেই লুঠ হয়। মাণিকলাল যুদ্ধক্ষেত্র হইতে আসিবার সময়ে নিহত মোগল সওয়ারদিগের বস্ত্র মধ্যে অনুসন্ধান করিয়া কিছু সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল—ঝনাৎ করিয়া পিসীর কাছে গোটাকতক আসরফি ফেলিয়া দিল, পিসীমা আনন্দে পরিপ্লুত হইয়া তাহা কুড়াইয়া লইয়া পেঁটরায় তুলিয়া রাখিয়া বিবাহের উদ্যোগ করিতে বাহির হইলেন। বিবাহের উদ্যোগের মধ্যে ফুল, চন্দন ও পুরোহিত সংগ্রহ, সুতরাং আসরফিগুলি পিসীমাকে পেঁটরা হইতে আর বাহির করিতে হইল না। মাণিকলালের লাভের মধ্যে তিনি যথাশাস্ত্র নির্ম্মলকুমারীর স্বামী হইলেন। বলা বাহুল্য যে, মাণিকলাল রাণার সৈনিকদিগের মধ্যে বিশেষ উচ্চপদ লাভ করিলেন এবং নিজগুণে সর্ব্বত্র সম্মান প্রাপ্ত হইলেন।

পঞ্চম খণ্ড

অগ্নির আয়োজন

প্রথম পরিচ্ছেদ

শাহজাদী অপেক্ষা দুঃখী ভাল

বলিয়াছি, মবারক রণভূমিতে পর্ব্বতের সানুদেশে সহসা অদৃশ্য হইলেন। অদৃশ্য হইবার কারণ, তিনি যে পথে অশ্বারোহণে সৈন্য লইয়া যাইতেছিলেন, তাহার মধ্যে একটা কূপ ছিল। কেহ পর্ব্বতোপরি বাস করিবার অভিপ্রায়ে জলের জন্য এই কূপটি খনন করিয়াছিল। এক্ষণে চারিপাশের জঙ্গল কূপের মুখে পড়িয়া কূপটি আচ্ছাদন করিয়াছিল। মবারক তাহা না দেখিতে পাইয়া উপর দিয়া ঘোড়া চালাইলেন এবং ঘোড়া সমেত তাহার ভিতর পড়িয়া গিয়া অদৃশ্য হইলেন। তাহার ভিতর জল ছিল না। কিন্তু পতনের আঘাতেই ঘোড়াটি মরিয়া গেল। মবারক পতন কালে সতর্ক হইয়াছিলেন; তিনি বড় বেশী আঘাত পাইলেন না;

কিন্তু কূপ হইতে উঠিবার কোন উপায় দেখিলেন না। যদি কেহ শব্দ শুনিয়া তাঁহার উদ্ধার করে, এ জন্য ডাকাডাকি করিতে লাগিলেন। কিন্তু যুদ্ধের কোলাহলে তিনি কোন উত্তর শুনিতে পাইলেন না। কেবল একবার যেন, দূর হইতে কে বলিল, "স্থির হইয়া থাক—তুলিব।" সেটাও সন্দেহ মাত্র।

যুদ্ধ সমাপ্ত হইলে, রণক্ষেত্র নিঃশব্দ হইলে, কেহ যেন কূপের উপর হইতে বলিল, "বাঁচিয়া আছ?"

মবারক উত্তর করিল, "আছি। তুমি কে?"

সে বলিল, "আমি যে হই, বড় জখম হইয়াছ কি?"

"সামান্য।"

"আমি একটা কাঠে দুই চারিখানা কাপড় বাঁধিয়া লম্বা দড়ির মত করিয়াছি। পাকাইয়া মজবুত করিয়াছি। তাহা কূয়ার ভিতর ফেলিয়া দিতেছি। দুই হাতে কাঠের দুই দিক্ ধর—আমি টানিয়া তুলিতেছি।"

মবারক বিস্মিত হইয়া বলিল, "এ যে স্ত্রীলোকের স্বর। কে তুমি?

স্ত্রীলোক বলিল, "এ গলা কি চেন না?"

মবা। চিনিতেছি। দরিয়া এখানে কোথা হইতে?

দরিয়া বলিল, "তোমারই জন্য। এখন তুলিতেছি—উঠ।"

এই বলিয়া দরিয়া কাপড়ের কাছিতে বাঁধা কাঠখানা কূপের ভিতর ফেলিয়া দিল। তরবারি দিয়া কূপের মুখের জঙ্গল কাটিয়া সাফ করিয়া দিল। মবারক কাঠের দুই দিক্ ধরিল, দরিয়া তখন টানিয়া তুলিতে লাগিল। জোরে কুলায় না। কান্না আসিতে লাগিল। তখন দরিয়া একটা বৃক্ষের বিনত শাখার উপর বস্ত্ররজ্জু স্থাপন করিয়া, শুইয়া পড়িয়া টানিতে লাগিল। মবারক উঠিল। দরিয়াকে দেখিয়া মবারক বিস্মিত হইল। বলিল, "এ কি? এ বেশ কেন?"

দরিয়া বলিল, "আমি বাদশাহী সওয়ার

মবা। কেন?

দরি। তোমারই জন্য।

মবা। কেন?

দরি। নহিলে তোমাকে আজ বাঁচাইত কে?

মবা। সেই জন্য কি দিল্লী হইতে এখানে আসিয়াছ? সেই জন্য কি সওয়ার সাজিয়াছ? এই যে রক্ত দেখিতেছি। তুমি যে জখম হইয়াছ। কেন এ করিলে?

দরি। তোমার জন্য করিয়াছি। না করিলে তুমি বাঁচিতে কি? শাহজাদী কেমন ভালবাসে?

মবারক ম্লানমুখে ঘাড় হেঁট করিয়া বলিল, "শাহজাদীরা ভালবাসে না।"

দরিয়া বলিল, "আমরা দুঃখী—আমরা ভালবাসি। এখন বসো, আমি তোমার জন্য দোলা স্থির করিয়া রাখিয়াছি; লইয়া আসিতেছি। তোমার চোট লাগিয়াছে—ঘোড়ায় চড়া সৎপরামর্শ হইবে না।"

যে সকল দোলা মোগলসেনার সঙ্গে ছিল, যুদ্ধে ভীত হইয়া তাহার বাহকেরা কতকগুলি লইয়া পলায়ন করিয়াছিল। দরিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে মবারককে কূপমগ্ন হইতে দেখিয়া প্রথমেই দোলার সন্ধানে গিয়াছিল। পলাতক বাহকদিগকে সন্ধান করিয়া দুইখানা দোলা ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল। তার পর এখন, সেই দোলা ডাকিয়া আনিল। একখানায় আহত মবারককে তুলিল, একখানায় স্বয়ং উঠিল।

তখন মবারককে লইয়া দরিয়া দিল্লীর পথে চলিল। দোলায় উঠিবার সময় মবারক দরিয়ার মুখচুম্বন করিয়া বলিল, "আর কখনও তোমায় ত্যাগ করিব না।"

উপযুক্ত স্থানে উপস্থিত হইয়া, দরিয়া মবারকের শুশ্রূষা করিল। দরিয়ার চিকিৎসাতে মবারক আরোগ্য লাভ করিল।

দিল্লীতে পৌঁছিলে মবারক দরিয়ার হাত ধরিয়া আপন গৃহে লইয়া গেল। দিন কতক ইহাতে উভয়ে বড় সুখী হইল। তার পর ইহার যে ফল উপস্থিত হইল, তাহা ভয়ানক। দরিয়ার পক্ষে ভয়ানক, মবারকের পক্ষে ভয়ানক, জেব-উন্নিসার পক্ষে ভয়ানক, ঔরঙ্গজেবের পক্ষে ভয়ানক। সে অপূর্ব্ব রহস্য আমি পশ্চাৎ বলিব। একণে চঞ্চলকুমারীর কথা কিছু বলা আবশ্যক।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাজসিংহের পরাভব

রাজসিংহ উদয়পুরে আসিলেন বলিয়াছি। চঞ্চলকুমারীর উদ্ধারের জন্য যুদ্ধ, এ জন্য চঞ্চলকুমারীকেও উদয়পুরে লইয়া আসিয়া রাজাবরোধে সংস্থাপিত করিলেন। কিন্তু তাঁহাকে উদয়পুরে

রাখিবেন, কি রূপনগরে তাঁহার পিতার নিকট পাঠাইয়া দিবেন, ইহার মীমাংসা তাঁহার পক্ষে কঠিন হইল। তিনি যত দিন ইহার সুমীমাংসা করিতে না পারিলেন, তত দিন চঞ্চলকুমারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন না।

এ দিকে চঞ্চলকুমারী রাজার ভাবগতিক দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন। ভাবিলেন, "রাজা যে আমাকে বিবাহ করিয়া গ্রহণ করিবেন, এমন ত ভাবগতিক কিছুই দেখিতেছি না। যদি না করেন, তবে কেন আমি উঁহার অন্তঃপুরে বাস করি? যাবই বা কোথায়?"

রাজসিংহ কিছু মীমাংসা করিতে না পারিয়া কতিপয় দিন পরে চঞ্চলকুমারীর মনের ভাব জানিবার জন্য তাঁহার কাছে গিয়া উপস্থিত হইলেন। যাইবার সময়ে যে পত্রখানি চঞ্চলকুমারী অনন্ত মিশ্রের হাতে পাঠাইয়াছিলেন, যাহা রাজসিংহ মাণিকলালের নিকট পাইয়াছিলেন, তাহা লইয়া গেলেন।

রাণা আসন গ্রহণ করিলে, চঞ্চলকুমারী তাঁহাকে প্রণাম করিয়া সলজ্জ এবং বিনীতভাবে একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলেন। লোকমনোমোহিনী মূর্ত্তি দেখিয়া রাজা একটু মুগ্ধ হইলেন। কিন্তু তখনই মোহ পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "রাজকুমারি! এক্ষণে তোমার কি অভিপ্রায়, তাহা জানিবার জন্য আমি আসিয়াছি। তোমার পিত্রালয়ে যাইবার অভিলাষ, না এইখানে থাকিতেই প্রবৃত্তি?"

শুনিয়া চঞ্চলকুমারীর হৃদয় যেন ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি কথা কহিতে পারিলেন না—নীরবে রহিলেন।

তখন রাণা চঞ্চলকুমারীর পত্রখানি বাহির করিয়া চঞ্চলকুমারীকে দেখাইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ তোমার পত্র বটে?"

চঞ্চল বলিল, "আজ্ঞা হাঁ।"

রাণা। কিন্তু সবটুকু এক হাতের লেখা নহে। দুই হাতের লেখা দেখিতেছি। তোমার নিজের হাতের কোন অংশ আছে কি?

চঞ্চল। প্রথম ভাগটা আমার হাতের লেখা।

রাণা। তবে শেষ ভাগটা অন্যের লেখা?

পাঠকের স্মরণ থাকিবে যে, এই শেষ অংশেই বিবাহের প্রস্তাবটা ছিল। চঞ্চলকুমারী উত্তর করিলেন, "আমার হাতের নহে।"

রাজসিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিন্তু তোমার সম্মতিক্রমেই ইহা লিখিত হইয়াছিল?"

প্রশ্নটা অতি নির্দ্দয়। কিন্তু চঞ্চলকুমারী আপনার উন্নত স্বভাবের উপযুক্ত উত্তর করিলেন। বলিলেন, "মহারাজ! ক্ষত্রিয়রাজগণ বিবাহার্থই কন্যাহরণ করিতে পারেন; অন্য কোন কারণে কন্যাহরণ মহাপাপ। মহাপাপ করিতে আপনাকে অনুরোধ করিব কি প্রকারে?"

রাণা। আমি তোমাকে হরণ করি নাই, তোমার জাতিকুল রক্ষার্থ তোমাকে মুসলমানের হাত হইতে উদ্ধার করিয়াছি। এক্ষণে তোমাকে তোমার পিতার নিকট প্রতিপ্রেরণ করাই রাজধর্ম্ম।

চঞ্চলকুমারী কয়টা কথা কহিয়া যুবতী-সুলভ লজ্জাকে বশে আনিয়াছিল। এক্ষণে মুখ তুলিয়া রাজসিংহের প্রতি চাহিয়া বলিল, "মহারাজ! আপনার রাজধর্ম্ম আপনি জানেন। আমার ধর্ম্মও আমি জানি। আমি জানি যে, যখন আমি আপনার চরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছি, তখন আমি ধর্ম্মতঃ আপনার মহিষী। আপনি গ্রহণ করুন বা করুন, ধর্ম্মতঃ আমি আর কাহাকেও বরণ করিতে পারিব না। যখন ধর্ম্মতঃ আপনি আমার স্বামী, তখন আপনার আজ্ঞামাত্র শিরোধার্য্য। আপনি যদি রূপনগরে ফিরিয়া যাইতে বলেন, তবে অবশ্য আমি যাইব। সেখানে গেলে পিতা আমাকে পুনর্ব্বার বাদশাহের নিকট পাঠাইতে বাধ্য হইবেন। কেন না, আমাকে রক্ষা করিবার তাঁহার সাধ্য নাই। —যদি তাহাই অভিপ্রেত, তাহা হইলে রণক্ষেত্রে যখন আমি বলিয়াছিলাম যে, 'মহারাজ! আমি দিল্লী যাইব'—তখন কেন যাইতে দিলেন না?"

রাজসিংহ। সে আমার আপনার মানরক্ষার্থ।

চঞ্চল। তার পর এখন যে আপনার শরণ লইয়াছে, তাহাকে আবার দিল্লী যাইতে দিবেন কি?

রাজ। তাও হইতে পারে না। তবে তুমি এইখানেই থাক।

চঞ্চল। অতিথিস্বরূপ থাকিব? না দাসী হইয়া? রূপনগরের রাজকন্যা এখানে মহিষী ভিন্ন আর কিছু হইতে পারে না।

রাজ। তোমার মত লোকমনোমোহিনী সুন্দরী যে রাজার মহিষী, সকলেই তাঁহাকে ভাগ্যবান্ বলিবে। তুমি এমন অদ্বিতীয়া রূপবতী বলিয়াই তোমাকে মহিষী করিতে সঙ্কুচিত হইতেছি। শুনিয়াছি যে শাস্ত্রে আছে, রূপবতী ভার্য্যা শত্রুস্বরূপ—

"ঋণকারী পিতা শত্রুর্মাতা চ ব্যভিচারিণী।
ভার্য্যা রূপবতী শত্রুঃ পুত্রঃ শত্রুরপণ্ডিতঃ।"

চঞ্চলকুমারী একটু হাসিয়া বলিল, "বালিকার বাচালতা মার্জ্জনা করিবেন—উদয়পুরের রাজমহিষীগণ সকলেই কি কুরূপা ?"

রাজসিংহ বলিলেন, "তোমার মত কেহই সুরূপা নহে।"

চঞ্চলকুমারী বলিল, "আমার বিনীত নিবেদন, কথাটা মহিষীদের কাছে বলিবেন না। মহারাণা রাজসিংহেরও ভয়ের স্থান থাকিতে পারে।"

রাজসিংহ উচ্চহাস্য করিলেন। চঞ্চলকুমারী এতক্ষণ দাঁড়াইয়া ছিল—এখন চাপিয়া বসিল, মনে মনে বলিল, "আর ইনি আমার কাছে মহারাণা নহেন, ইনি এখন আমার বর।"

আসন গ্রহণ করিয়া চঞ্চলকুমারী বলিল, "মহারাজ, বিনা আজ্ঞায় আমি যে মহারাজের সম্মুখে আসন গ্রহণ করিলাম, সে অপরাধ আপনাকে মার্জ্জনা করিতে হইতেছে—কেন না, আমি আপনার নিকট জ্ঞান লাভের আকাঙ্ক্ষায় বসিলাম, শিষ্যের আসনে অধিকার আছে। মহারাজ! রূপবতী ভার্য্যা শত্রু কি প্রকারে, তাহা আমি এখনও বুঝিতে পারি নাই।"

রাজসিংহ। তাহা সহজে বুঝান যায়। ভার্য্যা রূপবতী হইলে, তাহার জন্য বিবাদ-বিসংবাদ উপস্থিত হয়। এই দেখ, তুমি এখনও আমার ভার্য্যা হও নাই, তথাপি তোমার জন্য ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে আমার বিবাদ বাধিয়াছে। আমাদের বংশের মহারাণী পদ্মিনীর কথা শুনিয়াছ ত ?

চঞ্চল। ঋষিবাক্যে আমার বড় শ্রদ্ধা হইল না। সুন্দরী মহিষী না থাকিলে রাজারা কি বিবাদ হইতে মুক্তি পান ? আর এ পামরীর জন্য মহারাজ কেন এ কথা তুলেন ? আমি সুরূপা হই, আর কুরূপা হই, আমার জন্য যে বিবাদ বাধিবার, তাহা ত বাধিয়াছে।

রাজসিংহ। আরও কথা আছে। রূপবতী ভার্য্যাতে পুরুষ অত্যন্ত আসক্ত হয়। ইহা রাজার পক্ষে অত্যন্ত নিন্দনীয়। কেন না তাহাতে রাজকার্য্যের ব্যাঘাত ঘটে।

চঞ্চল। রাজারা বহুশত মহিষী কর্ত্তৃক পরিবৃত থাকিয়াও রাজকার্য্যে অমনোযোগী হয়েন না। আমার ন্যায় বালিকার প্রণয়ে মহারাণা রাজসিংহের রাজকার্য্যে বিরাগ জন্মিবে, ইহা অতি অশ্রদ্ধার কথা।

রাজসিংহ। কথা তত অশ্রদ্ধেয় নহে। শাস্ত্রে বলে, "বৃদ্ধস্য তরুণী বিষম্।"

চঞ্চল। মহারাজ কি বৃদ্ধ ?

রাজসিংহ। যুবা নহি।

চঞ্চল। যাহার বাহুতে বল আছে, রাজপুতকন্যার কাছে সেই যুবা। দুর্ব্বল যুবাকে রাজপুতকন্যাগণ বৃদ্ধের মধ্যে গণ্য করেন।

রাজ। আমি সুরূপ নহি।

চঞ্চল। কীর্ত্তিই রাজাদিগের রূপ।

রাজ। রূপবান, বলবান্, যুবা রাজপুত্রের অভাব নাই।

চঞ্চল। আমি আপনাকে আত্মসমর্পণ করিয়াছি। অন্যের পত্নী হইলে দ্বিচারিণী হইব। আমি অত্যন্ত নির্লজ্জের মত কথা বলিতেছি। কিন্তু মনে করিয়া দেখিবেন, দুষ্মন্ত কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলে শকুন্তলা লজ্জা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আমারও আজ প্রায় সেই দশা। আপনি আমায় পরিত্যাগ করিলে আমি রাজসমন্দরে * ডুবিয়া মরিব।

রাজসিংহ বাগ্‌যুদ্ধে এইরূপ পরাভব প্রাপ্ত হইয়া বলিলেন, "তুমিই আমার উপযুক্ত মহিষী। তবে তুমি কেবল বিপদে পড়িয়া আমাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলে; এক্ষণে আমার হাত হইতে উদ্ধারের ইচ্ছা রাখ কি না, আমার এই বয়সে তুমি আমাতে অনুরাগিণী হইতে পারিবে কি না, আমার মনে এই সকল সংশয় ছিল। সে সকল সংশয় আজিকার কথাবার্ত্তায় দূর হইয়াছে। তুমি আমার মহিষী হইবে। তবে একটা কথার অপেক্ষা করিতে চাই। তোমার পিতার মত হইবে কি ? তাঁহার অমতে আমি বিবাহ করিতে চাহি না। তাহার কারণ, যদিও তোমার পিতার ক্ষুদ্র রাজ্য এবং তাঁহার সৈন্য অল্প, কিন্তু বিক্রম শোলাঙ্কি যে এক জন বীরপুরুষ ও উপযুক্ত সেনানায়ক, ইহা প্রসিদ্ধ। মোগলের সঙ্গে আমার যুদ্ধ বাধিবেই বাধিবে। বাধিলে তাঁহার সাহায্য আমার পক্ষে বিশেষ মঙ্গলজনক হইবে। তাঁহার অনুমতি লইয়া বিবাহ না করিলে তিনি কখনও আমার সহায় হইবেন না। বরং তাঁহার অমতে বিবাহ করিলে তিনি মোগলের সহায় এবং আমার শত্রু হইতে পারেন। তাহা বাঞ্ছনীয় নহে, অতএব আমার ইচ্ছা, তাঁহাকে পত্র লিখিয়া তাঁহার সম্মতি আনাইয়া তোমাকে বিবাহ করি। তিনি সম্মত হইবেন কি ?"

চঞ্চল। না হইবার ত কোন কারণ দেখি না। আমার ইচ্ছা, পিতামাতার আশীর্ব্বাদ লইয়াই

---

* রাজসিংহের নির্ম্মিত সরোবর।

আপনার চরণসেবাব্রত গ্রহণ করি। লোক পাঠান আমারও ইচ্ছা।

তখন রাজসিংহ একখানি সবিনয় পত্র লিখিয়া বিক্রম শোলাঙ্কির নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। চঞ্চলকুমারীও মাতার আশীর্ব্বাদ কামনা করিয়া একখানা পত্র লিখিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অগ্নি জ্বালিবার প্রয়োজন

রূপনগরের অধিপতির উত্তর, উপযুক্ত সময়ে পৌঁছিল। উত্তর বড় ভয়ানক। তাহার মর্ম্ম এই;—রাজসিংহকে তিনি লিখিতেছেন, "আপনি রাজপুতানার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। রাজপুতানার মুকুটস্বরূপ। এক্ষণে আপনি রাজপুতের নামে কলঙ্ক দিতে প্রস্তুত। আপনি বলপূর্ব্বক আমার অপমান করিয়া আমার কন্যাকে হরণ করিয়াছেন। আমার কন্যা পৃথিবীশ্বরী হইত, আপনি তাহাতে বাদ সাধিয়াছেন। আপনারও শত্রুতা করা আমার কর্ত্তব্য। আমার সম্মতিক্রমে আপনি আমার কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে পারিবেন না।

"আপনি বলিতে পারেন, সেকালে ক্ষত্রিয়বীরেরা কন্যা হরণ করিয়া বিবাহ করিতেন। ভীষ্ম, অর্জ্জুন, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ কন্যা হরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু আপনার সে বলবীর্য্য কৈ? আপনার বাহুতে যদি বল আছে, তবে হিন্দুস্থানে মোগল বাদশাহ কেন? শৃগাল হইয়া সিংহের অনুকরণ করা কর্ত্তব্য নহে। আমিও রাজপুত, মুসলমানকে কন্যাদান করিলে আমার গৌরব বৃদ্ধি পাইবে না, জানি। কিন্তু না দিলে মোগল রূপনগরের পাহাড়ের একখানি পাতরও রাখিবে না। যদি আমি আপনি আত্মরক্ষা করিতে পারিতাম, কি কেহ আমাকে রক্ষা করিবে জানিতাম, তবে আমিও ইহাতে সম্মত হইতাম না। যখন জানিব যে আপনার সে ক্ষমতা আছে, তখন না হয় আপনাকে কন্যাদান করিব।

"সত্য বটে, পূর্ব্বকালে ক্ষত্রিয় রাজগণ কন্যাহরণ করিয়া বিবাহ করিতেন, কিন্তু এমন চাতুরী, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা কেহই করিতেন না। আপনি আমার কাছে লোক পাঠাইয়া মিথ্যা কথা বলিয়া আমার সেনা লইয়া গিয়া আমারই কন্যাহরণ করিলেন,—নচেৎ আপনার সাধ্য হয় নাই। ইহাতে আমার কতটা অনিষ্ট সাধিয়াছেন, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখুন। মোগল বাদশাহ মনে করিবেন, যখন আমার সৈন্য যুদ্ধ করিয়াছে, তখন আমারই কুচক্রে আমার কন্যা অপহৃত হইয়াছে। অতএব নিশ্চয়ই আগে রূপনগর ধ্বংস করিয়া তবে আপনার দণ্ডবিধান করিবেন। আমিও যুদ্ধ করিতে জানি, কিন্তু মোগলের লক্ষ লক্ষ ফৌজের কাছে কার সাধ্য অগ্রসর হয়? সেই জন্য প্রায় সকল রাজপুত তাঁহার পদানত হইয়া আছে—আমি কোন্ ছার।

"জানি না, এখন তাঁহার কাছে সত্য কথা বলিয়া নিষ্কৃতি পাইব কি না। কিন্তু আপনি যদি আমার কন্যা বিবাহ করেন, তাঁহাকে সে কন্যা দিবার আর যদি পথ না থাকে, তবে আমার বা আমার কন্যার নিষ্কৃতির আর কোন উপায় থাকিবে না।

"আপনি আমার কন্যা বিবাহ করিবেন না। করিলে আপনাদিগকে আমার শাপগ্রস্ত হইতে হইবে। আমি শাপ দিতেছি যে, তাহা হইলে আমার কন্যা বিধবা, সহগমনে বঞ্চিতা, মৃতপ্রজা এবং চিরদুঃখিনী হইবে এবং আপনার রাজধানী শৃগালকুক্কুরের বাসভূমি হইবে।"

বিক্রম শোলাঙ্কি এই ভীষণ অভিসম্পাতের পর নীচে একছত্র লিখিয়া দিলেন, "যদি আপনাকে কখন উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিবার কারণ পাই, তবে ইচ্ছাপূর্ব্বক আমি আপনাকে কন্যাদান করিব।"

চঞ্চলকুমারীর মাতা পত্রের কোন উত্তর দিলেন না। তাঁহার পিতার পত্র রাজসিংহ চঞ্চলকুমারীকে পড়িয়া শুনাইলেন। চঞ্চলকুমারী চারিদিক্ অন্ধকার দেখিল।

চঞ্চলকুমারী অনেকক্ষণ নীরব হইয়া থাকিলে, রাণা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এক্ষণে কি করিব? পরিণয় বিধেয় কি না?"

চঞ্চলকুমারী—চক্ষের একবিন্দু, বিন্দুমাত্র, জল মুছিয়া ফেলিয়া বলিলেন, "বাপের এ অভিসম্পাত মাথায় করিয়া কোন্ কন্যা বিবাহ করিতে সাহস করিবে?"

রাণা। তবে যদি পিতৃগৃহে ফিরিয়া যাইবার অভিপ্রায় কর, তবে পাঠাইতে পারি।

চঞ্চল। কাজেই তাই। কিন্তু পিতৃগৃহে যাওয়াও যা, দিল্লী যাওয়াও তাই; তাহার অপেক্ষা বিষপান কিসে মন্দ?

রাণা। আমার এক পরামর্শ শুন। তুমিই আমার যোগ্যা মহিষী, আমি সহসা তোমাকে ত্যাগ করিতে পারিতেছি না, কিন্তু তোমার পিতার আশীর্ব্বাদ ব্যতীতও তোমাকে বিবাহ করিব না। সে আশীর্ব্বাদের ভরসা আমি একেবারে ত্যাগ করিতেছি না। মোগলের সঙ্গে যুদ্ধ নিশ্চিত। একলিঙ্গ* আমার সহায়। আমি সেই যুদ্ধে হয় মরিব, নয় মোগলকে পরাজিত করিব।

চঞ্চল। আমার স্থির বিশ্বাস, মোগল আপনার নিকট পরাজিত হইবে।

রাণা। সে অতিশয় দুঃসাধ্য কাজ। যদি সফল হই, তবে নিশ্চিত তোমার পিতার আশীর্ব্বাদ পাইব।

চঞ্চল। তত দিন ?

রাণা। তত দিন তুমি আমার অন্তঃপুরে থাক। মহিষীদিগের ন্যায় তোমার পৃথক্ রেউলা† হইবে। মহিষীদিগের ন্যায় তোমারও দাস-দাসী ও পরিচর্য্যার ব্যবস্থা করিব। আমি প্রচার করিব যে, অল্পদিনের মধ্যে তুমি আমার মহিষী হইবে এবং সেই বিবেচনায় সকলেই তোমাকে মহিষীদিগের ন্যায় মহারাণী বলিয়া সম্বোধন করিবে। কেবল যত দিন না তোমার সঙ্গে আমার যথাশাস্ত্র বিবাহ হয়, তত দিন আমি তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব না। কি বল ?

চঞ্চলকুমারী বিবেচনা করিয়া দেখিলেন, "ইহার অপেক্ষা সুব্যবস্থা এক্ষণে আর কিছু হইতে পারে না।" কাজেই সম্মত হইলেন। রাজসিংহও যেরূপ অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, সেইরূপ বন্দোবস্ত করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অগ্নি জ্বালিবার আরও প্রয়োজন

মাণিকলালের কাছে নির্ম্মল শুনিল যে, চঞ্চলকুমারী রাজমহিষী হইলেন। কিন্তু কবে বিবাহ হইল, বিবাহ হইয়াছে কি না, তাহা মাণিকলাল কিছুই বলিতে পারিল না। নির্ম্মল তখন স্বয়ং চঞ্চলকুমারীকে দেখিতে আসিলেন।

অনেক দিনের পর নির্ম্মলকে দেখিয়া চঞ্চলকুমারী অত্যন্ত আনন্দিতা হইলেন। সে দিন নির্ম্মলকে যাইতে দিলেন না। রূপনগর পরিত্যাগ করার পর যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা পরস্পর পরস্পরের কাছে সবিস্তার বলিলেন। নির্ম্মলের সুখ শুনিয়া চঞ্চলকুমারী আহ্লাদিতা হইলেন। সুখ—কেন না, মাণিকলাল রাণার কাছে অনেক পুরস্কার পাইয়াছিলেন—অনেক টাকা হইয়াছে; তাহার পর, মাণিকলাল রাণার অনুগ্রহে সৈন্যমধ্যে অতি উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এবং রাজসম্মানে গৌরবান্বিত হইয়াছেন; নির্ম্মলের উচ্চ অট্টালিকা, ধন-দৌলত, দাস-দাসী সব হইয়াছে এবং মাণিকলাল তাঁহার কেনা গোলাম হইয়াছে। পক্ষান্তরে, নির্ম্মল চঞ্চলকুমারীর দুঃখ শুনিয়া অতিশয় মর্ম্মাহত হইল এবং চঞ্চলকুমারীর পিতা-মাতা, রাজসিংহ এবং চঞ্চলকুমারীর উপর অতিশয় বিরক্ত হইল। চঞ্চলকুমারীকে সে মহারাণী বলিয়া ডাকিতে অস্বীকৃত হইল এবং মহারাণার সাক্ষাৎ পাইলে তাঁহাকে দুই কথা শুনাইয়া দিবে, প্রতিজ্ঞা করিল। চঞ্চলকুমারী বলিল, "সে সকল কথা এখন থাক। আমার সঙ্গে আমার একটি চেনা লোক নাই। আত্মীয়-স্বজন কেহ নাই। আমি এ অবস্থায় এখানে থাকিতে পারি না। যদি ভগবান্ তোমাকে মিলাইয়াছেন, তবে আমি তোমাকে ছাড়িব না, তোমাকে আমার কাছে থাকিতে হইবে।"

শুনিয়া প্রথমে নির্ম্মলের বোধ হইল, যেন বুকের উপর পাহাড় ভাঙ্গিয়া পড়িল। এই সে সবে স্বামী পাইয়াছে—নূতন প্রণয়, নূতন সুখ, এ সব ছাড়িয়া কি চঞ্চলকুমারীর কাছে আসিয়া থাকা যায় ? নির্ম্মলকুমারী হঠাৎ সম্মত হইতে পারিল না—কোন মিছা ওজর করিল না—কিন্তু আসল কথা ভাঙ্গিয়াও বলিতে পারিল না। বলিল, "ও-বেলা বলিব।"

চঞ্চলকুমারীর চক্ষে একটু জল আসিল; মনে মনে বলিল, "নির্ম্মলও আমায় ত্যাগ করিল! হে ভগবান্! তুমি যেন আমায় ত্যাগ করিও না!" তার পর চঞ্চলকুমারী একটু হাসিল, বলিল, "নির্ম্মল, তুমি আমার জন্য একা পদব্রজে রূপনগর হইতে চলিয়া আসিয়া মরিতে বসিয়াছিলে! আর আজ! আজ তুমি স্বামী পাইয়াছ!"

নির্ম্মল অধোবদন হইল। আপনাকে শত ধিক্কার দিল; বলিল, "আমি ওবেলা আসিব, যাহাকে মালিক করিয়াছি, তাহাকে একবার

---

* রাণাদিগের কুলদেবতা—মহাদেব।
† অবরোধ।

জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। আর একটা মেয়ে ঘাড়ে পড়িয়াছে তাহার একটা ব্যবস্থা করিতে হইবে।"

চঞ্চল। মেয়ে না হয় এখানে আনলে?

নির্ম্মল। সে খ্যান্‌-খ্যান্‌ প্যান্‌-প্যান্‌ এখানে কাজ নাই। একটা পাতার মতন পিসী আছে—সেইটাকে ডাকিয়া বাড়ীতে বসাইয়া আসিব।

এই সকল পরামর্শের পর নির্ম্মলকুমারী বিদায় লইল। গৃহে গিয়া মাণিকলালকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইল। মাণিকলালও নির্ম্মলকে বিদায় দিতে বড় কষ্ট বোধ করিল। কিন্তু সে নিতান্ত প্রভুভক্ত, আপত্তি করিল না। পিসীমা আসিয়া কন্যাটির ভার লইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সে প্রয়োজন কি?

নির্ম্মল শিবিকারোহণে দাসদাসী সঙ্গে লইয়া রাণার অন্তঃপুরাভিমুখে চলিতেছে। পথিমধ্যে বড় চক বা চৌক। তাহার একটা বাড়ীতে বড় লোকের ভিড়। নির্ম্মলের দোলা বহুমূল্য বস্ত্রে আবৃত ছিল। কিন্তু জনমর্দ্দের শব্দে তিনি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া আবরণ উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেখিলেন। এক জন পরিচারিকাকে ইঙ্গিত করিয়া ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি এ?" শুনিলেন, এক জন বিখ্যাত "জ্যোতিষী" এই বাড়ীতে থাকে। সহস্র সহস্র লোক তাহার কাছে প্রত্যহ গণনা করাইতে আসে। যাহারা গণাইতে আসিয়াছে, তাহারাই ভিড় করিয়াছে। নির্ম্মল আরও শুনিলেন, এই জ্যোতিষী সকল প্রকার প্রশ্ন গণিতে পারে এবং যাহাকে যাহা বলিয়া দিয়াছে, তাহা ঠিক ফলিয়াছে। নির্ম্মল তখন দাসীদিগকে বলিলেন, "সঙ্গের পাইকদিগকে বল, লোক সকল সরাইয়া দেয়। আমি ভিতরে গিয়া গণনা করাইব। কিন্তু আমার পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই।"

পাইকদিগের বল্লমের গুঁতায় লোক সকল সরিল—নির্ম্মলের শিবিকা জ্যোতিষীর গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। যে গণাইতে বসিয়াছিল—সে উঠিয়া গেলে নির্ম্মল প্রশ্নকর্ত্তার আসনে বসিল। জ্যোতিষীকে প্রণাম করিয়া কিঞ্চিৎ দর্শনী অগ্রিম দিল। জ্যোতিষী জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, তুমি কি গণাইবে?"

নির্ম্মল বলিল, "আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিব, তাহা গণিয়া বলিয়া দিন।"

জ্যোতিষী। প্রশ্ন। ভাল, বল।

নির্ম্মল বলিল, "আমার এক প্রিয়সখী আছেন।"

জ্যোতিষী একটু কি লিখিল। বলিল, "তার পর?"

নির্ম্মল বলিল, "তিনি অবিবাহিতা।"

জ্যোতিষী আবার লিখিল। বলিল, "তার পর?"

নির্ম্মল। তাঁর কবে বিবাহ হইবে?

জ্যোতিষী আবার লিখিল। পরে খড়ি পাতিতে লাগিল। লগ্নসারণী দেখিল। শঙ্কুপট্ট দেখিল। নির্ম্মলকে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল। অনেক অঙ্ক কষিল। অনেক পুথি খুলিয়া পড়িল। শেষে নির্ম্মলের দিকে চাহিয়া ঘাড় নাড়িল।

নির্ম্মল বলিল, "বিবাহ হইবে না?"

জ্যোতিষী। প্রায় সেইরূপ উত্তর শাস্ত্রে লেখে।

নির্ম্মল। প্রায় কেন?

জ্যোতিষী। যদি সসাগরা পৃথিবীপতির মহিষী আসিয়া কখনও তোমার সখীর পরিচর্য্যা করে, তখন বিবাহ হইবে। নহিলে হইবে না। তাহা অসম্ভব বলিয়াই বলিতেছি, বিবাহ হইবে না।

"অসম্ভব বটে!" বলিয়া নির্ম্মল জ্যোতিষীকে আরও কিছু দিয়া চলিয়া গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

আগুন জ্বালিবার প্রস্তাব

চঞ্চলকুমারীর হরণে ভারতবর্ষে যে আগুন জ্বলিল, তাহাতে হয় মোগল-সাম্রাজ্য নয় রাজপুতানা ধ্বংস প্রাপ্ত হইত। কেবল মহারাণা রাজসিংহের দয়া-দাক্ষিণ্যের জন্য এতটা হইতে পারে নাই। সেই আশ্চর্য্য ঘটনা-পরম্পরা বিবৃত করা উপন্যাসগ্রন্থের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। তবে কিছু কিছু না বলিলেও এই গ্রন্থের পরিশিষ্ট বুঝা যাইবে না।

রূপনগরের রাজকুমারীর হরণ-সংবাদ দিল্লীতে আসিয়া পৌঁছিল। দিল্লীতে অত্যন্ত কোলাহল পড়িয়া গেল। বাদশাহ রাগে স্বসৈন্যের নেতৃগণের মধ্যে কাহাকে পদচ্যুত, কাহাকে বা আবদ্ধ, কাহাকে বা নিহত করিলেন। কিন্তু যাহারা প্রধান অপরাধী—চঞ্চলকুমারী এবং রাজসিংহ—তাঁহাদের

তত শীঘ্র দণ্ডিত করা দুঃসাধ্য। কেন না, যদিও মেবার ক্ষুদ্র রাজ্য, তথাপি বড় "কঠিন ঠাঁই।" চারিদিকে দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বতমালার প্রাচীর, রাজপুতেরা সকলেই বীরপুরুষ এবং রাজসিংহ হিন্দু বীরচূড়ামণি। এ অবস্থায় রাজপুত কি করিতে পারে, তাহা প্রতাপসিংহ আকব্বর শাহকেও শিখাইয়াছিল। দুনিয়ার বাদশাহকে কিল খাইয়া কিছুদিনের জন্য কিল চুরি করিতে হইল।

কিন্তু ঔরঙ্গজেব কাহারও উপর রাগ সহ্য করিবার লোক নহেন। হিন্দুর অনিষ্ট করিতে তাঁহার জন্ম, হিন্দুর অপরাধ বিশেষ অসহ্য। একে হিন্দু মারহাট্টা পুনঃ পুনঃ অপমান করিয়াছে, আবার রাজপুত অপমান করিল। মারহাট্টার বড় কিছু করিতে পারেন নাই, রাজপুতের হঠাৎ কিছু করিতে পারিতেছেন না। অথচ বিষ উদ্গিরণ করিতে হইবে। অতএব রাজসিংহের অপরাধে সমস্ত হিন্দুজাতির পীড়নই অভিপ্রেত করিলেন।

আমরা এখন ইন্‌কম্ টেক্সকে অসহ্য মনে করি, তাহার অধিক অসহ্য একটা "টেক্স" মুসলমানি আমলে ছিল। তাহার অধিক অসহ্য—কেন না, এই "টেক্স" মুসলমানকে দিতে হইত না; কেবল হিন্দুকেই দিতে হইত। ইহার নাম জেজেয়া। পরম রাজনীতিজ্ঞ আকব্বর বাদশাহ ইহার অনিষ্টকারিতা বুঝিয়া ইহা উঠাইয়া দিয়াছিলেন। সেই অবধি ইহা বন্ধ ছিল। এক্ষণে হিন্দুদ্বেষী ঔরঙ্গজেব তাহা পুনর্ব্বার স্থাপন করিয়া হিন্দুর যন্ত্রণা বাড়াইতে প্রবৃত্ত হইলেন।

ইতিপূর্ব্বে বাদশাহ, জেজেয়ার পুনরাবির্ভাবের আজ্ঞা প্রচারিত করিয়াছেন, কিন্তু এক্ষণে বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ হইল। হিন্দুরা ভীত, অত্যাচারগ্রস্ত, মর্ম্মপীড়িত হইল। যুক্তকরে সহস্র সহস্র হিন্দু বাদশাহের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিল; কিন্তু ঔরঙ্গজেবের ক্ষমা ছিল না। শুক্রবারে যখন বাদশাহ মস্‌জীদে ঈশ্বরকে ডাকিতে যান, তখন লক্ষ হিন্দু সমবেত হইয়া তাঁহার নিকট রোদন করিতে লাগিল। দুনিয়ার বাদশাহ দ্বিতীয় হিরণ্যকশিপুর মত আজ্ঞা দিলেন, "হস্তীগুলা পদতলে ইহাদিগকে দলিত করুক।" সেই বিষম জনমর্দ্দ হস্তিপদতলে দলিত হইয়া নিবারিত হইল।

ঔরঙ্গজেবের অধীন ভারতবর্ষ জেজেয়া দিল। ব্রহ্মপুত্র হইতে সিন্ধুতীর পর্য্যন্ত হিন্দুর দেবপ্রতিমা চূর্ণীকৃত, বহুকালের গগনস্পর্শী দেবমন্দির সকল ভগ্ন ও বিলুপ্ত হইতে লাগিল, তাহার স্থানে মুসলমানের মসজীদ প্রস্তুত হইতে লাগিল। কাশীতে বিশ্বেশ্বরের মন্দির গেল; মথুরায় কেশবদেবের মন্দির গেল; বাঙ্গালায় বাঙ্গালীর যাহা কিছু স্থাপত্য কীর্ত্তি ছিল, চিরকালের জন্য তাহা লুপ্ত হইল।

ঔরঙ্গজেব এক্ষণে আজ্ঞা দিলেন যে, রাজপুতানীয় রাজপুতেরাও জেজেয়া দিবে। রাজপুতানার রাজারা তাঁহার প্রজা নহে, তথাপি হিন্দু বলিয়া তাহাদের উপর এ দণ্ডাজ্ঞা প্রচারিত হইল। রাজপুতেরা প্রথমে অস্বীকৃত হইল; কিন্তু উদয়পুর ভিন্ন আর সর্ব্বত্র রাজপুতানা কর্ণধারবিহীন নৌকার ন্যায় অচল। জয়পুরের জয়সিংহ—যাঁহার বাহুবল মোগল-সাম্রাজ্যের একটি প্রধান অবলম্বন ছিল, তিনি এক্ষণে গতায়ু; বিশ্বাসঘাতক বন্ধুহন্তা ঔরঙ্গজেবের কৌশলে বিষপ্রয়োগ দ্বারা তাঁহার মৃত্যু সাধিত হইয়াছিল। তাঁহার বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্র দিল্লীতে আবদ্ধ। সুতরাং জয়পুর জেজেয়া দিল।

যোধপুরের যশোবন্ত সিংহও লোকান্তরগত। তাঁহার রাণী এখন রাজপ্রতিনিধি। স্ত্রীলোক হইয়াও তিনি বাদশাহের কর্ম্মচারীদিগকে হাঁকাইয়া দিলেন। ঔরঙ্গজেব তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইলেন। স্ত্রীলোক যুদ্ধের ধমকে ভয় পাইলেন। রাণী জেজেয়া দিলেন না, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে রাজ্যের কিয়দংশ ছাড়িয়া দিলেন।

রাজসিংহ জেজেয়া দিলেন না। কিছুতেই দিবেন না; সর্ব্বস্ব পণ করিলেন। জেজেয়া সম্বন্ধে ঔরঙ্গজেবকে একখানি পত্র লিখিলেন। রাজপুতানার ইতিহাসবেত্তা সেই পত্র সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "The Rana remonstrated by letter, in the name of the nation of which he was the head, in a style of such uncompromising dignity, such lofty yet temperate resolve, so much of soul-stirring rebuke mingled with a boundless and tolerating benevolence, such elevating excess of the Divinity with such pure philanthropy, that it may challenge competition with any epistolary production of any age, clime or condition." * পত্রখানি বাদশাহের ক্রোধানলে ঘৃতাহুতি দিল।

বাদশাহ রাজসিংহের উপর আজ্ঞা প্রচার করিলেন,—জেজেয়া ত দিতে হইবেই, তাহা ছাড়া রাজ্যে গোহত্যা করিতে দিতে হইবে এবং দেবালয়-

* Tod's 'Rajasthan' vol 1. Page 381.

সকল ভাঙ্গিতে হইবে। রাজসিংহ যুদ্ধের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

ঔরঙ্গজেবও যুদ্ধের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। এরূপ ভয়ানক যুদ্ধের উদ্যোগ করিলেন যে, তিনি কখন এমন আর করেন নাই। চীনের সম্রাট, কি পারস্যের রাজা তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইলে যে উদ্যোগ করিতেন না, এই ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজার বিরুদ্ধে সেই উদ্যোগ করিলেন। অর্দ্ধেক আসিয়ার অধিপতি সের (Xerxes) যেমন ক্ষুদ্র গ্রীসরাজ্য জয় করিবার জন্য আয়োজন করিয়াছিলেন, সপ্তদশ শতাব্দীর সের, ক্ষুদ্র রাজা রাণা রাজসিংহকে পরাজয় করিবার জন্য সেইরূপ উদ্যোগ করিয়াছিলেন। এই দুইটি ঘটনা পরস্পর তুলনীয়, ইহার তৃতীয় তুলনা আর নাই। আমরা গ্রীক ইতিহাস মুখস্থ করিয়া মরি—রাজসিংহের ইতিহাসের কিছুই জানি না, আধুনিক শিক্ষার সুফল।

ষষ্ঠ খণ্ড

অগ্নির উৎপাদন

প্রথম পরিচ্ছেদ

অরণিকাষ্ঠ—উর্ব্বশী

রাজসিংহ যে তীব্রঘাতী পত্র ঔরঙ্গজেবকে লিখিয়াছিলেন, তৎপ্রেরণ হইতে এই অগ্ন্যুৎপাদন-খণ্ড আরম্ভ করিতে হইবে। সেই পত্র ঔরঙ্গজেবের কাছে কে লইয়া যাইবে, তাহার মীমাংসা কঠিন হইল। কেন না, যদিও দূত অবধ্য, তথাপি পাপে কুণ্ঠাশূন্য ঔরঙ্গজেব অনেক দূত বধ করিয়াছিলেন, ইহা প্রসিদ্ধ। অতএব প্রাণের শঙ্কা রাখে, অন্ততঃ এমন সুচতুর নয় যে আপনার প্রাণ বাঁচাইতে পারে, এমন লোককে পাঠাইতে রাজসিংহ ইচ্ছুক হইলেন না। তখন মাণিকলাল আসিয়া প্রার্থনা করিল যে, আমাকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করা হউক। রাজসিংহ উপযুক্ত পাত্র পাইয়া তাহাকেই এই কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন।

এ সংবাদ শুনিয়া চঞ্চলকুমারী নির্ম্মলকুমারীকে ডাকিলেন। বলিলেন, "তুমিও কেন তোমার স্বামীর সঙ্গে যাও না?"

নির্ম্মল বিস্মিত হইয়া বলিল, "কোথা যাব? দিল্লী? কেন?"

চঞ্চল। একবার বাদশাহের রঙমহালটা বেড়াইয়া আসিবে।

নির্ম্মল। শুনিয়াছি, সে না কি নরক।

চঞ্চল। নরকে কি কখন তোমার যাইতে হইবে না? তুমি গরীব বেচারা মাণিকলালের উপর যে দৌরাত্ম্য কর, তাহাতে তোমার নরক হইতে নিস্তার নাই।

নির্ম্মল। কেন, সুন্দর দেখে বিয়ে করেছিল কেন?

চঞ্চল। সে বুঝি তোমার গাছতলায় মরিয়া পড়িয়া থাকিতে সাধিয়াছিল?

নির্ম্মল। আমি ত আর তাকে ডাকি নাই। এখন সে ভূতের বোঝা বহিয়া দিল্লী গিয়া কি করিব, বলিয়া দাও।

চঞ্চল। উদিপুরীকে নিমন্ত্রণ-পত্র দিয়া আসিতে হইবে।

নির্ম্মল। কিসের?

চঞ্চল। তামাকু সাজার।

নির্ম্মল। বটে, কথাটা মনে ছিল না। পৃথিবীশ্বরী তোমার পরিচর্য্যা না করিলে তোমারও ভূতের বোঝা মিলবে না।

চঞ্চল। দূর হ পাপিষ্ঠা। আমিই এখন ভূতের বোঝা। হয়, বাদশাহের বেগম আমার দাসী হইবে—নহিলে আমাকে বিষ খাইতে হইবে। গণকের ত এই গণনা।

নির্ম্মল। তা পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণ করিলেই কি বেগম আসিবে?

চঞ্চল। না, আমার উদ্দেশ্য বিবাদ বাধান। আমার বিশ্বাস, বিবাদ বাধিলেই মহারাণার জয় হইবে। আর বেগম বাঁদী হইবে। আর উদ্দেশ্য, তুমি বেগমদিগকে চিনিয়া আসিবে।

নির্ম্মল। তা কি প্রকারে এ কাজ পারিব, বলিয়া দাও।

চঞ্চল। আমি বলিয়া দিতেছি। তুমি জান যে, যোধপুরী বেগমের পাঞ্জাটা আমার কাছে আছে। সেই পাঞ্জা তুমি লইয়া যাও। তাহার গুণে তুমি রঙ্‌মহালে প্রবেশ করিতে পারিবে এবং তাহার গুণে তুমি যোধপুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে পারিবে। তাঁহাকে সবিশেষ বৃত্তান্ত বলিবে। আমি উদিপুরীর নামে যে পত্র দিতেছি, তাহা তাঁহাকে দেখাইবে। তিনি ঐ পত্র কোন প্রকারে উদিপুরীর কাছে পাঠাইয়া দিবেন। যেখানে নিজের বুদ্ধিতে কুলাইবে না, সেখানে স্বামীর বুদ্ধি হইতে কিছু ধার লইও।

নির্ম্মল। ইঃ। আমি যাই মেয়ে, তাই তার সংসার চলে।

হাসিতে হাসিতে নির্ম্মলও পত্র লইয়া চলিয়া গেল এবং যথাকালে স্বামীর সঙ্গে, উপযুক্ত লোকজন সমভিব্যাহারে দিল্লীযাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অরণিকাষ্ঠ—পুরূরবা

উদ্যোগ মাণিকলালেরই বেশী। তাহার একটা নমুনা সে এক দিন নির্ম্মলকুমারীকে দেখাইল। নির্ম্মল সবিস্ময়ে দেখিল, তাহার কাটা আঙ্গুলের স্থানে আবার নূতন আঙ্গুল হইয়াছে। সে মাণিকলালকে জিজ্ঞাসা করিল, "এ আবার কি?"

মাণিকলাল বলিল, "গড়াইয়াছি।"

নির্ম্মল। কিসে?

মাণিক। হাতীর দাঁতে। কল-কব্জা বেমালুম লাগাইয়াছি, তাহার উপর ছাগলের পাতলা চামড়া মুড়িয়া আমার গায়ের মত রং করাইয়াছি। ইচ্ছানুসারে খোলা যায়, পরা যায়।

নির্ম্মল। এর দরকার?

মাণিক। দিল্লীতে জানিতে পারিবে। দিল্লীতে ছদ্মবেশের দরকার হইতে পারে। আঙ্গুল-কাটার ছদ্মবেশ চলে না। কিন্তু দুই রকম হইলে খুব চলে।

নির্ম্মল হাসিল। তার পর মাণিকলাল একটি পিঞ্জরমধ্যে একটা পোষা পায়রা লইল। এই পারাবতটি অতিশয় সুশিক্ষিত। দৌত্যকার্য্যে সুনিপুণ। যাঁহারা আধুনিক ইউরোপীয় যুদ্ধে "Carrier-pigeon" গুলির গুণ অবগত আছেন, তাঁহারা ইহা বুঝিতে পারিবেন। পূর্ব্বে ভারতবর্ষে এই জাতীয় শিক্ষিত পারাবতের ব্যবহার চলিত ছিল। পারাবতের গুণ মাণিকলাল সবিশেষ নির্ম্মলকুমারীকে বুঝাইয়া দিল।

রীতি ছিল যে, দিল্লীর বাদশাহের নিকট দূত পাঠাইতে হইলে, কিছু উপঢৌকন সঙ্গে পাঠাইতে হয়। ইংলণ্ড, পর্ত্তুগাল প্রভৃতির রাজারাও তাহা পাঠাইতেন। রাজসিংহও কিছু দ্রব্যসামগ্রী মাণিকলালের সঙ্গে পাঠাইলেন। তবে অপ্রণয়ের দৌত্য, বেশী সামগ্রী পাঠাইলেন না।

অন্যান্য দ্রব্যের মধ্যে শ্বেতপ্রস্তরনির্ম্মিত, মণিরত্নখচিত, কারুকার্য্যযুক্ত কতকগুলি সামগ্রী পাঠাইলেন। মাণিকলাল তাহা পৃথক্ বাহনে বোঝাই করিয়া লইলেন।

অবধারিত দিবসে রাণার আজ্ঞালিপি ও পত্র লইয়া, নির্ম্মলকুমারী সমভিব্যাহারে, দাসদাসী, লোকজন, হাতী-ঘোড়া, উট-বলদ, শকট, এক্কা, দোলা, রেশালা প্রভৃতি সঙ্গে লইয়া বড় ঘটার সহিত মাণিকলাল যাত্রা করিল। যাইতে অনেক দিন লাগিল। দিল্লীর কয় ক্রোশমাত্র বাকি থাকিতে, মাণিকলাল তাম্বু ফেলিয়া নির্ম্মলকুমারীকে ও অন্যান্য লোকজনকে তথায় রাখিয়া, এক জন মাত্র বিশ্বাসী লোক সঙ্গে লইয়া দিল্লী চলিল। আর সেই পাতরের সামগ্রীগুলিও সঙ্গে লইল। গড়া আঙ্গুল খুলিয়া নির্ম্মলকুমারীর কাছে রাখিয়া গেল, বলিল, "কাল আসিব।"

নির্ম্মল জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপার কি?"

মাণিকলাল একখানা পাতরের জিনিষ নির্ম্মলকে দেখাইয়া, তাহাতে একটি ক্ষুদ্র চিহ্ন দেখাইল। বলিল, "সবগুলিতেই এইরূপ চিহ্ন দিয়াছি।"

নির্ম্মল। কেন?

মাণিক। দিল্লীতে তোমাতে আমাতে ছাড়াছাড়ি অবশ্য হইবে। তার পর যদি মোগলের প্রতিবন্ধকতায়, পরস্পরের সন্ধান না পাই, তাহা হইলে তুমি পাতরের জিনিষ কিনিতে বাজারে পাঠাইও, যে দোকানের জিনিষে তুমি এই চিহ্ন দেখিবে, সেই দোকানেই আমার সন্ধান করিও।

এইরূপ পরামর্শ আঁটিয়া মাণিকলাল বিশ্বাসী লোকটি ও প্রস্তরনির্ম্মিত দ্রব্যগুলি লইয়া দিল্লী গেল সেখানে গিয়া একখানা ঘরভাড়া লইয়া, পাতরের দোকান সাজাইয়া ঐ সমভিব্যাহারী লোকটিকে দোকানদার সাজাইয়া শিবিরে ফিরিয়া আসিল।

ে পরে সমস্ত ফৌজ ও রেশালা এবং নির্ম্মল-কুমারীকে লইয়া পুনর্ব্বার দিল্লী গেল এবং সেখানে যথারীতি শিবির সংস্থাপন করিয়া বাদশাহের নিকট সংবাদ পাঠাইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অগ্নিচয়ন

অপরাহ্ণে ঔরঙ্গজেব দরবারে আসীন হইলে, মাণিকলাল সেখানে গিয়া হাজির হইলেন। দিল্লীর বাদশাহের আমখাস অনেক গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে, এখানে তাহার বিস্তারিত বর্ণনা আমার অভিপ্রেত নহে। মাণিকলাল প্রথম সোপানাবলী আরোহণ করিয়া একবার কুর্ণিশ করিলেন। তার পর উঠিতে হইল। এক পদ উঠিয়া আবার কুর্ণিশ—আবার এক পদ উঠিয়া আবার কুর্ণিশ—এইরূপ তিনবার উঠিয়া তক্তেতাউস্-সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। মাণিকলাল অভিবাদন করিয়া রাজসিংহ-প্রেরিত সামান্য উপহার বাদশাহের সম্মুখে অর্পিত করিলেন নজরের অনর্ঘ্যতা দেখিয়া ঔরঙ্গজেব রুষ্ট হইলেন, কিন্তু মুখে কিছু বলিলেন না। প্রেরিত দ্রব্যের মধ্যে দুইখানি তরবারি ছিল; একখানি কোষে আবৃত আর একখানি নিষ্কোষ। ঔরঙ্গজেব নিষ্কোষ অসি গ্রহণ করিয়া আর সব উপহার পরিত্যাগ করিলেন।

মাণিকলাল রাজসিংহের পত্র দিলেন। পত্রার্থ অবগত হইয়া ঔরঙ্গজেব ক্রোধে অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি ক্রুদ্ধ হইলে সচরাচর বাহিরে কোপ প্রকাশ করিতেন না। তখন মাণিকলালকে বিশেষ সমাদরের সহিত জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন। তাঁহাকে উত্তম বাসস্থান দিবার জন্য বখ্‌শীকে আদেশ করিলেন এবং আগামী কল্য মহারাণার পত্রের উত্তর দিবেন বলিয়া মাণিকলালকে বিদায় করিলেন।

তখনই দরবার বরখাস্ত হইল। দরবার হইতে উঠিয়া আসিয়াই ঔরঙ্গজেব মাণিকলালের বধের আজ্ঞা করিলেন। বধের আজ্ঞা হইল, কিন্তু যাহারা মাণিকলালকে বধ করিবে, তাহারা মাণিকলালকে খুঁজিয়া পাইল না। যাহাদিগের প্রতি মাণিকলালের সমাদরের আদেশ হইয়াছিল, তাহারাও খুঁজিয়া পাইল না। দিল্লীর সর্ব্বত্র খুঁজিল, কোথাও মাণিকলালকে পাওয়া গেল না। তাহার বধের আজ্ঞা প্রচার হইবার আগেই মাণিকলাল সরিয়া পড়িয়াছিল। বলা বাহুল্য যে, যখন মাণিকলালের জন্য এত খোঁজ তল্লাস হইতেছিল, তখন সে আপনার পাতড়ের দোকানে ছদ্মবেশে সওদাগরী করিতেছিল। আহদীরা মাণিকলালকে না পাইয়া তাঁহার শিবিরে যাহাকে যাহাকে পাইল, তাহাকে তাহাকে ধরিয়া কোতোয়ালের নিকট লইয়া গেল।

কোতোয়াল অপর লোকদিগের কাছে কিছু সন্ধান পাইলেন না, ভয়প্রদর্শন ও মারপিটেও কিছুই হইল না, তাহারা কোন সন্ধান জানে না, কি প্রকারে বলিবে?

কোতোয়াল শেষ নির্ম্মলকুমারীকে জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ করিলেন—পরদানশীন বলিয়া তাঁহাকে এতক্ষণ তফাৎ রাখা হইয়াছিল। কোতোয়াল এখন নির্ম্মলকুমারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন। সে উত্তর করিল, "রাণার এল্‌চিকে আমি চিনি না।"

কোতোয়াল। তাহার নাম মাণিকলাল সিংহ।

নির্ম্মল। মাণিকলাল সিংহকে আমি চিনি না।

কো। তুমি রাণার এল্‌চির সঙ্গে উদয়পুর হইতে আস নাই?

নি। উদয়পুর আমি কখন দেখিও নাই।

কো। তবে তুমি কে?

নি। আমি জুনাব যোধপুরী বেগমের হিন্দু বাঁদী।

কো। জুনাব যোধপুরী বেগমের বাঁদীরা মহালের বাহিরে আসে না।

নি। আমিও কখন আসি নাই, এইবার হিন্দু এল্‌চি আসিয়াছে শুনিয়া বেগম সাহেবা আমাকে তাহার তাম্বুতে পাঠাইয়া দিয়াছেন।

কো। সে কি? কেন?

নি। কিষণজীর চরণামৃতের জন্য, তাহা সকল রাজপুত রাখিয়া থাকে।

কো। তোমাকে ত একা দেখিতেছি। তুমি মহালের বাহিরেই বা আসিলে কি প্রকারে?

নি। ইহার বলে।

এই বলিয়া নির্ম্মলকুমারী যোধপুরী বেগমের পাঞ্জা বস্ত্রমধ্য হইতে বাহির করিয়া দেখাইল। দেখিয়া, কোতোয়াল তিন সেলাম করিল। নির্ম্মলকে বলিল, "তুমি যাও, তোমাকে কেহ আর কিছু বলিবে না।"

নির্ম্মল তখন বলিল, "কোতোয়াল সাহেব, আর একটু মেহেরবাণী করিতে হইবে। আমি কখন মহালের বাহির হই নাই। আজ বড় ধর-পাকড়

দেখিয়া আমার বড় ভয় হইয়াছে। আপনি যদি দয়া করিয়া একটি আহদী কি পাইক সঙ্গে দেন, যে আমাকে মহাল পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া দিয়া আসে, তাহা হইলে বড় ভাল হয়।"

কোতোয়াল তখনই এক জন অস্ত্রধারী রাজপুরুষকে উপযুক্ত উপদেশ দিয়া নির্ম্মলকে বাদশাহের অন্তঃপুরে পাঠাইয়া দিলেন। বাদশাহের প্রধানা মহিষীর পাঞ্জা দেখিয়া খোজারা কেহ কিছু আপত্তি করিল না, নির্ম্মলকুমারী একটু চাতুরীর সহিত জিজ্ঞাসাবাদ করিতে করিতে যোধপুরী বেগমের সন্ধান পাইল। তাঁহাকে প্রণাম করিয়া সেই পাঞ্জা দেখাইল। দেখিবামাত্র সতর্ক হইয়া রাজমহিষী তাহাকে নিভৃতে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন। বলিলেন, "তুমি এই পাঞ্জা কোথায় পাইলে?"

নির্ম্মলকুমারী বলিল, "আমি সমস্ত কথা সবিস্তার বলিতেছি।"

নির্ম্মলকুমারী প্রথমে আপনার পরিচয় দিল। তার পর দেবীর রূপনগরে যাওয়ার কথা, সে যাহা বলিয়াছিল, সে কথা, পাঞ্জা দেওয়ার কথা, তার পর চঞ্চল ও নির্ম্মলের যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা বলিল। মাণিকলালের পরিচয় দিল। মাণিকলালের সঙ্গে যে নির্ম্মল আসিয়াছিল, চঞ্চলকুমারীর পত্র লইয়া আসিয়াছিল, তাহা বলিল। পরে দিল্লীতে আসিয়া যে প্রকারে বিপদে পড়িয়াছিল, তাহা বলিল, যে প্রকারে উদ্ধার পাইল, যে কৌশলে মহালমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা বলিল। পরে চঞ্চলকুমারী উদিপুরীর জন্য যে পত্র দিয়াছিলেন, তাহা দিল। শেষ বলিল, "এই পত্র কি প্রকারে উদিপুরী বেগমের কাছে পৌঁছাইতে পারিব, সেই উপদেশ পাইবার জন্যই আপনার কাছে আসিয়াছি।"

রাজমহিষী বলিলেন, "তাহার কৌশল আছে। জেব-উন্নিসা বেগমের হুকুমের সাপেক্ষ, তাহা এখন চাহিতে গেলে গোলযোগ হইবে, রাত্রে যখন এই পাপিষ্ঠারা শরাব খাইয়া বিহ্বল হইবে, তখন সে উপায় হইবে। এখন তুমি আমার হিন্দু বাঁদী-দিগের মধ্যে থাক। হিন্দুর অন্নজল খাইতে পাইবে।"

নির্ম্মলকুমারী সম্মত হইলেন। বেগম সেইরূপ আজ্ঞা প্রচার করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সমিধ্‌ সংগ্রহ—উদিপুরী

রাত্রি একটু বেশী হইলে যোধপুরী বেগম নির্ম্মলকে উপযুক্ত উপদেশ দিয়া, এক জন তুর্কী (তাতারী) প্রহরিণী সঙ্গে দিয়া জেব-উন্নিসার কাছে পাঠাইয়া দিলেন, নির্ম্মল জেব-উন্নিসার কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া আতর-গোলাপের, পুষ্পরাশির এবং তামাকুর সদ্‌গন্ধে বিমুগ্ধ হইল। নানাবিধ রত্নরাজিখচিত হর্ম্ম্যতল, শয্যাভরণ এবং গৃহাভরণ দেখিয়া বিস্মিত হইল। সর্ব্বাপেক্ষা জেব-উন্নিসার বিচিত্র, রত্নপুষ্পমিশ্রিত অলঙ্কারপ্রভায়, চন্দ্রসূর্য্য-তুল্য উজ্জ্বল সৌন্দর্য্যপ্রভায় চমকিত হইল। এই সকলে সজ্জিতা পাপিষ্ঠা জেব-উন্নিসাকে দেবলোকবাসিনী অপ্সরা বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

কিন্তু অপ্সরার তখন চক্ষু ঢুলু ঢুলু; মুখ রক্তবর্ণ; চিত্ত বিভ্রান্ত; দ্রাক্ষাসুধার তখন পূর্ণাধিকার।

নির্ম্মলকুমারী তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইলে, তিনি জড়িতরসনায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুই?"

নির্ম্মলকুমারী বলিল, "আমি উ- পুরের রাজমহিষীর দূতী।"

জেব। মোগল বাদশাহের তক্তেতাউস লইয়া যাইতে আসিয়াছিস্?

নি। না, চিঠি লইয়া আসিয়াছি।

জেব। চিঠি কি হইবে? পুড়াইয়া রোশনাই করিবি?

নি। না, উদিপুরী বেগম সাহেবাকে দিব।

জেব। সে বাঁচিয়া আছে না মরিয়া গিয়াছে?

নি। বোধ হয় বাঁচিয়া আছেন।

জেব। না, সে মরিয়া গিয়াছে। এ দাসীটাকে কেহ তাহার কাছে লইয়া যা।

জেব-উন্নিসার উন্মত্ত প্রলাপ-বাক্যের উদ্দেশ্য যে, ইহাকে যমের বাড়ী পাঠাইয়া দাও। কিন্তু তাতারী প্রহরিণী তাহা বুঝিল না। সাদা অর্থ বুঝিয়া নির্ম্মল-কুমারীকে উদিপুরী বেগমের কাছে লইয়া গেল।

সেখানে নির্ম্মল দেখিল, উদিপুরীর চক্ষু উজ্জ্বল, হাস্য উচ্চ, মেজাজ বড় প্রফুল্ল। নির্ম্মল খুব একটা বড় সেলাম করিল। উদিপুরী জিজ্ঞাসা করিল, "কে আপনি?"

নির্ম্মল উত্তর করিল, "আমি উদয়পুরের রাজমহিষীর দূতী। চিঠি লইয়া আসিয়াছি।"

উদিপুরী বলিল, "না না। তুমি ফার্সী মুলুকের বাদশাহ। মোগল বাদশাহের হাত হইতে আমাকে কাড়িয়া লইতে আসিয়াছ।"

নির্ম্মলকুমারী হাসি সামলাইয়া লইয়া চঞ্চলের পত্রখানি উদিপুরীর হাতে দিল। উদিপুরী তাহা পড়িবার ভাণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "কি লিখিতেছে? লিখিতেছে, 'অয় নাজনী! পিয়ারী মেরে! তোমার সুরৎ ও দৌলত শুনিয়া আমি একেবারেই বেহোস ও দেওয়ানা হইয়াছি। তুমি শীঘ্র আসিয়া আমার কলিজা ঠাণ্ডা করিবে।' আচ্ছা, তা করিব। হুজুরের সঙ্গে আলবৎ যাইব। আপনি একটু অপেক্ষা করুন—আমি একটু শরাব খাইয়া লই। আপনি একটু শরাব মোলাহেজা করিবেন? আচ্ছা শরাব! ফেরেঙ্গের এলচি ইহা নজর দিয়াছে। এমন শরাব আপনার মুলুকেও পয়দা হয় না।"

উদিপুরী পিয়ালা মুখে তুলিলেন। সেই অবসরে নির্ম্মলকুমারী বহির্গত হইয়া যোধপুরী বেগমের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং যোধপুরীর জিজ্ঞাসামত যেমন যেমন ঘটিয়াছিল, তাহা বলিল। শুনিয়া যোধপুরী বেগম হাসিয়া বলিল, "কাল পত্রখানা ঠিক হইয়া পড়িবে। তুমি এই বেলা পলায়ন কর। নচেৎ কাল একটা গণ্ডগোল হইতে পারে। আমি তোমার সঙ্গে এক জন বিশ্বাসী খোজা দিতেছি। সে তোমাকে মহালের বাহির করিয়া তোমার স্বামীর শিবিরে পৌঁছাইয়া দিবে। সেখানে যদি তোমার আত্মীয় স্বজন কাহাকেও পাও, তার সঙ্গে আজই দিল্লীর বাহিরে চলিয়া যাইও। যদি শিবিরে কাহাকেও না পাও, তবে ইহার সঙ্গে দিল্লীর বাহিরে যাইও। তোমার স্বামী বোধ হয়, দিল্লী ছাড়াইয়া কোথাও তোমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। পথে তাঁহার সঙ্গে যদি সাক্ষাৎ না হয়, তাহা হইলে এই খোজাই তোমাকে উদয়পুর পর্য্যন্ত রাখিয়া আসিবে। খরচপত্র তোমার কাছে না থাকে, তবে তাহাও আমি দিতেছি। কিন্তু সাবধান। আমি ধরা না পড়ি।"

নির্ম্মল বলিল, "হজরৎ! সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি রাজপুতের মেয়ে।"

তখন যোধপুরী বনাসী নামে তাঁহার বিশ্বাসী খোজাকে ডাকাইয়া যাহা করিতে হইবে, তাহা বুঝাইয়া বলিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখনই যাইতে পারিবে ত?"

বনাসী বলিল, "তা পারিব; কিন্তু বেগমসাহেবার দস্তখতি একখানা পরওয়ানা না পাইলে এত করিতে সাহস হইতেছে না।"

যোধপুরী তখন বলিলেন, "যেরূপ পরওয়ানা চাহি, লিখাইয়া আন, আমি বেগম সাহেবার দস্তখত করাইতেছি।"

খোজা পরওয়ানা লিখাইয়া আনিল। তাহা সেই তাতারী প্রহরিণীর হাতে দিয়া, রাজমহিষী বলিলেন, "ইহাতে বেগম সাহেবার দস্তখত করাইয়া আন।"

প্রহরিণী জিজ্ঞাসা করিল, "যদি জিজ্ঞাসা করে কিসের পরওয়ানা?"

যোধপুরী বলিলেন, "বলিও, আমার কোতলের পরওয়ানা; কিন্তু কালি-কলম লইয়া যাও। আর পাঞ্জা ছেপ্‌ত করিতে ভুলিও না।"

প্রহরিণী কালি-কলম সহিত পরওয়ানা লইয়া গিয়া জেব-উন্নিসার কাছে ধরিল। জেব-উন্নিসা পূর্ব্বভাবাপন্ন, জিজ্ঞাসা করিল, "কিসের পরওয়ানা?"

প্রহরিণী বলিল, "আমার কোতলের পরওয়ানা।"

জেব। কি চুরি করেছিস্?

প্রহরিণী। হজরৎ উদিপুরী বেগমের পেশওয়াজ।

জেব। আচ্ছা করেছিস্—কোতলের পর পরিস্।

এই বলিয়া বেগম সাহেবা পরওয়ানা দস্তখত করিয়া দিলেন। প্রহরিণী মোহর ছেপ্‌ত করিয়া লইয়া যোধপুরী বেগমকে আনিয়া দিল। বনাসী সেই পরওয়ানা এবং নির্ম্মলকে লইয়া যোধপুরীর মহাল হইতে যাত্রা করিল। নির্ম্মলকুমারী অতি প্রফুল্লমনে খোজার সঙ্গে চলিলেন।

কিন্তু সহসা সে প্রফুল্লতা দূর হইল—রঙমহলের ফটকের নিকট আসিয়া খোজা ভীত, স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল; বলিল, "কি বিপদ্! পালাও! পালাও!" এই বলিয়া খোজা ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সমিধ্ সংগ্রহ—স্বয়ং যম

নির্ম্মল বুঝিল না যে, কেন পলাইতে হইবে। এ দিক্ ও দিক্ নিরীক্ষণ করিল—পলাইবার কারণ কিছুই দেখিতে পাইল না। কেবল দেখিল, ফটকের নিকট পরিণতবয়স্ক শুভ্রবেশ এক জন লোক দাঁড়াইয়া আছে। মনে করিল, এটা কি ভূত-প্রেত যে,

তাই ভয় পাইয়া খোজা পলাইল? নির্ম্মল নিজে ভূতের ভয়ে তেমন কাতর নহে, এ জন্য সে না পলাইয়া ইতস্ততঃ করিতেছিল; ইতিমধ্যে সেই শুভ্রবেশ পুরুষ আসিয়া নির্ম্মলের নিকট দাঁড়াইল। নির্ম্মলকে দেখিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে?"

নির্ম্মল বলিল, "আমি যে হই না কেন?"

শুভ্রবেশী পুরুষ জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে? কোথা যাইতেছিলে?"

নি। বাহিরে।

পুরুষ। কেন?

নি। আমার দরকার আছে।

পু। দরকার ভিন্ন কেহ কিছু করে না, তাহা আমার জানা আছে। কি দরকার?

নি। আমি বলিব না।

পু। তোমার সঙ্গে কে আসিতেছিল?

নি। আমি বলিব না।

পু। তুমি হিন্দুর মেয়ে দেখিতেছি, কি জাতি?

নি। রাজপুত।

পু। তুমি কি যোধপুরী বেগমের কাছে থাক?

নির্ম্মল দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিল, যোধপুরী বেগমের নাম কাহারও সাক্ষাতে করিবে না—কি জানি যদি তাঁহার কোনরূপ অনিষ্ট ঘটে। অতএব বলিল, "আমি এখানে থাকি না, আজ আসিয়াছি।"

সে পুরুষ জিজ্ঞাসা করিল, "কোথা হইতে আসিয়াছ?"

নির্ম্মল মনে ভাবিল, মিথ্যা কথা কেন বলিব, এ ব্যক্তি আমার কি করিবে? কার ভয়ে রাজপুতের মেয়ে মিথ্যা বলিবে? অতএব উত্তর করিল, "আমি উদয়পুর হইতে আসিয়াছি।"

তখন সে পুরুষ জিজ্ঞাসা করিল, "কেন আসিয়াছ?"

নির্ম্মল ভাবিল, ইহাকে বা এত পরিচয় কেন দিব? বলিল, "আপনাকে এত পরিচয় দিয়া কি হইবে? এত জিজ্ঞাসাবাদ না করিয়া, আপনি যদি আমাকে কটক পার করিয়া দেন, তাহা হইলে বিশেষ উপকৃত হইব।"

পুরুষ উত্তর করিল, "তোমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া উত্তরে যদি সন্তুষ্ট হই, তবে তোমাকে কটক পার করিয়া দিতে পারি।"

নির্ম্মল। আপনি কে, তাহা না জানিলে আমি সকল কথা আপনাকে বলিব না।

পুরুষ উত্তর করিল, "আমি আলমগীর বাদশাহ।"

তখন সেই তসবীর, যাহা চঞ্চলকুমারী পদাঘাতে ভাঙ্গিয়াছিল, নির্ম্মলকুমারীর মনে উদয় হইল। নির্ম্মল একটু জিব কাটিয়া, মনে মনে বলিল, "হাঁ, সেই ত বটে!"

তখন নির্ম্মলকুমারী ভূমি স্পর্শ করিয়া বাদশাহকে রীতিমত সেলাম করিল। যুক্তকরে বলিল, "হুকুম ফরমাউন।"

বাদশাহ বলিলেন, "এখানে কাহার কাছে আসিয়াছিলে?"

নির্ম্মল। হজরৎ বাদশাহ বেগম উদিপুরী সাহেবার কাছে।

বাদশাহ। কি বলিলে? উদয়পুর হইতে উদিপুরীর কাছে? কেন?

নি। পত্র ছিল।

বাদ। কাহার পত্র?

নি। মহারাণার রাজমহিষীর।

বাদ। কৈ সে পত্র?

নি। হজরৎ বেগম সাহেবাকে তাহা দিয়াছি।

বাদশাহ বড় বিস্মিত হইলেন। বলিলেন, "আমার সঙ্গে এসো।"

নির্ম্মলকে সঙ্গে লইয়া বাদশাহ উদিপুরীর মন্দিরে গমন করিলেন। দ্বারে নির্ম্মলকে দাঁড় করাইয়া, তাতারী প্রহরিণীদিগকে বলিলেন, "ইহাকে ছাড়িও না।" নিজে উদিপুরীর শয্যা-গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, উদিপুরী ঘোর নিদ্রাভিভূত, তাহার বিছানায় পত্রখানা পড়িয়া আছে। ঔরঙ্গজেব তাহা লইয়া পাঠ করিলেন। পত্রখানি তখনকার রীতিমত ফার্সীতে লেখা।

পত্র পাঠ করিয়া, নিদাঘসন্ধ্যাকাদম্বিনী তুল্য ভীষণ কান্তি লইয়া ঔরঙ্গজেব বাহিরে আসিলেন। নির্ম্মলকে বলিলেন, "তুই কি প্রকারে এই মহাল-মধ্যে প্রবেশ করিলি?"

নির্ম্মল যুক্তকরে বলিল, "বাঁদীর অপরাধ মার্জ্জনা হউক—আমি এ কথার উত্তর দিব না।"

ঔরঙ্গজেব বিস্মিত হইলেন। বলিলেন, "কি, এত হেমাকৎ? আমি দুনিয়ার বাদশাহ—আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুই উত্তর দিবি না?"

নির্ম্মল করযোড়ে বলিল, "দুনিয়া হুজুরের। কিন্তু রসনা আমার। আমি যাহা না বলিব, দুনিয়ার বাদশাহ তাহা কিছুতেই বলাইতে পারিবেন না।"

ঔরঙ্গ। তা না পারি, যে রসনার বড়াই করিতেছ, তা এখনই তাতারী প্রহরিণীর হাতে কাটিয়া ফেলিয়া কুকুরকে খাওয়াইতে পারি।

নির্ম্মল। দিল্লীশ্বরের মর্জ্জি। কিন্তু তাহা হইলে যে সংবাদ আপনি খুঁজিতেছেন, তাহা প্রকাশের পথ চিরকালের জন্য বন্ধ হইবে।

ঔরঙ্গ। সেই জন্য তোমার জিভ রাখিলাম। তোমার প্রতি এই হুকুম দিতেছি যে, আগুন জ্বালিয়া তোমাকে কাপড়ে মুড়িয়া, একটু একটু করিয়া তাতারীরা পোড়াইতে থাকুক। আমার কথায় যাহা বলিবে না, আগুনের জ্বালায় তাহা বলিবে।

নির্ম্মলকুমারী হাসিল। বলিল, "হিন্দুর মেয়ে আগুনে পুড়িয়া মরিতে ভয় করে না। হিন্দুস্থানের বাদশাহ কি কখন শুনেন নাই যে, হিন্দুর মেয়ে হাসিতে হাসিতে স্বামীর সঙ্গে জ্বলন্ত চিতায় চড়িয়া পুড়িয়া মরে? আপনি যে মরণের ভয় দেখাইতেছেন, আমার মা মাতামহী প্রভৃতি পুরুষানুক্রমে সেই আগুনেই মরিয়াছেন। আমিও কামনা করি, যে ঈশ্বরের কৃপায় আমিও স্বামীর পাশে স্থান পাইয়া আগুনে জীবন্ত পুড়িয়া মরি।"

বাদশাহ মনে মনে বলিলেন, "বাহবা! বাহবা!" প্রকাশ্যে বলিলেন, "সে কথার মীমাংসা পরে করিব। আপাততঃ তুমি এই মহালের একটা কামরার ভিতর চাবিবন্ধ থাক। ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর হইলে কিছু খাইতে পাইবে না। তবে যখন নিতান্ত প্রাণ যায় বিবেচনা করিবে, তখন কবাটে ঘা মারিও, প্রহরীরা দ্বার খুলিয়া দিয়া আমার কাছে লইয়া যাইবে। তখন আমার নিকট সকল উত্তর দিলে, পান আহার করিতে পাইবে।"

নির্ম্মল। শাহান্-শাহ! আপনি কখনও কি শুনেন নাই যে, হিন্দু স্ত্রীলোকেরা ব্রত-নিয়ম করে! ব্রত-নিয়ম জন্য এক দিন, দুই দিন, তিন দিন নিরম্বু উপবাস করে? শুনেন নাই, ধরণা-ধরণার জন্য অনিয়মিত কাল উপবাস করে? শুনেন নাই, তারা কখন কখন উপবাস করিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করে? জাঁহাপনা! এ দাসীও তা পারে। ইচ্ছা হয়, আমার মৃত্যু পর্য্যন্ত পরীক্ষা করিয়া দেখুন।

ঔরঙ্গজেব দেখিলেন, এ মেয়েকে ভয় দেখাইয়া কিছু হইবে না, মারিয়া ফেলিলেও কিছু হইবে না। পীড়ন করিলে কি হয় বলা যায় না। কিন্তু তার পূর্ব্বে একবার প্রলোভনের শক্তিটা পরীক্ষা করা ভাল। অতএব বলিলেন, "ভাল, নাই তোমাকে পীড়ন করিলাম। তোমাকে ধন-দৌলত দিয়া বিদায় করিব। তুমি এ সকল কথা আমার নিকট যথার্থ প্রকাশ কর।"

নির্ম্মল। রাজপুতকন্যা যেমন মৃত্যুকে ঘৃণা করে, ধন-দৌলতকেও তেমনই। সামান্যা স্ত্রীলোক আমি—নিজ গুণে আমাকে বিদায় দিন।

ঔরঙ্গ। দিল্লীর বাদশাহের অদেয় কিছুই নাই। তাঁহার কাছে প্রার্থনীয় তোমার কি কিছুই নাই?

নি। আছে। নির্ব্বিঘ্নে বিদায়।

ঔরঙ্গ। কেবল সেইটি এখন পাইতেছ না। তা ছাড়া আর জগতে তোমার প্রার্থনা করিবার কি ভয় করিবার কিছু নাই?

নি। প্রার্থনার আছে বৈ কি. কিন্তু দিল্লীর বাদশাহের রত্নাগারে সে রত্ন নাই।

ঔরঙ্গ। এমন কি সামগ্রী?

নি। আমরা হিন্দু. আমরা জগতে কেবল ধর্ম্মকেই ভয় করি, ধর্ম্মই কামনা করি। দিল্লীর বাদশাহ ম্লেচ্ছ আর দিল্লীর বাদশাহ ঐশ্বর্য্যশালী। দিল্লীর বাদশাহের সাধ্য কি যে, আমার কাম্যবস্তু দিতে পারেন, কি লইতে পারেন?

দিল্লীশ্বর নির্ম্মলকুমারীর সাহস ও চতুরতা দেখিয়া, ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া, বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলেন, কিন্তু এই কটূক্তিতে পুনর্ব্বার ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, "বটে! বটে! ঐ কথাটা ভুলিয়া গিয়াছিলাম।" তখন তিনি এক জন তাতারীকে আদেশ করিলেন, "যা, বাবুর্চ্চিমহাল হইতে কিছু গোমাংস আনিয়া, দুই তিন জনে ধরিয়া ইহার মুখে গুঁজিয়া দে।"

নির্ম্মল তাহাতেও টলিল না, বলিল, "জানি, আপনাদিগের সে বিদ্যা আছে। সে বিদ্যার জোরেই এই সোণার হিন্দুস্থান কাড়িয়া লইয়াছেন। জানি, গোরুর পাল সম্মুখে রাখিয়া লড়াই করিয়াই মুসলমান হিন্দুকে পরাস্ত করিয়াছে—নহিলে রাজপুতের বাহুবলের কাছে মুসলমানের বাহুবল, সমুদ্রের কাছে গোষ্পদ। কিন্তু আবার একটা কথা আপনাকে মনে করিয়া দিতে হইল। শুনেন নাই কি যে, রাজপুতের মেয়ে বিষ সঙ্গে না লইয়া এক পা চলে না? আমার নিকটে এমন তীব্র বিষ আছে যে, আপনার ভৃত্যগণ গোমাংস লইয়া এই ঘরে পা দেওয়ার পরেও যদি আমি তাহা মুখে দিই, তবে জীবন্তে আর আমার মুখে কেহ গোমাংস দিতে পারিবে না। জাঁহাপনা! আপনার বড় ভাই দারা শেকোকে বধ করিয়া তাহার দুইটা

করিলা। কাড়িয়া আনিতে গিয়াছিলেন—পারিয়াছিলেন কি?—অধম খৃষ্টীয়ানীটা আসিয়াছিল জানি, রাজপুতনী দিল্লীর বাদশাহের মুখে সাত পয়জার মারিয়া স্বর্গে চলিয়া যায় নাই কি? আমিও এখনই তোমার মুখে সাত পয়জার মারিয়া স্বর্গে চলিয়া যাইব।"

বাদশাহ বাক্যশূন্য! যিনি পৃথিবীপতি বলিয়া বিখ্যাত, পৃথিবীময় যাঁহার গৌরব ঘোষিত, যিনি সমস্ত ভারতবর্ষের ত্রাস, তিনি আজ এই অনাথা নিঃসহায় অবলার নিকট অপমানিত—পরাস্ত। ঔরঙ্গজেব পরাজয় স্বীকার করিলেন। মনে মনে বলিলেন, "এ অমূল্য রত্ন, ইহাকে নষ্ট করা হইবে না। আমি ইহাকে বশীভূত করিব।" প্রকাশ্যে অতি মধুরস্বরে বলিলেন, "তোমার নাম কি পিয়ারি?"

নির্ম্মলকুমারী হাসিয়া বলিল, "ও কি জাঁহাপনা! আরও রাজপুত-মহিষীতে সাধ আছে না কি? তা সে সাধও পরিত্যাগ করিতে হইতেছে। আমি বিবাহিতা, আমার হিন্দু স্বামী জীবিত আছেন।"

ঔ। সে কথা এখন থাক্। এখন তুমি কিছু দিন আমার এই রঙ্‌মহালমধ্যে বাস কর। এ হুকুম বোধ করি তুমি অমান্য করিবে না?

নি। কেন আমাকে আটক করিতেছেন?

ঔ। তুমি এখন দেশে গেলে আমার বিস্তর নিন্দা করিবে। যাহাতে তুমি আমার প্রশংসা করিতে পার, এক্ষণে তোমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করিব। পরে তোমাকে ছাড়িয়া দিব।

নি। যদি আপনি না ছাড়েন, তবে আমার যাইবার সাধ্য নাই। কিন্তু আপনি কয়েকটি কথা প্রতিশ্রুত হইলেই আমি দিন কতক থাকিতে পারি।

ঔ। কি কি কথা?

নি। হিন্দুর অন্নজল ভিন্ন আমি স্পর্শ করিব না।

ঔ। তাহা স্বীকার করিলাম।

নি। কোন মুসলমান আমাকে স্পর্শ করিবে না।

ঔ। তাহাও স্বীকার করিলাম।

নি। আমি কোন রাজপুত বেগমের নিকট থাকিব।

ঔ। তাহাও হইবে। আমি তোমাকে যোধপুরী বেগমের নিকট রাখিয়া দিব।

নির্ম্মলকুমারীর জন্য বাদশাহ সেইরূপ বন্দোবস্ত করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পুনশ্চ সমিধ-সংগ্রহের জন্য

পরদিন ঔরঙ্গজেব জেব-উন্নিসা ও নির্ম্মলকুমারীকে সঙ্গে লইয়া রঙ্‌মহালমধ্যে তদারক করিলেন—কে ইহাকে অন্তঃপুর-মধ্যে আসিতে দিয়াছে। অন্তঃপুরবাসী সমস্ত খোজা, তাতারী বাঁদীদিগকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। যাহারা নির্ম্মলকে আসিতে দিয়াছিল, তাহারা তাহাকে চিনিল, কিন্তু একটা গর্হিত কাজ হইয়াছে বুঝিয়া কেহই অপরাধ স্বীকার করিল না। ঔরঙ্গজেব বা জেব-উন্নিসা কোন সন্ধানই পাইলেন না।

তখন ঔরঙ্গজেব ও জেব-উন্নিসা অপ পৌরবর্গকে এইরূপ আদেশ করিলেন যে ইহাকে আসিতে দেওয়ায় তত ক্ষতি হয় নাই, কি ইহাকে কেহ আমাদের হুকুম ব্যতীত বাহির হইতে দিও না। তবে ইহাকে কেহ কোন প্রকার পীড়ন বা অপমান করিও না। বেগমদিগের মত ইহাকে মান্য করিবে। এ যোধপুরী বেগমের হিন্দু বাঁদীদিগের পাক ও জল খাইবে, মুসলমান ইহাকে ছুঁইবে না।

তখন নির্ম্মলকুমারীকে সকলে সেলাম করিল। জেব-উন্নিসা তাহাকে আদর করিয়া ডাকিয়া লইয়া আপন মন্দিরে বসাইলেন এবং নানাবিধ আলাপ করিলেন। নির্ম্মলের কাছে ভিতরের কথা কিছু পাইলেন না।

সেই দিন অপরাহ্নে এক জন তাতারী প্রহরিণী আসিয়া যোধপুরী বেগমকে সংবাদ দিল যে, "একজন সওদাগর পাত্থরের জিনিষ লইয়া দুর্গমধ্যে বেচিতে আসিয়াছে। কতকগুলা সে মহালমধ্যে পাঠাইয়া দিয়াছে। জিনিষগুলা ভাল নহে—কোন বেগমই তাহা পসন্দ করিলেন না। আপনি কিছু লইবেন কি?"

মাণিকলাল বাছিয়া বাছিয়া মন্দ জিনিষ আনিয়াছিল—যে-সে বেগম যেন পসন্দ করিয়া কিনিয়া না রাখে। যখন প্রহরিণী এই কথা বলিল, তখন নির্ম্মলকুমারী যোধপুরীর নিকটে ছিল। সে যোধপুরীকে একটু চক্ষুর ইঙ্গিত করিয়া বলিল, "আমি নিব।"

পূর্ব্বরাত্রিতে নির্ম্মলকুমারীর সঙ্গে যেরূপ বাদশাহের সাক্ষাৎ ও কথোপকথন হইয়াছিল, নির্ম্মল সকলই তাহা যোধপুরী বেগমের কাছে বলিয়াছিল। যোধপুরী শুনিয়া নির্ম্মলের অনেক প্রশংসা এবং

নির্ম্মলকে অনেক আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে বহু যত্ন করিতেছিলেন। এক্ষণে নির্ম্মলের অভিপ্রায় বুঝিয়া পাত্তরের দ্রব্য আনাইতে হুকুম দিলেন।

প্রহরিণী বাহিরে গেলে নির্ম্মল সংক্ষেপে যোধপুরীকে মাণিকলালের সঙ্কেত-কৌশল বুঝাইয়া দিল। যোধপুরী তখন বলিলেন, "তবে তুমি ততক্ষণ তোমার স্বামীকে একখানা পত্র লেখ। আমি পাত্তরের জিনিষ পসন্দ করি। এই সুযোগে তাঁহাকে তোমার সংবাদ দিতে হইবে।" উপযুক্ত সময়ে সেই প্রস্তরনির্ম্মিত দ্রব্যগুলি আসিয়া উপস্থিত হইল।

নির্ম্মল দেখিল যে, সকল দ্রব্যেই মাণিকলালের চিহ্ন আছে। দেখিয়া নির্ম্মল পত্র লিখিতে বসিল। যতক্ষণ না নির্ম্মলের পত্র লেখা হইল, ততক্ষণ যোধপুরী পসন্দ করিতে লাগিলেন। দ্রব্যজাতের মধ্যে প্রস্তরনির্ম্মিত মূল্যবান রত্নরাজির কারুকার্য্যবিশিষ্ট একটা কৌটা ছিল। তাহাতে জড়াইয়া চাবি-তালা বন্ধ করিবার জন্য একটা সুবর্ণনির্ম্মিত শৃঙ্খল ছিল। নির্ম্মলের পত্র লেখা হইলে যোধপুরী অন্যের অলক্ষ্যে সেই পত্র ঐ কৌটার মধ্যে রাখিয়া চাবি বন্ধ করিলেন।

যোধপুরী সকল দ্রব্য পসন্দ করিয়া রাখিলেন, কেবল এই কৌটাটি না-পসন্দ করিয়া ফেরৎ দিলেন। ফেরৎ দিবার সময়ে ইচ্ছাপূর্ব্বক চাবিটা ফেরৎ দিতে ভুলিয়া গেলেন।

ছদ্মবেশী সওদাগর মাণিকলাল, কেবল কৌটা ফেরৎ আসিল, তাহার চাবি আসিল না দেখিয়া প্রত্যাশাপন্ন হইল। সে টাকা-কড়ি সব বুঝিয়া লইয়া কৌটা লইয়া দোকানে গেল। সেখানে, নির্জ্জনে কৌটার ভিতরে নির্ম্মলকুমারীর পত্র পাইল।

পত্রে যাহা লিখিত হইয়াছিল, তাহা সবিস্তারে জানিবার পাঠকের প্রয়োজন নাই। স্থূল কথা যাহা, তাহা পাঠক বুঝিতে পারিতেছেন। আনুষঙ্গিক কথা পরে বুঝিতে পারিবেন। পত্র পাইয়া নির্ম্মল সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া মাণিকলাল স্বদেশ-যাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই দিনই দোকানপাট উঠাইলে পাছে কেহ সন্দেহ করে, এ জন্য দিনকতক বিলম্ব করা স্থির করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সমিৎসংগ্রহ—জেব-উন্নিসা

এখন একবার নির্ম্মলকুমারীকে ছাড়িয়া মোগলবীর মবারকের সংবাদ লইতে হইবে। বলিয়াছি, যাহারা রূপনগর হইতে পরাঙ্মুখ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল, ঔরঙ্গজেব তাহাদিগের মধ্যে কাহাকে বা পদচ্যুত, কাহাকে বা দণ্ডিত করিয়াছিলেন; কিন্তু মবারক সে শ্রেণীভুক্ত হয়েন নাই। ঔরঙ্গজেব সকলের নিকট তাঁহার বীরত্বের কথা শুনিয়া তাঁহাকে বহাল রাখিয়াছিলেন।

জেব-উন্নিসাও সে সুখ্যাতি শুনিলেন। মনে করিলেন যে, মবারক নিজে উপযাচক হইয়া তাঁহার নিকট হাজির হইয়া সকল পরিচয় দিবে। কিন্তু মবারক আসিল না।

মবারক দরিয়াকে নিজালয়ে লইয়া আসিয়াছিল। তাহার খোজা বাঁদী নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিল। তাহাকে এলবাস পোষাক দিয়া সাজাইয়াছিল। যথাসাধ্য অলঙ্কারে ভূষিত করিয়াছিল। মবারক পবিত্রা পরিণীতা পত্নী লইয়া ঘরকরণা সাজাইতেছিল।

মবারক স্বেচ্ছাক্রমে আসিল না দেখিয়া, জেব-উন্নিসা বিশ্বাসী খোজা আসীরুদ্দীনের দ্বারা তাহাকে ডাকাইলেন। তথাপি মবারক আসিল না। জেব-উন্নিসার বড় রাগ হইল। বড় হেমাকৎ—বাদশাহজাদী মেহেরবানি ফরমাইয়া ইয়াদ করিতেছেন—তবু নফর হাজির হয় না—বড় গোস্তাকী।

দিনকতক জেব-উন্নিসা রাগের উপর রহিলেন—মনে মনে বলিলেন, "আমার ত সকলই সমান।" কিন্তু জেব-উন্নিসা তখনও জানিতেন না যে, বাদশাহজাদীরও ভুল হয় যে, খোদা বাদশাহজাদীকে ও চাষার মেয়েকে এক ছাঁচেই ঢালিয়াছেন—ধন, দৌলত, তক্তেতাউস সকলই কর্ম্মভোগ মাত্র, আর কোন প্রভেদ নাই।

সব সমান হয় না, জেব-উন্নিসারও সব সমান নয়। কিছুদিন রাগের উপর থাকিয়া, জেব-উন্নিসা মবারকের জন্য একটু কাতর হইলেন। মান খোয়াইয়া—শাহজাদীর মান, নায়িকার মান, দুই খোয়াইয়া, আবার সেই মবারককে ডাকিয়া পাঠাইলেন। মবারক বলিল, "আমার বহুৎ বহুৎ তসলিমাৎ; শাহজাদীর অপেক্ষা আমার নিকট বেশ্ কিম্মৎ আর দুনিয়ায় কিছু নাই। কেবল এক আছে। খোদা আছেন, 'দীন' আছে। গুনাহ্গারী

আর আয়া হইতে হইবে না। আমি আর মহালের ভিতর যাইব না—আমি দরিয়াকে ঘরে আনিয়াছি।"

উত্তর শুনিয়া জেব-উন্নিসা রাগে ফুলিয়া আট-খানা হইলেন এবং মবারকের ও দরিয়ার নিপাত-সাধন জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ইহা বাদশাহী দস্তর।

মহালমধ্যে নির্ম্মলকুমারীর অবস্থানে, জেব-উন্নিসার এ অভিপ্রায়সাধনের কিছু সুবিধা ঘটিল। নির্ম্মলকুমারী ঔরঙ্গজেবের নিকট ক্রমশঃ আদরের বস্তু হইয়া উঠিলেন। ইহার মধ্যে কন্দর্পঠাকুরের কোন কারসাজি ছিল না; কাজটা সয়তানের। ঔরঙ্গজেব প্রত্যহ অবসরমত, সুখের ও আয়েশের সময়ে রূপনগরী নাজনীকে' ডাকিয়া কথোপকথন করিতেন। কথোপকথনের প্রধান উদ্দেশ্য, রাজসিংহের রাজকীয় অবস্থাঘটিত সংবাদ লওয়া। তবে চতুর-চূড়ামণি ঔরঙ্গজেব এমনভাবে কথাবার্ত্তা কহিতেন যে, হঠাৎ কেহ বুঝিতে না পারে যে, তিনি যুদ্ধকালে ব্যবহার্য্য সংবাদ সংগ্রহ করিতেছেন। কিন্তু নির্ম্মলও চতুরতায় ফেলা যায় না, সে সকল কথারই অভিপ্রায় বুঝিত এবং সকল প্রয়োজনীয় কথার মিথ্যা উত্তর দিত।

অতএব ঔরঙ্গজেব তাহার কথাবার্ত্তায় সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হইতেন না। মনে মনে এইরূপ বিচার করিলেন—"যেবার আমি সৈন্যের সাগরে ডুবাইয়া দিব, তাহাতে সন্দেহই করি না—রাজসিংহের রাজ্য থাকিবে না। কিন্তু তাহাতেই আমার মান বজায় হইবে না। তাহার রূপনগরী রাণীকে না কাড়িয়া আনিতে পারিলে আমার মান বজায় হইবে না। কিন্তু রাজ্য পাইলেই যে আমি রাজমহিষীকে পাইব, এমন ভরসা করা যায় না, কেন না, রাজপুতের মেয়ে কথায় কথায় চিতায় উঠিয়া পুড়িয়া মরে, কথায় কথায় বিষ খায়। আমার হাতে পড়িবার আগে সে সয়তানী প্রাণত্যাগ করিবে। কিন্তু এই বাঁদীটাকে যদি হস্তগত করিতে পারি—বশীভূত করিতে পারি, তবে ইহা দ্বারা তাহাকে ভুলাইয়া আনিতে পারিব না? এ বাঁদীটা কি বশীভূত হইবে না? আমি দিল্লীর বাদশাহ, আমি একটা বাঁদীকে বশীভূত করিতে পারিব না? না পারি, তবে আমার বাদশাহী নাবোনাসেক্।"

তার পর বাদশাহের ইঙ্গিতে জেব-উন্নিসা নির্ম্মলকুমারীকে রত্নালঙ্কারে ভূষিত করিলেন। তাঁহার বেশভূষা, এল্‌বাস্-পোষাক বেগমদিগের সঙ্গে সমান হইল। নির্ম্মল যাহা বলিতেন, তাহা হইত; যাহা চাহিতেন, তাহা পাইতেন; কেবল বাহির হইতে পাইতেন না।

এ সব কথা লইয়া যোধপুরীর সঙ্গে নির্ম্মলের আন্দোলন হইত। একদা হাসিয়া নির্ম্মল যোধপুরীকে বলিল,—

সোণে কি পিঁজিরা, সোণে কি চিড়িয়া,
সোণে কি জিঞ্জির পয়ের মে,
সোণে কি চানা, সোণে কি দানা,
মট্টি কেঁও সেরেক খয়ের মে।

যোধপুরী জিজ্ঞাসা করিল, "তুই নিস্ কেন?"

নির্ম্মল বলিল, "উদয়পুরে গিয়া দেখাইব যে, মোগল-বাদশাহকে ঠকাইয়া আনিয়াছি।"

জেব-উন্নিসা ঔরঙ্গজেবের দাহিন হাত। ঔরঙ্গজেবের আদেশ পাইয়া, জেব-উন্নিসা নির্ম্মলকে লইয়া পড়িলেন। আসল কাজটা শাহজাদীর হাতে রহিল—বাদশাহ নিজে মধুর আলাপের ভারটুকু আপন হাতে রাখিলেন। নির্ম্মলের সঙ্গে রঙ্গরসিকতা করিতেন, কিন্তু তাহাও একটু বাদশাহী রকমের মাজাঘষা থাকিত—নির্ম্মল রাগ করিতে পারিত না, কেবল উত্তর করিত, তাও মেয়েলী রকম মাজাঘষা, তবে রূপনগরের পাহাড়ের কর্কশতা-শূন্য নহে। এখনকার ইংরেজী রুচির সঙ্গে ঠিক মিলিবে না বলিয়া, সেই বাদশাহী রুচির উদাহরণ দিতে পারিলাম না।

জেব-উন্নিসার কাছে নির্ম্মলের যাহা বলিবার আপত্তি নাই, তাহা সে অপকটে বলিয়াছিল। অন্যান্য কথার মধ্যে রূপনগরের যুদ্ধটা কি প্রকারে হইয়াছিল, সে কথাও পাড়িয়াছিল। নির্ম্মল যুদ্ধের প্রথমভাগের কিছু দেখে নাই, কিন্তু চঞ্চলকুমারীর কাছে সে সকল কথা শুনিয়াছিল। যেমন শুনিয়াছিল, জেব-উন্নিসাকে তেমনই শুনাইল। মবারক যে মোগল-সৈন্যকে ডাকিয়া চঞ্চলকুমারীর কাছে পরাভব স্বীকার করিয়া, রণজয় ত্যাগ করিতে বলিয়াছিল, তাহা বলিল; চঞ্চলকুমারী যে রাজপুতগণের রক্ষার্থ ইচ্ছাপূর্ব্বক দিল্লীতে আসিতে চাহিয়াছিল, তাহাও বলিল; বিষ খাইবার ভরসার কথাও বলিল, মবারক যে চঞ্চলকুমারীকে লইয়া আসিল না, তাহাও বলিল।

শুনিয়া জেব-উন্নিসা মনে মনে বলিলেন, "মবারক সাহেব! এই অস্ত্রে তোমার কাঁধ হইতে মাথা নামাইব।" উপযুক্ত অবসর পাইলে, জেব-উন্নিসা ঔরঙ্গজেবকে যুদ্ধের সেই ইতিহাস শুনাইলেন।

ঔরঙ্গজেব শুনিয়া বলিলেন, "যদি সে নফর এমন বিশ্বাসঘাতক হয়, তবে আজি সে জাহান্নমে যাইবে।" ঔরঙ্গজেব কাণ্ডটা না বুঝিলেন, তাহা নহে। জেব-উন্নিসার কুচরিত্রের কথা তিনি সর্ব্বদাই শুনিতে পাইতেন। কতকগুলি লোক আছে, এ দেশের লোকে তাহাদের বর্ণনার সময় বলে, "ইহারা কুকুর মারে, কিন্তু হাঁড়ি ফেলে না।" মোগল বাদশাহেরা সেই সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। তাঁহারা কন্যা বা ভগিনীর দুশ্চরিত্র জানিতে পারিলে, কন্যা কি ভগিনীকে কিছু বলিতেন না; কিন্তু যে ব্যক্তি কন্যা বা ভগিনীর অনুগৃহীত, তাহার ঠিকানা পাইলেই কোন ছলে কৌশলে তাহার নিপাত সাধন করিতেন। ঔরঙ্গজেব অনেক দিন হইতে মবারককে জেব-উন্নিসার প্রীতিভাজন বলিয়া সন্দেহ করিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত ঠিক বুঝিতে পারেন নাই। এখন কন্যার কথায় ঠিক বুঝিলেন, বুঝি কলহ ঘটিয়াছে, তাই বাদশাহজাদী, যে পিপীলিকা তাঁহাকে দংশন করিয়াছে, তাহাকে টিপিয়া মারিতে চাহিতেছেন। ঔরঙ্গজেব তাহাতে খুব সম্মত। কিন্তু একবার নির্ম্মলের নিজমুখে এ সকল কথা বাদশাহের শুনা কর্ত্তব্য বোধে, তিনি নির্ম্মলকে ডাকাইলেন। ভিতরের কথা নির্ম্মল কিছু জানে না, বা বুঝিল না, সকল কথাই ঠিক বলিল।

যথাবিহিত সময়ে বখ্‌শীকে তলব করিয়া, বাদশাহ মবারকের সম্বন্ধে আজ্ঞা প্রচার করিলেন। বখ্‌শীর আজ্ঞা পাইয়া আট জন আহদী গিয়া মবারককে ধরিয়া আনিয়া বখ্‌শীর নিকট হাজির করিল। মবারক হাসিতে হাসিতে বখ্‌শীর নিকট উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, বখ্‌শীর সম্মুখে দুইটি লৌহপিঞ্জর। তন্মধ্যে এক একটি বিষধর সর্প গর্জ্জন করিতেছে।

এখনকার দিনে যে রাজদণ্ডে প্রাণ হারায়, তাহাকে ফাঁসি যাইতে হয়, অন্য প্রকার রাজকীয় বধোপায় প্রচলিত নাই। মোগলদিগের রাজ্যে এরূপ অনেক প্রকার বধোপায় প্রচলিত ছিল। কাহারও মস্তকচ্ছেদ হইত; কেহ শূলে যাইত; কেহ হস্তিপদতলে নিক্ষিপ্ত হইত; কেহ বা বিষধর সর্পের দংশনে প্রাণত্যাগ করিত। যাহাকে গোপনে বধ করিতে হইবে, তাহার প্রতি বিষ-প্রয়োগ হইত।

মবারক সহাস্যবদনে বখ্‌শীর কাছে উপস্থিত হইয়া এবং দুই পার্শ্বে দুইটি বিষধর সর্পের পিঞ্জর দেখিয়া পূর্ব্ববৎ হাসিয়া বলিল, "কি, আমার যাইতে হইবে?"

বখ্‌শী বিষণ্ণভাবে বলিল, "বাদশাহের হুকুম।"

মবারক জিজ্ঞাসা করিল, "কেন এ হুকুম হইল, কিছু প্রকাশ পাইয়াছে কি?"

বখ্‌শী। না—আপনি কিছু জানেন না?

মবারক। এক রকম—আন্দাজী আন্দাজী। বিলম্বে কাজ কি?

বখ্‌শী। কিছু না।

তখন মবারক জুতা খুলিয়া একটা পিঞ্জরের উপর পা দিলেন। সর্প গর্জ্জাইয়া আসিয়া পিঞ্জরার ছিদ্রমধ্য হইতে দংশন করিল।

দংশনজ্বালায় মবারক একটু মুখ বিকৃত করিলেন। বখ্‌শীকে বলিলেন, "সাহেব! যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে যে, মবারক কেন মরিল, তখন মেহেরবানি করিয়া বলিবেন—শাহজাদী আলম্ জেব-উন্নিসা বেগম সাহেবার ইচ্ছা।"

বখ্‌শী সভয়ে অতি কাতর ভাবে বলিলেন, "চুপ! চুপ! এটাও!"

যদি একটা সাপের বিষ না থাকে, এ জন্য দুইটা সাপের দ্বারা বধ্য ব্যক্তিকে দংশন করান রীতি ছিল। মবারক তাহা জানিতেন। তিনি দ্বিতীয় পিঞ্জরের উপর পা রাখিলেন, দ্বিতীয় মহাসর্পও তাঁহাকে দংশন করিয়া তীক্ষ্ণ বিষ ঢালিয়া দিল।

মবারক তখন বিষের জ্বালায় জর্জ্জরীভূত ও নীলকান্তি হইয়া, ভূমে জানু পাতিয়া বসিয়া যুক্তকরে ডাকিতে লাগিল—"আল্লা আক্‌বর! যদি কখনও তোমার দয়া পাইবার যোগ্য কার্য্য করিয়া থাকি, তবে এই সময়ে দয়া কর।"

এইরূপে জগদীশ্বরের ধ্যান করিতে করিতে, তীব্র সর্পবিষে জর্জ্জরীভূত হইয়া মোগলবীর মবারক-আলি প্রাণত্যাগ করিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সব সমান

রঙমহালে সকল সংবাদই আসে—সকল সংবাদই জেব-উন্নিসা নিয়া থাকেন—তিনি নাএবে-বাদশাহ। মবারকের বধ-সংবাদও আসিয়া পৌছিল।

জেব-উন্নিসা প্রত্যাশা করিয়াছিলেন যে, তিনি এই সংবাদে অত্যন্ত সুখী হইবেন। সহসা দেখিলেন

যে, ঠিক বিপরীত ঘটিল। সংবাদ আসিবামাত্র সহসা তাঁহার চক্ষু জলে ভরিয়া গেল—এ শুক্‌না মাটীতে কখনও জল উঠে নাই। দেখিলেন, কেবল তাই নহে, গণ্ড বাহিয়া ধারায় ধারায় সে জল গড়াইতে লাগিল। শেষ দেখিলেন, চীৎকার করিয়া কাঁদিতে ইচ্ছা করিতেছে। জেব-উন্নিসা দ্বার রুদ্ধ করিয়া হস্তিদন্তনির্ম্মিত রত্নখচিত পালঙ্কে শয়ন করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

কৈ শাহজাদী? হস্তিদন্তনির্ম্মিত রত্নদণ্ডভূষিত পালঙ্কে শুইলেও ত চক্ষুর জল থামে না! তুমি যদি বাহিরে গিয়া দিল্লীর সহরতলীর ভগ্নকুটীরমধ্যে প্রবেশ করিতে, তাহা হইলে দেখিতে পাইতে—কত লোক ছেঁড়া কাঁথায় শুইয়া কত হাসিতেছে। তোমার মত কান্না কেহই কাঁদিতেছে না।

জেব-উন্নিসার প্রথমে কিছু বোধ হইল যে, তাঁহার আপনার সুখের হানি তিনি আপনিই করিয়াছেন। ক্রমশঃ বোধ হইল যে, সব সমান নহে—বাদশাহজাদীরাও ভালবাসে, জানিয়া হউক, না জানিয়া হউক, নারীদেহ ধারণ করিলেই ঐ পাপকে হৃদয়ে আশ্রয় দিতে হয়। জেব-উন্নিসা আপনা আপনি জিজ্ঞাসা করিল, "আমি তাকে এত ভালবাসিতাম, সে কথা এত দিন জানিতে পারি নাই কেন?" কেহ তাহাকে বলিয়া দিল না যে, ঐশ্বর্য্যমদে তুমি অন্ধ হইয়াছিলে, রূপের গর্ব্বে তুমি অন্ধ হইয়াছিলে, ইন্দ্রিয়ের দাসী হইয়া তুমি ভালবাসাকে চিনিতে পার নাই। তোমার উপযুক্ত দণ্ড হইয়াছে—কেহ যেন তোমাকে দয়া না করে।

কেহ বলিয়া না দিক—তার নিজের মনে এ সকল কথা কিছু কিছু আপনা আপনি উদয় হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে এমনও মনে হইল, ধর্ম্মাধর্ম্ম বুঝি আছে। যদি থাকে, তবে বড় অধর্ম্মের কাজ হইয়াছে। শেষ ভয় হইল, ধর্ম্মাধর্ম্মের পুরস্কার দণ্ড যদি থাকে? তাহার পাপের যদি দণ্ডদাতা কেহ থাকেন? তিনি বাদশাহজাদী বলিয়া জেব-উন্নিসাকে মার্জ্জনা করিবেন কি? সম্ভব নয়।

জেব-উন্নিসার মনে ভয়ও হইল।

দুঃখে, শোকে, ভয়ে জেব-উন্নিসা দ্বার খুলিয়া তাহার বিশ্বাসী খোজা আসিরদ্দীনকে ডাকাইল। সে আসিলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "সাপের বিষে মানুষ মরিলে তার কি চিকিৎসা আছে?"

আসিরদ্দীন বলিল, "মরিলে আর চিকিৎসা কি?"

জেব। কখনও শুন নাই?

আসি। হাতেম মাল এমনই একটা চিকিৎসা করিয়াছিল, কানে শুনিয়াছি, চক্ষে দেখি নাই।

জেব-উন্নিসা একটু হাঁপ ছাড়িল। বলিল, "হাতেম মালকে চেন?"

আসি। চিনি।

জেব। সে কোথায় থাকে?

আসি। দিল্লাতেই থাকে।

জেব। বাড়ী চেন?

আসি। চিনি।

জেব। এখন সেখানে যাইতে পারিবে?

আসি। হুকুম দিলেই পারি।

জেব। আজ মবারক আলি (একটু গলা কাঁপিল) সর্পাঘাতে মরিয়াছে জান?

আসি। জানি।

জেব। কোথায় তাহাকে গোর দিয়াছে, জান?

আসি। দেখি নাই, কিন্তু যে গোরস্থানে গোর দিবে, তাহা আমি জানি। নূতন গোর, ঠিকানা করিয়া লইতে পারিব।

জেব। আমি তোমাকে দুই শত আসরফি দিতেছি। এক শ হাতেম মালকে দিবে, এক শ আপনি লইবে। মবারক আলির গোর খুঁড়িয়া মোরদা বাহির করিয়া চিকিৎসা করিয়া তাহাকে বাঁচাইবে। যদি বাঁচে, তাহাকে আমার কাছে লইয়া আসিবে; এখনই যাও।

আসরফি লইয়া খোজা আসিরদ্দীন তখনই বিদায় হইল।

নবম পরিচ্ছেদ

সমিধ্ সংগ্রহ—দরিয়া

আর একবার রঙমহালে পাতরের দ্রব্য বেচিয়া মাণিকলাল নির্ম্মলকুমারীর খবর লইল। এবারও সেই পাতরের কৌটা চাবি-বন্ধ হইয়া আসিয়াছিল। চাবি খুলিয়া, নির্ম্মল পাইল—সেই দৌত্য-পারাবত। নির্ম্মল সেটিকে রাখিল।* পত্রের দ্বারা পূর্ব্ববৎ সংবাদ পাঠাইল। লিখিল, "সব মঙ্গল! তুমি এখন যাও, আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, আমি বাদশাহের সঙ্গে যাইব।"

মাণিকলাল তখন দোকান-পাট উঠাইয়া উদয়পুর যাত্রা করিল। রাত্রি প্রভাত হইবার তখন অল্প বিলম্ব আছে। দিল্লীর অনেক 'দরওয়াজা।' পাছে কেহ কিছু সন্দেহ করে, এ জন্য মাণিকলাল

আজমীর দরওয়াজায় না গিয়া, অন্য দরওয়াজায় চলিল। পথিপার্শ্বে একটা সামান্য গোরস্থান আছে। একটা গোরের নিকট দুইটা লোক দাঁড়াইয়া আছে। মাণিকলালকে এবং তাহার সমভিব্যাহারীদিগকে দেখিয়া, সেই দুইটা মানুষ দৌড়াইয়া পলাইল। মাণিকলাল তখন ঘোড়া হইতে নামিয়া নিকটে গিয়া দেখিল। দেখিল যে, গোরের মাটী উঠাইয়া উহারা মৃতদেহ বাহির করিয়াছে। মাণিকলাল সেই মৃতদেহ খুব যত্নের সহিত, উদয়োন্মুখ উষার আলোকে পর্য্যবেক্ষণ করিল। তার পর কি বুঝিয়া ঐ দেহ আপনার অশ্বের উপর তুলিয়া বাঁধিয়া কাপড় ঢাকা দিয়া আপনি পদব্রজে চলিল।

মাণিকলাল দিল্লীর দরওয়াজার বাহিরে গেল। কিছু পরে সূর্য্যোদয় হইল, তখন মাণিকলাল ঐ মৃতদেহ ঘোড়া হইতে নামাইয়া জঙ্গলের ছায়ায় লইয়া গিয়া রাখিল এবং আপনার পেঁটারা হইতে একটি ঔষধের বড়ী বাহির করিয়া তাহা কোন অনুপান দিয়া মাড়িল। তার পর ছুরি দিয়া মৃতদেহটা স্থানে স্থানে একটু একটু চিরিয়া, ছিদ্রমধ্যে সেই ঔষধ প্রবেশ করাইয়া দিল এবং জিবে ও চক্ষুতে কিছু কিছু মাখাইয়া দিল। দুই দণ্ড পরে আবার ঐরূপ করিল। এইরূপ তিনবার ঔষধপ্রয়োগ করিলে মৃতব্যক্তি নিশ্বাস ফেলিল। চারিবারে সে চক্ষু চাহিল ও তাহার চৈতন্য হইল। পাঁচবারে সে উঠিয়া বসিয়া কথা কহিল।

মাণিকলাল একটু দুগ্ধ সংগ্রহ করাইয়াছিল। তাহা মবারককে পান করাইল। মবারক ক্রমশঃ দুগ্ধ পান করিয়া সবল হইলে সকল কথা তাঁহার স্মরণ হইল। তিনি মাণিকলালকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে আমাকে বাঁচাইল? আপনি?"

মাণিকলাল বলিল, "হাঁ।"

মবারক বলিল, "কেন বাঁচাইলেন? আপনাকে আমি চিনিয়াছি। আপনার সঙ্গে রূপনগরের পাহাড়ে যুদ্ধ করিয়াছি। আপনি আমায় পরাভব করিয়াছিলেন।"

মাণিক। আমিও আপনাকে চিনিয়াছি। আপনিই মহারাণাকে পরাজয় করেন, আপনার এ অবস্থা কেন ঘটিল?

মবারক। এখন বলিবার কথা নহে, সময়ান্তরে বলিব। আপনি কোথায় যাইতেছেন—উদয়পুরে?

মাণিক। হাঁ।

মবা। আমাকে সঙ্গে লইবেন? দিল্লীতে আমার ফিরিবার যো নাই, তা বুঝিতেছেন বোধ হয়। আমি রাজদণ্ডে দণ্ডিত।

মাণিক। সঙ্গে লইয়া যাইতে পারি; কিন্তু আপনি এখন বড় দুর্ব্বল।

মবা। সন্ধ্যা নাগায়েৎ শক্তি পাইতে পারি। ততক্ষণ বিলম্ব করিতে পারিবেন কি?

মাণিক। করিব।

মাণিকলাল মবারককে আর কিছু দুগ্ধাদি খাওয়াইল। গ্রাম হইতে একটা টাটু কিনিয়া আনিল। তাহার উপর মবারককে চড়াইয়া উদয়পুর যাত্রা করিল।

পথে যাইতে যাইতে ঘোড়া পাশাপাশি করিয়া নির্জ্জনে মবারক জেব-উন্নিসার সকল কথা মাণিকলালকে বলিল। মাণিকলাল বুঝিল যে, জেব-উন্নিসার কোপানলে মবারক ভস্মীভূত হইয়াছে।

এ দিকে আসিরুদ্দীন ফিরিয়া আসিয়া জেব-উন্নিসাকে জানাইল যে, কিছুতেই বাঁচান গেল না। জেব-উন্নিসা আতরমাখা রুমালখানা চক্ষুতে দিয়াছিল, এখন পাতরে লুটাইয়া পড়িয়া চাষার মেয়ের মত মাথা কুটিতে লাগিল।

যে দুঃখ কাহারও কাছে প্রকাশ করিবার নয়, তাহা সহ্য করা বড়ই কষ্ট। বাদশাহজাদীর সেই দুঃখ হইল। জেব-উন্নিসা ভাবিল, "যদি চাষার মেয়ে হইতাম!"

এই সময়ে কক্ষদ্বারে গণ্ডগোল উপস্থিত হইল। কেহ কক্ষ-প্রবেশ করিবার জন্য জিদ করিতেছে,—প্রতিহারী তাহাকে আসিতে দিতেছে না। জেব-উন্নিসা যেন দরিয়ার গলা শুনিলেন। প্রতিহারী তাহাকে আটক করিয়া রাখিতে পারিল না। দরিয়া প্রতিহারীকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার হাতে তরবারি ছিল। সে জেব-উন্নিসাকে কাটিবার জন্য তরবারি উঠাইল। কিন্তু সহসা তরবারি ফেলিয়া দিয়া জেব-উন্নিসার সম্মুখে নৃত্য আরম্ভ করিল। বলিল, "বহুৎ আচ্ছা—চোখে জল!" এই বলিয়া উচ্চস্বরে হাসিতে লাগিল। জেব-উন্নিসা প্রতিহারীকে ডাকিয়া উহাকে দূর করিতে আজ্ঞা দিলেন। প্রতিহারী তাহাকে ধরিতে পারিল না। সে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। প্রতিহারী তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া তাহার বস্ত্র ধরিল। দরিয়া বস্ত্র খুলিয়া ফেলিয়া দিয়া নগ্নাবস্থায় পলায়ন করিল। সে তখন ঘোর উন্মাদগ্রস্ত। মবারকের মৃত্যুসংবাদ সে শুনিয়াছিল।

সপ্তম খণ্ড

অগ্নি জ্বলিল

প্রথম পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয়—Xerxes—দ্বিতীয় Platæa.

রাজসিংহের রাজ্য ধ্বংস করিবার জন্ম ঔরঙ্গজেবের যাত্রা করিতে যে বিলম্ব হইল, তাহার কারণ, তাঁহার সেনোদ্যোগ অতি ভয়ঙ্কর। দুর্য্যোধন ও যুধিষ্ঠিরের ন্যায় তিনি ব্রহ্মপুত্র-পার হইতে বাহ্লীক পর্য্যন্ত, কাশ্মীর হইতে কেরল ও পাণ্ড্য পর্য্যন্ত যেখানে যত সেনা ছিল, সব এই মহাযুদ্ধে আহূত করিলেন। দক্ষিণাপথের মহাসৈন্ত, গোলকুণ্ডা, বিজয়পুর, মহারাষ্ট্রের সমরের অবিশ্রান্ত বজ্রাঘাতে, দ্বিতীয় বৃত্রাসুরের ন্যায় যাহার পৃষ্ঠ অশনিচূর্ণিত হইয়াছিল—তাহা লইয়া বাদশাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র শাহ আলম্, দক্ষিণ হইতে উদয়পুর ভাসাইতে আসিলেন। অন্য পুত্র আজম শাহ,—বাঙ্গালার রাজপ্রতিনিধি, পূর্ব্বভারতবর্ষের মহতী চমূ লইয়া মেবারের পর্ব্বতমালার দ্বারে উপস্থিত হইলেন। পশ্চিমে মূলতান হইতে পঞ্জাব-কাবুল-কাশ্মীরের অজেয় যোদ্ধৃবর্গ লইয়া অপর পুত্র আকব্বর শাহ আসিয়া, সেনাসাগরের অনন্ত স্রোতে আপনার সেনাসাগর মিশাইলেন। উত্তরে স্বয়ং শাহন্‌শাহ বাদশাহ দিল্লী হইতে অপরাজেয় বাদশাহী সেনা লইয়া উদয়পুরের নাম পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত করিবার জন্ম মেবারে দর্শন দিলেন। সাগরমধ্যস্থ উন্নত-পর্ব্বতশিখরসদৃশ সেই অনন্ত মোগল সেনাসাগর-মধ্যে উদয়পুর শোভা পাইতে লাগিল।

অনন্তসর্পশ্রেণী-পরিবেষ্টিত গরুড়, যতটুকু শঙ্কাভীত হওয়ার সম্ভাবনা, রাজসিংহ এই সাগরসদৃশ মোগল-সেনা দেখিয়া ততটুকু ভীত হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষে এরূপ সেনোদ্যোগ কুরুক্ষেত্রের পর হইয়াছিল কি না, বলা যায় না। যে সেনা চীন, পারস্য বা রুম জয়ের জন্যও আবশ্যক হয় না—ক্ষুদ্র উদয়পুর জয়ের জন্য ঔরঙ্গজেব বাদশাহ তাহা রাজপুতানায় আনিয়া উপস্থিত করিলেন। একবারমাত্র পৃথিবীতে এরূপ ঘটনা হইয়াছিল। যখন পারস্য পৃথিবীর মধ্যে বড় রাজ্য ছিল, তখন তদধিপতি শের (Xerxes) পঞ্চাশ লক্ষ লোক লইয়া গ্রীস নামা ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ড জয় করিতে গিয়াছিলেন। থার্ম্মপলিতে Leonidas, সালামিসে Themistocles এবং প্লাতীয়ায় Pausanias তাঁহার গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া তাঁহাকে দূর করিয়া দিল—শৃগাল-কুক্কুরের মত শের পলাইয়া আসিলেন। সেইরূপ ঘটনা পৃথিবীতলে এই দ্বিতীয়বারমাত্র ঘটিয়াছিল। বহুলক্ষ সেনা লইয়া ভারতপতি—শেরের অপেক্ষাও দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপশালী রাজা—রাজপুতানার একটু ক্ষুদ্র ভূমি-খণ্ড জয় করিতে গিয়াছিলেন—রাজসিংহ তাঁহাকে কি করিলেন, তাহা বলিতেছি।

যুদ্ধবিদ্যা ইউরোপীয় বিদ্যা। আসিয়াখণ্ডে ভারতবর্ষে ইহার বিকাশ কোনকালে নাই। যে পুরাণেতিহাস-বর্ণিত আর্য্যবীরগণের এত খ্যাতি শুনি, তাঁহাদের কৌশল কেবল তীর-ন্দাজী ও লাঠিয়ালিতে। ইতিহাসলেখক ব্রাহ্মণেরা যুদ্ধবিদ্যা কি, তাহা বুঝিতেন না বলিয়াই হৌক, আর যুদ্ধবিদ্যা বস্তুতঃ প্রাচীন-কালে ভারতবর্ষে ছিল না বলিয়াই হৌক, রামচন্দ্র-অর্জ্জুনাদির সেনাপতিত্বের কোন পরিচয় পাই নাই। অশোক, চন্দ্রগুপ্ত, বিক্রমাদিত্য, শকাদিত্য, শিলাদিত্য—কাহারও সেনাপতিত্বের কোন পরিচয় পাই না। যাঁহারা ভারতবর্ষ জয় করিয়াছিলেন, মহম্মদ কাসিম, গজনবী মহম্মদ, সাহাবুদ্দীন, আলাউদ্দিন, বাবর, তৈমুর, নাদের, শের—কাহারও সেনাপতিত্বের কোন পরিচয় পাই না। বোধ হয়, মুসলমান লেখকেরাও ইহা বুঝিতেন না। আক্‌বরের সময় হইতেই এই সেনাপতিত্বের কতক কতক পরিচয় পাওয়া যায়। আক্‌বর, শিবজী, আমদদ আবদালী, হৈদর আলি, হরি সিং প্রভৃতিতে সেনাপতিত্বের লক্ষণ—রণপাণ্ডিত্যের লক্ষণ দেখা যায়। ভারতবর্ষের ইতিহাসে যত রণপণ্ডিতের কথা আছে, রাজসিংহ কাহারও অপেক্ষা ন্যূন নহেন। ইউরোপেও এরূপ রণপণ্ডিত অতি অল্পই জন্মিয়া-ছিল। অল্প সেনার সাহায্যে এরূপ বৃহৎকার্য্য

ওলন্দাজবীর মূকাখ্য উইলিয়মের পর পৃথিবীতে আর কেহ করে নাই।

সে অপূর্ব্ব সেনাপতিত্বের পরিচয় দিবার এ স্থল নহে। সংক্ষেপে বলিব।

চতুর্ভাগে বিভক্ত ঔরঙ্গজেবের মহতী সেনা সমাগত হইলে রণপণ্ডিতের যাহা কর্ত্তব্য, রাজসিংহ প্রথমেই তাহা করিলেন। পর্ব্বতমালার বাহিরে রাজ্যের যে অংশ সমতল, তাহা ছাড়িয়া দিয়া পর্ব্বতোপরি আরোহণ করিয়া সেনা সংস্থাপিত করিলেন। তিনি নিজ সৈন্য তিন ভাগে বিভক্ত করিলেন। এক ভাগ তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র জয়সিংহের কর্ত্তৃত্বাধীনে পর্ব্বতশিখরে সংস্থাপিত করিলেন; দ্বিতীয় ভাগ, দ্বিতীয় পুত্র ভীমসিংহের অধীনে পশ্চিমে সংস্থাপিত করিলেন; সে দিকের পথ খোলা থাকে, অন্যান্য রাজপুতগণ সেই পথে প্রবেশ করিয়া সাহায্য করেন, ইহাও অভিপ্রেত। নিজে তৃতীয় ভাগ লইয়া পূর্ব্বদিকে নয়ন নামে গিরিশঙ্কট-মধ্যে উপবিষ্ট হইলেন।

আজম শাহ সৈন্য লইয়া যেখানে উপস্থিত হইলেন, সেখানে ত পর্ব্বতমালায় তাঁহার গতিরোধ হইল। আরোহণ করিবার সাধ্য নাই, উপর হইতে গোলা ও শিলাবৃষ্টি হয়। ক্রিয়াবাড়ীর দ্বার বন্ধ হইলে কুকুর যেমন রুদ্ধ দ্বার ঠেলাঠেলি করে, কিছু করিতে পারে না, তিনি সেইরূপ পার্ব্বত্য দ্বার ঠেলাঠেলি করিতে লাগিলেন—ঢুকিতে পাইলেন না।

ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে আজমীরে আক্‌ব্বরের মিলন হইল। পিতাপুত্র সৈন্য মিশাইয়া পর্ব্বতমালার মধ্য যেখানে তিনটি পথ খোলা, সে দিকে আসিলেন। এই তিনটি পথ গিরিশঙ্কট। একটির নাম দোবারি, আর একটি দয়েলবারা; আর একটি পূর্ব্বকথিত নয়ন। দোবারিতে পৌঁছিলে পর ঔরঙ্গজেব আক্‌ব্বরকে ঐ পথে পঞ্চাশ হাজার সৈন্য লইয়া আগে আগে যাইতে অনুমতি করিয়া উদয়সাগর নামে বিখ্যাত সরোবরতীরে শিবির সংস্থাপন পূর্ব্বক স্বয়ং কিঞ্চিৎ বিশ্রামলাভের চেষ্টা করিলেন।

শাহজাদা আক্‌ব্বর পার্ব্বত্যপথে উদয়পুরে প্রবেশ করিতে চলিলেন। জনপ্রাণী তাঁহার গতিরোধ করিল না; রাজপ্রাসাদমালা, উপবনশ্রেণী, সরোবর, তন্মধ্যস্থ উপদ্বীপ সকল দেখিলেন, কিন্তু মনুষ্যমাত্র দেখিতে পাইলেন না। সমস্ত নীরব। আক্‌ব্বর তখন শিবির সংস্থাপন করিলেন, মনে করিলেন যে, তাঁহার ফৌজের ভয়ে দেশের লোক পলাইয়াছে। মোগলশিবিরে আমোদ-প্রমোদ হইতে লাগিল। কেহ ভোজনে, কেহ খেলায়, কেহ নেমাজে রত। এমন সময় সুপ্ত পথিকের উপর যেমন বাঘ লাফাইয়া পড়ে, কুমার জয়সিংহ তেমনই শাহজাদা আক্‌ব্বরের উপর লাফাইয়া পড়িলেন। বাঘ প্রায় সমস্ত মোগলকে দংষ্ট্রামধ্যে পুরিল—প্রায় কেহ বাঁচিল না। পঞ্চাশ সহস্র মোগলের মধ্যে অল্পই ফিরিল। শাহজাদা গুজরাট অভিমুখে পলাইলেন।

মাজুম শাহ, যাঁহার নামান্তর শাহ আলম, তিনি দাক্ষিণাত্য হইতে সৈন্যরাশি লইয়া আহম্মদাবাদ ঘুরিয়া পর্ব্বতমালার পশ্চিম প্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই পথ গণরাও নামক পার্ব্বত্য-পথ। তিনি সেই পথ উত্তীর্ণ হইয়া কাঁকরলির সমীপবর্ত্তী সরোবর ও রাজপ্রাসাদমালার নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, আর পথ নাই। পথ করিয়া অগ্রসর হইতেও পারেন না। তাহা হইলে রাজপুতেরা তাঁহার পশ্চাতে পথ বন্ধ করিবে—রসদ আনিবার আর উপায় থাকিবে না—না খাইয়া মরিবেন। যাঁহারা যথার্থ সেনাপতি, তাঁহারা জানেন যে, হাতে মারিলে যুদ্ধ জয় হয় না—পেটে মারিতে হয়। যাঁহারা যথার্থ সেনাপতি, তাঁহারা জানেন যে, পেট চলিবার উপায় বজায় রাখিয়া—হাত চালান চাই। শিখেরা আজিও রোদন করিয়া বলে, শিখ সেনাপতিরা শিখ সেনার রসদ বন্ধ করিল বলিয়া শিখ পরাজিত হইল। সার বার্টল ফ্রিয়র একদা বলিয়াছিলেন, বাঙ্গালী যুদ্ধ করিতে জানে না বলিয়া ঘৃণা করিও না—বাঙ্গালী এক দিনে সমস্ত খাদ্য লুকাইতে পারে। শাহ আলম যুদ্ধ বুঝিতেন, সুতরাং আর অগ্রসর হইলেন না।

রাজসিংহের সেনাসংস্থাপনের গুণে [এইটিই সেনাপতির প্রধান কার্য্য] বাঙ্গালার সেনা ও দাক্ষিণাত্যের সেনা বৃষ্টিকালে কপিদলের মত—কেবল জড়সড় হইয়া বসিয়া রহিল। সুলতানের সেনা ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া ঝড়ের মুখে ধূলার মত কোথায় উড়িয়া গেল। বাকি খোদ বাদশাহ—দুনিয়াবাজ বাদ্‌শাহ আলমগীর।

—

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নয়নবহ্নিও বুঝি জ্বলিয়াছিল

শাহজাদা আক্‌বর শাহকে আগে পাঠাইয়া, খোদ বাদশাহ উদয়সাগরতীরে শিবির ফেলিয়াছেন। পাশ্চাত্য পরিব্রাজক, মোগলদিগের দিল্লী দেখিয়া বলিয়াছিলেন,—দিল্লী একটি বৃহৎ শিবির মাত্র। পক্ষান্তরে, ইহা বলা যাইতে পারে যে, মোগল বাদশাহদিগের শিবির একটি দিল্লী নগরী। নগরের যেমন চক, তেমনই বড় বড় চক সাজাইয়া তাম্বু পাতা হইত। এমন অসংখ্য চত্বরশ্রেণীতে একটি বস্ত্রনির্ম্মিতা মহানগরীর সৃষ্টি হইত। সকলের মধ্যে বাদশাহের তাম্বুর চক। দিল্লীতে যেমন মহার্ঘ্য হর্ম্ম্যশ্রেণীমধ্যে বাদশাহ বাস করিতেন, তেমনই মহার্ঘ্য হর্ম্ম্যশ্রেণীমধ্যে এখানেও বাস করিতেন; তেমনই দরবার, আমখাস, গোসলখানা,* রঙ্‌মহাল। এই সকল বাদশাহী তাম্বু কেবল বস্ত্রনির্ম্মিত নহে। ইহার লৌহ-পিত্তলের সজ্জা ছিল—এবং ইহাতে দ্বিতল ত্রিতল কক্ষও থাকিত। সম্মুখে দিল্লীর দুর্গের ফটকের ন্যায় ফটক। বাদশাহী তাম্বুসকলের বস্ত্রনির্ম্মিত প্রাচীর'ও পট পাদ-ক্রোশ দীর্ঘ, সমস্তই চারুকারুকার্য্যখচিত পট্টবস্ত্র-নির্ম্মিত। যেমন দুর্গপ্রাচীরে বুরুজ, গম্বুজ প্রভৃতি থাকিত, ইহাতেও তাহা ছিল। পিত্তলের স্তম্ভের দ্বারা এই প্রাচীর রক্ষিত হইত। কক্ষসকলের বাহিরে উজ্জ্বল রক্তিম পটের শোভা, ভিতরে সমস্ত দেওয়াল "ছবি"-মোড়া। ছবি আমরা এখন যাহাকে বলি, তাই অর্থাৎ কাচের পরকলার ভিতর চিত্র। দরবার-তাম্বুতে শিরোপরি সুবর্ণখচিত চন্দ্রাতপ—নিম্নে বিচিত্র গালিচা, মধ্যে রত্নমণ্ডিত রাজসিংহাসন। চারিদিকে অস্ত্রধারিণী তাতারসুন্দরীগণের প্রহরা।

রাজপ্রাসাদাবলীর পরে আমীর-ওমরাহদিগের পটমণ্ডপরাজির শোভা। এমন শোভা অনেক ক্রোশ ব্যাপিয়া। কোন পটনির্ম্মিত অট্টালিকা রক্তবর্ণ, কোনটি পীতবর্ণ, কোনটি শ্বেত, কোনটি হরিৎ-কপিশ, কোনটি নীল; সকলের সুবর্ণ-কলস চন্দ্র-সূর্য্যের কিরণে ঝলসিতে থাকে। তীরে এই সকলের চারিদিকে দিল্লীর চকের ন্যায় বিচিত্র পণ্য-বীথিকা, বাজারের পর বাজার। সহসা বাদশাহের শুভাগমনে উদয়সাগর-তীরে এই রমণীয় মহানগরীর সৃষ্টি হইল দেখিয়া লোক বিস্ময়াপন্ন হইল।

বাদশাহ যখন শিবিরে আসিতেন, তখন অন্তঃপুরবাসিনী সকলেই সঙ্গে আসিত। বেগমরা সকলেই আসিত। এবারও আসিয়াছিল। যোধপুরী, উদিপুরী, জেব-উন্নিসা, সকলেই আসিয়াছিল। যোধপুরীর সঙ্গে নির্ম্মলকুমারীও আসিয়াছিল। দিল্লীর রঙ্‌মহালে যেমন তাহাদের পৃথক্ পৃথক্ মন্দির ছিল, শিবিরের রঙ্‌মহালেও তেমনই তাহাদের পৃথক্ পৃথক্ মন্দির ছিল।

এই সুখের শিবিরে, ঔরঙ্গজেব রাত্রিকালে যোধপুরীর মহালে আসিয়া সুখে কথোপকথন করিতেছেন। নির্ম্মলকুমারীও সেখানে উপস্থিত।

"ইম্‌লি বেগম!" বলিয়া বাদশাহ নির্ম্মলকে ডাকিলেন। নির্ম্মলকে তিনি ইতিপূর্ব্বে "নিম্‌লি বেগম" বলিতেন, কিন্তু বাক্যের যন্ত্রণা ভুগিয়া এক্ষণে "ইম্‌লি বেগম" বলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। বাদশাহ নির্ম্মলকে বলিলেন, "ইম্‌লি বেগম! তুমি আমার না রাজপুতের?" নির্ম্মল যুক্তকরে বলিল, "দুনিয়ার বাদশাহ দুনিয়ার বিচার করিতেছেন, এ কথারও তিনি বিচার করুন।"

ঔরঙ্গ। আমার বিচারে এই হইতেছে যে, তুমি রাজপুতের কন্যা, রাজপুত তোমার স্বামী, তুমি রাজপুতমহিষীর সখী—তুমি রাজপুতেরই।

নির্ম্মল। জাঁহাপনা! বিচার কি ঠিক হইল? আমি রাজপুতের কন্যা বটে, কিন্তু হজরৎ যোধপুরীও তাই। আপনার পিতামহী ও প্রপিতামহীও তাই—তাঁহারা মোগল বাদশাহের হিতাকাঙ্ক্ষিণী ছিলেন না কি?

ঔরঙ্গ। ইঁহারা মোগল বাদশাহের বেগম, তুমি রাজপুতের স্ত্রী।

নি। (হাসিয়া) আমি শাহান্‌শাহ আলম্‌গীর বাদশাহের ইম্‌লি বেগম।

ঔ। তুমি রূপনগরীর সখী।

নি। যোধপুরীরও তাই।

ঔ। তবে তুমি আমার?

নি। আপনি যেমন বিবেচনা করেন।

ঔ। আমি তোমাকে একটি কার্য্যে নিযুক্ত করিতে চাই। তাহাতে আমার উপকার আছে, রাজসিংহের অনিষ্ট আছে; এমন কার্য্যে তোমাকে নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা করি, তুমি তাহা করিবে?

---

* যাহাকে মোগল বাদশা[illegible] গোসলখানা বলিতেন, তাহাতে আধুনিক বৈঠকখ[illegible]র মত কার্য্য হইত, সেইটি আয়েশের স্থান।

নি। কি কার্য্য তাহা না জানিলে আমি বলিতে পারি না। আমি কোন দেবতাব্রাহ্মণের অনিষ্ট করিতে পারিব না।

ঔ। আমি তোমাকে সে সব কিছু করিতে বলিব না। আমি উদয়পুর নগর দখল করিব—রাজসিংহের রাজপুরী দখল করিব, সে সকল বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু রাজপুরী দখল হইলে পর রূপনগরীকে হস্তগত করিতে পারিব কি না সন্দেহ। তুমি সেই বিষয়ে সহায়তা করিবে।

নি। আমি আপনার নিকট গঙ্গাজী যমুনাজীর শপথ করিতেছি যে, আপনি যদি উদয়পুরের রাজপুরী দখল করেন, তবে আমি চঞ্চলকুমারীকে আনিয়া আপনার হস্তে সমর্পণ করিব।

ঔ। সে কথা বিশ্বাস করি, কেন না, তুমি নিশ্চয় জান যে, যে আমার সঙ্গে প্রবঞ্চনা করে, তাহাকে টুক্‌রা টুক্‌রা কাটিয়া কুকুরকে খাওয়াইতে পারি।

নি। পারেন কি না, সে বিষয়ের বিচার হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি আপনাকে প্রবঞ্চনা করিব না। তবে আপনি পুরী অধিকার করার পর তাহাকে আমি জীবিত পাইব কি না সন্দেহ। রাজপুতমহিষীদিগের রীতি এই যে, শত্রুর হস্তে পড়িবার আগে চিতায় পাড়য়া পুড়িয়া মরে। তাহাকে জীবিত পাইব না বলিয়াই এ কথা স্বীকার করিতেছি। নহিলে আমা হইতে চঞ্চলকুমারীর কোন অনিষ্ট ঘটিবে না।

ঔ। ইহাতে অনিষ্ট কি? সে ত বাদশাহের বেগম হইবে।

নির্ম্মল উত্তর করিতে যাইতেছিল, এমন সময়ে খোজা আসিয়া নিবেদন করিল, "পেস্কার দরবারে হাজির, জরুরি আরজি পেস্ করিবে। হজরত শাহজাদা আকব্বর শাহের সংবাদ আসিয়াছে।"

ঔরঙ্গজেব অতিশয় ব্যস্ত হইয়া দরবারে গেলেন। পেস্কার আর্‌জি পেস্ করিল। ঔরঙ্গজেব শুনিলেন, আক্‌ব্বরের পঞ্চাশ হাজার মোগল সেনা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া প্রায় নিঃশেষে নিহত হইয়াছে। হতাবশিষ্ট কোথায় পলায়ন করিয়াছে, কেহ জানে না।

ঔরঙ্গজেব তখনই শিবির ভঙ্গ করিতে আজ্ঞা দিলেন।

আক্‌ব্বরের সংবাদ রঙ্‌মহালেও পৌঁছিল। শুনিয়া নির্ম্মলকুমারী পেশোয়াজ পরিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া যোধপুরী বেগমের নিকট রূপনগরী নাচের মহলা দিল।

বেশভূষা পরিত্যাগ করিয়া নির্ম্মলকুমারী ভাল মানুষ হইয়া বসিলে, বাদশাহ তাহাকে তলব করিলেন। নির্ম্মল হাজির হইলে বাদশাহ বলিলেন, "আমরা তাম্বু ভাঙ্গিতেছি—লড়াইয়ে যাইব—তুমি কি এখন উদয়পুরে যাইতে চাও?"

নি। না, একণে আমি ফৌজের সঙ্গে যাইব। যাইতে যাইতে যেখানে সুবিধা বুঝিব, সেইখান হইতে চলিয়া যাইব।

ঔরঙ্গজেব একটু দুঃখিতভাবে বলিলেন, "কেন যাইবে?"

নির্ম্মল বলিল, "শাহান্‌শাহের হুকুম।"

ঔরঙ্গজেব প্রফুল্লভাবে বলিলেন, "আমি যদি যাইতে না দিই, তুমি কি চিরদিন আমার রঙ্‌মহালে থাকিতে সম্মত হইবে?"

নির্ম্মলকুমারী যুক্তকরে বলিল, "আমার স্বামী আছেন।"

ঔরঙ্গজেব একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "যদি তুমি ইসলাম-ধর্ম্ম গ্রহণ কর, যদি সে স্বামী ত্যাগ কর, তবে উদিপুরী অপেক্ষা তোমাকে গৌরবে রাখিব।"

নির্ম্মল একটু হাসিয়া অথচ সসম্ভ্রমে বলিল, "তাহা হইবে না, জাঁহাপনা।"

ঔ। কেন হইবে না? কত রাজপুতরাজকন্যা ত মোগলের ঘরে আসিয়াছে।

নি। তাহারা কেহ স্বামী ত্যাগ করিয়া আসে নাই।

ঔ। যদি তোমার স্বামী না থাকিত, তাহা হইলে আসিতে?

নি। এ কথা কেন?

ঔ। কেন, তাহা বলিতে আমার লজ্জা করে। আমি তেমন কথা কখনও কাহাকেও বলি নাই। আমি প্রাচীন হইয়াছি, কিন্তু কখনও কাহাকেও ভালবাসি নাই। এ জন্মে কেবল তোমাকেই ভালবাসিয়াছি। তাই, তুমি যদি বল যে, তোমার স্বামী না থাকিলে তুমি আমার বেগম হইতে, তাহা হইলে এ স্নেহশূন্য হৃদয়—পোড়া পাহাড়ের মত হৃদয়—একটু স্নিগ্ধ হয়।

নির্ম্মল ঔরঙ্গজেবের কথায় বিশ্বাস করিল—কেন না, ঔরঙ্গজেবের কণ্ঠের স্বর বিশ্বাসের যোগ্য বলিয়া বোধ হইল। নির্ম্মল ঔরঙ্গজেবের জন্য কিছু দুঃখিত হইয়া বলিল, "জাঁহাপনা, এ বাঁদী এমন কি কাজ করিয়াছে যে, সে আপনার ভালবাসার যোগ্য হয়?"

ঔ। তাহা বলিতে পারি না। তুমি সুন্দরী বটে, কিন্তু সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইবার বয়স আমার আর নাই। আর তুমি সুন্দরী হইলেও, উদিপুরী অপেক্ষা নও। বোধ করি, আমি তোমার কাছে ভিন্ন আর কোথাও সত্য কথা কখন পাই নাই, সেই জন্য। বোধ করি, তোমার বুদ্ধি, চতুরতা আর সাহস দেখিয়া তোমাকেই আমার উপযুক্ত মহিষী বলিয়া বিশ্বাস হইয়াছে। যাই হউক, আলমগীর বাদশাহ তোমার ভিন্ন আর কাহারও কখন বশীভূত হয় নাই। আর কাহারও চক্ষুর কটাক্ষে মোহিত হয় নাই।

নি। শাহান্‌শাহ! আমাকে একদা রূপনগরের রাজকন্যা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, "তুমি কাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা কর?" আমি বলিয়াছিলাম, আলমগীর বাদশাহকে। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেন'? আমি তাঁহাকে বুঝাইলাম যে, আমি বাল্যকালে বাঘ পুষিয়াছিলাম, বাঘকে বশ করাতেই আমার আনন্দ ছিল। বাদশাহকে বশ করিতে পারিলে আমার সেই আনন্দ হইবে। আমার ভাগ্যবশতঃই অবিবাহিত অবস্থায় আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয় নাই। আমি যে দীন-দরিদ্রকে স্বামিত্বে বরণ করিয়াছি, তাহাতেই আমি সুখী। এক্ষণে আমায় বিদায় দিন।

ঔরঙ্গজেব দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "দুনিয়ার বাদশাহ হইলেও কেহ সুখী হয় না—কাহারও সাধ মিটে না। এ পৃথিবীতে আমি কেবল তোমায় ভালবাসিয়াছি, কিন্তু তোমাকে পাইলাম না। তোমায় ভালবাসিয়াছি, অতএব তোমায় আটকাইব না—ছাড়িয়া দিব। তুমি যাহাতে সুখী হও, তাহাই করিব। যাহাতে তোমার দুঃখ হয়, তাহা করিব না। তুমি যাও। আমাকে স্মরণ রাখিও। যদি কখনও আমা হইতে তোমার কোন উপকার হয়, আমাকে জানাইও। আমি তাহা করিব।"

নির্ম্মল কুর্ণিশ করিল। বলিল, "আমার একটি মাত্র ভিক্ষা রহিল। যখন উভয় পক্ষের মঙ্গলার্থ সন্ধি করিতে আমি আপনাকে অনুরোধ করিব, তখন আমার কথায় কর্ণপাত করিবেন।"

ঔরঙ্গজেব বলিলেন, "সে কথার বিচার সেই সময়ে হইবে।"

তখন নির্ম্মল ঔরঙ্গজেবকে তাঁহার কপোত দেখাইল। বলিল, "এ শিক্ষিত পায়রা আপনি রাখিবেন। যখন এ দাসীকে [illegible] স্মরণ করিবেন, এই পায়রাটি আপনি ছাড়িয়া দিবেন। ইহা দ্বারা আমার নিবেদন আপনাকে জানাইব। আমি এক্ষণে সৈন্যের সঙ্গেই রহিলাম। যখন আমার বিদায় লইবার সময় হইবে, বেগমসাহেবা যেন আমাকে বিদায় দেন, এই অনুমতি তাঁর প্রতি থাক।"

তখন ঔরঙ্গজেব সৈন্যচালনার ব্যবস্থা করিতে নিযুক্ত হইলেন।

কিন্তু তাঁহার মনে বড় বিষাদ উপস্থিত হইল। নির্ম্মলের মত কথোপকথনে সাহস, বাক্‌চাতুর্য্য এবং স্পষ্টবক্তৃত্ব মোগল বাদশাহ আর কোথাও দেখেন নাই। যদি কোন রাজা—শিবাজী বা রাজসিংহ, যদি কোন সেনাপতি—দিলীর কি তয়বার, যদি কোন শাহজাদা—আজিম কি আক্‌ব্বর এরূপ সাহসে এরূপ স্পষ্ট কথা বলিত, ঔরঙ্গজেব তাহা সহ্য করিতেন না। কিন্তু রূপবতী, যুবতী, সহায়হীনা নির্ম্মলের কাছে তাহা মিষ্ট লাগিত। বুড়ার উপর যতটুকু কন্দর্পের অত্যাচার হইতে পারে, বোধ হয়, তাহা হইয়াছিল। তিনি প্রেমান্ধের মত বিচ্ছেদে শোকে শোকাকুল না হইয়া একটু বিষণ্ণ হইলেন মাত্র। ঔরঙ্গজেব মার্ক আন্তনি বা অগ্নিবর্ণ ছিলেন না, কিন্তু মনুষ্য কখন পাষাণও হয় না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বাদশাহ বহ্নিচক্রে

প্রভাতে বাদশাহী সেনা কুচ করিতে আরম্ভ করিল। সর্ব্বাগ্রে পথপরিষ্কারক সৈন্য পথ পরিষ্কারের জন্য সশস্ত্রে ধাবিত। তাহাদের অস্ত্র কোদালি, কুড়ালি, দা ও কাটারি। তাহারা সম্মুখের গাছ সকল কাটিয়া, সরাইয়া, খানা-পয়গার বুজাইয়া মাটী চাঁচিয়া বাদশাহী সেনার জন্য প্রশস্ত পথ প্রস্তুত করিয়া অগ্রে অগ্রে চলিল। সেই প্রশস্ত পথে কামানের শ্রেণী, শকটের উপর আরূঢ় হইয়া ঘড়্‌-ঘড়্‌ হড়্‌-হড়্‌ করিয়া চলিল—সঙ্গে গোলন্দাজ সেনা। অসংখ্য গোলন্দাজি গাড়ীর ঘড়্‌-ঘড়্‌ শব্দে কর্ণ বধির,—তাহার চক্রসহস্র হইতে বিঘূর্ণিত উর্দ্ধোত্থিত ধূলিজালে নয়ন অন্ধ; কালান্তক যমের ন্যায় ব্যাদিতাস্য কামানসকলের আকার দেখিয়া হৃদয় কম্পিত। এই গোলন্দাজ সেনার পশ্চাৎ রাজ-কোষাগার। বাদশাহী কোষাগার সঙ্গে সঙ্গে চলিত; দিল্লীতে কাহাকেও বিশ্বাস করিয়া ঔরঙ্গজেব ধনরাশি রাখিয়া যাইতে পারিতেন না। ঔরঙ্গজেবের সাম্রাজ্যশাসনের মূলমন্ত্র সর্ব্বজনে অবিশ্বাস। ইহাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, এইবার

দিল্লী হইতে যাত্রা করিয়া ঔরঙ্গজেব আর কখন দিল্লী ফিরিলেন না। শতাব্দীর একপাদ শিবিরে শিবিরে ফিরিয়া দাক্ষিণাত্যে প্রাণত্যাগ করিলেন।

অনন্ত ধনরত্নরাজিপরিপূর্ণ গজাদিবাহিত রাজকোষের পর বাদশাহী দফ্‌তরখানা চলিল। থাকে থাকে থাকে, গাড়ী, হাতী, উটের উপর সাজান খাতাপত্র বহিজাত ; সারির পর সারি, শ্রেণীর পর শ্রেণী ; অসংখ্য, অনন্ত, চলিতে লাগিল। তার পর গঙ্গাজলবাহী উটের শ্রেণী। গঙ্গাজলের মত সুপেয় কোন নদীর জল নহে, তাই বাদশাহদিগের সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গার জল চলিত। জলের পর আহার্য্য—আটা, ঘৃত, চাউল, মশলা, শর্করা, নানাবিধ পক্ষী, চতুষ্পদ—প্রস্তুত, অপ্রস্তুত, পক্ব, অপক্ব, ভক্ষ্য চলিত। তার পর সঙ্গে সঙ্গে সহস্র সহস্র বাবুর্চি। তৎপশ্চাৎ তোষাখানা—এল্‌বাস-পোষাকের, জেওরাতের হুড়াহুড়ি ছড়াছড়ি ; তার পর অগণনীয় অশ্বারোহী মোগলসেনা।

এই গেল সৈন্যের প্রথম ভাগ। দ্বিতীয় ভাগে বাদশাহ খোদ। আগে আগে অসংখ্য উষ্ট্রশ্রেণীর উপর জলন্ত বহ্নিবাহী বৃহৎ কটাহসকলে ধূনা, গুগ্‌গুল, চন্দন, মৃগনাভি প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য। সুগন্ধে ক্রোশ ব্যাপিয়া পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ আমোদিত, তৎপশ্চাৎ বাদশাহী খাস আহদী সেনা, দোষ-শূন্য রমণীয় অশ্বরাজির উপর আরূঢ়, দুই পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া চলিতেছে। মধ্যে বাদশাহ নিজে মণিরত্নকিঙ্কিণীজালাদি শোভায় উজ্জ্বল উচ্চৈঃশ্রবা তুল্য অশ্বের উপর আরূঢ়—শিরোপরি বিখ্যাত শ্বেতচ্ছত্র। তার পর সৈন্যের সার, দিল্লীর সার, বাদশাহীর সার—ঔরঙ্গজেবের অবরোধবাসিনী সুন্দরীসম্প্রদায়। কেহ বা ঐরাবততুল্য গজপৃষ্ঠে, সুবর্ণনির্ম্মিত কারুকার্য্যবিশিষ্ট মখমলে মোড়া, মুক্তাঝালরভূষিত অতিসূক্ষ্ম লূতাতন্তু-তুল্য রেশমী বস্ত্রে আবৃত হাওদার ভিতরে অতি ক্ষীণমেঘাবৃত উজ্জ্বল পূর্ণচন্দ্রতুল্য জ্বলিতেছে, রত্নমালাজড়িত কালভুজঙ্গীতুল্য বেণী পৃষ্ঠে দুলিতেছে ; কৃষ্ণতার বৃহচ্চক্ষুর মধ্যে কালাগ্নিতুল্য কটাক্ষ খেলিতেছে ; উপরে কালো ভ্রূযুগল, নীচে সুরমার রেখা, তাহার মধ্যে সেই বিদ্যুদ্দামবিস্ফূরণে, সমস্ত সৈন্য বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিতেছে ; মধুর তাম্বূলারক্ত অধরে মাধুর্য্যময়ী সুন্দরীকুল মধুর মধুর হাসিতেছে। এমন এক জন নয়, দুই জন নয়—হাতীর গায়ে হাতী, হাতীর পিছু হাতী, তার পিছু হাতী। সকলের উপরেই তেমনই হাওদা, সকল হাওদার ভিতর তেমনই সুন্দরী, সকল সুন্দরীর নয়নেই মেঘযুগলমধ্যস্থ বিদ্যুদ্দামের ক্রীড়া ! কালো পৃথিবী আলো হইয়া গেল। কেহ বা কদাচিৎ দোলায় চলিল—দোলার বাহিরে কিংখাপ, ভিতরে জরদোজী কামদার মখমল, উপরে মুক্তার ঝালর, রূপার দাণ্ডা, সোনার হাঙ্গর—তাহার ভিতর রত্নমণ্ডিতা সুন্দরী। যোধপুরী ও নির্ম্মলকুমারী, উদিপুরী ও জেব-উন্নিসা—ইঁহারা গজ পৃষ্ঠে। উদিপুরী হাস্যময়ী। যোধপুরী অপ্রসন্না। নির্ম্মলকুমারী রহস্যময়ী। জেব-উন্নিসা গ্রীষ্মকালের উন্মূলিতা লতার মত ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন, পরিশুষ্ক, শীর্ণ, মৃত-কল্প। জেব-উন্নিসা ভাবিতেছিল, "এ হাতিয়ার-লহরীমাঝে আমার ডুবিয়া মরিবার কি উপায় নাই ?"

এই মনোমোহিনী বাহিনীর পশ্চাৎ কুটুম্বিনী ও দাসীবৃন্দ। সকলেই অশ্ব রূঢ়া, লম্বিতবেণী, রক্তাধরা, বিদ্যুৎকটাক্ষা ; অলঙ্কারশিঞ্জিতে ঘোড়াসকল নাচিয়া উঠিতেছে। এই অশ্বারোহিণী বাহিনীও অতিশয় লোকমনোমোহিনী। ইহাদের পশ্চাতে আবার গোলন্দাজ সেনা। কিন্তু ইহাদের কামান অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। বাদশাহ বুঝি স্থির করিয়াছিলেন, কামিনীর কমনীয় কটাক্ষের পর আর বড় কামানের প্রয়োজন নাই।

তৃতীয় ভাগে পদাতি-সৈন্য। তৎপশ্চাৎ দাসদাসী, মুটে, মজুর, নর্ত্তকী প্রভৃতি বাজে লোক, খালি ঘোড়া, তাম্বুর রাশি এবং মোট-ঘাট।

যেমন ঘোরনাদে গ্রাম, প্রদেশ ভাসাইয়া তিমিমকর-আবর্ত্তাদিতে ভয়ঙ্করী, বর্ষাবিপ্লাবিতা স্রোতস্বতী ক্ষুদ্র সৈকত ডুবাইতে যায়, তেমনই মহাকোলাহলে মহাবেগে এই পরিমাণরহিতা অসংখ্যেয়া বিস্ময়করী মোগলবাহিনী রাজসিংহের রাজ্য ডুবাইতে চলিল।

কিন্তু হঠাৎ একটা প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইল। যে পথে আক্‌ব্বর সৈন্য লইয়া গিয়াছিলেন, ঔরঙ্গজেবও সেই পথে সৈন্য লইয়া যাইতেছিলেন। অভিপ্রায় এই যে, আক্‌ব্বর শাহের সৈন্যের সঙ্গে নিজ সৈন্য মিলিত করিবেন। মধ্যে যদি কুমার জয়সিংহের সৈন্য পান, তবে তাঁহাকে মাঝে ফেলিয়া টিপিয়া মারিবেন, পরে দুই জনে উদয়পুর প্রবেশ করিয়া রাজ্যধ্বংস করিবেন। কিন্তু পার্ব্বত্যপথে আরোহণ করিবার পূর্ব্বে সবিস্ময়ে দেখিলেন যে, রাজসিংহ ঊর্দ্ধে, পর্ব্বতের উপত্যকায় তাঁহার পথের পার্শ্বে সৈন্য লইয়া বসিয়া আছেন। রাজসিংহ নয়ন-নামা গিরি-সঙ্কটে পার্ব্বত্য পথ রোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু অতি দ্রুতগামী দূতমুখে আক্‌ব্বরের সংবাদ শুনিয়া

রণপাণ্ডিত্যের অদ্ভুত প্রতিভার বিকাশ করিয়া, আমিষলোলুপ শ্যেনপক্ষীর মত দ্রুতবেগে সেনা সহিত পূর্ব্বপরিচিত পার্ব্বত্যপথ অতিক্রম করিয়া এই গিরিসানুদেশে সসৈন্যে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন।

মোগল দেখিল, রাজসিংহের এই অদ্ভুত রণপাণ্ডিত্যে তাহাদিগের সর্ব্বনাশ উপস্থিত। কেন না, মোগলেরা যে পথে যাইতেছিল, সে পথে আর চলিলে রাজসিংহকে পার্শ্বে রাখিয়া যাইতে হয়; শত্রুসৈন্যকে পার্শ্বে রাখিয়া যাওয়ার অপেক্ষা বিপদ অল্পই আছে। পার্শ্ব হইতে যে আক্রমণ করে, তাহাকে রণে বিমুখ করা যায় না, সেই জয়ী হইয়া বিপক্ষকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলে। শালামাঙ্কা ও ঔন্তরলিজে ইহাই ঘটিয়াছিল। ঔরঙ্গজেবও এই স্বতঃসিদ্ধ রণতত্ত্ব জানিতেন। তিনি ইহাও জানিতেন যে, পার্শ্বস্থিত শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করা যায় বটে, কিন্তু তাহা করিতে গেলে নিজ সৈন্যকে ফিরাইয়া শত্রুর সম্মুখবর্ত্তী করিতে হয়। এই পার্ব্বত্যপথে তাদৃশ মহতী সেনা ফিরাইবার ঘুরাইবার স্থান নাই এবং সময়ও পাওয়া যাইবে না। কেন না, সেনার মুখ ফিরাইতে না ফিরাইতে রাজসিংহ পর্ব্বত হইতে অবতরণ পূর্ব্বক তাঁহার সেনা দুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়া এক এক খণ্ড পৃথক করিয়া বিনষ্ট করিতে পারেন। এরূপ যুদ্ধে সাহস করা অকর্ত্তব্য। তার পর, এমন হইতে পারে, রাজসিংহ যুদ্ধ না করিতেও পারেন। নির্ব্বিঘ্নে ঔরঙ্গজেবকে যাইতে দিতেও পারেন। তাহা হইলে আরও বিপদ। তাহা হইলে ঔরঙ্গজেব চলিয়া গেলে রাজসিংহ পর্ব্বতাবতরণ করিয়া ঔরঙ্গজেবের পশ্চাদ্গামী হইবেন। হইলে তিনি যে মোগলের পশ্চাদ্বর্ত্তী মাল, আসবাব লুটপাট ও সেনা ধ্বংস করিবেন, সে-ও ক্ষুদ্র কথা। আসল কথা, রসদের পথ বন্ধ হইবে। সম্মুখে কুমার জয়সিংহের সেনা। রাজসিংহের সেনা ও জয়সিংহের সেনা উভয়ের মধ্যে পড়িয়া ফাঁদের ভিতর প্রবিষ্ট মূষিকের মত দিল্লীর বাদশাহ সসৈন্যে নিহত হইবেন।

ফলে দিল্লীশ্বরের অবস্থা জালনিবদ্ধ রোহিতের মত,—কোনমতেই নিস্তার নাই। তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারেন, কিন্তু তাহা হইলে রাজসিংহ তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইবেন। তিনি উদয়পুরের রাজ্য অতল জলে ডুবাইতে আসিয়াছিলেন—সে কথা দূরে থাকুক, এখন উদয়পুরের রাজা তাঁহার পশ্চাৎ করতালি দিতে দিতে ছুটিবে, পৃথিবী হাসিবে। মোগল বাদশাহের অপরিমিত গৌরবের পক্ষে ইহার অপেক্ষা অবনতি আর কি হইতে পারে?

ঔরঙ্গজেব ভাবিলেন—সিংহ হইয়া মূষিকের ভয়ে পলাইব? কিছুতেই পলায়নের কথাকে মনে স্থান দিলেন না।

তখন আর কি হইতে পারে? একমাত্র ভরসা—উদয়পুরে যাইবার যদি অন্য পথ থাকে। ঔরঙ্গজেবের আদেশে চারিদিকে অশ্বারোহী পদাতি অন্য পথের সন্ধানে ছুটিল। ঔরঙ্গজেব নির্ম্মলকুমারীকেও জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন। নির্ম্মলকুমারী বলিল, "আমি পরদানশীন স্ত্রীলোক—পথের কথা আমি কি জানি?" কিন্তু অল্পকাল মধ্যে সংবাদ আসিল যে, উদয়পুর যাইবার একটা পথ আছে। এক জন মোগল সওদাগরের সাক্ষাৎ পাওয়া গিয়াছে, সে পথ দেখাইয়া দিবে। এক জন মনসবদার সে পথ দেখিয়া আসিয়াছে। সে একটি পার্ব্বত্য রন্ধ্র-পথ; অতিশয় সঙ্কীর্ণ। কিন্তু পথটা সোজা পথ, শীঘ্র বাহির হওয়া যাইবে। সে দিকে কোন রাজপুত দেখা যাইতেছে না। যে মোগল সংবাদ দিয়াছে, সে বলিতেছে যে, সে দিকে কোন রাজপুত-সেনা নাই।

ঔরঙ্গজেব ভাবিলেন। বলিলেন—"নাই, কিন্তু লুকাইয়া থাকিতে পারে।"

যে মনসবদার পথ দেখিয়া আসিয়াছিল—বখত খাঁ—সে বলিল যে, "যে মোগল আমাকে প্রথমেই এই পথের সন্ধান দেয়, তাহাকে আমি পর্ব্বতের উপরে পাঠাইয়া দিয়াছি। সে যদি রাজপুত-সেনা দেখিতে পায়, তবে আমাকে সঙ্কেত করিবে।"

ঔরঙ্গজেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কি আমার সিপাহী?"

বখত খাঁ। না, সে এক জন সওদাগর। উদয়পুরে শাল বেচিতে গিয়াছিল। এখন শিবিরে বেচিতে আসিয়াছিল।

ঔরঙ্গজেব। ভাল, সেই পথেই তবে ফৌজ লইয়া যাও।

তখন বাদশাহী হুকুমে ফৌজ ফিরিল। ফিরিল—কেন না, কিছু পথ ফিরিয়া আসিয়া তবে রন্ধ্র-পথে প্রবেশ করিতে হয়। ইহাতেও বিশেষ বিপদ্—জালনিবদ্ধ বৃহৎ রোহিত আর কোন্ দিকে যায়? যেরূপ পারম্পর্য্যের সহিত মোগল-সেনা আসিয়াছিল—তাহা আর রক্ষিত হইতে পারিল না। যে ভাগ আগে ছিল, তাহা পিছে পড়িল; যাহা পিছনে ছিল, তাহা আগে চলিল। সেনার তৃতীয় ভাগ আগে আগে চলিল। বাদশাহ হুকুম দিলেন যে, তাম্বু ও মোট-ঘাট এবং বাজে লোক সকল এক্ষণে উদয়সাগরের পথে যাক—পরে সেনার পশ্চাতে

তাহারা আসিবে। তাহাই হইল। ঔরঙ্গজেব নিজে পদাতি ও ছোট কামান ও গোলন্দাজ সেনা লইয়া রন্ধ্র পথে চলিলেন। আগে আগে বখ্‌ত খাঁ।

দেখিয়া, রাজসিংহ সিংহের মত লাফ দিয়া পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া মোগলসেনার মধ্যে পড়িলেন। অমনই মোগলসেনা দ্বিখণ্ড হইয়া গেল—ছুরিকাঘাতে যেন ফুলের মালা কাটিয়া গেল। এক ভাগ ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে রন্ধ্রমধ্যে প্রবিষ্ট; আর এক ভাগ পূর্ব্ব-পথে, কিন্তু রাজসিংহের সম্মুখে।

মোগলের বিপদের উপর বিপদ্ এই যে, যেখানে হাতী, ঘোড়া, দোলার উপর বাদশাহের পৌরাঙ্গনাগণ—ঠিক সেইখানে, পৌরাঙ্গনাদিগের সম্মুখে, রাজসিংহ সসৈন্যে অবতীর্ণ হইলেন। দেখিয়া, যেমন চিল পড়িলে চড়াইয়ের দল কিল-কিল করিয়া উঠে, এই সসৈন্য গরুড়কে দেখিয়া রাজাবরোধের কালভুজঙ্গীর দল তেমনই আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। এখানে যুদ্ধের নামমাত্র হইল না। যে সকল আহদীয়ান তাঁহাদের প্রহরায় নিযুক্ত ছিল—তাহারা কেহই অস্ত্রসঞ্চালন করিতে পারিল না—পাছে বেগমেরা আহত হয়েন। রাজপুতেরা বিনা যুদ্ধে আহদীদিগকে বন্দী করিল। সমস্ত মহিষীগণ এবং তাঁহাদিগের অসংখ্য অশ্বারোহিণী অনুচরীবর্গ বিনা যুদ্ধে রাজসিংহের বন্দিনী হইলেন।

মাণিকলাল রাজসিংহের নিকটে নিকটে থাকেন—তিনি রাজসিংহের অতিশয় প্রিয়। মাণিকলাল আসিয়া যুক্তকরে নিবেদন করিলেন,—"মহারাজাধিরাজ! এখন এই মার্জ্জারী-সম্প্রদায় লইয়া কি করা যায়? আজ্ঞা হয় ত উদর পূরিয়া দধি-দুগ্ধ ভোজনের জন্য ইহাদের উদয়পুরে পাঠাইয়া দিই।"

রাজসিংহ হাসিয়া বলিলেন—"এত দই-দুধ উদয়পুরে নাই। শুনিয়াছি, মার্জ্জারীদের পেট মোটা। কেবল উদীপুরীকে মহিষী চঞ্চলকুমারীর কাছে পাঠাইয়া দাও। তিনি ইহার জন্য আমাকে বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন। আর সব ঔরঙ্গজেবের ধন ঔরঙ্গজেবকে ফিরাইয়া দাও।"

মাণিকলাল যোড়হাতে বলিল, "লুঠের সামগ্রী সৈনিকেরা কিছু কিছু পাইয়া থাকে।"

রাজসিংহ হাসিতে হাসিতে বলিলেন "তোমার কাহাকেও প্রয়োজন থাকে গ্রহণ করিতে পার। কিন্তু মুসলমানী, হিন্দুর অস্পৃশ্যা।"

মাণিক। উহারা নাচিতে গাইতে জানে।

রাজ। নাচগানে মন দিলে, রাজপুত কি আর তোমাদের মত বীরপণা দেখাইতে পারিবে? সব ছাড়িয়া দাও। উদিপুরীকে কেবল উদয়পুরে পাঠাইয়া দাও।

মাণিক। এ সমুদ্রমধ্যে সে রত্ন কোথায় খুঁজিয়া পাইব? আমার ত চেনা নাই। যদি আজ্ঞা হয়, তবে হনুমানের মত এ গন্ধমাদন লইয়া গিয়া মহিষীর কাছে উপস্থিত করি। তিনি বাছিয়া লইবেন। যাহাকে রাখিতে হয়, রাখিবেন, বাকিগুলা ছাড়িয়া দিবেন। তাহারা উদয়পুরের বাজারে সুর্ম্মা-মিশি বেচিয়া দিনপাত করিবে।

এমন সময়ে মহাগজপৃষ্ঠ হইতে নির্ম্মলকুমারী রাজসিংহ ও মাণিকলাল উভয়কে দেখিতে পাইল। করযুগল উত্তোলন করিয়া সে উভয়কে প্রণাম করিল। দেখিয়া রাজসিংহ মাণিকলালকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও আবার কোন্ বেগম? হিন্দু বোধ হইতেছে—সেলাম না করিয়া, আমাদের প্রণাম করিল!"

মাণিকলাল দেখিয়া উচ্চহাস্য করিলেন। বলিলেন, "মহারাজ! ও একটা বাঁদী—ওটা বেগম হইল কি প্রকারে? উহাকে ধরিয়া আনিতে হইবে।"

এই বলিয়া মাণিকলাল হুকুম দিয়া নির্ম্মলকুমারীকে হাতীর উপর হইতে নামাইয়া আপনার নিকট আনাইল। নির্ম্মল কথা না কহিয়া হাসিতে আরম্ভ করিল। মাণিকলাল জিজ্ঞাসা করিল, "এ আবার কি? তুমি বেগম হইলে কবে?"

নির্ম্মল মুখ-চোখ ঘুরাইয়া বলিল, "মেয়নে হজরৎ ইম্‌লি বেগম। তস্‌লিম দে।"

মাণিকলাল। তা না হয় দিতেছি—বেগম ত তুমি নও জানি; তোমার বাপ-দাদাও কখনও বেগম হয় নাই—কিন্তু এ বেশ কেন?

নির্ম্মল। পহেলা যেরা হুকুম তামিল কর্—বাজে বাত্ আব্ হি রাখ্।

মাণিকলাল। সীতারাম! বেগমসাহেবার ধমক দেখ!

নির্ম্মল। হামারি হুকুম যেহি হৈ কি হজরৎ উদিপুরী বেগম সাহেবা সামনেকা পঞ্জকল্যদার হাওদাওয়ালে হাতিপর তশরিফ রাখ্‌তী হৈঁই। উন্‌কো হামারা হুজুরমে হাজির কর্।

বলিতে বিলম্ব সহিল না—মাণিকলাল তখনই উদীপুরীকে হাতী হইতে নামাইতে বলিল। উদিপুরী অবগুণ্ঠনে মুখ আবৃত করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে নামিল। মাণিকলাল একখানা দোলা

খালি করিয়া, সে দোলা উদিপুরীর হাতীর কাছে পাঠাইয়া দিয়া, দোলায় চড়াইয়া, উদিপুরীকে লইয়া আসিল। তার পর মাণিকলাল নির্ম্মলকুমারীকে কানে কানে বলিল "জী হাম্‌নী বেগম সাহেবা। আর একটা কথা—"

নির্ম্মল। চুপ রহ, বেতমিজ! মেরে নাম হজরৎ ইম্‌লি বেগম।

মাণিক। আচ্ছা, যে বেগমই হও না কেন, জেব-উন্নিসা বেগমকে চেন?

নির্ম্মল। জান্‌তে নেহিন্? বহ হামারি বেটী লাগ্‌তী হৈ। দেখ আগাড়ী সোনেকা তিন কলস যো হাওদে পর জলুষ দেতা হ্যায়, বস্‌পর জেব-উন্নিসা বৈঠী হৈ।

মাণিকলাল তাঁহাকে হাতী হইতে নামাইয়া দোলায় তুলিয়া লইয়া আসিলেন।

সেই সময়ে আবার কোন মহিষী হাওদার জরির পরদা টানিয়া মুখ বাহির করিয়া নির্ম্মলকুমারীকে ডাকিল। মাণিকলাল নির্ম্মলকে জিজ্ঞাসা করিল, "আবার তোমাকে কে ডাকিতেছে না?"

নির্ম্মল দেখিয়া বলিল, "হাঁ। যোধপুরী বেগম। কিন্তু উঁহাকে এখানে আনা হইবে না। আমাকে হাতীর উপর চড়াইয়া উঁহার কাছে লইয়া চল। শুনিয়া আসি।"

মাণিকলাল তাহাই করিল। নির্ম্মলকুমারী যোধপুরীর হাতীর উপর উঠিয়া তাঁহার ইন্দ্রাসনতুল্য হাওদার ভিতর প্রবেশ করিল। যোধপুরী বলিলেন, "আমাকে তোমাদের সঙ্গে লইয়া চল।"

নি। কেন মা?

যোধপুরী। কেন, তা ত কতবার বলিয়াছি। আমি এ ম্লেচ্ছপুরীতে, এ মহাপাপের ভিতর আর থাকিতে পারি না।

নির্ম্মল। তাহা হইবে না। তোমার যাওয়া হইবে না। আজ যদি মোগল সাম্রাজ্য টিকে, তবে তোমার ছেলে দিল্লীর বাদশাহ হইবে। আমরা সেই চেষ্টা করিব। তাঁর রাজত্বে আমরা সুখে থাকিব।

যোধপুরী। অমন কথা মুখে আনিও না, বাছা! বাদশাহ শুনিলে, আমার ছেলে একদিনও বাঁচিবে না। বিষপ্রয়োগে তাহার প্রাণ যাইবে।

নির্ম্মল। এখনকার কথা বলিতেছি না। যাহা শাহজাদার হক্, কালে তিনি পাইবেন। আপনি আমাকে আর কোন আজ্ঞা করিবেন না। আপনি যদি আমার সঙ্গে এখন যান, আপনার পুত্রের অনিষ্ট হইতে পারে।

যোধপুরী ভাবিয়া বলিলেন, "সে কথা সত্য, তোমার কথাই শুনিলাম; আমি যাইব না। তুমি যাও।"

নির্ম্মলকুমারী তখন তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

উদিপুরী এবং জেব-উন্নিসা উপযুক্ত সৈন্যে বেষ্টিত হইয়া নির্ম্মলকুমারীর সহিত উদয়পুরে চঞ্চলকুমারীর নিকট প্রেরিত হইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অগ্নিচক্র বড় ভীষণ হইল

তখন রাজসিংহ আর সকল পৌরাঙ্গনাকে—গজারূঢ়া, শিবিকারূঢ়া, এবং অশ্বারূঢ়া—সকলকেই ঔরঙ্গজেব যে রন্ধ্র পথে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই পথে প্রবেশ করিতে দিলেন। তাহারা প্রবেশ করিলে পর, উভয় সেনা নিস্তব্ধ হইল। ঔরঙ্গজেবের অবশিষ্ট সেনা অগ্রসর হইতে পারিতেছে না—কেন না, রাজসিংহ পথ বন্ধ করিয়া বসিয়াছেন। কিন্তু ঔরঙ্গজেবের সাগরতুল্য অশ্বারোহী সেনা যুদ্ধের উদ্যোগ করিতে লাগিল। তাহারা ঘোড়ার মুখ ফিরাইয়া রাজপুতের সম্মুখীন হইল। তখন রাজসিংহ একটু হটিয়া গিয়া তাহাদের পথ ছাড়িয়া দিলেন—তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিলেন না। তাহারা "দীন্ দীন্" শব্দ করিতে করিতে বাদশাহের আজ্ঞানুসারে বাদশাহ যে সঙ্কীর্ণ রন্ধ্রপথে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই পথে প্রবেশ করিল। রাজসিংহ আবার আগু হইলেন।

তার পর বাদশাহী তোষাখানা আসিয়া উপস্থিত হইল। রক্ষক নাই বলিলেই হয়, রাজপুতেরা তাহা লুঠিয়া লইল। তার পর খাদ্যদ্রব্য। যাহা হিন্দুর ব্যবহার্য্য, তাহা রাজসিংহের রসদের সামিল হইল। যাহা হিন্দুর অব্যবহার্য্য, তাহা ডোম-দোসাদে লইয়া গিয়া কতক খাইল, কতক পর্ব্বতে ছড়াইল—শৃগাল কুকুর এবং বন্যপশুতে খাইল। রাজপুতেরা দপ্তরখানা হাতীর উপর হইতে নামাইল—কতক বা পুড়াইয়া দিল, কতক বা ছিঁড়িয়া দিল। তার পর মালখানা—তাহাতে যে ধনরত্নরাশি আছে, পৃথিবীতে এমন আর কোথাও নাই,—জানিতে পারিয়া রাজপুত সেনা-

পতিগণ লোভে উন্মত্ত হইল। তাহার পশ্চাতে বড় গোলন্দাজ সেনা। রাজসিংহ আপন সেনা সংযত করিলেন। বলিলেন, "তোমরা ব্যস্ত হইও না। ও সব তোমাদেরই। আজ ছাড়িয়া দাও। আজ এখন যুদ্ধের সময় নহে।" রাজসিংহ নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন। ঔরঙ্গজেবের সমস্ত সেনা রন্ধ্রপথে প্রবেশ করিল।

তার পর মাণিকলালকে বিরলে লইয়া গিয়া বলিলেন, "আমি সেই মোগলের উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। এতটা সুবিধা হইবে, আমি মনে করি নাই। আমি যাহা অভিপ্রেত করিয়াছিলাম, তাহাতে যুদ্ধ করিয়া মোগলকে বিনষ্ট করিতে হইত। এক্ষণে বিনা যুদ্ধে মোগলকে বিনষ্ট করিতে পারিব। মবারককে আমার নিকট লইয়া আসিবে। আমি তাহাকে সমাদর করিব।"

পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, মবারক মাণিকলালের হাতে জীবন পাইয়া তাহার সঙ্গে উদয়পুর আসিয়াছিলেন। রাজসিংহ তাঁহার বীরত্ব অবগত ছিলেন, অতএব তাঁহাকে নিজ সেনামধ্যে উপযুক্ত পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু মোগল বলিয়া তাঁহাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন না। তাহাতে মবারক কিছু দুঃখিত ছিল। আজ সেই দুঃখে গুরুতর কার্য্যের ভার লইয়াছিল। সে গুরুতর কার্য্য যে সুসম্পন্ন হইয়াছে, তাহা পাঠক দেখিয়াছেন। পাঠক বুঝিয়া থাকিবেন যে, মবারকই ছদ্মবেশী মোগল সওদাগর।

মাণিকলাল আজ্ঞা পাইয়া মবারককে লইয়া আসিলেন। রাজসিংহ মবারকের অনেক প্রশংসা করিলেন। বলিলেন, "তুমি এই সাহস ও চাতুর্য্য প্রকাশ করিয়া, মোগল সওদাগর সাজিয়া, মোগল-সেনা রন্ধ্রপথে না লইয়া গেলে, অনেক প্রাণিহত্যা হইত। তোমাকে কেহ চিনিতে পারিলে তোমারও মহা বিপদ উপস্থিত হইত।"

মবারক বলিল, "মহারাজ! যে ব্যক্তি সকলের সমক্ষে মরিয়াছে, যাহাকে সকলের সমক্ষে গোর দিয়াছে, তাহাকে কেহ চিনিতে পারিলেও চেনে না—মনে করে, ভ্রম হইতেছে। আমি এই সাহসেই গিয়াছিলাম।"

রাজসিংহ বলিলেন, "এক্ষণে যদি আমার কার্য্য সিদ্ধ না হয়, তবে সে আমার দোষ। তুমি যে পুরস্কার চাহিবে, আমি তাহাই তোমাকে দিব।"

মবারক কহিল, "মহারাজ! বে-আদবী মাফ হউক। আমি মোগল হইয়া মোগলের রাজ্যধ্বংসের উপায় করিয়া দিয়াছি। আমি মুসলমান হইয়া হিন্দুরাজ্যস্থাপনের কার্য্য করিয়াছি। আমি সত্যবাদী হইয়া মিথ্যা প্রবঞ্চনা করিয়াছি। আমি বাদশাহের নেমক খাইয়া নেমকহারামী করিয়াছি। আমি মৃত্যুযন্ত্রণার অধিক কষ্ট পাইতেছি। আমার আর কোন পুরস্কারের সাধ নাই। আমি কেবল এক পুরস্কার আপনার নিকট ভিক্ষা করি। আমাকে তোপের মুখে রাখিয়া উড়াইয়া দিবার আদেশ করুন। আমার আর বাঁচিবার ইচ্ছা নাই।"

রাজসিংহ বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "যদি এ কাজে তোমার এতই কষ্ট, তবে এমন কাজ কেন করিলে? আমাকে জানাইলে না কেন? আমি অন্য লোক নিযুক্ত করিতাম। আমি কাহাকেও এতদূর মনঃপীড়া দিতে চাহি না।"

মবারক মাণিকলালকে দেখাইয়া দিয়া বলিল, "এই মহাত্মা আমার জীবন দান করিয়াছিলেন। ইঁহার নিতান্ত অনুরোধ যে, আমি এই কার্য্য সিদ্ধ করি। আমি নহিলেও এ কাজ সিদ্ধ হইত না, কেন না, মোগল ভিন্ন হিন্দুকে মোগলেরা বিশ্বাস করিত না। আমি ইহা অস্বীকার করিলে অকৃতজ্ঞতাপাশে পড়িতাম। তাই এ কাজ করিয়াছি। এক্ষণে এ প্রাণ আর রক্ষা করিব না স্থির করিয়াছি আমাকে তোপের মুখে উড়াইয়া দিতে আদেশ করুন। অথবা আমাকে বাঁধিয়া বাদশাহের নিকট পাঠাইয়া দিন, অথবা অনুমতি দিন যে, আমি যে প্রকারে পারি, মোগলসেনামধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করি।"

রাজসিংহ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। বলিলেন, "কাল তোমাকে আমি মোগল-সেনায় প্রবেশের অনুমতি দিব। আর এক দিন মাত্র থাক। আমার কেবল এক্ষণে একটা কথা জিজ্ঞাস্য আছে। ঔরঙ্গজেব তোমাকে বধ করিয়াছিলেন কেন?"

মবারক। তাহা মহারাজের সাক্ষাৎ বক্তব্য নহে।

রাজসিংহ। মাণিকলালের সাক্ষাৎ?

মবারক। বলিয়াছি।

রাজসিংহ। আর একদিন অপেক্ষা কর।

এই বলিয়া রাজসিংহ মবারককে বিদায় দিলেন।

তারপর মাণিকলাল মবারককে নিভৃতে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সাহেব! যদি আপনা

মরিবার ইচ্ছা, তবে শাহজাদীকে ধরিতে আমাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন কেন ?"

মবারক বলিল—"ভুল ! সিংহজী, ভুল ! আমি আর শাহজাদী লইয়া কি করিব ? মনে করিয়াছিলাম বটে যে, যে সয়তানী আমার ভালবাসার বিনিময়ে আমাকে কালসাপের বিষদন্তে সমর্পণ করিয়া মারিয়াছিল, তাহাকে তাহার কর্ম্মের প্রতিফল দিব। কিন্তু মানুষ যাহা আজ চাহে, কাল তাহার সে ইচ্ছা থাকে না। আমি এখন মরিব নিশ্চয় করিয়াছি—এখন আর শাহজাদী প্রতিফল পাইল না পাইল, তাহাতে আমার কি ? আমি আর কিছুই দেখিতে আসিব না।"

মাণিকলাল। জেব-উন্নিসাকে রাখিতে যদি আপনি অনুমতি না করেন, তবে আমি বাদশাহের নিকট কিছু ঘুষ লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিই।

মবারক। আর একবার তাহাকে আমার দেখিতে ইচ্ছা আছে। একবার জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা আছে যে, জগতে ধর্ম্মাধর্ম্মে তাহার কিছু বিশ্বাস আছে কি না ? একবার শুনিবার ইচ্ছা আছে যে, সে আমায় দেখিয়া কি বলে ? একবার জানিবার ইচ্ছা আছে যে, আমাকে দেখিয়া সে কি করে ?

মাণিকলাল। তবে আপনি এখনও তাহার প্রতি অনুরক্ত ?

মবারক। কিছুমাত্র না। একবার দেখিব মাত্র। আপনার কাছে এই পর্য্যন্ত ভিক্ষা।

অষ্টম খণ্ড

আগুনে কে কে পুড়িল ?

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাদশাহের দাহনারম্ভ

এদিকে বাদশাহ বড় গোলযোগে পড়িলেন। তাঁহার সমস্ত সেনা রন্ধ্রপথে প্রবেশ করিবার অল্প পরেই দিবাবসান হইল। কিন্তু রন্ধ্রের অপর মুখে কেহই পৌঁছিল না। অপর মুখের কোন সংবাদ নাই। সন্ধ্যার পরেই সেই সঙ্কীর্ণ রন্ধ্রপথে অতিশয় গাঢ় অন্ধকার হইল। সমস্ত সেনার পথ আলোকযুক্ত হয়, এমন রোশনাইয়ের সরঞ্জাম সঙ্গে কিছুই নাই, বাদশাহের ও বেগমদিগের নিকট রোশনাই হইল—কিন্তু আর সমস্ত সেনাই গাঢ়-তিমিরাচ্ছন্ন। তাহাতে আবার বন্ধুর পার্ব্বত্যতলভূমি বিকীর্ণ উপলখণ্ডে ভীষণ হইয়া আছে। ঘোড়াসকল টক্কর খাইতে লাগিল,—কত ঘোড়া আরোহী সমেত পড়িয়া গেল ; অপর অশ্বের পাদদলনে পিষ্ট হইয়া অশ্ব ও আরোহী উভয়ে আহত বা নিহত হইল। কত হাতীর পায়ে বড় বড় শিলাখণ্ড ফুটিতে লাগিল—হস্তিগণ দুর্দ্দমনীয় হইয়া ইতস্ততঃ ফিরিতে লাগিল। অশ্বারোহিণী স্ত্রীগণ ভূপতিতা হইয়া অশ্বপদে, হস্তিপদে দলিত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। দোলার বাহকদিগের চরণসকল ক্ষতবিক্ষত হইয়া রুধিরে পরিপ্লুত হইতে লাগিল। পদাতিক সেনা আর চলিতে পারে না—পদস্খলনে এবং উপলাঘাতে অত্যন্ত পীড়িত হইল। তখন ঔরঙ্গজেব রাত্রিতে সেনার গতি বন্ধ করিয়া শিবির-সংস্থাপন করিতে অনুমতি করিলেন।

কিন্তু তাম্বু ফেলিবার স্থান নাই। অতি কষ্টে বাদশাহ ও বেগমদিগের তাম্বুর স্থান হইল। আর কাহারও হইল না। যে যেখানে ছিল, সে সেইখানে রহিল। অশ্বারোহী অশ্বপৃষ্ঠে—গজারোহী গজপৃষ্ঠে—পদাতিক চরণে ভর করিয়া রহিল। কেহ বা কষ্টে পর্ব্বতসানুদেশে একটু স্থান করিয়া তাহাতে পা ঝুলাইয়া বসিয়া রহিল। কিন্তু সানুদেশ দুরারোহণীয়, এমন খাড়া যে, উঠা যায় না। অধিকাংশ লোকই এরূপ বিশ্রামের স্থান পাইল না।

তার পর বিপদের উপর বিপদ—খাদ্যের অত্যন্ত অভাব। সঙ্গে যাহা ছিল, তাহা ত রাজপুতেরা লুঠিয়া লইয়াছে। যে রন্ধ্রপথে সেনা উপস্থিত—সেখানে অন্য খাদ্যের কথা দূরে থাক, ঘোড়ার ঘাস পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না। সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর কেহ কিছু খাইতে পাইল না। বাদশাহ কি

বেগমেরাও নয়। ক্ষুধায়, নিদ্রার অভাবে, সকলে মৃতপ্রায় হইল। মোগলসেনা বড় গোলযোগে পড়িল।

এ দিকে বাদশাহ উদিপুরী এবং জেব-উন্নিসার হরণ-সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন। ক্রোধে অগ্নিতুল্য জ্বলিয়া উঠিলেন। একা সমস্ত সৈনিকদিগকে নিহত করা যায় না, নহিলে ঔরঙ্গজেব তাহা করিতেন। বিবরে নিরুদ্ধ সিংহ সিংহীকে পিঞ্জরাবদ্ধ দেখিলে যেরূপ গর্জ্জন করে, ঔরঙ্গজেব সেইরূপ গর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

গভীর রাত্রে সেনার কোলাহল কিছু নিবৃত্ত হইলে, অনেকে শুনিল, অতিদূরে অনেক পাহাড়ের উপর যেন বহুসংখ্যক বৃক্ষ উন্মূলিত হইতেছে। কিছু বুঝিতে না পারিয়া অথবা ভৌতিক শব্দ মনে করিয়া সকলে চুপ করিয়া রহিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দাহনে বাদশাহের বড় জ্বালা

রাত্রিপ্রভাতে ঔরঙ্গজেব সৈন্যচালনার আদেশ করিলেন। সেই বৃহতী সেনা—তোপ লইয়া চতুরঙ্গিণী—অতি দ্রুতপদে রন্ধ্রমুখের উদ্দেশে চলিল। ক্ষুৎপিপাসায় সকলেই অত্যন্ত ক্লিষ্ট—বাহির হইলে তবে পানাহারের ভরসা—সকলে শ্রেণীভঙ্গ করিয়া ছুটিল। ঔরঙ্গজেব নিজে উদিপুরী ও জেব-উন্নিসাকে মুক্ত করিয়া উদয়পুর নিঃশেষে ভস্ম করিবার জন্য আপনার ক্রোধাগ্নিতে আপনি দগ্ধ হইতেছিলেন—তিনি আর কিছুমাত্র ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারিলেন না। বড় ছুটাছুটি করিয়া মোগলসেনা রন্ধ্র পথে উপস্থিত হইল। উপস্থিত হইয়া দেখিল, মোগলের সর্ব্বনাশ ঘটিবার উপক্রম হইয়া আছে। রন্ধ্র-মুখ বন্ধ। রাত্রিতে রাজপুতেরা সংখ্যাতীত মহামহীরুহ সকল ছেদন করিয়া পর্ব্বত-শিখর হইতে রন্ধ্র মুখে ফেলিয়া দিয়াছে—পর্ব্বতাকার সপল্লব ছিন্ন বৃক্ষরাশি রন্ধ্র মুখ একেবারে বন্ধ করিয়াছে; হস্তী, অশ্ব, পদাতিক দূরে থাক, শৃগাল-কুক্কুরেরও যাতায়াতের পথ নাই।

মোগল-সেনামধ্যে ঘোরতর আর্ত্তনাদ উঠিল, স্ত্রীগণের রোদনধ্বনি শুনিয়া ঔরঙ্গজেবের পাষাণ-নির্ম্মিত হৃদয়ও কম্পিত হইল।

সৈন্যের পথপরিষ্কারক সম্প্রদায় অগ্রে থাকে, কিন্তু এই সৈন্যকে বিপরীত-গতিতে রন্ধ্রে প্রবেশ করিতে হইয়াছিল বলিয়া, তাহারা পশ্চাতে ছিল। ঔরঙ্গজেব প্রথমতঃ তাহাদিগকে সম্মুখে আনিবার জন্য আজ্ঞা প্রচার করিলেন। কিন্তু তাহাদের আসা কালবিলম্বের কথা। তাহাদের অপেক্ষা করিতে গেলে, হয় ত সে দিনও উপবাসে কাটিবে। অতএব ঔরঙ্গজেব হুকুম দিলেন যে, পদাতিক সৈন্য এবং অন্য যে পারে, বহু লোক একত্র হইয়া, গাছের প্রাচীরের উপর চড়িয়া, গাছসকল ঠেলিয়া পাশে ফেলিয়া দেয়, এবং এই পরিশ্রমের সাহায্য জন্য হস্তি-সকলকে নিযুক্ত করিলেন। অতএব সহস্র সহস্র পদাতিক এবং শত শত হস্তী বৃক্ষ-প্রাকার ভগ্ন করিতে ছুটিল। কিন্তু যখন এ সকল বৃক্ষ-প্রাকারমূলে সমবেত হইল, তখন অমনই গিরিশিখর হইতে যেমন ফাল্গুনের বাত্যায় শিলাবৃষ্টি হয়, তেমনই বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডের অবিশ্রান্ত ধারা পড়িতে লাগিল। পদাতিক সকলের মধ্যে কাহারও হস্ত, কাহারও পদ, কাহারও মস্তক, কাহারও কক্ষ, কাহারও বক্ষ চূর্ণীকৃত হইল—কাহারও বা সমস্ত শরীর কর্দ্দম-পিণ্ডবৎ হইয়া গেল। হস্তিসকলের মধ্যে কাহারও কুম্ভ, কাহারও দন্ত, কাহারও মেরুদণ্ড, কাহারও পঞ্জর ভগ্ন হইয়া গেল, হস্তী সকল বিকট চীৎকার করিতে করিতে পদাতিক সৈন্য পদতলে বিদলিত করিতে করিতে পলায়ন করিল, তদ্দ্বারা ঔরঙ্গজেবের সমস্ত সেনা বিত্রস্ত ও বিধ্বস্ত হইয়া উঠিল। সকলে ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া সভয়ে দেখিল, পর্ব্বতের শিরোদেশে সহস্র সহস্র রাজপুত পদাতিক পিপীলিকার মত শ্রেণীবদ্ধ হইয়া আছে। যাহারা প্রস্তরখণ্ডের আঘাতে আহত বা নিহত না হইল, রাজপুতগণের বন্দুকের গুলীতে তাহারা মরিল। ঔরঙ্গজেবের সৈনিকেরা বৃক্ষপ্রাকারমূলে ক্ষণমাত্র তিষ্ঠিতে পারিল না।

শুনিয়া ঔরঙ্গজেব সৈন্যাধ্যক্ষগণকে তিরস্কৃত করিয়া পুনর্ব্বার বৃক্ষপ্রাচীর-ভঙ্গের উদ্যম করিতে আদেশ করিলেন। তখন "দীন দীন" শব্দ করিয়া মোগল-সেনা আবার ছুটিল। আবার রাজপুত-সেনাকৃত গুলীর বৃষ্টি এবং শিলাবৃষ্টিতে বাত্যা-সমীপে ইক্ষুক্ষেত্রের ইক্ষুর মত ভূমিশায়ী হইল। এইরূপ পুনঃ পুনঃ উদ্যম করিয়াও মোগল-সেনা বৃক্ষপ্রাকার ভগ্ন করিতে পারিল না।

তখন ঔরঙ্গজেব হতাশ হইয়া সেই বৃহতী সেনাকে রন্ধ্র-পথে ফিরিতে আদেশ করিলেন। রন্ধ্রের যে মুখে সেনা প্রবেশ করিয়াছিল, সেই

তারাচরণকে যে বাড়ী করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা বেচিয়া কুন্দকে কাগজ করিয়া দিলেন।

পাঠক মহাশয় বড় বিরক্ত হইলেন সত্য, কিন্তু এত দূরে আখ্যায়িকা আরম্ভ হইল। এত দূরে বিষবৃক্ষের বীজবপন হইল।

নবম পরিচ্ছেদ

হরিদাসী বৈষ্ণবী

বিধবা কুন্দনন্দিনী নগেন্দ্রের গৃহে কিছুদিন কালাতিপাত করিল। এক দিন মধ্যাহ্নের পর পৌরস্ত্রীরা সকলে মিলিত হইয়া পুরাতন অন্তঃপুরে বসিয়াছিল। ঈশ্বরকৃপায় তাহারা অনেকগুলি; সকলে স্ব স্ব মনোমত গ্রাম্য-স্ত্রীসুলভ কার্য্যে ব্যাপৃতা ছিল। তাহাদের মধ্যে অনতীতবাল্যা কুমারী হইতে পলিতকেশা বর্ষীয়সী পর্য্যন্ত সকলেই ছিল। কেহ চুল বাঁধাইতেছিল, কেহ চুল বাঁধিয়া দিতেছিল, কেহ মাথা দেখাইতেছিল, কেহ মাথা দেখিতেছিল এবং "উঁ উঁ" করিয়া উকুন মারিতেছিল; কেহ পাকা চুল তুলাইতেছিল, কেহ ধান্য হস্তে তাহা তুলিতেছিল। কোন সুন্দরী স্বীয় বালকের জন্য বিচিত্র কাঁথা সিয়াইতেছিলেন, কেহ বালককে স্তন্যপান করাইতেছিলেন, কোন সুন্দরী চুলের দড়ি বিনাইতেছিলেন, কেহ ছেলে ঠেঙ্গাইতেছিলেন, ছেলে মুখব্যাদান করিয়া তিনগ্রামে সপ্তসুরে রোদন করিতেছিল। কোন রূপসী কার্পেট বুনিতেছিলেন, কেহ থাবা পাতিয়া তাহা দেখিতেছিলেন। কোন চিত্রকুশলা কাহারও বিবাহের কথা মনে করিয়া পিঁড়িতে আলপনা দিতেছিলেন, কোন সদ্‌গ্রন্থরসগ্রাহিণী বিদ্যাবতী দাশু রায়ের পাঁচালী পড়িতেছিলেন, কোন বর্ষীয়সী পুত্রের নিন্দা করিয়া শ্রোত্রীবর্গের কর্ণ পরিতৃপ্ত করিতেছিলেন, কোন রসিকা যুবতী অর্দ্ধস্ফুটস্বরে স্বামীর রসিকতার বিবরণ সখীদের কাণে কাণে বলিয়া বিরহিণীর মনোবেদনা বাড়াইতেছিলেন। কেহ গৃহিণীর নিন্দা, কেহ কর্তার নিন্দা, কেহ প্রতিবাসীদিগের নিন্দা করিতেছিলেন; অনেকেই আত্মপ্রশংসা করিতেছিলেন। যিনি সূর্য্যমুখী কর্ত্তৃক প্রাতে নিজ বুদ্ধিহীনতার জন্য মৃদু-ভর্ৎসিতা হইয়াছিলেন, তিনি আপনার বুদ্ধির অসাধারণ প্রাখর্য্যের অনেক উদাহরণ প্রয়োগ করিতেছিলেন। যাঁহার রন্ধনে প্রায় লবণ সমান হয় না, তিনি আপনার পাকনৈপুণ্য সম্বন্ধে সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিতেছিলেন; যাঁহার স্বামী গ্রামের মধ্যে গণ্ডমূর্খ, তিনি সেই স্বামীর অলৌকিক পাণ্ডিত্য কীর্ত্তন করিয়া সঙ্গিনীকে বিস্মিতা করিতেছিলেন। যাঁহার পুত্রকন্যাগুলি এক একটি কৃষ্ণবর্ণ মাংসপিণ্ড, তিনি রত্নগর্ভা বলিয়া আস্ফালন করিতেছিলেন। সূর্য্যমুখী এ সভায় ছিলেন না। তিনি কিছু গর্ব্বিতা, এই জন্য এ সম্প্রদায়ে বড় বসিতেন না এবং তিনি থাকিলে অন্য সকলের আমোদের বিঘ্ন হইত। সকলেই তাঁহাকে ভয় করিত, তাঁহার নিকট মন খুলিয়া সকল কথা বলিত না। কিন্তু কুন্দনন্দিনী এক্ষণে এই সম্প্রদায়েই থাকিত, এখনও ছিল। সে একটি বালককে তাহার মাতার অনুরোধে ক, খ, শিখাইতেছিল, কুন্দ বলিয়া দিতেছিল, তাহার ছাত্র অন্য বালকের করস্থ সন্দেশের প্রতি হাঁ করিয়া চাহিয়া ছিল; সুতরাং তাহার বিশেষ বিদ্যালাভ হইতেছিল।

এমন সময়ে সেই নারীসভামণ্ডলে "জয় রাধে" বলিয়া এক বৈষ্ণবী আসিয়া দাঁড়াইল।

নগেন্দ্রের ঠাকুরবাড়ীতে নিত্য অতিথিসেবা হইত এবং তদ্ব্যতীত সেইখানেই প্রতি রবিবারে তণ্ডুলাদি বিতরণ হইত, ইহা ভিন্ন ভিক্ষার্থে বৈষ্ণবী কি কেহ অন্তঃপুরে আসিতে পাইত না। এই জন্য অন্তঃপুরমধ্যে "জয় রাধে" শুনিয়া এক জন পুরবাসিনী বলিতেছিল,—"কে রে মাগী বাড়ীর ভিতর? ঠাকুরবাড়ী যা।" কিন্তু এই কথা বলিতে বলিতে সে মুখ ফিরাইয়া বৈষ্ণবীকে দেখিয়া কথা আর সমাপ্ত করিল না; তৎপরিবর্ত্তে বলিল, "ও মা! এ আবার কোন্ বৈষ্ণবী গো!"

সকলেই বিস্মিত হইয়া দেখিল যে, বৈষ্ণবী যুবতী, তাহার শরীরে আর রূপ ধরে না। সেই বহুসুন্দরীশোভিত রমণীমণ্ডলেও কুন্দনন্দিনী ব্যতীত তাহা হইতে সমধিক রূপবতী কেহই নহে। তাহার স্ফুরিত বিম্বাধর, সুগঠিত নাসা, বিস্ফারিত ফুল্লেন্দীবরতুল্য চক্ষু, চিত্ররেখাবৎ ভ্রূযুগল, নিটোল ললাট, বাহুযুগের মৃণালবৎ গঠন এবং চম্পকদামবৎ বর্ণ রমণীকুলদুর্লভ। কিন্তু সেখানে যদি কেহ সৌন্দর্য্যের সদ্বিচারক থাকিত, তবে সে বলিত যে, বৈষ্ণবীর গঠনে কিছু লালিত্যের অভাব। চলনফেরণ—এ সকলও পৌরুষ।

বৈষ্ণবীর নাকে রসকলি, মাথায় টেড়িকাটা, পরণে কালাপেড়ে সিমলার ধুতি, হাতে একটি

খঞ্জনী। হাতে পিত্তলের বালা এবং তাহার উপর জলতরঙ্গ চুড়ি।

স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে এক জন বয়োজ্যেষ্ঠা কহিল, "হ্যা গা, তুমি কে গা?"

বৈষ্ণবী কহিল, "আমার নাম হরিদাসী বৈষ্ণবী, মা ঠাকুরাণীরা গান শুনবে?"

তখন "শুনবো গো শুনবো" এই ধ্বনি চারিদিকে আবাল বৃদ্ধের কণ্ঠ হইতে বাহির হইতে লাগিল। তখন খঞ্জনী হাতে বৈষ্ণবী উঠিয়া গিয়া ঠাকুরাণীদিগের কাছে বসিল। সে যেখানে বসিল, সেইখানেই কুন্দ ছেলে পড়াইতেছিল। কুন্দ অত্যন্ত গীতপ্রিয়, বৈষ্ণবী গান করিবে শুনিয়া সে তাহার আর একটু সন্নিকটে আসিল। তাহার ছাত্র সেই অবকাশে উঠিয়া গিয়া সন্দেশভোজী বালকের হাত হইতে সন্দেশ কাড়িয়া লইয়া আপনি ভক্ষণ করিল।

বৈষ্ণবী জিজ্ঞাসা করিল, "কি গায়িব?" তখন শ্রোত্রীগণ নানাবিধ ফরমায়েস আরম্ভ করিলেন; কেহ চাহিলেন "গোবিন্দ অধিকারী"—কেহ "গোপাল উড়ে।" যিনি দাশরথির পাঁচালী পড়িতেছিলেন, তিনি তাহাই কামনা করিলেন। দুই এক জন প্রাচীনা কৃষ্ণবিষয়ক হুকুম করিলেন। তাহারই টীকা করিতে গিয়া মধ্যবয়সীরা 'সখীসংবাদ' এবং 'বিরহ' বলিয়া মতভেদ প্রচার করিলেন। কেহ চাহিলেন 'গোষ্ঠ'—কোন লজ্জাহীনা যুবতী বলিল, "নিধুর টপ্পা গাইতে হয় ত গাও—নহিলে শুনিব না।" একটি অস্ফুটবাচা বালিকা বৈষ্ণবীকে শিক্ষা দিবার অভিপ্রায়ে গাইয়া দিল,—"তোলা দাসূনে দাসূনে দাসূনে দুতি।"

বৈষ্ণবী সকলের হুকুম শুনিয়া কুন্দের প্রতি বিদ্যুদ্দামতুল্য এক কটাক্ষ করিয়া কহিল, "হ্যা গা—তুমি কিছু ফরমায়েস করিলে না?" কুন্দ তখন লজ্জাবনতমুখী হইয়া অল্প একটু হাসিল, কিছু উত্তর করিল না; কিন্তু তখনই এক জন বয়স্যার কাণে কাণে কহিল, "কীর্ত্তন গায়িতে বল না?"

বয়স্যা তখন কহিল, "ওগো, কুন্দ কীর্ত্তন করিতে বলিতেছে গো!" তাহা শুনিয়া বৈষ্ণবী কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিল। সকলের কথা টালিয়া বৈষ্ণবী তাহার কথা রাখিল দেখিয়া কুন্দ বড় লজ্জিতা হইল।

হরিদাসী বৈষ্ণবী প্রথমে খঞ্জনীতে দুই একবার মৃদু মৃদু যেন ক্রীড়াচ্ছলে অঙ্গুলি প্রহার করিল। পরে আপন কণ্ঠমধ্যে অতি মৃদু মৃদু নববসন্তপ্রেরিতা এক ভ্রমরীর গুঞ্জনবৎ সুরের আলাপ করিতে লাগিল—যেন লজ্জাশীলা বালিকা স্বামীর নিকট প্রথম প্রেমব্যক্তি জন্য মুখ ফুটাইতেছে। পরে অকস্মাৎ সেই ক্ষুদ্রপ্রাণ খঞ্জনী হইতে বাদ্যবিদ্যাবিশারদের অঙ্গুলিজনিত শব্দের ন্যায় মেঘগম্ভীর শব্দ বাহির হইল এবং তৎসঙ্গে শ্রোত্রীদিগের শরীর কণ্টকিত করিয়া অপ্সরোনিন্দিত কণ্ঠধ্বনি সমুত্থিত হইল। তখন রমণীমণ্ডল বিস্মিত বিমোহিতচিত্তে শুনিল যে, সেই বৈষ্ণবীর অতুলিত কণ্ঠ অট্টালিকা পরিপূর্ণ করিয়া আকাশমার্গে উঠিল। মূঢ়া পৌরস্ত্রীগণ সেই গানের পারিপাট্য কি বুঝিবে? বোদ্ধা থাকিলে বুঝিত যে, এই সর্ব্বাঙ্গীণ-তাললয়স্বর-পরিশুদ্ধ গান কেবল সুকণ্ঠের কার্য্য নহে। বৈষ্ণবী যেই হউক, সে সঙ্গীতবিদ্যায় অসাধারণ সুশিক্ষিত এবং অল্পবয়সে তাহার পারদর্শী।

বৈষ্ণবী গীত সমাপন করিলে, পৌরস্ত্রীগণ তাহাকে গায়িবার জন্য পুনশ্চ অনুরোধ করিল। তখন হরিদাসী সতৃষ্ণবিলোলনেত্রে কুন্দনন্দিনীর মুখপানে চাহিয়া পুনশ্চ কীর্ত্তন আরম্ভ করিল—

"শ্রীমুখপঙ্কজ—দেখবো ব'লে হে,
তাই এসেছিলাম এ গোকুলে।
আমায় স্থান দিও রাই চরণতলে।
মানের দায়ে তুই মানিনী,
তাই সেজেছি বিদেশিনী,
এখন বাঁচাও রাধে কথা কোয়ে,
ঘরে যাই হে চরণ ছুঁয়ে।
দেখবো তোমায় নয়ন ভ'রে,
তাই বাজাই বাঁশী ঘরে ঘরে।
যখন রাধা বলে বাজে বাঁশী;
তখন নয়নজলে আপনি ভাসি
তুমি যদি না চাও ফিরে,
তবে যাব সেই যমুনাতীরে,
ভাঙ্গবো বাঁশী তেজ্‌ব প্রাণ,
এই বেলা তোর ভাঙ্গুক মান।
ব্রজের সুখ রাই দিয়ে জলে,
বিকাইনু পদতলে,
এখন চরণ নূপুর বেঁধে গলে,
পশিব যমুনা-জলে॥"

গীত সমাপ্ত হইলে বৈষ্ণবী কুন্দনন্দিনীর মুখপ্রতি চাহিয়া বলিল, "গীত গাহিয়া আমার মুখ শুকাইতেছে, আমায় একটু জল দাও।"

কুন্দ পাত্রে করিয়া জল আনিল। বৈষ্ণবী কহিল, "তোমাদিগের পাত্র আমি ছুঁইব না।

আসিয়া আমার হাতে ঢালিয়া দাও ; আমি জাতি-বৈষ্ণবী নহি।”

ইহাতে বুঝাইল, বৈষ্ণবী পূর্ব্বে কোন অপবিত্র জাতীয়া ছিল, এক্ষণে বৈষ্ণবী হইয়াছে। এই কথা শুনিয়া কুন্দ তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ জল ফেলিবার যে স্থান সেইখানে গেল। যেখানে অন্য স্ত্রীলোকেরা বসিয়া রহিল, সে স্থান হইতে ঐ স্থান এরূপ ব্যবধান যে, তথায় মৃদু মৃদু কথা কহিলে কেহ শুনিতে পায় না। সেই স্থানে গিয়া কুন্দ বৈষ্ণবীর হাতে জল ঢালিয়া দিতে লাগিল। বৈষ্ণবী হাত-মুখ ধুইতে লাগিল। ধুইতে ধুইতে অন্যের অশ্রুতস্বরে বৈষ্ণবী মৃদু মৃদু বলিতে লাগিল, “তুমি না কি গা কুন্দ ?”

কুন্দ বিস্মিতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “কেন গা ?”

বৈষ্ণবী। তোমার শাশুড়ীকে কখন দেখিয়াছ ?

কুন্দ। না।

কুন্দ শুনিয়াছিল যে, তাহার শাশুড়ী ভ্রষ্টা হইয়া দেশত্যাগিনী হইয়াছিল।

বৈষ্ণবী। তোমার শাশুড়ী এখানে আসিয়াছেন। তিনি আমার বাড়ীতে আছেন, তোমাকে একবার দেখবার জন্য বড়ই কাঁদিতেছেন—আহা! হাজার হোক্ শাশুড়ী। সে ত আর এখানে আসিয়া তোমাদের গিন্নীর কাছে পোড়ার মুখ দেখাতে পারবে না—তা তুমি একবার কেন আমার সঙ্গে গিয়ে তাকে দেখা দিয়ে এস না ?

কুন্দ সরলা হইলেও বুঝিল যে, সে শাশুড়ীর সঙ্গে সম্বন্ধস্বীকারই অকর্ত্তব্য। অতএব বৈষ্ণবীর কথায় কেবল ঘাড় নাড়িয়া অস্বীকার করিল।

কিন্তু বৈষ্ণবী ছাড়ে না।—পুনঃ পুনঃ উত্তেজনা করিতে লাগিল। তখন কুন্দ কহিল, “আমি গিন্নীকে না বলিয়া যাইতে পারি না।”

হরিদাসী মানা করিল। বলিল, “গিন্নীকে বলিও না। যাইতে দিবে না। হয় ত তোমার শাশুড়ীকে আনিতে পাঠাইবে, তাহা হইলে তোমার শাশুড়ী দেশছাড়া হইয়া পলাইবে।”

বৈষ্ণবী যতই দার্ঢ্য প্রকাশ করুক, কুন্দ কিছুতেই সূর্য্যমুখীর অনুমতি ব্যতীত যাইতে সম্মত হইল না। তখন অগত্যা হরিদাসী বলিল, “আচ্ছা, তবে তুমি গিন্নীকে ভাল করিয়া বলিয়া রেখো। আমি আর এক দিন আসিয়া লইয়া যাইব ; কিন্তু দেখো, ভাল করিয়া ব’লো ; আর একটু কাঁদাকাটা করিও, নহিলে হইবে না।”

কুন্দ ইহাতে স্বীকৃত হইল না, কিন্তু বৈষ্ণবীকে হাঁ কি না, কিছুই বলিল না। তখন হরিদাসী হস্ত-মুখ প্রক্ষালন সমাপ্ত করিয়া অন্য সকলের কাছে ফিরিয়া আসিয়া পুরস্কার চাহিল। এমন সময়ে সেখানে সূর্য্যমুখী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন বাজে কথা একেবারে বন্ধ হইল, অল্পবয়স্কারা সকলেই একটা একটা কাজ লইয়া বসিল।

সূর্য্যমুখী হরিদাসীকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, “তুমি কে গা ?” তখন নগেন্দ্রের এক মামী কহিলেন, “ও এক জন বৈষ্ণবী, গান করিতে এসেছে। গান যে সুন্দর গায়! এমন গান কখনও শুনিনে মা। তুমি একটি শুনিবে ? গা তো গা হরিদাসী। একটি ঠাকরুণবিষয় গা।”

হরিদাসী এক অপূর্ব্ব শ্যামাবিষয় গায়িলে সূর্য্যমুখী তাহাতে মোহিতা ও প্রীতা হইয়া বৈষ্ণবীকে পুরস্কার পূর্ব্বক বিদায় করিলেন।

বৈষ্ণবী প্রণাম করিয়া এবং কুন্দের প্রতি আর একবার দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া বিদায় লইল। সূর্য্যমুখীর চক্ষের আড়ালে গেলেই সে খঞ্জনীতে মৃদু মৃদু খেমটা বাজাইয়া মৃদু মৃদু গায়িতে গায়িতে গেল,—

“আয় রে চাঁদের কণা।
তোরে খেতে দিব ফুলের মধু,
পরতে দিব সোণা।
আতর দিব শিশি ভোরে,
গোলাব দিব কার্ব্বা ক’রে,
আর আপনি সেজে বাটা ভোরে
দিব পানের দোনা।”

বৈষ্ণবী গেলে স্ত্রীলোকেরা অনেকক্ষণ কেবল বৈষ্ণবীর প্রসঙ্গ লইয়াই রহিল। প্রথমে তাহার বড় সুখ্যাতি আরম্ভ হইল। পরে ক্রমে একটু একটু খুঁত বাহির করিতে লাগিল। বিরাজ বলিল, “তা হউক কিন্তু নাকটা একটু চাপা।” তখন বামা বলিল, “রঙটা বাপু বড় ফেঁকাসে।” তখন চন্দ্রমুখী বলিল, “চুলগুলো যেন শণের দড়ী।” তখন চাঁপা বলিল, “কপালটা একটু উঁচু।” কমলা বলিল, “ঠোঁট দুখানা পুরু।” হারাণী বলিল, “গড়নটা বড় কাঠ কাঠ।” প্রমদা বলিল, “মাগীর বুকের কাছটা যেন যাত্রার সখীদের মত, দেখে ঘৃণা করে।” এই-রূপে সুন্দরী বৈষ্ণবী শীঘ্রই অদ্বিতীয় কুৎসিত বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। তখন ললিতা বলিল, “তা দেখিতে যেমন হউক, মাগী গায় ভাল।” তাহাতেও নিস্তার নাই। চন্দ্রমুখী বলিল, “তাই বা কি, মাগীর গলা মোটা।” মুক্তকেশী বলিল, “ঠিক বলেছ—মাগী

যেন ষাঁড় ডাকে।" অনঙ্গ বলিল, "মাগী গান জানে না, একটাও দাশু রায়ের গান গাইতে পারিল না।" কনক বলিল, "মাগীর তালবোধ নাই।" ক্রমে প্রতিপন্ন হইল যে, হরিদাসী বৈষ্ণবী কেবল যে যার-পর-নাই কুৎসিতা, এমন নহে—তাহার গানও যার-পর-নাই মন্দ।

—·—

দশম পরিচ্ছেদ

বাবু

হরিদাসী বৈষ্ণবী দত্তদিগের গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া দেবীপুরের দিকে গেল। দেবীপুরে বিচিত্র লৌহরেইল-পরিবেষ্টিত এক পুষ্পোদ্যান আছে। তন্মধ্যে নানাবিধ ফলপুষ্পের বৃক্ষ, মধ্যে পুষ্করিণী, তাহার উপরে বৈঠকখানা। হরিদাসী সেই পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করিল এবং বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া এক নিভৃত কক্ষে গিয়া বেশপরিত্যাগে প্রবৃত্ত হইল। অকস্মাৎ সেই নিবিড় কেশদামরচিত কবরী মস্তকচ্যুত হইয়া পড়িল, সে ত পরচুলা মাত্র। বক্ষ হইতে স্তন-যুগল খসিল—তাহা বস্ত্রনির্ম্মিত। বৈষ্ণবী পিত্তলের বালা ও জলতরঙ্গ চুড়ি খুলিয়া ফেলিল—রসকলি ধুইল। তখন উপযুক্ত পরিচ্ছদ পরিধানানন্তর বৈষ্ণবীর স্ত্রীবেশ ঘুচিয়া এক অপূর্ব্ব সুন্দর যুবা পুরুষ দাঁড়াইল। যুবার বয়স পঞ্চবিংশ বৎসর, কিন্তু ভাগ্যক্রমে মুখমণ্ডলে রোমাবলীর চিহ্ন মাত্র ছিল না। মুখ এবং গঠন কিশোরবয়স্কের ন্যায়। কান্তি পরম সুন্দর। এই যুবা পুরুষ দেবেন্দ্র বাবু। পূর্ব্বেই তাহার কিছু পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

দেবেন্দ্র এবং নগেন্দ্র উভয়েই একবংশসম্ভূত; কিন্তু বংশের উভয় শাখার মধ্যে পুরুষানুক্রমে বিবাদ চলিতেছে। এমন কি, দেবীপুরের বাবুদিগের সঙ্গে গোবিন্দপুরের বাবুদিগের মুখের আলাপ পর্য্যন্ত ছিল না। পুরুষানুক্রমে দুই শাখায় মোকদ্দমা চলিতেছে। শেষে এক বড় মোকদ্দমায় নগেন্দ্রের পিতামহ দেবেন্দ্রের পিতামহকে পরাজিত করায় দেবীপুরের বাবুরা একেবারে হীনবল হইয়া পড়িলেন। ডিক্রীজারিতে তাঁহাদের সর্ব্বস্ব গেল—গোবিন্দপুরের বাবুরা তাঁহাদের তালুকসকল কিনিয়া লইলেন। সেই অবধি দেবীপুর হ্রস্বতেজা, গোবিন্দপুর বর্দ্ধিতশ্রী হইতে লাগিল। উভয় বংশে আর কখনও মিল হইল না। দেবেন্দ্রের পিতা ক্ষুণ্ণ ধন-গৌরব পুনর্ব্বর্দ্ধিত করিবার জন্য এক উপায় করিলেন। গণেশ বাবু নামে আর এক জন জমীদার হরিপুর জেলার মধ্যে বাস করিতেন। তাঁহার একমাত্র অপত্য হৈমবতী। দেবেন্দ্রের সঙ্গে হৈমবতীর বিবাহ দিলেন। হৈমবতীর অনেক গুণ—সে কুরূপা, মুখরা, অপ্রিয়বাদিনী, আত্মপরায়ণা। যখন দেবেন্দ্রের সহিত তাহার বিবাহ হইল, তখন পর্য্যন্ত দেবেন্দ্রের চরিত্র নিষ্কলঙ্ক। লেখাপড়ায় তাঁহার বিশেষ যত্ন ছিল এবং প্রকৃতিও সুধীর ও সত্যনিষ্ঠ ছিল। কিন্তু সেই পরিণয় তাঁহার কাল হইল। যখন দেবেন্দ্র উপযুক্ত বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন, তখন দেখিলেন যে, ভার্য্যার গুণে গৃহে তাঁহার কোনও সুখেরই আশা নাই। বয়োগুণে তাঁহার রূপতৃষ্ণা জন্মিল, কিন্তু আত্মগৃহে তাহা ত নিবারণ হইল না। বয়োগুণে দম্পতিপ্রণয়াকাঙ্ক্ষা জন্মিল—কিন্তু অপ্রিয়বাদিনী হৈমবতীকে দেখিবামাত্র সে আকাঙ্ক্ষা দূর হইত। সুখ দূরে থাকুক—দেবেন্দ্র দেখিলেন যে, হৈমবতীর রসনাবর্ষিত বিষের জ্বালায় গৃহে তিষ্ঠান ভার। এক দিন হৈমবতী দেবেন্দ্রকে এক কদর্য্য কটুবাক্য কহিল, দেবেন্দ্র অনেক সহিয়াছিলেন—আর সহিলেন না। হৈমবতীর কেশাকর্ষণ করিয়া তাহাকে পদাঘাত করিকরিলেন এবং সেই দিন হইতে গৃহত্যাগ করিয়া, পুষ্পোদ্যানমধ্যে তাঁহার বাসোপযোগী গৃহ-প্রস্তুতের অনুমতি দিয়া কলিকাতায় গেলেন। ইতিপূর্ব্বেই দেবেন্দ্রের পিতার পরলোকগমন হইয়াছিল; সুতরাং দেবেন্দ্র এক্ষণে স্বাধীন। কলিকাতায় পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইয়া দেবেন্দ্র অতৃপ্ত বিলাসতৃষ্ণা নিবারণে প্রবৃত্ত হইলেন। তজ্জনিত যে কিছু স্বচিত্তের অপ্রসাদ জন্মিত, তাহা ভূরি ভূরি সুরাভিষিঞ্চনে ধৌত করিতে যত্ন করিতে লাগিলেন। পরিশেষে তাহার আর আবশ্যকতা রহিল না—পাপেই চিত্তের প্রসাদ জন্মিতে লাগিল। কিছুকাল পরে বাবুগিরিতে বিলক্ষণ সুশিক্ষিত হইয়া দেবেন্দ্র দেশে ফিরিয়া আসিলেন এবং তথায় নূতন উপবন-গৃহে আপন আবাস সংস্থাপন করিয়া বাবুগিরিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

কলিকাতা হইতে দেবেন্দ্র অনেক প্রকার ঢং শিখিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি দেবীপুরে প্রত্যাগমন করিয়া রিফরমড্ বলিয়া আত্মপরিচয় দিলেন। প্রথমেই এক ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত করিলেন। তারাচরণ প্রভৃতি অনেক ব্রাহ্ম জুটিল, বক্তৃতার আর সীমা রহিল না। একটা ফিমেল-স্কুলের জন্যও

মধ্যে মধ্যে আড়ম্বর করিতে লাগিলেন, কিন্তু কাজে বড় বেশী করিতে পারিলেন না। বিধবা-বিবাহের বড় উৎসাহ। এমন কি, দুই চারিটা কাওরা ও তিওরের বিধবা মেয়ের বিবাহ দিয়া ফেলিয়াছিলেন; কিন্তু সে বরকন্যার গুণে। জেনানারূপ কারাগারের শিকল-ভাঙ্গার বিষয়ে তারাচরণের সঙ্গে তাঁহার একমত। উভয়েই বলিতেন, মেয়েদের বাহির কর। এ বিষয়ে দেবেন্দ্র বাবু বিশেষ কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন—কিন্তু সে বাহির করার অর্থবিশেষে।

দেবেন্দ্র গোবিন্দপুর হইতে প্রত্যাগমনের পর বৈষ্ণবীবেশ ত্যাগ করিয়া নিজমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক পাশের কামরায় আসিয়া বসিলেন। এক জন ভৃত্য শ্রমহারী তামাকু প্রস্তুত করিয়া আলবোলা আনিয়া সম্মুখে দিল; দেবেন্দ্র কিছুকাল সেই সর্ব্বশ্রম-সংহারিণী তামাকুদেবীর সেবা করিলেন। যে এই মহাদেবীর প্রসাদ-সুখভোগ না করিয়াছে, সে মনুষ্যই নহে। হে সর্ব্বলোকচিত্তরঞ্জিনি বিশ্ববিমোহিনি! তোমাতে যেন আমাদের ভক্তি অচলা থাকে। তোমার বাহন আলবোলা, হুঁকা, গুড়গুড়ি প্রভৃতি দেবকন্যারা সর্ব্বদাই যেন আমাদের নয়নপথে বিরাজ করেন, দৃষ্টিমাত্রেই মোক্ষলাভ করিব। হে হুঁকে! হে আলবোলে! হে কুণ্ডলাকৃতধূমরাশিসমুদ্গারিণি! হে ফণিনীনিন্দিত-দীর্ঘনলসংসর্পিণি! হে রজতকিরীট-মণ্ডিত-শিরোদেশ-সুশোভিনি! কি বা তোমার কিরীটবিলম্বিত ঝালর ঝলমলায়মান! কি বা শৃঙ্খলাঙ্গুরীয়-সম্ভূষিত বক্তাগ্রভাগ মুখনলের শোভা! কি বা তোমার গর্ভস্থ শীতলাম্বুরাশির গভীর নিনাদ! হে বিশ্বরমে! তুমি বিশ্বজন-শ্রমহারিণী, অলসজন-প্রতিপালিনী, ভার্য্যাভৎর্সিতজনচিত্তবিকারবিনাশিনি! প্রভুভীত-জন-সাহস-প্রদায়িনি! মূঢ়ে তোমার মহিমা কি জানিবে! তুমি শোকপ্রাপ্ত জনকে প্রবোধ দাও, ভয়প্রাপ্ত জনকে ভরসা দাও, বুদ্ধিভ্রষ্ট জনকে বুদ্ধি দাও, কোপযুক্ত জনকে শান্তি প্রদান কর। হে বরদে! হে সর্ব্বসুখপ্রদায়িনি! তুমি যেন আমার ঘরে অক্ষয় হইয়া বিরাজ কর। তোমার সুগন্ধ দিনে দিনে বাড়ুক। তোমার গর্ভস্থ জলকল্লোল মেঘগর্জ্জনবৎ ধ্বনিত হইতে থাকুক। তোমার মুখনলের সহিত আমার অধরোষ্ঠের যেন তিলেক বিচ্ছেদ না হয়।

ভোগাসক্ত দেবেন্দ্র যথেচ্ছা এই মহাদেবীর প্রসাদ ভোগ করিলেন—কিন্তু তাহাতে পরিতৃপ্তি জন্মিল না। পরে অন্যা মহাশক্তির অর্চ্চনার উদ্যোগ হইল। তখন ভৃত্যহস্তে তৃণপটাবৃত বোতলবাহিনীর আবির্ভাব হইল। তখন সেই অমল শ্বেত সুবিস্তৃত শয্যার উপরে, রজতাসুকৃতাসনে সান্ধ্যগগনশোভি-রক্তাম্বুদতুল্য বর্ণবিশিষ্টা দ্রবময়ী মহাদেবী, ডেকাণ্টর নামে আসুরিক ঘটে সংস্থাপিত হইলেন। কট্ গ্লাসের কোষা পড়িল; প্লেটেড জগ তাম্রকুণ্ড হইল এবং পাকশালা হইতে এক কৃষ্ণকূর্চ্চ পুরোহিত হট্ ওয়াটার প্লেট নামক দিব্য পুষ্পপাত্রে রোষ্ট মটন এবং কাট্‌লেট নামক সুগন্ধ কুসুমরাশি রাখিয়া গেল। তখন দেবেন্দ্র দত্ত যথাশাস্ত্র ভক্তিভাবে দেবীর পূজা করিতে বসিলেন।

পরে তানপুরা, তবলা, সেতার প্রভৃতি সমেত গায়ক-বাদক-দল আসিল। তাহারা পূজার প্রয়োজনীয় সঙ্গীতোৎসব সম্পন্ন করিয়া গেল।

সর্ব্বশেষে দেবেন্দ্রের সমবয়স্ক, সুশীতলকান্তি এক যুবা পুরুষ আসিয়া বসিলেন। ইনি দেবেন্দ্রের মাতুলপুত্র সুরেন্দ্র; গুণে সর্ব্বাংশে দেবেন্দ্রের বিপরীত। ইঁহার স্বভাবগুণে দেবেন্দ্রও ইঁহাকে ভালবাসিতেন। দেবেন্দ্র ইঁহার ভিন্ন সংসারে আর কাহারও কথার বাধ্য নহেন। সুরেন্দ্র প্রত্যহ রাত্রে একবার দেবেন্দ্রের সংবাদ লইতে আসিতেন। কিন্তু মদ্যাদির ভয়ে অধিকক্ষণ বসিতেন না। সকলে উঠিয়া গেলে সুরেন্দ্র দেবেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ তোমার শরীর কিরূপ আছে?"

দে। "শরীরং ব্যাধিমন্দিরম্।"

সু। বিশেষ তোমার। আজ জ্বর জানিতে পারিয়াছিলে?

দে। না।

সু। আর যকৃতের সেই ব্যথাটা?

দে। পূর্ব্বমত আছে।

সু। তবে এখন এ সব স্থগিত রাখিলে ভাল হয় না?

দে। কি—মদ খাওয়া? কত দিন বলিবে? ও আমার সাথের সাথী।

সু। সাথের সাথী কেন? সঙ্গে আসে নাই, সঙ্গেও যাইবে না। অনেকে ত্যাগ করিয়াছে—তুমিও ত্যাগ করিবে না কেন?

দে। আমি কি সুখের জন্য ত্যাগ করিব? যাহারা ত্যাগ করে, তাহাদের অন্য সুখ আছে—সেই ভরসায় ত্যাগ করে। আমার আর কোন সুখই নাই।

সু। তবু বাঁচিবার আশায়, প্রাণের আকাঙ্ক্ষায় ত্যাগ কর।

দে। যাহাদের বাঁচিয়া সুখ, তাহারা বাঁচিবার আশায় মদ ছাড়ুক। আমার বাঁচিয়া কি লাভ?

সুরেন্দ্রের চক্ষু বাষ্পাকুল হইল। তখন বন্ধুস্নেহে পরিপূর্ণ হইয়া কহিলেন, "তবে আমাদের অনুরোধে ত্যাগ কর।"

দেবেন্দ্রের চক্ষে জল আসিল। দেবেন্দ্র বলিল, "আমাকে যে সৎপথে যাইতে অনুরোধ করে, তুমি ভিন্ন এমন আর কেহ নাই। যদি কখন ত্যাগ করি, সে তোমারই অনুরোধে করিব। আর—"

সু। আর কি?

দে। আর যদি কখন আমার স্ত্রীর মৃত্যুসংবাদ কর্ণে শুনি—তবে মদ ছাড়িব, নচেৎ এখন মরি বাঁচি, সমান কথা।

সুরেন্দ্র সজল নয়নে মনোমধ্যে হৈমবতীকে শত শত গালাগালি দিতে দিতে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

সূর্য্যমুখীর পত্র

"প্রাণাধিকা শ্রীমতী কমলমণি দাসী চিরায়ুষ্মতীষু।

আর তোমাকে আশীর্ব্বাদ পাঠ লিখিতে লজ্জা করে। এখন তুমিও এক জন হইয়া উঠিয়াছ—এক ঘরের গৃহিণী। তা যাহাই হউক, আমি তোমাকে আমার কনিষ্ঠ ভগিনী ভিন্ন আর কিছুই বলিয়া ভাবিতে পারিতেছি না। তোমাকে মানুষ করিয়াছি। প্রথম 'ক খ' লিখাই; কিন্তু তোমার হাতের অক্ষর দেখিয়া, আমার এ হিজিবিজি তোমার কাছে পাঠাইতে লজ্জা করে, তা লজ্জা করিয়া কি করিব? আমাদিগের দিনকাল গিয়াছে। সুকাল থাকিলে আমার এমন দশা হইবে কেন? কি দশা? এ কথা কাহাকে বলিবার নহে—বলিতে দুঃখও হয়, লজ্জাও করে। কিন্তু অন্তঃকরণের ভিতর যে কষ্ট, তাহা কাহাকে না বলিলেও সহ্য হয় না। আর কাহাকে বলিব? তুমি আমার প্রাণের ভগিনী—তুমি ভিন্ন আর আমাকে কেহ ভালবাসে না। আর তোমার ভাইয়ের কথা তোমা ভিন্ন পরের কাছেও বলিতে পারি না।

আমি আপনার চিতা আপনিই সাজাইয়াছি। কুন্দনন্দিনী যদি না খাইয়া মরিত, তাহাতে আমার কি ক্ষতি ছিল? পরমেশ্বর এত লোকের উপায় করিতেছেন, তাহার কি উপায় করিতেন না? আমি কেন আপনা খাইয়া তাহাকে ঘরে আনিলাম?

তুমি সে হতভাগিনীকে যখন দেখিয়াছিলে, তখন সে বালিকা। এখন তাহার বয়স ১৭।১৮ বৎসর হইয়াছে। সে যে সুন্দরী, তাহা স্বীকার করিতেছি, সেই সৌন্দর্য্যই আমার কাল হইয়াছে।

পৃথিবীতে যদি আমার কোন সুখ থাকে, তবে সে স্বামী; পৃথিবীতে যদি আমার কোন চিন্তা থাকে, তবে সে স্বামী; পৃথিবীতে যদি আমার কোন কিছু সম্পত্তি থাকে, তবে সে স্বামী; সেই স্বামী কুন্দনন্দিনী আমার হৃদয় হইতে কাড়িয়া লইতেছে। পৃথিবীতে যদি আমার কোন অভিলাষ থাকে, তবে সে স্বামীর স্নেহ; সেই স্বামীর স্নেহে কুন্দনন্দিনী আমাকে বঞ্চিত করিতেছে।

তোমার সহোদরকে মন্দ বলিও না। আমি তাঁহার নিন্দা করিতেছি না। তিনি ধর্ম্মাত্মা, শত্রুতেও তাঁহার চরিত্রের কলঙ্ক এখনও করিতে পারে না। আমি প্রত্যহ দেখিতে পাই, তিনি প্রাণপণে আপনার চিত্তকে বশ করিতেছেন। যে দিকে কুন্দনন্দিনী থাকে, সাধ্যানুসারে কখন সে দিকে নয়ন ফিরান না; নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে তাহার নাম মুখে আনেন না। এমন কি, তাহার প্রতি কর্কশ ব্যবহারও করিয়া থাকেন; তাহাকে বিনাদোষে ভর্ৎসনা করিতেও শুনিয়াছি।

তবে কেন আমি এত হাবড়হাটি লিখিয়া মরি? পুরুষে এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে বুঝান বড় ভার হইত, কিন্তু তুমি মেয়েমানুষ, এতক্ষণে বুঝিয়াছ। যদি কুন্দনন্দিনী অন্য স্ত্রীলোকের মত তাঁহার চক্ষে সামান্যা হইত, তবে তিনি কেন তাহার প্রতি না চাহিবার জন্য ব্যস্ত হইবেন? তাহার নাম মুখে না আনিবার জন্য কেন এত যত্নশীল হইবেন? কুন্দনন্দিনীর জন্য তিনি আপনার নিকট আপনি অপরাধী হইয়াছেন। এ জন্য কখন কখন তাহার প্রতি অকারণ ভর্ৎসনা করেন। সে রাগ তাহার উপর নহে—আপনার উপর। সে ভর্ৎসনা তাহাকে নহে, আপনাকে। আমি ইহা বুঝিতে পারি। আমি এত কাল পর্য্যন্ত অনন্যব্রত হইয়া অন্তরে বাহিরে কেবল তাঁহাকেই দেখিলাম—তাঁহার ছায়া দেখিলে, তাঁহার মনের কথা বলিতে পারি—তিনি আমাকে কি লুকাইবেন? কখন কখন অন্যমনে তাঁহার চক্ষু এদিক্ ওদিক্ চাহে, কাহার সন্ধানে, তাহা কি আমি বুঝিতে পারি

না? দেখিলে আবার ব্যস্ত হইয়া চক্ষু ফিরাইয়া লয়েন কেন, তাহা কি বুঝিতে পারি না? কাহার কণ্ঠের শব্দ শুনিবার জন্য, আহারের সময় গ্রাস হাতে করিয়াও কাণ তুলিয়া থাকেন, তাহা কি বুঝিতে পারি না? হাতের ভাত হাতে থাকে, কি মুখে দিতে কি মুখে দেন, তবু কাণ তুলিয়া থাকেন, —কেন? আবার কুন্দের স্বর কাণে গেলে তখনই বড় জোরে হাপুস হাপুস করিয়া ভাত খাইতে আরম্ভ করেন কেন, তাহা কি বুঝিতে পারি না? আমার প্রাণাধিক সর্ব্বদা প্রসন্নবদন—এখন এত অন্যমনা কেন? কথা বলিলে কথা কাণে না তুলিয়া, অন্যমনে উত্তর দেন 'হুঁ'। আমি যদি রাগ করিয়া বলি, 'আমি শীঘ্র মরি', তিনি না শুনিয়া বলেন 'হুঁ'। এত অন্যমনা কেন? জিজ্ঞাসা করিলে বলেন, 'মোকদ্দমার জ্বালায়'। আমি জানি, মোকদ্দমার কথা তাঁহার মনে স্থান পায় না। যখন মোকদ্দমার কথা বলেন, তখন হাসিয়া হাসিয়া কথা বলেন। আর এক কথা—এক দিন পাড়ার প্রাচীনার দল কুন্দের কথা কহিতেছিল, তাহার বাল্য-বৈধব্য, অনাথিনীত্ব, এই সকল লইয়া তাহার জন্য দুঃখ করিতেছিল। তোমার সহোদর সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আমি অন্তরাল হইতে দেখিলাম, তাঁহার চক্ষু জলে পূরিয়া গেল—তিনি সহসা দ্রুতবেগে সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন।

"এখন এক জন নূতন দাসী রাখিয়াছি—তাহার নাম কুমুদ। বাবু তাহাকে কুমুদ বলিয়া ডাকেন। কখন কখন কুমুদ বলিয়া ডাকিতে কুন্দ বলিয়া ফেলেন; আর কত অপ্রতিভ হন। অপ্রতিভ কেন?

"এ কথা বলিতে পারিব না যে, তিনি আমাকে অযত্ন বা অনাদর করেন। বরং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক যত্ন, অধিক আদর করেন। ইহার কারণ বুঝিতে পারি। তিনি আপনার মনে আমার নিকট অপরাধী; কিন্তু ইহাও বুঝিতে পারি যে, আমি আর তাঁহার মনে স্থান পাই না। যত্ন এক, ভালবাসা আর, ইহার মধ্যে প্রভেদ কি—আমরা স্ত্রীলোক সহজেই বুঝিতে পারি।

"আর একটা হাসির কথা। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নামে কলিকাতায় কে না কি বড় পণ্ডিত আছেন, তিনি আবার একখানি বিধবা-বিবাহের বহি বাহির করিয়াছেন। যে বিধবা-বিবাহের ব্যবস্থা দেয়, সে যদি পণ্ডিত, তবে মূর্খ কে? এখন বৈঠকখানায় ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ আসিলে সেই গ্রন্থ লইয়া বড় তর্ক-বিতর্ক হয়। সে দিন ন্যায়কচ্‌কচি ঠাকুর—মা সরস্বতীর সাক্ষাৎ বরপুত্র—বিধবা-বিবাহের পক্ষে তর্ক করিয়া বাবুর নিকট হইতে টোল মেরামতের জন্য দশটা টাকা লইয়া যায়। তাহার পরদিন সার্ব্বভৌম ঠাকুর বিধবা-বিবাহের প্রতিবাদ করেন। তাঁহার কন্যার বিবাহের জন্য আমি পাঁচ ভরির সোণার বালা গড়াইয়া দিয়াছি। আর কেহ বড় বিধবা-বিবাহের দিকে নয়।

"আপনার দুঃখের কথা লইয়া তোমাকে অনেকক্ষণ জ্বালাতন করিয়াছি। তুমি না জানি কত বিরক্ত হইবে। কিন্তু কি করি ভাই—তোমাকে মনের দুঃখ না বলিয়া কাহাকে বলিব? আমার কথা এখনও ফুরায় নাই—কিন্তু তোমার মুখ চেয়ে আজ ক্ষান্ত হইলাম। এ সকল কথা কাহাকেও বলিও না। আমার মাথার দিব্য, জামাইবাবুকে এ পত্র দেখাইও না।

"তুমি কি আমাদিগকে দেখিতে আসিবে না? এই সময় একবার আসিও, তোমাকে পাইলে অনেক ক্লেশ নিবারণ হইবে।

"তোমার ছেলের সংবাদ ও জামাইবাবুর সংবাদ শীঘ্র লিখিবে, ইতি।

সূর্য্যমুখী।"

"পুনশ্চ, আর এক কথা—পাপ বিদায় করিতে পারিলেই বাঁচি। কোথায় বিদায় করি? তুমি নিতে পার? না ভয় করে?"

কমল প্রত্যুত্তরে লিখিলেন—

"তুমি পাগল হইয়াছ। নচেৎ তুমি স্বামীর হৃদয় প্রতি অবিশ্বাসিনী হইবে কেন? স্বামীর প্রতি বিশ্বাস হারাইও না। আর যদি নিতান্তই সে বিশ্বাস না রাখিতে পার—তবে দীঘির জলে ডুবিয়া মর। আমি কমলমণি তর্কসিদ্ধান্ত ব্যবস্থা দিতেছি, তুমি দড়িকলসী লইয়া জলে ডুবিয়া মরিতে পার। স্বামীর প্রতি যাহার বিশ্বাস রহিল না—তাহার মরাই মঙ্গল।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

অঙ্কুর

দিন কয়মধ্যে ক্রমে ক্রমে নগেন্দ্রের সকল চরিত্র পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। নির্ম্মল আকাশে মেঘ দেখা দিল—নিদাঘকালের প্রদোষাকাশের মত অকস্মাৎ সে চরিত্র মেঘাবৃত হইতে লাগিল।

দেখিয়া সূর্য্যমুখী গোপনে আপনার অঞ্চলে চক্ষু মুছিলেন। সূর্য্যমুখী ভাবিলেন, "আমি কমলের কথা শুনিব। স্বামীর চিত্তপ্রতি কেন অবিশ্বাসিনী হইব? তাঁহার চিত্ত অচলপর্ব্বত—আমিই ভ্রান্ত বোধ হয়। তাঁহার কোন ব্যামোই হইয়া থাকিবে।" সূর্য্যমুখী বালির বাঁধ বাঁধিল।

বাড়ীতে একটি ছোট রকম ডাক্তার ছিল। সূর্য্যমুখী গৃহিণী। অন্তরালে থাকিয়া সকলের সঙ্গেই কথা কহিতেন। বারেণ্ডার পাশে এক চিক থাকিত; চিকের পশ্চাতে সূর্য্যমুখী থাকিতেন। বারেণ্ডায় সম্বোধিত ব্যক্তি থাকিত; মধ্যে এক দাসী থাকিত, তাহার মুখে সূর্য্যমুখী কথা কহিতেন। এইরূপে সূর্য্যমুখী ডাক্তারের সঙ্গে কথা কহিতেন। সূর্য্যমুখী তাহাকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "বাবুর অসুখ হইয়াছে, ঔষধ দাও না কেন?"

ডাক্তার। কি অসুখ, তাহা ত আমি জানি না। আমি ত অসুখের কোন কথা শুনি নাই।

সূ। বাবু কিছু বলেন নাই?

ডা। না—কি অসুখ?

সূ। কি অসুখ, তাহা তুমি ডাক্তার, তুমি জান না—আমি জানি?

ডাক্তার সুতরাং অপ্রতিভ হইল। "আমি গিয়া ...রিতেছি" এই বলিয়া ডাক্তার প্রস্থানের ...র্গ করিতেছিল, সূর্য্যমুখী তাহাকে ফিরাই- ...; বলিলেন, "বাবুকে কিছু জিজ্ঞাসা করিও ঔষধ দাও।"

...াক্তার ভাবিল, মন্দ চিকিৎসা নহে, "যে ..., ঔষধের ভাবনা কি?" বলিয়া পলায়ন ...। পরে ডিস্পেন্সারীতে গিয়া একটু সোডা, ...টু পোর্ট ওয়াইন, একটু সিরাপ ফেরিমিউরেটিস, ...টু মাথামুণ্ডু, মিশাইয়া, শিশি পূরিয়া, টিকিট ...য়া, প্রত্যহ দুইবার সেবনের ব্যবস্থা লিখিয়া ... সূর্য্যমুখী ঔষধ খাওয়াইতে গেলেন, নগেন্দ্র ... হাতে লইয়া পড়িয়া দেখিয়া একটা বিড়ালকে ...য়া মারিলেন—বিড়াল পলাইয়া গেল—ঔষধ ...হার ল্যাজ দিয়া গড়াইয়া পড়িতে পড়িতে ...ল।

সূর্য্যমুখী বলিলেন, "ঔষধ না খাও—তোমার অসুখ, আমাকে বল।"

নগেন্দ্র বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "কি অসুখ?"

সূর্য্যমুখী বলিলেন, "তোমার শরীর দেখ দেখি ...হইয়াছে?" এই বলিয়া সূর্য্যমুখী একখানি ...ণ আনিয়া নিকটে ধরিলেন। নগেন্দ্র তাঁহার হাত হইতে দর্পণ লইয়া দূরে নিক্ষিপ্ত করিলেন। দর্পণ চূর্ণ হইয়া গেল।

সূর্য্যমুখীর চক্ষু দিয়া জল পড়িল। দেখিয়া নগেন্দ্র চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া উঠিয়া গেলেন। বহির্ব্বাটী গিয়া এক জন ভৃত্যকে বিনাপরাধে প্রহার করিলেন। সে প্রহার সূর্য্যমুখীর অঙ্গে বাজিল।

ইতিপূর্ব্বে নগেন্দ্র অত্যন্ত শীতলস্বভাব ছিলেন। এখন কথায় কথায় রাগ।

শুধু রাগ নয়। এক দিন রাত্রে আহারের সময় অতীত হইয়া গেল, তথাপি নগেন্দ্র অন্তঃপুরে আসিলেন না। সূর্য্যমুখী প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া আছেন। অনেক রাত্রি হইল। অনেক রাত্রে নগেন্দ্র আসিলেন; সূর্য্যমুখী দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, নগেন্দ্রের মুখ আরক্ত, চক্ষু আরক্ত, নগেন্দ্র মদ্যপান করিয়াছেন। নগেন্দ্র কখনও মদ্যপান করিতেন না। দেখিয়া সূর্য্যমুখী বিস্মিতা হইলেন।

সেই অবধি প্রত্যহ এইরূপ হইতে লাগিল। এক দিন সূর্য্যমুখী নগেন্দ্রের দুইটি চরণে হাত দিয়া গলদশ্রু কোনরূপে রুদ্ধ করিয়া অনেক অনুনয় করিলেন। বলিলেন, "কেবল আমার অনুরোধে ইহা ত্যাগ কর।" নগেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি দোষ?"

জিজ্ঞাসার ভাবেই উত্তর নিবারণ হইল। তথাপি সূর্য্যমুখী উত্তর করিলেন, "দোষ কি, তাহা ত আমি জানি না। তুমি যাহা জান না, তাহা আমিও জানি না, কেবল আমার অনুরোধ।"

নগেন্দ্র প্রত্যুত্তর করিলেন, "সূর্য্যমুখী, আমি মাতাল, মাতালকে শ্রদ্ধা হয়, আমাকে শ্রদ্ধা করিও, নচেৎ আবশ্যক করে না।"

সূর্য্যমুখী ঘরের বাহিরে গেলেন। ভৃত্যের প্রহার অবধি নগেন্দ্রের সম্মুখে আর চোখের জল ফেলিবেন না, প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন।

দেওয়ানজী বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন, "মা-ঠাকুরাণীকে বলিও, বিষয় গেল, আর থাকে না।"

"কেন?"

"বাবু কিছু দেখেন না। সদর মফঃস্বলের আমলারা যাহা ইচ্ছা, তাহা করিতেছে। কর্ত্তার অমনোযোগে আমাকে কেহ মানে না।" শুনিয়া সূর্য্যমুখী বলিলেন, "যাঁহার বিষয়, তিনি রাখেন, থাকিবে। না হয়, গেল গেলই।"

ইতিপূর্ব্বে নগেন্দ্র সকলই স্বয়ং তত্ত্বাবধান করিতেন।

এক দিন তিন চার হাজার প্রজা নগেন্দ্রের কাছারীর দরওয়াজায় যোড়হাত করিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। "দোহাই হুজুর—নায়েব গোমস্তার দৌরাত্ম্যে আর বাঁচি না। সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইল। আপনি না রাখিলে কে রাখে?"

নগেন্দ্র হুকুম দিলেন, "সব হাঁকায় দাও।"

ইতিপূর্ব্বে তাঁহার এক জন গোমস্তা এক জন প্রজাকে মারিয়া একটি টাকা লইয়াছিল। নগেন্দ্র গোমস্তার বেতন হইতে দশটি টাকা লইয়া প্রজাকে দিয়াছিলেন।

হরদেব ঘোষাল নগেন্দ্রকে লিখিলেন, "তোমার কি হইয়াছে? তুমি কি করিতেছ? আমি কিছু ভাবিয়া পাই না। তোমার পত্র ত পাই-ই না, যদি পাই, ত সে ছত্র দুই, তাহার মানে মাথা-মুণ্ড কিছুই নাই। তাতে কোন কথাই থাকে না। তুমি কি আমার উপর রাগ করিয়াছ? তা বল না কেন? আর কিছু বল না বল, শারীরিক ভাল আছ কি না, বল।"

নগেন্দ্র উত্তর লিখিলেন, "আমার উত্তরে রাগ করিও না—আমি অধঃপাতে যাইতেছি।"

হরদেব বড় বিজ্ঞ, পত্র পড়িয়া মনে করিলেন, "কি এ? অর্থচিন্তা? বন্ধু-বিচ্ছেদ? দেবেন্দ্র দত্ত? না, এ প্রেম?"

কমলমণি সূর্য্যমুখীর আর একখানি পত্র পাইলেন, তাহার শেষ এই—"একবার এসো! কমলমণি! ভগিনি! তুমি বই আর আমার সুহৃদ্ কেহ নাই। একবার এসো!"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

মহাসমর

কমলমণির আসন টলিল। আর তিনি থাকিতে পারিলেন না। কমলমণি রমণীরত্ন! অমনি স্বামীর কাছে গেলেন।

শ্রীশচন্দ্র অন্তঃপুরে বসিয়া আপিসের আয়ব্যয়ের হিসাবকিতাব দেখিতেছিলেন, তাঁহার পার্শ্বে বিছানায় বসিয়া এক বৎসরের পুত্র সতীশচন্দ্র ইংরেজী সংবাদপত্রখানি অধিকার করিয়াছিল। সতীশচন্দ্র সংবাদপত্রখানি প্রথমে ভোজনের চেষ্টা দেখিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া এক্ষণে পাতিয়া বসিয়াছিল।

কমলমণি স্বামীর নিকটে গিয়া গললগ্নীকৃতবাসা হইয়া, ভূমিষ্ঠা হইয়া প্রণাম করিলেন এবং করযোড় করিয়া কহিলেন,—"সেলাম পৌঁছে মহারাজ!"

(ইতিপূর্ব্বে বাড়ীতে গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রা হইয়া গিয়াছিল।)

শ্রীশচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, "আবার শশা-চুরি না কি?"

ক। শশা কাঁকুড় নয়। এবার বড় ভারী জিনিষ চুরি গিয়াছে।

শ্রী। কোথায় কি চুরি হলো?

ক। গোবিন্দপুরে চুরি হয়েছে। দাদাবাবুর একটি সোণার কৌটায় এক কড়া কাণা কড়ি ছিল, তাই কে নিয়া গিয়াছে!

শ্রীশ বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন, "তোমার দাদাবাবুর সোণার কৌটা ত সূর্য্যমুখী—কাণা কড়িটি কি?"

ক। সূর্য্যমুখীর বুদ্ধিখানি।

শ্রীশচন্দ্র কহিলেন, "তাই লোকে বলে, যে খেলে সে কাণা কড়িতে খেলে। সূর্য্যমুখী ঐ কাণা কড়িতেই তোমার ভাইকে কিনে রেখেছে—আর তোমার এতটা বুদ্ধি থাকিতেও ভাই"—কমলমণি শ্রীশচন্দ্রের মুখ টিপিয়া ধরিলেন। ছাড়িয়া দিলে শ্রীশ বলিলেন, "তা কাণা কড়িটি চুরি করলে কে?"

ক। তা ত জানি না—কিন্তু তার পত্র পড়িয়া বুঝিলাম যে, সে কাণা কড়িটি খোওয়া গিয়াছে—নইলে মাগী এমন পত্র লিখবে কেন?

শ্রী। পত্রখানি দেখিতে পাই?

কমলমণি শ্রীশচন্দ্রের হাতে সূর্য্যমুখীর পত্র দিয়া কহিলেন, "এই পড়। সূর্য্যমুখী তোমাকে এই সকল কথা বলিতে মানা করিয়াছে,—কিন্তু যতক্ষণ তোমাকে সব না বলিতেছি, ততক্ষণ আমার প্রাণ খাবি খেতেছে। তোমাকে পত্র না পড়াইলে, আমার আহার-নিদ্রা হইবে না—দুরন্ত রোগই বা উপস্থিত হয়।"

শ্রীশচন্দ্র পত্র হস্তে লইয়া চিন্তা করিয়া বলিলেন, "যখন তোমাকে নিষেধ করিয়াছে, তখন আমি এ পত্র দেখিব না। কথাটা কি, তা শুনিতেও চাহিব না। এখন করিতে হইবে কি, তাই বল।"

ক। করতে হবে এই, সূর্য্যমুখীর বুদ্ধিটুকু গিয়েছে, তার একটু বুদ্ধি চাই। বুদ্ধি দেয়, এমন লোক তার কে আছে—বুদ্ধি যা কিছু আছে, তা সতীশ বাবুর। তাই সতীশ বাবুকে একবার গোবিন্দপুর যেতে তার মামী লিখে পাঠিয়েছে।

সতীশ বাবু ততক্ষণ একটা ফুলদানি ফুলসমেত উল্টাইয়া ফেলিয়াছিলেন এবং তৎপরে দোয়াতের উপর নজর করিতেছিলেন। দেখিয়া শ্রীশচন্দ্র কহিলেন, "উপযুক্ত বুদ্ধিদাতা বটে। তা যাহা হোক, এতক্ষণে বুঝিলাম—ভাজের বাড়ী মহাশয়ের নিমন্ত্রণ। সতীশকে যেতে হ'লেই সুতরাং কমলমণিও যাবে। তা সূর্য্যমুখীর কাণা কড়িটি না হারালে আর এমন কথা লিখবে কেন?"

ক। শুধু কি তাই? সতীশের নিমন্ত্রণ, আমার নিমন্ত্রণ আর তোমার নিমন্ত্রণ।

শ্রী। আমার নিমন্ত্রণ কেন?

ক। আমি বুঝি একা যাব? আমার সঙ্গে গাড়ু-গামছা নিয়ে যায় কে?

শ্রী। এ সূর্য্যমুখীর বড় অন্যায়। শুধু গাড়ু-গামছা বহিবার জন্য যদি ঠাকুরজামাইকে দরকার হয়, তবে আমি দু'দিনের জন্য একটা ঠাকুরজামাই দেখিয়ে দিতে পারি।

কমলমণির বড় রাগ হইল। ভ্রূকুটি করিল, শ্রীশকে ভেঙ্গাইল এবং শ্রীশচন্দ্র যে কাগজখানায় লিখিতেছিল, তাহা ছিঁড়িয়া ফেলিল। শ্রীশ হাসিয়া কহিল, "তা লাগ্‌তে এসো কেন?"

কমলমণি কৃত্রিম কোপসহকারে কহিল, "আমার খুসি, লাগ্‌বো।"

শ্রীশচন্দ্রও কৃত্রিম কোপসহকারে কহিলেন, "আমার খুসি, বল্‌বো।"

তখন কোপযুক্তা কমলমণি শ্রীশকে একটি কিল দেখাইল। কুন্দদন্তে অধর টিপিয়া ছোট হাতে একটি ছোট কিল দেখাইল।

কিল দেখিয়া শ্রীশচন্দ্র কমলমণির খোঁপা খুলিয়া দিলেন। তখন বর্দ্ধিতরোষা কমলমণি, শ্রীশচন্দ্রের দোয়াতের কালি পিক্‌দানীতে ঢালিয়া ফেলিয়া দিল।

রাগে শ্রীশচন্দ্র দ্রুতগতি ধাবমান হইয়া কমলমণির মুখচুম্বন করিলেন। রাগে কমলমণিও অধীরা হইয়া শ্রীশচন্দ্রের মুখচুম্বন করিল। দেখিয়া সতীশচন্দ্রের বড় প্রীতি জন্মিল। তিনি জানিতেন যে, মুখচুম্বন তাঁহার ইজারা মহল। অতএব তাহার ছড়াছড়ি দেখিয়া রাজ-ভাগ আদায়ের অভিলাষে মা'র জানু ধরিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন এবং উভয়েরই মুখপানে চাহিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসির লহর তুলিলেন। সে হাসি কমলমণির কর্ণে কি মধুর বাজিল! কমলমণি তখন সতীশকে ক্রোড়ে উঠাইয়া লইয়া ভূরি ভূরি মুখচুম্বন করিল। পরে শ্রীশচন্দ্র কমলের ক্রোড় হইতে তাহাকে লইলেন এবং ভূরি ভূরি মুখচুম্বন করিলেন। সতীশ বাবু এইরূপে রাজ-ভাগ আদায় করিয়া যথাকালে অবতরণ করিলেন এবং পিতার সুবর্ণময় পেন্‌সিল্‌টি দেখিতে পাইয়া অপহরণ মানসে ধাবমান হইলেন। পরে হস্তগত করিয়া উপাদেয় ভোজ্য বিবেচনায় পেন্‌সিলটি মুখে দিয়া লেহন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকালে ভগদত্ত এবং অর্জ্জুনে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। ভগদত্ত অর্জ্জুন প্রতি অনিবার্য্য বৈষ্ণবাস্ত্র নিক্ষেপ করেন, অর্জ্জুনকে তন্নিবারণে অক্ষম জানিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বক্ষঃ পাতিয়া সেই অস্ত্র গ্রহণ করিয়া তাহার শমতা করেন। সেইরূপ কমলমণি ও শ্রীশচন্দ্রের এই বিষম যুদ্ধে, সতীশচন্দ্র মহাস্ত্র সকল আপন বদনমণ্ডলে গ্রহণ করায় যুদ্ধের শমতা হইল। কিন্তু ইহাদের এইরূপ সন্ধিবিগ্রহ বাদলের বৃষ্টির মত—দণ্ডে দণ্ডে হইত, দণ্ডে দণ্ডে যাইত।

শ্রীশচন্দ্র তখন কহিলেন, "তা সত্য সত্যই কি তোমায় গোবিন্দপুরে যেতে হবে? আমি একা থাকিব কি প্রকারে?"

ক। তোমায় যেন আমি একা থাকিতে সাধ্‌তেছি। আমিও যাব, তুমিও যাবে। তা যাও, সকাল সকাল আফিস সারিয়া আইস, আর দেরী কর ত, সতীশে আমাতে দুদিকে দুজনে কাঁদতে বস্‌বো।

শ্রী। আমি যাই কি প্রকারে? আমাদের এই তিসি কিনিবার সময়। তুমি তবে একা যাও।

ক। আয়, সতীশ! আমরা দুই জনে দুই দিকে কাঁদতে বসি।

মা'র আদরের ডাক সতীশের কাণে গেল—সতীশ অমনি পেন্‌সিল্‌ভোজন ত্যাগ করিয়া লহর তুলিয়া আহ্লাদের হাসি হাসিল, সুতরাং কমলের এবার কাঁদা হলো না। তৎপরিবর্ত্তে সতীশের মুখচুম্বন করিলেন—দেখাদেখি শ্রীশও তাহাই করিলেন। সতীশ আপনার বাহাদুরী দেখাইয়া আর একবার লহর তুলিয়া হাসিল। এই সকল বৃহৎ ব্যাপার সমাধা হইলে কমল আবার কহিলেন—

"এখন কি হুকুম হয়?"

শ্রী। তুমি যাও, মানা করি না; কিন্তু তিসির মরসুমটায় আমি কি প্রকারে যাই?

শুনিয়া কমলমণি মুখ ফিরাইয়া মানে বসিলেন। আর কথা কহেন না।

শ্রীশচন্দ্রের কলমে একটু কালি ছিল। শ্রীশ সেই কলম লইয়া পশ্চাৎ হইতে গিয়া কমলের কপালে একটি টিপ কাটিয়া দিলেন। তখন কমল হাসিয়া বলিলেন, "প্রাণাধিক, আমি তোমায় কত ভালবাসি।" এই বলিয়া কমল, শ্রীশচন্দ্রের স্কন্ধ বাহু দ্বারা বেষ্টন করিয়া তাঁহার মুখচুম্বন করিলেন, সুতরাং টিপের কালি সমুদায়টাই শ্রীশের গালে লাগিয়া রহিল।

এইরূপে এবারকার যুদ্ধে জয় হইলে পর, কমল বলিলেন, "যদি তুমি একান্তই যাইবে না, তবে আমার যাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দাও।"

শ্রী। ফিরিবে কবে?

ক। জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন? তুমি যদি গেলে না, তবে আমি কয় দিন থাকিতে পারিব?

শ্রীশচন্দ্র কমলমণিকে গোবিন্দপুরে পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু আমরা নিশ্চিত সংবাদ রাখি যে, সে বার শ্রীশচন্দ্রের সাহেবেরা তিসির কাজে বড় লাভ করিতে পারেন নাই। হৌসের কর্ম্মচারীরা আমাদিগের নিকট গোপনে বলিয়াছে যে, সে শ্রীশ বাবুরই দোষ। তিনি ঐ সময়টা কাজ-কর্ম্মে বড় মন দেন নাই। কেবল ঘরে বসিয়া কড়ি গুণিতেন। এ কথা শ্রীশচন্দ্র এক দিন শুনিয়া বলিলেন, "হবেই ত। আমি তখন লক্ষ্মীছাড়া হইয়াছিলাম।" শ্রোতারা শুনিয়া মুখ ফিরাইয়া বলিল, "ছি! বড় স্ত্রৈণ।" কথাটা শ্রীশের কাণে গেল, তিনি শুনিয়া হৃষ্টমনে ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওরে ভাল করিয়া আহারের উদ্যোগ কর। বাবুরা আজ এখানে আহার করিবেন।"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

ধরা পড়িল

গোবিন্দপুরে দত্তদিগের বাড়ীতে যেন অন্ধকারে একটি ফুল ফুটিল। কমলমণির হাসিমুখ দেখিয়া সূর্য্যমুখীরও চক্ষের জল শুকাইল। কমলমণি বাড়ীতে পা দিয়াই সূর্য্যমুখীর চুলের গোছা লইয়া বসিয়া গেলেন। অনেক দিন সূর্য্যমুখী কেশ-রচনা করেন নাই। কমলমণি বলিলেন, "দুটো ফুল গুঁজিয়া দিব।" সূর্য্যমুখী তাহার গাল টিপিয়া ধরিলেন। "না! না!" বলিয়া কমলমণি লুকাইয়া দুটা ফুল গুঁজিয়া দিলেন। লোক আসিলে বলিলেন, "দেখেছ, মাগী বুড়া বয়সে মাথায় ফুল পরে।"

আলোকময়ীর আলো নগেন্দ্রের মুখমণ্ডলের মেঘেও ঢাকা পড়িল না। নগেন্দ্রকে দেখিয়া কমলমণি ঢিপ করিয়া প্রণাম করিল। নগেন্দ্র বলিলেন, "কমল! কোথা থেকে?" কমল মুখ নত করিয়া নিরীহ ভাল মানুষের মত বলিলেন, "আজ্ঞে, খোকা ধরিয়া আনিল।" নগেন্দ্র বলিলেন, "বটে! মার পাজিকে।" এই বলিয়া খোকাকে কোলে লইয়া দণ্ডস্বরূপ তাহার মুখচুম্বন করিলেন। খোকা কৃতজ্ঞ হইয়া তাঁহার গায়ে লাল দিল, আর গোঁপ ধরিয়া টানিল।

কুন্দনন্দিনীর সহিত কমলমণির এইরূপ আলাপ হইল—"ওলো কুঁদী—কুঁদী—মুদী—দুঁদী—ভাল আছিস্ ত কুঁদী?"

কুঁদী অবাক্ হইয়া রহিল। কিছুকাল ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল, "আছি।"

"আছি দিদি—আমায় দিদি বল্‌বি—না বলিস্ ত ঘুমিয়ে থাকবি, আর তোর চুলে আগুন ধরিয়ে দিব। আর নহিলে গায়ে আরসুলা ছাড়িয়া দিব।"

কুন্দ দিদি বলিতে আরম্ভ করিল। যখন কলিকাতায় কুন্দ কমলের কাছে থাকিত, তখন কমলকে কিছু বলিত না। বড় কথাও কহিত না। কিন্তু কমলের যে প্রকৃতি চিরপ্রেমময়ী, তাহাতে সে তখন হইতেই তাহাকে ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াছিল। মধ্যে কয় বৎসর অদর্শনে কতক কতক ভুলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে কমলের স্বভাবগুণে, কুন্দেরও স্বভাবগুণে সেই ভালবাসা নূতন হইয়া বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

প্রণয় গাঢ় হইল। এ দিকে কমলমণি স্বামীর গৃহে যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন; সূর্য্যমুখী বলিলেন, "না ভাই! আর দু'দিন থাক! তুমি গেলে আর বাঁচিব না। তোমার কাছে সকল কথা বলাও সোয়াস্তি।" কমল কহিলেন, "তোমার কাজ না করিয়া যাইব না।" সূর্য্যমুখী বলিলেন, "আমার কি কাজ করিবে?" কমলমণি মুখে বলিলেন, "তোমার শ্রাদ্ধ"—মনে বলিলেন, "তোমার কণ্টকোদ্ধার।"

কুন্দনন্দিনী কমলের যাওয়ার কথা শুনিয়া আপনার ঘরে গিয়া লুকাইয়া কাঁদিল, কমলমণি

লুকাইয়া লুকাইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেল। কুন্দনন্দিনী বালিসে মাথা দিয়া কাঁদিতেছে, কমলমণি তাহার চুল বাঁধিতে বসিল।

চুল-বাঁধা কমলের একটা রোগ। চুল-বাঁধা সমাপ্ত হইলে, কুন্দের মাথা তুলিয়া, কমল তাহার মস্তক আপনার কোলে রাখিলেন। অঞ্চল দিয়া তাহার চক্ষু মুছাইয়া দিলেন। এই সব কাজ শেষ করিয়া শেষে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কুঁদি, কাঁদিতেছিলি কেন?"

কুন্দ বলিল, "তুমি যাবে কেন?"

কমলমণি একটু হাসিলেন। কিন্তু ফোঁটা দুই চক্ষের জল সে হাসি মানিল না—না বলিয়া কহিয়া তাহারা কমলমণির গণ্ড বাহিয়া হাসির উপর আসিয়া পড়িল। রৌদ্রের উপর বৃষ্টি হইল।

কমলমণি বলিলেন, "তাতে কাঁদিস্ কেন?"

কুন্দ। তুমি আমায় ভালবাস।

ক। কেন—আর কেহ কি ভালবাসে না?

কুন্দ চুপ করিয়া রহিল।

ক। কে ভালবাসে না? গিন্নি ভালবাসে না —না? আমায় লুকুস্‌নে।

কুন্দ নীরব।

কমল। দাদা বাবু ভালবাসে না?

কুন্দ নীরব।

কমল বলিলেন, "যদি আমি তোমায় ভালবাসি —আর তুমি আমায় ভালবাস, তবে কেন আমার সঙ্গে চল না?"

কুন্দ তথাপি কিছু বলিল না। কমল বলিলেন, "যাবে?" কুন্দ ঘাড় নাড়িল—"যাব না।"

কমলের প্রফুল্ল মুখ গম্ভীর হইল।

তখন কমলমণি সস্নেহে কুন্দনন্দিনীর মস্তক বক্ষে তুলিয়া লইয়া ধারণ করিলেন এবং সস্নেহে তাহার গণ্ডদেশ গ্রহণ করিয়া কহিলেন, "কুন্দ, সত্য বলিবি?"

কুন্দ বলিল, "কি?"

কমল বলিলেন, "যা জিজ্ঞাসা করিব? আমি তোর দিদি—আমার কাছে লুকুস্‌নে—আমি কাহারও কাছে বলিব না।" কমল মনে মনে রাখিলেন, "যদি বলি ত রাজমন্ত্রী শ্রীশ বাবুকে, আর খোকার কাণে কাণে।"

কুন্দ বলিলেন, "কি বল?"

ক। তুই দাদা বাবুকে বড় ভালবাসিস্—না?

কুন্দ উত্তর দিল না, কমলমণির হৃদয়মধ্যে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

কমল বলিলেন—"বুঝেছি—মরিয়াছ।' মর তাতে ক্ষতি নাই—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অনেকে মরে যে?"

কুন্দনন্দিনী মস্তক উত্তোলন করিয়া কমলের মুখপ্রতি স্থিরদৃষ্টি করিয়া রহিল। কমলমণি প্রশ্ন বুঝিলেন। বলিলেন, "পোড়ারমুখী, চোখের মাথা খেয়েছ? দেখতে পাওনা যে"—মুখের কথা মুখে রহিল, তখন ঘুরিয়া কুন্দের উন্নত মস্তক আবার কমলমণির বক্ষের উপর পড়িল। কুন্দনন্দিনীর অশ্রুজলে কমলমণির হৃদয় প্লাবিত হইল। কুন্দনন্দিনী অনেকক্ষণ নীরবে কাঁদিল—বালিকার ন্যায় বিবশা হইয়া কাঁদিল। সে কাঁদিল, আবার পরের চক্ষের জলে তাহার চুল ভিজিয়া গেল।

ভালবাসা কাহাকে বলে, সোণার কমল তাহা জানিত। অন্তঃকরণের অন্তঃকরণমধ্যে কুন্দনন্দিনীর দুঃখে দুঃখী, সুখে সুখী হইল। কুন্দনন্দিনীর চক্ষু মুছাইয়া কহিল, "কুন্দ!"

কুন্দ আবার মাথা তুলিয়া চাহিল।

ক। আমার সঙ্গে চল।

কুন্দের চক্ষে আবার জল পড়িতে লাগিল। কমল বলিলেন, "নহিলে নয়।—সোণার সংসার ছারখার গেল।"

কুন্দ কাঁদিতে লাগিল। কমল বলিলেন, "যাবি? মনে করিয়া দেখ্?"

কুন্দ অনেকক্ষণ পরে চক্ষু মুছিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, "যাব।"

অনেকক্ষণ পরে কেন? তাহা কমল বুঝিল। বুঝিল যে, কুন্দনন্দিনী পরের মঙ্গলমন্দিরে আপনার প্রাণের প্রাণ বলি দিল। নগেন্দ্রের মঙ্গলার্থ, সূর্য্যমুখীর মঙ্গলার্থ, নগেন্দ্রকে ভুলিতে স্বীকৃত হইল। সেই জন্য অনেকক্ষণ লাগিল। আপনার মঙ্গল? কমল বুঝিয়াছিলেন যে, কুন্দনন্দিনী আপনার মঙ্গল বুঝিতে পারে না।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

হীরা

এমন সময় হরিদাসী বৈষ্ণবী আসিয়া গান করিল,—

"কাঁটা বনে তুলতে গেলাম কলঙ্কের ফুল
গো সখি কলঙ্কেরি ফুল।
মাথায় পরলাম মালা গেঁথে, কাণে পরলাম দুল,
সখি কলঙ্কেরি ফুল।"

এ দিন সূর্য্যমুখী উপস্থিত। তিনি কমলকে গান শুনিতে ডাকিতে পাঠাইলেন। কমল কুন্দকে সঙ্গে করিয়া গান শুনিতে আসিলেন। বৈষ্ণবী গায়িতে লাগিল ;—

"মরি মরব কাঁটা ফুটে,
ফুলের মধু খাব লুটে,
খুঁজে বেড়াই কোথায় ফুটে,
নবীন মুকুল।"

কমলমণি ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিলেন, "বৈষ্ণবী দিদি—তোমার মুখে ছাই পড়ুক—আর তুমি মর। আর কি গান জান না ?"

হরিদাসী বলিল, "কেন ?" কমলের আরও রাগ বাড়িল ; বলিলেন, "কেন ? একটা বাবলার ডাল আনত রে—কাঁটা ফোটা কত সুখ মাগীকে দেখিয়ে দিই।"

সূর্য্যমুখী মৃদুভাবে হরিদাসীকে বলিলেন, "ও সব গান আমাদের ভাল লাগে না—গৃহস্থবাড়ী, ভাল গান গাও।"

হরিদাসী বলিল, "আচ্ছা।" বলিয়া গায়িতে আরম্ভ করিল—

"স্মৃতিশাস্ত্র পড়্ব আমি ভট্টাচার্য্যের পায়ে ধ'রে।
ধর্ম্মাধর্ম্ম শিখে নিব, কোন্ বেটী বা নিন্দা করে॥"

কমল ভ্রূকুটি করিয়া বলিলেন, "গিন্নি মশাই—তোমার প্রবৃত্তি হয়, তোমার বৈষ্ণবীর গান তুমিই শোন, আমি চলিলাম।" এই বলিয়া কমল চলিয়া গেলেন—সূর্য্যমুখীও মুখ অপ্রসন্ন করিয়া উঠিয়া গেলেন। আর আর স্ত্রীলোকেরা আপন আপন প্রবৃত্তিমতে কেহ উঠিয়া গেল, কেহ রহিল। কুন্দনন্দিনী রহিল। তাহার কারণ, কুন্দনন্দিনী গানের মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারে নাই—বড় শুনেও নাই—অন্যমনে ছিল, এই জন্য যেখানকার সেইখানেই রহিল। হরিদাসী তখন আর গান করিল না। এদিক্ সেদিক্ বাজে কথা আরম্ভ করিল। গান আর হইল না দেখিয়া আর সকলে উঠিয়া গেল। কুন্দ কেবল উঠিল না—চরণে তাহার গতিশক্তি ছিল কি না সন্দেহ। তখন কুন্দকে বিরলে পাইয়া হরিদাসী তাহাকে অনেক কথা বলিল। কুন্দ কতক বা শুনিল, কতক বা শুনিল না।

সূর্য্যমুখী ইহা সকলই দূর হইতে দেখিতেছিলেন। যখন উভয়ে গাঢ় মনঃসংযোগের সহিত কথাবার্ত্তা হওয়ার চিহ্ন দেখিলেন, তখন সূর্য্যমুখী কমলকে ডাকিয়া দেখাইলেন। কমল বলিল, "কি তা ? কথা কহিতেছে—কহুক না। মেয়ে বৈ ত আর পুরুষ না।"

সূর্য্য। মেয়ে কি পুরুষ, তার ঠিক কি ?

কমল বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "সে কি ?"

সূর্য্য। আমার বোধ হয়, কোন ছদ্মবেশী পুরুষ। তাহা এখনি জানিব—কিন্তু কুন্দ কি পাপিষ্ঠা !

"রসো। আমি একটা বাবলার ডাল আনি। মিন্‌ষেকে কাঁটা ফোটার সুখটা দেখাই।" এই বলিয়া কমল বাবলার ডালের সন্ধানে গেলেন। পথে সতীশের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল—সতীশ মামীর সিন্দুরকৌটা অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন—এবং সিন্দুর লইয়া আপনার গালে, নাকে, দাড়িতে, বুকে, পেটে বিলক্ষণ করিয়া অঙ্গরাগ করিতেছিলেন—দেখিয়া কমল, বৈষ্ণবী, বাবলার ডাল, কুন্দনন্দিনী প্রভৃতি সব ভুলিয়া গেলেন।

তখন সূর্য্যমুখী হীরা দাসীকে ডাকাইলেন।

হীরার নাম একবার উল্লেখ হইয়াছে। তাহার কিছু বিশেষ পরিচয় আবশ্যক।

নগেন্দ্র এবং তাঁহার পিতার বিশেষ যত্ন ছিল যে, গৃহের পরিচারিকারা বিশেষ সৎস্বভাববিশিষ্টা হয়, এই অভিপ্রায়ে উভয়েই পর্য্যাপ্ত বেতনদান স্বীকার করিয়া একটু ভদ্রঘরের স্ত্রীলোকগণকে দাসীত্বে নিযুক্ত করিতে চেষ্টা পাইতেন। তাঁহাদিগের গৃহে পরিচারিকা সুখে ও সম্মানে থাকিত, সুতরাং অনেক দারিদ্র্যগ্রস্ত ভদ্রলোকের কন্যারা তাঁহাদের দাসীবৃত্তি স্বীকার করিত। এই প্রকার যাহারা ছিল, তাহাদের মধ্যে হীরা প্রধান। অনেকগুলি পরিচারিকা কায়স্থকন্যা—হীরাও কায়স্থ। নগেন্দ্রের পিতা হীরার মাতামহীকে গ্রামান্তর হইতে আনয়ন করেন। প্রথমে তাহার মাতামহীই পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইয়াছিল—হীরা তখন বালিকা, মাতামহীর সঙ্গে আসিয়াছিল। পরে হীরা সমর্থা হইলে, প্রাচীনা দাসীবৃত্তি ত্যাগ করিয়া আপন সঞ্চিত ধনে একটি সামান্য গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া গোবিন্দপুরে বাস করিল—হীরা দত্তগৃহে চাকরী করিতে প্রবৃত্ত হইল।

এক্ষণে হীরার বয়স বিংশতি বৎসর। বয়সে সে অন্যান্য দাসীগণ অপেক্ষা কনিষ্ঠা। তাহার বুদ্ধির প্রভাবে এবং চরিত্রগুণে সে দাসীমধ্যে শ্রেষ্ঠা বলিয়া গণিত হইয়াছিল।

হীরা বাল্যবিধবা বলিয়া গোবিন্দপুরে পরিচিতা। কেহ কখন তাহার স্বামীর কোন প্রসঙ্গ

শুনে নাই। কিন্তু হীরার চরিত্রেও কেহ কোন কলঙ্ক শুনে নাই। তবে হীরা অত্যন্ত মুখরা, সধবার ন্যায় বেশবিন্যাস করিত এবং বেশবিন্যাসে বিশেষ প্রীতা ছিল।

হীরা আবার সুন্দরী—উজ্জ্বল শ্যামাঙ্গী, পদ্মপলাশলোচনা। দেখিতে খর্ব্বাকৃতি; মুখখানি যেন মেঘঢাকা চাঁদ; চুলগুলি যেন সাপ ফণা ধরিয়া ঝুলিয়া রহিয়াছে। হীরা আড়ালে ব'সে গান করে, দাসীতে দাসীতে ঝগড়া বাধাইয়া তামাসা দেখে। পাচিকাকে অন্ধকারে ভয় দেখায়; ছেলেদের বিবাহের আবদার করিতে শিখাইয়া দেয়; কাহাকেও নিদ্রিত দেখিলে চুণকালি দিয়া সং সাজায়।

কিন্তু হীরার অনেক দোষ। তাহা ক্রমে জানা যাইবে। আপাততঃ বলিয়া রাখি, হীরা আতর-গোলাপ দেখিলেই চুরি করে।

সূর্য্যমুখী হীরাকে ডাকিয়া কহিলেন, "ঐ বৈষ্ণবীকে চিনিস্?"

হীরা। না। আমি কখনও পাড়ার বাহির হই না।—আমি বৈষ্ণবী ভিখারীকে কিসে চিনিব? ঠাকুরবাড়ীর মাগীদের ডেকে জিজ্ঞাসা কর না। করুণা কি শীতলা জানিতে পারে।

সূর্য্য। এ ঠাকুরবাড়ীর বৈষ্ণবী নয়। এ বৈষ্ণবী কে, তোকে জান্‌তে হবে। এ বৈষ্ণবীই বা কে, আর বাড়ীই বা কোথায়, আর কুন্দের সঙ্গে এত ভাবই বা কেন? এ সকল কথা যদি ঠিক জেনে এসে বলিতে পারিস্, তবে তোকে নূতন বারাণসী পরাইয়া সং দেখিতে পাঠাইয়া দিব।

নূতন বারাণসীর কথা শুনিয়া হীরার পাঁচ হাত বুক হইল। জিজ্ঞাসা করিল, "কখন্ জানিতে যেতে হবে?"

সূর্য্য। তোর যখন খুসি। কিন্তু এখনই ওর পাছু পাছু না গেলে, ঠিকানা পাবি না।

হীরা। আচ্ছা।

সূর্য্য। কিন্তু দেখিস্, যেন বৈষ্ণবী কিছু বুঝিতে না পারে। আর কেহ কিছু বুঝিতে না পারে।

এমন সময়ে কমল ফিরিয়া আসিল। সূর্য্যমুখী তাহাকে পরামর্শের কথা সব বলিলেন। শুনিয়া কমল খুসি হইলেন। হীরাকে বলিলেন, "আর পারিস্ ত মাগীকে দুটো বাবলার কাঁটা ফুটিয়ে দিয়ে আসিস্।"

হীরা বলিল, "সব পারিব, কিন্তু শুধু বারাণসী নিব না।"

সূর্য্য। কি নিবি?

কমল বলিল, "ও একটি বর চায়, ওর একটি বিয়ে দাও।"

সূর্য্য। আচ্ছা, তাই হবে—জামাইবাবুকে মনে ধরে? বল্, তা হ'লে কমল সম্বন্ধ করে।

হীরা। তেবে দেখ্‌বো। কিন্তু আমার মনের মত একটি বর আছে।

সূর্য্য। কে লো?

হীরা। যম।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

"না"

সেই দিন প্রদোষকালে উদ্যানমধ্যস্থ বাপীতটে বসিয়া কুন্দনন্দিনী। এই দীর্ঘিকা অতি সুবিস্তৃতা; তাহার জল অতি পরিষ্কার এবং সর্ব্বদা নীলপ্রভ। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, এই পুষ্করিণীর পশ্চাতে পুষ্পোদ্যান। পুষ্পোদ্যানমধ্যে এক শ্বেত-প্রস্তররচিত লতামণ্ডপ ছিল। সেই লতামণ্ডপের সম্মুখেই পুষ্করিণীতে অবতরণ করিবার সোপান। সোপান প্রস্তরবৎ ইষ্টকে নির্ম্মিত, অতি প্রশস্ত এবং পরিষ্কার। তাহার দুই ধারে দুইটি বহুকালের বড় বকুল-গাছ। সেই বকুলের তলায়, সোপানের উপরে কুন্দনন্দিনী, অন্ধকার প্রদোষে একাকিনী বসিয়া স্বচ্ছ সরোবরহৃদয়ে প্রতিফলিত নক্ষত্রাদি-সহিত আকাশ-প্রতিবিম্ব নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। কোথাও কতকগুলি লাল ফুল অন্ধকারে অস্পষ্ট লক্ষ্য হইতেছিল। দীর্ঘিকার অপর তিন পার্শ্বে, আম্র, কাঁটাল, জাম, লেবু, লিচু, নারিকেল, কুল, বেল প্রভৃতি ফলবান্ ফলের গাছ ঘনশ্রেণীবদ্ধ হইয়া অন্ধকারে অসমশীর্ষ প্রাচীরবৎ দৃষ্ট হইতেছিল। কদাচিৎ তাহার শাখায় বসিয়া মাচাড়পাখী বিকট রব করিয়া নিঃশব্দ সরোবরকে শব্দিত করিতেছিল। শীতল বায়ু সরোবর পার হইয়া ইন্দীবরকোরককে ঈষন্মাত্র বিধূত করিয়া, আকাশচিত্রকে স্বল্পমাত্র কম্পিত করিয়া, কুন্দনন্দিনীর শিরঃস্থ বকুলপত্র-মালায় মর্ম্মর শব্দ করিতেছিল এবং নিদাঘপ্রস্ফুটিত বকুলপুষ্প সকল নিঃশব্দে কুন্দনন্দিনীর অঙ্গে এবং চারিদিকে ঝরিয়া পড়িতেছিল। পশ্চাৎ হইতে অসংখ্য মল্লিকা, যূথিকা এবং কামিনীর সুগন্ধ

আসিতেছিল। চারিদিকে অন্ধকারে খদ্যোতমালা স্বচ্ছবারির উপর উঠিতেছিল, পড়িতেছিল, ফুটিতেছিল, নিবিতেছিল। দুই একটা বাদুড় ডাকিতেছে—দুই একটা শৃগাল, অন্য পশু তাড়াইবার তাহাদিগের যে শব্দ, সেই শব্দ করিতেছে—দুই একখানা মেঘ আকাশে পথ হারাইয়া বেড়াইতেছে—দুই একটা তারা মনের দুঃখে খসিয়া পড়িতেছে—কুন্দনন্দিনী মনের দুঃখে ভাবিতেছেন। কি ভাবনা ভাবিতেছেন? এইরূপ :—"ভাল, সবাই আগে মলো—মা মলো, দাদা মলো, বাবা মলো, আমি মলেম না কেন? যদি না মলেম ত এখানে এলাম কেন? ভাল, মানুষ কি মরিয়া নক্ষত্র হয়?" পিতার পরলোকযাত্রার রাত্রে কুন্দ যে স্বপ্ন দেখিয়াছিল, কুন্দের আর তাহা কিছুই মনে ছিল না; কখনও মনে হইত না, এখনও তাহা মনে হইল না। কেবল আভাসমাত্র মনে আসিল। এইমাত্র মনে হইল, যেন সে কবে মাতাকে স্বপ্নে দেখিয়াছিল, তাহার মা যেন তাহাকে নক্ষত্র হইতে বলিয়াছেন। কুন্দ ভাবিতে লাগিল—"ভাল, মানুষ মরিলে কি নক্ষত্র হয়? তা হ'লে ত বাবা, মা, সবাই নক্ষত্র হইয়াছেন? তবে তাঁরা কোন্ নক্ষত্রগুলি? ঐটি? না ঐটি? কোন্‌টি কে? কেমন করিয়া জানিব? তা যেটিই যিনি হউন, আমায় ত দেখতে পেতেছেন? আমি যে এত কাঁদি—তা দূর হউক, ও আর ভাবিব না—বড় কান্না পায়। কেঁদে কি হবে? আমার ত কপালে কান্নাই আছে—নহিলে মা—আবার ঐ কথা! দূর হউক—ভাল, মরিলে হয় না? কেমন করিয়া? জলে ডুবিয়া? বেশ ত! মরিলে নক্ষত্র হব—তা হ'লে হব ত? দেখিতে পাব—রোজ রোজ দেখিতে পাব—কাকে? মুখে বলিতে পারিনে কি? আচ্ছা, নাম মুখে আনিতে পারিনে কেন? এখন ত কেহ নাই, কেহ শুনিতে পাবে না। একবার মুখে আনিব? কেহ নাই—মনের সাধে নাম করি। ন—নগ—নগেন্দ্র! নগেন্দ্র, নগেন্দ্র, নগেন্দ্র, নগেন্দ্র, নগেন্দ্র! নগেন্দ্র, আমার নগেন্দ্র! আলো! আমার নগেন্দ্র? আমি কে? সূর্য্যমুখীর নগেন্দ্র। কতই নাম করিতেছি—হ'লেম কি? আচ্ছা, সূর্য্যমুখীর সঙ্গে বিয়ে না হয়ে যদি আমার সঙ্গে হতো—দূর হউক! ডুবেই মরি! আচ্ছা, যেন এখন ডুবিলাম, কা'ল ভেসে উঠ্‌বো—তবে সবাই শুন্‌বে, শুনে নগেন্দ্র—নগেন্দ্র!—নগেন্দ্র!—নগেন্দ্র! আবার বলি—নগেন্দ্র, নগেন্দ্র, নগেন্দ্র!—নগেন্দ্র শুনে কি বলিবেন? ডুবে মরা হবে না—ফুলে পড়িয়া থাকিব—দেখিতে রাক্ষসীর মত হব। যদি তিনি দেখেন? বিষ খেয়ে ত মরিতে পারি? কি বিষ খাব? বিষ কোথা পাব—কে আমায় এনে দিবে? দিলে যেন—মরিতে পারিব কি? পারি—কিন্তু আজি না—একবার আকাঙ্ক্ষা ভরিয়া মনে করি—তিনি আমায় ভালবাসেন। কমল কি কথাটা বল্‌তে বল্‌তে বলিল না? সে ঐ কথাই। আচ্ছা, সে কথা কি সত্য? কিন্তু কমল জানিবে কিসে? আমি পোড়ারমুখী জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না। ভালবাসেন? কিসে ভালবাসেন? কি দেখে ভালবাসেন, রূপ না গুণ? রূপ—দেখি? (এই কহিয়া কালামুখী স্বচ্ছ সরোবরে আপনার প্রতিবিম্ব দেখিতে গেল। কিন্তু কিছুই দেখিতে না পাইয়া আবার পূর্ব্বস্থানে আসিয়া বসিল।) দূর হউক, যা নয়, তা ভাবি কেন? আমার চেয়ে সূর্য্যমুখী সুন্দর; আমার চেয়ে হরমণি সুন্দর; বিশু সুন্দর, মুক্ত সুন্দর; চন্দ্র সুন্দর; প্রসন্ন সুন্দর; বামা সুন্দর, প্রমদা সুন্দর; আমার চেয়ে হীরা দাসীও সুন্দরী। হীরাও আমার চেয়ে সুন্দর? হাঁ, শ্যামবর্ণ হ'লে কি হয়—মুখ আমার চেয়ে সুন্দর। তা রূপ ত গোল্লায় গেল—গুণ কি? আচ্ছা, দেখি দেখি ভেবে। কই, মনে ত হয় না। কে জানে! কিন্তু মরা হবে না, ঐ কথা ভাবি। মিছে কথা! তা মিছে কথাই ভাবি। মিছে কথাকে সত্য করিয়া ভাবিব, কিন্তু কলিকাতায় যেতে হবে যে, তা ত যেতে পারব না; দেখতে পাব না যে, আমি যেতে পার্‌ব না—পার্‌ব না—পার্‌ব না। তা না গিয়াই বা কি করি? যদি কমলের কথা সত্য হয়, তবে ত যারা আমার জন্য এত করেছে তাঁদের ত সর্ব্বনাশ করিতেছি। সূর্য্যমুখীর মনে কিছু হয়েছে বুঝিতে পারি। সত্যই হউক, মিথ্যাই হউক, কাজে কাজেই আমায় যেতে হবে। তা পারিব না। তাই ডুবে মরি, মরিবই মরিব। বাবা গো! তুমি কি আমাকে ডুবিয়া মরিবার জন্য রাখিয়া গিয়াছিলে?—"

কুন্দ তখন দুই চক্ষে হাত দিয়া কাঁদিতে লাগিল। সহসা অন্ধকার গৃহে প্রদীপ জ্বালার ন্যায় কুন্দের সেই স্বপ্ন-বৃত্তান্ত সুস্পষ্ট মনে পড়িল। কুন্দ তখন বিদ্যুৎস্পৃষ্টার ন্যায় গাত্রোত্থান করিল। "আমি সকল ভুলিয়া গিয়াছি—আমি কেন ভুলিলাম! মা আমাকে দেখা দিয়াছিলেন—আমার

কপালের লিখন জানিতে পারিয়া আমায় ঐ নক্ষত্রলোকে যাইতে বলিয়াছিলেন—আমি কেন তাঁর কথা শুন্‌লেম না—আমি কেন গেলাম না! আমি কেন মলাম না! আমি এখনও বিলম্ব করিতেছি কেন? আমি এখনও মরিতেছি না কেন? আমি এখনই মরিব।” এই ভাবিয়া কুন্দ ধীরে ধীরে সেই সরোবরসোপান অবতরণ আরম্ভ করিল। কুন্দ নিতান্ত অবলা—নিতান্ত ভীরুস্বভাবাপন্না—প্রতি পদার্পণে ভয় পাইতেছিল—প্রতি পদার্পণে তাহার অঙ্গ শিহরিতেছিল। তথাপি অস্খলিত সঙ্কল্পে সে মাতার আজ্ঞাপালনার্থ ধীরে ধীরে যাইতেছিল। এমন সময়ে পশ্চাৎ হইতে কে অতি ধীরে ধীরে তাহার পৃষ্ঠে অঙ্গুলিস্পর্শ করিল। বলিল, “কুন্দ!” কুন্দ দেখিল—সে অন্ধকারে দেখিবামাত্র চিনিল—নগেন্দ্র। কুন্দের সে দিন মরা হলো না।

আর নগেন্দ্র! এই কি তোমার এত কালের সুচরিত্র? এই কি তোমার এত কালের শিক্ষা? এই কি সূর্য্যমুখীর প্রাণপণ প্রণয়ের প্রতিফল? ছি! ছি! দেখ, তুমি চোর! চোরের অপেক্ষাও হীন। চোর সূর্য্যমুখীর কি করিত? তাহার গহনা চুরি করিত, অর্থহানি করিত, কিন্তু তুমি তাহার প্রাণহানি করিতে আসিয়াছ। চোরকে সূর্য্যমুখী কখন কিছু দেয় নাই; তবু সে চুরি করিলে চোর হয়। আর সূর্য্যমুখী তোমাকে সর্ব্বস্ব দিয়াছে—তবু তুমি চোরের অধিক চুরি করিতে আসিয়াছ! নগেন্দ্র, তুমি মরিলেই ভাল হয়। যদি সাহস থাকে, তবে তুমি গিয়া ডুবিয়া মর।

আর ছি! ছি! কুন্দনন্দিনি! তুমি চোরের স্পর্শে কাঁপিলে কেন? ছি! ছি! কুন্দনন্দিনি!—চোরের কথা শুনিয়া তোমার গায়ে কাঁটা দিল কেন? কুন্দনন্দিনি! দেখ, পুষ্করিণীর জল পরিষ্কার, সুশীতল, সুবাসিত—বায়ুর হিল্লোলে তাহার নীচে তারা কাঁপিতেছে। ডুবিবে? ডুবিয়া মর না? কুন্দনন্দিনী মরিতে চাহে না।

চোর বলিল, “কুন্দ! কলিকাতায় যাইবে?”

কুন্দ কথা কহিল না—চক্ষু মুছিল—কথা কহিল না।

চোর বলিল, “কুন্দ, ইচ্ছাপূর্ব্বক যাইতেছ?”

ইচ্ছাপূর্ব্বক! হরি! হরি! কুন্দ আবার চক্ষু মুছিল—কথা কহিল না।

“কুন্দ কাঁদিতেছ কেন?” কুন্দ এবার কাঁদিয়া ফেলিল। তখন নগেন্দ্র বলিতে লাগিলেন,—“শুন কুন্দ! আমি বহু কষ্টে এত দিন সহ্য করিয়াছিলাম, কিন্তু আর পারিলাম না। কি কষ্টে যে বাঁচিয়া আছি, তাহা বলিতে পারি না। আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আপনি ক্ষতবিক্ষত হইয়াছি। ইতর হইয়াছি। মদ খাই। আর পারি না। তোমাকে ছাড়িয়া দিতে পারি না। শুন কুন্দ! এখন বিধবা-বিবাহ চলিত হইতেছে—আমি তোমাকে বিবাহ করিব। তুমি বলিলেই বিবাহ করি।”

কুন্দ এবার কথা কহিল। বলিল, “না।”

আবার নগেন্দ্র বলিলেন, “কেন কুন্দ? বিধবার বিবাহ কি অশাস্ত্র?” কুন্দ আবার বলিল, “না।”

নগেন্দ্র বলিল, “তবে ‘না’ কেন? বল—বল—বল, আমার গৃহিণী হইবে কি না? আমায় ভালবাসিবে কি না?”

কুন্দ বলিল, “না।”

তখন নগেন্দ্র যেন সহস্রমুখে অপরিমিত প্রেমপরিপূর্ণ মর্ম্মভেদী কত কথা বলিলেন। কুন্দ বলিল, “না।”

তখন নগেন্দ্র চাহিয়া দেখিলেন, পুষ্করিণী নির্ম্মল, সুশীতল—কুসুমবাস-সুবাসিত পবনহিল্লোলে তন্মধ্যে তারা কাঁপিতেছে—ভাবিলেন, “উহার মধ্যে শয়ন কেমন?”

অন্তরীক্ষে যেন কুন্দ বলিতে লাগিল, “না।” বিধবার বিবাহ শাস্ত্রে আছে, তাহার জন্য নয়। তবে কুন্দ ডুবিয়া মরিল না কেন? স্বচ্ছ বারি, শীতল জল—নীচে নক্ষত্র নাচিতেছে—কুন্দ ডুবিয়া মরিল না কেন?

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

যোগ্যং যোগ্যেন যোজয়েৎ

হরিদাসী বৈষ্ণবী উপবনগৃহে আসিয়া হঠাৎ দেবেন্দ্র বাবু হইয়া বসিল। পাশে এক দিকে আলবোলা। বিচিত্র রৌপ্যশৃঙ্খলদলমালাময়ী, কলকলকল্লোলনাদিনী, আলবোলা সুন্দরী দীর্ঘ ওষ্ঠ চুম্বনার্থ বাড়াইয়া দিলেন—মাথার উপর সোহাগের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। আর এক দিকে স্ফটিকপাত্রে হেমাঙ্গী একশাকুমারী টল-টল করিতে লাগিলেন। সম্মুখে ভোক্তার ভোজনপাত্রের নিকট উপবিষ্ট গৃহমার্জ্জারের মত এক জন চাটুকার প্রসাদাকাঙ্ক্ষায় নাক বাড়াইয়া বসিলেন। হুঁকা বলিতেছে, “দেখ! দেখ! মুখ বাড়াইয়া আছি! ছি! ছি! মুখ বাড়াইয়া আছি!” একশাকুমারী

বলিতেছে, "আগে আমায় আদর কর। দেখ, আমি কেমন রাঙ্গা! ছি! ছি! আগে আমায় খাও।" প্রসাদাকাঙ্ক্ষীর নাক বলিতেছে, "আমি যার, তাকে একটু দিও।"

দেবেন্দ্র সকলের মন রাখিলেন। আলবোলার মুখচুম্বন করিলেন, তাহার প্রেম ধুঁয়াইয়া উঠিতে লাগিল। একৃশা-নন্দিনীকে উদরস্থ করিলেন, সে ক্রমে মাথায় উঠিতে লাগিল। গৃহমার্জ্জার মহাশয়ের নাককে পরিতুষ্ট করিলেন—নাক দুই চারি গেলাসের পর ডাকিতে আরম্ভ করিল। ভৃত্যেরা নাসিকাধিকারীকে "গুরুমহাশয় গুরুমহাশয়" করিয়া স্থানান্তরে রাখিয়া আসিল।

তখন সুরেন্দ্র আসিয়া দেবেন্দ্রের কাছে বসিলেন, এবং তাঁহার শারীরিক কুশলাদি জিজ্ঞাসার পর বলিলেন, "আবার আজ তুমি কোথায় গিয়াছিলে?"

দে। ইহারই মধ্যে তোমার কাণে গিয়াছে!

সু। এই তোমার আর একটি ভ্রম। তুমি মনে কর, সব তুমি লুকিয়ে কর—কেহ জানিতে পারে না, কিন্তু পাড়ায় পাড়ায় ঢাক বাজে।

দে। দোহাই ধর্ম্ম! আমি কাহাকেও লুকাইতে চাহি না—কোন্ শালাকে লুকাইব?

সু। সেও একটা বাহাদুরী মনে করিও না। তোমার যদি একটু লজ্জা থাকিত, তাহা হইলে আমাদেরও একটু ভরসা থাকিত। লজ্জা থাকিলে আর তুমি বৈষ্ণবী সেজে গ্রামে গ্রামে ঢলাতে যাও?

দে। কিন্তু কেমন রসের বৈষ্ণবী দাদা? রসকলি দেখে ঘুরে পড়নি ত?

সু। আমি সে পোড়ারমুখ দেখি নাই, দেখিলে দুই চাবুকে বৈষ্ণবীর বৈষ্ণবী-যাত্রা ঘুচিয়ে দিতাম।

পরে দেবেন্দ্রের হস্ত হইতে মদ্যপাত্র কাড়িয়া লইয়া সুরেন্দ্র বলিতে লাগিলেন, "এখন একটু বন্ধ করিয়া, জ্ঞান থাকিতে থাকিতে, দুটো কথা শুন, তার পর গিলো।"

দে। বল, দাদা! আজ যে বড় চটাচটা দেখি—হৈমবতার বাতাস গায়ে লেগেছে না কি?

সুরেন্দ্র দুর্ম্মুখের কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিলেন,—"বৈষ্ণবী সেজেছিলে কার সর্ব্বনাশ করবার জন্য?"

দে। তা কি জান না? মনে নাই, তারা মাষ্টারের বিয়ে হয়েছিল এক দেবকন্যার সঙ্গে? সেই দেবকন্যা এখন বিধবা হয়ে ও-গাঁয়ের দত্তবাড়ী রেঁধে খায়। তাই তাকে দেখতে গিয়েছিলাম।

সু। কেন, এত দুর্বৃত্তিতেও তৃপ্তি জন্মিল না যে, সে অনাথা বালিকাকে অধঃপাতে দিতে হবে! দেখ দেবেন্দ্র, তুমি এত বড় পাপিষ্ঠ, এত বড় নৃশংস, এমন অত্যাচারী যে, বোধ হয়, আর আমরা তোমার সহবাস করিতে পারি না।

সুরেন্দ্র এরূপ দার্ঢ্যসহকারে এই কথা বলিলেন যে, দেবেন্দ্র নিস্তব্ধ হইলেন। পরে দেবেন্দ্র গাম্ভীর্য্য সহকারে কহিলেন—"তুমি আমার উপর রাগ করিও না। আমার চিত্ত আমার বশ নহে। আমি সকল ত্যাগ করিতে পারি, এই স্ত্রীলোকের আশা ত্যাগ করিতে পারি না। যে দিন প্রথম তাহাকে তারাচরণের গৃহে দেখিয়াছি, সেই দিন অবধি আমি তাহার সৌন্দর্য্যে অভিভূত হইয়া আছি। আমার চক্ষে এত সৌন্দর্য্য আর কোথাও নাই। জ্বরে যেমন তৃষ্ণা রোগীকে দগ্ধ করে, সেই অবধি উহার জন্য লালসা আমাকে সেইরূপ দগ্ধ করিতেছে। সেই অবধি আমি উহাকে দেখিবার জন্য কত কৌশল করিতেছি, তাহা বলিতে পারি না। এ পর্য্যন্ত পারি নাই—শেষে এই বৈষ্ণবী-সজ্জা ধরিয়াছি। তোমার কোন আশঙ্কা নাই—সে স্ত্রীলোক অত্যন্ত সাধ্বী।"

সু। তবে যাও কেন?

দে। কেবল তাহাকে দেখিবার জন্য। তাহাকে দেখিয়া, তাহার সঙ্গে কথা কহিয়া, তাহাকে গান শুনাইয়া আমার যে কি পর্য্যন্ত তৃপ্তি হয়, তাহা বলিতে পারি না।

সু। তোমাকে আমি সত্য বলিতেছি—উপহাস করিতেছি না। তুমি যদি এই দুষ্প্রবৃত্তি ত্যাগ না করিবে—তুমি যদি সে পথে আর যাইবে—তবে আমার সঙ্গে তোমার আলাপ এই পর্য্যন্ত বন্ধ। আমিও তোমার শত্রু হইব।

দে। তুমি আমার একমাত্র সুহৃদ্। আমি অর্দ্ধেক বিষয় ছাড়িতে পারি, তবু তোমাকে ছাড়িতে পারিব না। কিন্তু তোমাকে যদি ছাড়িতে হয়, সেও স্বীকার, তবু আমি কুন্দনন্দিনীকে দেখিবার আশা ছাড়িতে পারিব না।

সু। তবে তাহাই হউক। তোমার সঙ্গে আমার এই পর্য্যন্ত সাক্ষাৎ।

এই বলিয়া সুরেন্দ্র দুঃখিতচিত্তে উঠিয়া গেলেন। দেবেন্দ্র একমাত্র বন্ধুবিচ্ছেদে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া কিয়ৎকাল বিমর্ষভাবে রহিলেন। শেষ, ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন, "দূর হউক। এ সংসারে কে কার! আমিই আমার" এই বলিয়া পাত্র

পূর্ণ করিয়া ব্র্যাণ্ডি পান করিলেন। তাহার বশে আশু চিত্ত-প্রফুল্লতা জন্মিল। তখন দেবেন্দ্র শুইয়া পড়িয়া চক্ষু মুদিয়া গান ধরিলেন—

"আমার নাম হীরা মালিনী।
আমি থাকি রাধার কুঞ্জে, কুব্জা আমার ননদিনী।
রাবণ বলে চন্দ্রাবলী
তুমি আমার কমলকলি,
শুনে কীচক মেরে কৃষ্ণ,
উদ্ধারিল যাজ্ঞসেনী!"

তখন পারিষদেরা সকলে উঠিয়া গিয়াছিল; দেবেন্দ্র নৌকাশূন্য-নদীবক্ষঃস্থিত ভেলার ন্যায় একা বসিয়া রসের তরঙ্গে হাবুডুবু খাইতেছিলেন। রোগরূপ তিমি-মকরাদি এখন জলের ভিতর লুকাইয়াছিল—এখন কেবল মন্দ পবন আর চাঁদের আলো। এমন সময়ে জানালার দিকে কি একটা খড়-খড় শব্দ হইল—কে যেন খড়খড়ি তুলিয়া দেখিতেছিল—হঠাৎ ফেলিয়া দিল। দেবেন্দ্র বোধ হয় মনে মনে কাহারও প্রতীক্ষা করিতেছিলেন—বলিলেন, "কে খড়খড়ি চুরি করে?" কোন উত্তর না পাইয়া জানালা দিয়া দেখিলেন—দেখিতে পাইলেন, এক জন স্ত্রীলোক পলায়। স্ত্রীলোক পলায় দেখিয়া দেবেন্দ্র জানালা খুলিয়া লাফাইয়া পড়িয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ টলিতে টলিতে ছুটিলেন।

স্ত্রীলোক অনায়াসে পলাইলে পলাইতে পারিত, কিন্তু ইচ্ছাপূর্ব্বক পলাইল না, কি অন্ধকারে ফুলবাগানের মাঝে পথ হারাইল, তাহা বলা যায় না। দেবেন্দ্র তাহাকে ধরিয়া অন্ধকারে তাহার মুখপানে চাহিয়া চিনিতে পারিলেন না। চুপি চুপি মদের ঝোঁকে বলিলেন, "বাবা! কোন্ গাছ থেকে?" পরে তাহাকে ঘরের ভিতর টানিয়া আনিয়া একবার একদিকে, আবার আর এক দিকে আলো ধরিয়া দেখিয়া, সেইরূপ স্বরে বলিলেন, "তুমি কাদের পেত্নী গা?" শেষে কিছু স্থির করিতে না পারিয়া বলিলেন, "পারলেম না বাপ! আজ ফিরে যাও, অমাবস্যায় লুচি-পাঁঠা দিয়ে পূজা দেব—আজ একটু কেবল ব্র্যাণ্ডি খেয়ে যাও।" এই বলিয়া মত্তপ স্ত্রীলোকটিকে বৈঠকখানায় বসাইয়া, মদের গেলাস তাহার হাতে দিল।

স্ত্রীলোকটা তাহা গ্রহণ না করিয়া নামাইয়া রাখিল।

তখন মাতাল আলোটা স্ত্রীলোকের মুখের কাছে লইয়া গেল। এদিক ওদিক চারিদিক আলোটা ফিরাইয়া ফিরাইয়া গম্ভীরভাবে তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া শেষে হঠাৎ আলোটা ফেলিয়া দিয়া গান ধরিল,—"তুমি কে বট হে, তোমায় চেন চেন করি—কোথাও দেখেছি হে।"

তখন সে স্ত্রীলোক ধরা পড়িয়াছে ভাবিয়া বলিল, "আমি হীরা।"

"Hurrah! Three Cheers for হীরা!" বলিয়া মাতাল লাফাইয়া উঠিল। তখন আবার ভূমিষ্ঠ হইয়া হীরাকে প্রণাম করিয়া গ্লাস হস্তে স্তব করিতে আরম্ভ করিল—

"নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।
যা দেবী বটবৃক্ষেষু ছায়ারূপেণ সংস্থিতা॥
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।
যা দেবী দত্তগৃহেষু হীরারূপেণ সংস্থিতা॥
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।
যা দেবী পুকুরঘাটেষু চুপড়িহস্তেন সংস্থিতা॥
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।
যা দেবী ঘরদ্বারেষু ঝাঁটাহস্তেন সংস্থিতা॥
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।
যা দেবী মম গৃহেষু পেত্নীরূপেণ সংস্থিতা॥
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥

তারপর মালিনী মাসী!—কি মনে করে?"

হীরা ইতিপূর্ব্বে বৈষ্ণবীর সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া দিনমানে জানিয়া গিয়াছিল যে, হরিদাসী বৈষ্ণবী ও দেবেন্দ্র বাবু একই ব্যক্তি। কিন্তু কেন দেবেন্দ্র বৈষ্ণবী-বেশে দত্তগৃহে যাতায়াত করিতেছে, এ কথা জানা সহজ নহে। হীরা মনে মনে অত্যন্ত দুঃসাহসিক সঙ্কল্প করিয়া এই সময়ে স্বয়ং দেবেন্দ্রের গৃহে আসিল। সে গোপনে উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিয়া জানালার কাছে দাঁড়াইয়া, দেবেন্দ্রের কথাবার্ত্তা শুনিয়াছিল। সুরেন্দ্রের সঙ্গে দেবেন্দ্রের কথোপকথন অন্তরাল হইতে শুনিয়া হীরা সিদ্ধমনস্কাম হইয়া ফিরিয়া যাইতেছিল, যাইবার সময় অসাবধানে খড়খড়ি ফেলিয়া দিয়াছিল—ইহাতেই গোল বাধিল।

এখন হীরা পলাইবার জন্য ব্যস্ত। দেবেন্দ্র তাহার হাতে আবার মদের গেলাস দিল। হীরা বলিল, "আপনি খান।" বলিবামাত্র দেবেন্দ্র তাহা গলাধঃকরণ করিলেন। সেই গেলাস দেবেন্দ্রের পূর্ণ মাত্রা হইল—দুই একবার ঢুলিয়া—দেবেন্দ্র শুইয়া পড়িলেন। হীরা তখন উঠিয়া পলাইল। দেবেন্দ্র তখন ঝিমঝিনি মারিয়া গাইতে লাগিল;—

"বয়স তাহার বছর ষোল,
দেখতে শুন্‌তে কালো কোলো,
পিলে অগ্রমাসে মলো ;
আমি তখন খানায় পোড়ে।"

সে রাত্রে হীরা আর দত্তবাড়ীতে গেল না। আপন গৃহে গিয়া শয়ন করিয়া রহিল। পরদিন প্রাতে গিয়া সূর্য্যমুখীর নিকট দেবেন্দ্রের সংবাদ বলিল। দেবেন্দ্র কুন্দের জন্য বৈষ্ণবী সাজিয়া যাতায়াত করে। কুন্দ যে নির্দ্দোষী, তাহা হীরাও বলিল না ; সূর্য্যমুখীও বুঝিলেন না। হীরা কেন সে কথা লুকাইল—পাঠক তাহা ক্রমে বুঝিতে পারিবেন। সূর্য্যমুখী দেখিয়াছিলেন, কুন্দ বৈষ্ণবীর সঙ্গে চুপি চুপি কথা কহিতেছে—সুতরাং সূর্য্যমুখী তাহাকে দোষী মনে করিলেন। হীরার কথা শুনিয়া সূর্য্যমুখীর নীলোৎপললোচন রাঙ্গা হইয়া উঠিল, তাঁহার কপালে শিরা স্থূলতাপ্রাপ্ত হইয়া প্রকটিত হইল। কমলও সকল শুনিলেন। কুন্দকে সূর্য্যমুখী ডাকাইলেন। সে আসিলে পর বলিলেন ;—

"কুন্দ! হরিদাসী বৈষ্ণবী কে, আমরা চিনিয়াছি। আমরা জানিয়াছি যে, সে তোর কে! তুই যা, তা জানিলাম। আমরা এমন স্ত্রীলোককে বাড়ীতে স্থান দিই না। তুই বাড়ী হইতে এখনি দূর হ। নহিলে হীরা তোকে ঝাঁটা মারিয়া তাড়াইবে।"

কুন্দের গা কাঁপিতে লাগিল। কমল দেখিলেন যে, সে পড়িয়া যায়। কমল তাহাকে ধরিয়া শয়নগৃহে লইয়া গেলেন। শয়নগৃহে থাকিয়া আদর করিয়া সান্ত্বনা করিলেন এবং বলিলেন, "ও মাগী যাহা বলে বলুক, আমি উহার একটি কথাও বিশ্বাস করি না।"

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

অনাথিনী

গভীর রাত্রে গৃহস্থ সকলে নিদ্রিত হইলে কুন্দনন্দিনী শয়নাগারের দ্বার খুলিয়া বাহির হইল। এক বসনে সূর্য্যমুখীর গৃহ ত্যাগ করিয়া গেল। সেই গভীর রাত্রে একবসনে সপ্তদশবর্ষীয়া অনাথিনী সংসারসমুদ্রে একাকিনী ঝাঁপ দিল।

রাত্রি অত্যন্ত অন্ধকার। অল্প অল্প মেঘ করিয়াছে। কোথায় পথ? কে বলিয়া দিবে, কোথায় পথ? কুন্দনন্দিনী কখন দত্তদিগের বাটীর বাহির হয় নাই—কোন্ দিকে কোথায় যাইবার পথ, তাহা জানে না। আর কোথায়ই বা যাইবে?

অট্টালিকার বৃহৎ অন্ধকারময় কায়া, আকাশের গায়ে লাগিয়া রহিয়াছে—সেই অন্ধকার বেষ্টন করিয়া কুন্দনন্দিনী বেড়াইতে লাগিল। মানস, একবার নগেন্দ্রনাথের শয়নকক্ষে বাতায়নপথের আলো দেখিয়া যায়। একবার সেই আলো দেখিয়া চক্ষু জুড়াইয়া যাইবে।

তাঁহার শয়নাগার চিনিত—ফিরিতে ফিরিতে তাহা দেখিতে পাইল—বাতায়নপথে আলো দেখা যাইতেছে। কবাট খোলা—সার্সী বন্ধ—অন্ধকারমধ্যে তিনটি জানেলা জ্বলিতেছে। তাহার উপর পতঙ্গজাতি উড়িয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে। আলো দেখিয়া উড়িয়া পড়িতেছে, কিন্তু রুদ্ধপথে প্রবেশ করিতে না পারিয়া কাচে ঠেকিয়া ফিরিয়া যাইতেছে। কুন্দনন্দিনী এই ক্ষুদ্র পতঙ্গদিগের জন্য হৃদয়মধ্যে পীড়িতা হইল।

কুন্দনন্দিনী মুগ্ধলোচনে সেই গবাক্ষপথ-প্রেরিত আলোক দেখিতে লাগিল—সে আলো ছাড়িয়া যাইতে পারিল না। শয়নাগারের সম্মুখে কতকগুলি ঝাউগাছ ছিল—কুন্দনন্দিনী তাহার তলায় গবাক্ষ প্রতি সম্মুখ করিয়া বসিল। রাত্রি অন্ধকার, চারিদিক্ অন্ধকার। গাছে গাছে খদ্যোতের চাকচিক্য সহস্রে সহস্রে ফুটিতেছে, মুদিতেছে; মুদিতেছে ফুটিতেছে। আকাশে কালো মেঘের পশ্চাৎ কালো মেঘ ছুটিতেছে—তাহার পশ্চাৎ আরও কালো মেঘ ছুটিতেছে—তৎপশ্চাৎ আরও কালো। আকাশে দুই একটি নক্ষত্রমাত্র কখনও মেঘে ডুবিতেছে, কখনও ভাসিতেছে। বাড়ীর চারিদিকে ঝাউগাছের শ্রেণী, সেই মেঘময় আকাশে মাথা তুলিয়া নিশাচর পিশাচের মত দাঁড়াইয়া আছে। বায়ুর স্পর্শে সেই করালবদনা নিশীথিনী-অঙ্কে থাকিয়া তাহারা আপন আপন পৈশাচী ভাষায় কুন্দনন্দিনীর মাথার উপর কথা কহিতেছে; পিশাচেরাও করাল রাত্রির ভয়ে, অল্প শব্দে কথা কহিতেছে। কদাচিৎ বায়ুসঞ্চালনে গবাক্ষের মুক্ত কবাট প্রাচীরে বারেকমাত্র আঘাত করিয়া শব্দ করিতেছে। কালপেঁচা সৌধোপরি বসিয়া ডাকিতেছে। কদাচিৎ একটা কুকুর অন্য পশু দেখিয়া সম্মুখ দিয়া অতি দ্রুতবেগে ছুটিতেছে। কদাচিৎ ঝাউয়ের পল্লব অথবা ফল খসিয়া পড়ি-

তেছে। দূরে নারিকেল-বৃক্ষের অন্ধকার শিরোভাগ অন্ধকারে মন্দ মন্দ হেলিতেছে; দূর হইতে তাল বৃক্ষের পত্রের তর তর মর্ম্মর-শব্দ কর্ণে আসিতেছে; সর্ব্বোপরি সেই বাতায়নশ্রেণীর উজ্জ্বল আলো জ্বলিতেছে—আর পতঙ্গদল ফিরিয়া ফিরিয়া আসিতেছে। কুন্দনন্দিনী সেই দিকে চাহিয়া রহিল।

ধীরে ধীরে একটি গবাক্ষের সার্সী খুলিল। এক মনুষ্যমূর্ত্তি আলোকপটে চিত্রিত হইল। হরি! হরি! সে নগেন্দ্রের মূর্ত্তি। নগেন্দ্র—নগেন্দ্র! যদি ঐ ঝাউতলার অন্ধকারের মধ্যে ক্ষুদ্র কুন্দ কুসুমটি দেখিতে পাইতে। যদি তোমাকে গবাক্ষ-পথে দেখিয়া তাহার হৃদয়াঘাতের শব্দ—দুপ্! দুপ্! শব্দ—যদি সে শব্দ শুনিতে পাইতে। যদি জানিতে পারিতে যে, তুমি আবার এখনই সরিয়া অদৃশ্য হইবে, এই ভয়ে তাহার দেখার সুখ হইতেছে না। নগেন্দ্র! দীপের দিকে পশ্চাৎ করিয়া দাঁড়াইয়াছ—একবার দীপ সম্মুখে করিয়া দাঁড়াও! তুমি দাঁড়াও, সরিও না—কুন্দ বড় দুঃখিনী। দাঁড়াও—তাহা হইলে, সেই পুষ্করিণীর স্বচ্ছ শীতল বারি—তাহার তলে নক্ষত্রচ্ছায়া—তাহার আর মনে পড়িবে না।

ঐ শুন! কালপেঁচা ডাকিল। তুমি সরিয়া যাইবে, আর কুন্দনন্দিনীর ভয় করিবে। দেখিলে বিদ্যুৎ! তুমি সরিও না, কুন্দনন্দিনীর ভয় করিবে! ঐ দেখ, আবার কালো মেঘ পবনে চাপিয়া যে যুদ্ধে ছুটিতেছে। ঝড়-বৃষ্টি হইবে। কুন্দকে কে আশ্রয় দিবে?

দেখ, তুমি গবাক্ষ মুক্ত করিয়াছ, ঝাঁকে ঝাঁকে পতঙ্গ আসিয়া তোমার শয্যাগৃহে প্রবেশ করিতেছে। কুন্দ মনে করিতেছে, কি পুণ্য করিলে পতঙ্গজন্ম হয়। কুন্দ! পতঙ্গ যে পুড়িয়া মরে। কুন্দ তাই চায়। মনে করিতেছে, "আমি পুড়িলাম—মরিলাম না কেন?"

নগেন্দ্র সার্সী বন্ধ করিয়া সরিয়া গেলেন। নির্দ্দয়! ইহাতে কি ক্ষতি? না, তোমার রাত্রি জাগিয়া কাজ নাই—নিদ্রা যাও—শরীর অসুস্থ হইবে। কুন্দনন্দিনী মরে মরুক। তোমার মাথা না ধরে, কুন্দনন্দিনীর কামনা এই।

এখন আলোকময় গবাক্ষ যেন অন্ধকার হইল। চাহিয়া, চাহিয়া, চাহিয়া, চক্ষের জল মুছিয়া, কুন্দনন্দিনী উঠিল। সম্মুখে যে পথ পাইল—সেই পথে চলিল। কোথায় চলিল? নিশাচর পিশাচ ঝাউগাছেরা সর্ সর্ শব্দ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কোথায় যাও?" তালগাছেরা তর্ তর্ শব্দ করিয়া বলিল, "কোথায় যাও?" পেচক গম্ভীর নাদে বলিল, "কোথায় যাও?" উজ্জ্বল গবাক্ষ-শ্রেণী বলিতে লাগিল, "যায় যাউক—আমরা আর নগেন্দ্র দেখাইব না।" তবু কুন্দনন্দিনী—নির্ব্বোধ কুন্দনন্দিনী—ফিরিয়া ফিরিয়া সেই দিকে চাহিতে লাগিল।

কুন্দ চলিল, চলিল—কেবল চলিল। আকাশে আরও মেঘ ছুটিতে লাগিল—মেঘসকল একত্র হইয়া আকাশেও রাত্রি করিল—বিদ্যুৎ হাসিল—আবার হাসিল—আবার! বায়ু গর্জ্জিল, মেঘ গর্জ্জিল; বায়ুতে মেঘেতে একত্র হইয়া গর্জ্জিল। আকাশ আর রাত্রি একত্র হইয়া গর্জ্জিল। কুন্দ! কোথায় যাইবে?

ঝড় উঠিল। প্রথমে শব্দ, পরে ধূলি উঠিল, পরে গাছের পাতা ছিঁড়িয়া লইয়া বায়ু স্বয়ং আসিল। শেষে পিট্ পিট্!—পট্ পট্!—হু হু! বৃষ্টি আসিল। কুন্দ কোথায় যাইবে?

বিদ্যুতের আলোকে পথিপার্শ্বে কুন্দ একটা সামান্য গৃহ দেখিল। গৃহের চতুষ্পার্শ্বে মৃৎপ্রাচীর; মৃৎপ্রাচীরের ছোট চাল; কুন্দনন্দিনী আসিয়া তাহার আশ্রয়ে দ্বারের নিকটে বসিল; দ্বারে পিঠ রাখিয়া বসিল। দ্বার পিঠের স্পর্শে শব্দিত হইল। গৃহস্থ সজাগ, দ্বারের শব্দ তাহার কাণে গেল। গৃহস্থ মনে করিল, ঝড়; কিন্তু তাহার দ্বারে একটা কুক্কুর শয়ন করিয়া থাকে—সেটা উঠিয়া ডাকিতে লাগিল। গৃহস্থ তখন ভয় পাইল। আশঙ্কায় দ্বার খুলিয়া দেখিতে আইল। দেখিল, আশ্রয়হীনা স্ত্রীলোক মাত্র। জিজ্ঞাসা করিল, "কে গা তুমি?"

কুন্দ কথা কহিল না।

"কে রে মাগী?"

কুন্দ বলিল, "বৃষ্টির জন্য দাঁড়াইয়াছি।"

গৃহস্থ ব্যগ্রভাবে বলিল, "কি? কি? কি? আবার বল ত?"

কুন্দ বলিল, "বৃষ্টির জন্য দাঁড়াইয়াছি।"

গৃহস্থ বলিল, "ও গলা যে চিনি। বটে? ঘরের ভিতর এস ত।"

গৃহস্থ কুন্দকে ঘরের ভিতর লইয়া গেল। আগুন করিয়া আলো জ্বালিল। কুন্দ তখন দেখিল,—হীরা।

হীরা বলিল, "বুঝিয়াছি, তিরস্কারে পলাইয়াছ। ভয় নাই। আমি কাহারও সাক্ষাতে বলিব না। আমার এইখানে দুই দিন থাক।"

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

হীরার রাগ

হীরার বাড়ী প্রাচীর আঁটা। দুইটি ঝর্‌ঝরে মেটে ঘর। তাহাতে আল্‌পনা—পদ্ম আঁকা—পাখী আঁকা—ঠাকুর আঁকা। উঠান নিকান—এক পাশে রাঙ্গা শাক, তার কাছে দোপাটি, মল্লিকা, গোলাপফুল। বাবুর বাড়ীর মালী আপনি আসিয়া চারা আনিয়া ফুলগাছ পুতিয়া দিয়া গিয়াছিল—হীরা চাহিলে, চাই কি বাগান শুদ্ধই উহার বাড়ী তুলিয়া দিয়া যায়। মালীর লাভের মধ্যে এই, হীরা আপন হাতে তামাকু সাজিয়া দেয়। হীরা কালো-চুড়ি-পরা হাতখানিতে হুকা ধরিয়া মালীর হাতে দেয়; মালী বাড়ী গিয়া রাত্রে তাই ভাবে।

হীরার বাড়ী হীরার আয়ী থাকে, আর হীরা। এক ঘরে আয়ী, এক ঘরে হীরা শোয়। হীরা কুন্দকে আপনার কাছে বিছানা করিয়া রাত্রে শুয়াইল। কুন্দ শুইল—ঘুমাইল না। পর দিন তাহাকে সেইখানে রাখিল। বলিল, "আজি কালি দুই দিন থাক; দেখ, রাগ না পড়ে, পরে যেখানে ইচ্ছা, সেইখানে যাইও।" কুন্দ রহিল। কুন্দের ইচ্ছানুসারে তাহাকে লুকাইয়া রাখিল। ঘরে চাবি দিল, আয়ী না দেখে। পরে বাবুর বাড়ীতে কাজে গেল। দুই প্রহর বেলায় আয়ী স্নানে যায়, হীরা তখন আসিয়া কুন্দকে স্নানাহার করাইল। আবার চাবি দিয়া চলিয়া গেল। রাত্রে আসিয়া চাবী খুলিয়া উভয়ে শয্যা রচনা করিল।

"টিট্—কিট্—খিট্—খিটি—খাট্" বাহির দুয়ারের শিকল সাবধানে নাড়িল। হীরা বিস্মিত হইল। একজন মাত্র কখনও কখনও রাত্রে শিকল নাড়ে। সে বাবুর বাড়ীর দ্বারবান্, রাত-ভিত ডাকিতে আসিয়া শিকল নাড়ে। কিন্তু তাহার হাতে শিকল অমন মধুর বলে না, তাহার হাত শিকল নাড়িলে বলে, "কট্ কট্! কটাঃ তোর মথামুণ্ড উঠা! কড়্‌ কড়্ কড়াং! খিল-খোল নয় ভাঙ্গি ঠ্যাং।" ভাত শিকল বলিল না। এ শিকল বলিতেছে, "কিট্ কিট্ কিটি! দেখি কেমন আমার হীরেটি! খিট্ খাট ছন্! উঠ্‌লো আমার হীরামন্! ঠিট্ ঠিট্ ঠিঠি ঠিনিক্—আয় আয় আমার হীরামাণিক।" হীরা উঠিয়া দেখিতে গেল; বাহির-দুয়ার খুলিয়া দেখিল, স্ত্রীলোক। প্রথমে চিনিতে পারিল না, পরেই চিনিল—"কে ও গঙ্গাজল! এ কি ভাগ্য!" হীরার গঙ্গাজল মালতী গোয়ালিনী। মালতী গোয়ালিনীর বাড়ী দেবীপুর—দেবেন্দ্র বাবুর বাড়ীর কাছে—বড় রসিকা স্ত্রীলোক। বয়স বৎসর ত্রিশ বত্রিশ, শাড়ী পরা, হাতে রুলি, মুখে পানের রাগ। মালতী গোয়ালিনী প্রায় গৌরাঙ্গী—একটু রৌদ্র-পোড়া-মুখে রাঙ্গা রাঙ্গা দাগ, নাক খাঁদা—কপালে উল্কি। কসে তামাকুপোড়া টেপা আছে। মালতী গোয়ালিনী দেবেন্দ্র বাবুর দাসী নহে—আশ্রিতাও নহে—অথচ তাঁহার বড় অনুগত—অনেক ফরমায়েস—যাহা অন্যের অসাধ্য তাহা মালতী সিদ্ধ করে, মালতীকে দেখিয়া চতুরা হীরা বলিল, "ভাই গঙ্গাজল! অন্তিমকালে যেন তোমায় পাই, কিন্তু এখন কেন?"

গঙ্গাজল চুপি চুপি বলিল, "তোকে দেবেন্দ্র বাবু ডেকেছে।" হীরা কাদা মাখে, হাসিয়া বলিল, "তুই কিছু পাবি না কি?"

মালতী দুই অঙ্গুলের দ্বারা হীরাকে মারিল; বলিল, "মরণ আর কি! তোর মনের মত কথা তুই জানিস্। এখন চ।"

হীরা ইহাই চায়। কুন্দকে বলিল, "আমায় বাবুর বাড়ী যেতে হলো—ডাকিতে এসেছে। কে জানে কেন?" বলিয়া প্রদীপ নিবাইল এবং অন্ধকারে কৌশলে বেশভূষা করিয়া মালতীর সঙ্গে যাত্রা করিল। দুই জনে অন্ধকারে গলা মিলাইয়া—

"মনের মতন রতন পেলে যতন করি তায়।
সাগর ছেঁচে তুলব নাগর পতন ক'রে কায়॥"

ইতি গীত গায়িতে গায়িতে চলিল।

দেবেন্দ্রের বৈঠকখানায় হীরা একা গেল। দেবেন্দ্র দেবীর আরাধনা করিতেছিলেন, কিন্তু আজি সরু কাটিতেছিলেন। জ্ঞান টন্‌টনে। হীরার সঙ্গে আজ অন্যপ্রকার সম্ভাষণ করিলেন, স্তবস্তুতি কিছুই নাই। বলিলেন, "হীরে, সে দিন আমি অধিক মদ খাইয়া তোমায় কথার মর্ম্ম কিছুই গ্রহণ করিতে পারি নাই। কেন আসিয়াছিলে, সেই কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য ডাকিয়া পাঠাইয়াছি।"

হী। কেবল আপনাকে দর্শন করিতে আসিয়া-ছিলাম।

দেবেন্দ্র হাসিলেন। বলিলেন, "তুমি বড় বুদ্ধিমতী। ভাগ্যক্রমে নগেন্দ্র বাবু তোমার মত দাসী পাইয়াছেন। বুঝিলাম, হরিদাসী বৈষ্ণবীর তত্ত্বে আসিয়াছিলে। আমার মনের কথা জানিতে আসিয়াছিলে। কেন আমি বৈষ্ণবী সাজি, কেন দত্তবাড়ী যাই, এই কথা জানিতে আসিয়াছিলে। তাহা এক প্রকার জানিয়াও গিয়াছ। আমিও তোমার কাছে সে কথা লুকাইব না। তুমি প্রভুর কাজ করিয়া প্রভুর কাছে পুরস্কার পাইয়াছ, সন্দেহ নাই। এখন আমার একটি কাজ কর, আমিও পুরস্কার করিব।"

মহাপাপে নিমগ্ন যাহাদিগের চরিত্র, তাহা-দিগের সকল কথা স্পষ্ট করিয়া লেখা বড় কষ্টকর। দেবেন্দ্র হীরাকে বহু অর্থের লোভ প্রদর্শন করিয়া কুন্দকে বিক্রয় করিতে বলিলেন। শুনিয়া ক্রোধে হীরার পদ্মপলাশ-চক্ষু রক্তময় হইল—কর্ণরন্ধ্রে অগ্নি-বৃষ্টি হইল। হীরা গাত্রোত্থান করিয়া কহিল, "মহাশয়! আমি দাসী বলিয়া এরূপ কথা বলিলেন। ইহার উত্তর আমি দিতে পারিব না। আমার মুনিবকে বলিব। তিনি ইহার উপযুক্ত উত্তর দিবেন।"

এই বলিয়া হীরা বেগে প্রস্থান করিল। দেবেন্দ্র ক্ষণেককাল অপ্রতিভ এবং ভগ্নোৎসাহ হইয়া নীরব হইয়াছিলেন। পরে প্রাণ ভরিয়া দুই গ্লাস ব্রাণ্ডি পান করিলেন। তখন প্রকৃতিস্থ হইয়া মৃদু মৃদু গায়িলেন,—

"এসেছিস বক্‌না গরু
পর-গোয়ালে জাব্‌না খেতে"—

বিংশ পরিচ্ছেদ

হীরার দ্বেষ

প্রাতে উঠিয়া হীরা কাজে গেল। দত্তদের বাড়ীতে দুই দিন পর্য্যন্ত বড় গোল, কুন্দকে পাওয়া যায় না। বাড়ীর সকলেই জানিল যে, সে রাগ করিয়া গিয়াছে, পাড়াপ্রতিবাসীরা কেহ জানিল, কেহ জানিল না। নগেন্দ্র শুনিলেন যে, কুন্দ গৃহ ত্যাগ করিয়া গিয়াছে—কেন গিয়াছে, কেহ তাহা শুনাইল না। নগেন্দ্র ভাবিলেন, আমি যাহা বলিয়াছিলাম, তাহা শুনিয়া কুন্দ আমার গৃহে আর থাকা অনুচিত বলিয়া চলিয়া গিয়াছে। যদি তাই, তবে কমলের সঙ্গে গেল না কেন? নগেন্দ্রের মুখ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া রহিল। কেহ তাঁহার নিকটে আসিতে সাহস করিল না। সূর্য্যমুখীর কি দোষ, তাহা কিছু জানিলেন না, কিন্তু সূর্য্যমুখীর সঙ্গে আলাপ বন্ধ করিলেন। গ্রামে গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় কুন্দনন্দিনীর সন্ধানার্থ স্ত্রীলোক চর পাঠাইলেন।

সূর্য্যমুখী রাগে বা ঈর্ষার বশীভূত হইয়া যাহাই বলুন, কুন্দের পলায়ন শুনিয়া অতিশয় কাতর হইলেন, বিশেষ কমলমণি বুঝাইয়া দিলেন যে, দেবেন্দ্র যাহা বলিয়াছিল, তাহা কদাচ বিশ্বাসযোগ্য নহে। কেন না, দেবেন্দ্রের সহিত গুপ্তপ্রণয় থাকিলে, কখন অপ্রচার থাকিত না। আর কুন্দের যেরূপ স্বভাব, তাহাতে কদাচ ইহা সম্ভব বোধ হয় না। দেবেন্দ্র মাতাল, মদের মুখে মিথ্যা বড়াই করিয়াছে। সূর্য্যমুখী এ সকল কথা বুঝিলেন, এ জন্য অনুতাপ কিছু গুরুতর হইল। তাহাতে আবার স্বামীর বিরাগে আরও মর্ম্মব্যথা পাইলেন। শতবার কুন্দকে গালি দিতে লাগিলেন। সহস্রবার আপ-নাকে গালি দিলেন। তিনিও কুন্দের সন্ধানে লোক পাঠাইলেন।

কমল কলিকাতায় যাওয়া স্থগিত করিলেন। কমল কাহাকেও গালি দিলেন না—সূর্য্যমুখীকেও অণুমাত্র তিরস্কার করিলেন না। কমল গলা হইতে কণ্ঠহার খুলিয়া লইয়া গৃহস্থ সকলকে দেখাইয়া বলিলেন, "যে কুন্দকে আনিয়া দিবে, তাহাকে এই হার দিব।"

পাপ হীরা এই সব দেখে শুনে, কিছু বলে না। কমলের হার দেখিয়া একবার লোভ হইয়াছিল, কিন্তু সে লোভ সংবরণ করিল। দ্বিতীয় দিন কাজ করিয়া দুই প্রহরের সময়ে আয়ীর স্নানের সময় বুঝিয়া কুন্দকে খাওয়াইল। পরে রাত্রে আসিয়া উভয়ে শয্যারচনা করিয়া শয়ন করিল। কুন্দ বা হীরা কেহই নিদ্রা গেল না—কুন্দ আপনার মনের দুঃখে জাগিয়া রহিল। হীরা আপন মনের সুখ-দুঃখে জাগিয়া রহিল। সেও কুন্দের ন্যায় বিছানায় শুইয়া চিন্তা করিতেছিল। যাহা চিন্তা করিতেছিল, তাহা মুখে অবাচ্য—অতি গোপন।

ও হীরে! ছি! ছি! হীরে! মুখখানি ত দেখিতে মন্দ নয়—বয়সও নবীন, তবে হৃদয়মধ্যে এত খলকপট কেন? কেন? বিধাতা তাহাকে ফাঁকি দিয়াছে, সেও সকলকে ফাঁকি দিতে চায়।

হীরাকে সূর্য্যমুখীর আসনে বসাইলে হীরার কি খলকপট থাকিত? হীরা বলে, "না।" হীরাকে হীরার আসনে বসাইয়াছে বলিয়াই হীরা, হীরা! লোকে বলে, "সকলই দুষ্টের দোষ।" দুষ্ট বলে, "আমি ভালমানুষ হইতাম—কিন্তু লোকের দোষে দুষ্ট হইয়াছি।" লোকে বলে, "পাঁচ কেন সাত হইল না?" পাঁচ বলে, "আমি সাত হইতাম—কিন্তু দুই আর পাঁচে সাত—বিধাতা অথবা বিধাতার সৃষ্ট লোকে যদি আর আমাকে দুই দিত, তা হ'লেই আমি সাত হইতাম।" হীরা তাহাই ভাবিতেছিল।

হীরা ভাবিতেছিল—"এখন কি করি? পরমেশ্বর যদি সুবিধা করিয়া দিয়াছেন, তবে আপনার দোষে সব নষ্ট না হয়। এদিকে যদি কুন্দকে দত্তবাড়ী ফিরিয়া লইয়া যাই, তবে কমল হার দিবে, গৃহিণীও কিছু দিবেন—বাবুকেই কি ছাড়িব? আর যদি এদিকে কুন্দকে দেবেন্দ্র বাবুর হাতে দিই, তাহালে অনেক টাকা নগদ পাই। কিন্তু সে ত প্রাণ থাকিতে পারিব না। আচ্ছা, দেবেন্দ্র কুন্দকে কি এত সুন্দরী দেখেছে? আমরা গতর খাটিয়ে খাই; আমরা যদি ভাল খাই, ভাল পরি, পটের বিবির মত ঘরে তোলা থাকি, তা হ'লে আমরাও অমন হ'তে পারি। আর এটা মিন্‌মিনে, ঘ্যান্‌ঘেনে, প্যান্‌পেনে, সে দেবেন্দ্র বাবুর মর্ম্ম বুঝিবে কি? পাঁক নইলে পদ্মফুল ফুটে না, আর কুন্দ নইলে দেবেন্দ্র বাবুর মনোহরণ হয় না। তা যার কপালে যা, আমি রাগ করি কেন? রাগ করি কেন? ছা: কপাল, আর মনকে চোখ ঠার্‌লে কি হবে? ভালবাসার কথা শুনিলে হাসিতাম। বলিতাম, ওসব মুখের কথা, লোকে একটা প্রবাদ আছে মাত্র। এখন আর ত হাসিব না। মনে করিয়াছিলাম, যে ভালবাসে সে বাসুক, আমি ত কখনও কাহাকে ভালবাসিব না। ঠাকুর বল্লে, রহ, তোরে মজা দেখাচ্ছি। শেষে বেগারের দৌলতে গঙ্গাস্নান। পরের চোর ধর্‌তে গিয়ে আপনার প্রাণটা চুরি গেল! কি মুখখানি! কি গড়ন! কি গলা! অন্য মানুষের কি এমন আছে? আবার মিন্‌ষে আমায় বলে কুন্দকে এনে দে! আর বল্‌তে লোক পেলেন না! মারি মিন্‌ষের নাকে এক কিল। আহা, তার নাকে কিল মেরেও সুখ। দূর হোক, ও সব কথা যাক! ও পথেও ধর্ম্মের কাঁটা। এ জন্মের সুখদুঃখ অনেক কাল ঠাকুরকে দিয়াছি। তাই বলিয়া কুন্দকে দেবেন্দ্রের হাতে দিতে পারিব না। সে কথা মনে হ'লেও গা জ্বালা করে; বরং কুন্দ যাহাতে কখনও তার হাতে না পড়ে, তাই করিব। কি করিলে তাহা হয়? কুন্দ যেখানে ছিল, সেইখানে থাকিলেই তার হাতছাড়া। সে বৈষ্ণবীই সাজুক, আর বাসদেবই সাজুক, সে বাড়ীর ভিতর দন্তস্ফুট হইবে না। তবে সেইখানে কুন্দকে ফিরিয়া রাখিয়া আসাই মত। কিন্তু কুন্দ যাইবে না—আর সে বাড়ীমুখো হইবার মত নাই। কিন্তু যদি সবাই মিলে 'বাপু বাছা' ব'লে লইয়া যায়, তবে যাইতেও পারে। আর একটা আমার মনের কথা আছে, ঈশ্বর তাহা কি করিবেন? সূর্য্যমুখীর ধোঁতা মুখ ভোঁতা হবে? দেবতা করিলে হ'তেও পারে। আচ্ছা, সূর্য্যমুখীর উপর আমার এত রাগই বা কেন? সে ত কখন আমার কিছু মন্দ করে নাই, বরং ভালই বাসে, ভালই করে। তবে রাগ কেন? তা কি হীরা জানে না? হীরা না জানে কি? কেন বল্‌বো? সূর্য্যমুখী সুখী, আমি দুঃখী, এই জন্য আমার রাগ। সে বড়, আমি ছোট,—সে মুনিব, আমি বাঁদী। সুতরাং তার উপরে আমার বড় রাগ। যদি বল ঈশ্বর তাকে বড় করিয়াছেন, তার দোষ কি? আমি তার হিংসা করি কেন? তাতে আমি বলি, ঈশ্বর আমাকে হিংসুক করেছেন, আমারই বা দোষ কি? তা, আমি খান্‌কা তার মন্দ করিতে চাই না, কিন্তু যদি তার মন্দ করিলে আমার ভাল হয়, তবে না করি কেন? আপনার ভাল কে না করে? তা হিসাব করিয়া দেখি, কিসে কি হয়। এখন আমার হলো কিছু টাকার দরকার; আর দাসপনা পারি না। টাকা আসিবে কোথা থেকে? দত্তবাড়ী বৈ আর টাকা কোথা? তা দত্তবাড়ীর টাকা নেবার ফিকির এই,—সবাই জানে যে, কুন্দের উপর নগেন্দ্র বাবুর চোখ পড়েছে—বাবু এখন কুন্দমন্ত্রের উপাসক। বড় মানুষ লোক মনে করিলেই পারে। পারে না কেবল সূর্য্যমুখীর জন্য। যদি দুজনে একটা চটাচটি হয়, তা হ'লে আর বড় সূর্য্যমুখীর খাতির করবে না। এখন যাতে একটু চটাচটি হয়, সেইটি আমায় করবে হবে।

"তা হ'লেই বাবু যোড়শোপচারে কুন্দের পূজা আরম্ভ করিবেন। এখন কুন্দ হ'লো বোকা মেয়ে, আমি হলেম সেয়ানা মেয়ে, আমি কুন্দকে শীঘ্র বশ করিতে পারিব। এরই মধ্যে তাহার অনেক যোগাড় হয়ে রয়েছে। মনে করলে, কুন্দকে দিয়া যা ইচ্ছা করি, তাই করাতে পারি। আর যদি, বাবু কুন্দের পূজা আরম্ভ করেন, তবে তিনি হবেন

কুন্দের আজ্ঞাকারী। কুন্দকে করবো আমার আজ্ঞাকারী। সুতরাং পূজার ছোলাটা-কলাটা আমিও পাব। যদি আর দাসীপনা করিতে না হয়, এমনটা হয়, তা হ'লেই আমার হলো। দেখি, দুর্গা কি করেন। নগেন্দ্রকে কুন্দনন্দিনী দিব। কিন্তু হঠাৎ না। আগে কিছু দিন লুকিয়ে রেখে দেখি। প্রেমের পাক বিচ্ছেদে; বিচ্ছেদে বাবুর ভালবাসাটা পেকে আসবে। সেই সময়ে কুন্দকে বাহির করিয়া দিব। তাতে যদি সূর্য্যমুখীর কপাল না ভাঙ্গে, তবে তার বড় জোর কপাল। তত দিন আমি ব'সে ব'সে কুন্দকে উঠ-বস করান মকৃশ করাই। আগে আমীকে কামারঘাটা পাঠাইয়া দিই; নইলে কুন্দকে আর লুকিয়ে রাখা যায় না।"

এইরূপ কল্পনা করিয়া পাপিষ্ঠা হীরা সেইরূপ আচরণে প্রবৃত্ত হইল। ছল করিয়া আমীকে কামারঘাটা গ্রামে কুটুম্ববাড়ী পাঠাইয়া দিল এবং কুন্দকে অতি সঙ্গোপনে আপন বাড়ীতে রাখিল। কুন্দ তাহার যত্ন ও সহৃদয়তা দেখিয়া ভাবিতে লাগিল, "হীরার মত মানুষ আর নাই। কমলও আমায় এত ভালবাসে না।"

একবিংশ পরিচ্ছেদ

হীরার কলহ—বিষবৃক্ষের মুকুল

তা ত হলো। কুন্দ বশ হবে। কিন্তু সূর্য মুখী নগেন্দ্রের দুই চক্ষের বিষ না হলে ত কিছুতেই কিছু হবে না। গোড়ার কাজ সেই। হীরা এক্ষণে তাহাদের অভিন্ন হৃদয় ভিন্ন করিবার চেষ্টায় রহিল।

এক দিন প্রভাত হইলে পাপ হীরা মুনিব-বাড়ী আসিয়া গৃহকার্য্যে প্রবৃত্তা হইল। কৌশল্যা নাম্নী আর এক জন পরিচারিকা দত্তগৃহে কাজ করিত এবং হীরা প্রধানা বলিয়া ও প্রভুপত্নীর প্রসাদ-পুরস্কারভাগিনী বলিয়া তাহার হিংসা করিত। হীরা তাহাকে বলিল, "কুশি দিদি! আজ আমার গা কেমন কেমন করিতেছে, তুই আমার কাজগুলো কর্ না?" কৌশল্যা হীরাকে ভয় করিত, অগত্যা স্বীকৃত হইয়া বলিল, "তা করিব বৈ কি? সকলেরই ভাই শরীরের ভাল মন্দ আছে—তা এক মনিবের চাকর—করিব না?" হীরার ইচ্ছা ছিল যে, কৌশল্যা যে উত্তরই দিউক না, তাহাতেই ছল ধরিয়া কলহ করিবে। অতএব তখন মস্তক হেলাইয়া তর্জ্জন-গর্জ্জন করিয়া কহিল, "কে লা কুশি, তোর যে বড় আস্পর্দ্ধা দেখতে পাই? তুই গালি দিস্!" কৌশল্যা চমৎকৃত হইয়া বলিল, "আ মরি! আমি কখন গালি দিলাম?"

হীরা। আ মলো! আবার বলে কখন্ গালি দিলাম? কেন শরীরের ভাল মন্দ কি লা? আমি কি মরতে বসেছি না কি? আমাকে শরীরের ভালমন্দ দেখাবেন, আবার লোকে বল্‌বে, উনি আশীর্ব্বাদ করলেন। তোর শরীরের ভালমন্দ হউক।

কৌশল্যা। হয় হউক। তা বোন্ রাগ করিস্ কেন? মরিতে হইবেই এক দিন—যম ত আর তোকেও ভুল্‌বে না, আমাকেও ভুল্‌বে না।

হীরা। তোমাকে যেন—প্রাতর্ব্বাক্যে কখনও না ভোলে। তুমি আমার হিংসায় মর। তুমি যেন হিংসাতেই মর! শীগ্‌গির অল্লাই যাও, নিপাত যাও, নিপাত যাও, নিপাত যাও! তুমি যেন দুটি চক্ষের মাথা খাও।

কৌশল্যা আর সহ্য করিতে পারিল না। তখন কৌশল্যাও আরম্ভ করিল। "তুমি দুটি চক্ষের মাথা খাও। তুমি নিপাত যাও। তোমায় যেন যম না ভোলে। পোড়ারমুখি। আবাগি। শতেকখোয়ারি।" কোন্দলবিদ্যায় হীরার অপেক্ষা কৌশল্যা পটুতরা। সুতরাং হীরা পাটকেলটি খাইল।

হীরা তখন প্রভুপত্নীর নিকট নালিশ করিতে চলিল; যাইবার সময় যদি হীরার মুখ কেহ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিত, তবে দেখিতে পাইত যে, হীরার ক্রোধলক্ষণ কিছু নাই, বরং অধরপ্রান্তে একটু হাসি আছে। হীরা সূর্য্যমুখীর নিকট যখন গিয়া উপস্থিত হইল, তখন বিলক্ষণ ক্রোধলক্ষণ এবং সে প্রথমেই স্ত্রীলোকের ঈশ্বরদত্ত অস্ত্র ছাড়িল অর্থাৎ কাঁদিয়া দেশ ভাসাইল।

সূর্য্যমুখী নালিশী আরজী মোলাহেজা করিয়া বিহিত বিচার করিলেন। দেখিলেন, হীরারই দোষ, তথাপি হীরার অনুরোধে কৌশল্যাকে যৎকিঞ্চিৎ অনুযোগ করিলেন। হীরা তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া বলিল, "ও মাগীকে ছাড়াইয়া দাও, নহিলে আমি থাকিব না।"

তখন সূর্য্যমুখী হীরার উপর বিরক্ত হইলেন। বলিলেন, "হীরে, তোর বড় আদর বাড়িয়াছে! তুই আগে দিলি গা'ল—দোষ সব তোর—আবার তোর কথায় ওকে ছাড়াইব? আমি এমন অন্যায় করিতে পারিব না—তোর যাইতে ইচ্ছা হয় যা, আমি থাকিতে বলি না।"

হীরা ইহাই চায়; তখন "আচ্ছা চল্লেম" বলিয়া হীরা চক্ষের জলে বুক ভাসাইতে ভাসাইতে বহির্ব্বাটীতে বাবুর নিকট গিয়া উপস্থিত হইল।

বাবু বৈঠকখানায় একা ছিলেন—এখন একাই থাকিতেন। হীরা কাঁদিতেছে দেখিয়া নগেন্দ্র বলিলেন, "হীরে, কাঁদিতেছিস্ কেন?"

হী। আমার মাহিনাপত্র হিসাব করিয়া দিতে হুকুম করুন।

ন। (সবিস্ময়ে) সে কি! কি হয়েছে?

হী। আমার জবাব হয়েছে। মা ঠাকুরাণী আমাকে জবাব দিয়েছেন।

ন। কি করেছিস্ তুই?

হী। কুন্দ আমাকে গালি দিয়াছিল—আমি নালিশ করিয়াছিলাম। তিনি তার কথায় বিশ্বাস করিয়া আমাকে জবাব দিলেন।

নগেন্দ্র মাথা নাড়িয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "সে কাজের কথা নয় হীরে, আসল কথা কি বল্।"

হীরা তখন খজু হইয়া বলিল, "আসল কথা, আমি থাকিব না।"

ন। কেন?

হী। মা ঠাকুরাণীর মুখ বড় এলোমেলো হয়েছে—কারে কখন্ কি বলেন ঠিক নাই।

নগেন্দ্র ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া তীব্রস্বরে বলিলেন, "সে কি?"

হীরা যাহা বলিতে আসিয়াছিল, তাহা এইবার বলিল, "সে দিন কুন্দঠাকুরাণীকে কি না বলিয়াছিলেন। শুনিয়া কুন্দঠাকুরাণী দেশত্যাগী হয়েছেন। আমাদের ভয়, পাছে আমাদের সেইরূপ কোন্ দিন কি বলেন,—আমরা তা হ'লে বাঁচিব না—তাই আগে হইতে সরিতেছি।"

ন। সে কি কথা?

হী। আপনার সাক্ষাতে লজ্জায় তা আমি বলিতে পারি না।

শুনিয়া নগেন্দ্রের ললাট অন্ধকার হইল। তিনি হীরাকে বলিলেন, "আজ বাড়ী যা, কাল ডাকব।"

হীরার মনস্কাম সিদ্ধ হইল। সে এই জন্য কৌশল্যার সঙ্গে বচসা সৃজন করিয়াছিল।

নগেন্দ্র উঠিয়া সূর্য্যমুখীর নিকটে গেলেন। হীরা পা টিপিয়া টিপিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেল।

সূর্য্যমুখীকে নিভৃতে লইয়া গিয়া নগেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি হীরাকে বিদায় দিয়াছ?" সূর্য্যমুখী বলিলেন, "দিয়াছি।" অনন্তর হীরা ও কৌশল্যার বৃত্তান্ত সবিশেষ বিবৃত করিলেন। শুনিয়া নগেন্দ্র বলিলেন, "মরুক। তুমি কুন্দনন্দিনীকে কি বলিয়াছিলে?"

নগেন্দ্র দেখিলেন, সূর্য্যমুখীর মুখ শুকাইল। সূর্য্যমুখী অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "কি বলিয়াছিলাম?"

ন। কোন দুর্ব্বাক্য?

সূর্য্যমুখী কিয়ৎকাল স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। পরে যাহা বলা উচিত, তাহাই বলিলেন। বলিলেন, "তুমি আমার সর্ব্বস্ব। তুমি আমার ইহকাল, তুমি আমার পরকাল। তোমার কাছে কেন আমি লুকাইব? কখনও কোনও কথা তোমার কাছে লুকাই নাই, আজ কেন এক জন পরের কথা তোমার কাছে লুকাইব? আমি কুন্দকে কুকথা বলিয়াছিলাম। পাছে তুমি রাগ কর বলিয়া, তোমার কাছে ভরসা করিয়া বলি নাই। অপরাধ মার্জ্জনা করিও। আমি সকল বলিতেছি।"

তখন সূর্য্যমুখী হরিদাসী বৈষ্ণবীর পরিচয় হইতে কুন্দনন্দিনীর তিরস্কার পর্য্যন্ত অকপটে সকল বিবৃত করিলেন। বলিয়া, শেষে কহিলেন, "আমি কুন্দনন্দিনীকে তাড়াইয়া আপনার মরমে আপনি মরিয়া আছি। দেশে দেশে তাহার তত্ত্বে লোক পাঠাইয়াছি। যদি সন্ধান পাইতাম, ফিরাইয়া আনিতাম। আমার অপরাধ লইও না।"

নগেন্দ্র তখন বলিলেন, "তোমার বিশেষ অপরাধ নাই, তুমি যেরূপ কুন্দের কলঙ্ক শুনিয়াছিলে, তাহাতে কোন্ ভদ্রলোকের স্ত্রী তাকে মিষ্ট কথা বলিবে, কি ঘরে স্থান দিবে? কিন্তু একবার ভাবিলে ভাল হইত যে, কথাটা সত্য কি না?"

সূর্য্য। তখন সে কথা ভাবি নাই। এখন ভাবিতেছি।

ন। ভাবিলে না কেন?

সূর্য্য। আমার মনের ভ্রান্তি জন্মিয়াছিল। বলিতে বলিতে সূর্য্যমুখী—পতিপ্রাণা—সাধ্বী—নগেন্দ্রের চরণপ্রান্তে ভূতলে উপবেশন করিলেন এবং নগেন্দ্রের উভয় চরণ দুই হস্তে গ্রহণ করিয়া নয়নজলে সিক্ত করিলেন. তখন মুখ তুলিয়া বলিলেন, "প্রাণাধিক. তুমি। কোন কথা এ পাপ মনের ভিতর থাকিতে তোমার কাছে লুকাইব না। আমার অপরাধ লইও না।"

নগেন্দ্র বলিলেন, "তোমায় বলিতে হইবে না। আমি জানি, তুমি সন্দেহ করিয়াছিলে যে, আমি কুন্দনন্দিনীতে অনুরক্ত।"

সূর্য্যমুখী নগেন্দ্রের যুগলচরণে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন; আবার সেই শিশির-সিক্ত

কমল-তুল্য ক্লিষ্ট মুখমণ্ডল উন্নত করিয়া সর্ব্বদুঃখাপহারী স্বামিমুখপ্রতি চাহিয়া বলিলেন, "কি বলিব তোমায়? আমি যে দুঃখ পাইয়াছি, তাহা কি তোমায় বলিতে পারি? মরিলে পাছে তোমার দুঃখ বাড়ে, এই জন্য মরি নাই। নহিলে যখন জানিয়াছিলাম, অন্যা তোমার হৃদয়ভাগিনী, আমি তখন মরিতে চাহিয়াছিলাম; মুখের মরা নহে—যেমন সকলে মরিতে চাহে, তেমন মরা নহে; আমি যথার্থ আন্তরিক অকপটে মরিতে চাহিয়াছিলাম। আমার অপরাধ লইও না।"

নগেন্দ্র অনেকক্ষণ স্থিরভাবে থাকিয়া, শেষ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"সূর্য্যমুখি! অপরাধ সকলই আমার। তোমার অপরাধ কিছুই নাই। আমি যথার্থ তোমার নিকট বিশ্বাসহন্তা। যথার্থই আমি তোমাকে ভুলিয়া কুন্দনন্দিনীতে—কি বলিব? আমি যে যন্ত্রণা পাইয়াছি, যে যন্ত্রণা পাইতেছি, তাহা তোমাকে কি বলিব; তুমি মনে করিয়াছ, আমি চিত্তদমনের চেষ্টা করি নাই। এমত ভাবিও না। আমি যত আমাকে তিরস্কার করিয়াছি, তুমি কখনও তত তিরস্কার করিবে না। আমি পাপাত্মা—আমার চিত্ত বশ হইল না।"

সূর্য্যমুখী আর সহ্য করিতে পারিলেন না। যোড়হাত করিয়া কাতরস্বরে বলিলেন, "যাহা তোমার মনে থাকে, থাক—আমার কাছে আর বলিও না। তোমার প্রতি কথায় আমার বুকে শেল বিঁধিতেছে—আমার অদৃষ্টে যাহা ছিল, তাহা ঘটিয়াছে—আর শুনিতে চাহি না। এ সকল আমার অশ্রাব্য।"

"না, তা নয় সূর্য্যমুখি! আরও শুনিতে হইবে। যদি কথা পাড়িলে, তবে মনের কথা ব্যক্ত করিয়া বলি,—কেন না, অনেক দিন হইতে বলি-বলি করিতেছি। আমি এ সংসার ত্যাগ করিব। মরিব না—কিন্তু দেশান্তরে যাইব। বাড়ী-ঘর-সংসারে আর সুখ নাই। তোমাতে আমার আর সুখ নাই,—আমি তোমার অযোগ্য স্বামী। আমি আর কাছে থাকিয়া তোমাকে ক্লেশ দিব না। কুন্দনন্দিনীকে সন্ধান করিয়া আমি দেশদেশান্তরে ফিরিব। তুমি এ গৃহে গৃহিণী থাক। মনে মনে ভাবিও, তুমি বিধবা—যাহার স্বামী এরূপ পামর, সে বিধবা নয় ত কি? কিন্তু আমি পামর হই আর যা-ই হই, তোমাকে প্রবঞ্চনা করিব না। আমি অন্যাগতপ্রাণ হইয়াছি,—সে কথা তোমাকে স্পষ্ট বলিব; এখন আমি দেশত্যাগ করিয়া চলিলাম। যদি কুন্দনন্দিনীকে ভুলিতে পারি, তবে আবার আসিব। নচেৎ তোমার সঙ্গে এই শেষ সাক্ষাৎ।"

এই শেল-সম কথা শুনিয়া সূর্য্যমুখী কি বলিলেন? কয়েক মুহূর্ত্ত প্রস্তরময়ী মূর্ত্তিবৎ পৃথিবীপানে চাহিয়া রহিলেন। পরে সেই ভূতলে অধোমুখে শুইয়া পড়িলেন। মাটীতে মুখ লুকাইয়া সূর্য্যমুখী—কাঁদিলেন কি? হত্যাকারী ব্যাঘ্র যেরূপ হতজীবের যন্ত্রণা দেখে, নগেন্দ্র সেইরূপ স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলেন। মনে মনে বলিতেছিলেন, "সেই ত মরিতে হইবে, তার আর আজকাল কি? জগদীশ্বরের ইচ্ছা,—আমি কি করিব? আমি কি মনে করিলে ইহার প্রতিকার করিতে পারি? আমি মরিতে পারি, কিন্তু তাহাতে সূর্য্যমুখী বাঁচিবে?"

না; নগেন্দ্র! তুমি মরিলে সূর্য্যমুখী বাঁচিবে না, কিন্তু তোমার মরাই ভাল ছিল।

দণ্ডেক পরে সূর্য্যমুখী উঠিয়া বসিলেন। আবার স্বামীর পায় ধরিয়া বলিলেন—"এক ভিক্ষা।"

নগেন্দ্র। কি?

সূর্য্য। আর এক মাস মাত্র গৃহে থাক। ইতিমধ্যে যদি কুন্দনন্দিনীকে না পাওয়া যায়, তবে তুমি দেশত্যাগ করিও। আমি মানা করিব না।

নগেন্দ্র মৌনভাবে বাহির হইয়া গেলেন। মনে মনে আরও এক মাস থাকিতে স্বীকার করিলেন। সূর্য্যমুখীও তাহা বুঝিলেন। তিনি গমনশীল নগেন্দ্রের মূর্ত্তিপ্রতি চাহিয়াছিলেন। সূর্য্যমুখী মনে মনে বলিতেছিলেন, "আমার সর্ব্বস্ব ধন! তোমার পায়ের কাঁটাটি তুলিবার জন্য প্রাণ দিতে পারি। তুমি পাপ সূর্য্যমুখীর জন্য দেশত্যাগী হইবে? তুমি বড় না আমি বড়?"

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

চোরের উপর বাটপাড়ি

হীরা দাসীর চাকরী গেল, কিন্তু দত্তবাড়ীর সঙ্গে সম্বন্ধ ঘুচিল না। সে-বাড়ীর সংবাদের জন্য হীরা সর্ব্বদা ব্যস্ত। সেখানকার লোক পাইলে ধরিয়া বসাইয়া গল্প ফাঁদে। কথার ছলে সূর্য্যমুখীর প্রতি নগেন্দ্রের কি ভাব, তাহা জানিয়া লয়। যে দিন কাহারও সাক্ষাৎ না পায়, সে দিন ছল করিয়া বাবুদের বাড়ীতেই আসিয়া বসে। দাসী মহলে পাঁচ রকম কথা পাড়িয়া অভিপ্রায় সিদ্ধ করিয়া চলিয়া যায়।

এইরূপে কিছুদিন গেল। কিন্তু এক দিন একটি গোলযোগ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা হইয়া উঠিল ;- দেবেন্দ্রের নিকট হীরার পরিচয়াবধি, হীরার বাড়ী মালতী গোয়ালিনীর কিছু ঘন ঘন যাতায়াত হইতে লাগিল। মালতী দেখিল, তাহাতে হীরা বড় সন্তুষ্টা নহে। আরও দেখিল, একটি ঘর প্রায় বন্ধ থাকে। সে ঘরে, হীরার বুদ্ধির প্রাখর্য্য হেতু, বাহির হইতে শিকল এবং তাহাতে তালাচাবী আঁটা থাকিত, কিন্তু একদিন অকস্মাৎ মালতী আসিয়া দেখিল, তালাচাবী দেওয়া নাই। মালতী হঠাৎ শিকল খুলিয়া দুয়ার ঠেলিয়া দেখিল। দেখিল, ঘর ভিতর হইতে বন্ধ, তখন সে বুঝিল, ইহার ভিতর মানুষ থাকে।

মালতী হীরাকে কিছু বলিল না, কিন্তু মনে মনে ভাবিতে লাগিল—মানুষটা কে? প্রথমে ভাবিল, পুরুষমানুষ। কিন্তু কে কার কে, মালতী সকলই ত জানিত—এ কথা সে বড় মনে স্থান দিল না। শেষে তাহার মনে মনে সন্দেহ হইল—কুন্দই বা এখানে আছে। কুন্দের নিরুদ্দেশ হওয়ার কথা মালতী সকলই শুনিয়াছিল। এখন সন্দেহভঞ্জনার্থ শীঘ্র সদুপায় করিল। হীরা বাবুদের বাড়ী হইতে একটি হরিণশিশু আনিয়াছিল। সেটি বড় চঞ্চল বলিয়া বাঁধাই থাকিত। এক দিন মালতী তাহাকে আহার করাইতেছিল। আহার করাইতে করাইতে হীরার অলক্ষ্যে তাহার বন্ধন খুলিয়া দিল ; হরিণশিশু মুক্ত হইবামাত্র বেগে বাহিরে পলায়ন করিল। দেখিল, হীরা ধরিবার জন্য তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেল।

হীরা যখন ছুটিয়া যায়, মালতী তখন ব্যগ্রস্বরে ডাকিতে লাগিল, "হীরে! ও হীরে! ও গঙ্গাজল!" হীরা দূরে গেলে মালতী আছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল, "ও মা! আমার গঙ্গাজল এমন হলো কেন?" এই বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কুন্দের দ্বারে ঘা মারিয়া কাতরস্বরে বলিতে লাগিল—"কুন্দঠাকরুণ! কুন্দ? শীঘ্র বাহির হও! গঙ্গাজল কেমন হয়েছে!" সুতরাং কুন্দ ব্যস্ত হইয়া দ্বার খুলিল। মালতী তাহাকে দেখিয়া হি হি করিয়া হাসিয়া পলাইল।

কুন্দ দ্বার রুদ্ধ করিল। পাছে হীরা তিরস্কার করে বলিয়া হীরাকে কিছু বলিল না।

মালতী গিয়া দেবেন্দ্রকে সন্ধান বলিল। দেবেন্দ্র স্থির করিলেন, স্বয়ং হীরার বাড়ী গিয়া এসপার কি ওসপার, যা হয় একটা করিয়া আসিবেন। কিন্তু সে দিন একটা "পার্টি" ছিল—সুতরাং ছুটিতে পারিলেন না। পরদিন যাইবেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

পিঞ্জরের পাখী

কুন্দ এখন পিঞ্জরের পাখী—"সতত চঞ্চল।" দুইটি ভিন্নদিগভিমুখগামিনী স্রোতস্বতী পরস্পর প্রতিহত হইলে স্রোতোবেগে বাড়িয়াই উঠে। কুন্দের হৃদয় তাহাই হইল। এ দিকে মহালজ্জা,—অপমান—তিরস্কার—মুখ দেখাইবার উপায় নাই—সূর্য্যমুখী ত বাড়ী হইতে দূর করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু সেই লজ্জাস্রোতের উপরে প্রণয়স্রোত আসিয়া পড়িল। পরস্পর প্রতিঘাতে প্রণয়প্রবাহই বাড়িয়া উঠিল ; বড় নদীতে ছোট নদী ডুবিয়া গেল। সূর্য্যমুখীকৃত অপমান ক্রমে বিলুপ্ত হইতে লাগিল। সূর্য্যমুখী আর মনে স্থান পাইলেন না—নগেন্দ্রই সর্ব্বত্র। ক্রমে কুন্দ ভাবিতে লাগিল, "আমি কেন সে গৃহ ত্যাগ করিয়া আসিলাম? দুটো কথায় আমার কি ক্ষতি হইয়াছিল? আমি ত নগেন্দ্রকে দেখিতাম। এখন যে একবারও দেখিতে পাই না। তা আমি কি আবার ফিরে সে বাড়ীতে যাব? তা যদি আমাকে তাড়াইয়া না দেয়, তবে আমি যাই। কিন্তু পাছে আবার তাড়াইয়া দেয়?" কুন্দনন্দিনী দিবানিশি মনোমধ্যে এই চিন্তা করিত। দত্তগৃহে প্রতিগমন কর্ত্তব্য কি না, এ বিচার আর বড় করিত না—সেটা দুই চারি দিনে স্থির সিদ্ধান্ত হইল যে, যাওয়াই কর্ত্তব্য—নহিলে প্রাণ যায় ; তবে গেলে সূর্য্যমুখী পুনশ্চ দূরীকৃত করিবে কি না, ইহাই বিবেচ্য হইল। শেষে কুন্দের এমনই দুর্দ্দশা হইল যে, সে সিদ্ধান্ত করিল, সূর্য্যমুখী দূরীকৃতই করুক, আর যাই করুক, যাওয়াই স্থির।

কিন্তু ফিরিয়া কুন্দ আবার গিয়া সে গৃহ-প্রাঙ্গণে দাঁড়াইবে? একা তো যাইতে বড় লজ্জা করে—তবে হীরা যদি সঙ্গে করিয়া লইয়া যায়, তা হলে যাওয়া হয়। কিন্তু হীরাকে মুখ ফুটিয়া বলিতে বড় লজ্জা করিতে লাগিল। মুখ ফুটিয়া বলিতেও পারিল না।

হৃদয়ও আর প্রাণাধিকের অদর্শন সহ্য করিতে পারে না। এক দিন দুই চারি দণ্ড রাত্রি থাকিতে কুন্দ শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিল। হীরা তখন নিদ্রিত। নিঃশব্দে কুন্দ দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া বাটীর বাহির হইল। কৃষ্ণপক্ষাবশেষে ক্ষীণচন্দ্র আকাশপ্রান্তে সাগরে নিক্ষিপ্তা বালিকা সুন্দরীর ন্যায় ভাসিতেছিল। বৃক্ষান্তরাল মধ্যে রাশি রাশি অন্ধকার লুকাইয়া ছিল। অতি মন্দ শীতল বায়ুতে পথিপার্শ্বস্থ সরোবরের পদ্মপত্র-শৈবালাদি-সমাচ্ছন্ন জলের বীচি-বিক্ষেপ হইতেছিল না। অস্পষ্টলক্ষ্য বৃক্ষাগ্রভাগ সকলের উপর নিবিড় নীল আকাশ শোভা পাইতেছিল। কুকুরেরা পথিপার্শ্বে নিদ্রা যাইতেছিল। প্রকৃতি স্নিগ্ধগাম্ভীর্য্যময়ী হইয়া শোভা পাইতেছিল। কুন্দ পথ অনুমান করিয়া দত্তগৃহাভিমুখে সন্দেহমন্দপদে চলিল। যাইবার আর কিছুই অভিপ্রায় নহে—যদি কোন সুযোগে একবার নগেন্দ্রকে দেখিতে পায়। দত্তগৃহে ফিরিয়া যাওয়া ত ঘটিতেছে না—যবে ঘটিবে তবে ঘটিবে—ইতিমধ্যে একদিন লুকাইয়া দেখিয়া আসিলে ক্ষতি কি? কিন্তু লুকাইয়া দেখিব কখন? কি প্রকারে? কুন্দ ভাবিয়া ভাবিয়া এই স্থির করিয়াছিল যে, রাত্রি থাকিতে দত্তদিগের গৃহসন্নিধানে গিয়া চারিদিকে বেড়াইব—কোন সুযোগে নগেন্দ্রকে বাতায়নে, কি প্রাসাদে, কি উদ্যানে, কি পথে দেখিতে পাইব। নগেন্দ্র প্রভাতে উঠিয়া থাকেন, কুন্দ তাঁহাকে দেখিতে পাইলেও পাইতে পারে। দেখিয়াই অমনি কুন্দ ফিরিয়া আসিবে।

মনে মনে এইরূপ কল্পনা করিয়া কুন্দ শেষরাত্রে নগেন্দ্রের গৃহাভিমুখে চলিল। অট্টালিকা সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া দেখিল, তখন রাত্রি প্রভাত হইতে কিছু বিলম্ব আছে। কুন্দ পথপানে চাহিয়া দেখিল—নগেন্দ্র কোথাও নাই—ছাদপানে চাহিল, সেখানেও নগেন্দ্র নাই—বাতায়নেও নগেন্দ্র নাই। কুন্দ ভাবিল, এখনও তিনি বুঝি উঠেন নাই,—উঠিবার সময় হয় নাই। প্রভাত হউক, আমি ঝাউতলায় বসি। কুন্দ ঝাউতলায় বসিল। ঝাউতলা বড় অন্ধকার। দুই একটি ঝাউয়ের ফল কি পল্লব টুট টুট করিয়া নীরমধ্যে খসিয়া পড়িতেছিল। মাথার উপরে বৃক্ষস্থ পক্ষীরা পাখা ঝাড়া দিতেছিল। অট্টালিকারক্ষক দ্বারবান্‌দিগের দ্বারা দ্বারোদ্ঘাটনের ও অবরোধের শব্দ মধ্যে মধ্যে শোনা যাইতেছিল। শেষ উষাসমাগমসূচক শীতল বায়ু বহিল।

তখন পাপিয়া স্বরলহরীতে আকাশ ভাসাইয়া মাথার উপর দিয়া ডাকিয়া গেল। কিছু পরে ঝাউগাছে কোকিল ডাকিল। শেষে সকল পক্ষী মিলিয়া গণ্ডগোল করিতে লাগিল। তখন কুন্দের ভরসা নিবিতে লাগিল—আর ত ঝাউতলায় বসিয়া থাকিতে পারে না, প্রভাত হইল—কেহ দেখিতে পাইবে। তখন প্রত্যাবর্ত্তনার্থ কুন্দ গাত্রোত্থান করিল। এক আশা মনে বড় প্রবলা হইল। অন্তঃপুরসংলগ্ন যে পুষ্পোদ্যান আছে—নগেন্দ্র প্রাতে উঠিয়া কোন কোন দিন সেইখানে বায়ু সেবন করিয়া থাকেন। হয় ত নগেন্দ্র এতক্ষণ সেইখানে পদচারণ করিতেছেন। একবার সে স্থান না দেখিয়া কুন্দ ফিরিতে পারিল না। কিন্তু সে উদ্যান প্রাচীরবেষ্টিত। খিড়কীর দ্বার মুক্ত না হইলে, তাহার মধ্যে প্রবেশের পথ নাই। বাহির হইতেও তাহা দেখা যায় না। খিড়কীর দ্বার মুক্ত কি রুদ্ধ, ইহা দেখিবার জন্য কুন্দ সেই দিকে গেল।

দেখিল দ্বার মুক্ত। কুন্দ সাহসে ভর করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিল, এবং উদ্যানপ্রান্তে ধীরে ধীরে আসিয়া এক বকুলবৃক্ষের অন্তরালে দাঁড়াইল।

উদ্যানটি ঘন বৃক্ষলতাগুল্মরাজিপরিবৃত। বৃক্ষশ্রেণীমধ্যে প্রস্তর-রচিত সুন্দর পথ, স্থানে স্থানে শ্বেত, রক্ত, নীল, পীতবর্ণ বহু কুসুমরাশিতে বৃক্ষাদি মণ্ডিত হইয়া রহিয়াছে। তদুপরি প্রভাতমধুলুব্ধ মক্ষিকাসকল দলে দলে ভ্রমিতেছে, বসিতেছে, উড়িতেছে,—গুন্ গুন্ শব্দ করিতেছে। এবং মনুষ্যের চরিত্রের অনুকরণ করিয়া একটা একটা বিশেষ মধুযুক্ত ফুলের উপর পালে পালে ঝুঁকিতেছে। বিচিত্রবর্ণ অতিক্ষুদ্র পক্ষিগণ প্রস্ফুটিত পুষ্পগুচ্ছোপরি বৃক্ষফলবৎ আরোহণ করিয়া পুষ্পরস পান করিতেছে, কাহারও কণ্ঠ হইতে সপ্তস্বর-সম্মিলিত ধ্বনি নির্গত হইতেছে। প্রভাত-বায়ুর মন্দহিল্লোলে পুষ্পভারাবনত ক্ষুদ্র শাখা দুলিতেছে—পুষ্পহীন শাখাসকল দুলিতেছে না, কেন না, তাহারা নম্র নহে। কোকিল মহাশয় বকুলের ঝোপের মধ্যে কালবর্ণ লুকাইয়া গলাবাজিতে সকলকে জিতিতেছেন।

উদ্যানমধ্যস্থলে একটি শ্বেতপ্রস্তর-নির্ম্মিত লতামণ্ডপ। তাহা অবলম্বন করিয়া নানাবিধ লতা-পুষ্পধারণ করিয়া রহিয়াছে এবং তাহার ধারে

মৃত্তিকাধারে রোপিত সপুষ্প গুল্মসকল শ্রেণীবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে।

কুন্দনন্দিনী বকুলান্তরাল হইতে উদ্যানমধ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া নগেন্দ্রের দীর্ঘায়ত দেবমূর্ত্তি দেখিতে পাইল না। লতামণ্ডপমধ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল যে, তাহার প্রস্তরনির্ম্মিত স্নিগ্ধ হর্ম্ম্যোপরি কেহ শয়ন করিয়া রহিয়াছে, কুন্দনন্দিনীর বোধ হইল, সেই নগেন্দ্র। ভাল করিয়া দেখিবার জন্য সে ধীরে ধীরে বৃক্ষের অন্তরালে অন্তরালে থাকিয়া অগ্রবর্ত্তিনী হইতে লাগিল। দুর্ভাগ্যক্রমে সেই সময়ে লতামণ্ডপস্থ ব্যক্তি গাত্রোত্থান করিয়া বাহির হইল। হতভাগিনী কুন্দ দেখিল যে, সে নগেন্দ্র নহে, সূর্য্যমুখী।

কুন্দ তখন ভীতা হইয়া এক প্রস্ফুটিতা কামিনীর অন্তরালে দাঁড়াইল। ভয়ে অগ্রসর হইতে পারিল না, পশ্চাদপসৃতও হইতে পারিল না। দেখিতে লাগিল, সূর্য্যমুখী উদ্যানমধ্যে পুষ্পচয়ন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। যেখানে কুন্দ লুকাইয়া আছে, সূর্য্যমুখী ক্রমে সেই দিকে আসিতে লাগিলেন। কুন্দ দেখিল যে, ধরা পড়িলাম। শেষে সূর্য্যমুখী কুন্দকে দেখিতে পাইলেন। দূর হইতে চিনিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও কে গা?"

কুন্দ ভয়ে নীরব হইয়া রহিল—পা সরিল না। সূর্য্যমুখী তখন নিকটে আসিলেন—দেখিলেন—চিনিলেন যে, কুন্দ। বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "কে, কুন্দ না কি!"

কুন্দ তখনও উত্তর করিতে পারিল না। সূর্য্যমুখী কুন্দের হাত ধরিলেন, বলিলেন, "কুন্দ! এসো—দিদি এসো। আর আমি তোমায় কিছু বলিব না।"

এই বলিয়া সূর্য্যমুখী হস্ত ধরিয়া কুন্দনন্দিনীকে অন্তঃপুরমধ্যে লইয়া গেলেন।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

অবতরণ

সেই দিন রাত্রে দেবেন্দ্র দত্ত একাকী ছদ্মবেশে, সুরারঞ্জিত হইয়া কুন্দনন্দিনীর অনুসন্ধানে হীরার বাড়ীতে দর্শন দিলেন, এ ঘর ও ঘর খুঁজিয়া দেখিলেন, কুন্দ নাই। হীরা মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে লাগিল। দেবেন্দ্র রুষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাসিস্ কেন?"

হীরা বলিল, "তোমার দুঃখ দেখে। পিঞ্জরার পাখী পলাইয়াছে—আমার বাড়ী খানাতল্লাসী করিলে পাইবে না।"

তখন দেবেন্দ্রের প্রশ্নে হীরা যাহা যাহা জানিত, আদ্যোপান্ত কহিল। শেষে কহিল, "প্রভাতে তাহাকে না দেখিয়া অনেক খুঁজিলাম, খুঁজিতে খুঁজিতে বাবুদের বাড়ীতে দেখিলাম—এবার বড় আদর।"

দেবেন্দ্র হতাশ্বাস হইয়া ফিরিয়া আসিতেছেন, কিন্তু, মনের সন্দেহ মিটিল না। ইচ্ছা—আর একটুকু বসিয়া ভাবগতিক বুঝিয়া যান। আকাশে একটু কাল মেঘ ছিল দেখিয়া বলিলেন, "বুঝি বৃষ্টি এলো।" অনন্তর ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। হীরার ইচ্ছা, দেবেন্দ্র একটু বসেন—কিন্তু সে স্ত্রীলোক—একাকিনী থাকে—তাহাতে রাত্রি—বসিতে বলিতে পারিল না। তাহা হইলে অধঃপাতের সোপানে আর এক পদ নামিতে হয়। তাহাও তাহার কপালে ছিল। দেবেন্দ্র বলিলেন, "তোমার ঘরে ছাতি আছে?"

হীরার ঘরে ছাতি ছিল না। দেবেন্দ্র বলিলেন, "তোমার এখানে একটু বসিয়া, জলটা দেখিয়া গেলে কেহ কিছু মনে করিবে?"

হীরা বলিল, "মনে করিবে না কেন? কিন্তু যাহা দোষ, আপনি রাত্রে আমার বাড়ী আসাতেই তাহা ঘটিয়াছে।"

দে। তবে বসিতে পারি?

হীরা উত্তর করিল না। দেবেন্দ্র বসিলেন।

তখন হীরা তক্তপোষের উপর অতি পরিষ্কার শয্যা রচনা করিয়া দেবেন্দ্রকে বসাইল এবং সিন্দুক হইতে একটি ক্ষুদ্র বাঁধা হুঁকা বাহির করিল। স্বহস্তে তাহাতে শীতল জল পুরিয়া, মিঠাকড়া তামাকু সাজিয়া, পাতার নল করিয়া দিল।

দেবেন্দ্র পকেট হইতে একটি ব্রাণ্ডি ফ্লাস্ক বাহির করিয়া বিনা জলে পান করিলেন এবং রাগযুক্ত হইলে দেখিলেন, হীরার চক্ষু বড় সুন্দর। বস্তুতঃ সে চক্ষু সুন্দর। চক্ষু বৃহৎ নিবিড়-কৃষ্ণতার, প্রদীপ্ত এবং বিলোল-কটাক্ষ।

দেবেন্দ্র হীরাকে বলিলেন, "তোমার দিব্য চক্ষু!" হীরা মৃদু হাসিল। দেবেন্দ্র দেখিলেন, এক কোণে একখানা ভাঙ্গা বেহালা পড়িয়া আছে। দেবেন্দ্র গুন্ গুন্ করিয়া গান করিতে করিতে সেই

বেহালা আনিয়া তাহাতে ছড়ি দিলেন। বেহালা ধেঁকর ধোঁকর করিতে লাগিল। দেবেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "এ বেহালা কোথায় পাইলে?"

হীরা কহিল, "এক জন সিপাহীর কাছে কিনিয়াছিলাম।" দেবেন্দ্র বেহালা হস্তে লইয়া এক প্রকার চলনসই করিয়া লইলেন এবং তাহার সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া, মধুরস্বরে মধুর-ভাবযুক্ত মধুর পদ মধুর ভাবে গায়িলেন। হীরার চক্ষু আরও জ্বলিতে লাগিল। ক্ষণকাল জন্য হীরার সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃতি জন্মিল। সে যে হীরা, এই যে দেবেন্দ্র, তাহা ভুলিয়া গেল। মনে করিতেছিল, ইনি স্বামী—আমি পত্নী! মনে করিতেছিল, বিধাতা দুই জনকে পরস্পরের জন্য সৃজন করিয়া বহুকাল হইতে মিলিত করিয়াছেন, বহুকাল হইতে যেন উভয়ের প্রণয়সুখে উভয়ে সুখী। এই মোহে অভিভূত হীরার মনের কথা মুখে ব্যক্ত হইল। দেবেন্দ্র হীরার মুখে অর্দ্ধব্যক্ত স্বরে শুনিলেন যে, হীরা দেবেন্দ্রকে মনে মনে প্রাণ সমর্পণ করিয়াছে।

কথা ব্যক্ত হইবার পর হীরার চৈতন্য হইল, মস্তক ঘুরিয়া উঠিল। তখন সে উন্মত্তের ন্যায় আকুল হইয়া দেবেন্দ্রকে কহিল, "আপনি শীঘ্র আমার ঘর হইতে যান।"

দেবেন্দ্র বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "সে কি, হীরা?"

হীরা। আপনি শীঘ্র যান—নহিলে আমি চলিলাম।

দে। সে কি? তাড়াইয়া দিতেছ কেন?

হীরা। আপনি যান—নহিলে আমি লোক ডাকিব—আপনি কেন আমার সর্ব্বনাশ করিতে আসিয়াছিলেন?

হীরা তখন উন্মাদিনীর ন্যায় বিবশা।

দে। একেই বলে স্ত্রীচরিত্র।

হীরা রাগিল—বলিল, "স্ত্রীচরিত্র? স্ত্রীচরিত্র মন্দ নহে। তোমাদের ন্যায় পুরুষের চরিত্রই অতি মন্দ। তোমাদের ধর্ম্মজ্ঞান নাই—পরের ভালমন্দ বোধ নাই—কেবল আপনার সুখ খুঁজিয়া বেড়াও—কেবল কিসে কোন্ স্ত্রীলোকের সর্ব্বনাশ করিবে, সেই চেষ্টায় ফের। নহিলে কেন তুমি আমার বাড়ীতে বসিলে? আমার সর্ব্বনাশ করিবে, তোমার কি এ অভিপ্রায় ছিল না? তুমি আমাকে কুলটা ভাবিয়াছিলে, নহিলে কোন্ সাহসে বসিবে? কিন্তু আমি কুলটা নহি। আমরা দুঃখী লোক, গতর খাটাইয়া খাই—কুলটা হইবার আমাদের অবকাশ নাই—বড় মানুষের বউ হইলে কি হইতাম, বলিতে পারি না।" দেবেন্দ্র ভ্রূভঙ্গী করিলেন। দেখিয়া হীরা প্রীতা হইল। পরে উন্নমিতাননে দেবেন্দ্রের প্রতি স্থির দৃষ্টি করিয়া কোমলতর স্বরে কহিতে লাগিল, "প্রভু, আমি আপনার রূপ-গুণ দেখিয়া পাগল হইয়াছি। কিন্তু আমাকে কুলটা বিবেচনা করিবেন না। আমি আপনাকে দেখিলেই সুখী হই। এ জন্য আপনি আমার ঘরে বসিতে চাহিলে বারণ করিতে পারি নাই—কিন্তু অবলা স্ত্রীজাতি—আমি বারণ করিতে পারি নাই বলিয়া কি আপনার বসা উচিত হইয়াছে? আপনি মহা পাপিষ্ঠ, এই ছলে ঘরে প্রবেশ করিয়া আমার সর্ব্বনাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এখনি আপনি এখান হইতে যান।"

দেবেন্দ্র আর এক ঢোক পান করিয়া বলিলেন, "ভাল, ভাল। হীরে, তুমি ভাল বক্তৃতা করিয়াছ। আমাদের ব্রাহ্মসমাজে একদিন বক্তৃতা দিবে?"

হীরা এই উপহাসে মর্ম্মপীড়িতা হইয়া, রোষ-দাতরস্বরে কহিল, "আমি আপনার উপহাসের যোগ্য নই—আপনাকে অতি অধম লোকে ভাল-বাসিলেও, তাহার ভালবাসা লইয়া তামাসা করা ভাল নয়। আমি ধার্ম্মিক নহি, ধর্ম্ম বুঝি না—ধর্ম্মে আমার মন নাই। তবে যে আমি কুলটা নই বলিয়া স্পর্দ্ধা করিলাম, তাহার কারণ এই, আমার মনে মনে প্রতিজ্ঞা আছে, আপনার ভাল-বাসার লোভে পড়িয়া কলঙ্ক কিনিব না। যদি আপনি আমাকে একটুকুও ভালবাসিতেন, তাহা হইলে আমি এ প্রতিজ্ঞা করিতাম না—আমার ধর্ম্মজ্ঞান নাই, ধর্ম্মে ভক্তি নাই—আমি আপনার ভালবাসার তুলনায় কলঙ্ককে তৃণজ্ঞান করি। কিন্তু আপনি যেখানে ভালবাসেন না—সেখানে কি সুখের জন্য কলঙ্ক কিনিব? কিসের লোভে আমার গৌরব ছাড়িব? আপনি যুবতী স্ত্রী হাতে পাইলে কখন ছাড়েন না, এ জন্য আমার পূজা গ্রহণ করিলেও করিতে পারেন, কিন্তু কালে আমাকে হয়ত ভুলিয়া যাইবেন, নয়ত যদি মনে রাখেন, তবে আমার কথা লইয়া দলবলের কাছে উপহাস করিবেন—এমন স্থানে কেন আমি আপনার বাঁদী হইব? কিন্তু যে দিন আপনি আমাকে ভালবাসিবেন, সেই দিন আপনার দাসী হইয়া চরণ সেবা করিব।"

দেবেন্দ্র হীরার মুখে এই তিন প্রকার কথা শুনিলেন। তাহার চিত্তের অবস্থা বুঝিলেন। মনে

মনে ভাবিলেন, "আমি তোমাকে চিনিলাম, এখন কলে নাচাইতে পারি। যে দিন মনে করিব, সেই দিন তোমার দ্বারা কার্য্যোদ্ধার করিব।" এই ভাবিয়া চলিয়া গেলেন।

দেবেন্দ্র হীরার সম্পূর্ণ পরিচয় পান নি।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

খোস-খবর

বেলা দুই প্রহর। শ্রীশ বাবু আপিসে বাহির হইয়াছেন। বাটীর লোকজন সব আহারান্তে নিদ্রা যাইতেছে। বৈঠকখানায় চাবী বন্ধ—একটা দো-আসলাগোছ টেরিয়র বৈঠকখানার বাহিরে পাপোসের উপর পায়ের ভিতর মাথা রাখিয়া ঘুমাইতেছে। অবকাশ পাইয়া কোন প্রেমময়ী চাকরাণী কোন রসিক চাকরের নিকট বসিয়া গোপনে তামাকু খাইতেছে, আর ফিস্ ফিস্ করিয়া বকিতেছে। কমলমণি শয্যাগৃহে বসিয়া পা ছড়াইয়া সূচীহস্তে কার্পেট তুলিতেছে,—কেশ-বেশ একটু আলুথালু। কোথায় কেহ নাই, কেবল কাছে সতীশ বাবু বসিয়া মুখে অনেক প্রকার শব্দ করিতেছেন এবং বুকে লাল ফেলিতেছেন। সতীশ বাবু প্রথমে মাতার নিকট হইতে উলগুলি অপহরণ করিবার যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু পাহারা বড় কড়াকড় দেখিয়া একটা মৃন্ময় ব্যাঘ্রের মুণ্ডলেহনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। দূরে একটা বিড়াল থাবা পাতিয়া বসিয়া, উভয়কে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল; তাহার ভাব অতি গম্ভীর; মুখে বিশেষ বিজ্ঞতার লক্ষণ এবং চিত্ত চাঞ্চল্যশূন্য। বোধ হয়, বিড়াল ভাবিতেছিল, "মানুষের দশা অতি ভয়ানক, সর্ব্বদা কার্পেটতোলা, পুতুল খেলা প্রভৃতি তুচ্ছ কাজে ইহাদের মন নিবিষ্ট, ধর্ম্মে কর্ম্মে মতি নাই, বিড়ালজাতির আহার যোগাইবার মন নাই, অতএব ইহাদের পরকালে কি হইবে?" অন্যত্র একটা টিকটিকি প্রাচীরাবলম্বন করিয়া ঊর্দ্ধমুখে একটি মক্ষিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছিল। সে-ও মক্ষিকাজাতির দুশ্চরিত্রের কথা মনে মনে আন্দোলন করিতেছিল, সন্দেহ নাই। একটি প্রজাপতি উড়িয়া বেড়াইতেছিল। সতীশ বাবু যেখানে বসিয়া সন্দেশ ভোজন করিয়াছিলেন, ঝাঁকে ঝাঁকে সেখানে মাছি বসিতেছিল—পিপীলিকারাও সারি দিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

ক্ষণকাল পরে টিকটিকি মক্ষিকাকে হস্তগত করিতে না পারিয়া অন্যদিকে সরিয়া গেল। বিড়ালও মনুষ্য-চরিত্র পরিবর্ত্তনের কোন লক্ষণ সম্প্রতি উপস্থিত না দেখিয়া, হাই তুলিয়া, ধীরে ধীরে অন্যত্র চলিয়া গেল। প্রজাপতি উড়িয়া বাহির হইয়া গেল। কমলমণিও বিরক্ত হইয়া কার্পেট রাখিলেন এবং সতু বাবুর সঙ্গে আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন।

কমলমণি বলিলেন, "অ, সতু বাবু, মানুষে আপিসে যায় কেন বলিতে পার?" সতু বাবু বলিলেন, "ইলি—লি—ল্লি।"

কম। সতু বাবু, কখনও আপিসে যেও না।

সতু বলিল, "হাম্!"

কমলমণি বলিলেন, "তোমার হাম্ করার ভাবনা কি? তোমার হাম্ করার জন্য আপিসে যেতে হবে না। আপিসে যেও না—আপিসে গেলে বৌ দুপুর বেলা বসে কাঁদবে।"

সতু বাবু বৌ কথাটা বুঝিলেন, কেন না, কমলমণি সর্ব্বদা তাহাকে ভয় দেখাইতেন যে, বৌ আসিয়া মারিবে। সতু বাবু এবার উত্তর করিলেন, "বৌ মাবে।"

কমল বলিলেন, "মনে থাকে যেন, আপিসে গেলে বৌ মারিবে।"

এইরূপ কথোপকথন কতক্ষণ চলিতে পারিত, তাহা বলা যায় না, কেন না এই সময়ে এক জন দাসী ঘুমে চোখ মুছিতে মুছিতে আসিয়া একখানি পত্র আনিয়া কমলের হাতে দিল। কমল দেখিলেন, সূর্য্যমুখীর পত্র। খুলিয়া পড়িলেন। পড়িয়া আবার পড়িলেন। আবার পড়িয়া বিষণ্ণ মনে মৌনী হইয়া বসিলেন। পত্র এইরূপ।

"প্রিয়তমে! তুমি কলিকাতায় গিয়া পর্য্যন্ত আমাদের ভুলিয়া গিয়াছ—নহিলে একখান বই পত্র লিখিলে না কেন? তোমার সংবাদের জন্য আমি সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকি, জান না?

"তুমি কুন্দনন্দিনীর কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তাহাকে পাওয়া গিয়াছে—শুনিয়া সুখী হইবে—ষষ্ঠী দেবতার পূজা দিও। তাহা ছাড়া আরও একটা খোসখবর আছে—কুন্দের সঙ্গে আমার স্বামীর বিবাহ হইবে—এ বিবাহে আমিই ঘটক। বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রে আছে—তবে দোষ কি? দুই এক দিনের মধ্যে বিবাহ হইবে। তুমি আসিয়া জুটিতে পারিবে না—নচেৎ তোমাকে নিমন্ত্রণ করিতাম। পার যদি, তবে ফুলশয্যার সময়ে আসিও।

কেন না, তোমাকে দেখিতে বড় সাধ হইয়াছে।"

কমলমণি পত্রের কিছুই অর্থ বুঝিতে পারিলেন না। ভাবিয়া চিন্তিয়া সতীশ বাবুকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। সতীশ বাবু সম্মুখে একখানা বাঙ্গলা কেতাব পাইয়া, তাহার কোণ খাইতেছিল, কমলমণি তাহাকে পত্রখানি পড়িয়া শুনাইলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, "এর মানে কি, বল দেখি সতু বাবু?" সতু বাবু রস বুঝিলেন, মাতার হাতের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া কমলমণির নাসিকা-ভোজনে প্রবৃত্ত হইলেন। সুতরাং কমলমণি সূর্য্যমুখীকে ভুলিয়া গেলেন। সতু বাবুর নাসিকা-ভোজন সমাপ্ত হইলে কমলমণি আবার সূর্য্যমুখীর পত্র পড়িতে লাগিলেন। মনে মনে বলিলেন, "এ সতু বাবুর কর্ম্ম নয়, এ আমার সেই মন্ত্রীটি নহিলে হইবে না। মন্ত্রীর আপিস কি ফুরায় না? সতু বাবু, আজ এস, আমরা রাগ করিয়া থাকি।"

যথাসময়ে মন্ত্রিবর শ্রীশচন্দ্র আপিস হইতে আসিয়া ধড়াচূড়া ছাড়িলেন। কমলমণি তাঁহাকে জল খাওয়াইয়া শেষে সতীশকে লইয়া রাগ করিয়া গিয়া খাটের উপর শুইলেন। শ্রীশচন্দ্র রাগ দেখিয়া হাসিতে হাসিতে হুঁকা লইয়া দূরে কৌচের উপর বসিলেন। হুঁকাকে সাক্ষী করিয়া বলিলেন, "হে হুঁকে! তুমি পেটে ধর গঙ্গাজল, মাথায় ধর আগুন! তুমি সাক্ষী, যারা আমার উপর রাগ করেছে, তারা এখনি আমার সঙ্গে কথা কবে—কবে—কবে। নহিলে আমি তোমার মাথায় আগুন দিয়া এইখানে বসিয়া দশ ছিলিম তামাক পোড়াব!" শুনিয়া কমলমণি উঠিয়া বসিয়া মধুর কোপে নীলোৎপল তুল্য চক্ষু ঘুরাইয়া বলিলেন, "আর দশ ছিলিম তামাক টানে না! এক ছিলিমের টানের জ্বালায় আমি একটি কথা কহিতে পাই না—আবার দশ ছিলিম তামাক খায়—আমি আর কি ভেসে এয়েছি।" এই বলিয়া শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিলেন এবং হুঁকা হইতে ছিলিম তুলিয়া লইয়া সাগ্নিক তামাকু-ঠাকুরকে বিসর্জ্জন দিলেন।

এইরূপে কমলমণির দুর্জ্জয় মানভঞ্জন হইলে তিনি মানের কারণের পরিচয় দিয়া সূর্য্যমুখীর পত্র পড়িতে দিলেন এবং বলিলেন, "ইহার অর্থ করিয়া দাও, তা নইলে আজ মন্ত্রিবরের মাহিয়ানা কাটিব।"

শ্রীশ। বরং আগাম মাহিয়ানা দাও—অর্থ করিব।

কমলমণি শ্রীশচন্দ্রের মুখের কাছে মুখ আনিলেন, শ্রীশচন্দ্র মাহিয়ানা আদায় করিলেন। তখন পত্র পড়িয়া বলিলেন, "এটা তামাসা।"

কম। কোন্‌টা তামাসা? তোমার কথাটা, না পত্রখানা?

শ্রীশ। পত্রখানা।

কম। আজি মন্ত্রিমশাইকে ডিস্চার্জ্জ করিব। ঘটে এ বুদ্ধিটুকুও নাই? মেয়েমানুষে কি এমন তামাসা মুখে আনিতে পারে?

শ্রীশ। তবে যা তামাসা ক'রে পারে না, তা সত্য সত্য পারে?

কম। প্রাণের দায়ে পারে। আমার বোধ হয়, এ সত্য।

শ্রীশ। সে কি? সত্য সত্য?

কম। মিথ্যা বলি ত কমলমণির মাথা খাই।

শ্রীশচন্দ্র কমলের গাল টিপিয়া দিলেন। কমল বলিলেন, "আচ্ছা, মিথ্যা বলি ত কমলমণির সতীনের মাথা খাই।"

শ্রীশ। তা হ'লে কেবল উপবাস করিতে হইবে।

কম। ভাল, কারু মাথা নাই খেলাম, এখন বিধাতা বুঝি সূর্য্যমুখীর মাথা খায়। দাদা বুঝি জোর ক'রে বিয়ে করতেছে।

শ্রীশচন্দ্র বিমনা হইলেন। বলিলেন, "আমি কিছু বুঝিতে পারিতেছি না। নগেন্দ্রকে পত্র লিখিব? কি বল?"

কমলমণি তাহাতে সম্মত হইলেন। শ্রীশচন্দ্র ব্যঙ্গ করিয়া পত্র লিখিলেন। নগেন্দ্র প্রত্যুত্তরে যাহা লিখিলেন, তাহা এই;—

"ভাই! আমাকে ঘৃণা করিও না,—অথবা সে ভিক্ষাতেই বা কাজ কি? ঘৃণাস্পদকে অবশ্য ঘৃণা করিবে। আমি এ বিবাহ করিব। যদি পৃথিবীর সকলে আমাকে ত্যাগ করে, তথাপি আমি বিবাহ করিব। নচেৎ আমি উন্মাদগ্রস্ত হইব—তাহার বড় বাকিও নাই।

"এ কথা বলার পর আর বোধ হয়, কিছু বলিবার আবশ্যক করে না। তোমরাও বোধ হয় ইহার পর আমাকে নিবৃত্ত করিবার জন্য কোন কথা বলিবে না। যদি বল, তবে আমিও তর্ক করিতে প্রস্তুত আছি।

"যদি কেহ বলে যে, বিধবা-বিবাহ হিন্দুধর্ম্ম-বিরুদ্ধ, তাহাকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রবন্ধ পড়িতে দিই। যেখানে তাদৃশ শাস্ত্রবিশারদ মহামহোপাধ্যায় বলেন যে, বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রসম্মত, তখন কে ইহা অশাস্ত্র বলিবে? আর যদি বল, শাস্ত্রসম্মত হইলেও ইহা সমাজসম্মত নহে, আমি এ বিবাহ করিলে সমাজচ্যুত হইব, তাহার উত্তর, এ গোবিন্দপুরে আমাকে সমাজচ্যুত করে, কার সাধ্য? যেখানে আমিই সমাজ, সেখানে আমার আবার সমাজচ্যুতি কি? তথাপি আমি তোমাদিগের মনোরক্ষার্থ এ বিবাহ গোপনে রাখিব—আপাততঃ কেহ জানিবে না।

"তুমি এ সকল আপত্তি করিবে না। তুমি বলিবে, দুই বিবাহ নীতিবিরুদ্ধ কাজ। ভাই, কিসে জানিলে ইহা নীতিবিরুদ্ধ কাজ? তুমি এ কথা ইংরেজের কাছে শিখিয়াছ, নচেৎ ভারতবর্ষে এ কথা ছিল না। কিন্তু ইংরেজরা কি অভ্রান্ত? য়িহুদীর বিধি আছে বলিয়া ইংরেজদিগের এ সংস্কার—কিন্তু তুমি আমি য়িহুদী-বিধি ঈশ্বরবাক্য বলিয়া মানি না। তবে কি হেতুতে এক পুরুষের দুই বিবাহ নীতিবিরুদ্ধ বলিব?

"তুমি বলিবে, যদি এক পুরুষের দুই স্ত্রী হইতে পারে, তবে এক স্ত্রীর দুই স্বামী হয় না কেন? উত্তর—এক স্ত্রীর দুই স্বামী হইলে অনেক অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা; এক পুরুষের দুই বিবাহে তাহার সম্ভাবনা নাই। এক স্ত্রীর দুই স্বামী হইলে সন্তানের পিতৃনিরূপণ হয় না—পিতাই সন্তানের পালনকর্ত্তা—তাহার অনিশ্চয়ে সামাজিক বিশৃঙ্খলতা জন্মিতে পারে। কিন্তু পুরুষের দুই বিবাহে সন্তানের মাতার অনিশ্চয়তা জন্মে না। ইত্যাদি আরও অনেক কথা বলা যাইতে পারে।

"যাহা অধিকাংশ লোকের অনিষ্টকারক, তাহাই নীতিবিরুদ্ধ। তুমি যদি পুরুষের দুই বিবাহ নীতিবিরুদ্ধ বিবেচনা কর, তবে দেখাও যে, ইহা অধিকাংশ লোকের অনিষ্টকর।

"গৃহে কলহাদির কথা বলিয়া তুমি আমাকে যুক্তি দিবে। আমি একটা যুক্তির কথা বলিব। আমি নিঃসন্তান, আমি মরিয়া গেলে, আমার পিতৃকুলের নাম লুপ্ত হইবে। আমি এ বিবাহ করিলে সন্তান হইবার সম্ভাবনা—ইহা কি অযুক্তি?

"শেষ আপত্তি—সূর্য্যমুখী। স্নেহময়ী পত্নীর সপত্নীর কণ্টক করি কেন? উত্তর—সূর্য্যমুখী এ বিবাহে দুঃখিতা নহেন, তিনিই বিবাহের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন—তিনিই ইহাতে আমাকে প্রবৃত্ত করিয়াছেন—তিনিই ইহাতে উদ্যোগী। তবে আর কার আপত্তি?

"তবে কোন্ কারণে আমার এ বিবাহ নিন্দনীয়?"

—

বঙ্গ বিংশ

কাহার আপত্তি?

কমলমণি পত্র পড়িয়া বলিলেন,—"কোন্ কারণে নিন্দনীয়? জগদীশ্বর জানেন, কিন্তু কি ভ্রম! পুরুষে বুঝি কিছুই বুঝে না। যা হৌক, মন্ত্রিবর, আপনি সজ্জা করুন। আমাদিগের গোবিন্দপুরে যাইতে হইবে।"

শ্রীশ। তুমি কি বিবাহ বন্ধ করিতে পারিবে?

কমল। না পারি, দাদার সম্মুখে মরিব।

শ্রীশ। তা পারিবে না। তবে নূতন ভাইজের নাক কাটিয়া আনিতে পারিবে। চল, সেই উদ্দেশ্যে যাই।

তখন উভয়ে গোবিন্দপুর যাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। পরদিন প্রাতে তাঁহারা নৌকারোহণে গোবিন্দপুর যাত্রা করিলেন। যথাকালে তথায় উপস্থিত হইলেন।

বাটীতে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই দাসীদিগের এবং পল্লীস্থ স্ত্রীলোকদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইল, অনেকেই কমলমণিকে নৌকা হইতে লইতে আসিল। বিবাহ হইয়া গিয়াছে কি না জানিবার জন্য তাঁহার ও তাঁহার স্বামীর নিতান্ত ব্যগ্রতা জন্মিয়াছিল, কিন্তু দুই জনের কেহই এ কথা কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিলেন না—এ লজ্জার কথা কি প্রকারে অপর লোককে মুখ ফুটিয়া জিজ্ঞাসা করেন?

অতি ব্যস্তে কমলমণি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন; এবার সতীশ যে পশ্চাৎ পড়িয়া রহিল, তাহা ভুলিয়া গেলেন। বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া স্পষ্টস্বরে সাহসশূন্য হইয়া দাসীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "সূর্য্যমুখী কোথায়?" মনে ভয়, পাছে কেহ বলিয়া ফেলে যে, বিবাহ হইয়া গিয়াছে—পাছে কেহ বলিয়া ফেলে, সূর্য্যমুখী মরিয়াছে।

দাসীরা বলিয়া দিল, সূর্য্যমুখী শয়নগৃহে আছেন। কমলমণি ছুটিয়া শয়নগৃহে গেলেন।

প্রবেশ করিয়া প্রথমে কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। মুহূর্ত্তকাল ইতস্তত: নিরীক্ষণ করিলেন; শেষে দেখিতে পাইলেন, ঘরের কোণে এক রুদ্ধ গবাক্ষসন্নিধানে অধোবদনে একটি স্ত্রীলোক বসিয়া আছে। কমলমণি তাহার মুখ দেখিতে পাইলেন না; কিন্তু চিনিলেন যে, সূর্য্যমুখী। পরে সূর্য্যমুখী তাহার পদধ্বনি শুনিতে পাইয়া উঠিয়া কাছে আসিলেন। সূর্য্যমুখীকে দেখিয়া, কমলমণি, বিবাহ হইয়াছে কি না, জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না:—সূর্য্যমুখীর কাঁধের হাড় উঠিয়া পড়িয়াছে, নবদেবদারুতুল্য সূর্য্যমুখীর দেহতরু ধনুকের মত ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, সূর্য্যমুখীর প্রফুল্ল পদ্মপলাশচক্ষু কোটরে পড়িয়াছে, সূর্য্যমুখীর পদ্মমুখ দীর্ঘাকৃতি হইয়াছে। কমলমণি বুঝিলেন যে, বিবাহ হইয়া গিয়াছে;—জিজ্ঞাসা করিলেন, "কবে হলো?" সূর্য্যমুখী সেইরূপ মৃদুস্বরে বলিলেন "কাল।"

তখন দুই জনে সেইখানে বসিয়া নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন—কেহ কিছু বলিলেন না। সূর্য্যমুখী কমলের কোলে মাথা লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন, কমলমণির চক্ষের জল তাঁহার বক্ষে ও কেশের উপর পড়িতে লাগিল।

তখন নগেন্দ্র বৈঠকখানায় বসিয়া কি ভাবিতেছিলেন? ভাবিতেছিলেন, "কুন্দনন্দিনী! কুন্দ আমার! কুন্দ আমার স্ত্রী! কুন্দ! কুন্দ! কুন্দ! সে আমার!" কাছে শ্রীশচন্দ্র আসিয়া বসিয়াছিলেন—ভাল করিয়া তাঁহার সঙ্গে কথা কহিতে পারিতেছিলেন না। এক একবার মনে পড়িতেছিল "সূর্য্যমুখী উদ্যোগী হইয়া বিবাহ দিয়াছে, তবে আমার এ সুখে আর কাহার আপত্তি?"

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

সূর্য্যমুখী ও কমলমণি

যখন প্রদোষে, উভয়ে উভয়ের নিকট স্পষ্ট করিয়া কথা কহিতে সমর্থ হইলেন, তখন সূর্য্যমুখী কমলমণির কাছে নগেন্দ্র ও কুন্দনন্দিনীর বিবাহ-বৃত্তান্তের আমূল পরিচয় দিলেন। শুনিয়া কমলমণি বিস্মিতা হইয়া বলিলেন, "এ বিবাহ তোমার যত্নেই হইয়াছে—কেন তুমি আপনার মৃত্যুর উদ্যোগ আপনি করিলে?"

সূর্য্যমুখী হাসিয়া বলিলেন, "আমি কে?"—মৃদু ক্ষীণ হাসি হাসিয়া উত্তর করিলেন—বৃষ্টির পর আকাশপ্রান্তে ছিন্ন মেঘে যেমন বিদ্যুৎ হয়, সেইরূপ হাসি হাসিয়া উত্তর করিলেন,—"আমি কে? একবার তোমার ভাইকে দেখিয়া আইস—সে মুখভরা আহ্লাদ দেখিয়া আইস; তখন জানিবে, তিনি আজ কত সুখে সুখী। তাঁহার সুখ যদি আমি চক্ষে দেখিলাম, তবে কি আমার জীবন সার্থক হইল না? কোন্ সুখের আশায় তাঁকে অসুখী রাখিব? যাঁহার এক দণ্ডের অসুখ দেখিলে মরিতে ইচ্ছা করে, দেখিলাম, দিবারাত্র তাঁর মর্ম্মান্তিক অসুখ—তিনি সকল সুখ বিসর্জ্জন দিয়া দেশত্যাগী হইবার উদ্যোগ করিলেন—তবে আমার সুখ কি হইল? বলিলাম, প্রভু! তোমার সুখই আমার সুখ—তুমি কুন্দকে বিবাহ কর—আমি সুখী হইব,—তাই বিবাহ করিয়াছেন।"

কমল। আর তুমি সুখী হইয়াছ?

সূর্য্য। আবার আমার কথা কেন জিজ্ঞাসা কর? আমি কে? যদি কখনও স্বামীর পায়ে কাঁকর ফুটিয়াছে দেখিয়াছি, তখনই মনে হইয়াছে যে, আমি এখানে বুক পাতিয়া দিই নাই কেন, স্বামী আমার বুকের উপর পা রাখিয়া যাইতেন।

বলিয়া সূর্য্যমুখী ক্ষণকাল নীরবে রহিলেন—তাঁহার চক্ষের জলে বসন ভিজিয়া গেল;—পরে সহসা মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কমল, কোন্ দেশে মেয়ে হলে মেরে ফেলে?"

কমল মনের ভাব বুঝিয়া বলিলেন, "মেয়ে হ'লেই কি হয়? যার যেমন কপাল, তার তেমনই ঘটে।"

সূ। আমার কপালের চেয়ে কার কপাল ভাল? কে এমন ভাগ্যবতী? কে এমন স্বামী পেয়েছে? রূপ, ঐশ্বর্য্য, সম্পদ—সে সকল ত তুচ্ছ কথা—এত গুণ কার স্বামীর? আমার কপাল, জোর কপাল—তবে কেন এমন হইল?

কমল। এও কপাল!

সূ। তবে এ জ্বালায় মন পোড়ে কেন?

কমল। তুমি স্বামীর আজিকার আহ্লাদপূর্ণ মুখ দেখিয়া সুখী—তথাপি বলিতেছ, এ জ্বালায় মন পোড়ে কেন? দুই কথাই কি সত্য?

সূ। দুই কথাই সত্য। আমি তাঁর সুখে সুখী—কিন্তু আমায় যে তিনি পায়ে ঠেলিলেন, আমায় পায়ে ঠেলিয়াছেন বলিয়াই তাঁর এত আহ্লাদ!—

সূর্য্যমুখী আর বলিতে পারিলেন না, কণ্ঠ রুদ্ধ হইল—চক্ষু ভাসিয়া গেল, কিন্তু সূর্য্যমুখীর অসমাপ্ত কথার মর্ম্ম কমলমণি সম্পূর্ণ বুঝিয়াছিলেন। বলিলেন, "তোমার পায়ে ঠেলেছেন বলে তোমার অন্তর্দাহ হতেছে। তবে কেন বল, 'আমি কে?' তোমার অন্তঃকরণের আধখানা আজও 'আমি'তে ভরা; নহিলে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াও অনুতাপ করিবে কেন?"

সূ। অনুতাপ করি না। ভালই করিয়াছি, ইহাতে আমার কোন সংশয় নাই। কিন্তু মরণের ত যন্ত্রণা আছেই। আমার মরণই ভাল বলিয়া আপনার হাতে আপনি মরিলাম। কিন্তু তাই বলিয়া মরণের সময় কি তোমার কাছে কাঁদিব না?

সূর্য্যমুখী কাঁদিলেন। কমল তাঁহার মাথা আপন হৃদয়ে আনিয়া হাত দিয়া ধরিয়া রাখিলেন। কথায় সকল কথা ব্যক্ত হইতেছিল না—কিন্তু অন্তরে অন্তরে কথোপকথন হইতেছিল। অন্তরে অন্তরে কমলমণি বুঝিতেছিলেন যে, সূর্য্যমুখী কত দুঃখী। অন্তরে অন্তরে সূর্য্যমুখী বুঝিয়াছিলেন যে, কমলমণি তাঁহার দুঃখ বুঝিতেছেন।

উভয়ে রোদন সংবরণ করিয়া চক্ষু মুছিলেন। সূর্য্যমুখী তখন আপনার কথা ত্যাগ করিয়া অন্যান্য কথা পাড়িলেন। সতীশচন্দ্রকে আনাইয়া আদর করিলেন, এবং তাহার সঙ্গে কথোপকথন করিলেন। কমলের সঙ্গে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সতীশ-শ্রীশচন্দ্রের কথা কহিলেন। সতীশচন্দ্রের বিদ্যাশিক্ষা, বিবাহ ইত্যাদি বিষয়ে অনেক সুখের কথার আলোচনা হইল। এইরূপ গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত উভয়ে কথোপকথন করিয়া সূর্য্যমুখী কমলকে স্নেহভরে আলিঙ্গন করিলেন, এবং সতীশচন্দ্রকে ক্রোড়ে লইয়া মুখচুম্বন করিলেন। উভয়কে বিদায় দিবার কালে সূর্য্যমুখীর চক্ষের জল আবার অসংবরণীয় হইল। রোদন করিতে করিতে তিনি সতীশকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, "বাবা! আশীর্ব্বাদ করি, যেন মামার মত অক্ষয় গুণে গুণবান্ হও, ইহার বাড়া আশীর্ব্বাদ আর আমি জানি না।"

সূর্য্যমুখী স্বাভাবিক মৃদুস্বরে কথা কহিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার কণ্ঠস্বরের ভঙ্গীতে কমলমণি চমকিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "বউ! তোমার মনে কি হইতেছে—কি? বল না?"

সূ। কিছু না।

কম। আমার কাছে লুকাইও না।

সূ। তোমার কাছে লুকাইবার আমার কোন কথাই নাই।

কমল তখন স্বচ্ছন্দচিত্তে শয়নমন্দিরে গেলেন। কিন্তু সূর্য্যমুখীর একটি লুকাইবার কথা ছিল। তাহা কমল প্রাতে জানিতে পারিলেন। প্রাতে সূর্য্যমুখীর সন্ধানে তাঁহার শয্যাগৃহে গিয়া দেখিলেন, সূর্য্যমুখী তথায় নাই, কিন্তু অভুক্ত শয্যার উপরে একখানি পত্র পড়িয়া আছে। পত্র দেখিয়াই কমলমণির মাথা ঘুরিয়া গেল—পত্র পড়িতে হইল না—না পড়িয়াই সকল বুঝিলেন। বুঝিলেন, সূর্য্যমুখী পলায়ন করিয়াছেন। পত্র খুলিয়া পড়িতে ইচ্ছা হইল না—তাহা করতলে বিমর্দ্দিত করিলেন। কপালে করাঘাত করিয়া শয্যায় বসিয়া পড়িলেন। বলিলেন, "আমি পাগল! নচেৎ কা'ল ঘরে যাইবার সময় বুঝিয়াও বুঝিলাম না কেন?" সতীশ নিকটে দাঁড়াইয়া ছিল। মার কপালে করাঘাত ও রোদন দেখিয়া সেও কাঁদিতে লাগিল।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

আশীর্ব্বাদ-পত্র

শোকের প্রথম বেগ সংবরণ হইলে কমলমণি পত্র খুলিয়া পড়িলেন। পত্রখানির শিরোনামায় তাঁহারই নাম। পত্র এইরূপ:—

"যে দিন স্বামীর মুখে শুনিলাম যে, আমাতে আর তাঁর কিছুমাত্র সুখ নাই, তিনি কুন্দনন্দিনীর জন্য উন্মাদগ্রস্ত হইবেন, অথবা প্রাণত্যাগ করিবেন, সেই দিনই মনে মনে সঙ্কল্প করিলাম, যদি কুন্দনন্দিনীকে আবার কখনও পাই, তবে তাহার হাতে স্বামীকে সমর্পণ করিয়া তাঁহাকে সুখী করিব। কুন্দনন্দিনীকে স্বামী দান করিয়া আপনি গৃহত্যাগ করিয়া যাইব; কেন না, আমার স্বামী কুন্দনন্দিনীর হইলেন, ইহা চক্ষে দেখিতে পারিব না। এখন কুন্দনন্দিনীকে পুনর্ব্বার পাইয়া তাহাকে স্বামী দান করিলাম। আপনিও গৃহত্যাগ করিয়া চলিলাম।

"কালি বিবাহ হইবার পরেই আমি রাত্রে গৃহত্যাগ করিয়া যাইতাম; কিন্তু স্বামীর যে সুখের কামনায় আপনার প্রাণ আপনিই বধ করিলাম, সে সুখ দুই এক দিন চক্ষে দেখিয়া যাইবার সাধ ছিল। আর তোমাকে আসিতে লিখিয়াছিলাম—তুমি অবশ্য আসিবে, জানিতাম।

এখন উভয় সাধ পরিপূর্ণ হইয়াছে। আমার যিনি প্রাণাধিক, তিনি সুখী হইয়াছেন, ইহা দেখিয়াছি। তোমার নিকট বিদায় লইয়াছি। আমি এখন চলিলাম।

"তুমি যখন এই পত্র পাইবে, তখন আমি অনেক দূর যাইব। তোমাকে যে বলিয়া আসিলাম না, তাহার কারণ এই যে, তাহা হইলে তুমি আসিতে দিতে না। এখন তোমাদের কাছে আমার এই ভিক্ষা যে, তোমরা আমার সন্ধান করিও না।

"আর যে তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে, এমন ভরসা নাই। কুন্দনন্দিনী থাকিতে আমি আর এ দেশে আসিব না এবং আমার সন্ধানও পাইবে না। আমি এখন পথের কাঙ্গালিনী হইলাম—ভিখারিণীবেশে দেশে দেশে ফিরিব—ভিক্ষা করিয়া দিনপাত করিব—আমাকে কে চিনিবে? আমি টাকা-কড়ি সঙ্গে লইলে লইতে পারিতাম, কিন্তু প্রবৃত্তি হইল না। আমার স্বামী আমি ত্যাগ করিয়া চলিলাম—সোণা-রূপা সঙ্গে লইয়া যাইব?

"তুমি আমার একটি কাজ করিও। আমার স্বামীর চরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম জানাইও। আমি তাঁহাকে পত্র লিখিয়া যাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলাম, কিন্তু পারিলাম না। চক্ষের জলে অক্ষর দেখিতে পাইলাম না—কাগজ ভিজিয়া নষ্ট হইল। কাগজ ছিঁড়িয়া ফেলিয়া আবার লিখিলাম—আবার ছিঁড়িলাম—আবার লিখিলাম—কিন্তু আমার বলিবার যে কথা আছে, তাহা কোন পত্রেই বলিতে পারিলাম না। কথা বলিতে পারিলাম না বলিয়া তাঁহাকে পত্র লেখা হইল না। তুমি যেমন করিয়া ভাল বিবেচনা কর, তেমনি করিয়া আমার এ সংবাদ তাঁহাকে দিও। তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিও যে, তাঁহার উপর রাগ করিয়া আমি দেশান্তরে চলিলাম না। তাঁহার উপর আমার রাগ নাই; কখনও তাঁহার উপর রাগ করি নাই; কখনও করিব না। যাঁহাকে মনে হইলে আহ্লাদ হয়, তাঁহার উপর কি রাগ হয়? তাঁহার উপর যে অচলা ভক্তি, তাহাই রহিল,—যত দিন না মাটিতে এ মাটি মিশে, তত দিন থাকিবে। কেন না, তাঁহার সহস্র গুণ আমি কখনও ভুলিতে পারিব না। এত গুণ কাহারও নাই। এত গুণ কাহারও নাই বলিয়াই আমি তাঁর দাসী। এক দোষে যদি তাঁহার সহস্র গুণ ভুলিতে পারিতাম, তবে আমি তাঁহার দাসী হইবার যোগ্যা নহি। তাঁহার নিকট আমি জন্মের মত বিদায় লইলাম। জন্মের মত স্বামীর কাছে বিদায় লইলাম, ইহাতেই জানিতে পারিবে যে, আমি কত দুঃখে সর্ব্বত্যাগিনী হইতেছি।

"তোমার কাছে জন্মের মত বিদায় লইলাম,—আশীর্ব্বাদ করি, তোমার স্বামী-পুত্র দীর্ঘজীবী হউক, তুমি চিরসুখী হও, আরও আশীর্ব্বাদ করি যে, যে দিন তুমি স্বামীর প্রেমে বঞ্চিত হইবে, সেই দিন যেন তোমার আয়ুঃশেষ হয়। আমায় এ আশীর্ব্বাদ কেহ করে নাই।"

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

বিষবৃক্ষ কি?

যে বিষবৃক্ষের বীজবপন হইতে ফলোৎপত্তি এবং ফলভোগ পর্য্যন্ত ব্যাখ্যানে আমরা প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহা সকলেরই গৃহপ্রাঙ্গণে রোপিত আছে। রিপুর প্রাবল্য ইহার বীজ; ঘটনাধীনে তাহা সকল ক্ষেত্রে উপ্ত হইয়া থাকে। কেহই এমন মনুষ্য নাই যে, তাঁহার চিত্ত রাগ-দ্বেষ-কাম-ক্রোধাদির অস্পৃশ্য। জ্ঞানী ব্যক্তিরাও ঘটনাধীনে সেই সকল রিপু কর্ত্তৃক বিচলিত হইয়া থাকেন। কিন্তু মনুষ্যে মনুষ্যে প্রভেদ এই যে, কেহ আপন উচ্ছলিত মনোবৃত্তি সকল সংযত করিতে পারেন এবং করিয়া থাকেন,—সেই ব্যক্তি মহাত্মা; কেহ বা আপন চিত্ত সংযত করে না,—তাহারই জন্য বিষবৃক্ষের বীজ উপ্ত হয়। চিত্তসংযমের অভাবই ইহার অঙ্কুর, তাহাতেই এ বৃক্ষের বৃদ্ধি। এই বৃক্ষ মহা তেজস্বী, একবার ইহার পুষ্টি হইলে আর নাশ নাই। এবং ইহার শোভা অতিশয় নয়ন-প্রীতিকর; দূর হইতে ইহার বিবিধবর্ণ পল্লব ও সমুৎফুল্ল মুকুলদাম দেখিতে অতি রমণীয়। কিন্তু ইহার ফল বিষময়; যে খায়, সেই মরে।

ক্ষেত্রভেদে, বিষবৃক্ষে নানাবিধ ফল ফলে। পাত্র-বিশেষে, বিষবৃক্ষে রোগশোকাদি নানাবিধ ফল। চিত্তসংযমপক্ষে প্রথমতঃ চিত্তসংযমে প্রবৃত্তি, দ্বিতীয়তঃ চিত্তসংযমের শক্তি আবশ্যক। ইহার মধ্যে শক্তি প্রকৃতিজন্যা; প্রবৃত্তি শিক্ষাজন্যা। প্রকৃতিও শিক্ষার উপর নির্ভর করে। সুতরাং চিত্তসংযম পক্ষে শিক্ষাই মূল। কিন্তু গুরূপদেশকে

কেবল শিক্ষা বলিতেছি না, অন্তঃকরণের পক্ষে দুঃখভোগই প্রধান শিক্ষা।

নগেন্দ্রের এ শিক্ষা কখনও হয় নাই। জগদীশ্বর তাঁহাকে সকল সুখের অধিপতি করিয়া পৃথিবীতে পাঠাইয়াছিলেন। কান্ত রূপ, অতুল ঐশ্বর্য্য, নীরোগ শরীর, সর্ব্বব্যাপিনী বিদ্যা, সুশীল চরিত্র, স্নেহময়ী সাধ্বী স্ত্রী;—এ সকল এক জনের ভাগ্যে প্রায় ঘটে না। নগেন্দ্রের এ সকলই ঘটিয়াছিল। প্রধানপক্ষে, নগেন্দ্র নিজ চরিত্রগুণেই চিরকাল সুখী; তিনি সত্যবাদী, অথচ প্রিয়ংবদ; পরোপকারী, অথচ ন্যায়নিষ্ঠ; দাতা, অথচ মিতব্যয়ী; স্নেহশীল, অথচ কর্ত্তব্যকর্ম্মে স্থির-সংকল্প। পিতামাতা বর্ত্তমান থাকিতে তাঁহাদিগের নিতান্ত ভক্ত এবং প্রিয়কারী ছিলেন; ভার্য্যার প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত ছিলেন; বন্ধুর হিতকারী; ভৃত্যের প্রতি কৃপাবান্; অনুগতের প্রতিপালক; শত্রুর প্রতি বিবাদশূন্য। তিনি পরামর্শে বিজ্ঞ; কার্য্যে সরল; আলাপে নম্র; রহস্যে বাগ্মী। এরূপ চরিত্রের পুরস্কারই অবিচ্ছিন্ন সুখ; নগেন্দ্রের আশৈশব তাহাই ঘটিয়াছিল। তাঁহার দেশে সম্মান বিদেশে যশঃ; অনুগত ভৃত্য; প্রজাগণের সন্নিধানে ভক্তি; সূর্য্যমুখীর নিকট অবিচলিত অপরিমিত অকলুষিত স্নেহরাশি। যদি তাঁহার কপালে এত সুখ না ঘটিত, তবে তিনি কখনও এত দুঃখী হইতেন না।

দুঃখী না হইলে লোভে পড়িতে হয় না। যাহার যাহাতে অভাব, তাহার তাহাতেই লোভ। কুন্দনন্দিনীকে লুব্ধলোচনে দেখিবার পূর্ব্বে নগেন্দ্র কখনও লোভে পড়েন নাই, কেন না, কখনও কিছুরই অভাব জানিতে পারেন নাই। সুতরাং লোভসংবরণ করিবার জন্য যে মানসিক অভ্যাস বা শিক্ষা আবশ্যক, তাহা তাঁহার হয় নাই। এই জন্যই তিনি চিত্তসংযমে প্রবৃত্ত হইয়াও সক্ষম হইলেন না। অবিচ্ছিন্ন সুখ দুঃখের মূল; পূর্ব্বগামী দুঃখ ব্যতীত স্থায়ী সুখ জন্মে না।

নগেন্দ্রের যে দোষ নাই, এমন বলি না। তাঁহার দোষ গুরুতর; প্রায়শ্চিত্তও গুরুতর আরম্ভ হইল।

—

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

অন্বেষণ

বলা বাহুল্য যে, যখন সূর্য্যমুখীর পলায়নের সংবাদ গৃহমধ্যে রাষ্ট্র হইল, তখন তাঁহার অন্বেষণে লোক পাঠাইবার বড় তাড়াতাড়ি পড়িয়া গেল। নগেন্দ্র চারিদিকে লোক পাঠাইলেন, শ্রীশচন্দ্র পাঠাইলেন, কমলমণি চারিদিকে লোক পাঠাইলেন। বড় বড় দাসীরা জলের কলসী ফেলিয়া ছুটিল; হিন্দুস্থানী দ্বারবানেরা বাঁশের লাঠি হাতে করিয়া তুলা ভরা ফরাসীর ছিটের মেরজাই গায়ে দিয়া, মস্ মস্ করিয়া নাগরা জুতার শব্দ করিয়া চলিল—খানসামারা গামছা কাঁধে গোট কাঁকালে মাতাঠাকুরাণীকে ফিরাতেই চলিল। কতকগুলি আত্মীয় লোক গাড়ী লইয়া বড় রাস্তায় গেল। গ্রামস্থ লোক মাঠে ঘাটে খুঁজিয়া দেখিতে লাগিল; কোথাও বা গাছতলায় কমিটী করিয়া তামাকু পোড়াইতে লাগল। ভদ্রলোকেরাও বারো-য়ারির আটচালায়, শিবের মন্দিরের রকে, ন্যায়-কচ্‌কচি ঠাকুরের টোলে এবং অন্যান্য তথাবিধ স্থানে বসিয়া ঘোঁট করিতে লাগিলেন। মাগী-ছাগী স্নানের ঘাটগুলাকে ছোট আদালত করিয়া তুলিল। বালক মহলে ঘোর পর্ব্বাহ বাধিয়া গেল, অনেক ছেলে ভরসা করিতে লাগিল, পাঠশালার ছুটী হইবে।

প্রথমে শ্রীশচন্দ্র নগেন্দ্র এবং কমলকে ভরসা দিতে লাগিলেন, "তিনি কখনও পথ হাঁটেন নাই—কতদূর যাইবেন? এক পোওয়া আধ ক্রোশ পথ গিয়া কোথায় বসিয়া আছেন, এখনই সন্ধান পাইব।" কিন্তু যখন তিন ঘণ্টা অতীত হইল, অথচ সূর্য্যমুখীর কোন সংবাদ পাওয়া গেল না, তখন নগেন্দ্র স্বয়ং তাঁহার সন্ধানে বাহির হই-লেন। কিছুক্ষণ রৌদ্রে পুড়িয়া মনে করিলেন, "আমি খুঁজিয়া বেড়াইতেছি, কিন্তু হয়ত সূর্য্য-মুখীকে এতক্ষণ বাড়ী আনিয়াছে।" এই বলিয়া ফিরিলেন। বাড়ী আসিয়া দেখিলেন, সূর্য্যমুখীর কোন সংবাদ নাই। আবার বাহির হইলেন। আবার ফিরিয়া বাড়ী আসিলেন। এইরূপে দিন-মান গেল।

বস্তুতঃ, শ্রীশচন্দ্র যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা সত্য। সূর্য্যমুখী কখন পদব্রজে বাটীর বাহির হয়েন নাই। কতদূর যাইবেন? বাড়ী হইতে অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে একটা পুষ্করিণীর ধারে আম্র-

বাগানে শয়ন করিয়াছিলেন। একজন খানসামা, যে অন্তঃপুরে যাতায়াত করিত, সেই সন্ধান করিতে করিতে সেইখানে আসিয়া তাঁহাকে দেখিল; চিনিয়া বলিল—"আজ্ঞে, আসুন।"

সূর্য্যমুখী কোন উত্তর করিলেন না। সে আবার বলিল, "আজ্ঞে, আসুন। বাড়ীতে সকলে বড় ব্যস্ত হইয়াছেন।" তখন সূর্য্যমুখী ক্রোধভরে কহিলেন, "আমাকে ফিরাইবার তুই কে?" খানসামা ভীত হইল। তথাপি সে দাঁড়াইয়া রহিল। সূর্য্যমুখী তাহাকে কহিলেন, "তুই যদি এখানে দাঁড়াইবি, তবে এই পুষ্করিণীর জলে আমি ডুবিয়া মরিব।"

খানসামা কিছু করিতে না পারিয়া দ্রুত গিয়া নগেন্দ্রকে সংবাদ দিল। নগেন্দ্র শিবিকা লইয়া স্বয়ং সেইখানে আসিলেন। কিন্তু তখন আর সূর্য্যমুখীকে সেখানে পাইলেন না। নিকটে অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কিছুই হইল না।

সূর্য্যমুখী সেখান হইতে উঠিয়া গিয়া এক বনে বসিয়াছিলেন। সেখানে এক বুড়ীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। বুড়ী কাঠ কুড়াইতে আসিয়াছিল—কিন্তু সূর্য্যমুখীর সন্ধান দিতে পারিলে ইনাম পাওয়া যাইতে পারে, অতএব সেও সন্ধানে ছিল। সূর্য্যমুখীকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ গা, তুমি কি আমাদের মা-ঠাকুরাণী গা?"

সূর্য্যমুখী বলিলেন, "না বাছা।"

বুড়ী বলিল, "হাঁ, তুমি আমাদের মা-ঠাকুরাণী।"

সূর্য্যমুখী বলিলেন, "তোমাদের মা-ঠাকুরাণী কে গা?"

বুড়ী বলিল, "বাবুদের বাড়ীর বউ গা।"

সূর্য্যমুখী বলিলেন, "আমার গায়ে কি সোনা-দানা আছে যে, আমি বাবুদের বাড়ীর বউ?"

বুড়ী ভাবিল, "তাও ত বটে!"

সে তখন কাঠ কুড়াইতে কুড়াইতে অন্য বনে গেল।

দিনমান এইরূপে বৃথায় গেল। রাত্রেও কোন ফললাভ হইল না। তৎপরদিন ও তৎপরদিনও কার্য্যসিদ্ধি হইল না—অথচ অনুসন্ধানের ত্রুটি হইল না। পুরুষ অনুসন্ধানকারীরা প্রায় কেহই সূর্য্যমুখীকে চিনিত না—তাহারা অনেক কাঙ্গাল গরীব ধরিয়া আনিয়া নগেন্দ্রের সম্মুখে উপস্থিত করিল। শেষে ভদ্রলোকের মেয়েছেলেদের একা পথে ঘাটে স্নান করিতে যাওয়া দায় ঘটিল। একা দেখিলেই নগেন্দ্রের সেবক-হালাল হিন্দুস্থানীরা "মা-ঠাকুরাণী" বলিয়া পাছু লাগিত, এবং স্নান বন্ধ করিয়া অকস্মাৎ পাল্কী বেহারা আনিয়া উপস্থিত করিত। অনেকে কখন পাল্কী চড়ে নাই, সুবিধা পাইয়া বিনা-ব্যয়ে পাল্কী চড়িয়া লইল।

শ্রীশচন্দ্র আর থাকিতে পারিলেন না। কলিকাতায় গিয়া অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন। কমলমণি গোবিন্দপুরে থাকিয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

একত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ

সকল সুখেরই সীমা আছে

কুন্দনন্দিনী যে সুখের আশা করিতে কখন ভরসা করেন নাই, তাঁহার সে সুখ হইয়াছিল;—তিনি নগেন্দ্রের স্ত্রী হইয়াছিলেন। যে দিন বিবাহ হইল, কুন্দনন্দিনী মনে করিলেন, এ সুখের সীমা নাই, পরিমাণ নাই। তাহার পর সূর্য্যমুখী পলায়ন করিলেন। তখন মনে পরিতাপ হইল—মনে করিলেন, "সূর্য্যমুখী আমাকে অসময়ে রক্ষা করিয়াছিল—নহিলে আমি কোথায় যাইতাম—কিন্তু আজি সে আমার জন্য গৃহত্যাগী হইল। আমি সুখী না হইয়া, মরিলে ভাল ছিল।" দেখিলেন, সুখের সীমা আছে।

প্রদোষে নগেন্দ্র শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন—কুন্দনন্দিনী শিয়রে বসিয়া ব্যজন করিতেছেন। উভয়ে নীরবে আছেন। এটি সুলক্ষণ নহে; আর কেহ নাই—অথচ দুই জনেই নীরব—সম্পূর্ণ সুখ থাকিলে এরূপ ঘটে না।

কিন্তু সূর্য্যমুখীর পলায়ন অবধি ইঁহাদের সম্পূর্ণ সুখ কোথায়? কুন্দনন্দিনী সর্ব্বদা মনে ভাবিতেন, "কি করিলে আবার যেমন ছিল, তেমনি হয়?" আজিকার দিন, এই সময় কুন্দনন্দিনী মুখ ফুটিয়া এ কথা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি করিলে যেমন ছিল তেমনি হয়?"

নগেন্দ্র বিরক্তির সহিত বলিলেন, "যেমন ছিল, তেমনি হয়? তোমাকে বিবাহ করিয়াছি বলিয়া কি তোমার অনুতাপ হইয়াছে?"

কুন্দনন্দিনী ব্যথা পাইলেন। "তুমি আমাকে বিবাহ করিয়া যে সুখী করিয়াছ—তাহা আমি কখনও আশা করি নাই। আমি তাহা বলি না—

আমি বলিতেছিলাম যে, কি করিলে সূর্য্যমুখী ফিরিয়া আসে?"

নগেন্দ্র বলিলেন, "ঐ কথাটি তুমি মুখে আনিও না। তোমার মুখে সূর্য্যমুখীর নাম শুনিলে আমার অন্তর্দ্দাহ হয়। তোমারই জন্য সূর্য্যমুখী আমাকে ত্যাগ করিয়া গেল।"

ইহা কুন্দনন্দিনী জানিতেন,—কিন্তু নগেন্দ্রের ইহা বলাতে কুন্দনন্দিনী ব্যথিত হইলেন। ভাবিলেন, "এটি কি তিরস্কার? আমার ভাগ্য মন্দ, কিন্তু আমি ত কোন দোষ করি নাই। সূর্য্যমুখীই ত এ বিবাহ দিয়াছে।" কুন্দ আর কোন কথা না কহিয়া ব্যজনে রত রহিলেন। কুন্দনন্দিনীকে অনেকক্ষণ নীরব দেখিয়া নগেন্দ্র বলিলেন, "কথা কহিতেছ না কেন? রাগ করিয়াছ?"

কুন্দ কহিলেন,—"না।"

ন। কেবল একটি ছোট্টো না বলিয়া আবার চুপ করিলে। তুমি কি আমায় আর ভালবাস না?

কু। বাসি বই কি?

ন। "বাসি বই কি?" এ যে বালক-ভুলান কথা। কুন্দ, বোধ হয়, তুমি আমায় কখন ভালবাসিতে না।

কু। বরাবর বাসি।

নগেন্দ্র বুঝিয়াও বুঝিলেন না যে, এ সূর্য্যমুখী নয়। সূর্য্যমুখীর ভালবাসা যে কুন্দনন্দিনীতে ছিল না, তাহা নহে—কিন্তু কুন্দ কথা জানিতেন না। তিনি বালিকা, ভীরু-স্বভাব, কথা জানেন না, আর কি বলিবেন? কিন্তু নগেন্দ্র তাহা বুঝিলেন না, বলিলেন, "আমাকে সূর্য্যমুখী বরাবর ভালবাসিত। বানরের গলায় মুক্তার হার সহিবে কেন?—লোহার শিকলই ভাল।"

এবার কুন্দনন্দিনী রোদন সংবরণ করিতে পারিলেন না। ধীরে ধীরে উঠিয়া বাহিরে গেলেন। এমন কেহ ছিল না যে, তাঁহার কাছে রোদন করেন। কমলমণি আসা পর্য্যন্ত কুন্দ তাঁহার কাছে যান নাই—কুন্দনন্দিনী আপনাকে এ বিবাহের প্রধান অপরাধিনী বোধ করিয়া লজ্জায় তাঁহার কাছে মুখ দেখাইতে পারেন নাই। কিন্তু আজিকার মর্ম্মপীড়া, সহৃদয়া স্নেহময়ী কমলমণির সাক্ষাতে বলিতে ইচ্ছা করিলেন। যে দিন প্রণয়ের নৈরাশ্যের সময়, কমলমণি তাঁহার দুঃখে দুঃখী হইয়া, তাঁহাকে কোলে লইয়া, চক্ষের জল মুছাইয়া দিয়াছিলেন—সেই দিন মনে করিয়া, তাঁহার কাছে কাঁদিতে গেলেন। কমলমণি কুন্দনন্দিনীকে দেখিয়া অপ্রসন্ন হইলেন,—কুন্দকে কাছে আসিতে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন,—কিছু বলিলেন না। কুন্দ তাঁহার কাছে আসিয়া বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কমলমণি কিছু বলিলেন না; জিজ্ঞাসাও করিলেন না, কি হইয়াছে। সুতরাং কুন্দনন্দিনী আপনা আপনি চুপ করিলেন। কমল তখন বলিলেন, "আমার কাজ আছে।" অনন্তর উঠিয়া গেলেন।

কুন্দনন্দিনী দেখিলেন, সকল সুখেরই সীমা আছে।

দ্বাত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ

বিষবৃক্ষের ফল

(হরদেব ঘোষালের প্রতি নগেন্দ্র দত্তের পত্র)

"তুমি লিখিয়াছ যে, আমি এ পৃথিবীতে যত কাজ করিয়াছি, তাহার মধ্যে কুন্দনন্দিনীকে বিবাহ করা সর্ব্বাপেক্ষা ভ্রান্তিমূলক কাজ, ইহা আমি স্বীকার করি। আমি এই কাজ করিয়া সূর্য্যমুখীকে হারাইলাম। সূর্য্যমুখীকে পত্নীভাবে পাওয়া বড় জোর কপালের কাজ। সকলেই মাটি খোঁড়ে, কোহিনুর এক জনের কপালেই উঠে। সূর্য্যমুখী সেই কোহিনুর। কুন্দনন্দিনী কোন্ গুণে তাঁহার স্থান পূর্ণ করিবে?

"তবে, কুন্দনন্দিনীকে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করিয়াছিলাম কেন? ভ্রান্তি! ভ্রান্তি! এখন চেতনা হইয়াছে। কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল মরিবার জন্য। আমারও মরিবার জন্য মোহনিদ্রা ভাঙ্গিয়াছে। এখন সূর্য্যমুখীকে কোথায় পাই?

"আমি কেন কুন্দনন্দিনীকে বিবাহ করিয়াছিলাম? আমি কি তাহাকে ভালবাসিতাম? ভালবাসিতাম বৈ কি—তাহার জন্য উন্মাদগ্রস্ত হইতে বসিয়াছিলাম—প্রাণ বাহির হইতেছিল। কিন্তু এখন বুঝিতেছি, সে কেবল চোখের ভালবাসা। নহিলে আজি পনের দিবসমাত্র বিবাহ করিয়াছি—এখনই বলিব কেন, 'আমি কি তাহাকে ভালবাসিতাম?' ভালবাসিতাম কেন? এখনও ভালবাসি—কিন্তু আমার সূর্য্যমুখী কোথায় গেল? অনেক কথা লিখিব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু আজ আর পারিলাম না। বড় কষ্ট হইতেছে। ইতি।"

(হরদেব ঘোষালের উত্তর)

"আমি তোমার মন বুঝিয়াছি। কুন্দনন্দিনীকে ভালবাসিতে না, এমত নহে—এখনও ভালবাস;

কিন্তু সে যে চোখের ভালবাসা, ইহা যথার্থ বলিয়াছ। সূর্য্যমুখার প্রতি তোমার গাঢ় স্নেহ—কেবল দুইদিনের জন্ত কুন্দনন্দিনীর ছায়ায় তাহা আবৃত হইয়াছিল। এখন সূর্য্যমুখীকে হারাইয়া তাহা বুঝিয়াছ। যতক্ষণ সূর্য্যদেব অনাচ্ছন্ন থাকেন, ততক্ষণ তাঁহার কিরণে সন্তাপিত হই, মেঘ ভাল লাগে। কিন্তু সূর্য্য অস্ত গেলে বুঝিতে পারি, সূর্য্যদেবই সংসারের চক্ষু। সূর্য্য বিনা সংসার আঁধার। তুমি আপনার হৃদয় না বুঝিতে পারিয়া এমন গুরুতর ভ্রান্তিমূলক কাজ করিয়াছ—ইহার জন্ত আর তিরস্কার করিব না—কেন না, তুমি যে ভ্রমে পড়িয়াছিলে, আপনা হইতে তাহার অপনোদন বড় কঠিন। মনের অনেকগুলি ভাব আছে, তাহার সকলকেই লোকে ভালবাসা বলে। কিন্তু চিত্তের যে অবস্থায় অন্তের সুখের জন্ত আমরা আত্মসুখ বিসর্জ্জন করিতে স্বতঃপ্রস্তুত হই, তাহাকে প্রকৃত ভালবাসা বলা যায়। 'স্বতঃপ্রস্তুত হই' অর্থাৎ ধর্ম্মজ্ঞান বা পুণ্যাকাঙ্ক্ষায় নহে। সুতরাং রূপবতীর রূপভোগলালসা ভালবাসা নহে। যেমন ক্ষুধাতুরের ক্ষুধাকে অন্নের প্রতি প্রণয় বলিতে পারি না, তেমনই কামাতুরের চিত্তচাঞ্চল্যকে রূপবতীর প্রতি ভালবাসা বলিতে পারি না। সেই চিত্তচাঞ্চল্যকেই আর্য্য কবিরা মদন-শরজ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যে বৃত্তির কল্পিত অবতার বসন্তসহায় হইয়া মহাদেবের ধ্যানভঙ্গ করিতে গিয়াছিলেন, যাঁহার প্রসাদে কবির বর্ণনায় মৃগেরা মৃগীদের গাত্রে গাত্রকণ্ডূয়ন করিতেছে, করিগণ করিণীদিগকে পদ্মমৃণাল ভাঙ্গিয়া দিতেছে, সে এই রূপজ মোহমাত্র। এ বৃত্তিও জগদীশ্বরপ্রেরিতা; ইহা দ্বারাও সংসারের ইষ্টসাধন হইয়া থাকে এবং ইহা সর্ব্বজীবমুগ্ধকরী। কালিদাস, বাইরণ, জয়দেব, ইঁহারা কবি;—বিদ্যাসুন্দর ইহার ভেঙ্গান। কিন্তু ইহা প্রণয় নহে। প্রেম বুদ্ধিবৃত্তিমূলক। প্রণয়াস্পদ ব্যক্তির গুণসকল যখন বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা পরিগৃহীত হয়, হৃদয় সেই সকল গুণে মুগ্ধ হইয়া তৎপ্রতি সমাকৃষ্ট এবং সঞ্চালিত হয়, তখন সেই গুণাধারের সংসর্গলিপ্সা, এবং তৎপ্রতি ভক্তি জন্মে। ইহার ফল, সহৃদয়তা এবং পরিণামে আত্মবিস্মৃতি ও আত্মবিসর্জ্জন। এই যথার্থ প্রণয়; সেক্ষপিয়র, বাল্মীকি, শ্রীমদ্ভাগবতকার ইহার কবি; ইহা রূপে জন্মে না। প্রথমে বুদ্ধি দ্বারা গুণগ্রহণ, গুণগ্রহণের পর আসঙ্গলিপ্সা; আসঙ্গলিপ্সা সফল হইলে সংসর্গ, সংসর্গফলে প্রণয়, প্রণয়ে আত্মবিসর্জ্জন। আমি ইহাকেই ভালবাসা বলি।' নিতান্তপক্ষে স্ত্রীপুরুষের ভালবাসা আমার বিবেচনায় এইরূপ। আমার বোধ হয়, অন্ত ভালবাসারও মূল এইরূপ; তবে স্নেহ এক কারণে উপস্থিত হয় না। কিন্তু সকল কারণই বুদ্ধিবৃত্তিমূলক। নিতান্তপক্ষে বুদ্ধিবৃত্তিমূলক কারণজাত স্নেহ ভিন্ন স্থায়ী হয় না, রূপজ মোহ তাহা নহে। রূপদর্শন-জনিত যে সকল চিত্তবিকৃতি, তাহার তীক্ষ্ণতা পৌনঃপুন্যে হ্রস্ব হয়। অর্থাৎ পৌনঃপুন্যে পরিতৃপ্তি জন্মে। গুণজনিতের পরিতৃপ্তি নাই। কেন না, রূপ এক—প্রত্যহই তাহার একপ্রকারই বিকাশ; গুণ নিত্য নূতন নূতন ক্রিয়ায় নূতন হইয়া প্রকাশ পায়। রূপেও প্রণয় জন্মে, গুণেও প্রণয় জন্মে,—কেন না, উভয়ের দ্বারা আসঙ্গলিপ্সা জন্মে; যদি উভয় একত্র হয়, তবে প্রণয় শীঘ্র জন্মে; কিন্তু একবার প্রণয়সংসর্গ-ফল বদ্ধমূল হইলে, রূপ থাকা না থাকা সমান। রূপবান্ ও কুৎসিতের প্রতি স্নেহ ইহার নিত্য উদাহরণস্থল।

"গুণজনিত প্রণয় চিরস্থায়ী বটে—কিন্তু গুণ চিনিতে দিন লাগে। এই জন্য সে প্রণয় একেবারে হঠাৎ বলবান্ হয় না—ক্রমে সঞ্চারিত হয়। কিন্তু রূপজ মোহ এককালীন সম্পূর্ণ বলবান হইবে। তাহার প্রথম বল এমন দুর্দমনীয় হয় যে, অন্য সকল বৃত্তি তদ্দ্বারা উচ্ছিন্ন হয়। এই মোহ কি—এই স্থায়ী প্রণয় কি না—ইহা জানিবার শক্তি থাকে না। অনন্তকালস্থায়ী প্রণয় বলিয়া তাহাকে বিবেচনা হয়। তোমার তাহাই বিবেচনা হইয়াছিল—এই মোহের প্রথম বলে সূর্য্যমুখীর প্রতি তোমার যে স্থায়ী প্রেম, তাহা তোমার চক্ষে অদৃশ্য হইয়াছিল। এই তোমার ভ্রান্তি। এ ভ্রান্তি মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ। অতএব তোমাকে তিরস্কার করিব না। বরং পরামর্শ দিই, ইহাতেই সুখী হইবার চেষ্টা কর।

"তুমি নিরাশ হইও না। সূর্য্যমুখী অবশ্য পুনরাগমন করিবেন—তোমাকে না দেখিয়া তিনি কত কাল থাকিবেন? যত দিন না আসেন, তুমি কুন্দনন্দিনীকে স্নেহ করিও। তোমার পত্রাদিতে যতদূর বুঝিয়াছি, তাহাতে বোধ হইয়াছে, তিনিও গুণহীনা নহেন। রূপজ মোহ দূর হইলে কালে স্থায়ী প্রেমের সঞ্চার হইবে। তাহা হইলে তাঁহাকে লইয়াই সুখী হইতে পারিবে। এবং যদি তোমার জ্যেষ্ঠা ভার্য্যার সাক্ষাৎ আর না পাও, তবে তাঁহাকে ভুলিতেও পারিবে। বিশেষ কনিষ্ঠা তোমাকে ভালবাসেন। ভালবাসার কখন অযত্ন করিবে না।

কেন না, ভালবাসাতেই মানুষের একমাত্র নির্ম্মল এবং অবিনশ্বর সুখ। ভালবাসাই মনুষ্যজাতির উন্নতির শেষ উপায়—মনুষ্যমাত্রে পরস্পরে ভালবাসিলে আর মনুষ্যকৃত অনিষ্ট পৃথিবীতে থাকিবে না।"

[নগেন্দ্রনাথের প্রত্যুত্তর]

"তোমার পত্র পাইয়া মানসিক ক্লেশের কারণ, এ পর্য্যন্ত উত্তর দিই নাই। তুমি যাহা লিখিয়াছ, তাহা সকলই বুঝিয়াছি এবং তোমার পরামর্শই যে সৎপরামর্শ, তাহাও জানি। কিন্তু গৃহে মনঃস্থির করিতে পারি না। এক মাস হইল, আমার সূর্য্যমুখী আমাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, আর তাঁহার কোন সংবাদ পাইলাম না। তিনি যে পথে গিয়াছেন, আমিও সেই পথে যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছি। আমিও গৃহত্যাগ করিব। দেশে দেশে তাঁহার সন্ধান করিয়া বেড়াইব। তাঁহাকে পাই, লইয়া গৃহে আসিব; নচেৎ আর আসিব না। কুন্দনন্দিনীকে লইয়া আর গৃহে থাকিতে পারি না। সে চক্ষুঃশূল হইয়াছে। তাহার দোষ নাই—দোষ আমারই—কিন্তু আমি তাহার মুখদর্শন আর সহ্য করিতে পারি না। আগে কিছু বলিতাম না—এখন নিত্য ভর্ৎসনা করি—সে কাঁদে—আমি কি করিব? আমি চলিলাম, শীঘ্র তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া অন্যত্র যাইব। ইতি।"

নগেন্দ্রনাথ যেরূপ লিখিয়াছিলেন, সেইরূপই করিলেন। বিষয়ের রক্ষণাবেক্ষণের ভার দেওয়ানের উপর ন্যস্ত করিয়া অচিরাৎ গৃহত্যাগ করিয়া পর্য্যটনে যাত্রা করিলেন। কমলমণি অগ্রেই কলিকাতায় গিয়াছিলেন। সুতরাং এ আখ্যায়িকায় লিখিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে কুন্দনন্দিনী একাই দত্তদিগের অন্তঃপুরে রহিলেন, আর হীরা দাসী তাঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত রহিল।

দত্তদিগের সেই সুবিস্তৃতা পুরী অন্ধকার হইল। যেমন বহুদীপসমুজ্জ্বল, বহুলোকসমাকীর্ণ, গীতধ্বনিপূর্ণ নাট্যশালা নাট্যরঙ্গ সমাপন হইলে পর, অন্ধকার, জনশূন্য, নীরব হয়, এই মহাপুরী সূর্য্যমুখী-নগেন্দ্র কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া সেইরূপ আঁধার হইল। যেমন বালক, চিত্রিত পুত্তলি লইয়া এক দিন ক্রীড়া করিয়া, পুতুল ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দেয়, পুতুল মাটিতে পড়িয়া থাকে, তাহার উপর মাটি পড়ে, তৃণাদি জন্মিতে থাকে, তেমন কুন্দনন্দিনী ভগ্ন পুতুলের ন্যায় নগেন্দ্র কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া একাকিনী সেই বিস্তৃতা পুরীমধ্যে অযত্নে পড়িয়া রহিলেন। যেমন দাবানলে বনদাহকালীন শাবক সহিত পক্ষিনীড় দগ্ধ হইলে পক্ষিণী আহার লইয়া আসিয়া দেখে, বৃক্ষ নাই, শাবক নাই, তখন বিহঙ্গী নীড়ান্বেষণে উচ্চ কাতরোক্তি করিতে করিতে সেই দগ্ধ বনের উপরে মণ্ডলে মণ্ডলে ঘুরিয়া বেড়ায়, নগেন্দ্র সেইরূপ সূর্য্যমুখীর সন্ধানে দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। যেমন অনন্ত সাগরে অতল জলে মণিখণ্ড ডুবিলে আর দেখা যায় না, সূর্য্যমুখী তেমনি দুষ্প্রাপণীয়া হইলেন।

ত্রয়স্ত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ

ভালবাসার চিহ্নস্বরূপ

কার্পাসবস্ত্রমধ্যস্থ তপ্ত অঙ্গারের ন্যায় দেবেন্দ্রের নিরুপম মূর্ত্তি হীরার অন্তঃকরণকে স্তরে স্তরে দগ্ধ করিতেছিল। অনেকবার হীরার ধর্ম্মভীতি এবং লোকলজ্জা, প্রণয়বেগে ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইল; কিন্তু দেবেন্দ্রের স্নেহহীন ইন্দ্রিয়পর চরিত্র মনে পড়াতে আবার তাহা বদ্ধমূল হইল। হীরা চিত্তসংযমে বিশেষ ক্ষমতাশালিনী, এবং সেই ক্ষমতা ছিল বলিয়াই, সে বিশেষ ধর্ম্মভীতা না হইয়াও এ পর্য্যন্ত সতীত্বধর্ম্ম সহজেই রক্ষা করিয়াছিল। সেই ক্ষমতা প্রভাবেই সে দেবেন্দ্রের প্রতি প্রবলানুরাগ অপাত্রন্যস্ত জানিয়া সহজেই শমিত করিয়া রাখিতে পারিল। বরং চিত্তসংযমের সদুপায়স্বরূপ হীরা স্থির করিল যে, পুনর্ব্বার দাসীবৃত্তি অবলম্বন করিবে। পরগৃহের গৃহকর্ম্মাদিতে অনুদিন নিরত থাকিলে সে অন্যমনে এই বিফলানুরাগের বৃশ্চিকদংশনস্বরূপ জ্বালা ভুলিতে পারিবে। নগেন্দ্র যখন কুন্দনন্দিনীকে গোবিন্দপুরে রাখিয়া পর্য্যটনে যাত্রা করিলেন, তখন হীরা ভূতপূর্ব্ব আনুগত্যের বলে দাসীত্ব ভিক্ষা করিল। কুন্দের অভিপ্রায় জানিয়া নগেন্দ্র হীরাকে কুন্দনন্দিনীর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত রাখিয়া গেলেন।

হীরার পুনর্ব্বার দাসীবৃত্তি স্বীকার করার আর একটি কারণ ছিল। পূর্ব্বে হীরা অর্থাদি কামনায় কুন্দকে নগেন্দ্রের ভবিষ্যৎ প্রিয়তমা মনে করিয়া স্বীয় বশীভূত করিবার জন্য যত্ন পাইয়াছিল। ভাবিয়াছিল, নগেন্দ্রের অর্থ কুন্দের হস্তগত হইবে, কুন্দের হস্তগত অর্থ হীরার হইবে, এক্ষণে সেই কুন্দ নগেন্দ্রের গৃহিণী হইল। অর্থসম্বন্ধে কুন্দের কোন বিশেষ আধিপত্য জন্মিল না। কিন্তু এখন সে কথা হীরারও মনে স্থান পাইল না। হীরার অর্থে

আর মন ছিল না, মন থাকিলেও কুন্দ হইতে লব্ধ অর্থ বিষতুল্য বোধ হইত।

হীরা, আপনার নিষ্ফল প্রণয়যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিত, কিন্তু কুন্দনন্দিনীর প্রতি দেবেন্দ্রের অনুরাগ সহ্য করিতে পারিল না। যখন হীরা শুনিল যে, নগেন্দ্র বিদেশ-পরিভ্রমণে যাত্রা করিবেন, কুন্দনন্দিনী গৃহে গৃহিণী হইয়া থাকিবেন, তখন হরিদাসী বৈষ্ণবীর যাতায়াতের পথে কাঁটা দিবার জন্য প্রহরী হইয়া আসিল।

হীরা কুন্দনন্দিনীর মঙ্গল কামনা করিয়া এরূপ অভিসন্ধি করে নাই। হীরা ঈর্ষ্যাবশতঃ কুন্দের উপরে এরূপ জাতক্রোধ হইয়াছিল যে, তাহার মঙ্গলচিন্তা দূরে থাকুক, কুন্দের নিপাত দৃষ্টি করিলে পরমাহ্লাদিত হইত। পাছে কুন্দের সঙ্গে দেবেন্দ্রের সাক্ষাৎ হয়, এইরূপ ঈর্ষ্যাজাত ভয়েই হীরা নগেন্দ্রের পত্নীকে প্রহরাতে রাখিল।

হীরা দাসী কুন্দের এক যন্ত্রণার মূল হইয়া উঠিল। কুন্দ দেখিল, হীরার সে যত্ন, মমতা বা প্রিয়বাদিনীত্ব নাই। দেখিল যে, হীরা দাসী হইয়া তাহার প্রতি সর্ব্বদা অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে, এবং তাহাকে তিরস্কৃত ও অপমানিত করে। কুন্দ নিতান্ত শান্তস্বভাব; হীরার আচরণে নিতান্ত পীড়িতা হইয়াও কখনও তাহাকে কিছু বলিত না। কুন্দ শীতলপ্রকৃতি, হীরা উগ্রপ্রকৃতি। এ জন্য কুন্দ প্রভুপত্নী হইয়াও দাসীর নিকট দাসীর মত থাকিতে লাগিল, হীরা দাসী হইয়াও প্রভুপত্নীর প্রভু হইয়া বসিল। পুরবাসিনীরা কখনও কখনও কুন্দের যন্ত্রণা দেখিয়া হীরাকে তিরস্কার করিত, কিন্তু বাগ্মী হীরার নিকট তাল কাঁদিতে পারিত না। দেওয়ানজী এ সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া হীরাকে বলিলেন, "তুমি দূর হও। তোমাকে জবাব দিলাম।" শুনিয়া হীরা রোষবিস্ফারিত-লোচনে দেওয়ানজীকে কহিল, "তুমি জবাব দিবার কে? আমাকে মুনিব রাখিয়া গিয়াছেন। মুনিবের কথা নহিলে আমি যাইব না। আমাকে জবাব দিবার তোমার যে ক্ষমতা, তোমাকে জবাব দিবার আমারও সেই ক্ষমতা।" শুনিয়া দেওয়ানজী অপমানভয়ে দ্বিতীয় বাক্যব্যয় করিলেন না। হীরা আপন জোরেই রহিল। সূর্য্যমুখী নহিলে কেহ হীরাকে শাসিত করিতে পারিত না।

একদিন নগেন্দ্র বিদেশ যাত্রা করিলে পর, হীরা একাকিনী অন্তঃপুরসন্নিহিত পুষ্পোদ্যানে লতামণ্ডপে শয়ন করিয়াছিল। নগেন্দ্র ও সূর্য্যমুখী পরিত্যাগ করা অবধি সে সকল লতামণ্ডপ হীরা অধিকারগত হইয়াছিল। তখন সন্ধ্যা অতী হইয়াছে; আকাশে প্রায় পূর্ণচন্দ্র শোভা করিতেছে উদ্যানের ভাস্বর বৃক্ষপত্রে তৎকিরণমালা প্রতিফলি হইতেছে। লতাপল্লবরন্ধ্র মধ্য হইতে অপসৃত হই চন্দ্রকিরণ শ্বেতপ্রস্তরময় হর্ম্ম্যতলে পতিত হইয়া এবং সমীপস্থ দীর্ঘিকার প্রদোষবায়ুসন্তাড়িত স্ব জলের উপর নাচিতেছে। উদ্যানপুষ্পের সৌর আকাশ উন্মাদকর হইয়াছিল। এমন সময় হ অকস্মাৎ লতামণ্ডপমধ্যে পুরুষমূর্ত্তি দেখি পাইল। চাহিয়া দেখিল যে, সে দেবেন্দ্র; দ দেবেন্দ্র ছদ্মবেশী নহেন, নিজবেশেই আসিয়াছে

হীরা বিস্মিত হইয়া কহিল, "আপনার এ অ দুঃসাহস। কেহ দেখিতে পাইলে আপনি ম পড়িবেন।"

দেবেন্দ্র বলিলেন, "যেখানে হীরা আ সেখানে আমার ভয় কি?" এই বলিয়া দে হীরার পার্শ্বে বসিলেন। হীরা চরিতার্থ হই কিয়ৎক্ষণ পরে কহিল, "কেন এখানে এসেছে যার আশায় এসেছেন, তার দেখা পাইবেন না।"

"তা ত পাইয়াছি। আমি তোমারই আ এসেছি।"

হীরা লুব্ধ চাটুকারের কপটালাপে প্রতা না হইয়া হাসিল এবং কহিল, "আমার কপাল এত প্রসন্ন হইয়াছে, তা ত জানি না। য হউক, যদি আমার ভাগ্যই ফিরিয়াছে, এ যেখানে নিষ্কণ্টকে বসিয়া আপনাকে দেখিয়া ম তৃপ্তি হইবে, এমন স্থানে যাই চলুন। এখ অনেক বিঘ্ন।"

দেবেন্দ্র বলিলেন, "কোথায় যাইব?"

হীরা বলিল, "যেখানে কোন ভয় না আপনার নিকুঞ্জবনে চলুন।"

দে। তুমি আমার জন্য কোন ভয় করিও

হী। যদি আপনার জন্য ভয় না থাকে, আ জন্য ভয় করিতে হয়। আমাকে আপনার ক দেখিলে আমার দশা কি হইবে?

দেবেন্দ্র সঙ্কুচিত হইয়া কহিলেন, "তবে চ তোমাদের নূতন গৃহিণীর সঙ্গে আলাপটা এক ঝালিয়ে গেলে হয় না?"

হীরা এই কথা শুনিয়া দেবেন্দ্রের প্রতি ঈর্ষ্যানলজ্বলিত কটাক্ষ করিল, দেবেন্দ্র অল্পালো ভাল দেখিতে পাইলেন না। হীরা কহিল "তাঁহার সাক্ষাৎ পাইবেন কি প্রকারে?"

দেবেন্দ্র বিনীতভাবে কহিলেন, "তুমি কৃপা করিলে সকলই হয়।"

হীরা কহিল, "তবে এইখানে আপনি সতর্ক হইয়া বসিয়া থাকুন, আমি তাঁহাকে ডাকিয়া আনিতেছি।"

এই বলিয়া হীরা লতামণ্ডপ হইতে বাহির হইল। কিয়দ্দূর আসিয়া এক বৃক্ষান্তরালে বসিল, এবং তখন তাহার কণ্ঠসংরুদ্ধ নয়নবারি দরবিগলিত হইয়া বহিতে লাগিল। পরে গাত্রোত্থান করিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল, কিন্তু কুন্দনন্দিনীর কাছে গেল না। বাহিরে গিয়া দ্বাররক্ষকদিগকে বলিল, "তোমরা শীঘ্র আইস, ফুলবাগানে চোর আসিয়াছে।"

তখন দোবে, চোবে, পাঁড়ে এবং তেওয়ারি পাকা বাঁশের লাঠি হাতে করিয়া অন্তঃপুরমধ্য দিয়া ফুলবাগানের দিকে ছুটিল। দেবেন্দ্র দূর হইতে তাহাদের নাগরা জুতার শব্দ শুনিয়া, দূর হইতে তাহাদের কালো গালপাট্টা দেখিতে পাইয়া, লতামণ্ডপ হইতে লাফ দিয়া বেগে পলায়ন করিল। তেওয়ারি-গোষ্ঠী কিছুদূর পশ্চাদ্ধাবিত হইল। তাহারা দেবেন্দ্রকে ধরিতে পারিয়াও ধরিল না। কিন্তু দেবেন্দ্র কিঞ্চিৎ পুরস্কৃত না হইয়া গেলেন না। পাকা বাঁশের লাঠির আস্বাদ তিনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন কি না, আমরা নিশ্চিত জানি না, কিন্তু দ্বারবান্ কর্তৃক "শ্বশুরা" "শালা" প্রভৃতি প্রিয়সম্বন্ধসূচক নানা মিষ্ট সম্বোধনের দ্বারা অভিহিত হইয়াছিলেন, এমন আমরা শুনিয়াছি; এবং তাঁহার ভৃত্য এক দিন তাঁহার প্রসাদী ব্র্যাণ্ডি পাইয়া পরদিবস আপন উপপত্নীর নিকট গল্প করিয়াছিল যে, "আজ বাবুকে তৈল মাখাইবার সময়ে দেখি যে, তাঁহার পিঠে একটা কালশিরা দাগ।"

দেবেন্দ্র গৃহে গিয়া দুই বিষয়ে স্থিরসঙ্কল্প হইলেন। প্রথম, হীরা থাকিতে তিনি আর দত্তবাড়ী যাইবেন না। দ্বিতীয়, হীরাকে ইহার প্রতিফল দিবেন। পরিণামে তিনি হীরাকে গুরুতর প্রতিফল প্রদান করিলেন। হীরার লঘুপাপে গুরু দণ্ড হইল। হীরা এমন গুরুতর শাস্তি প্রাপ্ত হইল যে, তাহা দেখিয়া শেষে দেবেন্দ্রেরও পাষাণহৃদয় বিদীর্ণ হইয়াছিল। তাহা বিস্তারে বর্ণনীয় নহে, পরে সংক্ষেপে বলিব।

চতুস্ত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ

পথিপার্শ্বে

বর্ষাকাল। বড় দুর্দ্দিন। সমস্ত দিন বৃষ্টি হইয়াছে। একবারও সূর্য্যোদয় হয় নাই। আকাশ মেঘে ঢাকা। কাশী যাইবার পাকা রাস্তার ঘুটিঙের উপর একটু একটু পিছল হইয়াছে। পথে প্রায় লোক নাই—ভিজিয়া ভিজিয়া কে পথ চলে? এক জন মাত্র পথিক পথ চলিতেছিল। পথিকের ব্রহ্মচারী বেশ। গৈরিকবর্ণ বস্ত্র পরা—গলায় রুদ্রাক্ষ—কপালে চন্দনরেখা—জটার আড়ম্বর কিছু নাই, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেশ—কতক কতক শ্বেতবর্ণ। এক হাতে গোলপাতার ছাতা, অপর হাতে তৈজস—ব্রহ্মচারী ভিজিতে ভিজিতে চলিয়াছেন। একে ত দিনেই অন্ধকার, তাহাতে আবার পথে রাত্রি হইল—অমনি পৃথিবী মসীময় হইল—পথিক কোথায় পথ, কোথায় অপথ, কিছু অনুভব করিতে পারিলেন না—তথাপি পথিক পথ অতিবাহিত করিয়া চলিলেন—কেন না, তিনি সংসারত্যাগী ব্রহ্মচারী। যে সংসারত্যাগী, তাহার অন্ধকার, আলো, কুপথ, সুপথ, সব সমান।

রাত্রি অনেক হইল। ধরণী মসীময়ী—আকাশের মুখে কৃষ্ণাবগুণ্ঠন। বৃক্ষগণের শিরোমালা কেবল গাঢ়তর অন্ধকারে স্তূপস্বরূপ লক্ষিত হইতেছে। সেই বৃক্ষশিরোমালার বিচ্ছেদে মাত্র পথের রেখা অনুভূত হইতেছে। বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি পড়িতেছে। এক একবার বিদ্যুৎ হইতেছে—সে আলোর অপেক্ষা আঁধার ভাল। অন্ধকারে ক্ষণিক বিদ্যুদালোকে সৃষ্টি যেমন ভীষণ দেখায়, অন্ধকারে তত নয়।

"মা গো!"

অন্ধকারে যাইতে যাইতে ব্রহ্মচারী অকস্মাৎ পথিমধ্যে এই শব্দসূচক দীর্ঘনিশ্বাস শুনিতে পাইলেন। শব্দ অলৌকিক কিন্তু তথাপি মনুষ্যকণ্ঠনিঃসৃত বলিয়া নিশ্চিত বোধ হইল। শব্দ অতি মৃদু, অথচ অতিশয় ব্যথাব্যঞ্জক বলিয়া বোধ হইল। ব্রহ্মচারী পথে স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। কতক্ষণে আবার বিদ্যুৎ হইবে—সেই প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। ঘন ঘন বিদ্যুৎ হইতেছিল। বিদ্যুৎ হইলে পথিক দেখিলেন, পথিপার্শ্বে কি একটা পড়িয়া আছে। এটা কি মনুষ্য? পথিক তাহাই বিবেচনা করিলেন। কিন্তু আর একবার বিদ্যুতের অপেক্ষা করিলেন। দ্বিতীয়বার বিদ্যুতে স্থির করিলেন,

মনুষ্য বটে। তখন পথিক ডাকিয়া বলিলেন, "কে তুমি পথে পড়িয়া আছ?"

কেহ কোন উত্তর দিল না। আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—এবার অস্ফুট কাতরোক্তি—আবার মুহূর্ত্তজন্য কর্ণে প্রবেশ করিল। তখন ব্রহ্মচারী ছত্র তৈজস ভূতলে রাখিয়া সেই স্থান লক্ষ্য করিয়া ইতস্ততঃ হস্তপ্রসারণ করিতে লাগিলেন। অচিরাৎ কোমল মনুষ্যদেহে করস্পর্শ হইল। "কে গা তুমি?" শিরোদেশে হাত দিয়া কবরী স্পর্শ করিলেন, "দুর্গে! এ যে স্ত্রীলোক।"

তখন ব্রহ্মচারী উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া মুমূর্ষু অথবা অচেতন স্ত্রীলোকটিকে দুই হস্ত দ্বারা কোলে তুলিলেন। ছত্র, তৈজস পথে পড়িয়া রহিল। ব্রহ্মচারী পথ ত্যাগ করিয়া সেই অন্ধকারে মাঠ ভাঙ্গিয়া গ্রামাভিমুখে চলিলেন। ব্রহ্মচারী এ প্রদেশের পথ ঘাট গ্রাম বিলক্ষণ জানিতেন। শরীর বলিষ্ঠ নহে, তথাপি শিশু-সন্তানবৎ সেই মরণোন্মুখীকে কোলে করিয়া এই দুর্গম পথ ভাঙ্গিয়া চলিলেন। যাহারা পরোপকারী, পরপ্রেমে বলবান্, তাহারা কখনও শারীরিক বলের অভাব জানিতে পারে না।

গ্রামের প্রান্তভাগে ব্রহ্মচারী এক পর্ণকুটীর প্রাপ্ত হইলেন। নিঃসংজ্ঞ স্ত্রীলোককে ক্রোড়ে লইয়া সেই কুটীরের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। ডাকিলেন, "বাছা, হর, ঘরে আছ গা?" কুটীরমধ্য হইতে এক জন স্ত্রীলোক কহিল, "এ যে ঠাকুরের গলা শুনিতে পাই! ঠাকুর কবে এলেন?"

ব্রহ্মচারী। এই আস্‌ছি। শীঘ্র দ্বার খোল—আমি বড় বিপদ্‌গ্রস্ত।

হরমণি কুটীরের দ্বার মোচন করিল। ব্রহ্মচারী তখন তাহাকে প্রদীপ জ্বালিতে বলিয়া দিয়া আস্তে আস্তে স্ত্রীলোকটিকে গৃহমধ্যে মাটীর উপর শোওয়াইলেন। হর প্রদীপ জ্বালিত করিল, তাহা মুমূর্ষুর মুখের কাছে আনিয়া উভয়ে তাঁহাকে বিশেষ করিয়া দেখিলেন।

দেখিলেন, স্ত্রীলোকটি প্রাচীনা নহে। কিন্তু এখন তাহার শরীরের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে তাহার বয়স অনুভব করা যায় না। তাহার শরীর অত্যন্ত শীর্ণ—সাংঘাতিক পীড়ার লক্ষণযুক্ত। সময়বিশেষে তাহার সৌন্দর্য্য ছিল—এমন হইলেও হইতে পারে; কিন্তু এখন সৌন্দর্য্য কিছুমাত্র নাই। আর্দ্রবস্ত্র অত্যন্ত মলিন,—এবং শত স্থানে ছিন্নবিচ্ছিন্ন। আলুলায়িত আর্দ্র কেশ চিররুক্ষ। চক্ষু কোটরপ্রবিষ্ট, এখন সে নিমীলিত। নিশ্বাস বহিতেছে, কিন্তু সংজ্ঞা নাই। বোধ হইল, যেন মৃত্যু নিকটে।

হরমণি জিজ্ঞাসা করিল, "একে কোথায় পেলেন?"

ব্রহ্মচারী সবিশেষ পরিচয় দিয়া বলিলেন, "ইহার মৃত্যু নিকট দেখিতেছি। কিন্তু তাপ-সেক করিলে বাঁচিলেও বাঁচিতে পারে। আমি যেমন বলি, তাই করিয়া দেখ।"

তখন হরমণি ব্রহ্মচারীর আদেশমত, তাহাকে আর্দ্রবস্ত্রের পরিবর্ত্তে আপনার একখানি শুষ্ক বস্ত্র কৌশলে পরাইল। শুষ্ক বস্ত্রের দ্বারা তাহার অঙ্গের এবং কেশের জল মুছাইল। পরে আঁগি প্রস্তুত করিয়া তাপ দিতে লাগিল। ব্রহ্মচারী বলিলেন, "বোধ হয়, অনেকক্ষণ অবধি অনাহারে আছে। যদি ঘরে দুধ থাকে, তবে একটু একটু ক'রে দুধ খাওয়াইবার চেষ্টা দেখ।"

হরমণির গোরু ছিল—ঘরে দুধও ছিল। দুধ তপ্ত করিয়া অল্প অল্প করিয়া স্ত্রীলোকটিকে পান করাইতে লাগিল। স্ত্রীলোক তাহা পান করিল। উদরে দুগ্ধ প্রবেশ করিলে, সে চক্ষু উন্মীলিত করিল। দেখিয়া হরমণি জিজ্ঞাসা করিল, "মা, তুমি, কোথা থেকে আসিতেছিলে গা?"

সংজ্ঞালব্ধ স্ত্রীলোক কহিল,—"আমি কোথা?"

ব্রহ্মচারী কহিলেন, "তোমাকে পথে মুমূর্ষু অবস্থায় দেখিয়া এখানে আনিয়াছি। তুমি কোথা যাইবে?"

স্ত্রীলোক বলিল, "অনেক দূর।"

হরমণি। "তোমার হাতে রুলি রয়েছে। তুমি কি সধবা?" পীড়িতা ভ্রূভঙ্গী করিল। "বাছা, তোমায় কি বলিয়া ডাকিব? তোমার নাম কি?"

অনাথিনী কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, "আমার নাম সূর্য্যমুখী।"

পঞ্চত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ

আশাপথে

সূর্য্যমুখীর বাঁচিবার আশা ছিল না। ব্রহ্মচারী তাঁহার পীড়ার লক্ষণ বুঝিতে না পারিয়া পরদিন প্রাতে গ্রামস্থ বৈদ্যকে ডাকাইলেন।

রামকৃষ্ণ রায় বড় বিজ্ঞ। বৈদ্যশাস্ত্রে বড় পণ্ডিত। চিকিৎসাতে গ্রামে তাঁহার বিশেষ যশঃ ছিল। তিনি পীড়ার লক্ষণ দেখিয়া বলিলেন, "ইঁহার কাস রোগ। তাহার উপর জ্বর হইতেছে। পীড়া সাঙ্ঘাতিক বটে। তবে বাঁচিলেও বাঁচিতে পারেন।"

এ সকল কথা সূর্য্যমুখীর অসাক্ষাতে হইল। বৈদ্য ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন—অনাথিনী দেখিয়া পারিতোষিকের কথাটি রামকৃষ্ণ রায় উত্থাপন করিলেন না। রামকৃষ্ণ রায় অর্থপিশাচ ছিলেন না। বৈদ্য বিদায় হইলে, ব্রহ্মচারী হরমণিকে কার্য্যান্তরে প্রেরণ করিয়া, বিশেষ কথোপকথনের জন্য সূর্য্যমুখীর নিকট বসিলেন। সূর্য্যমুখী বলিলেন, "ঠাকুর! আপনি আমার জন্য এত যত্ন করিতেছেন কেন? আমার জন্য ক্লেশের প্রয়োজন নাই।"

ব্রহ্ম। আমার ক্লেশ কি? এই আমার কার্য্য। আমার কেহ নাই। আমি ব্রহ্মচারী। পরোপকার আমার ধর্ম্ম। আজ যদি তোমার কাজে নিযুক্ত না থাকিতাম, তবে তোমার মত অন্য কাহারও কাজে থাকিতাম।

সূর্য্য। তবে আমাকে রাখিয়া, আপনি অন্য কাহারও উপকারে নিযুক্ত হউন। আপনি অন্যের উপকার করিতে পারিবেন,—আমার আপনি উপকার করিতে পারিবেন না।

ব্রহ্ম। কেন?

সূর্য্য। বাঁচিলে আমার উপকার নাই। মরাই আমার মঙ্গল। কা'ল রাত্রে যখন পথে পড়িয়া ছিলাম—তখন নিতান্ত আশা করিয়াছিলাম যে, মরিব। আপনি কেন আমাকে বাঁচাইলেন?

ব্রহ্ম। তোমার এত কি দুঃখ, তাহা আমি জানি না—কিন্তু দুঃখ যতই হোক না কেন, আত্মহত্যা মহাপাপ। কদাচ আত্মহত্যা করিও না। আত্মহত্যা পরহত্যাতুল্য পাপ।

সূর্য্য। আমি আত্মহত্যা করিবার চেষ্টা করি নাই। আমার মৃত্যু আপনি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল—এই জন্য ভরসা করিতেছিলাম। কিন্তু মরণেও আমার আনন্দ নাই।

"মরণে আনন্দ নাই" এই কথা বলিতে সূর্য্যমুখীর কণ্ঠ রুদ্ধ হইল। চক্ষু দিয়া জল পড়িল।

ব্রহ্মচারী কহিলেন, "যতবার মরিবার কথা হইল, ততবার তোমার চক্ষে জল পড়িল, দেখিলাম। অথচ তুমি মরিতে চাহ। মা, আমি তোমার সন্তান সদৃশ। আমাকে পুত্র বিবেচনা করিয়া মনের বাসনা ব্যক্ত করিয়া বল। যদি তোমার দুঃখনিবারণের কোন উপায় থাকে, আমি তাহা করিব। এই কথা বলিব বলিয়াই হরমণিকে বিদায় দিয়া নির্জ্জনে তোমার কাছে আসিয়া বসিয়াছি। কথাবার্ত্তায় বুঝিতেছি, তুমি বিশেষ ভদ্রঘরের কন্যা হইবে। তোমার যে উৎকট মনঃপীড়া আছে, তাহাও বুঝিতেছি। কেন তাহা আমার সাক্ষাতে বলিবে না? আমাকে সন্তান মনে করিয়া বল।"

সূর্য্যমুখী সজললোচনে কহিলেন, "এখন মরিতে বসিয়াছি—লজ্জাই বা এ সময়ে কেন করি? আর আমার মনোদুঃখ কিছুই নয়,—কেবল মরিবার সময় যে স্বামীর মুখ দেখিতে পাইলাম না, এই দুঃখ। মরণেই আমার সুখ—কিন্তু যদি তাঁহাকে না দেখিয়া মরিলাম, তবে মরণেও দুঃখ। যদি এ সময়ে একবার তাঁহাকে দেখিতে পাই, তবে মরণেই আমার সুখ।"

ব্রহ্মচারীও চক্ষু মুছিলেন। বলিলেন, "তোমার স্বামী কোথায়? এখন তোমাকে তাঁহার কাছে লইয়া যাইবার উপায় নাই। কিন্তু তিনি যদি সংবাদ দিলে, এখানে আসিতে পারেন, তবে আমি তাঁহাকে পত্রের দ্বারা সংবাদ দিই।"

সূর্য্যমুখীর রোগক্লিষ্ট মুখে হর্ষবিকাশ হইল। তখন আবার ভগ্নোৎসাহ হইয়া কহিলেন, "তিনি আসিলে আসিতে পারেন, কিন্তু আসিবেন কি না, জানি না। আমি তাঁহার কাছে গুরুতর অপরাধে অপরাধী—তবে তিনি আমার পক্ষে দয়াময়—ক্ষমা করিলেও করিতে পারেন। কিন্তু তিনি অনেক দূরে আছেন—আমি ততদিন বাঁচিব কি?"

ব্রহ্ম। কতদূরে সে?

সূর্য্য। হরিপুর জেলা।

ব্রহ্ম। বাঁচিবে।

এই বলিয়া ব্রহ্মচারী কাগজ-কলম লইয়া আসিলেন এবং সূর্য্যমুখীর কথামত নিম্নলিখিত মত পত্র লিখিলেন :—

"আমি মহাশয়ের নিকট পরিচিত নহি। আমি ব্রাহ্মণ—ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে আছি। আপনি কে, তাহাও আমি জানি না। কেবল এই মাত্র জানি যে, শ্রীমতী সূর্য্যমুখী দাসী আপনার ভার্য্যা। তিনি এই মধুপুর গ্রামে সঙ্কটাপন্ন রোগগ্রস্ত হইয়া হরমণি বৈষ্ণবীর বাড়ীতে আছেন। তাঁহার চিকিৎসা

হইতেছে,—কিন্তু বাঁচিবার আকার নহে। এই সংবাদ দিবার জন্য আপনাকে এই পত্র লিখিলাম। তাঁহার মানস—মৃত্যুকালে একবার আপনাকে দর্শন করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। যদি তাঁহার অপরাধ ক্ষমা করিতে পারেন, তবে একবার এই স্থানে আসিবেন। আমি তাঁহাকে মাতৃসম্বোধন করি। পুত্রস্বরূপ তাঁহার অনুমতিক্রমে এই পত্র লিখিলাম। তাঁহার নিজের লিখিবার শক্তি নাই।

"যদি আসা মত হয়, তবে রাণীগঞ্জের পথে আসিবেন। রাণীগঞ্জে অনুসন্ধান করিয়া শ্রীমান্ মাধবচন্দ্র গোস্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন। তাঁহাকে আমার নাম করিয়া বলিলে, তিনি সঙ্গে লোক দিবেন। তাহা হইলে মধুপুর খুঁজিয়া বেড়াইতে হইবে না।

"আসিতে হয় ত শীঘ্র আসিবেন, আসিতে বিলম্ব হইলে অভীষ্টসিদ্ধি হইবে না। ইতি শিবপ্রসাদ শর্ম্মা।"

পত্র লিখিয়া ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাহার নামে শিরোনামা দিব?"

সূর্য্যমুখী বলিলেন, "হরমণি আসিলে বলিব।"

হরমণি আসিলে নগেন্দ্রনাথ দত্তের নামে শিরোনামা দিয়া ব্রহ্মচারী পত্রখানি নিকটস্থ ডাকঘরে দিতে গেলেন।

ব্রহ্মচারী যখন পত্র হাতে লইয়া ডাকে দিতে গেলেন, তখন সূর্য্যমুখী সজলনয়নে, যুক্তকরে, ঊর্দ্ধমুখে, জগদীশ্বরের নিকট কায়মনোবাক্যে ভিক্ষা করিলেন,—"হে পরমেশ্বর! যদি তুমি সত্য হও, আমার যদি পতিভক্তি থাকে, তবে যেন এই পত্রখানি সফল হয়। আমি চিরকাল স্বামীর চরণ ভিন্ন কিছু জানি না—ইহাতে যদি পুণ্য থাকে, তবে সে পুণ্যের ফলে আমি স্বর্গ চাহি না। কেবল এই চাই, যেন মৃত্যুকালে স্বামীর মুখ দেখিয়া মরি।"

কিন্তু পত্র ত নগেন্দ্রের নিকট পৌঁছিল না। পত্র যখন গোবিন্দপুরে পৌঁছিল, তাহার অনেক পূর্ব্বে নগেন্দ্র দেশপর্য্যটনে যাত্রা করিয়াছিলেন। হরকরা পত্র বাড়ীর দেওয়ানের কাছে দিয়া গেল।

দেওয়ানের প্রতি নগেন্দ্রের আদেশ ছিল যে, "আমি যখন যেখানে পৌঁছিব, তখন সেইখান হইতে পত্র লিখিব। আমার আজ্ঞা পাইলে সেইখানে আমার নামের পত্রগুলি পাঠাইয়া দিবে।" ইতিপূর্ব্বে নগেন্দ্র পাটনা হইতে পত্র লিখিয়াছিলেন যে, "আমি নৌকাপথে কাশীযাত্রা করিলাম। কাশী পৌঁছিলে পত্র লিখিব। আমার পত্র পাইলে, সেখানে আমার পত্রাদি পাঠাইবে।" দেওয়ান এই সংবাদের প্রতীক্ষায় ব্রহ্মচারীর পত্র বাক্সমধ্যে বন্ধ করিয়া রাখিলেন।

যথাসময়ে নগেন্দ্র কাশীধামে আসিলেন। আসিয়া দেওয়ানকে সংবাদ দিলেন। তখন দেওয়ান অন্যান্য পত্রের সঙ্গে শিবপ্রসাদ ব্রহ্মচারীর পত্র পাঠাইলেন। নগেন্দ্র পত্র পাইয়া মর্ম্মাবগত হইয়া অঙ্গুলিদ্বারা কপাল টিপিয়া ধরিয়া কাতরে কহিলেন, "জগদীশ্বর! মুহূর্ত্তজন্য আমার চেতনা রাখ।" জগদীশ্বরের চরণে সে বাক্য পৌঁছিল, মুহূর্ত্তজন্য নগেন্দ্রের চেতনা রহিল; কর্ম্মাধ্যক্ষকে ডাকিয়া আদেশ করিলেন, "আজ রাত্রেই আমি রাণীগঞ্জ যাত্রা করিব—সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়াও তুমি তাহার বন্দোবস্ত কর।"

কর্ম্মাধ্যক্ষ বন্দোবস্ত করিতে গেল। নগেন্দ্র তখন ভূতলে ধূলির উপর শয়ন করিয়া, অচেতন হইলেন।

সেই রাত্রে নগেন্দ্র কাশী পশ্চাৎ করিলেন। ভুবনসুন্দরী বারাণসি! কোন্ সুখী জন এমন শারদ রাত্রে তৃপ্তলোচনে তোমাকে পশ্চাৎ করিয়া আসিতে পারে? নিশা চন্দ্রহীনা; আকাশে সহস্র সহস্র নক্ষত্র জ্বলিতেছে—গঙ্গাহৃদয়ে তরণীর উপর দাঁড়াইয়া যে দিকে চাও, সেই দিকে আকাশে নক্ষত্র—অনন্ত তেজে অনন্তকাল হইতে জ্বলিতেছে—অবিরত জ্বলিতেছে, বিরাম নাই। ভূতলে দ্বিতীয় আকাশ!—নীলাম্বরবৎ স্থিরনীল তরঙ্গিণীহৃদয়; তীরে সোপানে এবং অনন্ত পর্ব্বতশ্রেণীবৎ অট্টালিকায় সহস্র আলোক জ্বলিতেছে। প্রাসাদ পরে প্রাসাদ, তৎপরে প্রাসাদ, এইরূপ আলোকরাজিশোভিত অনন্ত প্রাসাদশ্রেণী। আবার সমুদয় সেই স্বচ্ছ নদীনীরে প্রতিবিম্বিত—আকাশ, নগর, নদী—সকলই জ্যোতির্ব্বিন্দুময়। দেখিয়া নগেন্দ্র চক্ষু মুছিলেন। পৃথিবীর সৌন্দর্য্য তাঁহার আজি সহ্য হইল না। নগেন্দ্র বুঝিয়াছিলেন যে, শিবপ্রসাদের পত্র অনেক দিনের পর পৌঁছিয়াছে—এখন সূর্য্যমুখী কোথায়?

ষট্‌ত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ

হীরার বিষবৃক্ষ মুকুলিত

যে দিন পাড়ে-গোষ্ঠী পাকা বাঁশের লাঠি হাতে করিয়া দেবেন্দ্রকে তাড়াইয়া দিয়াছিল, সে দিন

হীরা মনে মনে বড় হাসিয়াছিল। কিন্তু তাহার পরে তাহাকে অনেক পশ্চাত্তাপ করিতে হইল। হীরা মনে মনে ভাবিতে লাগিল, "আমি তাঁহাকে অপমানিত করিয়া ভাল করি নাই। তিনি না জানি মনে মনে আমার উপর কত রাগ করিয়াছেন। একে ত আমি তাঁহার মনের মধ্যে স্থান পাই নাই; এখন আমার সকল ভরসা দূর হইল।"

দেবেন্দ্রও আপন খলতাজনিত হীরার দণ্ডবিধানের মনস্কামসিদ্ধির অভিলাষ সম্পূর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মালতীর দ্বারা হীরাকে ডাকাইলেন। হীরা দুই এক দিন ইতস্ততঃ করিয়া শেষে আসিল। দেবেন্দ্র কিছুমাত্র রোষপ্রকাশ করিলেন না—ভূতপূর্ব্ব ঘটনার কোন উল্লেখ করিতে দিলেন না। সে সকল কথা ত্যাগ করিয়া তাহার সহিত মিষ্টালাপে প্রবৃত্ত হইলেন। যেমন উর্ণনাভ মক্ষিকার জন্য জাল পাতে, হীরার জন্য তেমনি দেবেন্দ্র জাল পাতিতে লাগিলেন। লুব্ধাশয়া হীরা-মক্ষিকা সহজেই সেই জালে পড়িল। সে দেবেন্দ্রের মধুরালাপে মুগ্ধ এবং তাহার কৈতববাদে প্রতারিত হইল। মনে করিল, ইহাই প্রণয়। দেবেন্দ্র তাহার প্রণয়ী। হীরা চতুরা, কিন্তু এখানে তাহার বুদ্ধি ফলোপধায়িনী হইল না। প্রাচীন কবিগণ যে শক্তিকে জিতেন্দ্রিয় মৃত্যুঞ্জয়ের সমাধিভঙ্গে ক্ষমতাশালিনী বলিয়া কীর্ত্তিত করিয়াছেন, সেই শক্তির প্রভাবে হীরার বুদ্ধিলোপ হইল।

দেবেন্দ্র সে সকল কথা ত্যাগ করিয়া, তানপুরা লইলেন এবং সুরাপানসমুৎসাহিত হইয়া গীতারম্ভ করিলেন। তখন দৈবকণ্ঠ কৃতবিদ্য দেবেন্দ্র এরূপ সুধাময় সঙ্গীতলহরী সৃজন করিলেন যে, হীরা শ্রুতিমাত্রাত্মক হইয়া একেবারে বিমোহিত হইল। তখন তাহার হৃদয় চঞ্চল, মন দেবেন্দ্রপ্রেমবিদ্রাবিত হইল। তখন তাহার চক্ষে দেবেন্দ্র সর্ব্বসংসারসুন্দর, সর্ব্বার্থসার, রমণীর সর্ব্বাদরণীয় বলিয়া বোধ হইল। হীরার চক্ষে প্রেমবিমুক্ত অশ্রুধারা বহিল।

দেবেন্দ্র তানপুরা রাখিয়া সযত্নে আপন বসনাগ্রভাগে হীরার অশ্রুবারি মুছাইয়া দিলেন; হীরার শরীর পুলক-কণ্টকিত হইল। তখন দেবেন্দ্র, সুরাপানদীপ্ত হইয়া, এরূপ হাস্যপরিহাসযুক্ত সরস সম্ভাষণ আরম্ভ করিলেন, কখনও বা এরূপ প্রণয়ীর অনুরূপ, স্নেহসিক্ত, অস্পষ্টালঙ্কারবচনে আলাপ করিতে লাগিলেন যে, জ্ঞানহীনা অপরিমার্জ্জিতবাগ্‌বুদ্ধি হীরা মনে করিল, এই স্বর্গসুখ। হীরা ত কখনও এমন কথা শুনে নাই। হীরা যদি বিমলচিত্ত হইত, এবং তাহার বুদ্ধি সৎসংসর্গপরিমার্জ্জিত হইত, তবে সে মনে করিত, এই নরক। পরে প্রেমের কথা পড়িল—প্রেম কাহাকে বলে, দেবেন্দ্র তাহা কিছুই কখন হৃদয়ঙ্গম করেন নাই—বরং হীরা জানিয়াছিল—কিন্তু দেবেন্দ্র তদ্বিষয়ে প্রাচীন কবিদিগের চর্ব্বিতচর্ব্বণে বিলক্ষণ পটু। দেবেন্দ্রের মুখে প্রেমের অনির্ব্বচনীয় মহিমাকীর্ত্তন শুনিয়া হীরা দেবেন্দ্রকে অমানুষিক চিত্তসম্পন্ন মনে করিল—স্বয়ং আপাদকবরী প্রেমরসার্দ্রা হইল। তখন আবার দেবেন্দ্র প্রথম-বসন্ত-প্রেরিত একমাত্র ভ্রমরঝঙ্কারবৎ গুন্ গুন্ স্বরে সঙ্গীতোদ্যম করিলেন। হীরা দুর্দ্দমনীয় প্রণয়স্ফূর্ত্তি-প্রযুক্ত সেই স্বরের সঙ্গে আপনার কামিনীসুলভ কলকণ্ঠধ্বনি মিলাইতে লাগিল। দেবেন্দ্র হীরাকে গায়িতে অনুরোধ করিলেন। তখন হীরা প্রেমার্দ্রচিত্তে, সুরারাগরঞ্জিত কমলনেত্র বিস্ফারিত করিয়া চিত্রিতবৎ ভ্রূযুগবিলাসে মুখমণ্ডল প্রফুল্ল করিয়া প্রস্ফুটস্বরে সঙ্গীতারম্ভ করিল। চিত্তস্ফূর্ত্তিবশতঃ তাহার কণ্ঠে উচ্চস্বর উঠিল। হীরা যাহা গায়িল, তাহা প্রেমবাক্য—প্রেমভিক্ষায় পরিপূর্ণ।

তখন সেই পাপমণ্ডপে বসিয়া পাপান্তঃকরণ দুই জনে পাপাভিলাষবশীভূত হইয়া চিরপাপরূপ চিরপ্রেম পরস্পরের নিকট প্রতিশ্রুত হইল। হীরা চিত্তসংযম করিতে জানিত, কিন্তু তাহাতে তাহার প্রবৃত্তি ছিল না বলিয়া, সহজে পতঙ্গবৎ বহ্নিমুখে প্রবেশ করিল। দেবেন্দ্রকে অপ্রণয়ী জানিয়া, চিত্তসংযমে প্রবৃত্তি হইয়াছিল, তাহাও অল্পদূর মাত্র; কিন্তু যতদূর অভিলাষ করিয়াছিল, ততদূর কৃতকার্য্য হইয়াছিল। দেবেন্দ্রকে অঙ্কাগত প্রাপ্ত হইয়া, হাসিতে হাসিতে তাঁহার কাছে প্রেম স্বীকার করিয়াও অবলীলাক্রমে তাঁহাকে বিমুখ করিয়াছিল। আবার সেই পুষ্পগত কীটাণুরূপ হৃদয়বেধকারী অনুরাগকে কেবল পরগৃহে কার্য্য উপলক্ষ করিয়া শমিত করিয়াছিল। কিন্তু যখন তাহার বিবেচনা হইল যে, দেবেন্দ্র প্রণয়শালী, তখন আর তাহার চিত্তদমনে প্রবৃত্তি রহিল না। এই অপ্রবৃত্তি হেতু বিষবৃক্ষে তাহার ভোগ্য ফল ফলিল।

লোকে বলে, ইহলোকে পাপের দণ্ড দেখা যায় না। ইহা সত্য হউক বা না হউক—তুমি দেখিবে না যে, চিত্তসংযমে অপ্রবৃত্ত ব্যক্তি ইহলোকে বিষবৃক্ষের ফল ভোগ করিল না।

—

সপ্তত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ

সূর্য্যমুখীর সংবাদ

বর্ষা গেল। শরৎকাল আসিল। শরৎকালও যায়। মাঠের জল শুকাইল। ধান সকল ফুলিয়া উঠিতেছে। পুষ্করিণীর পদ্ম ফুরাইয়া আসিল। প্রাতঃকালে বৃক্ষপল্লব হইতে শিশির ঝরিতে থাকে। সন্ধ্যাকালে মাঠে মাঠে ধূমাকার হয়। এমন সময়ে কার্ত্তিক মাসের একদিন প্রাতঃকালে মধুপুরের রাস্তার উপরে একখানি পাল্কী আসিল। পল্লীগ্রামে পাল্কী দেখিয়া দেশের ছেলে খেলা ফেলে পাল্কীর ধারে কাতার দিয়া দাঁড়াইল। গ্রামের ঝি, বউ, মাগী ছাগী, জলের কলসী কাঁকে নিয়া একটু তফাৎ দাঁড়াইল—কাঁকের কলসী কাঁকেই রহলি—অবাক্ হইয়া পাল্কী দেখিতে লাগিল। বউগুলি ঘোমটার ভিতর হইতে চোখ বাহির করিয়া দেখিতে লাগিল—আর আর স্ত্রীলোকেরা ফেল্ ফেল্ করিয়া চাহিয়া রহিল। চাষারা কার্ত্তিক মাসে ধান কাটিতেছিল—ধান ফেলিয়া, হাতে কাস্তে, মাথায় পাগড়ী, হাঁ করিয়া পাল্কী দেখিতে লাগিল। গ্রামের মণ্ডল মাতব্বর লোকে অমনি কমিটীতে বসিয়া গেল। পাল্কীর ভিতর হইতে একটা বুটওয়ালা পা বাহির হইয়াছিল। সকলেই সিদ্ধান্ত করিল, সাহেব আসিয়াছে—ছেলেরা ধ্রুব জানিত, বৌ আসিয়াছে।

পাল্কীর ভিতর হইতে নগেন্দ্র নাথ বাহির হইলেন। অমনি তাঁহাকে পাঁচ সাত জনে সেলাম করিল,—কেন না, তাঁহার পেণ্টলুন পরা, টুপি মাথায় ছিল। কেহ ভাবিল দারোগা, কেহ ভাবিল বরকন্দাজ সাহেব আসিয়াছেন।

দর্শকদিগের মধ্যে প্রাচীন এক ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া নগেন্দ্র শিবপ্রসাদ ব্রহ্মচারীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি নিশ্চিত জানিত, এখনই কোন খুনী মামলার সুরৎহাল হইবে—অতএব সত্য উত্তর দেওয়া ভাল নয়। সে বলিল, "আজ্ঞে, আমি মশাই ছেলেমানুষ, আমি অত জানি না।" নগেন্দ্র দেখিলেন, একজন ভদ্রলোকের সাক্ষাৎ না পাইলে কার্য্যসিদ্ধি হইবে না। গ্রামে অনেক ভদ্রলোকের বসতিও ছিল। নগেন্দ্রনাথ তখন একজন বিশিষ্ট লোকের বাড়ীতে গেলেন। সে গৃহের স্বামী রামকৃষ্ণ রায় কবিরাজ। রামকৃষ্ণ রায় একজন বাবু আসিয়াছেন দেখিয়া, যত্ন করিয়া একখানি চেয়ারের উপর নগেন্দ্রকে বসাইলেন। নগেন্দ্র ব্রহ্মচারীর সংবাদ তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন। রামকৃষ্ণ রায় বলিলেন, "ব্রহ্মচারী ঠাকুর এখানে নাই।" নগেন্দ্র বড় বিষণ্ণ হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তিনি কোথায় গিয়াছেন?"

উত্তর। তাহা বলিয়া যান নাই। কোথায় গিয়াছেন, তাহা আমরা জানি না। বিশেষ, তিনি একস্থানে স্থায়ী নহেন; সর্ব্বদা নানা স্থানে পর্য্যটন করিয়া বেড়া'ন।

নগেন্দ্র। কবে আসিবেন তাহা কেহ জানে?

রামকৃষ্ণ। তাঁহার কাছে আমার নিজেরও কিছু আবশ্যক আছে। এজন্য আমি সে কথারও তদন্ত করিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি যে কবে আসিবেন, তাহা কেহ বলিতে পারে না।

নগেন্দ্র বড় বিষণ্ণ হইলেন। পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কত দিন এখান হইতে গিয়াছেন?"

রামকৃষ্ণ। তিনি শ্রাবণ মাসে এখানে আসিয়াছিলেন। ভাদ্রমাসে গিয়াছেন।

নগেন্দ্র। ভাল, এ গ্রামে হরমণি বৈষ্ণবীর বাড়ী কোথায়, আমাকে কেহ দেখাইয়া দিতে পারেন?

রামকৃষ্ণ। হরমণির ঘর পথের ধারেই ছিল। কিন্তু, এখন আর তার সে ঘর নাই। সে ঘর আগুন লাগিয়া পুড়িয়া গিয়াছে।

নগেন্দ্র আপনার কপাল টিপিয়া ধরিলেন। ক্ষীণতর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হরমণি কোথায় আছে?"

রামকৃষ্ণ। তাহাও কেহ বলিতে পারে না। যে রাত্রে তাহার ঘরে আগুন লাগে, সেই অবধি সে কোথায় পলাইয়া গিয়াছে। কেহ কেহ এমনও বলে যে, সে আপনার ঘরে আপনি আগুন দিয়া পলাইয়াছে।

নগেন্দ্র ভগ্নস্বর হইয়া কহিলেন, "তাহার ঘরে কোন স্ত্রীলোক থাকিত?"

রামকৃষ্ণ রায় কহিলেন, না, কেবল শ্রাবণ মাস হইতে একটি বিদেশী স্ত্রীলোক পীড়িতা হইয়া আসিয়া তাহার বাড়ীতে ছিল। সেটিকে ব্রহ্মচারী কোথা হইতে আনিয়া তাহার বাড়ীতে রাখিয়াছিলেন। শুনিয়াছিলাম, তাহার নাম সূর্য্যমুখী। স্ত্রীলোকটি কাসরোগগ্রস্ত ছিল,—আমিই তাহার চিকিৎসা করি। প্রায় আরোগ্য করিয়া তুলিয়াছিলাম—এমন সময়ে—"

নগেন্দ্র হাঁপাইতে হাঁপাইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এমন সময়ে কি—"

রামকৃষ্ণ বলিলেন, "এমন সময়ে হরবৈষ্ণবীর গৃহদাহে ঐ স্ত্রীলোকটি পুড়িয়া মরিল।"

নগেন্দ্রনাথ চৌকী হইতে পড়িয়া গেলেন। মস্তকে দারুণ আঘাত পাইলেন। সেই আঘাতে মূর্চ্ছিত হইলেন, কবিরাজ তাঁহার শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলেন।

বাঁচিতে কে চাহে? এ সংসার বিষময়। বিষবৃক্ষ সকলেরই গৃহপ্রাঙ্গণে। কে ভালবাসিতে চাহে?

অষ্টত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ

এত দিনে সব ফুরাইল

এত দিনে সব ফুরাইল। সন্ধ্যাকালে যখন নগেন্দ্র দত্ত মধুপুর হইতে পাল্কীতে উঠিলেন, তখন এই কথা মনে মনে বলিলেন, "আমার এত দিনে সব ফুরাইল।"

কি ফুরাইল? সুখ? তা ত যেদিন সূর্য্যমুখী গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই দিনই ফুরাইয়াছিল। তবে এখন ফুরাইল কি? আশা। যতদিন মানুষের আশা থাকে, ততদিন কিছুই ফুরায় না, আশা ফুরাইলে সব ফুরাইল।

নগেন্দ্রের আজ সব ফুরাইল। সেই জন্য তিনি গোবিন্দপুর চলিলেন। গোবিন্দপুরে গৃহে বাস করিতে চলিলেন না; গৃহধর্ম্মের নিকট জন্মের শোধ বিদায় লইতে চলিলেন। সে অনেক কাজ। বিষয়-আশয়ের বিলিব্যবস্থা করিতে হইবে। জমিদারী, ভদ্রাসন-বাড়ী এবং অপরাপর স্বোপার্জ্জিত স্থাবর সম্পত্তি ভাগিনেয় সতীশচন্দ্রকে দানপত্রের দ্বারা লিখিয়া দিবেন—সে লেখাপড়া উকিলের বাড়ী নইলে হইবে না। অস্থাবর সকল সম্পত্তি কমলমণিকে দান করিবেন—সে সকল গুছাইয়া কলিকাতায় তাঁহার বাড়াতে পাঠাইয়া দিতে হইবে। কিছুমাত্র কাগজ আপনার সঙ্গে রাখিবেন—যে কয় বৎসর জীবিত থাকেন, সেই কয় বৎসর তাহাতেই তাঁহার নিজব্যয় নির্ব্বাহ হইবে। কুন্দনন্দিনীকে কমলমণির নিকট পাঠাইবেন। বিষয়-আশয়ের আয়ব্যয়ের কাগজপত্রসকল শ্রীশচন্দ্রকে বুঝাইয়া দিতে হইবে। আর সূর্য্যমুখী যে খাটে শুইতেন, সেই খাটে শুইয়া একবার কাঁদিবেন। সূর্য্যমুখীর অলঙ্কারগুলি লইয়া আসিবেন। সেগুলি কমলমণিকে দিবেন না—আপনার সঙ্গে রাখিবেন। যেখানে যাইবেন, সঙ্গে লইয়া যাইবেন। পরে যখন সময় উপস্থিত হইবে, তখন সেইগুলি দেখিতে দেখিতে মরিবেন। এই সকল আবশ্যক কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া নগেন্দ্র জন্মের শোধ ভদ্রাসন ত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার দেশপর্য্যটন করিবেন। আর যতদিন বাঁচিবেন, পৃথিবীর কোথাও এক কোণে লুকাইয়া থাকিয়া দিনপাত করিবেন।

শিবিকারোহণে এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে নগেন্দ্র চলিলেন। শিবিকা-দ্বার মুক্ত, রাত্রি কার্ত্তিকী জ্যোৎস্নাময়ী; আকাশে তারা; বাতাসে রাজপথিপার্শ্বস্থ টেলিগ্রাফের তার ধ্বনিত হইতেছিল। সে রাত্রে নগেন্দ্রের চক্ষে একটি তারাও সুন্দর বোধ হইল না। জ্যোৎস্না অত্যন্ত কর্কশ বোধ হইতে লাগিল। দৃষ্টপদার্থমাত্রেই চক্ষুঃশূল বলিয়া বোধ হইল। পৃথিবী অত্যন্ত নৃশংস। সুখের দিনে যে শোভা ধারণ করিয়া মনোহরণ করিয়াছিল, আজি সেই শোভা বিকাশ করে কেন? যে দীর্ঘতৃণে চন্দ্রকিরণ প্রতিবিম্বিত হওয়ায় হৃদয় স্নিগ্ধ হইত, আজি সে দীর্ঘতৃণ তেমনি সমুজ্জ্বল কেন? আজিও আকাশ তেমনি নীল, মেঘ তেমনি শ্বেত, নক্ষত্র তেমনি উজ্জ্বল, বায়ু তেমনি ক্রীড়াশীল। পশুগণ তেমনি বিচরণ করিতেছে; মনুষ্য তেমনি হাস্যপরিহাসে রত, পৃথিবী তেমনি অনন্তগামিনী; সংসার-স্রোত তেমনি অপ্রতিহত! জগতের দয়াশূন্যতা আর সহ্য হয় না। কেন পৃথিবী বিদীর্ণা হইয়া নগেন্দ্রকে শিবিকাসমেত গ্রাস করিল না?

নগেন্দ্র ভাবিয়া দেখিলেন, সব তাঁরই দোষ। তাঁহার তেত্রিশ বৎসর মাত্র বয়ঃক্রম হইয়াছে। ইহারই মধ্যে সব ফুরাইল। অথচ জগদীশ্বর তাঁহাকে যাহা দিয়াছিলেন, তাহার কিছুই ফুরাইবার নহে। যাহাতে যাহাতে মনুষ্য সুখী, সে সব তাঁহাকে ঈশ্বর যে পরিমাণে দিয়াছিলেন, সে পরিমাণে কাহাকেও দেন না। ধন, ঐশ্বর্য্য, সম্পদ, মান, এ সকল ভূমিষ্ঠ হইয়াই অসাধারণ পরিমাণে পাইয়াছিলেন। বুদ্ধি নহিলে এ সকল সুখ হয় না—তাহাতে বিধাতা কার্পণ্য করেন নাই। শিক্ষায় পিতা-মাতা ত্রুটি করেন নাই—তাঁহার তুল্য সুশিক্ষিত কে? রূপ, বল, স্বাস্থ্য, প্রণয়শীলতা, তাহাও ত প্রকৃতি তাঁহাকে অমিত হস্তে দিয়াছেন; ইহার অপেক্ষাও যে ধন দুর্লভ—যে একমাত্র সামগ্রী এ সংসারে অমূল্য—অশেষ প্রণয়শালিনী

সাধ্বী ভার্য্যা—ইহাও তাঁহার প্রসন্ন কপালে ঘটিয়াছিল। সুখের সামগ্রী পৃথিবীতে এত আর কাহার ছিল? আজি এত অসুখী পৃথিবীতে কে? আজ যদি তাঁহার সর্ব্বস্ব দিলে—ধন, সম্পদ, মান, রূপ, যৌবন, বিদ্যা, বুদ্ধি, সব দিলে—তিনি আপন শিবিকার এক জন বাহকের সঙ্গে অবস্থা পরিবর্ত্তন করিতে পারিতেন, তাহা হইলে স্বর্গসুখ মনে করিতেন। বাহক কি?—ভাবিলেন, এই দেশের রাজ-কারাগারে এমন কে নরঘ্ন পাপী আছে যে, আমার অপেক্ষা সুখী নয়? আমা হ'তে পবিত্র নয়? তারা ত অপরকে হত করিয়াছে, আমি সূর্য্যমুখীকে বধ করিয়াছি। আমি ইন্দ্রিয় দমন করিলে সূর্য্যমুখী বিদেশে আসিয়া কুটীরদাহে মরিবে কেন? আমি সূর্য্যমুখীর বধকারী—কে এমন পিতৃঘ্ন, মাতৃঘ্ন, পুত্রঘ্ন আছে যে, আমার অপেক্ষা গুরুতর পাপী? সূর্য্যমুখী কি কেবল আমার স্ত্রী? সূর্য্যমুখী আমার—সব। সম্বন্ধে স্ত্রী, সৌহার্দ্দে ভ্রাতা, যত্নে ভগিনী, আপ্যায়িত করিতে কুটুম্বিনী, স্নেহে মাতা, ভক্তিতে কন্যা, প্রমোদে বন্ধু, পরামর্শে শিক্ষক, পরিচর্য্যায় দাসী। আমার সূর্য্যমুখী—কাহার এমন ছিল? সংসারে সহায়, গৃহে লক্ষ্মী, হৃদয়ে ধর্ম্ম, কণ্ঠে অলঙ্কার! আমার নয়নের সর্ব্বস্ব! হৃদয়ের শোণিত, দেহের জীবন, জীবনের সর্ব্বস্ব! আমার প্রমোদে হর্ষ, বিষাদে শান্তি, চিন্তায় বুদ্ধি, কার্য্যে উৎসাহ! আর এমন সংসারে কি আছে? আমার দর্শনে আলোক, শ্রবণে সঙ্গীত, নিশ্বাসে বায়ু, স্পর্শে জগৎ। আমার বর্ত্তমানের সুখ, অতীতের স্মৃতি, ভবিষ্যতের আশা, পরলোকের পুণ্য। আমি শূকর, রত্ন চিনিব কেন?

হঠাৎ তাঁহার স্মরণ হইল যে, তিনি সুখে শিবিকারোহণে যাইতেছেন; সূর্য্যমুখী পথ হাঁটিয়া হাঁটিয়া পীড়িতা হইয়াছিলেন। অমনি নগেন্দ্র শিবিকা হইতে অবতরণ করিয়া পদব্রজে চলিলেন। বাহকেরা শূন্য শিবিকা পশ্চাৎ পশ্চাৎ আনিতে লাগিল। প্রাতে যে বাজারে আসিলেন, সেইখানে শিবিকা ত্যাগ করিয়া বাহকদিগকে বিদায় দিলেন। অবশিষ্ট পথ পদব্রজে অতিবাহিত করিলেন।

তখন মনে করিলেন, "এ জীবন এই সূর্য্যমুখীর বধের প্রায়শ্চিত্তে উৎসর্গ করিব। কি প্রায়শ্চিত্ত? সূর্য্যমুখী গৃহত্যাগ করিয়া যে সকল সুখে বঞ্চিতা হইয়াছিলেন—আমি সে সকল সুখভোগ ত্যাগ করিব; ঐশ্বর্য্য, সম্পদ্, দাস-দাসী, বন্ধু-বান্ধবের আর কোন সংস্রব রাখিব না। সূর্য্যমুখী গৃহত্যাগ করিয়া অবধি যে সকল ক্লেশ ভোগ করিয়াছিলেন, আমি সেই সকল ক্লেশ ভোগ করিব। যে দিন গোবিন্দপুর হইতে যাত্রা করিব, সেই দিন হইতে আমার গমন পদব্রজে, ভোজন কদন্ন, শয়ন বৃক্ষতলে বা পর্ণকুটীরে। আর কি প্রায়শ্চিত্ত? যেখানে যেখানে অনাথা স্ত্রীলোক দেখিব, সেইখানে প্রাণ দিয়া তাহার উপকার করিব। যে অর্থ নিজব্যয়ার্থে রাখিলাম, সেই অর্থে আপনার প্রাণধারণমাত্র করিয়া অবশিষ্ট সহায়হীনা স্ত্রীলোকদিগের সেবার্থে ব্যয় করিব। যে সম্পত্তি স্বত্ব ত্যাগ করিয়া সতীশকে দিব, তাহারও অর্দ্ধাংশ আমার যাবজ্জীবন সতীশ সহায়হীনা স্ত্রীলোকদিগের সাহায্যার্থ ব্যয় করিবে, ইহাও দানপত্রে লিখিয়া দিব। প্রায়শ্চিত্ত? নাই। দুঃখের প্রায়শ্চিত্ত কেবল মৃত্যু। মরিলেই দুঃখ যায়। সে প্রায়শ্চিত্ত না করি কেন? তখন চক্ষু হস্তে আবৃত করিয়া, জগদীশ্বরের নাম স্মরণ করিয়া নগেন্দ্রনাথ মৃত্যু আকাঙ্ক্ষা করিলেন।

ঊনচত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ

সব ফুরাইল, যন্ত্রণা ফুরায় না

রাত্রি প্রহরেকের সময় শ্রীশচন্দ্র একাকী বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন, এমন সময়ে—পদব্রজে নগেন্দ্র সেইখানে উপস্থিত হইয়া, স্বহস্তবাহিত কান্‌বাস ব্যাগ দূরে নিক্ষিপ্ত করিলেন। ব্যাগ রাখিয়া নীরবে একখানা চেয়ারের উপর বসিলেন।

শ্রীশচন্দ্র তাঁহার ক্লিষ্ট, মলিন মুখকান্তি দেখিয়া ভীত হইলেন; কি জিজ্ঞাসা করিবেন, কিছু বুঝিতে পারিলেন না। শ্রীশচন্দ্র জানিতেন যে, কাশীতে নগেন্দ্র ব্রহ্মচারীর পত্র পাইয়াছিলেন এবং পত্র পাইয়া মধুপুর যাত্রা করিয়াছিলেন। এ সকল কথা শ্রীশচন্দ্রকে লিখিয়া নগেন্দ্র কাশী হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন। এখন নগেন্দ্র আপনা হইতে কোন কথা বলিলেন না দেখিয়া, শ্রীশচন্দ্র নগেন্দ্রের নিকট গিয়া বসিলেন এবং তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন,—"ভাই নগেন্দ্র, তোমাকে নীরব দেখিয়া আমি বড় ব্যস্ত হইয়াছি। তুমি মধুপুর যাও নাই?"

নগেন্দ্র এইমাত্র বলিলেন, "গিয়াছিলাম।"

শ্রীশচন্দ্র ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্রহ্মচারীর সাক্ষাৎ পাও নাই?"

নগেন্দ্র। না।

শ্রীশ। সূর্য্যমুখীর কোন সংবাদ পাইলে? কোথায় তিনি?

নগেন্দ্র ঊর্দ্ধে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "স্বর্গে।"

শ্রীশচন্দ্র নীরব হইলেন। নগেন্দ্রও নীরব হইয়া মুখাবনত করিয়া রহিলেন। ক্ষণেক পরে মুখ তুলিয়া বলিলেন, "তুমি স্বর্গ মান না—আমি মানি।"

শ্রীশচন্দ্র জানিতেন, পূর্ব্বে নগেন্দ্র স্বর্গ মানিতেন না; বুঝিলেন যে, এখন মানেন। বুঝিলেন যে, এ স্বর্গ প্রেম ও বাসনার সৃষ্টি। "সূর্য্যমুখী কোথাও নাই" এ কথা সহ্য হয় না—"সূর্য্যমুখী স্বর্গে আছেন" এ চিন্তায় অনেক সুখ।

উভয়ে নীরব হইয়া বসিয়া রহিলেন। শ্রীশচন্দ্র জানিতেন যে, সান্ত্বনার কথার সময় এ নয়; এখন পরের কথা বিষবোধ হইবে। পরের সংসর্গও বিষ। এই বুঝিয়া শ্রীশচন্দ্র নগেন্দ্রের শয্যাদি করাইবার উদ্যোগে উঠিলেন। আহারের কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইল না; মনে করিলেন, সে ভার কমলকে দিবেন।

কমল শুনিলেন, সূর্য্যমুখী নাই। তখন আর তিনি কোন ভারই লইলেন না। সতীশকে একা ফেলিয়া, কমলমণি সে রাত্রের মত অদৃশ্য হইলেন—কমলমণি ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া আলুলায়িত কুন্তলে কাঁদিতেছেন দেখিয়া, দাসী সেইখানে সতীশচন্দ্রকে ছাড়িয়া দিয়া সরিয়া আসিল। সতীশচন্দ্র মাতাকে ধূলিধূসরা, নীরবে রোদনপরায়ণা দেখিয়া, প্রথমে নীরবে নিকটে বসিয়া রহিল। পরে মাতার চিবুকে ক্ষুদ্র কুসুমনিন্দিত অঙ্গুলি দিয়া, মুখ তুলিয়া দেখিতে যত্ন করিল। কমলমণি মুখ তুলিলেন, কিন্তু কথা কহিলেন না। সতীশ তখন মাতার প্রসন্নতার আকাঙ্ক্ষায়, তাঁহার মুখচুম্বন করিল। কমলমণি সতীশের অঙ্গে হস্ত প্রদান করিয়া আদর করিলেন, কিন্তু মুখচুম্বন করিলেন না, কথাও কহিলেন না। তখন সতীশ মাতার কণ্ঠে হস্ত দিয়া মাতার ক্রোড়ে শয়ন করিয়া রোদন করিল! সে বালকহৃদয়ে প্রবেশ করিয়া, বিধাতা ভিন্ন কে সে বালকরোদনের কারণ নির্ণয় করিবে?

শ্রীশচন্দ্র অগত্যা আপন বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া কিঞ্চিৎ খাদ্য লইয়া আপনি নগেন্দ্রের সম্মুখে রাখিলেন। নগেন্দ্র বলিলেন, "উহার আবশ্যক নাই—কিন্তু তুমি বসো। তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে—তাহা বলিতেই এখানে আসিয়াছি।"

তখন নগেন্দ্র, রামকৃষ্ণ রায়ের কাছে যাহা যাহা শুনিয়াছিলেন, সকল শ্রীশচন্দ্রের নিকট বিবৃত করিলেন। তাহার পর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যাহা যাহা কল্পনা করিয়াছিলেন, তাহা সকল বলিলেন।

শ্রীশচন্দ্র বলিলেন, "ব্রহ্মচারীর সঙ্গে পথে তোমার সাক্ষাৎ হয় নাই, ইহা আশ্চর্য্য! কেন না, গত কল্য কলিকাতা হইতে তোমার সন্ধানে তিনি মধুপুর যাত্রা করিয়াছেন।"

নগেন্দ্র। সে কি? তুমি ব্রহ্মচারীর সন্ধান কি প্রকারে পাইলে?

শ্রীশ। তিনি অতি মহৎ ব্যক্তি। তোমার পত্রের উত্তর না পাইয়া, তিনি তোমার সন্ধান করিতে স্বয়ং গোবিন্দপুরে আসিয়াছিলেন; গোবিন্দপুরেও তোমায় পাইলেন না; কিন্তু শুনিলেন যে, তাঁহার পত্র কাশীতে প্রেরিত হইবে। সেখানে তুমি পত্র পাইবে। অতএব আর ব্যস্ত না হইয়া এবং কাহাকেও কিছু না বলিয়া তিনি পুরুষোত্তম যাত্রা করেন। সেখান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তোমার সন্ধানার্থ পুনশ্চ গোবিন্দপুর গিয়াছিলেন। সেখানে তোমার কোন সংবাদ পাইলেন না—শুনিলেন, আমার কাছে তোমার সংবাদ পাইবেন। আমার কাছে আসিলেন। পরশ্ব আমার কাছে আসিয়াছিলেন, আমি তাঁহাকে তোমার পত্র দেখাইলাম। তিনি তখন মধুপুরে তোমার সাক্ষাৎ পাইবার ভরসায় কালি গিয়াছেন। কালি রাত্রে রাণীগঞ্জে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা ছিল।

নগেন্দ্র। আমি কাল রাণীগঞ্জে ছিলাম না, সূর্য্যমুখীর কথা তিনি তোমাকে কিছু বলিয়াছিলেন?

শ্রীশ। সে সকল কালি বলিব।

নগেন্দ্র। তুমি মনে করিতেছ, শুনিয়া আমার ক্লেশ-বৃদ্ধি হইবে। এ ক্লেশের আর বৃদ্ধি নাই। তুমি বল।

তখন শ্রীশচন্দ্র ব্রহ্মচারীর নিকট শ্রুত তাঁহার সহিত সূর্য্যমুখীর সঙ্গে পথে সাক্ষাতের কথা, পীড়ার কথা এবং চিকিৎসা ও অপেক্ষাকৃত আরোগ্যলাভের কথা বলিলেন। অনেক বাদ দিয়া বলিলেন—সূর্য্যমুখী কত দুঃখ পাইয়াছিলেন, সে সকল বলিলেন না।

শুনিয়া, নগেন্দ্র গৃহ হইতে নির্গত হইলেন। শ্রীশচন্দ্র সঙ্গে যাইতেছিলেন, কিন্তু নগেন্দ্র বিরক্ত হইয়া নিষেধ করিলেন। পথে পথে নগেন্দ্র রাত্রি

দুই প্রহর পর্য্যন্ত পাগলের মত বেড়াইলেন। ইচ্ছা, জনস্রোতোমধ্যে আত্মবিস্মৃতি লাভ করেন। কিন্তু জনস্রোত তখন মন্দীভূত হইয়াছিল—আর আত্মবিস্মৃতি কে লাভ করিতে পারে? তখন পুনর্ব্বার শ্রীশচন্দ্রের গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। শ্রীশচন্দ্র আবার নিকটে বসিলেন। নগেন্দ্র বলিলেন, "আরও কথা আছে। তিনি কোথায় গিয়াছিলেন, কি করিয়াছিলেন, তাহা ব্রহ্মচারী অবশ্য তাঁহার নিকট শুনিয়া থাকিবেন। ব্রহ্মচারী তোমাকে বলিয়াছিলেন কি?"

শ্রীশ। আজি আর সে কথায় কাজ কি? আজি শ্রান্ত আছ, বিশ্রাম কর।

নগেন্দ্র ভ্রূকুটি করিয়া মহা পরুষকণ্ঠে কহিলেন, "বল?" শ্রীশচন্দ্র নগেন্দ্রের মুখপ্রতি চাহিয়া দেখিলেন, নগেন্দ্র পাগলের মত হইয়াছেন; বিদ্যুদ্গর্ভ মেঘের মত তাঁহার মুখ কালীময় হইয়াছে। ভীত হইয়া শ্রীশচন্দ্র বলিলেন, "বলিতেছি।" নগেন্দ্রের মুখ প্রসন্ন হইল, শ্রীশচন্দ্র সংক্ষেপে বলিলেন, "গোবিন্দপুর হইতে সূর্য্যমুখী স্থলপথে অল্প অল্প করিয়া প্রথমে পদব্রজে এই দিকে আসিয়াছিলেন।"

নগেন্দ্র। প্রত্যহ কত পথ চলিত?

শ্রীশ। এক ক্রোশ, দেড় ক্রোশ।

নগেন্দ্র। তিনি ত একটি পয়সাও লইয়া বাড়ী হইতে যান নাই—দিনপাত হইত কিসে?

শ্রীশ। কোন দিন উপবাস—কোন দিন ভিক্ষা—তুমি পাগল।

এই বলিয়া শ্রীশচন্দ্র নগেন্দ্রকে তাড়না করিলেন। কেন না, নগেন্দ্র আপনার হস্ত দ্বারা আপনার কণ্ঠ রোধ করিতেছেন দেখিতে পাইলেন। বলিলেন, "মরিলে কি সূর্য্যমুখীকে পাইবে?" এই বলিয়া নগেন্দ্রের হস্ত লইয়া আপনার হস্তমধ্যে রাখিলেন। নগেন্দ্র বলিলেন, "বল।"

শ্রীশ। তুমি স্থির হইয়া না শুনিলে আমি আর বলিব না।

কিন্তু শ্রীশচন্দ্রের কথা আর নগেন্দ্রের কর্ণে প্রবেশ হইল না। তাঁহার চেতনা বিলুপ্ত হইয়াছিল। নগেন্দ্র মুদ্রিতনয়নে স্বর্গারূঢ়া সূর্য্যমুখীর রূপ ধ্যান করিতেছিলেন। দেখিতেছিলেন—তিনি রত্নসিংহাসনে রাজরাণী হইয়া বসিয়াছেন; চারিদিক্ হইতে শীতল সুগন্ধময় পবন তাঁহার অলকদাম দুলাইতেছে; চারিদিকে পুষ্পনির্ম্মিত বিহঙ্গমগণ উড়িয়া বীণারবে গান করিতেছে। দেখিলেন, তাঁহার পদতলে শত শত কোকনদ ফুটিয়া রহিয়াছে; তাঁহার সিংহাসন-চন্দ্রাতপে শতচন্দ্র জ্বলিতেছে; চারিপার্শ্বে শত শত নক্ষত্র জ্বলিতেছে। দেখিলেন, নগেন্দ্র স্বয়ং এক অন্ধকারপূর্ণ স্থানে পড়িয়া আছেন; তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে বেদনা; অসুরে তাঁহাকে বেত্রাঘাত করিতেছে; সূর্য্যমুখী অঙ্গুলীসঙ্কেতে তাহাদিগকে নিষেধ করিতেছেন।

অনেক যত্নে শ্রীশচন্দ্র নগেন্দ্রের চেতনাবিধান করিলেন। চেতনাপ্রাপ্ত হইয়া নগেন্দ্র উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন,—"সূর্য্যমুখি! প্রাণাধিকে! কোথায় তুমি?" চীৎকার শুনিয়া শ্রীশচন্দ্র স্তম্ভিত এবং ভীত হইয়া নীরবে বসিলেন। ক্রমে নগেন্দ্র স্বভাবে পুনঃস্থাপিত হইয়া বলিলেন, "বল।"

শ্রীশচন্দ্র ভীত হইয়া বলিলেন, "আর কি বলিব?"

নগেন্দ্র। বল, নহিলে আমি এখনই প্রাণত্যাগ করিব।

ভীত শ্রীশচন্দ্র পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন, "সূর্য্যমুখী অধিক দিন এইরূপ কষ্ট পান নাই। এক জন ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ সপরিবারে কাশী যাইতেছিলেন। তিনি কলিকাতা পর্য্যন্ত নৌকাপথে আসিতেছিলেন। এক দিন নদীকূলে সূর্য্যমুখী বৃক্ষমূলে শয়ন করিয়া ছিলেন, ব্রাহ্মণেরা সেইখানে পাক করিতে উঠিয়াছিলেন। গৃহিণীর সহিত সূর্য্যমুখীর আলাপ হয়। সূর্য্যমুখীর অবস্থা দেখিয়া এবং চরিত্রে প্রীতা হইয়া ব্রাহ্মণগৃহিণী তাঁহাকে নৌকায় তুলিয়া লইলেন। সূর্য্যমুখী তাঁহার সাক্ষাতে বলিয়াছিলেন যে, তিনিও কাশী যাইবেন।"

নগেন্দ্র। সে ব্রাহ্মণের নাম কি? বাটী কোথায়?

নগেন্দ্র মনে মনে কি প্রতিজ্ঞা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহার পর?"

শ্রীশ। ব্রাহ্মণের সঙ্গে তাঁহার পরিবারস্থার ন্যায় সূর্য্যমুখী বর্হি পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। কলিকাতা পর্য্যন্ত নৌকায়, কলিকাতা হইতে রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত রেলে, রাণীগঞ্জ হইতে বুলক্ ট্রেণে গিয়াছিলেন; এ পর্য্যন্ত হাঁটিয়া ক্লেশ পান নাই।

নগেন্দ্র। তার পর কি ব্রাহ্মণ তাঁকে বিদায় দিল?

শ্রীশ। না, সূর্য্যমুখী আপনি বিদায় লইলেন। তিনি আর কাশী গেলেন না। কত দিন তোমাকে না দেখিয়া থাকিবেন? তোমাকে দেখিবার মানসে বর্হি হইতে পদব্রজে ফিরিলেন।

কথা বলিতে শ্রীশচন্দ্রের চক্ষে জল আসিল। তিনি নগেন্দ্রের মুখপানে চাহিয়া দেখিলেন। শ্রীশচন্দ্রের চক্ষের জলে নগেন্দ্রের বিশেষ উপকার হইল। তিনি শ্রীশচন্দ্রের কণ্ঠলগ্ন হইয়া তাঁহার কাঁধে মাথা রাখিয়া রোদন করিলেন। শ্রীশচন্দ্রের বাটী আসিয়া এ পর্য্যন্ত নগেন্দ্র রোদন করেন নাই, —তাঁহার শোক রোদনের অতীত। এখন রুদ্ধ-শোকপ্রবাহ বেগে বহিল। নগেন্দ্র শ্রীশচন্দ্রের স্কন্ধে মুখ রাখিয়া বালকের মত বহুক্ষণ রোদন করিলেন। উহাতে যন্ত্রণার অনেক উপশম হইল, যে শোকে রোদন নাই, সে যমের দূত।

নগেন্দ্র কিছু শান্ত হইলে শ্রীশচন্দ্র বলিলেন, "এ সব কথায় আজ আর আবশ্যক নাই।"

নগেন্দ্র বলিলেন, "আর বলিবেই বা কি? অবশিষ্ট যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা ত চক্ষে দেখিতে পাইতেছি। বহি হইতে তিনি একাকিনী পদব্রজে মধুপুরে আসিয়াছিলেন। পথ হাঁটিয়া পরিশ্রমে, অনাহারে, রৌদ্রে, বৃষ্টিতে, নিরাশ্রয়ে আর মনের ক্লেশে সূর্য্যমুখী রোগগ্রস্ত হইয়া মরিবার জন্য পথে পড়িয়াছিলেন।"

শ্রীশচন্দ্র নীরব হইয়া রহিলেন। পরে কহিলেন, "ভাই, বৃথা কেন আর সে কথা ভাব? তোমার দোষ কিছুই নাই। তুমি তাঁর অমতে বা অবাধ্য হইয়া কিছুই কর নাই। যাহা আত্মদোষে ঘটে নাই, তার জন্য অনুতাপ বুদ্ধিমানে করে না।"

নগেন্দ্রনাথ বুঝিলেন না। তিনি জানিতেন, তাঁরই সকল দোষ; তিনি কেন বিষবৃক্ষের বীজ হৃদয় হইতে উচ্ছিন্ন করেন নাই?

চত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ

হীরার বিষবৃক্ষের ফল

হীরা মহারত্ন কপর্দ্দকের বিনিময়ে বিক্রয় করিল। ধর্ম্ম চিরকষ্টে রক্ষিত হয়, কিন্তু এক দিনের অসাবধানতায় বিনষ্ট হয়। হীরার তাই হইল। যে ধনের লোভে হীরা এই মহারত্ন বিক্রয় করিল, সে এক কড়া কাণা কড়ি। কেন না, দেবেন্দ্রের প্রেম বন্যার জলের মত; যেমন পঙ্কিল, তেমনি ক্ষণিক। তিন দিনে বন্যার জল সরিয়া গেল, হীরাকে কাদায় বসাইয়া রাখিয়া গেল। যেমন কোন কোন কৃপণ অথচ যশোলিপ্সু ব্যক্তি বহুকালাবধি প্রাণপণে সঞ্চিতার্থ রক্ষা করিয়া, পুত্রোদ্বাহ বা অন্য উৎসব উপলক্ষে এক দিনের সুখের জন্য ব্যয় করিয়া ফেলে, হীরা তেমনি এত দিন যত্নে ধর্ম্মরক্ষা করিয়া, এক দিনের সুখের জন্য তাহা নষ্ট করিয়া উৎসৃষ্টার্থ কৃপণের ন্যায় চিরানুশোচনার পথে দণ্ডায়মান হইল। ক্রীড়াশীল বালক কর্ত্তৃক অল্পোপভুক্ত অপক্ব চূতফলের ন্যায়, হীরা দেবেন্দ্রকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলে, প্রথমে হৃদয়ে দারুণ ব্যথা পাইল। কিন্তু কেবল পরিত্যক্ত নহে —সে দেবেন্দ্র দ্বারা যেরূপ অপমানিত ও মর্ম্মপীড়িত হইয়াছিল, তাহা স্ত্রীলোক মধ্যে অতি অধমারও অসহ্য।

যখন, দেখা সাক্ষাতের শেষ দিনে হীরা দেবেন্দ্রের চরণাবলুণ্ঠিতা হইয়া বলিয়াছিল যে, "দাসীরে পরিত্যাগ করিও না", তখন দেবেন্দ্র তাহাকে বলিয়াছিলেন যে, "আমি কেবল কুন্দ-নন্দিনীর লোভে তোমাকে এত দূর সম্মানিত করিয়াছিলাম—যদি কুন্দের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ করাইতে পার, তবেই তোমার সঙ্গে আমার আলাপ থাকিবে—নচেৎ এই পর্য্যন্ত। তুমি যেমন গর্ব্বিতা, তেমনি আমি তোমাকে প্রতিফল দিলাম; এখন তুমি এই কলঙ্কের ডালি মাথায় লইয়া গৃহে যাও।"

হীরা ক্রোধে অন্ধকার দেখিতে লাগিল। যখন তাহার মস্তক স্থির হইল, তখন সে দেবেন্দ্রের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ভ্রূকুটী কুটিল করিয়া, চক্ষু আরক্ত করিয়া, যেন শতমুখে দেবেন্দ্রকে তিরস্কার করিল। মুখরা পাপিষ্ঠা স্ত্রীলোকেই যেরূপ তিরস্কার করিতে জানে, সেইরূপ তিরস্কার করিল। তাহাতে দেবেন্দ্রের ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। তিনি হীরাকে পদাঘাত করিয়া প্রমোদোদ্যান হইতে বিদায় করিলেন। হীরা পাপিষ্ঠা—দেবেন্দ্র পাপিষ্ঠ এবং পশু। এইরূপ উভয়ের চিরপ্রেমের প্রতিশ্রুতি সফল হইয়া পরিণত হইল।

হীরা পদাহত হইয়া গৃহে গেল না। গোবিন্দপুরে এক জন চণ্ডাল চিকিৎসা-ব্যবসায় করিত সে কেবল চণ্ডালাদি ইতরজাতির চিকিৎসা করিত। চিকিৎসা বা ঔষধ কিছুই জানিত না— কেবল বিষবড়ীর সাহায্যে লোকের প্রাণসংহার করিত। হীরা জানিত যে, সে বিষবড়ী প্রস্তুত করার জন্য উদ্ভিজ্জবিষ, খনিজবিষ, সর্পবিষাদি নানা প্রকার সদ্যঃপ্রাণাপহারী বিষ সংগ্রহ করিয়া রাখিত। হীরা সেই রাত্রে তাহার ঘরে গিয়া

তাহাকে ডাকিয়া গোপনে বলিল যে, "একটা শেয়ালে রোজ আমার হাঁড়ী খাইয়া যায়। আমি সে শেয়ালটাকে না মারিলে তিষ্টিতে পারি না। মনে করিয়াছি, ভাতের সঙ্গে বিষ মিশাইয়া রাখিব—সে আজ হাঁড়ী খাইতে আসিলে, বিষ খাইয়া মরিবে। তোমার কাছে অনেক বিষ আছে। সদ্যঃ প্রাণ নষ্ট হয়, এমন বিষ আমাকে বিক্রয় করিতে পার ?"

চণ্ডাল শিয়ালের গল্পে বিশ্বাস করিল না। বলিল, "আমার কাছে যাহা চাহ, তাহা আছে। কিন্তু আমি তাহা বিক্রয় করিতে পারি না। আমি বিষ বিক্রয় করিয়াছি, জানিলে আমাকে পুলিসে ধরিবে।"

হীরা বলিল, "তোমার কোন চিন্তা নাই। তুমি যে বিক্রয় করিয়াছ, ইহা কেহ জানিবে না—আমি ইষ্টদেবতা আর গঙ্গার দিব্য করিয়া বলিতেছি। দুইটা শিয়াল মরে, এতটা বিষ আমাকে দাও, আমি তোমাকে পঞ্চাশ টাকা দিব।"

চণ্ডাল নিশ্চিত মনে বুঝিল যে, এ কাহার প্রাণ বিনাশ করিবে। কিন্তু পঞ্চাশ টাকার লোভ সংবরণ করিতে পারিল না। বিষ বিক্রয়ে স্বীকৃত হইল। হীরা গৃহ হইতে টাকা আনিয়া চণ্ডালকে দিল। চণ্ডাল তীব্র মানুষঘাতী হলাহল কাগজে মুড়িয়া হীরাকে দিল। হীরা গমনকালে কহিল, "দেখিও, এ কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না—তাহা হইলে আমাদের উভয়েরই অমঙ্গল।"

চণ্ডাল কহিল, "মা! আমি তোমাকে চিনিও না।" হীরা তখন নিঃশঙ্ক হইয়া গৃহে গমন করিল।

গৃহে গিয়া, বিষের মোড়ক হস্তে করিয়া অনেক রোদন করিল। পরে চক্ষু মুছিয়া, মনে মনে কহিল, "আমি কি দোষে বিষ খাইয়া মরিব ? যে আমাকে মারিল, আমি তাহাকে না মারিয়া আপনি মরিব কেন ? এ বিষ আমি খাইব না। যে আমার এ দশা করিয়াছে, হয় সেই ইহা খাইবে, নহিলে তাহার প্রেয়সী কুন্দনন্দিনী ইহা ভক্ষণ করিবে। ইহাদের এক জনকে মারিয়া, পরে মরিতে হয় মরিব।"

একচত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ

হীরার আয়ি

"হীরার আয়ি বুড়ী।
গোবরের ঝুড়ি।
হাঁটে গুড়ি গুড়ি।
দাঁতে ভাঙ্গে মুড়ি।
কাঁটাল খায় দেড় বুড়ি।"

হীরার আয়ি লাঠি ধরিয়া গুড়ি গুড়ি যাইতেছিল, পশ্চাৎ পশ্চাৎ বালকের পাল এই অপূর্ব্ব কবিতাটি পাঠ করিতে করিতে করতালি দিতে দিতে এবং নাচিতে নাচিতে চলিয়াছিল।

এই কবিতাতে বিশেষ কোন নিন্দার কথা ছিল কি না, সন্দেহ—কিন্তু হীরার আয়ি বিলক্ষণ কোপাবিষ্ট হইয়াছিল। সে বালকদিগকে যমের বাড়ী যাইতে অনুজ্ঞা প্রদান করিতেছিল—এবং তাহাদিগের পিতৃপুরুষের আহারাদির বড় অন্যায় ব্যবস্থা করিতেছিল। এইরূপ প্রায় প্রত্যহই হইত।

নগেন্দ্রের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া হীরার আয়ি বালকদিগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইল, দ্বারবান্‌দিগের ভ্রমরকৃষ্ণ শ্মশ্রুরাজি দেখিয়া তাহারা রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইল। পলায়নকালে কোন বালক বলিল;—

"রামচরণ দোবে,
সন্ধ্যাবেলা শোবে,
চোর এলে কোথায় পালাবে ?"

কেহ বলিল;—

"রামদীন পাঁড়ে,
বেড়ায় লাঠি ঘাড়ে,
চোর দেখলে দৌড় মারে পুকুরের পাড়ে।"

কেহ বলিল;—

"লালচাঁদ সিং
নাচে তিড়িং মিড়িং,
ডালরুটির যম কিন্তু কাজে ঘোড়ার ডিম।"

বালকেরা দ্বারবান্‌দিগের দ্বারা নানাবিধ অভিধান-ছাড়া শব্দে অভিহিত হইয়া পলায়ন করিল।

হীরার আয়ি লাঠি ঠক্ ঠক্ করিয়া নগেন্দ্রের বাড়ীর ডাক্তারখানায় উপস্থিত হইল। ডাক্তারকে দেখিয়া, চিনিয়া বুড়ী কহিল,—

"হাঁ বাবা—ডাক্তার বাবা কোথা গা ?" ডাক্তার কহিলেন, "আমিই ত ডাক্তার।" বুড়ী কহিল, "আর

বাবা চোখে দেখতে পাইনে—বয়স হ'লো পাঁচ সাত গণ্ডা, কি এক পোণই হয়—আমার দুঃখের কথা বলিব কি—একটা বেটা ছিল, তা যমকে দিলাম—এখন একটি নাত্নী ছিল, তারও—" বলিয়া বুড়ী হাঁউ—মাউ—খাঁউ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল।

ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিল, "কি হইয়াছে তোর ?"

বুড়ী সে কথার উত্তর না দিয়া আপনার জীবন-চরিত্র আখ্যাত করিতে আরম্ভ করিল এবং অনেক কাঁদাকাটার পর তাহা সমাপ্ত করিলে, ডাক্তারকে আবার জিজ্ঞাসা করিতে হইল—"এখন তুই চা হস্ কি ? তোর কি হইয়াছে ?"

বুড়ী তখন পুনর্ব্বার আপন জীবনচরিতের অপূর্ব্ব কাহিনী আরম্ভ করিতেছিল, কিন্তু ডাক্তার বড় বিরক্ত হওয়ায়, তাহা পরিত্যাগ করিয়া হীরার ও হীরার মাতার ও হীরার পিতার ও হীরার স্বামীর জীবনচরিত আখ্যান আরম্ভ করিল। ডাক্তার বহুকষ্টে তাহার মর্ম্মার্থ বুঝিলেন—কেন না তাহাতে আত্মপরিচয় ও রোদনের বিশেষ বাহুল্য।

মর্ম্মার্থ এই যে, বুড়ী হীরার জন্য একটু ঔষধ চাহে। রোগ, বাতিক। হীরা গর্ভে থাকা কালে, তাহার মাতা উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছিল। সে সেই অবস্থায় কিছুকাল থাকিয়া সেই অবস্থাতেই মরে। হীরা বাল্যকাল হইতে অত্যন্ত বুদ্ধিমতী—তাহাতেই কখনও মাতৃব্যাধির কোন লক্ষণ দৃষ্ট হয় নাই, কিন্তু আজিকালি বুড়ীর কিছু সন্দেহ হইয়াছে। হীরা এখন কখনও কখনও একা হাসে, একা কাঁদে! কখনও বা ঘরে দ্বার দিয়া নাচে, কখনও চীৎকার করে। কখনও মূর্চ্ছা যায়। বুড়ী ডাক্তারের কাছে ইহার ঔষধ চাহিল।

ডাক্তার চিন্তা করিয়া বলিলেন, "তোর নাত্নীর হিষ্টিরিয়া হইয়াছে।"

বুড়ী জিজ্ঞাসা করিল, "তা বাবা! ইষ্টিরসের ঔষধ নাই ?"

ডাক্তার বলিলেন, "ঔষধ আছে বৈ কি। উহাকে খুব গরমে রাখিস্ আর এই কাষ্টর-অয়েল-টুকু লইয়া যা—কাল প্রাতে খাওয়াইস্। পরে অন্য ঔষধ দিব।" ডাক্তার বাবুর বিদ্যাটা ঐ রকম।

বুড়ী কাষ্টর-অয়েলের শিশি হাতে লাঠি ঠক্ ঠক্ করিয়া চলিল। পথে এক জন প্রতিবাসিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "কি গো হীরের আয়ি, তোমার হাতে ও কি ?"

হীরার আয়ি কহিল যে, "হীরের ইষ্টিরস হয়েছে, তাই ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম, সে একটু কেষ্টরস দিয়েছে। তা হাঁ গা, কেষ্টরসে কি ইষ্টিরস্ ভাল হয় ?"

প্রতিবাসিনী অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল,—"তা হবেও বা। কেষ্টই ত সকলের ইষ্টি। তা তাঁর অনুগ্রহে ইষ্টিরস ভাল হইতে পারে। আচ্ছা, হীরার আয়ি, তোর নাত্নীর এত রস হয়েছে কোথা থেকে ?" হীরার আয়ি অনেক ভাবিয়া বলিল, "বয়সদোষে অমন হয়।"

প্রতিবাসিনী কহিল, "একটু কৈলে বাছুরের চোনা খাইয়ে দিও। শুনিয়াছি, তাহাতে বড় রস পরিপাক হয়।"

বুড়ী বাড়ী গেলে তাহার মনে পড়িল যে, ডাক্তার গরমে রাখার কথা বলিয়াছে। বুড়ী হীরার সম্মুখে এক কড়া আগুন আনিয়া উপস্থিত করিল। হীরা বলিল, "মর্, আগুন কেন ?" বুড়ী বলিল, "ডাক্তার তোকে গরম করতে বলেছে।"

দ্বিচত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ

অন্ধকার পুরী—অন্ধকার জীবন

গোবিন্দপুরে দত্তদিগের বৃহৎ অট্টালিকা, ছয় মহল বাড়ী—নগেন্দ্র সূর্য্যমুখী বিনা সব অন্ধকার। কাছারীবাড়ীতে আমলারা বসে, অন্তঃপুরে কেবল কুন্দনন্দিনী, নিত্যপ্রতিপাল্য কুটুম্বিনীদিগের সহিত বাস করে। কিন্তু চন্দ্র বিনা রোহিণীতে আকাশের কি অন্ধকার যায় ? কোণে কোণে মাকড়সার জাল—ঘরে ঘরে ধূলার রাশি, কার্ণিসে কার্ণিসে পায়রার বাসা, কড়িতে কড়িতে চড়ুই। বাগানে শুকনা পাতার রাশি, পুকুরেতে পানা। উঠানেতে শিয়ালা, ফুলবাগানে জঙ্গল, ভাণ্ডার-ঘরে ইন্দুর। জিনিষপত্র ঘেরাটোপে ঢাকা, অনেকেতেই ছাতা ধরেছে। অনেক ইন্দুরে কেটেছে। ছুঁচো, বিছা, বাদুড়, চামচিকে অন্ধকারে, অন্ধকারে দিবারাত্র বেড়াইতেছে। সূর্য্যমুখীর পোষা পাখীগুলিকে প্রায় বিড়ালে ভক্ষণ করিয়াছে। কোথাও কোথাও ভোজনাবশিষ্ট পাখীগুলি পড়িয়া আছে। হাঁসগুলা শৃগালে মারিয়াছে। ময়ূরগুলা বুনো হইয়া গিয়াছে। গোরুগুলার হাড় উঠিয়াছে—আর দুধ দেয় না। নগেন্দ্রের কুকুরগুলার স্ফূর্ত্তি নাই, খেলা নাই, ডাক নাই—বাঁধাই থাকে। কোনটা মরিয়া গিয়াছে,

কোনটা ক্ষেপিয়া গিয়াছে, কোনটা পলাইয়া গিয়াছে। ঘোড়াগুলার নানা রোগ—অথবা নীরোগেই রোগ। আস্তাবলে যেখানে সেখানে খড়কুটা, শুকনা পাতা, ঘাস, ধূলা আর পায়রার পালক। ঘোড়া সকল ঘাস-দানা কখনও পায়, কখনও পায় না। সহিসেরা প্রায় আস্তাবলমুখো হয় না; সহিসিনী-মহলেই থাকে। অট্টালিকার কোথাও আলিশা ভাঙ্গিয়াছে, কোথাও জমাট খসিয়াছে, কোথাও সার্সী, কোথাও খড়খড়া, কোথাও রেলিং টুটিয়াছে। মেটিঙ্গের উপর বৃষ্টির জল, দেওয়ালের পেণ্টের উপর বসুধারা, বুক-কেসের উপর কুমীরকার বাসা, ঝাড়ের ফানুসের উপর চড়ুইয়ের বাসার খড়কুটা। গৃহে লক্ষ্মী নাই! লক্ষ্মী বিনা বৈকুণ্ঠও লক্ষ্মীছাড়া হয়।

যে উদ্যানে মালী নাই—ঘাসে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে, সেখানে যেমন কখনও একটি গোলাপ কি একটি স্থলপদ্ম ফুটে, এই গৃহমধ্যে তেমনি একা কুন্দনন্দিনী বাস করিতেছিল। যেমন আর পাঁচ জনে খাই পরিত, কুন্দও তাই। যদি কেহ তাহাকে গৃহিণী ভাবিয়া কোন কথা কহিত, কুন্দ ভাবিত, আমায় তামাসা করিতেছে। দেওয়ানজী যদি কোন কথা জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইতেন, ভয়ে কুন্দের বুক দুড়-দুড় করিত। বাস্তবিক কুন্দ দেওয়ানজীকে বড় ভয় করিত। ইহার একটি কারণও ছিল। নগেন্দ্র কুন্দকে পত্র লিখিতেন না; সুতরাং নগেন্দ্র দেওয়ানজীকে যে পত্রগুলি লিখিতেন, কুন্দ তাহাই চাহিয়া আনিয়া পড়িত। পড়িয়া আর ফিরাইয়া দিত না—সেইগুলি পাঠ তাহার সন্ধ্যাগায়ত্রী হইয়াছিল। সর্ব্বদা ভয় পাছে—দেওয়ান পত্রগুলি ফিরাইয়া চায়। এই ভয়ে দেওয়ানের নাম শুনিলেই কুন্দের মুখ শুকাইত। দেওয়ান হীরার কাছে এ কথা জানিয়াছিলেন। পত্রগুলি আর চাহিতেন না। আপনি তাহার নকল রাখিয়া কুন্দকে পড়িতে দিতেন।

বাস্তবিক সূর্য্যমুখী যন্ত্রণা পাইয়াছিলেন—কুন্দ কি পাইতেছে না? সূর্য্যমুখী স্বামীকে ভালবাসিতেন—কুন্দ কি বাসে না? সেই ক্ষুদ্র হৃদয়খানির মধ্যে অপরিমিত প্রেম! প্রকাশের শক্তি নাই বলিয়া, তাহা বিরুদ্ধ বায়ুর ন্যায় সতত কুন্দের সে হৃদয়ে আঘাত করিত। বিবাহের অগ্রে, বাল্যকালাবধি কুন্দ নগেন্দ্রকে ভালবাসিয়াছিল—কাহাকে বলে নাই, কেহ জানিতে পারে নাই। নগেন্দ্রকে পাইবার কোন বাসনা করে নাই—আশাও করে নাই, আপনার নৈরাশ্য আপনি সহ্য করিত। তাকে আকাশের চাঁদ ধরিয়া হাতে দিল। তার পর—এখন কোথায় সে চাঁদ, কি দোষে তাকে নগেন্দ্র পায়ে ঠেলিয়াছেন? কুন্দ এই কথা রাত্রিদিন ভাবে, রাত্রিদিন কাঁদে। ভাল, নগেন্দ্র নাই ভালবাসুন—তাকে ভালবাসিবেন, কুন্দের এমন কি ভাগ্য—একবার তাঁকে দেখিতে পায় না কেন? শুধু তাই কি? তিনি ভাবেন, কুন্দই এই বিপত্তির মূল, সকলেই ভাবে, কুন্দই অনর্থের মূল! কুন্দ ভাবে, কি দোষে আমি সকল অনর্থের মূল।

কুক্ষণে নগেন্দ্র কুন্দকে বিবাহ করিয়াছিলেন। যেমন উপাস বৃক্ষের তলায় যে বসে, সেই মরে, তেমনি এই বিবাহের ছায়া যাহাকে স্পর্শ করিয়াছে, সেই মরিয়াছে!

আবার কুন্দ ভাবিত, "সূর্য্যমুখীর এই দশা আমা হ'তে হইল। সূর্য্যমুখী আমাকে রক্ষা করিয়াছিল—আমাকে ভগিনীর ন্যায় ভালবাসিত—তাহাকে পথের কাঙ্গালী করিলাম; আমার মত অভাগিনী কি আর আছে? আমি মরিলাম না কেন? এখন মরি না কেন?" আবার ভাবিত, "এখন মরিব না। তিনি আসুন—তাঁকে আর একবার দেখি—তিনি কি আর আসিবেন না?" কুন্দ সূর্য্যমুখীর মৃত্যু-সংবাদ পায় নাই। তাই মনে মনে বলিত, "এখন শুধু শুধু মরিয়া কি হইবে? যদি সূর্য্যমুখী ফিরিয়া আসে, তবে মরিব। আর তার সুখের পথে কাঁটা হব না।"

ত্রিচত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ

প্রত্যাগমন

কলিকাতার আবশ্যক কার্য্য সমাপ্ত হইল। দানপত্র লিখিত হইল। তাহাতে ব্রহ্মচারীর এবং অজ্ঞাতনাম ব্রাহ্মণের পুরস্কারের বিশেষ বিধি রহিল। তাহা হরিপুরে রেজিষ্ট্রি হইবে, এই কারণে দানপত্র সঙ্গে করিয়া নগেন্দ্র গোবিন্দপুরে গেলেন। শ্রীশ-চন্দ্রকে যথোচিত যানে অনুসরণ করিতে উপদেশ দিয়া গেলেন। শ্রীশচন্দ্র তাঁহাকে দানপত্রাদির ব্যবস্থা এবং পদব্রজে গমন ইত্যাদি কার্য্য হইতে বিরত করিবার জন্য অনেক যত্ন করিলেন, কিন্তু সে যত্ন নিষ্ফল হইল। অগত্যা তিনি নদীপথে তাঁহার অনুগামী হইলেন। মন্ত্রী ছাড়া হইলে কমলমণির চলে না, সুতরাং তিনিও বিনা জিজ্ঞাসাবাদে

সতীশকে লইয়া শ্রীশচন্দ্রের নৌকায় গিয়া উঠিলেন।

কমলমণি আগে গোবিন্দপুরে আসিলেন, দেখিয়া কুন্দনন্দিনীর বোধ হইল, আবার আকাশে একটি তারা উঠিল। যে অবধি সূর্য্যমুখী গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন, সেই অবধি কুন্দনন্দিনীর উপর কমলমণির দুর্জ্জয় ক্রোধ; মুখ দেখিতেন না। কিন্তু এবার আসিয়া কুন্দনন্দিনীর শুষ্কমূর্ত্তি দেখিয়া কমলমণির রাগ দূর হইল—দুঃখ হইল। তিনি কুন্দনন্দিনীকে প্রফুল্ল করিবার জন্য যত্ন করিতে লাগিলেন; নগেন্দ্র আসিতেছেন, সংবাদ দিয়া কুন্দের মুখে হাসি দেখিলেন। সূর্য্যমুখীর মৃত্যু-সংবাদ দিতে কাজে কাজেই হইল। শুনিয়া কুন্দ কাঁদিল। এ কথা শুনিয়া, এ গ্রন্থের অনেক সুন্দরী পাঠকারিণী মনে মনে হাসিবেন; আর বলিবেন, "মাছ মরেছে, বেরাল কাঁদে।" কিন্তু কুন্দ বড় নির্ব্বোধ। সতীন মরিলে যে হাসিতে হয়, সেটা তার মোটা বুদ্ধিতে আসে নাই। বোকা মেয়ে সতীনের জন্য একটু কাঁদিল। আর তুমি ঠাকুরাণি! তুমি যে হেসে হেসে বল্‌ছ, "মাছ মরেছে বেরাল কাঁদে"—তোমার সতীন মরিলে তুমি যদি একটু কাঁদ, তা হইলে আমি বড় তোমার উপর খুসী হব।

কমলমণি কুন্দকে শান্ত করিলেন। কমলমণি নিজে শান্ত হইয়াছিলেন। প্রথম প্রথম কমল অনেক কাঁদিয়াছিলেন—তার পরে ভাবিলেন, "কাঁদিয়া কি করিব? আমি কাঁদিলে শ্রীশচন্দ্র অসুখী হন—আমি কাঁদিলে সতীশ কাঁদে—কাঁদিলে ত সূর্য্যমুখী ফিরিবে না, তবে কেন এদের কাঁদাই? আমি কখনও সূর্য্যমুখীকে ভুলিব না, কিন্তু আমি হাসিলে যদি সতীশ হাসে, তবে কেন হাসিব না?" এই বলিয়া কমলমণি রোদন ত্যাগ করিয়া আবার সেই কমলমণি হইলেন।

কমলমণি শ্রীশচন্দ্রকে বলিলেন, "এ বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী ত বৈকুণ্ঠ ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। তাই ব'লে দাদাবাবু বৈকুণ্ঠে এসে কি বটপত্রে শোবেন?"

শ্রীশচন্দ্র বলিলেন, "এসো, আমরা সব পরিষ্কার করি।"

অমনি শ্রীশচন্দ্র রাজ, মজুর, ফরাস, মালী, যেখানে যাহার প্রয়োজন, সেখানে তাহাকে নিযুক্ত করিলেন। এ দিকে কমলমণির দৌরাত্ম্যে ছুঁচা, বাদুড়, চামচিকে মহলে বড় কিচ-মিচ পড়িয়া গেল; পায়রাগুলা "বকম্-বকম্" করিয়া এ কার্ণিশ ও কার্ণিশ করিয়া বেড়াইতে লাগিল; চড়ুইগুলা পলাইতে ব্যাকুল—যেখানে সার্সী বন্ধ, সেখানে দ্বার খোলা মনে করিয়া ঠেঁটে কাচ লাগিয়া ঘুরিয়া পড়িতে লাগিল; পরিচারিকারা ঝাঁটা হাতে জনে জনে দিকে দিকে দিগ্বিজয়ে ছুটিল। অচিরাৎ অট্টালিকা আবার প্রসন্ন হইয়া হাসিতে লাগিল।

পরিশেষে নগেন্দ্র আসিয়া পৌঁছিলেন। তখন সন্ধ্যাকাল। যেমন নদী প্রথম প্রথম জলোচ্ছ্বাস-কালে অত্যন্ত বেগবতী, কিন্তু জোয়ার পুরিলে গভীর জল শান্তভাব ধারণ করে, তেমনি নগেন্দ্রের সম্পূর্ণ শোকপ্রবাহ এক্ষণে গম্ভীর শান্তিরূপে পরিণত হইয়াছিল। যে দুঃখ, তাহা কিছুই কমে নাই; অধৈর্য্যের হ্রাস হইয়া আসিয়াছিল; তিনি স্থিরভাবে পৌরবর্গের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিলেন, সকলকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কাহারও সাক্ষাতে তিনি সূর্য্যমুখীর প্রসঙ্গ করিলেন না—কিন্তু তাঁহার ধীরভাব দেখিয়া সকলেই তাঁহার দুঃখে দুঃখিত হইল। প্রাচীন ভৃত্যেরা তাঁহাকে প্রণাম করিতে গিয়া আপনা আপনি রোদন করিল; নগেন্দ্র কেবল একজনকে মনঃপীড়া দিলেন। চিরদুঃখিনী কুন্দনন্দিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না।

চতুশ্চত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ

স্তিমিত প্রদীপ

নগেন্দ্রের আদেশমত পরিচারিকারা সূর্য্যমুখীর শয্যাগৃহে তাঁহার শয্যা প্রস্তুত করিয়াছিল। শুনিয়া কমলমণি ঘাড় নাড়িলেন।

নিশীথকালে, পৌরজন সকলে সুষুপ্ত হইলে, নগেন্দ্র সূর্য্যমুখীর শয়নগৃহে শয়ন করিতে গেলেন। শয়ন করিতে না—রোদন করিতে! সূর্য্যমুখীর শয্যাগৃহ অতি প্রশস্ত এবং মনোহর; উহা নগেন্দ্রের সকল সুখের মন্দির, এই জন্য তাহা যত্ন করিয়া প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ঘরটি প্রশস্ত এবং উচ্চ, হর্ম্ম্যতল শ্বেতকৃষ্ণ মর্ম্মর প্রস্তরে রচিত। কক্ষ-প্রাচীরে নীল, পিঙ্গল, লোহিত লতাপল্লব-ফলপুষ্পাদি চিত্রিত; তদুপরি বসিয়া নানাবিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিহঙ্গমসকল ফলভক্ষণ করিতেছে, লেখা আছে। এক পার্শে বহুমূল্য দারুনির্ম্মিত হস্তিদন্ত-খচিত কারুকার্য্যবিশিষ্ট পর্য্যঙ্ক, আর এক পার্শে বিচিত্র বস্ত্রমণ্ডিত নানাবিধ কাষ্ঠাসন এবং বৃহদ্দর্পণ প্রভৃতি গৃহসজ্জার বস্তু বিস্তর ছিল। কয়খানি

চিত্র কক্ষপ্রাচীর হইতে বিলম্বিত ছিল। চিত্রগুলি বিলাতী নহে। সূর্য্যমুখী নগেন্দ্র উভয়ে মিলিত হইয়া চিত্রের বিষয় মনোনীত করিয়া এক দেশী চিত্রকরের দ্বারা চিত্রিত করাইয়াছিলেন। দেশী চিত্রকর এক জন ইংরেজের শিষ্য; লিখিয়াছিল ভাল। নগেন্দ্র তাহা মহামূল্য ফ্রেম দিয়া শয্যাগৃহে রাখিয়াছিলেন। একখানি চিত্র কুমারসম্ভব হইতে নীত। মহাদেব পর্ব্বতশিখরে বেদীর উপর বসিয়া তপশ্চরণ করিতেছেন। লতাগৃহদ্বারে নন্দী, বামপ্রকোষ্ঠার্পিতহেমবেত্র—মুখে এক অঙ্গুলি দিয়া কাননশব্দ নিবারণ করিতেছেন। কানন স্থির—ভ্রমরেরা পাতার ভিতর লুকাইয়াছে—মৃগেরা শয়ন করিয়া আছে। সেইকালে হরধ্যানভঙ্গের জন্য মদনের অধিষ্ঠান। সঙ্গে সঙ্গে বসন্তের উদয়। অগ্রে বসন্তপুষ্পাভরণময়ী পার্ব্বতী মহাদেবকে প্রণাম করিতে আসিয়াছেন। উমা যখন শম্ভুসম্মুখে প্রণাম জন্য নত হইতেছেন, এক জানু ভূমিস্পৃষ্ট করিয়াছেন, আর এক জানু দ্বারা ভূমিস্পর্শ করিতেছেন, স্কন্ধসহিত মস্তক নমিত হইয়াছে, সেই অবস্থা চিত্রে চিত্রিত। মস্তক নমিত হওয়াতে অলকবদ্ধ হইতে দুই একটি কর্ণবিলম্বী কুরুবক-কুসুম খসিয়া পড়িতেছে, বক্ষ হইতে বসন ঈষৎ স্রস্ত হইতেছে, দূর হইতে মন্মথ সেই সময়ে বসন্তপ্রফুল্লবনমধ্যে অর্দ্ধলুক্কায়িত হইয়া, এক জানু ভূমিতে রাখিয়া, চারু ধনু চক্রাকার করিয়া, পুষ্পধনুতে পুষ্পশর সংযোজিত করিতেছেন। আর এক চিত্রে শ্রীরাম জানকী লইয়া লঙ্কা হইতে ফিরিয়া আসিতেছেন, উভয়ে এক রত্নমণ্ডিত বিমানে বসিয়া শূন্যমার্গে চলিতেছেন। শ্রীরাম জানকীর স্কন্ধে এক হস্ত রাখিয়া, আর এক হস্তের অঙ্গুলি দ্বারা নিম্নে পৃথিবীর শোভা দেখাইতেছেন। বিমান-চতুষ্পার্শ্বে নানাবর্ণের মেঘ নীল, লোহিত, শ্বেত, ধূমতরঙ্গোৎক্ষেপ করিয়া বেড়াইতেছে। নিম্নে আবার বিশাল নীলসমুদ্রে তরঙ্গ-ভঙ্গ হইতেছে—সূর্য্যকরে তরঙ্গ সকল হীরকরাশির মত জ্বলিতেছে। এক পারে অতি দূরে "সৌধকিরীটিনী লঙ্কা"—তাহার প্রাসাদাবলীর স্বর্ণমণ্ডিত চূড়াসকল সূর্য্যকরে জ্বলিতেছে। অপর পারে শ্যামশোভাময়ী "তমালতালীবনরাজিনীলা" সমুদ্রবেলা। মধ্যে শূন্যে হংসশ্রেণীসকল উড়িয়া যাইতেছে। আর এক চিত্রে অর্জ্জুন সুভদ্রাকে হরণ করিয়া রথে তুলিয়াছেন। রথ শূন্যপথে মেঘমধ্যে পথ করিয়া চলিয়াছে, পশ্চাৎ অগণিত যাদবী সেনা ধাবিত হইতেছে, দূরে তাহাদের পতাকাশ্রেণী এবং রজোজনিত মেঘ দেখা যাইতেছে। সুভদ্রা স্বয়ং সারথি হইয়া রথ চালাইতেছেন। অশ্বেরা মুখামুখি করিয়া পদক্ষেপে মেঘসকল চূর্ণ করিতেছে; সুভদ্রা আপন সারথ্যনৈপুণ্যে প্রীতা হইয়া মুখ ফিরাইয়া অর্জ্জুনের প্রতি বক্র দৃষ্টি করিতেছেন, কুন্দদন্তে আপন অধর দংশন করিয়া টিপি টিপি হাসিতেছেন; রথবেগজনিত পবনে তাঁহার অলক সকল উড়িতেছে—দুই এক গুচ্ছ কেশ স্বেদবিজড়িত হইয়া কপালে চক্রাকারে লিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। আর একখানি চিত্রে সাগরিকাবেশে রত্নাবলী, পরিষ্কার নক্ষত্রালোকে বালতমালতলে উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিতে যাইতেছেন। তমালশাখা হইতে একটি উজ্জ্বল পুষ্পময়ী লতা বিলম্বিত হইয়াছে, রত্নাবলী এক হস্তে সেই লতার অগ্রভাগ লইয়া গলদেশে পরাইতেছেন আর এক হস্তে চোখের জল মুছিতেছেন। লতাপুষ্প সকল তাঁহার কেশদামের উপর অপূর্ব্ব শোভা করিয়া রহিয়াছে। আর একখানি চিত্রে, শকুন্তলা দুষ্মন্তকে দেখিবার জন্য চরণ হইতে কাল্পনিক কুশাঙ্কুর মুক্ত করিতেছেন—অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা হাসিতেছেন—শকুন্তলা ক্রোধে ও লজ্জায় মুখ তুলিতেছেন না—দুষ্মন্তের দিকেও চাহিতে পারিতেছেন না—যাইতেও পারিতেছেন না। আর এক চিত্রে রণসজ্জিত হইয়া সিংহশাবকতুল্য প্রতাপশালী কুমার অভিমন্যু উত্তরার নিকট যুদ্ধযাত্রার জন্য বিদায় লইতেছেন—উত্তরা যুদ্ধে যাইতে দিবেন না বলিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া আপনি দ্বারে দাঁড়াইতেছেন। অভিমন্যু তাঁহার ভয় দেখিয়া হাসিতেছেন, আর কেমন করিয়া অবলীলাক্রমে ব্যূহভেদ করিবেন, তাহা মাটীতে তরবারীর অগ্রভাগের দ্বারা অঙ্কিত করিয়া দেখাইতেছেন। উত্তরা তাহা কিছুই দেখিতেছেন না; চক্ষে দুই হস্ত দিয়া কাঁদিতেছেন। আর একখানি চিত্রে, সত্যভামার তুলাব্রত চিত্রিত হইয়াছে। বিস্তৃত প্রস্তরনির্ম্মিত প্রাঙ্গণ, তাহার পাশে উচ্চসৌধপরিশোভিত রাজপুরী স্বর্ণচূড়ার সহিত দীপ্তি পাইতেছে। প্রাঙ্গণমধ্যে এক অত্যুচ্চ রজতনির্ম্মিত তুলাযন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে। তাহার এক দিকে ভর করিয়া বিদ্যুদ্দীপ্ত নীরদখণ্ডবৎ নানালঙ্কারভূষিত, প্রৌঢ়বয়স্ক দ্বারকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণ বসিয়াছেন; তুলাযন্ত্রের সেই ভাগ ভূমিস্পর্শ করিতেছে; আর এক দিকে নানারত্নাদির সহিত

সুবর্ণরাশি স্তূপীকৃত হইয়া রহিয়াছে, তথাপি তুলাযন্ত্রের সেই ভাগ উর্দ্ধোত্থিত হইতেছে না। তুলাপাশে সত্যভামা; সত্যভামা প্রৌঢ়বয়স্কা, সুন্দরী, উন্নতদেহবিশিষ্টা, পুষ্পকান্তিমতী, নানাভরণভূষিতা, পঙ্কজলোচনা; কিন্তু তুলাযন্ত্রের অবস্থা দেখিয়া তাঁহার মুখ শুকাইয়াছে। তিনি অঙ্গের অলঙ্কার খুলিয়া তুলায় ফেলিতেছেন, হস্তের চম্পকোপম অঙ্গুলীর দ্বারা কর্ণবিলম্বী রত্নভূষা খুলিতেছেন, লজ্জায় কপালে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম হইতেছে, দুঃখে চক্ষে জল আসিতেছে। ক্রোধে নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হইতেছে, অধর দংশন করিতেছেন। এই অবস্থায় চিত্রকর তাঁহাকে লিখিয়াছেন; পশ্চাতে দাঁড়াইয়া স্বর্ণপ্রতিমারূপিণী রুক্মিণী দেখিতেছেন। তাঁহারও মুখ বিমর্ষ। তিনিও আপনার অঙ্গের অলঙ্কার খুলিয়া সত্যভামাকে দিতেছেন। কিন্তু তাঁহার চক্ষু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি; তিনি স্বামিপ্রতি অপাঙ্গে দৃষ্টিপাত করিয়া, ঈষন্মাত্র অধরপ্রান্তে হাসি হাসিতেছেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সেই হাসিতে সপত্নীর আনন্দ সম্পূর্ণ দেখিতে পাইতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের মুখ গম্ভীর, স্থির, যেন কিছুই জানেন না; কিন্তু তিনি অপাঙ্গে রুক্মিণীর প্রতি দৃষ্টি করিতেছেন, সে কটাক্ষেও একটু হাসি আছে। মধ্যে শুভ্রবসন, শুভ্রকান্তি দেবর্ষি নারদ; তিনি বড় আনন্দিতের ন্যায় সকল দেখিতেছেন, বাতাসে তাঁহার উত্তরীয় এবং শ্মশ্রু উড়িতেছে। চারিদিকে বহুসংখ্যক পৌরবর্গ নানাপ্রকার বেশভূষা ধারণ করিয়া আলো করিয়া রহিয়াছে। বহুসংখ্যক ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ আসিয়াছে। কত কত পুররক্ষিগণ গোল থামাইতেছে। এই চিত্রের নীচে সূর্য্যমুখী স্বহস্তে লিখিয়া রাখিয়াছেন,—"যেমন কর্ম্ম তেমনই ফল। স্বামীর সঙ্গে সোণারূপার তুলা?"

নগেন্দ্র যখন কক্ষমধ্যে একাকী প্রবেশ করিলেন, তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছিল। রাত্রি অতি ভয়ানক। সন্ধ্যার পর হইতে অল্প অল্প বৃষ্টি হইয়াছিল এবং বাতাস উঠিয়াছিল। এক্ষণে ক্ষণে ক্ষণে বৃষ্টি হইতেছিল, বায়ু প্রচণ্ড বেগধারণ করিয়াছিল। গৃহের কবাট যেখানে যেখানে মুক্ত ছিল, সেইখানে সেইখানে বজ্রতুল্য শব্দে তাহার প্রতিঘাত হইতেছিল। সার্সী সকল ঝন্ ঝন্ শব্দে শব্দিত হইতেছিল। নগেন্দ্র শয্যাগৃহে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন। তখন বাত্যানিনাদ মন্দীভূত হইল। খাটের পার্শ্বে আর একটি দ্বার খোলা ছিল—সে দ্বার দিয়া বাতাস আসিতেছিল না, সে দ্বার মুক্ত রহিল।

নগেন্দ্র শয্যাগৃহে প্রবেশ করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, একখানি সোফার উপর শয়ন করিলেন। নগেন্দ্র তাহাতে বসিয়া কত যে কাঁদিলেন, তাহা কেহ জানিল না। কতবার সূর্য্যমুখীর সঙ্গে মুখামুখি করিয়া সেই সোফার উপর বসিয়া কত সুখের কথা বলিয়াছেন।

নগেন্দ্র ভূয়োভূয়ঃ সেই অচেতন আসনকে চুম্বনালিঙ্গন করিলেন। আবার মুখ তুলিয়া সূর্য্যমুখীর প্রিয় চিত্রগুলির প্রতি চাহিয়া দেখিলেন। গৃহে উজ্জ্বল দীপ জ্বলিতেছিল—তাহার চঞ্চল রশ্মিতে সেই সকল চিত্রপুত্তলি সজীব দেখাইতেছিল। প্রতিচিত্রে নগেন্দ্র সূর্য্যমুখীকে দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে পড়িল যে, উমার কুসুমসজ্জা দেখিয়া সূর্য্যমুখী এক দিন আপনি ফুল পরিতে সাধ করিয়াছিলেন। তাহাতে নগেন্দ্র আপনি উদ্যান হইতে পুষ্পচয়ন করিয়া আনিয়া স্বহস্তে সূর্য্যমুখীকে কুসুমময়ী সাজাইয়াছিলেন, তাহাতে সূর্য্যমুখী যে কত সুখী হইয়াছিলেন—কোন্ রমণী রত্নময়ী সাজিয়া তত সুখী হয়? আর এক দিন সুভদ্রার সারথ্য দেখিয়া সূর্য্যমুখী নগেন্দ্রের গাড়ী হাঁকাইবার সাধ করিয়াছিলেন। পত্নীবৎসল নগেন্দ্র তখনই একখানি ক্ষুদ্র যানে দুইটি ছোট ছোট বর্ম্মা জুড়িয়া অন্তঃপুরের উদ্যানমধ্যে সূর্য্যমুখীর সারথ্যজন্য আনিলেন। উভয়ে তাহাতে আরোহণ করিলেন। সূর্য্যমুখী বল্গা ধরিলেন। অশ্বেরা আপনি চলিল। দেখিয়া সূর্য্যমুখী সুভদ্রার মত নগেন্দ্রের দিকে মুখ ফিরাইয়া দংশিতাধরে টিপি টিপি হাসিতে লাগিলেন। এই অবকাশে অশ্বেরা ফটক নিকটে দেখিয়া একেবারে গাড়ী লইয়া বাহির হইয়া সদর রাস্তায় গেল। তখন সূর্য্যমুখী লোকলজ্জায় ম্রিয়মাণা হইয়া ঘোমটা টানিতে লাগিলেন। তাঁহার দুর্দ্দশা দেখিয়া নগেন্দ্র নিজহস্তে বল্গা ধারণ করিয়া গাড়ী অন্তঃপুরে ফিরাইয়া আনিলেন এবং উভয়ে অবতরণ করিয়া কত হাসি হাসিলেন। শয্যাগৃহে আসিয়া সূর্য্যমুখী সুভদ্রার চিত্রকে একটি কিল দেখাইয়া বলিলেন, "তুই সর্ব্বনাশীই ত যত আপদের গোড়া।" নগেন্দ্র ইহা মনে করিয়া কত কাঁদিলেন। আর যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া গাত্রোত্থান করিয়া পদচারণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু যে দিকে চাহেন—সেই দিকেই সূর্য্যমুখীর চিহ্ন। দেওয়ালে চিত্রকর যে লতা লিখিয়াছিল—সূর্য্যমুখী তাহার

অনুকরণমানসে একটি লতা লিখিয়াছিলেন। তাহা তেমনি বিদ্যমান রহিয়াছে। এক দিন দোলে সূর্য্যমুখী স্বামীকে কুঙ্কুম ফেলিয়া মারিয়াছিলেন—কুঙ্কুম নগেন্দ্রকে না লাগিয়া দেওয়ালে লাগিয়াছিল। আজিও আবীরের চিহ্ন রহিয়াছে। গৃহ প্রস্তুত হইলে সূর্য্যমুখী একস্থানে স্বহস্তে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন—

"১৯১০ সম্বৎসরে

ইষ্টদেবতা

স্বামীর স্থাপনা জন্য

এই মন্দির

তাঁহার দাসী সূর্য্যমুখী

কর্ত্তৃক

প্রতিষ্ঠিত হইল।"

নগেন্দ্র ইহা পড়িলেন। নগেন্দ্র কতবার পড়িলেন—পড়িয়া আকাঙ্ক্ষা পূরে না—চক্ষের জলে দৃষ্টি পুনঃ পুনঃ লোপ পাইতে লাগিল—চক্ষু মুছিয়া মুছিয়া পড়িতে লাগিলেন। পড়িতে পড়িতে দেখিলেন, ক্রমে আলোক ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। ফিরিয়া দেখিলেন, দীপ নির্ব্বাণোন্মুখ। তখন নগেন্দ্র নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, শয্যায় শয়ন করিতে গেলেন। শয্যায় উপবেশন করিবামাত্র অকস্মাৎ প্রবলবেগে বর্দ্ধিত হইয়া ঝটিকা ধাবিত হইল; চারিদিকে কবাটতাড়নের শব্দ হইতে লাগিল। সেই সময়ে, শুষ্কতৈল দীপ প্রায় নির্ব্বাণ হইল—অল্পমাত্র খদ্যোতের ন্যায় আলো রহিল। সেই অন্ধকারতুল্য আলোতে এক অদ্ভুত ব্যাপার তাঁহার দৃষ্টিপথে আসিল। ঝঞ্ঝাবাতের শব্দে চমকিত হইয়া, খাটের পার্শে যে দ্বার মুক্ত ছিল, সেই দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। সেই মুক্তদ্বারপথে, ক্ষীণালোকে এক ছায়াতুল্য মূর্ত্তি দেখিলেন। ছায়া স্ত্রীরূপিণী, কিন্তু আরও যাহা দেখিলেন, তাহাতে নগেন্দ্রের শরীর কণ্টকিত এবং হস্তপদাদি কম্পিত হইল। স্ত্রীরূপিণী মূর্ত্তি সূর্য্যমুখীর অবয়ববিশিষ্টা। নগেন্দ্র যেমন চিনিলেন যে, এ সূর্য্যমুখীর ছায়া—অমনি পর্য্যঙ্ক হইতে ভূতলে পড়িয়া ছায়াপ্রতি ধাবমান হইতে গেলেন। ছায়া অদৃশ্য হইল। সেই সময়ে আলো নিবিল। তখন নগেন্দ্র চীৎকার করিয়া ভূতলে পড়িয়া মূর্চ্ছিত হইলেন।

পঞ্চচত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ

ছায়া

যখন নগেন্দ্রের চৈতন্যপ্রাপ্তি হইল, তখনও শয্যাগৃহে নিবিড়ান্ধকার, ক্রমে ক্রমে তাঁহার সংজ্ঞা পুনঃসঞ্চিত হইতে লাগিল। যখন মূর্চ্ছার কথা সকল স্মরণ হইল, তখন বিস্ময়ের উপর আরও বিস্ময় জন্মিল। তিনি ভূতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তবে তাঁহার শিরোদেশে উপাধান কোথা হইতে আসিল? আবার এক সন্দেহ—এ কি বালিস? বালিস স্পর্শ করিয়া দেখিলেন—এ ত বালিস নহে। কোন মনুষ্যের উরুদেশ। কোমলতায় বোধ হইল, স্ত্রীলোকের উরুদেশ। কে আসিয়া মূর্চ্ছিত অবস্থায় তাঁহার মাথা তুলিয়া উরুতে রাখিয়াছে? এ কি কুন্দনন্দিনীর? সন্দেহভঞ্জনার্থ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুমি?" তখন শিরোরক্ষাকারিণী কোন উত্তর দিল না—কেবল দুই তিন বিন্দু উষ্ণ বারি নগেন্দ্রের কপালদেশে পড়িল। নগেন্দ্র বুঝিলেন, যেই হউক, সে কাঁদিতেছে। উত্তর না পাইয়া নগেন্দ্র তাহার অঙ্গস্পর্শ করিলেন। তখন অকস্মাৎ নগেন্দ্র বুদ্ধিভ্রষ্ট হইলেন, তাঁহার শরীর রোমাঞ্চিত হইল। তিনি নিশ্চেষ্ট জড়ের মত ক্ষণকাল পড়িয়া রহিলেন। পরে ধীরে ধীরে রুদ্ধনিশ্বাসে রমণীর উরুদেশ হইতে মাথা তুলিয়া বসিলেন।

এখন ঝড়-বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছিল। আকাশে আর মেঘ ছিল না—পূর্ব্বদিকে প্রভাতোদয় হইতেছিল। বাহিরে বিলক্ষণ আলোক প্রকাশ পাইয়াছিল—গৃহমধ্যেও আলোকরন্ধ্র দিয়া অল্প অল্প আলোক আসিতেছিল। নগেন্দ্র উঠিয়া বসিয়া দেখিলেন যে, রমণী গাত্রোত্থান করিল—ধীরে ধীরে দ্বারোদ্দেশে চলিল। নগেন্দ্র তখন অনুভব করিলেন, এ ত কুন্দনন্দিনী নহে। তখন এমন আলো নাই যে, মানুষ চিনিতে পারা যায়। কিন্তু আকার ও ভঙ্গী কতক কতক উপলব্ধ হইল। আকার ও ভঙ্গী নগেন্দ্র মুহূর্ত্তকাল বিলক্ষণ করিয়া দেখিলেন। দেখিয়া, সেই দণ্ডায়মানা স্ত্রীমূর্ত্তির পদতলে পতিত হইলেন। কাতরস্বরে অশ্রুপরিপূর্ণলোচনে বলিলেন, "দেবীই হও, আর মানুষীই হও, তোমার পায়ে পড়িতেছি, আমার সঙ্গে একবার কথা কও। নচেৎ আমি মরিব।"

রমণী কি বলিল, কপালদোষে নগেন্দ্র তাহা বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু কথার শব্দ যেন

নগেন্দ্রের কর্ণে প্রবেশ করিল, অমনি তিনি তীরবৎ দাঁড়াইয়া উঠিলেন। এবং দণ্ডায়মানা স্ত্রীলোককে বক্ষে ধারণ করিতে গেলেন। কিন্তু তখন মন, শরীর, দুই-ই মোহে আচ্ছন্ন হইয়াছে—পুনর্ব্বার বৃক্ষচ্যুত বল্লীবৎ সেই মোহিনীর পদপ্রান্তে পড়িয়া গেলেন। আর কথা কহিলেন না।

রমণী আবার উরুদেশে মস্তক তুলিয়া লইয়া বসিয়া রহিলেন। যখন নগেন্দ্র মোহ বা নিদ্রা হইতে উত্থিত হইলেন, তখন দিনোদয় হইয়াছে। গৃহমধ্যে আলো। গৃহপার্শ্বে উদ্যানমধ্যে বৃক্ষে বৃক্ষে পক্ষিগণ কলরব করিতেছে। শিরঃস্থ আলোক-পন্থা হইতে বালসূর্য্যের কিরণ গৃহমধ্যে পতিত হইতেছে। তখনও নগেন্দ্র দেখিলেন, কাহার উরু-দেশে তাঁহার মস্তক রহিয়াছে; চক্ষু না চাহিয়া বলিলেন, "কুন্দ, তুমি কখন আসিলে? আমি আজ সমস্ত রাত্রি সূর্য্যমুখীকে স্বপ্ন দেখিয়াছি। স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম, সূর্য্যমুখীর কোলে মাথা দিয়া আছি। তুমি যদি সূর্য্যমুখী হইতে পারিতে, তবে কি সুখ হইত!"

রমণী বলিল, "সেই পোড়ারমুখীকে দেখিলে যদি তুমি অত সুখী হও, তবে আমি সেই পোড়ার-মুখীই হইলাম।"

নগেন্দ্র চাহিয়া দেখিলেন। চমকিয়া উঠিয়া বসিলেন। চক্ষু মুছিলেন! আবার চাহিলেন। মাথা ধরিয়া বসিয়া রহিলেন। আবার চক্ষু মুছিয়া চাহিয়া দেখিলেন। তখন পুনশ্চ মুখাবনত করিয়া মৃদু মৃদু আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন, "আমি কি পাগল হইলাম—না সূর্য্যমুখী বাঁচিয়া আছেন? শেষে এই কি কপালে ছিল? আমি পাগল হইলাম!" এই বলিয়া নগেন্দ্র ধরাশায়ী হইয়া বাহুমধ্যে চক্ষু লুকাইয়া আবার কাঁদিতে লাগিলেন।

এবার রমণী তাঁহার পদযুগল ধরিলেন। তাঁহার পদযুগলে মুখাবৃত করিয়া, অশ্রুজলে অভিষিক্ত করিলেন। বলিলেন "উঠ, উঠ! আমার জীবন-সর্ব্বস্ব! মাটি ছাড়িয়া উঠিয়া বোস। আমি যে এত দুঃখ সহিয়াছি, আজ আমার সকল দুঃখের শেষ হইল। উঠ, উঠ! আমি মরি নাই। আবার তোমার পদসেবা করিতে আসিয়াছি।"

আর কি ভ্রম থাকে? তখন নগেন্দ্র সূর্য্যমুখীকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন এবং তাহার বক্ষে মস্তক রাখিয়া, বিনা বাক্যে অবিশ্রান্ত রোদন করিতে লাগিলেন। তখন উভয়ে উভয়ের স্কন্ধে মস্তক ন্যস্ত করিয়া কত রোদন করিলেন। কেহ কোন কথা বলিলেন না—কত রোদন করিলেন। রোদনে কি সুখ!

ষট্চত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ

পূর্ব্ববৃত্তান্ত

যথাসময়ে সূর্য্যমুখী নগেন্দ্রের কৌতূহল নিবারণ করিলেন। বলিলেন, "আমি মরি নাই—কবিরাজ যে আমার মরার কথা বলিয়াছিলেন—সে মিথ্যা কথা। কবিরাজ জানেন না। আমি তাঁহার চিকিৎসায় সবল হইলে, তোমাকে দেখিবার জন্য গোবিন্দপুরে আসিবার কারণ নিতান্ত কাতর হইলাম। ব্রহ্মচারীকে ব্যতিব্যস্ত করিলাম। শেষে তিনি আমাকে গোবিন্দপুরে লইয়া আসিতে সম্মত হইলেন। এক দিন সন্ধ্যার পর আহারাদি করিয়া তাঁহার সঙ্গে গোবিন্দপুরে আসিবার জন্য যাত্রা করিলাম। এখানে আসিয়া শুনিলাম যে, তুমি দেশে নাই। ব্রহ্মচারী আমাকে এখান হইতে তিন ক্রোশ দূরে, এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে আপন কন্যা পরিচয়ে রাখিয়া তোমার উদ্দেশে গেলেন। তিনি প্রথমে কলিকাতায় গিয়া শ্রীশচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। শ্রীশচন্দ্রের নিকট শুনিলেন, তুমি মধুপুরে আসিতেছ। ইহা শুনিয়া তিনি আবার মধুপুরে গেলেন। মধুপুরে জানিলেন যে, যে দিন আমরা হরমণির বাটী হইতে আসি, সেই দিনই তাহার গৃহদাহ হইয়াছিল। হরমণি গৃহমধ্যে পুড়িয়া মরিয়াছিল। প্রাতে লোকে দগ্ধ দেহ দেখিয়া চিনিতে পারে নাই। তাহারা সিদ্ধান্ত করিল যে, এ গৃহে দুইটি স্ত্রীলোক থাকিত, তাহার একটি মারা গিয়াছে—আর একটি নাই। তবে বোধ হয়, একটি পলাইয়া বাঁচিয়াছে—আর একটি পুড়িয়া মরিয়াছে। যে পলাইয়াছে, সেই সবল ছিল; যে রুগ্ন, সে পলাইতে পারে নাই। এইরূপে তাহারা সিদ্ধান্ত করিল যে, হরমণি পলাইয়াছে, আমি মরিয়াছি। যাহা প্রথমে অনুমান মাত্র ছিল, তাহা জনরবে ক্রমে নিশ্চিত বলিয়া প্রচার হইল। রামকৃষ্ণ সেই কথা শুনিয়া তোমাকে বলিয়াছেন। ব্রহ্মচারী এই সকল অবগত হইয়া আরও শুনিলেন যে, তুমি মধুপুরে গিয়াছিলে এবং আমার মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া এই দিকে আসিয়াছ। তিনি অমনি ব্যস্ত

হইয়া তোমার সন্ধানে ফিরিলেন। কালি বৈকালে তিনি প্রতাপপুরে পৌঁছিয়াছেন, আরও শুনিলাম যে, তুমি দুই এক দিন মধ্যে বাটী আসিবে। সেই প্রত্যাশায় আমি পরশ্ব এখানে আসিয়াছিলাম। এখন আর তিন ক্রোশ পথ হাঁটিতে ক্লেশ হয় না—পথ হাঁটিতে শিখিয়াছি। পরশ্ব তোমার আসা হয় নাই শুনিয়া ফিরিয়া গেলাম, আবার কাল ব্রহ্মচারীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর গোবিন্দপুরে আসিলাম। যখন এখানে পৌঁছিলাম, তখন এক প্রহর রাত্রি। দেখিলাম, তখনও খিড়কী-দুয়ার খোলা। গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলাম—কেহ আমাকে দেখিল না; সিঁড়ির নীচে লুকাইয়া রহিলাম। পরে সকলে শুইলে সিঁড়িতে উঠিলাম; মনে ভাবিলাম, তুমি অবশ্য এই ঘরে শয়ন করিয়া আছ। দেখিলাম, এই দুয়ার খোলা। দুয়ারে উঁকি মারিয়া দেখিলাম—তুমি মাথায় হাত দিয়া বসিয়া আছ। বড় সাধ হইল, তোমার পায়ে লুটাইয়া পড়ি—কিন্তু আবার কত ভয় হইল—তোমার কাছে যে অপরাধ করিয়াছি—তুমি যদি ক্ষমা না কর? আমি ত তোমাকে কেবল দেখিয়াই তৃপ্ত। কবাটের আড়াল হইতে দেখিলাম; ভাবিলাম, এই সময়ে দেখা দিই। দেখা দিবার জন্য আসিতেছিলাম—কিন্তু দুয়ারে আমাকে দেখিয়াই তুমি অচেতন হইলে। সেই অবধি কোলে লইয়া বসিয়া আছি। এ সুখ যে আমার কপালে হইবে, তাহা জানিতাম না। কিন্তু ছি! তুমি আমায় ভালবাস না। তুমি আমার গায়ে হাত দিয়াও আমাকে চিনিতে পার নাই—আমি তোমার গায়ের বাতাস পাইলেই চিনিতে পারি।"

— —

সপ্তচত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ

সরলা এবং সর্পী

যখন শয়নাগারে, সুখসাগরে ভাসিতে ভাসিতে নগেন্দ্র ও সূর্য্যমুখী এই প্রাণস্নিগ্ধকর কথোপকথন করিতেছিলেন, তখন সেই গৃহের অংশান্তরে এক প্রাণসংহারক কথোপকথন হইতেছিল। কিন্তু তৎপূর্ব্বে, পূর্ব্বরাত্রের কথা বলা আবশ্যক।

বাটী আসিয়া নগেন্দ্র কুন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন না। কুন্দ আপন শয়নাগারে, উপাধানে মুখ ন্যস্ত করিয়া সমস্ত রাত্রি রোদন করিল। কেবল বালিকা-সুলভ রোদন নহে—মর্ম্মান্তিক পীড়িত হইয়া রোদন করিল। যদি কেহ কাহাকে বাল্য-কালে অকপটে আত্মসমর্পণ করিয়া, যেখানে অমূল্য হৃদয় দিয়াছিল, সেখানে তাহার বিনিময়ে কেবল তাচ্ছল্য প্রাপ্ত হইতে থাকে, তবে সেই এই রোদনের মর্ম্মচ্ছেদকতা অনুভব করিবে। এখন কুন্দ পরিতাপ করিতে লাগিল যে, "কেন আমি স্বামিদর্শনলালসায় প্রাণ রাখিয়াছিলাম?" আরও ভাবিল যে, "এখন আর কোন্ সুখের আশায় প্রাণ রাখি?"

সমস্ত রাত্রি জাগরণ এবং রোদনের পর প্রভাত-কালে কুন্দের তন্দ্রা আসিল। কুন্দ তন্দ্রাভিভূত হইয়া দ্বিতীয়বার লোমহর্ষণ স্বপ্ন দেখিল।

দেখিল, চারি বৎসর পূর্ব্বে পিতৃভবনে পিতার মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে শয়নকালে যে জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি তাহার মাতার রূপ ধারণ করিয়া স্বপ্নাবির্ভূতা হইয়াছিলেন, এক্ষণে সেই আলোকময়ী প্রশান্তমূর্ত্তি আবার কুন্দের মস্তকোপরি অবস্থান করিতেছেন। কিন্তু এবার তিনি বিশুদ্ধ শুভ্র চন্দ্রমণ্ডলমধ্যবর্ত্তিনী নহেন। এক অতি নিবিড় বর্ষণোন্মুখ নীল নীরদ-মধ্যে আরোহণ করিয়া অবতরণ করিতেছেন। তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে অন্ধকারময় কৃষ্ণবাষ্পের তরঙ্গ উৎক্ষিপ্ত হইতেছে, সেই অন্ধকার মধ্যে এক মনুষ্য-মূর্ত্তি অল্প অল্প হাসিতেছে। তন্মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে সৌদামিনী প্রভাসিত হইতেছে। কুন্দ সভয়ে দেখিল যে, ঐ হাস্যনিরত বদনমণ্ডল হীরার মুখানু-রূপ। আর দেখিল, মাতার করুণাময়ী কান্তি এক্ষণে গম্ভীরভাবাপন্ন। মাতা কহিলেন, "কুন্দ! তখন আমার কথা শুনিলে না, আমার সঙ্গে আসিলে না—এখন দুঃখ দেখিলে ত?"

কুন্দ রোদন করিল।

তখন মাতা পুনরপি কহিলেন, "বলিয়াছিলাম, আর একবার আসিব; তাই আবার আসিলাম। এখন যদি সংসারসুখে পরিতৃপ্তি জন্মিয়া থাকে, তবে আমার সঙ্গে চল।"

তখন কুন্দ কাঁদিয়া কহিল, "মা, তুমি আমাকে সঙ্গে লইয়া চল। আমি আর এখানে থাকিতে চাহি না।"

ইহা শুনিয়া মাতা প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, "তবে আইস।"

এই বলিয়া তেজোময়ী অন্তর্হিতা হইলেন। নিদ্রাভঙ্গ হইলে, কুন্দ স্বপ্ন স্মরণ করিয়া দেবতার নিকট ভিক্ষা চাহিল যে, "এবার আমার স্বপ্ন সফল হউক।"

প্রাতঃকালে হীরা কুন্দের পরিচর্য্যার্থ সেই গৃহে প্রবেশ করিল। দেখিল, কুন্দ কাঁদিতেছে।

কমলমণির আসা অবধি হীরা কুন্দের নিকট বিনীত ভাব ধারণ করিয়াছিল। নগেন্দ্র আসিতেছেন, এই সংবাদই ইহার কারণ। পূর্ব্বপরুষব্যবহারের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ বরং হীরা, পূর্ব্বাপেক্ষাও কুন্দের প্রিয়বাদিনী ও আজ্ঞাকারিণী হইয়াছিল। অন্য কেহ এই কাপট্য সহজেই বুঝিতে পারিত—কিন্তু কুন্দ অসামান্য সরলা এবং আশুসন্তুষ্টা—সুতরাং হীরার এই নূতন প্রিয়কামিতায় প্রীতা ব্যতীত সন্দেহবিশিষ্টা হয় নাই। অতএব, এখন কুন্দ হীরাকে পূর্ব্বমত বিশ্বাসভাগিনী বিবেচনা করিত। কোন কালেই রুক্ষভাষিণী ভিন্ন অবিশ্বাসভাগিনী মনে করে নাই।

হীরা জিজ্ঞাসা করিল, "মা ঠাকুরাণী কাঁদিতেছ কেন?"

কুন্দ কথা কহিল না। হীরার মুখপ্রতি চাহিয়া দেখিল। হীরা দেখিল, কুন্দের চক্ষু ফুলিয়াছে, বালিস্ ভিজিয়াছে। হীরা কহিল, "এ কি? সমস্ত রাত্রিই কেঁদেছ না কি? কেন, বাবু কিছু বলেছেন?"

কুন্দ বলিল, "কিছু না।"

এই বলিয়া আবার সংবর্দ্ধিতবেগে রোদন করিতে লাগিল। হীরা দেখিল, কোন বিশেষ ব্যাপার ঘটিয়াছে, কুন্দের ক্লেশ দেখিয়া আনন্দে তাহার হৃদয় ভাসিয়া গেল। মুখ ম্লান করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু বাড়ী আসিয়া তোমার সঙ্গে কি কথাবার্ত্তা কহিলেন? আমরা দাসী, আমাদের কাছে তা বলিতে হয়।"

কুন্দ কহিল, "কোন কথাবার্ত্তা বলেন নাই।"

হীরা বিস্মিতা হইয়া কহিল, "সে কি মা! এত দিনের পর দেখা হলো! কোন কথাই বলিলেন না?"

কুন্দ কহিল, "আমার সহিত দেখা হয় নাই।"

এই কথা বলিতে কুন্দের রোদন অসংবরণীয় হইল।

হীরা মনে মনে বড় প্রীতা হইল। হাসিয়া বলিল, "ছি মা, এতে কি কাঁদতে হয়? কত লোকের কত বড় বড় দুঃখ মাথার উপর দিয়া গেল—আর তুমি একটু দেখা করার বিলম্ব জন্য কাঁদিতেছ?"

"বড় বড় দুঃখ" আবার কি প্রকার, কুন্দ তাহা কিছুই বুঝিতে পারিল না। হীরা তখন বলিতে লাগিল, "আমার মত যদি তোমাকে সহিতে হইত—তবে এত দিনে তুমি আত্মহত্যা করিতে।"

"আত্মহত্যা" এই মহা[illegible]জনক শব্দ কুন্দনন্দিনীর [illegible] বাজিল। সে শিহরিয়া উঠিল। রাত্রিকালে অনেকবার সে আত্মহত্যার কথা ভাবিয়াছিল। হীরার মুখে সেই কথা শুনিয়া নবাঙ্কিতের ন্যায় বোধ হইল।

হীরা বলিতে লাগিল, "তবে আমার দুঃখের কথা বলি, শুন। আমিও এক জনকে আপনার প্রাণ অপেক্ষা ভালবাসিতাম। সে আমার স্বামী নহে—কিন্তু যে পাপ করিয়াছি, তাহা মনিবের কাছে লুকাইলেই বা কি হইবে—স্পষ্ট স্বীকার করাই ভাল।"

এই লজ্জাহীন কথা কুন্দের কর্ণে প্রবেশও করিল না। তাহার কাণে সেই "আত্মহত্যা" শব্দ বাজিতেছিল। যেন ভূতে তাহার কাণে কাণে বলিতেছিল, "তুমি আত্মঘাতিনী হইতে পারিবে? এ যন্ত্রণা সহা ভাল, না মরা ভাল?"

হীরা বলিতে লাগিল, "সে আমার স্বামী নহে, কিন্তু আমি তাহাকে লক্ষ স্বামীর অপেক্ষা ভালবাসিতাম। সে আমাকে ভালবাসিত না; আমি জানিতাম যে, সে আমাকে ভালবাসিত না—এবং আমার অপেক্ষা শতগুণে নির্গুণ আর এক পাপিষ্ঠাকে ভালবাসিত।" ইহা বলিয়া হীরা নতনয়না কুন্দের প্রতি একবার অতি তীব্র কোপকটাক্ষ করিল; পরে বলিতে লাগিল, "আমি ইহা জানিয়া তাহার দিকে ঘেঁসিলাম না, কিন্তু একদিন আমাদের উভয়েরই দুর্ব্বুদ্ধি হইল।" এইরূপে আরম্ভ করিয়া হীরা সংক্ষেপে কুন্দের নিকট আপনার দারুণ ব্যথার পরিচয় দিল। কাহারও নাম ব্যক্ত করিল না, দেবেন্দ্রের নাম কুন্দের নাম উভয়ই অব্যক্ত রহিল। এমন কোন কথা বলিল না যে, তদ্দ্বারা, কে হীরার প্রণয়ী, কে বা সেই প্রণয়ীর প্রণয়িনী, তাহা অনুভূত হইতে পারে। আর সকল কথা সংক্ষেপে প্রকাশ করিয়া বলিল। শেষে পদাঘাতের কথা বলিয়া কহিল, "বল দেখি, তাহাতে আমি কি করিলাম?"

কুন্দ জিজ্ঞাসা করিল, "কি করিলে?" হীরা হাত-মুখ নাড়িয়া বলিতে লাগিল, "আমি তখনই চাঁড়াল কবিরাজের বাড়ীতে গেলাম। তাহার নিকট এমন সব বিষ আছে যে, খাইবামাত্রই মানুষ মরিয়া যায়।"

কুন্দ ধীরতার সহিত, মৃদুতার সহিত কহিল, "তার পর ?"

হীরা কহিল, "আমি বিষ খাইয়া মরিব বলিয়া বিষ কিনিয়াছিলাম, কিন্তু শেষে ভাবিলাম যে, পরের জন্য আমি মরিব কেন ? ইহা ভাবিয়া বিষ কৌটায় পুরিয়া বাক্সতে তুলিয়া রাখিয়াছি।"

এই বলিয়া হীরা কক্ষান্তর হইতে তাহার বাক্স আনিল। সে বাক্সটি হীরা মুনিববাড়ীর প্রসাদ, পুরস্কার এবং অপহরণের দ্রব্য লুকাইবার জন্য সেইখানে রাখিত।

হীরা সেই বাক্সতে নিজক্রীত বিষের মোড়ক রাখিয়াছিল।

বাক্স খুলিয়া হীরা কৌটার মধ্যে বিষের মোড়ক কুন্দকে দেখাইল। আমিষলোলুপ মার্জ্জারবৎ কুন্দ তাহার প্রতি দৃষ্টি করিতে লাগিল। হীরা তখন যেন অন্যমনবশতঃ বাক্স বন্ধ করিতে ভুলিয়া গিয়া কুন্দকে প্রবোধ দিতে লাগিল। এমন সময় অকস্মাৎ সেই প্রাতঃকালে, নগেন্দ্রের পুরীমধ্যে মঙ্গলজনক শঙ্খ এবং হুলুধ্বনি উঠিল। বিস্মিত হইয়া হীরা ছুটিয়া দেখিতে গেল। মন্দভাগিনী কুন্দনন্দিনী সেই অবকাশে কৌটা হইতে বিষের মোড়ক চুরি করিল।

অষ্টচত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ

কুন্দের কার্য্যতৎপরতা

হীরা আসিয়া শঙ্খধ্বনির যে কারণ দেখিল, প্রথম তাহার কিছুই বুঝিতে পারিল না। দেখিল, একটা বৃহৎ ঘরের ভিতর গৃহস্থ যাবতীয় স্ত্রীলোক, বালক এবং বালিকা সকলে মিলিয়া কাহাকে মণ্ডলাকারে বেড়িয়া মহাকলরব করিতেছে। যাঁহাকে বেড়িয়া তাহারা কোলাহল করিতেছে—সে স্ত্রীলোক—হীরা কেবল তাহার কেশরাশি দেখিতে পাইল। হীরা দেখিল, সেই কেশরাশি কৌশল্যাদি পরিচারিকাগণ সুস্নিগ্ধ তৈলনিষিক্ত করিয়া কেশরঞ্জিনীর দ্বারা [illegible]ত করিতেছে। যাহারা তাহাকে মণ্ডলাকারে বেড়িয়া আছে, তাহারা কেহ হাসিতেছে, কেহ কাঁদিতেছে, কেহ বকিতেছে, কেহ আশীর্ব্বচন কহিতেছে। বালক-বালিকারা নাচিতেছে, গায়িতেছে এবং করতালি দিতেছে। সকলকে বেড়িয়া বেড়িয়া কমলমণি শাঁখ বাজাইতেছেন ও হুলু দিতেছেন এবং কাঁদিতে কাঁদিতে হাসিতেছেন—এবং কখন কখন এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া, এক একবার নৃত্য করিতেছেন।

দেখিয়া হীরা বিস্মিত হইল। হীরা মণ্ডলমধ্যে গলা বাড়াইয়া উঁকি মারিয়া দেখিল। দেখিয়া বিস্ময়বিহ্বল হইল। দেখিল যে, সূর্য্যমুখী হর্ম্ম্যতলে বসিয়া, সুধাময় সস্নেহ হাসি হাসিতেছেন। কৌশল্যাদি তাঁহার রুক্ষ কেশভার কুসুমসুবাসিত তৈলসিক্ত করিতেছে; কেহ বা তাহা রঞ্জিত করিতেছে; কেহ বা আর্দ্র গাত্রমার্জ্জনীর দ্বারা তাঁহার গাত্র পরিমার্জ্জিত করিতেছে। কেহ বা তাঁহার পূর্ব্বপরিত্যক্ত অলঙ্কার সকল পরাইতেছে। সূর্য্যমুখী সকলের সঙ্গে মধুর কথা কহিতেছেন—কিন্তু লজ্জিতা, একটু একটু অপরাধিনী হইয়া মধুর হাসি হাসিতেছেন। তাঁহার গণ্ডে স্নেহযুক্ত অশ্রু পড়িতেছে।

সূর্য্যমুখী মরিয়াছিলেন; তিনি আসিয়া আবার গৃহমধ্যে বিরাজ করিতেছেন, মধুর হাসি হাসিতেছেন, ইহা দেখিয়াও হীরার হঠাৎ বিশ্বাস হইল না। হীরা অস্ফুটস্বরে এক জন পৌরস্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ গা, কে গা ?"

কথা কৌশল্যার কাণে গেল। কৌশল্যা কহিল, "চেন না, নেকি ? আমাদের ঘরের লক্ষ্মী আর তোমার যম।" কৌশল্যা এত দিন হীরার ভয়ে চোরের মত ছিল, আজ দিন পাইয়া ভালমতে চোখ ঘুরাইয়া লইল।

বেশবিন্যাস সমাপ্ত হইলে এবং সকলের সঙ্গে আলাপকুশল শেষ হইলে, সূর্য্যমুখী কমলের কাণে কাণে বলিলেন, "তোমায় আমায় একবার কুন্দকে দেখিয়া আসি। সে আমার কাছে কোন দোষ করে নাই—বা তাহার উপর আমার রাগ নাই। সে আমার এখন কনিষ্ঠা ভগিনী।"

কেবল কমল ও সূর্য্যমুখী কুন্দের সম্ভাষণে গেলেন। অনেকক্ষণ তাঁহাদের বিলম্ব হইল। শেষে কমলমণি ভয়ক্লিষ্টবদনে কুন্দের ঘর হইতে বাহির হইলেন এবং অতিব্যস্তে নগেন্দ্রকে ডাকিতে পাঠাইলেন। নগেন্দ্র আসিলে, বধূরা ডাকিতেছে বলিয়া তাঁহাকে কুন্দের ঘর দেখাইয়া দিলেন। নগেন্দ্র তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দ্বারে সূর্য্যমুখীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। সূর্য্যমুখী রোদন করিতেছিলেন। নগেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে ?"

সূর্য্যমুখী বলিলেন, "সর্ব্বনাশ হইয়াছে। আমি এত দিনে জানিলাম, আমার কপালে এক দিনেরও

সুখ নাই—নতুবা আমি আবার সুখী হইবামাত্রই এমন সর্ব্বনাশ হইবে কেন?"

নগেন্দ্র ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে?"

সূর্য্যমুখী পুনরপি রোদন করিয়া কহিলেন, "কুন্দকে আমি বালিকাবয়স হইতেই মানুষ করিয়াছি, এখন সে আমার ছোট ভগিনী, বহিনের ন্যায় তাহাকে আদর করিব, সাধ করিয়া আসিয়াছিলাম, আমার সে সাধে ছাই পড়িল। কুন্দ বিষপান করিয়াছে।"

নগেন্দ্র। সে কি!

সূ। তুমি তাহার কাছে থাক—আমি ডাক্তার বৈদ্য আনাইতেছি।

এই বলিয়া সূর্য্যমুখী নিষ্ক্রান্ত হইলেন। নগেন্দ্র একাকী কুন্দনন্দিনীর নিকটে গেলেন।

নগেন্দ্র প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, কুন্দনন্দিনীর মুখে কালিমা ব্যাপ্ত হইয়াছে। চক্ষু তেজোহীন হইয়াছে, শরীর অবসন্ন হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে।

ঊনপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ

এত দিনে মুখ ফুটিল

কুন্দনন্দিনী খাটের বাজুতে মাথা রাখিয়া ভূতলে বসিয়াছিল—নগেন্দ্রকে নিকটে আসিতে দেখিয়া তাহার চক্ষুর জল আপনি উছলিয়া উঠিল। নগেন্দ্র নিকটে দাঁড়াইলে, কুন্দ ছিন্নবল্লীবৎ তাঁহার পদপ্রান্তে মাথা লুটাইয়া পড়িল। নগেন্দ্র গদগদকণ্ঠে কহিলেন, "এ কি এ কুন্দ! তুমি কি দোষে আমায় ত্যাগ করিয়া যাইতেছ?"

কুন্দ কখন স্বামীর কথায় উত্তর করিত না—আজি সে অন্তিমকালে মুক্তকণ্ঠে স্বামীর সঙ্গে কথা কহিল—বলিল, "তুমি কি দোষে আমাকে ত্যাগ করিয়াছ?"

নগেন্দ্র তখনি নিরুত্তর হইয়া, অধোবদনে কুন্দনন্দিনীর নিকটে বসিলেন। কুন্দ তখন আবার কহিল, "কাল যদি তুমি আসিয়া এমনি করিয়া একবার কুন্দ বলিয়া ডাকিতে,—কাল যদি একবার আমার নিকটে এমনি করিয়া বসিতে—তবে আমি মরিতাম না। আমি অল্পদিনমাত্র তোমাকে পাইয়াছি—তোমাকে দেখিয়া আমার আজিও তৃপ্তি হয় নাই। আমি মরিতাম না।"

এই প্রীতিপূর্ণ শেলসম কথা শুনিয়া নগেন্দ্র জানুর উপর ললাট রক্ষা করিয়া নীরবে রহিলেন।

তখন কুন্দ আবার কহিল,—কুন্দ আজি বড় মুখরা, সে আর ত স্বামীর সঙ্গে কথা কহিবার দিন পাইবে না—কুন্দ কহিল, "ছিঃ! তুমি অমন করিয়া নীরব হইয়া থাকিও না। আমি তোমার হাসিমুখ দেখিতে দেখিতে যদি না মরিলাম—তবে আমার মরণেও সুখ নাই।"

সূর্য্যমুখীও এইরূপ কথা বলিয়াছিলেন; অন্তকালে সবাই সমান।

নগেন্দ্র তখন মর্ম্মপীড়িত হইয়া কাতর স্বরে কহিলেন, "কেন তুমি এমন কাজ করিলে? তুমি আমায় একবার কেন ডাকিলে না?"

কুন্দ, বিলয়োন্মুখ জলদান্তর্ব্বর্ত্তিনী বিদ্যুতের ন্যায় মৃদুমধুর দিব্য হাসি হাসিয়া কহিল, "তাহা ভাবিও না। যাহা বলিলাম, তাহা কেবল মনের আবেগে বলিয়াছি। তোমার আসিবার আগেই আমি মনে স্থির করিয়াছিলাম যে, তোমাকে দেখিয়া মরিব। মনে মনে স্থির করিয়াছিলাম যে, দিদি যদি কখনও ফিরিয়া আসেন, তবে তাঁহার কাছে তোমাকে রাখিয়া আমি মরিব—আর তাঁহার সুখের পথে কাঁটা হইয়া থাকিব না। আমি মরিব বলিয়াই স্থির করিয়াছিলাম—তবে তোমাকে দেখিলে আমার মরিতে ইচ্ছা করে না।"

নগেন্দ্র কোন উত্তর করিতে পারিলেন না। আজি তিনি বালিকা অবাকপটু কুন্দনন্দিনীর নিকট নিরুত্তর হইলেন।

কুন্দ ক্ষণকাল নীরব হইয়া রহিল। তাহার কথা কহিবার শক্তি অপনীত হইতেছিল। মৃত্যু তাহাকে অধিকৃত করিতেছিল।

নগেন্দ্র তখন, সেই মৃত্যুচ্ছায়ান্ধকার-ম্লান মুখমণ্ডলের স্নেহ-প্রফুল্লতা দেখিতেছিলেন। তাহার সেই আধিক্লিষ্ট মুখে মন্দবিদ্যুদ্বিনিন্দিত যে হাসি তখন দেখিয়াছিলেন, নগেন্দ্রের প্রাচীন বয়স পর্য্যন্ত তাহা হৃদয়ে অঙ্কিত ছিল।

কুন্দ আবার কিছুকাল বিশ্রামলাভ করিয়া, অপরিতৃপ্তের ন্যায় পুনরপি ক্লিষ্ট নিশ্বাস সহকারে কহিতে লাগিল, "আমার কথা কহিবার তৃষ্ণা নিবারণ হইল না—আমি তোমাকে দেবতা বলিয়া জানিতাম—সাহস করিয়া কখনও মুখ ফুটিয়া কথা কহি নাই। আমার সাধ মিটিল না—আমার শরীর অবসন্ন হইয়া আসিতেছে—আমার মুখ শুকাইতেছে, জিব টানিতেছে—আমার আর বিলম্ব নাই।" এই

বলিয়া কুন্দ পর্য্যঙ্কাবলম্বন ত্যাগ করিয়া, ভূমে শয়ন করিয়া, নগেন্দ্রের অঙ্কে মাথা রাখিল এবং নয়ন মুদ্রিত করিয়া নীরব হইল।

ডাক্তার আসিল। দেখিয়া শুনিয়া ঔষধ দিল না—আর ভরসা নাই দেখিয়া ম্লানমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

পরে সময় আসন্ন বুঝিয়া, কুন্দ সূর্য্যমুখী ও কমলমণিকে দেখিতে চাহিল। তাঁহারা উভয়ে আসিলে, কুন্দ তাঁহাদের পদধূলি গ্রহণ করিল। তাঁহারা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিলেন।

তখন কুন্দনন্দিনী স্বামীর পদযুগলমধ্যে মুখ লুকাইল। তাহাকে নীরব দেখিয়া দুই জনে আবার উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। কিন্তু কুন্দ আর কথা কহিল না। ক্রমে ক্রমে চৈতন্যভ্রষ্টা হইয়া চরণমধ্যে মুখ রাখিয়া, নবীন যৌবনে কুন্দনন্দিনী প্রাণত্যাগ করিল। অপরিস্ফুট কুন্দকুসুম শুকাইল।

প্রথম রোদন সংবরণ করিয়া সূর্য্যমুখী মৃতা সপত্নী প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "ভাগ্যবতি! তোমার মত প্রসন্ন অদৃষ্ট আমার হউক। আমি যেন এইরূপে স্বামীর চরণে মাথা রাখিয়া প্রাণত্যাগ করি।"

এই বলিয়া সূর্য্যমুখী রোরুদ্যমান স্বামীর হস্ত ধারণ করিয়া স্থানান্তরে লইয়া গেলেন। পরে নগেন্দ্র ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক কুন্দকে নদীতীরে লইয়া যথাবিধি সৎকারের সহিত, সেই অতুল স্বর্ণপ্রতিমা বিসর্জ্জন করিয়া আসিলেন।

—

পঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ

সমাপ্তি

কুন্দনন্দিনীর বিয়োগের পর সকলেই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল যে, কুন্দনন্দিনী বিষ কোথা পাইল? তখন সকলেই সন্দেহ করিল যে, হীরার এ কাজ।

তখন হীরাকে না দেখিয়া, নগেন্দ্র তাহাকে ডাকিতে পাঠাইলেন। হীরার সাক্ষাৎ পাওয়া গেল না। কুন্দনন্দিনীর মৃত্যুকাল হইতে হীরা অদৃশ্যা হইয়াছিল।

সেই অবধি আর কেহ সে দেশে হীরাকে দেখিতে পাইল না। গোবিন্দপুরে হীরার নাম লোপ হইল। একবার মাত্র বৎসরেক পরে, সে দেবেন্দ্রকে দেখা দিয়াছিল।

তখন দেবেন্দ্রের রোপিত বিষবৃক্ষের ফল ফলিয়াছিল। সে অতি কদর্য্য রোগগ্রস্ত হইয়াছিল। তদুপরি মদ্যসেবার বিরতি না হওয়ায় রোগ দুর্নিবার্য্য হইল। দেবেন্দ্র মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিল। কুন্দনন্দিনীর মৃত্যুর পরে বৎসরেক মধ্যে দেবেন্দ্রের মৃত্যুকাল উপস্থিত হইল। মরিবার দুই চারি দিন পূর্ব্বে সে গৃহমধ্যে রুগ্নশয্যায় উত্থানশক্তিরহিত হইয়া শয়ন করিয়া আছে—এমন সময় তাহার গৃহদ্বারে বড় গোল উঠিল। দেবেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "কি?" ভৃত্যেরা কহিল যে, "এক জন পাগলী আপনাকে দেখিতে চাহিতেছে। বারণ মানে না।" দেবেন্দ্র অনুমতি করিল, "আসুক।"

উন্মাদিনী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। দেবেন্দ্র দেখিল যে, সে এক জন অতি দীনভাবাপন্ন স্ত্রীলোক। তাহার উন্মাদের লক্ষণ বিশেষ কিছু বুঝিতে পারিল না—কিন্তু অতি দীনা ভিখারিণী বলিয়া বোধ করিল। তাহার বয়স অল্প এবং পূর্ব্বলাবণ্যের চিহ্নসকল বর্ত্তমান রহিয়াছে। কিন্তু এক্ষণে তাহার অত্যন্ত দুর্দ্দশা। তাহার বসন অতি মলিন, শতধাছিন্ন, শতগ্রন্থিবিশিষ্ট এবং এত অল্পায়ত যে, তাহা জানুর নীচে পড়ে নাই এবং তদ্দ্বারা পৃষ্ঠ ও মস্তক আবৃত হয় নাই। তাহার কেশ রুক্ষ, অবেণীবদ্ধ ধূলিধূসরিত—কদাচিৎ বা জটাযুক্ত। তাহার তৈলহীন অঙ্গে খড়ি উঠিতেছিল এবং কাদা পড়িয়াছিল।

ভিখারিণী দেবেন্দ্রের নিকট আসিয়া এরূপ তীব্র দৃষ্টি করিতে লাগিল যে, তখন দেবেন্দ্র বুঝিল, ভৃত্যদিগের কথাই সত্য—এ কোন উন্মাদিনী।

উন্মাদিনী অনেকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "আমায় চিনিতে পারিলে না? আমি হীরা।"

দেবেন্দ্র তখন চিনিল যে, হীরা। চমৎকৃত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার এমন দশা কে করিল?"

হীরা রোষপ্রদীপ্ত কটাক্ষে অধর দংশিত করিয়া মুষ্টিবদ্ধহস্তে দেবেন্দ্রকে মারিতে আসিল। পরে স্থির হইয়া কহিল—"তুমি আবার জিজ্ঞাসা কর—আমার এমন দশা কে করিল? আমার এ দশা তুমিই করিয়াছ। এখন চিনিতেছ না—কিন্তু এক দিন আমার খোসামোদ করিয়াছিলে। এখন তোমার মনে পড়ে না, কিন্তু এক দিন এই ঘরে বসিয়া, এই পা ধরিয়া (এই বলিয়া হীরা খাটের উপর পা রাখিল) গাহিয়াছিলে—

"স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদপল্লবমুদারম্।"

এইরূপ কত কথা মনে করিয়া দিয়া উন্মাদিনী বলিতে লাগিল, "যেদিন তুমি আমাকে উৎসৃষ্ট করিয়া নাথি মারিয়া তাড়াইলে, সেই দিন হইতেই আমি পাগল হইয়াছি। আমি আপনি বিষ খাইতে গিয়াছিলাম—একটা আহ্লাদের কথা মনে পড়িল—সে বিষ আপনি না খাইয়া তোমাকে কি তোমার কুন্দকে খাওয়াইব, সেই ভরসায় কয় দিন কোন মতে আমার পীড়া লুকাইয়া রাখিলাম। আমার এ রোগ কখন আসে, কখন যায়। যখন আমি উন্মত্ত হইতাম, তখন ঘরে পড়িয়া থাকিতাম; যখন ভাল থাকিতাম, তখন কাজকর্ম করিতাম। শেষে তোমার কুন্দকে বিষ খাওয়াইয়া মনের সাধ মিটাইলাম; তাহার মৃত্যু দেখিয়া অবধি আবার রোগ বাড়িল। আর লুকাইতে পারিব না দেখিয়া—দেশত্যাগ করিয়া গেলাম। আর আমার অন্ন হইল না—পাগলকে কে অন্ন দিবে? সেই অবধি ভিক্ষা করি—যখন ভাল থাকি, ভিক্ষা করি, যখন রোগ চাপে, তখন গাছতলায় পড়িয়া থাকি। এখন তোমার মরণ নিকট শুনিয়া একবার আহ্লাদ করিয়া তোমাকে দেখিতে আসিয়াছি। আশীর্ব্বাদ করি, নরকেও যেন তোমার স্থান না হয়।"

এই বলিয়া উন্মাদিনী উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। দেবেন্দ্র ভীত হইয়া শয্যার অপর পার্শ্বে গেল। হীরা তখন নাচিতে নাচিতে ঘরের বাহির হইয়া গায়িতে লাগিল,—

"স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদপল্লবমুদারম্।"

সেই অবধি দেবেন্দ্রের মৃত্যুশয্যা কণ্টকময় হইল। মৃত্যুর অল্প পূর্ব্বেই জ্বরকালীন প্রলাপে দেবেন্দ্র কেবল বলিয়াছিল,—

"পদপল্লবমুদারম্" "পদপল্লবমুদারম্"

দেবেন্দ্রের মৃত্যুর পর কত দিন তাঁহার উদ্যান-মধ্যে নিশীথ সময়ে রক্ষকেরা ভীতচিত্তে শুনিয়াছে যে, স্ত্রীলোক গায়িতেছে—

"স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদপল্লবমুদারম্।"

আমরা বিষবৃক্ষ সমাপ্ত করিলাম। ভরসা করি, ইহাতে গৃহে গৃহে অমৃত ফলিবে।

সমাপ্ত

যুগলাঙ্গুরীয়

[পঞ্চম সংস্করণ হইতে মুদ্রিত]

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

যুগলাঙ্গুরীয়

প্রথম পরিচ্ছেদ

দুই জনে উদ্যানমধ্যে লতামণ্ডপতলে দাঁড়াইয়া ছিলেন। তখন প্রাচীন নগর তাম্রলিপ্তের * চরণ ধৌত করিয়া অনন্ত নীল সমুদ্র মৃদু মৃদু নিনাদ করিতেছিল।

তাম্রলিপ্ত নগরের প্রান্তভাগে সমুদ্রতীরে এক বিচিত্র অট্টালিকা ছিল। তাহার নিকট একটি সুনির্ম্মিত বৃক্ষবাটিকার অধিকারী ধনদাস নামক একজন শ্রেষ্ঠী। শ্রেষ্ঠীর কন্যা হিরণ্ময়ী লতামণ্ডপে দাঁড়াইয়া এক যুবা পুরুষের সঙ্গে কথা কহিতেছিলেন।

হিরণ্ময়ী বিবাহের বয়স অতিক্রম করিয়াছিলেন। তিনি ঈপ্সিত স্বামীর কামনায় একাদশ বৎসরে আরম্ভ করিয়া ক্রমাগত পঞ্চ বৎসর এই সমুদ্রতীরবাসিনী সাগরেশ্বরী নাম্নী দেবীর পূজা করিয়াছিলেন, কিন্তু মনোরথ সফল হয় নাই। প্রাপ্তযৌবনা কুমারী কেন যে এই যুবার সঙ্গে একা কথা কহেন, তাহা সকলেই জানিত। হিরণ্ময়ী যখন চারি বৎসরের বালিকা, তখন এই যুবার বয়ঃক্রম আট বৎসর। ইঁহার পিতা শচীসুত শ্রেষ্ঠী ধনদাসের প্রতিবাসী, এ জন্য উভয়ে একত্রে বাল্যক্রীড়া করিতেন; হয় শচীসুতের গৃহে, নয় ধনদাসের গৃহে সর্ব্বদা একত্রে সহবাস করিতেন। এক্ষণে যুবতীর বয়স ষোড়শ, যুবার বয়স বিংশতি বৎসর, তথাপি উভয়ের সেই বালসখিত্ব সম্বন্ধই ছিল, একটুমাত্র বিঘ্ন ঘটিয়াছিল। যথাবিহিত কালে উভয়ের পিতা, এই যুবক-যুবতীর পরস্পরের সঙ্গে বিবাহ সম্বন্ধ করিয়াছিলেন। বিবাহের দিন স্থির পর্য্যন্ত হইয়াছিল। অকস্মাৎ হিরণ্ময়ীর পিতা বলিলেন, "আমি বিবাহ দিব না।" সেই অবধি হিরণ্ময়ী আর পুরন্দরের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন না। অদ্য পুরন্দর অনেক বিনয় করিয়া বিশেষ কথা আছে বলিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া আনিয়াছিলেন। লতামণ্ডপতলে আসিয়া হিরণ্ময়ী কহিলেন,

"আমাকে কেন ডাকিয়া আনিলে? আমি এক্ষণে আর বালিকা নহি। এখন আর তোমার সঙ্গে এমত স্থলে একা সাক্ষাৎ করা ভাল দেখায় না, আর ডাকিলে আমি আসিব না।"

ষোল বৎসরের বালিকা বলিতেছে, 'আমি আর বালিকা নহি', ইহা বড় মিষ্ট কথা। কিন্তু সে রস অনুভব করিবার লোক সেখানে কেহই ছিল না। পুরন্দরের বয়স বা মনের ভাব সেরূপ নহে।

পুরন্দর মণ্ডপবিলম্বিত লতা হইতে একটি পুষ্প ভাঙ্গিয়া লইয়া ছিন্ন করিতে করিতে বলিলেন, "আমি আর ডাকিব না। আমি দূরদেশে চলিলাম। তাই তোমাকে বলিয়া যাইতে আসিয়াছি।"

হি। দূরদেশে? কোথায়?

পু। সিংহলে।

হি। সিংহলে? সে কি? কেন সিংহলে যাইবে?

"কেন যাইব? আমরা শ্রেষ্ঠী, বাণিজ্যার্থ যাইব।"—বলিতে বলিতে পুরন্দরের চক্ষু ছল-ছল করিয়া আসিল।

হিরণ্ময়ী বিমনা হইলেন; কোন কথা কহিলেন না, অনিমেষলোচনে সম্মুখবর্ত্তী সাগর-তরঙ্গে সূর্য্যকিরণের ক্রীড়া দেখিতে লাগিলেন। প্রাতঃকাল, মৃদুপবন বহিতেছে, মৃদুলপবনোত্থিত অতুল তরঙ্গে বালারুণরশ্মি আরোহণ করিয়া কাঁপিতেছে—সাগর-জলে তাহার অনন্ত উজ্জ্বল রেখা প্রসারিত হইয়াছে—শ্যামাঙ্গীর অঙ্গে রজতালঙ্কারবৎ ফেননিচয় শোভিতেছে, তীরে জলচর পক্ষিকুল শ্বেত-রেখা সাজাইয়া বেড়াইতেছে।

হিরণ্ময়ী সব দেখিলেন;—নীল জল দেখিলেন, তরঙ্গশিরে ফেনমালা দেখিলেন, সূর্য্যরশ্মির ক্রীড়া দেখিলেন, দূরবর্ত্তী অর্ণবপোত দেখিলেন, নীলাম্বরে কৃষ্ণবিন্দুবৎ একটি পক্ষী উড়িতেছে, তাহাও দেখিলেন। শেষে ভূতলশায়ী একটি শুষ্ক কুসুমের প্রতি দৃষ্টি করিতে করিতে কহিলেন, "তুমি কেন যাবে, অন্যান্য বার তোমার পিতা যাইয়া থাকেন।"

---

* আধুনিক তমলুক। পুরাবৃত্তে পাওয়া যায় যে, পূর্ব্বকালে এই নগরী সমুদ্রতীরবর্ত্তী ছিল।

পুরন্দর বলিলেন, "আমার পিতা বৃদ্ধ হইতেছেন। আমার এখন অর্থোপার্জ্জনের সময় হইয়াছে। আমি পিতার অনুমতি পাইয়াছি।"

হিরণ্ময়ী লতামণ্ডপের কাষ্ঠে ললাট রক্ষা করিলেন, পুরন্দর দেখিলেন, তাঁহার ললাট কুঞ্চিত হইতেছে, অধর স্ফুরিত হইতেছে, নাসিকারন্ধ্র স্ফীত হইতেছে। দেখিলেন যে, হিরণ্ময়ী কাঁদিয়া ফেলিলেন।

পুরন্দর মুখ ফিরাইলেন। তিনিও একবার আকাশ, পৃথিবী, নগর, সমুদ্র সকল দেখিলেন, কিন্তু কিছুতেই রহিল না—চক্ষুর জল গণ্ড বহিয়া পড়িল। পুরন্দর চক্ষু মুছিয়া বলিলেন, "এই কথা বলিবার জন্য আসিয়াছি। যে দিন তোমার পিতা বলিলেন, কিছুতেই আমার সঙ্গে তোমার বিবাহ দিবেন না, সেই দিন হইতে আমি সিংহলে যাইবার কল্পনা স্থির করিয়াছিলাম। ইচ্ছা আছে যে, সিংহল হইতে ফিরিব না। যদি কখন তোমায় ভুলিতে পারি, তবেই ফিরিব। আমি অধিক কথা বলিতে জানি না, তুমিও অধিক কথা বুঝিতে পারিবে না, ইহাতে বুঝিতে পারিবে যে, আমার পক্ষে জগৎ-সংসার এক দিকে, তুমি এক দিকে হইলে, জগৎ তোমার তুল্য নহে।" এই বলিয়া পুরন্দর হঠাৎ পশ্চাৎ ফিরিয়া পদচারণ করিয়া অন্য একটা বৃক্ষের পাতা ছিঁড়িলেন। অশ্রুবেগ কিঞ্চিৎ শমিত হইলে, ফিরিয়া আসিয়া আবার কহিলেন, "তুমি আমায় ভালবাস, তাহা জানি। কিন্তু যবে হউক, তুমি অন্যের পত্নী হইবে। অতএব তুমি আর আমায় মনে রাখিও না। তোমার সঙ্গে যেন এ জন্মে আমার আর সাক্ষাৎ না হয়।"

এই বলিয়া পুরন্দর বেগে প্রস্থান করিলেন। হিরণ্ময়ী বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। রোদন সংবরণ করিয়া একবার ভাবিলেন, 'আমি যদি মরি, তবে কি পুরন্দর সিংহলে যাইতে পারে? আমি কেন গলায় লতা বাঁধিয়া মরি না, কিংবা সমুদ্রে ঝাঁপ দিই না?' আবার ভাবিলেন, 'যাক্ না যাক্, তাতে আমার কি?' এই ভাবিয়া হিরণ্ময়ী আবার কাঁদিতে বসিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কেন যে ধনদাস বলিয়াছিলেন যে, 'আমি পুরন্দরের সহিত হিরণের বিবাহ দিব না,' তাহা কেহ জানিত না। তিনি তাহা কাহারও সাক্ষাতে প্রকাশ করেন নাই। জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, "বিশেষ কারণ আছে।" হিরণ্ময়ীর অন্যান্য অনেক সম্বন্ধ আসিল, কিন্তু ধনদাস কোন সম্বন্ধেই সম্মত হইলেন না। বিবাহের কথামাত্রে কর্ণপাত করিতেন না। "কন্যা বড় হইল" বলিয়া গৃহিণী তিরস্কার করিতেন, ধনদাস শুনিতেন না; কেবল বলিতেন, "গুরুদেব আসুন, তিনি আসিলে এ কথা হইবে।"

পুরন্দর সিংহলে গেলেন। তাঁহার সিংহলযাত্রার পর দুই বৎসর এইরূপে গেল। পুরন্দর ফিরিলেন না। হিরণ্ময়ীর কোন সম্বন্ধ হইল না। হিরণ অষ্টাদশ বৎসরের হইয়া উদ্যানমধ্যস্থ নবপল্লবিত চূত বৃক্ষের ছায় ধনদাসের গৃহ শোভা করিতে লাগিলেন।

হিরণ্ময়ী ইহাতে দুঃখিত হয়েন নাই। বিবাহের কথা হইলে পুরন্দরকে মনে পড়িত; তাঁহার সেই ফুল্লকুসুমমালামণ্ডিত, কুঞ্চিত-কৃষ্ণ-কুন্তলাবলীবেষ্টিত সহাস্য মুখমণ্ডল মনে পড়িত; তাঁহার সেই দ্বিরদরদ-শুভ্র স্কন্ধদেশে স্বর্ণপুষ্প শোভিত নীল উত্তরীয় মনে পড়িত; পদ্মহস্তে হীরকাঙ্গুরীয়গুলি মনে পড়িত; হিরণ্ময়ী কাঁদিতেন। পিতার আজ্ঞা হইলে যাহাকে তাহাকে বিবাহ করিতে হইত, কিন্তু সে জীবন্মৃত্যুবৎ হইত। তবে তাঁহার বিবাহোদ্যোগে পিতাকে অপ্রবৃত্ত দেখিয়া, আহ্লাদিত হউন বা না হউন, বিস্মিতা হইতেন। লোকে এত বয়স অবধি কন্যা অবিবাহিতা রাখে না—রাখিলেও তাহার সম্বন্ধ করে। তাঁহার পিতা সে কথায় কর্ণ পর্য্যন্তও দেন না কেন? এক দিন অকস্মাৎ এ বিষয়ে কিছু সন্ধান পাইলেন।

ধনদাস বাণিজ্য হেতু চীনদেশে নির্ম্মিতা একটি বিচিত্র কৌটা পাইয়াছিলেন। কৌটা অতি বৃহৎ—ধনদাসের পত্নী তাহাতে অলঙ্কার রাখিতেন। ধনদাস কতকগুলি নূতন অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়া পত্নীকে উপহার দিলেন। শ্রেষ্ঠী-পত্নী পুরাতন অলঙ্কারগুলি কৌটাসমেত কন্যাকে দিলেন। অলঙ্কারগুলি রাখা ঢাকা করিতে হিরণ্ময়ী দেখিলেন যে, তাহাতে একখানি ছিন্ন লিপির অর্দ্ধাবশেষ রহিয়াছে।

হিরণ্ময়ী পড়িতে জানিতেন। তাহাতে প্রথমেই নিজের নাম দেখিতে পাইয়া কৌতূহলাবিষ্ট হইলেন। পড়িয়া দেখিলেন যে, যে অর্দ্ধাংশ আছে, তাহাতে কোন অর্থবোধ হয় না। কে কাহাকে লিখিয়াছিল, তাহাও কিছুই বুঝা গেল

না। কিন্তু তথাপি তাহা পড়িয়া হিরণ্ময়ীর ভীতি-সঞ্চার হইল। ছিন্ন পত্রখণ্ড এইরূপ ঃ—

"জ্যোতিষী গণনা করিয়া দেখিলা
হিরণ্ময়ী তুল্য সোনার পুত্তলি
বাহ হইলে ভয়ানক বিপদ।
সবু মুখ পরস্পরে

হিরণ্ময়ী কোন অজ্ঞাত বিপদ আশঙ্কা করিয়া অত্যন্ত ভীতা হইলেন। কাহাকে কিছু না বলিয়া পত্রখণ্ড তুলিয়া রাখিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দুই বৎসরের পর আরও এক বৎসর গেল। তথাপি পুরন্দরের সিংহল হইতে আসার কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। কিন্তু হিরণ্ময়ীর হৃদয়ে তাঁহার মূর্ত্তি পূর্ব্ববৎ উজ্জ্বল ছিল। তিনি মনে মনে বুঝিলেন যে, পুরন্দরও তাঁহাকে ভুলিতে পারেন নাই—নচেৎ এত দিন ফিরিতেন।

এইরূপে দুই আর একে তিন বৎসর গেলে অকস্মাৎ এক দিন ধনদাস বলিলেন যে, "চল, সপরিবারে কাশী যাইব। গুরুদেবের নিকট হইতে তাঁহার শিষ্য আসিয়াছেন। গুরুদেব সে স্থানে যাইতে অনুমতি করিয়াছেন। তথায় হিরণ্ময়ীর বিবাহ হইবে। সেইখানে তিনি পাত্র স্থির করিয়াছেন।"

ধনদাস, পত্নী ও কন্যাকে লইয়া কাশীযাত্রা করিলেন। উপযুক্ত কালে কাশীতে উপনীত হইলে পর-ধনদাসের গুরু আনন্দ স্বামী আসিয়া সাক্ষাৎ করিলেন এবং বিবাহের দিন স্থির করিয়া যথাশাস্ত্র উদ্যোগ করিতে বলিয়া গেলেন।

বিবাহের যথাশাস্ত্র উদ্যোগ হইল; কিন্তু ঘটা কিছুই হইল না, ধনদাসের পরিবারস্থ ব্যক্তি ভিন্ন কেহই জানিতে পারিল না যে, বিবাহ উপস্থিত। কেবল শাস্ত্রীয় আচার সকল রক্ষা করা হইল মাত্র।

বিবাহের দিন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল—এক প্রহর রাত্রে লগ্ন, তথাপি গৃহে সচরাচর যাহারা থাকে, তাহারা ভিন্ন আর কেহই নাই। প্রতিবাসীরাও কেহ উপস্থিত নাই। এ পর্য্যন্ত ধনদাস ব্যতীত গৃহস্থ কেহই জানে না যে, কে পাত্র—কোথাকার পাত্র। তবে সকলেই জানিত যে, যেখানে আনন্দ স্বামী বিবাহের সম্বন্ধ করিয়াছেন, সেখানে কখন অপাত্র স্থির করেন নাই। তিনি যে কেন পাত্রের পরিচয় ব্যক্ত করিলেন না, তাহা তিনিই জানেন—তাঁহার মনের কথা বুঝিবে কে? একটি গৃহে পুরোহিত সম্প্রদানের উদ্যোগাদি করিয়া একাকী বসিয়া আছেন। বাহিরে ধনদাস একাকী বরের প্রতীক্ষা করিতেছেন। অন্তঃপুরে কন্যা-সজ্জা করিয়া হিরণ্ময়ী বসিয়া আছেন—আর কোথাও কেহ নাই। হিরণ্ময়ী মনে মনে ভাবিতেছেন, 'এ কি রহস্য! কিন্তু পুরন্দরের সঙ্গে যদি বিবাহ না হইল—তবে যে হয়, তাহার সঙ্গে বিবাহ হউক—সে আমার স্বামী হইবে না।'

এমন সময় ধনদাস কন্যাকে ডাকিতে আসিলেন। কিন্তু তাঁহাকে সম্প্রদানের স্থানে লইয়া যাইবার পূর্ব্বে বস্ত্রের দ্বারা তাঁহার দুই চক্ষু দৃঢ়তর বাঁধিলেন। হিরণ্ময়ী কহিলেন, "এ কি পিতা?" ধনদাস কহিলেন, "গুরুদেবের আজ্ঞা, তুমিও আমাদের আজ্ঞামত কার্য্য কর। মন্ত্রগুলি মনে মনে বলিও।" শুনিয়া হিরণ্ময়ী কোন কথা কহিলেন না। ধনদাস দৃষ্টিহীনা কন্যার হস্ত ধরিয়া সম্প্রদানের স্থানে লইয়া গেলেন।

হিরণ্ময়ী তথায় উপনীত হইয়া যদি কিছু দেখিতে পাইতেন, তাহা হইলে দেখিতেন যে, পাত্রও তাঁহার ন্যায় আবৃতনয়ন। এইরূপে বিবাহ হইল। সে স্থানে গুরু, পুরোহিত এবং কন্যাকর্ত্তা ভিন্ন আর কেহ ছিল না। বর-কন্যা কেহ কাহাকে দেখিলেন না, শুভদৃষ্টি হইল না।

সম্প্রদানান্তে আনন্দ স্বামী বর-কন্যাকে কহিলেন যে, "তোমাদিগের বিবাহ হইল, কিন্তু তোমরা পরস্পরকে দেখিলে না। কন্যার কুমারী নাম ঘুচানই এই বিবাহের উদ্দেশ্য, ইহজন্মে কখন তোমাদের পরস্পরের সাক্ষাৎ হইবে কি না, বলিতে পারি না। যদি হয়, তবে কেহ কাহাকে চিনিতে পারিবে না। চিনিবার আমি একটি উপায় করিয়া দিতেছি। আমার হাতে দুইটি অঙ্গুরীয় আছে। দুইটি ঠিক এক প্রকার। অঙ্গুরীয় যে প্রস্তরে নির্ম্মিত, তাহা পাওয়া যায় না এবং অঙ্গুরীয়ের ভিতরের পৃষ্ঠে একটি ময়ূর অঙ্কিত আছে। ইহার একটি বরকে, একটি কন্যাকে দিলাম। এরূপ অঙ্গুরীয় অন্য কেহ পাইবে না—বিশেষ এই ময়ূরের চিত্র অননুকরণীয়, ইহা আমার স্বহস্তে ক্ষোদিত। যদি কন্যা কোন পুরুষের হস্তে এইরূপ অঙ্গুরীয় দেখেন, তবে জানিবেন যে, সেই পুরুষ তাঁহার স্বামী; যদি বর কখন কোন স্ত্রীলোকের হস্তে এইরূপ অঙ্গুরীয় দেখেন, তবে

জানিবেন যে, তিনি তাঁহার পত্নী। তোমরা কেহ এ অঙ্গুরীয় হারাইও না, বা কাহাকেও দিও না, অন্নাভাব হইলেও বিক্রয় করিও না। কিন্তু ইহাও আজ্ঞা করিতেছি যে, অদ্য হইতে পঞ্চ বৎসরমধ্যে কদাচ এই অঙ্গুরীয় পরিও না। অদ্য আষাঢ় মাসের শুক্লা পঞ্চমীর রাত্রি একাদশ দণ্ড হইয়াছে, ইহার পর পঞ্চম আষাঢ়ের শুক্লা পঞ্চমীর একাদশ দণ্ড রাত্রি পর্য্যন্ত অঙ্গুরীয় ব্যবহার নিষেধ করিলাম। আমার নিষেধ অবহেলা করিলে গুরুতর অমঙ্গল হইবে।"

এই বলিয়া আনন্দ স্বামী বিদায় হইলেন। ধনদাস কন্যার চক্ষুর বন্ধন মোচন করিলেন। হিরণ্ময়ী চাহিয়া দেখিলেন যে, গৃহমধ্যে কেবল পিতা ও পুরোহিত আছেন—তাঁহার স্বামী নাই। তাঁহার বিবাহ-রাত্রি একাই যাপন করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বিবাহান্তে ধনদাস স্ত্রী ও কন্যাকে লইয়া দেশে ফিরিয়া আসিলেন। আরও চারি বৎসর অতিবাহিত হইল। পুরন্দর ফিরিয়া আসিলেন না—হিরণ্ময়ীর পক্ষে এখন ফিরিলেই কি, না ফিরিলেই কি?

পুরন্দর এই যে সাত বৎসর ফিরিল না, ইহা ভাবিয়া হিরণ্ময়ী দুঃখিতা হইলেন। মনে ভাবিলেন, "তিনি যে আজও আমায় ভুলিতে পারেন নাই বলিয়া আসিলেন না, এমত কদাচ সম্ভবে না। তিনি জীবিত আছেন কি না সংশয়। তাঁহার দেখার আমি কামনা করি না, এখন আমি অন্যের স্ত্রী, কিন্তু আমার বাল্যকালের সুহৃৎ বাঁচিয়া থাকুন, এ কামনা কেন না করিব?"

ধনদাসের কোন কারণে না কোন কারণে চিন্তিত ভাব প্রকাশ হইতে লাগিল, ক্রমে চিন্তা গুরুতর হইয়া শেষে দারুণ রোগে পরিণত হইল। তাহাতে তাঁহার মৃত্যু হইল। ধনদাসের পত্নী অনুমৃতা হইলেন। হিরণ্ময়ীর আর কেহ ছিল না। এ জন্য হিরণ্ময়ী মাতার চরণ ধারণ করিয়া অনেক রোদন করিয়া কহিলেন যে, "তুমি মরিও না।" কিন্তু শ্রেষ্ঠিপত্নী শুনিলেন না। তখন হিরণ্ময়ী পৃথিবীতে একাকিনী হইলেন।

মৃত্যুকালে হিরণ্ময়ীর মাতা তাঁহাকে বুঝাইয়াছিলেন যে, "বাছা, তোমার কিসের ভাবনা? তোমার এক জন স্বামী অবশ্য আছেন। নিয়মিত কাল অতীত হইলে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলেও হইতে পারে। না হয়, তুমিও নিতান্ত বালিকা নহ। বিশেষ পৃথিবীতে যে সহায় প্রধান—ধন—তাহা তোমার অতুল পরিমাণে রহিল।"

কিন্তু সে আশা বিফল হইল—ধনদাসের মৃত্যুর পর দেখা গেল যে, তিনি কিছুই রাখিয়া যান নাই। অলঙ্কার, অট্টালিকা এবং গার্হস্থ্য সামগ্রী ভিন্ন আর কিছুই নাই। অনুসন্ধানে হিরণ্ময়ী জানিলেন যে, ধনদাস কয়েক বৎসর হইতে বাণিজ্যে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া আসিতেছিলেন। তিনি তাহা কাহাকেও না বলিয়া শোধনের চেষ্টায় ছিলেন। ইহাই তাঁহার চিন্তার কারণ। শেষে শোধন অসাধ্য হইল। ধনদাস মনের ক্লেশে পীড়িত হইয়া পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

এই সকল সংবাদ শুনিয়া অপরাপর শ্রেষ্ঠীরা আসিয়া হিরণ্ময়ীকে কহিল যে, "তোমার পিতা আমাদের নিকট ঋণগ্রস্ত হইয়া মরিয়াছেন। আমাদিগের ঋণ পরিশোধ কর।" শ্রেষ্ঠিকন্যা অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন যে, তাহাদের কথা যথার্থ। তখন হিরণ্ময়ী সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া তাহাদের ঋণ পরিশোধ করিলেন। বাসগৃহ পর্য্যন্ত বিক্রয় করিলেন।

এখন হিরণ্ময়ী অন্নবস্ত্রের দুঃখে দুঃখিনী হইয়া নগরপ্রান্তে এক কুটীরমধ্যে একা বাস করিতে লাগিলেন। কেবলমাত্র এক সহায়—পরমহিতৈষী আনন্দ স্বামী, কিন্তু তিনি তখন দূরদেশে ছিলেন। হিরণ্ময়ীর এমন একটি লোক ছিল না যে, আনন্দ স্বামীর নিকট প্রেরণ করেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

হিরণ্ময়ী যুবতী এবং সুন্দরী—একাকিনী এক গৃহে শয়ন করা ভাল নহে। আপদ্‌ও আছে, কলঙ্কও আছে। অমলা নামে এক গোপকন্যা হিরণ্ময়ীর প্রতিবাসিনী ছিল। সে বিধবা, তাহার একটি কিশোরবয়স্ক পুত্র এবং কয়েকটি কন্যা। তাহার যৌবনকাল অতীত হইয়াছিল। সচ্চরিত্রা বলিয়া খ্যাতি ছিল। হিরণ্ময়ী রাত্রিতে আসিয়া তাহার গৃহে শয়ন করিতেন।

এক দিন হিরণ্ময়ী অমলার গৃহে শয়ন করিতে আসিলে পর অমলা তাঁহাকে কহিল, "সংবাদ

শুনিয়াছ, পুরন্দর শ্রেষ্ঠী না কি আট বৎসরের পর নগরে ফিরিয়া আসিয়াছে?" শুনিয়া হিরণ্ময়ী মুখ ফিরাইলেন—চক্ষুর জল অমলা না দেখিতে পায়। পৃথিবীর সঙ্গে হিরণ্ময়ীর শেষ সম্বন্ধ ঘুচিল। পুরন্দর তাহাকে ভুলিয়া গিয়াছে; নচেৎ ফিরিত না। পুরন্দর এক্ষণে মনে রাখুক বা ভুলুক, তাঁহার লাভ বা ক্ষতি কি? তথাপি যাহার স্নেহের কথা ভাবিয়া যাবজ্জীবন কাটাইয়াছেন, সে ভুলিয়াছে, ভাবিতে হিরণ্ময়ীর মনে কষ্ট হইল। হিরণ্ময়ী একবার ভাবিলেন—"ভুলেন নাই, কত কাল আমার জন্য বিদেশে থাকিবেন? বিশেষ, তাহাতে তাঁহার পিতার মৃত্যু হইয়াছে"। আর ভাবিলেন, "আমি কুলটা সন্দেহ নাই—নহিলে পুরন্দরের কথা মনে করি কেন?"

অমলা কহিল, "পুরন্দরকে কি তোমার মনে পড়িতেছে না? পুরন্দর শচীসুত শ্রেষ্ঠীর ছেলে।"

হি। চিনি।

অ। তা সে ফিরে এসেছে—কত নৌকা যে ধন এনেছে, তাহা গুণে সংখ্যা করা যায় না। এত ধন না কি এ তাম্রলিপে কেহ কখনও দেখে নাই।

হিরণ্ময়ীর হৃদয়ে রক্ত একটু খর বহিল। তাঁহার দারিদ্র্যদশা মনে পড়িল, পূর্ব্বসম্বন্ধও মনে পড়িল। দারিদ্র্যের জ্বালা বড় জ্বালা। তাহার পরিবর্ত্তে এই অতুল ধনরাশি হিরণ্ময়ীর হইতে পারিত, ইহা ভাবিয়া যাহার খর রক্ত না বহে, এমন স্ত্রীলোক অতি অল্প আছে। হিরণ্ময়ী ক্ষণেক কাল অন্যমনে থাকিয়া পরে অন্য প্রসঙ্গ তুলিলেন। শেষ শয়নকালে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"অমলে, সেই শ্রেষ্ঠিপুত্রের বিবাহ হইয়াছে?"

অমলা কহিল, "না, বিবাহ হয় নাই।"

হিরণ্ময়ীর ইন্দ্রিয় সকল অবশ হইল। সে রাত্রিতে আর কোন কথা হইল না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পরে এক দিন অমলা হাসিমুখে হিরণ্ময়ীর নিকট আসিয়া মধুর ভৎর্সনা করিয়া কহিল, "হ্যাঁ গা বাছা, তোমার কি এমনই ধর্ম্ম?"

হিরণ্ময়ী কহিলেন, "কি করিয়াছি?"

অম। আমার কাছে এত দিন তা বলিতে নাই?

হি। কি বলি নাই?

অম। পুরন্দর শ্রেষ্ঠীর সঙ্গে তোমার এত আত্মীয়তা!

হিরণ্ময়ী ঈষল্লজ্জিতা হইলেন, বলিলেন, "তিনি বাল্যকালে আমার প্রতিবাসী ছিলেন, তার বলিব কি?"

অম। শুধু প্রতিবাসী? দেখ দেখি, কি এনেছি?

এই বলিয়া অমলা একটা কৌটা বাহির করিল; কৌটা খুলিয়া তাহার মধ্য হইতে অপূর্ব্বদর্শন, মহাপ্রভাযুক্ত মহামূল্য হীরার হার বাহির করিয়া হিরণ্ময়ীকে দেখাইল। শ্রেষ্ঠিকন্যা হীরা চিনিতেন—বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "এ যে মহামূল্য—এ কোথায় পাইলে?"

অম। ইহা তোমাকে পুরন্দর পাঠাইয়া দিয়াছে। তুমি আমার গৃহে থাক শুনিয়া আমাকে ডাকিয়া পাঠাইয়া ইহা তোমাকে দিতে বলিয়াছে।

হিরণ্ময়ী ভাবিয়া দেখিলেন, এই হার গ্রহণ করিলে চিরকালজন্য দারিদ্র্যমোচন হয়। ধনদাসের আদরের কন্যা আর অন্নবস্ত্রের কষ্ট সহ্য করিতে পারিতেছিল না। অতএব হিরণ্ময়ী ক্ষণেক বিমনা হইয়া পরে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "অমলা, তুমি বণিককে কহিও যে, আমি ইহা গ্রহণ করিব না।"

অমলা বিস্মিত হইল। বলিল, "সে কি? তুমি কি পাগল, না আমার কথা বিশ্বাস করিতেছ না?"

হি। আমি তোমার কথা বিশ্বাস করিতেছি—আর পাগলও নই। আমি উহা গ্রহণ করিব না।

অমলা অনেক তিরস্কার করিতে লাগিল। হিরণ্ময়ী কিছুতেই গ্রহণ করিলেন না। তখন অমলা হার লইয়া রাজা মদনদেবের নিকটে গেল। রাজাকে প্রণাম করিয়া হার উপহার দিল। বলিল, "এ হার আপনাকে গ্রহণ করিতে হইবে। এ হার আপনারই যোগ্য।"

রাজা হার লইয়া অমলাকে যথেষ্ট অর্থ দিলেন। হিরণ্ময়ী ইহার কিছুই জানিল না।

ইহার কিছুদিন পরে পুরন্দরের এক জন পরিচারিকা হিরণ্ময়ীর নিকটে আসিল। সে কহিল, "আমার প্রভু বলিয়া পাঠাইলেন যে, আপনি যে পর্ণকুটীরে বাস করেন, ইহা তাঁহার সহ্য হয় না, আপনি তাঁহার বাল্যকালের

সখা, আপনার গৃহ তাঁহার গৃহ একই; তিনি এমন বলেন না যে, আপনি তাঁহার গৃহে গিয়া বাস করুন, আপনার পিতৃগৃহ তিনি ধনদাসের মহাজনের নিকট ক্রয় করিয়াছেন। তাহা আপনাকে দান করিতেছেন, আপনি গিয়া সেইখানে বাস করুন, ইহাই তাঁহার ভিক্ষা।"

হিরণ্ময়ী দারিদ্র্য জন্য যত দুঃখ ভোগ করিতেছিলেন, তন্মধ্যে পিতৃভবন হইতে নির্ব্বাসনই তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর বোধ হইত। যেখানে বাল্যক্রীড়া করিয়াছিলেন, যেখানে পিতামাতার সহবাস করিতেন, যেখানে তাঁহাদিগের মৃত্যু দেখিয়াছেন, সেখানে যে আর বাস করিতে পান না, এ কষ্ট গুরুতর বোধ হইত। সেই ভবনের কথায় তাঁহার চক্ষে জল আসিল। তিনি পরিচারিকাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, "এ দান আমার গ্রহণ করা উচিত নহে—কিন্তু আমি এ লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। তোমার প্রভুর সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল হউক।"

পরিচারিকা প্রণাম করিয়া বিদায় হইল, অমলা উপস্থিত ছিল। হিরণ্ময়ী তাহাকে বলিলেন, "অমলা, তথায় আমার একা বাস করা হইতে পারে না। তুমি তথায় বাস করিবে চল।"

অমলা স্বীকৃতা হইল। উভয়ে গিয়া ধনদাসের গৃহে বাস করিতে লাগিলেন।

তথাপি অমলাকে সর্ব্বদা পুরন্দরের গৃহে যাইতে হিরণ্ময়ী এক দিন নিষেধ করিলেন, অমলা আর যাইত না।

পিতৃগৃহে গমনাবধি হিরণ্ময়ী একটা বিষয়ে বড় বিস্মিত হইলেন। এক দিন অমলা কহিল, "তুমি সংসারনির্ব্বাহের জন্য ব্যস্ত হইও না বা শারীরিক পরিশ্রম করিও না। রাজবাড়ীতে আমার কার্য্য হইয়াছে—আর এখন অর্থের আমার অভাব নাই। অতএব আমি সংসার চালাইব। তুমি সংসারে কর্ত্রী হইয়া থাক।"

হিরণ্ময়ী দেখিলেন, অমলার অর্থের বিলক্ষণ প্রাচুর্য্য। মনে মনে নানা প্রকার সন্দিহান হইলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বিবাহের পর পঞ্চমাঘাচের শুক্লা-পঞ্চমী আসিয়া উপস্থিত হইল। হিরণ্ময়ী এ কথা স্মরণ করিয়া সন্ধ্যাকালে বিমনা হইয়া বসিলেন। ভাবিতেছিলেন, "গুরুদেবের আজ্ঞানুসারে আমি কালি হইতে অঙ্গুরীয়টি পরিতে পারি। কিন্তু পরিব কি? পরিয়া আমার কি লাভ? হয় ত স্বামী পাইব, কিন্তু স্বামী পাইবার আমার বাসনা নাই। অথচ চিরকালের জন্য কেনই বা পরের মূর্ত্তি মনে আঁকিয়া রাখি? এ দুরন্ত হৃদয়কে শাসিত করাই উচিত। নইলে ধর্ম্মে পতিত হইতেছি!"

এমন সময় অমলা বিস্ময়বিহ্বলা হইয়া আসিয়া কহিল,—"কি সর্ব্বনাশ! আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। না জানি কি হইবে।"

হি। কি হইয়াছে?

অ। রাজপুরী হইতে তোমার জন্য শিবিকা লইয়া দাস-দাসী আসিয়াছে। তোমাকে লইয়া যাইবে।

হি। তুমি পাগল হইয়াছ। আমাকে রাজবাড়ী হইতে লইতে আসিবে কেন?

এমন সময় রাজদূত আসিয়া প্রণাম করিল এবং কহিল যে, "রাজাধিরাজ পরমভট্টারক শ্রীমদনদেবের আজ্ঞা যে, হিরণ্ময়ী এই মুহূর্ত্তেই শিবিকারোহণে রাজাবরোধে যাইবেন।"

হিরণ্ময়ী বিস্মিতা হইলেন, কিন্তু অস্বীকার করিতে পারিলেন না। রাজাজ্ঞা অলঙ্ঘ্য। বিশেষ রাজা মদনদেবের অবরোধে যাইতে কোন শঙ্কা নাই। রাজা পরম ধার্ম্মিক এবং জিতেন্দ্রিয় বলিয়া খ্যাত। তাঁহার প্রতাপে কোন রাজপুরুষ কোন স্ত্রী-লোকের উপর কোনরূপ অত্যাচার করিতে পারেন না।

হিরণ্ময়ী অমলাকে বলিলেন, "অমলে! আমি রাজদর্শনে যাইতে সম্মত। তুমি সঙ্গে চল।"

অমলা স্বীকৃতা হইল।

তৎসমভিব্যাহারে শিবিকারোহণে হিরণ্ময়ী রাজাবরোধমধ্যে প্রবিষ্টা হইলেন। প্রতিহারী রাজাকে নিবেদন করিল যে, শ্রেষ্ঠিকন্যা আসিয়াছে। রাজাজ্ঞা পাইয়া প্রহরীরা একা হিরণ্ময়ীকে রাজসমক্ষে লইয়া আসিল। অমলা বাহিরে রহিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

হিরণ্ময়ী রাজাকে দেখিয়া বিস্মিতা হইলেন। রাজা দীর্ঘাকৃতি পুরুষ; কবাটবক্ষ; দীর্ঘহস্ত; অতি সুগঠিত আকৃতি; ললাট প্রশস্ত; বিস্ফারিত

চক্ষু; শান্তমূর্ত্তি—এরূপ সুন্দর পুরুষ কদাচিৎ স্ত্রীলোকের নয়নপথে পড়ে। রাজাও শ্রেষ্ঠিকন্যাকে দেখিয়া জানিলেন যে, রাজাবরোধেও এরূপ সুন্দরী দুর্লভ।

রাজা কহিলেন, "তুমি হিরণ্ময়ী?"

হিরণ্ময়ী কহিলেন, "আমি আপনার দাসী।"

রাজা কহিলেন, "কেন তোমাকে ডাকাইয়াছি, তাহা শুন। তোমার বিবাহের কথা মনে পড়ে?"

হি। পড়ে।

রাজা। সেই রাত্রে আনন্দ স্বামী তোমাকে যে অঙ্গুরীয় দিয়াছিলেন, তাহা তোমার কাছে আছে?

হি। মহারাজ! সে অঙ্গুরীয় আছে। কিন্তু সে সকল অতি গুহ্যবৃত্তান্ত, কি প্রকারে আপনি তাহা অবগত হইলেন?

রাজা তাহার কোন উত্তর না দিয়া কহিলেন, "সে অঙ্গুরীয় কোথায় আছে? আমাকে দেখাও।"

হিরণ্ময়ী কহিলেন, "উহা আমি গৃহে রাখিয়া আসিয়াছি। পঞ্চবৎসর পরিপূর্ণ হইতে আরও কয়েক দণ্ড বিলম্ব আছে, অতএব তাহা পরিতে আনন্দ স্বামীর যে নিষেধ ছিল—তাহা এখনও আছে।"

রাজা। ভালই—কিন্তু সেই অঙ্গুরীয়ের অনুরূপ দ্বিতীয় যে অঙ্গুরীয় তোমার স্বামীকে আনন্দ স্বামী দিয়াছিলেন, তাহা দেখিলে চিনিতে পারিবে?

হি। উভয় অঙ্গুরীয় একই রূপ; সুতরাং দেখিলে চিনিতে পারিব।

তখন প্রতিহারী রাজাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া এক সুবর্ণের কৌটা আনিল। রাজা তাহার মধ্য হইতে একটি অঙ্গুরীয় লইয়া বলিলেন, "দেখ, এই অঙ্গুরীয় কাহার?"

হিরণ্ময়ী অঙ্গুরীয় প্রদীপালোকে বিলক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, "দেব! এই আমার স্বামীর অঙ্গুরীয় বটে, কিন্তু আপনি ইহা কোথায় পাইলেন?" পরে কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, "দেব! ইহাতে জানিলাম যে, আমি বিধবা হইয়াছি। নহিলে তিনি জীবিতাবস্থায় ইহা ত্যাগ করিবার সম্ভাবনা ছিল না।"

রাজা হাসিয়া কহিলেন, "আমার কথায় বিশ্বাস কর, তুমি বিধবা নহ।"

হি। তবে আমার স্বামী আমার অপেক্ষাও দরিদ্র। ধনলোভে ইহা বিক্রয় করিয়াছেন।

রা। তোমার স্বামী ধনী ব্যক্তি।

হি। তবে আপনি বলে-ছলে-কৌশলে তাঁহার নিকট হইতে ইহা অপহরণ করিয়াছেন।

রাজা এই দুঃসাহসিক কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। বলিলেন, "তোমার বড় সাহস, রাজা মদনদেব চোর, ইহা আর কেহ বলে না।"

হি। নচেৎ আপনি এ অঙ্গুরীয় কোথায় পাইলেন?

রা। আনন্দ স্বামী তোমার বিবাহের রাত্রে ইহা আমার অঙ্গুলিতে পরাইয়া দিয়াছেন।

হিরণ্ময়ী তখন লজ্জায় অধোমুখ হইয়া কহিলেন, —"আর্য্যপুত্র! আমার অপরাধ ক্ষমা করুন, আমি চপলা, না জানিয়া কটুকথা কহিয়াছি।"

নবম পরিচ্ছেদ

হিরণ্ময়ী রাজমহিষী, ইহা শুনিয়া হিরণ্ময়ী অত্যন্ত বিস্মিতা হইলেন; কিন্তু কিছুমাত্র আহ্লাদিতা হইলেন না; বরং বিষণ্ণা হইলেন। ভাবিতে লাগিলেন যে, "আমি এতদিন পুরন্দরকে পাই নাই বটে, কিন্তু পরপত্নীত্বের যন্ত্রণাভোগ করি নাই। এখন হইতে আমার সে যন্ত্রণা আরম্ভ হইল। আর আমি হৃদয়মধ্যে পুরন্দরের পত্নী—কি প্রকারে অন্যানুরাগিণী হইয়া এই মহাত্মার গৃহ কলঙ্কিত করিব?" হিরণ্ময়ী ভাবিতেছিলেন, এমত সময়ে রাজা বলিলেন, "হিরণ্ময়ি! তুমি আমার মহিষী বটে; কিন্তু তোমাকে গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে আমার কয়েকটি কথা জিজ্ঞাস্য আছে। তুমি বিনা মূল্যে পুরন্দরের গৃহে বাস কর কেন?"

হিরণ্ময়ী অধোবদন হইলেন। রাজা পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার দাসী অমলা সর্ব্বদা পুরন্দরের গৃহে যাতায়াত করে কেন?"

হিরণ্ময়ী আরও লজ্জাবনতমুখী হইয়া রহিলেন, ভাবিতেছিলেন, "রাজা মদনদেব কি সর্ব্বজ্ঞ?"

তখন রাজা কহিলেন, "আর একটা গুরুতর কথা আছে। তুমি পরনারী হইয়া পুরন্দর-প্রদত্ত হীরকহার গ্রহণ করিয়াছিলে কেন?"

এবার হিরণ্ময়ী কথা কহিলেন। বলিলেন, "আর্য্যপুত্র! জানিলাম, আপনি সর্ব্বজ্ঞ নহেন। হীরকহার আমি ফিরাইয়া দিয়াছি।"

রাজা। তুমি সেই হার আমার নিকট বিক্রয় করিয়াছ। এই দেখ সেই হার।

এই বলিয়া রাজা কৌটার মধ্য হইতে হার বাহির করিয়া দেখাইলেন, হিরণ্ময়ী হীরকহার চিনিতে পারিয়া বিস্মিতা হইলেন। কহিলেন, "আর্য্যপুত্র! এ হার কি আমি স্বয়ং আসিয়া আপনার কাছে বিক্রয় করিয়াছি?"

রা। না, তোমায় দাসী বা দূতী অমলা আসিয়া বিক্রয় করিয়াছে। তাহাকে ডাকাইব?

হিরণ্ময়ীর অমর্ষান্বিত বদনমণ্ডলে একটু হাসি দেখা দিল। তিনি বলিলেন, "আর্য্যপুত্র, অপরাধ ক্ষমা করুন; অমলাকে ডাকাইতে হইবে না, আমি এ বিক্রয় স্বীকার করিতেছি।"

এবার রাজা বিস্মিত হইলেন। বলিলেন, "স্ত্রীলোকের চরিত্র অভাবনীয়। তুমি পরের পত্নী হইয়া পুরন্দরের নিকট কেন এ হার গ্রহণ করিলে?"

হি। প্রণয়োপহার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি।

রাজা আরও বিস্মিত হইলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কি? কি প্রকারে প্রণয়োপহার?"

হি। আমি কুলটা। মহারাজ! আমি আপনার গ্রহণের যোগ্য নহি। আমি আপনাকে প্রণাম করিতেছি, আমাকে বিদায় দিন। আমার সঙ্গে বিবাহ বিস্মৃত হউন।

হিরণ্ময়ী রাজাকে প্রণাম করিয়া গমনোদ্যত হইয়াছেন, এমন সময় রাজার বিস্ময়বিকাশক মুখকান্তি অকস্মাৎ প্রফুল্ল হইল। তিনি উচ্চৈর্হাস্য করিয়া উঠিলেন। হিরণ্ময়ী ফিরিল।

রাজা কহিলেন, "হিরণ্ময়ি! তুমিই জিতিলে, আমি হারিলাম। তুমিও কুলটা নহ, আমিও তোমার স্বামী নহি। যাইও না।"

হি। মহারাজ! তবে এ কাণ্ডটা কি, আমাকে বুঝাইয়া বলুন। আমি অতি সামান্য স্ত্রী আমার সঙ্গে আপনার তুল্য গম্ভীরপ্রকৃতি রাজাধিরাজের রহস্য সম্ভবে না।

রাজা হাস্য ত্যাগ না করিয়া বলিলেন, "আমার ন্যায় রাজারই এইরূপ রহস্য সম্ভবে। ছয় বৎসর হইল, তুমি একখানি পত্রার্দ্ধ অলঙ্কারমধ্যে পাইয়াছিলে, তাহা কি আছে?"

হি। মহারাজ! আপনি সর্ব্বজ্ঞই বটে, পত্রার্দ্ধ আমার গৃহে।

রা। তুমি শিবিকারোহণে পুনশ্চ গৃহে গিয়া সেই পত্রার্দ্ধ লইয়া আইস। তুমি আসিলে আমি সকল কথা বলিব।

দশম পরিচ্ছেদ

হিরণ্ময়ী রাজার আজ্ঞায় শিবিকারোহণে স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এবং তথা হইতে সেই পূর্ব্ববর্ণিত পত্রার্দ্ধ লইয়া পুনশ্চ রাজসন্নিধানে আসিলেন। রাজা সেই পত্রার্দ্ধ দেখিয়া আর একখানি পত্রার্দ্ধ কৌটা হইতে বাহির করিয়া হিরণ্ময়ীকে দিলেন। বলিলেন, "উভয় অর্দ্ধকে মিলিত কর।" হিরণ্ময়ী উভয়ার্দ্ধ মিলিত করিয়া দেখিলেন, মিলিল। রাজা কহিলেন, উভয়ার্দ্ধ একত্রিত করিয়া পাঠ কর। তখন হিরণ্ময়ী নিম্নলিখিত মত পাঠ করিলেন।

"(জ্যোতিষী গণনা করিয়া দেখিলাম) যে, তুমি যে কল্পনা করিয়াছ, তাহা কর্ত্তব্য নহে। (হিরণ্ময়ী তুল্য সোণার পুত্তলিকে) কখন চিরবৈধব্যে নিক্ষিপ্ত করা যাইতে পারে না। তাহার (বিবাহ হইলে ভয়ানক বিপদ্‌), তাহার চিরবৈধব্য ঘটিবে, গণনা দ্বারা জানিয়াছি। তবে পঞ্চবৎসর (পর্য্যন্ত পরস্পরে) যদি দম্পতি মুখদর্শন না করে, তবে এই গ্রহ হইতে যাহাতে নিষ্কৃতি (হইতে পারে,) তাহার বিধান আমি করিতে পারি।"

পাঠ সমাপন হইলে, রাজা কহিলেন, "এই লিপি আনন্দ স্বামী তোমার পিতাকে লিখিয়াছিলেন।"

হি। তাহা এখন বুঝিতে পারিতেছি। কেন না, আমাদিগের বিবাহকালে নয়নাবৃত হইয়াছিল—কেনই বা গোপনে সেই অদ্ভুত বিবাহ হইয়াছিল—কেনই বা পঞ্চ বৎসর অঙ্গুরীয় ব্যবহার নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিতেছি; কিন্তু আর ত কিছু বুঝিতে পারিতেছি না।

রাজা। আর ত অবশ্য বুঝিয়াছ যে, এই পত্র পাইয়াই তোমার পিতা পুরন্দরের সহিত সম্বন্ধ রহিত করিলেন। পুরন্দর সেই দুঃখে সিংহলে গেল।

এ দিকে আনন্দ স্বামী পাত্রানুসন্ধান করিয়া একটি পাত্র স্থির করিলেন। পাত্রের কোষ্ঠী গণনা করিয়া জানিলেন যে, পাত্রটির অশীতি বৎসর পরমায়ু। তবে অষ্টাবিংশতি বৎসর বয়স অতীত হইবার পূর্ব্বে মৃত্যুর এক সম্ভাবনা ছিল। গণিয়া দেখিলেন যে, ঐ বয়স অতীত হইবার পূর্ব্বে এবং বিবাহের পঞ্চ বৎসরমধ্যে পত্নীশয্যায় শয়ন করিয়া তাহার প্রাণত্যাগ করিবার সম্ভাবনা। কিন্তু যদি কোনরূপে পঞ্চ বৎসর জীবিত থাকেন, তবে দীর্ঘজীবী হইবেন।

অতএব পাত্রের ত্রয়োবিংশতি বৎসর অতীত হইবার সময়ে বিবাহ দেওয়া স্থির করিলেন। কিন্তু এত দিন অবিবাহিত থাকিলে পাছে তুমি কোন প্রকার চঞ্চলা হও বা গোপনে কাহাকে বিবাহ কর, এই জন্য তোমাকে ভয় দেখাইবার কারণে এই পত্রার্দ্ধ তোমার অলঙ্কারমধ্যে রাখিয়াছিলেন।

তৎপরে বিবাহ দিয়া পঞ্চ বৎসর সাক্ষাৎ না হয়, তাহার জন্য যে যে কৌশল করিয়াছিলেন, তাহা জ্ঞাত আছ। সেই জন্যই পরস্পরের পরিচয়মাত্র পাও নাই।

কিন্তু সম্প্রতি কয়েক মাস হইল, বড় গোলযোগ হইয়া উঠিয়াছিল। কয়েক মাস হইল, আনন্দ স্বামী এ নগরে আসিয়া তোমার দারিদ্র্য শুনিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলেন। তিনি তোমাকে দেখিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু সাক্ষাৎ করেন নাই। তিনি আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তোমার বিবাহ-বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক কহিলেন। পরে কহিলেন, "আমি যদি জানিতে পারিতাম যে, হিরণ্ময়ী এরূপ দারিদ্র্যাবস্থায় আছে, তাহা হইলে আমি উহা মোচন করিতাম। এক্ষণে আপনি উহার প্রতীকার করিবেন। এ বিষয়ে আমাকেই আপনার নিকট ঋণী জানিবেন। আপনার ঋণ আমি পরিশোধ করিব। সম্প্রতি আমার আর একটা অনুরোধ রক্ষা করিতে হইবে। হিরণ্ময়ীর স্বামী এই নগরে বাস করিতেছেন। উঁহাদের পরস্পর সাক্ষাৎ না হয়, ইহা আপনি দেখিবেন।" এই বলিয়া তোমার স্বামীর পরিচয়ও আমার নিকট দিলেন। সেই অবধি অমলা যে অর্থব্যয়ের দ্বারা তোমার দারিদ্র্যদুঃখ মোচন করিয়া আসিতেছে, তাহা আমা হইতে প্রাপ্ত। আমি তোমার পিতৃগৃহ ক্রয় করিয়া তোমাকে বাস করিতে দিয়াছিলাম। হার আমি পাঠাইয়াছিলাম। সে-ও তোমার পরীক্ষার্থ।

হি। তবে আপনি এ অঙ্গুরীয় কোথায় পাইলেন? কেনই বা আমার নিকট স্বামিরূপে পরিচয় দিয়া আমাকে প্রতারিত করিয়াছিলেন? পুরন্দরের গৃহে বাস করিতেছি বলিয়া কেনই বা অনুযোগ করিতেছিলেন?

রাজা। যে দণ্ডে আমি আনন্দ স্বামীর অনুজ্ঞা পাইলাম, সেই দণ্ডেই আমি তোমার প্রহরায় লোক নিযুক্ত করিলাম। সেই দিনই অমলা দ্বারা তোমার নিকট হার পাঠাই। তার পর অভ পঞ্চম বৎসর পূর্ণ হইবে জানিয়া তোমার স্বামীকে ডাকাইয়া কহিলাম, 'তোমার বিবাহবৃত্তান্ত আমি সমুদয় জানি, তোমার সেই অঙ্গুরীয়টি লইয়া একাদশ দণ্ড রাত্রের সময় আসিও। তোমার স্ত্রীর সহিত মিলন হইবে।' তিনি কহিলেন যে, 'মহারাজের আজ্ঞা শিরোধার্য্য; কিন্তু বনিতার সহিত মিলনের আমার স্পৃহা নাই। না হইলেই ভাল হয়।' আমি কহিলাম, 'আমার আজ্ঞা।' তাহাতে তোমার স্বামী স্বীকৃত হইলেন, কিন্তু কহিলেন যে, 'আমার সেই বনিতা সচ্চরিত্রা কি দুশ্চরিত্রা, তাহা আপনি জানেন। যদি দুশ্চরিত্রা স্ত্রী গ্রহণ করিতে আজ্ঞা করেন, তবে আপনাকে অধর্ম্ম স্পর্শিবে।' আমি উত্তরে কহিলাম, 'অঙ্গুরীয়টি দিয়া যাও। আমি তোমার স্ত্রীর চরিত্র পরীক্ষা করিয়া গ্রহণ করিতে বলিব।' তিনি কহিলেন, এ অঙ্গুরীয় অন্যকে বিশ্বাস করিয়া দিতাম না, কিন্তু আপনাকে অবিশ্বাস নাই।' আমি অঙ্গুরীয় লইয়া তোমার যে পরীক্ষা করিয়াছি, তাহাতে তুমি জয়ী হইয়াছ।

হি। পরীক্ষা ত কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

এমন সময় রাজপুরে মঙ্গলসূচক ঘোরতর বাদ্যোদ্যম হইয়া উঠিল। রাজা কহিলেন, "রাত্রি একাদশ দণ্ড অতীত হইল—পরীক্ষার কথা পশ্চাতে বলিব। এক্ষণে তোমার স্বামী আসিয়াছেন, শুভলগ্নে তাঁহার সহিত শুভদৃষ্টি কর।"

তখন পশ্চাৎ হইতে সেই কক্ষের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। এক জন মহাকায় পুরুষ সেই দ্বারপথে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। রাজা কহিলেন, "হিরণ্ময়ি, ইনিই তোমার স্বামী।"

হিরণ্ময়ী চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল—জাগ্রত-স্বপ্নে ভেদজ্ঞানশূন্যা হইলেন। দেখিলেন—পুরন্দর।

উভয়ে উভয়কে নিরীক্ষণ করিয়া স্তম্ভিত, উন্মত্তপ্রায় হইলেন। কেহই যেন কথা বিশ্বাস করিলেন না।

রাজা পুরন্দরকে কহিলেন, "সুহৃৎ, হিরণ্ময়ী তোমার যোগ্যা পত্নী, আদরে গৃহে লইয়া যাও। ইনি অদ্যাপি তোমার প্রতি পূর্ব্ববৎ স্নেহময়ী। আমি দিবারাত্র ইঁহাকে প্রহরাতে রাখিয়াছিলাম, তাহাতে বিশেষ জানি যে, ইনি অনন্যানুরাগিণী। তোমার ইচ্ছাক্রমে উঁহার পরীক্ষা করিয়াছি, আমি উঁহার স্বামী বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলাম, কিন্তু রাজ্যলোভেও হিরণ্ময়ী লুব্ধ হইয়া তোমাকে ভুলেন নাই। আপনাকে হিরণ্ময়ীর স্বামী বলিয়া পরিচিত করিয়া ইঙ্গিতে জানাইলাম যে, হিরণ্ময়ীকে তোমার প্রতি অসৎপ্রণয়াসক্ত বলিয়া সন্দেহ করি। যদি

হিরণ্ময়ী তাহাতে দুঃখিত হইত, 'আমি নির্দোষী, আমাকে গ্রহণ করুন' বলিয়া কাতর হইত, তাহা হইলে বুঝিতাম যে, হিরণ্ময়ী তোমাকে ভুলিয়াছে। কিন্তু হিরণ্ময়ী তাহা না বলিয়া বলিল, 'মহারাজ, আমি কুলটা, আমাকে ত্যাগ করুন।' হিরণ্ময়ি! তোমার তখনকার মনের ভাব আমি সকলই বুঝিয়াছিলাম। তুমি অন্য স্বামীর সংসর্গ করিবে না বলিয়াই আপনাকে কুলটা বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলে। এক্ষণে আশীর্ব্বাদ করি, তোমরা সুখী হও।"

হি। মহারাজ! আমাকে আর একটি কথা বুঝাইয়া দিন। ইনি সিংহলে ছিলেন, কাশীতে আমার সঙ্গে পরিণয় হইল কি প্রকারে? যদি ইনি সিংহল হইতে সে সময় আসিয়াছিলেন, তবে আমরা কেহ জানিলাম না কেন?

রাজা। আনন্দ স্বামী এবং পুরন্দরের পিতার পরামর্শ করিয়া, সিংহলে লোক পাঠাইয়া উঁহাকে সিংহল হইতে একেবারে কাশী লইয়া গিয়াছিলেন, পরে সেখান হইতে ইনি পুনশ্চ সিংহল গিয়াছিলেন, তাম্রলিপ্তে আসেন নাই, এ জন্য তোমরা কেহ জানিতে পার নাই।

পুরন্দর কহিলেন, "মহারাজ! আপনি যেমন আমার চিরকালের মনোরথ পূর্ণ করিলেন, জগদীশ্বর এমনই আপনার সকল মনোরথ পূর্ণ করুন। অদ্য আমি যেমন সুখী হইলাম, এমন সুখী কেহ আপনার রাজ্যে কখন বাস করে নাই।"

সমাপ্ত

মৃণালিনী

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

"বিভর্ষি চাকারমনির্বৃতানাং
মৃণালিনী হৈমমিবোপরাগম্।"

[ত্রয়োদশ সংস্করণ হইতে মুদ্রিত]

বঙ্গকবিকুলতিলক

শ্রীযুক্ত বাবু দীনবন্ধু মিত্র সুহৃৎপ্রধানকে

এই গ্রন্থ প্রণয়োপহারস্বরূপ উৎসর্গ করিলাম।

মৃণালিনী

প্রথম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

আচার্য্য

এক দিন প্রয়াগতীর্থে, গঙ্গাযমুনা-সঙ্গমে, অপূর্ব্ব প্রাবৃট্-দিনান্তশোভা প্রকটিত হইতেছিল। প্রাবৃট্‌কাল, কিন্তু মেঘ নাই, অথবা যে মেঘ আছে, তাহা স্বর্ণময় তরঙ্গমালাবৎ পশ্চিম-গগনে বিরাজ করিতেছিল। সূর্য্যদেব অস্তে গমন করিয়াছিলেন। বর্ষার জলসঞ্চারে গঙ্গা যমুনা উভয়েই সম্পূর্ণশরীরা, যৌবনের পরিপূর্ণতায় উন্মাদিনী, যেন দুই ভগিনী ক্রীড়াচ্ছলে পরস্পরে আলিঙ্গন করিতেছিল। চঞ্চল বসনাগ্রভাগবৎ তরঙ্গমালা পবনতাড়িত হইয়া কূলে প্রতিঘাত করিতেছিল।

একখানি ক্ষুদ্র তরণীতে দুই জন মাত্র নাবিক। তরণী অসঙ্গত সাহসে সেই দুর্দ্দমনীয় যমুনার স্রোতোবেগে আরোহণ করিয়া প্রয়াগের ঘাটে আসিয়া লাগিল। এক জন নৌকায় রহিল, এক জন তীরে নামিল। যে নামিল, তাহার নবীন যৌবন, উন্নত বলিষ্ঠ দেহ, যোদ্ধৃবেশ। মস্তকে উষ্ণীষ, অঙ্গে কবচ, করে ধনুর্ব্বাণ, পৃষ্ঠে তূণীর, চরণে অনুপদীনা। এই বীরাকার পুরুষ পরম সুন্দর। ঘাটের উপরে সংসারবিরাগী পুণ্যপ্রয়াসীদিগের কতকগুলি আশ্রম আছে। তন্মধ্যে একটি ক্ষুদ্র কুটীরে এই যুবা প্রবেশ করিলেন।

কুটীরমধ্যে এক ব্রাহ্মণ কুশাসনে উপবেশন করিয়া জপে নিযুক্ত ছিলেন। ব্রাহ্মণ অতি দীর্ঘাকার পুরুষ; শরীর শুষ্ক, আয়ত মুখমণ্ডলে শ্বেতশ্মশ্রু বিরাজিত; ললাট ও বিরলকেশ তালুদেশে অল্পমাত্র বিভূতিশোভা। ব্রাহ্মণের কান্তি গম্ভীর এবং কটাক্ষ কঠিন; দেখিলে তাঁহাকে নির্দ্দয় বা অভক্তিভাজন বলিয়া বোধ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না, অথচ শঙ্কা হইত। আগন্তুককে দেখিবামাত্র তাঁহার সে পরুষভাব যেন দূর হইল, মুখের গাম্ভীর্য্যমধ্যে প্রসাদের সঞ্চার হইল। আগন্তুক, ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিয় সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। ব্রাহ্মণ আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন,—"বৎস হেমচন্দ্র, আমি অনেক দিবসাবধি তোমার প্রতীক্ষা করিতেছি।"

হেমচন্দ্র বিনীতভাবে কহিলেন, "অপরাধ গ্রহণ করিবেন না, দিল্লীতে কার্য্য সিদ্ধ হয় নাই। পরন্তু যবন আমার পশ্চাদ্গামী হইয়াছিল; এই জন্য কিছু সতর্ক হইয়া আসিতে হইয়াছিল। তদ্ধেতু বিলম্ব হইয়াছে।"

ব্রাহ্মণ কহিলেন, "দিল্লীর সংবাদ আমি সকল শুনিয়াছি। বখ্‌তিয়ার খিলিজীকে হাতীতে মারিত, ভালই হইত, দেবতার শত্রু, পশু-হস্তে নিপাত হইত। তুমি কেন তার প্রাণ বাঁচাইতে গেলে?"

হেম। তাহাকে স্বহস্তে যুদ্ধে মারিব বলিয়া। সে আমার পিতৃশত্রু, আমার পিতার রাজ্যচোর। আমারই সে বধ্য।

ব্রাহ্মণ। তবে তাহার উপর যে হাতী রাগিয়া আক্রমণ করিয়াছিল, তুমি বখতিয়ারকে না মারিয়া সে হাতীকে মারিলে কেন?

হেম। আমি কি চোরের মত বিনা যুদ্ধে শত্রু মারিব? আমি মগধবিজেতাকে যুদ্ধে জয় করিয়া পিতার রাজ্য উদ্ধার করিব। নহিলে আমার মগধরাজপুত্র নামে কলঙ্ক।

ব্রাহ্মণ কিঞ্চিৎ পরুষভাবে কহিলেন, "এ সকল ঘটনা ত অনেক দিন হইয়া গিয়াছে, ইহার পূর্ব্বে তোমার এখানে আসার সম্ভাবনা ছিল। তুমি কেন বিলম্ব করিলে? তুমি মথুরায় গিয়াছিলে?"

হেমচন্দ্র অধোবদন হইলেন। ব্রাহ্মণ কহিলেন, "বুঝিলাম, তুমি মথুরায় গিয়াছিলে, আমার নিষেধ গ্রাহ্য কর নাই। যাহাকে দেখিতে মথুরায় গিয়াছিলে, তাহার কি সাক্ষাৎ পাইয়াছ?"

এবার হেমচন্দ্র রুক্ষভাবে কহিলেন, "সাক্ষাৎ যে পাইলাম না, সে আপনারই দয়া। মৃণালিনীকে আপনি কোথায় পাঠাইয়াছেন?"

মাধবাচার্য্য কহিলেন, "আমি যে কোথায় পাঠাইয়াছি, তাহা তুমি কি প্রকারে সিদ্ধান্ত করিলে?"

হেম। মাধবাচার্য্য ভিন্ন এ মন্ত্রণা কাহার?

আমি মৃণালিনীর ধাত্রীর মুখে শুনিলাম যে, মৃণালিনী আমার আঙ্গটি দেখিয়া কোথায় গিয়াছে, আর তাহার উদ্দেশ নাই। আমার আঙ্গটি আপনি পাথেয় জন্য চাহিয়া লইয়াছিলেন। আঙ্গটির পরিবর্ত্তে অন্য রত্ন দিতে চাহিয়াছিলাম; কিন্তু আপনি লন নাই। তখনই, আমি সন্দিহান হইয়াছিলাম; কিন্তু আপনাকে অদেয় আমার কিছুই নাই, এই জন্যই বিনা বিবাদে আঙ্গটি দিয়াছিলাম। কিন্তু আমার সে অসতর্কতার আপনি সমুচিত প্রতিফল দিয়াছেন।

মাধবাচার্য্য কহিলেন, "যদি তাহাই হয়, আমার উপর রাগ করিও না। তুমি দেবকার্য্য না সাধিলে কে সাধিবে? তুমি যবনকে না তাড়াইলে কে তাড়াইবে? যবননিপাত তোমার একমাত্র ধ্যানস্বরূপ হওয়া উচিত। এখন মৃণালিনী তোমার মন অধিকার করিবে কেন? একবার তুমি মৃণালিনীর আশায় মথুরায় বসিয়া ছিলে বলিয়া তোমার বাপের রাজ্য হারাইয়াছ, যবনাগমনকালে হেমচন্দ্র যদি মথুরায় না থাকিয়া মগধে থাকিত, তবে মগধজয় কেন হইবে? আবার কি সেই মৃণালিনীপাশে বদ্ধ হইয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিবে? মাধবাচার্য্যের জীবন থাকিতে তাহা হইবে না। সুতরাং যেখানে থাকিলে তুমি মৃণালিনীকে পাইবে না, আমি তাহাকে সেইখানে রাখিয়াছি।"

হেম। আপনার দেবকার্য্য আপনি উদ্ধার করুন; আমি এই পর্য্যন্ত।

মা। তোমার দুর্ব্বুদ্ধি ঘটিয়াছে। এই কি তোমার দেবভক্তি? ভাল, তাহাই না হউক, দেবতারা আত্মকর্ম্মসাধন জন্য তোমার ন্যায় মনুষ্যের সাহায্যের অপেক্ষা করেন না। কিন্তু তুমি কাপুরুষ যদি না হও, তবে তুমি কি প্রকারে শত্রুশাসন হইতে অবসর পাইতে চাও? এই কি তোমার বীরগর্ব্ব? এই কি তোমার শিক্ষা? রাজবংশে জন্মিয়া কি প্রকারে আপনার রাজ্যোদ্ধারে বিমুখ হইতে চাহিতেছ?

হেম। রাজ্য—শিক্ষা—গর্ব্ব অতল জলে ডুবিয়া যাউক।

মা। নরাধম! তোমার জননী কেন তোমায় দশ মাস দশ দিন গর্ভে ধারণ করিয়া যন্ত্রণাভোগ করিয়াছিল? কেনই বা আমি দ্বাদশ বর্ষ দেবারাধনা ত্যাগ করিয়া এ পাষণ্ডকে সকল বিদ্যা শিখাইলাম?

মাধবাচার্য্য অনেকক্ষণ নীরবে করলগ্নকপোল হইয়া রহিলেন। ক্রমে হেমচন্দ্রের অনিন্দ্য-গৌর মুখকান্তি মধ্যাহ্নমরীচি-বিশোষিত স্থলপদ্মবৎ আরক্তবর্ণ হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু গর্ব্বাগ্নিগিরিশিখরতুল্য তিনি স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। পরিশেষে মাধবাচার্য্য কহিলেন, "হেমচন্দ্র! ধৈর্য্যাবলম্বন কর। মৃণালিনী কোথায়, তাহা বলিব—মৃণালিনীর সহিত তোমার বিবাহ দেওয়াইব। কিন্তু এক্ষণে আমার পরামর্শের অনুবর্ত্তী হও, আগে আপনার কাজ সাধন কর।"

হেমচন্দ্র কহিলেন, "মৃণালিনী কোথায় না বলিলে আমি যবনবধের জন্য অস্ত্র স্পর্শ করিব না।"

মাধবাচার্য্য কহিলেন, "আর যদি মৃণালিনী মরিয়া থাকে?"

হেমচন্দ্রের চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল। তিনি কহিলেন, "তবে সে আপনারই কাজ।"

মাধবাচার্য্য কহিলেন,—"আমি স্বীকার করিতেছি, আমিই দেবকার্য্যের কণ্টককে বিনষ্ট করিয়াছি।"

হেমচন্দ্রের মুখকান্তি বর্ষোন্মুখ মেঘবৎ হইল। ত্রস্তহস্তে ধনুকে শরসংযোগ করিয়া কহিলেন, "যে মৃণালিনীর বধকর্ত্তা, সে আমার বধ্য। এই শরে গুরুহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, উভয় দুষ্ক্রিয়া সাধন করিব।"

মাধবাচার্য্য হাস্য করিলেন, কহিলেন, "গুরুহত্যা, ব্রাহ্মণহত্যায় তোমার যত আমোদ, স্ত্রীহত্যায় আমার তত নহে। এক্ষণে তোমাকে পাতকের ভাগী হইতে হইবে না। মৃণালিনী জীবিতা আছে। পার, তাহার সন্ধান করিয়া সাক্ষাৎ কর। এক্ষণে আমার আশ্রম হইতে স্থানান্তরে যাও, আশ্রম কলুষিত করিও না; অপাত্রে আমি কোন অস্ত্র দিই না।" এই বলিয়া মাধবাচার্য্য পূর্ব্ববৎ জপে নিযুক্ত হইলেন।

হেমচন্দ্র আশ্রম হইতে নির্গত হইলেন। ঘাটে আসিয়া ক্ষুদ্র তরণী আরোহণ করিলেন। যে দ্বিতীয় ব্যক্তি নৌকায় ছিল, তাহাকে বলিলেন, "দিগ্বিজয়! নৌকা ছাড়িয়া দাও।"

দিগ্বিজয় বলিল, "কোথায় যাইব?" হেমচন্দ্র বলিলেন, "যেখানে ইচ্ছা—যমালয়।"

দিগ্বিজয় প্রভুর স্বভাব বুঝিত। অস্ফুটস্বরে কহিল, "সেটা অল্প পথ," এই বলিয়া সে তরণী ছাড়িয়া দিয়া স্রোতের প্রতিকূলে বাহিতে লাগিল।

হেমচন্দ্র অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া শেষে কহিলেন, "দূর হউক! ফিরিয়া চল।"

দিগ্বিজয় নৌকা ফিরাইয়া পুনরপি প্রয়াগের ঘাটে উপনীত হইল। হেমচন্দ্র এক লম্ফে তীরে

অবতরণ করিয়া পুনর্ব্বার মাধবাচার্য্যের আশ্রমে গেলেন।

তাঁহাকে দেখিয়া মাধবাচার্য্য কহিলেন, "পুনর্ব্বার কেন আসিয়াছ?"

হেমচন্দ্র কহিলেন, "আপনি যাহা বলিবেন, তাহাই স্বীকার করিব। মৃণালিনী কোথায় আছে, আজ্ঞা করুন।"

মা। তুমি সত্যবাদী—আমার আজ্ঞাপালন করিতে স্বীকার করিলে, ইহাতেই আমি সন্তুষ্ট হইলাম। গৌড়নগরে এক শিষ্যের বাটীতে মৃণালিনীকে রাখিয়াছি। তোমাকেও সেই প্রদেশে যাইতে হইবে, কিন্তু তুমি তাহার সাক্ষাৎ পাইবে না। শিষ্যের প্রতি আমার বিশেষ আজ্ঞা আছে যে, যত দিন মৃণালিনী তাঁহার গৃহে থাকিবে, তত দিন সে পুরুষান্তরের সাক্ষাৎ না পায়।

হেম। সাক্ষাৎ না পাই, যাহা বলিলেন, ইহাতেই আমি চরিতার্থ হইলাম। এক্ষণে কি কার্য্য করিতে হইবে, অনুমতি করুন।

মা। তুমি দিল্লী গিয়া যবনের মন্ত্রণা, কি, জানিয়া আসিয়াছ?

হেম। যবনেরা বঙ্গবিজয়ের উদ্যোগ করিতেছে। অতি ত্বরায় বখ্‌তিয়ার খিলিজি সেনা লইয়া গৌড়ে যাত্রা করিবে।

মাধবাচার্য্যের মুখ হর্ষপ্রফুল্ল হইল। তিনি কহিলেন, "এত দিনে বিধাতা বুঝি এ দেশের প্রতি সদয় হইলেন।"

হেমচন্দ্র একতানমনে মাধবাচার্য্যের প্রতি চাহিয়া তাঁহার কথার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। মাধবাচার্য্য বলিতে লাগিলেন,—"কয় মাস পর্য্যন্ত আমি কেবল গণনায় নিযুক্ত আছি। গণনায় যাহা ভবিষ্যৎ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে, তাহা ফলিবার উপক্রম হইয়াছে।"

হেম। কি প্রকারে?

মা। গণিয়া দেখিলাম যে, যবনসাম্রাজ্যধ্বংস বঙ্গরাজ্য হইতে আরম্ভ হইবে।

হেম। তাহা হইতে পারে। কিন্তু কত কালেই বা তাহা হইবে? আর কাহা কর্ত্তৃক?

মা। তাহাও গণিয়া স্থির করিয়াছি। যখন পশ্চিম দেশীয় বণিক্ বঙ্গরাজ্যে অস্ত্রধারণ করিবে, তখন যবনরাজ্য উৎসন্ন হইবে।

হেম। তবে আমার জয়লাভের কোথা সম্ভাবনা? আমি ত বণিক্ নহি।

মা। তুমিই বণিক। মথুরায় যখন তুমি মৃণালিনীর প্রয়াসে দীর্ঘকাল বাস করিয়াছিলে, তখন তুমি কি ছলনা করিয়া তথায় বাস করিতে?

হেম। আমি তখন বণিক বলিয়া মথুরায় পরিচিত ছিলাম বটে।

মা। সুতরাং তুমিই পশ্চিমদেশীয় বণিক। গৌড়রাজ্যে গিয়া তুমি অস্ত্রধারণ করিলেই যবন-নিপাত হইবে। তুমি আমার নিকট প্রতিশ্রুত হও যে, কা'ল প্রাতে গৌড়ে যাত্রা করিবে। যে পর্য্যন্ত সেখানে না যবনের সহিত যুদ্ধ কর, সে পর্য্যন্ত মৃণালিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিবে না।

হেমচন্দ্র দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "তাহাই স্বীকার করিলাম। কিন্তু একা যুদ্ধ করিয়া কি করিব?"

মা। গৌড়েশ্বরের সেনা আছে।

হেম। থাকিতে পারে,—সে বিষয়েও কতক সন্দেহ; কিন্তু যদি থাকে, তবে তাহারা আমার অধীন হইবে কেন?

মা। তুমি আগে যাও। নবদ্বীপে আমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। সেইখানে গিয়া ইহার বিহিত উদ্যোগ করা যাইবে। গৌড়েশ্বরের নিকট আমি পরিচিত আছি।

"যে আজ্ঞা" বলিয়া হেমচন্দ্র প্রণাম করিয়া বিদায় হইলেন। যতক্ষণ তাঁহার বীরমূর্ত্তি নয়নগোচর হইতে লাগিল, আচার্য্য ততক্ষণ তৎপ্রতি অনিমেষলোচনে চাহিয়া রহিলেন। আর যখন হেমচন্দ্র অদৃশ্য হইলেন, মাধবাচার্য্য মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"যাও, বৎস! প্রতি পদে বিজয়লাভ কর। যদি ব্রাহ্মণবংশে আমার জন্ম হয়, তবে তোমার পদে কুশাঙ্কুরও বিঁধিবে না। মৃণালিনী মৃণালিনী পাখী আমি তোমারই জন্য পিঞ্জরে বাঁধিয়া রাখিয়াছি। কিন্তু কি জানি, পাছে তুমি তাহার কলধ্বনিতে মুগ্ধ হইয়া বড় কাজ ভুলিয়া যাও, এই জন্য তোমার পরম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্রাহ্মণ তোমাকে কিছুদিনের জন্য মনঃপীড়া দিতেছে।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পিঞ্জরের বিহঙ্গী

লক্ষ্মণাবতীনিবাসী হৃষীকেশ সম্পন্ন বা দরিদ্র ব্রাহ্মণ নহেন। তাঁহার বাসগৃহের বিলক্ষণ সৌষ্ঠব ছিল। তাঁহার অন্তঃপুরমধ্যে যথায় দুইটি তরুণী কক্ষপ্রাচীরে আলেখ্য লিখিতেছিলেন, তথায় পাঠক

মহাশয়কে দাঁড়াইতে হইবে। উভয় রমণীই বাত্মকর্ম্মে সবিশেষ মনোভিনিবেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তন্নিবন্ধন পরস্পরের সহিত কথোপকথনের কোন বিঘ্ন হইতেছিল না। সেই কথোপকথনের মধ্যভাগ হইতে পাঠক মহাশয়কে শুনাইতে আরম্ভ করিব।

এক যুবতী অপরকে কহিলেন, "কেন, মৃণালিনী, কথার উত্তর দিস্ না কেন? আমি সেই রাজপুত্রটির কথা শুনিতে ভালবাসি।"

"সই মণিমালিনী! তোমার সুখের কথা বল, আমি আনন্দে শুনিব।"

মণিমালিনী কহিল, "আমার সুখের কথা শুনিতে শুনিতে আমিই জ্বালাতন হইয়াছি, তোমাকে কি শুনাইব?"

মৃ। তুমি শোন কার কাছে, তোমার স্বামীর কাছে?

মণি। নহিলে আর কারও কাছে বড় শুনিতে পাই না। এই পদ্মটি কেমন আঁকিলাম দেখ দেখি?

মৃ। ভাল হইয়াও হয় নাই। জল হইতে পদ্ম অনেক ঊর্দ্ধে আছে, কিন্তু সরোবরে সেরূপ থাকে না; পদ্মের বোঁটা জলে লাগিয়া থাকে, চিত্রেও সেইরূপ হইবে। আর কয়েকটা পদ্মপত্র আঁক, নহিলে পদ্মের শোভা স্পষ্ট হয় না। আরও পার যদি, উহার নিকট একটি রাজহাঁস আঁকিয়া দাও।

মণি। হাঁস এখানে কি করিবে?

মৃ। তোমার স্বামীর মত পদ্মের কাছে সুখের কথা কহিবে।

মণি। (হাসিয়া) দুই জনেই সুকণ্ঠ বটে। কিন্তু আমি হাঁস লিখিব না। আমি সুখের কথা শুনিয়া শুনিয়া জ্বালাতন হইয়াছি।

মৃ। তবে একটি খঞ্জন আঁক।

মণি। খঞ্জন আঁকিব না। খঞ্জন পাখা বাহির করিয়া উড়িয়া যাইবে। এ ত মৃণালিনী নহে যে, স্নেহ-শিকলে বাঁধিয়া রাখিব।

মৃ। খঞ্জন যদি এমনই দুষ্ট হয়, তবে মৃণালিনীকে যেমন পিঞ্জরে পুরিয়াছ, খঞ্জনকেও সেইরূপ করিও।

মণি। আমরা মৃণালিনীকে পিঞ্জরে পুরি নাই—সে আপনি আসিয়া পিঞ্জরে ঢুকিয়াছে।

মৃ। সে মাধবাচার্য্যের গুণ।

মণি। সখি! তুমি কতবার বলিয়াছ যে, মাধবাচার্য্যের সেই নিষ্ঠুর কাজের কথা সবিশেষ বলিবে; কিন্তু কৈ, আজও বলিলে না। কেন তুমি মাধবাচার্য্যের কথায় পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া আসিলে?

মৃ। মাধবাচার্য্যের কথায় আসি নাই। মাধবাচার্য্যকে আমি চিনিতাম না। আমি ইচ্ছাপূর্ব্বকও এখানে আসি নাই। এক দিন সন্ধ্যার পর আমার দাসী আমাকে এই আঙটি দিল এবং বলিল যে, যিনি এই আঙটি দিয়াছেন, তিনি ফুলবাগানে অপেক্ষা করিতেছেন। আমি দেখিলাম যে, উহা হেমচন্দ্রের সঙ্কেতের আঙটি। তাঁহার সাক্ষাতের অভিলাষ থাকিলে তিনি এই আঙটি পাঠাইয়া দিতেন। আমাদিগের বাটীর পিছনেই বাগান ছিল। যমুনা হইতে শীতল বাতাস সেই বাগানে নাচিয়া বেড়াইত। তথায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইত।

মণিমালিনী কহিলেন, "ঐ কথাটি মনে পড়িলেও আমার বড় অসুখ হয়। তুমি কুমারী হইয়া কি প্রকারে পুরুষের সহিত গোপনে প্রণয় করিতে?"

মৃ। অসুখ কেন সখি—তিনি আমার স্বামী। তিনি ভিন্ন অন্য কেহ কখন আমার স্বামী হইবে না।

মণি। কিন্তু এ পর্য্যন্ত ত তিনি স্বামী হয়েন নাই। রাগ করিও না সখি! তোমাকে ভগিনীর ন্যায় ভালবাসি। এই জন্য বলিতেছি।

মৃণালিনী অধোবদনে রহিলেন। ক্ষণেক পরে চক্ষুর জল মুছিলেন। কহিলেন, "মণিমালিনী! এ বিদেশে আমার আত্মীয় কেহ নাই, আমাকে ভাল কথা বলে, এমন কেহ নাই। যাহারা আমাকে ভালবাসিত, তাহাদিগের সহিত যে আর কখনও সাক্ষাৎ হইবে, সে ভরসাও করি না। কেবলমাত্র তুমি আমার সখী—তুমি আমাকে ভাল না বাসিলে, কে আর ভালবাসিবে?"

মণি। আমি তোমাকে ভালবাসিব, বাসিয়াও থাকি; কিন্তু যখন ঐ কথাটি মনে পড়ে, তখন মনে করি—

মৃণালিনী পুনশ্চ নীরবে রোদন করিলেন। কহিলেন, "সখি, তোমার মুখে এ কথা আমার সহ্য হয় না। যদি তুমি আমার নিকটে শপথ কর যে, যাহা বলিব, তাহা এ সংসারে কাহারও নিকটে ব্যক্ত করিবে না, তবে তোমার নিকট সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলিতে পারি। তাহা হইলে তুমি আমাকে ভালবাসিবে।"

মণি। আমি শপথ করিতেছি।

মৃ। তোমার চুলে দেবতার ফুল আছে, তাহা ছুঁয়ে শপথ কর।

মণিমালিনী তাই করিলেন।

তখন মৃণালিনী মণিমালিনীর কাণে যাহা কহিলেন, তাহার এক্ষণে বিস্তারিত ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই। শ্রবণে মণিমালিনী পরমপ্রীতি প্রকাশ করিলেন। গোপন কথা সমাপ্ত হইল।

মণিমালিনী কহিলেন, "তাহার পর মাধবাচার্য্যের সঙ্গে তুমি কি প্রকারে আসিলে? যে বৃত্তান্ত বলিতেছিলে, বল।"

মৃণালিনী কহিলেন, "আমি হেমচন্দ্রের আজ্ঞা দেখিয়া তাঁহাকে দেখিবার ভরসায় বাগানে আসিলে দূতী কহিল যে, 'রাজপুত্র নৌকায় আছেন, নৌকা তীরে লাগিয়া রহিয়াছে।' আমি অনেক দিন রাজপুত্রকে দেখি নাই, বড় ব্যগ্র হইয়াছিলাম, তাই বিবেচনা-শূন্য হইলাম। তীরে আসিয়া দেখিলাম যে, যথার্থই একখানি নৌকা লাগিয়া রহিয়াছে। তাহার বাহিরে এক জন পুরুষ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। মনে করিলাম যে, রাজপুত্র দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, আমি নৌকার নিকট আসিলাম। নৌকার উপর যিনি দাঁড়াইয়া ছিলেন, তিনি আমার হাত ধরিয়া নৌকায় উঠাইলেন। অমনি নাবিকেরা নৌকা খুলিয়া দিল। কিন্তু আমি স্পর্শেই বুঝিলাম যে, এ ব্যক্তি হেমচন্দ্র নহে।"

মণি। আর অমনি তুমি চীৎকার করিলে?

মৃ। চীৎকার করি নাই। একবার ইচ্ছা করিয়াছিল বটে, কিন্তু চীৎকার আসিল না।

মণি। আমি হইলে জলে ঝাঁপ দিতাম।

মৃ। হেমচন্দ্রকে না দেখিয়া কেন মরিব?

মণি। তার পর কি হইল?

মৃ। প্রথমেই সে ব্যক্তি আমাকে "মা" বলিয়া বলিল, "আমি তোমাকে মাতৃসম্বোধন করিতেছি—আমি তোমার পুত্র, কোন আশঙ্কা করিও না, আমার নাম মাধবাচার্য্য, আমি হেমচন্দ্রের গুরু। কেবল হেমচন্দ্রের গুরু, এমত নহে, ভারতবর্ষের রাজগণের মধ্যে অনেকের সহিত আমার সেই সম্বন্ধ। আমি এখন কোন দৈবকার্য্যে নিযুক্ত আছি, তাহাতে হেমচন্দ্র আমার প্রধান সহায়; তুমি তাহার প্রধান বিঘ্ন।"

আমি বলিলাম, "আমি বিঘ্ন?" মাধবাচার্য্য কহিলেন, "তুমি বিঘ্ন। যবনদিগের জয় করা, হিন্দুরাজ্যের পুনরুদ্ধার করা সুসাধ্য কর্ম্ম নহে; হেমচন্দ্র ব্যতীত কাহারও সাধ্য নহে। হেমচন্দ্রও অনন্যমনা না হইলে তাঁর দ্বারাও এ কাজ সিদ্ধ হইবে না। যত দিন তোমার সাক্ষাৎলাভ সুলভ থাকিবে, তত দিন হেমচন্দ্রের তুমি ভিন্ন অন্য ব্রত নাই—সুতরাং যবন মারে কে?" আমি কহিলাম, "বুঝিলাম, প্রথমে আমাকে না মারিলে যবন মারা হইবে না। আপনার শিষ্য কি আপনার দ্বারা আজ্ঞাটি পাঠাইয়া দিয়া আমাকে মারিতে আজ্ঞা করিয়াছেন?"

মণি। এত কথা বুড়াকে বলিলে কি প্রকারে?

মৃ। আমার বড় রাগ হইয়াছিল, বুড়ার কথায় আমার হাড় জলিয়া গিয়াছিল, আর বিপৎকালে লজ্জা কি? মাধবাচার্য্য আমাকে মুখরা মনে করিলেন, মৃদু হাসিলেন, কহিলেন, "আমি যে তোমাকে এইরূপে হস্তগত করিব, তাহা হেমচন্দ্র জানেন না।"

আমি মনে মনে কহিলাম, তবে যাঁহার জন্য এ জীবন রাখিয়াছি, তাঁহার অনুমতি ব্যতীত সে জীবন ত্যাগ করিব না। মাধবাচার্য্য বলিতে লাগিলেন, 'তোমাকে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে না—কেবল আপাততঃ হেমচন্দ্রকে ত্যাগ করিতে হইবে। ইহাতে তাঁহার পরম মঙ্গল। যাহাতে তিনি রাজ্যেশ্বর হইয়া তোমাকে রাজমহিষী করিতে পারেন, তাহা কি তোমার কর্ত্তব্য নহে? তোমার প্রণয়মন্ত্রে তিনি কাপুরুষ হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহার সে ভাব দূর করা কি উচিত নহে?' আমি কহিলাম, 'আমার সহিত সাক্ষাৎ যদি তাঁহার অনুচিত হয়, তবে তিনি কদাচ আমার সহিত আর সাক্ষাৎ করিবেন না।' মাধবাচার্য্য বলিলেন, 'বালকে ভাবিয়া থাকে, বালক ও বুড়া উভয়ের বিবেচনাশক্তি তুল্য; কিন্তু তাহা নহে। হেমচন্দ্রের অপেক্ষা আমাদের পরিণামদর্শিতা যে বেশী, তাহাতে সন্দেহ করিও না। আর তুমি সম্মত হও বা না হও, যাহা সঙ্কল্প করিয়াছি, তাহা করিব। আমি তোমাকে দেশান্তরে লইয়া যাইব। গৌড়দেশে অতি শান্তস্বভাব এক ব্রাহ্মণের বাটীতে তোমাকে রাখিয়া আসিব। তিনি তোমাকে আপন কন্যার ন্যায় যত্ন করিবেন। এক বৎসর পরে আমি তোমার পিতার নিকট তোমাকে আনিয়া দিব। আর সে সময়ে হেমচন্দ্র যে অবস্থায় থাকুন, তোমার সঙ্গে তাঁহার বিবাহ দেওয়াইব, ইহা সত্য করিলাম।' এই কথাতেই হউক, আর অগত্যাই হউক, আমি নিস্তব্ধ হইলাম। তাহার পর এইখানে আসিয়াছি। ও কি, ও সই?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ভিখারিণী

সখীদ্বয় এই সকল কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন, এমন সময়ে কোমলকণ্ঠনিঃসৃত মধুর সঙ্গীত তাঁহাদিগের কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিল।

"মথুরাবাসিনি মধুরহাসিনি
শ্যামবিলাসিনি রে!"

মৃণালিনী কহিলেন, "সই, কোথায় গান করিতেছে?"

মণিমালিনী কহিলেন, "বাহির বাড়ীতে গায়িতেছে।"

গায়িকা গায়িতে লাগিল—

"কহ লো নাগরি, গেহ পরিহরি
কাহে বিবাসিনী রে।"

মৃ। সখি! কে গায়িতেছে জান?

মণি। কোন ভিখারিণী হইবে।

আবার গীত!—

"বৃন্দাবনধন গোপিনীমোহন,
কাহে তু তেয়াগী রে;

দেশ দেশ পর সো শ্যামসুন্দর,
ফিরে তুয়া লাগি রে।"

মৃণালিনী আবেগের সহিত কহিলেন, "সই! সই! উহাকে বাটীর ভিতর ডাকিয়া আন।"

মণিমালিনী গায়িকাকে ডাকিতে গেলেন:—

ততক্ষণ সে গায়িতে লাগিল—

"বিকচ নলিনে, যমুনা-পুলিনে,
বহুত পিয়াসা রে।

চন্দ্রমাশালিনী, যা মধুযামিনী,
না মিটিল আশা রে!

সা নিশা সমরি—"

এমন সময়ে মণিমালিনী উহাকে ডাকিয়া বাটীর ভিতর আনিলেন।

সে অন্তঃপুরে আসিয়া পূর্ব্ববৎ গায়িতে লাগিল;—

"সা নিশা সমরি, কহ লো সুন্দরি
কাঁহা মিলে দেখা রে।

শুনি যাওয়ে চলি, বাজয়ি মুরলী,
বনে বনে একা রে।"

মৃণালিনী তাহাকে কহিলেন, "তোমার দিব্য গলা, তুমি গীতটি আবার গাও।"

গায়িকার বয়স ষোল বৎসর। ষোড়শী, খর্ব্বাকৃতা এবং কৃষ্ণাঙ্গী। সে প্রকৃত কৃষ্ণবর্ণা। তাই বলিয়া তাহার গায়ে ভ্রমর বসিলে যে দেখা যাইত না, অথবা কালি মাখিলে জল মাখিয়াছে বোধ হইত, কিংবা জল মাখিলে কালি বোধ হইত, এমন নহে। যেরূপ কৃষ্ণবর্ণ আপনার ঘরে থাকিলে শ্যামবর্ণ বলি, পরের ঘরে হইলে পাতুরে কালো বলি, ইহার সেইরূপ কৃষ্ণবর্ণ। কিন্তু বর্ণ যেমন হউক না কেন, ভিখারিণী কুরূপা নহে। তাহার অঙ্গ পরিষ্কার, সুমার্জ্জিত, চাকচিক্যবিশিষ্ট। মুখখানি প্রফুল্ল, চক্ষু দুটি বড় চঞ্চল, হাস্যময়; লোচনতারা নিবিড়কৃষ্ণ, একটি তারার পার্শ্বে একটি তিল। ওষ্ঠাধর ক্ষুদ্র, রক্তপ্রভ, তদন্তরে অতি পরিষ্কার অমলশ্বেত, কুন্দকলিকাসন্নিভ দুই শ্রেণী দন্ত। কেশগুলি সূক্ষ্ম; গ্রীবার উপরে মোহিনী কবরী, তাহাতে যূথিকার মালা বেষ্টিত। যৌবনসঞ্চারে শরীরের গঠন সুন্দর হইয়াছিল, যেন কৃষ্ণপ্রস্তরে কোন শিল্পকার পুত্তল ক্ষোদিত করিয়াছিল। পরিচ্ছদ অতি সামান্য, কিন্তু পরিষ্কার—ধূলিকর্দ্দম-পরিপূর্ণ নহে। অঙ্গ একেবারে নিরাভরণ নহে, অথচ অলঙ্কারগুলি ভিখারীর যোগ্য বটে। প্রকোষ্ঠে পিত্তলের বলয়, গলায় কাষ্ঠের মালা, নাসিকায় ক্ষুদ্র একটি তিলক, ভ্রূমধ্যে ক্ষুদ্র একটি চন্দনের টিপ। সে আজ্ঞামত পূর্ব্ববৎ গায়িতে লাগিল।

"মথুরাবাসিনি মধুরহাসিনি,
শ্যামবিলাসিনি রে।।
কহ লো নাগরি, গেহ পরিহরি,
কাহে বিবাসিনী রে॥
বৃন্দাবনধন, গোপিনীমোহন,
কাহে তু তেয়াগী রে।
দেশ দেশ পর, সো শ্যামসুন্দর,
ফিরে তুয়া লাগি রে॥
বিকচ নলিনে, যমুনা-পুলিনে,
বহুত পিয়াসা রে।
চন্দ্রমাশালিনা, যা মধুযামিনী,
না মিটিল আশা রে॥
সা নিশা সমরি, কহ লো সুন্দরি,
কাঁহা মিলে দেখা রে।
শুনি যাওয়ে চলি, বাজয়ি মুরলি,
বনে বনে একা রে॥"

---

* এই গীত চিমে তেতালা তালযোগে জয়জয়ন্তী রাগিণীতে গেয়।

গীত সমাপ্ত হইলে মৃণালিনী কহিলেন, "তুমি সুন্দর গাও। সই মণিমালিনি, ইহাকে কিছু দিলে ভাল হয়। একে কিছু দাও না।"

মণিমালিনী পুরস্কার আনিতে গেলেন। ইত্যবসরে মৃণালিনী বালিকাকে নিকটে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "শুন, ভিখারিণি! তোমার নাম কি?"

ভি। আমার নাম গিরিজায়া।

মৃ। তোমার বাড়ী কোথায়?

গি। এই নগরেই থাকি।

মৃ। তুমি কি গীত গায়িয়া দিনপাত কর?

গি। আর কিছুই ত জানি না।

মৃ। তুমি গীত সকল কোথায় পাও?

গি। যেখানে যা পাই, তাই শিখি।

মৃ। এ গীতটা কোথায় শিখিলে?

গি। একটি বেণে আমায় শিখাইয়াছে।

মৃ। সে বেণে কোথায় থাকে?

গি। এই নগরেই থাকে।

মৃণালিনীর মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইল—প্রাতঃ-সূর্য্যকরস্পর্শে যেন পদ্ম ফুটিল। কহিলেন,—"বেণেতে বাণিজ্য করে—সে বণিক্ কিসের বাণিজ্য করে?"

গি। সবার যা ব্যবসা, তারও সেই ব্যবসা।

মৃ। সে কিসের ব্যবসা?

গি। কথার ব্যবসা।

মৃ। এ নূতন ব্যবসা বটে! তাহাতে লাভালাভ কিরূপ?

গি। ইহাতে লাভের অংশ ভালবাসা, অলাভ কোন্দল।

মৃ। তুমিও ব্যবসায়ী বটে! ইহার মহাজন কে?

গি। যে মহাজন।

মৃ। তুমি ইহার কি?

গি। নগদা মুটে।

মৃ। ভাল, তোমার বোঝা নামাও। সামগ্রী কি আছে, দেখি।

গি। এ সামগ্রী দেখে না, শুনে।

মৃ। ভাল—শুনি।

গিরিজায়া গায়িতে লাগিল,—

"যমুনার জলে মোর কি নিধি মিলিল,
ঝাঁপ দিয়া পশি জলে, যতনে তুলিয়া গলে,
পরেছিনু কুতূহলে যে রতনে—
নিদ্রার আবেশে মোর, গৃহেতে পশিল চোর,
কণ্ঠের কাটিল ডোর, মণি হ'রে নিল।"

মৃণালিনী বাষ্পপীড়িত লোচনে, গদগদস্বরে, অথচ হাসিয়া কহিলেন, "এ কোন্ চোরের কথা?"

গি। বেণে বলেছেন, চুরির ধন লইয়াই তাঁহার ব্যাপার।

মৃ। তাঁহাকে বলিও যে, চোরা ব্যাপারে সাধু লোকের প্রাণ বাঁচে না।

গি। বুঝি ব্যাপারীরও নয়।

মৃ। কেন, ব্যাপারীর কি?

গিরিজায়া গায়িল,—

"ঘাট বাট তট মাঠ ফিরি ফিরিনু বহু দেশ।
কাঁহা মেরে কান্ত বরণ কাঁহা রাজবেশ॥
হিয়া পর রোপনু পঙ্কজ, কৈনু যতন ভারি।
সহি পঙ্কজ কাঁহা মোর, কাঁহা মৃণাল হামারি॥"

মৃণালিনী সস্নেহে কোমল স্বরে কহিলেন, "মৃণাল কোথায়? আমি সন্ধান বলিয়া দিতে পারি, তাহা মনে রাখিতে পারিবে?"

গি। পারিব, কোথায় বল।

মৃণালিনী বলিলেন,—

"কণ্টকে গঠিল বিধি, মৃণাল অধমে।
জলে তারে ডুবাইল পীড়িয়া মরমে॥
রাজহংস দেখি এক নয়নরঞ্জন।
চরণ বেড়িয়া তারে করিল বন্ধন॥
বলে হংসরাজ কোথা করিবে গমন।
হৃদয়কমলে দিব তোমার আসন॥
আসিয়া বসিল হংস হৃদয়কমলে।
কাঁপিল কণ্টক সহ মৃণালিনী জলে॥
হেনকালে কালমেঘ উঠিল আকাশে।
উড়িল মরালরাজ, মানস-বিলাসে॥
ভাঙ্গিল হৃদয়পদ্ম তার বেগভরে।
ডুবিয়া অতল জলে মৃণালিনী মরে॥

কেমন গিরিজায়া, শিখিতে পারিবে?"

গিরি। তা পারিব। চক্ষের জলটুকু শুদ্ধ কি শিখিব?

মৃ। না। এ ব্যবসায়ে আমার লাভের মধ্যে ঐটুকু।

মৃণালিনী গিরিজায়াকে এই কবিতাগুলি অভ্যাস করাইতেছিলেন, এমন সময়ে মণিমালিনীর পদধ্বনি শুনিতে পাইলেন। মণিমালিনী তাঁহার স্নেহশালিনী সখী, সকলেই জানিয়াছিলেন। তথাপি মণিমালিনী পিতৃ-প্রতিজ্ঞাভঙ্গের সহায়তা করিবে, এরূপ তাঁহার বিশ্বাস জন্মিল না। অতএব তিনি এ সকল কথা সখীর নিকট গোপনে যত্নবতী হইয়া গিরিজায়াকে

কহিলেন, "আজি আর কাজ নাই; বেণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও! তোমার বোঝা কাল আবার আনিও যদি কিনিবার কোন সামগ্রী থাকে, তবে তাহা আমি কিনিব।"

গিরিজায়া বিদায় হইল। মৃণালিনী যে তাহাকে পারিতোষিক দিবার অভিপ্রায় করিয়াছিলেন, তাহা ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

গিরিজায়া কতিপয় পদ গমন করিলে মণিমালিনী কিছু চাউল, এক ছড়া কলা, একখানি পুরাতন বস্ত্র আর কিছু কড়ি আনিয়া গিরিজায়াকে দিলেন। আর মৃণালিনীও একখানি পুরাতন বস্ত্র দিতে গেলেন। দিবার সময় উহার কাণে কাণে কহিলেন, "আমার ধৈর্য্য হইতেছে না; কালি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে পারিব না; তুমি আজ রাত্রে প্রহরেকের সময় আসিয়া এই গৃহের উত্তরদিকে প্রাচীর মূলে অবস্থান করিও, তথায় আমার সাক্ষাৎ পাইবে। তোমার বণিক্ যদি আসেন, সঙ্গে আনিও।"

গিরিজায়া কহিল, "বুঝিয়াছি, আমি নিশ্চিত আসিব।"

মৃণালিনী মণিমালিনীর নিকট প্রত্যাগতা হইলে মণিমালিনী কহিলেন, "সই, ভিখারিণীকে কাণে কাণে কি বলিতেছিলে?"

মৃণালিনী কহিলেন,

"কি বলিব সই—
সই মনের কথা কই, মনের কথা সই—
কাণে কাণে কি কথাটি ব'লে দিলি ওই।
সই ফিরে ক'না সই, সই ফিরে ক'না সই।
সই কথা কোন্ কথা কব, নইলে কারো নই।"

মণিমালিনী হাসিয়া কহিলেন, "হলি কি লো সই?" মৃণালিনী কহিলেন, "তোমারই সই।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

দূতী

লক্ষ্মণাবতী নগরীর প্রদেশান্তরে সর্ব্বধন বণিকের বাটীতে হেমচন্দ্র অবস্থিতি করিতেছিলেন। বণিকের গৃহদ্বারে এক অশোকবৃক্ষ বিরাজ করিতেছিল; অপরাহ্ণে তাহার তলে উপবেশন করিয়া, একটি কুসুমিত অশোকশাখা নিষ্প্রয়োজনে হেমচন্দ্র ছুরিকা দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিতেছিলেন, এবং মুহুর্মুহুঃ পথপ্রতি দৃষ্টি রাখিতেছিলেন, যেন কাহারও প্রতীক্ষা করিতেছেন। [illegible] প্রতীক্ষা [illegible], সে আসিল না। [illegible] হেমচন্দ্র দিগ্বিজয়কে কহিলেন,—"[illegible] ভিখারিণী আজি এখনও আসিল না। আমি বড় ব্যস্ত হইয়াছি। তুমি একবার তাহার সন্ধানে যাও।"

"যে আজ্ঞা" বলিয়া দিগ্বিজয় গিরিজায়ার সন্ধানে চলিল। নগরীর রাজপথে গিরিজায়ার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল।

গিরিজায়া বলিল, "কে ও, দিব্বিজয়?" দিগ্বিজয় রাগ করিয়া কহিল, "আমার নাম দিগ্বিজয়।"

গি। ভাল, দিগ্বিজয়—আজ কোন্ দিক্ জয় করিতে চলিয়াছ?

দি। তোমার দিক্।

গি। আমি কি একটা দিক্? তোর দিগ্বিদিক-জ্ঞান নাই।

দি। কেমন বরিয়' থাকিবে—তুমি যে অন্ধকার, এখন চল, প্রভু তোমাকে ডাকিয়াছেন।

গি। কেন?

দি। তোমার সঙ্গে বুঝি আমার বিবাহ দিবেন।

গি। কেন, তোমার কি মুখ-অগ্নি করিবার আর লোক জুটিল না?

দি। না, সে কাজ তোমাকেই করিতে হইবে। এখন চল।

গি। পরের জন্যই মলেম, তবে চল।

এই বলিয়া গিরিজায়া দিগ্বিজয়ের সঙ্গে চলিল। দিগ্বিজয় অশোকতলস্থ হেমচন্দ্রকে দেখাইয়া দিয়া অন্যত্র গমন করিল। হেমচন্দ্র অন্যমনে মৃদু মৃদু গায়িতেছিলেন,—

"বিকচ নলিনে, যমুনা-পুলিনে
বহুত পিয়াসা রে॥"

গিরিজায়া পশ্চাৎ হইতে গায়িল—

"চন্দ্রমাশালিনী, যা মধুযামিনী
না মিটিল আশা রে।"

গিরিজায়াকে দেখিয়া হেমচন্দ্রের মুখ প্রফুল্ল হইল। কহিলেন,—"কে, গিরিজায়া? আশা কি মিটিল?"

গি। কার আশা? আপনার না আমার?

হেম। আমার আশা। তাহা হইলেই তোমা মিটিবে।

গি। আপনার আশা কি প্রকারে মিটিবে? লোকে বলে, রাজরাজড়ার আশা কিছুতেই মিটে না।

হেম। আমার অতি সামান্য আশা।

গি। যদি কখনও মৃণালিনীর সাক্ষাৎ পাই, তবে এ কথা তাঁহার নিকট বলিব।

হেমচন্দ্র বিষণ্ণ হইলেন। কহিলেন, "তবে কি আজিও মৃণালিনীর সন্ধান পাও নাই? আজি কোন্ পাড়ায় গীত গাইতেছিলে?"

গি। অনেক পাড়ায়—সে পরিচয় আপনার নিকট নিত্য নিত্য কি দিব? অন্য কথা বলুন।

হেমচন্দ্র নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "বুঝিলাম, বিধাতা বিমুখ। ভাল, পুনর্ব্বার কাল সন্ধানে যাইবে।"

গিরিজায়া তখন প্রণাম করিয়া কপট বিদায়ের উদ্যোগ করিল। গমনকালে হেমচন্দ্র তাহাকে কহিলেন, "গিরিজায়া, তুমি হাসিতেছ না, কিন্তু তোমার চক্ষু হাসিতেছে। আজি কি তোমার গান শুনিয়া কেহ কিছু বলিয়াছে?"

গি। কে কি বলিবে? এক মাগী তাড়া করিয়া মারিতে আসিয়াছিল—বলে "মথুরাবাসিনীর জন্যে শ্যামসুন্দরের ত মাথাব্যথা পড়িয়াছে!"

হেমচন্দ্র দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া অস্ফুটস্বরে যেন আপনা আপনি কহিতে লাগিলেন, "এত যত্নেও যদি সন্ধান না পাইলাম, তবে আর বৃথা আশা—কেন মিছা কালক্ষেপ করিয়া আত্মকর্ম্ম নষ্ট করিব?—গিরিজায়া, কালি তোমাদের নগর হইতে বিদায় হইব।"

"কল্যাণমস্তু" বলিয়া গিরিজায়া মৃদু মৃদু গান করিতে লাগিল,—

"শুনি যাওয়ে চলি, বাজয়ি মুরলী'
বনে বনে একা রে।"

হেমচন্দ্র কহিলেন, "ও গান এই পর্য্যন্ত। অন্য গীত গাও।"

গিরিজায়া গায়িল,—

"যে ফুল ফুটিল সখি, গৃহতরু-শাখে,
কেন রে পবনা উড়ালি তাকে।"

হেমচন্দ্র কহিলেন, "পবনে যে ফুল উড়ে, তাহার জন্য দুঃখ কি? ভাল গীত গাও।"

গিরিজায়া গায়িল,—

"কণ্টকে গঠিল বিধি, মৃণাল অধমে।
জলে তারে ডুবাইল পীড়িয়া মরমে॥"—

হেম। কি, কি? মৃণাল কি?

গি। কণ্টকে গঠিল বিধি, মৃণাল অধমে।
জলে তারে ডুবাইল পীড়িয়া মরমে॥
রাজহংস দেখি এক নয়নরঞ্জন।
চরণ বেড়িয়া তারে করিল বন্ধন॥

না—অন্য গান গাই।

হে। না—না—না—না—এই গান! এই গান গাও, তুমি রাক্ষসী।

গি। বলে রাজহংস কোথা করিবে গমন।
হৃদয়কমলে দিব তোমার আসন॥
আসিয়া বসিল হংস হৃদয়কমলে।
কাঁপিল কণ্টক সহ মৃণালিনী জলে॥

হে। গিরিজায়া! গিরি—এ গীত তোমাকে কে শিখাইল?

গি। (সহাস্যে)

"হেনকালে কালমেঘ উঠিল আকাশে,
উড়িল মরালরাজ মানস-বিলাসে॥
ভাঙ্গিল হৃদয়পদ্ম তার বেগভরে।
ডুবিয়া অতল জলে মৃণালিনী মরে॥"

হেমচন্দ্র বাষ্পাকুললোচনে গদ্গদস্বরে গিরিজায়াকে কহিলেন, "এ আমারই মৃণালিনী। তুমি তাহাকে কোথায় দেখিলে?"

গি।—দেখিলাম সরোবরে, কাঁপিছে পবনভরে, মৃণাল উপরে মৃণালিনী।

হে। এখন রূপক রাখ, আমার কথার উত্তর দাও—কোথায় মৃণালিনী?

গি। এই নগরে।

হেমচন্দ্র রুষ্টভাবে কহিলেন, "তা ত আমি অনেক দিন জানি। এ নগরের কোন্ স্থানে?"

গি। হৃষীকেশ শর্ম্মার বাড়ী।

হে। কি পাপ! সে কথা আমিই তোমাকে বলিয়া দিয়াছিলাম। এত দিন ত তাহার সন্ধান করিতে পার নাই, এখন কি সন্ধান করিয়াছ?

গি। সন্ধান করিয়াছি।

হেমচন্দ্র দুই বিন্দু—দুই বিন্দু মাত্র অশ্রুমোচন করিলেন। পুনরপি কহিলেন, "সে এখান হইতে কত দূর?"

গি। অনেক দূর।

হে। এখান হইতে কোন্ দিকে যাইতে হয়?

গি। এখান হইতে দক্ষিণ, তার পর পূর্ব্ব, তার পর উত্তর, তার পর পশ্চিম—

হেমচন্দ্র হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিলেন। কহিলেন, "এ সময়ে তামাসা রাখ—নহিলে মাথা ভাঙ্গিয়া ফেলিব।"

গি। শান্ত হউন। পথ বলিয়া দিলে কি আপনি চিনিতে পারিবেন? যদি তা না পারিবেন, তবে জিজ্ঞাসার প্রয়োজন? আজ্ঞা করিলে আমি সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইব।

মেঘমুক্ত সূর্য্যের ন্যায় হেমচন্দ্রের মুখ প্রফুল্ল হইল। তিনি কহিলেন, "তোমার সর্ব্বকামনা সিদ্ধ হউক—মৃণালিনী কি বলিল?"

গি। তা ত বলিয়াছি।—

"ডুবিয়া অতল-জলে মৃণালিনী মরে।"

হে। মৃণালিনী কেমন আছে?

গি। দেখিলাম, শরীরে কোন পীড়া নাই।

হে। সুখে আছে কি ক্লেশে আছে—কি বুঝিলে?

গি। শরীরে গহনা, পরণে ভাল কাপড়—হৃষীকেশ ব্রাহ্মণের কন্যার সই।

হে। তুমি অধঃপাতে যাও; মনের কথা কিছু বুঝিলে?

গি। বর্ষাকালের পদ্মের মত মুখখানি কেবল জলে ভাসিতেছে।

হে। পরগৃহে কি ভাবে আছে?

গি। এই অশোক ফুলের স্তবকের মত। আপনার গৌরবে আপনি নম্র।

হে। গিরিজায়া! তুমি বয়সে বালিকা মাত্র। তোমার ন্যায় বালিকা আর দেখি নাই।

গি। মাথা ভাঙ্গিবার উপযুক্ত পাত্রও এমন আর দেখেন নাই।

হে। সে অপরাধ লইও না। মৃণালিনী আর কি বলিল?

গি। যো দিন জানকী—

হে। আবার?

গি। যো দিন জানকী, রঘুবীর নিরখি—

হেমচন্দ্র গিরিজায়ার কেশাকর্ষণ করিলেন। তখন সে কহিল, "ছাড়! ছাড়! বলি—বলি।"

"বল" বলিয়া হেমচন্দ্র কেশ ত্যাগ করিলেন।

তখন গিরিজায়া আদ্যোপান্ত মৃণালিনীর সহিত কথোপকথন বিবৃত করিল। পরে কহিল,—"মহাশয়! আপনি যদি মৃণালিনীকে দেখিতে চান, তবে, আমার সঙ্গে এক প্রহর রাত্রে যাত্রা করিবেন।"

গিরিজায়ার কথা সমাপ্ত হইলে, হেমচন্দ্র অনেকক্ষণ নিঃশব্দে অশোকতলে পাদচারণ করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ পরে কিছুমাত্র না বলিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং তথা হইতে একখানি পত্র আনিয়া গিরিজায়ার হস্তে দিলেন এবং কহিলেন, "মৃণালিনীর সহিত সাক্ষাতে আমার এক্ষণে অধিকার নাই। তুমি রাত্রে কথামত তাঁহার সহিত সাক্ষৎ করিবে এবং এই পত্র তাঁহাকে দিবে। কহিবে, 'দেবতা প্রসন্ন হইলে অবশ্য শীঘ্র বৎসরেকমধ্যে সাক্ষাৎ হইবে।' মৃণালিনী কি বলেন, আজ রাত্রেই আমাকে বলিয়া যাইও।"

গিরিজায়া বিদায় হইলে, হেমচন্দ্র অনেকক্ষণ চিন্তিতান্তঃকরণে অশোক বৃক্ষতলে তৃণশয্যায় শয়ন করিয়া রহিলেন। ভুজোপরি মস্তক রক্ষা করিয়া পৃথিবীর দিকে মুখ রাখিয়া শয়ান রহিলেন। কিয়ৎকাল পরে সহসা তাঁহার পৃষ্ঠদেশে কঠিন করস্পর্শ হইল। মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন, সম্মুখে মাধবাচার্য্য।

মাধবাচার্য্য কহিলেন, "বৎস! গাত্রোত্থান কর! আমি তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছি—সন্তুষ্টও হইয়াছি। তুমি আমাকে দেখিয়া বিস্মিতের ন্যায় কেন চাহিয়া রহিয়াছ?"

হেমচন্দ্র কহিলেন, "আপনি এখানে কোথা হইতে আসিলেন?"

মাধবাচার্য্য এ কথার কোন উত্তর না দিয়া কহিতে লাগিলেন, "তুমি এ পর্য্যন্ত নবদ্বীপে না গিয়া পথে বিলম্ব করিতেছ—ইহাতে তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছি। আর তুমি যে মৃণালিনীর সন্ধান পাইয়াও আত্মসত্য প্রতিপালনের জন্য তাঁহার সাক্ষাতের সুযোগ উপেক্ষা করিলে, এ জন্য তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি। তোমাকে কোন তিরস্কার করিব না। কিন্তু এখানে তোমার আর বিলম্ব করা হইবে না। মৃণালিনীর প্রত্যুত্তরের প্রতীক্ষা করা হইবে না। বেগবান্ হৃদয়কে বিশ্বাস নাই। আমি আজি নবদ্বীপে যাত্রা করিব। তোমাকে আমার সঙ্গে যাইতে হইবে—নৌকা প্রস্তুত আছে। অস্ত্রশস্ত্রাদি গৃহমধ্য হইতে লইয়া আইস। আমার সঙ্গে চল।"

হেমচন্দ্র নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "হানি নাই—আমি আশা-ভরসা বিসর্জ্জন করিয়াছি: চলুন। কিন্তু আপনি—কামচর না অন্তর্য্যামী?"

এই বলিয়া হেমচন্দ্র গৃহমধ্যে পুনঃপ্রবেশপূর্ব্বক বণিকের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন, এবং আপনার সম্পত্তি একজন বাহকের স্কন্ধে দিয়া আচার্য্যের অনুবর্ত্তী হইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

লুব্ধ

মৃণালিনী বা গিরিজায়া এতন্মধ্যে কেহই আত্ম-প্রতিশ্রুতি বিস্মৃতা হইলেন না। উভয়ে প্রহরেক রাত্রিতে হৃষীকেশের গৃহপার্শ্বে সম্মিলিত হইলেন। মৃণালিনী গিরিজায়াকে দেখিবামাত্র কহিলেন,—"কৈ, হেমচন্দ্র কোথায়?"

গিরিজায়া কহিল, "তিনি আইসেন নাই।"

"আইসেন নাই!"—এই কথাটি মৃণালিনীর অন্তস্তল হইতে ধ্বনিত হইল। ক্ষণেক উভয়ে নীরব। তৎপরে মৃণালিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন আসিলেন না?"

গি। তাহা আমি জানি না। এই পত্র দিয়াছেন

এই বলিয়া গিরিজায়া তাঁহার হস্তে পত্র দিল। মৃণালিনী কহিলেন, "কি প্রকারেই বা পড়ি? গৃহে গিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া পাড়লে মণিমালিনী উঠিবে।"

গিরিজায়া কহিল, "অধীরা হইও না। আমি প্রদীপ, তেল, চকমকি, সোলা, সকলই আনিয়া রাখিয়াছি। এখনই আলো করিতেছি।'

গিরিজায়া শীঘ্রহস্তে অগ্নি উৎপাদন করিয়া প্রদীপ জ্বালিত করিল। অগ্ন্যুৎপাদনশব্দ একজন গৃহবাসীর কর্ণে প্রবেশ করিল—দীপালোক সে দেখিতে পাইল।

গিরিজায়া দীপ জ্বালিত করিলে মৃণালিনী নিম্নলিখিতমত মনে মনে পাঠ করিলেন।

"মৃণালিনি! কি বলিয়া আমি তোমাকে পত্র লিখব? তুমি আমার জন্য দেশত্যাগিনী হইয়া পরগৃহে কষ্টে কালাতিপাত করিতেছ। যদি দৈবানুগ্রহে তোমার সন্ধান পাইয়াছি, তথাপি তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম না। তুমি ইহাতে আমাকে অপ্রণয়ী মনে করিবে—অথবা অন্যা হইলে মনে করিত—তুমি করিবে না। আমি কোন বিশেষ ব্রতে নিযুক্ত আছি—যদি তৎপ্রতি অবহেলা করি, তবে আমি কুলাঙ্গার। তৎসাধন জন্য আমি গুরুর নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি যে, তোমার সহিত এ স্থানে সাক্ষাৎ করিব না। আমি নিশ্চিত জানি যে, আমি যে তোমার জন্য সত্যভঙ্গ করিব, তোমারও এমন সাধ নহে। অতএব এক বৎসর কোনক্রমে দিনযাপন কর। পরে ঈশ্বর প্রসন্ন হয়েন, তবে অচিরাৎ তোমাকে রাজপুরবধূ করিয়া আত্মসুখ সম্পূর্ণ করিব। এই অল্পবয়স্কা প্রগল্ভবুদ্ধি বালিকাহস্তে উত্তর প্রেরণ করিও।"

মৃণালিনী পত্র পড়িয়া গিরিজায়াকে কহিলেন, —"গিরিজায়া! আমার পাতা, লেখনী, কিছুই নাই যে, উত্তর লিখিব। তুমি মুখে আমার প্রত্যুত্তর লইয়া যাও। তুমি বিশ্বাসী, পুরস্কারস্বরূপ আমার অঙ্গের অলঙ্কার দিতেছি।"

গিরিজায়া কহিল, "উত্তর কাহার নিকট লইয়া যাইব? তিনি আমাকে পত্র দিয়া বিদায় করিবার সময় বলিয়া দিয়াছিলেন যে, 'আজ রাত্রেই আমাকে প্রত্যুত্তর আনিয়া দিও। আমিও স্বীকার করিয়াছিলাম আসিবার সময় মনে করিলাম, হয় ত তোমার নিকট লিখিবার সামগ্রী কিছুই নাই; এজন্য সে সকল জোটপাট করিয়া আনিবার জন্য তাঁহার উদ্দেশে গেলাম। তাঁহার সাক্ষাৎ পাইলাম না, শুনিলাম, তিনি সন্ধ্যাকালে নবদ্বীপ যাত্রা করিয়াছেন।"

মৃ। নবদ্বীপ!

গি। নবদ্বীপ।

মৃ। সন্ধ্যাকালেই?

গি। সন্ধ্যাকালেই। শুনিলাম, তাঁহার গুরু আসিয়া তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছেন।

মৃ। মাধবাচার্য্য! মাধবাচার্য্যই আমার কাল।

পরে অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া মৃণালিনী কহিলেন, "গিরিজায়া তুমি বিদায় হও। আমি ঘরের বাহিরে থাকিব না।"

গিরিজায়া কহিল, "আমি চলিলাম।" এই বলিয়া গিরিজায়া বিদায় হইল। তাহার মৃদু মৃদু গীতধ্বনি শুনিতে শুনিতে মৃণালিনী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

মৃণালিনী বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া যেমন দ্বার রুদ্ধ করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, অমনি পশ্চাৎ হইতে কে আসিয়া তাঁহার হাত ধরিল; মৃণালিনী চমকিয়া উঠিলেন। হস্তরোধকারী কহিল, —"তবে সাধ্বি! এইবার জালে পড়িয়াছ। অনুগৃহীত ব্যক্তিটা কে, শুনিতে পাই না?"

মৃণালিনী তখন ক্রোধে কম্পিতা হইয়া কহিলেন, "ব্যোমকেশ! ব্রাহ্মণকুলে পাষণ্ড! হাত ছাড়!"

ব্যোমকেশ হৃষীকেশের পুত্র। এ ব্যক্তি ঘোর মূর্খ এবং দুশ্চরিত্র! সে মৃণালিনীর প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হইয়াছিল, এবং স্বাভিলাষ-পূরণের জন্য কোন সম্ভাবনা নাই জানিয়া বলপ্রকাশে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল। কিন্তু মৃণালিনী মণিমালিনীর সঙ্গ

প্রায় ত্যাগ করিতেন না, এ জন্ত ব্যোমকেশ এ পর্য্যন্ত অবসর প্রাপ্ত হয় নাই।

মৃণালিনীর ভৎর্সনায় ব্যোমকেশ কহিল, "কেন হাত ছাড়িব? হাতছাড়া কি করতে আছে? ছাড়াছাড়িতে কাজ কি, ভাই? একটা মনের দুঃখ বলি, আমি কি মনুষ্য নই? যদি একের মনোরঞ্জন করিয়াছ, তবে অপরের পার না?"

মৃ। কুলাঙ্গার! যদি না ছাড়িবে, তবে এখনই ডাকিয়া গৃহস্থ সকলকে উঠাইব।

ব্যো। উঠাও। আমি কাহব, অভিসারিকাকে ধরিয়াছি।

মৃ। তবে অধঃপাতে যাও।

এই বলিয়া মৃণালিনী সবলে হস্তমোচন জন্য চেষ্টা করিলেন; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। ব্যোমকেশ কহিল, "অধীর হইও না। আমার মনোরথ পূর্ণ হইলেই আমি তোমায় ত্যাগ করিব। এখন তোমার সই, মণিমালিনী কোথায়?"

মৃ। আমিই তোমার ভগিনী।

ব্যো। তুমি আমার সম্বন্ধীর ভগিনী—আমার ব্রাহ্মণীর ভেয়ের ভগিনী—আমার প্রাণাধিকা রাধিকা! সর্ব্বার্থসাধিকা!"

এই বলিয়া ব্যোমকেশ মৃণালিনীকে হস্ত দ্বারা আকর্ষণ করিয়া লইয়া চলিল। যখন মাধবাচার্য্য তাঁহাকে হরণ করিয়াছিল, তখন মৃণালিনী স্ত্রীস্বভাবসুলভ চীৎকারে রতি দেখান নাই, এখনও শব্দ করিলেন না।

কিন্তু মৃণালিনী আর সহ্য করিতে পারিলেন না। মনে মনে লক্ষ ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিয়া সবলে ব্যোমকেশকে পদাঘাত করিলেন। ব্যোমকেশ লাথি খাইয়া বলিল,—"ভাল ভাল, ধন্য হইলাম! ও চরণস্পর্শে মোক্ষপদ পাইব। সুন্দরি! তুমি আমার দ্রৌপদী—আমি জয়দ্রথ।"

পশ্চাৎ হইতে কে বলিল, "আর আমি তোমার অর্জ্জুন।"

অকস্মাৎ ব্যোমকেশ কাতরস্বরে বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল—"রাক্ষসি! তোর দন্তে কি বিষ আছে?" এই বলিয়া ব্যোমকেশ মৃণালিনীর হস্ত ত্যাগ করিয়া আপন পৃষ্ঠে হস্তমার্জ্জন করিতে লাগিল। স্পর্শানুভবে জানিল যে, পৃষ্ঠ দিয়া দরদরিত রুধির পড়িতেছে।

মৃণালিনী মুক্তহস্তা হইয়াও পলাইলেন না। তিনিও তখন ব্যোমকেশের ন্যায় বিস্মিতা হইয়াছিলেন, কেন না তিনি ত ব্যোমকেশকে দংশন করেন নাই। অনুকোচিত কার্য্য তাঁহার করণীয় নহে। কিন্তু তখনই নক্ষত্রালোকে খর্ব্বাকৃতি বালিকামূর্ত্তি সম্মুখ হইতে অপসৃতা হইতে দেখিতে পাইলেন। গিরিজায়া তাঁহার বসনাকর্ষণ করিয়া মৃদুস্বরে, "পলাইয়া আইস" বলিয়া স্বয়ং পলায়ন করিল।

পলায়ন মৃণালিনীর স্বভাবসঙ্গত নহে। তিনি পলায়ন করিলেন না। ব্যোমকেশ প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে এবং কাতরোক্তি করিতেছে দেখিয়া, তিনি গজেন্দ্রগমনে নিজ শয়নাগার অভিমুখে চলিলেন, কিন্তু তৎকালে ব্যোমকেশের আর্ত্তনাদে গৃহস্থ সকলেই জাগরিত হইয়াছিল। সম্মুখে হৃষীকেশ পুত্রকে শশব্যস্ত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"কি হইয়াছে? কেন ষাড়ের মত চীৎকার করিতেছ?"

ব্যোমকেশ কহিল, "মৃণালিনী অভিসারে গমন করিয়াছিল, আমি তাহাকে ধৃত করিয়াছি বলিয়া সে আমার পৃষ্ঠে দারুণ দংশন করিয়াছে।"

হৃষীকেশ পুত্রের কুরীতি কিছুই জানিতেন না। মৃণালিনীকে প্রাঙ্গণ হইতে উঠিতে দেখিয়া এ কথায় তাঁহার বিশ্বাস হইল। তৎকালে তিনি মৃণালিনীকে কিছুই বলিলেন না। নিঃশব্দে গজগামিনীর পশ্চাৎ তাঁহার শয়নাগারে আসিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

হৃষীকেশ

মৃণালিনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার শয়নাগারে আসিয়া হৃষীকেশ কহিলেন—"মৃণালিনি! তোমার এ কি চরিত্র?"

মৃ। আমার কি চরিত্র?

হৃ। তুমি কার মেয়ে, কি চরিত্র, কিছুই জানি না, গুরুর অনুরোধে আমি তোমাকে গৃহে স্থান দিয়াছি। তুমি আমার মেয়ে মণিমালিনীর সঙ্গে এক বিছানায় শোও—তোমার কুলটাবৃত্তি কেন?

মৃ। আমার কুলটাবৃত্তি যে বলে, সে মিথ্যাবাদী।

হৃষীকেশের ক্রোধে অধর কম্পিত হইল। কহিলেন, "কি পাপীয়সি! আমার অন্নে উদর পূরাবি, আর আমাকে দুর্ব্বাক্য বলিবি? তুই আমার গৃহ হইতে দূর হ, না হয় মাধবাচার্য্য রাগ

করিবেন, তা বলিয়া এমন কালসাপ ঘরে রাখিতে পারিব না।"

মৃ। যে আজ্ঞা—কালি প্রাতে আর আমাকে দেখিতে পাইবেন না।

হৃষীকেশের বোধ ছিল যে, যে কালে তাঁহার গৃহবহিষ্কৃতা হইলেই মৃণালিনী আশ্রয়হীনা হয়, সেকালে এমন উত্তর তাহার পক্ষে সম্ভব নহে। কিন্তু মৃণালিনী নিরাশ্রয়ের আশঙ্কায় কিছুমাত্র ভীতা নহেন দেখিয়া, মনে করিলেন যে, তিনি জারগৃহে স্থান পাইবার ভরসাতেই এরূপ উত্তর করিলেন। ইহাতে হৃষীকেশের কোপ আরও বৃদ্ধি হইল। তিনি অধিকতর বেগে কহিলেন,—"কালি প্রাতে! আজই দূর হও।"

মৃ। যে আজ্ঞা। আমি সখী মণিমালিনীর নিকট বিদায় হইয়া আজই দূর হইতেছি।

এই বলিয়া মৃণালিনী গাত্রোত্থান করিলেন।

হৃষীকেশ কহিলেন, "মণিমালিনীর সহিত কুলটার আলাপ কি?"

এবার মৃণালিনীর চক্ষে জল আসিল; কহিলেন "তাহাই হইবে। আমি কিছুই লইয়া আসি নাই; কিছুই লইয়া যাইব না। একবসনে চলিলাম। আপনাকে প্রণাম হই।"

এই বলিয়া দ্বিতীয় বাক্যব্যয় ব্যতীত মৃণালিনী শয়নাগার হইতে বহিষ্কৃতা হইয়া চলিলেন।

যেমন অন্যান্য গৃহবাসীরা ব্যোমকেশের আর্ত্তনাদে শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়াছিলেন, মণিমালিনীও তদ্রূপ উঠিয়াছিলেন। মৃণালিনীর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পিতৃশয্যাগৃহ পর্য্যন্ত আসিলেন দেখিয়া, তিনি এই অবসরে ভ্রাতার সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন এবং ভ্রাতার দুশ্চরিত্র বুঝিতে পারিয়া তাহাকে ভর্ৎসনা করিতেছিলেন। যখন তিনি ভর্ৎসনা সমাপন করিয়া প্রত্যাগমন করেন, তখন প্রাঙ্গণভূমে দ্রুতপদবিক্ষেপিণী মৃণালিনীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "সই, অমন করিয়া এত রাত্রে কোথায় যাইতেছ?" মৃণালিনী কহিলেন, "সখি,—মণিমালিনি, তুমি চিরায়ুষ্মতী হও, আমার সহিত আলাপ করিও না—তোমার বাপ মানা করিয়াছেন।"

মণি। সে কি মৃণালিনি! তুমি কাঁদিতেছ কেন? সর্ব্বনাশ! বাবা কি বলিতে না জানি কি বলিয়াছেন। সখি, ফের, রাগ করিও না।

মণিমালিনী মৃণালিনীকে ফিরাইতে পারিলেন না। পর্ব্বতসানুবাহী শিলাখণ্ডের ন্যায় অভিমানিনী সাধ্বী চলিয়া গেলেন। তখন অতি ব্যস্তে মণিমালিনী পিতৃ-সন্নিধানে আসিলেন। মৃণালিনীও গৃহের বাহিরে আসিলেন।

বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, পূর্ব্বসঙ্কেতস্থানে গিরিজায়া দাঁড়াইয়া আছে। মৃণালিনী তাহাকে দেখিয়া কহিলেন,—"তুমি এখনও দাঁড়াইয়া কেন?"

গি। আমি যে তোমাকে পলাইতে বলিয়া আসিলাম। তুমি আইস না আইস—দেখিয়া যাইবার জন্য দাঁড়াইয়া আছি।

মৃ। তুমি কি ব্রাহ্মণকে দংশন করিয়াছিলে?

গি। তা ক্ষতি কি? বামুন বৈ ত গোরু নয়।

মৃ। কিন্তু তুমি যে গান করিতে করিতে চলিয়া গেলে শুনিলাম?

গি। তার পর তোমাদের কথাবার্ত্তার শব্দ শুনিয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলাম। দেখে মনে হলো, মিন্‌ষে আমাকে এক দিন "কালা পিপঁড়ে" ব'লে ঠাট্টা করেছিল। সে দিন হুল ফুটানটা বাকী ছিল; সুযোগ পেয়ে বামুনের ঋণ শোধ দিলাম। এখন তুমি কোথা যাইবে?

মৃ। তোমার ঘরদ্বার আছে?

গি। আছে। পাতার কুঁড়ে।

মৃ। সেখানে আর কে থাকে?

গি। এক বুড়ী মাত্র। তাহাকে আয়ী বলি।

মৃ। চল, তোমার ঘরে যাব।

গি। চল। তাই ভাবিতেছিলাম।

এই বলিয়া দুই জনে চলিল। যাইতে যাইতে গিরিজায়া কহিল, "কিন্তু সে ত কুঁড়ে। সেখানে কয় দিন থাকিবে?"

মৃ। কালি প্রাতে অন্যত্র যাইব।

গি। কোথা? মথুরায়?

মৃ। মথুরায় আমার আর স্থান নাই।

গি। তবে কোথায়?

মৃ। যমালয়।

এই কথার পর দুই জনে ক্ষণেক কাল চুপ করিয়া রহিল, তার পর মৃণালিনী বলিলেন, "এ কথা কি তোমার বিশ্বাস হয়?"

গি। বিশ্বাস হইবে না কেন? কিন্তু সে স্থান ত আছেই, যখন ইচ্ছা তখনই যাইতে পারিবে। এখন কেন আর এক স্থানে যাও না?

মৃ। কোথা?

গি। নবদ্বীপ।

মৃ। গিরিজায়া, তুমি ভিখারিণী-বেশে কোন মায়াবিনী। তোমার নিকট কোন কথা গোপন করিব না। বিশেষ তুমি হিতৈষী। নবদ্বীপেই যাইব স্থির করিয়াছি।

গি। একা যাইবে?

মৃ। সঙ্গী কোথায় পাইব?

গি। (গায়িতে গায়িতে)

"মেঘ দরশনে হায়, চাতকিনী ধায় রে।
সঙ্গে যাবি কে কে তোরা আয় আয় আয় রে॥
মেঘেতে বিজলী-হাসি, আমি বড় ভালবাসি,
যে যাবি সে যাবি তোরা, গিরিজায়া যায় রে॥"

মৃ। এ কি রহস্য, গিরিজায়া?

গি। আমি যাব।

মৃ। সত্য সত্যই?

গি। সত্য সত্যই যাব।

মৃ। কেন যাবে?

গি। আমার সর্ব্বত্র সমান। রাজধানীতে ভিক্ষা বিস্তর।

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

গৌড়েশ্বর

অতিবিস্তীর্ণ সভামণ্ডপে নবদ্বীপোজ্জ্বলকারী রাজাধিরাজ গৌড়েশ্বর বিরাজ করিতেছেন। উচ্চ শ্বেত-প্রস্তরের বেদীর উপরে রত্নপ্রবালবিভূষিত সিংহাসনে রত্নপ্রবালমণ্ডিত ছত্রতলে বর্ষীয়ান্ রাজা বসিয়া আছেন। শিরোপরি কনককিঙ্কিণীসংবেষ্টিত বিচিত্র কারুকার্য্যখচিত শুভ্র চন্দ্রাতপ শোভা পাইতেছে। এক দিকে পৃথগাসনে হোমাবশেষ-বিভূষিত, অনিন্দ্যমূর্ত্তি ব্রাহ্মণমণ্ডল সভাপণ্ডিতকে পরিবেষ্টন করিয়া বসিয়াছেন। যে আসনে একদিন হলায়ুধ উপবেশন করিয়াছিলেন, সে আসনে এক্ষণে এক অপরিণামদর্শী চাটুকার অধিষ্ঠান করিতেছিলেন। অন্য দিকে মহামাত্য ধর্ম্মাধিকারকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া প্রধান রাজপুরুষেরা উপবেশন করিয়াছিলেন। মহাসামন্ত, মহাকুমারামাত্য, প্রমাতা, ঔপরিক, দাসাপরাধিক, চৌরোদ্ধরণিক, শৌল্কিক, গৌল্মিকগণ, ক্ষত্রপ, প্রান্তপালেরা, কোষ্ঠপালেরা, কাণ্ডরিক্য, তদাযুক্তক, বিনিযুক্তক প্রভৃতি সকলে উপবেশন করিয়াছেন। মহাপ্রতীহার সশস্ত্রে সভার অসাবধানতা রক্ষা করিতেছেন। স্তাবকেরা উভয় পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। সর্ব্বজন হইতে পৃথগাসনে কুশাসনমাত্র গ্রহণ করিয়া পণ্ডিতবর মাধবাচার্য্য উপবেশন করিয়া আছেন।

রাজসভার নিয়মিত কার্য্য সকল সমাপ্ত হইলে সভাভঙ্গের উদ্যোগ হইল। তখন মাধবাচার্য্য রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"মহারাজ! ব্রাহ্মণের বাচালতা মার্জ্জনা করিবেন। আপনি রাজনীতিবিশারদ, এক্ষণে ভূমণ্ডলে যত রাজগণ আছেন, সর্ব্বাপেক্ষা বহুদর্শী, প্রজাপালক আপনিই আজন্ম রাজা। আপনার অবিদিত নাই যে, শত্রুদমন রাজার প্রধান কর্ম্ম। আপনি প্রবল শত্রুদমনের কি উপায় করিয়াছেন?"

রাজা কহিলেন, "কি আজ্ঞা করিতেছেন?" সকল কথা বর্ষীয়ান্ রাজার শ্রুতিসুলভ হয় নাই।

মাধবাচার্য্যের পুনরুক্তির প্রতীক্ষা না করিয়া ধর্ম্মাধিকার পশুপতি কহিলেন, "মহারাজাধিরাজ! মাধবাচার্য্য রাজসমীপে জিজ্ঞাসু হইয়াছেন যে, রাজশত্রু-দমনের কি উপায় হইয়াছে? বঙ্গেশ্বরের কোন্ শত্রু এ পর্য্যন্ত দমিত হয় নাই, তাহা এখনও আচার্য্য ব্যক্ত করেন নাই। তিনি সবিশেষ বাচন করুন।"

মাধবাচার্য্য অল্প হাস্য করিয়া এবার অত্যুচ্চৈঃস্বরে কহিলেন,—"মহারাজ, তুরকীয়েরা আর্য্যাবর্ত্ত প্রায় সমুদয় হস্তগত করিয়াছে। আপাততঃ তাহারা মগধ জয় করিয়া গৌড়রাজ্য আক্রমণের উদ্যোগে আছে।"

এবার কথা রাজার কর্ণে প্রবেশলাভ করিল। তিনি কহিলেন,—"তুরকীদের কথা বলিতেছেন? তুরকীয়েরা কি আসিয়াছে?"

মাধবাচার্য্য কহিলেন,—"ঈশ্বর রক্ষা করিতেছেন। এখনও তাহারা এখানে আসে নাই। কিন্তু আসিলে আপনি কি প্রকারে তাহাদের নিবারণ করিবেন?"

রাজা কহিলেন, "আমি কি করিব—আমি কি করিব? আমার এই প্রাচীন শরীর, আমার যুদ্ধের উদ্যোগ সম্ভবে না। আমার এক্ষণে গঙ্গালাভ হইলেই হয়। তুরকীয়েরা আসে আসুক।"

এবম্ভূত রাজবাক্য সমাপ্ত হইলে সভাস্থ সকলেই নীরব হইল। কেবল মহাসামন্তের কোষমধ্যস্থ অসি অকারণ ঈষৎ ঝনৎকার শব্দ করিল। অধিকাংশ শ্রোতৃবর্গের মুখে কোন ভাবই ব্যক্ত হইল না; মাধবাচার্য্যের চক্ষু হইতে এক বিন্দু অশ্রুপাত হইল।

সভাপণ্ডিত দামোদর প্রথমে কথা কহিলেন, "আচার্য্য, আপনি কি ক্ষুব্ধ হইলেন? যেরূপ রাজাজ্ঞা হইল, ইহা শাস্ত্রসঙ্গত। শাস্ত্রে ঋষিবাক্য প্রযুক্ত আছে যে, তুরকীয়েরা এ দেশ অধিকার করিবে। শাস্ত্রে আছে, অবশ্য ঘটিবে—কাহার সাধ্য নিবারণ করে? তবে যুদ্ধোদ্যমে প্রয়োজন কি?"

মাধবাচার্য্য কহিলেন, "ভাল, সভাপণ্ডিত মহাশয়, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আপনি এতদুক্তি কোন্ শাস্ত্রে দেখিয়াছেন?"

দামোদর কহিলেন, "বিষ্ণুপুরাণে আছে। যথা—"

মাধ। 'যথা' থাকুক—বিষ্ণুপুরাণ আনিতে অনুমতি করুন। দেখান, এরূপ উক্তি কোথায় আছে।

দামো। আমি কি এতই ভ্রান্ত হইলাম? ভাল, স্মরণ করিয়া দেখুন দেখি, মনুতে এ কথা আছে কি না?

মাধ। গৌড়েশ্বরের সভাপণ্ডিত মানবধর্ম্মশাস্ত্রেও কি পারদর্শী নহেন?

দামো। কি জ্বালা! আপনি আমাকে বিহ্বল করিয়া তুলিলেন। আপনার সম্মুখে সরস্বতী বিমনা হয়েন, আমি কোন্ ছার? আপনার সম্মুখে গ্রন্থের নাম স্মরণ হইবে না; কিন্তু কবিতা শ্রবণ করুন।

মাধ। গৌড়েশ্বরের সভাপণ্ডিত যে অনুষ্টুপ্ ছন্দে একটি কবিতা রচনা করিয়া থাকিবেন, ইহা কিছুই অসম্ভব নহে; কিন্তু আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি—তুরকজাতীয় কর্ত্তৃক গৌড়বিজয়বিষয়িণী কথা কোন শাস্ত্রে কোথাও নাই।

পশুপতি কহিলেন, "আপনি কি সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ?"

মাধবাচার্য্য কহিলেন, "আপনি যদি পারেন, তবে আমাকে অশাস্ত্রজ্ঞ বলিয়া প্রতিপন্ন করুন।"

সভাপণ্ডিতের এক জন পারিষদ কহিলেন,—"আমি করিব। আত্মশ্লাঘা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। যে আত্মশ্লাঘাপরবশ, সে যদি পণ্ডিত, তবে মূর্খ কে?"

মাধবাচার্য্য কহিলেন, "মূর্খ তিন জন। যে আত্মরক্ষায় যত্নহীন, যে সেই যত্নহীনতার প্রতিপোষক, আর যে আত্মবুদ্ধির অতীত বিষয়ে বাক্যব্যয় করে, ইহারাই মূর্খ। আপনি ত্রিবিধ মূর্খ।"

সভাপণ্ডিতের পারিষদ অধোবদনে উপবেশন করিলেন।

পশুপতি কহিলেন, "যবন আইসে, আমরা যুদ্ধ করিব।"

মাধবাচার্য্য কহিলেন, "সাধু! সাধু! আপনার যেরূপ যশ, সেইরূপ প্রস্তাব করিলেন। জগদীশ্বর আপনাকে কুশলী করুন। আমার কেবল এই জিজ্ঞাস্য যে, যদি যুদ্ধই অভিপ্রায়, তবে তাহার কি উদ্যোগ হইয়াছে?"

পশুপতি কহিলেন, "মন্ত্রণা গোপনেই বক্তব্য। এ সভাতলে প্রকাশ্য নহে। কিন্তু যে অশ্ব, পদাতি এবং নাবিকসেনা সংগৃহীত হইতেছে, কিছুদিন এই নগরী পর্য্যটন করিলে তাহা জানিতে পারিবেন।"

মা। কতক কতক জানিয়াছি।

প। তবে এ প্রস্তাব করিতেছেন কেন?

মা। প্রস্তাবের তাৎপর্য্য এই যে, এক বীরপুরুষ এক্ষণে সমাগত হইয়াছেন। মগধের যুবরাজ হেমচন্দ্রের বীর্য্যের খ্যাতি শুনিয়া থাকিবেন।

প। বিশেষ শুনিয়াছি। ইহাও শ্রুত আছি যে, তিনি মহাশয়ের শিষ্য। আপনি বলিতে পারিবেন যে, ঈদৃশ বীরপুরুষের বাহুরক্ষিত মগধরাজ্য শত্রুহস্তগত হইল কি প্রকারে?

মা। যবন-বিপ্লবের কালে যুবরাজ প্রবাসে ছিলেন। এইমাত্র কারণ।

প। তিনি কি এক্ষণে নবদ্বীপে আগমন করিয়াছেন?

মা। আসিয়াছেন। রাজ্যাপহারক যবন এই দেশে আগমন করিতেছে শুনিয়া, এই দেশে তাহাদিগের সহিত সংগ্রাম করিয়া দস্যুর দণ্ডবিধান করিবেন। গৌড়রাজ তাঁহার সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করিয়া উভয়ে শত্রুবিনাশের চেষ্টা করিলে উভয়ের মঙ্গল।

প। রাজবল্লভেরা অদ্যই তাঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইবে। তাঁহার নিবাসার্থ যথাযোগ্য বাসগৃহ নির্দিষ্ট হইবে। সন্ধিনিবন্ধনের মন্ত্রণা যথাযোগ্য সময়ে স্থির হইবে।

পরে রাজাজ্ঞায় সভাভঙ্গ হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কুসুমনির্ম্মিতা

উপনগরপ্রান্তে গঙ্গাতীরবর্ত্তী এক অট্টালিকা হেমচন্দ্রের বাসার্থ রাজপুরুষেরা নির্দ্দিষ্ট করিলেন। হেমচন্দ্র মাধবাচার্য্যের পরামর্শানুসারে সুরম্য অট্টালিকায় আবাস সংস্থাপিত করিলেন।

নবদ্বীপে জনার্দ্দন নামে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি বয়োবাহুল্য-প্রযুক্ত এবং শ্রবণেন্দ্রিয়ের হানিপ্রযুক্ত সর্ব্বতোভাবে অসমর্থ, অথচ নিঃসহায়। তাঁহার সহধর্ম্মিণীও প্রাচীনা এবং শক্তিহীনা। কিছুদিন হইল, ইঁহাদিগের পর্ণকুটীর প্রবল বাত্যায় বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল। সেই অবধি ইঁহারা আশ্রয়াভাবে এই বৃহৎ পুরীর এক পার্শ্বে রাজপুরুষদিগের অনুমতি লইয়া বাস করিতেছিলেন। এক্ষণে কোন রাজপুত্র আসিয়া তথায় বাস করিবেন শুনিয়া, তাঁহারা পরাধিকার ত্যাগ করিয়া বাসান্তরের অন্বেষণে যাইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন।

হেমচন্দ্র উহা শুনিয়া দুঃখিত হইলেন। বিবেচনা করিলেন যে, এই বৃহৎ ভবনে আমাদিগের উভয়েরই স্থান হইতে পারে। ব্রাহ্মণ কেন নিরাশ্রয় হইবেন? হেমচন্দ্র দিগ্বিজয়কে আজ্ঞা করিলেন, "ব্রাহ্মণকে গৃহত্যাগ করিতে নিবারণ কর।" ভৃত্য ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিল, "এ কার্য্য ভৃত্যের দ্বারা সম্ভবে না। ব্রাহ্মণঠাকুর আমার কথা কাণে তুলেন না।"

ব্রাহ্মণ বস্তুতঃ অনেকেরই কথা কাণে তুলেন না—কেন না, তিনি বধির। হেমচন্দ্র ভাবিলেন, ব্রাহ্মণ অভিমান-প্রযুক্ত ভৃত্যের আলাপ গ্রহণ করেন না। এ জন্য স্বয়ং তৎসম্ভাষণে গেলেন। ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিলেন।

জনার্দ্দন আশীর্ব্বাদ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কে?"

হেম। আমি আপনার ভৃত্য।

জ। কি বলিলে—তোমার নাম রামকৃষ্ণ?

হেমচন্দ্র অনুভব করিলেন, ব্রাহ্মণের শ্রবণশক্তি বড় প্রবল নহে। অতএব উচ্চতরস্বরে কহিলেন, "আমার নাম হেমচন্দ্র। আমি ব্রাহ্মণের দাস।"

জ। ভাল ভাল; প্রথমে ভাল শুনিতে পাই নাই, তোমার নাম হনুমান্‌দাস।

হেমচন্দ্র মনে করিলেন, "নামের কথা দূর হউক; কার্য্যসাধন হইলেই হইল।" বলিলেন, "নবদ্বীপাধিপতির এই অট্টালিকা, তিনি ইহা আমার বাসের জন্য নিযুক্ত করিয়াছেন। শুনিলাম, আমার জন্য আপনি স্থানত্যাগ করিতেছেন।"

জ। না, এখনও গঙ্গাস্নানে যাই নাই; এই স্নানের উদ্যোগ করিতেছি।

হে। (অত্যুচ্চৈঃস্বরে) স্নান যথাসময়ে করিবেন। এক্ষণে আমি এই অনুরোধ করিতে আসিয়াছি যে, আপনি এ গৃহ ছাড়িয়া যাইবেন না।

জ। গৃহে আহার করিব না? তোমার বাটীতে কি? আদ্যশ্রাদ্ধ?

হে। ভাল, আহারাদির অভিলাষ করেন, তাহারও উদ্যোগ হইবে। এক্ষণে যেরূপ এ বাটীতে অবস্থিতি করিতেছেন, সেইরূপই করুন।

জ। ভাল ভাল; ব্রাহ্মণভোজন করাইলে দক্ষিণা ত আছেই। তা বলিতে হইবে না। তোমার বাড়ী কোথা?

হেমচন্দ্র হতাশ্বাস হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, এমন সময়ে পশ্চাৎ হইতে কে তাঁহার উত্তরীয় ধরিয়া টানিল। হেমচন্দ্র ফিরিয়া দেখিলেন। দেখিয়া প্রথম মুহূর্ত্তে তাঁহার বোধ হইল, সম্মুখে একখানি কুসুমনির্ম্মিতা দেবীপ্রতিমা। দ্বিতীয় মুহূর্ত্তে দেখিলেন, প্রতিমা সজীব; তৃতীয় মুহূর্ত্তে দেখিলেন, প্রতিমা নহে, বিধাতার নির্ম্মাণ-কৌশলসীমা রূপিণী বালিকা অথবা পূর্ণযৌবনা তরুণী।

বালিকা না তরুণী? ইহা হেমচন্দ্র তাহাকে দেখিয়া নিশ্চিত করিতে পারিলেন না।

বীণানিন্দিতস্বরে সুন্দরী কহিলেন, "তুমি পিতামহকে কি বলিতেছিলে? তোমার কথা উনি শুনিতে পাইবেন কেন?"

হেমচন্দ্র কহিলেন, "তাহা ত পাইলেন না দেখিলাম। তুমি কে?"

বালিকা বলিল, "আমি মনোরমা।"

হে। ইনি তোমার পিতামহ?

মনো। তুমি পিতামহকে কি বলিতেছিলে?

হে। শুনিলাম, ইনি এ গৃহ ত্যাগ করিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন; আমি তাই নিবারণ করিতে আসিয়াছি।

মনো। এ গৃহে এক রাজপুত্র আসিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে থাকিতে দিবেন কেন?

হে। আমিই সেই রাজপুত্র। আমি তোমাদিগকে অনুরোধ করিতেছি, তোমরা এখানে থাক।

ম। কেন?

এ 'কেন'র উত্তর নাই। হেমচন্দ্র আর উত্তর না

পাইয়া কহিলেন, "কেন? মনে কর, যদি তোমার ভাই আসিয়া এই গৃহে বাস করিত, সে কি তোমাদিগকে তাড়াইয়া দিত?"

ম। তুমি কি আমার ভাই?

হে। আজি হইতে তোমার ভাই হইলাম। এখন বুঝিলে?

ম। বুঝিয়াছি। কিন্তু ভগিনী বলিয়া আমাকে কখন তিরস্কার করিবে না ত?

হেমচন্দ্র মনোরমার কথার প্রণালীতে চমৎকৃত হইতে লাগিলেন। ভাবিলেন, "এ কি অলৌকিক সরলা বালিকা? না উন্মাদিনী?" কহিলেন, "কেন তিরস্কার করিব?"

ম। যদি আমি দোষ করি?

হে। দোষ দেখিলে কে না তিরস্কার করে?

মনোরমা ক্ষুণ্ণভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন; বলিলেন, "আমি কখন ভাই দেখি নাই; ভাইকে কি লজ্জা করিতে হয়?"

হে। না।

ম। তবে আমি তোমাকে লজ্জা করিব না,—তুমি আমাকে লজ্জা করিবে?

হেমচন্দ্র হাসিলেন—কহিলেন, "আমার বক্তব্য তোমার পিতামহকে জানাইতে পারিলাম না,—তাহার উপায় কি?"

ম। আমি বলিতেছি।

এই বলিয়া মনোরমা মৃদু মৃদু স্বরে জনার্দ্দনের নিকট হেমচন্দ্রের অভিপ্রায় জানাইলেন। হেমচন্দ্র দেখিয়া বিস্মিত হইলেন যে, মনোরমার সেই মৃদু কথা বধিরের বোধগম্য হইল।

ব্রাহ্মণ আনন্দিত হইয়া রাজপুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং কহিলেন, "মনোরমা, ব্রাহ্মণীকে বল, রাজপুত্র তাঁহার নাতি হইলেন—আশীর্ব্বাদ করুন।" এই বলিয়া ব্রাহ্মণ স্বয়ং "ব্রাহ্মণি! ব্রাহ্মণি!" বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণী তখন স্থানান্তরে গৃহকার্য্যে ব্যাপৃতা ছিলেন—ডাক শুনিতে পাইলেন না। ব্রাহ্মণ অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "ব্রাহ্মণীর ঐ বড় দোষ। কাণে কম শোনেন।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নৌকাযানে

হেমচন্দ্র ত উপবনগৃহে সংস্থাপিত হইলেন। আর মৃণালিনী? নির্ব্বাসিতা, পরপীড়িতা, সহায়হীনা মৃণালিনী কোথায়?

সান্ধ্যগগনে রক্তিম মেঘমালা কাঞ্চনবর্ণ ত্যাগ করিয়া ক্রমে ক্রমে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিল। রজনীর তিমিরাবরণে গঙ্গার বিশাল হৃদয় অস্পষ্টীকৃত হইল। সভামণ্ডপে পরিচারকহস্তজ্বালিত দীপমালার ন্যায়, অথবা প্রভাতে উদ্যানকুসুমসমূহের ন্যায় আকাশে নক্ষত্রগণ ফুটিতে লাগিল। প্রায়ান্ধকার নদীহৃদয়ে নৈশ সমীরণ কিঞ্চিৎ খরতরবেগে বহিতে লাগিল। তাহাতে রমণীহৃদয়ে নায়কসংস্পর্শজনিত প্রকম্পের ন্যায় নদীফেনপুঞ্জে শ্বেতপুষ্পমালা গ্রথিত হইতে লাগিল। বহু লোকের কোলাহলের ন্যায় বীচিরব উত্থিত হইল। নাবিকেরা নৌকাসকল তীরলগ্ন করিয়া রাত্রির জন্য বিশ্রামের ব্যবস্থা করিতে লাগিল। তন্মধ্যে একখানি ছোট ডিঙ্গী অন্য নৌকা হইতে পৃথক্ হইয়া এক খালের মুখে লাগিল। নাবিকেরা আহারাদির ব্যবস্থা করিতে লাগিল।

ক্ষুদ্র তরণীতে দুইটিমাত্র আরোহী। দুইটিই স্ত্রীলোক। পাঠককে বলিতে হইবে না, ইহারা মৃণালিনী আর গিরিজায়া।

গিরিজায়া মৃণালিনীকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "আজিকার দিন কাটিল।"

মৃণালিনী কোন উত্তর করিল না।

গিরিজায়া পুনরপি কহিল, "কালিকার দিনও কাটিবে—পরদিনও কাটিবে—কেন কাটিবে না?"

মৃণালিনী তথাপি কোন উত্তর করিলেন না। কেবলমাত্র দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

গিরিজায়া কহিল, "ঠাকুরাণি! এ কি এ? দিবানিশি চিন্তা করিয়া কি হইবে? যদি আমাদিগের নদীয়া আসা কাজ ভাল না হইয়া থাকে, চল, এখনও ফিরিয়া যাই।"

মৃণালিনী এবার উত্তর করিলেন। বলিলেন, "কোথায় যাইবে?"

গি। চল, হৃষীকেশের বাড়ী যাই।

মৃ। বরং এই গঙ্গাজলে ডুবিয়া মরিব।

গি। চল, তবে মথুরায় যাই।

মৃ। আমি ত বলিয়াছি, তথায় আমার স্থান নাই। কুলটার ন্যায় রাত্রিকালে যে বাপের ঘর ছাড়িয়া আসিয়াছি, কি বলিয়া সে বাপের ঘরে আর মুখ দেখাইব?

গি। কিন্তু তুমি ত আপন ইচ্ছায় আইস নাই, মন্দ ভাবিয়াও আইস নাই। যাইতে ক্ষতি কি?

মৃ। সে কথা কে বিশ্বাস করিবে? যে বাপের

বড় আদরের প্রতিমা ছিলাম, সে বাপের ঘরে ঘৃণিত হইয়াই বা কি প্রকারে থাকিব ?

গিরিজায়া অন্ধকারে দেখিতে পাইল না যে, মৃণালিনীর চক্ষু হইতে বারিবিন্দুর পর বারিবিন্দু পড়িতে লাগিল। গিরিজায়া কহিল, "তবে কোথায় যাইবে ?"

মৃ। যেখানে যাইতেছি।

গি। সে ত সুখের যাত্রা। তবে অন্যমন কেন ? যাহাকে দেখিতে ভালবাসি, তাহাকে দেখিতে যাইতেছি, ইহার অপেক্ষা আর সুখ কি আছে ?

মৃ। নদীয়ায় আমার সহিত হেমচন্দ্রের সাক্ষাৎ হইবে না।

গি। কেন ? তিনি কি সেখানে নাই ?

মৃ। সেইখানেই আছেন। কিন্তু তুমি ত জান যে, আমার সহিত এক বৎসর অসাক্ষাৎ তাঁহার ব্রত। আমি কি সে ব্রত ভঙ্গ করাইব ?

গিরিজায়া নীরব হইয়া রহিল। মৃণালিনী আবার কহিলেন, "আর কি বলিয়াই বা তাঁহার নিকট দাঁড়াইব ? আমি কি বলিব যে, হৃষীকেশের উপর রাগ করিয়া আসিয়াছি, না বলিব যে, হৃষীকেশ আমাকে কুলটা বলিয়া বিদায় করিয়া দিয়াছে ?"

গিরিজায়া ক্ষণেক নীরব থাকিয়া কহিল,"তবে কি নদীয়ায় তোমার সঙ্গে হেমচন্দ্রের সাক্ষাৎ হইবে না ?"

মৃ। না।

গি। তবে যাইতেছ কেন ?

মৃ। তিনি আমাকে দেখিতে পাইবেন না। কিন্তু আমি তাঁহাকে দেখিব। তাঁহাকে দেখিতেই যাইতেছি।

গিরিজায়ার মুখে হাসি ধরিল না। বলিল, "তবে আমি গীত গাই—

'চরণতলে দিনু হে শ্যাম পরাণ-রতন।
দিব না তোমারে নাথ মিছার যৌবন ॥
এ রতন সমতুল, ইহা তুমি দিবে মূল,
নিবানিশি মোরে নাথ দিবে দরশন ॥

ঠাকুরাণি, তুমি, তাঁহাকে দেখিয়া ত জীবন-ধারণ করিবে। আমি তোমার দাসী হইয়াছি, আমার ত তাহাতে পেট ভরিবে না, আমি কি খেয়ে বাঁচিব ?"

মৃ। আমি দুই একটি শিল্পকর্ম্ম জানি। মালা গাঁথিতে জানি, চিত্র করিতে জানি, কাপড়ের উপর ফুল তুলিতে জানি। তুমি বাজারে আমার শিল্পকর্ম্ম বিক্রয় করিয়া দিবে।

গি। আর আমি ঘরে ঘরে গীত গাহিব। "মৃণাল অধমে" গাইব কি ?

মৃণালিনী অর্দ্ধ হাস্য, অর্দ্ধ সকোপদৃষ্টিতে গিরিজায়ার প্রতি কটাক্ষ করিলেন।

গিরিজায়া কহিল, "অমন করিয়া চাহিলে আমি গীত গাহিব।" এই বলিয়া গাহিল,—

"সাধের তরণী আমার কে দিল তরঙ্গে।
কে আছে কাণ্ডারী হেন, কে যাইবে সঙ্গে।"

মৃণালিনী কহিল, "যদি এত ভয়, তবে একা এলে কেন ?"

গিরিজায়া কহিল, "আগে কি জানি।" বলিয়া গাহিতে লাগিল,—

"ভাসল তরী সকালবেলা, ভাবিলাম এ জলখেলা,
মধুর বহিবে বায়ু ভেসে যাব রঙ্গে।
এখন—গগনে গরজে ঘন, বহে খর সমীরণ,
কূল ত্যজি এলাম কেন, মরিতে আতঙ্কে।"

মৃণালিনী কহিল, "কূলে ফিরিয়া যাও না কেন ?"

গিরিজায়া গাহিতে লাগিল,—

"মনে করি কূলে ফিরি বাহি তরী ধীরি ধীরি,
কূলেতে কণ্টক-তরু বেষ্টিত ভুজঙ্গে।"

মৃণালিনী কহিলেন, "তবে ডুবিয়া মর না কেন ?"

গিরিজায়া কহিল, "মরি, তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু" বলিয়া আবার গাহিল,—

"যাহারে কাণ্ডারী করি, সাজাইয়া দিনু তরী,
সে কভু না দিল পদ, তরণীর অঙ্গে।"

মৃণালিনী কহিলেন, "গিরিজায়া, এ কোন্ অপ্রেমিকের গান ?"

গি। কেন ?

মৃ। আমি হইলে তরী ডুবাই।

গি। সাধ করিয়া ?

মৃ। সাধ করিয়া।

গি। তবে তুমি জলের ভিতর রত্ন দেখিয়াছ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বাতায়নে

হেমচন্দ্র কিছুদিন উপবন-গৃহে বাস করিলেন। জনার্দ্দনের সহিত প্রত্যহ সাক্ষাৎ হইত; কিন্তু ব্রাহ্মণের বধিরতা-প্রযুক্ত ইঙ্গিতে আলাপ হইত

মাত্র। মনোরমার সহিতও সর্ব্বদা সাক্ষাৎ হইত, মনোরমা কখন তাঁহার সহিত উপযাচিকা হইয়া কথা কহিতেন, কখন বা বাক্যব্যয় না করিয়া স্থানান্তরে চলিয়া যাইতেন। বস্তুতঃ, মনোরমার প্রকৃতি তাঁহার পক্ষে অধিকতর বিস্ময়জনক বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। প্রথমতঃ তাঁহার বয়ঃক্রম-চতুর্দশ বৎসর সহজে তাঁহাকে বালিকা বলিয়া বোধ হইত, কিন্তু কখন কখন মনোরমাকে অতিশয় গাম্ভীর্য্য-শালিনী দেখিতেন। মনোরমা কি অদ্যাপি কুমারী? হেমচন্দ্র একদিন কথোপকথনচ্ছলে মনোরমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মনোরমা, তোমার শ্বশুরবাড়ী কোথায়?" মনোরমা কহিল, "বলিতে পারি না।" আর এক দিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "মনোরমা, তুমি কয় বৎসরের হইয়াছ?" মনোরমা তাহাতেও উত্তর দিয়াছিলেন, "বলিতে পারি না।"

মাধবাচার্য্য হেমচন্দ্রকে উপবনে স্থাপিত করিয়া দেশপর্য্যটনে যাত্রা করিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় এই যে, এ সময়ে গৌড়দেশীয় অধীন রাজগণ যাহাতে নবদ্বীপে সসৈন্য সমবেত হইয়া গৌড়েশ্বরের আনুকূল্য করেন, তদ্বিষয়ে তাঁহাদিগকে প্রবৃত্তি দেন। হেমচন্দ্র নবদ্বীপে তাঁহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন; কিন্তু নিষ্কর্ম্মে দিনযাপন ক্লেশকর হইয়া উঠিল। হেমচন্দ্র বিরক্ত হইলেন। এক একবার মনে হইতে লাগিল যে, দিগ্বিজয়কে গৃহরক্ষায় রাখিয়া অশ্ব লইয়া একবার গৌড়ে গমন করেন। কিন্তু তথায় মৃণালিনীর সাক্ষাৎ লাভ করিলে তাঁহার প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হইবে, বিনা সাক্ষাতে গৌড়যাত্রায় কি ফলোদয় হইবে? এই সকল আলোচনায় যদিও গৌড়যাত্রায় হেমচন্দ্র নিরস্ত হইলেন, তথাপি অনুদিন মৃণালিনী-চিন্তায় হৃদয় নিযুক্ত থাকিত। একদা প্রদোষকালে তিনি শয়নকক্ষে, পর্য্যঙ্কোপরি শয়ন করিয়া মৃণালিনীর চিন্তা করিতেছিলেন। চিন্তাতেও হৃদয় সুখলাভ করিতেছিল। মুক্ত বাতায়নপথে হেমচন্দ্র প্রকৃতির শোভা নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। নবীন শরদুদয়। রজনী চন্দ্রিকাশালিনী, আকাশ নির্ম্মল, বিস্তৃত, নক্ষত্রখচিত, কচিৎ স্তরপরম্পরাবিন্যস্ত শ্বেতাম্বুদমালায় বিভূষিত। বাতায়নপথে অদূরবর্ত্তিনী ভাগীরথীও দেখা যাইতেছিল; ভাগীরথী বিশালোরসী, বহুদূর-বিসর্পিণী ও চন্দ্রকরপ্রতিঘাতে উজ্জ্বলতরঙ্গিণী, দূর-প্রান্তে ধূমময়ী, নববারিসমাগম-প্রহ্লাদিনী। নববারি-সমাগমজনিত কল্লোল হেমচন্দ্র শুনিতে পাইতে-ছিলেন। বাতায়ন-পথে বায়ু প্রবেশ করিতেছিল। বায়ু গঙ্গাতরঙ্গনিক্ষিপ্ত জলকণা-সংস্পর্শে শীতল, নিশাসমাগমে প্রফুল্ল, বন্য-কুসুম-সংস্পর্শে সুগন্ধি, চন্দ্রকরপ্রতিঘাতী শ্যামোজ্জ্বল বৃক্ষপত্র বিধূত করিয়া, নদীতীরবিরাজিত কাশকুসুম আন্দোলিত করিয়া, বায়ু বাতায়ন-পথে প্রবেশ করিতেছিল; হেমচন্দ্র বিশেষ প্রীতিলাভ করিলেন।

অকস্মাৎ বাতায়নপথ অন্ধকার হইল—চন্দ্রা-লোকের গতিরোধ হইল। হেমচন্দ্র বাতায়নসন্নিধি একটি মনুষ্যমুণ্ড দেখিতে পাইলেন। বাতায়ন ভূমি হইতে কিছু উচ্চ—এ জন্য কাহারও হস্তপদাদি কিছু দেখিতে পাইলেন না—কেবল একখানি মুখ দেখি-লেন। মুখখানি অতি বিশালশ্মশ্রুসংযুক্ত, তাহার মস্তকে উষ্ণীষ। সেই উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে বাতায়নের নিকটে, সম্মুখে, শ্মশ্রুসংযুক্ত উষ্ণীষধারী মনুষ্যমুণ্ড দেখিয়া, হেমচন্দ্র শয্যা হইতে লম্ফ দিয়া নিজ শাণিত অসি গ্রহণ করিলেন।

অসি গ্রহণ করিয়া হেমচন্দ্র চাহিয়া দেখিলেন যে, বাতায়নে আর মনুষ্যমুণ্ড নাই।

হেমচন্দ্র অসিহস্তে দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। বাতায়নতলে আসিলেন। তথায় কেহই নাই।

গৃহের চতুষ্পার্শ্বে, গঙ্গাতীরে, বনমধ্যে হেমচন্দ্র ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিলেন। কোথাও কাহাকেও দেখিলেন না।

হেমচন্দ্র গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তখন রাজপুত্র পিতৃদত্ত যোদ্ধৃবেশে আপাদমস্তক আত্ম-শরীর মণ্ডিত করিলেন। অকাল-জলদোদয়-বিমর্ষিত গগনমণ্ডলবৎ তাঁহার সুন্দর মুখকান্তি অন্ধকারময় হইল। তিনি একাকী সেই গম্ভীর নিশাতে শস্ত্রময় হইয়া যাত্রা করিলেন। বাতায়নপথে মনুষ্যমুণ্ড দেখিয়া, তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন যে, বঙ্গে তুরক আসিয়াছে।

—

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বাপীকূলে

অকালজলদোদয়স্বরূপ ভীমমূর্ত্তি রাজপুত্র হেমচন্দ্র তুরকের অন্বেষণে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। ব্যাঘ্র যেমন আহার্য্য দেখিবামাত্র বেগে ধাবিত হয়, হেমচন্দ্র তুরক দেখিবামাত্র সেইরূপ ধাবিত হইলেন। কিন্তু কোথায় তুরকের সাক্ষাৎ পাইবেন, তাহার স্থিরতা ছিল না।

হেমচন্দ্র একটিমাত্র তুরক দেখিয়াছিলেন। কিন্তু

তিনি এই সিদ্ধান্ত করিলেন যে, হয় তুরকসেনা নগরসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া লুক্কায়িত আছে, নতুবা এই ব্যক্তি তুরকসেনার পূর্ব্বচর। যদি তুরকসেনাই আসিয়া থাকে, তবে তৎসঙ্গে একাকী সংগ্রাম সম্ভবে না। কিন্তু যাহাই হউক, প্রকৃত অবস্থা কি, তাহার অনুসন্ধান না করিয়া হেমচন্দ্র কদাচ স্থির থাকিতে পারেন না। যে মহৎ কার্য্যের জন্য মৃণালিনীকে ত্যাগ করিয়াছেন, অদ্য রাত্রিতে নিদ্রাভিভূত হইয়া সে কর্ম্মে উপেক্ষা করিতে পারেন না। বিশেষ যবনবধে হেমচন্দ্রের আন্তরিক আনন্দ। উষ্ণীষধারী মুণ্ড দেখিয়া অবধি তাঁহার জিঘাংসা ভয়ানক প্রবল হইয়াছে, সুতরাং তাঁহার স্থির হইবার সম্ভাবনা কি? অতএব দ্রুতপদবিক্ষেপে হেমচন্দ্র রাজপথাভিমুখে চলিলেন।

উপবনগৃহ হইতে রাজপথ কিছু দূর। যে পথ বাহিত করিয়া উপবনগৃহ হইতে রাজপথে যাইতে হয়, সে বিরললোকপ্রবাহ গ্রাম্যপথমাত্র। হেমচন্দ্র সেই পথে চলিলেন। সেই পথপার্শ্বে অতি বিস্তারিত সুরম্য সোপানাবলিশোভিত এক দীর্ঘিকা ছিল। দীর্ঘিকাপাশে অনেক বকুল, শাল, অশোক, চম্পক, কদম্ব, অশ্বত্থ, বট, আম্র, তিন্তিড়ী প্রভৃতি বৃক্ষ ছিল। বৃক্ষগুলি যে সুশৃঙ্খলরূপে শ্রেণীবিন্যস্ত ছিল, এমত নহে; বহুতর বৃক্ষ পরস্পর শাখায় শাখায় সম্বদ্ধ হইয়া বাপীতীরে ঘনান্ধকার করিয়া রহিত। দিবসেও তথায় অন্ধকার। কিংবদন্তী ছিল যে, সেই সরোবরে ভূতযোনি বিহার করিত। এই সংস্কার প্রতিবাসী-দিগের মনে এরূপ দৃঢ় হইয়া উঠিয়াছিল যে, সচরাচর তথায় কেহ যাইত না। যদি যাইত, তবে একাকী কেহ যাইত না। নিশাকালে কদাপি কেহ যাইত না।

পৌরাণিকধর্ম্মের একাধিপত্যকালে হেমচন্দ্র ভূতযোনির অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রত্যয়শালী হইবেন, তাহা আর বিচিত্র কি! কিন্তু প্রেতসম্বন্ধে প্রত্যয়-শালী বলিয়া তিনি গন্তব্যপথে যাইতে সঙ্কোচ করেন, এরূপ ভীরুস্বভাব নহেন। অতএব তিনি নিঃসঙ্কোচ হইয়া বাপীপার্শ্ব দিয়া চলিলেন। নিঃ-সঙ্কোচ বটে, কিন্তু কৌতূহলশূন্য নহেন, বাপীপার্শ্বে সর্ব্বত্র এবং তত্তীর-প্রতি অনিমেষ লোচন নিক্ষিপ্ত করিতে করিতে চলিলেন। সোপানমার্গের নিকট-বর্ত্তী হইলেন। সহসা চমকিত হইলেন। জনশ্রুতির প্রতি তাঁহার বিশ্বাস দৃঢ়ীকৃত হইল। দেখিলেন, চন্দ্রালোকে সর্ব্বাধঃস্থ সোপানে জলে চরণ রক্ষা করিয়া শ্বেতবসনপরিধানা কে বসিয়া আছে। স্ত্রীমূর্ত্তি বলিয়া তাঁহার বোধ হইল। শ্বেতবসনা অবেণীসম্বদ্ধ-কুন্তলা; কেশজাল স্কন্ধ, পৃষ্ঠদেশ, বাহুযুগল, মুখমণ্ডল, হৃদয়, সর্ব্বত্র আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। প্রেত বিবে-চনা করিয়া হেমচন্দ্র নিঃশব্দে চলিয়া যাইতেছিলেন। কিন্তু মনে ভাবিলেন, যদি মনুষ্য হয়? এত রাত্রে কে এ স্থানে? সে ত তুরককে দেখিলে দেখিয়া থাকিতে পারে? এই সন্দেহে হেমচন্দ্র ফিরিলেন। নির্ভয়ে বাপীতীরারোহণ করিলেন, সোপানমার্গে ধীরে ধীরে অবতরণ করিতে লাগিলেন। প্রেতিনী তাঁহার আগমন জানিতে পারিয়াও সরিল না। পূর্ব্বমত রহিল। হেমচন্দ্র তাহার নিকটে আসি-লেন। তখন সে উঠিয়া দাঁড়াইল। হেমচন্দ্রের দিকে ফিরিল; হস্ত দ্বারা মুখাবরণকারী কেশদাম অপসৃত করিল। হেমচন্দ্র তাহার মুখ দেখিলেন। সে প্রেতিনী নহে, কিন্তু প্রেতিনী হইলে হেমচন্দ্র অধিকতর বিস্ময়াপন্ন হইতেন না। কহিলেন "কে, মনোরমা! তুমি এখানে?"

মনোরমা কহিল, "আমি এখানে অনেকবার আসি—কিন্তু তুমি এখানে কেন?"

হেম। আমার কর্ম্ম আছে।

মনো। এ রাত্রে কি কর্ম্ম?

হেম। পশ্চাৎ বলিব। তুমি এ রাত্রে এখানে কেন?

মনো। তোমার এ বেশ কেন? হাতে শূল, কাঁকালে তরবারি; তরবারে এ কি জ্বলিতেছে? এ কি হীরা? মাথায় এ কি? ইহাতে ঝক্‌মক্‌ করিয়া জ্বলিতেছে, এই বা কি? এও কি হীরা? এত হীরা পেলে কোথা?

হেম। আমার ছিল।

মনো। এ রাত্রে এত হীরা পরিয়া কোথায় যাইতেছ? চোরে যে কাড়িয়া লইবে।

হেম। আমার নিকট হইতে চোরে কাড়িতে পারে না।

মনো। তা এত রাত্রে এত অলঙ্কারে প্রয়োজন কি? তুমি কি বিবাহ করিতে যাইতেছ?

হেম। তোমার কি বোধ হয় মনোরমা?

মনো। মানুষ মারিবার অস্ত্র লইয়া কেহ বিবাহ করিতে যায় না। তুমি যুদ্ধে যাইতেছ।

হেম। কাহার সহিত যুদ্ধ করিব? তুমিই বা এখানে কি করিতেছিলে?

মনো। স্নান করিতেছিলাম। স্নান করিয়া বাতাসে চুল শুকাইতেছিলাম। এই দেখ, চুল এখনও ভিজা রহিয়াছে।

এই বলিয়া মনোরমা আর্দ্র কেশ হেমচন্দ্রের হস্তে স্পর্শ করাইলেন।

হেম। রাত্রে স্নান কেন?

মনো। আমার গা জ্বালা করে।

হেম। গঙ্গাস্নান না করিয়া এখানে কেন?

মনো। এখানকার জল বড় শীতল।

হেম। তুমি সর্ব্বদা এখানে আইস?

মনো। আসি।

হেম। আমি তোমার সম্বন্ধ করিতেছি—তোমার বিবাহ হইবে। বিবাহ হইলে—এরূপ কি প্রকারে আসিবে?

মনো। আগে বিবাহ হউক।

হেমচন্দ্র হাসিয়া কহিলেন, "তোমার লজ্জা নাই, তুমি কালামুখী।"

মনো। তিরস্কার কর কেন? তুমি যে বলিয়াছিলে, তিরস্কার করিবে না।

হেম। সে অপরাধ লইও না। এখান দিয়া কাহাকেও যাইতে দেখিয়াছ?

মনো। দেখিয়াছি।

হেম। তাহার কি বেশ?

মনো। তুরুকের বেশ।

হেমচন্দ্র অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন; বলিলেন, "সে কি? তুমি তুরক চিনিলে কি প্রকারে?"

মনো। আমি পূর্ব্বে তুরক দেখিয়াছি।

হেম। সে কি? কোথায় দেখিলে?

মনো। যেখানে দেখি না—তুমি কি সেই তুরুকের অনুসরণ করিবে?

হেম। করিব—সে কোন্ পথে গেল?

মনো। কেন?

হেম। তাহাকে বধ করিব।

মনো। মানুষ মেরে কি হবে?

হেম। তুরক আমার পরম শত্রু।

মনো। তবে একটি মারিয়া, কি তৃপ্তিলাভ করিবে?

হেম। আমি যত তুরক দেখিতে পাইব, তত মারিব।

মনো। পারিবে?

হেম। পারিব।

মনোরমা বলিল, "তবে সাবধানে আমার সঙ্গে আইস।"

হেমচন্দ্র ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। যবনকুলে এই বালিকা পথপ্রদর্শিনী!

মনোরমা তাঁহার মানসিক ভাব বুঝিলেন; বলিলেন, "আমাকে বালিকা ভাবিয়া অবিশ্বাস করিতেছ?"

হেমচন্দ্র মনোরমার প্রতি চাহিয়া দেখিলেন। বিস্ময়াপন্ন হইয়া ভাবিলেন—মনোরমা কি মানুষী!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পশুপতি

গৌড়দেশের ধর্ম্মাধিকার পশুপতি অসাধারণ ব্যক্তি; তিনি দ্বিতীয় গৌড়েশ্বর। রাজা বৃদ্ধ, বার্দ্ধক্যের ধর্ম্মানুসারে পরমতাবলম্বী এবং রাজকার্য্যে অযত্নবান্ হইয়াছিলেন, সুতরাং প্রধানামাত্য ধর্ম্মাধিকারের হস্তেই গৌড়রাজ্যের প্রকৃত ভার অর্পিত হইয়াছিল এবং সম্পদে অথবা ঐশ্বর্য্যে পশুপতি গৌড়েশ্বরের সমকক্ষ ব্যক্তি হইয়া উঠিয়াছিলেন।

পশুপতির বয়ঃক্রম পঞ্চত্রিংশৎ বৎসর হইবে। তিনি দেখিতে অতি সুপুরুষ। তাঁহার শরীর দীর্ঘ, বক্ষঃ বিশাল, সর্ব্বাঙ্গ অস্থিমাংসের উপযুক্ত সংযোগে সুন্দর। তাঁহার বর্ণ তপ্তকাঞ্চনসন্নিভ; ললাট অতি বিস্তৃত, মানসিক শক্তির মন্দিরস্বরূপ। নাসিকা দীর্ঘ এবং উন্নত, চক্ষু ক্ষুদ্র, কিন্তু অসাধারণ ঔজ্জ্বল্যসম্পন্ন। মুখকান্তি জ্ঞানগাম্ভীর্য্যব্যঞ্জক এবং অনুদিন বিষয়ানুষ্ঠানজনিত চিন্তার গুণে কিছু পরুষভাবপ্রকাশক। তাহা হইলে কি হয়, রাজসভাস্থলে তাঁহার ন্যায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পুরুষ আর কেহই ছিল না। লোকে বলিত, গৌড়দেশে তাদৃশ পণ্ডিত এবং বিচক্ষণ ব্যক্তিও কেহ ছিল না।

পশুপতি জাতিতে ব্রাহ্মণ, কিন্তু তাঁহার জন্মভূমি কোথা, তাহা কেহ বিশেষ জ্ঞাত ছিল না। কথিত ছিল যে, তাঁহার পিতা শাস্ত্রব্যবসায়ী দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন।

পশুপতি কেবল আপন বুদ্ধিবিদ্যার প্রভাবে গৌড়-রাজ্যের প্রধান পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

পশুপতি যৌবনকালে কাশীধামে পিতার নিকট থাকিয়া শাস্ত্রাধ্যয়ন করিতেন। তথায় কেশব নামে এক বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। হৈমবতী নামে কেশবের এক অষ্টমবর্ষীয়া কন্যা ছিল। তাহার সহিত পশুপতির পরিণয় হয়। কিন্তু অদৃষ্টবশতঃ বিবাহের রাত্রেই কেশব সম্প্রদানের কন্যা লইয়া অদৃশ্য হইল। আর তাহার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। সেই পর্য্যন্ত পশুপতি পত্নীসহবাসে বঞ্চিত ছিলেন। কারণবশতঃ এ কাল পর্য্যন্ত দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করেন নাই। তিনি একণে রাজ-প্রাসাদতুল্য উচ্চ

অট্টালিকায় বাস করিতেন, কিন্তু বামা-নয়ন-নিঃসৃত জ্যোতির অভাবে সেই উচ্চ অট্টালিকা আজি অন্ধকারময়।

আজি রাত্রে সেই অট্টালিকার এক নিভৃত কক্ষে পশুপতি একাকী দীপালোকে বসিয়া আছেন। এই কক্ষের পশ্চাতেই আম্রকানন। আম্রকাননে নিষ্ক্রান্ত হইবার জন্য একটি গুপ্তদ্বার আছে। সেই দ্বারে আসিয়া নিশীথকালে, মৃদু মৃদু কে আঘাত করিল। গৃহাভ্যন্তর হইতে পশুপতি দ্বার উদ্ঘাটিত করিলেন। এক ব্যক্তি গৃহে প্রবেশ করিল। সে মুসলমান। হেমচন্দ্র তাহাকেই বাতায়নপথে দেখিয়াছিলেন। পশুপতি তখন তাহাকে পৃথগাসনে উপবেশন করিতে বলিয়া বিশ্বাসজনক অভিজ্ঞান দেখিতে চাহিলেন। মুসলমান অভিজ্ঞান দৃষ্ট করাইলেন।

পশুপতি সংস্কৃতে কহিলেন, "বুঝিলাম, আপনি তুরক-সেনাপতির বিশ্বাসপাত্র। সুতরাং আমারও বিশ্বাসপাত্র। আপনারই নাম মহম্মদ আলি? এক্ষণে সেনাপতির অভিপ্রায় প্রকাশ করুন।"

যবন সংস্কৃতে উত্তর দিলেন, কিন্তু তাঁহার সংস্কৃতের তিন ভাগ ফারসী, আর অবশিষ্ট চতুর্থ ভাগ যেরূপ সংস্কৃত, তাহা ভারতবর্ষে কখনও ব্যবহৃত হয় নাই। তাহা মহম্মদ আলিরই সৃষ্ট সংস্কৃত। পশুপতি বহুকষ্টে তাহার অর্থবোধ করিলেন। পাঠক মহাশয়ের সে কষ্টভোগের প্রয়োজন নাই। আমরা তাঁহার সুবোধার্থ সে নূতন সংস্কৃত অনুবাদ করিয়া দিতেছি।

যবন কহিল, "খিলিজি সাহেবের অভিপ্রায় আপনি অবগত আছেন। বিনা যুদ্ধে গৌড়বিজয় করিবেন, তাঁহার ইচ্ছা হইয়াছে। কি হইলে আপনি এ রাজ্য তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিবেন?"

পশুপতি কহিলেন, "আমি এ রাজ্য তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিব কি না, তাহা অনিশ্চিত। স্বদেশ-বৈরিতা মহাপাপ। আমি এ কর্ম্ম কেন করিব?"

ম। উত্তম। আমি চলিলাম। কিন্তু আপনি তবে কেন খিলিজির নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন?

প। তাঁহার যুদ্ধের সাধ কত দূর পর্য্যন্ত, তাহা জানিবার জন্য।

ম। তাহা আমি আপনাকে জানাইয়া যাই। যুদ্ধেই তাঁহার আনন্দ।

প। মনুষ্যযুদ্ধে পশুযুদ্ধে চ? হস্তিযুদ্ধে কেমন আনন্দ?

মহম্মদ আলি সকোপে কহিলেন, "গৌড়ে যুদ্ধের অভিপ্রায়ে আসা পশুযুদ্ধেই আসা। বুঝিলাম, ব্যঙ্গ করিবার জন্যই আপনি সেনাপতিকে লোক পাঠাইতে বলিয়াছিলেন। আমরা যুদ্ধ জানি, ব্যঙ্গ জানি না। যাহা জানি, তাহা করিব

এই বলিয়া মহম্মদ আলি গমনোদ্যোগী হইল। পশুপতি কহিলেন,—

"ক্ষণেক অপেক্ষা করুন। আর কিছু শুনিয়া যান। আমি যবনহস্তে এ রাজ্য সমর্পণ করিতে অসম্মত নহি—অক্ষমও নহি। আমিই গৌড়ের রাজা, সেনরাজা নামমাত্র। কিন্তু সমুচিত মূল্য না পাইলে আপন রাজ্য কেন আপনাদিগকে দিব?"

মহম্মদ আলি কহিলেন, "আপনি কি চাহেন?"

প। খিলিজি কি দিবেন?

ম। আপনার যাহা আছে, তাহা সকলই থাকিবে—আপনার জীবন, ঐশ্বর্য্য, পদ, সকলই থাকিবে। এই মাত্র।

প। তবে আমি পাইলাম কি? এ সকলই ত আমার কাছে—কি লোভে আমি এ গুরুতর পাপানুষ্ঠান করিব?

ম। আমাদের আনুকূল্য না করিলে কিছুই থাকিবে না; যুদ্ধ করিলে, আপনার ঐশ্বর্য্য, পদ, জীবন পর্য্যন্ত অপহৃত হইবে।

প। তাহা যুদ্ধ শেষ না হইলে বলা যায় না। আমরা যুদ্ধ করিতে একেবারে অনিচ্ছুক বিবেচনা করিবেন না, বিশেষ, মগধে বিদ্রোহের উদ্যোগ হইতেছে, তাহাও অবগত আছি। তাহার নিবারণ জন্য এক্ষণে খিলিজি ব্যস্ত। গৌড়জয়-চেষ্টা আপাততঃ কিছু দিন তাঁহাকে ত্যাগ করিতে হইবে, তাহাও অবগত আছি। আমার প্রার্থিত পুরস্কার না দেন না দিবেন, কিন্তু যুদ্ধ করাই যদি স্থির হয়, তবে আমাদিগের এই উত্তম সময়। যখন বিহারে বিদ্রোহী সেনা সজ্জিত হইবে, তখন গৌড়েশ্বরের সেনাও সাজিবে।

ম। ক্ষতি কি? পিপড়ের কামড়ের উপর মশা কামড়াইলে হাতী মরে না। কিন্তু আপনার প্রার্থিত পুরস্কার কি, তাহা শুনিয়া যাইতে বাসনা করি।

প। শুনুন। আমিই এক্ষণে প্রকৃত গৌড়ের ঈশ্বর, কিন্তু লোকে আমাকে গৌড়েশ্বর বলে না। আমি স্বনামে রাজা হইতে বাসনা করি। সেনবংশ লোপ হইয়া পশুপতি গৌড়াধিপতি হউক।

ম। তাহাতে আমাদিগের কি উপকার করিলেন? আমাদিগকে কি দিবেন?

প। রাজকর মাত্র।' মুসলমানের অধীনে করপ্রদ মাত্র রাজা হইব।

ম। ভাল, আপনি যদি প্রকৃত গৌড়েশ্বর, রাজা যদি আপনার এরূপ করতলস্থ, তবে আমাদিগের সহিত আপনার কথাবার্ত্তার আবশ্যক কি? আমাদিগের সাহায্যের প্রয়োজন কি? আমাদিগকে কর দিবেন কেন?

প। তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিব। ইহাতে কপটতা করিব না। প্রথমতঃ, সেনরাজ আমার প্রভু, বয়সে বৃদ্ধ, আমাকে স্নেহ করেন। স্ববলে যদি আমি তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করি—তবে অত্যন্ত লোকনিন্দা। আপনারা কিছুমাত্র যুদ্ধোদ্যম দেখাইয়া, আমার আনুকূল্যে বিনা যুদ্ধে রাজধানী প্রবেশ পূর্ব্বক তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া, আমাকে তদুপরি স্থাপিত করিলে, সে নিন্দা হইবে না। দ্বিতীয়তঃ, রাজ্য অনধিকারীর অধিকারগত হইলেই বিদ্রোহের সম্ভাবনা, আপনাদিগের সাহায্যে সে বিদ্রোহ সহজেই নিবারণ করিতে পারিব। তৃতীয়তঃ, আমি স্বয়ং রাজা হইলে, এক্ষণে সেনরাজার সহিত আপনাদিগের যে সম্বন্ধ, আমার সঙ্গেও সেই সম্বন্ধ থাকিবে। আপনাদিগের সহিত যুদ্ধের সম্ভাবনা থাকিলে, যুদ্ধে আমি প্রস্তুত আছি—কিন্তু জয়-পরাজয় উভয়েরই সম্ভাবনা। জয় হইলে আমার নূতন কিছু লাভ হইবে না। কিন্তু পরাজয়ে সর্ব্বস্বহানি। কিন্তু আপনাদিগের সহিত সন্ধি করিয়া রাজ্যগ্রহণ করিলে সে আশঙ্কা থাকিবে না। বিশেষতঃ, সর্ব্বদা যুদ্ধোদ্যত থাকিতে হইলে নূতন রাজ্য সুশাসিত হয় না।

ম। আপনি রাজনীতিজ্ঞের ন্যায় বিবেচনা করিয়াছেন। আপনার কথায় আমার সম্পূর্ণ প্রত্যয় জন্মিল। আমিও এইরূপ স্পষ্ট করিয়া খিলিজি সাহেবের অভিপ্রায় ব্যক্ত করি। তিনি এক্ষণে অনেক চিন্তায় ব্যস্ত আছেন যথার্থ, কিন্তু হিন্দুস্থানে যবনরাজা একেশ্বর হইবেন, অন্য রাজার নামমাত্র আমরা রাখিব না। কিন্তু আপনাকে গৌড়ে শাসনকর্ত্তা করিব। যেমন দিল্লীতে মহম্মদ ঘোরির প্রতিনিধি কুতুবউদ্দীন, যেমন পূর্ব্বদেশে কুতুবউদ্দীনের প্রতিনিধি বখ্‌তিয়ার খিলিজি, তেমনি গৌড়ে আপনি বখ্‌তিয়ারের প্রতিনিধি হইবেন। আপনি ইহাতে স্বীকৃত আছেন কি না?

পশুপতি কহিলেন, "আমি ইহাতে সম্মত হইলাম।"

ম। ভাল; কিন্তু আমার আর এক কথা জিজ্ঞাস্য আছে। আপনি যাহা অঙ্গীকার করিতেছেন, তাহা সাধন করিতে আপনার ক্ষমতা কি?

প। আমার অনুমতি ব্যতীত একটি পদাতিকও যুদ্ধ করিবে না। রাজকোষ আমার অনুচরের হস্তে। আমার আদেশ ব্যতীত যুদ্ধের উদ্যোগে একটি কড়াও খরচ হইবে না। পাঁচ জন অনুচর লইয়া খিলিজিকে রাজপুর প্রবেশ করিতে বলিও, কেহ জিজ্ঞাসা করিবে না, 'কে তোমরা?'

ম। আরও এক কথা বাকি আছে। এই দেশে যবনের পরম শত্রু হেমচন্দ্র বাস করিতেছে। আজ রাত্রেই উহার মুণ্ড যবনশিবিরে প্রেরণ করিতে হইবে।

প। আপনারা আসিয়াই তাহা ছেদন করিবেন—আমি শরণাগতহত্যা-পাপ কেন স্বীকার করিব?

ম। আমাদিগের হইতে হইবে না। যবন-সমাগম শুনিবামাত্র সে ব্যক্তি নগর ত্যাগ করিয়া পলাইবে। আজি সে নিশ্চিন্ত আছে। আজি লোক পাঠাইয়া তাহাকে বধ করুন।

প। ভাল, ইহাও স্বীকার করিলাম।

ম। আমরা সন্তুষ্ট হইলাম। আমি আপনার উত্তর লইয়া চলিলাম।

প। যে আজ্ঞে। আর একটা কথা জিজ্ঞাস্য আছে।

ম। কি, আজ্ঞা করুন।

প। আমি ত রাজ্য আপনাদিগের হাতে দিব। পরে যদি আপনারা আমাকে বহিষ্কৃত করেন?

ম। আমরা আপনার কথায় নির্ভর করিয়া অল্পমাত্র সেনা লইয়া দূত-পরিচয়ে পুরপ্রবেশ করিব। তাহাতে যদি আমরা স্বীকার মত কার্য্য না করি, আপনি সহজেই আমাদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া দিবেন।

প। আর যদি আপনারা অল্প সেনা লইয়া না আইসেন?

ম। "তবে যুদ্ধ করিবেন।" এই বলিয়া মহম্মদ আলি বিদায় হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

চৌরোদ্ধরণিক

মহম্মদ আলি বাহির হইয়া দৃষ্টিপথাতীত হইলে, অন্য এক জন গুপ্তদ্বার-নিকটে আসিয়া মৃদুস্বরে কহিল, "প্রবেশ করিব?"

পশুপতি কহিলেন, "কর!"

এক জন চৌরোদ্ধরণিক প্রবেশ করিল। সে প্রণত হইলে পশুপতি আশীর্ব্বাদ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন শান্তশীল! মঙ্গল সংবাদ ত?"

চৌরোদ্ধরণিক কহিল, "আপনি একে একে প্রশ্ন করুন—আমি ক্রমে ক্রমে সকল সংবাদ নিবেদন করিতেছি।"

পশু। যবনদিগের অবস্থিতিস্থানে গিয়াছিলে?

শান্ত। সেখানে কেহ যাইতে পারে না।

পশু। কেন?

শান্ত। অতি নিবিড় বন, দুর্ভেদ্য।

পশু। কুঠার হস্তে বৃক্ষচ্ছেদন করিতে করিতে গেলে না কেন?

শান্ত। ব্যাঘ্র-ভল্লুকের দৌরাত্ম্য।

পশু। সশস্ত্রে গেলে না কেন?

শান্ত। যে সকল কাঠুরিয়ারা ব্যাঘ্র-ভল্লুক বধ করিয়া বনমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহারা সকলেই যবন-হস্তে প্রাণত্যাগ করিয়াছে—কেহই ফিরিয়া আইসে নাই।

পশু। তুমিও না হয় না আসিতে?

শান্ত। তাহা হইলে কে আসিয়া আপনাকে সংবাদ দিত?

পশুপতি হাসিয়া কহিলেন, "তুমিই আসিতে।"

শান্তশীল প্রণাম করিয়া কহিল, "আমিই সংবাদ দিতে আসিয়াছি।"

পশুপতি আনন্দিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি প্রকারে গেলে?"

শান্ত। প্রথমে উষ্ণীষ, অস্ত্র ও তুরকী-বেশ সংগ্রহ করিলাম। তাহা বাঁধিয়া পৃষ্ঠে সংস্থাপিত করিলাম। তার পর কাঠুরিয়াদিগের সঙ্গে বনমধ্যে প্রবেশ করিলাম। পথে যখন যবনেরা কাঠুরিয়াদিগকে দেখিতে পাইয়া তাহাদিগকে মারিতে প্রবৃত্ত হইল—তখন আমি অপসৃত হইয়া বৃক্ষান্তরালে বেশ পরিবর্ত্তন করিলাম। পরে মুসলমান হইয়া যবনশিবিরের সর্ব্বত্র বেড়াইলাম।

পশু। প্রশংসনীয় বটে। যবন-সৈন্য কত দেখিলে?

শান্ত। সে বৃহৎ অরণ্যে যত ধরে। বোধ হয়, পঁচিশ হাজার হইবে।

পশুপতি ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। পরে কহিলেন, "তাহাদিগের কথাবার্ত্তা কি শুনিলে?"

শান্ত। বিস্তর শুনিলাম—কিন্তু তাহার কিছুই আপনার নিকট নবেদন করিতে পারিলাম না।

পশু। কেন?

শান্ত। যাবনিক ভাষায় পণ্ডিত নহি।

পশুপতি হাস্য করিলেন। শান্তশীল তখন কহিলেন, "মহম্মদ আলি যে এখানে আসিয়াছিলেন, তাহাতে বিপদ্ আশঙ্কা করিতেছি।"

পশুপতি চমকিত হইয়া বলিলেন, "কেন?"

শান্ত। তিনি অলক্ষিত হইয়া আসিতে পারেন নাই। তাঁহার আগমন কেহ কেহ জানিতে পারিয়াছে।

পশুপতি অত্যন্ত শঙ্কান্বিত হইয়া কহিলেন, "কিসে জানিলে?"

শান্তশীল কহিলেন, "আমি শ্রীচরণদর্শনে আসিবার সময় দেখিলাম যে, বৃক্ষতলে এক ব্যক্তি লুক্কায়িত হইল। তাহার যুদ্ধের সাজ। তাহার সঙ্গে কথোপকথনে বুঝিলাম যে, সে মহম্মদ আলিকে এ পুরীতে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তাহার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে। অন্ধকারে তাহাকে চিনিতে পারিলাম না।"

পশু। তার পর?

শান্ত। তার পর দাস তাহাকে চিত্রগৃহে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়া আসিয়াছে।

পশুপতি চৌরোদ্ধরণিককে সাধুবাদ করিতে লাগিলেন এবং কহিলেন, "কাল প্রাতে উঠিয়া সে ব্যক্তির প্রতি বিহিত করা যাইবে। আজি রাত্রিতে সে কারারুদ্ধই থাক। এক্ষণে তোমাকে অন্য এক কার্য্যসাধন করিতে হইবে; যবনসেনাপতির ইচ্ছা, অদ্য রাত্রিতে তিনি মগধরাজপুত্রের ছিন্নমস্তক দর্শন করেন। তাহা এখনই সংগ্রহ করিবে।"

শান্ত। কার্য্য নিতান্ত সহজ নহে। রাজপুত্র পিঁপড়ে-মাছি নন।

পশু। আমি তোমাকে একা যুদ্ধে যাইতে বলিতেছি না। কতকগুলি লোক লইয়া তাঁহার বাড়ী আক্রমণ করিবে।

শান্ত। লোকে কি বলিবে?

পশু। লোকে বলিবে, দস্যুতে তাঁহাকে মারিয়া গিয়াছে।

শান্ত। যে আজ্ঞা, আমি চলিলাম।

পশুপতি শান্তশীলকে পুরস্কার দিয়া বিদায় করিলেন। পরে গৃহাভ্যন্তরে যথা বিচিত্র সূক্ষ্ম কারুকার্য্যখচিত মন্দিরে অষ্টভুজামূর্ত্তি স্থাপিত আছে, তথায় গমন করিয়া প্রতিমাগ্রে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। গাত্রোত্থান করিয়া যুক্তকরে ভক্তিভরে ইষ্টদেবীর স্তুতি করিয়া কহিলেন, "জননি! বিশ্বপালিনি! আমি অকূল সাগরে ঝাঁপ দিলাম—দেখিও মা! আমায় উদ্ধার করিও। আমি জননীস্বরূপা জন্মভূমি কখন দেবদ্বেষী যবনকে বিক্রয় করিব না। কেবলমাত্র এই আমার পাপাভিসন্ধি যে, অক্ষম প্রাচীন রাজার স্থানে আমি রাজা হইব। যেমন কণ্টক দ্বারা কণ্টক উদ্ধার করিয়া পরে উভয় কণ্টককে দূরে ফেলিয়া দেয়, তেমনই যবন-সহায়তায় রাজ্যলাভ করিয়া রাজ্যসহায়তায় যবনকে নিপাত করিব। ইহাতে পাপ ক মা? যদি ইহাতে পাপ হয়, যাবজ্জীবন প্রজার সুখানুষ্ঠান করিয়া সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব। জগৎপ্রসবিনি! প্রসন্ন হইয়া আমার কামনা সিদ্ধ কর।"

এই বলিয়া পশুপতি পুনরপি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। প্রণাম করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন—শয্যাগৃহে যাইবার জন্য ফিরিয়া দেখিলেন—অপূর্ব্বদর্শন—সম্মুখে দ্বারদেশ ব্যাপ্ত করিয়া জীবনময়ী প্রতিমারূপিণী তরুণী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

পশুপতি প্রথমে চমকিত হইলেন—শিহরিয়া উঠিলেন। পরক্ষণেই উচ্ছ্বাসোন্মুখ সমুদ্রবারিবৎ আনন্দে স্ফীত হইলেন।

তরুণী বীণানিন্দিত স্বরে কহিলেন, "পশুপতি!"
পশুপতি দেখিলেন—"মনোরমা!"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মোহিনী

সেই রত্নপ্রদীপদীপ্ত দেবীমন্দিরে, চন্দ্রালোকবিভাসিত দ্বারদেশে, মনোরমাকে দেখিয়া পশুপতির হৃদয় উচ্ছ্বাসোন্মুখ সমুদ্রের ন্যায় স্ফীত হইয়া উঠিল। মনোরমা নিতান্ত খর্ব্বাকৃতি নহে, তবে তাঁহাকে বালিকা বলিয়া বোধ হইত; তাহার হেতু এই যে, মুখকান্তি অনির্ব্বচনীয় কোমল, অনির্ব্বচনীয় মধুর, নিতান্ত বালিকাবয়সের ঔদার্য্যবিশিষ্ট; সুতরাং হেমচন্দ্র যে তাঁহার পঞ্চদশ বৎসর বয়ঃক্রম অনুভব করিয়াছিলেন, তাহা অন্যায় হয় নাই। মনোরমার বয়ঃক্রম যথার্থ পঞ্চদশ, কি ষোড়শ, কি তদধিক, কি তরুন, তাহা ইতিহাস লেখে না, পাঠক মহাশয় স্বয়ং সিদ্ধান্ত করিবেন।

মনোরমার বয়স যতই হউক না কেন, তাঁহার রূপরাশি অতুল—চক্ষুতে ধরে না। বাল্যে, কৈশোরে, যৌবনে, সর্ব্বকালে সে রূপরাশি দুর্লভ। একে বর্ণ সোনার চাঁপা, তাহাতে ভুজঙ্গশিশুশ্রেণীর ন্যায় কুঞ্চিত অলকশ্রেণী মুখখানি বেড়িয়া থাকে; এক্ষণে বাপীজলসিঞ্চনে সে কেশ ঋজু হইয়াছে; অর্দ্ধচন্দ্রাকৃত নির্ম্মল ললাট; ভ্রমর-ভর-স্পন্দিত নীলপুষ্পতুল্য কৃষ্ণতার চঞ্চল লোচনযুগল; মুহুর্ম্মুহুঃ আকুঞ্চন-বিস্ফারণ-প্রবৃত্ত রন্ধ্রযুক্ত সুগঠন নাসা; অধরোষ্ঠ যেন প্রাতঃশিশিরে সিক্ত, প্রাতঃসূর্য্যের কিরণে প্রোদ্ভিন্ন রক্তকুসুমাবলীর স্তরযুগল তুল্য; কপোল যেন চন্দ্রকরোজ্জ্বল নিতান্ত স্থির গঙ্গাম্বুবিস্তারবৎ প্রসন্ন, শাবকহিংসাশঙ্কায় উত্তেজিতা হংসীর ন্যায় গ্রীবা,—বেণী বাঁধিলেও সে গ্রীবার উপরে অবদ্ধ ক্ষুদ্র কুঞ্চিত কেশ সকল আসিয়া কেলি করে। দ্বিরদরদ যদি কুসুমকোমল হইত, কিংবা চম্পক যদি গঠনোপযোগী কাঠিন্য পাইত, কিংবা চন্দ্রকিরণ যদি শরীরবিশিষ্ট হইত, তবে তাহাতে সে বাহুযুগল গড়িতে পারা যাইত—সে হৃদয় কেবল সেই হৃদয়েই গড়া যাইতে পারিত—এ সকলই অন্য সুন্দরীর আছে। মনোরমার রূপরাশি অতুল—কেবল তাঁহার সর্ব্বাঙ্গীণ সৌকুমার্য্যের জন্য। তাঁহার বদন সুকুমার; অধর, ভ্রূযুগল, ললাট সুকুমার; সুকুমার কপোল; সুকুমার কেশ। অলকাবলী যে ভুজঙ্গশিশুরূপী, সেও সুকুমার ভুজঙ্গ-শিশু। গ্রীবায় গ্রীবাভঙ্গীতে সৌকুমার্য্য; বাহুতে বাহুর প্রক্ষেপে সৌকুমার্য্য; হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে সেই সৌকুমার্য্য; সুকুমার চরণ, চরণবিন্যাস সুকুমার। গমন সুকুমার, বসন্ত-বায়ু সঞ্চালিত, কুসুমিত লতার মন্দান্দোলন তুল্য; বচন সুকুমার, নিশীথসময়ে জলরাশিপার হইতে সমাগত বিরহসঙ্গীত তুল্য; কটাক্ষ সুকুমার ক্ষণমাত্র জন্য মেঘমালামুক্ত সুধাংশুর কিরণসম্পাত তুল্য; আর ঐ যে মনোরমা দেবী গৃহদ্বারদেশে দাঁড়াইয়া আছেন,—পশুপতির মুখাবলোকন জন্য উন্নতমুখী, নয়নতারা ঊর্দ্ধস্থাপনস্পন্দিত, আর বাপীজলার্দ্র অবদ্ধ কেশরাশির কিয়দংশ এক হস্তে ধরিয়া, এক চরণ ঈষন্মাত্র অগ্রবর্ত্তী করিয়া, যে ভঙ্গীতে মনোরমা দাঁড়াইয়া আছে, ও ভঙ্গীও সুকুমার নবীন সূর্য্যোদয়ে সদ্যঃপ্রফুল্ল-দলমালাময়ী নলিনীর প্রসন্ন ব্রীড়াতুল্য সুকুমার। সেই মাধুর্য্যময় দেহের উপর বেদীপার্শ্বস্থিত রত্নদীপের আলোক

পতিত হইল। পশুপতি অতৃপ্তনয়নে দেখিতে লাগিলেন।

—

নবম পরিচ্ছেদ

মোহিতা

পশুপতি অতৃপ্তনয়নে দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে মনোরমার সৌন্দর্য্য-সাগরের এক অপূর্ব্ব মহিমা দেখিতে পাইলেন। যেমন সূর্য্যের প্রখর করমালায় হাস্যময় অম্বুরাশি মেঘসঞ্চারে ক্রমে ক্রমে গম্ভীর কৃষ্ণকান্তি প্রাপ্ত হয়, তেমনই পশুপতি দেখিতে দেখিতে মনোরমার সৌকুমার্য্যময় মুখমণ্ডল গম্ভীর হইতে লাগিল; আর সে বালিকাসুলভ ঔদার্য্যব্যঞ্জক ভাব রহিল না। অপূর্ব্ব তেজোভিব্যক্তির সহিত প্রগল্‌ভ বয়সেরও দুর্ল্লভ গাম্ভীর্য্য তাহাতে বিরাজ করিতে লাগিল। সরলতাকে ঢাকিয়া প্রতিভা উদিত হইল। পশুপতি কহিলেন, 'মনোরমা, এত রাত্রিতে কেন আসিয়াছ? এ ক? আজি তোমার এ ভাব কেন?"

মনোরমা উত্তর করিলেন, "আমার কি ভাব দেখিলে?"

প। তোমার দুই মূর্ত্তি—এক মূর্ত্তি আনন্দময়ী সরলা বালিকা—সে মূর্ত্তিতে কেন আসিলে না?—সেই রূপে আমার হৃদয় শীতল হয়। আর তোমার এই মূর্ত্তি গম্ভীর তেজস্বিনী, প্রতিভাময়ী, প্রখর-বুদ্ধিশালিনী, এ মূর্ত্তি দেখিলে আমি ভীত হই। তখন বুঝিতে পারি যে, তুমি কোন দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছ। আজ তুমি এ মূর্ত্তিতে আমাকে ভয় দেখাইতে কেন আসিয়াছ?

ম। পশুপতি, তুমি এত রাত্রি জাগরণ করিয়া কি করিতেছ?

প। আমি রাজকার্য্যে ব্যস্ত ছিলাম—কিন্তু তুমি—

ম। পশুপতি আবার? রাজকার্য্যে না নিজকার্য্যে?

প। নিজকার্য্যেই বল। রাজকার্য্যেই হউক, আর নিজকার্য্যেই হউক, আমি কবে না ব্যস্ত থাকি? তুমি আজি জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন?

ম। আমি সকল শুনিয়াছি।

প। কি শুনিয়াছ?

ম। যবনের সঙ্গে পশুপতির মন্ত্রণা—শান্তশীলের সঙ্গে মন্ত্রণা—দ্বারের পার্শ্বে থাকিয়া সকল শুনিয়াছি।

পশুপতির মুখমণ্ডল যেন মেঘান্ধকারে ব্যাপ্ত হইল। তিনি অনেকক্ষণ চিন্তামগ্ন থাকিয়া কহিলেন,—"ভালই হইয়াছে। সকল কথাই আমি তোমাকে বলিতাম—না হয় তুমি আগে শুনিয়াছ, তুমি কোন্ কথা না জান?"

ম। পশুপতি, তুমি আমাকে ত্যাগ করিলে?

প। কেন, মনোরমা? তোমার জন্য আমি এ মন্ত্রণা করিয়াছি। আমি এক্ষণে রাজভৃত্য, ইচ্ছামত কার্য্য করিতে পারি না। এখন বিধবা-বিবাহ করিলে জনসমাজে পরিত্যক্ত হইব; কিন্তু যখন আমি স্বয়ং রাজা হইব, তখন কে আমায় ত্যাগ করিবে? যেমন বল্লালসেন কৌলীন্যের নূতন পদ্ধতি প্রচলিত করিয়াছিলেন, আমি সেইরূপ বিধবা-পরিণয়ের নূতন পদ্ধতি প্রচলিত করিব।

মনোরমা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "পশুপতি, সে সকল আমার স্বপ্নমাত্র। তুমি রাজা হইলে, আমার সে স্বপ্ন ভঙ্গ হইবে। আমি কখনও তোমার মহিষী হইব না।"

প। কেন মনোরমা?

ম। কেন? তুমি রাজ্যভার গ্রহণ করিলে আর কি আমায় ভালবাসিবে? রাজ্যই তোমার হৃদয়ে প্রধান স্থান পাইবে।—তখন আমার প্রতি তোমার অনাদর হইবে। তুমি যদি ভাল না বাসিবে—তবে আমি কেন তোমার পত্নীত্ব-শৃঙ্খলে বাঁধা পড়িব?

প। এ কথাকে কেন মনে স্থান দিতেছ? আগে তুমি—পরে রাজ্য। আমার চিরকাল এইরূপ থাকিবে।

ম। রাজা হইয়া যদি তাহা কর, রাজ্য অপেক্ষা মহিষী যদি অধিক ভালবাস, তবে তুমি রাজ্য করিতে পারিবে না। তুমি রাজ্যচ্যুত হইবে। স্ত্রৈণ রাজার রাজ্য থাকে না।

পশুপতি প্রশংসমান লোচনে মনোরমার মুখপ্রতি চাহিয়া রহিলেন; কহিলেন, "যাহার বামে এমন সরস্বতী, তাহার আশঙ্কা কি? না হয় তাহাই হউক। তোমার জন্য রাজ্য ত্যাগ করিব।"

ম। তবে রাজ্য গ্রহণ করিতেছ কেন? ত্যাগের জন্য গ্রহণে ফল কি?

প। তোমার পাণিগ্রহণ।

ম। সে আশা ত্যাগ কর। তুমি রাজ্যলাভ করিলে আমি কখনও তোমার পত্নী হইব না।

প। কেন মনোরমা? আমি কি অপরাধ করিলাম?

ম। তুমি বিশ্বাসঘাতক—আমি বিশ্বাসঘাতককে কি প্রকারে ভক্তি করিব? কি প্রকারে বিশ্বাসঘাতককে ভালবাসিব?

প। কেন, আমি কিসে বিশ্বাসঘাতক হইলাম?

ম। তোমার প্রতিপালক প্রভুকে রাজ্যচ্যুত করিবার কল্পনা করিতেছ; শরণাগত রাজপুত্রকে মারিবার কল্পনা করিতেছ; ইহা কি বিশ্বাসঘাতকের কর্ম্ম নয়? যে প্রভুর নিকট বিশ্বাস নষ্ট করিল, সে স্ত্রীর নিকট অবিশ্বাসী না হইবে কেন?

পশুপতি নীরব হইয়া রহিলেন। মনোরমা পুনরপি বলিতে লাগিলেন, "পশুপতি, আমি মিনতি করিতেছি, এই দুর্ব্বুদ্ধি ত্যাগ কর।"

পশুপতি পূর্ব্ববৎ অধোবদনে রহিলেন, তাঁহার রাজ্যাকাঙ্ক্ষা এবং মনোরমাকে লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা উভয়ই গুরুতর। কিন্তু রাজ্যলাভের যত্ন করিলে মনোরমার প্রণয় হারাইতে হয়, সেও অত্যাজ্য। উভয় সঙ্কটে তাঁহার চিত্তমধ্যে গুরুতর চাঞ্চল্য জন্মিল। তাঁহার মতির স্থিরতা দূর হইতে লাগিল। "যদি মনোরমাকে পাই, ভিক্ষাও ভাল, রাজ্যে কাজ কি?" এইরূপ পুনঃপুনঃ মনে ইচ্ছা হইতে লাগিল। কিন্তু তখনই আবার ভাবিতে লাগিলেন, "কিন্তু তাহা হইলে লোকনিন্দা, জনসমাজে কলঙ্ক, জাতিনাশ হইবে; সকলের ঘৃণিত হইব। তাহা কি প্রকারে সহিব?" পশুপতি নীরবে রহিলেন; কোন উত্তর দিতে পারিলেন না।

মনোরমা উত্তর না পাইয়া কহিতে লাগিল, "শুন পশুপতি, তুমি আমার কথার উত্তর দিলে না। আমি চলিলাম কিন্তু এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, বিশ্বাসঘাতকের সঙ্গে ইহজন্মে আমার সাক্ষাৎ হইবে না।"

এই বলিয়া মনোরমা পশ্চাৎ ফিরিল। পশুপতি রোদন করিয়া উঠিলেন।

অমনই মনোরমা আবার ফিরিল। আসিয়া পশুপতির হস্তধারণ করিল। পশুপতি তাহার মুখপানে চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন, তেজোগর্ব্ববিশিষ্টা, কুঞ্চিতভ্রূবীচিবিক্ষেপকারিণী সরস্বতী-মূর্ত্ত আর নাই; সে প্রতিভাদেবী অন্তর্দ্ধান হইয়াছেন; কুসুমসুকুমারী বালিকা তাঁহার হস্তধারণ করিয়া তাঁহার সঙ্গে রোদন করিতেছে।

মনোরমা কহিলেন, "পশুপতি, কাঁদিতেছ কেন?"

পশুপতি চক্ষুর জল মুছিয়া কহিলেন, "তোমার কথায়।"

ম। কেন, আমি কি বলিয়াছি?

প। তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া যাইতেছিলে।

ম। আমি আর এমন করিব না।

প। তুমি আমার রাজমহিষী হইবে?

ম। হইব।

পশুপতির আনন্দসাগর উছলিয়া উঠিল। উভয়ে অশ্রুপূর্ণ-লোচনে উভয়ের মুখ প্রতি চাহিয়া উপবেশন করিয়া রহিলেন। সহসা মনোরমা পক্ষিণীর ন্যায় গাত্রোত্থান করিয়া চলিয়া গেলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

ফাঁদ

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, বাপীতীর হইতে হেমচন্দ্র মনোরমার অনুবর্ত্তী হইয়া যবন-সন্ধানে আসিতেছিলেন। মনোরমা ধর্ম্মাধিকারের গৃহ কিছু দূরে থাকিতে হেমচন্দ্রকে কহিলেন, "সম্মুখে এই অট্টালিকা দেখিতেছ?"

হেম। দেখিতেছি।

মনো। ঐখানে যবন প্রবেশ করিয়াছে।

হেম। কেন?

এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়া মনোরমা কহিলেন, "তুমি এইখানেই গাছের আড়ালে থাক। যবনকে এই স্থান দিয়া যাইতে হইবে।

হে। তুমি কোথায় যাইবে?

মনো। আমিও এই বাড়ীতে যাইব।

হেমচন্দ্র স্বীকৃত হইলেন। মনোরমার আচরণ দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইলেন। তাঁহার পরামর্শানুসারে পথিপার্শ্বে বৃক্ষান্তরালে লুক্কায়িত হইয়া রহিলেন। মনোরমা গুপ্তপথে অলক্ষ্যে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

এই সময়ে শান্তশীল পশুপতির গৃহে আসিতেছিল। সে দেখিল যে, এক ব্যক্তি বৃক্ষান্তরালে লুক্কায়িত হইল। শান্তশীল সন্দেহ প্রযুক্ত সেই বৃক্ষতলে গেল। তথায় হেমচন্দ্রকে দেখিয়া প্রথমে চৌর অনুমানে কহিল, "কে তুমি? এখানে কি করিতেছ?" পরে তৎক্ষণাৎ হেমচন্দ্রের বহুমূল্যের অলঙ্কারশোভিত যোদ্ধবেশ দেখিয়া কহিল, "আপনি কে?"

হেমচন্দ্র কহিলেন, "আমি যে হই না কেন?"

শা। আপনি এখানে কি করিতেছেন?

হে। আমি এখানে যবনানুসন্ধান করিতেছি।

শান্তশীল চমকিত হইয়া কহিল, "যবন কোথায়?"

হে। এই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে।

শান্তশীল ভীত ব্যক্তির ন্যায় স্বরে কহিল, "এ গৃহে কেন?"

হে। তাহা আমি জানি না।

শা। এ গৃহ কাহার?

হে। তাহা জানি না।

শা। তবে আপনি কি প্রকারে জানিলেন যে, এই গৃহে যবন প্রবেশ করিয়াছে?

হে। তা তোমার শুনিয়া কি হইবে?

শা। এই গৃহ আমার। যদি যবন ইহাতে প্রবেশ করিয়া থাকে, তবে কোন অনিষ্ট কামনা করিয়া গিয়াছে, সন্দেহ নাই। আপনি যোদ্ধা এবং যবনদ্বেষী দেখিতেছি। যদি ইচ্ছা থাকে, তবে আমার সঙ্গে আসুন—উভয়ে চোরকে ধৃত করিব।

হেমচন্দ্র সম্মত হইয়া শান্তশীলের সঙ্গে চলিলেন। শান্তশীল সিংহদ্বার দিয়া পশুপতির গৃহে হেমচন্দ্রকে লইয়া প্রবেশ করিলেন এবং এক কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিলেন, "এই গৃহমধ্যে আমার সুবর্ণরত্নাদি সকল আছে, আপনি ইহার প্রহরায় অবস্থিতি করুন। আমি ততক্ষণ সন্ধান করিয়া আসি, কোন্ স্থানে যবন লুক্কায়িত আছে।"

এই কথা বলিয়াই শান্তশীল সেই কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং হেমচন্দ্র কোন উত্তর দিতে না দিতেই বাহির হইতে কক্ষদ্বার রুদ্ধ করিলেন। হেমচন্দ্র ফাঁদে পড়িয়া বন্দী রহিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

মুক্ত

মনোরমা পশুপতির নিকট বিদায় হইয়াই দ্রুতপদে চিত্রগৃহে আসিল। পশুপতির সহিত শান্তশীলের কথোপকথন সময়ে শুনিয়াছিল যে, ঐ ঘরে হেমচন্দ্র রুদ্ধ হইয়াছিলেন। আসিয়াই চিত্রগৃহের দ্বারোন্মোচন করিল। হেমচন্দ্রকে কহিল, "হেমচন্দ্র, গৃহের বাহির হইয়া যাও।"

হেমচন্দ্র গৃহের বাহিরে আসিলেন। মনোরমা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আসিল। তখন হেমচন্দ্র মনোরমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমি রুদ্ধ হইয়াছিলাম কেন?"

ম। তাহা পরে বলিব।

হে। যে ব্যক্তি আমাকে রুদ্ধ করিয়াছিল, সে কে?

ম। শান্তশীল।

হে। শান্তশীল কে?

ম। চৌরোদ্ধরণিক।

হে। এই কি তাহার বাড়ী?

ম। না।

হে। এ কাহার বাড়ী?

ম। পরে বলিব।

হে। যবন কোথায় গেল?

ম। শিবিরে গিয়াছে।

হে। শিবির! কত যবন আসিয়াছে?

ম। পঁচিশ হাজার।

হে। কোথায় তাহাদের শিবির?

ম। মহাবনে।

হে। মহাবন কোথায়?

ম। এই নগরের উত্তরে কিছু দূরে।

হেমচন্দ্র করলগ্নকপোল হইয়া ভাবিতে লাগিলেন।

মনোরমা কহিল, "ভাবিতেছ কেন? তুমি কি তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবে?"

হে। পঁচিশ হাজারের সঙ্গে একের যুদ্ধ সম্ভবে?

ম। তবে কি করিবে—ঘরে ফিরিয়া যাইবে?

হে। এখন ঘরে যাব না।

ম। কোথায় যাইবে?

হে। মহাবনে।

ম। যুদ্ধ করিবে না, তবে মহাবনে যাইবে কেন?

হে। যবনদিগকে দেখিতে।

ম। যুদ্ধ করিবে না, তবে দেখিয়া কি হইবে?

হে। দেখিলে জানিতে পারিব, কি উপায়ে তাহাদিগকে মারিতে পারিব।

মনোরমা চমকিয়া উঠিলেন। কহিলেন, "বিশ হাজার মানুষ মারিবে? কি সর্ব্বনাশ! ছি! ছি!"

হে। মনোরমা, তুমি এ সকল সংবাদ কোথায় পাইলে?

ম। আরও সংবাদ আছে। আজ রাত্রিতে তোমাকে মারিবার জন্য তোমার ঘরে দস্যু আসিবে। আজ ঘরে যাইও না।

এই বলিয়া মনোরমা ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

অতিথি-সৎকার

হেমচন্দ্র গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া, এক সুন্দর অশ্ব সজ্জিত করিয়া তদুপরি আরোহণ করিলেন এবং অশ্বে কশাঘাত করিয়া মহাবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। নগর পার হইলেন ; তৎপরে প্রান্তর। প্রান্তরেরও কিয়দংশ পার হইলেন, এমন সময়ে অকস্মাৎ স্কন্ধদেশে গুরুতর বেদনা পাইলেন। দেখিলেন, স্কন্ধে একটি তীর বিদ্ধ হইয়াছে ; পশ্চাতে অশ্বের পদধ্বনি শ্রুত হইল। ফিরিয়া দেখিলেন, তিন জন অশ্বারোহী আসিতেছে।

হেমচন্দ্র ঘোটকের মুখ ফিরাইয়া, তাহাদিগের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ফিরিবামাত্র দেখিলেন, প্রত্যেক অশ্বারোহী তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া এক এক শরসন্ধান করিল। হেমচন্দ্র বিচিত্র শিক্ষাকৌশলে করস্থ শূলান্দোলন দ্বারা তীরত্রয়ের আঘাত এককালে নিবারণ করিলেন।

অশ্বারোহিগণ পুনর্ব্বার একেবারে শরসংযোগ করিল এবং তাহা নিবারিত হইতে না হইতেই পুনর্ব্বার শরত্রয় ত্যাগ করিল।

এইরূপ অবিরতহস্তে হেমচন্দ্রের উপর বাণক্ষেপ করিতে লাগিল। হেমচন্দ্র তখন বিচিত্র রত্নাদি-মণ্ডিত চর্ম্ম হস্তে লইলেন এবং তৎসঞ্চালন দ্বারা অবলীলাক্রমে সেই শরজালবর্ষণ নিবারণ করিতে লাগিলেন ; কদাচিৎ দুই এক শর অশ্ব-শরীরে বিদ্ধ হইল মাত্র। স্বয়ং অক্ষত রহিলেন।

বিস্মিত হইয়া অশ্বারোহীত্রয় নিরস্ত হইল। পরস্পরে কি পরামর্শ করিতে লাগিল। হেমচন্দ্র সেই অবকাশে এক জনের প্রতি এক শর ত্যাগ করিলেন। সে অব্যর্থ সন্ধান। শর এক জন অশ্বারোহীর ললাটমধ্যে বিদ্ধ হইল। সে অমনি অশ্বপৃষ্ঠচ্যুত হইয়া ধরাতলশায়িত হইল।

তৎক্ষণাৎ অপর দুই জনে অশ্বে কশাঘাত করিয়া, শূলযুগল প্রণত করিয়া হেমচন্দ্রের প্রতি ধাবমান হইল এবং শূলক্ষেপযোগ্য নৈকট্য প্রাপ্ত হইলে শূলক্ষেপ করিল। যদি তাহারা হেমচন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া শূলত্যাগ করিত, তবে হেমচন্দ্রের বিচিত্র শিক্ষায় তাহা নিবারিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু তাহা না করিয়া আক্রমণকারীরা হেমচন্দ্রের অশ্বপ্রতি লক্ষ্য করিয়া, শূলত্যাগ করিয়াছিল। তত দূর অধঃপর্য্যন্ত হস্তসঞ্চালনে হেমচন্দ্রের বিলম্ব হইল। একের শূল নিবারিত হইল, অপরের নিবারিত হইল না। শূল অশ্বের গ্রীবাতলে বিদ্ধ হইল। সেই আঘাতপ্রাপ্তি-মাত্র সেই রমণীয় ঘোটক মুমূর্ষু হইয়া ভূতলে পড়িল।

সুশিক্ষিতের ন্যায় হেমচন্দ্র পতনশীল অশ্ব হইতে লম্ফ দিয়া ভূতলে দাঁড়াইলেন এবং পলকমধ্যে নিজ করস্থ করাল শূল উন্নত করিয়া বলিলেন, "আমার পিতৃদত্ত শূল শত্রুরক্ত পান না করিয়া কখন ফেরে নাই।" তাঁহার এই কথা সমাপ্ত হইতে না হইতে তদগ্রে বিদ্ধ হইয়া দ্বিতীয় অশ্বারোহী ভূতলে পতিত হইল।

ইহা দেখিয়া তৃতীয় অশ্বারোহী অশ্বের মুখ ফিরাইয়া বেগে পলায়ন করিল। সেই শান্তশীল।

হেমচন্দ্র তখন অবকাশ পাইয়া নিজ স্কন্ধবিদ্ধ তীর মোচন করিলেন। তীর কিছু অধিক মাংস ভেদ করিয়াছিল—মোচনমাত্র অতিশয় শোণিত-স্রুতি হইতে লাগিল। হেমচন্দ্র নিজ বস্ত্র দ্বারা তাহার নিবারণের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহা নিষ্ফল হইল। ক্রমে হেমচন্দ্র রক্তক্ষতি হেতু দুর্ব্বল হইতে লাগিলেন। তখন বুঝিলেন যে, যবন-শিবিরে গমনের অদ্য আর কোন সম্ভাবনা নাই। অশ্ব হত হইয়াছে—নিজবল হত হইতেছে। অতএব অপ্রসন্নমনে, ধীরে ধীরে নগরাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

হেমচন্দ্র প্রান্তর পার হইলেন। তখন শরীর নিতান্ত অবশ হইয়া আসিল—শোণিতস্রাবে সর্ব্বাঙ্গ আর্দ্র হইল। গতিশক্তি রহিত হইয়া আসিতে লাগিল। কষ্টে নগরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। আর যাইতে পারেন না। এক কুটীরের নিকট বটবৃক্ষ-তলে উপবেশন করিলেন। তখন রজনী প্রভাত হইয়াছে। রাত্রিজাগরণ—সমস্ত রাত্রির পরিশ্রম—রক্তস্রাবে বলহানি—এই সকল কারণে, হেমচন্দ্রের চক্ষুতে পৃথিবী ঘুরিতে লাগিল। তিনি বৃক্ষমূলে পৃষ্ঠ রক্ষা করিলেন। চক্ষু মুদ্রিত হইল। নিদ্রা প্রবল হইল—চেতনা অপহৃত হইল। নিদ্রাবেশে স্বপ্নে যেন শুনিলেন, কে গাহিতেছে—

"কণ্টকে গঠিল বিধি মৃণাল অধমে।"

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

"উনি তোমার কে ?"

যে কুটীরের নিকটস্থ বৃক্ষতলে বসিয়া হেমচন্দ্র বিশ্রাম করিতেছিলেন, সেই কুটীরমধ্যে এক পাটনী বাস করিত। কুটীর মধ্যে তিনটি ঘর। এক ঘরে পাটনীর পাকাদি সমাপন হইত। অপর ঘরে পাটনীর পত্নী শিশুসন্তানসকল লইয়া শয়ন করিত। তৃতীয় ঘরে পাটনীর যুবতী কন্যা রত্নময়ী আর অপর দুইটি স্ত্রীলোক শয়ন করিয়াছিল। সে দুইটি স্ত্রীলোক পাঠক মহাশয়ের নিকট পরিচিতা; মৃণালিনী আর গিরিজায়া, নবদ্বীপে অন্যত্র আশ্রয় না পাইয়া এই স্থানে আশ্রয় লইয়াছিলেন।

একে একে তিনটি স্ত্রীলোক প্রভাতে জাগরিতা হইল। প্রথমে রত্নময়ী জাগিল। গিরিজায়াকে সম্বোধন করিয়া কহিল,—"সই!"

গি। কি সই ?

র। তুমি কোথায় সই ?

গি। বিছানাসই।

র। উঠ না সই!

গি। না সই।

র। গায়ে জল দিব সই ?

গি। জলসই ?

র। নহিলে ছাড়ি কই।

গি। ছাড়িবে কেন সই ? তুমি আমার প্রাণের সই—তোমার মত আছে কই ? তুমি পারঘাটার রসমই—তোমায় না কইলে আর কারে কই ?

র। কথায় সই তুমি চিরজই; আমি তোমার কাছে বোবা হই, মিলাইতে পারি কই ?

গি। আরও মিল চাই ?

র। তোমার মুখে ছাই, আর মিলে কাজ নাই, আমি কাজে যাই।

এই বলিয়া রত্নময়ী গৃহকর্মে গেল। মৃণালিনী এ পর্য্যন্ত কোন কথা কহেন নাই। এখন গিরিজায়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল,—"ঠাকুরাণী জাগিয়াছ ?"

মৃণালিনী কহিলেন, "জাগিয়াই আছি। জাগিয়াই থাকি।"

গি। কি ভাবিতেছিলে ?

মৃ। যাহা ভাবি।

গিরিজায়া তখন গম্ভীরভাবে কহিল, "কি করিব ? আমার দোষ নাই। আমি শুনিয়াছি, তিনি এই নগরমধ্যে আছেন, এ পর্য্যন্ত সন্ধান পাই নাই। কিন্তু আমরা ত সবে দুই তিন দিন আসিয়াছি। শীঘ্র সন্ধান করিব।"

মৃ। গিরিজায়া, যদি এ নগরে সন্ধান না পাই, তবে যে এই পাটনীর গৃহে মৃত্যু পর্য্যন্ত বাস করিতে হইবে। আমার যে যাইবার স্থান নাই।

মৃণালিনী উপাধানে মুখ লুকাইলেন। গিরিজায়ারও গণ্ডে নীরবস্রুত অশ্রু বহিতে লাগিল।

এমন সময়ে রত্নময়ী শশব্যস্তে গৃহমধ্যে আসিয়া কহিল, "সই! সই! দেখিয়া যাও। আমাদের বটতলায় কে ঘুমাইতেছে। আশ্চর্য্য পুরুষ।"

গিরিজায়া কুটীরদ্বারে দেখিতে আসিল। মৃণালিনীও কুটীরদ্বার পর্য্যন্ত আসিয়া দেখিলেন। উভয়েই দৃষ্টিমাত্র চিনিল।

সাগর একেবারে উছলিয়া উঠিল। মৃণালিনী গিরিজায়াকে আলিঙ্গন করিলেন। গিরিজায়া গায়িল,—

"কণ্টকে গঠিল বিধি মৃণাল অধমে।"

সেই ধ্বনি স্বপ্নবৎ হেমচন্দ্রের কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল। মৃণালিনী গিরিজায়ার কণ্ঠকণ্ডুয়ন দেখিয়া কহিলেন,—"চুপ, রাক্ষসি, আমাদিগের দেখা দেওয়া হইবে না, ঐ উনি জাগরিত হইতেছেন, এই অন্তরাল হইতে দেখ, উনি কি করেন। উনি যেখানে যান, অদৃশ্যভাবে দূরে থাকিয়া উঁহার সঙ্গে যাও।—এ কি! উঁহার অঙ্গ রক্তময় দেখিতেছি কেন ? চল, তবে আমিও সঙ্গে চলিলাম।"

হেমচন্দ্রের ঘুম ভাঙ্গিয়াছিল। প্রাতঃকাল উপস্থিত দেখিয়া তিনি শূলদণ্ডে ভর করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন এবং ধীরে ধীরে গৃহাভিমুখে চলিলেন।

হেমচন্দ্র কিয়দ্দূর গেলে, মৃণালিনী আর গিরিজায়া তাঁহার অনুসরণার্থ গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্তা

হইলেন। তখন রত্নময়ী জিজ্ঞাসা করিল,—"ঠাকুরাণি, উনি তোমার কে?"

মৃণালিনী কহিলেন, "দেবতা জানেন।"

——

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রতিজ্ঞা—পর্ব্বতো বহ্নিমান্

বিশ্রাম করিয়া হেমচন্দ্র কিঞ্চিৎ সবল হইয়াছিলেন; শোণিতস্রাবও কতক মন্দীভূত হইয়াছিল। শূলে ভর করিয়া হেমচন্দ্র স্বচ্ছন্দে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

গৃহে আসিয়া দেখিলেন, মনোরমা দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া আছেন

মৃণালিনী ও গিরিজায়া অন্তরালে থাকিয়া মনোরমাকে দেখিলেন।

মনোরমা চিত্রার্পিত পুত্তলিকার ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। দেখিয়া মৃণালিনী মনে মনে ভাবিলেন, "আমার প্রভু যদি রূপে বশীভূত হয়েন, তবে আমার সুখের নিশি প্রভাত হইয়াছে।" গিরিজায়া ভাবিল, "রাজপুত্র যদি রূপে মুগ্ধ হয়েন, তবে আমার ঠাকুরাণীর কপাল ভাঙ্গিয়াছে।"

হেমচন্দ্র মনোরমার নিকট আসিয়া কহিলেন, "মনোরমা—এমন করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছ কেন?"

মনোরমা কোন কথা কহিলেন না। হেমচন্দ্র পুনরপি ডাকিলেন,—"মনোরমা!"

তথাপি উত্তর নাই। হেমচন্দ্র দেখিলেন, আকাশমার্গে তাঁহার স্থিরদৃষ্টি স্থাপিত হইয়াছে।

হেমচন্দ্র পুনরপি বলিলেন, "মনোরমা, কি হইয়াছে?"

তখন মনোরমা ধীরে ধীরে আকাশ হইতে চক্ষু ফিরাইয়া হেমচন্দ্রের মুখমণ্ডলে স্থাপিত করিল এবং কিয়ৎকাল অনিমেষলোচনে তৎপ্রতি চাহিয়া রহিল; পরে হেমচন্দ্রের রুধিরাক্ত পরিচ্ছদে দৃষ্টিপাত হইল। তখন মনোরমা বিস্মিত হইয়া কহিল,—"এ কি হেমচন্দ্র! রক্ত কেন? তোমার মুখ শুষ্ক; তুমি কি আহত হইয়াছ?"

হেমচন্দ্র অঙ্গুলি দ্বারা স্কন্ধের ক্ষত দেখাইয়া দিলেন।

মনোরমা তখন হেমচন্দ্রের হস্ত ধারণ করিয়া গৃহমধ্যে পালঙ্কোপরি লইয়া গেল এবং পলকমধ্যে বারিপূর্ণ ভৃঙ্গার আনীত করিয়া, একে একে হেমচন্দ্রের গাত্রবসন পরিত্যাক্ত করাইয়া অঙ্গের রুধির সকল ধৌত করিল এবং গোজাতি-প্রলোভন নবদূর্ব্বাদল ভূমি হইতে ছিন্ন করিয়া আপন কুন্দ-নিন্দিত দন্তে চর্ব্বিত করিল। পরে তাহা ক্ষতমুখে প্রয়োগ করিয়া উপবীতাকারে বস্ত্র দ্বারা বাঁধিল। তখন কহিল,—"হেমচন্দ্র! আর কি করিব? তুমি সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়াছ, নিদ্রা যাইবে?"

হেমচন্দ্র কহিলেন, "নিদ্রাভাবে নিতান্ত কাতর হইতেছি।"

মৃণালিনী মনোরমার কার্য্য দেখিয়া চিন্তিতান্তঃ-করণে গিরিজায়াকে কহিলেন, "এ কে গিরিজায়া?"

গি। নাম শুনিলাম মনোরমা।

মৃ। এ কি হেমচন্দ্রের মনোরমা?

গি। তুমি কি বিবেচনা করিতেছ?

মৃ। আমি ভাবিতেছি, মনোরমাই ভাগ্যবতী। আমি হেমচন্দ্রের সেবা করিতে পারিলাম না, সে করিল। যে কার্য্যের জন্য আমার অন্তঃকরণ দগ্ধ হইতেছিল—মনোরমা সে কার্য্য সম্পন্ন করিল—দেবতারা উহাকে আয়ুষ্মতী করুন। গিরিজায়া, আমি গৃহে চলিলাম, আমার আর থাকা উচিত নহে। তুমি এই পল্লীতে থাক, হেমচন্দ্র কেমন থাকেন, সংবাদ লইয়া যাইও। মনোরমা যেই হউক, হেমচন্দ্র আমারই—

——

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হেতু—ধূমাৎ

মনোরমা এবং হেমচন্দ্র গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে, মৃণালিনীকে বিদায় দিয়া গিরিজায়া উপবন-গৃহ প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। যেখানে যেখানে বাতায়নপথ মুক্ত দেখিলেন, সেইখানে সাবধানে মুখ উন্নত করিয়া গৃহমধ্যে দৃষ্টিপাত করিলেন। এক কক্ষে হেমচন্দ্রকে শয়নাবস্থায় দেখিতে পাইলেন; দেখিলেন, তাঁহার শয্যোপরি মনোরমা বসিয়া আছে। গিরিজায়া সেই বাতায়ন-তলে উপবেশন করিলেন। পূর্ব্বরাত্রে সেই বাতায়নপথে যবন হেমচন্দ্রকে দেখা দিয়াছিল।

বাতায়ন-তলে উপবেশনে গিরিজায়ার অভি-প্রায় এই ছিল যে, হেমচন্দ্র-মনোরমার কি কথোপ-কথন হয়, তাহা বিরলে থাকিয়া শ্রবণ করে। কিন্তু হেমচন্দ্র নিদ্রাগত, কোন কথোপকথনই ত হয় না। একাকী নীরবে সেই বাতায়ন-

তলে বসিয়া গিরিজায়ার বড়ই কষ্ট হইল। কথা কহিতে পায় না, হাসিতে পায় না, ব্যঙ্গ করিতে পায় না, বড়ই কষ্ট—স্ত্রীরসনা কণ্ডুয়িত হইয়া উঠিল। মনে মনে ভাবিতে লাগিল—সেই পাপিষ্ঠ দিগ্বিজয়ই বা কোথায়? তাহাকে পাইলেই ত মুখ খুলিয়া বাঁচি। কিন্তু দিগ্বিজয় গৃহ-মধ্যে প্রভুর কার্য্যে নিযুক্ত ছিল—কাহারও সাক্ষাৎ পাইল না। তখন অন্য পাত্রাভাবে গিরিজায়া আপনার সহিত মনে মনে কথোপকথন আরম্ভ করিল। সে কথোপকথন শুনিতে পাঠক মহাশয়ের কৌতূহল জন্মিয়া থাকিলে, প্রশ্নোত্তরচ্ছলে তাহা জানাইতে পারি। গিরিজায়াই প্রশ্নকর্ত্রী, গিরিজায়াই উত্তরদাত্রী।

প্র। ওগো! তুই বসিয়া কে লো?

উ। গিরিজায়া লো।

প্র। এখানে কেন লো?

উ। মৃণালিনীর জন্যে লো।

প্র। মৃণালিনী তোর কে?

উ। কেউ না।

প্র। তবে তার জন্যে তোর এত মাথাব্যথা কেন?

উ। আমার আর কাজ কি? বেড়াইয়া বেড়াইয়া কি করিব?

প্র। মৃণালিনীর জন্যে এখানে কেন?

উ। এখানে তার একটি শিকলীকাটা পাখী আছে।

প্র। পাখী ধরিয়া নিয়ে যাবি না কি?

উ। শিকলী কেটে থাকে ত ধরিয়া কি করিব? ধরিবই বা কিরূপে?

প্র। তবে বসিয়া কেন?

উ। দেখি, শিকল কেটেছে কি না।

প্র। কেটেছে না কেটেছে, জেনে কি হইবে?

উ। পাখীটির জন্যে মৃণালিনী প্রতি রাত্রে কত লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদে—আজি না জানি কতই কাঁদিবে। যদি ভাল সংবাদ লইয়া যাই, তবে অনেক রক্ষা হইবে।

প্র। আর যদি শিকল কেটে থাকে?

উ। মৃণালিনীকে বলিব যে, পাখী হাতছাড়া হয়েছে—রাধাকৃষ্ণ নাম শুনিবে ত আবার বনের পাখী ধরিয়া আন। পড়া পাখীর আশা ছাড়। পিঞ্জরা খালি রাখিও না।

প্র। মর্ ভিখারীর মেয়ে! তুই আপনার মনের মত কথা বলিলি। মৃণালিনী যদি রাগ করিয়া পিঞ্জরা ভাঙ্গিয়া ফেলে?

উ। ঠিক বলেছিস্ সই। তা সে পারে। বলা হবে না।

প্র। তবে এখানে বসিয়া রৌদ্রে পুড়িয়া মরিস্ কেন?

উ। বড় মাথা ধরিয়াছে, তাই। এই যে মেয়েটা ঘরের ভিতর বসিয়া আছে—এ মেয়েটা বোবা—নইলে এখনও কথা কয় না কেন? মেয়েমানুষের মুখ এখনও বন্ধ?

ক্ষণেক পরে গিরিজায়ার মনস্কামনা সিদ্ধ হইল। হেমচন্দ্রের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তখন মনোরমা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেমন, তোমার ঘুম হয়েছে?"

হে। বেশ ঘুম হয়েছে।

ম। এখন বল, কি প্রকারে আঘাত পাইলে?

তখন হেমচন্দ্র, রাত্রির ঘটনা সংক্ষেপে বিবৃত করিলেন। শুনিয়া মনোরমা চিন্তা করিতে লাগিল।

হেমচন্দ্র কহিলেন, "তোমার জিজ্ঞাস্য শেষ হইল, এখন আমার কথার উত্তর দাও। কালি রাত্রিতে তুমি আমার সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া গেলে যাহা ঘটিয়াছিল, সকল বল।"

মনোরমা মৃদু মৃদু অস্ফুটস্বরে কি বলিল, গিরিজায়া তাহা শুনিতে পাইল না। বুঝিল, চুপি চুপি কি কথা হইল।

গিরিজায়া আর কোন কথা শুনিতে না পাইয়া গাত্রোত্থান করিল; তখন পুনর্ব্বার প্রশ্নোত্তরমালা মনোমধ্যে গ্রথিত হইতে লাগিল।

প্র। কি বুঝিলে?

উ। কয়েকটি লক্ষণ মাত্র।

প্র। কি কি লক্ষণ?

গিরিজায়া অঙ্গুলিতে গণিতে লাগিল, এক—মেয়েটি আশ্চর্য্য সুন্দরী; আগুনের কাছে ঘি কি গাঢ় থাকে? দুই—মনোরমা ত হেমচন্দ্রকে ভালবাসে, নহিলে এত যত্ন করিল কেন? তিন—একত্রে বাস। চারি—একত্রে রাত বেড়ান। পাঁচ—চুপি চুপি কথা।

প্র। মনোরমা ভালবাসে; হেমচন্দ্রের কি?

উ। বাতাস না থাকিলে কি জলে ঢেউ হয়? আমাকে যদি কেহ ভালবাসে, আমি তাহাকে ভালবাসিব সন্দেহ নাই।

প্র। কিন্তু মৃণালিনীও ত হেমচন্দ্রকে ভালবাসে। তবে ত হেমচন্দ্র মৃণালিনীকে ভালবাসিবেই।

উ। যথার্থ, কিন্তু মৃণালিনী অনুপস্থিত, মনোরমা উপস্থিত।

এই ভাবিয়া গিরিজায়া ধীরে ধীরে গৃহের দ্বারদেশে আসিয়া দাঁড়াইল। তথায় একটি গীত আরম্ভ করিয়া কহিল,—"ভিক্ষা দাও গো।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

উপনয়ন—বহ্নিব্যাপ্যো ধূমবান্

গিরিজায়া গীত গায়িল,—

"কাহে সই জীয়ত মরত কি বিধান ?
ব্রজকি কিশোর সই, কাঁহা গেল ভাগই,
ব্রজজন টুটায়ল পরাণ।"

সঙ্গীতধ্বনি হেমচন্দ্রের কর্ণে প্রবেশ করিল। স্বপ্নশ্রুত শব্দের ন্যায় কর্ণে প্রবেশ করিল।

গিরিজায়া আবার গায়িল,—

"ব্রজকি কিশোর সই, কাঁহা গেল ভাগই,
ব্রজবঁধু টুটায়ল পরাণ।"

হেমচন্দ্র উন্মুখ হইয়া শুনিতে লাগিলেন।

গিরিজায়া আবার গায়িল,—

"মিলি গেই নাগরী, ভুলি গেই মাধব,
রূপবিহীন গোপকুঙারী।
কো জানে পিয় সই, রসময় প্রেমিক,
হেন বঁধু রূপ কি ভিখারী॥"

হেমচন্দ্র কহিলেন, "এ কি ! মনোরমা, এ যে গিরিজায়ার স্বর। আমি চলিলাম।" এই বলিয়া লম্ফ দিয়া হেমচন্দ্র শয্যা হইতে অবতরণ করিলেন।

গিরিজায়া গায়িতে লাগিল,—

"আগে নাহি বুঝনু, রূপ দেখি ভুলনু,
হৃদি বৈনু চরণ-যুগল।
যমুনা-সলিলে সই, অব তনু ডারব,
আন সখি ভখিব গরল॥"

হেমচন্দ্র গিরিজায়ার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। ব্যস্ত স্বরে কহিলেন,—"গিরিজায়া ! এ কি গিরিজায়া ! তুমি এখানে ? তুমি এখানে কেন ? তুমি এ দেশে কবে আসিলে ?"

গিরিজায়া কহিল, "আমি এখানে অনেক দিন আসিয়াছি।" এই বলিয়া আবার গায়িতে লাগিল ;—

"কিবা কাননবল্লরী, গল বেঢ়ি বাঁধই,
নবীন তমালে দিব ফাঁস।"

হেমচন্দ্র কহিলেন, "তুমি এ দেশে কেন এলে ?"

গিরিজায়া কহিল, "ভিক্ষা আমার উপজীবিকা। রাজধানীতে অধিক ভিক্ষা পাইব বলিয়া আসিয়াছি।

"কিবা কাননবল্লরী, গল বেঢ়ি বাঁধই,
নবীন তমালে দিব ফাঁস।"

হেমচন্দ্র গীতে কর্ণপাত না করিয়া কহিলেন, "মৃণালিনী কেমন আছে, দেখিয়া আসিয়াছ ?"

গিরিজায়া গায়িতে লাগিল—

"নহে—শ্যাম শ্যাম শ্যাম, শ্যাম নাম জপয়ি'
ছার তনু করব বিনাশ।"

হেমচন্দ্র কহিলেন, "তোমার গীত রাখ ! আমার কথার উত্তর দাও। মৃণালিনী কেমন আছে, দেখিয়া আসিয়াছ ?"

গিরিজায়া কহিল, "মৃণালিনীকে আমি দেখিয়া আসি নাই ; এ গীত আপনার ভাল না লাগে, অন্য গীত গায়িতেছি—

"এ জনমের সঙ্গে কি সই জনমের সাধ ফুরাইবে।
কিংবা জন্ম-জন্মান্তরে, এ সাধ মোর পূরাইবে।"

হেমচন্দ্র কহিলেন, "গিরিজায়া, তোমাকে মিনতি করিতেছি, গান রাখ, মৃণালিনীর সংবাদ বল। বল।"

গি। কি বলিব ?

হে। মৃণালিনীকে কেন দেখিয়া আইস নাই ?

গি। গৌড়নগরে তিনি নাই।

হে। কেন ? কোথায় গিয়াছেন ?

গি। মথুরায়।

হে। মথুরায় ? মথুরায় কাহার সঙ্গে গেলেন ? কি প্রকারে গেলেন ? কেন গেলেন ?

গি। তাঁহার পিতা কি প্রকারে সন্ধান পাইয়া লোক পাঠাইয়া লইয়া গিয়াছেন। বুঝি তাঁহার বিবাহ উপস্থিত। বুঝি বিবাহ দিতে লইয়া গিয়াছেন।

হে। কি ? কি করিতে ?

গি। মৃণালিনীর বিবাহ দিতে তাঁহার পিতা তাঁহাকে লইয়া গিয়াছেন।

হেমচন্দ্র মুখ ফিরাইলেন। গিরিজায়া সে মুখ দেখিতে পাইল না, আর যে হেমচন্দ্রের স্কন্ধস্থ ক্ষতমুখ ছুটিয়া বন্ধনবস্ত্র রক্তে প্লাবিত হইতেছিল,

তাহাও দেখিতে পাইল না। সে পূর্ব্ববৎ গায়িল,—

"বিধি তোরে সাধি শুন, জন্ম যদি দিবে পুন,
আমারে আবার যেন, রমণী-জনম দিবে।
লাজ-ভয় তেয়াগিব, এ সাধ মোর পুরাইব,
সাগর ছেঁচে রতন নিব, কণ্ঠে রাখ্‌ব নিশি-দিবে।"

হেমচন্দ্র মুখ ফিরাইলেন। বলিলেন, "গিরিজায়া, তোমার সংবাদ শুভ। উত্তম হইয়াছে।"

এই বলিয়া হেমচন্দ্র গৃহমধ্যে পুনঃ প্রবেশ করিলেন। গিরিজায়ার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। গিরিজায়া মনে করিয়াছিল, মিছা করিয়া মৃণালিনীর বিবাহের কথা বলিয়া সে হেমচন্দ্রের পরীক্ষা করিয়া দেখিবে। মনে করিয়াছিল যে, মৃণালিনীর বিবাহ উপস্থিত শুনিয়া হেমচন্দ্র বড় কাতর হইবে, বড় রাগ করিবে। কৈ, তা ত কিছুই হইল না। তখন গিরিজায়া কপালে করাঘাত করিয়া ভাবিল, "হায়, কি করিলাম! কেন অনর্থক এ মিথ্যা রটনা করিলাম? হেমচন্দ্র ত সুখী হইল দেখিতেছি—বলিয়া গেল সংবাদ শুভ। এখন ঠাকুরাণীর দশা কি হইবে?" হেমচন্দ্র যে কেন গিরিজায়াকে বলিলেন, "তোমার সংবাদ শুভ", তাহা গিরিজায়া ভিখারিণী বৈ ত নয়—কি বুঝিবে? যে ক্রোধভরে হেমচন্দ্র এই মৃণালিনীর জন্য গুরুদেবের প্রতি শরসন্ধানে উদ্যত হইয়াছিলেন, সেই দুর্জ্জয় ক্রোধ হৃদয়মধ্যে সমুদিত হইল। অভিমানাধিক্যে দুর্দ্দম ক্রোধাবেগে, হেমচন্দ্র গিরিজায়াকে বলিলেন, "তোমার সংবাদ শুভ।"

গিরিজায়া তাহা বুঝিতে পারিল না। মনে করিল, এই ষষ্ঠ লক্ষণ। কেহ তাহাকে ভিক্ষা দিল না, সেও ভিক্ষার প্রতীক্ষা করিল না; "শিকলী কাটিয়াছে" সিদ্ধান্ত করিয়া গৃহাভিমুখে চলিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আর একটি সংবাদ

সেই দিন মাধবাচার্য্যের পর্য্যটন সমাপ্ত হইল। তিনি নবদ্বীপে উপস্থিত হইলেন; তথায় প্রিয় শিষ্য হেমচন্দ্রকে দর্শনদান করিয়া চরিতার্থ করিলেন এবং আশীর্ব্বাদ, আলিঙ্গন, কুশলপ্রশ্নাদির পরে বিরলে, উভয়ে উদ্দেশ্যসাধনের কথোপকথন করিতে লাগিলেন।

আপন ভ্রমণবৃত্তান্ত সবিস্তারে বিবৃত করিয়া মাধবাচার্য্য কহিলেন, "এত শ্রম করিয়া কতক দূর কৃতকার্য্য হইয়াছি। এতদ্দেশে অধীন রাজগণের মধ্যে অনেকেই রণক্ষেত্রে সসৈন্যে সেন রাজার সহায়তা করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। অচিরাৎ সকলে আসিয়া নবদ্বীপে সমবেত হইবেন।"

হেমচন্দ্র কহিলেন, "তাঁহারা অদ্যই এ স্থলে না আসিলে সকলই বিফল হইবে। যবন-সেনা আসিয়াছে, মহাবনে অবস্থিতি করিতেছে। আজিকালি নগর আক্রমণ করিবে।"

মাধবাচার্য্য শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। কহিলেন "গৌড়েশ্বরের পক্ষ হইতে কি উদ্যম হইয়াছে?

হে। কিছুই না। বোধ হয়, রাজসন্নিধানে এ সংবাদ এ পর্য্যন্ত প্রচার হয় নাই। আমি দৈবাৎ কালি এ সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছি।

মা। এ বিষয় তুমি রাজগোচর করিয়া সৎপরামর্শ দাও নাই কেন?

হে। সংবাদ-প্রাপ্তির পরেই পথিমধ্যে দস্যু কর্ত্তৃক আহত হইয়া রাজপথে পড়িয়াছিলাম, এইমাত্র গৃহে আসিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিতেছি। বলহানি-প্রযুক্ত রাজসমক্ষে যাইতে পারি নাই। এখনই যাইতেছি।

"তুমি এখন বিশ্রাম কর। আমি রাজার নিকট যাইতেছি। পশ্চাৎ যেরূপ হয়, তোমাকে জানাইব।" এই বলিয়া মাধবাচার্য্য গাত্রোত্থান করিলেন।

তখন হেমচন্দ্র বলিলেন, "প্রভু! আপনি গৌড় পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন শুনিলাম—"

মাধবাচার্য্য অভিপ্রায় বুঝিয়া কহিলেন, "গিয়াছিলাম। তুমি মৃণালিনীর সংবাদ কামনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছ? মৃণালিনী তথায় নাই।"

হে। কোথায় গিয়াছে?

মা। তাহা আমি অবগত নহি, কেহ সংবাদ দিতে পারিল না।

হে। কেন গিয়াছে?

মা। বৎস! সে সকল পরিচয় বৃত্তান্তে দিব।

হেমচন্দ্র ভ্রূকুটী করিয়া কহিলেন, "স্বরূপ বৃত্তান্ত আমাকে জানাইলে, আমি যে মর্ম্মপীড়ায় কাতর হইব, সে আশঙ্কা করিবেন না। আমিও কিয়দংশ শ্রবণ করিয়াছি। যাহা অবগত আছেন, তাহা নিঃসঙ্কোচে আমার নিকট প্রকাশ করুন।"

মাধবাচার্য্য গৌড়-নগরে গমন করিলে হৃষীকেশ তাঁহাকে আপন জ্ঞানমত মৃণালিনীর বৃত্তান্ত জ্ঞাত করিয়াছিলেন। তাহাই প্রকৃত বৃত্তান্ত বলিয়া মাধবাচার্য্যেরও বোধ হইয়াছিল; মাধবাচার্য্য কস্মিন্‌কালে স্ত্রীজাতির অনুরাগী নহেন—সুতরাং স্ত্রীচরিত্র বুঝিতেন না। একণে হেমচন্দ্রের কথা শুনিয়া তাঁহার বোধ হইল যে, হেমচন্দ্র সেই বৃত্তান্তই কতক কতক শ্রবণ করিয়া মৃণালিনীর কামনা পরিত্যাগ করিয়াছেন—অতএব কোন নূতন মনঃপীড়ার সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া, পুনর্ব্বার আসন গ্রহণ পূর্ব্বক হৃষীকেশের কথিত বিবরণ হেমচন্দ্রকে শুনাইতে লাগিলেন।

হেমচন্দ্র অধোমুখে করতলোপরি ভ্রূকুটীকুটিল ললাট সংস্থাপিত করিয়া নিঃশব্দে সমুদয় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেন। মাধবাচার্য্যের কথা সমাপ্ত হইলেও বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিলেন না। সেই অবস্থাতেই রহিলেন। মাধবাচার্য্য ডাকিলেন, "হেমচন্দ্র!" কোন উত্তর পাইলেন না। পুনরপি ডাকিলেন, "হেমচন্দ্র!" তথাপি নিরুত্তর।

তখন মাধবাচার্য্য গাত্রোত্থান করিয়া হেমচন্দ্রের হস্ত ধারণ করিলেন; অতি কোমল, স্নেহময় স্বরে কহিলেন, "বৎস! তাত! মুখ তোল, আমার সঙ্গে কথা কও।"

হেমচন্দ্র মুখ তুলিলেন। মুখ দেখিয়া মাধবাচার্য্যও ভীত হইলেন। মাধবাচার্য্য কহিলেন, "আমার সহিত আলাপ কর। ক্রোধ হইয়া থাকে তাহা ব্যক্ত কর।"

হেমচন্দ্র কহিলেন, "কাহার কথায় বিশ্বাস করিব? হৃষীকেশ একরূপ কহিয়াছে। ভিখারিণী আর এক প্রকার বলিল!"

মাধবাচার্য্য কহিলেন, "ভিখারিণী কে? সে কি বলিয়াছে?"

হেমচন্দ্র অতি সংক্ষেপে উত্তর দিলেন।

মাধবাচার্য্য সঙ্কুচিত স্বরে কহিলেন, "হৃষীকেশেরই কথা মিথ্যা বোধ হয়।"

হেমচন্দ্র কহিলেন, "হৃষীকেশের প্রত্যক্ষ।"

তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। পিতৃদত্ত শূল হস্তে লইলেন। কম্পিত-কলেবরে গৃহমধ্যে নিঃশব্দে পাদচারণ করিতে লাগিলেন।

আচার্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ভাবিতেছ?"

হেমচন্দ্র করস্থ শূল দেখাইয়া কহিলেন, "মৃণালিনীকে এই শূলে বিদ্ধ করিব।"

মাধবাচার্য্য তাঁহার মুখকান্তি দেখিয়া ভীত হইয়া অপসৃত হইলেন।

প্রাতে মৃণালিনী বলিয়া গিয়াছিলেন, "হেমচন্দ্র আমারই।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

"আমি ত উন্মাদিনী"

অপরাহ্নে মাধবাচার্য্য প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তিনি সংবাদ আনিলেন যে, ধর্ম্মাধিকার প্রকাশ করিয়াছেন, যবনসেনা আসিয়াছে বটে, কিন্তু পূর্ব্বজিত রাজ্যে বিদ্রোহের সম্ভাবনা শুনিয়া যবনসেনাপতি সন্ধিসংস্থাপনে ইচ্ছুক হইয়াছেন। আগামী কল্য তাঁহারা দূত প্রেরণ করিবেন। দূতের আগমন অপেক্ষা করিয়া কোন যুদ্ধোদ্যম হইতেছে না। এই সংবাদ দিয়া মাধবাচার্য্য কহিলেন, "এই কুলাঙ্গার রাজা ধর্ম্মাধিকারের বুদ্ধিতে নষ্ট হইবে।"

কথা হেমচন্দ্রের কর্ণে প্রবেশলাভ করিল কি না সন্দেহ। তাঁহাকে বিমনা দেখিয়া মাধবাচার্য্য বিদায় হইলেন।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে মনোরমা হেমচন্দ্রের গৃহে প্রবেশ করিল। হেমচন্দ্রকে দেখিয়া মনোরমা কহিল—"ভাই! আজ তুমি অমন কেন?"

হেম। কেমন আমি?

মনো। তোমার মুখখানা শ্রাবণের আকাশের মত অন্ধকার; ভাদ্রমাসের গঙ্গার মত রাগে ভরা; অত ভ্রূকুটী করিতেছ কেন? চক্ষের পলক নাই কেন? আর দেখি—তাই ত, চোখে জল। তুমি কেঁদেছ?

হেমচন্দ্র মনোরমার মুখ প্রতি চাহিয়া দেখিলেন। আবার চক্ষু অবনত করিলেন; পুনর্ব্বার উন্নত গবাক্ষপথে দৃষ্টি করিলেন; আবার মনোরমার মুখপ্রতি চাহিয়া রহিলেন। মনোরমা বুঝিল যে, দৃষ্টির এইরূপ গতির কোন উদ্দেশ্য নাই। যখন কথা কণ্ঠাগত, অথচ বলিবার নহে, তখনই দৃষ্টি এইরূপ হয়। মনোরমা কহিল,—"হেমচন্দ্র, তুমি কেন কাতর হইয়াছ? কি হইয়াছে?"

হেমচন্দ্র কহিলেন "কিছু না।"

মনোরমা প্রথমে কিছু বলিল না—পরে আপনা আপনি মৃদু মৃদু কথা কহিতে লাগিল। "কিছু না—বলিবে না! ছি! ছি! বুকের ভিতর বিছা পুষিবে।" বলিতে বলিতে মনোরমার চক্ষু দিয়া এক বিন্দু বারি বহিল;—পরে অকস্মাৎ হেমচন্দ্রের

মুখপ্রতি চাহিয়া কহিল, "আমাকে বলিবে না কেন? আমি যে তোমার ভগিনী।"

মনোরমার মুখের ভাবে, শান্তদৃষ্টিতে, এত যত্ন, এত মৃদুতা, এত সহৃদয়তা প্রকাশ পাইল যে, হেমচন্দ্রের অন্তঃকরণ দ্রবীভূত হইল। তিনি কহিলেন, "আমার যে যন্ত্রণা, তাহা ভগিনীর নিকট কথনীয় নহে।"

মনোরমা কহিল, "তবে আমি ভগিনী নহি।"

হেমচন্দ্র কিছুতেই উত্তর করিলেন না। তথাপি প্রত্যাশাপন্ন হইয়া মনোরমা তাঁহার মুখপ্রতি চাহিয়া রহিল। কহিল,—"আমি তোমার কেহ নহি।"

হেম। আমার দুঃখ ভগিনীর অশ্রাব্য—অপরেরও অশ্রাব্য।

হেমচন্দ্রের কণ্ঠস্বর করুণাময়—নিতান্ত অভিব্যক্তিপরিপূর্ণ; তাহা মনোরমার প্রাণের ভিতর গিয়া বাজিল, তখনই সে স্বর পরিবর্তিত হইল, নয়নে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল—অধর দংশন করিয়া হেমচন্দ্র কহিলেন, "আমার দুঃখ কি? দুঃখ কিছুই না। আমি মণিভ্রমে কালসাপ কণ্ঠে ধরিয়াছিলাম, এখন তাহা ফেলিয়া দিয়াছি।"

মনোরমা আবার পূর্ব্ববৎ হেমচন্দ্রের প্রতি অনিমেষলোচনে চাহিয়া রহিল। ক্রমে তাহার মুখমণ্ডলে অতি মধুর, অতি সকরুণ হাস্য প্রকটিত হইল। বালিকা প্রগল্‌ভতা প্রাপ্ত হইল। সূর্য্যরশ্মির অপেক্ষা যে রশ্মি সমুজ্জ্বল, তাহার কিরীট পরিয়া প্রতিভাদেবী দেখা দিলেন। মনোরমা কহিল,—"বুঝিয়াছি। তুমি না বুঝিয়া ভালবাস, তাহার পরিণাম ঘটিয়াছে।"

হেম। "ভালবাসিতাম।" হেমচন্দ্র বর্ত্তমানের পরিবর্ত্তে অতীতকাল ব্যবহার করিলেন। অমনি নীরবে নিঃস্রুত অশ্রুজলে তাঁহার মুখমণ্ডল ভাসিয়া গেল।

মনোরমা বিরক্ত হইল। বলিল, "ছি! ছি! প্রতারণা! যে পরকে প্রতারণা করে, সে বঞ্চক মাত্র। যে আত্মপ্রতারণা করে, তাহার সর্ব্বনাশ ঘটে!" মনোরমা বিরক্তি বশতঃ আপন অলকদাম চম্পকাঙ্গুলীতে জড়িত করিয়া টানিতে লাগিল।

হেমচন্দ্র বিস্মিত হইলেন, কহিলেন, "কি প্রতারণা করিলাম?"

মনোরমা কহিল, "ভালবাসিতাম কি? তুমি ভালবাস। নহিলে কাঁদিলে কেন? কি? আজি তোমার স্নেহের পাত্র অপরাধী হইয়াছে বলিয়া তোমার ভালবাসা গিয়াছে? কে তোমায় এমন প্রবোধ দিয়াছে?" বলিতে বলিতে মনোরমার প্রৌঢ়ভাবাপন্ন মুখকান্তি সহসা প্রফুল্ল পদ্মবৎ অধিকতর ভাবব্যঞ্জক হইতে লাগিল, চক্ষু অধিকতর জ্যোতিঃস্ফুরৎ হইতে লাগিল, কণ্ঠস্বর অধিকতর পরিস্ফুট, আগ্রহকম্পিত হইতে লাগিল, সে বলিতে লাগিল, "এ কেবল বীরদম্ভকারী পুরুষদের দর্পমাত্র। অহঙ্কার করিয়া আগুন নিবান যায়? তুমি বালির বাঁধ দিয়া এই কূলপরিপ্লাবিনী গঙ্গার বেগ রোধ করিতে পারবে, তথাপি তুমি প্রণয়িনীকে পাপিষ্ঠা মনে করিয়া কখনও প্রণয়ের বেগ রোধ করিতে পারিবে না। হা কৃষ্ণ! মানুষ সকলেই প্রতারক।"

হেমচন্দ্র বিস্মিত হইয়া ভাবিলেন,—"আমি ইহাকে এক দিন বালিকা মনে করিয়াছিলাম!"

মনোরমা কহিতে লাগিল, "তুমি পুরাণ শুনিয়াছ? আমি পণ্ডিতের নিকট তাহার গূঢ়ার্থ সহিত শুনিয়াছি। লেখা আছে, ভগীরথ গঙ্গা আনিয়াছিলেন; এক দাম্ভিক মত্ত হস্তী তাহার বেগ সংবরণ করিতে গিয়া ভাসিয়া গিয়াছিল। ইহার অর্থ কি? গঙ্গা প্রেমপ্রবাহস্বরূপ; ইহা জগদীশ্বর-পাদপদ্ম-নিঃসৃত, ইহা জগতে পবিত্র,—যে ইহাতে অবগাহন করে, সেই পুণ্যময় হয়। ইনি মৃত্যুঞ্জয়জটা-বিহারিণী; যে মৃত্যুকে জয় করিতে পারে, সেই প্রণয়কে মস্তকে ধারণ করে, আমি যেমন শুনিয়াছি, ঠিক সেইরূপ বলিতেছি। দাম্ভিক হস্তী দম্ভের অবতারস্বরূপ, সে প্রণয়বেগে ভাসিয়া যায়। প্রণয় প্রথমে একমাত্র পথ অবলম্বন করিয়া উপযুক্ত সময়ে শতমুখী হয়; প্রণয় স্বভাবসিদ্ধ হইলে, শতপাত্রে ন্যস্ত হয়—পরিশেষে সাগরসঙ্গমে লয়প্রাপ্ত হয়—সংসারস্থ সর্ব্বজীবে বিলীন হয়।"

হে। তোমার উপদেষ্টা কি বলিয়াছেন, প্রণয়ের পাত্রাপাত্র নাই? পাপাসক্তকে কি ভালবাসিতে হইবে?

ম। পাপাসক্তকে ভালবাসিতে হইবে। প্রণয়ের পাত্রাপাত্র নাই। সকলকেই ভালবাসিবে, প্রণয় জন্মিলেই তাহাকে যত্নে স্থান দিবে, কেন না, প্রণয় অমূল্য। ভাই, যে ভাল, তাকে কে না ভালবাসে? যে মন্দ, তাকে যে আপনা ভুলিয়া ভালবাসে, আমি তাকে বড় ভালবাসি। কিন্তু আমি ত উন্মাদিনী।

হেমচন্দ্র বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "মনোরমা, এ সকল তোমায় কে শিখাইল? তোমার উপদেষ্টা অলৌকিক ব্যক্তি।"

মনোরমা মুখাবনত করিয়া কহিলেন, "তিনি সর্ব্বজ্ঞানী, কিন্তু—"

হে। কিন্তু কি?

ম। তিনি অগ্নিস্বরূপ, আলো করেন, কিন্তু দগ্ধও করেন।

মনোরমা ক্ষণেক মুখাবনত করিয়া নীরব হইয়া রহিল।

হেমচন্দ্র বলিলেন, "মনোরমা! তোমার মুখ দেখিয়া আর তোমার কথা শুনিয়া, আমার বোধ হইতেছে, তুমিও ভালবাসিয়াছ। বোধ হয়, যাঁহাকে তুমি অগ্নির সহিত তুলনা করিলে, তিনিই তোমার প্রণয়াধিকারী।"

মনোরমা পূর্ব্বমত নীরবে রহিল। হেমচন্দ্র পুনরপি কহিতে লাগিলেন, "যদি ইহা সত্য হয়, তবে আমার একটি কথা শুন। স্ত্রীলোকের সতীত্বের অধিক আর ধর্ম্ম নাই; যে স্ত্রীর সতীত্ব নাই, সে শূকরীর অপেক্ষাও অধম। সতীত্বের হানি কেবল কার্য্যেই ঘটে, এমন নহে; স্বামী ভিন্ন অন্য পুরুষের চিন্তামাত্রও সতীত্বের বিঘ্ন। তুমি বিধবা, যদি স্বামী ভিন্ন অপরকে মনেও ভাব, তবে তুমি ইহলোকে পরলোকে স্ত্রীজাতির অধম হইয়া থাকিবে। অতএব সাবধান হও। যদি কাহারও প্রতি চিত্ত নিবিষ্ট হইয়া থাকে, তবে তাহাকে বিস্মৃত হও।"

মনোরমা উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল, পরে মুখে অঞ্চল দিয়া হাসিতে লাগিল, হাসি বন্ধ হয় না। হেমচন্দ্র কিঞ্চিৎ অপ্রসন্ন হইলেন; কহিলেন, "হাসিতেছ কেন?"

মনোরমা কহিলেন, "ভাই, এই গঙ্গাতীরে গিয়া দাঁড়াও; গঙ্গাকে ডাকিয়া কহ, গঙ্গে,—তুমি পর্ব্বতে ফিরিয়া যাও।"

হে। কেন?

ম। স্মৃতি কি আপন ইচ্ছাধীন? রাজপুত্র, কালসর্পকে মনে করিয়া কি সুখ? কিন্তু তথাপি তুমি তাহাকে ভুলিতেছ না কেন?

হে। তাহার দংশনের জ্বালায়।

ম। তোমাকে সে যদি দংশন না করিত? তবে কি তাহাকে ভুলিতে?

হেমচন্দ্র উত্তর করিলেন না। মনোরমা বলিতে লাগিল, "তোমার ফুলের মালা কালসাপ হইয়াছে, তবু তুমি ভুলিতে পারিতেছ না; আমি, আমি ত পাগল—আমি আমার পুষ্পহার কেন ছিঁড়িব?"

হেমচন্দ্র কহিলেন, "তুমি এক প্রকার অন্যায় বলিতেছ না। বিস্মৃতি স্বেচ্ছাধীন ক্রিয়া নহে; লোক আত্মগরিমায় অন্ধ হইয়া পরের প্রতি যে সকল উপদেশ করে, তন্মধ্যে 'বিস্মৃত হও' এই উপদেশের অপেক্ষা হাস্যাস্পদ আর কিছুই নাই। কেহ কাহাকেও বলে না,—অর্থচিন্তা ছাড়; যশের ইচ্ছা ছাড়; জ্ঞানচিন্তা ছাড়; ক্ষুধানিবারণেচ্ছা ত্যাগ কর; তৃষ্ণানিবারণেচ্ছা ত্যাগ কর; নিদ্রা ছাড়; তবে কেন বলিবে, ভালবাসা ছাড়? ভালবাসা কি এ সকল অপেক্ষা ছোট? এ সকল অপেক্ষা প্রণয় ন্যূন নহে—কিন্তু ধর্ম্মের অপেক্ষা ন্যূন বটে। ধর্ম্মের জন্য প্রেমকে সংহার করিবে। স্ত্রীর পরম ধর্ম্ম সতীত্ব। সেই জন্য বলিতেছি, যদি পার, প্রেম সংহার কর।"

ম। আমি অবলা জ্ঞানহীনা, বিবশা; আমি ধর্ম্মাধর্ম্ম কাহাকে বলে, তাহা জানি না। আমি এইমাত্র জানি, ধর্ম্ম ভিন্ন প্রেম জন্মে না।

হে। সাবধান, মনোরমা! বাসনা হইতে ভ্রান্তি জন্মে; ভ্রান্তি হইতে অধর্ম্ম জন্মে। তোমার ভ্রান্তি পর্য্যন্ত হইয়াছে। তুমি বিবেচনা করিয়া বল দেখি, তুমি যদি ধর্ম্মে একের পত্নী, মনে অন্যের পত্নী হইলে, তবে তুমি দ্বিচারিণী হইলে কি না?

গৃহমধ্যে হেমচন্দ্রের অসিচর্ম্ম ঝুলিতেছিল; মনোরমা চর্ম্ম হস্তে লইয়া কহিল, "ভাই হেমচন্দ্র, তোমার এ ঢাল কিসের চামড়ার?"

হেমচন্দ্র হাস্য করিলেন। মনোরমার মুখের প্রতি চাহিয়া দেখিলেন, বালিকা।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

গিরিজায়ার সংবাদ

গিরিজায়া যখন পাটনীর গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে, তখন প্রাণান্তে হেমচন্দ্রের নবানুরাগের কথা মৃণালিনীর সাক্ষাতে ব্যক্ত করিবে না স্থির করিয়াছিল। মৃণালিনী তাহার আগমন প্রতীক্ষায় পিঞ্জরে বদ্ধ বিহঙ্গীর ন্যায় চঞ্চলা হইয়া রহিয়াছিলেন; গিরিজায়াকে দেখিবামাত্র কহিলেন, "বল গিরিজায়া, কি দেখিলে? হেমচন্দ্র কেমন আছেন?"

গিরিজায়া কহিল, "ভাল আছেন।"

মৃ। কেন, অমন করিয়া বলিলে কেন? তোমার কথায় উৎসাহ নাই কেন? যেন দুঃখিত হইয়া বলিতেছ; কেন?

গি। সে কি?

মৃ। গিরিজায়া, আমাকে প্রতারণা করিও না; হেমচন্দ্র কি ভাল হয়েন নাই, তাহা হইলে আমাকে স্পষ্ট করিয়া বল। সন্দেহের অপেক্ষা প্রতীতি ভাল।

গিরিজায়া এবার সহাস্তে কহিল, "তুমি কেন অনর্থক ব্যস্ত হও? আমি নিশ্চিত বলিতেছি, তাঁহার শরীরে কিছুই ক্লেশ নাই। তিনি উঠিয়া বেড়াইতেছেন।"

মৃণালিনী ক্ষণেক চিন্তা করিয়া কহিলেন, "মনোরমার সহিত তাঁহার কোন কথাবার্ত্তা শুনিলে?"

গি। শুনিলাম।

মৃ। কি শুনিলে?

গিরিজায়া তখন হেমচন্দ্র যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা কহিল। কেবল হেমচন্দ্রের সঙ্গে যে মনোরমা নিশাপর্য্যটন করিয়াছিলেন ও কানে কানে কথা বলিয়াছিলেন, এই দুইটি বিষয় গোপন করিল। মৃণালিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি হেমচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছ?"

গিরিজায়া কিছু ইতস্তত: করিয়া কহিল, "করিয়াছি।"

মৃ। তিনি কি কহিলেন?

গি। তোমার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

মৃ। তুমি কি বলিলে?

গি। আমি বলিলাম, তুমি ভাল আছ।

মৃ। আমি এখানে আসিয়াছি, তাহা বলিয়াছ?

গি। না।

মৃ। গিরিজায়া, তুমি ইতস্তত: করিয়া উত্তর দিতেছ, তোমার মুখ শুকন। তুমি আমার মুখপানে চাহিতে পারিতেছ না; আমি নিশ্চিত বুঝিতেছি, তুমি কোন অমঙ্গল সংবাদ আমার নিকট লুকাইতেছ। আমি তোমার কথায় বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। যাহা থাকে অদৃষ্টে, আমি স্বয়ং হেমচন্দ্রকে দেখিতে যাইব। পার আমার সঙ্গে আইস, নচেৎ আমি একাকিনী যাইব।

এই বলিয়া মৃণালিনী অবগুণ্ঠনে মুখাবৃত করিয়া বেগে রাজপথ অতিবাহন করিয়া চলিলেন।

গিরিজায়া তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হইল। কিছু-দূর আসিয়া তাঁহার হস্ত ধরিয়া কহিল, "ঠাকুরাণি! ফের, আমি যাহা লুকাইয়াছি, তাহা প্রকাশ করিতেছি।"

মৃণালিনী গিরিজায়ার সঙ্গে সঙ্গে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। তখন গিরিজায়া যাহা যাহা গোপন করিয়াছিল, তাহা সবিস্তারে প্রকাশিত করিল।

গিরিজায়া হেমচন্দ্রকে ঠকাইয়াছিল। কিন্তু মৃণালিনীকে ঠকাইতে পারিল না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মৃণালিনীর লিপি

মৃণালিনী কহিলেন, "গিরিজায়া, তিনি রাগ করিয়া বলিয়া থাকিবেন, 'উত্তম হইয়াছে', ইহা শুনিয়া তিনি কেনই বা রাগ না করিবেন?"

গিরিজায়ারও তখন সংশয় জন্মিল। সে কহিল, "ইহা সম্ভব বটে।"

তখন মৃণালিনী কহিলেন, "তুমি এ কথা বলিয়া ভাল কর নাই। এর বিহিত করা উচিত; তুমি আহারাদি করিতে যাও। আমি ততক্ষণ একখানি পত্র লিখিয়া রাখিব। তুমি খাইবার পর, সেইখানি লইয়া তাঁহার নিকট যাইবে।"

গিরিজায়া স্বীকৃত হইয়া সত্বরে আহারাদির জন্য গমন করিল। মৃণালিনী সংক্ষেপে পত্র লিখিলেন। লিখিলেন,—

"গিরিজায়া মিথ্যাবাদিনী। যে কারণে সে তোমার নিকট মৎসম্বন্ধে মিথ্যা বলিয়াছে, তাহা জিজ্ঞাসা করিলে, সে স্বয়ং বিস্তারিত করিয়া কহিবে। আমি মথুরায় যাই নাই। যে রাত্রিতে তোমার অঙ্গুরীয় দেখিয়া যমুনাতটে আসিয়াছিলাম, সেই রাত্রি অবধি আমার পক্ষে মথুরার পথ রুদ্ধ হইয়াছে। আমি মথুরায় না গিয়া তোমাকে দেখিতে নবদ্বীপে আসিয়াছি। নবদ্বীপে আসিয়াও যে এ পর্য্যন্ত তোমার সহিত সাক্ষাৎ করি নাই, তাহার কারণ এই, আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলে তোমার প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হইবে। আমার অভিলাষ তোমাকে দেখিব, তৎসিদ্ধিপক্ষে তোমাকে দেখা দেওয়ার আবশ্যক কি?"

গিরিজায়া এই লিপি লইয়া পুনরপি হেমচন্দ্রের গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল। সন্ধ্যাকালে মনোরমার সহিত কথোপকথন সমাপ্তির পরে, হেমচন্দ্র গঙ্গা-দর্শনে যাইতেছিলেন, পথে গিরিজায়ার সহিত সাক্ষাৎ হইল। গিরিজায়া তাঁহার হস্তে লিপি দিল।

হেমচন্দ্র কহিলেন, "তুমি আবার কেন?"

গি। পত্র লইয়া আসিয়াছি।

হে। পত্র কাহার?

গি। মৃণালিনীর পত্র।

হেমচন্দ্র বিস্মিত হইলেন, "এ পত্র কি প্রকারে তোমার নিকট আসিল ?"

গি। মৃণালিনী নবদ্বীপে আছেন। আমি মথুরার কথা আপনার নিকট মিথ্যা বলিয়াছি।

হে। এই পত্র তাঁহার ?

গি। হাঁ, তাঁহার স্বহস্তলিখিত।

হেমচন্দ্র লিপিখানা না পড়িয়া তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিন্ন-ভিন্ন করিলেন। ছিন্ন খণ্ড সকল বনমধ্যে নিক্ষিপ্ত করিয়া কহিলেন,—"তুমি যে মিথ্যাবাদিনী, তাহা আমি ইতিপূর্ব্বেই শুনিতে পাইয়াছি। তুমি যে দুষ্টার পত্র লইয়া আসিয়াছ, সে যে বিবাহ করিতে যায় নাই, হৃষীকেশ তাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছে, তাহা আমি ইতিপূর্ব্বেই শুনিয়াছি। আমি কুলটার পত্র পড়িব না। তুমি আমার সম্মুখ হইতে দূর হও।"

গিরিজায়া চমৎকৃত হইয়া নিরুত্তরে হেমচন্দ্রের মুখপানে চাহিয়া রহিল।

হেমচন্দ্র পথিপার্শ্বস্থ এক ক্ষুদ্র বৃক্ষের শাখা ভগ্ন করিয়া হস্তে লইয়া কহিলেন, "দূর হ, নচেৎ বেত্রাঘাত করিব।"

গিরিজায়ার আর সহ্য হইল না। ধীরে ধীরে বলিল, "বীরপুরুষ বটে! এই রকম বীরত্ব প্রকাশ করিতে বুঝি নদীয়ায় এসেছ? কিছু প্রয়োজন ছিল না—এ বীরত্ব মগধে বসিয়াও দেখাইতে পারিতে। মুসলমানের জুতা বহিতে, আর গরীব-দুঃখীর মেয়ে দেখিলে বেত মারিতে।"

হেমচন্দ্র অপ্রতিভ হইয়া বেত ফেলিয়া দিলেন। কিন্তু গিরিজায়ার রাগ গেল না। বলিল, "তুমি মৃণালিনীকে বিবাহ করিবে? মৃণালিনী দূরে থাক, তুমি আমারও যোগ্য নও।"

এই বলিয়া গিরিজায়া সদর্পে গজেন্দ্রগমনে চলিয়া গেল। হেমচন্দ্র ভিখারিণীর গর্ব্ব দেখিয়া অবাক্ হইয়া রহিলেন।

গিরিজায়া প্রত্যাগত হইয়া হেমচন্দ্রের আচরণ মৃণালিনীর নিকট সবিশেষ বিবৃত করিল। এবার কিছু লুকাইল না। মৃণালিনী শুনিয়া কোন উত্তর করিলেন না। রোদনও করিলেন না। যেরূপ অবস্থায় শ্রবণ করিতেছিলেন, সেইরূপ অবস্থাতেই রহিলেন। দেখিয়া গিরিজায়া শঙ্কান্বিত হইল—তখন মৃণালিনীর কথোপকথনের সময় নয় বুঝিয়া তথা হইতে সরিয়া গেল।

পাটনীর গৃহের অনতিদূরে যে এক সোপান-বিশিষ্ট পুষ্করিণী ছিল, তথায় গিয়া গিরিজায়া সোপানোপরি উপবেশন করিল। শারদীয়া পূর্ণিমার প্রদীপ্ত কৌমুদীতে পুষ্করিণীর স্বচ্ছ নীলাম্বু অধিকতর নীলোজ্জ্বল হইয়া প্রভাসিত হইতেছিল। তদুপরি স্পন্দনরহিত কুসুমশ্রেণী অর্দ্ধপ্রস্ফুটিত হইয়া নীল জলে প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল; চারিদিকে বৃক্ষমালা নিঃশব্দে পরস্পরাশ্লিষ্ট হইয়া আকাশের সীমা নির্দ্দেশ করিতেছিল; কচিৎ দুই একটি দীর্ঘ শাখা উর্দ্ধোত্থিত হইয়া আকাশপটে চিত্রিত হইয়া রহিয়াছিল। তলস্থ অন্ধকারপুঞ্জ হইতে নবস্ফুট-কুসুম-সৌরভ আসিতেছিল। গিরিজায়া সোপানোপরি উপবেশন করিল।

গিরিজায়া প্রথমে ধীরে ধীরে, মৃদু মৃদু গীত আরম্ভ করিল—যেন নবশিক্ষিতা বিহঙ্গী প্রথমোদ্যমে স্পষ্ট গান করিতে পারিতেছে না। ক্রমে তাহার স্বর স্পষ্টতালাভ করিতে লাগিল—ক্রমে ক্রমে উচ্চতর হইতে লাগিল, শেষে সেই সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ-তানলয়বিশিষ্ট কমনীয় কণ্ঠধ্বনি পুষ্করিণী, উপবন, আকাশ বিপ্লুত করিয়া স্বর্গচ্যুত স্বরসরিত্তরঙ্গ-স্বরূপ মৃণালিনীর কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল। গিরিজায়া গায়িল :—

"পরাণ না গেলো।
যো দিন পেখনু সই যমুনাকি তীরে,
গায়ত নাচত সুন্দর ধীরে ধীরে,
উঁহি পর পিয় সই, কাহে কালো নীরে,
জীবন না গেলো ?
ফিরি ঘর আয়নু, না কহনু বোলি,
তিতায়নু আঁখিনীরে আপনা আঁচলি,
রোই রোই পিয় সই কাহে লো পরাণি
তইখন না গেলো ?
শুনয়ু শ্রবণ-পথে মধুর বাজে
রাধে রাধে রাধে রাধে বিপিনমাঝে,
যব শুনন্ লাগি সই, সো মধুর বোলি,
জীবন না গেলো ?
ধায়নু পিয় সই, সোহি উপকূলে,
লুটায়নু কাঁদি সই শ্যামপদমূলে,
সোহি পদমূলে রই, কাহে লো হামারি
মরণ না ভেলো ?"

গিরিজায়া গায়িতে গায়িতে দেখিল, তাহার সম্মুখে চন্দ্রের কিরণোপরি মনুষ্যের ছায়া পড়িয়াছে। ফিরিয়া দেখিল, মৃণালিনী দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার মুখপ্রতি চাহিয়া দেখিল, মৃণালিনী কাঁদিতেছেন।

গিরিজায়া দেখিয়া হর্ষান্বিত হইল,—সে বুঝিতে পারিল যে, যখন মৃণালিনীর চক্ষুতে জল আসিয়াছে—তখন তাঁহার ক্লেশের কিছু শমতা হইয়াছে। ইহা সকলে বুঝে না—মনে করে, "কৈ, ইহার চক্ষুতে ত জল দেখিলাম না, তবে ইহার কিসের দুঃখ?" যদি ইহা সকলে বুঝিত, সংসারের কত মর্ম্মপীড়াই না জানি নিবারণ হইত।

কিয়ৎক্ষণ উভয়েই নীরব হইয়া রহিল। মৃণালিনী কিছু বলিতে পারেন না; গিরিজায়াও কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারে না। পরে মৃণালিনী কহিলেন, "গিরিজায়া, আর একবার তোমাকে যাইতে হইবে।"

গি। আবার সে পাষণ্ডের নিকট যাইব কেন?

মৃ। পাষণ্ড বলিও না। হেমচন্দ্র ভ্রান্ত হইয়া থাকিবেন—এ সংসারে অভ্রান্ত কে? কিন্তু হেমচন্দ্র পাষণ্ড নহেন। আমি স্বয়ং তাঁহার নিকট এখনই যাইব—তুমি সঙ্গে চল। তুমি আমাকে ভগিনীর অধিক স্নেহ কর—তুমি আমার জন্য না করিয়াছ কি? তুমি কখন আমাকে অকারণে মনঃপীড়া দিবে না—কখনও আমার নিকট এ সকল কথা মিথ্যা করিয়া বলিবে না, ইহা আমি নিশ্চিত জানি। কিন্তু তাই বলিয়া, আমার হেমচন্দ্র আমাকে বিনাপরাধে ত্যাগ করিলেন, ইহা তাঁহার মুখে না শুনিয়া কি প্রকারে অন্তঃকরণকে স্থির করিতে পারি? যদি তাঁহার নিজ মুখে শুনি যে, তিনি মৃণালিনীকে কুলটা ভাবিয়া ত্যাগ করিলেন, তবে এ প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে পারিব।

গি। প্রাণবিসর্জ্জন! সে কি মৃণালিনী?

মৃণালিনী কোন উত্তর করিলেন না। গিরিজায়ার স্কন্ধে বাহু স্থাপন করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। গিরিজায়াও রোদন করিল।

নবম পরিচ্ছেদ

অমৃতে গরল—গরলামৃত

হেমচন্দ্র আচার্য্যের কথায় বিশ্বাস করিয়া মৃণালিনীকে দুশ্চরিত্রা বিবেচনা করিয়াছিলেন; মৃণালিনীর পত্র পাঠ না করিয়া তাহা ছিন্ন-ভিন্ন করিয়াছিলেন, তাঁহার দূতীকে বেত্রাঘাত করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি যে মৃণালিনীকে ভালবাসিতেন না, তাহা নহে। মৃণালিনীর জন্য তিনি রাজ্য ত্যাগ করিয়া মথুরাবাসী হইয়াছিলেন; গুরুর প্রতি শরসন্ধান করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, মৃণালিনীর জন্য গৌড়ে নিজ ব্রত বিস্মৃত হইয়া ভিখারিণীর তোষামোদ করিয়াছিলেন। আর এখন? এখন হেমচন্দ্র মাধবাচার্য্যকে শূল দেখাইয়া বলিয়াছিলেন,—"মৃণালিনীকে এই শূলে বিদ্ধ করিব।" কিন্তু তাই বলিয়া কি এখন তাঁহার স্নেহ একেবারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল? স্নেহ কি একদিনে ধ্বংস হইয়া থাকে? বহুদিন অবধি পার্ব্বতীয় বারি পৃথিবী-হৃদয়ে বিচরণ করিয়া আপন গতিপথ নিখাত করে, এক দিনের সূর্য্যোত্তাপে কি সে নদী শুকায়? জলের যে পথ নিখাত হইয়াছে, জল সেই পথেই যাইবে; সে পথ রোধ কর, পৃথিবী ভাসিয়া যাইবে। হেমচন্দ্র সেই রাত্রিতে নিজ শয়নকক্ষে শয্যোপরি শয়ন করিয়া সেই মুক্ত বাতায়নসন্নিধানে মস্তক রাখিয়া বাতায়নপথে দৃষ্টি করিতেছিলেন—তিনি কি নৈশ শোভা দৃষ্টি করিতেছিলেন? যদি তাঁহাকে সে সময় কেহ জিজ্ঞাসা করিত যে, রাত্রি সজ্যোৎস্না কি অন্ধকার, তাহা তিনি তখন সহসা বলিতে পারিতেন না। তাঁহার হৃদয়মধ্যে যে রজনীর উদয় হইয়াছিল, তিনি কেবল তাহাই দেখিতেছিলেন। সে রাত্রি ত তখনও সজ্যোৎস্না। নহিলে তাঁহার উপাধান আর্দ্র কেন? কেবল মেঘোদয়মাত্র। যাহার হৃদয়-আকাশে অন্ধকার বিরাজ করে, সে রোদন করে না।

যে কখনও রোদন করে নাই, সে মনুষ্যমধ্যে অধম, তাহাকে কখনও বিশ্বাস করিও না। নিশ্চিত জানিও, সে পৃথিবীর সুখ কখনও ভোগ করে নাই—পরের সুখ কখনও তাহার সহ্য হয় না। এমন হইতে পারে যে, কোন আত্মচিত্তজয়ী মহাত্মা বিনা বাষ্পমোচনে গুরুতর মনঃপীড়া সকল সহ্য করিতেছেন এবং করিয়া থাকেন; কিন্তু তিনি যদি কস্মিন্‌কালে এক দিন বিরলে একবিন্দু অশ্রুজলে পৃথিবী সিক্ত না করিয়া থাকেন, তবে তিনি চিত্তবিজয়ী মহাত্মা হইলে হইতে পারেন, কিন্তু আমি বরং চোরের সহিত প্রণয় করিব, তথাপি তাঁহার সঙ্গে নহে।

হেমচন্দ্র রোদন করিতেছিলেন,—যাহাকে পাপিষ্ঠা, মনে স্থান দিবার অযোগ্যা বলিয়া জানিয়াছিলেন, তাহার জন্য রোদন করিতেছিলেন। মৃণালিনীর কি তিনি দোষ আলোচনা করিতেছিলেন? তাহা করিতেছিলেন বটে, কিন্তু কেবল তাহাই নহে। এক একবার মৃণালিনীর প্রেম-

পরিপূর্ণ মুখমণ্ডল, প্রেমপরিপূর্ণ কথা, প্রেমপরিপূর্ণ কার্য্য সকল মনে করিতেছিলেন। সেই মৃণালিনী কি অবিশ্বাসিনী? এক দিন মথুরায় হেমচন্দ্র মৃণালিনীর নিকট একখানি লিপি প্রেরণ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন, উপযুক্ত বাহক পাইলেন না; কিন্তু মৃণালিনীকে গবাক্ষপথে দেখিতে পাইলেন। তখন হেমচন্দ্র একটি আম্রফলের উপরে আবশ্যক কথা লিখিয়া মৃণালিনীর ক্রোড় লক্ষ্য করিয়া বাতায়ন-পথে প্রেরণ করিলেন; আম্র ধরিবার জন্য মৃণালিনী কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া আসাতে আম্র মৃণালিনীর ক্রোড়ে না পড়িয়া তাঁহার কর্ণে লাগিল, অমনি ভদাঘাতে কর্ণবিলম্বী রত্নকুণ্ডল কর্ণ ছিন্নভিন্ন করিয়া কাটিয়া পড়িল; কর্ণস্রুত রুধিরে মৃণালিনীর গ্রীবা ভাসিয়া গেল। মৃণালিনী ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। কর্ণে হস্তও দিলেন না; হাসিয়া আম্র তুলিয়া লিপি পাঠ পূর্ব্বক তখনই তৎপৃষ্ঠে প্রত্যুত্তর লিখিয়া আম্র প্রতিপ্রেরণ করিলেন এবং যতক্ষণ হেমচন্দ্র দৃষ্টিপথে রহিলেন, ততক্ষণ বাতায়নে থাকিয়া হাস্যমুখে দেখিতে লাগিলেন। হেমচন্দ্রের তাহা মনে পড়িল। সেই মৃণালিনী কি অবিশ্বাসিনী? ইহা সম্ভব নহে। আর এক দিন মৃণালিনীকে বৃশ্চিক দংশন করিয়াছিল। তাহার যন্ত্রণায় মৃণালিনী মুমূর্ষুবৎ কাতর হইয়াছিলেন। তাঁহার এক জন পরিচারিকা তাহার উত্তম ঔষধ জানিত; তৎপ্রয়োগ-মাত্র যন্ত্রণা একেবারে শীতল হয়; দাসী শীঘ্র ঔষধ আনিতে গেল। ইত্যবসরে হেমচন্দ্রের দূতী গিয়া কহিল যে, হেমচন্দ্র উপবনে তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছেন। মুহূর্ত্তমধ্যে ঔষধ আসিত, কিন্তু মৃণালিনী তাহার অপেক্ষা করেন নাই; অমনি সেই মরণাধিক যন্ত্রণা বিস্মৃত হইয়া উপবনে উপস্থিত হইলেন। আর ঔষধ প্রয়োগ হইল না। হেমচন্দ্রের তাহা স্মরণ হইল। সেই মৃণালিনী ব্রাহ্মণকুলকলঙ্ক ব্যোমকেশের জন্য হেমচন্দ্রের কাছে অবিশ্বাসিনী হইবে? না, তা কখনই হইতে পারে না। আর এক দিন হেমচন্দ্র মথুরা হইতে গুরুদর্শনে যাইতেছিলেন, মথুরা হইতে এক প্রহরের পথ আসিয়া হেমচন্দ্রের পীড়া হইল। তিনি এক পান্থনিবাসে পড়িয়া রহিলেন, কোন প্রকারে এ সংবাদ অন্তঃপুরে মৃণালিনীর কর্ণে প্রবেশ করিল। মৃণালিনী সেই রাত্রিতে এক ধাত্রীমাত্র সঙ্গে লইয়া রাত্রিকালে সেই এক যোজন পথ পদব্রজে অতিক্রম করিয়া হেমচন্দ্রকে দেখিতে আসিলেন। যখন মৃণালিনী পান্থনিবাসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন তিনি পথশ্রান্তিতে প্রায় নির্জীব। চরণ ক্ষতবিক্ষত—রুধির বহিতেছিল। সেই রাত্রিতেই মৃণালিনী পিতার ভয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। গৃহে আসিয়া তিনি স্বয়ং পীড়িতা হইলেন। হেমচন্দ্রের তাহাও মনে পড়িল। সেই মৃণালিনী নরাধম ব্যোমকেশের জন্য তাঁহাকে ত্যাগ করিবে? সে কি অবিশ্বাসিনী হইতে পারে? যে এমন কথায় বিশ্বাস করিবে, সে অবিশ্বাসী, সে নরাধম, সে গণ্ডমূর্খ। হেমচন্দ্র শতবার ভাবিতে-ছিলেন, "কেন আমি মৃণালিনীর পত্র পড়িলাম না? নবদ্বীপে কেন আসিয়াছে, তাহাই বা কেন জানিলাম না?" পত্রখণ্ডগুলি যে বনে নিক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন, তাহা যদি সেখানে পাওয়া যায়, তবে তাহা যুক্ত করিয়া যত দূর পারেন, তত দূর মর্ম্মাবগত হইবেন, এইরূপ প্রত্যাশা করিয়া একবার সেই বন পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন; কিন্তু সেখানে বন-তলস্থ অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পায়েন নাই। বায়ু লিপিখণ্ড সকল উড়াইয়া লইয়া গিয়াছে। যদি তখন আপন দক্ষিণ বাহু ছেদন করিয়া দিলে হেমচন্দ্র সেই লিপিখণ্ডগুলি পাইতেন, তবে হেমচন্দ্র তাহাই দিতেন।

আবার ভাবিতেছিলেন, "আচার্য্য কেন মিথ্যা কথা বলিবেন? আচার্য্য অত্যন্ত সত্যনিষ্ঠ—কখনও মিথ্যা বলিবেন না। বিশেষ আমাকে পুত্রাধিক স্নেহ করেন—জানেন, এ সংবাদে আমার মরণাধিক যন্ত্রণা হইবে, কেন আমাকে তিনি মিথ্যা কথা বলিয়া এত যন্ত্রণা দিবেন? আর তিনিও স্বেচ্ছা-ক্রমে এত কথা বলেন নাই। আমি সদর্পে তাঁহার নিকট কথা বাহির করিয়া লইলাম—যখন আমি বলিলাম যে, আমি সকলই অবগত আছি—তখনই তিনি কথা বলিলেন। মিথ্যা বলিবার উদ্দেশ্য থাকিলেও বলিতে অনিচ্ছুক হইবেন কেন? তবে হইতে পারে, হৃষীকেশ তাঁহার নিকট মিথ্যা বলিয়া থাকিবে। কিন্তু হৃষীকেশই বা অকারণে গুরুর নিকট মিথ্যা বলিবে কেন? আর মৃণালিনীই বা তাঁহার গৃহ ত্যাগ করিয়া নবদ্বীপে আসিবে কেন?"

যখন এইরূপ ভাবেন, তখন হেমচন্দ্রের মুখ কালিমাময় হয়, ললাট ঘর্ম্মসিক্ত হয়; তিনি শয়ন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া বসেন; দন্তে অধর দংশন করেন, লোচন আরক্ত এবং বিস্ফারিত হয়। শূলধারণ জন্য হস্ত মুষ্টিবদ্ধ হয়। আবার মৃণালিনীর প্রেমময় মুখমণ্ডল মনে পড়ে, অমনি ছিন্নমূল বৃক্ষের

ন্যায় শয্যায় পতিত হয়েন, উপাধানে মুখ লুক্কায়িত করিয়া শিশুর ন্যায় রোদন করেন। হেমচন্দ্র ঐরূপ রোদন করিতেছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার শয়ন-গৃহের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। গিরিজায়া প্রবেশ করিল।

হেমচন্দ্র প্রথমে মনে করিলেন, মনোরমা। তখনই দেখিলেন, সে কুসুমময়ী মূর্ত্তি নহে। পরে চিনিলেন যে, গিরিজায়া। প্রথমে বিস্মিত, পরে আহ্লাদিত, শেষে কৌতূহলাক্রান্ত হইলেন। বলিলেন, "তুমি আবার কেন ?"

গিরিজায়া কহিল, "আমি মৃণালিনীর দাসী। মৃণালিনীকে আপনি ত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু আপনি মৃণালিনীর ত্যাজ্য নহেন। সুতরাং আমাকে আবার আসিতে হইয়াছে। আমাকে বেত্রাঘাত করিতে সাধ থাকে, করুন। ঠাকুরাণীর জন্য এবার তাহা সহিব, স্থিরসঙ্কল্প করিয়াছি।"

এ তিরস্কারে হেমচন্দ্র অত্যন্ত অপ্রতিভ হইলেন। বলিলেন, "তোমার কোন শঙ্কা নাই। স্ত্রীলোককে আমি মারিব না। তুমি কেন আসিয়াছ ? মৃণালিনী কোথায় ? বৈকালে তুমি বলিয়াছিলে, তিনি নবদ্বীপে আসিয়াছেন; নবদ্বীপে আসিয়াছেন কেন ? আমি তাঁহার পত্র না পড়িয়া ভাল করি নাই।"

গি। মৃণালিনী নবদ্বীপে আপনাকে দেখিতে আসিয়াছেন।

হেমচন্দ্রের শরীর কণ্টকিত হইল। এই মৃণালিনীকে কুলটা বলিয়া অবমানিত করিয়াছেন ? তিনি পুনরপি গিরিজায়াকে কহিলেন, "মৃণালিনী কোথায় আছেন ?"

গি। তিনি আপনার নিকট জন্মের শোধ বিদায় লইতে আসিয়াছেন। সরোবর-তীরে দাঁড়াইয়া আছেন। আপনি আসুন।

এই বলিয়া গিরিজায়া চলিয়া গেল। হেমচন্দ্র তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন।

গিরিজায়া বাপীতীরে, যথায় মৃণালিনী সোপানোপরি বসিয়া ছিলেন, তথায় উপনীত হইল। হেমচন্দ্রও তথায় আসিলেন। গিরিজায়া কহিল, "ঠাকুরাণি ! উঠ। রাজপুত্র আসিয়াছেন।"

মৃণালিনী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। উভয়ে উভয়ের মুখ নিরীক্ষণ করিলেন। মৃণালিনীর দৃষ্টিলোপ হইল; অশ্রুজলে চক্ষু পূরিয়া গেল। অবলম্বনশাখা ছিন্ন হইলে যেমন শাখাবিলম্বিনী লতা ভূতলে পড়িয়া যায়, মৃণালিনী সেইরূপ হেমচন্দ্রের পদমূলে পতিত হইলেন। গিরিজায়া অন্তরে গেল।

দশম পরিচ্ছেদ

এত দিনের পর

হেমচন্দ্র মৃণালিনীকে হস্তে ধরিয়া তুলিলেন। উভয়ে উভয়ের সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইলেন।

এত কাল পরে দুই জনের সাক্ষাৎ হইল। যেদিন প্রদোষকালে যমুনার উপকূলে নৈদাঘানিল-সন্তাড়িত বকুলমূলে দাঁড়াইয়া, নীলাম্বুময়ীর চঞ্চল-তরঙ্গশিরে নক্ষত্ররশ্মির প্রতিবিম্ব নিরীক্ষণ করিতে করিতে উভয়ে উভয়ের নিকট সজলনয়নে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার পর এই সাক্ষাৎ হইল। নিদাঘের পর বর্ষা গিয়াছে, বর্ষার পর শরৎ যায়, কিন্তু ইঁহাদের হৃদয়মধ্যে যে কত দিন গিয়াছে, তাহা কি ঋতুগণনায় গণিত হইতে পারে ?

সেই নিশীথসময়ে স্বচ্ছসলিলা-বাপীতীরে, দুই জনে পরস্পর সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইলেন। চারিদিকে সেই নিবিড় বন, ঘনবিন্যস্ত লতাগুল্মবিশোভী বিশাল বিটপিসকল দৃষ্টিপথ রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল; সম্মুখে নীলনীরদখণ্ডবৎ দীর্ঘিকা শৈবাল-কুমুদ-কহ্লার সহিত বিস্তৃত রহিয়াছিল। মাথার উপরে চন্দ্র-নক্ষত্র-জলদ সহিত আকাশ আলোকে হাসিতেছিল। চন্দ্রালোক—আকাশে, বৃক্ষশিরে, লতাপল্লবে, বাপীসোপানে, নীলজলে—সর্ব্বত্র হাসিতেছিল। প্রকৃতি স্পন্দনহীনা, ধৈর্য্যময়ী। সেই ধৈর্য্যময়ী প্রকৃতির প্রাসাদমধ্যে মৃণালিনী-হেমচন্দ্র মুখে মুখে দাঁড়াইলেন।

ভাষায় কি শব্দ ছিল না ? তাঁহাদিগের মনে কি বলিবার কথা ছিল না ? যদি মনে বলিবার কথা ছিল, ভাষায় শব্দ ছিল, তবে কেন তাঁহারা কথা কহেন না ? তখন চক্ষুর দেখাতেই মন উন্মত্ত—কথা কহিবেন কি প্রকারে ? এ সময় কেবলমাত্র প্রণয়ীর নিকট অবস্থিতিতে এত সুখ যে, হৃদয়মধ্যে অন্য সুখের স্থান থাকে না। যে সে সুখ ভোগ করিতে থাকে, সে আর কথার সুখ বাসনা করে না।

সে সময়ে এত কথা বলিবার থাকে যে, কোন্ কথা আগে বলিব, তাহা কেহ স্থির করিতে পারে না।

মনুষ্যভাষায় এমন কোন শব্দ আছে যে, সে সময়ে প্রযুক্ত হইতে পারে ?

তাঁহারা পরস্পরের মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন ; হেমচন্দ্র মৃণালিনীর সেই প্রেমময় মুখ আবার দেখিলেন—হৃষীকেশ-বাক্যে প্রত্যয় দূর হইতে লাগিল, সেই গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে ত পবিত্রতা লেখা আছে। হেমচন্দ্র তাঁহার লোচন প্রতি চাহিয়া রহিলেন ; সেই অপূর্ব্ব আয়তনশালী ইন্দীবর-নিন্দি অন্তঃকরণের দর্পণরূপ চক্ষুঃপ্রতি চাহিয়া রহিলেন—তাহা হইতে কেবল প্রেমাশ্রু বহিতেছে ! সে চক্ষুঃ যাহার,—সে কি অবিশ্বাসিনী ?

হেমচন্দ্র প্রথমে কথা কহিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "মৃণালিনি ! কেমন আছ ?"

মৃণালিনী উত্তর করিতে পারিলেন না। এখনও তাঁহার চিত্ত শান্ত হয় নাই ; উত্তরের উপক্রম করিলেন, কিন্তু আবার চক্ষুঃ জলে ভাসিয়া গেল। কণ্ঠ রুদ্ধ হইল। কথা সরিল না।

হেমচন্দ্র আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কেন আসিয়াছ ?"

মৃণালিনী তথাপি উত্তর করিতে পারিলেন না। হেমচন্দ্র তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া সোপানোপরি বসাইলেন, স্বয়ং নিকটে বসিলেন, মৃণালিনীর যে কিছু চিত্তের স্থিরতা ছিল, এই আদরে তাহার লোপ হইল। ক্রমে ক্রমে তাঁহার মস্তক আপনি আসিয়া হেমচন্দ্রের স্কন্ধে স্থাপিত হইল, মৃণালিনী তাহা জানিয়াও জানিতে পারিলেন না। মৃণালিনী আবার রোদন করিলেন—তাঁহার অশ্রুজলে হেমচন্দ্রের স্কন্ধ, বক্ষঃ প্লাবিত হইল। এ সংসারে মৃণালিনী যত সুখ অনুভব করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কোন সুখই এই রোদনের তুল্য নহে।

হেমচন্দ্র আবার কথা কহিলেন, "মৃণালিনি ! আমি তোমার নিকট গুরুতর অপরাধ করিয়াছি। সে অপরাধ আমার ক্ষমা করিও। আমি তোমার নামে কলঙ্ক-রটনা শুনিয়া তাহা বিশ্বাস করিয়াছিলাম। বিশ্বাস করিবার কতক কারণও ঘটিয়াছিল—তাহা তুমি দূর করিতে পারিবে। যাহা আমি জিজ্ঞাসা করি, তাহার পরিষ্কার উত্তর দাও।"

মৃণালিনী হেমচন্দ্রের স্কন্ধ হইতে মস্তক না তুলিয়া কহিলেন, "কি ?"

হেমচন্দ্র কহিলেন, "তুমি হৃষীকেশের গৃহত্যাগ করিলে কেন ?"

ঐ নাম শ্রবণমাত্র কুপিতা ফণিনীর ন্যায় মৃণালিনী মাথা তুলিল। কহিল, "হৃষীকেশ আমাকে গৃহ হইতে বিদায় করিয়া দিয়াছে।"

হেমচন্দ্র ব্যথিত হইলেন—অল্প সন্দিহান হইলেন, কিঞ্চিৎ চিন্তা করিলেন। এই অবকাশে মৃণালিনী পুনরপি হেমচন্দ্রের স্কন্ধে মস্তক রাখিলেন। সে সুখাসনে শিরোরক্ষায় এত সুখ যে, মৃণালিনী তাহাতে বঞ্চিত হইয়া থাকিতে পারিলেন না।

হেমচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন তোমাকে হৃষীকেশ গৃহবহিষ্কৃত করিয়া দিল ?"

মৃণালিনী হেমচন্দ্রের হৃদয়মধ্যে মুখ লুকাইলেন। অতি মৃদুস্বরে কহিলেন, "তোমাকে কি বলিব ? হৃষীকেশ আমাকে কুলটা বলিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে।"

শ্রুতমাত্র তীরের ন্যায় হেমচন্দ্র দাঁড়াইয়া উঠিলেন। মৃণালিনীর মস্তক তাঁহার বক্ষশ্চ্যুত হইয়া সোপানে আহত হইল।

"পাপীয়সি—নিজ মুখে স্বীকৃতা হইলি !" এই কথা দন্তমধ্য হইতে ব্যক্ত করিয়া হেমচন্দ্র বেগে প্রস্থান করিলেন। পথে গিরিজায়াকে দেখিলেন, গিরিজায়া তাঁহার সজল-জলদ ভীমমূর্ত্তি দেখিয়া চমকিয়া দাঁড়াইল। লিখিতে লজ্জা করিতেছে—কিন্তু না লিখিলে নয়—হেমচন্দ্র পদাঘাতে গিরিজায়াকে পথ হইতে অপসৃত করিলেন। বলিলেন, "তুমি যাহার দূতী, তাহাকে পদাঘাত করিলে আমার চরণ কলঙ্কিত হইত।" এই বলিয়া হেমচন্দ্র চলিয়া গেলেন।

যাহার ধৈর্য্য নাই, যে ক্রোধের জন্মমাত্র অন্ধ হয়, সে সংসারে সকল সুখে বঞ্চিত। কবি কল্পনা করিয়াছেন যে, কেবল অধৈর্য্যমাত্র দোষে বীর-শ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য্যের নিপাত হইয়াছিল। "অশ্বত্থামা হতঃ" এই শব্দ শুনিয়া তিনি ধনুর্ব্বাণ ত্যাগ করিলেন। প্রশ্নান্তর দ্বারা সবিশেষ তত্ত্ব লইলেন না। হেমচন্দ্রের কেবল অধৈর্য্য নহে—অধৈর্য্য, অভিমান, ক্রোধ।

শীতল-সমীরণময়ী উষার পিঙ্গল মূর্ত্তি বাপীতীর-বনে উদয় হইল। তখনও মৃণালিনী আহত মস্তক ধারণ করিয়া সোপানে বসিয়া আছেন। গিরিজায়া জিজ্ঞাসা করিল,—"ঠাকুরাণি, আঘাত কি গুরুতর বোধ হইতেছে ?"

মৃণালিনী কহিলেন, "কিসের আঘাত ?"

গি। মাথায়।

মৃ। মাথায় আঘাত ? আমার মনে হয় না।

চতুর্থ খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

ঊর্ণনাভ

যতক্ষণ মৃণালিনীর সুখের তারা ডুবিতেছিল, ততক্ষণ গৌড়দেশের সৌভাগ্যশশীও সেই পথে যাইতেছিল। যে ব্যক্তি রাখিলে গৌড় রাখিতে পারিত, সে ঊর্ণনাভের ন্যায় বিরলে বসিয়া অভাগা জন্মভূমিকে বদ্ধ করিবার জন্য জাল পাতিতেছিল। নিশীথসময়ে নিভৃতে বসিয়া ধর্ম্মাধিকার পশুপতি নিজ দক্ষিণহস্তস্বরূপ শান্তশীলকে ভৎর্সনা করিতেছিলেন, "শান্তশীল! প্রাতে যে সংবাদ দিয়াছ, তাহা কেবল তোমার অদক্ষতার পরিচয় মাত্র। তোমার প্রতি আর কোন কার্য্যের ভার দিবার ইচ্ছা নাই।"

শান্তশীল কহিল, "যাহা অসাধ্য, তাহা পারি নাই। অন্য কার্য্যের পরিচয় গ্রহণ করুন।"

প। সৈনিকদিগকে কি উপদেশ দেওয়া হইয়াছে?

শা। এই যে, আমাদিগের আজ্ঞা না পাইলে কেহ না সাজে।

প। প্রান্তপাল ও কোষ্ঠপালদিগকে কি উপদেশ দেওয়া হইয়াছে?

শা। এই বলিয়া দিয়াছি যে, অচিরাৎ যবনসম্রাটের নিকট হইতে কর লইয়া কয় জন যবন দূতস্বরূপ আসিতেছে, তাহাদিগের গতিরোধ না করে।

প। দামোদর শর্ম্মা উপদেশানুযায়ী কার্য্য করিয়াছেন কি না?

শা। তিনি বড় চতুরের ন্যায় কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন।

প। সে কি প্রকার?

শা। তিনি একখানি পুরাতন গ্রন্থের একখানি পত্র পরিবর্ত্তন করিয়া তাহাতে আপনার রচিত কবিতাগুলি বসাইয়াছিলেন। তাহা লইয়া অদ্য প্রাতে রাজাকে শ্রবণ করাইয়াছেন এবং মাধবাচার্য্যের অনেক নিন্দা করিয়াছেন।

প। কবিতায় ভবিষ্যৎ গৌড়বিজেতার রূপবর্ণন সবিস্তারে লিখিত আছে। সে বিষয়ে মহারাজ কোন অনুসন্ধান করিয়াছিলেন?

শা। করিয়াছিলেন। মদনসেন সম্প্রতি কাশীধাম হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন, এ সংবাদ মহারাজ অবগত আছেন। মহারাজ কবিতায় ভবিষ্যৎ গৌড়জেতার অবয়ব-বর্ণনা শুনিয়া তাঁহাকে ডাকিতে পাঠাইলেন। মদনসেন উপস্থিত হইলে মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, তুমি মগধে যবন-রাজ-প্রতিনিধিকে দেখিয়া আসিয়াছ?" সে কহিল, "আসিয়াছি।" মহারাজ তখন আজ্ঞা করিলেন, "সে দেখিতে কি প্রকার, বিবৃত কর।" তখন মদনসেন, বখতিয়ার খিলিজির যথার্থ যে রূপ দেখিয়াছেন, তাহাই বিবৃত করিলেন। কবিতাতেও সেই রূপ বর্ণিত ছিল। সুতরাং গৌড়জয় ও তাঁহার রাজ্যনাশ নিশ্চিত বলিয়া বুঝিলেন।

প। তাহার পর?

শা। রাজা তখন রোদন করিতে লাগিলেন। কহিলেন, "আমি এ বৃদ্ধবয়সে কি করিব? সপরিবারে যবনহস্তে প্রাণে নষ্ট হইব দেখিতেছি।" তখন দামোদর শিক্ষামত কহিলেন, "মহারাজ! ইহার সদুপায় এই যে, অবসর থাকিতে থাকিতে আপনি সপরিবারে তীর্থযাত্রা করুন। ধর্ম্মাধিকারের প্রতি রাজকার্য্যের ভার দিয়া যাউন। তাহা হইলে আপনার শরীররক্ষা হইবে। পরে শাস্ত্র মিথ্যা হয়, রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন।" রাজা এ পরামর্শে সন্তুষ্ট হইয়া নৌকাসজ্জা করিতে আদেশ করিয়াছেন। অচিরাৎ সপরিবারে তীর্থযাত্রা করিবেন।

প। দামোদর সাধু। তুমিও সাধু। এখন আমার মনস্কামনা-সিদ্ধির সম্ভাবনা দেখিতেছি। নিতান্তপক্ষে স্বাধীন রাজা না হই, যবন-রাজ-প্রতিনিধি হইব। কার্য্যসিদ্ধি হইলে, তোমাদিগকে সাধ্যমত পুরস্কৃত করিতে ত্রুটি করিব না, তা ত জান। এক্ষণে বিদায় হও। কাল প্রাতেই যেন তীর্থযাত্রার জন্য নৌকা প্রস্তুত থাকে।

শান্তশীল বিদায় হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিনা সূতার হার

পশুপতি উচ্চ অট্টালিকায় বহু ভৃত্য সমভিব্যাহারে বাস করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহার পুরী কানন হইতেও অন্ধকার। গৃহ যাহাতে আলো

হয়, স্ত্রী, পুত্র পরিবার—এ সকল তাঁহার গৃহে ছিল না।

অদ্য শান্তশীলের সহিত কথোপকথনের পর পশুপতির সেই সকল কথা মনে পড়িল। মনে ভাবিলেন, "এত কালের পর বুঝি এ অন্ধকার পুরী আলো হইল—যদি জগদম্বা অনুকূলা হয়েন, তবে মনোরমা এ অন্ধকার ঘুচাইবে।"

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে পশুপতি শয়নের পূর্ব্বে অষ্টভুজাকে নিয়মিত প্রণাম-বন্দনাদির জন্য দেবী-মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, তথায় মনোরমা বসিয়া আছে।

পশুপতি কহিলেন, "মনোরমা, কখন্ আসিলে?" মনোরমা পূজাবশিষ্ট পুষ্পগুলি লইয়া বিনা সূত্রে মালা গাঁথিতেছিল। কথার কোন উত্তর দিল না। পশুপতি কহিলেন "আমার সঙ্গে কথা কও। যতক্ষণ তুমি থাক, ততক্ষণ সকল যন্ত্রণা বিস্মৃত হই।"

মনোরমা মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল। পশুপতির মুখপ্রতি চাহিয়া রহিল, ক্ষণেক পরে কহিল, "আমি তোমাকে কি বলিতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা আমার মনে হইতেছে না।"

পশুপতি কহিলেন, "তুমি মনে কর। আমি অপেক্ষা করিতেছি।"

পশুপতি বসিয়া রহিলেন, মনোরমা মালা গাঁথিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পরে পশুপতি কহিলেন, "আমারও কিছু বলিবার আছে, মনোযোগ দিয়া শুন। আমি এ বয়স পর্য্যন্ত কেবল বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়াছি, বিষয়ালোচনা করিয়াছি, অর্থোপার্জ্জন করিয়াছি। সংসারধর্ম্ম করি নাই। যাহাতে অনুরাগ তাহাই করিয়াছি, দারপরিগ্রহে অনুরাগ নাই, এ জন্য তাহা করি নাই। কিন্তু যে পর্য্যন্ত তুমি আমার নয়নপথে আসিয়াছ, সেই পর্য্যন্ত মনোরমালাভ আমার একমাত্র ধ্যান হইয়াছে। সেই লাভের জন্য এই নিদারুণ ব্রতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। যদি জগদীশ্বরী অনুগ্রহ করেন, তবে দুই চারি দিনের মধ্যে রাজ্য-লাভ করিব এবং তোমাকে বিবাহ করিব। ইহাতে তুমি বিধবা বলিয়া যে বিঘ্ন, আমি শাস্ত্রীয় প্রমাণের দ্বারা তাহার খণ্ডন করিতে পারিব। কিন্তু তাহাতে দ্বিতীয় বিঘ্ন এই যে, তুমি কুলীনকন্যা, জনার্দ্দন শর্ম্মা কুলীন শ্রেষ্ঠ, আমি শ্রোত্রিয়।"

মনোরমা এ সকল কথায় কর্ণপাত করিতেছিল কি না সন্দেহ। পশুপতি দেখিলেন যে, মনোরমা চিত্ত হারাইয়াছে। পশুপতি সরলা আবক্তা বালিকা মনোরমাকে ভালবাসিতেন, প্রৌঢ়া তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী মনোরমাকে ভয় করিতেন। কিন্তু অদ্য ভাবান্তরে সন্তুষ্ট হইলেন না। তথাপি পুনরুদ্যম করিয়া পশুপতি কহিলেন, "কিন্তু কুলরীতি ত শাস্ত্রমূলক নহে, কুলনাশে ধর্ম্মনাশ বা জাতিভ্রংশ হয় না। তাঁহার অজ্ঞাতে যদি তোমাকে বিবাহ করিতে পারি, তবে ক্ষতি কি? তুমি সম্মত হইলেই তাহা পারি। পরে তোমার পিতামহ জানিতে পারিলে বিবাহ ত ফিরিবে না।"

মনোরমা কোন উত্তর করিল না। সে সকল শ্রবণ করিয়াছিল কি না সন্দেহ। একটি কৃষ্ণবর্ণ মার্জ্জার তাহার নিকটে আসিয়া বসিয়াছিল, সে সেই বিনা সূত্রের মালা তাহার গলদেশে পরাইতেছিল। পরাইতে মালা খুলিয়া গেল। মনোরমা তখন আপন মস্তক হইতে কেশগুচ্ছ ছিন্ন করিয়া তৎসূত্রে আবার মালা গাঁথিতে লাগিল।

পশুপতি উত্তর না পাইয়া নিঃশব্দে মালাকুসুম মধ্যে মনোরমার অনুপম অঙ্গুলীর গতি মুগ্ধলোচনে দেখিতে লাগিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিহঙ্গী পিঞ্জরে

পশুপতি মনোরমার বুদ্ধি-প্রদীপ জ্বালিবার অনেক যত্ন করিতে লাগিলেন, কিন্তু ফলোৎপত্তি কঠিন হইল। পরিশেষে বলিলেন, "মনোরমা রাত্রি অধিক হইয়াছে, আমি শয়নে যাই।"

মনোরমা অম্লান বদনে কহিলেন—"যাও।"

পশুপতি শয়নে গেলেন না; বসিয়া মালা গাঁথা দেখিতে লাগিলেন। আবার উপায়ান্তরস্বরূপ ভয়সূচক চিন্তার আবির্ভাবে কার্য্যসিদ্ধি হইবে ভাবিয়া, মনোরমাকে ভীতা করিবার জন্য পশুপতি কহিলেন, "মনোরমা, যদি ইতিমধ্যে যবন আইসে, তবে তুমি কোথায় যাইবে?"

মনোরমা মালা হইতে মুখ না তুলিয়া কহিল, "বাড়ীতে থাকিব।"

পশুপতি কহিলেন, "বাটীতে তোমাকে কে রক্ষা করিবে?"

মনোরমা পূর্ব্ববৎ অন্যমনে কহিল, "জানি না। নিরুপায়।"

পশুপতি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আমাকে কি বলিতে মন্দিরে আসিয়াছ?"

ম। দেবতা প্রণাম করিতে।

পশুপতি বিরক্ত হইলেন। কহিলেন, "তোমাকে মিনতি করিতেছি, মনোরমা, এইবার যাহা বলিতেছি, তাহা মনোযোগ দিয়া শুন—তুমি আজিও বল, আমাকে বিবাহ করিবে কি না?"

মনোরমার মালা গাঁথা সম্পন্ন হইয়াছিল,—সে তাহা একটা কৃষ্ণবর্ণ মার্জ্জারের গলায় পরাইতেছিল। পশুপতির কথা কর্ণে গেল না। মার্জ্জার মালা পরিধানে বিশেষ অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেছিল—যতবার মনোরমা মালা তাহার গলায় দিতেছিল, ততবার সে মালার ভিতর হইতে মস্তক বাহির করিয়া লইতেছিল—মনোরমা কুন্দনিন্দিত দন্তে অধরদংশন করিয়া ঈষৎ হাসিতেছিল, আবার মালা তাহার গলায় দিতেছিল। পশুপতি অধিকতর বিরক্ত হইয়া বিড়ালকে এক চপেটাঘাত করিলেন—বিড়াল উর্দ্ধলাঙ্গুল হইয়া দূরে পলায়ন করিল। মনোরমা সেইরূপ দংশিতাধরে হাসিতে হাসিতে করস্থ মালা পশুপতির মস্তকে পরাইয়া দিল।

মার্জ্জার-প্রসাদ মস্তকে পাইয়া রাজপ্রসাদভোগী ধর্ম্মাধিকার হতবুদ্ধি হইয়া রহিলেন। অল্প ক্রোধ হইল—কিন্তু দংশিতাধরা হাস্যময়ীর তৎকালীন অনুপম রূপমাধুরী দেখিয়া তাঁহার মস্তক ঘুরিয়া গেল। তিনি মনোরমাকে আলিঙ্গন করিবার জন্য বাহু প্রসারণ করিলেন—অমনি মনোরমা লম্ফ দিয়া দূরে দাঁড়াইল—পথিমধ্যে উন্নতফণা কালসর্প দেখিয়া পথিক যেমন দূরে দাঁড়ায়, সেইরূপ দাঁড়াইল।

পশুপতি অপ্রতিভ হইলেন; ক্ষণেক মনোরমার মুখপ্রতি চাহিতে পারিলেন না—পরে চাহিয়া দেখিলেন—মনোরমা প্রৌঢ়বয়ঃপ্রফুল্লমুখী মহিমময়ী সুন্দরী।

পশুপতি কহিলেন, "মনোরমা, দোষ ভাবিও না। তুমি আমার পত্নী—আমাকে বিবাহ কর।"

মনোরমা পশুপতির মুখপ্রতি তীব্র কটাক্ষ করিয়া কহিল—"পশুপতি! কেশবের কন্যা কোথায়?"

পশুপতি কহিলেন, "কেশবের কন্যা কোথায়, জানি না—জানিতেও চাহি না। তুমি আমার একমাত্র পত্নী।"

ম। আমি জানি, কেশবের মেয়ে কোথায়—বলিব?

পশুপতি অবাক্ হইয়া মনোরমার মুখপ্রতি চাহিয়া রহিলেন। মনোরমা বলিতে লাগিল,—

"এক জন জ্যোতির্ব্বিদ্ গণনা করিয়া বলিয়াছিল যে, কেশবের মেয়ে অল্পবয়সে বিধবা হইয়া স্বামীর অনুমৃতা হইবে। কেশব এই কথায়, অল্পকালে মেয়েকে হারাইবার ভয়ে বড়ই দুঃখিত হইয়াছিলেন। তিনি ধর্ম্মনাশের ভয়ে মেয়েকে পাত্রস্থ করিলেন, কিন্তু বিধিলিপি খণ্ডাইবার ভরসায় বিবাহের রাত্রিতেই মেয়ে লইয়া প্রয়াগে পলায়ন করিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় এই ছিল যে, তাঁহার মেয়ে স্বামীর মৃত্যুসংবাদ কস্মিন্‌কালে না পাইতে পারেন। দৈবাধীন কিছুকাল পরে প্রয়াগে কেশবের মৃত্যু হইল। তাঁহার মেয়ে পূর্ব্বেই মাতৃহীনা হইয়াছিল—এখন মৃত্যুকালে কেশব হৈমবতীকে আচার্য্যের হাতে সমর্পণ করিয়া গেলেন। মৃত্যুকালে কেশব আচার্য্যকে এই কথা বলিয়া গেলেন—'এই অনাথা মেয়েটিকে আপনার গৃহে রাখিয়া প্রতিপালন করিবেন। ইহার স্বামী পশুপতি—কিন্তু জ্যোতির্ব্বিদেরা বলিয়া গিয়াছেন যে, ইনি অল্প বয়সে স্বামীর অনুমৃতা হইবেন। অতএব আপনি আমার নিকট স্বীকার করুন যে, এই মেয়েকে কখনও বলিবেন না যে, পশুপতি ইহার স্বামী। অথবা পশুপতিকে কখনও জানাইবেন না যে, ইনি তাঁহার স্ত্রী।'

"আচার্য্য সেইরূপ অঙ্গীকার করিলেন। সেই পর্য্যন্ত তিনি তাহাকে পরিবারস্থ করিয়া প্রতিপালন করিয়া তোমার সঙ্গে বিবাহের কথা লুকাইয়াছেন।"

প। এখন সে কন্যা কোথায়?

ম। আমিই কেশবের মেয়ে। জনার্দ্দন শর্ম্মা তাঁহার আচার্য্য।

পশুপতি চিত্ত হারাইলেন; তাঁহার মস্তক ঘুরিতে লাগিল। তিনি বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া প্রতিমা-সমীপে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। পরে গাত্রোত্থান করিয়া মনোরমাকে বক্ষে ধারণ করিতে গেলেন। মনোরমা পূর্ব্ববৎ সরিয়া দাঁড়াইল। কহিল,—"এখন নয়—আরও কথা আছে।"

প। মনোরমা—রাক্ষসি! এত দিন কেন আমাকে অন্ধকারে রাখিয়াছিলে?

ম। কেন? তুমি কি আমার কথায় বিশ্বাস করিতে?

প। মনোরমা, তোমার কথায় কবে আমি অবিশ্বাস করিয়াছি? আর যদিই আমার অপ্রত্যয় জন্মিত, তবে আমি জনার্দ্দন শর্ম্মাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারিতাম।

ম। জনার্দ্দন কি তাহা প্রকাশ করিতেন? তিনি শিষ্যের নিকট সত্যে বদ্ধ আছেন।

প। তবে তোমার কাছে প্রকাশ করিলেন কেন?

ম। তিনি আমার নিকট প্রকাশ করেন নাই। এক দিন গোপনে ব্রাহ্মণীর নিকট প্রকাশ করিতেছিলেন। আমি দৈবাৎ গোপনে শুনিয়াছিলাম। আরও, আমি বিধবা বলিয়া পরিচিতা। তুমি আমার কথায় প্রত্যয় করিলে লোকে প্রত্যয় করিবে কেন? তুমি লোকের কাছে নিন্দনীয় না হইয়া কি প্রকারে আমাকে গ্রহণ করিতে?

প। আমি সকল লোককে একত্র করিয়া তাহাদিগকে বুঝাইয়া বলিতাম।

ম। ভাল, তাহাই হউক—জ্যোতির্ব্বিদের গণনা?

প। আমি গ্রহশান্তি করাইতাম। ভাল, যাহা হইবার, তাহা হইয়া গিয়াছে।—এক্ষণে যদি আমি রত্ন পাইয়াছি, তবে আর তাহা গলা হইতে নামাইব না। তুমি আর আমার ঘর ছাড়িয়া যাইতে পারিবে না।

মনোরমা কহিল, "এ ঘর ছাড়িতে হইবে। পশুপতি! আমি যাহা আজি বলিতে আসিয়াছিলাম, তাহা বলি, শুন। এ ঘর ছাড়। তোমার রাজ্যলাভের দুরাশা ছাড়। প্রভুর অহিত-চেষ্টা ছাড়। এ দেশ ছাড়িয়া চল, আমরা কাশীধামে যাত্রা করি। সেইখানে আমি তোমার চরণসেবা করিয়া জন্ম সার্থক করিব। যে দিন আমাদের আয়ুঃশেষ হইবে, একত্রে পরমধামে যাত্রা করিব। যদি ইহা স্বীকার কর—আমার ভক্তি অচলা থাকিবে। নহিলে—"

প। নহিলে কি?

মনোরমা তখন উন্নতমুখে সবাষ্পলোচনে, দেবীপ্রতিমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া যুক্তকরে, গদ্গদকণ্ঠে কহিল,—"নহিলে দেবীসমক্ষে শপথ করিতেছি, তোমায় আমায় এই সাক্ষাৎ, এজন্মে আর সাক্ষাৎ হইবে না।"

পশুপতিও দেবীর সমক্ষে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন,—"মনোরমা—আমিও শপথ করিতেছি, আমার জীবন থাকিতে তুমি আমার বাড়ী ছাড়িয়া যাইতে পারিবে না। মনোরমা আমি যে পথে পদার্পণ করিয়াছি, সে পথ হইতে ফিরিবার উপায় থাকিলে আমি ফিরিতাম—তোমাকে লইয়া সর্ব্বত্যাগী হইয়া কাশীযাত্রা করিতাম। কিন্তু অনেক দূর গিয়াছি। আর ফিরিবার উপায় নাই—যে গ্রন্থি বাঁধিয়াছি, তাহা আর খুলিতে পারি না—স্রোতে ভেলা ভাসাইয়া আর ফিরাইতে পারি না। যাহা ঘটিবার, তাহা ঘটিয়াছে। তাই বলিয়া কি আমার পরম সুখে আমি বঞ্চিত হইব? তুমি আমার স্ত্রী, আমার কপালে যাই থাকুক, আমি তোমাকে গৃহিণী করিব। তুমি ক্ষণেক অপেক্ষা কর—আমি শীঘ্র আসিতেছি।"

এই বলিয়া পশুপতি মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন। মনোরমার চিত্তে সংশয় জন্মিল। সে চিন্তিতান্তঃকরণে কিয়ৎক্ষণ মন্দিরমধ্যে দাঁড়াইয়া রহিল। আর একবার পশুপতির নিকট বিদায় না লইয়া যাইতে পারিল না।

অল্পকাল পরেই পশুপতি ফিরিয়া আসিলেন। বলিলেন, "প্রাণাধিকে! আজ আর তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে পারিবে না। আমি সকল দ্বার রুদ্ধ করিয়া আসিয়াছি।"

মনোরমা-বিহঙ্গী পিঞ্জরে বদ্ধ হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

যবনদূত—যমদূত বা

বেলা প্রহরেকের সময় নগরবাসীরা বিস্মিতলোচনে দেখিল, কোন অপরিচিত-জাতীয় সপ্তদশ অশ্বারোহী পুরুষ রাজপথ অতিবাহিত করিয়া রাজভবনাভিমুখে যাইতেছে। তাহাদিগের আকারইঙ্গিত দেখিয়া নবদ্বীপবাসীরা ধন্যবাদ করিতে লাগিল। তাহাদিগের শরীর আয়ত, দীর্ঘ অথচ পুষ্ট; তাহাদিগের বর্ণ তপ্তকাঞ্চন-সন্নিভ; তাহাদিগের মুখমণ্ডল বিস্তৃত, ঘনকৃষ্ণ-শ্মশ্রুরাজি-বিভূষিত; নয়ন প্রশস্ত, জ্বালাবিশিষ্ট। তাহাদিগের পরিচ্ছদ অনর্থক চাকচিক্যবিবর্জ্জিত; তাহাদিগের যোদ্ধবেশ, সর্ব্বাঙ্গ প্রহরণজালমণ্ডিত, লোচনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। আর যে সকল সিন্ধুপারজাত অশ্বপৃষ্ঠে তাহারা আরোহণ করিয়া যাইতেছিল, তাহারাই বা কি মনোহর! পর্ব্বতশিলাখণ্ডের ন্যায় বৃহদাকার, বিমার্জ্জিতদেহ, বক্রগ্রীব, বল্গারোধ-অসহিষ্ণু তেজোগর্ব্বে নৃত্যশীল। আরোহীরা কিবা তচ্চালনকৌশলী—অবলীলাক্রমে সেই বদ্ধবায়ুতুল্য তেজঃপ্রখর অশ্ব সকল দমিত করিতেছে। দেখিয়া গৌড়বাসীরা বহুতর প্রশংসা করিল।

সপ্তদশ অশ্বারোহী দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় অধরৌষ্ঠ সংশ্লিষ্ট করিয়া নীরবে রাজপুরাভিমুখে চলিল। কৌতূহলবশতঃ কোন নগরবাসী কিছু জিজ্ঞাসা করিলে, সমভিব্যাহারী এক জন ভাষাজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়া দিতে লাগিল, "ইহারা যবন রাজার দূত।" এই বলিয়া ইহারা প্রান্তপাল ও কোষ্ঠপালদিগের নিকট পরিচয় দিয়াছিল—এবং পশুপতির আজ্ঞাক্রমে সেই পরিচয়ে নির্ব্বিঘ্নে নগরমধ্যে প্রবেশলাভ করিল।

সপ্তদশ অশ্বারোহী রাজদ্বারে উপনীত হইল। বৃদ্ধ রাজার শৈথিল্য আর পশুপতির কৌশলে রাজপুরী প্রায় রক্ষকহীন। রাজসভা ভঙ্গ হইয়াছিল—পুরীমধ্যে কেবল পৌরজন ছিল মাত্র—অল্প সংখ্যক দৌবারিক দ্বার রক্ষা করিতেছিল। এক জন দৌবারিক জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা কি জন্য আসিয়াছ?"

যবনেরা উত্তর করিল, "আমরা যবন রাজপ্রতিনিধির দূত; গৌড়রাজের সহিত সাক্ষাৎ করিব।"

দৌবারিক কহিল, "মহারাজাধিরাজ গৌড়েশ্বর এক্ষণে অন্তঃপুরে গমন করিয়াছেন—এখন সাক্ষাৎ হইবে না।"

যবনেরা নিষেধ না শুনিয়া মুক্ত দ্বারপথে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইল। সর্ব্বাগ্রে একজন খর্ব্বকায় দীর্ঘবাহু কুরূপ যবন। দুর্ভাগ্যবশতঃ দৌবারিক তাহার গতিরোধ জন্য শূলহস্তে তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল। কহিল, "ফের—নচেৎ এখনই মারিব।"

"আপনিই তবে মর!" এই বলিয়া ক্ষুদ্রকায় যবন দৌবারিককে নিজ করস্থ তরবারে ছিন্ন করিল। দৌবারিক প্রাণত্যাগ করিল। তখন আপন সঙ্গীদিগের মুখাবলোকন করিয়া ক্ষুদ্রকায় যবন কহিল, "এক্ষণে আপন আপন কার্য্য কর।" অমনি বাক্যহীন ষোড়শ অশ্বারোহীদিগের মধ্যে ভীষণ জয়ধ্বনি সমুত্থিত হইল। তখন সেই ষোড়শ যবনের কটিবন্ধ হইতে ষোড়শ অসিফলক নিষ্কোষিত হইল—এবং অশনিসম্পাতসদৃশ তাহারা দৌবারিকদিগকে আক্রমণ করিল। দৌবারিকেরা রণসজ্জায় ছিল না—অকস্মাৎ নিরুদ্যোগে আক্রান্ত হইয়া আত্মরক্ষার কোন চেষ্টা করিতে পারিল না—মুহূর্তমধ্যে সকলেই নিহত হইল।

ক্ষুদ্রকায় যবন কহিল, "যেখানে যাহাকে পাও, বধ কর। পুরী অরক্ষিতা—বৃদ্ধ রাজাকে বধ কর।"

তখন যবনেরা পুরমধ্যে তড়িতের ন্যায় প্রবেশ করিয়া বালবৃদ্ধবনিতা পৌরজন যেখানে যাহাকে দেখিল, তাহাকে অসি দ্বারা ছিন্নমস্তক, অথবা শূলাগ্রে বিদ্ধ করিল।

পৌরজন তুমুল আর্ত্তনাদ করিয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। সেই ঘোর আর্ত্তনাদ অন্তঃপুরে যথা বৃদ্ধ রাজা ভোজন করিতেছিলেন, তথা প্রবেশ করিল। তাঁহার মুখ শুকাইল। জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ঘটিয়াছে—যবন আসিয়াছে?"

পলায়নতৎপর পৌরজনেরা কহিল, "যবন সকলকে বধ করিয়া আপনাকে বধ করিতে আসিতেছে।"

কবলিত অন্নগ্রাস রাজার মুখ হইতে পড়িয়া গেল। তাঁহার শুষ্ক শরীর জলস্রোতঃপ্রহত বেতসের ন্যায় কাঁপিতে লাগিল। নিকটে রাজমহিষী ছিলেন—রাজা ভোজনপাত্রের উপর পড়িয়া যান দেখিয়া মহিষী তাঁহার হস্ত ধরিলেন; কহিলেন,—"চিন্তা নাই—আপনি উঠুন।" এই বলিয়া তাঁহার হস্ত ধরিয়া তুলিলেন। রাজা কলের পুত্তলিকার ন্যায় দাঁড়াইয়া উঠিলেন।

মহিষী কহিলেন, "চিন্তা কি? নৌকায় সকল দ্রব্য গিয়াছে, চলুন, আমরা খিড়কী-দ্বার দিয়া সোনারগাঁ যাত্রা করি।"

এই বলিয়া মহিষী রাজার অধৌত হস্ত ধারণ করিয়া খিড়কীদ্বারপথে সুবর্ণগ্রাম যাত্রা করিলেন। সেই রাজকুলকলঙ্ক, অসমর্থ রাজার সঙ্গে গৌড়রাজ্যের রাজলক্ষ্মীও যাত্রা করিলেন।

ষোড়শ সহচর লইয়া মর্কটাকার বখতিয়ার খিলিজি গৌড়েশ্বরের রাজপুরী অধিকার করিল।

ষষ্টি বৎসর পরে যবন-ইতিহাসবেত্তা মিন্হাজউদ্দীন এইরূপ লিখিয়াছিলেন। ইহার কতদূর সত্য, কতদূর মিথ্যা, তাহা কে জানে? যখন মনুষ্যের লিখিত চিত্রে সিংহ পরাজিত, মনুষ্য সিংহের অপমানকর্ত্তৃস্বরূপ চিত্রিত হইয়াছিল, তখন সিংহের হস্তে চিত্রফলক দিলে কিরূপ চিত্র লিখিত হইত? মনুষ্য মূষিকতুল্য প্রতীয়মান হইত সন্দেহ নাই। মন্দভাগিনী বঙ্গভূমি সহজেই দুর্ব্বলা, আবার তাহাতে শত্রুহস্তে চিত্রফলক।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

জাল ছিঁড়িল

গৌড়েশ্বরপুরে অধিষ্ঠিত হইয়াই বখতিয়ার খিলিজি ধর্ম্মাধিকারের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। ধর্ম্মাধিকারের সহিত সাক্ষাতের অভিলাষ জানাইলেন। তাঁহার সহিত যবনের সন্ধিবন্ধন হইয়াছিল, তাহার ফলোৎপাদনের সময় উপস্থিত।

পশুপতি ইষ্টদেবীকে প্রণাম করিয়া, কুপিতা মনোরমার নিকট বিদায় লইয়া, কদাচিৎ উল্লাসিত কদাচিৎ শঙ্কিতচিত্তে যবনসমীপে উপস্থিত হইলেন। বখতিয়ার খিলিজি গাত্রোত্থান করিয়া সাদরে তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন এবং কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। পশুপতি রাজভৃত্যবর্গের রক্তনদীতে চরণ প্রক্ষালন করিয়া আসিয়াছেন, সহসা কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। বখতিয়ার খিলিজি তাঁহার চিত্তের ভাব বুঝিতে পারিয়া কহিলেন,— "পণ্ডিতবর! রাজসিংহাসনে আরোহণের পথ কুসুমাবৃত নহে। এ পথে চলিতে গেলে, বন্ধুবর্গের অস্থিমুণ্ড সর্ব্বদা পদে বিদ্ধ হয়।"

পশুপতি কহিলেন, "সত্য। কিন্তু যাহারা বিরোধী, তাহাদিগেরই বধ আবশ্যক। ইহারা নির্ব্বিরোধী।"

বখতিয়ার কহিলেন, "আপনি কি শোণিত-প্রবাহ দেখিয়া, নিজ অঙ্গীকার স্মরণে অসুখী হইতেছেন?"

পশুপতি কহিলেন, "যাহা স্বীকার করিয়াছি, তাহা অবশ্য করিব। মহাশয়ও যে তদ্রূপ করিবেন, তাহাতে আমার কোন সংশয় নাই।"

বখ। কিছুমাত্র সংশয় নাই। কেবলমাত্র আমাদিগের এক যাচ্ঞা আছে।

প। আজ্ঞা করুন।

ব। কুতুব উদ্দীন গৌড়শাসনভার আপনার প্রতি অর্পণ করিলেন। আজ হইতে আপনি বঙ্গে রাজপ্রতিনিধি হইলেন। কিন্তু যবন-সম্রাটের সঙ্কল্প এই যে, ইস্‌লামধর্ম্মাবলম্বী ব্যতীত কেহ তাঁহার রাজকার্য্যে সংলিপ্ত হইতে পারিবে না। আপনাকে ইস্‌লাম ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে হইবে।

পশুপতির মুখ শুকাইল। তিনি কহিলেন, "সন্ধির সময়ে এইরূপ কোন কথা হয় নাই।"

ব। যদি না হইয়া থাকে, তবে সেটা ভ্রান্তিমাত্র। আর এ কথা উত্থাপিত না হইলেও আপনার ন্যায় বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি দ্বারা অনায়াসেই অনুমিত হইয়া থাকিবে। কেন না, এমন কখনও সম্ভবে না যে, মুসলমানেরা বাঙ্গালা জয় করিয়াই আবার হিন্দুকে রাজ্য দিবে।

প। আমি বুদ্ধিমান্ বলিয়া আপনার নিকট পরিচিত হইতে পারিলাম না।

ব। না বুঝিয়া থাকেন, এখন বুঝিলেন; আপনি যবনধর্ম্ম অবলম্বনে স্থিরসঙ্কল্প হউন।

প। (সদর্পে) আমি স্থিরসঙ্কল্প হইয়াছি যে, যবন-সম্রাটের সাম্রাজ্যের জন্যও সনাতন ধর্ম্ম ছাড়িয়া নরকগামী হইব না।

ব। ইহা আপনার ভ্রম। যাহাকে সনাতন ধর্ম্ম বলিতেছেন, সে ভূতের পূজা মাত্র। কোরাণ-উক্ত ধর্ম্মই সত্যধর্ম্ম। মহম্মদ ভজিয়া ইহকাল পরকালের মঙ্গলসাধন করুন।

পশুপতি যবনের শঠতা বুঝিলেন। তাহার অভিপ্রায় এইমাত্র যে, কার্য্যসিদ্ধি করিয়া নিবন্ধ সন্ধি ছলক্রমে ভঙ্গ করিবে। আরও বুঝিলেন, ছলক্রমে না পারিলে বলক্রমে করিবে। অতএব কপটের সহিত কাপট্য অবলম্বন না করিয়া দর্প করিয়া ভাল করেন নাই। তিনি ক্ষণেক চিন্তা করিয়া কহিলেন, "যে আজ্ঞা, আমি আজ্ঞানুবর্ত্তী হইব।"

বখতিয়ারও তাঁহার মনের ভাব বুঝিলেন। বখতিয়ার যদি পশুপতির অপেক্ষা চতুর না হইতেন, তবে এত সহজে গৌড় জয় করিতে পারিতেন না। বঙ্গভূমির অদৃষ্টলিপি এই যে, এ ভূমি যুদ্ধে জিত হইবে না; চাতুর্য্যেই ইহার জয়। চতুর ক্লাইব সাহেব ইহার দ্বিতীয় পরিচয়স্থান।

বখতিয়ার কহিলেন, "ভাল, ভাল। আজ আমাদিগের শুভ দিন। এরূপ কার্য্যে বিলম্বের প্রয়োজন নাই। আমাদিগের পুরোহিত উপস্থিত, এখনই আপনাকে ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত করিবেন।"

পশুপতি দেখিলেন, সর্ব্বনাশ! বলিলেন, "একবার মাত্র অবকাশ দিউন, পরিবারগণকে লইয়া আসি, সপরিবারে একেবারে দীক্ষিত হইব।"

বখতিয়ার কহিলেন, "আমি তাঁহাদিগকে আনিতে লোক পাঠাইতেছি। আপনি এই প্রহরীর সঙ্গে গিয়া বিশ্রাম করুন।"

প্রহরী আসিয়া পশুপতিকে ধরিল, পশুপতি ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, "সে কি? আমি কি বন্দী হইলাম?"

বখতিয়ার কহিলেন, "আপাততঃ তাহাই বটে।"

পশুপতি রাজপুরীমধ্যে নিরুদ্ধ হইলেন। ঊর্ণনাভের জাল ছিঁড়িল—সে জালে কেবল স্বয়ং জড়িত হইলেন।

আমরা পাঠক মহাশয়ের নিকট পশুপতিকে বুদ্ধিমান্ বলিয়া পরিচিত করিয়াছি। পাঠক মহাশয় বলিবেন, যে ব্যক্তি শত্রুকে এতদূর বিশ্বাস করিল, সহায়হীন হইয়া তাহাদিগের অধিকৃত পুরীমধ্যে প্রবেশ করিল, তাহার চতুরতা কোথায়? কিন্তু বিশ্বাস না করিয়া কি করেন। এ বিশ্বাস না করিলে যুদ্ধ করিতে হয়। ঊর্ণনাভ জাল পাতে, যুদ্ধ করে না।

সেই দিন রাত্রিকালে মহাবন হইতে বিংশতি সহস্র যবন আসিয়া নবদ্বীপ প্লাবিত করিল। নবদ্বীপজয় সম্পন্ন হইল। যে সূর্য্য সেই দিন অস্ত গিয়াছে, আর তাহার উদয় হইল না। আর কি উদয় হইবে না? উদয় অস্ত উভয়ই ত স্বাভাবিক নিয়ম।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পিঞ্জর ভাঙ্গিল

যতক্ষণ পশুপতি গৃহে ছিলেন, ততক্ষণ তিনি মনোরমাকে নয়নে নয়নে রাখিয়াছিলেন। যখন তিনি যবনদর্শনে গেলেন, তখন তিনি গৃহের সকল দ্বার রুদ্ধ করিয়া শান্তশীলকে গৃহরক্ষায় রাখিয়া গেলেন।

পশুপতি যাইবামাত্র মনোরমা পলায়নের উদ্যোগ করিতে লাগিল। গৃহের কক্ষে কক্ষে অনুসন্ধান করিতে লাগিল। পলায়নের উপযুক্ত কোন পথ মুক্ত দেখিল না। অতি ঊর্দ্ধে কতকগুলি গবাক্ষ ছিল, কিন্তু তাহা দুরারোহ; তাহার মধ্য দিয়া মনুষ্যশরীর নির্গত হইবার সম্ভাবনা ছিল না, আর তাহা ভূমি হইতে এত উচ্চে যে, তথা হইতে লম্ফ দিয়া ভূমিতে পড়িলে অস্থি চূর্ণ হইবার সম্ভাবনা। মনোরমা উন্মাদিনী, সেই গবাক্ষপথেই নিষ্ক্রান্ত হইবার মানস করিল।

অতএব পশুপতি যাইবার ক্ষণকাল পরেই মনোরমা পশুপতির শয্যাগৃহে পালঙ্কের উপর আরোহণ করিল। পালঙ্ক হইতে গবাক্ষারোহণ সুলভ হইল। পালঙ্ক হইতে গবাক্ষ অবলম্বন করিয়া মনোরমা গবাক্ষরন্ধ্র দিয়া প্রথমে দুই হস্ত, পশ্চাৎ মস্তক, পরে বক্ষ পর্য্যন্ত বাহির করিয়া দিল। গবাক্ষনিকটে উদ্যানস্থ একটি আম্রবৃক্ষের ক্ষুদ্র শাখা দেখিল; মনোরমা তাহা ধারণ করিল এবং তখন পশ্চাদ্ভাগ গবাক্ষ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া, শাখাবলম্বনে ঝুলিতে লাগিল। কোমল শাখা তাহার ভরে নমিত হইল; তখন ভূমি তাহার চরণ হইতে অনতিদূরবর্ত্তী হইল। মনোরমা শাখা ত্যাগ করিয়া অবলীলাক্রমে ভূতলে পড়িল এবং তিলমাত্র অপেক্ষা না করিয়া জনার্দ্দনের গৃহাভিমুখে চলিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

যবন বিপ্লব

সেই নিশীথে নবদ্বীপ নগর বিজয়োন্মত্ত যবনসেনার নিষ্পীড়নে, বাত্যাসন্তাড়িত তরঙ্গোৎক্ষেপী সাগর সদৃশ চঞ্চল হইয়া উঠিল। রাজপথ ভূরি ভূরি অশ্বারোহিগণে, ভূরি ভূরি পদাতিদলে, ভূরি ভূরি খড়্গ, ধানুকা, শূলিসমূহসমারোহে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। সেনাবলহীন রাজধানীর নাগরিকেরা ভীত হইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল; দ্বার রুদ্ধ করিয়া সভয়ে ইষ্টনাম জপ করিতে লাগিল।

যবনেরা রাজপথে যে দুই এক জন হতভাগ্য আশ্রয়হীন ব্যক্তিকে প্রাপ্ত হইল, তাহাদিগকে শূলবিদ্ধ করিয়া রুদ্ধদ্বার ভবন সকল আক্রমণ করিতে লাগিল; কোথাও বা দ্বার ভগ্ন করিয়া, কোথাও বা প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া, কোথাও বা শঠতাপূর্ব্বক ভীত গৃহস্থকে জীবনাশা দিয়া গৃহপ্রবেশ করিতে লাগিল। গৃহপ্রবেশ করিয়া, গৃহস্থের সর্ব্বস্বাপহরণ, পশ্চাৎ স্ত্রী, পুরুষ, বৃদ্ধ, বনিতা, বালক সকলেরই শিরশ্ছেদ, ইহাই নিয়ম পূর্ব্বক করিতে লাগিল। কেবল যুবতীর পক্ষে স্বতন্ত্র নিয়ম।

শোণিতে গৃহস্থের গৃহসকল প্লাবিত হইতে লাগিল। শোণিতে রাজপথ পঙ্কিল হইল। শোণিতে যবনসেনা রক্তচিত্রময় হইল। অপহৃত দ্রব্যজাতের ভারে অশ্বের পৃষ্ঠ এবং মনুষ্যের স্কন্ধ পীড়িত হইতে লাগিল। শূলাগ্রে বিদ্ধ হইয়া ব্রাহ্মণের মুণ্ডসকল ভীষণ ভাব ব্যক্ত করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণের যজ্ঞোপবীত অশ্বের গলদেশে দুলিতে লাগিল। সিংহাসনস্থ শালগ্রামশিলাসকল যবন-পদাঘাতে গড়াইতে লাগিল।

ভয়ানক শব্দে নৈশাকাশ পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। অশ্বের পদধ্বনি, সৈনিকের কোলাহল, হস্তীর বৃংহিত, যবনের জয়শব্দ, তদুপরি পীড়িতের আর্তনাদ, মাতার রোদন, শিশুর রোদন, বৃদ্ধের করুণাকাঙ্ক্ষা, যুবতীর কণ্ঠবিদার।

যে বীরপুরুষকে মাধবাচার্য্য এত যত্নে যবনদমনার্থ নবদ্বীপে লইয়া আসিয়াছিলেন, এ সময়ে তিনি কোথা?

এই ভয়ানক যবনপ্রলয়কালে হেমচন্দ্র রণোন্মুখ নহেন। একাকী রণোন্মুখ হইয়া কি করিবেন?

হেমচন্দ্র এখন আপন শয়ন-মন্দিরে শয্যোপরি শয়ন করিয়াছিলেন। নগরাক্রমণের কোলাহল তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি দিগ্বিজয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন "কিসের শব্দ?"

দিগ্বিজয় কহিল, "যবনসেনা নগর আক্রমণ করিয়াছে।"

হেমচন্দ্র চমৎকৃত হইলেন। তিনি এ পর্য্যন্ত বখ্‌তিয়ার কর্তৃক রাজপুরাধিকার এবং রাজার পলায়নের বৃত্তান্ত শুনেন নাই। দিগ্বিজয় তদ্বিশেষ হেমচন্দ্রকে শুনাইল।

হেমচন্দ্র কহিলেন, "নাগরিকেরা কি করিতেছে?"

দি। যে পারিতেছে, পলায়ন করিতেছে, যে না পারিতেছে, সে প্রাণ হারাইতেছে।

হে। আর গৌড়ীয় সেনা?

দি। কাহার জন্য যুদ্ধ করিবে? রাজা পলাতক। সুতরাং তাহারা আপন আপন পথ দেখিতেছে।

হে। আমার অশ্বসজ্জা কর।

দিগ্বিজয় বিস্মিত হইল, জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাইবেন?"

হে। নগরে।

দি। একাকী?

হেমচন্দ্র ভ্রূকুটী করিলেন, ভ্রূকুটী দেখিয়া দিগ্বিজয় ভীত হইয়া অশ্বসজ্জা করিতে গেল।

হেমচন্দ্র তখন মহামূল্য রণসজ্জায় সজ্জিত হইয়া সুন্দর অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন এবং ভীষণ শূলহস্তে নিঝরিণীপ্রেরিত জলবিম্ববৎ সেই অসীম যবনসেনা-সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন।

হেমচন্দ্র দেখিলেন, যবনেরা যুদ্ধ করিতেছে না, কেবল অপহরণ করিতেছে। যুদ্ধজন্য কেহই তাহাদিগের সম্মুখীন হয় নাই, সুতরাং যুদ্ধে তাহাদিগেরও মন ছিল না। যাহাদিগের অপহরণ করিতেছিল, তাহাদিগকেই অপহরণকালে বিনা যুদ্ধে মারিতেছিল। সুতরাং যবনেরা দলবদ্ধ হইয়া হেমচন্দ্রকে নষ্ট করিবার কোন উদ্যোগ করিল না। যে কোন যবন তৎকর্তৃক আক্রান্ত হইয়া তাঁহার সহিত একা যুদ্ধোদ্যম করিল, সে তৎক্ষণাৎ মরিল।

হেমচন্দ্র বিরক্ত হইলেন। তিনি যুদ্ধাকাঙ্ক্ষায় আসিয়াছিলেন, কিন্তু যবনেরা পূর্ব্বেই বিজয়লাভ করিয়াছে, অর্থসংগ্রহ ত্যাগ করিয়া তাঁহার সহিত রীতিমত যুদ্ধ করিল না। তিনি মনে ভাবিলেন, "একটি একটি করিয়া গাছের পাতা ছিঁড়িয়া কে অরণ্যকে নিষ্পত্র করিতে পারে? একটি একটি যবন মারিয়া কি করিব? যখন যুদ্ধ করিতেছে না—যবনবধেই বা কি সুখ? বরং গৃহীদের রক্ষার সাহায্যে মন দেওয়া ভাল।" হেমচন্দ্র তাহাই করিতে লাগিলেন, বিশেষ কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। দুই জন যবন যখন তাঁহার সহিত যুদ্ধ করে, অপর যবনে সেই অবসরে গৃহস্থদিগের সর্ব্বস্বান্ত করিয়া চলিয়া যায়। যাহাই হউক, হেমচন্দ্র যথাসাধ্য পীড়িতের উপকার করিতে লাগিলেন। পথপার্শ্বে এক কুটীরমধ্য হইতে হেমচন্দ্র আর্তনাদ শ্রবণ করিলেন। যবন কর্তৃক আক্রান্ত ব্যক্তির আর্তনাদ বিবেচনা করিয়া হেমচন্দ্র গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

দেখিলেন, গৃহমধ্যে যবন নাই। কিন্তু গৃহমধ্যে যবন-দৌরাত্ম্যের চিহ্নসকল বিদ্যমান রহিয়াছে। দ্রব্যাদি প্রায় কিছুই নাই, যাহা আছে, তাহার ভগ্নাবস্থা, আর এক ব্রাহ্মণ আহত অবস্থায় ভূমে পড়িয়া আর্তনাদ করিতেছে। সে এ প্রকার গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে যে, মৃত্যু আসন্ন হেমচন্দ্রকে দেখিয়া সে যবনভ্রমে কহিতে লাগিল,—"আইস—প্রহার কর—শীঘ্র মরিব—মার—আমার মাথা লইয়া সেই রাক্ষসীকে দিও—আঃ—প্রাণ যায়—জল! জল! কে জল দিবে।"

হেমচন্দ্র কহিলেন, "তোমার ঘরে জল আছে?"

ব্রাহ্মণ কাতরোক্তিতে কহিতে লাগিল, "জানি না—মনে হয় না—জল! জল! পিশাচী!—সেই পিশাচীর জন্য প্রাণ গেল!"

হেমচন্দ্র কুটীরমধ্যে অন্বেষণ করিয়া দেখিলেন, এক কলসে জল আছে। পাত্রাভাবে পত্রপুটে তাহাকে জলদান করিলেন। ব্রাহ্মণ কহিল, "না! না! জল খাইব না! যবনের জল খাইব না।"

হেমচন্দ্র কহিলেন, "আমি যবন নহি, আমি হিন্দু—আমার হাতের জল পান করিতে পার। আমার কথায় বুঝিতে পারিতেছ না?"

ব্রাহ্মণ জল পান করিল। হেমচন্দ্র কহিলেন, "তোমার আর কি উপকার করিব ?"

ব্রাহ্মণ কহিল, "আর কি করিবে ? আর কি ? আমি মরি! মরি! যে মরে, তাহার কি করিবে ?"

হেমচন্দ্র কহিলেন, "তোমার কেহ আছে ? তাহাকে তোমার নিকট রাখিয়া যাইব ?"

ব্রাহ্মণ কহিল, "আর কে—কে আছে ? ঢের আছে। তার মধ্যে সেই রাক্ষসী। সেই রাক্ষসী—তাহাকে বলিও—বলিও—আমার—অপ—অপরাধের প্রতিশোধ হইয়াছে।"

হেমচন্দ্র। কে সে ? কাহাকে বলিব ?

ব্রাহ্মণ কহিতে লাগিল, "কে ?—সে—পিশাচী! পিশাচী চেন না ? পিশাচী, মৃণালিনী—মৃণালিনী। মৃণালিনী—পিশাচী।"

ব্রাহ্মণ অধিকতর আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল—হেমচন্দ্র মৃণালিনীর নাম শুনিয়া চমকিত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "মৃণালিনী তোমার কে হয় ?"

ব্রাহ্মণ কহিলেন, "মৃণালিনী কে হয় ? কেহ না—আমার যম।"

হেমচন্দ্র। মৃণালিনী তোমার কি করিয়াছে ?

ব্রাহ্মণ। কি করিয়াছে ?—কিছু না—আমি—আমি তার দুর্দ্দশা করিয়াছি, তাহার প্রতিশোধ হইল—

হে। কি দুর্দ্দশা করিয়াছ ?

ব্রা। আর কথা কহিতে পারি না, জল দাও।

হেমচন্দ্র পুনর্ব্বার তাহাকে জল পান করাইলেন। ব্রাহ্মণ জল পান করিয়া স্থির হইলে হেমচন্দ্র তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি ?"

ব্রা। ব্যোমকেশ।

হেমচন্দ্রের চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল। দন্তে অধর দংশন করিলেন। করস্থ শূল দৃঢ়তর মুষ্টিবদ্ধ করিয়া ধরিলেন। আবার তখনই শান্ত হইয়া কহিলেন, "তোমার নিবাস কোথা ?"

ব্রা। গৌড়—গৌড় জান না ? মৃণালিনী আমাদের বাড়ীতে থাকিত।

হে। তার পর ?

ব্রা। তার পর—তার পর আর কি ? তার পর আমার এই দশা—মৃণালিনী পাপিষ্ঠা; বড় নির্দ্দয়—আমার প্রতি ফিরিয়াও চাহিল না। রাগ করিয়া আমার পিতার নিকট আমি তাহার নামে মিছা কলঙ্ক রটাইলাম। পিতা তাহাকে বিনা দোষে তাড়াইয়া দিলেন। রাক্ষসী—রাক্ষসী আমাদের ছেড়ে গেল।

হে। তবে তুমি তাহাকে গালি দিতেছ কেন ?

ব্রা। কেন ?—কেন ? গালি—গালি দিই। মৃণালিনী আমাকে ফিরিয়া দেখিত না—আমি—আমি তাহাকে দেখিয়া জীবন—জীবন ধারণ করিতাম। সে চলিয়া আসিল, সেই—সেই অবধি আমার সর্ব্বস্বত্যাগ, তাহার জন্য কোন্ দেশে—কোন্ দেশে না গিয়াছি—কোথায় পিশাচীর সন্ধান না করিয়াছি ? গিরিজায়া—ভিখারীর মেয়ে—তার আমী বলিল,—নবদ্বীপে আসিয়াছে—নবদ্বীপে আসিলাম, সন্ধান নাই। যবন—যবনহস্তে মরিলাম, রাক্ষসীর জন্য মরিলাম—দেখা হইলে বলিও—আমার পাপের ফল ফলিল।

আর ব্যোমকেশের কথা সরিল না। সে পরিশ্রমে একেবারে নির্জ্জীব হইয়া পড়িল। নির্ব্বাণোন্মুখ দীপ নিবিল। ক্ষণপরে বিকট মুখভঙ্গী করিয়া ব্যোমকেশ প্রাণত্যাগ করিল।

হেমচন্দ্র আর দাঁড়াইলেন না। আর যবনবধ করিলেন না—কোনমতে পথ করিয়া গৃহাভিমুখে চলিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মৃণালিনীর সুখ কি ?

যেখানে হেমচন্দ্র তাঁহাকে সোপান-প্রস্তরাঘাতে ব্যথিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন—মৃণালিনী এখনও সেইখানে। পৃথিবীতে যাইবার আর স্থান ছিল না—সর্ব্বত্র সমান হইয়াছিল। নিশা প্রভাতা হইল, গিরিজায়া যত কিছু বলিলেন—মৃণালিনী কোন উত্তর দিলেন না, অধোবদনে বসিয়া রহিলেন। স্নানাহারের সময় উপস্থিত হইল—গিরিজায়া তাঁহাকে জলে নামাইয়া স্নান করাইল। স্নান করিয়া মৃণালিনী আর্দ্র বসনে সেই স্থানে বসিয়া রহিলেন। গিরিজায়া স্বয়ং ক্ষুধাতুরা হইল—কিন্তু গিরিজায়া মৃণালিনীকে উঠাইতে পারিল না—সাহস করিয়া বার বার বলিতেও পারিল না। সুতরাং নিকটস্থ বন হইতে কিঞ্চিৎ ফলমূল সংগ্রহ করিয়া ভোজন জন্য মৃণালিনীকে দিল। মৃণালিনী তাহা স্পর্শ করিলেন মাত্র। প্রসাদ গিরিজায়া ভোজন করিল—ক্ষুধার অনুরোধে মৃণালিনীকে ত্যাগ করিল না।

এইরূপে পূর্ব্বাচলের সূর্য্য মধ্যাকাশে, মধ্যাকাশের সূর্য্য পশ্চিমে গেলেন। সন্ধ্যা হইল। গিরিজায়া দেখিল যে, তখনও মৃণালিনী গৃহে প্রত্যাগমন করিবার লক্ষণ প্রকাশ করিতেছেন না। গিরিজায়া বিশেষ চঞ্চলা হইল। পূর্ব্বরাত্রে জাগরণ গিয়াছে—এ রাত্রেও জাগরণের আকার। গিরিজায়া কিছু বলিল না—বৃক্ষপল্লব সংগ্রহ করিয়া সোপানোপরি আপন শয্যা রচনা করিল। মৃণালিনী তাহার অভিপ্রায় বুঝিয়া কহিলেন, "তুমি ঘরে গিয়া শোও।"

গিরিজায়া মৃণালিনীর কথা শুনিয়া আনন্দিত হইল। বলিল, "একত্র যাইব।"

মৃণালিনী বলিলেন, "আমি যাইতেছি।"

গি। আমি ততক্ষণ অপেক্ষা করিব। ভিখারিণী দুই দণ্ড পাতা পাতিয়া শুইলে ক্ষতি কি? কিন্তু সাহস পাই ত বলি—রাজপুত্রের সহিত এ জন্মের মত সম্বন্ধ ঘুচিল—তবে আর কার্ত্তিকের হিমে আমরা কষ্ট পাই কেন?

মৃ। গিরিজায়া, হেমচন্দ্রের সহিত এ জন্মে আমার সম্বন্ধ ঘুচিবে না। আমি কালিও হেমচন্দ্রের দাসী ছিলাম—আজিও তাঁহার দাসী।

গিরিজায়ার বড় রাগ হইল—সে উঠিয়া বসিল। বলিল, "কি ঠাকুরাণি! তুমি এখনও বল—তুমি সেই পাষণ্ডের দাসী! তুমি যদি তাঁহার দাসী—তবে আমি চলিলাম—আমার এখানে আর প্রয়োজন নাই।"

মৃ। গিরিজায়া, যদি হেমচন্দ্র তোমাকে পীড়ন করিয়া থাকেন, তুমি স্থানান্তরে তাঁহার নিন্দা করিও। হেমচন্দ্র আমার প্রতি কোন অত্যাচার করেন নাই—আমি কেন তাঁহার নিন্দা সহিব? তিনি রাজপুত্র—আমার স্বামী; তাঁহাকে পাষণ্ড বলিও না।

গিরিজায়া আরও রাগ করিল। বহুযত্নরচিত পর্ণশয্যা ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া ফেলিয়া দিতে লাগিল। কহিল, "পাষণ্ড বলিব না?—একবার বলিব?" (বলিয়াই কতকগুলি শয্যাবিন্যাসের পল্লব সদর্পে জলে ফেলিয়া দিল) "একবার বলিব?—দশবার বলিব" (আবার পল্লব নিক্ষেপ)—"শতবার বলিব" (পল্লব নিক্ষেপ)—"হাজারবার বলিব।" এইরূপে সকল পল্লব জলে গেল। গিরিজায়া বলিতে লাগিল, "পাষণ্ড বলিব না? কি দোষে তোমাকে তিনি এত তিরস্কার করিলেন?"

মৃ। সে আমারই দোষ—আমি গুছাইয়া সকল কথা তাঁহাকে বলিতে পারি নাই—কি বলিতে কি বলিলাম।

গি। ঠাকুরাণি! আপনার কপাল টিপিয়া দেখ।

মৃণালিনী ললাট স্পর্শ করিলেন।

গি। কি দেখিলে?

মৃ। বেদনা।

গি। কেন হইল?

মৃ। মনে নাই।

গি। তুমি হেমচন্দ্রের অঙ্গে মাথা রাখিয়াছিলে—তিনি ফেলিয়া দিয়া গিয়াছেন। পাতরে পড়িয়া তোমার মাথায় লাগিয়াছে।

মৃণালিনী ক্ষণেক চিন্তা করিয়া দেখিলেন—কিছু মনে পড়িল না। বলিলেন, "মনে হয় না; বোধ হয়, আমি আপনি পড়িয়া গিয়া থাকিব।"

গিরিজায়া বিস্মিতা হইল। বলিল, "ঠাকুরাণি! এ সংসারে আপনি সুখী।"

মৃ। কেন?

গি। আপনি রাগ করেন না।

মৃ। আমিই সুখী—কিন্তু তাহার জন্য নহে।

গি। তবে কি সে?

মৃ। হেচমন্দ্রের সাক্ষাৎ পাইয়াছি।

নবম পরিচ্ছেদ

স্বপ্ন

গিরিজায়া কহিল, "গৃহে চল।" মৃণালিনী কহিলেন, "নগরে এ কিসের গোলযোগ?" তখন যবনসেনা নগর মন্থন করিতেছিল।

তুমুল কোলাহল শুনিয়া উভয়ের শঙ্কা হইল। গিরিজায়া বলিল, "চল, এই বেলা সতর্ক হইয়া যাই।" কিন্তু দুই জন রাজপথের নিকট পর্য্যন্ত গিয়া দেখিলেন, গমনের কোন উপায়ই নাই। অগত্যা প্রত্যাগমন করিয়া সরোবর-সোপানে বসিলেন। গিরিজায়া বলিল, "যদি এখানে উহারা আইসে?"

মৃণালিনী নীরবে রহিলেন। গিরিজায়া আপনিই বলিল, "বনের ছায়ামধ্যে এমন লুকাইব,—কেহ দেখিতে পাইবে না।"

উভয়ে আসিয়া সোপানোপরি উপবেশন করিয়া রহিলেন।

মৃণালিনী ম্লানবদনে গিরিজায়াকে কহিলেন, 'গিরিজায়া, বুঝি আমার যথার্থই সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইল।"

গি। সে কি?

মৃ। এই এক অশ্বারোহী গমন করিল; ইনি হেমচন্দ্র। সখি—নগরে ঘোর যুদ্ধ হইতেছে; যদি নিঃসহায় প্রভু সে যুদ্ধে গিয়া থাকেন—না জানি, কি বিপদে পড়িবেন।

গিরিজায়া কোন উত্তর করিতে পারিল না। তাহার নিদ্রা আসিতেছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে মৃণালিনী দেখিলেন যে, গিরিজায়া ঘুমাইতেছে।

মৃণালিনীও একে আহারনিদ্রাভাবে দুর্ব্বলা—তাহাতে সমস্ত রাত্রিদিন মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলেন, সুতরাং নিদ্রা ব্যতীত আর শরীর বহে না—তাঁহারও তন্দ্রা আসিল। নিদ্রায় তিনি স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন যে, হেমচন্দ্র একাকী সর্ব্বসমরে বিজয়ী হইয়াছেন। মৃণালিনী যেন বিজয়ী বীরকে দেখিতে রাজপথে দাঁড়াইয়াছিলেন। রাজপথে হেমচন্দ্রের অগ্রে, পশ্চাতে, কত হস্তী, অশ্ব, পদাতি যাইতেছে; মৃণালিনীকে যেন সেই সেনাতরঙ্গ ফেলিয়া দিয়া চরণদলিত করিয়া চলিয়া গেল—তখন হেমচন্দ্র নিজ সৈন্ধবী তুরঙ্গী হইতে অবতরণ করিয়া তাঁহাকে হস্ত ধরিয়া উঠাইলেন। তিনি যেন হেমচন্দ্রকে বলিলেন, "প্রভু! অনেক যন্ত্রণা পাইয়াছি; দাসীকে আর ত্যাগ করিও না।" হেমচন্দ্র যেন বলিলেন, "আর কখনও তোমায় ত্যাগ করিব না।" সেই কণ্ঠস্বরে যেন—তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল, "আর কখনও তোমায় ত্যাগ করিব না।" জাগ্রতেও এই কথা শুনিলেন। চক্ষু উন্মীলন করিলেন—কি দেখিলেন! যাহা দেখিলেন তাহা বিশ্বাস হইল না। আবার দেখিলেন, সত্য, হেমচন্দ্র সম্মুখে;—হেমচন্দ্র বলিতেছেন—"আর একবার ক্ষমা কর—আর কখনও তোমায় ত্যাগ করিব না।"

নিরভিমানিনী, নির্লজ্জা মৃণালিনী আবার তাঁহার কণ্ঠলগ্না হইয়া স্কন্ধে মস্তক রক্ষা করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

প্রেম নানা প্রকার

আনন্দাশ্রু-প্লাবিত-বদনা মৃণালিনীকে হেমচন্দ্র হস্তে ধরিয়া উপবন-গৃহাভিমুখে লইয়া চলিলেন। হেমচন্দ্র মৃণালিনীকে একবার অপমানিতা, তিরস্কৃতা, ব্যথিতা করিয়া ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন; আবার আপনি আসিয়াই তাঁহাকে হৃদয়ে গ্রহণ করিলেন,—ইহা দেখিয়া গিরিজায়া বিস্মিতা হইল, কিন্তু মৃণালিনী একটি কথাও জিজ্ঞাসা করিলেন না, একটি কথাও কহিলেন না! আনন্দ-পরিপ্লববিবশা হইয়া বসনে অশ্রুস্রুতি আবৃত করিয়া চলিলেন। গিরিজায়াকে ডাকিতে হইল না—সে স্বয়ং অন্তরে থাকিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

উপবন-বাটিকায় মৃণালিনী আসিলে, তখন উভয়ে বহুদিনের হৃদয়ের সকল কথা ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। তখন হেমচন্দ্র, যে যে ঘটনায় মৃণালিনীর প্রতি তাঁহার চিত্তের বিরাগ হইয়াছিল, আর যে যে কারণে সেই বিরাগের ধ্বংস হইয়াছিল, তাহা বলিলেন। তখন মৃণালিনী যে প্রকারে হৃষীকেশের গৃহ ত্যাগ করিয়াছিলেন, যে প্রকারে নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন, সেই সকল বলিলেন। তখন উভয়েই হৃদয়ের পূর্ব্বোদিত কত ভাব পরস্পরের নিকট ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। তখন উভয়েই কত ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কল্পনা করিতে লাগিলেন; তখন কতই নূতন নূতন প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হইতে লাগিলেন। তখন উভয়ে নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন কত কথাই অতি প্রয়োজনীয় কথার ন্যায় আগ্রহ সহকারে ব্যক্ত করিতে লাগিলেন; তখন কতবার উভয়ে মোক্ষোন্মুখ অশ্রুজল কষ্টে নিবারিত করিলেন। তখন কতবার উভয়ের মুখপ্রতি চাহিয়া অনর্থক মধুর হাসি হাসিলেন;—সে হাসির অর্থ—"আমি এখন কতসুখী!" পরে যখন পক্ষিগণ প্রভাতোদয়সূচক রব করিয়া উঠিল, তখন কতবার উভয়েই বিস্মিত হইয়া ভাবিলেন যে—আজি এখনই রাত্রি পোহাইল কেন?—আর সেই নগরমধ্যে যবনবিপ্লবের যে কোলাহল উচ্ছ্বসিত সমুদ্রের বীচি-রববৎ উঠিতেছিল, আজ হৃদয়-সাগরের তরঙ্গ-রবে সে রব ডুবিয়া গেল।

উপবন গৃহে আর এক স্থানে আর এক কাণ্ড হইয়াছিল। দিগ্বিজয় প্রভুর আজ্ঞামত রাত্রিজাগরণ করিয়া গৃহরক্ষা করিতেছিল, মৃণালিনীকে লইয়া যখন হেমচন্দ্র আইসেন, তখন সে দেখিয়া চিনিল। মৃণালিনী তাহার নিকট অপরিচিতা ছিলেন না—যে কারণে পরিচিতা ছিলেন, তাহা ক্রমে প্রকাশ পাইতেছে। মৃণালিনীকে দেখিয়া দিগ্বিজয় কিছু বিস্মিত হইল, কিন্তু জিজ্ঞাসার সম্ভাবনা নাই, কি করে? ক্ষণেক পরে গিরিজায়াও আসিল দেখিয়া

দিগ্বিজয় মনে ভাবিল, "বুঝিয়াছি—ইহারা দুই জন গৌড় হইতে আমাদিগের দুই জনকে দেখিতে আসিয়াছে। ঠাকুরাণী যুবরাজকে দেখিতে আসিয়াছেন, আর এটা আমাকে দেখিতে আসিয়াছে, সন্দেহ নাই।" এই ভাবিয়া দিগ্বিজয় একবার আপনার গোঁপ-দাড়ি চুমরিয়া লইল এবং ভাবিল, "না হবে কেন?" আবার ভাবিল, "এটা কিন্তু বড়ই নষ্ট—এক দিনের তরে কৈ আমাকে ভাল কথা বলে না—কেবল আমাকে গালিই দেয়—তবে ও আমাকে দেখিতে আসিবে, তাহার সম্ভাবনা কি? যাহা হউক, একটা পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক। রাত্রি ত শেষ হইল—প্রভুও ফিরিয়া আসিয়াছেন; এখন আমি পাশ কাটিয়া একটু শুই। দেখি, পিয়ারী আমাকে খুঁজিয়া নেয় কিনা?" এই ভাবিয়া দিগ্বিজয় এক নিভৃত স্থানে গিয়া শয়ন করিল। গিরিজায়া তাহা দেখিল।

গিরিজায়া তখন মনে মনে ভাবিতে লাগিল, "আমি ত মৃণালিনীর দাসী—মৃণালিনী এ গৃহের কর্ত্রী হইলেন অথবা হইবেন—তবে ত বাড়ীর গৃহ-কর্ম্ম করিবার অধিকার আমারই।" এইরূপ মনকে প্রবোধ দিয়া গিরিজায়া একগাছা ঝাঁটা সংগ্রহ করিল এবং যে ঘরে দিগ্বিজয় শয়ন করিয়াছে, সেই ঘরে প্রবেশ করিল। দিগ্বিজয় চক্ষু বুজিয়া আছে, পদধ্বনিতে বুঝিল যে, গিরিজায়া আসিল—মনে বড় আনন্দ হইল, তবে ত গিরিজায়া তাহাকে ভালবাসে। দেখি, গিরিজায়া কি বলে? এই ভাবিয়া দিগ্বিজয় চক্ষু বুজিয়া রহিল। অকস্মাৎ তাহার পৃষ্ঠে দুম দাম্ করিয়া ঝাঁটার ঘা পড়িতে লাগিল। গিরিজায়া গলা ছাড়িয়া বলিতে লাগিল, "আঃ মলো, ঘরগুলায় ময়লা জমিয়া রহিয়াছে দেখ—এ কি? এক মিন্‌ষে! চোর না কি? মলো মিন্‌ষে, রাজার ঘরে চুরি!" এই বলিয়া আবার সম্মার্জ্জনীর আঘাত। দিগ্বিজয়ের পিঠ ফাটিয়া গেল।

"ও গিরিজায়া, আমি! আমি!"

"আমি! আরে তুই বলিয়াই ত খ্যাংরা দিয়া বিছাইয়া দিতেছি।" এই বলিবার পর আবার বরাশী সিকা ওজনের ঝাঁটা পড়িতে লাগিল।

"দোহাই! দোহাই! গিরিজায়া! আমি দিগ্বিজয়!"

"আবার চুরি করিতে এসে—আমি দিগ্বিজয়! দিগ্বিজয় কে রে মিন্‌ষে?" ঝাঁটার বেগ আর থামে না।

দিগ্বিজয় এবার সকাতরে কহিল, "গিরিজায়া, আমাকে ভুলিয়া গেলে?"

গিরিজায়া বলিল, "তোর আমার সঙ্গে কোন্ পুরুষে আলাপ রে মিন্‌ষে!"

দিগ্বিজয় দেখিল, নিস্তার নাই—রণে ভঙ্গ দেওয়াই পরামর্শ। দিগ্বিজয় তখন অনুপায় দেখিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে গৃহ হইতে পলায়ন করিল। গিরিজায়া সম্মার্জ্জনীহস্তে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

পূর্ব্ব পরিচয়

প্রভাতে হেমচন্দ্র মাধবাচার্য্যের অনুসন্ধানে যাত্রা করিলেন। গিরিজায়া আসিয়া মৃণালিনীর নিকট বসিল।

গিরিজায়া মৃণালিনীর দুঃখের ভাগিনী হইয়াছিল, সহৃদয় হইয়া দুঃখের সময় দুঃখের কাহিনী সকল শুনিয়াছিল। আজি সুখের দিনে সে কেন সুখের ভাগিনী না হইবে? আজি সেইরূপ সহৃদয়তার সহিত সুখের কথা কেন না শুনিবে? গিরিজায়া ভিখারিণী, মৃণালিনী মহাধনীর কন্যা—উভয়ে এতদূর সামাজিক প্রভেদ। কিন্তু দুঃখের দিনে গিরিজায়া মৃণালিনীর একমাত্র সুহৃৎ, সে সময়ে ভিখারিণী আর রাজপুর-বধূতে প্রভেদ থাকে না, আজি সেই বলে গিরিজায়া মৃণালিনীর হৃদয়ের সুখের অংশাধিকারিণী হইল।

যে আলাপ হইতেছিল, তাহাতে গিরিজায়া বিস্মিত ও প্রীত হইতেছিল। সে মৃণালিনীকে জিজ্ঞাসা করিল, "তা এত দিন এমন কথা প্রকাশ কর নাই কি জন্য?"

মৃ। এত দিন রাজপুত্রের নিষেধ ছিল, এ জন্য প্রকাশ করি নাই। এক্ষণে তিনি প্রকাশের অনুমতি করিয়াছেন, এ জন্য প্রকাশ করিতেছি।

গি। ঠাকুরাণি! সকল কথা বল না? আমার শুনিয়া বড় তৃপ্তি হবে।

তখন মৃণালিনী বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"আমার পিতা এক জন বৌদ্ধমতাবলম্বী শ্রেষ্ঠী। তিনি অত্যন্ত ধনী ও মথুরারাজের প্রিয়পাত্র ছিলেন—মথুরার রাজকন্যার সহিত আমার সখিত্ব ছিল।

"আমি একদিন মথুরার রাজকন্যার সঙ্গে নৌকায় যমুনায় জলবিহারে গিয়াছিলাম। তথায়

অকস্মাৎ প্রবল ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ায় নৌকা জলমধ্যে ডুবিল। রাজকন্যা প্রভৃতি অনেকেই রক্ষক ও নাবিকদের হাতে রক্ষা পাইলেন। আমি ভাসিয়া গেলাম। দৈবযোগে এক রাজপুত্র সেই সময়ে নৌকায় বেড়াইতেছিলেন। তাঁহাকে তখন চিনিতাম না—তিনিই হেমচন্দ্র। তিনিও বাতাসের ভয়ে নৌকা তীরে লইতেছিলেন। জলমধ্যে আমার চুল দেখিতে পাইয়া স্বয়ং জলে পড়িয়া আমাকে উঠাইলেন, আমি তখন অজ্ঞান। হেমচন্দ্র আমার পরিচয় জানিতেন না। তিনি তখন তীর্থদর্শনে মথুরায় আসিয়াছিলেন। তাঁহার বাসায় আমায় লইয়া গিয়া শুশ্রূষা করিলেন। আমি জ্ঞান পাইলে, তিনি আমার পরিচয় লইয়া আমাকে আমার বাপের বাড়ী পাঠাইবার উদ্যোগ করিলেন। কিন্তু তিন দিবস পর্য্যন্ত ঝড়বৃষ্টি থামিল না। এরূপ দুর্দ্দিন হইল যে, কেহ বাড়ীর বাহির হইতে পারে না। সুতরাং তিন দিন আমাদিগের উভয়কে এক বাড়ীতে থাকিতে হইল। উভয়ে উভয়ের পরিচয় পাইলাম। কেবল কুলপরিচয় নহে—উভয়ের অন্তঃকরণের পরিচয় পাইলাম। তখন আমার বয়স পনের বৎসর মাত্র। কিন্তু সেই বয়সেই আমি তাঁহার দাসী হইলাম। সে কোমল বয়সে সকল বুঝিতাম না। হেমচন্দ্রকে দেবতার ন্যায় দেখিতে লাগিলাম। তিনি যাহা বলিলেন, তাহা পুরাণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তিনি বলিলেন, 'বিবাহ কর।' সুতরাং আমারও বোধ হইল, ইহা অবশ্যকর্ত্তব্য। চতুর্থ দিবসে, দুর্য্যোগের উপশম দেখিয়া উপবাস করিলাম, দিগ্বিজয় উদ্যোগ করিয়া দিল। তীর্থপর্য্যটনে রাজপুত্রের কুলপুরোহিত সঙ্গে ছিলেন। তিনি আমাদিগের বিবাহ দিলেন।"

গি। কন্যা সম্প্রদান করিল কে?

মৃ। অরুন্ধতী নামে আমার এক প্রাচীন কুটুম্ব ছিলেন। তিনি সম্বন্ধে মা'র ভগিনী হইতেন। আমাকে বাল্যকাল হইতে লালন-পালন করিয়াছিলেন। তিনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন; আমার সকল দৌরাত্ম্য সহ্য করিতেন। আমি তাঁহার নাম করিলাম। দিগ্বিজয় কোন ছলে পুরমধ্যে তাঁহাকে সংবাদ পাঠাইয়া দিয়া ছলক্রমে হেমচন্দ্রের গৃহে তাঁহাকে ডাকিয়া আনিল। অরুন্ধতী মনে জানিতেন, আমি যমুনায় ডুবিয়া মরিয়াছি। তিনি আমাকে জীবিত দেখিয়া এতই আহ্লাদিত হইলেন যে, আমার কোন কথাতেই অসন্তুষ্ট হইলেন না। আমি যাহা বলিলাম, তাহাতেই স্বীকৃত হইলেন। তিনিই কন্যা সম্প্রদান করিলেন। বিবাহের পর মাসীর সঙ্গে বাপের বাড়ী গেলাম। সকল সত্য বলিয়া কেবল বিবাহের কথা লুকাইলাম। আমি, হেমচন্দ্র, দিগ্বিজয়, কুলপুরোহিত আর অরুন্ধতী মাসী ভিন্ন এ বিবাহ আর কেহ জানিত না। অদ্য তুমি জানিলে।

গি। মাধবাচার্য্য জানেন না?

মৃ। না। তিনি জানিলে সর্ব্বনাশ হইত। মগধরাজ তাহা হইলে অবশ্য শুনিতেন। আমার বাপ বৌদ্ধ, মগধরাজ বৌদ্ধের বিষম শত্রু।

গি। ভাল, তোমার বাপ যদি তোমাকে এ পর্য্যন্ত কুমারী বলিয়া জানিতেন, তবে এত বয়সেও তোমার বিবাহ দেন নাই কেন?

মৃ। বাপের দোষ নাই। তিনি অনেক যত্ন করিয়াছেন, কিন্তু বৌদ্ধ সুপাত্র পাওয়া সুকঠিন; কেন না, বৌদ্ধধর্ম্ম প্রায় লোপ হইয়াছে। পিতা বৌদ্ধ জামাতা চাহেন, অথচ সুপাত্রও চাহেন। এরূপ একটি পাওয়া গিয়াছিল, সে আমার বিবাহের পর। বিবাহের দিন স্থির হইয়া সকল উদ্যোগও হইয়াছিল। কিন্তু আমি সেই সময়ে জ্বর করিয়া বসিলাম। পাত্র অন্যত্র বিবাহ করিল।

গি। ইচ্ছাপূর্ব্বক জ্বর করিয়াছিলে?

মৃ। হাঁ, ইচ্ছাপূর্ব্বক। আমাদিগের উদ্যানে একটা কূয়া আছে, তাহার জল কেহ স্পর্শ করে না। তাহার পানে বা স্নানে নিশ্চিত জ্বর। আমি রাত্রিতে গোপনে সেই জলে স্নান করিয়াছিলাম।

গি। আবার সম্বন্ধ হইলে, সেইরূপ করিতে?

মৃ। সন্দেহ কি? নচেৎ হেমচন্দ্রের নিকট পলাইয়া যাইতাম।

গি। মথুরা হইতে মগধ এক মাসের পথ। স্ত্রীলোক হইয়া কাহার সহায়ে পলাইতে?

মৃ। আমার সহিত সাক্ষাতের জন্য হেমচন্দ্র মথুরায় এক দোকান করিয়া আপনি তথায় রত্নদাস বণিক্ বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। বৎসরে একবার করিয়া তথায় বাণিজ্য করিতে আসিতেন। যখন তিনি তথায় না থাকিতেন, তখন দিগ্বিজয় তথায় তাঁহার দোকান রাখিত। দিগ্বিজয়ের প্রতি আদেশ ছিল যে, যখন আমি যেরূপ আজ্ঞা করিব, সে তখনই সেরূপ করিবে। সুতরাং আমি নিঃসহায় ছিলাম না।

কথা সমাপ্ত হইলে গিরিজায়া বলিল, "ঠাকুরাণি! আমি একটি বড় গুরুতর অপরাধ করিয়াছি।

আমাকে মার্জ্জনা করিতে হইবে। আমি তাহার উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিতে স্বীকৃত আছি।"

মৃ। কি এমন গুরুতর কাজ করিলে?

গি। দিগ্বিজয়টা তোমার হিতকারী, তাহা আমি জানিতাম না, আমি জানিতাম, ওটা অতি অপদার্থ। এ জন্য আমি প্রভাতে তাহাকে ভালরূপে ঘা-কত ঝাঁটা দিয়াছি, তা ভাল করি নাই।

মৃণালিনী হাসিয়া বলিলেন, "তা কি প্রায়শ্চিত্ত করিবে?"

গি। ভিখারীর মেয়ের কি বিবাহ হয়?

মৃ। (হাসিয়া) করিলেই হয়।

"তবে আমি সে অপদার্থটাকে বিবাহ করিব—আর কি করি?"

মৃণালিনী আবার হাসিয়া বলিলেন, "তবে আজি তোমার গায়ে হলুদ দিব।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

পরামর্শ

হেমচন্দ্র মাধবাচার্য্যের বসতিস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, আচার্য্য জপে নিযুক্ত আছেন। হেমচন্দ্র প্রণাম করিয়া কহিলেন,—"আমাদিগের সকল যত্ন বিফল হইল। এখন ভৃত্যের প্রতি আর কি আদেশ করেন? যবন গৌড় অধিকার করিয়াছে। বুঝি এ ভারতভূমির অদৃষ্টে যবনের দাসত্ব বিধিলিপি। নচেৎ বিনা বিবাদে যবনেরা গৌড়জয় করিল কি প্রকারে? যদি এখন এই দেহপতন করিলে এক দিনের তরেও জন্মভূমি দস্যুর হাত হইতে মুক্ত হয়, তবে এইক্ষণে তাহা করিতে প্রস্তুত আছি। সেই অভিপ্রায়ে রাত্রিতে যুদ্ধের আশায় নগরমধ্যে অগ্রসর হইয়াছিলাম—কিন্তু যুদ্ধ ত দেখিলাম না। কেবল দেখিলাম যে, এক পক্ষ আক্রমণ করিতেছে—অপর পক্ষ পলাইতেছে।"

মাধবাচার্য্য কহিলেন, "বৎস! দুঃখিত হইও না। দৈবনির্দ্দেশ কখনও বিফল হইবার নহে। আমি যখন গণনা করিয়াছি যে, যবন পরাভূত হইবে, তখন নিশ্চয়ই জানিও, তাহারা পরাভূত হইবে। যবনেরা নবদ্বীপ অধিকার করিয়াছে বটে, কিন্তু নবদ্বীপ ত গৌড় নহে। প্রধান রাজা সিংহাসন ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছেন। কিন্তু গৌড়রাজ্যে অনেক করপ্রদ রাজা আছেন, তাঁহারা ত এখনও বিজিত হয়েন নাই। কে জানে যে, সকল রাজা একত্রে প্রাণপণ করিলে যবন বিজিত না হইবে?"

হেমচন্দ্র কহিলেন, "তাহার অল্পই সম্ভাবনা।"

মাধবাচার্য্য কহিলেন, "জ্যোতিষগণনা মিথ্যা হইবার নহে; অবশ্য সফল হইবে। তবে আমার এক ভ্রম হইয়া থাকিবে। পূর্ব্বদেশে যবন পরাভূত হইবে—ইহাতে আমরা নবদ্বীপেই যবন জয় করিবার প্রত্যাশা করিয়াছিলাম। কিন্তু গৌড়রাজ্য ত প্রকৃত পূর্ব্ব নহে—কামরূপই পূর্ব্ব। বোধ হয়, তথায়ই আমাদিগের আশা ফলবতী হইবে।"

হে। কিন্তু এক্ষণে ত যবনের কামরূপ যাওয়ার কোন সম্ভাবনা দেখি না।

মা। এই যবনেরা ক্ষণকাল স্থির নহে। গৌড়ে ইহারা সুস্থির হইলেই কামরূপ আক্রমণ করিবে।

হে। তাহাও মানিলাম এবং ইহারা যে কামরূপ আক্রমণ করিলে পরাজিত হইবে, তাহাও মানিলাম। কিন্তু তাহা হইলে আমার পিতৃরাজ্য উদ্ধারের কি সদুপায় হইল?

মা। এই যবনেরা এ পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ জয়লাভ করিয়া অজেয় বলিয়া রাজগণমধ্যে প্রতিপন্ন হইয়াছে। ভয়ে কেহ তাহাদের বিরোধী হইতে চাহে না। তাহারা একবারমাত্র পরাজিত হইলে তাহাদিগের সে মহিমা আর থাকিবে না। তখন ভারতবর্ষীয় তাবৎ আর্য্যবংশীয় রাজারা ধৃতাস্ত্র হইয়া উঠিবেন। সকলে এক হইয়া অস্ত্রধারণ করিলে যবনেরা কত দিন তিষ্ঠিবে?

হে। গুরুদেব! আপনি আশামাত্রের আশ্রয় লইতেছেন; আমিও তাহাই করিলাম; এক্ষণে আমি কি করিব—আজ্ঞা করুন।

মা। আমিও তাহাই চিন্তা করিতেছিলাম। এ নগরমধ্যে তোমার আর অবস্থিতি করা অকর্ত্তব্য। কেন না, যবনেরা তোমার মৃত্যুসাধন সঙ্কল্প করিয়াছে। আমার আজ্ঞা—তুমি অদ্যই এ নগর ত্যাগ করিবে।

হে। কোথায় যাইব?

মা। আমার সঙ্গে কামরূপ চল।

হেমচন্দ্র অধোবদন হইয়া, অপ্রতিভ হইয়া, মৃদু মৃদু কহিলেন, "মৃণালিনীকে কোথায় রাখিয়া যাইবেন?"

মাধবাচার্য্য বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "সে কি! আমি ভাবিয়াছিলাম যে, তুমি কালিকার কথায় মৃণালিনীকে চিত্ত হইতে দূর করিয়াছিলে!"

হেমচন্দ্র পূর্ব্বের ন্যায় মৃদুভাবে বলিলেন, "মৃণালিনী অত্যাজ্যা। তিনি আমার পরিণীতা স্ত্রী।"

মাধবাচার্য্য চমৎকৃত হইলেন। রুষ্ট হইলেন। ক্ষোভ করিয়া কহিলেন, "আমি ইহার কিছুই জানিলাম না?"

হেমচন্দ্র তখন আন্তোপান্ত তাঁহার বিবাহের বৃত্তান্ত বিবৃত করিলেন। শুনিয়া মাধবাচার্য্য কিছুক্ষণ মৌনী হইয়া রহিলেন। কহিলেন, "যে স্ত্রী অসদাচারিণী, সে ত শাস্ত্রানুসারে ত্যাজ্যা। মৃণালিনীর চরিত্র সম্বন্ধে যে সংশয়, তাহা আমি প্রকাশ করিয়াছি।"

তখন হেমচন্দ্র ব্যোমকেশের বৃত্তান্ত সকল প্রকাশ করিয়া বলিলেন। শুনিয়া মাধবাচার্য্য আনন্দ প্রকাশ করিলেন। কহিলেন,—"বৎস! বড় প্রীত হইলাম। তোমার প্রিয়তমা এবং গুণবতী ভার্য্যাকে তোমার নিকট হইতে বিযুক্ত করিয়া তোমাকে অনেক ক্লেশ দিয়াছি। এক্ষণে আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তোমরা দীর্ঘজীবী হইয়া বহুকাল একত্র ধর্ম্মাচরণ কর। যদি তুমি এক্ষণে সস্ত্রীক হইয়াছ, তবে তোমাকে আর আমি আমার সঙ্গে কামরূপ যাইতে অনুরোধ করি না। আমি অগ্রে যাইতেছি। যখন সময় বুঝিবেন, তখন তোমার নিকট কামরূপাধিপতি দূত প্রেরণ করিবেন। এক্ষণে তুমি বধূকে লইয়া মথুরায় গিয়া বাস কর—অথবা অন্য অভিপ্রেত স্থানে বাস করিও।"

এইরূপ কথোপকথনের পর হেমচন্দ্র মাধবাচার্য্যের নিকট বিদায় হইলেন। মাধবাচার্য্য আশীর্ব্বাদ, আলিঙ্গন করিয়া সাশ্রুলোচনে তাঁহাকে বিদায় করিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

মহম্মদ আলির প্রায়শ্চিত্ত

যে রাত্রে রাজধানী যবন-সেনা-বিপ্লবে পীড়িতা হইতেছিল, সেই রাত্রে পশুপতি একাকী কারাগারে অবরুদ্ধ ছিলেন। নিশাবশেষে সেনা-বিপ্লব সমাপ্ত হইয়া গেল। মহম্মদ আলি তখন তাঁহার সম্ভাষণে আসিলেন। পশুপতি কহিলেন,—"যবন!—প্রিয় সম্ভাষণে আর আবশ্যক নাই। একবার তোমারই প্রিয়সম্ভাষণে বিশ্বাস করিয়া এই অবস্থাপন্ন হইয়াছি। বিধর্ম্মী যবনকে বিশ্বাস করিবার যে ফল, তাহা প্রাপ্ত হইয়াছি। এখন আমি মৃত্যু শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিয়া অন্য ভরসা ত্যাগ করিয়াছি। তোমাদের কোন প্রিয়সম্ভাষণ শুনিব না।"

মহম্মদ আলি কহিল, "আমি প্রভুর আজ্ঞা প্রতিপালন করি—প্রভুর আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে আসিয়াছি। আপনাকে যবন-বেশ পরিধান করিতে হইবে।"

পশুপতি কহিলেন, "সে বিষয়ে চিত্ত স্থির করুন। আমি এক্ষণে মৃত্যু স্থির করিয়াছি। প্রাণত্যাগ করিতে স্বীকৃত আছি, কিন্তু যবনধর্ম্ম অবলম্বন করিব না।"

ম। আপনাকে এক্ষণে যবনধর্ম্ম অবলম্বন করিতে বলিতেছি না। কেবল রাজপ্রতিনিধির তৃপ্তির জন্য যবনের পোষাক পরিধান করিতে বলিতেছি।

প। ব্রাহ্মণ হইয়া কি জন্য ম্লেচ্ছের বেশ পরিব?

ম। আপনি ইচ্ছাপূর্ব্বক না পরিলে আপনাকে বলপূর্ব্বক পরাইব। অস্বীকারে লাভের ভাগ অপমান।

পশুপতি উত্তর করিলেন না। মহম্মদ আলি স্বহস্তে তাঁহাকে যবনবেশ পরাইলেন; কহিলেন, "আমার সঙ্গে আসুন।"

প। কোথায় যাইব?

ম। আপনি বন্দী—জিজ্ঞাসার প্রয়োজন কি?

মহম্মদ আলি তাঁহাকে সিংহদ্বারে লইয়া চলিলেন। যে ব্যক্তি পশুপতির রক্ষায় নিযুক্ত ছিল, সেও সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

দ্বারে প্রহরিগণের জিজ্ঞাসামতে মহম্মদ আলি আপন পরিচয় দিলেন; এক সঙ্কেত করিলেন। প্রহরিগণ তাঁহাদিগকে যাইতে দিল। সিংহদ্বার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া তিন জনে কিছু দূর রাজপথ অতিবাহিত করিলেন। তখন যবনসেনা নগর-মন্থন সমাপন করিয়া বিশ্রাম করিতেছিল। সুতরাং রাজপথে আর উপদ্রব ছিল না। মহম্মদ আলি কহিলেন,—"ধর্ম্মাধিকার! আপনি আমাকে বিনা দোষে তিরস্কার করিয়াছেন। বখতিয়ার খিলিজির এরূপ অভিপ্রায় আমি কিছুই অবগত ছিলাম না। তাহা হইলে আমি কদাচ প্রবঞ্চকের বার্ত্তাবহ হইয়া আপনার নিকট যাইতাম না। যাহা হউক, আপনি আমার কথায় প্রত্যয় করিয়া এরূপ দুর্দশা-

পন্ন হইয়াছেন, ইহার যথাসাধ্য প্রায়শ্চিত্ত করিলাম। গঙ্গাতীরে নৌকা প্রস্তুত আছে—আপনি যথেচ্ছ স্থানে প্রস্থান করুন। আমি এখান হইতে বিদায় হই।"

পশুপতি বিস্ময়াপন্ন হইয়া অবাক্ হইয়া রহিলেন। মহম্মদ আলি পুনরপি কহিতে লাগিলেন, "আপনি এই রাত্রিমধ্যে এ নগরী ত্যাগ করিবেন। নচেৎ কাল প্রাতে যবনের সহিত আপনার সাক্ষাৎ হইলে প্রমাদ ঘটিবে। খিলিজির আজ্ঞার বিপরীত আচরণ করিলাম—ইহার সাক্ষী এই প্রহরী। সুতরাং আত্মরক্ষার জন্য ইহাকেও দেশান্তরিত করিলাম। ইহাকেও আপনার নৌকায় লইয়া যাইবেন।"

এই বলিয়া মহম্মদ আলি বিদায় লইলেন। পশুপতি কিয়ৎকাল বিস্ময়াপন্ন হইয়া থাকিয়া গঙ্গাতীরাভিমুখে চলিলেন।

—

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

ধাতুমূর্ত্তির বিসর্জ্জন

মহম্মদ আলির নিকট বিদায় হইয়া, রাজপথ অতিবাহিত করিয়া পশুপতি ধীরে ধীরে চলিলেন। ধীরে ধীরে চলিলেন—যবনের কারাগার হইতে বিমুক্ত হইয়াও দ্রুতপদক্ষেপণে তাঁহার প্রবৃত্তি জন্মিল না। রাজপথে যাহা দেখিলেন, তাহাতে আপনার মনোমধ্যে আপনি মরিলেন। তাঁহার প্রতি পদে মৃত নাগরিকদের দেহ চরণে বাজিতে লাগিল; প্রতি পদে শোণিতসিক্ত কর্দ্দমে চরণ আর্দ্র হইতে লাগিল। পথের দুই পার্শ্বে গৃহাবলী জনশূন্য—বহু গৃহ ভস্মীভূত, কোথাও বা তপ্ত অঙ্গার এখনও জ্বলিতেছিল। গৃহান্তরে দ্বার ভগ্ন—গবাক্ষ ভগ্ন—প্রকোষ্ঠ ভগ্ন—তদুপরি মৃতদেহ। এখনও কোন হতভাগ্য মরণযন্ত্রণায় অমানুষিক কাতরস্বরে শব্দ করিতেছিল। এ সকলের মূল তিনিই। দারুণ লোভের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি রাজধানীকে শ্মশান-ভূমি করিয়াছেন। পশুপতি মনে মনে স্বীকার করিলেন যে, তিনি প্রাণদণ্ডের যোগ্যপাত্র বটে—কেন মহম্মদ আলিকে কলঙ্কিত করিয়া কারাগার হইতে পলায়ন করিলেন? যবন তাঁহাকে ধৃত করুক, অভিপ্রেত শাস্তি প্রদান করুক—মনে করিলেন, ফিরিয়া যাইবেন। মনে মনে তখন ইষ্টদেবীকে স্মরণ করিলেন—কিন্তু কি কামনা করিবেন? কামনার বিষয় আর কিছুই নাই। আকাশ প্রতি চাহিলেন। গগনের নক্ষত্রচন্দ্রগ্রহ-মণ্ডলীবিভূষিত সহাস্য পবিত্র শোভা তাঁহার চক্ষে সহিল না—তীব্র জ্যোতিঃ-সম্পীড়িতের ন্যায় চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। সহসা অনৈসর্গিক ভয় আসিয়া তাঁহার হৃদয় আচ্ছন্ন করিল—অকারণ ভয়ে তিনি আর পদক্ষেপ করিতে পারিলেন না। সহসা বল-হীন হইলেন; বিশ্রাম করিবার জন্য পথিমধ্যে উপবেশন করিতে গিয়া দেখিলেন—এক শবাসনে উপবেশন করিতেছিলেন। শবনিঃসৃত রক্ত তাঁহার বসনে এবং অঙ্গে লাগিল। তিনি কণ্টকিত-কলেবরে পুনরুত্থান করিলেন। আর দাঁড়াইলেন না—দ্রুতপদে চলিলেন। সহসা আর এক কথা মনে পড়িল—তাঁহার নিজবাটী? তাহা কি যবন-হস্তে রক্ষা পাইয়াছে? আর সে বাটীতে যে কুসুমময়ী প্রাণপুত্তলীকে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, তাহার কি দশা হইয়াছে? মনোরমার কি দশা হইয়াছে? তাঁহার প্রাণাধিকা তাঁহাকে পাপপথ হইতে পুনঃ পুনঃ নিবারণ করিয়াছিল, সেও বুঝি তাঁহার পাপসাগরের তরঙ্গে ডুবিয়াছে। এ যবন-সেনা-প্রবাহে কুসুমকলিকা না জানি কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে!

পশুপতি উন্মত্তের ন্যায় আপন ভবনাভিমুখে ছুটিলেন; আপনার ভবনসম্মুখে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, যাহা ভাবিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিয়াছে,—জলন্ত পর্ব্বতের ন্যায় উচ্চচূড় অট্টালিকা অগ্নিময় হইয়া জ্বলিতেছে।

দৃষ্টিমাত্র হতভাগ্য পশুপতির প্রতীতি হইল যে, যবনেরা তাঁহার পৌরজনসহ মনোরমাকে বধ করিয়া গৃহে অগ্নি দিয়া গিয়াছে। মনোরমা যে পলায়ন করিয়াছিল, তাহা তিনি কিছুই জানিতে পারেন নাই।

নিকটে কেহই ছিল না যে, তাঁহাকে এ সংবাদ প্রদান করে। আপন বিকল চিত্তের সিদ্ধান্তই তিনি গ্রহণ করিলেন। হলাহল-কলস পরিপূর্ণ হইল—হৃদয়ের শেষ তন্ত্রী ছিঁড়িল। তিনি কিয়ৎক্ষণ বিস্ফারিত নয়নে দহ্যমান অট্টালিকার প্রতি চাহিয়া রহিলেন—মরণোন্মুখ পতঙ্গবৎ অল্পক্ষণ বিকল-শরীরে এক স্থানে অবস্থিতি করিলেন—শেষে মহাবেগে সেই অনলতরঙ্গমধ্যে ঝাঁপ দিলেন। সঙ্গের প্রহরী চমকিত হইয়া রহিল।

মহাবেগে পশুপতি জলন্ত দ্বারপথে পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। চরণ দগ্ধ হইল—অঙ্গ দগ্ধ হইল

—কিন্তু পশুপতি ফিরিলেন না। অগ্নিকুণ্ড অতিক্রম করিয়া আপন শয়ন-কক্ষে গমন করিলেন—কাহাকেও দেখিলেন না। দগ্ধ শরীরে কক্ষে কক্ষে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তাঁহার অন্তরমধ্যে যে দুরন্ত অগ্নি জ্বলিতেছিল—তাহাতে তিনি বাহ্য দাহযন্ত্রণা অনুভব করিতে পারিলেন না।

ক্ষণে ক্ষণে গৃহের নূতন নূতন খণ্ড সকল অগ্নি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইতেছিল। আক্রান্ত-প্রকোষ্ঠ বিষম শিখা আকাশপথে উত্থাপিত করিয়া ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিতেছিল। ক্ষণে ক্ষণে দগ্ধ গৃহাংশ সকল অশনিসম্পাত শব্দে ভূতলে পড়িয়া যাইতেছিল। ধূমে, ধূলিতে, তৎসঙ্গে লক্ষ লক্ষ অগ্নিস্ফুলিঙ্গে আকাশ অদৃশ্য হইতে লাগিল।

দাবানলসংবেষ্টিত আরণ্যগজের ন্যায় পশুপতি অগ্নিমধ্যে ইতস্ততঃ দাসদাসী, স্বজন ও মনোরমার অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, কাহারও কোন চিহ্ন পাইলেন না—হতাশ হইলেন। তখন দেবীর মন্দির প্রতি তাঁহার দৃষ্টিপাত হইল। দেখিলেন, দেবী অষ্টভুজার মন্দির অগ্নি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া জ্বলিতেছে। পশুপতি পতঙ্গবৎ তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, অনলমণ্ডল-মধ্যে অদগ্ধা স্বর্ণপ্রতিমা বিরাজ করিতেছে। পশুপতি উন্মত্তের ন্যায় কহিলেন,—"মা! জগদম্বে! আর তোমাকে জগদম্বা বলিব না। আর তোমার পূজা করিব না। তোমাকে প্রণামও করিব না। আশৈশব আমি কায়মনোবাক্যে তোমার সেবা করিলাম—ঐ পদধ্যান ইহজন্মে সার করিয়াছিলাম—এখন মা! একদিনের পাপে সর্ব্বস্ব হারাইলাম! তবে কিজন্য তোমার পূজা করিয়াছিলাম? কেনই বা তুমি আমার পাপমতি অপনীত না করিলে?"

মন্দিরদহনে অগ্নি অধিকতর প্রবল হইয়া গর্জ্জিয়া উঠিল। পশুপতি তথাপি প্রতিমা সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"ঐ দেখ, ধাতুমূর্ত্তি!—তুমি ধাতুমূর্ত্তি মাত্র, দেবী নহ—ঐ দেখ, অগ্নি গর্জ্জিতেছে! যে পথে আমার প্রাণাধিকা গিয়াছে—সেই পথে অগ্নি তোমাকেও প্রেরণ করিবে। কিন্তু আমি অগ্নিকে এ কীর্ত্তি রাখিতে দিব না—আমি তোমাকে স্থাপনা করিয়াছিলাম, আমিই তোমাকে বিসর্জ্জন করিব। চল, ইষ্টদেবি! তোমাকে গঙ্গার জলে বিসর্জ্জন করিব।"

এই বলিয়া পশুপতি প্রতিমা উত্তোলন আকাঙ্ক্ষায় উভয় হস্তে তাহা ধারণ করিলেন। এই সময়ে আবার অগ্নি গর্জ্জিয়া উঠিল। তখন পর্ব্বত-বিদারানুরূপ প্রবল শব্দ হইল,—দগ্ধ মন্দির, আকাশপথে ধূলিধূমভস্ম সহিত অগ্নিস্ফুলিঙ্গরাশি প্রেরণ করিয়া চূর্ণ হইয়া পড়িয়া গেল; তন্মধ্যে প্রতিমা সহিত পশুপতির সজীবন সমাধি হইল।

—

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

অন্তিমকালে

পশুপতি স্বয়ং অষ্টভুজার অর্চ্চনা করিতেন বটে—কিন্তু তথাপি তাঁহার নিত্য-সেবার জন্য দুর্গাদাস নামে এক ব্রাহ্মণ নিযুক্ত ছিলেন। নগর-বিপ্লবের পরদিবস দুর্গাদাস শ্রুত হইলেন যে, পশুপতির গৃহ ভস্মীভূত হইয়া ভূমিসাৎ হইয়াছে। তখন ব্রাহ্মণ অষ্টভুজার মূর্ত্তি ভস্ম হইতে উদ্ধার করিয়া আপন গৃহে স্থাপন করিবার সঙ্কল্প করিলেন। যবনেরা নগর লুঠ করিয়া তৃপ্ত হইলে, বখতিয়ার খিলিজি অনর্থক নগরবাসীদিগের পীড়ন নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। সুতরাং এক্ষণে সাহস করিয়া বাঙ্গালীরা রাজপথে বাহির হইতেছিল। ইহা দেখিয়া দুর্গাদাস অপরাহ্নে অষ্টভুজার উদ্ধারে পশুপতির ভবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পশুপতির ভবনে গমন করিয়া যথায় দেবীর মন্দির ছিল, সেই প্রদেশে গেলেন। দেখিলেন, অনেক ইষ্টকরাশি স্থানান্তরিত না করিলে, দেবীর প্রতিমা বহিষ্কৃত করিতে পারা যায় না। ইহা দেখিয়া দুর্গাদাস আপন পুত্রকে ডাকিয়া আনিলেন। ইষ্টক সকল অর্দ্ধদ্রবীভূত হইয়া পরস্পর লিপ্ত হইয়াছিল—এবং এখন পর্য্যন্ত সন্তপ্ত ছিল। পিতাপুত্রে এক দীর্ঘিকা হইতে জল বহন করিয়া তপ্ত ইষ্টক সকল শীতল করিলেন এবং বহুকষ্টে তন্মধ্য হইতে অষ্টভুজার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। ইষ্টকরাশি স্থানান্তরিত হইলে তন্মধ্য হইতে দেবীর প্রতিমা আবিষ্কৃতা হইল। কিন্তু প্রতিমার পাদমূলে—এ কি? সভয়ে পিতাপুত্র নিরীক্ষণ করিলেন যে, মনুষ্যের মৃতদেহ রহিয়াছে। তখন উভয়ে মৃতদেহ উত্তোলন করিয়া দেখিলেন যে, পশুপতির দেহ।

বিস্ময়সূচক বাক্যের পর দুর্গাদাস কহিলেন, "যে প্রকারেই প্রভুর এ দশা হইয়া থাকুক, ব্রাহ্মণের এবম্ভ প্রতিপালিতের কার্য্য আমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। গঙ্গাতীরে এই দেহ লইয়া আমরা প্রভুর সৎকার করি চল।"

এই বলিয়া দুই জনে প্রভুর দেহ বহন করিয়া গঙ্গাতীরে লইয়া গেলেন। তথায় পুত্রকে শবরক্ষায়

নিযুক্ত করিয়া দুর্গাদাস নগরে কাষ্ঠাদি সৎকারের উপযোগী সামগ্রী অনুসন্ধানে গমন করিলেন এবং যথাসাধ্য সুগন্ধি-কাষ্ঠ ও অন্যান্য সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া গঙ্গাতীরে প্রত্যাগমন করিলেন।

তখন দুর্গাদাস পুত্রের আনুকূল্যে যথাশাস্ত্র দাহের পূর্ব্বগামী ক্রিয়া সকল সমাপন করিয়া সুগন্ধি-কাষ্ঠে চিতা রচনা করিলেন এবং তদুপরি পশুপতির মৃতদেহ স্থাপন করিয়া অগ্নি প্রদান করিতে গেলেন।

কিন্তু অকস্মাৎ শ্মশানভূমিতে এ কাহার আবির্ভাব হইল? ব্রাহ্মণদ্বয় বিস্মিতলোচনে দেখিলেন যে, এক মলিনবসনা, রুক্ষকেশী, আলুলায়িত-কুন্তলা, ভস্মধূলিসংসর্গে বিবর্ণা, উন্মাদিনী আসিয়া শ্মশানভূমিতে অবতরণ করিতেছে। রমণী ব্রাহ্মণদিগের নিকটবর্ত্তী হইলেন।

দুর্গাদাস সভয়চিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে?"

রমণী কহিলেন, "তোমরা কাহার সৎকার করিতেছ?"

দুর্গাদাস কহিলেন, "মৃত ধর্ম্মাধিকার পশুপতির।"

রমণী করিলেন, "পশুপতির কি প্রকারে মৃত্যু হইল?"

দুর্গাদাস কহিলেন, "প্রাতে নগরে জনরব শুনিয়াছিলাম যে, তিনি যবন কর্ত্তৃক কারারুদ্ধ হইয়া কোন সুযোগে রাত্রিকালে পলায়ন করিয়াছিলেন। অদ্য তাঁহার অট্টালিকা ভস্মসাৎ হইয়াছে দেখিয়া, ভস্মমধ্য হইতে অষ্টভুজার প্রতিমা উদ্ধার-মানসে গিয়াছিলাম। তথায় গিয়া প্রভুর মৃতদেহ পাইলাম।"

রমণী কোন উত্তর করিলেন না। গঙ্গাতীরে সৈকতের উপর উপবেশন করিলেন। বহুক্ষণ নীরবে থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কে?"

দুর্গাদাস কহিলেন, "আমরা ব্রাহ্মণ; ধর্ম্মাধিকারের অন্নে প্রতিপালিত হইয়াছিলাম। আপনি কে?"

রমণী কহিলেন, "আমি তাঁহার পত্নী।"

দুর্গাদাস কহিলেন, "তাঁহার পত্নী বহুকাল নিরুদ্দিষ্টা, আপনি কি প্রকারে তাঁহার স্ত্রী?"

যুবতী কহিলেন, "আমি সেই নিরুদ্দিষ্টা কেশব-কন্যা। অনুমরণভয়ে পিতা আমাকে এতকাল লুক্কায়িত রাখিয়াছিলেন। আমি আজ কালপূর্ণে বিধিলিপি পুরাইবার জন্য আসিয়াছি।"

শুনিয়া পিতাপুত্রে শিহরিয়া উঠিলেন। তাঁহা-দিগকে নিরুত্তর দেখিয়া বিধবা বলিতে লাগিলেন, "এখন স্ত্রীজাতির কর্ত্তব্য কাজ করিব। তোমরা উদ্যোগ কর।"

দুর্গাদাস তরুণীর অভিপ্রায় বুঝিলেন। পুত্রের মুখ চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বল?"

পুত্র কিছু উত্তর করিল না। দুর্গাদাস তখন তরুণীকে কহিলেন, "মা, তুমি বালিকা—এ কঠিন কার্য্যে কেন প্রস্তুত হইতেছ?"

তরুণী ভ্রূভঙ্গী করিয়া কহিলেন, "ব্রাহ্মণ হইয়া অধর্ম্মে প্রবৃত্তি দিতেছ কেন?—ইহার উদ্যোগ কর।"

তখন ব্রাহ্মণ আয়োজন জন্য নগরে পুনর্ব্বার চলিলেন। গমনকালে বিধবা দুর্গাদাসকে কহিলেন, "তুমি নগরে যাইতেছ। নগরপ্রান্তে রাজার উপবন-বাটিকায় হেমচন্দ্র নামে বিদেশী রাজপুত্র বাস করেন। তাঁহাকে বলিও, মনোরমা গঙ্গাতীরে চিতারোহণ করিতেছে—তিনি আসিয়া একবার তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাউন, তাঁহার নিকট ইহলোকে মনোরমার এইমাত্র ভিক্ষা।"

হেমচন্দ্র যখন ব্রাহ্মণমুখে শুনিলেন যে, মনোরমা পশুপতির পত্নীপরিচয়ে তাঁহার অনুমৃতা হইতেছেন, তখন তিনি কিছুই বুঝিতে পারিলেন না দুর্গাদাসের সমভিব্যাহারে গঙ্গাতীরে আসিলেন। তথায় মনোরমার অতিমলিনা, উন্মাদিনীমূর্ত্তি, তাঁহার স্থির গম্ভীর, এখনও অনিন্দ্যসুন্দর মুখকান্তি দেখিয়া তাঁহার চক্ষুর জল আপনি বহিতে লাগিল! তিনি বলিলেন, "মনোরমা! ভগিনি! এ কি এ?"

তখন মনোরমা জ্যোৎস্নাপ্রদীপ্ত সরোবর তুল্য স্থিরমূর্ত্তিতে মৃদুগম্ভীরস্বরে কহিলেন, "ভাই, যে জন্য আমার জীবন, তাহা আজি চরম সীমা প্রাপ্ত হইয়াছে। আজ আমি আমার স্বামীর সঙ্গে গমন করিব।"

মনোরমা সংক্ষেপে অন্যের শ্রবণাতীত স্বরে হেমচন্দ্রের নিকট পূর্ব্বকথার পরিচয় দিয়া বলিলেন, —"আমার স্বামী অপরিমিত ধনসঞ্চয় করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। আমি এক্ষণে সে ধনের অধিকারিণী। আমি তাহা তোমাকে দান করি-তেছি। তুমি তাহা গ্রহণ করিও। নচেৎ পাপিষ্ঠ যবনে তাহা ভোগ করিবে। তাহার অল্পভাগ ব্যয় করিয়া জনার্দ্দন শর্ম্মাকে কাশীধামে স্থাপন করিবে। জনার্দ্দনকে অধিক ধন দিও না। তাহা হইলে যবনে কাড়িয়া লইবে। আমার দাহের পর, তুমি আমার স্বামীর গৃহে গিয়া অর্থের অনুসন্ধান করিও। আমি যে স্থান বলিয়া দিতেছি, সেই স্থান খুঁজিলেই

তাহা পাইবে। আমি ভিন্ন সে স্থান আর কেহই জানে না।" এই বলিয়া মনোরমা যথা অর্থ আছে, তাহা বলিয়া দিলেন।

তখন মনোরমা আবার হেমচন্দ্রের নিকট বিদায় হইলেন। জনার্দ্দনকে ও তাঁহার পত্নীকে উদ্দেশে প্রণাম করিয়া হেমচন্দ্রের দ্বারা তাঁহাদিগের নিকট কত স্নেহসূচক কথা বলিয়া পাঠাইলেন।

পরে ব্রাহ্মণেরা মনোরমাকে যথাশাস্ত্র এই ভীষণ ব্রতে ব্রতী করাইলেন এবং শাস্ত্রীয় আচারান্তে, মনোরমা ব্রাহ্মণের আনীত নূতন বস্ত্র পরিধান করিলেন। নব বস্ত্র পরিধান করিয়া, দিব্য পুষ্পমালা কণ্ঠে পরিয়া, পশুপতির প্রজ্বলিত চিতা প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক তদুপরি আরোহণ করিলেন, এবং সহাস্য আননে সেই প্রজ্বলিত হুতাশনরাশির মধ্যে উপবেশন করিয়া নিদাঘসন্তপ্ত কুসুমকলিকার ন্যায় অনলতাপে প্রাণত্যাগ করিলেন।

পরিশিষ্ট

হেমচন্দ্র মনোরমার দত্ত ধন উদ্ধার করিয়া, তাহার কিয়দংশ জনার্দ্দনকে দিয়া, তাঁহাকে কাশী প্রেরণ করিলেন। অবশিষ্ট ধন গ্রহণ করা কর্ত্তব্য কি না, তাহা মাধবাচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন। মাধবাচার্য্য বলিলেন, "এই ধনের বলে পশুপতির বিনাশকারী বখতিয়ার খিলিজিকে প্রতিফল দেওয়া কর্ত্তব্য এবং তদভিপ্রায়ে ইহা গ্রহণও উচিত। দক্ষিণ সমুদ্রের উপকূলে অনেক প্রদেশ জনহীন হইয়া পড়িয়া আছে। আমার পরামর্শ যে, তুমি এই ধনের দ্বারা তথায় নূতন রাজ্য সংস্থাপন কর এবং তথায় যবন দমনোপযোগী সেনা সৃজন কর। তৎ-সাহায্যে পশুপতির শত্রুর নিপাত সিদ্ধ করিও।"

এই পরামর্শ করিয়া মাধবাচার্য্য সেই রাত্রিতেই হেমচন্দ্রকে নবদ্বীপ হইতে দাক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করাইলেন। পশুপতির ধনরাশি তিনি গোপনে সঙ্গে লইলেন। মৃণালিনী, গিরিজায়া এবং দিগ্বিজয় তাঁহার সঙ্গে গেলেন। মাধবাচার্য্যও হেমচন্দ্রকে নূতন রাজ্যে স্থাপিত করিবার জন্য তাঁহার সঙ্গে গেলেন। রাজ্য স্থাপন অতি সহজ কাজ হইয়া উঠিল, কেন না যবনদিগের ধর্ম্মদ্বেষিতায় পীড়িত এবং তাহাদিগের ভয়ে ভীত হইয়া অনেকে তাহা-দিগের অধিকৃত রাজ্য ত্যাগ করিয়া হেমচন্দ্রের নবস্থাপিত রাজ্যে বাস করিতে লাগিল।

মাধবাচার্য্যের পরামর্শেও অনেক প্রধান ধনী ব্যক্তি তথায় আশ্রয় লইল। এইরূপে অতি শীঘ্র ক্ষুদ্র রাজ্যটি সৌষ্ঠবান্বিত হইয়া উঠিল। ক্রমে ক্রমে সেনা সংগ্রহ হইতে লাগিল। অচিরাৎ রমণীয় রাজপুরী নির্ম্মিত হইল। মৃণালিনী তন্মধ্যে মহিষী হইয়া সে পুরী আলো করিলেন।

গিরিজায়ার সহিত দিগ্বিজয়ের পরিণয় হইল। গিরিজায়া মৃণালিনীর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত রহিল, দিগ্বিজয় হেমচন্দ্রের কার্য্য পূর্ব্ববৎ নির্ব্বাহ করিতে লাগিল। কথিত আছে যে, বিবাহ অবধি এমন দিনই ছিল না, যে দিন গিরিজায়া এক আধ ঘা ঝাঁটার আঘাতে দিগ্বিজয়ের শরীর পবিত্র করিয়া না দিত। ইহাতে যে দিগ্বিজয় বড়ই দুঃখিত ছিল, এমন নহে; বরং এক দিন কোন দৈব কারণ বশতঃ গিরিজায়া ঝাঁটা মারিতে ভুলিয়া গিয়াছিল, ইহাতে দিগ্বিজয় বিষণ্ণবদনে গিরিজায়াকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "গিরি, আজ তুমি আমার উপর রাগ করিয়াছ না কি?" বস্তুতঃ, ইহারা যাবজ্জীবন পরমসুখে কালাতিপাত করিয়াছিল।

হেমচন্দ্রকে নূতন রাজ্যে স্থাপন করিয়া মাধবাচার্য্য কামরূপে গমন করিলেন। সেই সময়ে হেমচন্দ্র দক্ষিণ হইতে মুসলমানের প্রতিকূলতা করিতে লাগিলেন। বখতিয়ার খিলিজি পরাভূত হইয়া কামরূপ হইতে দূরীকৃত হইলেন এবং প্রত্যাগমন কালে অপমানে ও কষ্টে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইল। কিন্তু সে সকল ঘটনার বর্ণনা করা এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে।

রত্নময়ী এক সম্পন্ন পাটনীকে বিবাহ করিয়া হেমচন্দ্রের নূতন রাজ্যে গিয়া বাস করিল। তথায় মৃণালিনীর অনুগ্রহে তাহার স্বামীর বিশেষ সৌষ্ঠব হইল। গিরিজায়া ও রত্নময়ী চিরকাল "সই" "সই" রহিল।

মৃণালিনী মাধবাচার্য্যের দ্বারা হৃষীকেশকে অনুরোধ করাইয়া মণিমালিনীকে আপন রাজ-ধানীতে আনাইলেন। মণিমালিনী রাজপুরীমধ্যে মৃণালিনীর সখীস্বরূপ বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্বামী রাজবাটীর পৌরোহিত্যে নিযুক্ত হইলেন।

শান্তশীল যখন দেখিল যে, হিন্দুর আর রাজ্য পাইবার সম্ভাবনা নাই, তখন সে আপন চতুরতা ও কর্ম্মদক্ষতা দেখাইয়া যবনদিগের প্রিয়পাত্র হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। হিন্দুদিগের প্রতি অত্যাচার ও বিশ্বাসঘাতকতার দ্বারা শীঘ্র সে মনস্কামনা সিদ্ধ করিয়া অভীষ্ট রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইল।

সমাপ্ত

রজনী

[ষষ্ঠ সংস্করণ হইতে মুদ্রিত]

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বিজ্ঞাপন

রজনী প্রথমে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। এক্ষণে, পুনর্মুদ্রাঙ্কনকালে, এই গ্রন্থে এত পরিবর্ত্তন করা গিয়াছে যে, ইহাকে নূতন গ্রন্থ বলা যাইতে পারে। কেবল প্রথম খণ্ড পূর্ব্ববৎ আছে। অবশিষ্টাংশের কিছু পরিত্যক্ত হইয়াছে; কিছু স্থানান্তরে সমাবিষ্ট হইয়াছে; অনেক পুনর্লিখিত হইয়াছে।

এখন লর্ড লিটন-প্রণীত "Last Days of Pompeeii" নামক উৎকৃষ্ট উপন্যাসে নিদিয়া নামে একটি কাণা ফুলওয়ালী আছে; রজনী তৎস্মরণে সূচিত হয়। যে সকল মানসিক বা নৈতিক তত্ত্ব প্রতিপাদন করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য, তাহা অন্ধ-যুবতীর সাহায্যে বিশেষ পুষ্টতালাভ করিতে পারিবে বলিয়াই ঐরূপ ভিত্তির উপর রজনীর চরিত্র নির্ম্মাণ করা গিয়াছে।

উপাখ্যানের অংশবিশেষ বা নায়ক নায়িকাবিশেষের দ্বারা ব্যক্ত করা প্রচলিত রচনা-প্রণালীর মধ্যে সচরাচর দেখা যায় না, কিন্তু ইহা নূতন নহে; উইল্‌কি কলিন্সকৃত "Woman in white" নামক গ্রন্থপ্রণয়নে ইহা প্রথম ব্যবহৃত হয়। এ প্রথার গুণ এই যে, যে কথা যাহার মুখে শুনিতে ভাল লাগে, সেই কথা তাহার মুখে ব্যক্ত করা যায়। এই প্রথা অবলম্বন করিয়াছি বলিয়াই, এই উপন্যাসে যে সকল অনৈসর্গিক বা অপ্রাকৃত ব্যাপার আছে, আমাকে তাহার দায়ী হইতে হয় নাই।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

রজনী

প্রথম খণ্ড

রজনীর কথা

প্রথম পরিচ্ছেদ

তোমাদের সুখ-দুঃখে আমার সুখ-দুঃখ পরিমিত হইতে পারে না। তোমরা আর আমি ভিন্ন-প্রকৃতি। আমার সুখে তোমরা সুখী হইতে পারিবে না—আমার দুঃখ তোমরা বুঝিবে না—আমি একটি ক্ষুদ্র যূথিকার গন্ধে সুখী হইব, আর ষোলকলা শশী আমার লোচনাগ্রে সহস্র নক্ষত্র-মণ্ডলমধ্যস্থ হইয়া বিকসিত হইলেও আমি সুখী হইব না—আমার উপাখ্যান কি তোমরা মন দিয়া শুনিবে? আমি জন্মান্ধ।

কি প্রকারে বুঝিবে? তোমাদের জীবন দৃষ্টিময়—আমার জীবন অন্ধকার—দুঃখ এই, আমি ইহা অন্ধকার বলিয়া জানি না। আমার এ রুদ্ধনয়নে তাই আলো। না জানি তোমাদের আলো কেমন।

তাই বলিয়া কি আমার সুখ নাই? তাহা নহে। সুখ-দুঃখ তোমার আমার প্রায় সমান। তুমি রূপ দেখিয়া সুখী, আমি শব্দ শুনিয়া সুখী। দেখ, এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যূথিকা সকলের বৃন্তগুলি কত সূক্ষ্ম, আর আমার এই করস্থ সূচিকাগ্রভাগ আরও কত সূক্ষ্ম। আমি সূচিকাগ্রে সেই ক্ষুদ্র পুষ্পবৃন্ত সকল বিদ্ধ করিয়া মালা গাঁথি—আশৈশব মালাই গাঁথিয়াছি—কেহ কখন আমার গাঁথা মালা পরিয়া বলে নাই যে, কাণায় মালা গাঁথিয়াছে।

আমি মালাই গাঁথিতাম। বালিগঞ্জের প্রান্তভাগে আমার পিতার একখানি পুষ্পোদ্যান জমা ছিল—তাহাই তাঁহার উপজীবিকা ছিল। ফাল্গুনমাস হইতে যত দিন ফুল ফুটিত, তত দিন পর্য্যন্ত পিতা প্রত্যহ তথা হইতে পুষ্পচয়ন করিয়া আনিয়া দিতেন, আমি মালা গাঁথিয়া দিতাম। পিতা তাহা লইয়া মহানগরীর পথে পথে বিক্রয় করিতেন। মাতা গৃহকর্ম্ম করিতেন। অবকাশমতে পিতা-মাতা উভয়েই আমার মালা গাঁথার সহায়তা করিতেন।

ফুলের স্পর্শ বড় সুন্দর—পরিতে বুঝি বড় সুন্দর হইবে—ঘ্রাণে পরম সুন্দর বটে। কিন্তু ফুল গাঁথিয়া দিন চলে না। অন্নের বৃক্ষে ফুল নাই, সুতরাং পিতা নিতান্ত দরিদ্র ছিলেন। মৃজাপুরে একখানি সামান্য খাপরেলের ঘরে বাস করিতেন। তাহারই এক প্রান্তে ফুল বিছাইয়া, ফুল স্তূপাকৃতি করিয়া ফুল ছড়াইয়া আমি ফুল গাঁথিতাম। পিতা বাহির হইয়া গেলে গান গাহিতাম।

"আমার এত সাধের প্রভাতে সই,
ফুটলো নাকো কলি—"

ও হরি—এখনও আমার বলা হয় নাই, আমি পুরুষ কি মেয়ে? তবে, এতক্ষণে যিনি না বুঝিয়াছেন, তাঁহাকে না বলাই ভাল; আমি এখন বলিব না।

পুরুষ হই, মেয়েই হই, অন্ধের বিবাহের বড় গোল। কাণা বলিয়া আমার বিবাহ হইল না। সেটা দুর্ভাগ্য কি সৌভাগ্য, যে চোখের মাথা না খাইয়াছে, সেই বুঝিবে। অনেক অপাঙ্গরঙ্গরঙ্গিণী আমার চিরকৌমার্য্যের কথা শুনিয়া বলিয়া গিয়াছে, "আহা, আমিও যদি কাণা হইতাম।"

বিবাহ না হউক—তাতে আমার দুঃখ ছিল না। আমি স্বয়ংবরা হইয়াছিলাম। এক দিন পিতার কাছে কলিকাতার বর্ণনা শুনিতেছিলাম। শুনিলাম, মনুমেণ্ট বড় ভারি ব্যাপার, অতি উঁচু, অটল, অচল, ঝড়ে ভাঙ্গে না, গলায় চেন—একা একাই বাবু। মনে মনে মনুমেণ্টকে বিবাহ করিলাম। আমার স্বামীর চেয়ে বড় কে? আমি মনুমেণ্টমহিষী।

কেবল একটা বিবাহ নহে। যখন মনুমেণ্টকে বিবাহ করি, তখন আমার বয়স পনর বৎসর। সতের বৎসর বয়সে, বলিতে লজ্জা করে, সধবা অবস্থাতেই—আর একটা বিবাহ ঘটিয়া গেল।

আমাদের বাড়ীর কাছে কালীচরণ বসু নামে এক জন কায়স্থ ছিল। চীনাবাজারে তাহার একখানি খেলনার দোকান ছিল। সে কায়স্থ—আমরাও কায়স্থ—সেই জন্য একটু আত্মীয়তা হইয়াছিল। কালী বসুর একটি চারি বৎসরের শিশুপুত্র ছিল। তাহার নাম বামাচরণ। বামাচরণ সর্ব্বদা আমাদের বাড়ী আসিত। এক দিন একটা বর বাজনা বাজাইয়া মন্দগামী ঝড়ের মত আমাদিগের বাড়ীর সম্মুখ দিয়া যায়। দেখিয়া বামাচরণ জিজ্ঞাসা করিল—"ও কে ও?"

আমি বলিলাম, "ও বর।" বামাচরণ তখন কান্না আরম্ভ করিল—"আমি বল হব।"

তাহাকে কিছুতেই থামাইতে না পারিয়া বলিলাম, "কাঁদিস্ না, তুই আমার বর।" এই বলিয়া একটা সন্দেশ তাহার হাতে দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেমন, তুই আমার বর হবি?" শিশু সন্দেশ হাতে পাইয়া রোদন সংবরণ করিয়া বলিল, "হব।"

সন্দেশ সমাপ্ত হইলে, বালক ক্ষণেক কাল পরে বলিল, "হাঁ গা, বলে কি কলে গা?" বোধ হয় তাহার ধ্রুব বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, বরে বুঝি কেবল সন্দেশই খায়। যদি তা হয়, তবে সে আর একটা আরম্ভ করিতে প্রস্তুত। ভাব বুঝিয়া আমি বলিলাম, "বরে ফুলগুলি গুছিয়ে দেয়।" বামাচরণ স্বামীর কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বুঝিয়া লইয়া, ফুলগুলি আমার হাতে গুছাইয়া তুলিয়া দিতে লাগিল। সেই অবধি আমি তাহাকে বর বলি, সে আমাকে ফুল গুছাইয়া দেয়।

আমার এই দুই বিবাহ এখন এ কালের জটিলাকুটিলাদিগকে আমার জিজ্ঞাস্য—আমি সতী বলাইতে পারি কি?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বড় বাড়ীতে ফুল যোগান বড় দায়। সে-কালের মালিনী মাসী রাজবাড়ীতে ফুল যোগাইয়া মশানে গিয়াছিল। ফুলের মধু খেলে বিদ্যাসুন্দর, কিল খেলে হীরা মালিনী—কেন না, সে বড় বাড়ীতে ফুল যোগাইত। সুন্দরের সেই রামরাজ্য হইল—কিন্তু মালিনীর কিল আর ফিরিল না।

বাবা ত "বেলফুল" হাঁকিয়া রসিকমহলে ফুল বেচিতেন, মা দুই একটা অরসিক মহলে ফুল নিত্য যোগাইতেন; তাহার মধ্যে রামসদয় মিত্রের বাড়ীই প্রধান। রামসদয় মিত্রের সাড়ে চারিটা ঘোড়া ছিল—(নাতিদের একটা পণি, আর আদত চারিটা), সাড়ে চারিটা ঘোড়া আর দেড়খানা গৃহিণী। এক জন আদত—এক জন চিররুগ্না এবং প্রাচীনা, তাঁহার নাম ভুবনেশ্বরী—কিন্তু তাঁর গলার সাঁই সাঁই শব্দ শুনিয়া রামমণি ভিন্ন অন্য নাম আমার মনে আসিত না।

আর যিনি পুরা একখানি গৃহিণী, তাঁহার নাম লবঙ্গলতা। লবঙ্গলতা লোকে বলিত, কিন্তু তাঁর পিতা নাম রাখিয়াছিলেন—ললিতলবঙ্গলতা এবং রামসদয় বাবু আদর করিয়া বলিতেন, "ললিত-লবঙ্গলতা-পরিশীলন-কোমল-মলয় সমীরে।" রামসদয় বাবু প্রাচীন, বয়ঃক্রম ৬৩ বৎসর। ললিতলবঙ্গলতা নবীনা, বয়স ১৯ বৎসর। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী, আদরের আদরিণী, গৌরবের গৌরবিণী, মানের মানিনী, নয়নের মণি, ষোল আনা গৃহিণী। তিনি রামসদয়ের সিন্দুকের চাবি, বিছানার চাদর, পানের চুণ, গেলাসের জল। তিনি রামসদয়ের জ্বরে কুইনাইন, কাসিতে ইপিকা, বাতে ফ্লানেল এবং আরোগ্যে শুশ্রূষা।

নয়ন নাই—ললিতলবঙ্গলতাকে কখন দেখিতে পাইলাম না—কিন্তু শুনিয়াছি, তিনি রূপসী। রূপ যাউক, গুণ শুনিয়াছি, লবঙ্গ বাস্তবিক গুণবতী। গৃহকার্য্যে নিপুণা, দানে মুক্তহস্ত, হৃদয়ে সরলা, কেবল বাক্যে বিষময়ী। লবঙ্গলতার অশেষ গুণের মধ্যে একটি এই যে, তিনি বাস্তবিক পিতামহের তুল্য সেই স্বামীকে ভালবাসিতেন—কোন নবীনা নবীন স্বামীকে সেরূপ ভালবাসিতেন কি না সন্দেহ। ভালবাসিতেন বলিয়া, তাঁহাকে নবীন সাজাইতেন। —সে সজ্জার রস কাহাকে বলি? আপন হস্তে নিত্য শুভ্রকেশে কলপ মাখাইয়া কেশগুলি রঞ্জিত করিতেন। যদি রামসদয় লজ্জার অনুরোধে কোন দিন মলমলের ধুতি পরিত, স্বহস্তে তাহা ত্যাগ করাইয়া কোকিলপেড়ে, ফিতে পেড়ে, কল্কা পেড়ে পরাইয়া দিতেন—মলমলের ধুতিখানি তৎক্ষণাৎ বিধবা দরিদ্রদিগকে বিতরণ করিতেন। রামসদয় প্রাচীন বয়সে আতরের শিশি দেখিলে ভয়ে পলাইত—লবঙ্গলতা, তাহার নিদ্রাবস্থায় সর্ব্বাঙ্গে আতর মাখাইয়া দিতেন। রামসদয়ের চসমাগুলি লবঙ্গ প্রায় চুরি করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিত, সোণাটুকু লইয়া যাহার কন্যার বিবাহের সম্ভাবনা, তাহাকে দিত। রামসদয়ের নাক ডাকিলে, লবঙ্গ ছয়গাছা

মল বাহির করিয়া পরিয়া ঘরময় ঝম্‌ঝম্‌ করিয়া রামসদয়ের নিদ্রা ভাঙ্গিয়া দিত।

লবঙ্গলতা আমাদের ফুল কিনিত—চার আনার ফুল লইয়া দুই টাকা মূল্য দিত। তাহার কারণ, আমি কাণা। মালা পাইলে লবঙ্গ গালি দিত, বলিত, "এমন কদর্য্য মালা আমাকে দিস্‌ কেন?" কিন্তু মূল্য দিবার সময় ডবল পয়সার সঙ্গে ভুল করিয়া টাকা দিত। ফিরাইয়া দিতে গেলে বলিত, —'ও আমার টাকা নয়,'—দুইবার বলিতে গেলে গালি দিয়া তাড়াইয়া দিত। তাহার দানের কথা মুখে আনিলে মারিতে আসিত। বাস্তবিক রামসদয় বাবুর ঘর না থাকিলে আমাদিগের দিনপাত হইত না। তবে যাহা রয় সয়,—তাই বলিয়া মাতা লবঙ্গের কাছে অধিক লইতেন না। দিনপাত হইলেই আমরা সন্তুষ্ট থাকিতাম। লবঙ্গলতা আমাদিগের নিকট রাশি রাশি ফুল কিনিয়া রামসদয়কে সাজাইত—সাজাইয়া বলিত, "দেখ রতিপতি!" রামসদয় বলিত, "দেখ, সাক্ষাৎ—খুল্লনানন্দন।" সেই প্রাচীনে নবীনে মনের মিল ছিল, দর্পণের মত দুই জনে দুই জনের মন দেখিতে পাইত। তাহাদের প্রেমের পদ্ধতিটা এইরূপ—

রামসদয় বলিত, "ললিতলবঙ্গলতাপরিশী—?"

লবঙ্গ। আজ্ঞে, ঠাকুরদাদা মহাশয়, দাসী হাজির!

রাম। আমি যদি মরি?

লবঙ্গ। "আমি তোমার বিষয় খাইব।" লবঙ্গ মনে মনে বলিত, "আমি বিষ খাইব।" রামসদয় তাহা মনে মনে জানিত।

লবঙ্গ এত টাকা দিত, তবে বড় বাড়ীতে ফুল যোগান দুঃখ কেন? শুন।

এক দিন মা'র জ্বর। অন্তঃপুরে বাবা যাইতে পারিবেন না—তবে আমি বৈ আর কে লবঙ্গলতাকে ফুল দিতে যাইবে? আমি লবঙ্গের জন্য ফুল লইয়া চলিলাম। অন্ধ হই, যা-ই হই—কলিকাতার রাস্তা সকল আমার নখদর্পণে ছিল। বেত্রহস্তে সর্ব্বত্র যাইতে পারিতাম, কখন গাড়ী-ঘোড়ার সম্মুখে পড়ি নাই। অনেক বার পথচারীর ঘাড়ে পড়িয়াছি বটে—তাহার কারণ, কেহ কেহ অন্ধ যুবতী দেখিয়া সাড়া দেয় না, বরং বলে, "আ মলো দেখতে পাস্‌নি? কাণা না কি?" আমি ভাবিতাম "উভয়তঃ!"

ফুল লইয়া লবঙ্গের কাছে গেলাম। দেখিয়া লবঙ্গ বলিলেন, "কি লো কাণী—আবার ফুল লইয়া মরতে এসেছিস্‌ কেন?" কাণী বলিলে আমার হাড় জ্বলিয়া যাইত—আমি কি কদর্য্য উত্তর দিতে যাইতেছিলাম; এমন সময় সেখানে হঠাৎ কাহার পদধ্বনি শুনিলাম—কে আসিল। যে আসিল—সে বলিল, "এ কে ছোট মা?"

ছোট মা!—তবে রামসদয়ের পুত্র। রামসদয়ের কোন্‌ পুত্র? বড় পুত্রের কণ্ঠ এক দিন শুনিয়াছিলাম, সে এমন অমৃত নহে—এমন করিয়া কর্ণবিবর ভরিয়া সুধা ঢালিয়া দেয় নাই। বুঝিলাম, এ ছোট বাবু।

ছোট মা বলিলেন,—এবার বড় মৃদুকণ্ঠে বলিলেন,—"ও কাণা ফুলওয়ালী।"

"ফুলওয়ালী? আমি বলি বা কোন ভদ্রলোকের মেয়ে।"

লবঙ্গ বলিলেন, "কেন গা, ফুলওয়ালী হইলে কি ভদ্রলোকের মেয়ে হয় না?"

ছোট বাবু অপ্রতিভ হইলেন। বলিলেন, "হবে না কেন? এটি ত ভদ্রলোকের মেয়ের মত বোধ হইতেছে। তা ওটি কাণা হ'লো কিসে?"

লবঙ্গ। ও জন্মান্ধ।

ছোট বাবু। দেখি?

ছোট বাবুর বড় বিদ্যার গৌরব ছিল। তিনি অন্যান্য বিদ্যাও যেরূপ যত্নের সহিত শিক্ষা করিয়াছিলেন, অর্থের প্রত্যাশী না হইয়া চিকিৎসা-শাস্ত্রেও সেইরূপ যত্ন করিয়াছিলেন। লোকে রাষ্ট্র করিত যে, শচীন্দ্রবাবু (ছোট বাবু) কেবল দরিদ্রগণের বিনামূল্যে চিকিৎসা করিবার জন্য চিকিৎসাবিদ্যা শিখিতেছিলেন। "দেখি" বলিয়া আমাকে বলিলেন, "একবার দাঁড়াও ত গা।"

আমি জড়সড় হইয়া দাঁড়াইলাম।

ছোট বাবু বলিলেন, "আমার দিকে চাও।"

চাব কি ছাই!

"আমার দিকে চোখ ফিরাও।"

কাণা চোখে শব্দভেদী বাণ মারিলাম। ছোট বাবুর মনের মত হইল না, তিনি আমার দাড়ি ধরিয়া মুখ ফিরাইলেন।

ডাক্তারির কপালে আগুন জ্বেলে দি! সে চিবুকস্পর্শে আমি মরিলাম!

সে স্পর্শ পুষ্পময়। সেই স্পর্শে যূথী, জাতি, মল্লিকা, শেফালিকা, কামিনী, গোলাপ, সেঁউতি—সব ফুলের ঘ্রাণ পাইলাম—বোধ হইল, আমার আশে পাশে ফুল, আমার মাথায় ফুল, আমার পায়ে ফুল—আমার পরনে ফুল, আমার বুকের ভিতর

ফুলের রাশি। আ মরি মরি! কোন্ বিধাতা এ কুসুমময় স্পর্শ গড়িয়াছিল। বলিয়াছি ত, কাণার সুখ-দুঃখ তোমরা বুঝিবে না; আ মরি মরি—সে নবনীত-সুকুমার পুষ্পগন্ধময় বীণাধ্বনিবৎ স্পর্শ! বীণাধ্বনিবৎ স্পর্শ, যার চোখ আছে, সে বুঝিবে কি প্রকারে? আমার সুখ-দুঃখ আমাতেই থাকুক, যখন সেই স্পর্শ মনে পড়িত, তখন কত বীণাধ্বনিবৎ কর্ণে শুনিতাম, তাহা তুমি বিলোলকটাক্ষ-কুশলিনী কি বুঝিবে?

ছোট বাবু বলিলেন, "না, এ কাণা সারিবার নয়।"

আমার ত সেই জন্য ঘুম হইতেছিল না।

লবঙ্গ বলিল, "তা না সারুক, টাকা খরচ করিলে কাণার কি বিয়ে হয় না?"

ছোট বাবু। কেন, এর কি বিবাহ হয় নাই?

লবঙ্গ। না। টাকা খরচ করিলে হয়?

ছোট বাবু। আপনি কি উহার বিবাহের জন্য টাকা দিবেন?

লবঙ্গ রাগিল। বলিল, "এমন ছেলেও দেখি নাই। আমার কি টাকা রাখিবার জায়গা নাই? বিয়ে কি হয়, তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি। মেয়ে-মানুষ সকল কথা ত জানে না। বিবাহ কি হয়?"

ছোট বাবু ছোট মাকে চিনিতেন। হাসিয়া বলিলেন, "তা মা, তুমি টাকা রেখো, আমি সম্বন্ধ করিব।"

মনে মনে ললিতলবঙ্গলতার মুণ্ডপাত করিতে করিতে আমি সেই স্থান হইতে পলাইলাম।

তাই বলিতেছিলাম, বড়মানুষের বাড়ী ফুল যোগান বড় দায়।

বহুমূর্ত্তিময়ি বসুন্ধরে। তুমি দেখিতে কেমন? তুমি যে অসংখ্য অচিন্তনীয় শক্তিধর, অনন্ত বৈচিত্র্য-বিশিষ্ট জড়পদার্থসকল হৃদয়ে ধারণ কর, সে সব দেখিতে কেমন? যাকে যাকে লোকে সুন্দর বলে, সে সব দেখিতে কেমন? তোমার হৃদয়ে যে অসংখ্য বহুপ্রকৃতিবিশিষ্ট জন্তুগণ বিচরণ করে, তারা সব দেখিতে কেমন? বল মা, তোমার হৃদয়ের সারভূত পুরুষজাতি দেখিতে কেমন? দেখাও মা, তাহার মধ্যে যাহার করস্পর্শে এত সুখ, সে দেখিতে কেমন? দেখা মা, দেখিতে কেমন দেখায়? দেখা কি? দেখা কেমন? দেখিলে কিরূপ সুখ হয়? এক মুহূর্ত্তের জন্য এই সুখময় স্পর্শ দেখিতে পাই না? দেখা মা! বাহিরের চক্ষু নিমীলিত থাকে—থাকুক মা! আমার হৃদয়ের মধ্যে চক্ষু ফুটাইয়া দে, আমি একবার অন্তরের ভিতর অন্তর লুকাইয়া মনের সাধে রূপ দেখে নারীজন্ম সার্থক করি। সবাই দেখে—আমি দেখিব না কেন? বুঝি কীটপতঙ্গ অবধি দেখে, আমি কি অপরাধে দেখিতে পাই না? শুধু দেখা—কারও ক্ষতি নাই, কারও কষ্ট নাই, কারও পাপ নাই, সবাই অবহেলে দেখে—কি দোষে আমি কখন দেখিব না?

না, না। অদৃষ্টে নাই। হৃদয়মধ্যে খুঁজিলাম, শুধু শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ। আর কিছু পাইলাম না।

আমার অন্তর বিদীর্ণ করিয়া ধ্বনি উঠিতে লাগিল, কে দেখাবি দেখা গো—আমায় রূপ দেখা! বুঝিল না! কেহই অন্ধের দুঃখ বুঝিল না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সেই অবধি আমি প্রায় প্রত্যহ রামসদয় মিত্রের বাড়ী ফুল বেচিতে যাইতাম। কিন্তু কেন, তাহা জানি না। যাহার নয়ন নাই, তাহার এ যত্ন কেন? সে দেখিতে পাইবে না, কেবল কথার শব্দ শুনিবার ভরসা মাত্র। কেন শচীন্দ্রবাবু আমার কাছে আসিয়া কথা কহিবেন? তিনি থাকেন সদরে—আমি যাই অন্তঃপুরে। যদি তাঁহার স্ত্রী থাকিত, তবেও বা কখন আসিতেন। কিন্তু বৎসরেক পূর্ব্বে তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছিল—আর বিবাহ করেন নাই, অতএব সে ভরসাও নাই। কদাচিৎ কোন প্রয়োজনে মাতাদিগের নিকট আসিতেন। আমি যে সময় ফুল লইয়া যাইব, তিনিও ঠিক সেই সময়ে আসিবেন, তাহারই বা সম্ভাবনা কি? অতএব যে এক শব্দ শুনিবার মাত্র আশা, তাহাও যদি সফল হইত না, তথাপি অন্ধ প্রত্যহ ফুল লইয়া যাইত কোন্ দুরাশায়, তাহা জানি না। নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিবার সময় প্রত্যহ ভাবিতাম, আমি কেন আসি? প্রত্যহ মনে করিতাম, আর আসিব না। প্রত্যহই সে কল্পনা বৃথা হইত, প্রত্যহই আবার যাইতাম, যেন কে চুল ধরিয়া লইয়া যাইত। আবার নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিতাম, আবার প্রতিজ্ঞা করিতাম, যাইব না—আবার যাইতাম, এইরূপে দিন কাটিতে লাগিল।

মনে মনে আলোচনা করিতাম, কেন যাই? শুনিয়াছি—স্ত্রীজাতি পুরুষের রূপে মুগ্ধ হইয়া ভালবাসে। আমি কাণা, কাহার রূপ দেখিয়াছি?

তবে কেন যাই? কথা শুনিব বলিয়া? কখন কেহ শুনিয়াছে যে, কোন রমণী শুধু কথা শুনিয়াই উন্মাদিনী হইয়াছে? আমি কি তাই হইয়াছি? তাও কি সম্ভব? যদি তাই হয়, তবে বাদ্য শুনিবার জন্য বাদকের বাড়ী যাই না কেন? সেতার, সারেঙ্গী, এসরাজ, বেহালার অপেক্ষা কি শচীন্দ্র সুকণ্ঠ? সে কথা মিথ্যা।

তবে কি, সেই স্পর্শ? আমি যে কুসুমরাশি রাত্রি-দিবা লইয়া আছি, কখন পাতিয়া শুইতেছি, কখন বুকে চাপাইতেছি—ইহা'র অপেক্ষা তাহার স্পর্শ কোমল? তা ত নয়। তবে কি? এ কাণাকে কে বুঝাইবে, তবে কি?

তোমরা বুঝ না, বুঝাইবে কি? তোমাদের চক্ষু আছে, রূপ চেন, রূপই বুঝ। আমি জানি, রূপ দ্রষ্টার মানসিক বিকারমাত্র—শব্দও মানসিক বিকার। রূপ রূপবানে নাই। রূপ দর্শকের মনে—নহিলে এক জনকে সকলে সমান রূপবান্ দেখে না কেন? এক জনে সকলেই আসক্ত হয় না কেন? সেইরূপ শব্দও তোমার মনে। রূপ দর্শকের একটি মনের সুখ মাত্র, শব্দও শ্রোতার একটি মনের সুখ মাত্র। স্পর্শও স্পর্শকের মনের সুখ মাত্র। যদি আমার রূপ-সুখের পথ বন্ধ থাকে, তবে শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ কেন রূপসুখের ন্যায় মনোমধ্যে সর্ব্বময় না হইবে?

শুষ্কভূমিতে বৃষ্টি পড়িলে কেন না সে উৎপাদিনী হইবে? শুষ্ককাষ্ঠে অগ্নি সংলগ্ন হইলে কেন না সে জ্বলিবে? রূপে হউক, শব্দে হউক, স্পর্শে হউক, শূন্য রমণী-হৃদয়ে সুপুরুষ-সংস্পর্শ হইলে কেন না প্রেম জন্মিবে? দেখ, অন্ধকারেও ফুল ফুটে, মেঘে ঢাকিলেও চাঁদ গগনে বিহার করে, জনশূন্য অরণ্যেও কোকিল ডাকে, যে সাগরগর্ভে মনুষ্য কখনও যাইবে না, সেখানেও রত্ন প্রভাসিত হয়, অন্ধের হৃদয়েও প্রেম জন্মে, আমার নয়ন নিরুদ্ধ বলিয়া হৃদয় কেন প্রস্ফুটিত হইবে না?

হইবে না কেন, কিন্তু সে কেবল আমার যন্ত্রণার জন্য। বোবার কবিত্ব কেবল তাহার যন্ত্রণার জন্য, বধিরের সঙ্গীতানুরাগ' যদি হয়, কেবল তাহার যন্ত্রণার জন্য, আপনার গীত আপনি শুনিতে পায় না। আমার হৃদয়ে প্রণয়সঞ্চার তেমনি যন্ত্রণার জন্য। পরের রূপ দেখিব কি—আমি আপনার রূপ কখন আপনি দেখিলাম না। রূপ! রূপ! আমার কি রূপ! এই ভূমণ্ডলে রজনী নামে ক্ষুদ্র বিন্দু কেমন দেখায়? আমাকে দেখিলে কখন কি কাহারও আবার ফিরিয়া দেখিতে ইচ্ছা হয় নাই? এমন নীচাশয় ক্ষুদ্র কেহ কি জগতে নাই যে, আমাকে সুন্দর দেখে? নয়ন না থাকিলে নারী সুন্দরী হয় না—আমার নয়ন নাই—কিন্তু তবে কারিগরে পাতর কোদিয়া চক্ষুশূন্য মূর্ত্তি গড়ে কেন? আমি কি কেবল সেইরূপ পাষাণী-মাত্র? তবে বিধাতা এ পাষাণমধ্যে এ সুখদুঃখসমাকুল প্রণয়-লালসা-পরবশ হৃদয় কেন পূরিল? পাষাণের দুঃখ পাইয়াছি, পাষাণের সুখ পাইলাম না কেন? এ সংসারে এ তারতম্য কেন? অনন্ত দুষ্কৃতকারীও চক্ষে দেখে, আমি জন্ম-পূর্ব্বেই কোন্ দোষ করিয়াছিলাম যে, আমি চক্ষে দেখিতে পাইব না? এ সংসারে বিধাতা নাই—বিধান নাই, পাপ-পুণ্যের দণ্ডপুরস্কার নাই—আমি মরিব।

আমার এই জীবনে বহু বৎসর গিয়াছে—বহু বৎসর আসিতেও পারে। বৎসরে বৎসরে বহু দিবস—দিবসে দিবসে বহু দণ্ড—দণ্ডে দণ্ডে বহু মুহূর্ত্ত—তাহার মধ্যে এক মুহূর্ত্ত জন্য, এক পলক জন্য আমার চক্ষু কি ফুটিবে না? এক মুহূর্ত্ত জন্য চক্ষু মেলিতে পারিলে দেখিয়া লই, এই শব্দস্পর্শময় বিশ্বসংসার কি—আমি কি—শচীন্দ্র কি?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আমি প্রত্যহই ফুল লইয়া যাইতাম, ছোট বাবুর কথার শব্দশ্রবণ প্রায় ঘটিত না। কিন্তু কদাচিৎ দুই এক দিন ঘটিত। সে আহ্লাদের কথা বলিতে পারি না। আমার বোধ হইত, বর্ষার জলভরা মেঘ যখন ডাকিয়া বর্ষে, তখন মেঘের বুঝি সেইরূপ আহ্লাদ হয়, আমারও সেইরূপ ডাকিতে ইচ্ছা করিত। আমি প্রত্যহ মনে করিতাম, আমি ছোট-বাবুকে কতগুলি বাছা ফুলের তোড়া বাঁধিয়া দিয়া আসিব—কিন্তু তাহা এক দিনও পারিলাম না। একে লজ্জা করিত—আবার মনে ভাবিতাম, ফুল দিলে তিনি দাম দিতে চাহিবেন, কি বলিয়া না লইব? মনের দুঃখে ঘরে আসিয়া ফুল লইয়া ছোট বাবুকেই গড়িতাম। কি গড়িতাম, তাহা জানি না—কখন দেখি নাই।

এ দিকে আমার যাতায়াতে একটি অচিন্তনীয় ফল ফলিতেছিল—আমি তাহার কিছুই জানিতাম না; পিতা-মাতার কথোপকথনে তাহা প্রথম জানিতে পারিলাম। একদিন সন্ধ্যার পর আমি মালা গাঁথিতে গাঁথিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম।

কি একটা শব্দে নিদ্রা ভাঙ্গিল। জাগরিত হইলে কর্ণে পিতা-মাতার কথোপকথনের শব্দ প্রবেশ করিল। বোধ হয়, প্রদীপ নিবিয়া গিয়া থাকিবে, কেন না, পিতা-মাতা আমার নিদ্রাভঙ্গ জানিতে পারিলেন, এমত বোধ হইল না। আমিও আমার নাম শুনিয়া কোন সাড়াশব্দ করিলাম না। শুনিলাম, মা বলিতেছেন, "তবে এক প্রকার স্থিরই হইয়াছে?"

পিতা উত্তর করিলেন, "স্থির বৈ কি? অমন বড়মানুষ লোকে কথা দিলে কি আর নড়চড় আছে? আর আমার মেয়ের দোষের মধ্যে অন্ধ, নহিলে অমন মেয়ে লোকে তপস্যা করিয়া পায় না।"

মা। তা পরে এত করবে কেন?

পিতা। তুমি বুঝিতে পার না যে, ওরা আমাদের মত টাকার কাঙ্গালী নয়—হাজার দুই-হাজার টাকা ওরা টাকার মধ্যে ধরে না। যে দিন রজনীর সাক্ষাতে রামসদয় বাবুর স্ত্রী বিবাহের কথা প্রথম পাড়িলেন, সেই দিন হইতে রজনী তাঁহার কাছে প্রত্যহ যাতায়াত আরম্ভ করিল। তিনি ছেলেকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, টাকায় কি কাণার বিয়ে হয়? ইহাতে অবশ্য মেয়ের মনে আশা-ভরসা হইতে পারে যে, বুঝি ইনি দয়াবতী হইয়া টাকা খরচ করিয়া আমার বিবাহ দিবেন। সে দিন হইতে রজনী নিত্য যায় আসে। সেই দিন হইতে নিত্য যাতায়াত দেখিয়া লবঙ্গ বুঝিলেন যে, মেয়েটি বিবাহের জন্য বড় কাতর হয়েছে—না হবে কেন, বয়স ত হয়েছে। তাতে আবার ছোট বাবু টাকা দিয়া হরনাথ বসুকে রাজি করিয়াছেন। গোপালও রাজি হইয়াছেন।

হরনাথ বসু রামসদয় বাবুর বাড়ীর সরকার, গোপাল তাহার পুত্র। গোপালের কথা কিছু কিছু জানিতাম। গোপালের বয়স ত্রিশ বৎসর—একটি বিবাহ আছে, কিন্তু সন্তানাদি হয় নাই। গৃহধর্মার্থে তাঁহার গৃহিণী আছে—সন্তানার্থ অন্ধ পত্নীতে তাঁহার আপত্তি নাই। বিশেষ লবঙ্গ তাহাকে টাকা দিবে। পিতামাতার কথায় বুঝিলাম, গোপালের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে—টাকার লোভে সে কুড়ি বৎসরের মেয়েও বিবাহ করিতে প্রস্তুত। টাকায় জাতি কিনিবে। পিতা-মাতা মনে করিলেন, এ জন্মের মত অন্ধ কন্যা উদ্ধারপ্রাপ্ত হইল। তাঁহারা আহ্লাদ করিতে লাগিলেন। আমার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল।

তার পরদিন স্থির করিলাম, আর আমি লবঙ্গের কাছে যাইব না—মনে মনে তাহাকে শতবার পোড়ারমুখী বলিয়া গালি দিলাম। লজ্জায় মরিয়া যাইতে ইচ্ছা হইতে লাগিল। রাগে লবঙ্গকে মারিতে ইচ্ছা করিতে লাগিল। দুঃখে কান্না আসিতে লাগিল। আমি লবঙ্গের কি করিয়াছি যে, সে আমার উপর এত অত্যাচার করিতে উদ্যত? ভাবিলাম, যদি বড়মানুষ বলিয়া অত্যাচার করিয়াই সুখী হয়, তবে জন্মান্ধ দুঃখিনী ভিন্ন আর কি অত্যাচার করিবার পাত্র পাইল না? মনে করিলাম, না, আর এক দিন যাইব, তাহাকে এমনই করিয়া তিরস্কার করিয়া আসিব—তার পর আর যাইব না—আর ফুল বেচিব না—আর তাহার টাকা লইব না—মা যদি তাহাকে ফুল দিয়া মূল্য লইয়া আসেন, তবে তাহার টাকার অন্ন ভোজন করিব না—না খাইয়া মরিতে হয়, সে-ও ভাল। ভাবিলাম, বলিব, বড়মানুষ হইলেই কি পরপীড়ন করিতে হয়? বলিব, আমি অন্ধ, অন্ধ বলিয়া কি দয়া হয় না? বলিব, পৃথিবীতে যাহার কোন সুখ নাই, তাহাকে নিরপরাধে কষ্ট দিয়া তোমার কি সুখ? যত ভাবি এই এই বলিব, তত আপনার চক্ষের জলে আপনি ভাসি। মনে এই ভয় হইতে লাগিল, পাছে বলিবার সময় কথাগুলি ভুলিয়া যাই।

যথাসময়ে আবার রামসদয় বাবুর বাড়ী চলিলাম। ফুল লইব না মনে করিয়াছিলাম—কিন্তু শুধু হাতে যাইতে লজ্জা করিতে লাগিল—কি বলিয়া গিয়া বসিব? পূর্ব্বমত কিছু ফুল লইলাম। কিন্তু আজি মাকে লুকাইয়া গেলাম।

ফুল দিলাম—তিরস্কার করিব বলিয়া লবঙ্গের কাছে বসিলাম। কি বলিয়া প্রসঙ্গ উত্থাপন করিব? হরি! হরি! কি বলিয়া আরম্ভ করিব? গোড়ার কথা কোন্‌টা? যখন চারিদিকে আগুন জ্বলিতেছে, আগে কোন্ দিক্ নিবাইব? কিছুই বলা হইল না। কথা পাড়িতেই পারিলাম না। কান্না আসিতে লাগিল।

ভাগ্যক্রমে লবঙ্গ আপনি প্রসঙ্গ তুলিল, "কাণি—তোর বিয়ে হবে।"

আমি জ্বলিয়া উঠিলাম; বলিলাম, "ছাই হবে।"

লবঙ্গ বলিল, "কেন ছোট বাবু বিবাহ দেওয়াইবেন—হবে না কেন?"

আরও জ্বলিলাম, বলিলাম, "কেন, আমি তোমাদের কাছে কি দোষ করেছি?"

লবঙ্গও রাগিল। বলিল, "আঃ! মলো! তোর্ কি বিয়ের মন নাই না কি?"

আমি মাথা নাড়িয়া বলিলাম, "না।"

লবঙ্গ আরও রাগিল, বলিল, "পাপিষ্ঠা কোথাকার! বিয়ে কর্‌বি না কেন?"

আমি বলিলাম, "খুসি।"

লবঙ্গের মনে বোধ হয় সন্দেহ হইল—আমি ভ্রষ্টা—নহিলে বিবাহে অসম্মত কেন? সে বড় রাগ করিয়া বলিল, "আঃ মলো! বেরো বলিতেছি—নহিলে খেঙরা মারিয়া বিদায় করিব।"

আমি উঠিলাম,—আমার দুই অন্ধ চক্ষে জল পড়িতেছিল। তাহা লবঙ্গকে দেখাইলাম না—ফিরিলাম। গৃহে যাইতেছিলাম, সিঁড়িতে আসিয়া একটু ইতস্ততঃ করিতেছিলাম, কৈ, তিরস্কারের কথা কিছুই বলা হয় নাই। অকস্মাৎ কাহার পদশব্দ শুনিলাম। অন্ধের শ্রবণশক্তি অনৈসর্গিক প্রখরতা প্রাপ্ত হয়—আমি দুই একবার সে পদশব্দ শুনিয়াই চিনিয়াছিলাম, কাহার পদবিক্ষেপের এ শব্দ। আমি সিঁড়িতে বসিলাম। ছোট বাবু আমার নিকটে আসিলেন, আমাকে দেখিয়া দাঁড়াইলেন। বোধ হয়, আমার চক্ষের জল দেখিতে পাইয়াছেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে, রজনি!"

সকল ভুলিয়া গেলাম! রাগ ভুলিলাম, অপমান ভুলিলাম, দুঃখ ভুলিলাম, কাণে বাজিতে লাগিল, "কে, রজনি!" আমি উত্তর করিলাম না। মনে করিলাম, আর দুই একবার জিজ্ঞাসা করুন, আমি শুনিয়া কাণ জুড়াই।

ছোট বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "রজনি, কাঁদিতেছ কেন?"

আমার অন্তর আনন্দে ভরিতে লাগিল। চক্ষের জল আরও উছলিতে লাগিল। আমি কথা কহিলাম না, আরও জিজ্ঞাসা করুন। মনে করিলাম, আমি কি ভাগ্যবতী! বিধাতা আমায় কাণা করিয়াছিলেন, কালা করেন নাই।

তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন কাঁদিতেছ? কেহ কিছু বলিয়াছে?"

আমি সে বার উত্তর করিলাম, তাঁহার সঙ্গে কথোপকথনের সুখ যদি জন্মে একবার ঘটিতেছে—তবে ত্যাগ করি কেন? আমি বলিলাম, "ছোট মা তিরস্কার করিয়াছেন।"

ছোট বাবু হাসিলেন। বলিলেন, "ছোট মা'র কথা ধরিও না, তাঁর মুখ ঐ রকম—কিন্তু মনে রাগ করেন না। তুমি আমার সঙ্গে এস, এখনই তিনি আবার ভাল কথা বলিবেন।"

তাঁহার সঙ্গে কেন না যাইব? তিনি ডাকিলে কি আর রাগ থাকে? আমি উঠিলাম। তাঁহার সঙ্গে চলিলাম। তিনি সিঁড়িতে উঠিতে লাগিলেন, আমিও পশ্চাৎ পশ্চাৎ উঠিতেছিলাম। তিনি বলিলেন, "তুমি দেখিতে পাও না, সিঁড়িতে উঠ কিরূপে? না পার, আমি হাত ধরিয়া লইয়া যাইতেছি।"

আমার গা কাঁপিয়া উঠিল। সর্ব্বশরীরে রোমাঞ্চ হইল। তিনি আমার হাত ধরিলেন। ধরুন না—লোকে নিন্দা করে করুক, আমার নারীজন্ম সার্থক হউক, আমি পরের সাহায্য ব্যতীত কলিকাতার গলি গলি বেড়াইতে পারি, কিন্তু ছোট বাবুকে নিষেধ করিলাম না। ছোট বাবু—বলিব কি?—কি বলিয়া বলিব—উপযুক্ত কথা পাই না—ছোট বাবু হাত ধরিলেন।

যেন একটি প্রভাত-প্রফুল্ল পদ্ম, দলগুলি দিয়া আমার প্রকোষ্ঠ বেড়িয়া ধরিল—যেন গোলাপের মালা গাঁথিয়া কে আমার হাতে বেড়িয়া দিল। আমার আর কিছু মনে নাই। বুঝি সেই সময় ইচ্ছা হইয়াছিল—এখন মরি না কেন? বুঝি তখন গলিয়া জল হইয়া যাইতে ইচ্ছা করিয়াছিল—বুঝি ইচ্ছা করিয়াছিল, শচীন্দ্র আর আমি, দুইটি ফুল হইয়া এইরূপ সংস্পৃষ্ট হইয়া কোন বন্যবৃক্ষে গিয়া একটি বোঁটায় ঝুলিয়া থাকি। আর কি মনে হইয়াছিল, তাহা মনে নাই। যখন সিঁড়ির উপর উঠিয়া ছোট বাবু হাত ছাড়িয়া দিলেন,—তখন দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলাম—এ সংসার আবার মনে পড়িল—সেই সঙ্গে মনে পড়িল—"কি করিলে প্রাণেশ্বর! না বুঝিয়া কি করিলে! তুমি আমার পাণি গ্রহণ করিয়াছ। এখন তুমি আমায় গ্রহণ কর না কর—তুমি আমার স্বামী, আমি তোমার পত্নী। ইহজন্মে অন্ধ ফুলওয়ালীর আর কেহ স্বামী হইবে না।"

সেই সময় কি পোড়া লোকের চোখ পড়িল! বুঝি তাই।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ছোট বাবু ছোট মা'র কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "রজনীকে কি বলিয়াছ গা! সে কাঁদিতেছে।" ছোট মা আমার চক্ষে জল দেখিয়া

অপ্রতিভ হইলেন—আমাকে ভাল কথা বলিয়া কাছে বসাইলেন—বয়োজ্যেষ্ঠ সপত্নীপুত্রের কাছে সকল কথা ভাঙ্গিয়া বলিতে পারিলেন না। ছোট বাবু ছোট মাকে প্রসন্ন দেখিয়া নিজ প্রয়োজনে বড় মা'র কাছে চলিয়া গেলেন। আমিও বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম।

এ দিকে গোপাল বাবুর সঙ্গে আমার বিবাহের উদ্যোগ হইতে লাগিল। দিন স্থির হইল। আমি কি করিব? ফুল গাঁথা বন্ধ করিয়া দিবারাত্রি কিসে এ বিবাহ বন্ধ করি—সেই চিন্তা করিতে লাগিলাম। বিবাহে মাতার আনন্দ, পিতার উৎসাহ, লবঙ্গ-লতার যত্ন, ছোট বাবু ঘটক! এই কথাটি সর্ব্বাপেক্ষা কষ্টদায়ক—ছোট বাবু ঘটক! আমি একা, অন্ধ, কি প্রকারে ইহার প্রতিবন্ধকতা করিব? কোন উপায় দেখিতে পাইলাম না। মালা গাঁথা বন্ধ হইল। মাতা-পিতা মনে করিলেন, বিবাহ-আনন্দে আমি বিহ্বল হইয়া মালা গাঁথা ত্যাগ করিয়াছি।

ঈশ্বর আমাকে এক সহায় আনিয়া দিলেন। বলিয়াছি, গোপাল বসুর বিবাহ ছিল—তাঁহার পত্নীর নাম চাঁপা—বাপ রেখেছিল, চম্পকলতা। চাঁপাই কেবল এ বিবাহে অসম্মত। চাঁপা একটু শক্ত মেয়ে। যাহাতে ঘরে সপত্নী না হয়, তাহার চেষ্টার কিছু ত্রুটি করিল না।

হীরালাল নামে চাঁপার এক ভাই ছিল—চাঁপার অপেক্ষা দেড় বৎসরের ছোট। হীরালাল মদ খায়—তাহাও অল্প মাত্রায় নহে। শুনিয়াছি, গাঁজাও টানে। তাহার পিতা তাহাকে লেখাপড়া শিখান নাই—কোন প্রকারে সে হস্তাক্ষরটি প্রস্তুত করিয়াছিল মাত্র, তথাপ রামসদয় বাবু তাহাকে কোথা কেরাণীগিরি করিয়া দিয়াছিলেন। মাতলামির দোষে সে চাকরীটি গেল। হরনাথ বসু, তাহার গুণে ভুলিয়া লাভের আশায় তাহাকে দোকান করিয়া দিলেন। দোকানে লাভ দূরে থাক, দেনা পড়িল—দোকান উঠিয়া গেল। তার পর কোন গ্রামে বার টাকা বেতনে হীরালাল মাষ্টার হইয়া গেল। সে গ্রামে মদ পাওয়া যায় না বলিয়া হীরালাল পলাইয়া আসিল। তার পর সে একখানা খবরের কাগজ করিল। দিন কতক তাহাতে খুব লাভ হইল, বড় পসার জাকিল, কিন্তু অশ্লীলতা-দোষে পুলিস টানাটানি আরম্ভ করিল। ভয়ে হীরালাল কাগজ ফেলিয়া রূপোষ হইল। কিছু দিন পরে হীরালাল আবার হঠাৎ ভাসিয়া উঠিয়া ছোট বাবুর মোসাহেবী করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু ছোট বাবুর কাছে মদের চাল নাই দেখিয়া আপনাআপনি সরিল। অনন্যোপায় হইয়া নাটক লিখিতে আরম্ভ করিল। নাটক একখানাও বিক্রয় হইল না। তবে ছাপাখানার দেনা শুধিতে হয় না বলিয়া সে যাত্রা রক্ষা পাইল। এক্ষণে এ ভবসংসারে আর কূল-কিনারা না দেখিয়া হীরালাল চাঁপা-দিদির আঁচল ধরিয়া বসিয়া রহিল।

চাঁপা হীরালালকে স্বকার্য্যোদ্ধার জন্য নিয়োজিত করিল। হীরালাল ভগিনীর কাছে সবিশেষ শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "টাকার কথা সত্য ত? যেই কাণীকে বিবাহ করিবে, সেই টাকা পাইবে?"

চাঁপা সেই বিষয়ে সন্দেহ ভঞ্জন করিল। হীরালালের টাকা বড় দরকার। সে তখনই আমার পিতৃভবনে আসিয়া দর্শন দিল। পিতা তখন বাড়ী ছিলেন; আমি তখন সেখানে ছিলাম না। আমি নিকটস্থ অন্য ঘরে ছিলাম—অপরিচিত পুরুষে পিতার সঙ্গে কথা কহিতেছে, কণ্ঠস্বরে জানিতে পারিয়া কাণ পাতিয়া কথাবার্ত্তা শুনিতে লাগিলাম, হীরালালের কি কর্কশ কদর্য্য স্বর!

হীরালাল বলিতেছে, "সতীনের উপর কেন মেয়ে দিবে?

পিতা দুঃখিতভাবে বলিলেন, "কি করি। না দিলে ত বিয়ে হয় না—এত কাল ত হলো না।"

হীরালাল। কেন, কেন, তোমার মেয়ের বিবাহের ভাবনা কি?

পিতা হাসিলেন, বলিলেন, "আমি গরীব—ফুল বেচিয়া খাই—আমার মেয়ে কে বিবাহ করিবে? তাতে আমার কাণা মেয়ে, আবার বয়সও ঢের হয়েছে।"

হীরা। কেন, পাত্রের অভাব কি? আমায় বলিলে আমি বিয়ে করি। এখন বয়স্থা মেয়ে ত লোকে চায়। আমি যখন ভম্চভিম্চ্পাৎ পত্রিকার এডিটার ছিলাম, তখন আমি মেয়ে বড় করিয়া বিবাহ দিবার জন্য কত আর্টিকেল লিখেছি—পড়িয়া আকাশের মেঘ ডেকে উঠেছিল। বাল্যবিবাহ। ছি! ছি! মেয়ে ত বড় করিয়াই বিবাহ দিবে। এসো! আমাকে দেশের উন্নতির একজাম্পল সেট্ করিতে দাও—আমিই এ মেয়ে বিবাহ করিব।

আমরা তখন হীরালালের চরিত্রের কথা সবিশেষ শুনি নাই—পশ্চাৎ শুনিয়াছি। পিতা ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। এত বড় পণ্ডিত জামাই হাতছাড়া হয় ভাবিয়া শেষে একটু দুঃখিত হইলেন। শেষে বলিলেন, "এখন কথা ধার্য্য হইয়া

গিয়াছে, এখন আর নড়চড় হয় না, বিশেষ এ বিবাহের কর্ত্তা শচীন্দ্র বাবু। তাঁহারাই বিবাহ দিতেছেন। তাঁহারা যাহা করিবেন, তাহাই হইবে। তাঁহারাই গোপাল বাবুর সঙ্গে সম্বন্ধ করিয়াছেন।"

হীরা। তাহাদের মতলব তুমি কি বুঝিবে? বড়মানুষের চরিত্রের অন্ত পাওয়া ভার। তাহাদের বড় বিশ্বাস করিও না।

এই বলিয়া হীরালাল চুপি চুপি কি বলিল, তাহা শুনিতে পাইলাম না। পিতা বলিলেন, "সে কি? না—আমার কাণা মেয়ে।"

হীরালাল তৎকালে ভগ্নমনোরথ হইয়া ঘরের এদিক্ সেদিক্ দেখিতে লাগিল। চারিদিক্ দেখিয়া বলিল, "তোমার ঘরে মদ নাই, বটে হে?" পিতা বিস্মিত হইলেন। বলিলেন, "মদ। কি জন্য রাখিব?"

হীরালাল মদ নাই জানিয়া বিজ্ঞের ন্যায় বলিল, "সাবধান করিয়া দিবার জন্য বল্‌ছিলাম। এখন ভদ্রলোকের সঙ্গে কুটুম্বিতা করিতে চলিলে, ওগুলা যেন না থাকে।"

কথাটা পিতার বড় ভাল লাগিল না। তিনি চুপ করিয়া রহিলেন। হীরালাল না বিবাহে, না মদে, কোন দিকেই দেশের উন্নতির একজাম্পল্ সেট্ করিতে না পারিয়া ক্ষুণ্নমনে বিদায় হইল।

—

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বিবাহের দিন অতি নিকট হইল—আর এক দিনমাত্র বিলম্ব আছে। উপায় নাই। নিষ্কৃতি নাই। চারিদিক্ হইতে উচ্ছ্বসিত বারিরাশি গর্জ্জিয়া আসিতেছে—নিশ্চিত ডুবিব।

তখন লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়া, মাতার পায়ে আছড়াইয়া কাঁদিতে লাগিলাম—যোড়হাত করিয়া বলিলাম, "আমার বিবাহ দিও না—আমি আইবুড়ো থাকিব।"

মা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন? কেন?" তাহার উত্তর দিতে পারিলাম না। কেবল যোড়হাত করিতে লাগিলাম—কেবল কাঁদিতে লাগিলাম। মাতা বিরক্ত হইলেন, রাগিয়া উঠিলেন, গালি দিলেন। শেষে পিতাকে বলিয়া দিলেন। পিতাও গালি দিয়া মারিতে আসিলেন। আর কিছু বলিতে পারিলাম না।

উপায় নাই। নিষ্কৃতি নাই। ডুবিলাম।

সেই দিন বৈকালে কেবল গৃহে আমি একা ছিলাম—পিতা বিবাহের খরচ সংগ্রহে গিয়াছেন, —মাতা দ্রব্য সামগ্রী কিনিতে গিয়াছিলেন। এ সব যে সময়ে হয়, সে সময়ে আমি দ্বার দিয়া থাকিতাম, না হয় বামাচরণ আমার কাছে বসিয়া থাকিত। বামাচরণ এই দিন বসিয়াছিল। এক জন কে দ্বার ঠেলিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। চেনা পায়ের শব্দ নহে। জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে গা।"

উত্তর, "তোমার যম।"

কথা কোপযুক্ত বটে, কিন্তু স্বর স্ত্রীলোকের। ভয় পাইলাম না। হাসিয়া বলিলাম,—"আমার কি যম আছে? তবে এত দিন কোথায় ছিলে?"

স্ত্রীলোকটির রাগ-শান্তি হইল না। "এখন জান্‌বি। বড় বিয়ের সাধ! পোড়ারমুখী! আবাগী!" ইত্যাদি গালির ছড়া আরম্ভ হইল। গালি সমাপ্তে সেই মধুরভাষিণী বলিলেন, "হাঁ দেখ, কাণি, যদি আমার স্বামীর সঙ্গে তোর বিয়ে হয়, তবে যে দিন তুই ঘর করিতে যাইবি, সেই দিন তোকে বিষ খাওয়াইয়া মারিব।"

বুঝিলাম, চাঁপা খোদ। আদর করিয়া বসিতে বলিলাম। বলিলাম, "শুন, তোমার সঙ্গে কথা আছে।"

এত গালির উত্তরে সাদর-সম্ভাষণ দেখিয়া চাঁপা একটু শীতল হইয়া বসিল।

আমি বলিলাম, "শুন, এ বিবাহে তুমি যেমন বিরক্ত, আমিও তেমনি। আমার এ বিবাহ যাহাতে না হয়, আমি তাহাই করিতে রাজি আছি। কিসে বিবাহ বন্ধ হয়, তাহার উপায় বলিতে পার?"

চাঁপা বিস্মিত হইল। বলিল, "তা তোমার বাপ-মাকে বল না কেন?"

আমি বলিলাম, "হাজার বার বলিয়াছি। কিছু হয় নাই।"

চাঁপা। বাবুদের বাড়ীতে গিয়া তাঁহাদের হাতে-পায়ে ধর না কেন?

আমি। তাতেও কিছু হয় নাই।

চাঁপা একটু ভাবিয়া বলিল, "তবে এক কাজ করিবি?"

আমি। কি?

চাঁপা। দুই দিন লুকাইয়া থাকিবি?

আমি। কোথায় লুকাইব? আমার স্থান কোথায় আছে?

চাঁপা আবার একটু ভাবিল। বলিল, "আমার বাপের বাড়ী গিয়া থাকবি?"

ভাবিলাম, মন্দ কি? আর ত উদ্ধারের কোন উপায় দেখি না। বলিলাম, "আমি কাণা, নূতন স্থানে আমাকে কে পথ চিনাইয়া লইয়া যাইবে? তাহারাই বা স্থান দিবে কেন?"

চাঁপা আমার সর্ব্বনাশিনী কুপ্রবৃত্তি মূর্ত্তিমতী হইয়া আসিয়াছিল; সে বলিল, "তোর তা ভাবিতে হইবে না। সে সব বন্দোবস্ত আমি করিব। আমি সঙ্গে লোক দিব, আমি তাদের বলিয়া পাঠাইব। তুই যাস্ ত বল?"

মজ্জনোন্মুখের সমীপবর্ত্তী কাষ্ঠফলকবৎ এই প্রবৃত্তি আমার চক্ষে একমাত্র রক্ষার উপায় বলিয়া বোধ হইল। আমি সম্মত হইলাম।

চাঁপা বলিল, "আচ্ছা, তবে তুই ঠিক থাকিস্। রাত্রে সবাই ঘুমাইলে আমি আসিয়া দ্বারে টোকা মারিব, বাহির হইয়া আসিস্।"

আমি সম্মত হইলাম।

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে দ্বারে ঠক্‌ঠক করিয়া অল্প শব্দ হইল। আমি জাগ্রত ছিলাম। দ্বিতীয় বস্ত্রমাত্র লইয়া আমি দ্বারোদ্ঘাটনপূর্ব্বক বাহির হইলাম। বুঝিলাম, চাঁপা দাঁড়াইয়া আছে। তাহার সঙ্গে চলিলাম। একবার ভাবিলাম না, একবার বুঝিলাম না যে, কি দুষ্কর্ম্ম করিতেছি। পিতা-মাতার জন্য মন কাতর হইল বটে, কিন্তু তখন মনে মনে বিশ্বাস ছিল যে, অল্প দিনের জন্য যাইতেছি। বিবাহের কথা নিবৃত্তি পাইলেই আবার আসিব।

আমি চাঁপার গৃহে—আমার শ্বশুরবাড়ী?—উপস্থিত হইলে চাঁপা আমায় সন্ধ্যাই লোক সঙ্গে দিয়া বিদায় করিল—পাছে তাহার স্বামী জানিতে পারে, এই ভয়ে বড় তাড়াতাড়ি করিল—যে লোক সঙ্গে দিল, তাহার সঙ্গে যাওয়ার পক্ষে আমার বিশেষ আপত্তি—কিন্তু চাঁপা এমনি তাড়াতাড়ি করিল যে, আমার আপত্তি ভাসিয়া গেল। মনে কর, কাহাকে আমার সঙ্গে দিল?

হীরালালকে।

হীরালালের মন্দ চরিত্রের কথা তখন আমি কিছুই জানিতাম না। সে জন্য আপত্তি করি নাই। সে যুবা পুরুষ, আমি যুবতী—তাহার সঙ্গে কি প্রকারে একা যাইব? এই আপত্তি। কিন্তু তখন আমার কথা কে শুনে? আমি অন্ধ, পথ অপরিচিত, রাত্রে আসিয়াছি—সুতরাং পথে যে সকল শব্দঘটিত চিহ্ন চিনিয়া রাখিয়া আসিয়া থাকি, সে সকল কিছু শুনিতে পাই নাই—অতএব বিনাহারে বিনা সহায়ে বাড়ী ফিরিয়া যাইতে পারিলাম না—বাড়ী ফিরিয়া গেলেও সেই পাপ-বিবাহ। অগত্যা হীরালালের সঙ্গে যাইতে হইল। তখন মনে হইল—আর কেহ অন্ধের সহায় থাক না থাক—মাথার উপর দেবতা আছেন, তাঁহারা কখনও লবঙ্গলতার ন্যায় পীড়িতকে পীড়ন করিবেন না; তাঁহাদের দয়া আছে, শক্তি আছে, অবশ্য দয়া করিয়া আমাকে রক্ষা করিবেন—নহিলে দয়া কার জন্য?

তখন জানিতাম না যে, ঐশিক নিয়ম বিচিত্র—মনুষ্যের বুদ্ধির অতীত—আমরা যাহাকে দয়া বলি, ঈশ্বরের অনন্ত জ্ঞানের কাছে তাহা দয়া নহে। আমরা যাহাকে পীড়ন বলি, ঈশ্বরের অনন্ত জ্ঞানের কাছে তাহা পীড়ন নহে। তখন জানিতাম না যে, এই সংসারের অনন্ত চক্র দয়াদাক্ষিণ্যশূন্য, সে চক্র নিয়মিত পথে অনতিক্ষুণ্ণ রেখায় অহরহঃ চলিতেছে, তাহার দারুণ বেগের পথে যে পড়িবে—অন্ধ হউক, খঞ্জ হউক, আর্ত্ত হউক, সেই পিষিয়া মরিবে। আমি অন্ধ নিঃসহায় বলিয়া, অনন্ত সংসারচক্রপথ ছাড়িয়া চলিব কেন?

হীরালালের সঙ্গে প্রশস্ত রাজপথে বাহির হইলাম—তাহার পদশব্দ অনুসরণ করিয়া চলিলাম—কোথাকার ঘড়ীতে একটা বাজিল। পথে কেহ নাই—কোথাও শব্দ নাই, দুই একখানা গাড়ীর শব্দ—দুই এক জন সুরাপহৃতবুদ্ধি কামিনীর অসম্বদ্ধ গীতিশব্দ। আমি হীরালালকে সহসা জিজ্ঞাসা করিলাম—"হীরালাল বাবু, আপনার গায়ে জোর কেমন?"

হীরালাল একটু বিস্মিত হইল—বলিল, "কেন?"

আমি বলিলাম, "জিজ্ঞাসা করি।"

হীরালাল বলিল, "তা মন্দ নয়।"

আমি। তোমার হাতে কিসের লাঠি?

হীরা। তালের।

আমি। ভাঙ্গিতে পার?

হীরা। সাধ্য কি?

আমি। আমার হাতে দাও দেখি।

হীরালাল আমার হাতে লাঠি দিল। আমি তাহা ভাঙ্গিয়া দ্বিখণ্ড করিলাম। হীরালাল আমার বল দেখিয়া বিস্মিত হইল। আমি আধখানা তাহাকে দিয়া আধখানা আপনি রাখিলাম। তাহার লাঠি ভাঙ্গিয়া দিলাম দেখিয়া হীরালাল রাগ করিল। আমি বলিলাম—"আমি এখন নিশ্চিন্ত হইলাম—রাগ করিও না। তুমি আমার বল দেখিলে,—আমার হাতে এই আধখানা লাঠি দেখিলে—

তোমার ইচ্ছা থাকিলেও তুমি আমার উপর কোন অত্যাচার করিতে সাহস করিবে না।"

হীরালাল চুপ করিয়া রহিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

হীরালাল জগন্নাথের ঘাটে গিয়া নৌকা করিল। রাত্রিকালে দক্ষিণা বাতাসে পাল দিল। সে বলিল, তাহাদের পিত্রালয় হুগলী। আমি তাহা জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম।

পথে হীরালাল বলিল, গোপালের সঙ্গে তোমার বিবাহ ত হইবে না—আমায় বিবাহ কর।

আমি বলিলাম, "না।"

হীরালাল বিচার আরম্ভ করিল। তাহার যত্ন যে—বিচারের দ্বারা প্রতিপন্ন করে যে, তাহার ন্যায় সৎপাত্র পৃথিবীতে দুর্লভ, আমার ন্যায় কুপাত্রীও পৃথিবীতে দুর্লভ। আমি উভয়ই স্বীকার করিলাম —তথাপি বলিলাম যে, "না, তোমাকে বিবাহ করিব না।"

তখন হীরালাল বড় ক্রুদ্ধ হইল। বলিল, "কাণাকে কে বিবাহ করিতে চাহে?" এই বলিয়া নীরব হইল। উভয়ে নীরব রহিলাম—এইরূপে রাত্রি কাটিতে লাগিল।

তাহার পর শেষ-রাত্রে হীরালাল অকস্মাৎ মাঝিদিগকে বলিল, "এইখানে ভিড়ো।" মাঝিরা নৌকা লাগাইল—নৌকাতলে ভূমিস্পর্শের শব্দ শুনিলাম। হীরালাল আমাকে বলিব, "নাম—আসিয়াছি।"—সে আমার হাত ধরিয়া নামাইল। আমি কূলে দাঁড়াইলাম।

তাহার পর শব্দ শুনিলাম, যেন হীরালাল আবার নৌকায় উঠিল। মাঝিদিগকে বলিল, "দে, নৌকা খুলিয়া দে, নৌকা খুলিয়া দে।" আমি বলিলাম, "সে কি? আমাকে নামাইয়া দিয়া নৌকা খুলিয়া দাও কেন?"

হীরালাল বলিল, "আপনার পথ আপনি দেখ।" মাঝিরা নৌকা খুলতে লাগিল, দাঁড়ের শব্দ শুনিলাম। আমি তখন কাতর হইয়া বলিলাম, "তোমার পায়ে পড়ি, আমি অন্ধ—যদি একান্তই আমাকে ফেলিয়া যাইবে, তবে কাহারও বাড়ী পর্য্যন্ত আমাকে রাখিয়া দিয়া যাও। আমি ত এখানে কখনও আসি নাই—এখানকার পথ চিনিব কি প্রকারে?"

হীরালাল বলিল, "আমাকে বিবাহ করিতে সম্মত আছ?"

আমার কান্না আসিল। ক্ষণেক রোদন করিলাম, রাগে হীরালালকে বলিলাম, "তুমি যাও। তোমার কাছে কোন উপকার পাইতে নাই—রাত্রি প্রভাত হইলে তোমার অপেক্ষা দয়ালু শত শত লোকের সাক্ষাৎ পাইব। তাহারা অন্ধের প্রতি তোমার অপেক্ষা দয়া করিবে।"

হীরা। দেখা পেলে ত? এ যে চড়া; চারিদিকে জল। আমাকে বিবাহ করিবে?

হীরালালের নৌকা তখন কিছু বাহিরে গিয়াছিল, শ্রবণশক্তি আমার জীবনাবলম্বন—শ্রবণই আমার চক্ষের কাজ করে! কেহ কথা কহিলে—কত দূরে কোন্ দিকে কথা কহিতেছে, তাহা অনুভব করিতে পারি। হীরালাল কোন্ দিকে কত দূর থাকিয়া কথা কহিল, তাহা মনে মনে অনুভব করিয়া জলে নামিয়া সেই দিকে ছুটিলাম—ইচ্ছা, নৌকা ধরিব। গলাজল অবধি নামিলাম। নৌকা পাইলাম না। নৌকা আরও বেশী জলে। নৌকা ধরিতে গেলে ডুবিয়া মরিব। তালের লাঠি তখনও হাতে ছিল। আবার ঠিক করিয়া শব্দানুভব করিয়া বুঝিলাম, হীরালাল এই দিকে এত দূর হইতে কথা কহিতেছে। পিছু হটিয়া কোমরজলে উঠিয়া, শব্দের স্থানানুভব করিয়া সবলে সেই তালের লাঠি নিক্ষেপ করিলাম।

চীৎকার করিয়া হীরালাল নৌকার উপর পড়িয়া গেল।—"খুন হইয়াছে,—খুন হইয়াছে!" বলিয়া মাঝিরা নৌকা খুলিয়া দিল। বাস্তবিক সেই পাপিষ্ঠ খুন হয় নাই। তখনই তাহার মধুর কণ্ঠ শুনিতে পাইলাম—নৌকা বাহিয়া চলিল। সে উচ্চৈঃস্বরে আমাকে গালি দিতে দিতে চলিল—অতি কদর্য্য অশ্রাব্য ভাষায় পবিত্র গঙ্গা কলুষিত করিতে করিতে চলিল। আমি স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম যে, সে শাসাইতে লাগিল যে, আবার খবরের কাগজ করিয়া আমার নামে আর্টিকেল লিখিবে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সেই জনহীনা রাত্রিতে, আমি অন্ধ যুবতী একা সেই দ্বীপে দাঁড়াইয়া গঙ্গার কলকল জলকল্লোল শুনিতে লাগিলাম।

হায়, মানুষের জীবন! কি অসার তুই! কেন আসিস্—কেন থাকিস্—কেন যাস্? এ দুঃখময় জীবন কেন? ভাবিলে জ্ঞান থাকে না। শচীন্দ্র বাবু একদিন তাঁহার মাতাকে বুঝাইতেছিলেন, সকলই নিয়মাধীন। মানুষের এই জীবন কি কেবল সেই নিয়মের ফল? যে নিয়মে ফুল ফুটে, মেঘ ছুটে, চাঁদ উঠে—যে নিয়মে জলবুদ্‌বুদ্ ভাসে, হাসে, মিলায়; যে নিয়মে ধূলা উড়ে, তৃণ পড়ে, পাতা খসে, সেই নিয়মেই কি এই সুখদুঃখময় মনুষ্যজীবন আবদ্ধ, সম্পূর্ণ, বিলীন হয়? যে নিয়মের অধীন হইয়া নদীগর্ভস্থ কুম্ভীর শিকারের সন্ধান করিতেছে—যে নিয়মের অধীন হইয়া এই চরে ক্ষুদ্র কীট সকল অন্য কীটের সন্ধান করিয়া বেড়াইতেছে, সেই নিয়মের অধীন হইয়া আমি শচীন্দ্রের জন্য প্রাণত্যাগ করিতে বসিয়াছি? ধিক্ প্রাণত্যাগে! ধিক্ প্রণয়ে। ধিক্ মনুষ্যজীবনে! কেন এই গঙ্গাজলে ইহা পরিত্যাগ করি না।

জীবন অসার—সুখ নাই বলিয়া অসার, তাহা নহে। শিমুল-গাছে শিমুল-ফুলই ফুটিবে; তাহা বলিয়া তাহাকে অসার বলিব না। দুঃখময় জীবনে দুঃখ আছে বলিয়া তাহাকে অসার বলিব না। কিন্তু অসার বলি এই জন্য যে, দুঃখই দুঃখের পরিণাম—তাহার পর আর কিছুই নাই। আমার মর্ম্মের দুঃখ আমি একা ভোগ করিলাম, আর কেহ জানিল না—আর কেহ বুঝিল না—দুঃখ প্রকাশের ভাষা নাই বলিয়া তাহা বলিতে পারিলাম না; শ্রোতা নাই বলিয়া তাহা শুনাইতে পারিলাম না; সহৃদয় বোদ্ধা নাই বলিয়া তাহা বুঝাইতে পারিলাম না। একটি শিমুল-বৃক্ষ হইতে সহস্র শিমুল-বৃক্ষ হইতে পারিবে, কিন্তু তোমাদের দুঃখে আর কয় জনের দুঃখ হইবে? পরের অন্তঃকরণের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে, এমন কয় জন পর পৃথিবীতে জন্মিয়াছে? পৃথিবীতে কে এমন জন্মিয়াছে যে, এ ক্ষুদ্র হৃদয়ে, প্রতি কথায়, প্রতি শব্দে, প্রতি বর্ণে, কত সুখ-দুঃখের তরঙ্গ উঠে, তাহা বুঝিতে পারে? সুখ-দুঃখ? হাঁ, সুখও আছে। যখন চৈত্রমাসে ফুলের বোঝার সঙ্গে সঙ্গে মৌমাছি ছুটিয়া আমাদের গৃহমধ্যে প্রবেশ করিত, তখন সে শব্দের সঙ্গে আমার কত সুখ উছলিত, কে বুঝিত? যখন গীত-ব্যবসায়িনীর অট্টালিকা হইতে বাদ্যনিক্কণ সান্ধ্য-সমীরণে কর্ণে আসিত, তখন আমার সুখ কে বুঝিয়াছে? যখন বামাচরণের আধ আধ কথা ফুটিয়াছিল, জল বলিতে "ত" বলিত, কাপড় বলিতে "খাব" বলিত, রজনী বলিতে "জুন্নি" বলিত, তখন আমার মনে কত সুখ উছলিত, তাহা কে বুঝিয়াছিল? আমার দুঃখই বা কে বুঝিবে? অন্ধের রূপোন্মাদ কে বুঝিবে? না দেখায় যে দুঃখ, তাহা কে বুঝিবে? বুঝিলেও বুঝিতে পারে, কিন্তু দুঃখ যে কখন প্রকাশ করিতে পারিলাম না, এ দুঃখ কে বুঝিবে? পৃথিবীতে যে দুঃখের ভাষা নাই, এ দুঃখ কে বুঝিবে? ছোট মুখে বড় কথা তোমরা ভালবাস না, ছোট ভাষায় বড় দুঃখ কি প্রকাশ করা যায়? এমনই দুঃখ যে, আমার যে কি দুঃখ, তাহাতে হৃদয় ধ্বংস হইলেও সকলটা আপনি মনে ভাবিয়া আনিতে পারি না।

মনুষ্য-ভাষাতে তেমন কথা নাই, মনুষ্যের তেমন চিন্তাশক্তি নাই। দুঃখ ভোগ করি—কিন্তু দুঃখটা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। আমার কি দুঃখ? কি তাহা জানি না, কিন্তু হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছে। সর্ব্বদা দেখিতে পাইবে, যেন তোমার দেহ শীর্ণ হইতেছে, বল অপহৃত হইতেছে, কিন্তু তোমার শারীরিক রোগ কি, তাহা জানিতে পারিতেছ না। তেমনি অনেক সময় দেখিবে যে, দুঃখে তোমার বক্ষঃ বিদীর্ণ হইতেছে, প্রাণ বাহির করিয়া দিয়া, শূন্যমার্গে পাঠাইতে ইচ্ছা করিতেছে—কিন্তু কি দুঃখ, তাহা আপনি বুঝিতে পারিতেছ না। আপনি বুঝিতে পারিতেছ না—পরে বুঝিবে কি? ইহা কি সামান্য দুঃখ? সাধ করিয়া বলি, জীবন অসার!

যে জীবন এমন দুঃখময়, তাহার রক্ষার জন্য এত ভয় পাইতেছিলাম কেন? আমি কেন ইহা ত্যাগ করি না? এই ত কলনাদিনী গঙ্গার তরঙ্গ-মধ্যে দাঁড়াইয়া আছি—আর দুই পা অগ্রসর হইলেই মরিতে পারি। না মরি কেন? এ জীবন রাখিয়া কি হইবে? মরিব।

আমি কেন জন্মিলাম? কেন অন্ধ হইলাম? জন্মিলাম ত শচীন্দ্রের যোগ্য হইয়া জন্মিলাম না কেন? শচীন্দ্রের যোগ্য না হইলাম, তবে শচীন্দ্রকে ভালবাসিলাম কেন? ভালবাসিলাম, তবে তাঁহার কাছে থাকিতে পারিলাম না কেন? কিসের জন্য শচীন্দ্রকে ভাবিয়া গৃহত্যাগ করিতে হইল?

নিঃসহায় অন্ধ, গঙ্গার চরে মরিতে আসিলাম কেন? কেন বানের মুখে কুটার মত, সংসারস্রোতে অজ্ঞাতপথে ভাসিয়া চলিলাম? এ সংসারে অনেক দুঃখী আছে, আমি সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখী কেন? এ সকল কাহার খেলা? দেবতার? জীবের এত কষ্টে দেবতার কি সুখ? কষ্ট দিবার জন্য সৃষ্টি করিয়া কি সুখ? মূর্ত্তিমতী নির্দ্দয়তাকে কেন দেবতা বলিব? কেন নিষ্ঠুরতার পূজা করিব? মানুষের এত ভয়ানক দুঃখ কখন দেবকৃত নহে—তাহা হইলে দেবতা রাক্ষসের অপেক্ষা সহস্রগুণে নিকৃষ্ট। তবে কি আমার কর্ম্মফল? কোন্ পাপে আমি জন্মান্ধ?

দুই এক পা অগ্রসর হইতে লাগিলাম—মরিব। গঙ্গার তরঙ্গরব কাণে বাজিতে লাগিল—বুঝি মরা হইল না—আমি মিষ্টশব্দ বড় ভালবাসি। না, মরিব। চিবুক ডুবিল। অধর ডুবিল। আর একটুমাত্র। নাসিকা ডুবিল। চক্ষু ডুবিল। আমি ডুবিলাম।

ডুবিলাম, কিন্তু মরিলাম না। কিন্তু এ যন্ত্রণাময় জীবনচরিত আর বলিতে সাধ করে না। আর এক জন বলিবে।

আমি সেই প্রভাতবায়ু-তাড়িত গঙ্গাজল-প্রবাহ মধ্যে নিমগ্ন হইয়া ভাসিতে ভাসিতে চলিলাম। ক্রমে শ্বাস নিশ্চেষ্ট, চেতনা বিনষ্ট হইয়া আসিল।

দ্বিতীয় খণ্ড

অমরনাথের কথা

প্রথম পরিচ্ছেদ

আমার এই অসার জীবনের ক্ষুদ্র কাহিনী লিখিবার বিশেষ প্রয়োজন আছে। এ সংসার-সাগরে কোন্ চরে লাগিয়া আমার এ নৌকা ভাঙ্গিয়াছে, তাহা এই বিশ্বচিত্রে আঁকিয়া রাখিব, দেখিয়া নবীন নাবিকেরা সতর্ক হইতে পারিবে।

আমার নিবাস অথবা পিত্রালয় শান্তিপুর—আমার বর্ত্তমান বাসস্থানের কিছুমাত্র স্থিরতা নাই। আমি সৎ কায়স্থ-কুলোদ্ভূত, কিন্তু আমার পিতৃকুলে একটি গুরুতর কলঙ্ক ঘটিয়াছিল। আমার খুল্লতাত-পত্নী কুলত্যাগিনী হইয়াছিলেন। আমার পিতার ভূসম্পত্তি যাহা ছিল—তদ্দ্বারা অন্য উপায় অবলম্বন না করিয়াও সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করা যায়। লোকে তাঁহাকে ধনী বলিয়া গণনা করিত। তিনি আমার শিক্ষার্থ অনেক ধনব্যয় করিয়াছিলেন। আমিও কিঞ্চিৎ লেখাপড়া শিখিয়াছিলাম—কিন্তু সে কথায় কাজ নাই। সর্পের মণি থাকে, আমারও বিদ্যা ছিল।

আমার বিবাহযোগ্য বয়স উপস্থিত হইলে, আমার অনেক সম্বন্ধ আসিল—কিন্তু কোন সম্বন্ধই পিতার মনোমত হইল না; তাঁহার ইচ্ছা, কন্যা পরমাসুন্দরী হইবে, কন্যার পিতা পরম ধনী হইবে এবং কৌলীন্যের নিয়ম সকল বজায় থাকিবে। কিন্তু এরূপ কোন সম্বন্ধ উপস্থিত হইল না। আসল কথা, আমাদিগের কুলকলঙ্ক শুনিয়া কোন বড় লোক আমাকে কন্যাদান করিতে ইচ্ছুক হয়েন নাই। এইরূপ সম্বন্ধ করিতে করিতে আমার পিতার পরলোকপ্রাপ্তি হইল।

পরিশেষে পিতার স্বর্গারোহণের পর আমার এক পিসী এক সম্বন্ধ উপস্থিত করিলেন। গঙ্গাপার, কালিকাপুর নামে এক গ্রাম ছিল। এই ইতিহাসে ভবানীনগর নামে অন্য গ্রামের নাম উত্থাপিত হইবে, এই কালিকাপুর সেই ভবানীনগরের নিকটস্থ গ্রাম। আমার পিসীর শ্বশুরালয় সেই কালিকাপুরে। সেইখানে লবঙ্গ নামে, কোন ভদ্রলোকের কন্যার সঙ্গে পিসী আমার সম্বন্ধ উপস্থিত করিলেন।

সম্বন্ধের পূর্ব্বে আমি লবঙ্গকে সর্ব্বদাই দেখিতে পাইতাম। আমার পিসীর বাড়ীতে আমি মধ্যে মধ্যে যাইতাম। লবঙ্গকে পিসীর বাড়ীতেও দেখিতাম—তাহার পিত্রালয়েও দেখিতাম। মধ্যে

মধ্যে লবঙ্গকে শিশুবোধ হইতে করে করাত, খরে খরা শিখাইতাম। যখন তাহার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ হইল, তখন হইতে সে আমার কাছে আর আসিত না, কিন্তু সেই সময়ে আমিও তাহাকে দেখিবার জন্য অধিকতর উৎসুক হইয়া উঠিলাম। তখন লবঙ্গের বিবাহের বয়ঃক্রম উত্তীর্ণ হইয়াছিল—লবঙ্গকলিকা ফোট-ফোট হইয়াছিল, চক্ষের চাহনী চঞ্চল অথচ ভীত হইয়া আসিয়াছিল—উচ্চহাস্য মৃদু এবং ব্রীড়াযুক্ত হইয়া উঠিয়াছিল—দ্রুত গতি মন্থর হইয়া আসিতেছিল। আমি মনে করিতাম, এমন সৌন্দর্য্য কখন দেখি নাই—এ সৌন্দর্য্য যুবতীর অদৃষ্টে কখন ঘটে না। বস্তুতঃ, অতীত-শৈশব অথচ অপ্রাপ্ত-যৌবনার সৌন্দর্য্য এবং অস্ফুটবাক্ শিশুর সৌন্দর্য্য—ইহাই মনোহর; যৌবনের সৌন্দর্য্য তাদৃশ নহে। যৌবনে বসন-ভূষণের ঘটা, হাসি-চাহনির ঘটা—বেণীর দোলনি, বাহুর বলনি, গ্রীবার হেলনী, কথার ছলনি—যুবতীর রূপের বিকাশ এক প্রকার দোকানদারি। আর আমরা যে চক্ষে সে সৌন্দর্য্য দেখি, তাহাও বিকৃতি। যে সৌন্দর্য্যের উপভোগে ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধযুক্ত চিত্তভাবের সংস্পর্শমাত্র নাই, সেই সৌন্দর্য্যেই সৌন্দর্য্য।

এই সময়ে আমাদের কুলকলঙ্ক কন্যাকর্ত্তার কর্ণে প্রবেশ করিল। সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গেল। আমার হৃদয়পতত্রী সবে এই লবঙ্গলতায় বসিতেছিল—এমত সময় ভবানীনগরের রামসদয় মিত্র আসিয়া লবঙ্গলতা ছিঁড়িয়া লইয়া গেল। তাহার সঙ্গে লবঙ্গলতার বিবাহ হইল, লবঙ্গলাভে নিরাশ হইয়া আমি বড় ক্ষুণ্ণ হইলাম।

ইহার কয় বৎসর পরে এমন একটি ঘটনা ঘটিল যে, তাহা আমি বলিতে পারিতেছি না। পশ্চাৎ বলিব কি না, তাহাও স্থির করিতে পারিতেছি না। সেই অবধি আমি গৃহত্যাগ করিলাম। সেই পর্য্যন্ত নানা দেশ ভ্রমণ করিয়াই বেড়াই, কোথাও স্থায়ী হইতে পারি না।

কোথাও স্থায়ী হই নাই, কিন্তু মনে করিলেই স্থায়ী হইতে পারিতাম, মনে করিলে কুলীন ব্রাহ্মণের অপেক্ষা অধিক বিবাহ করিতে পারিতাম। আমার সব ছিল—ধন, সম্পদ, বয়স, বিদ্যা, বাহুবল, কিছুরই অভাব ছিল না; অদৃষ্টদোষে একদিনের দুর্ব্বুদ্ধি-দোষে সকল ত্যাগ করিয়া আমি এই সুখময় গৃহ—এই উদ্যানতুল্য পুষ্পময় সংসার ত্যাগ করিয়া, বাত্যাতাড়িত পতঙ্গের মত দেশে দেশে বেড়াইলাম। আমি মনে করিলে আমার সেই জন্মভূমিতে রম্যগৃহ রম্যসজ্জায় সাজাইয়া, রঙ্গের পবনে সুখের নিশান উড়াইয়া দিয়া, হাসির বাণে দুঃখ-রাক্ষসকে বধ করিতে পারিতাম। কিন্তু—এখন তাই ভাবি, কেন করিলাম না। সুখ-দুঃখের বিধান পরের হাতে, কিন্তু মন ত আমার। তরঙ্গে নৌকা ডুবিল বলিয়া, কেন ডুবিয়া রহিলাম—সাঁতার দিয়া ত কূল পাওয়া যায়। আর দুঃখ—দুঃখ কি? মনের অবস্থা, সে ত নিজের আয়ত্ত। সুখ-দুঃখ পরের হাত, না আমার নিজের হাত? পর কেবল বহির্জ্জগতের কর্ত্তা—অন্তর্জ্জগতে আমি একা কর্ত্তা। আমার রাজ্য লইয়া আমি সুখী হইতে পারিব না কেন? জড়-জগৎ জগৎ, অন্তর্জ্জগৎ কি জগৎ নয়? আপনার মন লইয়া কি থাকা যায় না? তোমার বাহ্য জগতে যে কয়টি সামগ্রী আছে, আমার অন্তরে কি তাই নাই? আমার অন্তরে যাহা আছে, তাহা তোমার বাহ্যজগৎ দেখাইবে, সাধ্য কি? যে কুসুম এ মৃত্তিকায় ফুটে, যে বায়ু এ আকাশে বয়, যে চাঁদ এ গগনে ওঠে, যে সাগর এই অন্ধকারে আপনি মাতে, তোমার বাহ্য জগতে তেমন কোথায়?

তবে কেন এই নিশীথকালে, সুষুপ্তা সুন্দরীর সৌন্দর্য্যপ্রভা—দূর হউক। এক দিন নিশীথকালে—এই অসীম পৃথিবী সহসা আমার চক্ষে শুষ্কদরীর মত ক্ষুদ্র হইয়া গেল—আমি লুকাইবার স্থান পাইলাম না। দেশে দেশে ফিরিলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কালের শীতল প্রলেপে সেই হৃদয়ক্ষত ক্রমে পূরিয়া উঠিতে লাগিল।

কাশীধামে গোবিন্দকান্ত দত্ত নামে কোন সচ্চরিত্র অতি প্রাচীন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে আমার আলাপ হইল। ইনি বহুকাল হইতে কাশীবাস করিয়া আছেন।

একদা তাঁহার সঙ্গে কথোপকথনকালে পুলিসের অত্যাচারের কথা প্রসঙ্গক্রমে উত্থাপিত হইল। অনেকে পুলিসের অত্যাচারঘটিত অনেকগুলি গল্প বলিলেন—দুই একটা বা সত্য, দুই একটা বক্তাদিগের কপোলকল্পিত। গোবিন্দকান্ত বাবু একটি গল্প বলিলেন, তাহার সার মর্ম্ম এই:—

"হরেকৃষ্ণ দাস নামে আমাদের গ্রামে এক ঘর দরিদ্র কায়স্থ ছিল। তাহার একটি কন্যা ভিন্ন অন্য

সন্তান ছিল না। তাহার গৃহিণীর মৃত্যু হইয়াছিল এবং সে নিজেও রুগ্ন। এ জন্য সে কন্যাটি আপন শ্যালীপতিকে প্রতিপালন করিতে দিয়াছিল। তাহার কন্যাটির কতকগুলি স্বর্ণালঙ্কার ছিল। লোভবশতঃ তাহা সে শ্যালীপতিকে দেয় নাই। কিন্তু যখন মৃত্যু উপস্থিত দেখিল, তখন সেই অলঙ্কারগুলি সে আমাকে ডাকিয়া আমার কাছে রাখিল—বলিল যে, 'আমার কন্যার জ্ঞান হইলে তাহাকে দিবেন, এখন দিলে রাজচন্দ্র ইহা আত্মসাৎ করিবে।' আমি স্বাকৃত হইলাম। পরে হরেকৃষ্ণের মৃত্যু হইলে সে লাওয়ারেশ মরিয়াছে বালয়া নন্দি-ভৃঙ্গি সঙ্গে দেবাদিদেব মহাদেব দারোগা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হরেকৃষ্ণের ঘটী-বাটি, পাথর-টুকনি, লাওয়ারেশ মাল বলিয়া হস্তগত করিলেন। কেহ কেহ বলিল যে, হরেকৃষ্ণ লাওয়ারেশ নহে, কলিকাতায় তাহার কন্যা আছে, দারোগা মহাশয় তাহাকে কটু বলিয়া আজ্ঞা করিলেন, 'ওয়ারেশ থাকে, হুজুরে হাজির হইবে।' তখন আমার দুই একজন শত্রু সুযোগ মনে করিয়া বালয়াছিল যে, গোবিন্দ দত্তের কাছে ইহার স্বর্ণালঙ্কার আছে। আমাকে তলব হইল। আমি তখন দেবাদিদেবের কাছে আসিয়া যুক্তকরে দাঁড়াইলাম, কিছু গালি খাইলাম। আসামীর শ্রেণীতে চালান হইবার গতিক দেখিলাম। বলিব কি, ঘুষাঘুষির উদ্যোগ দেখিয়া অলঙ্কারগুলি সকল দারোগা মহাশয়ের পাদপদ্মে ঢালিয়া দিলাম, তাহার উপর পঞ্চাশ টাকা নগদ দিয়া নিষ্কৃতি পাইলাম।

বলা বাহুল্য যে, দারোগা মহাশয় অলঙ্কারগুলি আপন কন্যার ব্যবহারার্থ ।নজালয়ে প্রেরণ করিলেন। সাহেবের কাছে তিনি রিপোর্ট করিলেন যে, 'হরেকৃষ্ণ দাসের এক লোটা আর এক দেরকো ভিন্ন অন্য কোন সম্পত্তিই নাই এবং সে লাওয়ারেশা ফৌত করিয়াছে, তাহার কেহ নাই।'

হরেকৃষ্ণ দাসের নাম শুনিয়াছিলাম। আমি গোবিন্দ বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ঐ হরেকৃষ্ণ দাসের এক ভাইয়ের নাম মনোহর দাস না?"

গোবিন্দকান্ত বাবু বলিলেন, "হাঁ, আপনি কি প্রকারে জানিলেন?"

আমি বিশেষ কিছু বলিলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম, "হরেকৃষ্ণের শ্যালীপতির নাম কি?"

গোবিন্দ বাবু বলিলেন, "রাজচন্দ্র দাস।"

আমি। তাহার বাড়ী কোথায়?

গোবিন্দ বাবু বলিলেন, "কলিকাতায়, ।কন্তু কোন্ স্থানে, তাহা আমি ভুলিয়া গিয়াছি।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "সে কন্যাটির নাম কি জানেন?"

গোবিন্দ বাবু বলিলেন, "হরেকৃষ্ণ তাহার নাম রজনী রাখিয়াছিলেন।"

ইহার অল্পদিন পরেই আমি কাশী পরিত্যাগ করিলাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রথমে আমাকে বুঝিতে হইতেছে, আমি কি খুঁজি। চিত্ত আমার দুঃখময়, এ সংসার আমার পক্ষে অন্ধকার। আজি আমার মৃত্যু হইলে, আমি কাল চাহি না। যদি দুঃখনিবারণ করিতে না পারিলাম, তবে পুরুষত্ব কি? কিন্তু ব্যাধির শান্তি করিতে গেলে আগে ব্যাধির নির্ণয় চাহি, দুঃখ-নিবারণের আগে আমার দুঃখ কি, তাহা নিরূপণের আবশ্যক।

দুঃখ কি? অভাব। সকল দুঃখই অভাব। রোগ দুঃখ, কারণ, রোগ স্বাস্থ্যের অভাব। অভাব-মাত্রই দুঃখ নহে, তাহা জানি। রোগের অভাব দুঃখ নহে। অভাববিশেষই দুঃখ।

আমার কিসের অভাব? আমি চাই কি? মনুষ্যই বা কি চায়? ধন? আমার যথেষ্ট আছে।

যশ? পৃথিবীতে এমন কেহ নাই—যাহার যশ নাই। যে পাকা জুয়াচোর, তাহারও বুদ্ধি সম্বন্ধে যশ আছে। আমি একজন কশাইয়েরও যশ শুনিয়াছি—মাংস সম্বন্ধে সে কাহাকেও প্রবঞ্চনা করিত না। সে কখন মেষমাংস বলিয়া কাহাকেও কুক্কুরমাংস দেয় নাই। যশ সকলেরই আছে। আবার কাহারও যশ সম্পূর্ণ নহে। বেকনের ঘুষখোর অপবাদ—সক্রেতিস্ অপযশ হেতু বধদণ্ডার্হ হইয়াছিলেন। যুধিষ্ঠির দ্রোণবধে মিথ্যা-বাদী, অর্জ্জুন বভ্রুবাহন কর্ত্তৃক পরাভূত। কাইসরকে যে বিথানিয়ার রাণী বলিত, সে কথা অদ্যাপি প্রচলিত;—সেক্ষপীয়রকে বজ্‌টের ভাঁড় বলিয়া-ছিলেন। যশ চাহি না।

যশ সাধারণ লোকের মুখে। সাধারণ লোক কোন বিষয়ের বিচারক নহে—কেন না, সাধারণ লোক মূর্খ এবং স্থূলবুদ্ধি। মূর্খ ও স্থূলবুদ্ধির কাছে

যশস্বী হইয়া আমার কি সুখ হইবে? আমি যশ চাহি না।

মান? সংসারে এমন লোক কে আছে যে, সে মানিলে সুখী হই? যে দুই চারি জন আছে, তাহাদিগের কাছে আমার মান আছে। অন্যের কাছে মান অপমান মাত্র। রাজদরবারে মান—সে কেবল দাসত্বের প্রাধান্য-চিহ্ন বলিয়া আমি অগ্রাহ্য করি। আমি মান চাহি না। মান চাহি কেবল আপনার কাছে।

রূপ? কতটুকু চাই? কিছু চাই। লোকে দেখিয়া না নিষ্ঠীবন ত্যাগ করে। আমাকে দেখিয়া কেহ নিষ্ঠীবন ত্যাগ করে না। রূপ যাহা আছে, তাহাই আমার যথেষ্ট।

স্বাস্থ্য? আমার স্বাস্থ্য অদ্যাপি অনন্ত।

বল? লইয়া কি করিব? প্রহার করিতে বল আবশ্যক। আমি কাহাকেও প্রহার করিতে চাহি না।

বুদ্ধি? এ সংসারে কেহ কখন বুদ্ধির অভাব আছে মনে করে নাই—আমিও করি না। সকলেই আপনাকে অত্যন্ত বুদ্ধিমান্ বলিয়া জানে আমিও জানি।

বিদ্যা? ইহার অভাব স্বীকার করি, কিন্তু কেহ কখন বিদ্যার অভাবে আপনাকে অসুখী মনে করে নাই। আমিও করি না।

ধর্ম্ম? লোকে বলে ধর্ম্মের অভাব পরকালের দুঃখের কারণ, ইহকালের নহে। লোকের চরিত্রে দেখিতে পাই, অভাবই দুঃখ। জানি আমি সে মিথ্যা, কিন্তু জানিয়াও ধর্ম্মকামনা করি না। আমার সে দুঃখ নহে।

প্রণয়? স্নেহ? ভালবাসা? আমি জানি, ইহার অভাবই সুখ, ভালবাসাই দুঃখ। সাক্ষী লবঙ্গলতা।

তবে আমার দুঃখ কিসের? আমার অভাব কিসের? আমার কিসের কামনা যে, তাহা লাভে সফল হইয়া দুঃখ নিবারণ করিব? আমার কাম্যবস্তু কি?

বুঝিয়াছি। আমার কাম্যবস্তুর অভাবই আমার দুঃখ। আমি বুঝিয়াছি যে, সকলই অসার, তাই আমার কেবল দুঃখ সার।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কিছু কাম্য কি খুঁজিয়া পাই নাই? এই অনন্ত সংসার অসংখ্য রত্নরাজিময়, ইহাতে আমার প্রার্থনীয় কি কিছুই নাই? যে সংসারে এক একটি দুরবেক্ষণীয় ক্ষুদ্র কীট-পতঙ্গ অনন্ত কৌশলের স্থান, অনন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার, যে জগতে পথিস্থ বালুকার এক এক কণা অনন্ত-রত্নপ্রভব নগাধিরাজের ভগ্নাংশ, সে জগতে কি আমার কাম্যবস্তু কিছুই নাই? দেখ, আমি কোন্ ছার! টিণ্ডল, হক্‌সলী, ডার্বিন এবং লায়ল এক আসনে বসিয়া যাবজ্জীবন ঐ ক্ষুদ্র নীহারবিন্দুর, ঐ বালুকাকণার বা ঐ শিয়ালকাঁটা ফুলটির গুণ বর্ণনা করিয়া উঠিতে পারেন না—তবু আমার কাম্যবস্তু নাই? আমি কি?

দেখ, এই পৃথিবীতে কত কোটি মনুষ্য আছে, তাহা কেহ গণিয়া সংখ্যা করে নাই। বহু কোটি মনুষ্য সন্দেহ নাই। উহার এক একটি মনুষ্য অসংখ্য গুণের আধার। সকলেই ভক্তি, প্রীতি, দয়া, ধর্ম্মাদির আধার—সকলেই পূজ্য, সকলেই অনুসরণীয়। আমার কাম্য কি কেহ নাই? আমি কি?

আমার এক বাঞ্ছনীয় পদার্থ ছিল—আজিও আছে। কিন্তু সে বাসনা পূর্ণ হইবার নহে। পূর্ণ হইবার নহে বলিয়া তাহা হৃদয় হইতে অনেক দিন হইল উন্মূলিত করিয়াছি। আর পুনরুজ্জীবিত করিতে চাহি না। অন্য কোন বাঞ্ছনীয় কি সংসারে নাই?

তাই খুঁজি। কি করিব?

কয় বৎসর হইতে আমি আপনা আপনি এই প্রশ্ন করিতেছিলাম, উত্তর দিতে পারিতেছিলাম না। যে দুই এক জন বন্ধুবান্ধব আছেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, "তোমার আপনার কাজ না থাকে, পরের কাজ কর। লোকের যথাসাধ্য উপকার কর।"

সে ত প্রাচীন কথা। লোকের উপকার কিসে হয়? রামের মা'র ছেলের জ্বর হইয়াছে, নাড়ী টিপিয়া একটু কুইনাইন দাও। রঘো পাগলের গাত্রবস্ত্র নাই, কম্বল কিনিয়া দাও। সন্তার মা বিধবা, মাসিক দাও। সুন্দর নাপিতের ছেলে ইস্কুলে পড়িতে পায় না—তাহার বেতনের আনুকূল্য কর। এই কি পরের উপকার?

মানিলাম, এই পরের উপকার। কিন্তু এ সকলে কতক্ষণ যায়? কতটুকু সময় কাটে?

কতটুকু পরিশ্রম হয়? মানসিক শক্তি-সকল কতখানি উত্তেজিত হয়? আমি এমত বলি না যে, এই সকল কার্য্য আমার যথাসাধ্য আমি করিয়া থাকি; কিন্তু যতটুকু করি, তাহাতে আমার বোধ হয় না যে, ইহাতে আমার অভাব পূরণ হইবে। আমার যোগ্য কাজ আমি খুঁজি; যাহাতে আমার মন মজিবে, তাই খুঁজি।

আর এক প্রকারে লোকের উপকারের ঢং উঠিয়াছে। তাহার এক কথায় নাম দিতে হইলে বলিতে হয়, "বকাবকি, লেখালেখি।" সোসাইটি, ক্লব, এসোসিয়েসন, সভা, সমাজ, বক্তৃতা, রিজলিউশন, আবেদন, নিবেদন, সমবেদন—আমি তাহাতে নহি। আমি একদা কোন বন্ধুকে একটি মহাসভায় ঐরূপ একখানি আবেদন পড়িতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম যে, 'কি পড়িতেছ?" তিনি বলিলেন, "এমন কিছু না, 'কেবল কাণা ফকির ভিক্ মাঙ্গে।'" এ সকল আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে তাই—কেবল "কাণা ফকির ভিক্ মাঙ্গে রে বাবা।"

এই রোগের আর এক প্রকার বিকার আছে। বিধবার বিবাহ দাও, কুলীন ব্রাহ্মণের বহু বিবাহ বন্ধ কর, অল্প বয়সে বিবাহ বন্ধ কর, জাতি উঠাইয়া দাও, স্ত্রীলোকগণ এক্ষণে গোরুর মত গোয়ালে বাঁধা থাকে—দড়ি খুলিয়া তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেও, চরিয়া খাক। আমার গোরু নাই। পরের গোয়ালের সঙ্গেও আমার বিশেষ সম্বন্ধ নাই। জাতি উঠাইতে আমি বড় রাজি নহি, আমি ততদূর আজও সুশিক্ষিত হই নাই। আমি এখনও আমার ঝাড়ুদারের সঙ্গে একত্রে বসিয়া খাইতে অনিচ্ছুক; তাহার কন্যা বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক এবং যে গালি শিরোমণি মহাশয় দিলে নিঃশব্দে সহিব, ঝাড়ুদারের কাছে তাহা সহিতে অনিচ্ছুক। সুতরাং আমার জাতি থাকুক। বিধবা বিবাহ করে করুক, ছেলেপুলেরা আইবুড় থাকে থাকুক, কুলীন ব্রাহ্মণ এক পত্নীর যন্ত্রণায় সুখী হয় হউক, আমার আপত্তি নাই; কিন্তু তাহার পোষকতায় লোকের কি হিত হইবে, তাহা আমার বুদ্ধির অতীত।

সুতরাং এ বঙ্গসমাজে আমার কোন কার্য্য নাই। এখানে আমি কেহ নহি—আমি কোথাও নহি। আমি—আমি, এই পর্য্যন্ত, আর কিছু নহি। আমার সেই দুঃখ। আর কিছু দুঃখ নাই—লবঙ্গলতার হস্তলিপি ভুলিয়া যাইতেছি।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আমার এইরূপ মনের অবস্থা, আমি এমত সময়ে—কাশীধামে গোবিন্দ দত্তের কাছে রজনীর নাম শুনিলাম। মনে হইল, ঈশ্বর আমাকে বুঝি একটি গুরুতর কার্য্যের ভার দিলেন। এ সংসারে আমি একটি কার্য্য পাইলাম। রজনীর যথার্থ উপকার চেষ্টা করিলে করা যায়। আমার ত কোন কাজ নাই—এই কাজ কেন করি না! ইহা কি আমার যোগ্য কাজ নহে?

এখানে শচীন্দ্রের বংশাবলীর পরিচয় কিছু দিতে হইল। শচীন্দ্রনাথের পিতার নাম রামসদয় মিত্র, পিতামহের নাম বাঞ্ছারাম মিত্র; প্রপিতামহের নাম কেবলরাম মিত্র। তাহাদিগের পূর্ব্বপুরুষের বাস কলিকাতায় নহে।—তাহার পিতা প্রথমে কলিকাতায় বাস করেন। তাহাদিগের পূর্ব্বপুরুষের বাস ভবানীনগর গ্রামে। তাহার প্রপিতামহ দরিদ্র নিঃস্ব ব্যক্তি ছিলেন। পিতামহ বুদ্ধিবলে ধনসঞ্চয় করিয়া তাঁহাদিগের ভোগ্য ভূসম্পত্তি সকল ক্রয় করিয়াছিলেন।

বাঞ্ছারামের এক পরম বন্ধু ছিলেন, নাম মনোহর দাস। বাঞ্ছারাম মনোহর দাসের সাহায্যেই এই বিভবের অধিপতি হইয়াছিলেন। মনোহর প্রাণপাত করিয়া তাঁহার কার্য্য করিতেন, নিজে কখনও ধনসঞ্চয় করিতেন না; বাঞ্ছারাম তাঁহার এই সকল গুণে অত্যন্ত বাধ্য ছিলেন। মনোহরকে সহোদরের ন্যায় ভালবাসিতেন এবং মনোহর বয়োজ্যেষ্ঠ বলিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় তাঁহাকে মান্য করিতেন। তাঁহার পিতার সঙ্গে পিতামহের তাদৃশ সম্প্রীতি ছিল না। বোধ হয়, উভয় পক্ষেরই কিছু কিছু দোষ ছিল।

একদা রামসদয়ের সঙ্গে মনোহর দাসের ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইল। মনোহর দাস বাঞ্ছারামকে বলিলেন যে, রামসদয় তাঁহাকে কোন বিষয়ে সহনাতীত অপমান করিয়াছেন। অপমানের কথা বাঞ্ছারামকে বলিয়া, মনোহর তাঁহার কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া সপরিবারে ভবানীনগর হইতে উঠিয়া গেলেন। বাঞ্ছারাম মনোহরকে অনেক অনুনয়-বিনয় করিলেন; মনোহর কিছুই শুনিলেন না। উঠিয়া কোন্ দেশে গিয়া বাস করিলেন, তাহাও কাহাকে জানাইলেন না।

বাঞ্ছারাম রামসদয়ের প্রতি যত স্নেহ করুন বা না করুন, মনোহরকে ততোধিক স্নেহ করিতেন। সুতরাং রামসদয়ের উপর তাঁহার ক্রোধ অপরিসীম হইল। বাঞ্ছারাম অত্যন্ত কটূক্তি করিয়া গালি দিলেন, রামসদয়ও সকল কথা নীরবে সহ্য করিলেন না।

পিতা-পুত্রের বিবাদের ফল এই দাঁড়াইল যে, বাঞ্ছারাম পুত্রকে গৃহবহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। পুত্রও গৃহত্যাগ করিয়া শপথ করিলেন, আর কখনও পিতৃভবনে মুখ দেখাইব না। বাঞ্ছারাম রাগ করিয়া এক উইল করিলেন। উইলে লিখিত হইল যে, বাঞ্ছারাম মিত্রের সম্পত্তিতে তস্য পুত্র রামসদয় মিত্র কখন অধিকারী হইবে না। বাঞ্ছারাম মিত্রের অবর্তমানে মনোহর দাস, মনোহর দাসের অভাবে মনোহরের উত্তরাধিকারিগণ অধিকারী হইবেন; তদভাবে রামসদয়ের পুত্র-পৌত্রাদি যথাক্রমে, কিন্তু রামসদয় নহে।

রামসদয় গৃহত্যাগ করিয়া প্রথমা স্ত্রীকে লইয়া কলিকাতায় আসিলেন। ঐ স্ত্রীর কিছু পিতৃদত্ত অর্থ ছিল। তদবলম্বনে এবং এক জন সজ্জন বণিক্ সাহেবের আনুকূল্যে তিনি বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইলেন। লক্ষ্মী সুপ্রসন্না হইলেন; সংসার প্রতিপালনের জন্য তাঁহাকে কোন কষ্ট পাইতে হইল না।

যদি কষ্ট পাইতে হইত, তাহা হইলে বোধ হয় বাঞ্ছারাম সদয় হইতেন। পুত্রের সুখের অবস্থা শুনিয়া বৃদ্ধের যে স্নেহাবশেষ ছিল, তাহাও নিবিয়া গেল। পুত্র অভিমানপ্রযুক্ত পিতা না ডাকিলে আর যাইব না, ইহা স্থির করিয়া আর পিতার কোন সংবাদ লইলেন না। অভক্তি এবং তাচ্ছল্যবশতঃ পুত্র এরূপ করিতেছে বিবেচনা করিয়া বাঞ্ছারাম তাহাকেও আর ডাকিলেন না।

সুতরাং কাহারও রাগ পড়িল না। উইলও অপরিবর্তিত রহিল। এমতকালে হঠাৎ বাঞ্ছারামের স্বর্গপ্রাপ্তি হইল।

রামসদয় শোকাকুল হইলেন; তাঁহার পিতার মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎলাভ করিয়া যথাকর্ত্তব্য করেন নাই, এই দুঃখে অনেক দিন বসিয়া রোদন করিলেন। তিনি আর ভবানীনগরে গেলেন না, কলিকাতাতেই পিতৃকৃত্য সম্পন্ন করিলেন। কেন না, এক্ষণে ঐ বাটী মনোহর দাসের হইল।

এ দিকে মনোহর দাসের কোন সংবাদ নাই। পশ্চাতে জানিতে পারা গেল যে, বাঞ্ছারামের জীবিত অবস্থাতেও মনোহরের কেহ কোন সংবাদ পায় নাই। মনোহর দাস ভবানীনগর হইতে যে গিয়াছিল, সেই গিয়াছিল; কোথায় গেল, বাঞ্ছারাম তাহার অনেক সন্ধান করিলেন; কিছুতেই কোন সংবাদ পাইলেন না। তখন তিনি উইলের এক ক্রোড়পত্র সৃজন করিলেন। তাহাতে বিষ্ণুরাম সরকার নামক একজন কলিকাতানিবাসী আত্মীয় কুটুম্বকে উইলের একজিকিউটর নিযুক্ত করিলেন। তাহাতে কথা রহিল যে, তিনি সযত্নে মনোহর দাসের অনুসন্ধান করিবেন। পশ্চাৎ ফলানুসারে সম্পত্তি যাহার প্রাপ্য, তাহাকে দিবেন।

বিষ্ণুরাম বাবু অতি বিচক্ষণ, নিরপেক্ষ এবং কর্ম্মঠ ব্যক্তি। তিনি বাঞ্ছারামের মৃত্যুর পরেই মনোহর দাসের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন; অনেক পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিয়া, যাহা বাঞ্ছারাম কর্তৃক অনুসন্ধান হয় নাই, তাহার নিগূঢ় কথা পরিজ্ঞাত হইলেন। স্থূল বৃত্তান্ত অনুসন্ধানে এই জানা গেল যে, মনোহর ভবানীনগর হইতে পলাইয়া কিছুকাল সপরিবারে ঢাকা-অঞ্চলে গিয়া বাস করেন। পরে সেখানে জীবিকানির্ব্বাহের জন্য কষ্ট হওয়াতে কলিকাতায় নৌকাযোগে আসিতেছিলেন। পথিমধ্যে বাত্যায় পতিত হইয়া সপরিবারে জলমগ্ন হইয়াছিলেন। তাঁহার আর উত্তরাধিকারী ছিল, এমন সন্ধান পাইলেন না।

বিষ্ণুরাম বাবু এ সকল কথার অকাট্য প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া রামসদয়কে দেখাইলেন। তখন বাঞ্ছারামের ভূসম্পত্তি শচীন্দ্রদিগের দুই ভ্রাতার হইল এবং বিষ্ণুরাম বাবুও তাহা তাঁহাদের হস্তে সমর্পণ করিলেন।

এক্ষণে এই রজনী যদি জীবিত থাকে, তবে যে সম্পত্তি রামসদয় মিত্র ভোগ করিতেছে, তাহা রজনীর। রজনী হয় ত নিতান্ত দরিদ্রাবস্থাপন্না। সন্ধান করিয়া দেখা যাউক। আমার আর কোন কাজ নাই।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বাঙ্গালায় আসার পর একদা কোন গ্রাম্য কুটুম্বের বাড়ী নিমন্ত্রণে গিয়াছিলাম। প্রাতঃকালে গ্রাম পর্য্যটনে গিয়াছিলাম। এক স্থানে অতি মনোহর নিভৃত জঙ্গল; দয়েল সপ্তস্বর মিলাইয়া আশ্চর্য্য ঐকতানবাদ্য বাজাইতেছে, চারিদিকে বৃক্ষরাজি, ঘনবিন্যস্ত, কোমলশ্যামপল্লবদলে আচ্ছন্ন;

পাতায় পাতায় ঠেসাঠেসি, মিশামিশি, শ্যামরূপের রাশি রাশি, কোথাও কলিকা, কোথাও স্ফুটিত পুষ্প, কোথাও অপক্ক, কোথাও সুপক্ক ফল। সেই বনমধ্যে আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইলাম; বনাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, এক জন বিকটমূর্ত্তি পুরুষ এক যুবতীকে বলপূর্ব্বক আক্রমণ করিতেছে।

দেখিবামাত্র বুঝিলাম, পুরুষ অতি নীচজাতীয় পাষণ্ড—বোধ হয়, ডোম কি সিউলি—কোমরে দা'। গঠন অত্যন্ত বলবানের মত।

ধীরে ধীরে তাহার পশ্চাদ্ভাগে গেলাম। গিয়া তা'হার কঙ্কাল হইতে দা'খানি টানিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলাম। দুষ্ট তখন যুবতীকে ছাড়িয়া দিল—আমার সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইল। আমাকে গালি দিল। তাহার দৃষ্টি দেখিয়া আমার শঙ্কা হইল।

বুঝিলাম, এ স্থলে বিলম্ব অকর্ত্তব্য। একেবারে তাহার গলদেশে হস্তার্পণ করিলাম। ছাড়াইয়া সেও আমাকে ধরিল। আমিও তাহাকে পুনর্ব্বার ধরিলাম। তাহার বল অধিক; কিন্তু আমি ভীত হই নাই বা অস্থির হই নাই। অবকাশ পাইয়া আমি যুবতীকে বলিলাম যে, তুমি এই সময় পলাও—আমি ইহার উপযুক্ত দণ্ড দিতেছি।

যুবতী বলিল, "কোথায় পলাইব? আমি যে অন্ধ! এখানকার পথ চিনি না।"

অন্ধ! আমার বল বাড়িল। আমি রজনী নামে একটি অন্ধকন্যাকে খুঁজিতেছিলাম।

দেখিলাম, সেই বলবান্ পুরুষ আমাকে প্রহার করিতে পারিতেছে না বটে, কিন্তু আমাকে বলপূর্ব্বক টানিয়া লইয়া যাইতেছে। তাহার অভিপ্রায় বুঝিলাম, যে দিকে আমি দা ফেলিয়া দিয়াছিলাম, সেই দিকে আমাকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। আমি তখন দুষ্টকে ছাড়িয়া দিয়া আগে গিয়া দা কুড়াইয়া লইলাম। সে এক বৃক্ষের ডাল ভাঙ্গিয়া লইয়া তাহা ফিরাইয়া আমার হস্তে প্রহার করিল, আমার হস্ত হইতে দা পড়িয়া গেল; সে দা তুলিয়া লইয়া আমাকে তিন চারি স্থানে আঘাত করিয়া পলাইয়া গেল।

আমি গুরুতর পীড়া প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। বহু কষ্টে আমি কুটুম্বের গৃহাভিমুখে চলিলাম। অন্ধ-যুবতী আমার পদশব্দানুসরণ করিয়া আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিতে লাগিল; কিছু দূর গিয়া আর আমি চলিতে পারিলাম না। পথিকলোক আমাকে ধরিয়া আমার কুটুম্বের বাড়ীতে রাখিয়া আসিল।

সেই স্থানে আমি কিছুকাল শয্যাগত রহিলাম—অন্য আশ্রয়াভাবেও বটে, এবং আমার দশা কি হয়, তাহা না জানিয়া কোথাও যাইতে পারে না, সে জন্যও বটে, অন্ধযুবতীও সেইখানে রহিল।

বহুদিনে বহুকষ্টে আমি আরোগ্যলাভ করিলাম।

মেয়েটি অন্ধ দেখিয়া অবধিই আমার সন্দেহ হইয়াছিল। যে দিন প্রথম সে আমার রুগ্নশয্যাপার্শ্বে আসিল, সেই দিনই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার নাম কি গা?"

"রজনী।"

আমি চমকিয়া উঠিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি রাজচন্দ্র দাসের কন্যা?"

রজনীও বিস্মিত হইল। বলিল, "আপনি বাবাকে কি চেনেন?"

আমি স্পষ্টতঃ কোন উত্তর দিলাম না।

আমি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ করিলে রজনীকে কলিকাতায় লইয়া গেলাম।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

কলিকাতায় গমনকালে আমি একা রজনীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলাম না। কুটুম্বগৃহ হইতে তিনকড়ি নামে এক জন প্রাচীনা পরিচারিকা সমভিব্যাহারে লইয়া গেলাম। এ সতর্কতা রজনীর মন প্রসন্ন করিবার জন্য। গমনকালে রজনীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "রজনি, তোমাদের বাড়ী কলিকাতায়—কিন্তু তুমি এখানে আসিলে কি প্রকারে?"

রজনী বলিল, "আমাকে কি সকল কথা বলিতে হইবে?"

আমি বলিলাম, "তোমার যদি ইচ্ছা না হয়, তবে বলিও না।

বস্তুত এই অন্ধ স্ত্রীলোকের বুদ্ধি, বিবেচনা এবং সরলতায় আমি বিশেষ প্রীত হইয়াছিলাম। তাহাকে কোনপ্রকার ক্লেশ দিবার আমার ইচ্ছা ছিল না। রজনী বলিল, "যদি অনুমতি করিলেন, তবে কতক কথা গোপন রাখিব। গোপাল বাবু বলিয়া আমার একজন প্রতিবেশী আছেন, তাঁহার স্ত্রী চাঁপা, চাঁপার সঙ্গে আমার হঠাৎ পরিচয় হইয়াছিল। তাহার বাপের বাড়ী হুগলী। সে আমাকে বলিল, 'আমার বাপের বাড়ী যাইবে?' আমি রাজি হইলাম। সে আমাকে এক দিন সঙ্গে

করিয়া গোপাল বাবুর বাড়ীতে লইয়া আসিল। কিন্তু তার বাপের বাড়ী আমাকে পাঠাইবার সময় আপনি আমার সঙ্গে আসিল না। তাহার ভাই হীরালালকে আমার সঙ্গে দিল, হীরালালও নৌকা করিয়া আমায় হুগলী লইয়া চলিল।"

আমি এইখানে বুঝিতে পারিলাম যে, রজনী হীরালাল সম্বন্ধে কথা গোপন করিতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি তাহার সঙ্গে গেলে?"

রজনী বলিল, "ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু যাইতে হইল, কেন যাইতে হইল, তাহা বলিতে পারিব না। পথিমধ্যে হীরালাল আমার উপর অত্যাচার করিতে লাগিল। আমি তাহার বাধ্য নয় দেখিয়া শেষে আমাকে নিরাশ করিবার জন্য গঙ্গার এক চরে নামাইয়া দিয়া নৌকা লইয়া চলিয়া গেল।"

রজনী চুপ করিল। আমি হীরালালকে ছদ্মবেশী রাক্ষস মনে করিয়া মনে মনে তাহার রূপ ধ্যান করিতে লাগিলাম। তার পর রজনী বলিতে লাগিল, "সে চলিয়া গেলে আমি ডুবিয়া মরিব বলিয়া জলে ডুবিলাম।"

আমি বলিলাম, "কেন? তুমি কি হীরালালকে এত ভালবাসিতে?

রজনী ভ্রুকুটি করিল। বলিল, "তিলার্দ্ধ না। পৃথিবীতে কাহারও উপর এত বিরক্ত নহি।"

"তবে ডুবিয়া মরিতে গেলে কেন?"

"আমার যে দুঃখ, তাহা আপনাকে বলিতে পারি না।"

"আচ্ছা, বলিয়া যাও।"

"আমি জলে ডুবিয়া ভাসিয়া উঠিলাম। একখানা গহনার নৌকা যাইতেছিল। সেই নৌকার লোক আমাকে ভাসিতে দেখিয়া উঠাইল। যে গ্রামে আপনার সহিত সাক্ষাৎ, সেইখানে এক জন আরোহী নামিল। সে নামিবার সময় আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি কোথায় নামিবে?' আমি বলিলাম, 'আমাকে যেখানে নামাইয়া দিবে, আমি সেইখানে নামিব।' তখন সে জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমার বাড়ী কোথায়?' আমি বলিলাম, 'কলিকাতায়।' সে বলিল, 'আমি কালি আবার কলিকাতা যাইব। তুমি আজ আমার সঙ্গে আইস। আজি আমার বাড়ী থাকিবে। কালি তোমাকে কলিকাতায় রাখিয়া আসিব।' আমি আনন্দিত হইয়া তাহার সঙ্গে উঠিলাম। সে আমাকে সঙ্গে লইয়া চলিল। তার পর আপনি সব জানেন।"

আমি বলিলাম, "যাহার হাত হইতে তোমাকে মুক্ত করিয়াছিলাম, সে কি সেই?"

"সে সেই।"

আমি রজনীকে কলিকাতায় আনিয়া তাহার কথিত স্থানে অন্বেষণ করিয়া রাজচন্দ্র দাসের বাড়ী পাইলাম। সেইখানে রজনীকে লইয়া গেলাম।

রাজচন্দ্র কন্যা পাইয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিল, তাহার স্ত্রী অনেক রোদন করিল। উহারা আমার কাছে রজনীর বৃত্তান্ত সবিশেষ শুনিয়া বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল।

পরে রাজচন্দ্রকে আমি নিভৃতে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার কন্যা গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছিল কেন? জান?"

রাজচন্দ্র বলিল, "না। আমি তাহা সর্ব্বদাই ভাবি, কিন্তু কিছুই ঠিকানা করিতে পারি নাই।"

আমি বলিলাম, "রজনী জলে ডুবিয়া মরিতে গিয়াছিল কি দুঃখে জান?"

রাজচন্দ্র বিস্মিত হইল। বলিল, "রজনীর এমন কি দুঃখ, কিছুই ত ভাবিয়া পাই নাই। সে অন্ধ, এইটি বড় দুঃখ বটে, কিন্তু তার জন্য এত দিনের পর ডুবিয়া মরিতে যাইবে কেন? তবে এত বড় মেয়ে, আজিও তাহার বিবাহ হয় নাই। কিন্তু তাহার জন্যও নয়; তাহার ত সম্বন্ধ করিয়া বিবাহ দিতেছিলুম। বিবাহের আগের রাত্রেই পলাইয়াছিল।"

আমি নূতন কথা পাইলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম "সে পলাইয়াছিল?"

রাজ। হাঁ।

[illegible]ম। তোমাদিগকে না বলিয়া?

[illegible]। কাহাকেও না বলিয়া।

আমি। কাহার সহিত সম্বন্ধ করিয়াছিলে?

রাজ। গোপাল বাবুর সঙ্গে।

আমি। কে গোপাল বাবু? চাঁপার স্বামী?

রাজ। আপনি সবই ত জানেন। সেই বটে।

আমি একটু আলো দেখিলাম, তবে চাঁপা সপত্নীযন্ত্রণাভয়ে রজনীকে প্রবঞ্চনা করিয়া ভ্রাতৃসঙ্গে হুগলী পাঠাইয়াছিল। বোধ হয়, তাহারই পরামর্শে হীরালাল উহার বিনাশে উদ্যোগ পাইয়াছিল।

সে কথা কিছু না বলিয়া রাজচন্দ্রকে বলিলাম, "আমি সবই জানি। আমি আরও যাহা জানি, তোমায় বলিতেছি। তুমি কিছু লুকাইও না।"

রাজ। কি—আজ্ঞা করুন।

আমি। রজনী তোমার কন্যা নহে।

রাজচন্দ্র বিস্মিত হইল। বলিল, "সে কি, আমার মেয়ে নয় ত কাহার?"

"হরেকৃষ্ণ দাসের।"

রাজচন্দ্র কিছুক্ষণ নীরব রহিল। শেষে বলিল, "আপনি কে, তাহা জানি না। কিন্তু আপনার পায়ে পড়ি, এ কথা রজনীকে বলিবেন না।"

আমি। এখন বলিব না, কিন্তু বলিতে হইবে। আমি যাহা জিজ্ঞাসা করি, তাহার সত্য উত্তর দাও। যখন হরেকৃষ্ণ মরিয়া যায়, তখন রজনীর কিছু অলঙ্কার ছিল?

রাজচন্দ্র ভীত হইল। বলিল, "আমি ত তাহার অলঙ্কারের কথা কিছু জানি না। অলঙ্কার কিছুই পাই নাই।"

আমি। হরেকৃষ্ণের মৃত্যুর পর তুমি তাহার ত্যক্ত সম্পত্তির সন্ধানে সে দেশে আর গিয়াছিলে?

রাজ। হাঁ গিয়াছিলাম। গিয়া শুনিলাম, হরেকৃষ্ণের যাহা কিছু ছিল, তাহা পুলিসে লইয়া গিয়াছে।

আমি। তাহাতে তুমি কি করিলে?

রাজ। আর কি করিব? আমি পুলিসকে বড় ভয় করি; রজনীর বালাচুরি মোকদ্দমায় বড় ভুগিয়াছিলাম। আমি পুলিসের নাম শুনিয়া আর কিছু বলিলাম না।

আমি। রজনীর বালাচুরি মোকদ্দমা কিরূপ?

রাজ। রজনীর অন্নপ্রাশনের সময় তাহার বালা চুরি গিয়াছিল। চোর ধরা পড়িয়াছিল। বর্দ্ধমানে তাহার মোকদ্দমা হইয়াছিল। এই কলিকাতা হইতে বর্দ্ধমানে আমাকে সাক্ষ্য দিতে যাইতে হইয়াছিল। বড় ভুগিয়াছিলাম।

আমি পথ দেখিতে পাইলাম।

তৃতীয় খণ্ড

শচীন্দ্র বক্তা

প্রথম পরিচ্ছেদ

এ ভার আমার প্রতি হইয়াছে—রজনীর জীবন-চরিত্রের এ অংশ আমাকে লিখিতে হইবে। লিখিব।

আমি রজনীর বিবাহের সকল উদ্যোগ করিয়াছিলাম—বিবাহের দিন প্রাতে শুনিলাম যে, রজনী পলাইয়াছে, তাহাকে আর পাওয়া যায় না। তাহার অনেক অনুসন্ধান করিলাম, পাইলাম না। কেহ বলিল, সে ভ্রষ্টা। আমি বিশ্বাস করিলাম না। আমি তাহাকে অনেকবার দেখিয়াছিলাম, শপথ করিতে পারি, সে কখন ভ্রষ্টা হইতে পারে না। তবে ইহা হইতে পারে যে, সে কুমারী, কৌমার্য্যাবস্থাতেই কাহারও প্রণয়াসক্ত হইয়া বিবাহাশঙ্কায় গৃহত্যাগ করিয়াছে। কিন্তু ইহাতেও দুইটি আপত্তি; —প্রথম, যে অন্ধ, সে কি প্রকারে সাহস করিয়া আশ্রয়ত্যাগ করিয়া যাইবে? দ্বিতীয়তঃ, যে অন্ধ, সে কি প্রণয়াসক্ত হইতে পারে? মনে করিলাম, কদাচ না। কেহ হাসিও না, আমার মত গণ্ডমূর্খ অনেক আছে। আমরা খান দুই তিন বহি পড়িয়া মনে করি, জগতে চেতনাচেতনের গূঢ়াদপি গূঢ়তত্ত্ব সকলই নখদর্পণ করিয়া ফেলিয়াছি; যাহা আমাদের বুদ্ধিতে ধরে না, তাহা বিশ্বাস করি না। ঈশ্বর মানি না, কেন না, আমাদের ক্ষুদ্র বিচারশক্তিতে সে বৃহত্তত্ত্বের মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারি না। অন্ধের রূপোন্মাদ কি প্রকারে বুঝিব? সন্ধান করিতে করিতে জানিলাম যে, যে রাত্রি হইতে রজনী অদৃশ্য হইয়াছে, সেই রাত্রি হইতে হীরালালও অদৃশ্য হইয়াছে। সকলে বলিতে লাগিল, হীরালালের সঙ্গে সে কুলত্যাগ করিয়া গিয়াছে। অগত্যা আমি এই সিদ্ধান্ত করিলাম যে, হীরালাল রজনীকে ফাঁকি দিয়া লইয়া গিয়াছে। রজনী পরমা সুন্দরী, কাণা হউক, এমন লোক নাই যে তাহার রূপে মুগ্ধ হইবে না। হীরালাল তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে বঞ্চনা করিয়া লইয়া গিয়াছে, অন্ধকে বঞ্চনা করা বড় সুসাধ্য।

কিছু দিন পরে হীরালাল দেখা দিল। আমি তাহাকে বলিলাম, "তুমি রজনীর সংবাদ জান?"

সে বলিল "না।"

কি করিব? নালিশ-ফরিয়াদ হইতে পারে না। আমার জ্যেষ্ঠকে বলিলাম। জ্যেষ্ঠ বলিলেন, "রাস্কালকে মার।" কিন্তু মারিয়া কি হইবে? আমি সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিতে আরম্ভ করিলাম। যে রজনীর সন্ধান দিবে, তাহাকে অর্থ পুরস্কার দিব ঘোষণা করিলাম। কিছু ফল ফলিল না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রজনী জন্মান্ধ, কিন্তু তাহার চক্ষু দেখিলে অন্ধ বলিয়া বোধ হয় না। চক্ষে দেখিতে কোন দোষ নাই। চক্ষু বৃহৎ, সুনীল, ভ্রমরকৃষ্ণ তারাবিশিষ্ট। অতি সুন্দর চক্ষু—কিন্তু কটাক্ষ নাই। চাক্ষুষ স্নায়ুর দোষে অন্ধ। স্নায়ুর নিশ্চেষ্টতাবশতঃ রেটিনাস্থিত প্রতিবিম্ব মস্তিষ্কে গৃহীত হয় না। রজনী সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী, বর্ণ উদ্ভেদপ্রমুখ নিতান্ত নবীন কদলীপত্রের ন্যায় গৌর; গঠন বর্ষাজলপূর্ণ তরঙ্গিণীর ন্যায় সম্পূর্ণতাপ্রাপ্ত, মুখকান্তি গম্ভীর; গতি ও অঙ্গভঙ্গী সকল মৃদু, স্থির এবং অন্ধতাবশতঃ সর্ব্বদা সঙ্কোচ-জ্ঞাপক; হাস্য দুঃখময়। সচরাচর এই স্থিরপ্রকৃতি সুন্দর শরীরে সেই কটাক্ষহীন দৃষ্টি দেখিয়া, কোন ভাস্কর্য্যপটু শিল্পকরের যত্ননির্ম্মিত প্রস্তরময়ী স্ত্রী-মূর্ত্তি বলিয়া বোধ হইত।

রজনীকে প্রথম দেখিয়াই আমার বিশ্বাস হইয়াছিল যে, এই সৌন্দর্য্য অনিন্দনীয় হইলেও মুগ্ধকর নহে। রজনী রূপবতী, কিন্তু তাহার রূপ দেখিয়া কেহ কখনও পাগল হইবে না। তাহার চক্ষের সে মোহিনী গতি নাই। সৌন্দর্য্য দেখিয়া লোকে প্রশংসা করিবে, বোধ হয়, সে মূর্ত্তি সহজে ভুলিবেও না। কেন না, সে স্থির গম্ভীর কান্তির একটি অদ্ভুত আকর্ষণী শক্তি আছে। কিন্তু সেই আকর্ষণ অন্যবিধ; ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। যাহাকে "পঞ্চবাণ" বলে, রজনীর রূপের সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। নাই কি?

সে যাহাই হউক—আমি মধ্যে মধ্যে চিন্তা করিতাম—রজনীর দশা কি হইবে? সে ইতর লোকের কন্যা, কিন্তু তাহাকে দেখিয়াই বোধ হয় যে, সে ইতর প্রকৃতি-বিশিষ্ট নহে। ইতর লোক ভিন্ন তাহার অন্যত্র বিবাহের সম্ভাবনা নাই। ইতর লোকের সঙ্গেও এতকালে বিবাহ ঘটে নাই। দরিদ্রের ভার্য্যা গৃহকর্ম্মের জন্য। যে ভার্য্যার অন্ধতা-নিবন্ধন গৃহকর্ম্মের সাহায্য হইবে না—তাহাকে কোন্ দরিদ্র বিবাহ করিবে? কিন্তু ইতর লোক ভিন্ন এই ইতরবৃত্তি-পরায়ণ কায়স্থের কন্যাকে কে বিবাহ করিবে? তাহাতে আবার এ অন্ধ। এরূপ স্বামীর সহবাসে রজনীর দুঃখ ভিন্ন সুখের সম্ভাবনা নাই। দুশ্ছেদ্য কণ্টক-কাননমধ্যে যত্ন-পালনীয় উদ্যান-পুষ্পের জন্মের ন্যায় এই রজনীর পুষ্পবিক্রেতার গৃহে জন্ম ঘটিয়াছে। কণ্টকাবৃত হইয়াই ইহাকে মরিতে হইবে। তবে আমি গোপালের সঙ্গে ইহার বিবাহ দিবার জন্য এত ব্যস্ত কেন? ঠিক জানি না। তবে ছোটমার দৌরাত্ম্য বড়; তাঁহারই উত্তেজনাতে ইহার বিবাহ দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। আর বলিতে কি, যাহাকে স্বয়ং বিবাহ করিতে না পারি, তাহার বিবাহ দিতে ইচ্ছা করে।

এই কথা শুনিয়া অনেক সুন্দরী মধুর হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, তোমার মনে মনে রজনীকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা আছে কি? না, সে ইচ্ছা নাই। রজনী সুন্দরী হইলেও অন্ধ, রজনী পুষ্পবিক্রেতার কন্যা এবং রজনী অশিক্ষিতা। রজনীকে আমি বিবাহ করিতে পারি না; ইচ্ছাও নাই। আমার বিবাহে অনিচ্ছাও নাই। তবে মনোমত কন্যা পাই না। আমি যাহাকে বিবাহ করিব, সে রজনীর মত সুন্দরী হইবে, অথচ বিদ্যুৎ-কটাক্ষবর্ষিণী হইবে; বংশমর্য্যাদায় শাহ আলমের বা মহল্লাররাও হুল্কারের প্র-পরাপ-সং পৌত্রী হইবে, বিদ্যায় লীলাবতী বা শাপভ্রষ্টা সরস্বতী হইবে এবং পতিভক্তিতে সাবিত্রী হইবে; চরিত্রে লক্ষ্মী, রন্ধনে দ্রৌপদী, আদরে সত্যভামা এবং গৃহকর্ম্মে গদার মা। আমি পান খাইবার সময় পানের লবঙ্গ খুলিয়া দিবে, তামাকু খাইবার সময়ে হুঁকায় কলিকা আছে কি না, বলিয়া দিবে, আহারের সময়ে মাছের কাঁটা বাছিয়া দিবে এবং স্নানের পর গা মুছিয়াছি কি না, তদারক করিবে। আমি চা খাইবার সময়ে দোয়াতের ভিতরে চামচে পুরিয়া চার অনুসন্ধান না করি এবং কালির অনুসন্ধানে চার পাত্রমধ্যে কলম না দিই, তদ্বিষয়ে সতর্ক থাকিবে; পিক্‌দানীতে টাকা রাখিয়া বাক্সের ভিতর ছেপ না ফেলি, তাহার খবরদারী করিবে। বন্ধুকে পত্র লিখিয়া আপনার নামে শিরোনামা দিলে, সংশোধন করাইয়া লইবে, পয়সা দিতে টাকা দিতেছি কি

না, খবর লইবে; নোটের পিঠে দোকানের চিঠি কাটিতেছি কি না দেখিবে, এবং তামাসা করিবার সময়ে বিমানের নামের পরিবর্ত্তে ভক্তিমতী প্রতিবাসিনীর নাম করিলে ভুল সংশোধন করিয়া লইবে। ঔষধ খাইতে ফুলেল তৈল না খাই, চাকরাণীর নাম করিয়া ডাকিতে হৌসের সাহেবের মেয়ের নাম না ধরি, এ সকল বিষয়ে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিবে। এমন কন্যা পাই, তবে বিবাহ করি। আপনারা যে ইনি উঁকে টিপিয়া হাসিতেছেন, আপনাদের মধ্যে যদি কেহ অবিবাহিতা এবং এই সকল গুণে গুণবতী থাকেন, তবে বলুন, আমি পুরোহিত ডাকি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শেষে রাজচন্দ্র দাসের কাছে শুনিতে পাইলাম যে, রজনীকে পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু রাজচন্দ্র দাস এ বিষয়ে আমাদিগের সঙ্গে বড় চমৎকার ব্যবহার করিতে লাগিল। রজনীকে কোথায় পাওয়া গেল, কি প্রকারে পাওয়া গেল, তাহা কিছুই বলিল না। আমরা অনেক জিজ্ঞাসা করিলাম, কিছুতেই কোন কথা বাহির করিতে পারিলাম না। সে কেনই বা গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছিল, তাহাও জিজ্ঞাসাবাদ করিলাম,—তাহাও বলিল না। তাহার স্ত্রীও ঐরূপ—ছোট মা সূচির ন্যায় লোকের মনের ভিতর প্রবেশ করেন, কিন্তু তাহার কাছ হইতে কোন কথাই বাহির করিতে পারিলেন না। রজনা স্বয়ং আর আমাদের বাড়ীতে আসিত না। কেন আসিত না, তাহাও কিছু জানিতে পারিলাম না। শেষে রাজচন্দ্র ও তাহার স্ত্রীও আমাদিগের বাড়ী আসা পরিত্যাগ করিল। ছোট মা কিছু দুঃখিত হইয়া তাহাদিগের অনুসন্ধানে লোক পাঠাইলেন। লোক ফিরিয়া আসিয়া বলিল যে, উহারা সপরিবারে অন্যত্র উঠিয়া গিয়াছে, সাবেক বাড়ীতে আর নাই। কোথায় গিয়াছে, তাহার কোন ঠিকানা করিতে পারিলাম না।

ইহার এক মাস পরে এক জন ভদ্রলোক আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। তিনি আসিয়াই আপনি আত্মপরিচয় দিলেন। "আমার নিবাস কলিকাতায় নহে। আমার নাম অমরনাথ ঘোষ, আমার নিবাস শান্তিপুর।"

তখন আমি তাঁহার সঙ্গে কথোপকথনে নিযুক্ত হইলাম। কি জন্য তিনি আসিয়াছিলেন, আমি তাঁহাকে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না। তিনিও প্রথমে কিছু বলিলেন না। সুতরাং সামাজিক ও রাজকীয় বিষয়ঘটিত নানা কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। দেখিলাম, তিনি কথাবার্ত্তায় অত্যন্ত বিচক্ষণ। তাঁহার বুদ্ধি মার্জ্জিত, শিক্ষা সম্পূর্ণ এবং চিন্তা বহুদূরগামিনী। কথাবার্ত্তায় একটু অবসর পাইয়া তিনি আমার টেবিলের উপরে স্থিত "সেক্ষপিয়র গেলেরির" পাতা উল্টাইতে লাগিলেন। ততক্ষণ আমি অমরনাথকে দেখিয়া লইতে লাগিলাম। অমরনাথ দেখিতে সুপুরুষ, গৌরবর্ণ, কিঞ্চিৎ খর্ব্ব, স্থূলও নহে, শীর্ণও নহে; বড় বড় চক্ষু, কেশগুলি সূক্ষ্ম, কুঞ্চিত, যত্ন-রঞ্জিত। বেশভূষার পারিপাট্যের বাড়াবাড়ি নাই, কিন্তু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বটে। তাঁহার কথা কহিবার ভঙ্গী অতি মনোহর; কণ্ঠ অতি সুমধুর। দেখিয়া বুঝিলাম, লোক অতি সুচতুর।

সেক্ষপিয়র গেলেরির পাতা উল্টান শেষ হইলে অমরনাথ নিজ প্রয়োজনের কথা কিছু না বলিয়া ঐ পুস্তকস্থিত চিত্র সকলের সমালোচনা আরম্ভ করিলেন। আমাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, যাহা বাক্য এবং কার্য্য দ্বারা চিত্রিত হইয়াছে, তাহা চিত্রফলকে চিত্রিত করিতে চেষ্টা পাওয়া ধৃষ্টতার কাজ। সে চিত্র কখনই সম্পূর্ণ হইতে পারে না এবং এ সকল চিত্র সম্পূর্ণ নহে। ডেস্‌ডেমনার চিত্র দেখিয়া কহিলেন, "আপনি এই চিত্রে ধৈর্য্য, মাধুর্য্য, নম্রতা পাইতেছেন, কিন্তু ধৈর্য্যের সহিত সে সাহস কৈ? নম্রতার সঙ্গে সে সতীত্বের অহঙ্কার কৈ?" জুলিয়েটের মূর্ত্তি দেখাইয়া কহিলেন, "এ নব যুবতীর মূর্ত্তি বটে, কিন্তু ইহাতে জুলিয়েটের নব-যৌবনের অদমনীয় চাঞ্চল্য কৈ?"

অমরনাথ এইরূপে কত বলিতে লাগিলেন। সেক্ষপিয়রের নায়িকাগণ হইতে শকুন্তলা, সীতা, কাদম্বরী, বাসবদত্তা, রুক্মিণী, সত্যভামা প্রভৃতি আসিয়া পড়িল। অমরনাথ একে একে তাঁহাদিগের চরিত্রের বিশ্লেষণ করিলেন। প্রাচীন সাহিত্যের কথায় ক্রমে প্রাচীন ইতিহাসের কথা আসিয়া পড়িল, তৎপ্রসঙ্গে তাসিতস্, প্লুটার্ক, থুকিদিদিস প্রভৃতির অপূর্ব্ব সমালোচনার অবতারণা হইল। প্রাচীন ইতিবৃত্ত-লেখকদিগের মত লইয়া অমরনাথ কোম্‌তের ত্রৈকালিক উন্নতি-সম্বন্ধীয় মতের সমর্থন করিলেন। কোম্‌ৎ হইতে তাঁহার সমালোচক মিল ও হক্‌স্‌লীর কথা আসিল। হক্‌স্‌লী হইতে ওয়েন্ ও ডারুইন, ডারুইন হইতে বুকনেরর,

সোপেনহয়র প্রভৃতির সমালোচনা আসিল। অমরনাথ অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্যস্রোত আমার কর্ণরন্ধ্রে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। আমি মুগ্ধ হইয়া আসল কথা ভুলিয়া গেলাম।

বেলা গেল দেখিয়া অমরনাথ বলিলেন, "মহাশয়কে আর বিরক্ত করিব না। যে জন্য আসিয়াছিলাম, তাহা এখনও বলা হয় নাই। রাজচন্দ্র দাস যে আপনাদিগকে ফুল বেচিত, তাহার একটি কন্যা আছে?"

আমি বলিলাম, "আছে বোধ হয়।"

অমরনাথ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "বোধ হয় নয়, সে আছে। আমি তাহাকে বিবাহ করিব স্থির করিয়াছি।"

আমি অবাক্ হইলাম। অমরনাথ বলিতে লাগিলেন, "আমি রাজচন্দ্রের নিকট এই কথা বলিতেই গিয়াছিলাম। তাহাকে বলা হইয়াছে। এক্ষণে আপনাদিগের সঙ্গে একটা কথা আছে। যে কথা বলিব, তাহা মহাশয়ের পিতার কাছে বলাই আমার উচিত। কেন না, তিনি কর্ত্তা। কিন্তু আমি যাহা বলিব, তাহাতে আপনাদিগের রাগ করিবার কথা। আপনি সর্ব্বাপেক্ষা স্থিরস্বভাব এবং ধর্ম্মজ্ঞ, এ জন্য আপনাকে বলিতেছি।"

আমি বলিলাম, "কি কথা মহাশয়?"

অমর। রজনীর কিছু বিষয় আছে।

আমি। সে কি? সে যে রাজচন্দ্রের কন্যা।

অমর। রাজচন্দ্রের পালিতা কন্যা মাত্র।

আমি। তবে সে কাহার কন্যা? কোথায় বিষয় পাইল? এ কথা আমরা এত দিন কিছু শুনিলাম না কেন?

অমর। আপনারা যে সম্পত্তি ভোগ করিতেছেন, ইহাই রজনীর। রজনী মনোহর দাসের ভ্রাতুষ্কন্যা।

একবার, প্রথমে চমকিয়া উঠিলাম, তার পর বুঝিলাম যে, কোন জালসাজ জুয়াচোরের হাতে পড়িয়াছি। প্রকাশ্যে উচ্চৈর্হাস্য করিয়া বলিলাম, "মহাশয়কে নিষ্কর্ম্মা লোক বলিয়া বোধ হইতেছে। আমার অনেক কর্ম্ম আছে। এক্ষণে আপনার সঙ্গে রহস্যের আমার অবসর নাই। আপনি গৃহে গমন করুন।"

অমরনাথ বলিলেন, "তবে উকীলের মুখে সংবাদ শুনিবেন।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এ দিকে বিষ্ণুরাম বাবু সংবাদ পাঠাইয়া দিলেন যে, মনোহর দাসের উত্তরাধিকারী উপস্থিত হইয়াছে,—বিষয় ছাড়িয়া দিতে হইবে। অমরনাথ তবে জুয়াচোর জালসাজ নহে?

কে উত্তরাধিকারী, তাহা বিষ্ণুরাম বাবু প্রথমে কিছু বলেন নাই। কিন্তু অমরনাথের কথা স্মরণ হইল। বুঝি রজনীই উত্তরাধিকারিণী। যে ব্যক্তি দাবিদার, সে যে মনোহর দাসের যথার্থ উত্তরাধিকারী, তদ্বিষয়ে নিশ্চয়তা আছে কি না, ইহা জানিবার জন্য বিষ্ণুরাম বাবুর কাছে গেলাম। আমি বলিলাম, "মহাশয় পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন যে, মনোহর দাস সপরিবারে জলে ডুবিয়া মরিয়াছে। তাহার প্রমাণও আছে, তবে তাহার আবার ওয়ারিস আসিল কোথা হইতে?"

বিষ্ণুরাম বাবু বলিলেন, "হরেকৃষ্ণ দাস নামে তাহার এক ভাই ছিল, জানেন বোধ হয়?"

আমি। তা ত জানি—কিন্তু সেও ত মরিয়াছে।

বিষ্ণু। বটে, কিন্তু মনোহরের পরে মরিয়াছে; সুতরাং সে বিষয়ের অধিকারী হইয়া মরিয়াছে।

আমি। তা হৌক, কিন্তু হরেকৃষ্ণেরও ত এক্ষণে কেহ নাই।

বিষ্ণু। পূর্ব্বে তাহাই মনে করিয়া আপনাদিগকে বিষয় ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। কিন্তু এক্ষণে জানিতেছি যে, তাহার এক কন্যা আছে।

আমি। তবে এত দিন সে কন্যার কোন প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয় নাই কেন?

বিষ্ণু। হরেকৃষ্ণের স্ত্রী তাহার পূর্ব্বে মরে। স্ত্রীর মৃত্যুর পরে শিশুকন্যাকে পালন করিতে অক্ষম হইয়া হরেকৃষ্ণ কন্যাটিকে তাহার শ্যালীকে দান করে। তাহার শ্যালী ঐ কন্যাটিকে আত্মকন্যাবৎ প্রতিপালন করে এবং আপনার বলিয়া পরিচয় দেয়। হরেকৃষ্ণের মৃত্যুর পর তাহার সম্পত্তি লাওয়ারেশ বলিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব কর্ত্তৃক গৃহীত হওয়ার প্রমাণ পাইয়া আমি হরেকৃষ্ণকে লাওয়ারেশ মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু এক্ষণে হরেকৃষ্ণের এক জন প্রতিবাসী আমার নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার কন্যার কথা প্রকাশ করিয়াছে। আমি তাহার প্রদত্ত সন্ধানের অনুসরণ করিয়া জানিয়াছি যে, তাহার কন্যা আছে বটে।

আমি বলিলাম, "যে হয় একটা মেয়ে ধরিয়া হরেকৃষ্ণ দাসের কন্যা বলিয়া ধূর্ত্ত লোকে উপস্থিত

করিতে পারে। কিন্তু সে যে যথার্থ হরেকৃষ্ণ দাসের কন্যা, তাহার কিছু প্রমাণ আছে কি?"

"আছে" বলিয়া বিষ্ণুরাম বাবু আমাকে একটা কাগজ দেখিতে দিলেন; বলিলেন, "এ বিষয়ে যে যে প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা উহাতে ইয়াদদাস্ত করিয়া রাখিয়াছি।"

আমি ঐ কাগজ লইয়া পড়িতে লাগিলাম। তাহাতে পাইলাম যে, হরেকৃষ্ণ দাসের শ্যালীপতি রাজচন্দ্র দাস এবং হরেকৃষ্ণের কন্যার নাম রজনী।

যাহা প্রমাণ দেখিলাম, তাহা ভয়ানক বটে। আমরা এতদিন অন্ধ রজনীর ধনে ধনী হইয়া তাহাকে দরিদ্র বলিয়া ঘৃণা করিতেছিলাম।

বিষ্ণুরাম এক জোবানবন্দীর জাবেদা নকল আমার হাতে দিয়া বলিলেন, "এক্ষণে দেখুন, এই জোবানবন্দী কাহার?"

আমি পড়িয়া দেখিলাম যে, জোবানবন্দীর বক্তা হরেকৃষ্ণ দাস; ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে তিনি এক বালা চুরির মোকদ্দমায় এই জোবানবন্দী দিতেছেন। জোবানবন্দীতে পিতার নাম ও বাসস্থান লেখা থাকে, তাহাও পড়িয়া দেখিলাম। তাহা মনোহর দাসের পিতার নাম ও বাসস্থানের সঙ্গে মিলিল। বিষ্ণুরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, "মনোহর দাসের ভাই হরেকৃষ্ণের এই জোবানবন্দী বলিয়া আপনার বোধ হইতেছে কি না?"

আমি। বোধ হইতেছে।

বিষ্ণু। যদি সংশয় থাকে, তবে এখনি তাহা ভঞ্জন হইবে। পড়িয়া যাউন।

পড়িতে লাগিলাম যে, সে বলিতেছে, "আমার ছয় মাসের একটি কন্যা আছে। এক সপ্তাহ হইল, তাহার অন্নপ্রাশন দিয়াছি। অন্নপ্রাশনের দিন বৈকালে তাহার বালা চুরি গিয়াছে।"

এই পর্য্যন্ত পড়িয়া দেখিলে, বিষ্ণুরাম বলিলেন, "দেখুন, কত দিনের জোবানবন্দী?"

জোবানবন্দীর তারিখ দেখিলাম, জোবানবন্দী উনিশ বৎসরের।

বিষ্ণুরাম বলিলেন, "এই কন্যার বয়স এক্ষণে হিসাবে কত হয়?"

আমি। উনিশ বৎসর কয় মাস—প্রায় কুড়ি।

বিষ্ণু। রজনীর বয়স কত অনুমান করেন?

আমি। প্রায় কুড়ি।

বিষ্ণু। পড়িয়া যাউন, হরেকৃষ্ণ কিছু পরে বালিকার নামোল্লেখ করিয়াছেন।

আমি পড়িতে লাগিলাম। দেখিলাম যে, এক স্থানে হরেকৃষ্ণ পুনঃপ্রাপ্ত বালা দেখিয়া বলিতেছেন, "এই বালা আমার কন্যা রজনীর বালা বটে।"

আর বড় সংশয়ের কথা রহিল না—তথাপি পড়িতে লাগিলাম। প্রতিবাদীর মোক্তার হরেকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "তুমি দরিদ্র লোক। তোমার কন্যাকে সোণার বালা দিলে কি প্রকারে?" হরেকৃষ্ণ উত্তর দিতেছে, "আমি গরীব, কিন্তু আমার ভাই মনোহর দাস দশ টাকা উপার্জ্জন করেন। তিনি আমার মেয়েকে সোণার গহনাগুলি দিয়াছেন।"

তবে যে এই হরেকৃষ্ণ দাস আমাদিগের মনোহর দাসের ভাই, তদ্বিষয়ে আর সংশয়ের স্থান রহিল না।

পরে মোক্তার আবার জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "তোমার ভাই তোমার পরিবার বা তোমার আর কাহাকে কখন অলঙ্কার দিয়াছে?"

উত্তর। না।

পুনশ্চ প্রশ্ন। সংসার-খরচ দেয়?

উত্তর। না।

প্রশ্ন। তবে তোমার কন্যাকে অন্নপ্রাশনে সোণার গহনা দিবার কারণ কি?

উত্তর। আমার এই মেয়েটি জন্মান্ধ, সে জন্য আমার স্ত্রী সর্ব্বদা কাঁদিয়া থাকে। আমার ভাই ও ভাইজ তাহাতে দুঃখিত হইয়া আমাদিগের মনোদুঃখ যদি কিছু নিবারণ হয়, এই ভাবিয়া অন্নপ্রাশনের সময় মেয়েটিকে এই গহনাগুলি দিয়াছেন।

জন্মান্ধ। তবে যে সে রজনা, তদ্বিষয়ে আর সংশয় কি?

আমি হতাশ হইয়া জোবানবন্দী রাখিয়া দিলাম। বলিলাম, "আমার আর বড় সন্দেহ নাই।"

বিষ্ণুরাম বলিলেন, "এত অল্প প্রমাণে আপনাকে সন্তুষ্ট হইতে বলি না। আর একটা জোবানবন্দীর নকল দেখুন।"

দ্বিতীয় জোবানবন্দীও দেখিলাম যে, উহাও ঐ কথিত বালা চুরির মোকদ্দমায় গৃহীত হইয়াছিল। সেই জোবানবন্দীতে বক্তা রাজচন্দ্র দাস। তিনি একমাত্র কুটুম্ব বলিয়া ঐ অন্নপ্রাশনে উপস্থিত ছিলেন। তিনি হরেকৃষ্ণের শ্যালীপতি বলিয়া আত্মপরিচয় দিতেছেন এবং চুরির বিষয় সকল সপ্রমাণ করিতেছেন।

বিষ্ণুরাম বলিলেন, "উপস্থিত রাজচন্দ্র দাস সেই রাজচন্দ্র দাস। সংশয় থাকে, ডাকিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করুন।"

আমি বলিলাম, "নিষ্প্রয়োজন।"

বিষ্ণুরাম আরও কতকগুলি দলিল দেখাইলেন, সে সকলের বৃত্তান্ত সবিস্তারে বলিতে গেলে, সকলের ভাল লাগিবে না। ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এই রজনী দাসী যে হরেকৃষ্ণ দাসের কন্যা, তদ্বিষয়ে আমার সংশয় রহিল না। তখন দেখিলাম, বৃদ্ধ পিতামাতা লইয়া অন্নের জন্য কাতর হইয়া বেড়াইব।

বিষ্ণুরামকে বলিলাম, "মোকদ্দমা করা বৃথা। বিষয় রজনী দাসীর, তাহার বিষয় তাহাকে ছাড়িয়া দিব। তবে আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর এ বিষয়ে আমার সঙ্গে তুল্যাধিকারী, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করার অপেক্ষা রহিল মাত্র।"

আমি একবার আদালতে গিয়া, আসল জোবানবন্দী দেখিয়া আসিলাম। এখন পুরান নথি ছিঁড়িয়া ফেলে, তখন রাখিত; আসল দেখিয়া জানিলাম যে, নকলে কোন কৃত্রিমতা নাই।

বিষয় রজনীকে ছাড়িয়া দিলাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

রজনীকে বিষয় ছাড়িয়া দিলাম, কিন্তু কেহ ত সে বিষয় দখল করিল না।

রাজচন্দ্র দাস একদিন দেখা করিতে আসিল। তাহার মুখে শুনিলাম যে, সে সিমলায় একটি বাড়ী কিনিয়া সেইখানে রজনীকে লইয়া আছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, "টাকা কোথায় পাইলে?" রাজচন্দ্র বলিল, "অমরনাথ কর্জ্জ দিয়াছেন, পশ্চাৎ বিষয় হইতে শোধ হইবে।" জিজ্ঞাসা করিলাম যে, "তবে তোমরা বিষয় দখল লইতেছ না কেন?" তাহাতে সে বলিল, "সে সকল কথা অমরনাথ বাবু জানেন।" "অমরনাথ বাবু কি রজনীকে বিবাহ করিয়াছেন?" তাহাতে রাজচন্দ্র বলিল, "না।" পরে রাজচন্দ্রের সঙ্গে কথোপকথন করিতে করিতে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "রাজচন্দ্র, তোমায় এত দিন দেখি নাই কেন?"

রাজচন্দ্র বলিল, "একটু গা-ঢাকা হইয়াছিলাম।"

আমি। কার কি চুরি করিয়াছ যে, গা-ঢাকা হইয়াছিলে?

রাজ। চুরি করিব কার? তবে অমরনাথ বাবু বলিয়াছিলেন যে, এখন বিষয় লইয়া গোলযোগ হইতেছে, এখন একটু আড়াল হওয়া ভাল। মানুষের চক্ষুলজ্জা আছে ত?

আমি। অর্থাৎ পাছে আমরা কিছু ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ করি। অমরনাথ বাবু বিজ্ঞ লোক দেখিতেছি। তা যাই হউক, এখন যে বড় দেখা দিলে?

রাজ। আপনার ঠাকুর আমাকে ডাকাইয়াছেন।

আমি। আমার ঠাকুর? তিনি তোমার সন্ধান পাইলেন কি প্রকারে?

রাজ। খুঁজিয়া খুঁজিয়া।

আমি। এত খোঁজাখুঁজি কেন? তোমায় বিষয় ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ করিবার জন্য নয় ত?

রাজ। না না—তা কেন—তা কেন? আর একটা কথার জন্য এখন রজনীর কিছু বিষয় হইয়াছে শুনিয়া অনেক সম্বন্ধ আসিতেছে। তা কোথায় সম্বন্ধ করি—তাই আপনাদের জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি।

আমি। কেন, অমরনাথ বাবুর সঙ্গে ত সম্বন্ধ হইতেছিল? তিনি এত করিয়া রজনীর বিষয় উদ্ধার করিলেন, তাঁহাকে ছাড়া কাহাকে বিবাহ দিবে?

রাজ। যদি তাঁর অপেক্ষাও ভাল পাত্র পাই?

আমি। অমরনাথের অপেক্ষা ভাল পাত্র কোথায় পাইবে?

রাজ। মনে করুন, আপনি যেমন, এমনই পাত্র যদি পাই?

আমি একটু চমকিলাম। বলিলাম, "তাহা হইলে অমরনাথের অপেক্ষা ভাল পাত্র হইল না। কিন্তু ছেঁদো কথা ছাড়িয়া দাও—তুমি কি আমার সঙ্গে রজনীর সম্বন্ধ করিতে আসিয়াছ?"

রাজচন্দ্র একটু কুণ্ঠিত হইল। বলিল, "হাঁ, তাই বটে। এ সম্বন্ধ করিতেই কর্ত্তা আমাকে ডাকাইয়াছিলেন।"

শুনিয়া আকাশ হইতে পড়িলাম। সম্মুখে দারিদ্র্য রাক্ষসকে দেখিয়া ভীত হইয়া পিতা যে এই সম্বন্ধ করিতেছেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম—রজনীকে আমি বিবাহ করিলে ঘরের বিষয় ঘরে থাকিবে। আমাকে অন্ধ পুষ্পনারীর কাছে বিক্রয় করিয়া, পিতা বিক্রয়মূল্যস্বরূপ হৃতসম্পত্তি পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন। শুনিয়া হাড় জ্বলিয়া গেল।

রাজচন্দ্রকে বলিলাম, "তুমি এখন যাও। কর্তার সঙ্গে আমার সে কথা হইবে।"

আমার রাগ দেখিয়া রাজচন্দ্র পিতার কাছে গেল, সে কি বলিল, বলিতে পারি না। পিতা তাহাকে বিদায় দিয়া আমাকে ডাকাইলেন।

তিনি আমাকে নানাপ্রকারে অনুরোধ করিলেন--রজনীকে বিবাহ করিতেই হইবে; নহিলে সপরিবারে মারা যাইব, খাইব কি? তাঁহার দুঃখ ও কাতরতা দেখিয়া আমার দুঃখ হইল না। বড় রাগ হইল। আমি রাগ করিয়া চলিয়া গেলাম।

পিতার কাছ হইতে গিয়া আমার মা'র হাতে পড়িলাম। পিতার কাছে রাগ করিলাম, কিন্তু মা'র কাছে রাগ করিতে পারিলাম না—তাঁহার চক্ষের জল অসহ্য হইল। সেখান হইতে পলাইলাম। কিন্তু আমার প্রতিজ্ঞা স্থির রহিল—যে রজনীকে দয়া করিয়া গোপালের সঙ্গে বিবাহিত করিবার উদ্যোগ করিয়াছিলাম, আজ তাহার টাকার লোভে তাহাকে স্বয়ং বিবাহ করিব?

বিপদে পড়িয়া মনে করিলাম, ছোটমা'র সাহায্য লইব। গৃহের মধ্যে ছোটমাই বুদ্ধিমতী। ছোটমা'র কাছে গেলাম—"ছোট মা, আমাকে কি রজনীকে বিবাহ করিতে হইবে? আমি কি অপরাধ করিয়াছি?"

ছোট-মা চুপ করিয়া রহিলেন।

আমি। তুমিও কি ঐ পরামর্শে?

ছোট-মা। বাছা, রজনী ত সৎ-কায়স্থের মেয়ে।

আমি। হইলই বা।

ছোট-মা। আমি জানি, সে সচ্চরিত্রা।

আমি। তাহাও স্বীকার করি।

ছোট-মা। সে পরম সুন্দরী।

আমি। পদ্মচক্ষু।

ছোট-মা। বাবা, যদি পদ্মচক্ষুই খোঁজ, তবে তোমার আর একটা বিবাহ করিতে কতক্ষণ?

আমি। সে কি মা! রজনীর টাকার জন্য রজনীকে বিবাহ করিয়া, তার বিষয় লইয়া, তার পর তাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া আর এক জনকে বিবাহ করা কেমন কাজটা হইবে?

ছোট-মা। ঠেলিয়া ফেলিবে কেন? তোমার বড়-মা কি ঠেলা আছেন?

এ কথার উত্তর ছোট-মা'র কাছে করিতে পারা যায় না। তিনি আমার পিতার দ্বিতীয় পক্ষের বনিতা। বহুবিবাহের দোষের কথা তাঁহার সাক্ষাতে কি প্রকারে বলিব, সে কথা না বলিয়া বলিলাম, "আমি এ বিবাহ করিব না,—তুমি আমায় রক্ষা কর। তুমি সব পার।"

ছোট-মা। আমি না বুঝি, এমন নহে। কিন্তু বিবাহ না করিলে আমরা সপরিবারে অন্নাভাবে মারা যাইব। আমি সকল কষ্ট সহ্য করিতে পারি, কিন্তু তোমাদিগের অন্নকষ্ট আমি চক্ষে দেখিতে পারিব না। তোমার সহস্র বৎসর পরমায়ু হউক, তুমি ইহাতে অমত করিও না।

আমি। টাকাই কি এত বড়?

ছোট-মা। তোমার আমার কাছে নহে; কিন্তু যাহারা তোমার আমার সর্ব্বস্ব, তাঁহাদের কাছে বটে, সুতরাং তোমার আমার কাছেও বটে। দেখ, তোমার জন্য আমরা তিন জনে প্রাণ দিতেও পারি, তুমি আমাদের জন্য একটি অন্ধকন্যা বিবাহ করিতে পারিবে না?

বিচারে ছোট-মা'র কাছে হারিলাম। হারিলে রাগ বাড়ে। আমার রাগ বাড়িল, আর মনে মনে বিশ্বাস ছিল যে, টাকার জন্য রজনীকে বিবাহ করা বড় অন্যায়। অতএব আমি দম্ভ করিয়া বলিলাম, "তোমরা যাহাই বল না কেন, আমি এ বিবাহ করিব না।"

ছোট-মাও দম্ভ করিয়া বলিলেন, "তুমিও যা-ই বল না কেন, আমি যদি কায়েতের মেয়ে হই, তবে তোমার এ বিবাহ দিবই দিব।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "তবে বোধ হয়, তুমি গোয়ালার মেয়ে। আমার এ বিবাহ দিতে পারিবে না।"

ছোট-মা বলিলেন, "না বাবা, আমি কায়েতের মেয়ে।"

ছোট মা বড় দুষ্ট। আমাকেই বাবা বলিয়া গালি ফিরাইয়া দিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

আমাদিগের বাড়ীতে এক সন্ন্যাসী আসিয়া মধ্যে মধ্যে থাকিত। কেহ সন্ন্যাসী বলিত, কেহ ব্রহ্মচারী, কেহ দণ্ডী, কেহ অবধূত। পরিধানে গৈরিক বাস, কণ্ঠে রুদ্রাক্ষমালা, মস্তকে রুক্ষ কেশ, জটা নহে, রক্তচন্দনের ছোট রকমের ফোঁটা, বড় একটা ধূলাকাদার ঘটা নাই; সন্ন্যাসিজাতির মধ্যে

ইনি একটি বাবু। খড়ম চন্দনকাষ্ঠের, তাহাতে হাতীর দাঁতের বৌল। তিনি যাই হউন, বালকেরা তাঁহাকে সন্ন্যাসী মহাশয় বলিত বলিয়া আমিও তাঁহাকে তাহাই বলিব।

পিতা কোথা হইতে তাঁহাকে লইয়া আসিয়াছিলেন। অনুভবে বুঝিলাম, পিতার মনে মনে বিশ্বাস ছিল, সন্ন্যাসী নানাবিধ ঔষধ জানে এবং তান্ত্রিক যাগযজ্ঞে সুদক্ষ। বিমাতা বন্ধ্যা।

পিতার অনুকম্পায় সন্ন্যাসী উপরের একটি বৈঠকখানা আসিয়া দখল করিয়াছিল। ইহা আমার একটু বিরক্তিকর হইয়া উঠিয়াছিল। আবার সন্ধ্যাকালে সূর্য্যের দিকে মুখ করিয়া সারঙ্গ রাগিণীতে আর্য্যাচ্ছন্দে স্তোত্র পাঠ করিত। ভণ্ডামী আর আমার সহ্য হইল না। আমি তাহার অর্দ্ধচন্দ্রের ব্যবস্থা করিবার জন্য তাহার নিকটে গেলাম। বলিলাম, "সন্ন্যাসী ঠাকুর, ছাদের উপর মাথা মুণ্ড কি বকিতেছিলে?"

সন্ন্যাসী হিন্দুস্থানী, কিন্তু আমাদিগের সঙ্গে যে ভাষায় কথা কহিত, তাহার চৌদ্দ আনা নিভাঁজ সংস্কৃত, এক আনা হিন্দী, এক আনা বাঙ্গালা। আমি বাঙ্গালাই রাখিলাম। সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন, "কেন, কি বকি, আপনি কি জানেন না?"

আমি বলিলাম, "বেদমন্ত্র?"

স। হইলে হইতে পারে।

আমি। পড়িয়া কি হয়?

স। কিছু না।

উত্তরটুকু সন্ন্যাসীর জিত—আমি এতটুকু প্রত্যাশা করি নাই। তখন জিজ্ঞাসা করিলাম, "তবে পড়েন কেন?"

স। কেন, শুনিতে কি কষ্টকর?

আমি। না, শুনিতে মন্দ নয়, বিশেষ আপনি সুকণ্ঠ। তবে যদি কিছু ফল নাই, তবে পড়েন কেন?

স। যেখানে ইহাতে কাহারও কোন অনিষ্ট নাই, সেখানে পড়ায় ক্ষতি কি?

আমি জারি করিতে আসিয়াছিলাম; কিন্তু দেখিলাম যে, একটু হটিয়াছি—সুতরাং আমাকে চাপিয়া ধরিতে হইল। বলিলাম, "ক্ষতি নাই, কিন্তু নিষ্ফলে কেহ কোন কাজ করে না—যদি বেদগান নিষ্ফল, তবে আপনি বেদগান করেন কেন?"

স। আপনিও ত পণ্ডিত, আপনি বলুন দেখি, বৃক্ষের উপর কোকিল গান করে কেন?

ফাঁপরে পড়িলাম। ইহার দুইটি উত্তর আছে, এক—"ইহাতে কোকিলের সুখ",—দ্বিতীয়—"স্ত্রী-কোকিলকে মোহিত করিবার জন্য।" কোন্‌টি বলি? প্রথমটি আগে বলিলাম;—"গাইয়াই কোকিলের সুখ।"

স। গাইয়াই আমার সুখ।

আমি। তবে টপ্পা, খিয়াল প্রভৃতি থাকিতে বেদগান করেন কেন?

স। কোন্ কথাগুলি সুখকর, সামান্য গণিকাগণের কদর্য্য চরিত্রের গুণগান সুখকর, না দেবতাদিগের অসীম মহিমাগান সুখকর?

হারিয়া দ্বিতীয় উত্তরে গেলাম; বলিলাম, "কোকিল গায় কোকিল-পত্নীকে মোহিত করিবার জন্য। মোহনার্থ যে শারীরিক স্ফূর্ত্তি, তাহাতে জীবের সুখ। কণ্ঠস্বরের স্ফূর্ত্তি, সেই শারীরিক স্ফূর্ত্তির অন্তর্গত। আপনি কাহাকে মুগ্ধ করিতে চাহেন?"

সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন, "আমার আপনার মনকে। মন আত্মার অনুরাগী নহে, আত্মার হিতকারী নহে। তাহাকে বশীভূত করিবার জন্য গাই।"

আমি। আপনারা দার্শনিক, মন এবং আত্মা পৃথক বলিয়া মানেন। কিন্তু মন একটি পৃথক, আত্মা একটি পৃথক পদার্থ, ইহা মানিতে পারি না। মনেরই ক্রিয়াতে দেখিতে পাই—ইচ্ছা, প্রবৃত্ত্যাদি আমার মনে। সুখ আমার মনে, দুঃখ আমার মনে। তবে আবার মনের অতিরিক্ত আত্মা কেন মানিব? যাহার ক্রিয়া দেখি; তাহাকেই মানিব; যাহার কোন চিহ্ন দেখি না, তাহাকে মানিব কেন?

স। তবে বল না কেন, মন ও শরীর এক। শরীর ও মনের প্রভেদ কেন মানিব? যে কিছু কার্য্য করিতেছ, সকলই শরীরের কার্য্য—কোন্‌টি মনের কার্য্য?

আমি। চিন্তা-প্রবৃত্তি-ভোগাদি।

স। কিসে জানিলে, সে সকল শারীরিক ক্রিয়া নহে?

আমি। তাহাও সত্য বটে। মন শরীরের ক্রিয়া * মাত্র।

স। ভাল ভাল। তবে আর একটু এসো। বল না কেন যে, শরীরও পঞ্চভূতের ক্রিয়া মাত্র। শুনিয়াছি, তোমরা পঞ্চভূত মান না—তোমরা

---

* Function of the brain.

বহুভূতবাদী। তাই হউক, বল না কেন যে, ক্ষিত্যাদি বা অন্য ভূতগণ, শরীর-রূপ ধারণ করিয়া সকলই করিতেছে? এই যে তুমি আমার সঙ্গে কথা কহিতেছ—আমি বলি যে কেবল ক্ষিত্যাদি আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া শব্দ করিতেছে, শচীন্দ্রনাথ নহে। মন ও শরীরাদির কল্পনার প্রয়োজন কি? ক্ষিত্যাদি ভিন্ন শচীন্দ্রনাথের অস্তিত্ব মানি না।

হারিয়া ভক্তিভরে সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া গেলাম। কিন্তু সেই অবধি সন্ন্যাসীর সঙ্গে একটু সম্প্রীতি হইল। সর্ব্বদা তাঁহার কাছে আসিয়া বসিতাম এবং শাস্ত্রীয় আলাপ করিতাম। দেখিলাম, সন্ন্যাসীর অনেক প্রকার ভণ্ডামী আছে। সন্ন্যাসী ঔষধ বিলায়, সন্ন্যাসী হাত দেখিয়া গণিয়া ভবিষ্যৎ বলে, সন্ন্যাসী যাগ-হোমাদিও মধ্যে মধ্যে করিয়া থাকে—নল চালে, চোর বলিয়া দেয়, আরও কত ভণ্ডামী করে। এক দিন আমার অসহ্য হইয়া উঠিল। এক দিন আমি তাঁহাকে বলিলাম, "আপনি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত; আপনার এ সকল ভণ্ডামী কেন?"

স। কোন্‌টা ভণ্ডামী?

আমি। এই নলচালা, হাতগণা প্রভৃতি।

স। কতকগুলা অনিশ্চিত বটে, কিন্তু তথাপি কর্ত্তব্য।

আমি। যাহা অনিশ্চিত জানিতেছেন, তদ্দ্বারা লোককে প্রতারণা কেন করেন?

স। তোমরা মরা কাট কেন?

আমি। শিক্ষার্থ।

স। যাহারা শিক্ষিত, তাহারা কাটে কেন?

আমি। তত্ত্বানুসন্ধান জন্য।

স। আমরাও তত্ত্বানুসন্ধান জন্য এ সকল করিয়া থাকি। শুনিয়াছি, বিলাতী পণ্ডিতের মধ্যে অনেকে বলেন, লোকের মাথার গঠন দেখিয়া তাহার চরিত্রের কথা বলা যায়। যদি মাথার গঠনে চরিত্র বলা যায়, তবে হাতের রেখা দেখিয়াই বা কেন না বলা যাইবে? ইহা মানি যে, হাতের রেখা দেখিয়া কেহ এ পর্য্যন্ত ঠিক বলিতে পারে নাই, ইহার কারণ এই হইতে পারে যে, ইহার প্রকৃত সঙ্কেত অদ্যাপি পাওয়া যায় নাই, কিন্তু ক্রমে ক্রমে হাত দেখিতে দেখিতে প্রকৃত সঙ্কেত পাওয়া যাইতে পারে। এ জন্য হাত পাইলেই দেখি।

আমি। আর নলচালা?

স। তোমরা লৌহের তারে পৃথিবীময় লিপি চালাইতে পার, আমরা কি নলটি চালাইতে পারি না? তোমাদের একটি ভ্রম আছে, তোমরা মনে কর যে, যাহা ইংরেজেরা জানে, তাহাই সত্য, যাহা ইংরেজে জানে না, তাহাই অসত্য, তাহা মনুষ্য-জ্ঞানের অতীত, তাহা অসাধ্য। বস্তুতঃ তাহা নহে। জ্ঞান অনন্ত। কিছু তুমি জান, কিছু আমি জানি, কিছু অন্যে জানে; কিন্তু কেহই বলিতে পারে না যে, আমি সব জানি, আর কেহ আমার জ্ঞানের অতিরিক্ত কিছু জানে না। কিছু ইংরেজেরা জানে, কিছু আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা জানিতেন। ইংরেজেরা যাহা জানে, ঋষিরা তাহা জানিতেন; ঋষিরা যাহা জানিতেন, ইংরেজেরা এ পর্য্যন্ত তাহা জানিতে পারেন নাই। সেই সকল আর্য্যবিদ্যা প্রায় লুপ্ত হইয়াছে। আমরা কেহ কেহ দুই একটি বিদ্যা জানি। যত্নে গোপন রাখি, কাহাকেও শিখাই না।

আমি হাসিলাম। সন্ন্যাসী বলিলেন, "তুমি বিশ্বাস করিতেছ না, কিছু প্রত্যক্ষ দেখিতে চাও?"

আমি বলিলাম, "দেখিলে বুঝিতে পারি।"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "পশ্চাৎ দেখাইব। এক্ষণে তোমার সঙ্গে আমার একটি বিশেষ কথা আছে। আমার সঙ্গে তোমার ঘনিষ্ঠতা আছে। তোমার পিতা আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন যে, তোমাকে বিবাহে প্রবৃত্তি দিই।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "প্রবৃত্তি দিতে হইবে না, আমি বিবাহে প্রস্তুত—কিন্তু—"

স। কিন্তু কি?

আমি। কন্যা কৈ? এক কাণা কন্যা আছে, তাহাকে বিবাহ করিব না।

স। এ বাঙ্গালা দেশে কি তোমার যোগ্য কন্যা নাই?

আমি। হাজার হাজার আছে; কিন্তু বাছিয়া লইব কি প্রকারে? এই শত সহস্র কন্যার মধ্যে কে আমাকে চিরকাল ভালবাসিবে, তাহা কি প্রকারে বুঝিব?

স। আমার একটি বিদ্যা আছে। যদি পৃথিবীতে এমত কেহ থাকে যে, তোমাকে মর্ম্মান্তিক ভালবাসে, তবে তাহাকে স্বপ্নে দেখাইতে পারি। কিন্তু যে তোমাকে এখন ভালবাসে না, ভবিষ্যতে বাসিতে পারে, তাহা আমার বিদ্যার অতীত।

আমি। এ বিদ্যা বড় আবশ্যক বিদ্যা নহে। যে যাহাকে ভালবাসে, সে তাহাকে প্রায় প্রণয়শালী বলিয়া জানে।

স। কে বলিল? অজ্ঞাত প্রণয়ই পৃথিবীতে অধিক; তোমাকে কেহ ভালবাসে? তুমি কি তাহাকে জান?

আমি। আত্মীয়স্বজন ভিন্ন কেহ যে আমাকে বিশেষ ভালবাসে, এমন জানি না।

স। তুমি আমাদের বিদ্যা কিছু প্রত্যক্ষ কর।

আমি। ক্ষতি কি?

স। তবে শয়নকালে আমাকে শয্যাগৃহে ডাকিও।

আমার শয্যাগৃহ বহির্ব্বাটীতে। আমি শয়নকালে সন্ন্যাসীকে ডাকাইলাম। সন্ন্যাসী আসিয়া আমাকে শয়ন করিতে বলিলেন। আমি শয়ন করিলে তিনি বলিলেন, "যতক্ষণ আমি এখানে থাকিব, চক্ষু চাহিও না। আমি গেলে যদি জাগ্রত থাক, চাহিও।" সুতরাং আমি চক্ষু মুদিয়া রহিলাম—সন্ন্যাসী কি কৌশল করিল, কিছুই জানিতে পারিলাম না। সন্ন্যাসী যাইবার পূর্ব্বেই আমি নিদ্রাভিভূত হইলাম।

সন্ন্যাসী বলিয়াছিল, পৃথিবীর মধ্যে যে নায়িকা আমাকে মর্ম্মান্তিক ভালবাসে, অদ্য তাহাকেই আমি স্বপ্নে দেখিব; স্বপ্ন দেখিলাম বটে। কলকল গঙ্গাপ্রবাহমধ্যে সৈকতভূমি, তাহার প্রান্তভাগে অর্দ্ধজলমগ্না—কে?

"রজনী"

পরদিন প্রভাতে সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাহাকে স্বপ্নে দেখিয়াছিলে?"

আমি। কাণা ফুলওয়ালী।

স। কাণা?

আমি। জন্মান্ধ।

সন্ন্যাসী। আশ্চর্য্য! কিন্তু যেই হউক, তাহার অধিক পৃথিবীতে আর কেহ তোমাকে ভালবাসে না।

আমি নীরব হইয়া রহিলাম।

চতুর্থ খণ্ড

(সকলের কথা)

প্রথম পরিচ্ছেদ

লবঙ্গলতার কথা

বড়ই গোল বাধিল। আমি ত সন্ন্যাসী ঠাকুরের হাতে পায়ে ধরিয়া, কাঁদিয়া কাটিয়া শচীন্দ্রকে রজনীর বশীভূত করিবার উপায় করিতেছি। সন্ন্যাসী তন্ত্রসিদ্ধ; জগদম্বার কৃপায় যাহা মনে করেন, তাহাই করিতে পারেন; মিত্র মহাশয় ষষ্টি বৎসর বয়সে যে এ পামরীর এত বশীভূত, তাহা আমার গুণে কি সন্ন্যাসী ঠাকুরের গুণে, তাহা বলিয়া উঠা ভার; আমিও কায়মনোবাক্যে পতিপদ সেবায় ত্রুটি করি না, ব্রহ্মচারীও আমার জন্য যাগ-যজ্ঞ, তন্ত্র-মন্ত্রপ্রয়োগে ত্রুটি করেন না। যাহার জন্য যাহা তিনি করিয়াছেন, তাহা ফলিয়াছে। কামার-বৌর পিতলের টুকনি সোণা করিয়া দিয়াছেন। উনি না পারেন কি? উঁহার মন্ত্রৌষধির গুণে শচীন্দ্র যে রজনীকে ভালবাসিবে—রজনীকে বিবাহ করিতে চাহিবে, তাহাতে আমার কোন সন্দেহই নাই, কিন্তু তবু গোল বাধিয়াছে। গোলমাল অমরনাথ বাধাইয়াছে। এখন শুনিতেছি, অমরনাথের সঙ্গেই রজনীর বিবাহ স্থির হইয়াছে।

রজনীর মাসী-মাসুয়া, রাজচন্দ্র এবং তাহার স্ত্রী আমাদিগের দিকে। তাহার কারণ, কর্ত্তা বলিয়াছেন, বিবাহ যদি হয়, তবে তোমাদিগকে ঘটকবিদায় স্বরূপ কিছু দিব। কথাটা ঘটকবিদায়, কিন্তু, পাঁচটা দু-হাজার দশ-হাজার! কিন্তু তাহারা আমাদের দিকে হইলেও কিছু হইতেছে না। অমরনাথ ছাড়িতেছে না। সে নিশ্চয় রজনীকে বিবাহ করিবে, জিদ করিতেছে।

ভাল, অমরনাথ কে? মেয়ের বিবাহ দিবার কর্ত্তা হইল তাহার মাসুয়া মাসী—বাপ-মা বলাই উচিত—রাজচন্দ্র ও তাহার স্ত্রী; তাহারা যদি আমাদিগের দিকে, তবে অমরনাথের জিদে কি আসিয়া যায়? সে তাহাদিগকে বিষয় দেওয়াইয়া দিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার মেহনতানা দুই চারি হাজার ধরিয়া দিলেই হইবে। আমার ছেলের বৌ করিব বলিয়াই আমি যে কন্যার সম্বন্ধ করিতেছি, অমরনাথ কি না তাহাকে বিবাহ করিতে চায়! অমরনাথের এত বড় স্পর্দ্ধা! আমি একবার অমরনাথকে কিছু শিক্ষা দিয়াছি—আর একবার না হয় কিছু শিক্ষা দিব। আমি যদি কায়েতের মেয়ে হই, তবে অমরনাথের নিকট হইতে এই রজনীকে কাড়িয়া লইয়া আমার ছেলের সঙ্গে বিবাহ দিব।

আমি অমরনাথের গুণ জানি। অমরনাথ অত্যন্ত ধূর্ত্ত—তাহার সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে বড় সতর্ক হইয়া কাজ করিতে হয়। আমি সতর্ক হইয়াই কার্য্য আরম্ভ করিলাম।

`প্রথমে রাজচন্দ্র দাসের স্ত্রীকে ডাকাইয়া পাঠাইলাম। সে আসিলে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন গা! মালী-বৌ?"—রাজচন্দ্রের স্ত্রীকে আমরা আজিও মালী-বৌ বলিতাম, রাগ না হইলে বরং বলিতাম না, রাগ হইলেই মালী-বৌ বলিতাম—মালী-বৌ বলিল, "কি গা?"

আমি। মেয়ের বিয়ে না কি অমরনাথ বাবুর সঙ্গে দিবে?

মালী-বৌ। সেই কথাই ত এখন হচ্ছে।

আমি। কেন হচ্ছে, আমাদের সঙ্গে কি কথা হইয়াছিল?

মালী-বৌ। কি করব মা—আমি মেয়েমানুষ, অত কি জানি?

মাগীর মোটা বুদ্ধি দেখিয়া আমার বড় রাগ হইল,—আমি বলিলাম, "সে কি মালী-বৌ? মেয়েমানুষে জানে না ত কি পুরুষমানুষে জানে? পুরুষমানুষ আবার সংসার-ধর্ম্ম কুটুম্ব-কুটুম্বিতার কি জানে? পুরুষমানুষ মাথায় মোট করিয়া টাকা বহিয়া আনিয়া দিবে, এই পর্য্যন্ত—পুরুষমানুষ আবার কর্ত্তা না কি?"

বোধ হয়, মাগীর মোটা বুদ্ধিতে আমার কথাগুলো অসঙ্গত বোধ হইল—সে একটু হাসিল। আমি বলিলাম, "তোমার স্বামীর কি মত, অমরনাথের সঙ্গে মেয়ের বিবাহ দেন?"

মালী-বৌ বলিল, "তাঁর মত নয়—তবে অমরনাথ বাবু হইতেই রজনী বিষয় পাইয়াছে, তাঁর বাধ্য হইতেই হয়।"

আমি। তবে অমরনাথ বাবুকে বল গিয়া, বিষয় রজনী এখনও পায় নাই। বিষয় আমাদের; বিষয় আমরা ছাড়িব না। পার, তোমারা বিষয় মোকদ্দমা করিয়া লও গিয়া।

মালী-বৌ। সে কথা আগে বলিলেই হইত। এত দিন মোকদ্দমা উপস্থিত হইত।

আমি। মোকদ্দমা করা মুখের কথা নহে। টাকার শ্রাদ্ধ। রাজচন্দ্র দাস ফুল বেচিয়া কত টাকা করিয়াছে?

মালী-বৌ রাগে গর্‌গর্‌ করিতে লাগিল। সত্য বলিতেছি, আমার কিছুই রাগ নাই। মালী-বৌ একটু রাগ সামলাইয়া বলিল, "অমর বাবু আমার জামাই হইলেই বিষয় অমর বাবুর হইবে। তিনি টাকা দিয়া মোকদ্দমা করিতে পারেন, তাঁহার এমন শক্তি আছে।"

এই বলিয়া মালী-বৌ উঠিয়া যায়, আমি তাহার আঁচল ধরিয়া বসাইলাম। মালী-বৌ হাসিয়া বসিল। আমি বলিলাম, "অমর বাবু মোকদ্দমা করিয়া বিষয় লইলে তোমার কি উপকার?"

মালী-বৌ। আমার মেয়ের সুখ হবে।

আমি। আর আমার ছেলের সঙ্গে তোমার মেয়ের বিয়ে হ'লে বুঝি বড় দুঃখ হবে?

মালী-বৌ। তা কেন? তবে যেখানে থাকে, আমার মেয়ে সুখী হইলেই হইল।

আমি। তোমাদের নিজের কিছু সুখ চাই না?

মালী-বৌ। আমাদের আবার সুখ কি? মেয়ের সুখেই আমাদের সুখ।

আমি। মটকালীটা?

মালী-বৌ মুখ মুচকাইয়া হাসিল। বলিল, "আসল কথাটা বলিব মা ঠাকুরাণি? এখানে বিয়ের মেয়ের মত নাই।"

আমি। সে কি? কি বলে?

মালী-বৌ। এখানকার কথা হইলেই বলে, কাণার আবার বিয়ের কাজ কি?

আমি। আর অমরনাথের সঙ্গে বিয়ের কথা হইলে?

মালী-বৌ। বলে, ও হতে আমাদের সব। উনি যা বলিবেন, তাহাই করিতে হইবে।

আমি। তা বিয়ের কন্যার আবা'র মতামত কি? মা বাপের মতামত হইলেই হইল।

আমি। প্রায়। আমি নিজে তাহাকে বিবাহ না করি, তাহার ভাল বিবাহ দিতে চাই। তোমার সঙ্গে তাহার বিবাহ হইতে দিব না।

অ। আমি সুপাত্র। রজনীর এরূপ আর জুটিতেছে না।

আমি। তুমি কুপাত্র, আমি সুপাত্র জোটাইয়া দিব।

অ। আমি কুপাত্র কিসে?

আমি। কামিজটা খুলিয়া পিঠ বাহির কর দেখি?

অমরনাথের মুখ শুকাইয়া কাল হইয়া গেল! অতি দুঃখিতভাবে বলিল, "ছি! লবঙ্গ।"

আমার দুঃখ হইল, কিন্তু দুঃখ দেখিয়া ভুলিলাম না। বলিলাম, "একটি গল্প বলিব, শুনিবে?"

আমি কথা চাপা দিতেছি মনে করিয়া অমরনাথ বলিল, "শুনিব।"

আমি তখন বলিতে লাগিলাম' "প্রথম যৌবন কালে লোকে আমাকে রূপবতী বলিত।"

অ। এটা যদি গল্প, তবে সত্য কোন্ কথা?

আমি। পরে শোন। সেই রূপ দেখিয়া এক চোর মুগ্ধ হইয়া, আমার পিত্রালয়ে যে ঘরে আমি এক পরিচারিকার সঙ্গে শয়ন করিয়া ছিলাম, সেই ঘরে সিঁধ দিল।

এই কথা বলিতে আরম্ভ করায় অমরনাথ গলদ্‌ঘর্ম হইয়া উঠিল। বলিল, "ক্ষমা কর।"

আমি বলিতে লাগিলাম, "সেই চোর সিঁধ-পথে আমার কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। ঘরে আলো জ্বলিতেছিল—আমি চোরকে চিনিলাম, ভীতা হইয়া পরিচারিকাকে উঠাইলাম। সে চোরকে চিনিত না। আমি তখন অগত্যা চোরকে আদর করিয়া আশ্বস্ত করিয়া পালঙ্কে বসাইলাম।"

অমর। ক্ষমা কর, সে ত সকলই জানি।

আমি। তবু একবার স্মরণ করাইয়া দেওয়া ভাল। ক্ষণেক পরে চোরের অলক্ষ্যে আমার সঙ্কেতানুসারে পরিচারিকা বাহিরে গিয়া দ্বারবান্‌কে ডাকিয়া লইয়া সিঁধমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। আমিও সময় বুঝিয়া, বাহিরের প্রয়োজন ছলনা করিয়া নির্গত হইয়া, বাহির হইতে একমাত্র দ্বারের শৃঙ্খল বদ্ধ করিলাম। মন্দ করিয়াছিলাম?

অমরনাথ বলিল, "এ সকল কথা কেন?"

আমি। পরে চোর নির্গত হইল কি প্রকারে, বল দেখি? ডাকিয়া পাড়ার লোক জমা করিলাম। দুই বড় বলবান্ আসিয়া চোরকে ধরিল। চোর লজ্জায় মুখে কাপড় দিয়া রহিল। আমি দয়া করিয়া তাহার মুখের কাপড় খুলাইলাম না, কিন্তু স্বহস্তে লোহার শলা তপ্ত করিয়া তাহার পিঠে লিখিয়া দিলাম—

"চোর"

অমরবাবু, অতি গ্রীষ্মেও কি আপনি গায়ের জামা খুলিয়া শয়ন করেন না?

অ। না।

আমি। লবঙ্গলতার হস্তাক্ষর মুছিবার নহে। আমি রজনীকে ডাকিয়া এই গল্প শুনাইয়া যাই, ইচ্ছা ছিল, কিন্তু শুনাইব না। তুমি রজনীর যোগ্য নহ, রজনীকে বিবাহ করিতে চেষ্টা পাইও না। যদি ক্ষান্ত না হও, তবে সুতরাং শুনাইতে বাধ্য হইব।

অমরনাথ কিছুক্ষণ ভাবিল। পরে দুঃখিতভাবে বলিল, "শুনাইতে হয়, শুনাইও, তুমি শুনাও বা না শুনাও, আমি স্বয়ং আজি সকল শুনাইব। আমার দোষ-গুণ সকল শুনিয়া রজনী আমাকে গ্রহণ করিতে হয়, গ্রহণ করিবে, না করিতে হয়, না করিবে। আমি তাহাকে প্রবঞ্চনা করিব না।"

আমি হাসিয়া মনে মনে অমরনাথকে শত শত ধন্যবাদ করিতে করিতে, হর্ষবিষাদে ঘরে ফিরিয়া আসিলাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

শচীন্দ্রনাথের কথা

ঐশ্বর্য্য হারাইয়া কিছু দিন পরে আমি পীড়িত হইলাম। ঐশ্বর্য্য হইতে দারিদ্র্যে পতনের আশঙ্কায় মনে কোন বিকার উপস্থিত হইয়াছিল বলিয়া কি, কি জন্য এই পীড়ার উৎপত্তি, তাহা আমি বলিবার কোন চেষ্টা পাইব না। কেবল পীড়ার লক্ষণ বলিব।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে রৌদ্রের তাপ অপনীত হইলে পর প্রাসাদের উপর বসিয়া অধ্যয়ন করিতেছিলাম, সমস্ত দিবস অধ্যয়ন করিয়াছিলাম। জগতের দুরূহ গূঢ়তত্ত্ব সকলের আলোচনা করিতেছিলাম। কিছুরই মর্ম্ম বুঝিতে পারি না, কিন্তু কিছুতেই আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি পায় না। যত পড়ি, তত পড়িতে সাধ করে। শেষে শ্রান্তিবোধ হইল। পুস্তক বন্ধ করিয়া হস্তে লইয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম। একটু নিদ্রা আসিল—অথচ নিদ্রা নহে। সে মোহ

নিদ্রার ন্যায় সুখকর বা তৃপ্তিজনক নহে। ক্লান্ত হস্ত হইতে পুস্তক খসিয়া পড়িল। চক্ষু চাহিয়া আছি—বাহ্যবস্তু সকলই দেখিতে পাইতেছি, কিন্তু কি দেখিতেছি, তাহা বলিতে পারি না। অকস্মাৎ সেইখানে প্রভাত-বীচি-বিক্ষেপ-চপলা কলকল-নাদিনী নদী বিস্তৃত দেখিলাম। যেন তথা উষার উজ্জ্বলবর্ণে পূর্ব্বদিক প্রভাসিত হইতেছে—দেখি, সেই গঙ্গা-প্রবাহমধ্যে, সৈকতমূলে রজনী। রজনী জলে নামিতেছে। ধীরে, ধীরে, ধীরে! অন্ধ অথচ কুঞ্চিত ভ্রূ; বিকলা অথচ স্থিরা; সেই প্রভাত-শান্তিশীতলা ভাগীরথীর ন্যায় গম্ভীরা, ধীরা, সেই ভাগীরথীর ন্যায় অন্তরে দুর্জ্জয় বেগশালিনী। ধীরে ধীরে, ধীরে,—জলে নামিতেছে। দেখিলাম, কি সুন্দর। রজনী কি সুন্দরী! বৃক্ষ হইতে নবমঞ্জরীর সুগন্ধের ন্যায়, দূরশ্রুত সঙ্গীতের শেষ ভাগের ন্যায়, রজনী জলে, ধীরে—ধীরে—ধীরে নামিতেছে! ধীরে রজনি! ধীরে! আমি দেখি তোমায়! তখন অনাদর করিয়া দেখি নাই, এখন একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লই। ধীরে রজনি, ধীরে!

আমার মূর্চ্ছা হইল। মূর্চ্ছার লক্ষণ সকল আমি অবগত নহি। যাহা পশ্চাৎ শুনিয়াছি, তাহা বলিয়া কোন ফল নাই। আমি যখন পুনর্ব্বার চেতনা প্রাপ্ত হইলাম, তখন রাত্রিকাল—আমার নিকটে অনেক লোক। কিন্তু আমি সে সকল কিছুই দেখিলাম না। আমি দেখিলাম—কেবল সেই মৃদুনাদিনী গঙ্গা, আর সেই মৃদুগামিনী রজনী ধীরে, ধীরে, ধীরে জল নামিতেছে। চক্ষু মুদিলাম, তবু দেখিলাম, সেই গঙ্গা আর সেই রজনী! আবার চাহিলাম, আবার দেখিলাম, সেই গঙ্গা, আর সেই রজনী! দিগন্তরে চাহিলাম, আবার সেই রজনী, ধীরে ধীরে ধীরে জলে নামিতেছে। ঊর্দ্ধে চাহিলাম, ঊর্দ্ধেও আকাশবিহারিণী গঙ্গা ধীরে ধীরে ধীরে বহিতেছে, আকাশবিহারিণী—রজনী ধীরে, ধীরে, নামিতেছে। অন্য দিকে মন ফিরাইলাম, তথাপি সেই গঙ্গা আর সেই রজনী! আমি নিরস্ত হইলাম। চিকিৎসকেরা আমার চিকিৎসা করিতে লাগিল।

অনেক দিন ধরিয়া আমার চিকিৎসা হইতে লাগিল, কিন্তু আমার নয়নাগ্র হইতে রজনী-রূপ তিলেক জন্য অন্তর্হিত হইল না। আমি জানি না আমার কি রোগ বলিয়া চিকিৎসকেরা চিকিৎসা করিতেছিল। আমার নয়নাগ্রে যে রূপ অহরহঃ নাচিতেছিল, তাহার কথা কাহাকেও বলি নাই।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

শচীন্দ্রের কথা

ওহে ধীরে, রজনি, ধীরে! ধীরে, ধীরে আমার এই হৃদয়-মন্দিরে প্রবেশ কর! এত দ্রুতগামিনী কেন? তুমি অন্ধ, পথ চেনা না, ধীরে রজনি, ধীরে! ক্ষুদ্র এই পুরী, আঁধার, আঁধার, আঁধার! চিরান্ধকার! দীপশলাকার ন্যায় ইহাতে প্রবেশ করিয়া আলো কর,—দীপশলাকার ন্যায় আপনি পুড়িবে, কিন্তু এ আঁধার পুরী আলো করিবে।

ওহে ধীরে, রজনি, ধীরে! এ পুরী আলো কর, কিন্তু দাহ কর কেন? কে জানে যে, শীতল প্রস্তরেও দাহ করিবে—তোমায় ত পাষাণগঠিতা পাষাণময়ী জানিতাম, কে জানে যে, পাষাণেও দাহ করিবে? অথবা কে না জানে, পাষাণে ও লৌহে সংঘর্ষণেই অগ্ন্যুৎপাত হয়। তোমার প্রস্তরধবল, প্রস্তরস্নিগ্ধ-দর্শন, প্রস্তরগঠিতবৎ মূর্ত্তি যত দেখি, ততই দেখিতে ইচ্ছা হয়। অনুদিন পলকে পলকে দেখিয়াও মনে হয়, দেখিলাম কৈ? আবার দেখি, আবার দেখি, কিন্তু দেখিয়াও ত সাধ মিটিল না।

পীড়িতাবস্থায় আমি প্রায় কাহারও সঙ্গে কথা কহিতাম না। কেহ কথা কহিতে আসিলে ভাল লাগিত না। রজনীর কথা মুখে আনিতাম না—কিন্তু প্রলাপকালে কি বলিতাম না বলিতাম, তাহা স্মরণ করিয়া বলিতে পারি না। প্রলাপ সচরাচরই ঘটিত।

শয্যা প্রায় ত্যাগ করিতাম না। শুইয়া শুইয়া কত কি দেখিতাম, তাহা বলিতে পারি না। কখন দেখিতাম, সমরক্ষেত্রে যবন নিপাত হইতেছে; রক্তের নদী বহিতেছে; কখন দেখিতাম, সুবর্ণ-প্রান্তরে হীরকবৃক্ষে স্তবকে স্তবকে নক্ষত্র ফুটিয়া আছে! কখন দেখিতাম, আকাশমার্গে অষ্টশশি-সমন্বিত শনৈশ্চর মহাগ্রহ চতুশ্চন্দ্রবাহী বৃহস্পতির উপর মহাবেগে পতিত হইল—গ্রহ উপগ্রহ সকল খণ্ড খণ্ড হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল—আঘাতোৎপন্ন বহ্নিতে সে সকল জ্বলিয়া উঠিয়া, দাহ্যমানাবস্থাতে মহাবেগে বিশ্বমণ্ডলের চতুর্দ্দিকে প্রধাবিত হইতেছে। কখন দেখিতাম, এই জগৎ জ্যোতির্ম্ময় কান্তরূপধর দেবযোনির মূর্ত্তিতে পরিপূর্ণ; তাহারা অবিরত অম্বরপথ প্রভাসিত করিয়া বিচরণ করিতেছে। তাহাদিগের অঙ্গের সৌরভে আমার নাসারন্ধ্র পরিপূর্ণ হইতেছে, কিন্তু যাহাই দেখি না, সকলের মধ্যস্থলে রজনীর সেই প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি

দেখিতে পাইতাম। হায়! রজনি! পাথরে এত আগুন?

ধীরে রজনি, ধীরে, ধীরে, ধীরে রজনি, ঐ অন্ধ নয়ন উন্মিলিত কর! দেখ, আমায় দেখ, আমি তোমায় দেখি! ঐ দেখিতেছি—তোমার নয়নপদ্ম ক্রমে প্রস্ফুটিত হইতেছে—ক্রমে, ক্রমে, ক্রমে, ধীরে ধীরে, ধীরে, ধীরে নয়নরাজীব ফুটিতেছে। এ সংসারে কাহার না নয়ন আছে? গো, মেষ, কুক্কুর, মার্জ্জার, ইহাদেরও নয়ন আছে—তোমার নাই? নাই, নাই, তবে আমারও নাই। আমিও আর চক্ষু চাহিব না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

লবঙ্গলতার কথা

আমি জানিতাম, শচীন্দ্র একটা কাণ্ড করিবে—ছেলেবয়সে অত ভাবিতে আছে! দিদি ত একবার চেয়েও দেখেন না—আমি বলিলে বিমাতা বলিয়া আমার কথা গ্রাহ্য করে না। ও সব ছেলেকে আঁটিয়া উঠা ভার। এখন দায় দেখিতেছি আমার। ডাক্তার বৈদ্য কিছু করিতে পারিল না, পারিবেও না। তারা রোগই নির্ণয় করিতে জানে না—রোগ হলো মনে—হাত দেখিলে, চোখ দেখিলে, জিভ দেখিলে তারা কি বুঝিবে? যদি তারা আমার মত আড়ালে লুকাইয়া বসিয়া আড়ি পেতে ছেলের কাণ্ড দেখিত, তবে এক দিন রোগের ঠিকানা করিলে করিতে পারিত।

কথাটা কি? "ধীরে রজনি!" ছেলে ত একেলা থাকিলে এই কথাই বলে। সন্ন্যাসী ঠাকুরের ঔষধে কি এই ফল ফলিল? আমার মাথা খাইতে কেন আমি এমন কাজ করিলাম! ভাল, রজনীকে একবার রোগীর কাছে বসাইয়া রাখিলে হয় না? কৈ, আমি রজনীর বাড়ী গিয়াছিলাম, সে ত সেই অবধি আমার বাড়ী একবারও আসে নাই। ডাকিয়া পাঠাইলে না আসিয়া থাকিতে পারিবে না। এই ভাবিয়া রজনীর গৃহে লোক পাঠাইলাম—বলিয়া পাঠাইলাম যে, আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে, একবার আসিতে বলিও।

মনে করিলাম, আগে একবার শচীন্দ্রের কাছে রজনীর কথা পাড়িয়া দেখি। তাহা হইলে বুঝিতে পারিব, রজনীর সঙ্গে শচীন্দ্রের পীড়ার কোন সম্বন্ধ আছে কি না?

অতএব প্রকৃত তত্ত্ব জানিবার জন্য শচীন্দ্রের কাছে গিয়া বসিলাম। এ-কথা ও-কথার পর রজনীর প্রসঙ্গ ছলে পাড়িলাম। আর কেহ সেখানে ছিল না। রজনীর নাম শুনিবামাত্র বাছা অমনি চমকিত হংসীর ন্যায় গ্রীবা তুলিয়া আমার মুখপ্রতি চাহিয়া রহিল। আমি যত রজনীর কথা বলিতে লাগিলাম, শচীন্দ্র কিছুই উত্তর করিল না, কিন্তু ব্যাকুলিত চক্ষে আমার প্রতি চাহিয়া রহিল। ছেলে বড় অস্থির হইয়া উঠিল—এটা পাড়ে, সেটা ভাঙ্গে, এইরূপ আরম্ভ করিল। আমি পরিশেষে রজনীকে তিরস্কার করিতে লাগিলাম; সে অত্যন্ত ধনলুব্ধা, আমাদের পূর্ব্বকৃত উপকার কিছুমাত্র স্মরণ করিল না। এইরূপ কথাবার্ত্তা শুনিয়া শচীন্দ্র অপ্রসন্ন-ভাবাপন্ন হইলেন, এমন আমার বোধ হইল, কিন্তু কথায় কিছু প্রকাশ পাইল না।

নিশ্চয় বুঝিলাম, এটি সন্ন্যাসীর কীর্ত্তি। তিনি এক্ষণে স্থানান্তরে গিয়াছেন। অল্প দিনে আসিবার কথা ছিল; তাঁহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। কিন্তু তাহাও মনে ভাবিতে লাগিলাম যে, তিনিই বা কি করিবেন? আমি নির্ব্বোধ দুরাকাঙ্ক্ষাপরবশ স্ত্রীলোক—ধনের লোভে অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া আপনিই এই বিপত্তি উপস্থিত করিয়াছি। তখন মনে জানিতাম যে, রজনীকে নিশ্চয়ই পুত্রবধূ করিব। তখন কে জানে যে, কাণা ফুলওয়ালীও দুর্ল্লভ হইবে? কে জানে যে, সন্ন্যাসীর মন্ত্রৌষধে হিতে বিপরীত হইবে? স্ত্রীলোকের বুদ্ধি অতি ক্ষুদ্র, তাহা জানিতাম না; আপনার বুদ্ধির অহঙ্কারে আপনি মজিলাম। আমার এমন বুদ্ধি হইবার আগে আমি মরিলাম না কেন? এখন ইচ্ছা হইতেছে মরি, কিন্তু শচীন্দ্র বাবুর আরোগ্য লাভ না দেখিয়া মরিতে পারিতেছি না।

কিছু দিন পরে কোথা হইতে সেই পূর্ব্বপরিচিত সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি বলিলেন, তিনি শচীন্দ্রের পীড়া শুনিয়া দেখিতে আসিয়াছেন, কে তাঁহাকে শচীন্দ্রের পীড়ার সংবাদ দিল, তাহা কিছুই বলিলেন না।

শচীন্দ্রের পীড়ার বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শুনিলেন, পরে শচীন্দ্রের কাছে বসিয়া নানা প্রকার কথোপকথন করিতে লাগিলেন। তৎপরে প্রণাম করিবার জন্য আমি তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলাম। প্রণাম করিয়া মঙ্গল-জিজ্ঞাসার পর বলিলাম, "মহাশয় সর্ব্বজ্ঞ; না জানেন, এমন তত্ত্বই নাই। শচীন্দ্রের কি রোগ আপনি জানেন?"

তিনি বলিলেন, "উহা বায়ুরোগ। অতি দুশ্চিকিৎস্য।"

আমি বলিলাম, "তবে শচীন্দ্র সর্ব্বদা রজনীর নাম করে কেন?"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "তুমি বালিকা, বুঝিবে কি?"

(কি সর্ব্বনাশ, আমি বালিকা, আমি শচীর মা!)

"এই রোগের এক গতি এই যে, হৃদয়স্থ লুক্কায়িত এবং অপরিচিত ভাব বা প্রবৃত্তি সকল প্রকাশিত হইয়া পড়ে এবং অত্যন্ত বলবান্ হইয়া উঠে। শচীন্দ্র কদাচিৎ আমাদিগের দৈববিদ্যা সকলের পরীক্ষার্থী হইলে আমি কোন তান্ত্রিক অনুষ্ঠান করিলাম। তাহাতে যে তাঁহাকে আন্তরিক ভালবাসে, তিনি তাহাকে স্বপ্নে দেখিবেন। শচীন্দ্র রাত্রিযোগে রজনীকে স্বপ্নে দেখিলেন। স্বাভাবিক নিয়ম এই যে, যে আমাদিগকে ভালবাসে বুঝিতে পারি, আমরা তাহার প্রতি অনুরক্ত হই। অতএব সেই রাত্রে শচীন্দ্রের মনে রজনীর প্রতি অনুরাগের বীজ গোপনে সমারোপিত হইল। কিন্তু রজনী অন্ধ এবং ইতর লোকের কন্যা ইত্যাদি কারণে সে অনুরাগ প্রস্ফুট হইতে পারে নাই। অনুরাগের লক্ষণ স্বহৃদয়ে কিছু দেখিতে পাইলেও, শচীন্দ্র তৎপ্রতি বিশ্বাস করেন নাই। ক্রমে ঘোরতর দারিদ্র্যদুঃখের আশঙ্কা তোমাদিগকে পীড়িত করিতে লাগিল। সর্ব্বাপেক্ষা শচীন্দ্রই তাহাতে গুরুতর ব্যথা পাইলেন। অন্যমনে, দারিদ্র্যদুঃখ ভুলিবার জন্য শচীন্দ্র অধ্যয়নে মন দিলেন। অন্যমনা হইয়া বিদ্যালোচনা করিতে লাগিলেন। সেই বিদ্যালোচনার আধিক্য-হেতু চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিল। তাহাতেই এই মানসিক রোগের সৃষ্টি। সেই মানসিক রোগকে অবলম্বন করিয়া রজনীর প্রতি সেই বিলুপ্তপ্রায় অনুরাগ পুনঃ প্রস্ফুটিত হইল। এখন আর শচীন্দ্রের সে মানসিক শক্তি ছিল না যে, তদ্দ্বারা তিনি সেই অবহিত অনুরাগকে প্রশমিত করেন। বিশেষ পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এই সকল মানসিক পীড়ার কারণ যে গুপ্ত মানসিক ভাব বিকসিত হয়, তাহা অপ্রাকৃত হইয়া উঠে। তখন তাহা বিকারের স্বরূপ প্রতীয়মান হয়। শচীন্দ্রের সেইরূপ এ বিকার।"

আমি তখন কাতর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম যে, "ইহার প্রতীকারের কি হইবে?"

সন্ন্যাসী বলিলেন,—"আমি ডাক্তারী শাস্ত্রের কিছুই জানি না। ডাক্তারদিগের দ্বারা এ রোগ উপশম হইতে পারে কি না, তাহা বিশেষ বলিতে পারি না, কিন্তু ডাক্তারেরা কখনও এ সকল রোগের প্রতীকার করিয়াছে, এমন আমি শুনি নাই।"

আমি বলিলাম যে, "অনেক ডাক্তার দেখান হইয়াছে, কোন উপকার হয় নাই।"

স। সচরাচর বৈদ্যচিকিৎসকের দ্বারাও কোন উপকার হইবে না।

আমি। তবে কি কোন উপায় নাই?

স। যদি বল, তবে আমি ঔষধ দিই।

আমি। আপনার ঔষধের অপেক্ষা কাহার ঔষধ? আপনি আমাদের রক্ষাকর্ত্তা, আপনিই ঔষধ দিন।

স। তুমি বাড়ীর গৃহিণী। তুমি বলিলেই ঔষধ দিতে পারি। শচীন্দ্রও তোমার বাধ্য। তুমি বলিলেই সে আমার ঔষধ সেবন করিবে। কিন্তু কেবল ঔষধে আরোগ্য হইবে না। মানসিক পীড়ার মানসিক চিকিৎসা চাই। রজনীকে চাই।

আমি। রজনী আসিবে, ডাকিয়া পাঠাইয়াছি।

স। কিন্তু রজনীর আগমনে ভাল হইবে কি মন্দ হইবে, তাহাও বিবেচ্য। এমন হইতে পারে যে, রজনীর প্রতি এই অপ্রাকৃত অনুরাগ রুগ্নাবস্থায় দেখা সাক্ষাৎ হইলে বদ্ধমূল হইয়া স্থায়িত্ব প্রাপ্ত হইবে। যদি রজনীর সঙ্গে বিবাহ না হয়, তবে রজনীর না আসাই ভাল।

আমি। রজনীর আসা ভাল হউক, মন্দ হউক, তাহা বিচার করিবার সময় নাই। ঐ দেখুন, রজনী আসিতেছে।

সেই সময় এক জন পরিচারিকার সঙ্গে রজনী আসিয়া উপস্থিত হইল। অমরনাথও শচীন্দ্রের পীড়া শুনিয়া স্বয়ং শচীন্দ্রকে দেখিতে আসিয়াছিলেন এবং রজনীকে সঙ্গে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছিলেন। আপনি বহির্ব্বাটীতে থাকিয়া, পরিচারিকার সঙ্গে তাহাকে অন্তঃপুরে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

পঞ্চম খণ্ড

অমরনাথের কথা

প্রথম পরিচ্ছেদ

এই অন্ধ পুষ্পনারী কি মোহিনী জানে, তাহা বলিতে পারি না। চক্ষে কটাক্ষ নাই, অথচ আমার মত সন্ন্যাসীকেও মোহিত করিল। আমি মনে করিয়াছিলাম, লবঙ্গলতার পর আর কখন কাহাকে ভালবাসিব না। মনুষ্যের সকলই অনর্থক দম্ভ! অন্য দূরে থাক, সহজেই এই অন্ধ পুষ্পনারী কর্ত্তৃক মোহিত হইলাম।

মনে করিয়াছিলাম—এ জীবন অমাবস্যার রাত্রিস্বরূপ—অন্ধকারেই কাটিবে—সহসা চন্দ্রোদয় হইল। মনে করিয়াছিলাম—এ জীবনসিন্ধু সাঁতরাইয়াই আমাকে পার হইতে হইবে—সহসা সম্মুখে সুবর্ণ সেতু দেখিলাম। মনে করিয়াছিলাম, এ মরুভূমি এমনই চিরকাল দগ্ধক্ষেত্র থাকিবে, রজনী সহসা সেখানে নন্দন-কানন আনিয়া বসাইল। আমার এ সুখের আর সীমা নাই। চিরকাল যে অন্ধকার গুহামধ্যে বাস করিয়াছে, সহসা সে যদি এই সূর্য্য-কিরণ-সমুজ্জ্বল তরুপল্লব-কুসুম-সুশোভিত মনুষ্য-লোকে স্থাপিত হয়, তাহার যে আনন্দ, আমার সেই আনন্দ! যে চিরকাল পরাধীন, পরপীড়িত, দাসানুদাস ছিল, সে যদি হঠাৎ সর্ব্বেশ্বর সার্ব্বভৌম হয়, তাহার যে আনন্দ, আমার সেই আনন্দ! রজনীর মত যে জন্মান্ধ, হঠাৎ তাহার চক্ষু ফুটিলে যে আনন্দ, রজনীকে ভালবাসিয়া আমার সে আনন্দ!

কিন্তু এ আনন্দে পরিণামে কি হইবে, তাহা বলিতে পারি না। আমি চোর। আমার পিঠে আগুনের অক্ষরে লেখা আছে যে, আমি চোর! যে দিন রজনী সেই অক্ষরে হাত দিয়া জিজ্ঞাসা করিবে, এ কিসের দাগ—আমি তাহাকে কি বলিব? বলিব কি যে, ও কিছু নহে? সে অন্ধ, কিন্তু যাহাকে অবলম্বন করিয়া আমি সংসারে সুখী হইতে চাহিতেছি—তাহাকে আবার প্রতারণা করিব? যে পারে, সে করুক। আমি যখন পারিয়াছি, তখন ইহার অপেক্ষাও গুরুতর দুষ্কার্য্য করিয়াছি—করিয়া ফলভোগ করিয়াছি—আর কেন? আমি লবঙ্গলতার কাছে বলিয়াছিলাম, সকল কথা রজনীকে বলিব, কিন্তু বলিতে মুখ ফুটে নাই। এখন বলিব।

যে দিন রজনী শচীন্দ্রকে দেখিয়া আসিয়াছিল, সেই দিন অপরাহ্নে আমি রজনীকে এই কথা বলিতে গেলাম। গিয়া দেখিলাম যে, রজনী একা বসিয়া কাঁদিতেছে। আমি তখন তাহাকে কিছু না বলিয়া রজনীর মাসীকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, রজনী কাঁদিতেছে কেন? তাহার মাসী বলিল যে, কি জানি? মিত্রদিগের বাড়ী হইতে আসিয়া অবধি রজনী কাঁদিতেছে। আমি স্বয়ং শচীন্দ্রের নিকট যাই নাই—আমার প্রতি শচীন্দ্র বিরক্ত, যদি আমাকে দেখিয়া তাহার পীড়াবৃদ্ধি হয়, এই আশঙ্কায় যাই নাই—সুতরাং সেখানে কি হইয়াছিল, তাহা জানিতাম না। রজনীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন কাঁদিতেছ?" রজনী চক্ষু মুছিয়া চুপ করিয়া রহিল।

আমি বড় কাতর হইলাম। বলিলাম, "দেখ রজনি! তোমার যাহা কিছু দুঃখ, তাহা জানিতে পারিলে আমি প্রাণপাত করিয়া তাহা নিবারণ করিব—তুমি কি দুঃখে কাঁদিতেছ, আমায় বলিবে না?"

রজনী আবার কাঁদিতে আরম্ভ করিল। বহুকষ্টে আবার রোদন সংবরণ করিয়া বলিল, "আপনি এত অনুগ্রহ করেন; কিন্তু আমি তাহার যোগ্য নহি।"

আমি। সে কি রজনি! আমি মনে জানি, আমিই তোমার যোগ্য নহি। আমি তোমাকে সেই কথাই বলিতে আসিয়াছি।

রজনী। আমি আপনার অনুগৃহীত দাসী আমাকে অমন কথা কেন বলেন?

আমি। শুন রজনি! আমি তোমা[কে] বিবাহ করিয়া ইহজন্ম সুখে কাটাইব, এই আমা[র] একান্ত ভরসা। এ আশা আমার ভগ্ন হইলে বু[ঝি] আমি মরিব, কিন্তু সে আশাতেও যে বিঘ্ন, তা[হা] তোমাকে বলিতে আসিয়াছি। শুনিয়া উ[ত্তর] দিও, না শুনিয়া উত্তর দিও না। প্রথম-যৌব[নে] এক দিন আমি রূপান্ধ হইয়া উন্মত্ত হইয়াছিলাম

জ্ঞান হারাইয়া চৌরের কাজ করিয়াছিলাম। অঙ্গে আজিও তাহার চিহ্ন আছে। সেই কথাই তোমাকে বলিতে আসিয়াছি।

তখন ধীরে, ধীরে, নিতান্ত ধৈর্য্যমাত্র সহায় করিয়া সেই অকথনীয় কথা রজনীকে বলিলাম। রজনী অন্ধ, তাই বলিতে পারিলাম, চক্ষে চক্ষে সন্দর্শন হইলে বলিতে পারিতাম না।

রজনী নীরব হইয়া রহিল। আমি তখন বলিলাম, "রজনি! রূপোন্মাদে উন্মত্ত হইয়া প্রথম যৌবনে এক দিন এই অজ্ঞানের কার্য্য করিয়াছিলাম। আর কখনও কোন অপরাধ করি নাই। চিরজীবন সেই একদিনের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছি। আমাকে কি তুমি গ্রহণ করিবে?"

রজনী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "আপনি যদি চিরকাল দস্যুবৃত্তি করিয়া থাকেন, আপনি যদি সহস্র ব্রহ্মহত্যা, গোহত্যা, স্ত্রীহত্যা করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও আপনি আমার কাছে দেবতা। আপনি আমাকে চরণে স্থান দিলেই আমি আপনার দাসী হইব। কিন্তু আমি আপনার যোগ্যা নহি। সেই কথাটি আপনার শুনিতে বাকী আছে।"

আমি। সে কি রজনি!

রজনী। আমার এই পাপ মন পরের কাছে বিক্রীত।

আমি চমকিয়া শিহরিয়া উঠিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, "সে কি রজনি!"

রজনী বলিল,—"আমি স্ত্রীলোক—আপনার কাছে ইহার অধিক আর কি প্রকারে বলিব? কিন্তু লবঙ্গ ঠাকুরাণী সকল জানেন। যদি আপনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, তবে সকল শুনিতে পাইবেন। বলিবেন, যে "আমি সকল কথা বলিতে বলিয়াছি।"

আমি তখনই মিত্রদিগের গৃহে গেলাম; যে প্রকারে লবঙ্গের সাক্ষাৎ পাইলাম, তাহা লিখিয়া ক্ষুদ্র বিষয়ে কালক্ষেপ করিব না। দেখিলাম, লবঙ্গলতা ধূল্যবলুণ্ঠিতা হইয়া শচীন্দ্রের জন্য কাঁদিতেছে। যাইবামাত্র লবঙ্গলতা আমার পা জড়াইয়া আরও কাঁদিতে লাগিল—বলিল, "ক্ষমা কর! তোমার উপর আমি এত অত্যাচার করিয়াছিলাম বলিয়া বিধাতা আমাকে দণ্ডিত করিতেছেন। আমার গর্ভজ পুত্রের অধিক প্রিয় পুত্র শচীন্দ্র বুঝি আমারই দোষে প্রাণ হারায়। আমি বিষ খাইয়া মরিব। আমি তোমার সম্মুখে বিষ খাইয়া মরিব।"

আমার বুক ভাঙ্গিয়া গেল। রজনী কাঁদিতেছে, লবঙ্গ কাঁদিতেছে! ইহারা স্ত্রীলোক, চক্ষের জল ফেলে, আমার চক্ষের জল পড়িতেছিল না—কিন্তু রজনীর কথায় আমার হৃদয়ের ভিতর হইতে রোদনধ্বনি উঠিতেছিল। লবঙ্গ কাঁদিতেছে, রজনী কাঁদিতেছে, আমি কাঁদিতেছি—আর শচীন্দ্রের এই দশা। কে বলে সংসার সুখের? সংসার অন্ধকার।

আপনার দুঃখ রাখিয়া আগে লবঙ্গের দুঃখের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। লবঙ্গ তখন কাঁদিতে কাঁদিতে শচীন্দ্রের পীড়ার বৃত্তান্ত সমুদয় বলিল। সন্ন্যাসীর বিদ্যাপরীক্ষা হইতে রুগ্নশয্যায় রজনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত লবঙ্গ সকল বলিল।

তার পর রজনীর কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। বলিলাম, "রজনী সকল কথা বলিতে বলিয়াছে, বল।"

লবঙ্গ তখন রজনীর কাছে যাহা যাহা শুনিয়াছিল, অকপটে সকল বলিল।

রজনী শচীন্দ্রের, শচীন্দ্র রজনীর, মাঝখানে আমি কে?

এবার বস্ত্রে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আমি ঘরে ফিরিয়া আসিলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এ ভবের হাট হইতে আমার দোকানপাট উঠাইতে হইল। আমার অদৃষ্টে সুখ বিধাতা লেখেন নাই—পরের সুখ কাড়িয়া লইব কেন? শচীন্দ্রের রজনী শচীন্দ্রকে দিয়া আমি এ সংসার ত্যাগ করিব। এ হাট ভাঙ্গিব, এ হৃদয়কে শাসিত করিব—যিনি সুখ-দুঃখের অতীত, তাঁহারই চরণে সকল সমর্পণ করিব।

প্রভো, তোমার অনেক সন্ধান করিয়াছি, কৈ তুমি? দর্শনে বিজ্ঞানে তুমি নাই। জ্ঞানীর জ্ঞানে —ধ্যানীর ধ্যানে তুমি নাই। তুমি অপ্রমেয়, এ জন্য তোমার পক্ষে প্রমাণ নাই। এই স্ফুটিতোন্মুখ হৃৎপদ্মেই তোমার প্রমাণ—ইহাতে তুমি আরোহণ কর। আমি অন্ধ পুষ্পনারীকে পরিত্যাগ করিয়া তোমার ছায়া সেখানে স্থাপন করি।

তুমি নাই? না থাক, তোমার নামে আমি সকল উৎসর্গ করিব। "অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং তস্মৈ নমঃ" বলিয়া এ কলঙ্কলাঞ্ছিত দেহ উৎসর্গ করিব। তুমি যাহা দিয়াছ, তুমি কি তাহা লইবে না? তুমি লইবে, নহিলে এ কলঙ্কের ভার আর কে পবিত্র করিবে?

প্রভো! আপনার কাছে একটা নিবেদন আছে। এ দেহ কলঙ্কিত করাইল কে, তুমি না আমি? আমি যে অসৎ, অসার, দোষ আমার না তোমার? আমার এ মণিহারীর দোকান সাজাইল কে, তুমি না আমি? যাহা তুমি সাজাইয়াছ, তাহা তোমাকেই দিব। আমি এ ব্যবসা আর রাখিব না।

সুখ! তোমাকে সর্ব্বত্র খুঁজিলাম—পাইলাম না। সুখ নাই—তবে আশায় কাজ কি? যে দেশে অগ্নি নাই, সে দেশে ইন্ধন আহরণ করিয়া কি হইবে? প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, সব বিসর্জ্জন দিব।

* * * *

আমি পরদিন শচীন্দ্রকে দেখিতে গেলাম। দেখিলাম, শচীন্দ্র অধিকতর স্থির—অপেক্ষাকৃত প্রফুল্ল। তাহার সঙ্গে অনেকক্ষণ কথোপকথন করিতে লাগিলাম। বুঝিলাম, আমার উপর যে বিরক্তি, শচীন্দ্রের মন হইতে তাহা যায় নাই।

পরদিন পুনরপি তাহাকে দেখিতে গেলাম। প্রত্যহ তাহাকে দেখিতে যাইতে লাগিলাম। শচীন্দ্রের দুর্ব্বলতা ও ক্লিষ্টভাব কমিল না, কিন্তু ক্রমে স্থৈর্য্য জন্মিতে লাগিল। প্রলাপ দূর হইল। ক্রমে শচীন্দ্র প্রকৃতিস্থ হইল

রজনীর কথা এক দিনও শচীন্দ্রের মুখে শুনি নাই। কিন্তু ইহা দেখিয়াছি যে, যে দিন হইতে রজনী আসিয়াছিল, সেই দিন হইতে তাঁহার পীড়া উপশম হইয়া আসিতেছিল।

এক দিন যখন আর কেহ শচীন্দ্রের কাছে ছিল না, তখন আমি ধীরে ধীরে বিনা আড়ম্বরে রজনীর কথা পাড়িলাম। ক্রমে তাহার অন্ধতার কথা পাড়িলাম। অন্ধের দুঃখের কথা বলিতে লাগিলাম, এই জগৎসংসার-শোভা-দর্শনে সে যে বঞ্চিত, —প্রিয়জন-দর্শন-সুখে সে যে আজন্ম-মৃত্যু পর্য্যন্ত বঞ্চিত, এই সকল কথা তাঁহার সাক্ষাতে বলিতে লাগিলাম। দেখিলাম, শচীন্দ্র মুখ ফিরাইলেন, তাঁহার চক্ষু জলপূর্ণ হইল।

অনুরাগ বটে?

তখন বলিলাম, "আপনি রজনীর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। আমি সেই জন্য একটি কথার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতে চাই। রজনী একে বিধাতাকর্ত্তৃক পীড়িতা, আবার আমা কর্ত্তৃক আরও গুরুতর পীড়িতা হইয়াছে।"

শচীন্দ্র আমার প্রতি বিকট কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন।

আমি বলিলাম, "আপনি যদি সমুদয় মনোযোগ পূর্ব্বক শুনেন, তবেই আমি বলিতে প্রবৃত্ত হই।"

শচীন্দ্র বলিলেন,—"বলুন।"

আমি বলিলাম, "আমি অত্যন্ত লোভী এবং স্বার্থপর। আমি তাহার চরিত্রে মোহিত হইয়া তাহাকে বিবাহ করিতে উদ্যোগী হইয়াছি। সে আমার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ ছিল, সেই জন্য আমার অভিপ্রায়ে সম্মত হইয়াছে।"

শচীন্দ্র বলিলেন, "মহাশয়, এ সকল কথা আমাকে বলিতেছেন কেন?"

আমি বলিলাম, "আমি ভাবিয়া দেখিলাম, আমি সন্ন্যাসী, আমি নানা দেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াই; অন্ধ রজনী কি প্রকারে আমার সঙ্গে দেশে দেশে বেড়াইবে? আমি এখন ভাবিতেছি, যদি অন্য কোন ভদ্রলোক তাহাকে বিবাহ করে, তবে সুখের হয়। আমি তাহাকে অন্য পাত্রস্থ করিতে চাই। যদি কেহ আপনার সন্ধানে থাকে, সেই জন্য আপনাকে এত কথা বলিতেছি।"

শচীন্দ্র একটু বেগের সহিত বলিলেন, "রজনীর পাত্রের অভাব নাই।" আমি বুঝিলাম, রজনীর বরপাত্র কে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পরদিন আবার মিত্রদিগের আলয়ে গিয়া দেখা দিলাম। লবঙ্গলতাকে বলিয়া পাঠাইলাম যে, আমি কলিকাতা ত্যাগ করিয়া যাইব, এক্ষণে সম্প্রতি প্রত্যাগমন করিব না—তিনি আমার শিষ্য, আমি তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিব।

লবঙ্গলতা আমার সহিত পুনশ্চ সাক্ষাৎ করিল, আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমি কালি যাহা শচীন্দ্রকে বলিয়া গিয়াছি, তাহা শুনিয়াছ কি?"

ল। শুনিয়াছি, তুমি অদ্বিতীয়। আমাকে ক্ষমা করিও, আমি তোমার গুণ জানিতাম না।

আমি নীরব হইয়া রহিলাম। তখন অবসর পাইয়া লবঙ্গলতা জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি আমার

সঙ্গে সাক্ষাতের ইচ্ছা করিয়াছ কেন? তুমি না কি কলিকাতা হইতে উঠিয়া যাইতেছ?"

আমি। যাইব।

ল। কেন?

আমি। যাইব না কেন? আমাকে যাইতে বারণ করিবার ত কেহ নাই।

ল। যদি আমি বারণ করি?

আমি। আমি তোমার কে যে বারণ করিবে?

ল। তুমি আমার কে? তা ত জানি না। এ পৃথিবীতে তুমি আমার কেহ নও। কিন্তু যদি লোকান্তর থাকে—

লবঙ্গলতা আর কিছুই বলিল না। আমি ক্ষণেক অপেক্ষা করিয়া বলিলাম, "যদি লোকান্তর থাকে, তবে?"

লবঙ্গলতা বলিল, "আমি স্ত্রীলোক—সহজে দুর্ব্বলা। আমার কত বল, দেখিয়া তোমার কি হইবে? আমি ইহাই বলিতে পারি, আমি তোমার পরম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী।"

আমি বড় বিচলিত হইলাম, বলিলাম, "আমি সে কথায় বিশ্বাস করি। কিন্তু একটি কথা আমি কখন বুঝিতে পারিলাম না। তুমি যদি আমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, তবে আমার গায়ে চিরদিনের জন্য এ কলঙ্ক লিখিয়া দিলে কেন? এ যে মুছিলে যায় না—কখন মুছিলে যাইবে না।"

লবঙ্গ অধোবদনে রহিল। ক্ষণেক ভাবিল। বলিল, "তুমি কুকাজ করিয়াছিলে, আমিও বালিকা-বুদ্ধিতেই কুকাজ করিয়াছিলাম। যাহার যে দণ্ড, বিধাতা তাহার বিচার করিবেন, আমি বিচারের কে? এখন সে অনুতাপ আমার—কিন্তু সে সকল কথা না বলাই ভাল। তুমি আমার সে অপরাধ ক্ষমা করিবে?"

আমি। তুমি না বলিতেই আমি ক্ষমা করিয়াছি। ক্ষমাই বা কি? উচিত দণ্ড করিয়াছিলে—তোমার অপরাধ নাই। আমি আর আসিব না—আর কখন তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে না। কিন্তু যদি কখনও ইহার পরে শোন যে, অমরনাথ কুচরিত্র নহে, তবে তুমি আমার প্রতি একটু—অণুমাত্র—স্নেহ করিবে?

ল। তোমাকে স্নেহ করিলে আমি অধর্ম্মে পতিত হইব।

আমি। না, আমি সে স্নেহের ভিখারী আর নহি। তোমার এই সমুদ্রতুল্য হৃদয়ে কি আমার জন্য এতটুকু স্থান নাই?

ল। না,—যে আমার স্বামী না হইয়া একবার আমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হইয়াছিল, স্বয়ং তিনি মহাদেব হইলেও তাহার জন্য আমার হৃদয়ে এতটুকু স্থান নাই। লোকে পাখী পুষিলে যে স্নেহ করে, ইহলোকে তোমার প্রতি আমার সে স্নেহও কখন হইবে না।

আবার "ইহলোকে।" যাক্—আমি লবঙ্গের কথা বুঝিলাম কি না, বলিতে পারি না, কিন্তু লবঙ্গ আমার কথা বুঝিল না, কিন্তু দেখিলাম, লবঙ্গ ঈষৎ কাঁদিতেছে।

আমি বলিলাম, 'আমার যাহা বলিবার অবশিষ্ট আছে, তাহা বলিয়া যাই। আমার কিছু ভূ-সম্পত্তি আছে, আমার তাহাতে প্রয়োজন নাই। তাহা আমি দান করিয়া যাইতেছি।"

ল। কাহাকে?

আমি। যে রজনীকে বিবাহ করিবে, তাহাকে।

ল। তোমার সমুদয় স্থাবর সম্পত্তি?

আমি। হাঁ, তুমি এই দানপত্র এক্ষণে তোমার কাছে অতি গোপনে রাখিবে। যত দিন না রজনীর বিবাহ হয়, তত দিন ইহার কথা প্রকাশ করিও না। বিবাহ হইয়া গেলে রজনীর স্বামীকে দানপত্র দিও।

এই কথা বলিয়া ললিতলবঙ্গলতার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া, দানপত্র আমি তাহার নিকট ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেলাম। আমি সকল বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া আসিয়াছিলাম—আমি আর বাড়ী গেলাম না। একেবারে ষ্টেশনে গিয়া বাষ্পীয় শকটারোহণে কাশ্মীরযাত্রা করিলাম।

দোকানপাট উঠিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ইহার দুই বৎসর পরে, একদা ভ্রমণ করিতে করিতে আমি ভবানীনগর গেলাম। শুনিলাম যে, মিত্রবংশীয় কেহ তথায় বাস করিতেছেন। কৌতূহল প্রবৃত্ত আমি দেখিতে গেলাম। দ্বারদেশে শচীন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ হইল।

শচীন্দ্র আমাকে চিনিতে পারিয়া নমস্কার আলিঙ্গন পূর্ব্বক আমার হস্ত ধারণ করিয়া লইয়া উত্তমাসনে বসাইলেন। অনেকক্ষণ তাঁহার সঙ্গে নানাবিধ কথোপকথন হইল। তাঁহার নিকট শুনিলাম যে, তিনি রজনীকে বিবাহ করিয়াছেন। কিন্তু রজনী ফুলওয়ালী ছিল, পাছে কলিকাতার ইহাতে লোকে ঘৃণা করে, এই ভাবিয়া, তিনি

কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া ভবানীনগরে বাস করিতেছেন। তাঁহার পিতা ও ভ্রাতা কলিকাতাতেই বাস করিতেছেন।

আমার নিজ সম্পত্ত প্রতিগ্রহণ করিবার জন্য শচীন্দ্র আমাকে বিস্তর অনুরোধ করিলেন। কিন্তু বলা বাহুল্য যে, আমি তাহাতে স্বীকৃত হইলাম না,. শেষে শচীন্দ্র রজনীর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আমাকে অনুরোধ করিলেন। আমারও সে ইচ্ছা ছিল। শচীন্দ্র আমাকে অন্তঃপুরে রজনীর নিকট লইয়া গেলেন।

রজনীর নিকটে গেলে, সে আমাকে প্রণাম পূর্ব্বক পদধূলি গ্রহণ করিল। আমি দেখিলাম যে, ধূলি গ্রহণ কালে পাদস্পর্শ জন্য অন্ধগণের স্বাভাবিক নিয়মানুযায়ী সে ইতস্ততঃ হস্তসঞ্চালন করিল না, একেবারেই আমার পাদস্পর্শ করিল। কিছু বিস্মিত হইলাম।

সে আমাকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু মুখ অবনত করিয়া রহিল। আমার বিস্ময় বাড়িল। অন্ধদিগের লজ্জা চক্ষুগত নহে। চক্ষে চক্ষে মিলনজনিত যে লজ্জা, তাহা তাহাদিগের ঘটিতে পারে না বলিয়া তাহারা দৃষ্টি লুকাইবার জন্য মুখ নত করে না। একটা কি কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, রজনী মুখ তুলিয়া আবার নত করিল, দেখিলাম—নিশ্চিত দেখিলাম, সে চক্ষে কটাক্ষ।

জন্মান্ধ রজনী কি এখন তবে দেখিতে পায়? আমি শচীন্দ্রকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিলাম, এমত সময় শচীন্দ্র আমাকে বসিবার আসন দিবার জন্য রজনীকে আজ্ঞা করিলেন। রজনী একখানা কার্পেট লইয়া পাতিতেছিল—যেখানে পাতিতেছিল, সেখানে অল্প এক বিন্দু জল পড়িয়াছিল, রজনী আসন রাখিয়া, অগ্রে অঞ্চলের দ্বারা জল মুছিয়া লইয়া আসন পাতিল। আমি বিলক্ষণ দেখিয়াছিলাম যে, রজনী সেই জল স্পর্শ না করিয়াই আসন পাতা বন্ধ করিয়া জল মুছিয়া লইয়াছিল। অতএব স্পর্শের দ্বারা তখন সে জানিতে পারে নাই যে, সেখানে জল আছে, তখন অবশ্য সে জল দেখিতে পাইয়াছিল।

আমি আর থাকিতে পারিলাম না, জিজ্ঞাসা করিলাম, "রজনি, এখন তুমি কি দেখিতে পাও?"

রজনী মুখ নত করিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "হাঁ।"

আমি বিস্মিত হইয়া শচীন্দ্রের মুখপানে চাহিলাম। শচীন্দ্র বলিলেন, "আশ্চর্য্য বটে, কিন্তু ঈশ্বর-কৃপায় না হইতে পারে, এমন কি আছে? আমাদিগের ভারতবর্ষে চিকিৎসা সম্বন্ধে কতকগুলি অতি আশ্চর্য্য প্রকরণ ছিল,—সে সকল তত্ত্ব ইউরোপীয়েরা বহুকাল পরিশ্রম করিলেও আবিষ্কৃত করিতে পারিবেন না। চিকিৎসাবিদ্যা কেন, সকল বিদ্যাতেই এইরূপ। কিন্তু সে সকল এক্ষণে লোপ পাইয়াছে, কেবল দুই এক জন সন্ন্যাসী, উদাসীন প্রভৃতির কাছে সে সকল লুপ্ত বিদ্যার কিয়দংশ অতি গুহ্যভাবে অবস্থিতি করিতেছে। আমাদিগের বাড়ীতে একজন সন্ন্যাসী কখন কখন যাতায়াত করিয়া থাকেন, তিনি আমাকে ভালবাসিতেন। তিনি যখন শুনিলেন, আমি রজনীকে বিবাহ করিব, তখন বলিলেন, 'শুভদৃষ্টি হইবে কি প্রকারে? কন্যা যে অন্ধ?' আমি রহস্য করিয়া বলিলাম, 'আপনি অন্ধত্ব আরোগ্য করুন।' তিনি বলিলেন, 'করিব—এক মাসে'। ঔষধ দিয়া তিনি এক মাসে রজনীর চক্ষে দৃষ্টির সৃজন করিলেন।"

আমি আরও বিস্মিত হইলাম, বলিলাম, "না দেখিলে আমি ইহা বিশ্বাস করিতাম না। ইউরোপীয় চিকিৎসাশাস্ত্রানুসারে ইহা অসাধ্য।"

এই কথা হইতেছিল, এমত সময়ে এক বৎসরের একটি শিশু টলিতে টলিতে, চলিতে চলিতে, পড়িতে পড়িতে, উঠিতে উঠিতে, সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। শিশু আসিয়া রজনীর পায়ের কাছে দুই একটা আছাড় খাইয়া, তাহার বস্ত্রের একাংশ ধৃত করিয়া, টানাটানি করিয়া উঠিয়া, রজনীর হাঁটু ধরিয়া তাহার মুখপানে চাহিয়া উচ্চ হাসি হাসিয়া উঠিল। তাহার পরে ক্ষণেক আমার মুখপানে চাহিয়া হস্ত উত্তোলন করিয়া আমাকে বলিল, "দা!" (যা!)

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে এটি?"

শচীন্দ্র বলিলেন, "আমার ছেলে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "ইহার নাম কি রাখিয়াছেন?"

শচীন্দ্র বলিলেন, "[illegible]।"

আমি আর সেখা[illegible] না।

সম্পূর্ণ

গ্রন্থাবলী-সিরিজ

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য গ্রন্থাবলী

(প্রথম ভাগ)

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত

রীজ-সংস্করণ

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী-বৈদ্যুতিক-রোটারী-মেসিনে"
শ্রীশশিভূষণ দত্ত মুদ্রিত

[মূল্য ২, দুই টাকা

১। কৃষ্ণচরিত্র

২। লোকরহস্য

৩। বিবিধ-প্রবন্ধ (১ম)

কৃষ্ণচরিত্র

[তৃতীয় সংস্করণ হইতে মুদ্রিত]

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রথমবারের বিজ্ঞাপন

ধর্ম্মসম্বন্ধে আমার যাহা বলিবার আছে, তাহার সমস্ত আনুপূর্ব্বিক সাধারণকে বুঝাইতে পারি, এমন সম্ভাবনা অল্পই। কেন না, কথা অনেক, সময় অল্প। সেই সকল কথার মধ্যে তিনটি কথা, আমি তিনটি প্রবন্ধে বুঝাইতে প্রবৃত্ত আছি। ঐ প্রবন্ধ তিনটি দুইখানি সাময়িক পত্রে ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হইতেছে।

উক্ত তিনটি প্রবন্ধের একটি অনুশীলনধর্ম্মবিষয়ক; দ্বিতীয়টি দেবতত্ত্ব-বিষয়ক; তৃতীয়টি কৃষ্ণচরিত্র। প্রথম প্রবন্ধ "নবজীবনে" প্রকাশিত হইতেছে; দ্বিতীয় ও তৃতীয় "প্রচার" নামক পত্রে প্রকাশিত হইতেছে। প্রায় দুই বৎসর হইল, এই প্রবন্ধগুলি প্রকাশ আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু ইহার মধ্যে একটিও আজি পর্য্যন্ত সমাপ্ত করিতে পারি নাই। সমাপ্তি দূরে থাকুক, কোনটিও অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। তাহার অনেকগুলি কারণ আছে। একে বিষয়গুলি অতি মহৎ, অতি বিস্তারিত সমালোচনা ভিন্ন তন্মধ্যে কোন বিষয়েরই মীমাংসা হইতে পারে না; তাহাতে আবার দাসত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ লেখকের সময়ও অতি অল্প; এবং পরিশ্রম করিবার শক্তিও মনুষ্যের চিরকাল সমান থাকে না।

এই সকল কারণের প্রতি মনোযোগ করিয়া, এবং মনুষ্যের পরমায়ুর সাধারণ পরিমাণ ও আপনার বয়স বিবেচনা করিয়া আমি, আমার বক্তব্য কথা সকলগুলি বলিবার সময় পাইব, এমন আশা পরিত্যাগ করিয়াছি। যে দেবমন্দির গঠন করিবার উচ্চাভিলাষকে মনে স্থান দিয়া দুই একখানি করিয়া ইষ্টক সংগ্রহ করিতেছি, তাহা সমাপ্ত করিতে পারিব, এমন আশা আর রাখি না। যে তিনটি প্রবন্ধ আরম্ভ করিয়াছি, তাহাও সমাপ্ত করিতে পারিব কি না, জগদীশ্বর জানেন। সকলগুলি সম্পূর্ণ হইলে তাহা পুনর্মুদ্রিত করিব, এ আশায় বসিয়া থাকিতে গেলে, হয় ত সময়ে কোন প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রিত হইবে না। কেন না, সকল কাজেরই সময় অসময় আছে। এই জন্য কৃষ্ণচরিত্রের প্রথম খণ্ড এক্ষণে পুনর্মুদ্রিত করা গেল। বোধ করি, এইরূপ পাঁচ ছয় খণ্ডে গ্রন্থ সমাপ্ত হইতে পারে। কিন্তু সকলই সময় ও শক্তি এবং ঈশ্বরানুগ্রহের উপর নির্ভর করে।

আগে অনুশীলন-ধর্ম্ম পুনর্মুদ্রিত হইয়া তৎপরে কৃষ্ণচরিত্র পুনর্মুদ্রিত হইলেই ভাল হইত। কেন না, "অনুশীলন-ধর্ম্মে" যাহা তত্ত্ব মাত্র, কৃষ্ণচরিত্রে তাহা দেহবিশিষ্ট। অনুশীলনে যে আদর্শে উপস্থিত হইতে হয়, কৃষ্ণচরিত্র কর্ম্মক্ষেত্রস্থ সেই আদর্শ। আগে তত্ত্ব বুঝাইয়া তার পর উদাহরণ দ্বারা তাহা স্পষ্টীকৃত করিতে হয়। কৃষ্ণচরিত্র সেই উদাহরণ। কিন্তু অনুশীলন-ধর্ম্ম সম্পূর্ণ না করিয়া পুনর্মুদ্রিত করিতে পারিলাম না। সম্পূর্ণ হইবারও বিলম্ব আছে।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপন

কৃষ্ণচরিত্রের প্রথম সংস্করণে কেবল মহাভারতীয় কৃষ্ণকথা সমালোচিত হইয়াছিল। তাহাও অল্পাংশ-মাত্র। এবার মহাভারতে কৃষ্ণসম্বন্ধীয় প্রয়োজনীয় কথা যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহা সমস্তই সমালোচিত হইয়াছে। তা ছাড়া, হরিবংশে ও পুরাণে যাহা সমালোচনার যোগ্য পাওয়া যায়, তাহাও বিচারিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া, উপক্রমণিকাভাগ পুনর্লিখিত এবং বিশেষরূপে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। ইহা আমার অভিপ্রেত সম্পূর্ণ গ্রন্থ। প্রথম সংস্করণে যাহা ছিল, তাহা এই দ্বিতীয় সংস্করণের অল্পাংশ মাত্র। অধিকাংশই নূতন।

আমি বলিতে বাধ্য যে, প্রথম সংস্করণে যে সকল মত প্রকাশ করিয়াছিলাম, এখন তাহার কিছু কিছু পরিত্যাগ এবং কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত করিয়াছি। কৃষ্ণের বাল্যলীলা সম্বন্ধে বিশিষ্টরূপে এই কথা আমার বক্তব্য। এরূপ মতপরিবর্ত্তন স্বীকার করিতে আমি লজ্জা করি না। আমার জীবনে আমি অনেক বিষয়ে মতপরিবর্ত্তন করিয়াছি—কে না করে? কৃষ্ণবিষয়েই আমার মতপরিবর্ত্তনের বিচিত্র উদাহরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বঙ্গদর্শনে যে কৃষ্ণচরিত্র লিখিয়াছিলাম, আর এখন যাহা লিখিলাম, আলোক অন্ধকারে যতদূর প্রভেদ এতদুভয়ে ততদূর প্রভেদ। মতপরিবর্ত্তন, বয়োবৃদ্ধি, অনুসন্ধানের বিস্তার, এবং ভাবনার ফল। যাঁহার কখন মত পরিবর্ত্তিত হয় না, তিনি হয় অভ্রান্ত দৈবজ্ঞানবিশিষ্ট, নয় বুদ্ধিহীন এবং জ্ঞানহীন। যাহা আর সকলের ঘটিয়া থাকে, তাহা স্বীকার করিতে আমি লজ্জাবোধ করিলাম না।

এ গ্রন্থে ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের মত অনেক স্থলেই অগ্রাহ্য করিয়াছি, কিন্তু তাঁহাদের নিকট সন্ধান ও সাহায্য না পাইয়াছি এমত নহে। Wilson Goldstucker, Weber, Muir—ইঁহাদিগের নিকট আমি ঋণ স্বীকার করিতে বাধ্য। দেশী লেখকদিগের মধ্যে আমাদের দেশের মুখোজ্জ্বলকারী শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত, C. I. E, শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সামশ্রমী, এবং মৃত মহাত্মা অক্ষয় কুমার দত্তের নিকট আমি বাধ্য। অক্ষয় বাবু উত্তম সংগ্রহকার। সর্ব্বাপেক্ষা আমার ঋণ মৃত মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের নিকট গুরুতর। যেখানে মহাভারত হইতে উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন হইয়াছে, আমি তাঁহার অনুবাদ উদ্ধৃত করিয়াছি। প্রয়োজনমতে মূলের সঙ্গে অনুবাদ মিলাইয়াছি। যে দুই এক স্থানে মারাত্মক ভ্রম আছে বুঝিয়াছি, সেখানে নোট করিয়া দিয়াছি। প্রয়োজনানুসারে স্থানবিশেষ ভিন্ন গ্রন্থের কলেবরবৃদ্ধি ভয়ে মহাভারতের মূল সংস্কৃত উদ্ধৃত করি নাই। হরিবংশ ও পুরাণ হইতে যাহা উদ্ধৃত করিয়াছি, মূল উদ্ধৃত করিয়াছি। এবং তাহার অনুবাদের দায় দোষ আমার নিজের।

পরিশেষে বক্তব্য, কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব প্রতিপন্ন করা এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে। তাঁহার মানবচরিত্র সমালোচন করাই আমার উদ্দেশ্য। আমি নিজে তাঁহার ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস করি;—সে বিশ্বাসও আমি লুকাই নাই। কিন্তু পাঠককে সেই মতাবলম্বী করিবার জন্য কোন যত্ন পাই নাই।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

কৃষ্ণচরিত্র

প্রথম খণ্ড

উপক্রমণিকা

"মহতস্তমসঃ পারে পুরুষং হ্যতিতেজসম্‌।
যং জ্ঞাত্বা মৃত্যুমত্যেতি তস্মৈ জ্ঞেয়াত্মনে নমঃ॥"
মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ৪৭ অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ

গ্রন্থের উদ্দেশ্য

ভারতবর্ষের অধিকাংশ হিন্দুর, বাঙ্গালা দেশের সকল হিন্দুর বিশ্বাস যে, শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরের অবতার। 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্'—ইহা তাঁহাদের দৃঢ়বিশ্বাস। বাঙ্গালা প্রদেশে কৃষ্ণের উপাসনা প্রায় সর্ব্বব্যাপক। গ্রামে গ্রামে কৃষ্ণের মন্দির, গৃহে গৃহে কৃষ্ণের পূজা, প্রায় মাসে মাসে কৃষ্ণোৎসব, উৎসবে উৎসবে কৃষ্ণযাত্রা, কণ্ঠে কণ্ঠে কৃষ্ণগীতি, সকল মুখে কৃষ্ণনাম। কাহারও গায়ে দিবার বস্ত্রে কৃষ্ণনামাবলি, কাহারও গায়ে কৃষ্ণনামের ছাপ। কেহ কৃষ্ণনাম না করিয়া কোথাও যাত্রা করেন না; কেহ কৃষ্ণনাম না লিখিয়া কোন পত্র বা কোন লেখাপড়া করেন না; ভিখারী "জয় রাধে কৃষ্ণ" না বলিয়া ভিক্ষা চায় না। কোন ঘৃণার কথা শুনিলে "রাধে কৃষ্ণ!" বলিয়া আমরা ঘৃণা প্রকাশ করি; বনের পাখী পুষিলে তাহাকে "রাধেকৃষ্ণ" নাম শিখাই। কৃষ্ণ এ দেশে সর্ব্বব্যাপক।

"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।" যদি তাহাই বাঙ্গালীর বিশ্বাস, তবে সর্ব্বসময়ে কৃষ্ণারাধনা, কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণকথা ধর্ম্মেরই উন্নতিসাধক। সকল সময়ে ঈশ্বরকে স্মরণ করার অপেক্ষা মনুষ্যের মঙ্গল আর কি আছে? কিন্তু ইঁহারা ভগবান্‌কে কিরূপ ভাবেন? ভাবেন, ইনি বাল্যে চোর—ননী-মাখন চুরি করিয়া খাইতেন; কৈশোরে পারদারিক—অসংখ্য গোপনারীকে পাতিব্রত্যধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট করিয়াছিলেন; পরিণতবয়সে বঞ্চক ও শঠ—বঞ্চনার দ্বারা দ্রোণাদির প্রাণহরণ করিয়াছিলেন। ভগবচ্চরিত্র কি এইরূপ? যিনি কেবল শুদ্ধসত্ত্ব, যাঁহা হইতে সর্ব্বপ্রকার শুদ্ধি, যাঁহার নামে অশুদ্ধি—অপুণ্য দূর হয়, মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া সমস্ত পাপাচরণ কি সেই ভগবচ্চরিত্রসঙ্গত?

ভগবচ্চরিত্রের এইরূপ কল্পনায় ভারতবর্ষের পাপস্রোত বৃদ্ধি পাইয়াছে, সনাতনধর্ম্মদ্বেষিগণ বলিয়া থাকেন। এবং সে কথার প্রতিবাদ করিয়া জয়শ্রী লাভ করিতেও কখনও কাহাকে দেখি নাই। আমি নিজেও কৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া দৃঢ়বিশ্বাস করি; পাশ্চাত্য শিক্ষার পরিণাম আমার এই হইয়াছে যে, আমার সে বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইয়াছে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যথার্থ কিরূপ চরিত্র পুরাণেতিহাসে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা জানিবার জন্য আমার যতদূর সাধ্য, আমি পুরাণ-ইতিহাসের আলোচনা করিয়াছি। তাহার ফল এই পাইয়াছি যে, কৃষ্ণসম্বন্ধীয় যে সকল পাপোপাখ্যান জনসমাজে প্রচলিত আছে, তাহা সকলই অমূলক বলিয়া জানিতে পারিয়াছি এবং উপন্যাসকারকৃত কৃষ্ণসম্বন্ধীয় উপন্যাসসকল বাদ দিলে যাহা বাকী থাকে, তাহা অতি বিশুদ্ধ, পরম পবিত্র, অতিশয় মহৎ ইহাও জানিতে পারিয়াছি। জানিয়াছি, ঈদৃশ সর্ব্বগুণান্বিত, সর্ব্বপাপসংস্পর্শশূন্য, আদর্শচরিত্র আর কোথাও নাই। কোন দেশীয় ইতিহাসেও না, কোন দেশীয় কাব্যেও না।

কি প্রকারে বিচারে আমি এরূপ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছি, তাহা বুঝান এই গ্রন্থের একটি উদ্দেশ্য। কিন্তু সে কথা ছাড়িয়া দিলেও এই গ্রন্থের বিশেষ প্রয়োজন আছে। আমার নিজের যাহা বিশ্বাস, পাঠককে তাহা গ্রহণ করিতে বলি না এবং কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব-সংস্থাপন করাও আমার উদ্দেশ্য নহে। এ গ্রন্থে আমি তাঁহার কেবল মানবচরিত্রেরই সমালোচনা করিব। তবে এখন হিন্দুধর্ম্মের আন্দোলন কিছু প্রবলতা লাভ করিয়াছে। ধর্ম্মান্দোলনের প্রবলতার

এই সময়ে কৃষ্ণচরিত্রের সবিস্তার সমালোচনা প্রয়োজনীয়। যদি পুরাতন বজায় রাখিতে হয়, তবে এখানে বজায় রাখিবার কি আছে না আছে, তাহা দেখিয়া লইতে হয়। আর যদি পুরাতন উঠাইতে হয়, তাহা হইলে কৃষ্ণচরিত্রের সমালোচনা চাই; কেন না, কৃষ্ণকে না উঠাইয়া দিলে পুরাতন উঠান যাইবে না।

ইহা ভিন্ন আমার অন্য এক গুরুতর উদ্দেশ্য আছে। ইতিপূর্ব্বে * "ধর্ম্মতত্ত্ব" নামে গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছি। তাহাতে আমি যে কয়টি কথা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি, সংক্ষেপে তাহা এই :—

"১। মনুষ্যের কতকগুলি শক্তি আছে। আমি তাহার 'বৃত্তি' নাম দিয়াছি। সেইগুলির অনুশীলন, প্রস্ফুরণ ও চরিতার্থতায় মনুষ্যত্ব।

২। তাহাই মনুষ্যের ধর্ম্ম।

৩। সেই অনুশীলনের সীমা, পরস্পরের সহিত বৃত্তিগুলির সামঞ্জস্য।

৪। তাহাই সুখ।"

এক্ষণে আমি স্বীকার করি যে, সমস্ত বৃত্তিগুলির সম্পূর্ণ অনুশীলন, প্রস্ফুরণ, চরিতার্থতা ও সামঞ্জস্য একাধারে দুর্লভ। এ সম্বন্ধে ঐ গ্রন্থেই যাহা বলিয়াছি, তাহাও উদ্ধৃত করিতেছি :—

"শিষ্য। ...জ্ঞানে পাণ্ডিত্য, বিচারে দক্ষতা, কার্য্যে তৎপরতা, চিত্তে ধর্ম্মাত্মতা এবং সুরসে রসিকতা, এই সকল হইলে, তবে মানসিক সর্ব্বাঙ্গীন পরিণতি হইবে। আবার তাহার উপর শারীরিক পরিণতি আছে, অর্থাৎ শরীর বলিষ্ঠ, সুস্থ এবং সর্ব্ববিধ সর্ব্বাঙ্গীণ শারীরিক ক্রিয়ায় সুদক্ষ হওয়া চাই।

* * * * *

এরূপ আদর্শ কোথায় পাইব? এরূপ মনুষ্য ত দেখি না।

গুরু। মনুষ্য না দেখ, ঈশ্বর আছেন। ঈশ্বরই সর্ব্বাঙ্গীন স্ফূর্ত্তির ও চরম পরিণতির একমাত্র উদাহরণ।

পুনশ্চ :—

"অনন্ত-প্রকৃতি ঈশ্বর উপাসকের প্রথমাবস্থায় তাহার আদর্শ হইতে পারেন না, ইহা সত্য, কিন্তু ঈশ্বরের অনুকারী মনুষ্যেরা, অর্থাৎ যাঁহাদিগের গুণাধিক্য দেখিয়া ঈশ্বরাংশ বিবেচনা করা যায়, অথবা যাঁহাদিগকে মানবদেহধারী ঈশ্বর মনে করা যায়, তাঁহারাই সেখানে বাঞ্ছনীয় আদর্শ হইতে পারেন। এই জন্য যীশুখ্রীষ্ট খ্রীষ্টিয়ানের আদর্শ, শাক্যসিংহ বৌদ্ধের আদর্শ। কিন্তু এরূপ ধর্ম্মপরিবর্দ্ধক আদর্শ যেরূপ হিন্দুশাস্ত্রে আছে, এমন আর পৃথিবীর কোন ধর্ম্মপুস্তকে নাই—কোন জাতির মধ্যে প্রসিদ্ধ নাই। জনকাদি রাজর্ষি, নারদাদি দেবর্ষি, বশিষ্ঠাদি ব্রহ্মর্ষি সকলেই অনুশীলনের চরমাদর্শ। তাহার উপর রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন, লক্ষ্মণ, দেবব্রত, ভীষ্ম প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ আরও সম্পূর্ণতাপ্রাপ্ত আদর্শ। খ্রীষ্ট ও শাক্যসিংহ কেবল উদাসীন কৌপীনধারী নির্ম্মম ধর্ম্মবেত্তা। কিন্তু ইঁহারা তা নয়। ইঁহারা সর্ব্বগুণবিশিষ্ট—ইঁহাদিগেতেই সর্ব্ববৃত্তি সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে। ইঁহারা সিংহাসনে বসিয়াও উদাসীন; কার্ম্মুক-হস্তেও ধর্ম্মবেত্তা; রাজা হইয়াও পণ্ডিত; শক্তিমান্ হইয়াও সর্ব্বজনে প্রেমময়। কিন্তু এই সকল আদর্শের উপর হিন্দুর আর এক আদর্শ আছে, যাঁহার কাছে আর সকল আদর্শ খাটো হইয়া যায়—যুধিষ্ঠির যাঁহার কাছে ধর্ম্মশিক্ষা করেন, স্বয়ং অর্জ্জুন যাঁহার শিষ্য, রাম-লক্ষ্মণ যাঁহার অংশমাত্র, যাঁহার তুল্য মহামহিমাময় চরিত্র কখনও মনুষ্যভাষায় কীর্ত্তিত হয় নাই।"

এই তত্ত্বটা প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করিবার জন্যও আমি শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের ব্যখ্যানে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র কিরূপ ছিল, তাহা জানিবার উপায় কি

আদৌ এখানে দুইটি গুরুতর আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে। যাঁহারা দৃঢ়বিশ্বাস করেন যে, কৃষ্ণ ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের কথা এখন ছাড়িয়া দিই। আমার সকল পাঠক সেরূপ বিশ্বাসযুক্ত নহেন। যাঁহারা সেরূপ বিশ্বাসযুক্ত নহেন, তাঁহারা বলিবেন, কৃষ্ণচরিত্রের মৌলিকতা কি? কৃষ্ণ নামে কোন ব্যক্তি পৃথিবীতে কখনও বিদ্যমান ছিলেন, তাহার প্রমাণ কি? যদি ছিলেন, তবে তাঁহার চরিত্র যথার্থ কি প্রকার ছিল, তাহা জানিবার কোন উপায় আছে কি?

আমরা প্রথমে এই দুই সন্দেহের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইব। কৃষ্ণের বৃত্তান্ত নিম্নলিখিত প্রাচীন গ্রন্থগুলিতে পাওয়া যায়।

(১) মহাভারত।

(২) হরিবংশ।

(৩) পুরাণ।

ইহার মধ্যে পুরাণ আঠারখানি; সকলগুলিতে কৃষ্ণবৃত্তান্ত নাই। নিম্নলিখিতগুলিতে আছে।

---

* ধর্ম্মতত্ত্ব, কৃষ্ণচরিত্রের প্রথম সংস্করণের পরে এবং এই সংস্করণের পূর্ব্বে প্রচারিত হইয়াছিল।

(১) ব্রহ্মপুরাণ।
(২) পদ্মপুরাণ।
(৩) বিষ্ণুপুরাণ।
(৪) বায়ুপুরাণ।
(৫) শ্রীমদ্ভাগবত।
(১০) ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।
(১৩) স্কন্দপুরাণ।
(১৪) বামনপুরাণ।
(১৫) কূর্ম্মপুরাণ।

মহাভারত আর উপরিলিখিত অন্য গ্রন্থগুলির মধ্যে কৃষ্ণজীবনী সম্বন্ধে একটি বিশেষ প্রভেদ আছে। যাহা মহাভারতে আছে, তাহা হরিবংশে ও পুরাণগুলিতে নাই। যাহা হরিবংশে ও পুরাণে আছে, তাহা মহাভারতে নাই। ইহার একটি কারণ এই যে, মহাভারত পাণ্ডবদিগের ইতিহাস। কৃষ্ণ পাণ্ডবদিগের সখা ও সহায়; তিনি পাণ্ডবদিগের সহায় হইয়া বা তাঁহাদের সঙ্গে থাকিয়া যে সকল কার্য্য করিয়াছেন, তাহাই মহাভারতে আছে ও থাকিবার কথা। প্রসঙ্গক্রমে অন্য দুই একটা কথা আছে মাত্র। তাঁহার জীবনের অবশিষ্টাংশ মহাভারতে নাই বলিয়াই হরিবংশ রচিত হইয়াছিল, ইহা হরিবংশে আছে। ভাগবতেও ঐরূপ কথা আছে। ব্যাস নারদকে মহাভারতের অসম্পূর্ণতা জানাইলেন। নারদ ব্যাসকে কৃষ্ণচরিত্র রচনার উপদেশ দিলেন। অতএব মহাভারতে যাহা আছে, এই ভাগবতে বা হরিবংশে বা অন্য পুরাণে তাহা নাই; মহাভারতে যাহা নাই—পরিত্যক্ত হইয়াছে, তাহাই আছে।

অতএব মহাভারত সর্ব্বপূর্ব্ববর্ত্তী। হরিবংশাদি ইহার অভাব-পূরণার্থ মাত্র। যাহা সর্ব্বাগ্রে রচিত হইয়াছিল, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা মৌলিক, ইহাই সম্ভব। কথিত আছে যে, মহাভারত, হরিবংশ এবং অষ্টাদশ পুরাণ একই ব্যক্তির রচিত। সকলই মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত। এ কথা সত্য কি না, তাহার বিচার এক্ষণে প্রয়োজন নাই। আগে দেখা যাউক, মহাভারতের কোন ঐতিহাসিকতা আছে কি না। যদি তাহা না থাকে, তবে হরিবংশে ও পুরাণে কোন ঐতিহাসিক তত্ত্বের অনুসন্ধান বৃথা।

এক্ষণে যে বিচারে প্রবৃত্ত হইব, তাহাতে দুই দিকে দুই ঘোর বিপদ। এক দিকে এ দেশীয় প্রাচীন সংস্কার যে, সংস্কৃতভাষায় যে কিছু রচনা আছে, যে কিছুতে অনুস্বার আছে, সকলই অভ্রান্ত-ঋষি-প্রণীত; সকলই প্রতিবাদ বা সন্দেহের অতীত যে সত্য, তাহাই আমাদিগের কাছে আনিয়া উপস্থিত করে। বেদবিভাগ, লক্ষশ্লোকাত্মক মহাভারত, হরিবংশ, অষ্টাদশ পুরাণ, সকল একজনে করিয়াছেন, সকলই কলিযুগের আরম্ভে হইয়াছে; সেও পাঁচ হাজার বৎসর হইল; আর এই সকল বেদব্যাস যেমন করিয়াছিলেন, ঠিক তেমনই আছে। অনেক লোকে, ঐ সংস্কারের প্রতিবাদ শুনা দূরে যাউক, যে প্রতিবাদ করিবে, তাহাকে মহাপাতকী, নারকী এবং দেশের সর্ব্বনাশে প্রবৃত্ত মনে করেন।

এই এক দিকের বিপদ। আর দিকে গুরুতর বিপদ, বিলাতী পাণ্ডিত্য। ইউরোপ ও আমেরিকায় কতকগুলি পণ্ডিত সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছেন। তাঁহারা প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে ঐতিহাসিক তত্ত্ব উদ্ধৃত করিতে নিযুক্ত, কিন্তু তাঁহাদের এ কথা অসহ্য যে, পরাধীন দুর্ব্বল হিন্দুজাতি কোন কালে সভ্য ছিল, এবং সেই সভ্যতা অতি প্রাচীন। অতএব দুই চারিজন ভিন্ন তাঁহারা সচরাচর প্রাচীন ভারতবর্ষের গৌরব খর্ব্ব করিতে নিযুক্ত। তাঁহারা যত্নপূর্ব্বক ইহাই প্রমাণ করিতে চাহেন যে, প্রাচীন ভারতবর্ষীয় গ্রন্থ সকলে যাহা কিছু আছে—হিন্দুধর্ম্মবিরোধী বৌদ্ধগ্রন্থ ছাড়া—সকলই আধুনিক, আর হিন্দুগ্রন্থে যাহাই আছে, তাহা হয় সম্পূর্ণ মিথ্যা, নয় অন্য দেশ হইতে চুরি করা। কোন মহাত্মা বলেন, রামায়ণ হোমরের কাব্যের অনুকরণ; কেহ বা বলেন, ভগবদ্গীতা বাইবেলের ছায়ামাত্র। হিন্দুর জ্যোতিষ চীন, যবন বা কাল্ডীয় হইতে প্রাপ্ত; হিন্দুর গণিতও পরের কাছে পাওয়া; লিখিত অক্ষরও কোন সীমীয় জাতীয় হইতে প্রাপ্ত। এ সকল কথা প্রতিপন্ন করিবার জন্য তাঁহাদের বিচার-প্রণালীর মূলসূত্র এই যে, ভারতবর্ষীয় গ্রন্থে ভারত-পক্ষে যাহা পাওয়া যায়, তাহা মিথ্যা বা প্রক্ষিপ্ত, যাহা ভারতবর্ষের বিপক্ষে পাওয়া যায়, তাহাই সত্য। পাণ্ডবদিগের ন্যায় বীরচরিত্র ভারতবর্ষীয় পুরুষের কথা মিথ্যা, পাণ্ডব কবিকল্পনামাত্র, কিন্তু পাণ্ডবপত্নী দ্রৌপদীর পঞ্চপতি সত্য, কেন না, তদ্দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে যে, প্রাচীন ভারতবর্ষীয়েরা চুয়াড় জাতি ছিল, তাহাদিগের মধ্যে স্ত্রীলোকদিগের বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল। ফর্গুসন সাহেব প্রাচীন অট্টালিকার ভগ্নাবশেষে কতকগুলা বিবস্ত্রা স্ত্রীমূর্ত্তি দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, প্রাচীন ভারতবর্ষে স্ত্রীলোকেরা কাপড় পরিত না; এ দিকে মথুরা প্রভৃতি স্থানের অপূর্ব্ব ভাস্কর্য্য দেখিয়া বিলাতী পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন, শিল্প গ্রীক মিস্ত্রীর। বেবর (Weber) সাহেব কোন মতে হিন্দুদিগের জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রাচীনতা উড়াইয়া দিতে না পারিয়া স্থির করিলেন, হিন্দুরা চান্দ্র নক্ষত্রমণ্ডল বাবিলনীয়দিগের নিকট হইতে পাইয়াছে। বাবিলনীয়দিগের যে চান্দ্র নক্ষত্রমণ্ডল আদৌ কখনও

ছিল না, তাহা চাপিয়া গেলেন। প্রমাণের অভাবেও Whitney সাহেব বলিলেন, তাহা হইতে পারে, কেন না, হিন্দুদের মানসিক স্বভাব তেমন তেজস্বী নয় যে, তাহারা নিজবুদ্ধিতে এত করে।

এই সকল মহাপুরুষগণের মতের সমালোচনায় আমার কোন প্রয়োজন ছিল না। কেন না, আমি স্বদেশীয় পাঠকের জন্য লিখি, হিন্দুদ্বেষীদিগের জন্য লিখি না। তবে দুঃখের বিষয় এই যে, আমার স্বদেশীয় শিক্ষিতসম্প্রদায় মধ্যে অনেকে তাঁহাদের মতের অনুবর্ত্তী। অনেকেই নিজে কিছু বিচার-আচার না করিয়াই কেবল ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের মত বলিয়াই সেই সকল মতের অনুবর্ত্তী। আমার দুরাকাঙ্ক্ষা যে, শিক্ষিতসম্প্রদায়ের মধ্যেও কেহ কেহ এই গ্রন্থ পাঠ করেন। তাই আমি ইউরোপীয় মতেরও প্রতিবাদে প্রবৃত্ত। যাঁহাদের কাছে বিলাতী সবই ভাল, যাঁহারা ইস্তক বিলাতী পণ্ডিত, লাগায়েৎ বিলাতী কুকুর, সকলেরই সেবা করেন, দেশী গ্রন্থ পড়া দূরে থাক, দেশী ভিখারীকেও ভিক্ষা দেন না, তাঁহাদের আমি কিছু করিতে পারিব না। কিন্তু শিক্ষিতসম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই সত্যপ্রিয় এবং দেশবৎসল। তাঁহাদের জন্য লিখিব।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মহাভারতের ঐতিহাসিকতা

বলিয়াছি যে, কৃষ্ণচরিত্র যে সকল গ্রন্থে পাওয়া যায়, মহাভারত তাহার মধ্যে সর্ব্বপূর্ব্ববর্ত্তী। কিন্তু মহাভারতের উপর কি নির্ভর করা যায়? মহাভারতের ঐতিহাসিকতা কিছু আছে কি? মহাভারতকে ইতিহাস বলে, কিন্তু ইতিহাস বলিলে History বুঝাইল? ইতিহাস কাহাকে বলে? এখনকার দিনে শৃগাল-কুক্কুরের গল্প লিখিয়াও লোকে তাহাকে "ইতিহাস" নাম দিয়া থাকে। কিন্তু বস্তুতঃ যাহাতে পুরাবৃত্ত অর্থাৎ পূর্ব্বে যাহা ঘটিয়াছে, তাহার আবৃত্তি আছে, তাহা ভিন্ন আর কিছুকেই ইতিহাস বলা যাইতে পারে না—

"ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামুপদেশসমন্বিতম্।
পূর্ব্ববৃত্তকথাযুক্তমিতিহাসং প্রচক্ষতে॥"

এখন, ভারতবর্ষের প্রাচীন গ্রন্থসকলের মধ্যে কেবল মহাভারতই অথবা কেবল মহাভারত ও রামায়ণ ইতিহাস নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। যেখানে মহাভারত ইতিহাস-পদে বাচ্য, অথচ অন্ততঃ রামায়ণ ভিন্ন আর কোন গ্রন্থই এই নাম প্রাপ্ত হয় নাই, তখন বিবেচনা করিতে হইবে যে, ইহার বিশেষ ঐতিহাসিকতা আছে বলিয়াই এরূপ হইয়াছে।

সত্য বটে, মহাভারতে এমন বিস্তর কথা আছে যে, তাহা স্পষ্টতঃ অলীক, অসম্ভব, অনৈতিহাসিক, সেই সকল কথাগুলি অলীক ও অনৈতিহাসিক বলিয়া পরিত্যাগ করিতে পারি। কিন্তু যে অংশে এমন কিছু নাই যে, তাহা হইতে ঐ অংশ অলীক বা অনৈতিহাসিক বিবেচনা করা যায়, সে অংশগুলি অনৈতিহাসিক বলিয়া কেন পরিত্যাগ করিব? সকল জাতির মধ্যে প্রাচীন ইতিহাসে এইরূপ ঐতিহাসিকে ও অনৈতিহাসিকে, সত্যে ও মিথ্যায় মিশিয়া গিয়াছে। রোমক ইতিহাসবেত্তা লিবি প্রভৃতি, যবন ইতিহাসবেত্তা হেরোডোটস প্রভৃতি, মুসলমান ইতিহাসবেত্তা ফেরেশতা প্রভৃতি এইরূপ ঐতিহাসিক বৃত্তান্তের সঙ্গে অনৈসর্গিক এবং অনৈতিহাসিক বৃত্তান্ত মিশাইয়াছেন। তাঁহাদিগের গ্রন্থ সকল ইতিহাস বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে—মহাভারতই অনৈতিহাসিক বলিয়া একেবারে পরিত্যক্ত হইবে কেন?

[আমি জানি যে, আধুনিক ইউরোপীয়েরা এই সকল ইতিহাসবেত্তাদিগকে (Livy, Herodotus প্রভৃতিকে) আদর করেন না। কিন্তু তাঁহারা এমন বলেন না যে, ইঁহাদের গ্রন্থ অনৈসর্গিক ব্যাপারে পরিপূর্ণ, এই জন্যই ইঁহারা পরিত্যাজ্য। তাঁহারা বলেন যে, ইঁহারা যে সকল সময়ের ইতিহাস লিখিয়াছেন, সে সকল সময়ে ইঁহারা নিজেও বর্ত্তমান ছিলেন না, কোন সমসাময়িক লেখকেরও সাহায্য পান নাই; অতএব তাঁহাদের গ্রন্থের উপর প্রকৃত ইতিহাস বলিয়া নির্ভর করা যায় না। এ কথা যথার্থ, কিন্তু লিবি বা হেরোডোটস্ অপেক্ষা মহাভারতের সমসাময়িকতা সম্বন্ধে দাবি-দাওয়া কিছু বেশী, তাহা এই গ্রন্থে সময়ান্তরে প্রমাণীকৃত হইবে। এই পর্য্যন্ত এখন বলিতে ইচ্ছা করি যে, আধুনিক ইউরোপীয় সমালোচকেরা যাহাই বলুন, প্রাচীন রোমক বা গ্রীক লিবি বা হেরোডোটসের গ্রন্থকে কখন অনৈতিহাসিক বলিতেন না। পক্ষান্তরে এমন দিনও উপস্থিত হইতে পারে যে, Gibbon বা Froude অসমসাময়িক বলিয়া পরিত্যক্ত হইবেন। আর আধুনিক সমালোচকের দল যাই বলুন, লিবি বা হেরোডোটসকে একেবারে পরিত্যাগ করিয়া রোম বা গ্রীসের কোন ইতিহাস আজিও লিখিত হয় না।

পাঠক মনে রাখিবেন যে, অনৈসর্গিকতায় বাহুল্য-ঘটিত যে দোষ, তাহারই বিচার হইতেছে। এ বিষয়ে ইউরোপীয়দিগের পদচিহ্নানুসরণই যদি বিদ্যাবুদ্ধির পরাকাষ্ঠার পরিচয় হয়, তবে আমরা এখানে সে গৌরবে

বর্জিত নহি। তাঁহারা স্থির করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের পূর্ব্বতম অবস্থা জানিবার জন্য দেশীয় গ্রন্থ সকল হইতে কোন সাহায্য পাওয়া যায় না, কেন না, সে সকল অতিশয় অবিশ্বাসযোগ্য, কিন্তু গ্রীক লেখক Megasthenes এবং Ktesias এ বিষয়ে অতিশয় বিশ্বাসযোগ্য—সে জন্য ইঁহারাই সে বিষয়ে ইউরোপীয় লেখকদিগের অবলম্বন। কিন্তু এই লেখকদিগের ক্ষুদ্র গ্রন্থগুলিতে যে রাশি রাশি অদ্ভুত, অলীক, অনৈসর্গিক উপন্যাস পাওয়া যায়, তাহা মহাভারতের লক্ষ শ্লোকের ভিতরও পাওয়া যায় না। এ গ্রন্থগুলি বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস, আর মহাভারত অবিশ্বাসযোগ্য কাব্য!! কি অপরাধে? *]

এখন ইহাও স্বীকার করা যাউক যে, ঐ সকল ভিন্নদেশীয় ইতিহাস-গ্রন্থের অপেক্ষা মহাভারতে অনৈসর্গিক ঘটনার বাহুল্য অধিক। তাহাতেও যেটুকু নৈসর্গিক ও সম্ভব ব্যাপারের ইতিবৃত্ত, সেটুকু গ্রহণ করিবার কোন আপত্তি দেখা যায় না। মহাভারতে যে অন্য দেশের প্রাচীন ইতিহাসের অপেক্ষা কিছু বেশী কাল্পনিক ব্যাপারের বাহুল্য আছে, তাহার বিশেষ কারণও আছে। ইতিহাস-গ্রন্থে দুই কারণে অনৈসর্গিক বা মিথ্যা ঘটনা সকল স্থান পায়। প্রথম, লেখক জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া, সেই সকলকে সত্য বিবেচনা করিয়া তাহা গ্রন্থভুক্ত করেন। দ্বিতীয়, তাঁহার গ্রন্থপ্রচারের পর পরবর্ত্তী লেখকরা আপনাদিগের রচনা পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকের রচনামধ্যে প্রক্ষিপ্ত করে। প্রথম কারণে সকল দেশের প্রাচীন ইতিহাস কাল্পনিক ব্যাপারের সংস্পর্শে দূষিত হইয়াছে—মহাভারতেও সেইরূপ ঘটিয়া থাকিবে।

কিন্তু দ্বিতীয় কারণটি অন্য দেশের ইতিহাসগ্রন্থে সেরূপ প্রবলতা প্রাপ্ত হয় নাই—মহাভারতেই বিশেষ প্রকারে অধিকার করিয়াছে। তাহার তিনটি কারণ আছে।

প্রথম কারণ এই যে, অন্যান্য দেশে যখন ঐ সকল প্রাচীন ঐতিহাসিক গ্রন্থ প্রণীত হয়, তখন প্রায়ই সে সকল দেশে গ্রন্থ সকল লিখিত করিবার প্রথা চলিয়াছে। গ্রন্থ লিখিত হইলে, তাহাতে পরবর্ত্তী লেখকেরা স্বীয় রচনা প্রক্ষিপ্ত করিবার বড় সুবিধা পান না,—লিখিত গ্রন্থে প্রক্ষিপ্ত রচনা শীঘ্র ধরা পড়ে। কেন না, প্রাচীন একখানা কাপি দ্বারা অন্য কাপির শুদ্ধাশুদ্ধি নিশ্চিত করা যায়। প্রাচীন ভারতবর্ষে গ্রন্থ সকল প্রণীত হইয়া মুখে মুখে প্রচারিত হইত; লিপিবিদ্যা প্রচলিত হইলে পরেও গ্রন্থ সকল পূর্ব্বপ্রথানুসারে গুরু-শিষ্য-পরম্পরা মুখে মুখেই প্রচারিত হইত। তাহাতে প্রক্ষিপ্ত রচনা প্রবেশ করিবার বিশেষ সুবিধা ঘটিয়াছিল।

দ্বিতীয় কারণ এই যে, রোম, গ্রীস বা অন্য কোন দেশে কোন ইতিহাস গ্রন্থ মহাভারতের ন্যায় জনসমাজে আদর বা গৌরব প্রাপ্ত হয় নাই; সুতরাং ভারতবর্ষীয় লেখকদিগের পক্ষে মহাভারতে স্বীয় রচনা প্রক্ষিপ্ত করিবার যে লোভ ছিল, অন্য কোন দেশীয় লেখকদিগের সেরূপ ঘটে নাই।

তৃতীয় কারণ এই যে, অন্য দেশের লেখকেরা আপনার যশ বা তাদৃশ অন্য কোন কামনার বশীভূত হইয়া গ্রন্থ প্রণয়ন করিতেন, কাজেই আপনার নামে আপনার রচনা প্রচার করাই তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য ছিল, পরের রচনার মধ্যে আপনার রচনা ডুবাইয়া দিয়া আপনার নাম লোপ করিবার অভিপ্রায় তাঁহাদের কখনও ঘটিত না। কিন্তু ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণেরা নিঃস্বার্থ ও নিষ্কাম হইয়া রচনা করিতেন। লোকহিত ভিন্ন আপনাদিগের যশ তাঁহাদিগের অভিপ্রেত ছিল না। অনেক গ্রন্থে তৎপ্রণেতার নামমাত্রও নাই। অনেক শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ এমন আছে যে, কে তাহার প্রণেতা, তাহা আজি পর্য্যন্ত কেহ জানে না। ঈদৃশ নিষ্কাম লেখক, যাহাতে মহাভারতের ন্যায় লোকাদৃত গ্রন্থের সাহায্যে তাঁহার রচনা লোকমধ্যে বিশেষ প্রকারে প্রচারিত হইয়া লোকহিত-সাধন করে, সেই চেষ্টায় আপনার রচনা সকল তাদৃশ গ্রন্থে প্রক্ষিপ্ত করিতেন।

এই সকল কারণে মহাভারতে কাল্পনিক বৃত্তান্তের বিশেষ বাহুল্য ঘটিয়াছে। কিন্তু কাল্পনিক বৃত্তান্তের বাহুল্য আছে বলিয়া এই প্রসিদ্ধ ইতিহাস-গ্রন্থে যে কিছুই ঐতিহাসিক কথা নাই, ইহা বলা নিতান্ত অসঙ্গত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মহাভারতের ঐতিহাসিকতা

ইউরোপীয়দিগের মত

অসঙ্গত হউক আর সঙ্গতই হউক, মহাভারতের ঐতিহাসিকতা অস্বীকার করেন, এমন অনেক আছেন। বলা বাহুল্য যে, ইঁহারা ইউরোপীয় পণ্ডিত অথবা তাঁহাদের শিষ্য। তাঁহাদিগের মতের সংক্ষেপতঃ উল্লেখ করিব।

বিলাতী বিদ্যার একটা লক্ষণ এই যে, তাঁহারা স্বদেশে যাহা দেখেন, মনে করেন, বিদেশে ঠিক তাই আছে। তাঁহারা Moor ভিন্ন অগৌরবর্ণ কোন জাতি

* [ ] এই চিহ্নিত অংশ ক্রোড়পত্র (ক) হইতে উদ্ধৃত।

জানিতেন না, এ জন্য এ দেশে আসিয়া হিন্দুদিগকে "Moor" বলিতে লাগিলেন। সেইরূপ স্বদেশে 'Epic' কাব্য ভিন্ন পদ্যে রচিত আখ্যান গ্রন্থ দেখেন নাই, সুতরাং ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা মহাভারত ও রামায়ণের সন্ধান পাইয়াই ঐ দুই গ্রন্থ Epic কাব্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন। যদি কাব্য, তবে আর উহার ঐতিহাসিকতা কিছু রহিল না, সব এক কথায় ভাসিয়া গেল।

ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা এ বোল কিয়ৎ পরিমাণে ছাড়িয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের দেশী শিষ্যরা ছাড়েন নাই।

কেন, মহাভারতকে সাহেবরা কাব্যগ্রন্থ বলেন, তাহা তাঁহারা ঠিক বুঝান নাই। উহা পদ্যে রচিত বলিয়া এরূপ বলা হয়, এমত হইতে পারে না, কেন না, সর্ব্বপ্রকার সংস্কৃত গ্রন্থই পদ্যে রচিত;—বিজ্ঞান, দর্শন, অভিধান, জ্যোতিষ, চিকিৎসা-শাস্ত্র সকলই পদ্যে প্রণীত হইয়াছে। তবে এমন হইতে পারে, মহাভারতে কাব্যাংশ বড় সুন্দর;—ইউরোপীয়েরা যে প্রকার সৌন্দর্য্য Epic কাব্যের লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, সেই জাতীয় সৌন্দর্য্য উহাতে বহুল পরিমাণে আছে বলিয়া উহাকে Epic বলেন, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে ঐ জাতীয় সৌন্দর্য্য অনেক ইউরোপীয় মৌলিক ইতিহাসেও আছে। ইংরেজের মধ্যে মেকলে, কার্লাইল ও ফ্রুদের গ্রন্থে, ফরাসীদিগের মধ্যে লামার্তীন্ ও মিশালার গ্রন্থে, গ্রীকদিগের মধ্যে থুকিদিদিসের গ্রন্থে এবং অন্যান্য ইতিহাস-গ্রন্থে আছে। মানবচরিত্রই কাব্যের শ্রেষ্ঠ উপাদান; ইতিহাসবেত্তাও মনুষ্যচরিত্রের বর্ণন করেন; ভাল করিয়া তিনি যদি আপনার কার্য্য-সাধন করিতে পারেন, তবে কাজেই তাঁহার ইতিহাসে কাব্যের সৌন্দর্য্য আসিয়া উপস্থিত হইবে। সৌন্দর্য্য-হেতু ঐ সকল গ্রন্থ অনৈতিহাসিক বলিয়া পরিত্যক্ত হয় নাই—মহাভারতও হইতে পারে না। মহাভারতে যে সে সৌন্দর্য্য অধিক পরিমাণে ঘটিয়াছে, তাহার বিশেষ কারণও আছে।

মূর্খের মতের বিশেষ আন্দোলনের প্রয়োজন নাই। কিন্তু পণ্ডিতে যদি মূর্খের মত কথা কয়, তাহা হইলে কি কর্ত্তব্য? বিখ্যাত Weber সাহেব পণ্ডিত বটে, কিন্তু আমার বিবেচনায় তিনি যেরূপে সংস্কৃত শিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, ভারতবর্ষের পক্ষে সে অতি অশুভক্ষণ। ভারতবর্ষের প্রাচীন গৌরব সে দিনকার জার্ম্মাণীর অরণ্যনিবাসী বর্ব্বরদিগের বংশধরের পক্ষে অসহ্য। অতএব প্রাচীন ভারতবর্ষের সভ্যতা অতি আধুনিক, ইহা প্রমাণ করিতে তিনি সর্ব্বদা যত্নশীল। তাঁহার বিবেচনায় খ্রীষ্টের জন্মের পূর্ব্বে যে মহাভারত ছিল, এমন বিবেচনা করিবার মুখ্য প্রমাণ কিছু নাই। এতটুকু প্রাচীনতার কথা স্বীকার করিবারও একমাত্র কারণ এই যে, Chrysostom নামা একজন ইউরোপীয় ভারতবর্ষে আসিয়া দাঁড়ি-মাঝির মুখে মহাভারতের কথা শুনিয়া গিয়াছিলেন। পাণিনির সূত্রে মহাভারত শব্দও আছে, যুধিষ্ঠিরাদিরও নাম আছে। কিন্তু তাহাতে তাঁহার বিশ্বাস হয় না। কেন না, পাণিনিও তাঁহার মতে "কালকের ছেলে।" তবে একজন ইউরোপীয়ের পবিত্র কর্ণরন্ধ্রে প্রবিষ্ট নাবিক-বাক্যের কোন প্রকার অবহেলা করিতে তিনি সক্ষম নহেন। অতএব মহাভারত যে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে ছিল, ইহা তিনি কায়ক্লেশে স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু আর একজন ইউরোপীয় লেখক (Megasthenes) যিনি খ্রীষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় বা চতুর্থ শতাব্দীর লোক এবং ভারতবর্ষে আসিয়া চন্দ্রগুপ্তের রাজধানীতে বাস করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার গ্রন্থে মহাভারতের কথা লেখেন নাই। কাজেই বেবর সাহেবের বিবেচনায় তাঁহার সময় মহাভারত ছিল না। * এখানে জর্ম্মান্ পণ্ডিতটি জানিয়া শুনিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক জুয়াচুরি করিয়াছেন। কেন না, তিনি বেশ জানেন যে, মিগাস্থেনিসের ভারতসম্বন্ধীয় গ্রন্থ বিদ্যমান নাই, কেবল অন্যান্য গ্রন্থকার তাহা হইতে যে সকল অংশ তাঁহাদিগের নিজ নিজ পুস্তকে উদ্ধৃত করিয়াছিলেন, তাহাই সংকলন পূর্ব্বক ডাক্তার শ্বান্‌বেক্ (Dr. Schwanbeck) নামক একজন আধুনিক পণ্ডিত একখানি গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছেন; তাহাই এখন মিগাস্থেনিসকৃত ভারতবৃত্তান্ত বলিয়া প্রচলিত। তাঁহার গ্রন্থের অধিকাংশ বিলুপ্ত। সুতরাং তিনি মহাভারতের কথা বলিয়াছিলেন কি না, বলা যায় না। ইহা জানিয়া শুনিয়াও কেবল ভারতবর্ষের প্রতি বিদ্বেষবুদ্ধিবশতঃ বেবর সাহেব এরূপ কথা লিখিয়াছেন। তাঁহার প্রণীত ভারত-সাহিত্যের ইতিবৃত্তবিষয়ক গ্রন্থে আদ্যোপান্ত ভারতবর্ষের গৌরব-লাঘবের চেষ্টা ভিন্ন, অন্য কোন উদ্দেশ্য দেখা যায় না। ইহার পর বলা বাহুল্য যে, মিগাস্থেনিস মহাভারতের নাম করেন নাই, ইহা হইতেই এমন বুঝায় না যে, তাঁহার সময়ে মহাভারত ছিল না। অনেক হিন্দু জর্ম্মনি বেড়াইয়া আসিয়াছেন, গ্রন্থও লিখিয়াছেন, তাঁহাদের

* Since Megasthenes says nothing of this epic, it is not an improbable hypothesis that its origin is to be placed in the interval between his time and that of Chrysostom; for what ignorant sailors took note of would hardly have escaped his observtion.—History of Sanskrit Literature, English Translation, P. 186, Trubner & Co. 1882.

কাহারও গ্রন্থে ত বেবর সাহেবের নাম দেখিলাম না। সিদ্ধান্ত করিতে হইবে কি যে, বেবর সাহেব কখনও ছিলেন না?

অন্যান্য পণ্ডিতেরা বেবর সাহেবের মত সব উঠাইয়া দিতে চাহেন না। তাঁহারা যে আপত্তি করেন, তাহা দুই প্রকার:—

(১) মহাভারত প্রাচীন গ্রন্থ বটে, কিন্তু খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ কি পঞ্চম শতাব্দীতে প্রণীত হইয়াছিল, তাহার পূর্ব্বে এরূপ গ্রন্থ ছিল না।

(২) আদিম মহাভারতে পাণ্ডবদিগের কোন কথা ছিল না। পাণ্ডব ও কৃষ্ণ প্রভৃতি কবিকল্পনা মাত্র।

দেশী মত আবার বিপরীত সীমান্তে গিয়াছে। দেশীয়েরা বলেন, কলির আরম্ভের ঠিক পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইয়াছিল। সে সময়ে বেদব্যাস বর্ত্তমান ছিলেন। কলির প্রবৃত্তিমাত্রে পাণ্ডবেরা স্বর্গারোহণ করেন। অতএব কলির আরম্ভেই অর্থাৎ অদ্য হইতে ৪৯৯২ বৎসর পূর্ব্বে মহাভারত প্রণীত হইয়াছিল।

দুটি মতই ঘোরতর ভ্রমপরিপূর্ণ। দুই দলের মতেরই খণ্ডন আবশ্যক। তজ্জন্য প্রথম প্রয়োজনীয় তত্ত্ব এই যে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ কবে হইয়াছিল, ইহার নির্ণয়। তাহা নির্ণীত হইলেই কতক বুঝিতে পারিব, মহাভারত কবে প্রণীত হইয়াছিল, এবং পাণ্ডবাদি কবিকল্পনামাত্র কি না? তাহা হইলেই জানিতে পারিব, মহাভারতের উপর নির্ভর করা যায় কি না?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ কবে হইয়াছিল

প্রথমে, দেশী মতেরই সমালোচনা আবশ্যক। ৪৯৯২ বৎসর পূর্ব্বে যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইয়াছিল, এ কথাটা সত্য নহে; ইহা আমি দেশী গ্রন্থ অবলম্বন করিয়াই প্রমাণ করিব। রাজতরঙ্গিণীকার বলেন, কলির ৬৫৩ বৎসর গতে গোনর্দ্দ কাশ্মীরে রাজা হইয়াছিলেন। আরও বলেন, গোনর্দ্দ যুধিষ্ঠিরের সমকালবর্ত্তী রাজা। তিনি ৩৫ বৎসর রাজত্ব করেন। অতএব প্রায় সাত শত বৎসর আরও বাদ দিতে হয়। তাহা হইলে ২৪০০ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দ পাওয়া যায়।

কিন্তু বিষ্ণুপুরাণে আছে—

"সপ্তর্ষীণাঞ্চ যৌ পূর্ব্বৌ দৃশ্যেতে উদিতৌ দিবি
তয়োস্তু মধ্যনক্ষত্রং দৃশ্যতে যৎ সমং নিশি।
তেন সপ্তর্ষয়ো যুক্তাস্তিষ্ঠন্ত্যব্দশতং নৃণাম্।
তে তু পারীক্ষিতে কালে মঘাস্বাসন্ দ্বিজোত্তম।
তদা প্রবৃত্তশ্চ কলির্দ্বাদশাব্দশতাত্মকঃ।"

৪ অংশঃ, ২৪ অ, ৩৩।৩৪

অর্থ। সপ্তর্ষিমণ্ডলের মধ্যে যে দুইটি তারা আকাশে পূর্ব্বদিকে উদিত দেখা যায়, ইঁহাদের সমসূত্রে যে মধ্য-নক্ষত্র দেখা যায়, সেই নক্ষত্রে সপ্তর্ষি শত বৎসর অবস্থান করেন *। সপ্তর্ষি পরীক্ষিতের সময়ে মঘা নক্ষত্রে ছিলেন, তখন কলির দ্বাদশ শত বৎসর প্রবৃত্ত হইয়াছিল।

অতএব এই কথা মতে কলির দ্বাদশ শত বর্ষের পর পরীক্ষিতের সময়, তাহা হইলে উপরি উদ্ধৃত ৩৪ শ্লোক অনুসারে ১৯০০ খ্রীষ্ট-পূর্ব্বাব্দে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইয়াছিল।

কিন্তু ৩৩ শ্লোকে যাহা পাওয়া যায়, তাহার সঙ্গে এ গণনা মিলে না। ঐ ৩৩ শ্লোকের তাৎপর্য্য অতি দুর্গম—সবিস্তার বুঝাইতে হইল। সপ্তর্ষিমণ্ডল কতক-গুলি স্থিরনক্ষত্র, উহার বিলাতী নাম Great Bear বা Ursa Major, মঘা নক্ষত্রও কতকগুলি স্থিরতারা। সকলেই জানেন, স্থিরতারার গতি নাই। তবে বিষুবের একটু সামান্য গতি আছে—ইংরেজ জ্যোতির্বিদেরা তাহাকে বলেন, Precession of the Equinoxes, এই গতি হিন্দুমতে প্রতি বৎসর ৫৪ বিকলা। এক এক নক্ষত্রে ১৩ ১/৩ অংশ। এ হিসাবে কোন স্থিরতারার এক নক্ষত্র পরিভ্রমণ করিতে সহস্র বৎসর লাগে—শত বৎসর নয়। তাহা ছাড়া সপ্তর্ষিমণ্ডল কখনও মঘা নক্ষত্রে থাকিতে পারে না। কারণ, মঘা নক্ষত্র সিংহ রাশিতে। দ্বাদশ রাশি রাশিচক্রের ভিতর। সপ্তর্ষি-মণ্ডল রাশিচক্রের বাহিরে। যেমন ইংলণ্ড ভারতবর্ষে কখনও থাকিতে পারে না, তেমন সপ্তর্ষিমণ্ডল মঘা নক্ষত্রে থাকিতে পারে না।

পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, তবে পুরাণকার ঋষি কি গাঁজা খাইয়া এই সকল কথা লিখিয়াছিলেন? এমন কথা আমরা বলিতেছি না; আমরা কেবল ইহাই বলিতেছি যে, এই প্রাচীন উক্তির তাৎপর্য্য আমাদের বোধগম্য নহে। কি ভাবিয়া পুরাণকার লিখিয়াছিলেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। পাশ্চাত্য পণ্ডিত বেণ্টলি সাহেব তাহা এইরূপ বুঝিয়াছেন:—

"The notion originated in a contrivance of the astronomers to show the quantity of the precession of the equin-

---

* নক্ষত্র এখানে অশ্বিন্যাদি।

oxes : This was by assuming an imaginary line, or great circle, passing through the poles of the ecliptic and the beginning of the fixed Magha, which circle was supposed to cut some of the stars in the Great Bear * * * The seven stars in the Great Bear being called the Rishis, the circle so assumed was called the line of the Rishis; and being invariably fixed to the beginning of the lunar asterism Magha, the precession would be noted by stating the degree &c. of any moveable lunar mansion cut by that fixed line or circle as an index." — Historical view of the Hindu Astronomy. P. 65.

এইরূপ গণনা করিয়া বেণ্টলি যুধিষ্ঠিরকে ৫৭৫ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে আনিয়া ফেলিয়াছেন অর্থাৎ তাঁহার মতে যুধিষ্ঠির শাক্যসিংহের অল্প পূর্ব্ববর্ত্তী। আমেরিকার পণ্ডিত Whitney সাহেব বলেন, হিন্দুদিগের জ্যোতিষিক গণনা এত অশুদ্ধ যে, তাহা হইতে কোন কালাবধারণচেষ্টা বৃথা। কিন্তু যে কোন প্রকারে হউক, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কালাবধারণ হইতে পারে, দেখাইতেছি।

প্রথমতঃ পুরাণকার ঋষির অভিপ্রায় অনুসারেই গণনা করা যাউক। তিনি বলেন যে, যুধিষ্ঠিরের সময়ে সপ্তর্ষি মঘায় ছিলেন, নন্দমহাপদ্মের সময় পূর্ব্বাষাঢ়ায়।

"প্রযাস্যন্তি যদা চৈতে পূর্ব্বাষাঢ়াং মহর্ষয়ঃ।
তদা নন্দাৎ প্রভৃত্যেষঃ কলির্বৃদ্ধিং গমিষ্যতি॥"

৪।২৪।৩৯

তার পর শ্রীমদ্ভাগবতেও ঐ কথা আছে—

"যদা মঘাভ্যো যাস্যন্তি পূর্ব্বাষাঢ়াং মহর্ষয়ঃ।
তদা নন্দাৎ প্রভৃত্যেষঃ কলির্বৃদ্ধিং গমিষ্যতি॥"

১২।২।৩২

মঘা হইতে পূর্ব্বাষাঢ়া দশম নক্ষত্র; যথা—মঘা, পূর্ব্বফল্গুনী, উত্তরফল্গুনী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতি, বিশাখা, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, মূলা, পূর্ব্বাষাঢ়া। অতএব যুধিষ্ঠির হইতে নন্দ ১০ × ১০০ = সহস্র বৎসর অন্তর।

এখন, আর এক প্রকার গণনা যাহা সকলেই বুঝিতে পারে, তাহা দেখা যাউক। বিষ্ণুপুরাণের যে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহার পূর্ব্বশ্লোক এই :—

"যাবৎ পরীক্ষিতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্।
এতদ্বর্ষসহস্রন্তু জ্ঞেয়ং পঞ্চদশোত্তরম্॥" ৪।২৪।৩২

নন্দের পুরা নাম নন্দমহাপদ্ম। বিষ্ণুপুরাণে ঐ ৪ অংশের ২৪ অধ্যায়েই আছে;—

"মহাপদ্মঃ তৎপুত্রাশ্চ একবর্ষশতমবনীপতয়ো ভবিষ্যন্তি। নবৈব তান্ নন্দান্ কৌটিল্যো ব্রাহ্মণঃ সমুদ্ধরিষ্যতি। তেষামভাবে মৌর্য্যাশ্চ পৃথিবীং ভোক্ষ্যন্তি। কৌটিল্য এব চন্দ্রগুপ্তং রাজ্যেঽভিষেক্ষ্যতি।"

ইহার অর্থ—মহাপদ্ম এবং তাঁহার পুত্রগণ এক শত বর্ষ পৃথিবীপতি হইবেন। কৌটিল্য * নামে ব্রাহ্মণ নন্দবংশীয়গণকে নির্ম্মূলত করিবেন। তাঁহাদের অভাবে মৌর্য্যগণ পৃথিবী ভোগ করিবেন। কৌটিল্য চন্দ্রগুপ্তকে রাজ্যাভিষিক্ত করিবেন।

তবেই যুধিষ্ঠির হইতে চন্দ্রগুপ্ত ১১১৫ বৎসর। চন্দ্রগুপ্ত অতি বিখ্যাত সম্রাট—ইনিই মাকিদনীয় যবন আলেকজন্দর ও সিলিউকস নৈকটরের সমসাময়িক। ইনি বাহুবলে মাকিদনীয় যবনদিগকে ভারতবর্ষ হইতে দূরীকৃত করিয়াছিলেন, এবং প্রবল প্রতাপ সিলিউকসকে পরাভূত করিয়া তাঁহার কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার মত দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ তখন কেহই পৃথিবীতে ছিলেন না। কথিত আছে, তিনি অল্পবয়সে আলেকজন্দরের শিবিরমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। আলেকজন্দর ৩২৫ খ্রীষ্টীয় অব্দে ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন।

চন্দ্রগুপ্ত ৩১৫ খ্রীঃ অব্দে রাজ্যপ্রাপ্ত হয়েন। অতএব ঐ ৩১৫ অঙ্কের সহিত উপরিলিখিত ১১১৫ যোগ করিলেই যুধিষ্ঠিরের সময় পাওয়া যাইবে। ৩১৫ + ১১১৫ = ১৪৩০ খ্রীঃ পূঃ তবে মহাভারতের যুদ্ধের সময়।

অন্যান্য পুরাণেও ঐরূপ কথা আছে। তবে মৎস্য ও বায়ুপুরাণে ১১১৫ স্থানে ১১৫০ লিখিত আছে। তাহা হইলে ১৪৬৫ পাওয়া যায়।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ যে ইহার বড় বেশী পূর্ব্বে হয় নাই, বরং কিছু পরেই হইয়াছিল, তাহার এক অখণ্ডনীয় প্রমাণ পাওয়া যায়। সকল প্রমাণ খণ্ডন করা যায়—গণিত জ্যোতিষের প্রমাণ খণ্ডন করা যায় না—"চন্দ্রার্কৌ যত্র সাক্ষিণৌ।"

সকলেই জানে যে, বৎসরে দুইটি দিনে দিবারাত্র সমান হয়। সেই দুইটি দিন একের ছয় মাস পরে আর একটি উপস্থিত হয়। উহাকে বিষুব বলে। আকাশের যে যে স্থানে ঐ দুই দিনে সূর্য্য থাকেন, সেই স্থান দুইটিকে ক্রান্তিপাত বা ক্রান্তিপাতবিন্দু (Equinoctial point) বলে। উহার প্রত্যেকটির ঠিক ৯০ অংশ (90 degrees) পরে অয়ন-পরিবর্ত্তন

* বিখ্যাত চাণক্য।

হয় (Solistice) ঐ ৯০ অংশে উপস্থিত হইলে সূর্য্য দক্ষিণায়ন হইতে উত্তরায়ণে বা উত্তরায়ণ হইতে দক্ষিণায়নে যান।

মহাভারতে আছে, ভীষ্মের ইচ্ছামৃত্যু। তিনি শরশয্যাশায়ী হইলে বলিয়াছিলেন যে, আমি দক্ষিণায়নে মরিব না, (তাহা হইলে সদ্গতির হানি হয়); অতএব শরশয্যায় শুইয়া উত্তরায়ণের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। মাঘমাসে উত্তরায়ণ হইলে তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন। প্রাণত্যাগের পূর্ব্বে ভীষ্ম বলিতেছেন,—

"মাঘোঽয়ং সমনুপ্রাপ্তো মাসঃ সৌম্য যুধিষ্ঠির।"

তবে তখন মাঘমাসেই উত্তরায়ণ হইয়াছিল। অনেকে মনে করেন, এখনও মাঘমাসেই উত্তরায়ণ হয়, কেন না, ১লা মাঘকে উত্তরায়ণ দিন এবং তৎপূর্ব্ব দিনকে মকরসংক্রান্তি বলে। কিন্তু তাহা আর হয় না। যখন অশ্বিনী নক্ষত্রের প্রথম অংশে ক্রান্তিপাত হইয়াছিল, তখন অশ্বিনী নক্ষত্র প্রথম বলিয়া গণিত হইয়াছিল, তখন আশ্বিন মাসে বৎসর আরম্ভ করা হইত এবং তখনই ১লা মাঘে উত্তরায়ণ হইত। এখনও গণনা সেইরূপ চলিয়া আসিতেছে, এখন ফসলী সন ১লা আশ্বিনে আরম্ভ হয়, কিন্তু এখন আর অশ্বিনী নক্ষত্রে ক্রান্তিপাত হয় না; এবং এখন ১লা মাঘে পূর্ব্বের মত উত্তরায়ণ হয় না। এখন ৭ই পৌষ বা ৮ই পৌষ (২১শে ডিসেম্বর) উত্তরায়ণ হয়, ইহার কারণ এই যে, ক্রান্তিপাতবিন্দুর একটা গতি আছে, ঐ গতিতে ক্রান্তিপাত, সুতরাং অয়নপরিবর্ত্তনস্থানও বৎসর বৎসর পিছাইয়া যায়। ইহাই পূর্ব্বকথিত Precession of Equinoxes—হিন্দুনাম "অয়নচলন;" কত পিছাইয়া যায়, তাহারও পরিমাণ স্থির আছে। হিন্দুরা বলেন, বৎসরে ৫৪ বিকলা, ইহাও পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে সামান্য ভুল আছে। ১৭২ খ্রীঃ-পূর্ব্বাব্দে হিপার্কস্‌নামা গ্রীক জ্যোতির্ব্বিদ্ ক্রান্তিপাত হইতে ১৭৪ অংশে চিত্রা নক্ষত্রকে দেখিয়াছিলেন। মাস্কেলাইন ১৮০২ খ্রীঃ অব্দে চিত্রাকে ২০১ অংশে ৪ কলা ৪ বিকলায় দেখিয়াছিলেন। ইহা হইতে হিসাব করিয়া পাওয়া যায়, ক্রান্তিপাতের বার্ষিক গতি সাড়ে পঞ্চাশ বিকলা। বিখ্যাত ফরাসী জ্যোতির্ব্বিদ্ Leverrier ঐ গতি অন্য কারণ হইতে ৫০'২৪ বিকলা স্থির করিয়াছেন। এবং সর্ব্বশেষে Stockwell গণিয়া ৫০'৪৩৮ বিকলা পাইয়াছেন। এই গণনা প্রথম গণনার সঙ্গে মিলে। অতএব ইহাই গ্রহণ করা যাউক।

ভীষ্মের মৃত্যুকালেও মাঘমাসে উত্তরায়ণ হইয়াছিল, কিন্তু সৌর মাঘের * কোন্ দিনে, তাহা লিখিত নাই। পৌষ মাঘে সচরাচর ২৮ কি ২৯ দিন দেখা যায়। এই দুই মাসে মোটে ৫৭ দিনের বেশী প্রায় দেখা যায় না। কিন্তু এমন হইতে পারে না যে, তখন মাঘমাসের শেষ দিনেই উত্তরায়ণ হইয়াছিল। কেন না, তাহা হইলেই 'মাঘোঽয়ং সমনুপ্রাপ্তঃ' কথাটি বলা হইত না। ২৮শে মাঘে উত্তরায়ণ ধরিলেও এখন হইতে ৪৮ দিন তফাৎ। ৪৮ দিনে রবির গতি মোটামুটি ৪৮ অংশ ধরা যাইতে পারে, কিন্তু ইহা ঠিক বলা যায় না, কেন না, রবির শীঘ্রগতি মন্দগতি আছে। ৭ই পৌষ হইতে ২৯শে মাঘ পর্য্যন্ত রবিস্ফুট বাঙ্গলা পঞ্জিকা ধরিয়া গণিলে ৪৪ অংশ ৪ কলা মাত্র গতি পাওয়া যায়। ঐ ৪৪ অংশ ৪ কলা লইলে খ্রীঃ পূঃ ১২৬৩ বৎসর পাওয়া যায়। ৪৮ অংশ পূরা লইলে খ্রীঃ পূঃ ১৫৩০ বৎসর পাওয়া যায়। ইহা কোন মতেই হইতে পারে না যে, ইহার পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইয়াছিল। বিষ্ণুপুরাণ হইতে যে খ্রীঃ পূঃ ১৪৩০ পাওয়া গিয়াছে, তাই ঠিক বোধ হয়। ভরসা করি, এই সকল প্রমাণের পর আর কেহই বলিবেন না যে, মহাভারতের যুদ্ধ দ্বাপরের শেষে, পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছিল। তাহা যদি হইত, তবে সৌর চৈত্রে উত্তরায়ণ হইত। চান্দ্র মাঘও কখনও সৌর চৈত্রে হইতে পারে না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পাণ্ডবদিগের ঐতিহাসিকতা

ইউরোপীয় মত

মহাভারতের যুদ্ধকাল সম্বন্ধে ইউরোপীয়দিগের সঙ্গে আমাদিগের কোন মারাত্মক মতভেদ হইতেছে না। কোল্‌ব্রুক সাহেব গণনা করিয়াছেন, খৃঃ পূঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে এই যুদ্ধ হইয়াছিল। উইল্‌সন সাহেব সেই মতাবলম্বী। এল্‌ফিনষ্টোন তাহা গ্রহণ করিয়াছেন। উইল্‌ফোর্ড সাহেব বলেন, খৃঃ পূঃ ১৩৭০ বৎসরে ঐ যুদ্ধ হয়। বুকাননের মত ত্রয়োদশ শতাব্দীতে। প্রাট সাহেব গণনা করিয়াছেন, খৃঃ পূঃ দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে। প্রতিবাদের কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। কিন্তু পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, ইউরোপীয়দিগের মত এই যে, মহাভারত খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দীতে

* সে কালেও সৌর মাসের নামই প্রচলিত ছিল, ইহা আমি প্রমাণ করিতে পারি। ছয় ঋতুর কথা মহাভারতেই আছে। ১২ মাস নহিলে ছয় ঋতু হয় না।

রচিত হইয়াছিল; এবং আদিম মহাভারতে পাণ্ডবদিগের কোন কথা ছিল না—ও সব পশ্চাদ্বর্ত্তী কবিদিগের কল্পনা, এবং মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত।

যদি এই দ্বিতীয় কথাটা সত্য হয়, তবে মহাভারত কবে প্রণীত হইয়াছিল, সে কথার মীমাংসার কিছু প্রয়োজন থাকে না। তাহা হইলে যবে মহাভারত প্রণীত হউক না কেন—কৃষ্ণঘটিত কথা যাহা কিছু এখন মহাভারতে পাওয়া যায়, সবই মিথ্যা। কেন না, কৃষ্ণঘটিত মহাভারতীয় সমস্ত কথাই প্রায় পাণ্ডবদিগের সঙ্গে সম্বন্ধবিশিষ্ট। অতএব আগে দেখা উচিত যে, এই শেষোক্ত আপত্তির কোন প্রকার ন্যায্যতা আছে কি না।

প্রথমতই লাসেন সাহেবকে ধরিতে হয়—কেন না, তিনি বড় লব্ধপ্রতিষ্ঠ জার্ম্মাণ্ পণ্ডিত। মহাভারত যবেই প্রণীত হউক, তিনি স্বীকার করেন যে, ইহার কিছু ঐতিহাসিকতা আছে। কিন্তু তিনি যেটুকু স্বীকার করেন, সেটুকু এইমাত্র যে, মহাভারতে যে যুদ্ধ বর্ণিত আছে, তাহা কুরুপাঞ্চালের যুদ্ধ—পাণ্ডবগণকে অনৈতিহাসিক কবিকল্পনা-প্রসূত বলিয়া উড়াইয়া দেন। বেবর সাহেবও সে মত গ্রহণ করেন। সর মনিয়র উইলিয়মস্, বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি অনেকেই সেই মতের অবলম্বী। মতটা কি, তাহা সংক্ষেপে বুঝাইতেছি।

কুরু নামে এক জন রাজা ছিলেন। আমরা পুরাণেতিহাসে শুনি, তদ্বংশীয় রাজগণকে কুরু বা কৌরব বলা যায়। তাঁহাদিগের অধিকৃত দেশবাসিগণকেও ঐ নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। তাহা হইলে কুরু শব্দে কৌরবাধিকৃত জনপদবাসিদিগকে বুঝাইল। পাঞ্চালেরা দ্বিতীয় জনপদবাসী। এই অর্থেই পাঞ্চাল শব্দ মহাভারতে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই দুই জনপদ পরস্পর সন্নিহিত। উত্তর-পশ্চিমে যে সকল জনপদ ছিল, মহাভারতীয় যুদ্ধের পূর্ব্বে এই দুই জনপদ তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। বোধ হয়, এককালে এই দুই জনপদবাসিগণ মিলিতই ছিল। কেন না, কুরু-পাঞ্চাল পদ বৈদিক গ্রন্থে পাওয়া যায়। পরে তাহাদিগের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল। বিরোধের পরিণাম মহাভারতের যুদ্ধ। সেই যুদ্ধে কুরুগণ পাঞ্চালগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিল।

এত দূর পর্য্যন্ত আমরা কোন আপত্তি করি না এবং এ কথায় আমাদের সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। বস্তুতঃ কুরুগণের প্রকৃত বিপক্ষগণ পাঞ্চালগণই বটে; মহাভারতে কৌরবদিগের প্রতিযুদ্ধকারী সেনা পাঞ্চাল-সেনা, অথবা পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ * বলিয়া বর্ণিত হইয়াছিল। পাঞ্চালরাজপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নই সেই সেনার সেনাপতি। পাঞ্চালরাজপুত্র শিখণ্ডীই কৌরবপ্রধান ভীষ্মকে নিপাতিত করেন। পাঞ্চালরাজপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন কৌরবাচার্য্য দ্রোণকে নিপাতিত করেন। যদি এ যুদ্ধ প্রধানতঃ ধৃতরাষ্ট্রপুত্র ও পাণ্ডুপুত্রদিগের যুদ্ধ হইত, তাহা হইলে ইহাকে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ কখনই বলিত না, কেন না, পাণ্ডবেরাও কুরু; তাহা হইলে ইহাকে ধার্ত্তরাষ্ট্র-পাণ্ডবদিগের যুদ্ধ বলিত। ভীষ্ম এবং কৌরবাচার্য্য দ্রোণ ও কৃপের সঙ্গে ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের যে সম্বন্ধ, পাণ্ডবদিগের সঙ্গেও সেই সম্বন্ধ, স্নেহও তুল্য। যদি এ যুদ্ধ ধার্ত্তরাষ্ট্র-পাণ্ডবের যুদ্ধ হইত, তবে তাঁহারা কখনই দুর্য্যোধনপক্ষ অবলম্বন করিয়া পাণ্ডবদিগের অনিষ্টসাধনে প্রবৃত্ত হইতেন না—কেন না, তাঁহারা ধর্ম্মাত্মা ও ন্যায়পর। কুরুপাঞ্চালের বিরোধ পাণ্ডবগণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইবার পূর্ব্ব হইতেই প্রচলিত ছিল, ইহা মহাভারতেই আছে। মহাভারতেই আছে যে, পাণ্ডব ও ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ প্রভৃতি সকল কৌরব মিলিত এবং দ্রোণাচার্য্য কর্ত্তৃক অভিরক্ষিত হইয়া পাঞ্চালরাজ্য আক্রমণ করেন, এবং পাঞ্চালরাজকে পরাজিত করিয়া তাঁহার অতিশয় লাঞ্ছনা করেন।

অতএব এই যুদ্ধ যে প্রধানতঃ কুরুপাঞ্চালের যুদ্ধ, স্বীকার করি। স্বীকার করিয়া ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ যে সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন, আমি তাহা গ্রহণ করিতে পারি না। তাঁহারা বলেন যে, যুদ্ধটা কুরুপাঞ্চালের,—পাণ্ডবেরা কেহ নহেন, পাণ্ডু বা পাণ্ডব কেহ ছিলেন না। এ সিদ্ধান্তের অন্য হেতুও তাঁহারা নির্দ্দেশ করেন। সে সকল হেতুর সমালোচনা আমি পশ্চাৎ করিব। এখন ইহা বুঝাইতে চাই যে, কুরুপাঞ্চালের যুদ্ধ বলিয়া যে পাণ্ডবদিগের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে হইবে, ইহা সঙ্গত নহে। পাণ্ডবের শ্বশুর পাঞ্চালাধিপতি ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের উপর আক্রমণ করিলে, পাণ্ডবেরা তাঁহার সহায় হইয়া, তাঁহার পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, ইহাই সম্ভব। পাণ্ডবদিগের জীবনবৃত্তান্ত এই;—কৌরবাধিপতি বিচিত্রবীর্য্যের দুই পুত্র, ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু।* ধৃতরাষ্ট্র জ্যেষ্ঠ, কিন্তু অন্ধ। অন্ধ বলিয়া রাজ্য-শাসনে অনধিকারী বা অক্ষম। রাজ্য পাণ্ডুর হস্তগত হইল। পরিশেষে পাণ্ডুকেও রাজ্যচ্যুত ও অরণ্যচারী দেখি; ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্য আবার ধৃতরাষ্ট্রের হাতে গেল। তাহার পর পাণ্ডুপুত্রেরা বয়ঃপ্রাপ্ত হইল, রাজ্য পাইবার আকাঙ্ক্ষা করিল, কাজেই ধৃতরাষ্ট্র ও ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ তাঁহাদিগকে নির্ব্বাসিত করিলেন। তাঁহারা বনে বনে ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে

* সৃঞ্জয়েরা পাঞ্চালভুক্ত—তাহাদিগের জাতি।

* বিদুর বৈশ্যাজাত।

পাঞ্চালরাজের কন্যা বিবাহ করিয়া পাঞ্চালদিগের সহিত আত্মীয়তা সংস্থাপন করিলেন। পাঞ্চালরাজের সাহায্যে এবং তাঁহাদিগের মাতুলপুত্র ও প্রবলপ্রতাপ যাদবদিগের নেতা কৃষ্ণের সাহায্যে তাঁহারা ইন্দ্রপ্রস্থে নূতন রাজ্য সংস্থাপিত করিলেন। পরিশেষে সে রাজ্যও ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের করকবলিত হইল।

পাণ্ডবেরা পুনর্ব্বার বনচারী হইলেন। এই অবস্থায় বিরাটের সঙ্গে সখ্য ও সম্বন্ধ স্থাপন করিলেন। পরে পাঞ্চালেরা কৌরবদিগকে আক্রমণ করিল। পূর্ব্ববৈর প্রতিশোধ জন্য এ আক্রমণ এবং পাণ্ডবদিগের রাজ্যাধিকার উপলক্ষ মাত্র কি না, স্থির করিয়া বলা যায় না। যাই হউক, পাঞ্চালেরা যুদ্ধে বদ্ধপরিকর হইলে, পাণ্ডবেরা তাঁহাদের পক্ষ থাকিয়া ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের সহিত যুদ্ধ করাই সম্ভব।

বলিয়াছি যে, পাণ্ডব ছিল না, এ কথা বলিবার উপরিলিখিত পণ্ডিতেরা অন্য কারণ নির্দ্দেশ করেন। একটি কারণ এই যে, সমসাময়িক কোন গ্রন্থে পাণ্ডব নাম পাওয়া যায় না। উত্তরে হিন্দু বলিতে পারেন, এই মহাভারতই ত সমসাময়িক গ্রন্থ—আবার চাই কি? সে কালে ইতিহাস লেখার প্রথা ছিল না যে, কতকগুলা গ্রন্থে তাঁহাদের নাম পাওয়া যাইবে। তবে ইউরোপীয়েরা বলিতে পারেন যে, শতপথব্রাহ্মণ একখানি অনল্পপরবর্ত্তী গ্রন্থ। তাহাতে ধৃতরাষ্ট্র, পরীক্ষিৎ এবং জনমেজয়ের নাম আছে, কিন্তু পাণ্ডবদিগের নামগন্ধ নাই—কাজেই পাণ্ডবেরাও ছিল না।

এরূপ সিদ্ধান্ত ভারতবর্ষীয় প্রাচীন রাজগণ সম্বন্ধে হইতে পারে না। কোন ভারতবর্ষীয় গ্রন্থে মাকিদনের আলেক্‌জন্দরের নাম-গন্ধ নাই—অথচ তিনি ভারতবর্ষে আসিয়া যে কাণ্ডটা উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহা কুরুক্ষেত্রের ন্যায়ই গুরুতর ব্যাপার। সিদ্ধান্ত করিতে হইবে কি, আলেক্‌জন্দর নামে কোন ব্যক্তি ছিলেন না, এবং গ্রীক্ ইতিহাস-বেত্তারা তদ্বৃত্তান্ত যাহা লিখিয়াছেন, তাহা কবিকল্পনামাত্র? কোন ভারতবর্ষীয় গ্রন্থে গজনবী মহম্মদের নামগন্ধ নাই—সিদ্ধান্ত করিতে হইবে, ইনি মুসলমান লেখকদিগের কল্পনাপ্রসূত ব্যক্তিমাত্র? বাঙ্গালার সাহিত্যে বখ্‌তিয়ার খিলিজির নামমাত্র নাই—সিদ্ধান্ত করিতে হইবে কি যে, ইনি মিনহাজুদ্দিনের কল্পনাপ্রসূত মাত্র? যদি তাহা না হয়, তবে একা মিনহাজুদ্দিনের বাক্য বিশ্বাসযোগ্য হইল কিসে, আর মহাভারতের কথা অবিশ্বাসযোগ্য কিসে?

বেবর সাহেব বলেন, শতপথব্রাহ্মণে অর্জ্জুন শব্দ আছে, কিন্তু ইহা ইন্দ্রার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে—কোন পাণ্ডবকে বুঝায়, এমন অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। এ জন্য তিনি বুঝিয়াছেন যে, পাণ্ডব অর্জ্জুন মিথ্যা কল্পনা, ইন্দ্রস্থানে ইনি অভিষিক্ত হইয়াছেন মাত্র। এ বুদ্ধির ভিতর প্রবেশ করিতে আমরা অক্ষম। ইন্দ্রার্থে অর্জ্জুন শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, এ জন্য অর্জ্জুন নামে কোন মনুষ্য ছিল না, এ সিদ্ধান্ত বুঝিতে আমরা অক্ষম।

কথাটা হাসিয়া উড়াইয়া দিলে চলিত, কিন্তু বেবর সাহেব মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত, বেদ ছাপাইয়াছেন, আর আমরা একে বাঙ্গালী, তাতে গণ্ডমূর্খ, তাঁহাকে হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া বড় ধৃষ্টতার কাজ হয়। তবে কথাটা একটু বুঝাই। শতপথব্রাহ্মণে, অর্জ্জুন নাম আছে, ফাল্গুন নামও আছে। যেমন অর্জ্জুন ইন্দ্র ও মধ্যম পাণ্ডব উভয়ের নাম, ফাল্গুনও তেমনই ইন্দ্র ও মধ্যম পাণ্ডব উভয়ের নাম। ইন্দ্রের নাম ফাল্গুন, কেন না, ইন্দ্র ফল্গুনী নক্ষত্রের অধিষ্ঠাতৃদেবতা;* অর্জ্জুনের নাম ফাল্গুন, কেন না, তিনি ফল্গুনী নক্ষত্রে জন্মিয়াছিলেন। হয় ত ইন্দ্রাধিষ্ঠিত নক্ষত্রে জন্ম বলিয়াই তিনি ইন্দ্রপুত্র বলিয়া খ্যাত; ইন্দ্রের ঔরসে তাঁহার জন্ম, এ কথায় কোন শিক্ষিত পাঠকই বিশ্বাস করিবেন না। আবার অর্জ্জুন শব্দে শুক্ল। মেঘদেবতা ইন্দ্রও শুক্ল নহে, মেঘবর্ণ অর্জ্জুনও শুক্লবর্ণ নহে। উভয়ে নির্ম্মলকর্ম্মকারী শুভ্র পবিত্র, এ জন্য উভয়েই অর্জ্জুন। ইন্দ্রের নাম যে অর্জ্জুন, শতপথব্রাহ্মণে সে কথাটা এইরূপে আছে,—"অর্জ্জুনো বৈ ইন্দ্রো যদস্য গুহ্যং নাম"; অর্জ্জুন, ইন্দ্র; সেটি ইহার গুহ্য নাম। ইহাতে কি বুঝায় না যে, অর্জ্জুন নামে অন্য ব্যক্তি ছিল, তাঁহার মহিমাবৃদ্ধির অভিপ্রায়ে ইন্দ্রের সঙ্গে তাঁহার ঐক্য-স্থাপনজন্য অর্জ্জুনের নাম ইন্দ্রের একটা লুকানো নাম বলিয়া প্রচারিত করিতেছেন? বেবর সাহেব "গুহ্য" অর্থে "mystic" বুঝিয়া লোককে বোকা বুঝাইয়াছেন।

আর একটি রহস্যের কথা বলি। কুরচি গাছের নামও অর্জ্জুন। আবার কুরচি গাছের নামও ফাল্গুন। এ গাছের নাম অর্জ্জুন, কেন না, ফুল শাদা; ইহার নাম ফাল্গুন, কেন না, ইহা ফাল্গুন মাসে ফুটে। এখন আমার বিনীত নিবেদন যে, ইন্দ্রের নামও অর্জ্জুন ও ফাল্গুন বলিয়া আমাদিগকে বলিতে হইবে যে, কুরচি গাছ নাই ও কখনও ছিল না? পাঠকেরা সেইরূপ অনুমতি করুন, আমি মহামহোপাধ্যায় Weber সাহেবের জয় গাই।

এই সকল পণ্ডিতেরা বলেন যে, কেবল ললিত-বিস্তরে পাণ্ডবদিগের নাম পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সে পাণ্ডবেরা পার্ব্বত্য দস্যু মাত্র। আমাদের বিবেচনা,

* এখনকার দৈবজ্ঞেরা এ কথা বলেন না, কিন্তু শতপথব্রাহ্মণেই এ কথা আছে। ২ কাণ্ড, ১ অধ্যায়, ২ ব্রাহ্মণ, ১১, দেখ।

তাহা হইতে এমন বুঝা যায় না যে, পাণ্ডুপুত্র পাণ্ডব পাঁচ জন কখনও জগতে বর্ত্তমান ছিলেন না। বাঙ্গালা সাহিত্যে "ফিরিঙ্গী" শব্দ যে দুই একখানা গ্রন্থে পাওয়া যায়, সে সকল গ্রন্থে ইহার অর্থ হয় "Eurasian," "European," 'Frank" শব্দ কোথাও পাওয়া যায় না, বা এ অর্থে 'ফিরিঙ্গী" শব্দ কোথাও ব্যবহৃত হয় নাই। ইহা হইতে যদি আমরা সিদ্ধ করি যে, "Frank" জাতি কখনও ছিল না, তাহা হইলে ইউরোপীয় পণ্ডিত ও তাঁহাদের শিষ্যগণ যে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, আমরাও সেই ভ্রমে পতিত হইব।*

এখনও লাসেন্ সাহেবের মতের সমালোচনা বাকি আছে। তিনি বলেন, কুরুপাঞ্চালের যুদ্ধ ঐতিহাসিক ব্যাপার; মহাভারতের ততটুকু ঐতিহাসিকতা আছে, কিন্তু তিনি পাণ্ডব প্রভৃতির নায়কনায়িকাদিগের প্রতি অবিশ্বাসযুক্ত। তিনি বলেন, অর্জ্জুনাদি সব রূপকমাত্র। যথা—অর্জ্জুন শব্দের অর্থ শ্বেতবর্ণ, এ জন্য যাহা আলোকময়, তাহাই অর্জ্জুন। যিনি অন্ধকার, তিনি কৃষ্ণ। কৃষ্ণাও তদ্রূপ। পাণ্ডবদিগের অবস্থানকালে যিনি রাজ্যধারণ করিয়াছিলেন, তিনি ধৃতরাষ্ট্র। পঞ্চপাণ্ডব, পাঞ্চালের পাঁচটি জাতি, এবং পাঞ্চালীর সহিত তাঁহাদের বিবাহ, ঐ পঞ্চজাতির এক করণসূচকমাত্র। যিনি ভদ্র অর্থাৎ মঙ্গল আনয়ন করেন, তিনি সুভদ্রা, অর্জ্জুনের সঙ্গে যাদবদিগের সৌহার্দ্দই এই সুভদ্রা, ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমি স্বীকার করি, হিন্দুদিগের শাস্ত্রগ্রন্থ সকলে —বেদে, ইতিহাসে, পুরাণে, কাব্যেও রূপকের অতিশয় প্রাবল্য। অনেক রূপক আছে। এই গ্রন্থে আমাদিগকেও অনেকগুলি রূপকের প্রসঙ্গ উপস্থাপিত করিতে হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া এমন স্বীকার

---

* "বৌদ্ধগ্রন্থকারেরা পাণ্ডব নামে পর্ব্বতবাসী একটি জাতির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন; তাহারা উজ্জয়িনী ও কোশলবাসীদের শত্রু ছিল। (Weber's H. I. Literature, 1878, 185) মহাভারতে পাণ্ডবদিকে হস্তিনাপুরবাসী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে বটে, কিন্তু ঐ গ্রন্থেরও স্থলবিশেষে লিখিত আছে, প্রথমে তাঁহারা হিমালয় পর্ব্বতে থাকিয়া পরিবর্দ্ধিত হন।

"এবং পাণ্ডোঃ সুতাঃ পঞ্চ দেবদত্তা মহাবলাঃ। * *
বিবর্দ্ধমানাস্তে তত্র পুণ্যে হৈমবতে গিরৌ।"

আদিপর্ব্ব। ১ ৪।২৭।২৯।

এইরূপে পাণ্ডুর দেব-দত্ত পাঁচটি মহাবল পুত্র * * সেই পবিত্র হিমালয় পর্ব্বতে পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকেন।

প্লিনি ও সলিনস্ নামে গ্রীক গ্রন্থকারেরা ভারতবর্ষের পশ্চিমোত্তর দিকে বাহ্লীক দেশের উত্তরাংশে সোগ্‌ডিয়েনা দেশের একটি নগরের নাম পাণ্ড্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং সিন্ধু নদীর মুখ সমীপস্থ জাতিবিশেষকেও পাণ্ড্য বলিয়া লিখিয়াছেন। ভূগোলবিৎ টলেমি পাণ্ড্য নাম লোকবিশেষকে বিতস্তা নদীর সমীপস্থ বলিয়া কীর্ত্তন করিতেছেন। কাত্যায়ন একটি পাণিনিসূত্রের বার্ত্তিকে পাণ্ডু হইতে পাণ্ড্য শব্দ নিষ্পন্ন করিয়াছেন। * লক্ষ্মীধর স্বকৃত ষড়্‌ভাষাচন্দ্রিকায় মধ্যে কেকয়বাহ্লীকাদি উত্তরদিকস্থ কতকগুলি জনপদের সহিত পাণ্ড্য দেশের নাম উল্লেখ করিয়াছেন এবং সে সমুদয়কে পিশাচ অর্থাৎ অসভ্য দেশবিশেষ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।

"পাণ্ড্যকেকয়বাহ্লীক * * * এতে পৈশাচদেশাঃ স্যুঃ।"

হরিবংশে দক্ষিণদিকস্থ চোল কেরলাদির সহিত পাণ্ড্য দেশের নাম উল্লিখিত আছে। (হরিবংশ ৩২ অঃ ১২৪ শ্লোক)। অতএব উহা দক্ষিণাপথের অন্তর্গত পাণ্ড্য দেশ। শ্রীমান্ উইলসন্ বিবেচনা করেন, ঐ জাতীয় লোক প্রথমে সোগডিয়েনা দেশের অধিবাসী ছিল; তথা হইতে ক্রমশঃ ভারতবর্ষে আসিয়া বাস করে এবং উত্তরোত্তর সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অধিবাস করিয়া পশ্চাৎ হস্তিনাপুরবাসী হয় ও অবশেষে দক্ষিণাপথে গিয়া পাণ্ড্যরাজ্য সংস্থাপন করে। (Asiatic Researches Vol, xv, P P. 95 and 96.)

রাজতরঙ্গিণীর মতে কাশ্মীররাজ্যের প্রথম রাজারা কুরুবংশীয়। অতএব তৎপ্রদেশ হইতে পাণ্ডবদের হস্তিনায় আসিয়া উপনিবেশ করা সম্ভব। তাঁহারা মধ্যদেশবাসী অথচ পাণ্ডব বলিয়া পরিচিত হইলেন, এই সমস্যা পূরণার্থেই কি পাণ্ডুপুত্র পাণ্ডব বলিয়া ক্রমশঃ একটি জনপ্রবাদ প্রচারিত হইল? তাঁহাদের জন্মবৃত্তান্তঘটিত গোলযোগ প্রসিদ্ধই আছে। লোকেও তাহাতে সংশয় প্রকাশ করিয়াছিল, তাহারও নিদর্শন পাওয়া যায়।

"যদা চিরমৃতঃ পাণ্ডুঃ কথং তস্যেতি চাপরে।"

আদিপর্ব্ব। ১।১১৭।

অন্য অন্য লোকে বলিল, "বহুকাল অতীত হইল, পাণ্ডু প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। অতএব ইঁহারা কিরূপে তাঁহার পুত্র হইতে পারেন?"

'ভারতবর্ষীয় উপাসকসম্প্রদায়' অক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত। দ্বিতীয় ভাগ, উপক্রমণিকা ১০৫ পৃঃ। অক্ষয় বাবু সচরাচর ইউরোপীয়দিগের মতের অবলম্বী।

---

* পাণ্ডোর্ড্যন্ বক্তব্য।—বার্ত্তিক।

করিতে পারি না যে, হিন্দুশাস্ত্রে যাহা কিছু আছে, সবই রূপক—যে রূপক ছাড়া শাস্ত্রগ্রন্থে আর কিছুই নাই।

আমরা ইহাও জানি যে, সংস্কৃত সাহিত্যে বা শাস্ত্রে যাহা কিছু আছে, তাহা রূপক হউক বা না হউক, রূপক বলিয়া উড়াইয়া দিতে অনেকেই ভালবাসেন। রামের নামের ভিতর 'রম্' ধাতু পাওয়া যায়, এবং সীতার নামের ভিতর 'সি' ধাতু পাওয়া যায়, এইজন্য রামায়ণ কৃষিকার্য্যের রূপকে পরিণত হইয়াছে। জর্ম্মন্ পণ্ডিতেরা এমনই দুই চারিটি ধাতু আশ্রয় করিয়া ঋগ্বেদের সকল সূক্তগুলিকে সূর্য্য ও মেঘের রূপক করিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। চেষ্টা করিলে বোধ করি, পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, তাহা এইরূপে উড়াইয়া দেওয়া যায়। আমাদিগের মনে পড়ে, এক সময় রহস্যচ্ছলে আমরা বিখ্যাত নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্রকে এইরূপ রূপক করিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলাম। তোমরা বলিবে, তিনি সে দিনের মনুষ্য—তাঁহার রাজধানী, রাজপুরী, রাজবংশ সকলই আজও বিদ্যমান আছে, তিনিও ইতিহাসে কীর্ত্তিত হইয়াছেন। তাহার উত্তরে বলা যায় যে, কৃষ্ণ অন্ধকার, তমোরূপী। কৃষ্ণনগরে অর্থাৎ অন্ধকারপূর্ণ স্থানে তাঁহার রাজধানী। তাঁহার ছয় পুত্র, অর্থাৎ তমোগুণ হইতে ছয় রিপুর উৎপত্তি। এক জন বালক পলাশীর যুদ্ধ সম্বন্ধে এইরূপ রূপক করিয়াছিল যে, পলমাত্র উদ্ভাসিত যে অসি, তাহা ক্লীবগুণযুক্ত ক্লৈব (Clive) কর্ত্তৃক প্রযুক্ত হওয়ায় সুরাজা অর্থাৎ যিনি উত্তম রাজা ছিলেন, তিনি পরাভূত হইয়াছিলেন। অতএব রূপকের অভাব নাই। আর এই বালকরচিত রূপকের সঙ্গে লাসেনরচিত শ্লোকের বিশেষ প্রভেদ দেখা যায় না। আমরা ইচ্ছা করিলে, 'লস' ধাতু খোদ লাসেন সাহেবের নামের ব্যুৎপত্তিসিদ্ধ করিয়া তাঁহার ঐতিহাসিক গবেষণা ক্রীড়াকৌতুক বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারি।

ভারতবর্ষের ইতিহাসলেখক Talboys Wheeler সাহেবেরও একটা মত আছে। যখন হস্তী অশ্ব তলগামী, তখন মেষের জলপরিমাণেচ্ছার প্রতি বেশী শ্রদ্ধা করা যায় না। তিনি বলেন,—হাঁ, ইহার কিছু ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে বটে, কিন্তু তাহা অতি সামান্যমাত্র—

The adventures of the Pandavas in the jungle, and their encounters with Asuras and Rakshasas are all palpable fictions, still they are valuable as traces which have been left in the minds of the people of the primitive wars of the Aryans against the aborigines.

টলবয়স্ হুইলর সাহেব সংস্কৃত জানেন না, মহাভারত কখনও পড়েন নাই। তাঁহার অবলম্বন বাবু অবিনাশ চন্দ্র ঘোষ নামে কোন ব্যক্তি। তিনি অবিনাশ বাবুকে অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, মূল মহাভারত অনুবাদ করিয়া তাঁহাকে দেন। অবিনাশ বাবু রহস্যপ্রিয় লোক সন্দেহ নাই, কাশী দাসের মহাভারত হইতে কতদূর অনুবাদ করিয়াছিলেন, বলিতে পারি না, কিন্তু হুইলর সাহেব চন্দ্রহাস ও বিষয়ার উপাখ্যান প্রভৃতি সামগ্রী মূল মহাভারতের অংশ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। যে বর্ষীয়সী মাণিকপীরের গান শুনিয়া রামায়ণ-ভ্রমে অশ্রুমোচন করিতেছিল, বোধ হয়, সেও এই পণ্ডিতবরের অপেক্ষা উপহাসাস্পদ নহে। ঈদৃশ লেখকের মতের প্রতিবাদ করা পাঠকের সময় বৃথা নষ্ট করা বিবেচনা করি। ফলে মহাভারতের যে অংশ মৌলিক, তাহার লিখিত বৃত্তান্ত ও পাণ্ডবাদি নায়ক সকল কল্পনাপ্রসূত, এরূপ বিবেচনা করিবার কোন উপযুক্ত কারণ এ পর্য্যন্তু নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। যাহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার সকলই এইরূপ অকিঞ্চিৎকর। সকলগুলির প্রতিবাদ করিবার এ গ্রন্থে স্থান হয় না। মহাভারতের অনেক ভাগ প্রক্ষিপ্ত, ইহা আমি স্বীকার করিয়াছি। কিন্তু পাণ্ডবাদির সকল কথা প্রক্ষিপ্ত নহে। ইহা প্রক্ষিপ্ত বিবেচনা করিবার কোন কারণ নাই। তাঁহারা ঐতিহাসিক, ইহা বিবেচনা করিবার কারণ যাহা বলিয়াছি, তাহা যদি যথেষ্ট না হয়, তবে পর পরিচ্ছেদে আরও কিছু বলিতেছি।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

পাণ্ডবদিগের ঐতিহাসিকতা

পাণিনি সূত্র করিয়াছেন,—

"মহান্ ব্রীহ্যপরাহ্নগৃষ্টীষ্বাসজাবালভারতহৈলিহিলরৌরবপ্রবৃদ্ধেষু।" ৬।২।৩৮

অর্থাৎ ব্রীহি ইত্যাদি শব্দের পূর্ব্বে মহৎ শব্দ প্রযুক্ত হয়। তাহার মধ্যে একটি শব্দ 'ভারত।' অতএব পাণিনিতে মহাভারত শব্দ পাওয়া গেল। প্রসিদ্ধ ইতিহাস গ্রন্থ ভিন্ন আর কোন বস্তু "মহাভারত" নামে কখনও অভিহিত হইয়াছিল, এমন প্রমাণ নাই। Weber সাহেব বলেন, এখানে মহাভারত অর্থে ভরতবংশ। এটা কেবল তাঁহার গায়ের জোর। এমন প্রয়োগ কোথাও নাই।

পুনশ্চ, পাণিনি সূত্র—

"গবিযুধিভ্যাং স্থিরঃ।" ৮।৩।৯৫

গবি ও যুধি শব্দের পর স্থির শব্দের স স্থানে ষ হয়। যথা—গবিষ্ঠিরঃ, যুধিষ্ঠিরঃ।

পুনশ্চ, পাণিনিসূত্র—

"বহ্বচ ইঞঃ প্রাচ্যভরতেষু।" ২।৪।৬৬

ভরতগোত্রের উদাহরণ "যুধিষ্ঠিরাঃ"। *

পুনশ্চ—

"স্ত্রিয়ামবন্তিকুন্তীকুরুভ্যশ্চ।" ৪।১।১৭৬

পাওয়া গেল "কুন্তী"।

পুনশ্চ—

"বাসুদেবার্জ্জুনাভ্যাং বুন্।" ৪।৩।৯৮

অর্থাৎ বাসুদেব ও অর্জ্জুন শব্দের পর ষষ্ঠ্যর্থে বুন্ হয়।

পুনশ্চ—

"নভ্রাণ নপান্নবেদানাসত্যানমুচিনকুল-নখ-নপুংসক-নক্ষত্রনক্রনাকেষু।" ৬।৩।৭৫

ইহাতে "নকুল" পাওয়া গেল।

"দ্রোণপর্ব্বতজীবন্তাদন্যতরস্যাম্।"

"দ্রৌণায়ন" শব্দ পাওয়া গেল। ইহাতে অশ্বত্থমা ভিন্ন আর কিছুই বুঝায় না। এইরূপ পাঁচটি পাণ্ডবের নামই এবং কুন্তী, দ্রোণ, অশ্বত্থমা প্রভৃতির নাম পাণিনি-সূত্রে পাওয়া যায়।

যদি মহাভারত গ্রন্থের নাম এবং সেই গ্রন্থের নায়কদিগের নাম পাওয়া গেল, তবে পাণিনির সময়েও মহাভারত পাণ্ডবদিগের ইতিহাস। এখন দেখিতে হইবে, পাণিনি কবেকার লোক।

ভারতদ্বেষী Weber সাহেব তাঁহাকেও আধুনিক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু এখানে তাঁহার মত চলে নাই,—স্বয়ং গোল্ডষ্টুকর পাণিনির অভ্যুদয়কাল নির্ণীত করিয়াছেন। তিনি যাহা বলেন, তাহার বিস্তারিত বিবরণ লিখিবার স্থান এ নহে ; কিন্তু বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত তাঁহার গ্রন্থের সারাংশ বাঙ্গালায় সঙ্কলন করিয়াছেন, অতএব না বলিলেও চলিবে। যাঁহারা বাঙ্গলা গ্রন্থ পড়িতে ঘৃণা করেন, তাঁহারা গোল্ডষ্টুকরের গ্রন্থই ইংরাজিতে পড়িতে পারেন, তাঁহার বিচারে পাণিনি অতি প্রাচীন বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। এ জন্য Weber সাহেব অতিশয় দুঃখিত। তিনি গোল্ডষ্টুকরের প্রতিবাদও করিয়াছেন, এবং লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া বলিয়াছেন, জয়পতাকা আমিই উড়াইয়াছি। কিন্তু কেহ আর তাহা বলে না।

গোল্ডষ্টুকর প্রমাণ করিয়াছেন যে, পাণিনির সূত্র যখন প্রণীত হয়, তখন বুদ্ধদেবের * আবির্ভাব হয় নাই, তবেই পাণিনি অন্ততঃ খ্রীঃ-পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক। কিন্তু কেবল তাহাই নহে, তখন ব্রাহ্মণ, আরণ্যক উপনিষদ্ প্রভৃতি বেদাংশ সকলও প্রণীত হয় নাই। ঋক্, যজুঃ, সাম, সংহিতা ভিন্ন আর কিছুই হয় নাই। আশ্বলায়ন, সাংখ্যায়ন প্রভৃতি অভ্যুদিত হন নাই। মক্ষমূলর বলেন, ব্রাহ্মণ-প্রণয়ন-কাল খ্রীঃ-পূঃ সহস্র বৎসর হইতে আরম্ভ। ডাক্তার মার্টিন হোগ বলেন, ঐ শেষ ; খ্রীঃ-পূঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে আরম্ভ। অতএব পাণিনির সময় খ্রীঃ-পূঃ দশম বা একাদশ শতাব্দী বলিলে বেশী বলা হয় না।

Max Mullar, Weber প্রভৃতি অনেকেই এ বিচারে প্রবৃত্ত, কিন্তু কাহারও কথায় গোল্ডষ্টুকরের মত খণ্ডিত হইতেছে না। অতএব আচার্য্যের এ মত গ্রহণ করা যাইতে পারে। তবে ইহা স্থির যে, খ্রীষ্টের সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে যুধিষ্ঠিরাদির বৃত্তান্তসংযুক্ত মহাভারত গ্রন্থ প্রচলিত ছিল। এমন প্রচলিত যে, পাণিনিকে মহাভারত ও যুধিষ্ঠিরাদির ব্যুৎপত্তি লিখিতে হইয়াছে। আর ইহাও সম্ভব যে, তাঁহার অনেক পূর্ব্বেই মহাভারত প্রচলিত হইয়াছিল। কেন না, "বাসুদেবার্জ্জুনাভ্যাং বুন্" এই সূত্রে 'বাসুদেবক' ও 'অর্জ্জুনক' শব্দ এই অর্থে পাওয়া যায় যে, বাসুদেবের উপাসক, অর্জ্জুনের উপাসক। অতএব পাণিনিসূত্র-প্রণয়নের পূর্ব্বেই কৃষ্ণার্জ্জুন দেবতা বলিয়া স্বীকৃত হইতেন। অতএব মহাভারতের যুদ্ধের অনতি পরেই আদিম মহাভারত প্রণীত হইয়াছিল বলিয়া যে প্রসিদ্ধি আছে, তাহার উচ্ছেদ করিবার কোন কারণ দেখা যায় না।

এক্ষণে ইহাও বক্তব্য যে, কেবল পাণিনির নয়, আশ্বলায়ন ও সাংখ্যায়ন গৃহ্যসূত্রেও মহাভারতের প্রসঙ্গ আছে। অতএব মহাভারতের প্রাচীনতা সম্বন্ধে বড় গোলযোগ করার কাহারও অধিকার নাই।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

কৃষ্ণের ঐতিহাসিকতা

কৃষ্ণের নাম পাণিনির কোন সূত্রে থাক না থাক, তাহাতে আসিয়া যায় না। কেন না, ঋগ্বেদসংহিতায়

---

* উদাহরণটি সিদ্ধান্তকৌমুদীর, ইহা বলা কর্ত্তব্য।

* মহাভারতে 'বৌদ্ধ' শব্দ পাওয়া যায়, কিন্তু ঐ অংশ যে প্রক্ষিপ্ত, তাহাও অনায়াসে প্রমাণ করা যাইতে পারে।

কৃষ্ণ * শব্দ অনেকবার পাওয়া যায়। প্রথম মণ্ডলের ১১৬ সূক্তে ২৩ ঋকে এবং ১১৭ সূক্তের ৭ ঋকে এক কৃষ্ণের নাম আছে। সে কৃষ্ণ কে, তাহা জানিবার উপায় নাই। সম্ভবতঃ তিনি বসুদেবনন্দন নহেন। তাহার পর দেখিতে পাই, ঋগ্বেদসংহিতার অনেকগুলি সূক্তের ঋষি এক জন কৃষ্ণ। তাঁহার কথা পরে বলিতেছি। অথর্ব্বসংহিতায় অসুর কৃষ্ণকেশীর নিধনকারী কৃষ্ণের কথা আছে। তিনি বসুদেবনন্দন সন্দেহ নাই। কেশিনিধনের কথা আমি পশ্চাৎ বলিব।

পাণিনির সূত্রে 'বাসুদেব' নাম আছে—সে সূত্র উদ্ধৃত করিয়াছি। কৃষ্ণ মহাভারতে বাসুদেব নামে সচরাচর অভিহিত হইয়াছেন। বসুদেবের পুত্র বলিয়াই বাসুদেব নাম নহে, সে কথা স্থানান্তরে বলিব। বসুদেবের পুত্র না হইলেও বাসুদেব নাম হয়। এই মহাভারতেই পাওয়া যায়, পুণ্ড্রাধিপতিরও নাম ছিল বাসুদেব। বসুদেবকে কবিকল্পনা বলিতে হয়, বল—কিন্তু বাসুদেব কবিকল্পনা নহেন।

ইউরোপীয়দিগের মত এই যে, কৃষ্ণ আদৌ মহাভারতে ছিলেন না, পরে মহাভারতে তাঁহাকে বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এরূপ বিবেচনা করিবার যে সকল কারণ তাঁহারা নির্দ্দেশ করেন, তাহা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। কেহ বলেন, কৃষ্ণকে মহাভারত হইতে উঠাইয়া দিলে, মহাভারতের কোন ক্ষতি হয় না। এক হিসাবে নয় বটে। গত ফরাসী-প্রুষের যুদ্ধ হইতে মোল্টকেকে উঠাইয়া দিলে কোন ক্ষতি হয় না। Gravelotte, Wœrth, Metz, Sedan, Paris প্রভৃতি রণজয় সবই বজায় থাকে; কেন না, Moltke হাতে হাতিয়ারে এ সকলের কিছুই করেন নাই। তাঁহার সেনাপতিত্ব তারে তারে বা পত্রে পত্রে নির্ব্বাহিত হইয়াছিল। মহাভারত হইতে কৃষ্ণকে উঠাইয়া দিলে সেইরূপ ক্ষতি হয় না। তাহার বেশী ক্ষতি হয় কি না, এ গ্রন্থ পাঠ করিলেই পাঠক জানিতে পারিবেন।

হুইলর সাহেবেরও এ বিষয়ে একটা মত আছে। তাঁহার যেরূপ পরিচয় দিয়াছি, তাহাতে বোধ হয়, তাঁহার মতের প্রতিবাদের বিশেষ প্রয়োজন নাই। তথাপি মতটা কিয়ৎ পরিমাণে চলিয়াছে বলিয়া তাঁহার প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিলাম। তিনি বলেন, দ্বারকা হস্তিনাপুর হইতে সাত শত ক্রোশ ব্যবধান। কাজেই কৃষ্ণের সঙ্গে পাণ্ডবদিগের যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ মহাভারতে কথিত হইয়াছে, তাহা অসম্ভব। কেন অসম্ভব, আমরা তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, কাজেই উত্তর করিতে পারিলাম না। বাঙ্গালার মুসলমান রাজপুরুষদিগের সঙ্গে দিল্লীর পাঠান মোগল রাজপুরুষদিগের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যিনিই স্মরণ করিবেন, তিনিই বোধ হয়, হুইলর সাহেবের এই অশ্রাব্য কথায় কর্ণপাত করিবেন না।

বিখ্যাত ফরাসী পণ্ডিত Bournouf বলেন যে, বৌদ্ধশাস্ত্রে কৃষ্ণ নাম না পাইলে, ঐ শাস্ত্র-প্রচারের উত্তরকালে কৃষ্ণোপাসনা প্রবর্ত্তিত হয়, বিবেচনা করিতে হইবে। কিন্তু বৌদ্ধশাস্ত্রের মধ্যে ললিতবিস্তরে কৃষ্ণের নাম আছে। বৌদ্ধশাস্ত্র মধ্যে সূত্রপিটক সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ। তাহাতেও কৃষ্ণের নাম আছে। ঐ গ্রন্থে কৃষ্ণকে অসুর বলা হইয়াছে। কিন্তু নাস্তিক ও হিন্দুধর্ম্মবিরোধী বৌদ্ধেরা কৃষ্ণকে যে অসুর বিবেচনা করিবে, ইহা বিচিত্র নয়। আর ইহাও বক্তব্য, বেদাদিতে ইন্দ্রাদি দেবগণকে মধ্যে মধ্যে অসুর বলা হইয়াছে। বৌদ্ধেরা ধর্ম্মের প্রধান শত্রু যে প্রবৃত্তি, তাহার নাম দিয়াছেন "মার।" কৃষ্ণ-প্রচারিত অপূর্ব্ব নিষ্কামধর্ম্ম, তৎকৃত সনাতন ধর্ম্মের অপূর্ব্ব সংস্কার, স্বয়ং কৃষ্ণের উপাসনা বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারের প্রধান বিঘ্ন ছিল সন্দেহ নাই। অতএব তাঁহারা কৃষ্ণকেই অনেক সময়ে "মার" বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

এ সকল কথা থাক। ছান্দোগ্যোপনিষদে একটি কথা আছে; সেইটি উদ্ধৃত করিতেছি। কথাটি এই—

"তদ্ধৈতদ্ঘোর আঙ্গিরসঃ কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায় উক্ত্বা, উবাচ। অপিপাস এব স বভূব। সোঽন্তবেলায়ামেতত্রয়ং প্রতিপদ্যেত অক্ষিতমসি, অচ্যুতমসি, প্রাণসংশিতমসীতি।"

ইহার অর্থ। আঙ্গিরসবংশীয় ঘোর (নামে ঋষি) দেবকীপুত্র কৃষ্ণকে এই কথা বলিয়া বলিলেন, (শুনিয়া তিনিও পিপাসাশূন্য হইলেন) যে অন্তকালে এই তিনটি

* কৃষ্ণ শব্দ আমি পাণিনির অষ্টাধ্যায়ে খুঁজিয়া পাই নাই—আছে কি না, বলিতে পারি না। কিন্তু কৃষ্ণ শব্দ পাণিনির পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল, তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই। কেন না, ঋগ্বেদসংহিতায় কৃষ্ণ শব্দ পুনঃপুনঃ পাওয়া যায়। কৃষ্ণনামা বৈদিক ঋষির কথা পশ্চাৎ বলিতেছি। তদ্ভিন্ন অষ্টম মণ্ডলে ৯৬ সূক্তে কৃষ্ণনামা এক জন অনার্য্য রাজার কথা পাওয়া যায়। এই অনার্য্য কৃষ্ণ অংশুমতী নদীতীর-নিবাসী; সুতরাং ইনি যে বাসুদেব কৃষ্ণ নহেন, তাহা নিশ্চিত। পাঠক ইহাতে বুঝিতে পারিবেন যে, পাণিনির কোন সূত্রে "কৃষ্ণ" শব্দ থাকিলেও তাহা বাসুদেব কৃষ্ণের ঐতিহাসিকতার প্রমাণ বলিয়া গণ্য হয় না। কিন্তু পাণিনিসূত্রে "বাসুদেব" নাম যদি পাওয়া যায়, তবে তাহা প্রমাণ বলিয়া গণ্য। ঠিক তাহাই আছে।

কথা অবলম্বন করিবে, "তুমি অক্ষিত, তুমি অচ্যুত, তুমি প্রাণসংশিত।"

এই ঘোর ঋষির পুত্র কণ্ব।* ঘোরপুত্র কণ্ব ঋগ্বেদের কতকগুলি সূক্তের ঋষি। যথা, প্রথম মণ্ডলে ৩৬ সূক্ত হইতে ৪৩ সূক্ত পর্য্যন্ত; এবং কণ্বের পুত্র মেধাতিথি ঐ মণ্ডলের ১২শ হইতে ২৩শ পর্য্যন্ত সূক্তের ঋষি। এবং কণ্বের অন্য পুত্র প্রস্কণ্ব ঐ মণ্ডলের ৪৪ হইতে ৫০ পর্য্যন্ত সূক্তের ঋষি। এখন নিরুক্তকার যাস্ক বলেন, "যস্য বাক্যং স ঋষিঃ" অতএব ঋষিগণ সূক্তের প্রণেতা হউন বা না হউন, বক্তা বটে; অতএব ঘোরের পুত্র এবং পৌত্রগণ ঋগ্বেদের কতকগুলি সূক্তের বক্তা। তাহা যদি হয় তবে ঘোর-শিষ্য কৃষ্ণ তাঁহাদিগের সমসাময়িক, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এখন আগে বেদের সূক্তগুলি উক্ত হইয়াছিল, তাহার পর বেদবিভাগ হইয়াছিল, এ সিদ্ধান্তের কোনও মতেই প্রতিবাদ করা যায় না। অতএব কৃষ্ণ বেদবিভাগকর্ত্তা বেদব্যাসের সমসাময়িক লোক, উপন্যাসের বিষয়মাত্র নহেন, তদ্বিষয়ে কোনও সংশয় করা যায় না।

ঋগ্বেদসংহিতার অষ্টম মণ্ডলের ৮৫।৮৬।৮৭ সূক্ত এবং দশম মণ্ডলের ৪২।৪৩।৪৪ সূক্তের ঋষি কৃষ্ণ। এই কৃষ্ণ দেবকীনন্দন কৃষ্ণ কি না, তাহার নির্ণয় করা দুরূহ। কিন্তু কৃষ্ণ ক্ষত্রিয় বলিয়াই বলা যাইতে পারে না যে, তিনি এই সকল সূক্তের ঋষি নহেন; কেন না, ত্রসদস্যু, ত্র্যরুণ, পুরুমীঢ়, অজমীঢ়, সিন্ধুদ্বীপ, সুদাস, মান্ধাতা, শিবি, প্রতর্দ্দন, কক্ষীবান্ প্রভৃতি রাজর্ষি যাঁহারা ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত, তাঁহারাও ঋগ্বেদসূক্তের ঋষি, ইহা দেখা যায়। দুই এক স্থানে শূদ্র ঋষির উল্লেখও পাওয়া যায়। কবষ নামে দশম মণ্ডলে এক জন শূদ্র ঋষি আছেন; অতএব ক্ষত্রিয় বলিয়া কৃষ্ণের ঋষিত্বে আপত্তি হইতে পারে না। তবে ঋগ্বেদসংহিতার অনুক্রমণিকায় শোনক কৃষ্ণ আঙ্গিরস ঋষি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

উপনিষদ্ সকল বেদের শেষভাগ, এই জন্য উপনিষদ্‌কে বেদান্তও বলে। বেদের যে সকল অংশকে ব্রাহ্মণ বলে, তাহা উপনিষদ্ হইতে প্রাচীনতর বলিয়া বোধ হয়। অতএব ছান্দোগ্যোপনিষদ্ হইতে কৌষীতকি-ব্রাহ্মণ আরও প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। তাহাতেও এই আঙ্গিরস ঘোরের নাম আছে এবং কৃষ্ণেরও নাম আছে। কৃষ্ণ তথায় দেবকীপুত্র বলিয়া বর্ণিত হয়েন নাই, আঙ্গিরস বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। কিন্তু কতকগুলি ক্ষত্রিয়ও আঙ্গিরস বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। তদ্বিষয়ে বিষ্ণুপুরাণে একটি প্রাচীন শ্লোক ধৃত হইয়াছে।

"এতে ক্ষত্রপ্রসূতা বৈ পুনশ্চাঙ্গিরসঃ স্মৃতাঃ।
রথীতরাণাং প্রবরাঃ ক্ষত্রোপেতা দ্বিজাতয়ঃ॥"

৪ অংশ ২।২

কিন্তু এই রথীতর রাজা সূর্য্যবংশীয়। কৃষ্ণের পূর্ব্বপুরুষ যদু যযাতির পুত্র. কাজেই চন্দ্রবংশীয়। এই কথাই সকল পুরাণেতিহাসে লেখে, কিন্তু হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে পাওয়া যায় যে, মথুরার যাদবেরা ইক্ষ্বাকুবংশীয়।

"এবং ইক্ষ্বাকুবংশাদ্ধি যদুবংশো বিনিঃসৃতঃ।"

৯৫ অধ্যায়, ৫২৯ শ্লোক।

কথাটাও খুব সম্ভব, কেন না, রামায়ণে পাওয়া যায় যে, ইক্ষ্বাকুবংশীয় রামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শত্রুঘ্ন মথুরা জয় করিয়াছিলেন।

সে যাহাই হউক, "বাসুদেবার্জ্জুনাভ্যাং বুন্" এই সূত্র আমরা পাণিনি হইতে উদ্ধৃত করিয়াছি। কৃষ্ণ এত প্রাচীনকালের লোক যে, পাণিনির সময়ে উপাস্য বলিয়া আর্য্যসমাজে গৃহীত হইয়াছিলেন। ইহাই যথেষ্ট।

নবম পরিচ্ছেদ

মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত

আমরা এতক্ষণ যাহা বলিলাম, তাহার স্থূলমর্ম্ম এই যে, মহাভারতের ঐতিহাসিকতা আছে এবং মহাভারতে কৃষ্ণপাণ্ডব সম্বন্ধীয় ঐতিহাসিক কথা পাওয়া যায়। কিন্তু এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, মহাভারতে কৃষ্ণপাণ্ডব সম্বন্ধে যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহাই কি ঐতিহাসিক তত্ত্ব?

মহাভারতের ঐতিহাসিকতা বা মহাভারতে কথিত কৃষ্ণপাণ্ডবসম্বন্ধীয় বৃত্তান্তের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে ইউরোপীয়গণের যে প্রতিকূল ভাব, তাহার মূলে এই কথা আছে যে, প্রাচীনকালে মহাভারত ছিল বটে, কিন্তু সে এ মহাভারত নহে। ইহার অর্থ যদি এমন বুঝিতে হয় যে, প্রচলিত মহাভারতে সেই প্রাচীন মহাভারতের কিছুই নাই, তাহা হইলে আমরা তাঁহাদের কথা যথার্থ বলিয়া স্বীকার করি না এবং এরূপ স্বীকার করি না বলিয়াই তাঁহাদের কথার এত প্রতিবাদ করিয়াছি। আর তাঁহাদের কথার মর্ম্মার্থ যদি এই হয় যে, সে প্রাচীন মহাভারতের উপর অনেক প্রক্ষিপ্ত উপন্যাসাদি চাপান হইয়াছে, প্রাচীন মহাভারত তাহার

---

* এই কণ্ব শকুন্তলার পালকপিতা কণ্ব নহেন। সে কণ্ব কাশ্যপ, ঘোরপুত্র কণ্ব আঙ্গিরস।

ভিতর ডুবিয়া আছে, তবে তাঁহাদের সঙ্গে আমার কোন মতভেদ নাই।

আমরা পুনঃপুঃ বলিয়াছি যে, পরবর্ত্তী প্রক্ষিপ্তকারদিগের রচনাবাহুল্যে আদিম মহাভারত প্রোথিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ঐতিহাসিকতা যদি কিছু থাকে, তবে সে আদিম মহাভারতের। অতএব বর্ত্তমান মহাভারতের কোন্ অংশ আদিম মহাভারতভুক্ত, তাহাই প্রথমে আমাদের বিচার্য্য বিষয়। তাহাতে কৃষ্ণকথা যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহারই কিছু ঐতিহাসিক মূল্য থাকিলে থাকিতে পারে। তাহাতে যাহা নাই, অন্য গ্রন্থে থাকিলেও তাহার ঐতিহাসিক মূল্য অপেক্ষাকৃত অল্প। কেন না, মহাভারতই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ।

প্রাচীন সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই বলিবেন, মহাভারতের কোন অংশই যে প্রক্ষিপ্ত, তাহারই বা প্রমাণ কি? এই পরিচ্ছেদে তাহার কিছু প্রমাণ দিব।

আদিপর্ব্বের দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়। মহাভারতে যে যে বিষয় বর্ণিত বা বিবৃত আছে, ঐ পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়ে তাহার গণনা করা হইয়াছে। উহা এখনকার গ্রন্থের সূচিপত্র বা Table of Contents সদৃশ। অতি ক্ষুদ্র বিষয়ও ঐ পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়ের গণনাভুক্ত হইয়াছে। এখন যদি দেখা যায় যে, কোন একটা গুরুতর বিষয় ঐ পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়ভুক্ত নহে, তবে অবশ্য বিবেচনা করিতে হইবে যে, উহা প্রক্ষিপ্ত। একটা উদাহরণ দিতেছি। আশ্বমেধিক পর্ব্বে অনুগীতা ও ব্রাহ্মণগীতা পর্ব্বাধ্যায় পাওয়া যায়। এই দুইটি ক্ষুদ্র বিষয় নয়, ইহাতে ছত্রিশ অধ্যায় গিয়াছে। কিন্তু পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়ে উহার কিছু উল্লেখ নাই, সুতরাং বিবেচনা করিতে হইবে যে, অনুগীতা ও ব্রাহ্মণগীতা সমস্তই প্রক্ষিপ্ত।

২য়—অনুক্রমণিকাধ্যায়ে কথিত হইয়াছে যে, মহাভারতের লক্ষ শ্লোক এবং পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়ে কোন্ পর্ব্বে কত শ্লোক, তাহা লিখিত হইয়াছে। যথা—

আদি	...	...	৮৮৮৪
সভা	...	...	২৫১১
বন	...	...	১১,৬৬৪
বিরাট	...	...	২০৫০
উদ্যোগ	...	...	৬৬৯৮
ভীষ্ম	...	...	৫৮৮৪
দ্রোণ	..	...	৮৯০৯
কর্ণ	...	...	৪৯৬৪
শল্য	...	...	৩২২০
সৌপ্তিক	...	...	৮৭০
স্ত্রী	...	...	৭৭৫
শান্তি	...	...	১৪,৭৩২
অনুশাসন	...	...	৮০০০
আশ্বমেধিক	...	...	৩৩২০
আশ্রমবাসিক	...	...	১৫০৬
মৌসল	...	...	৩২০
মাহাপ্রস্থানিক	...	...	৩২০
স্বর্গারোহণ	...	...	২০৯

ইহাতে কিন্তু লক্ষ শ্লোক হয় না, মোট ৮৪,৮৩৬ হয়। অতএব লক্ষ শ্লোক পূরাইবার জন্য পর্ব্বাধ্যায়সংগ্রহকার লিখিলেন,—

"অষ্টাদশৈবমুক্তানি পর্ব্বাণ্যেতান্যশেষতঃ।
খিলেষু হরিবংশশ্চ ভবিষ্যঞ্চ প্রকীর্ত্তিতম্।
দশশ্লোকসহস্রাণি বিংশচ্ছ্লোকশতানি চ।
খিলেষু হরিবংশে চ সংখ্যাতানি মহর্ষিণা॥"

অর্থাৎ "এইরূপে অষ্টাদশপর্ব্ব সবিস্তারে উক্ত হইয়াছে। ইহার পর হরিবংশ ভবিষ্যপর্ব্ব কথিত হইয়াছে। মহর্ষি হরিবংশে দ্বাদশ সহস্র শ্লোকসংখ্যা করিয়াছেন।" পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়ে এইটুকু ভিন্ন হরিবংশের আর কোন প্রসঙ্গ নাই। ইহাতে ৯৬৮৩৬ শ্লোক হইল। এক্ষণে প্রচলিত মহাভারতের শ্লোক গণনা করিয়া নিম্নলিখিত সংখ্যা সকল পাওয়া যায়:—

আদি	...	...	৮৪৭৯
সভা	...	...	২৭০৯
বন	...	...	১৭,৪৭৮
বিরাট	...	...	২৩১৬
উদ্যোগ	...	...	৭৬৫৬॥
ভীষ্ম	...	...	৫৮৫৬
দ্রোণ	...	...	৯৬৪৯
কর্ণ	...	...	৫০৪৬
শল্য	...	...	৩৬৭১
সৌপ্তিক	...	...	৮১১
স্ত্রী	...	...	৮২৭॥
শান্তি	...	...	১৩,৯৪৩
অনুশাসন	...	...	৭৭৯৬
আশ্বমেধিক	...	...	২৯০০
আশ্রমবাসিক	...	...	১১০৫
মৌসল	...	...	২৯২
মাহাপ্রস্থানিক	...	...	১০৯
স্বর্গারোহণ	...	...	৩১২
খিল হরিবংশ	...	...	১৬৩৭৪

মোট ১,০৭,৩৯০। ইহাতে দেখা যায় যে, প্রথমতঃ মহাভারতে লক্ষ শ্লোক কখনই ছিল না। পর্ব্বসংগ্রহের

পর হরিবংশ লইয়া মোটের উপর প্রায় এগার হাজার শ্লোক বাড়িয়াছে, অর্থাৎ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে।

৩য়,—এইরূপ হ্রাসবৃদ্ধির উদাহরণস্বরূপ অনুক্রমণিকাধ্যায়কে গ্রহণ করা যাইতে পারে। অনুক্রমণিকাধ্যায়ে ১০২ শ্লোকে লিখিত আছে যে, ব্যাসদেব সার্দ্ধশত শ্লোকময়ী অনুক্রমণিকা লিখিয়াছিলেন।

"ততোঽধ্যর্দ্ধশতং ভূয়ঃ সংক্ষেপং কৃতবানৃষিঃ।
অনুক্রমণিকাধ্যায়ং বৃত্তান্তানাং সপর্ব্বণাম্॥"

এক্ষণে বর্ত্তমান মহাভারতের অনুক্রমণিকাধ্যায়ে ২৭২ শ্লোক পাওয়া যায়। অতএব পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায় লিখিত হওয়ার পরে এই অনুক্রমণিকাতেই ১২২ শ্লোক বেশী পাওয়া যায়।

৪র্থ,—পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়ে ৮৪,৮৩৬ শ্লোক পাওয়া যায়। কিন্তু সহজেই বুঝা যাইতে পারে যে, পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায় আদিম মহাভারতকার কর্ত্তৃক সঙ্কলিত নয় এবং আদিম মহাভারত রচিত হইবার সময়েও সঙ্কলিত হয় নাই। মহাভারতেই আছে যে, মহাভারত বৈশম্পায়ন জনমেজয়ের নিকট কহিয়াছিলেন। তাহাই উগ্রশ্রবাঃ নৈমিষারণ্যে শৌনকাদি ঋষিগণের নিকট কহিতেছেন। পর্ব্বাধ্যায়সংগ্রহকার এই সংগ্রহ উগ্রশ্রবার উক্তি বলিয়া বর্ণিত করিয়াছেন। বৈশম্পায়নের উক্তি নহে, কাজেই ইহা আদিম বা বৈশম্পায়নের মহাভারতের অংশ নহে। অনুক্রমণিকাধ্যায়েই আছে যে, কেহ কেহ প্রথমাবধি, কেহ বা আস্তীকপর্ব্বাবধি, কেহ বা উপরিচর রাজার উপাখ্যানাবধি মহাভারতের আরম্ভ বিবেচনা করেন। সুতরাং যখন এই মহাভারত উগ্রশ্রবাঃ ঋষিদিগকে শুনাইতেছিলেন, তখনই পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায় দূরে থাক, প্রথম ৬২ অধ্যায়, সমস্ত* প্রক্ষিপ্ত বলিয়া প্রবাদ ছিল। এই পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায় পাঠ করিলেই বিবেচনা করা যায় যে, প্রক্ষিপ্তাংশ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়াতে ভবিষ্যতে তাহার নিবারণের জন্য এই পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায় সঙ্কলনপূর্ব্বক অনুক্রমণিকাধ্যায়ের পর কেহ সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। অতএব এই পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায় সঙ্কলিত হইবার পূর্ব্বেও যে অনেক অংশ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহাই অনুমেয়।

৫ম,—ঐ অনুক্রমণিকাধ্যায়ে আছে যে, মহাভারত প্রথমতঃ উপাখ্যান ত্যাগ করিয়া চতুর্ব্বিংশতি সহস্র শ্লোকে বিরচিত হয় এবং বেদব্যাস তাহাই প্রথমে স্বীয় পুত্র শুকদেবকে অধ্যয়ন করান।

"চতুর্ব্বিংশতিসাহস্রীং চক্রে ভারতসংহিতাম্।
উপাখ্যানৈর্ব্বিনা তাবদ্ভারতং প্রোচ্যতে বুধৈঃ।
ততোঽধ্যর্দ্ধশতং ভূয়ঃ সংক্ষেপং কৃতবানৃষিঃ।
অনুক্রমণিকাধ্যায়ং বৃত্তান্তানাং সপর্ব্বণাম্॥
ইদং দ্বৈপায়নঃ পূর্ব্বং পুত্রমধ্যাপয়ৎ শুকম্।
ততোঽন্যেভ্যোঽনুরূপেভ্যঃ শিষ্যেভ্যঃ প্রদদৌ বিভুঃ॥"

আদিপর্ব্ব, ১০১-১০৩

শুকদেবের নিকট বৈশম্পায়ন মহাভারত শিক্ষা করিয়াছিলেন। অতএব এই চতুর্ব্বিংশতিসহস্রশ্লোকাত্মক মহাভারতই জনমেজয়ের নিকট পঠিত হইয়াছিল এবং আদিম মহাভারতে চতুর্ব্বিংশতি সহস্রমাত্র শ্লোক ছিল। পরে ক্রমে নানা ব্যক্তির রচনা উহাতে প্রক্ষিপ্ত হইয়া মহাভারতের আকার চারিগুণ বাড়িয়াছে। সত্য বটে, ঐ অনুক্রমণিকাতেই লিখিত আছে যে, তাহার পরে বেদব্যাস ষষ্টিলক্ষশ্লোকাত্মক মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন এবং তাহার কিয়দংশ দেবলোকে, কিয়দংশ পিতৃলোকে, কিয়দংশ গন্ধর্ব্বলোকে ও এক লক্ষমাত্র মনুষ্যলোকে, পঠিত হইয়া থাকে। এই অনৈসর্গিক ব্যাপার-ঘটিত কথাটা যে আদিম অনুক্রমণিকাধ্যায়ের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কোনও সংশয় থাকিতে পারে না। দেবলোকে বা পিতৃলোকে বা গন্ধর্ব্বলোকে মহাভারত পাঠ অথবা বেদব্যাসই হউন বা যেই হউন, ব্যক্তিবিশেষের ষষ্টিলক্ষ শ্লোক রচনা আমরা সহজেই অবিশ্বাস করিতে পারি। আমি পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, ২৭২ শ্লোকাত্মক উপক্রমণিকার মধ্যে ১২২ শ্লোক প্রক্ষিপ্ত। এই ষষ্টিলক্ষ শ্লোক এবং লক্ষ শ্লোকের কথা প্রক্ষিপ্তের অন্তর্গত, তাহাতে কোন সংশয় নাই।

দশম পরিচ্ছেদ

প্রক্ষিপ্তনির্ব্বাচনপ্রণালী

আমাদিগের বিচার্য্য বিষয় যে, মহাভারতের কোন্ কোন্ অংশ প্রক্ষিপ্ত। ইহা পূর্ব্বপরিচ্ছেদে স্থির হইয়াছে। এক্ষণে দেখিতে হইবে যে, এই বিচার সম্পন্ন করিবার কোন উপায় আছে কি না। অর্থাৎ কোন্ অংশ প্রক্ষিপ্ত এবং কোন্ অংশ প্রক্ষিপ্ত নহে, তাহা স্থির করিবার কোন লক্ষণ পাওয়া যায় কি না?

মনুষ্যজীবনে যে সকল কার্য্য সম্পন্ন হয়, সকলই প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া নির্ব্বাহ করা যায়। তবে বিষয়ভেদে প্রমাণের অল্প বা অধিক বলবত্তা প্রয়োজনীয় হয়। যে প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া আমরা সচরাচর জীবনযাত্রায় কার্য্য নির্ব্বাহ করি,

---

* অবশ্য অনুক্রমণিকাধ্যায়ের ১৫০ শ্লোক ভিন্ন।

তাহার অপেক্ষা গুরুতর প্রমাণ ব্যতীত আদালতে একটা মোকদ্দমা নিষ্পন্ন হয় না, এবং আদালতে যেরূপ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া বিচারক একটা নিষ্পত্তিতে উপস্থিত হইতে পারেন, তাহার অপেক্ষা বলবান্ প্রমাণ ব্যতীত বৈজ্ঞানিক, বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন না। এই জন্য বিষয়ভেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রমাণশাস্ত্র সৃষ্ট হইয়াছে। যথা,—আদালতের জন্য প্রমাণসম্বন্ধীয় আইন (Law of Evidence), বিজ্ঞানের জন্য অনুমানতত্ত্ব (Logic বা Inductive Philosophy) এবং ঐতিহাসিক তত্ত্ব নিরূপণ জন্য এইরূপ একটি প্রমাণশাস্ত্রও আছে। উপস্থিত তত্ত্ব-নিরূপণ জন্য সেইরূপ কতকগুলি প্রমাণের নিয়ম সংস্থাপন করা যাইতে পারে; যথা,—

১ম,—আমরা পূর্ব্বে পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়ের কথা বলিয়াছি। যাহার প্রসঙ্গ সেই পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়ে নাই, তাহা যে নিশ্চিত প্রক্ষিপ্ত, ইহাও বুঝিয়াছি। এইটিই আমাদিগের প্রথম সূত্র।

২য়,—অনুক্রমণিকাধ্যায়ে লিখিত আছে যে, মহাভারতকার ব্যাসদেবই হউন, আর যিনিই হউন, তিনি মহাভারত রচনা করিয়া সার্দ্ধশত শ্লোকময়ী অনুক্রমণিকায় ভারতীয় নিখিল বৃত্তান্তের সার সঙ্কলন করিলেন। ঐ অনুক্রমণিকাধ্যায়ের ৯৩ শ্লোক হইতে ২৫১ শ্লোক পর্য্যন্ত এইরূপ একটি সার সংকলন আছে। যদিও ইহাতে সার্দ্ধশতের অপেক্ষা ৯টি শ্লোক বেশী হইল, তাহা না ধরিলেও চলে। এমনও হইতে পারে যে, ৯টি শ্লোক ইহারই মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। এখন এই ১৫৯ শ্লোকের মধ্যে যাহার প্রসঙ্গ না পাইব, তাহা আমরা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বিবেচনা করিতে বাধ্য।

৩য়,—যাহা পরস্পর-বিরোধী, তাহার মধ্যে একটি অবশ্য প্রক্ষিপ্ত। যদি দেখি যে, কোন ঘটনা দুই বার বা ততোধিক বার বিবৃত হইয়াছে, অথচ দুটি বিবরণ ভিন্নপ্রকার বা পরস্পরবিরোধী, তবে তাহার মধ্যে একটি প্রক্ষিপ্ত বিবেচনা করা উচিত। কোন লেখকই অনর্থক পুনরুক্তি এবং অনর্থক পুনরুক্তি দ্বারা আত্মবিরোধ উপস্থিত করেন না। অনবধানতা বা অক্ষমতা বশতঃ যে পুনরুক্তি বা আত্মবিরোধ উপস্থিত হয়, সে স্বতন্ত্র কথা, তাহাও অনায়াসে নির্ব্বাচন করা যায়।

৪র্থ,—সুকবিদের রচনাপ্রণালীতে প্রায়ই কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ থাকে। মহাভারতের কতকগুলি এমন অংশ আছে যে, তাহার মৌলিকতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। কেন না, তাহার অভাবে মহাভারতের মহাভারতত্ব থাকে না। দেখা যায় যে, সেগুলির রচনাপ্রণালী সর্ব্বত্র এক প্রকার লক্ষণবিশিষ্ট। যদি আর কোন অংশের রচনা এরূপ দেখা যায় যে, সেই সেই লক্ষণ তাহাতে নাই এবং এমন সকল লক্ষণ আছে যে, তাহা পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ সকলের সঙ্গে অসঙ্গত, তবে সেই অসঙ্গতলক্ষণযুক্ত রচনাকে প্রক্ষিপ্ত বিবেচনা করিবার কারণ উপস্থিত হয়।

৫ম,—মহাভারতের কবি একজন শ্রেষ্ঠ কবি, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। শ্রেষ্ঠ কবিদের বর্ণিত চরিত্রগুলির সর্ব্বাংশ পরস্পর সুসঙ্গত হয়। যদি কোথাও তাহার ব্যতিক্রম দেখা যায়, তবে সে অংশ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া সন্দেহ করা যাইতে পারে। মনে কর, যদি কোন হস্তলিখিত মহাভারতের কাপিতে দেখি যে, স্থানবিশেষে ভীষ্মের পরদারপরায়ণতা বা ভীমের ভীরুতা বর্ণিত হইয়েছে, তবে জানিবে যে, ঐ অংশ প্রক্ষিপ্ত।

৬ষ্ঠ,—যাহা অপ্রাসঙ্গিক, তাহা প্রক্ষিপ্ত হইলেও হইতে পারে, না হইলেও হইতে পারে। কিন্তু অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ে যদি পূর্ব্বোক্ত পাঁচটি লক্ষণের মধ্যে কোন লক্ষণ দেখিতে পাই, তবে তাহা প্রক্ষিপ্ত বিবেচনা করিবার কারণ আছে।

৭ম,—যদি দুইটি ভিন্ন ভিন্ন বিবরণের মধ্যে একটিকে তৃতীয় লক্ষণের দ্বারা প্রক্ষিপ্ত বোধ হয়, যেটি অন্য কোন লক্ষণের অন্তর্গত হইবে, সেইটিকেই প্রক্ষিপ্ত বলিয়া পরিত্যাগ করিতে হইবে।

এখন এই পর্য্যন্ত বুঝান গেল। নির্ব্বাচনপ্রণালী ক্রমশঃ স্পষ্টতর করা যাইবে।

একাদশ পরিচ্ছেদ

নির্ব্বাচনের ফল

মহাভারত পুনঃ পুনঃ পড়িয়া এবং উপরিলিখিত প্রণালীর অনুবর্ত্তী হইয়া বিচারপূর্ব্বক আমি এইটুকু বুঝিয়াছি যে, এই গ্রন্থের তিনটি ভিন্ন ভিন্ন স্তর আছে। প্রথম, একটি আদিম কঙ্কাল; তাহাতে পাণ্ডবদিগের জীবনবৃত্ত এবং আনুষঙ্গিক কৃষ্ণকথা ভিন্ন আর কিছুই নাই। ইহা বড় সংক্ষিপ্ত। বোধ হয়, ইহাই সেই চতুর্ব্বিংশতিসহস্রশ্লোকাত্মিকা ভারতসংহিতা। তাহার পর আর এক স্তর আছে, তাহা প্রথম স্তর হইতে ভিন্ন-লক্ষণাক্রান্ত; অথচ তাহার অংশ সমুদয় এক-লক্ষণাক্রান্ত। আমরা দেখিব যে, মহাভারতের কোন কোন অংশের রচনা অতি উদার, বিকৃতিশূন্য, অতি উচ্চ কবিত্বপূর্ণ। অন্য অংশ অনুদার, কিন্তু পারমার্থিক দার্শনিক তত্ত্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ-সম্বন্ধযুক্ত,

সুতরাং কাব্যাংশে কিছু বিকৃতিপ্রাপ্ত; কবিত্বশূন্য নহে, কিন্তু যে কবিত্ব আছে, সে কবিত্বের প্রধান অংশ অঘটনঘটন-কৌশল, তদ্বিষয়ে সৃষ্টিচাতুর্য্য। প্রথম শ্রেণীর লক্ষণাক্রান্ত যে সকল অংশ, সেগুলি এক জনের রচনা; দ্বিতীয় শ্রেণীর লক্ষণবিশিষ্ট যে সকল রচনা, তাহা দ্বিতীয় ব্যক্তির রচনা বলিয়া বোধ হয়। প্রথম শ্রেণীর লক্ষণবিশিষ্ট অংশই প্রাথমিক বা আদিম এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর লক্ষণযুক্ত অংশগুলি পরে রচিত হইয়া তাহার উপর প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, এরূপ বিবেচনা করা যাইতে পারে। কেন না, প্রথমকথিত অংশ উঠাইয়া লইলে মহাভারত থাকে না; যাহা থাকে, তাহা কঙ্কালবিচ্যুত মাংসপিণ্ডের ন্যায় বন্ধনশূন্য এবং প্রয়োজন-শূন্য নিরর্থক বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর লক্ষণবিশিষ্ট যাহা, তাহা উঠাইয়া লইলে মহাভারতের কিছু ক্ষতি হয় না, কেবল কতকগুলি নিষ্প্রয়োজন অলঙ্কার বাদ যায়, পাণ্ডবদিগের জীবনবৃত্ত অখণ্ড থাকে। অতএব প্রথম শ্রেণীর লক্ষণবিশিষ্ট অংশগুলিকে আমি প্রথম স্তর এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর লক্ষণবিশিষ্ট রচনাগুলিকে দ্বিতীয় স্তর বিবেচনা করি। প্রথম স্তরে ও দ্বিতীয় স্তরে আর একটা গুরুতর প্রভেদ এই দেখিবে যে, প্রথম স্তরে কৃষ্ণ ঈশ্বরাবতার বা বিষ্ণুর অবতার বলিয়া সচরাচর পরিচিত নহেন, নিজে তিনি আপনার দেবত্ব স্বীকার করেন না এবং মানুষী ভিন্ন দৈবী শক্তি দ্বারা কোন কর্ম্ম সম্পন্ন করেন না। কিন্তু দ্বিতীয় স্তরে তিনি স্পষ্টতঃ বিষ্ণুর অবতার বা নারায়ণ বলিয়া পরিচিত এবং অর্চিত; নিজেও নিজের ঈশ্বরত্ব ঘোষিত করেন, কবিও তাঁহার ঈশ্বরত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্য বিশেষ প্রকারে যত্নশীল।

ইহা ভিন্ন মহাভারতে আরও এক স্তর আছে। তাহাকে তৃতীয় স্তর বলিতেছি।

তৃতীয় স্তর অনেক শতাব্দী ধরিয়া গঠিত হইয়াছে। যে যাহা যখন রচিয়া "বেশ রচিয়াছি" মনে করিয়াছে, সে তাহাই মহাভারতে পুরিয়া দিয়াছে। মহাভারত পঞ্চম বেদ। এ কথার একটি গূঢ় তাৎপর্য্য আছে। চারি বেদে শূদ্র এবং স্ত্রীলোকের অধিকার নাই, কিন্তু Mass Education লইয়া তর্কবিতর্ক আজ নূতন ইংরেজের আমলে হইতেছে না। অসাধারণ প্রতিভা-শালী ভারতবর্ষের প্রাচীন ঋষিরা বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন যে, বিদ্যা ও জ্ঞানে স্ত্রীলোকের, ও ইতর লোকের উচ্চ শ্রেণীর সঙ্গে সমান অধিকার। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, আপামর সাধারণ সকলেরই শিক্ষা ব্যতীত সমাজের উন্নতি নাই। কিন্তু তাঁহারা আধুনিক হিন্দুদিগের এত প্রতিভাশালী পূর্ব্বপুরুষদিগকে অবজ্ঞা করিতেন না। তাঁহারা "অতীতের সহিত বর্ত্তমানের বিচ্ছেদকে" বড় ভয় করিতেন। পূর্ব্বপুরুষেরা বলিয়া গিয়াছেন যে, বেদে শূদ্র ও স্ত্রীলোকের অধিকার নাই—ভাল, সে কথা বজায় রাখা যাউক। তাঁহারা ভাবিলেন, যদি এমন কিছু উপায় করা যায় যে, যাহা শিখিবার, তাহা স্ত্রীলোকে ও শূদ্রে বেদ অধ্যয়ন না করিয়াও এক স্থানে পাইবে, তবে সে কথা বজায় রাখিয়া চলা যায়। বরং যাহা সর্ব্বজনমনোহর, এমন সামগ্রীর সঙ্গে যুক্ত হইয়া সর্ব্বলোকের নিকট সে শিক্ষা বড় আদরণীয় হইবে। তিন স্তরে সম্পূর্ণ যে মহাভারত এখন আমরা পড়ি, তাহা ব্রাহ্মণদিগের লোকশিক্ষার উদ্দেশ্যে অক্ষয় কীর্ত্তি।* কিন্তু এই কারণে ভালমন্দ অনেক কথাই ইহার ভিতর আসিয়া পড়িয়াছে। শান্তিপর্ব্ব ও অনুশাসনিক পর্ব্বের অধিকাংশ, ভীষ্মপর্ব্বের শ্রীমদ্ভগবদ্‌-গীতাপর্ব্বাধ্যায়, বনপর্ব্বের মার্কণ্ডেয়-সমস্যাপর্ব্বাধ্যায়, উদ্যোগপর্ব্বের প্রজাগরপর্ব্বাধ্যায় এই তৃতীয় স্তর-সঙ্কলনকালে রচিত বলিয়া বোধ হয়। পক্ষান্তরে, আদিপর্ব্বের শকুন্তলোপাখ্যানের পূর্ব্বের যে অংশ এবং বনপর্ব্বের তীর্থযাত্রাপর্ব্বাধ্যায় প্রভৃতি অপকৃষ্ট অংশও এই স্তরগত।

এই তিন স্তরের নিম্ন অর্থাৎ প্রথম স্তরই প্রাচীন; এই জন্যই তাহা মৌলিক বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। যাহা সেখানে নাই, তাহা দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্তরে দেখিলে তাহা কবিকল্পিত অনৈতিহাসিক বৃত্তান্ত বলিয়া আমাদিগের পরিত্যাগ করা উচিত।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

অনৈসর্গিক বা অতিপ্রকৃত

এত দূরে আমরা যে কথা পাইলাম, তাহা স্থূলতঃ এই—যে সকল গ্রন্থে কৃষ্ণকথা আছে, তাহার মধ্যে মহাভারত সর্ব্বপূর্ব্ববর্ত্তী। তবে, আমাদিগের মধ্যে যে মহাভারত প্রচলিত, তাহার তিন ভাগ প্রক্ষিপ্ত, এক ভাগমাত্র মৌলিক, সেই এক ভাগের কিছু ঐতি-হাসিকতা আছে। কিন্তু সেই ঐতিহাসিকতা কতটুকু?

এই প্রশ্নের উত্তরে কেহ কেহ বলিবেন যে, সে বিচারে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। কেন না, মহাভারত ব্যাসদেবপ্রণীত; ব্যাসদেব মহাভারতের যুদ্ধের সমকালিক ব্যক্তি; মহাভারত সমসাময়িক আখ্যান—

* "স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা।
কর্ম্মশ্রেয়সি মূঢ়ানাং শ্রেয় এবং ভবেদিহ।
ইতি ভারতমাখ্যানং কৃপয়া মুনিনা কৃতম্।"
শ্রীমদ্ভাগবত। ১ স্ক। ৪ অ। ২৫

Contemporary History, ইহার মৌলিক অংশ অবশ্য বিশ্বাসযোগ্য।

এখন যে মহাভারত প্রচলিত, তাহাকে ঠিক সমসাময়িক গ্রন্থ বলিতে পারি না। আদিম মহাভারত ব্যাসদেবের প্রণীত হইতে পারে, কিন্তু আমরা কি তাহা পাইয়াছি? প্রক্ষিপ্ত বাদ দিলে যাহা থাকে, তাহা কি ব্যাসদেবের রচনা? যে মহাভারত এখন প্রচলিত, তাহা উগ্রশ্রবাঃ সৌতি নৈমিষারণ্যে শৌনকাদি ঋষিদিগের নিকট বলিতেছেন। তিনি বলেন যে, জনমেজয়ের সর্পসত্রে বৈশম্পায়নের নিকট যে মহাভারত শুনিয়াছিলেন, তাহাই তিনি ঋষিদিগকে শুনাইবেন। স্থানান্তরে কথিত হইয়াছে যে, উগ্রশ্রবাঃ সৌতি তাঁহার পিতার কাছেই বৈশম্পায়নসংহিতা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এক্ষণে মহাভারতে ব্যাসের জন্মবৃত্তান্তের পর, ৬৩ অধ্যায়ে, বৈশম্পায়ন কর্ত্তৃকই কথিত হইয়াছে যে,—

"বেদানধ্যাপয়ামাস মহাভারতপঞ্চমান্।
সুমন্তুং জৈমিনিং পৈলং শুকঞ্চৈব স্বমাত্মজম্॥
প্রভুর্ব্বরিষ্ঠো বরদো বৈশম্পায়নমেব চ।
সংহিতাস্তৈঃ পৃথক্‌ত্বেন ভারতস্য প্রকাশিতাঃ॥"

আদিপর্ব্ব। ৬৩অ। ৯৫-৯৬

অর্থাৎ ব্যাসদেব বেদ এবং পঞ্চম বেদ মহাভারত সুমন্তু, জৈমিনি, পৈল, স্বীয় পুত্র শুক এবং বৈশম্পায়নকে শিখাইলেন। তাঁহারা পৃথক্ পৃথক্ ভারতসংহিতা প্রকাশিত করিলেন।*

তাহা হইলে প্রচলিত মহাভারত বৈশম্পায়নপ্রণীত ভারতসংহিতা। ইহা জনমেজয়ের সভায় প্রথম প্রচারিত হয়। জনমেজয় পাণ্ডবদিগের প্রপৌত্র।

সে যাহা হউক, উপস্থিত মহাভারত আমরা বৈশম্পায়নের নিকটও পাইতেছি না। উগ্রশ্রবাঃ বলিতেছেন যে, আমি ইহা বৈশম্পায়নের নিকট পাইয়াছি। অথবা তাঁহার পিতা বৈশম্পায়নের নিকট পাইয়াছিলেন, তিনি তাঁহার পিতার নিকট পাইয়াছিলেন। উগ্রশ্রবাঃ যাহা বলিতেছেন, তাহা আমরা আর এক ব্যক্তির নিকট পাইতেছি। সেই ব্যক্তিই বর্ত্তমান মহাভারতের প্রথম অধ্যায়ের প্রণেতা এবং মহাভারতের অনেক স্থানে তিনিই বক্তা।

*জৈমিনিভারতের নাম শুনিতে পাওয়া যায়। ইহার অশ্বমেধ-পর্ব্ব বেবর সাহেব দেখিয়াছেন। আর সকল বিলুপ্ত হইয়াছে। আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে আছে—"সুমন্তু-জৈমিনি-বৈশম্পায়ন-পৈলসূত্র-ভারত-মহাভারত-ধর্ম্মাচার্য্যাঃ।" তাহা হইলে সুমন্তু সূত্রকার, জৈমিনি ভারতকার, বৈশম্পায়ন মহাভারতকার এবং পৈল ধর্ম্মশাস্ত্রকার।

তিনি বলিতেছেন নৈমিষারণ্যে শৌনকাদি ঋষি উপস্থিত, সেখানে উগ্রশ্রবাঃ আসিলেন এবং ঋষিগণের সঙ্গে উগ্রশ্রবার এই ভারত সম্বন্ধে ও অন্যান্য বিষয়ে যে কথোপকথন হইল, তাহাও তিনি বলিতেছেন।

তবে ইহা স্থির হয় যে, (১) প্রচলিত মহাভারত আদিম বৈয়াসিকীসংহিতা নহে, (২) ইহা বৈশম্পায়নসংহিতা বলিয়া পরিচিত, কিন্তু আমরা প্রকৃত বৈশম্পায়নসংহিতা পাইয়াছি কিনা, তাহা সন্দেহ। তার পর প্রমাণ করিয়াছি যে, (৩) ইহার প্রায় তিন ভাগ প্রক্ষিপ্ত। অতএব আমাদের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক যে, মহাভারতকে কৃষ্ণচরিত্রের ভিত্তি করিতে গেলে অতি সাবধান হইয়া এই গ্রন্থের ব্যবহার করিতে হইবে।

সেই সাবধানতার জন্য আবশ্যক যে, যাহা অতিপ্রকৃত বা অনৈসর্গিক, তাহাতে আমরা বিশ্বাস করিব না।

আমি এমন বলি না যে, আমরা যাহাকে অনৈসর্গিক বলি, তাহা কাজে কাজেই মিথ্যা। আমি জানি যে, এমন অনেক নৈসর্গিক নিয়ম আছে, যাহা আমরা অবগত নহি। যেমন এক জন বন্যজাতীয় মনুষ্য, একটা ঘড়ী, কি বৈদ্যুতিক সংবাদতন্ত্রীকে অনৈসর্গিক ব্যাপার মনে করিতে পারে, আমরাও অনেক ঘটনাকে সেইরূপ ভাবি। আপনাদিগের এরূপ অজ্ঞতা স্বীকার করিয়াও বিশেষ প্রমাণ ব্যতীত কোন অনৈসর্গিক ঘটনায় বিশ্বাস করিতে পারি না। কেন না, আপনার জ্ঞানের অতিরিক্ত কোন ঐশিক নিয়ম প্রমাণ ব্যতীত কাহারও স্বীকার করা কর্ত্তব্য নহে। যদি তোমাকে কেহ বলে, 'আম গাছে তাল ফলিতেছে দেখিয়াছি,' তোমার তাহা বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নহে। তোমাকে বলিতে হইবে, হয় আমগাছে তাল দেখাও, নয় বুঝাইয়া দাও কি প্রকারে ইহা হইতে পারে। আর যে ব্যক্তি বলিতেছে যে, আমগাছে তাল ফলিয়াছে, সে ব্যক্তি যদি বলে, 'আমি দেখি নাই—শুনিয়াছি,' তবে অবিশ্বাসের কারণ আরও গুরুতর হয়। কেন না, এখানে প্রত্যক্ষ প্রমাণও পাওয়া গেল না। মহাভারতও তাই। অতিপ্রকৃতের প্রত্যক্ষ প্রমাণও পাইতেছি না।

বলিয়াছি যে, প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইলেও অতিপ্রকৃত হঠাৎ বিশ্বাস করা যায় না। নিজ চক্ষুতে দেখিলেও হঠাৎ বিশ্বাস করা যায় না। কেন না, বরং আমাদিগের জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ভ্রান্তি সম্ভব, তথাপি প্রাকৃতিক নিয়মলঙ্ঘন সম্ভব নহে। বুঝাইয়া দাও যে, যাহাকে অতি-প্রকৃত বলিতেছি, তাহা প্রাকৃতিক নিয়মসঙ্গত, তবে বুঝিব। বন্যজাতীয়কে ঘড়ী বা

বৈদ্যুতিক সংবাদতন্ত্রী বুঝাইয়া দিলে, সে ইহা অনৈসর্গিক ব্যাপার বলিয়া বিশ্বাস করিবে না।

আর ইহাও বক্তব্য যে, যদি শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া স্বীকার করা যায় (আমি তাহা করিয়া থাকি), তাহা হইলে তাঁহার ইচ্ছায় যে কোন অনৈসর্গিক ব্যাপার সম্পাদিত হইতে পারে না, ইহা বলা যাইতে পারে না। তবে যতক্ষণ না শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারা যায়, এবং যতক্ষণ না এমন বিশ্বাস করা যায় যে, তিনি মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া ঐশী শক্তি দ্বারা তাঁহার অভিপ্রেত কার্য্য সম্পাদন করিতেন, ততক্ষণ আমি অনৈসর্গিক ঘটনা তাঁহার ইচ্ছা দ্বারা সিদ্ধ বলিয়া পরিচিত করিতে পারি না বা বিশ্বাস করিতে পারি না।

কেবল তাহাই নহে। যদি স্বীকার করা যায় যে, কৃষ্ণ ঈশ্বরাবতার, তিনি স্বেচ্ছাক্রমে অতিপ্রকৃত ঘটনাও ঘটাইতে পারেন, তাহা হইলেও গোল মিটে না। যাহা তাঁহার দ্বারা সিদ্ধ, তাহাতে যেন বিশ্বাস করিলাম, কিন্তু যাহা তাঁহার দ্বারা সিদ্ধ নহে, এমন সকল অনৈসর্গিক ব্যাপারে বিশ্বাস করিব কেন? শাল্ব অসুর অন্তরীক্ষে সৌভনগর স্থাপিত করিয়া যুদ্ধ করিল; বাণের সহস্র বাহু; অশ্বত্থামা ব্রহ্মশিরা অস্ত্রত্যাগ করিলে তাহাতে ব্রহ্মাণ্ড দগ্ধ হইতে লাগিল এবং পরিশেষে অশ্বত্থামার আদেশানুসারে উত্তরার গর্ভস্থ বালককে গর্ভমধ্যে নিহত করিল, ইত্যাদি বিষয়ে বিশ্বাস করিব কেন?

তার পর, কৃষ্ণের নিজকৃত অনৈসর্গিক কর্ম্মেও অবিশ্বাস করিবার কারণ আছে। তাঁহাকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া স্বীকার করিলেও অবিশ্বাস করিবার কারণ আছে। তিনি মানবশরীর ধারণ করিয়া যদি কোন অনৈসর্গিক কর্ম্ম করেন, তবে তাহা তাঁহার দৈবী বা ঐশী শক্তি দ্বারা। কিন্তু দৈবী বা ঐশী শক্তি দ্বারা যদি কর্ম্ম সম্পাদন করিবেন, তবে তাঁহার মানবশরীর-ধারণের প্রয়োজন কি? যিনি সর্ব্ব-কর্ত্তা, সর্ব্বশক্তিমান্, ইচ্ছাময়—যাঁহার ইচ্ছায় এই সমস্ত জীবের সৃষ্টি ও ধ্বংস হইয়া থাকে, তিনি মনুষ্য-শরীর ধারণ না করিয়াও কেবল তাঁহার ঐশী শক্তির প্রয়োগ দ্বারা যে কোন অসুরের বা মানুষের সংহার বা অন্য যে কোন অভিপ্রেত কার্য্য সম্পাদন করিতে পারেন। যদি দৈবী শক্তি দ্বারা বা ঐশী শক্তি দ্বারা কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন, তবে তাঁহার মনুষ্যশরীর-ধারণের প্রয়োজন নাই। যদি ইচ্ছাময় ইচ্ছাপূর্ব্বক মনুষ্যের শরীর ধারণ করেন, তবে দৈবী বা ঐশী শক্তির প্রয়োগ তাঁহার উদ্দেশ্য বা অভিপ্রেত হইতে পারে না।

তবে শরীরধারণের প্রয়োজন কি? এমন কোন কর্ম্ম আছে কি যে, জগদীশ্বর শরীর ধারণ না করিলে সিদ্ধ হয় না?

ইহার উত্তরের প্রথমে এই আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে যে, জগদীশ্বরের মানবশরীরধারণ কি সম্ভব?

প্রথমে ইহার মীমাংসা করা যাইতেছে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

ঈশ্বর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়া কি সম্ভব?

বস্তুতঃ কৃষ্ণচরিত্রের আলোচনার প্রথমেই কাহারও কাহারও কাছে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় যে, ঈশ্বর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়া কি সম্ভব? এ দেশের লোকের বিশ্বাস, কৃষ্ণ ঈশ্বরের অবতার। শিক্ষিতের বিশ্বাস যে, কথাটা অতিশয় অবৈজ্ঞানিক এবং আমাদিগের খৃষ্টান উপদেশকদিগের মতে অতিশয় উপহাসের যোগ্য বিষয়।

এখানে একটা নহে, দুইটি প্রশ্ন হইতে পারে; (১) ঈশ্বর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়া সম্ভব কি না, (২) তাহা হইলে কৃষ্ণ ঈশ্বরাবতার কিনা। আমি এই দ্বিতীয় প্রশ্নের কোন উত্তর দিব না। প্রথম প্রশ্নের কিছু উত্তর দিতে ইচ্ছা করি।

সৌভাগ্যক্রমে আমাদিগের খৃষ্টিয়ান গুরুদিগের সঙ্গে আমাদিগের এই স্থূল কথা লইয়া মতভেদ হইবার সম্ভাবনা নাই। তাঁহাদিগকে ঈশ্বরের অবতার সম্ভব বলিয়া মানিতে হয়, নহিলে যীশু টিকেন না। আমাদিগের প্রধান বিবাদ দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকদিগের সঙ্গে।

ইঁহাদিগের মধ্যে অনেকে এই আপত্তি করিবেন, যেখানে আদৌ ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণাভাব সেখানে আবার ঈশ্বরের অবতার কি? যাঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন, আমরা তাঁহাদিগের সঙ্গে কোন বিচার করি না। তাঁহাদের ঘৃণা করিয়া বিচার করি না, এমন নহে। তবে জানা আছে যে, এ বিচারে কোন পক্ষের উপকার হয় না। তাঁহারা আমাদের ঘৃণা করেন, তাহাতে আপত্তি নাই।

তাহার পর আর কতকগুলি লোক আছেন যে, তাঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, কিন্তু তাঁহারা বলিবেন, ঈশ্বর নির্গুণ। সগুণেরই অবতার সম্ভব। ঈশ্বর নির্গুণ, সুতরাং তাঁহার অবতার অসম্ভব।

এ আপত্তিরও আমাকে বড় সোজা উত্তর দিতে হয়। নির্গুণ ঈশ্বর কি, তাহা আমি বুঝিতে পারি না, সুতরাং এ আপত্তির মীমাংসা করিতে সক্ষম নহি।

আমি জানি যে, বিস্তর পণ্ডিত ও ভাবুক ঈশ্বরকে নির্গুণ বলিয়াই মানেন। আমি পণ্ডিতও নহি, ভাবুকও নহি, কিন্তু আমার মনে মনে বিশ্বাস যে, এই ভাবুক পণ্ডিতগণও আমার মত নির্গুণ ঈশ্বর বুঝিতে পারেন না; কেন না মনুষ্যের এমন কোন চিত্তবৃত্তি নাই, যদ্দ্বারা আমরা নির্গুণ ঈশ্বর বুঝিতে পারি। ঈশ্বর নির্গুণ হইলে হইতে পারেন, কিন্তু আমরা নির্গুণ বুঝিতে পারি না, কেন না আমাদের সে শক্তি নাই। * মুখে বলিতে পারি বটে যে, ঈশ্বর নির্গুণ এবং এই কথার উপর একটা দর্শনশাস্ত্র গড়িতে পারি কিন্তু যাহা কথায় বলিতে পারি, তাহা যে মনে বুঝি, ইহা অনিশ্চিত। "চতুষ্কোণ গোলক" বলিলে আমাদের রসনা বিদীর্ণ হয় না বটে, কিন্তু "চতুষ্কোণ গোলক" মানে ত কিছুই বুঝিলাম না। তাই হর্বট স্পেন্সর এত কাল পরে নির্গুণ ঈশ্বর ছাড়িয়া দিয়া সগুণেরও অপেক্ষা যে সগুণ ঈশ্বর ("Something higher than personality"), তাহাতে আসিয়া পড়িয়াছেন। অতএব আইস, আমরা নির্গুণ ঈশ্বরের কথা ছাড়িয়া দিই। ঈশ্বরকে নির্গুণ বলিলে স্রষ্টা, বিধাতা, পাতা, ত্রাণকর্তা কাহাকেও পাই না। এমন ঝকমারিতে কাজ কি?

যাঁহারা সগুণ ঈশ্বর স্বীকার করেন, তাঁহাদেরও ঈশ্বর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা স্বীকার পক্ষে অনেকগুলি আপত্তি আছে। এক আপত্তি এই যে, ঈশ্বর সগুণ হউন, কিন্তু নিরাকার। যিনি নিরাকার, তিনি আকার ধারণ করিবেন কি প্রকারে?

উত্তরে, জিজ্ঞাসা করি, যিনি ইচ্ছাময় এবং সর্ব্বশক্তিমান, তিনি ইচ্ছা করিলে, নিরাকার হইলেও আকার ধারণ করিতে পারেন না কেন? তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তার এ সীমানির্দ্দেশ কর কেন? তবে কি তাঁহাকে সর্ব্বশক্তিমান্ বলিতে চাও না? যিনি এই জড়-জগৎকে আকার প্রদান করিয়াছেন, তিনি ইচ্ছা করিলে নিজে আকার গ্রহণ করিতে পারেন না কেন?

যাঁহারা এ আপত্তি না করেন, তাঁহারা বলিতে পারেন ও বলেন যে, যিনি সর্ব্বশক্তিমান, তাঁহার জগৎশাসনের জন্য, জগতের হিতজন্য মনুষ্যকলেবর ধারণ করিবার প্রয়োজন কি? যিনি ইচ্ছাক্রমেই কোটি কোটি বিশ্ব সৃষ্ট ও বিধ্বস্ত করিতেছেন, রাবণ-কুম্ভকর্ণ কি কংস-শিশুপালবধের জন্য তাঁহাকে নিজে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে, বালক হইয়া মাতৃস্তন্য পান করিতে হইবে, ক, খ, গ, ঘ, শিখিয়া শাস্ত্রাধ্যয়ন করিতে হইবে, তার পর দীর্ঘ মনুষ্য-জীবনের অপার দুঃখ ভোগ করিয়া, শেষে স্বয়ং অস্ত্রধারণ করিয়া আহত বা কখনও পরাজিত হইয়া, বহুায়াসে দুরাত্মাদের বধসাধন করিতে হইবে, ইহা অতি অশ্রদ্ধেয় কথা।

যাঁহারা এইরূপ আপত্তি করেন, তাঁহাদের মনের ভিতর এমনি একটা কথা আছে যে, এই মনুষ্যজন্মের যে সকল দুঃখ—গর্ভে অবস্থান, জন্ম, স্তন্যপান, শৈশবশিক্ষা, জয়, পরাজয়, জরা, মরণ, এ সকলে আমরাও যেমন কষ্ট পাই, ঈশ্বরও বুঝি সেইরূপ। তাঁহাদিগের স্থূলবুদ্ধিতে এটুকু আসে না যে, তিনি সুখ-দুঃখের অতীত, তাঁহার কিছুতেই দুঃখ নাই, কষ্ট নাই। জগতের সৃজন, পালন, লয় যেমন তাঁহার লীলা (Manifestation), এ সকল তেমনই তাঁহার লীলামাত্র হইতে পারে। তুমি বলিতেছ, তিনি মুহূর্ত্তমধ্যে যাহাদিগকে ইচ্ছাক্রমে সংহার করিতে পারেন, তাহাদের ধ্বংসের জন্য তিনি মনুষ্য-জীবন-পরিমিত কাল ব্যাপিয়া আয়াস পাইবেন কেন? তুমি ভুলিয়া যাইতেছ যে, যাহার কাছে অনন্তকালও পলকমাত্র, তাঁহার কাছে মুহূর্ত্তে ও মনুষ্য-জীবন-পরিমিতকালে প্রভেদ কি?

তবে এই যে অসুরবধ কথাটা আমরা বিষ্ণুর অবতার সম্বন্ধে অনেক দিন হইতে পুরাণাদিতে শুনিয়া আসিতেছি, এ কথা শুনিয়া অনেকের অবতার সম্বন্ধে অনাস্থা হইতে পারে বটে। কেবল একটা কংস বা শিশুপাল মারিবার জন্য যে স্বয়ং ঈশ্বরকে ভূতলে মানবরূপে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে, ইহা অসম্ভব কথা বটে। যিনি অনন্তশক্তিমান, তাঁহার কাছে কংস-শিশুপালও যে, এক ক্ষুদ্র পতঙ্গও সে। বাস্তবিক যাহারা হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করিতে না পারে, তাহারাই মনে করে যে, অবতারের উদ্দেশ্য দৈত্য বা দুরাত্মাবিশেষের নিধন। আসল কথাটা ভগবদ্গীতায় অতি সংক্ষেপে বলা হইতেছে,—

"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংরক্ষণার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

এ কথাটা অতি সংক্ষিপ্ত। "ধর্ম্মসংরক্ষণ" কি কেবল দুই একটা দুরাত্মা বধ করিলেই হয়? ধর্ম্ম কি? তাহার সংরক্ষণ কি কি প্রকারে হইতে পারে?

আমাদিগের শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি সকলের সর্ব্বাঙ্গীন স্ফূর্ত্তি ও পরিণতি, সামঞ্জস্য ও চরিতার্থতা ধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম অনুশীলনসাপেক্ষ, এবং অনুশীলন

---

* Our conception of the Deity is then bounbed by the conditions which bound all human knowledge and therefore we cannot represent the Deity as he is, but as he appears to us.—Mansel, Metaphysics, P 384.

কর্ম্মসাপেক্ষ।* অতএব কর্ম্মই ধর্ম্মের প্রধান উপায়। এই কর্ম্মকে স্বধর্ম্মপালন (Duty) বলা যায়।

মনুষ্য কতকটা নিজ রক্ষা, ও বৃত্তি সকলের বশীভূত হইয়া স্বতঃই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু যে কর্ম্ম দ্বারা সকল বৃত্তির সর্ব্বাঙ্গীন স্ফূর্ত্তি ও পরিণতি, সামঞ্জস্য ও চরিতার্থতা ঘটে, তাহা দুরূহ। যাহা দুরূহ, তাহার শিক্ষা কেবল উপদেশে হয় না—আদর্শ চাই। সম্পূর্ণ ধর্ম্মের সম্পূর্ণ আদর্শ ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহ নাই। কিন্তু নিরাকার ঈশ্বর আমাদের আদর্শ হইতে পারেন না। কেন না, তিনি প্রথমতঃ অশরীরী, শারীরিকবৃত্তিশূন্য; আমরা শরীরী, শারীরিকবৃত্তি আমাদের ধর্ম্মের প্রধান বিঘ্ন; দ্বিতীয়তঃ তিনি অনন্ত, আমরা সান্ত, অতি ক্ষুদ্র। অতএব যদি ঈশ্বর স্বয়ং সান্ত ও শরীরী হইয়া লোকালয়ে দর্শন দেন, তবে সেই আদর্শের আলোচনায় যথার্থ ধর্ম্মের উন্নতি হইতে পারে। এই জন্যই ঈশ্বরাবতারের প্রয়োজন। মনুষ্য কর্ম্ম জানে না; কর্ম্ম কিরূপে করিলে ধর্ম্মে পরিণত হয়, তাহা জানে না; ঈশ্বর স্বয়ং অবতার হইলে, সে শিক্ষা হইবার বেশী সম্ভাবনা। এমত স্থলে ঈশ্বর জীবের প্রতি করুণা করিয়া শরীর ধারণ করিবেন, ইহার অসম্ভাবনা কি?

এ কথা আমি গড়িয়া বলিতেছি না। ভগবদ্গীতায় ভগবদুক্তির তাৎপর্য্যও এই প্রকার।

"তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ॥ ১৯
কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি॥ ২০
যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥২১
ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি॥ ২২
যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥ ২৩
উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্।
সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ॥ ২৪।"

গীতা, ৩ অ।

"পুরুষ আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে মোক্ষলাভ করেন, অতএব তুমি আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান কর, জনক প্রভৃতি মহাত্মাগণ কর্ম্ম দ্বারাই সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যে আচরণ করেন, ইতর ব্যক্তিরা তাহা করিয়া থাকে এবং তিনি যাহা মান্য করেন, তাহারা তাহারই অনুষ্ঠান-অনুবর্ত্তী হয়। অতএব তুমি লোকদিগের ধর্ম্মরক্ষণার্থ কর্ম্মানুষ্ঠান কর। দেখ, ত্রিভুবনে আমার কিছুই অপ্রাপ্য নাই, সুতরাং আমার কোন প্রকার কর্ত্তব্যও নাই, তথাপি আমি কর্ম্মানুষ্ঠান করিতেছি।* যদি আমি আলস্যহীন হইয়া কখনও কর্ম্মানুষ্ঠান না করি, তাহা হইলে সমুদায় লোকে আমার অনুবর্ত্তী হইবে, অতএব আমি কর্ম্ম না করিলে এই সমস্ত লোক উৎসন্ন হইয়া যাইবে এবং আমি বর্ণসঙ্কর ও প্রজাগণের মলিনতার হেতু হইব।"—কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ।

সেশ্বর বৈজ্ঞানিকদিগের শেষ ও প্রধান আপত্তির কথা এখনও বলি নাই। তাঁহারা বলেন যে, ঈশ্বর আছেন সত্য এবং তিনি স্রষ্টা ও নিয়ন্তা, ইহাও সত্য। কিন্তু তিনি গাড়ীর কোচমানের মত স্বহস্তে রাশ ধরিয়া বা নৌকার কর্ণধারের মত স্বহস্তে হাল ধরিয়া এই বিশ্বসংসার চালান না। তিনি কতকগুলি অচল নিয়ম সংস্থাপন করিয়া দিয়াছেন, জগৎ তাহারই বশবর্ত্তী হইয়া চলিতেছে। এই নিয়মগুলি অচলও বটে, এবং জগতের স্থিতিপক্ষে যথেষ্টও বটে। অতএব ইহার মধ্যে ঈশ্বরের স্বয়ং হস্তক্ষেপণ করিবার স্থানও নাই এবং প্রয়োজনও নাই; সুতরাং ঈশ্বর মানবদেহ ধারণ করিয়া যে ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইবেন, ইহা অশ্রদ্ধেয় কথা।

ঈশ্বর যে কতকগুলি অচল নিয়ম সংস্থাপন করিয়া দিয়াছেন, জগৎ তাহারই বশবর্ত্তী হইয়া চলে, এ কথাও মানি। সেইগুলি জগতের রক্ষা ও পালন পক্ষে যথেষ্ট, এ কথাও মানি। কিন্তু সেগুলি আছে বলিয়া যে ঈশ্বরের নিজের কোন কাজের স্থান ও প্রয়োজনও নাই, এ কথা কি প্রকারে সিদ্ধ হয়, বুঝিতে পারি না। জগতের কিছুই এমন উন্নত অবস্থায় নাই যে, যিনি সর্ব্বশক্তিমান্, তিনি ইচ্ছা করিলেও তাহার আর উন্নতি হইতে পারে না। জাগতিক ব্যাপার আলোচনা করিয়া বিজ্ঞানশাস্ত্রের সাহায্যে ইহাই বুঝিতে পারি যে, জগৎ ক্রমে অসম্পূর্ণ ও অপরিণতাবস্থা হইতে সম্পূর্ণ ও পরিণতাবস্থায় আসিতেছে। ইহাই জগতের গতি এবং এই গতিই জগৎকর্ত্তার অভিপ্রেত বলিয়া বোধ হয়। তার পর জগতের বর্ত্তমান অবস্থাতে এমন কিছু দেখি না যে, তাহা হইতে বিবেচনা করিতে পারি যে, জগৎ চরম উন্নতিতে পৌঁছিয়াছে। এখনও জীবের সুখের অনেক বাকি আছে, উন্নতির বাকি আছে। যদি তাই বাকি আছে, তবে ঈশ্বরের হস্তক্ষেপণের বা কার্য্যের স্থান বা প্রয়োজন নাই কেন? সৃজন, রক্ষা, পালন, ধ্বংস ভিন্ন জগতের আর একটা নৈসর্গিক কার্য্য

* সংকৃত এই ধর্ম্মের ব্যাখ্যা 'ধর্ম্মতত্ত্বে' দেখ।

* কৃষ্ণ. অর্থাৎ যিনি শরীরধারী ঈশ্বর, তিনি এই কথা বলিতেছেন।

আছে,—উন্নতি। মনুষ্যের উন্নতির মূল,—ধর্ম্মের উন্নতি। ধর্ম্মের উন্নতিও ঐশিক নিয়মে সাধিত হইতে পারে, ইহাও স্বীকার করি। কিন্তু কেবল নিয়মফলে যত দূর তাহার উন্নতি হইতে পারে, ঈশ্বর কোনকালে স্বয়ং অবতীর্ণ হইলে তাহার অধিক উন্নতি সিদ্ধ হইতে পারে না, এমত বুঝিতে পারি না। এবং এরূপ অধিক উন্নতি যে তাঁহার অভিপ্রেত নহে, তাহাই বা কি প্রকারে বলিব?

আপত্তিকারকেরা বলেন যে, নৈসর্গিক যে সকল নিয়ম, তাহা ঈশ্বরকৃত হইলেও, তাহা অতিক্রম পূর্ব্বক জগতে কোন কাজ হইতে দেখা যায় নাই। এ জন্য এ সকল অতিপ্রকৃত ক্রিয়া (miracle) মানিতে পারি না। ইহার ন্যায্যতা স্বীকার করি, তাহার কারণও পূর্ব্বপরিচ্ছেদে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছি। আমাকে ইহাও বলিতে হয় যে, এরূপ অনেক ঈশ্বরাবতারের প্রবাদ আছে যে, তাহাতে অবতার অতিপ্রকৃতের সাহায্যেই স্বকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। খ্রীষ্ট অবতারের এরূপ অনেক কথা আছে। কিন্তু খ্রীষ্টের পক্ষসমর্থনের ভার খ্রীষ্টানদিগের উপরই থাকুক। আরও, বিষ্ণুর অবতারের মধ্যে মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ প্রভৃতির এইরূপ কার্য্য ভিন্ন অবতারের উপাদান আর কিছুই নাই। এখন বুদ্ধিমান্ পাঠককে ইহা বলা বাহুল্য যে, মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ প্রভৃতি উপন্যাসের বিষয়ীভূত পশুগণের ঈশ্বরাবতারত্বের যথার্থ দাবি-দাওয়া কিছুই নাই। গ্রন্থান্তরে দেখাইব যে, বিষ্ণুর দশ অবতারের কথাটা অপেক্ষাকৃত আধুনিক, এবং সম্পূর্ণরূপে উপন্যাসমূলক। সেই উপন্যাসগুলিও কোথা হইতে আসিয়াছে, তাহাও দেখাইব। সত্য বটে, এই সকল অবতার পুরাণে কীর্ত্তিত আছে, কিন্তু পুরাণে যে অনেক অলীক উপন্যাস স্থান পাইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য। প্রকৃত বিচারে শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন আর কাহাকেও ঈশ্বরের অবতার বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না।

কৃষ্ণের যে বৃত্তান্তটুকু মৌলিক, তাহার ভিতর অতিপ্রকৃতের কোন সহায়তা নাই। মহাভারত ও পুরাণ সকল প্রক্ষিপ্ত ও আধুনিক নিষ্কর্ম্মা ব্রাহ্মণদিগের নিরর্থক রচনায় পরিপূর্ণ, এ জন্য অনেক স্থলে কৃষ্ণের অতিপ্রকৃতের সাহায্য গ্রহণ করা উক্ত হইয়াছে। কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে জানা যাইবে যে, সেগুলি মূল গ্রন্থের কোন অংশ নহে। আমি ক্রমে সে বিচারে প্রবৃত্ত হইব এবং যাহা বলিতেছি, তাহা সপ্রমাণ করিব। দেখাইব যে, কৃষ্ণ অতিপ্রকৃত কার্য্য দ্বারা বা নৈসর্গিক নিয়মের বিলঙ্ঘন দ্বারা কোন কার্য্য সম্পন্ন করেন নাই। অতএব সে আপত্তি কৃষ্ণসম্বন্ধে খাটিবে না।

আমরা যাহা বলিলাম, কেবল তাহা আমাদের মত, এমন নহে। পুরাণকার ঋষিদিগেরও সেই মত। তবে লোকপরম্পরাগত কিংবদন্তীর সত্যমিথ্যা নির্ব্বাচন-পদ্ধতি সে কালে ছিল না বলিয়া অনেক অনৈসর্গিক ঘটনা পুরাণে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

বিষ্ণুপুরাণে আছে;—

“মনুষ্যধর্ম্মশীলস্য লীলা সা জগতঃ পতেঃ।
অস্ত্রাণ্যনেকরূপাণি যদরাতিষু মুঞ্চতি ॥
মনসৈব জগৎ সৃষ্টিং সংহারঞ্চ করোতি যঃ।
তস্যারিপক্ষক্ষপণে কোঽয়মুদ্যমবিস্তরঃ ॥
তথাপি যো মনুষ্যাণাং ধর্ম্মস্তমনুবর্ত্ততে।
কুর্ব্বন্ বলবতা সন্ধিং হীনৈর্যুদ্ধং করোত্যসৌ ॥
সাম চোপপ্রদানঞ্চ তথা ভেদং প্রদর্শয়ন্।
করোতি দণ্ডপাতঞ্চ কচ্চিদেব পলায়নম্ ॥
মনুষ্যদেহিনাং চেষ্টামিত্যেবমনুবর্ত্ততঃ।
লীলা জগৎপতেস্তস্য ছন্দতঃ সংপ্রবর্ত্ততে ॥”

৫ অংশ, ২২ অধ্যায়, ১৪-১৮

“জগৎপতি হইয়াও যে তিনি শত্রুদিগের প্রতি অনেক অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন, ইহা তিনি মনুষ্যধর্ম্মশীল বলিয়া তাঁহার লীলা। নহিলে যিনি মন দ্বারাই জগতের সৃষ্টি ও সংহার করেন, অরিক্ষয় জন্য তাঁহার বিস্তর উদ্যম কেন? তিনি মনুষ্যদিগের ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী, এজন্য তিনি বলবানের সঙ্গে সন্ধি এবং হীনবলের সঙ্গে যুদ্ধ করেন, সাম, দান, ভেদ প্রদর্শনপূর্ব্বক দণ্ডপাত করেন, কখনও পলায়নও করেন। মনুষ্যদেহীদিগের ক্রিয়ার অনুবর্ত্তী সেই জগৎপতির এইরূপ লীলা তাঁহার ইচ্ছানুসারে ঘটিয়াছিল।”

আমি ঠিক এই কথাই বলিতেছিলাম। ভরসা করি, ইহার পর কোন পাঠক বিশ্বাস করিবেন না যে, কৃষ্ণ মনুষ্যদেহে অতিমানুষশক্তি দ্বারা কোন কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন।* অতএব বিচারের তৃতীয়

* It is true that in the epic poems Rama and Krishna appear as incarnations of Vishnu, but they at the same time come before us as human heroes, and these two characters (the divine and the human) are so far from being inseparably blended together, that both these heroes are for the most part exhibited in no other light than other highly gifted men—acting according to human motives and taking no advantage of their divine superiority. It is only in

নিয়ম সংস্থাপিত হইল। বিচারের নিয়ম তিনটি পুনর্ব্বার স্মরণ করাই :—

১। যাহা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া প্রমাণ করিব, তাহা পরিত্যাগ করিব।

২। যাহা অতিপ্রকৃত, তাহা পরিত্যাগ করিব।

৩। যাহা প্রক্ষিপ্ত নয়, বা অতিপ্রকৃত নয়, তাহা যদি অন্য প্রকারে মিথ্যার লক্ষণযুক্ত দেখি, তবে তাহাও পরিত্যাগ করিব।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

পুরাণ

মহাভারতের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তার পর পুরাণ সম্বন্ধে আমাদের কিছু ব্যক্তব্য আছে।

পুরাণ সম্বন্ধেও দুই রকম ভ্রম আছে,—দেশী ও বিলাতী। দেশী ভ্রম এই যে, সমস্ত পুরাণগুলিই এক ব্যক্তির রচনা। বিলাতী ভ্রম এই যে, এক একখানি পুরাণ এক ব্যক্তির রচনা। আগে দেশী কথাটার সমালোচনা করা যাউক।

অষ্টাদশ পুরাণ যে এক ব্যক্তির রচিত নহে, তাহার কতকগুলি প্রমাণ দিতেছি ;—

১ম,—এক ব্যক্তি এক প্রকার রচনাই করিয়া থাকে। যেমন এক ব্যক্তির হাতের লেখা পাঁচ রকম হয় না, তেমনই এক ব্যক্তির রচনার গঠন ভিন্ন ভিন্ন হয় না। কিন্তু এই অষ্টাদশ পুরাণের রচনা আট রকম। কখনও তাহা এক ব্যক্তির রচনা নহে। যিনি বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবতপুরাণ পাঠ করিয়া বলিবেন, দুই-ই এক ব্যক্তির রচনা হইতে পারে, তাঁহার নিকট কোন প্রকার প্রমাণপ্রয়োগ করা বিড়ম্বনা মাত্র।

২য়,—এক ব্যক্তি এক বিষয়ে অনেকগুলি গ্রন্থ লেখে না। যে অনেকগুলি গ্রন্থ লেখে, সে এক বিষয়ই পুনঃ পুনঃ গ্রন্থ হইতে গ্রন্থান্তরে বর্ণিত ও বিবৃত করিবার জন্য গ্রন্থ লেখে না। কিন্তু অষ্টাদশ পুরাণে দেখা যায় যে, এক বিষয়ই পুনঃ পুনঃ ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে সবিস্তারে কথিত হইয়াছে। এই কৃষ্ণচরিত্রই ইহার উদাহরণস্বরূপ লওয়া যাইতে পারে। ইহা ব্রহ্মপুরাণের পূর্ব্বভাগে আছে, আবার বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চম অংশে আছে, শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম ও ১১শ স্কন্ধে আছে, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের ৩য় খণ্ডে আছে এবং পদ্ম ও বামনপুরাণে ও কূর্ম্মপুরাণে সংক্ষেপে আছে। এইরূপ অন্যান্য বিষয়েরও বর্ণনা পুনঃ পুনঃ কখন ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে আছে। এক ব্যক্তির লিখিত ভিন্ন ভিন্ন পুস্তকের এরূপ ঘটনা অসম্ভব।

৩য়,—আর যদিও এক ব্যক্তি এই অষ্টাদশ পুরাণ লিখিয়া থাকে, তাহা হইলে, তন্মধ্যে গুরুতর বিরোধের সম্ভাবনা কিছু থাকে না। কিন্তু অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে, মধ্যে মধ্যে এইরূপ গুরুতর বিরোধ ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। এই কৃষ্ণচরিত্র ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে ভিন্ন প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। সেই সকল বর্ণনা পরস্পর সঙ্গত নহে।

৪র্থ,—বিষ্ণুপুরাণে আছে ;—

"আখ্যানৈশ্চাপ্যুপাখ্যানৈর্গাথাভিঃ কল্পশুদ্ধিভিঃ।
পুরাণসংহিতাং চক্রে পুরাণার্থবিশারদঃ॥
প্রখ্যাতো ব্যাসশিষ্যোঽভূৎ সূতো বৈ লোমহর্ষণঃ।
পুরাণসংহিতাং তস্মৈ দদৌ ব্যাসো মহামুনিঃ॥

---

certain sections which have been added for the purpose of enforcing their divine character that they take the character of Vishnu. It is impossible to read either of these two poems with attention, without being reminded of the latter interpolation of such sections as ascribe a divine character to the heroes, and of the unskilful manner in which these passages are often introduced and without observing how loosely they are connected with the rest of the narrative, and how unnecessary they are for its progress.—Lassen's Indian Antiquities, quoted by Muir.

In other places (অর্থাৎ ভগবদ্গীতাপর্ব্বাধ্যায় ভিন্ন) the divine nature of Krishna is less decidedly affirmed. In some it is disputed or denied; and in most of the situations he is exhibited in action, as a prince and warrior, not as a divinity. He exercises no superhuman faculties in defence of himself or his friends, or in the defeat and destruction of his foes. The Mahabharata however, is the work of various periods and requires to be read through carefully, and critically, before its weight as an authority can be accurately appreciated.—Wilson. Preface to the Vishnu Purana.

সুমতিশ্চাগ্নিবর্চ্চাশ্চ মিত্রয়ুঃ শাংসপায়নঃ।
অকৃতব্রণোঽথ সাবর্ণিঃ ষট্‌শিষ্যাস্তস্য চাভবন্॥
কাশ্যপঃ সংহিতাকর্ত্তা সাবর্ণিঃ শাংসপায়নঃ।
লোমহর্ষণিকা চান্যা ত্রিস্থণাং মূলসংহিতা॥"
বিষ্ণুপুরাণ, ৩ অংশ ৬ অধ্যায়, ১৬-১৯ শ্লোক।

পুরাণার্থবিৎ (বেদব্যাস) আখ্যান, উপাখ্যান, গাথা ও কল্পশুদ্ধির দ্বারা পুরাণসংহিতা করিয়াছিলেন। লোমহর্ষণ নামে সূত বিখ্যাত ব্যাসশিষ্য ছিলেন। ব্যাস মহামুনি তাঁহাকে পুরাণসংহিতা দান করিলেন। সুমতি, অগ্নিবর্চ্চা, মিত্রয়ু, শাংসপায়ন, অকৃতব্রণ, সাবর্ণি—তাঁহার এই ছয় শিষ্য ছিল। (তাহার মধ্যে) কাশ্যপ, সাবর্ণি ও শাংসপায়ন সেই লোমহর্ষণিকা মূলসংহিতা হইতে তিনখানি সংহিতা সঙ্কলন করেন।

পুনশ্চ ভাগবতে আছে;—
"ত্রয্যারুণিঃ কাশ্যপশ্চ সাবর্ণিরকৃতব্রণঃ।
শিংসপায়নহারীতৌ ষড়্ বৈ পৌরাণিকা ইমে॥
অধীয়ন্ত ব্যাসশিষ্যাৎ সংহিতাং মৎপিতুর্মুখাৎ।
একৈকাহমেতেষাঞ্চ শিষ্যাঃ সর্ব্বাঃ সমধ্যগাম্॥
কাশ্যপোঽহঞ্চ সাবর্ণীরামশিষ্যোঽকৃতব্রণঃ।
অধীমহি ব্যাসশিষ্যাচ্চত্বারো মূলসংহিতাঃ॥"*
শ্রীমদ্ভাগবত ১২ স্কন্ধ, ৭ অধ্যায়, ৪-৬ শ্লোক।

ত্রয্যারুণি, কাশ্যপ, সাবর্ণি, অকৃতব্রণ, শিংসপায়ন, হারীত এই ছয় পৌরাণিক।

বায়ুপুরাণে নামগুলি কিছু ভিন্ন;—
"আত্রেয়ঃ সুমতির্ধীমান্ কাশ্যপোঽহং কৃতব্রণঃ।"

পুনশ্চ অগ্নিপুরাণে;—
"প্রাপ্য ব্যাসাৎ পুরাণাদি সূতো বৈ লোমহর্ষণঃ।
কৃতব্রণোঽথ সাবর্ণিঃ শিষ্যাস্তস্য তু চাভবন্।
শাংসপায়নাদয়শ্চক্রুঃ পুরাণানাস্তু সংহিতাঃ॥"

এই সকল বচনে জানিতে পারা যাইতেছে যে, এক্ষণকার প্রচলিত অষ্টাদশ পুরাণ বেদব্যাস-প্রণীত নহে। তাঁহার শিষ্য-প্রশিষ্যগণ পুরাণ-সংহিতা প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহাও এক্ষণে প্রচলিত নাই। যাহা প্রচলিত আছে, তাহা কাহার প্রণীত, কবে প্রণীত হইয়াছিল, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই।

এক্ষণে ইউরোপীয়দিগের যে সাধারণ ভ্রম, তাহার বিষয়ে কিছু বলা যাউক।

ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের ভ্রম এই যে, তাঁহারা মনে করেন যে, এক একখানি পুরাণ একই ব্যক্তির লিখিত। এই ভ্রমের বশীভূত হইয়া তাঁহারা বর্ত্তমান পুরাণ সকলের প্রণয়নকাল নিরূপণ করিতে বসেন। বস্তুতঃ কোনও পুরাণান্তর্গত সকল বৃত্তান্তগুলি এক ব্যক্তির প্রণীত নহে। বর্ত্তমান পুরাণসকল সংগ্রহমাত্র। যাহা সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা ভিন্ন ভিন্ন সময়ের রচনা। কথাটা একটু সবিস্তারে বুঝাইতে হইতেছে।

'পুরাণ' অর্থে আদৌ পুরাতন; পশ্চাৎ পুরাতন ঘটনার বিবৃতি। সকল সময়েই পুরাতন ঘটনা ছিল, এই জন্য সকল সময়েই পুরাণ ছিল। বেদেও পুরাণ আছে। শতপথব্রাহ্মণে, গোপথব্রাহ্মণে, আশ্বলায়ন-সূত্রে, অথর্ব্বসংহিতায়, বৃহদারণ্যকে, ছান্দোগ্যোপনিষদে, মহাভারতে, রামায়ণে, মানবধর্ম্মশাস্ত্রে সর্ব্বত্রই পুরাণ প্রচলিত থাকার কথা আছে। কিন্তু ঐ সকল কোনও গ্রন্থেই বর্ত্তমান কোনও পুরাণের নাম নাই। পাঠকের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, অতি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে লিপিবিদ্যা অর্থাৎ লেখা-পড়া প্রচলিত থাকিলেও গ্রন্থ সকল লিখিত হইত না; মুখে মুখে রচিত, অধীত এবং প্রচারিত হইত। প্রাচীন পৌরাণিক কথা সকল ঐরূপ মুখে মুখে প্রচারিত হইয়া অনেক সময়েই কেবল কিংবদন্তী মাত্রে পরিণত হইয়া গিয়াছিল। পরে সময়বিশেষে ঐ সকল কিংবদন্তী এবং প্রাচীন রচনা একত্র সংগৃহীত হইয়া এক একখানি পুরাণ সঙ্কলিত হইয়াছিল। বৈদিক সূক্তসকল ঐরূপে সঙ্কলিত হইয়া ঋক্, যজুঃ, সাম সংহিতাত্রয়ে বিভক্ত হইয়াছিল, ইহা প্রসিদ্ধ। যিনি বেদবিভাগ করিয়াছিলেন, তিনি এই বিভাগজন্য 'ব্যাস' এই উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 'ব্যাস' তাঁহার উপাধিমাত্র—নাম নহে। তাঁহার নাম কৃষ্ণ, এবং দ্বীপে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল বলিয়া তাঁহাকে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বলিত। এ স্থানে পুরাণ সঙ্কলনকর্ত্তার বিষয়ে দুইটি মত হইতে পারে। একটি মত এই যে, যিনি বেদবিভাগকর্ত্তা, তিনিই যে পুরাণসঙ্কলনকর্ত্তা, ইহা না হইতে পারে, কিন্তু যিনি পুরাণসঙ্কলনকর্ত্তা তাঁহারও উপাধি 'ব্যাস' হওয়া সম্ভব। বর্ত্তমান অষ্টাদশ পুরাণ এক ব্যক্তি কর্ত্তৃক অথবা এক সময়ে যে বিভক্ত ও সঙ্কলিত হইয়াছিল, এমন বোধ হয় না। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সঙ্কলিত হওয়ার প্রমাণ ঐ সকল পুরাণের মধ্যেই আছে; তবে যিনিই কতকগুলি পৌরাণিক বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া একখানি সংগ্রহ প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তিনিই ব্যাস নামের অধিকারী। হইতে পারে যে, এই জন্যই কিংবদন্তী আছে যে, অষ্টাদশ পুরাণই ব্যাস-প্রণীত। কিন্তু ব্যাস যে এক ব্যক্তি নহেন, অনেক ব্যক্তি ব্যাস উপাধি পাইয়াছিলেন, এরূপ বিবেচনা করিবার অনেক কারণ আছে। বেদবিভাগকর্ত্তা ব্যাস,

* ভাগবতের বক্তা ব্যাসপুত্র শুকদেব "বৈশম্পায়নহারীতৌ" ইতি পাঠান্তরও আছে।

মহাভারতপ্রণেতা ব্যাস, অষ্টাদশপুরাণপ্রণেতা ব্যাস, বেদান্তসূত্রকার ব্যাস; এমন কি, পাতঞ্জল-দর্শনের টীকাকার এক জন ব্যাস, এ সকলই এক ব্যাস হইতে পারেন না। সে দিন কাশীতে ভারতমণ্ডলের অধিবেশন হইয়াছিল, সংবাদপত্রে পড়িলাম, তাহাতে দুই জন ব্যাস উপস্থিত ছিলেন। একজনের নাম হরেকৃষ্ণ ব্যাস, আর এক জনের নাম শ্রীযুক্ত অম্বিকাদত্ত ব্যাস। অনেক ব্যক্তি যে ব্যাস উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। এ বেদবিভাগ-কর্ত্তা ব্যাস, মহাভারতপ্রণেতা ব্যাস এবং অষ্টাদশ পুরাণের সংগ্রহকর্ত্তা আঠারটি ব্যাস যে এক ব্যক্তি নন, ইহাই সম্ভব বোধ হয়।

দ্বিতীয় মত এই হইতে পারে যে, কৃষ্ণদ্বৈপায়নই প্রাথমিক পুরাণসঙ্কলনকর্ত্তা। তিনি যেমন বৈদিক সূক্তগুলি সঙ্কলিত করিয়াছিলেন, পুরাণসম্বন্ধেও সেইরূপ একখানি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বিষ্ণু, ভাগবত, অগ্নি প্রভৃতি পুরাণ হইতে যে সকল শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে সেইরূপ বুঝায়। অতএব আমরা সেই মতই অবলম্বন করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু তাহাতেও প্রমাণীকৃত হইতেছে যে, বেদব্যাস একখানি পুরাণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, আঠারখানি নহে। সেখানি নাই। তাঁহার শিষ্যেরা তাহা ভাঙ্গিয়া তিনখানি পুরাণ করিয়াছিলেন, তাহাও নাই। কালক্রমে নানা ব্যক্তির হাতে পড়িয়া তাহা আঠারখানি হইয়াছিল।

ইহার মধ্যে যে মতই গ্রহণ করা যাউক, পুরাণ-বিশেষের সময়-নিরূপণ করিবার চেষ্টায় কেবল এই ফলই পাওয়া যাইতে পারে যে, কবে কোন্ পুরাণ সঙ্কলিত হইয়াছিল, তাহারই ঠিকানা হয়। কিন্তু তাও হয় বলিয়াও আমার বিশ্বাস হয় না। কেন না, সকল গ্রন্থের রচনা বা সঙ্কলনের পর নূতন রচনা প্রক্ষিপ্ত হইতে পারে ও পুরাণ সকলে তাহা হইয়াছে বলিয়াই বোধ হয়। অতএব কোন্ অংশ ধরিয়া সঙ্কলনসময় নিরূপণ করিব? একটা উদাহরণ দ্বারা ইহা বুঝাইতেছি।

মৎস্যপুরাণে, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ সম্বন্ধে এই দুইটি শ্লোক আছে—

"রথন্তরস্য কল্পস্য বৃত্তান্তমধিকৃত্য যৎ।
সাবর্ণিনা নারদায় কৃষ্ণমাহাত্ম্যসংযুতম্॥
যত্র ব্রহ্মবরাহস্য চরিতং বর্ণ্যতে মুহুঃ।
তদষ্টাদশসাহস্রং ব্রহ্মবৈবর্ত্তমুচ্যতে॥"

অর্থাৎ যে পুরাণে রথন্তর কল্পবৃত্তান্তাধিকৃত কৃষ্ণ-মাহাত্ম্যসংযুক্ত কথা নারদকে সাবর্ণি বলিতেছেন এবং যাহাতে পুনঃপুনঃ ব্রহ্মবরাহচরিত কথিত হইয়াছে, সেই অষ্টাদশসহস্র শ্লোকসংযুক্ত ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।

এক্ষণে যে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ প্রচলিত আছে, তাহা সাবর্ণি নারদকে বলিতেছেন না। নারায়ণ নামে অন্য ঋষি নারদকে বলিতেছেন। তাহাতে রথন্তরকল্পের প্রসঙ্গমাত্র নাই এবং ব্রহ্মবরাহচরিতের প্রসঙ্গমাত্র নাই। এখনকার প্রচলিত ব্রহ্মবৈবর্ত্তে প্রকৃতিখণ্ড ও গণেশখণ্ড আছে, যাহার কোন প্রসঙ্গ দুই শ্লোকে নাই। অতএব প্রাচীন ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ এক্ষণে আর বিদ্যমান নাই। যাহা ব্রহ্মবৈবর্ত্ত নামে চলিত আছে, তাহা নূতন গ্রন্থ। তাহা দেখিয়া ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ-সঙ্কলন-সময় নিরূপণ করা অপূর্ব্ব রহস্য বলিয়াই বোধ হয়।

উইল্‌সন্ সাহেব পুরাণ সকলের এইরূপ প্রণয়ন-কাল নিরূপিত করিয়াছেন :—

ব্রহ্মপুরাণ খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ কি চতুর্দ্দশ শতাব্দী।
পদ্মপুরাণ „ ত্রয়োদশ হইতে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে।*
বিষ্ণুপুরাণ „ দশম শতাব্দী।
বায়ুপুরাণ „ সময় নিরূপিত হয় নাই, প্রাচীন বলিয়া লিখিত হইয়াছে।
ভাগবতপুরাণ „ ত্রয়োদশ শতাব্দী।
নারদপুরাণ „ ষোড়শ কি সপ্তদশ শতাব্দী, অর্থাৎ দুই শত বৎসরের গ্রন্থ।
মার্কণ্ডেয়পুরাণ „ নবম কি দশম শতাব্দী।
অগ্নিপুরাণ অনিশ্চিত; অতি অভিনব।
ভবিষ্যপুরাণ ঠিক হয় নাই।
লিঙ্গপুরাণ „ অষ্টম কি নবম শতাব্দীর এদিক্ ওদিক্।
বরাহপুরাণ „ দ্বাদশ শতাব্দী।
স্কন্দপুরাণ ভিন্ন ভিন্ন সময়ের পাঁচখানি পুরাণের সংগ্রহ।
বামনপুরাণ ৩।৪ শত বৎসরের গ্রন্থ।
কূর্ম্মপুরাণ প্রাচীন নহে।
মৎস্যপুরাণ পদ্মপুরাণেরও পর।
গারুড় পুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ } প্রাচীন পুরাণ নাই। বর্ত্তমান গ্রন্থ পুরাণ নয়।

পাঠক দেখিবেন, ইঁহার মতে (এই মতই প্রচলিত) কোন পুরাণই সহস্র বৎসরের অধিক প্রাচীন নয়। বোধ হয়, ইংরেজি পড়িয়া যাঁহার বুদ্ধি-বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, তিনি ভিন্ন এমন কোন হিন্দুই নাই, যিনি

* তাহা হইলে, এই পুরাণ দুই, তিন, কি চারি শত বৎসরের গ্রন্থ।

এই সময়-নির্দ্ধারণ উপযুক্ত বলিয়া গ্রহণ করিবেন। দুই একটা কথার দ্বারাই ইহার অযৌক্তিকতা প্রমাণ করা যাইতে পারে।

এ দেশের লোকের বিশ্বাস যে, কালিদাস বিক্রমাদিত্যের সমসাময়িক লোক এবং বিক্রমাদিত্য খ্রী:-পূ: ৫৬ বৎসরে জীবিত ছিলেন। কিন্তু সে সকল কথা এখন উড়িয়া গিয়াছে। ডাক্তার ভাওদাজি স্থির করিয়াছেন যে, কালিদাস খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক। এখন ইউরোপ শুদ্ধ এবং ইউরোপীয়দিগের দেশী শিষ্যগণ সকলে উচ্চৈঃস্বরে সেই ডাক ডাকিতেছেন। আমরাও এ মত অগ্রাহ্য করি না। অতএব কালিদাস ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক হউন। সকল পুরাণই তাঁহার অনেক পরে প্রণীত হইয়াছিল, ইহাই উইল্‌সন্ সাহেবের উপরিলিখিত বিচারে স্থির হইয়াছে। কিন্তু কালিদাস মেঘদূতে লিখিয়াছেন—

"যেন শ্যামং বপুরতিতরাং কান্তিমালপ্স্যতে তে
বর্হেণেব স্ফুরিতরুচিনা গোপবেশস্য বিষ্ণোঃ।"
১৫ শ্লোকঃ।

যে পাঠক সংস্কৃত না জানেন, তাঁহাকে শেষ ছত্রের অর্থ বুঝাইলেই হইবে। ময়ূরপুচ্ছ দ্বারা উজ্জ্বল বিষ্ণুর গোপবেশের সহিত ইন্দ্রধনুশোভিত মেঘের উপমা হইতেছে। এখন বিষ্ণুর গোপবেশ নাই, বিষ্ণুর অবতার কৃষ্ণেরই গোপবেশ ছিল। ইন্দ্রধনুর সঙ্গে উপমেয় কৃষ্ণচূড়াস্থিত ময়ূরপুচ্ছ। আমি বিনীতভাবে ইউরোপীয় মহামহোপাধ্যায়দিগের নিকট নিবেদন করিতেছি, যদি ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বে কোন পুরাণই ছিল না, তবে কৃষ্ণের ময়ূরপুচ্ছচূড়ার কথা আসিল কোথা হইতে? এ কথা কি বেদে আছে, না মহাভারতে আছে—না রামায়ণে আছে?—কোথাও না। পুরাণ বা তদনুবর্ত্তী গীতগোবিন্দাদি কাব্য ভিন্ন আর কোথাও নাই। আছে, হরিবংশে বটে; কিন্তু হরিবংশ ত উইল্‌সন্ সাহেবের মতে বিষ্ণুপুরাণেরও পরবর্ত্তী। অতএব ইহা নিশ্চিত যে, কালিদাসের পূর্ব্বে অর্থাৎ অন্ততঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বে হরিবংশ অথবা কোন বৈষ্ণবপুরাণ প্রচলিত ছিল।

আর একটা কথা বলিয়াই এ বিষয়ের উপসংহার করিব। এখন যে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ প্রচলিত, তাহা প্রাচীন ব্রহ্মবৈবর্ত্ত না হইলেও অন্ততঃ একাদশ শতাব্দীর অপেক্ষাও প্রাচীন গ্রন্থ। কেন না, গীতগোবিন্দকার জয়দেব গোস্বামী গৌড়াধিপতি লক্ষ্মণ সেনের সভাপণ্ডিত। লক্ষ্মণ সেন দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমাংশের লোক। ইহা বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রমাণীকৃত এবং ইংরেজদিগের দ্বারাও স্বীকৃত। আমরা পরে দেখাইব যে, এই ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ তখন প্রচলিত ও অতিশয় সম্মানিত না থাকিলে গীতগোবিন্দ লিখিত হইত না এবং বর্ত্তমান ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডের পঞ্চদশ অধ্যায় তখন প্রচলিত না থাকিলে গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোক "মেঘৈর্মেদুরমম্বরম্" ইত্যাদি কখনও রচিত হইত না। অতএব এই জাল ব্রহ্মবৈবর্ত্ত একাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বগামী। আদিম ব্রহ্মবৈবর্ত্ত না জানি আরও কত কালের। অথচ উইল্‌সন্ সাহেবের বিবেচনায় ইহা দুই শত মাত্র বৎসরের গ্রন্থ হইতে পারে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

পুরাণ

আঠারখানি পুরাণ মিলাইলে অনেক সময়েই ইহা দেখিতে পাওয়া যায় যে, অনেকগুলি শ্লোক কতকগুলি পুরাণে একই আছে। কোনখানে কিঞ্চিৎ পাঠান্তর আছে, কোনখানে তাহাও নাই। এই গ্রন্থে এইরূপ কতকগুলি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে বা হইবে। দশ মহাপদ্মের সময়নিরূপণ জন্য যে কয়টি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা এ কথার উদাহরণস্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহার অপেক্ষা আর একটা গুরুতর উদাহরণ দিতেছি। ব্রহ্মপুরাণের উত্তরভাগে শ্রীকৃষ্ণচরিত বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে ও বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চমাংশে শ্রীকৃষ্ণচরিত বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। উভয়ে কোন প্রভেদ নাই, অক্ষরে অক্ষরে এক। এই পঞ্চম অংশে আটাশটি অধ্যায়। বিষ্ণুপুরাণের এই আটাশ অধ্যায়ে যতগুলি শ্লোক আছে, ব্রহ্মপুরাণের কৃষ্ণচরিতে সে সকলগুলিই আছে, এবং ব্রহ্মপুরাণের কৃষ্ণচরিতে যে শ্লোকগুলি আছে, বিষ্ণুপুরাণের কৃষ্ণচরিতে সে সকলগুলিই আছে। এই দুই পুরাণে এই সম্বন্ধে কোন প্রকার প্রভেদ বা তারতম্য নাই। নিম্নলিখিত তিনটি কারণের মধ্যে কোন একটি কারণে এরূপ ঘটা সম্ভব।

১ম,—ব্রহ্মপুরাণ হইতে বিষ্ণুপুরাণ চুরি করিয়াছেন।

২য়,—বিষ্ণুপুরাণ হইতে ব্রহ্মপুরাণ চুরি করিয়াছেন।

৩য়,—কেহ কাহারও নিকট চুরি করেন নাই, এই কৃষ্ণ-চরিত বর্ণনা সেই আদিম বৈয়াসিকী পুরাণসংহিতার অংশ। ব্রহ্ম ও বিষ্ণু উভয় পুরাণেই এই অংশ রক্ষিত হইয়াছে।

প্রথম দুইটি কারণ যথার্থ কারণ বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না। কেন না, এরূপ প্রচলিত গ্রন্থ হইতে অষ্টাশ অধ্যায় স্পষ্ট চুরি অসম্ভব এবং অন্য কোন

স্থলেও এরূপ দেখাও যায় না। যে এরূপ চুরি করিবে, সে অন্ততঃ কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া লইতে পারে এবং রচনাও এমন কিছু নয় যে, তাহার কিছু পরিবর্ত্তন হয় না। আর কেবল এই আটাশ অধ্যায় দুইখানি পুরাণে একরূপ দেখিলেই না হয়, চুরির কথা মনে করা যাইত, কিন্তু বলিয়াছি যে, অনেক ভিন্ন ভিন্ন পুরাণের অনেক শ্লোক পরস্পরের সহিত ঐক্যবিশিষ্ট; এবং অনেক ঘটনা সম্বন্ধে পুরাণে পুরাণে বিরোধ থাকিলেও, অনেক ঘটনা সম্বন্ধে আবার পুরাণে পুরাণে বিশেষ ঐক্য আছে। এ স্থলে পূর্ব্বকথিত একখানি আদিম পুরাণ-সংহিতার অস্তিত্বই প্রমাণীকৃত হইতেছে। সেই আদিম সংহিতা কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন ব্যাসরচিত না হইলেও হইতে পারে। তবে সে সংহিতা যে অতি প্রাচীনকালে প্রণীত হইয়াছিল, তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। কেন না, আমরা পরে দেখিব যে, পুরাণকথিত অনেক ঘটনার অখণ্ডনীয় প্রমাণ মহাভারতে পাওয়া যায়, অথচ সে সকল ঘটনা মহাভারতে বিবৃত হয় নাই। সুতরাং এমন কথা বলা যাইতে পারে না যে, পুরাণকার তাহা মহাভারত হইতে লইয়াছেন।

যদি আমরা বিলাতী ধরণে পুরাণ সকলের সংগ্রহসময় নিরূপণ করিতে বসি, তাহা হইলে কিরূপ ফল পাই, দেখা যাউক। বিষ্ণুপুরাণে চতুর্থাংশে চতুর্ব্বিংশাধ্যায়ে মগধরাজদিগের বংশাবলী কীর্ত্তিত আছে। বিষ্ণুপুরাণে যে সকল বংশাবলী কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা ভবিষ্যদ্বাণীর আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। অর্থাৎ বিষ্ণুপুরাণ বেদব্যাসের পিতা পরাশর দ্বারা কলিকালের আরম্ভসময়ে কথিত হইয়াছিল বলিয়া পুরাণকার ভূমিকা করিতেছেন। সে সময়ে নন্দ-বংশীয়াদি আধুনিক রাজগণ জন্মগ্রহণ করেন নাই; কিন্তু উক্ত রাজগণের সমকাল বা পরকালবর্ত্তী প্রক্ষেপকারকের ইচ্ছা যে, উক্ত রাজগণের নাম ইহাতে থাকে। কিন্তু তাঁহাদিগের নামের উল্লেখ করিতে গেলে, ভবিষ্যদ্বাণীর আবরণ রচনার উপর প্রক্ষিপ্ত না করিলে, পরাশরকথিত বলিয়া পাচার করা যায় না। অতএব সংগ্রহকার বা প্রক্ষেপকারক এই সকল রাজার কথা লিখিবার সময় বলিয়াছেন, অমুক রাজা হইবেন, তাহার পর অমুক রাজা হইবেন, তাহার পর অমুক রাজা হইবেন। তিনি যে সকল রাজাদিগের নাম করিয়াছেন, তাহার মধ্যে অনেকে ঐতিহাসিক ব্যক্তি এবং তাঁহাদিগের রাজত্ব সম্বন্ধে বৌদ্ধগ্রন্থ, যবন-গ্রন্থ, সংস্কৃতগ্রন্থ, প্রস্তরলিপি ইত্যাদি বহুবিধ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

যথা—নন্দ, মহাপদ্ম, মৌর্য্য, চন্দ্রগুপ্ত, বিন্দুসার, অশোক, পুষ্পমিত্র, পুলিমান, শকরাজগণ, অন্ধ্র রাজগণ ইত্যাদি ইত্যাদি। পরে লেখা আছে, "নবনাগাঃ পদ্মাবত্যাং কান্তিপুর্য্যাং মথুরায়ামনুগঙ্গা-প্রয়াগং মাগধা গুপ্তাশ্চ ভোক্ষ্যন্তি।" * এই গুপ্ত-বংশীয়দিগের সময় Fleet সাহেবের কল্যাণে নিরূপিত হইয়াছে। এই বংশের প্রথম রাজাকে মহারাজগুপ্ত বলে। তারপর ঘটোৎকচ ও চন্দ্রগুপ্ত, বিক্রমাদিত্য। তার পর সমুদ্রগুপ্ত। ইঁহারা খ্রীঃ চতুর্থ শতাব্দীর লোক। তার পর দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত, বিক্রমাদিত্য. কুমারগুপ্ত, স্কন্দগুপ্ত, বুদ্ধগুপ্ত,—ইঁহারা খৃষ্টীয় পঞ্চ শতাব্দীর লোক। এই সকল গুপ্তগণ রাজা হইয়াছিলেন বা রাজত্ব করিতেছেন, ইহা না জানিলে পুরাণসংগ্রহকার কখনই এরূপ লিখিতে পারিতেন না। অতএব ইনি গুপ্তদিগের সমকাল বা পরকালবর্ত্তী। তাহা হইলে এই পুরাণ খৃষ্টীয় চতুর্থ পঞ্চম শতাব্দীতে রচিত বা প্রণীত হইয়াছিল। কিন্তু এমন হইতে পারে যে, এই গুপ্তরাজাদিগের নাম বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থাংশে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। অথবা এমনও হইতে পারে যে, এই চতুর্থাংশ এক সময়ের রচনা এবং অন্যান্য অংশ অন্যান্য সময়ের রচনা; সকলগুলিই কোনও অনির্দ্দিষ্ট সময়ে একত্রিত হইয়া বিষ্ণুপুরাণ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। আজিকার দিনেও কি ইউরোপে- কি এ দেশে সচরাচর ঘটিতেছে যে, ভিন্ন ভিন্ন সময়ের রচনা একত্রিত হইয়া একখানি সংগ্রহ-গ্রন্থে নিবদ্ধ হয়, এবং ঐ সংগ্রহের একটি বিশেষ নাম দেওয়া হয়। যথা "Percy Reliques" অথবা রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত "ফলিত জ্যোতিষ।" আমার বিবেচনায় সকল পুরাণই এইরূপ সংগ্রহ। উপরি উক্ত দুইখানি পুস্তকই আধুনিক সংগ্রহ; কিন্তু যে সকল বিষয় ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা প্রাচীন। সংগ্রহ আধুনিক বলিয়া সেগুলি আধুনিক হইল না।

তবে এমন অনেক সময়েই ঘটিয়া থাকিতে পারে যে, সংগ্রহকার নিজে অনেক নূতন রচনা করিয়া সংগ্রহের মধ্যে প্রবেশিত করিয়াছেন, অথবা প্রাচীন বৃত্তান্ত নূতন কল্পনাসংযুক্ত এবং অত্যুক্তি অলঙ্কারে রঞ্জিত করিয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণ সম্বন্ধে ঐ কথা বলা যায় না, কিন্তু ভাগবত সম্বন্ধে ইহা বিশেষ প্রকারে বক্তব্য।

প্রবাদ আছে যে, ভাগবত পুরাণ বোপদেবপ্রণীত। বোপদেব দেবগিরির রাজা হেমাদ্রির সভাসদ্। বোপদেব ত্রয়োদশ শতাব্দীর লোক। কিন্তু অনেক হিন্দুই উহা বোপদেবের রচনা বলিয়া স্বীকার করেন না। বৈষ্ণবেরা বলেন, ভাগবতদ্বেষী শাক্তেরা এইরূপ প্রবাদ রটাইয়াছে।

* বিষ্ণুপুরাণ—৪ অংশ, ২০ অ—১৮।

বাস্তবিক ভাগবতের পুরাণত্ব লইয়া অনেক বাদবিতণ্ডা ঘটিয়াছে। শাক্তেরা বলেন, ইহা পুরাণই নহে—বলেন, দেবীভাগবতই ভাগবত পুরাণ। তাঁহারা বলেন, "ভগবত ইদং ভাগবতম্" এইরূপ অর্থ না করিয়া "ভগবত্যা ইদং ভাগবতম্" এই অর্থ করিবে।

কেহ কেহ এইরূপ শঙ্কা করে বলিয়া শ্রীধরস্বামী ইহার প্রথম শ্লোকের টীকাতে লিখিয়াছেন,—"ভাগবতং নামান্যদিত্যপি নাশঙ্কনীয়ম্।" ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, ইহা পুরাণ নহে—দেবীভাগবতই প্রকৃত পুরাণ, এরূপ আশঙ্কা শ্রীধরস্বামীর পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত ছিল এবং তাহা লইয়া বিবাদও হইত। বিবাদকালে উভয় পক্ষে যে সকল পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, তাহার নামগুলি বড় মার্জ্জিত রুচির পরিচায়ক। একখানির নাম "দুর্জ্জন-মুখ চপেটিকা।" তাহার উত্তরের নাম "দুর্জ্জন মুখ-মহাচপেটিকা।" এবং অন্য উত্তরের নাম "দুর্জ্জন-মুখপাদুকা।" তার পর "ভাগবত-স্বরূপবিষয়-শঙ্কানিরাসত্রয়োদশঃ" ইত্যাদি অন্যান্য পুস্তকও এ বিষয়ে প্রণীত হইয়াছিল। আমি এই সকল পুস্তক দেখি নাই, কিন্তু ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা দেখিয়াছেন,—এবং Baurnouf সাহেব "চপেটিকা," "মহাচপেটিকা" এবং "পাদুকার" অনুবাদও করিয়াছেন। Wilson সাহেব তাঁহার বিষ্ণুপুরাণের অনুবাদে ভূমিকায় এই বিবাদের সারসংগ্রহ লিখিয়াছেন। আমাদের সে সকল কথায় কোন প্রয়োজন নাই। যাঁহার কৌতূহল থাকে, তিনি Wilson সাহেবের গ্রন্থ দেখিবেন। আমার মতের স্থূল মর্ম্ম এই যে, ভাগবত পুরাণেও অনেক প্রাচীন কথা আছে। কিন্তু অনেক নূতন উপন্যাসও তাহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, এবং প্রাচীন কথা যাহা আছে, তাহাও নানাপ্রকার অলঙ্কারবিশিষ্ট এবং অত্যুক্তি দ্বারা অতিরঞ্জিত হইয়াছে। এই পুরাণখানি অন্য অনেক পুরাণ হইতে আধুনিক বোধ হয়, তা না হইলে ইহার পুরাণত্ব লইয়া এত বিবাদ উপস্থিত হইবে কেন?

পুরাণের মধ্যে যে সকল পুরাণে কৃষ্ণচরিত্রের প্রসঙ্গ নাই, সে সকলের আলোচনায় আমাদিগের কোনও প্রয়োজন নাই। যে সকল গ্রন্থে কৃষ্ণচরিত্রের কোনও প্রসঙ্গ আছে, তাহার মধ্যে ব্রহ্ম, বিষ্ণু, ভাগবত এবং ব্রহ্মবৈবর্ত্ত এই চারিখানিতেই বিস্তারিত বৃত্তান্ত আছে। তাঁহার মধ্যে আবার ব্রহ্মপুরাণ বিষ্ণুপুরাণে একই কথা আছে। অতএব এই গ্রন্থে বিষ্ণু, ভাগবত এবং ব্রহ্মবৈবর্ত্ত ভিন্ন অন্য কোন পুরাণের ব্যবহার প্রয়োজন হইবে না। এই তিন পুরাণ সম্বন্ধে যাহা আমাদিগের বক্তব্য, তাহা বলিয়াছি। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ সম্বন্ধে আরও কিছু স্থানান্তরে বলিব। এক্ষণে কেবল আমাদের হরিবংশ সম্বন্ধে কিছু বলিতে বাকি আছে।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

হরিবংশেই আছে যে, [illegible] পর উগ্রশ্রবাঃ সৌতি শৌনকাদি ঋষির প্রার্থনানুসারে হরিবংশ কীর্ত্তন করিতেছেন। অতএব উহা মহাভারতের পরবর্ত্তী গ্রন্থ। কিন্তু মহাভারতের কত পরে এই গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছিল, ইহা নিরূপণ আবশ্যক। মহাভারতের পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়ে হরিবংশের প্রসঙ্গ কেবল শেষ শ্লোকে আছে, তাহা ইতিপূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি। কিন্তু মহাভারতের অষ্টাদশ পর্ব্বের অন্তর্গত বিষয়সকল ঐ পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়ে সংক্ষেপে যেরূপ কথিত হইয়াছে, হরিবংশের অন্তর্গত বিষয় সম্বন্ধে সেখানে সেরূপ কিছু কথিত হয় নাই। ঐ শ্লোক পাঠ করিয়া এমনই বোধ হয় যে, যখন প্রথম ঐ পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায় সঙ্কলিত হইয়াছিল, তখন হরিবংশের কোন প্রসঙ্গই ছিল না। পরিশেষে লক্ষ শ্লোক মিলাইবার জন্য কেহ ঐ শ্লোকটি যোজনা করিয়া দিয়াছেন। হরিবংশে এক্ষণে তিন পর্ব্ব পাওয়া যায়,—হরিবংশপর্ব্ব, বিষ্ণুপর্ব্ব ও ভবিষ্যপর্ব্ব। কিন্তু পূর্ব্বোদ্ধৃত মহাভারতের শ্লোকে কেবল হরিবংশপর্ব্ব ও ভবিষ্যপর্ব্বের নাম আছে, বিষ্ণুপর্ব্বের নামমাত্র নাই। হরিবংশপর্ব্বে ও ভবিষ্যপর্ব্বে ১২,০০০ শ্লোক ইহাই লিখিত আছে। এক্ষণে তিন পর্ব্বে ১৬,০০০ শ্লোকের উপর পাওয়া যায়। অতএব নিশ্চিতই মহাভারতে ঐ শ্লোক প্রবিষ্ট হইবার পরে বিষ্ণুপর্ব্ব হরিবংশে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে।

কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় অষ্টাদশপর্ব্ব মহাভারত অনুবাদ করিয়া হরিবংশের অনুবাদ সেই সঙ্গে প্রকাশ করিতে অনিচ্ছুক হইয়াছিলেন। তাহার কারণ তিনি এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

"অষ্টাদশপর্ব্ব মহাভারতের অতিরিক্ত হরিবংশনামক গ্রন্থকে অনেকে ভারতের অন্তর্ভূত একটি পর্ব্ব বলিয়া গণনা করিয়া থাকেন এবং উহাকে আশ্চর্য্য পর্ব্ব বা ঊনবিংশ পর্ব্ব বলিয়া উল্লেখ করেন, কিন্তু বস্তুতঃ হরিবংশ ভারতান্তর্গত একটি পর্ব্ব নহে। উহা মূল মহাভারত রচনার বহুকাল পরে পরিশিষ্টরূপে উহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। হরিবংশের রচনাপ্রণালী ও তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে বিচক্ষণ ব্যক্তি অনায়াসেই উহার আধুনিকত্ব অনুভব করিতে সমর্থ হয়েন। যদিও মূল মহাভারতের স্বর্গারোহণপর্ব্বে

হরিবংশ শ্রবণের ফলশ্রুতি বর্ণিত আছে, কিন্তু তাহাতে হরিবংশের প্রাচীনত্ব প্রমাণ না হইয়া বরং ঐ ফলশ্রুতি-বর্ণনেরই আধুনিকত্ব প্রতিপন্ন হয়। মূল মহাভারত গ্রন্থের সহিত হরিবংশ অনুবাদিত থাকিলে লোকের মনে পূর্ব্বোক্ত ভ্রম দৃঢ়ীভূত হইবে, আশঙ্কা করিয়া উহা একণে অনুবাদ করিতে ক্ষান্ত রহিলাম।"

হরেস্, হেমন্, উইলসন্ সাহেবও হরিবংশ-সম্বন্ধে ঐ কথা বলেন। তিনি বলেন ;—

"The internal evidence is strongly indicative of a date considerably subsequent to that of the major portion of the Mahabharata."*

আমারও সেইরূপ বিবেচনা হয়। আর হরিবংশ মহাভারতের অষ্টাদশ পর্ব্বের অল্পকালপরবর্ত্তী হইলেও এমন সন্দেহ করিবার কারণও আছে যে, বিষ্ণুপর্ব্ব তাহাতে অনেক পরে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। এ সকল কথার নিশ্চয়তাসম্পাদন অতি দুঃসাধ্য।

সুবন্ধুকৃত বাসবদত্তায় হরিবংশের পুষ্কর-প্রাদুর্ভাব-নামক বৃত্তান্তের উল্লেখ আছে। ইউরোপীয় বিচারে স্থির হইয়াছে, সুবন্ধু খ্রীঃ সপ্তম শতাব্দীর লোক। অতএব তখনও হরিবংশ প্রচলিত গ্রন্থ। কিন্তু কবে ইহা প্রণীত হইয়াছিল, তাহা বলা যায় না। তবে ইহা বলা যাইতে পারে যে, উহা মহাভারত ও বিষ্ণুপুরাণের পরবর্ত্তী এবং ভাগবত ব্রহ্মবৈবর্ত্তের পূর্ব্ববর্ত্তী।

কোন্ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া এ কথা বলিতে সাহসী হই, সেটি অতি গুরুতর কথা এবং এই কৃষ্ণচরিত্রবিচারের মূল সূত্র বলিলেও হয়। আমরা পরপরিচ্ছেদে তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

ঐতিহাসিক পৌর্ব্বাপর্য্য

উপনিষদে সৃষ্টিপ্রক্রিয়া এইরূপ কথিত হইয়াছে যে, জগদীশ্বর এক ছিলেন, বহু হইতে ইচ্ছা করিয়া এই জগৎ সৃষ্টি করিলেন।† ইহা প্রসিদ্ধ অদ্বৈতবাদের মূল কথা। ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকেরা অনেক সন্ধানের পর, সেই অদ্বৈতবাদের নিকটে আসিতেছেন। তাঁহারা বলেন, জগতের সমস্তই আদৌ এক, ক্রমশ বহু হইয়াছে। ইহাই প্রসিদ্ধ Evolution-বাদের মূল কথা। এক হইতে বহু বলিলে, কেবল সংখ্যায় বুঝায় না—একাকিত্ব এবং বহুকিত্ব বুঝিতে হইবে। যাহা অভিন্ন ছিল, তাহা ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গে পরিণত হয়। যাহা "Homogeneous" ছিল, তাহা পরিণতিতে "Heterogeneous" হয়। যাহা "Uniform" ছিল, তাহা "Multifarious" হয়। কেবল জড়জগৎসম্বন্ধে এই নিয়ম সত্য, এমন নহে। জড়জগতে, জীবজগতে, মানসজগতে, সমাজজগতে সর্ব্বত্র ইহা সত্য। সমাজজগতের অন্তর্গত যাহা সে সকলেরই পক্ষে ইহা খাটে। সাহিত্য ও বিজ্ঞান সমাজজগতের অন্তর্গত, তাহাতেও খাটে। উপন্যাস বা আখ্যান সাহিত্যের অন্তর্গত, তাহাতেও ইহা সত্য। এমন কি, বাজারের গল্প সম্বন্ধে ইহা সত্য। রাম যদি শ্যামকে বলে, "আমি কাল রাত্রে অন্ধকারে শুইয়াছিলাম, কি একটা শব্দ হইল, আমার বড় ভয় করিতে লাগিল", তবে নিশ্চয়ই শ্যাম যদুর কাছে গিয়া গল্প করিবে, "রামের ঘরে কাল রাত্রে ভূতে কি রকম শব্দ করিয়াছিল।" তার পর ইহাই সম্ভব যে, যদু গিয়া মধুর কাছে গল্প করিবে যে, "কাল রাত্রে রাম ভূত দেখিয়াছিল" এবং মধুও নিধুর কাছে বলিবে যে, "রামের বাড়ীতে বড় ভূতের দৌরাত্ম্য হইয়াছে।" এবং পরিশেষে বাজারে রাষ্ট্র হইবে যে, ভূতের দৌরাত্ম্যে রাম সপরিবারে বড় বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছে।

এ গেল বাজারে গল্পের কথা। প্রাচীন উপাখ্যান সম্বন্ধে এরূপ পরিণতির একটা বিশেষ নিয়ম দেখিতে পাই। প্রথমাবস্থায় নামকরণ,—যেমন বিষ্ ধাতু হইতে বিষ্ণু। দ্বিতীয়াবস্থায় রূপক,—যেমন বিষ্ণুর তিন পাদ ; কেহ বলেন, সূর্য্যের উদয়, মধ্যাহ্নস্থিতি এবং অস্ত। কেহ বলেন, ঈশ্বরের ত্রিলোকব্যাপিতা ; কেহ বলেন ভূত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ। তার পর তৃতীয়াবস্থায়, ইতিহাস—যেমন বলিবামনবৃত্তান্ত। চতুর্থাবস্থায়, ইতিহাসের অতিরঞ্জন। পুরাণাদিতে তাহা দেখা যায়।

এ কথার উদাহরণস্বরূপ আমরা উর্ব্বশীপুরূরবার উপাখ্যান লইতে পারি। ইহার প্রথমাবস্থা, যজুর্ব্বেদ-সংহিতায়। তথায় উর্ব্বশী, পুরূরবা, দুইখানি অরণিকাষ্ঠ মাত্র। বৈদিককালে দিয়াশলাই ছিল না ; চকমকি ছিল না ; অন্ততঃ যজ্ঞার্থ তত এ সকল ব্যবহৃত হইত না। কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ করিয়া যাজ্ঞিক অগ্নির উৎপাদন করিতে হইত। ইহাকে বর্জ্জিত,

---

* Horace Hayman Willson's Essays—Analytical, Critical and Philosophical—on subjects connected with Sanskrit Literature Vol, I, Dr. Reinhold Rost's Edition.

† সোঽকাময়ত বহুঃ স্যাং প্রজায়েয়েতি।—তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ ২ বল্লী, ৬ অনুবাক্।

"অগ্নিচয়ন।" অগ্নিচয়নের মন্ত্র ছিল। যজুর্ব্বেদ-সংহিতার (মাধ্যন্দিনী শাখার) পঞ্চম অধ্যায়ের ২য় কণ্ডিকায় সেই মন্ত্র আছে। উহার তৃতীয় মন্ত্রে একখানি অরণিকে, পঞ্চমে অপরখানিকে পূজা করিতে হয়। সেই দুই মন্ত্রের বাঙ্গালা অনুবাদ এই:—

"হে অরণে! অগ্নির উৎপত্তির জন্য আমরা তোমাকে স্ত্রীরূপে কল্পনা করিলাম। অদ্য হইতে তোমার নাম উর্ব্বশী।" ৩

(উৎপত্তির জন্য, কেবল স্ত্রী নহে, পুরুষও চাই। এজন্য উক্ত স্ত্রীকল্পিত অরণির উপর দ্বিতীয় অরণি স্থাপিত করিয়া বলিতে হইবে)—

"হে অরণে! অগ্নির উৎপত্তির জন্য আমরা তোমাকে পুরুষরূপে কল্পনা করিলাম। অদ্য হইতে তোমার নাম পুরূরবা" ৫ *

চতুর্থ মন্ত্রে অরণিস্পৃষ্ট আজ্যের নাম দেওয়া হইয়াছে আয়ু।

এই গেল প্রথমাবস্থা। দ্বিতীয়াবস্থা ঋগ্বেদসংহিতার † ১০ মণ্ডলের ৯৫ সূক্তে। এখানে উর্ব্বশীপুরূরবা আর অরণিকাষ্ঠ নহে; ইহারা নায়ক-নায়িকা। পুরূরবা উর্ব্বশীর বিরহশঙ্কিত। এই রূপকাবস্থা। রূপকে উর্ব্বশী (৫ম ঋকে) বলিতেছেন, "হে পুরূরবা, তুমি প্রতিদিন আমাকে তিনবার রমণ করিতে।" যজ্ঞের তিনটি অগ্নি ইহার দ্বারা সূচিত হইতেছে। * পুরূরবাকে উর্ব্বশী "ইলাপুত্র" বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন। ইলা শব্দের অর্থ পৃথিবী, পৃথিবীরই ‡ পুত্র অরণিকাষ্ঠ।

মহাভারতে পুরূরবা ঐতিহাসিক চন্দ্রবংশীয় রাজা। চন্দ্রের পুত্র বুধ, বুধের পুত্র ইলা, ইলার পুত্র পুরূরবা। উর্ব্বশীর গর্ভে ইঁহার পুত্র হয়; তাহার নাম আয়ু। ‡ যজুর্ম্মন্ত্র যাহা উপরে উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা দেখিলে পাঠক দেখিতে পাইবেন, আয়ু সেই অরণিস্পৃষ্ট আজ্য। মহাভারতে এই আয়ুর পুত্র বিখ্যাত নহুষ। নহুষের পুত্র বিখ্যাত যযাতি। যযাতির পুত্রের মধ্যে দুই জনের নাম যদু ও পুরু। যদু যাদবদিগের আদিপুরুষ, পুরু কুরুপাণ্ডবের আদিপুরুষ। এই তৃতীয়াবস্থা। তৃতীয়াবস্থায় অরণি-কাষ্ঠ ঐতিহাসিক সম্রাট্।

চতুর্থ অবস্থা, বিষ্ণু, পদ্ম প্রভৃতি পুরাণে। পুরাণ সকলে তৃতীয় অবস্থার ইতিহাস নূতন উপন্যাসে রঞ্জিত হইয়াছে, তাহার দুইটি নমুনা দিতেছি। একটি এই—

উর্ব্বশী ইন্দ্রসভায় নৃত্য করিতে করিতে মহারাজ পুরূরবাকে দেখিয়া মোহিত হওয়ায় নৃত্যের তালভঙ্গ হওয়াতে ইন্দ্রের অভিশাপে পঞ্চপঞ্চাশৎ বর্ষ স্বর্গভ্রষ্টা হইয়া পুরূরবার সহিত বাস করিয়াছিলেন।

আর একটি এইরূপ—

পূর্ব্বকালে কোন সময়ে, ভগবান্ বিষ্ণু ধর্ম্মপুত্র হইয়া গন্ধমাদন পর্ব্বতে বিপুল তপস্যা করিয়াছিলেন। ইন্দ্র তাঁহার উগ্র তপস্যায় ভীত হইয়া তাঁহার বিঘ্নার্থ কতিপয় অপ্সরার সহিত বসন্ত ও কামদেবকে প্রেরণ করেন। সেই সকল অপ্সরা যখন তাঁহার ধ্যানভঙ্গে অশক্তা হইল, তখন কামদেব অপ্সরোগণের উরু হইতে ইঁহাকে সৃজন করিলেন। ইনিই তাঁহার তপোভঙ্গে সমর্থা হন। ইহাতে ইন্দ্র অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং ইঁহার রূপে মোহিত হইয়া ইঁহাকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। ইনিও সম্মতা হইলেন। পরে

---

* সত্যব্রত সামশ্রমীকৃত অনুবাদ।

† সাহেবেরা বলেন, ঋগ্বেদসংহিতা আর সকল সংহিতা হইতে প্রাচীন। ইহার অর্থ এমন নয় যে, ঋক্‌সংহিতার সকল সূক্তগুলি সাম ও যজুঃসংহিতার সকল মন্ত্র হইতে প্রাচীন। যদি এ অর্থে এ কথা কেহ বলিয়া থাকেন বা বুঝিয়া থাকেন, তবে তিনি অতিশয় ভ্রান্ত। এ কথার প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, ঋক্‌সংহিতায় এমন কতকগুলি সূক্ত আছে যে, সেগুলি সকল বেদমন্ত্র অপেক্ষা প্রাচীন। নচেৎ ঋক্‌সংহিতায় এমন অনেক সূক্ত পাওয়া যায় যে, তাহা স্পষ্টতঃ আধুনিক বলিয়া সাহেবেরাই স্বীকার করেন। অনেকগুলি ঋক্ সামবেদসংহিতাতেও আছে। সংহিতা কেহ কাহারও অপেক্ষা প্রাচীন নহে, তবে কোন মন্ত্র অন্য মন্ত্রের অপেক্ষা প্রাচীন। এরূপ প্রাচীন মন্ত্র ঋক্‌সংহিতায় বেশী আছে, কিন্তু ঋক্-সংহিতায় এমন অনেক মন্ত্রও আছে যে, তাহা যজুঃ-সামের অনেক মন্ত্রের অপেক্ষা আধুনিক। দশম মণ্ডলের ৯৫ সূক্ত ইহার একটি উদাহরণ।

* মক্ষমূলর প্রভৃতি এই রূপকের অর্থ করেন, উর্ব্বশী উষা, পুরূরবা সূর্য্য। Solar myth এই পণ্ডিতেরা কোন মতেই ছাড়িতে পারেন না। যজুর্ম্মন্ত্র যাহা উদ্ধৃত করিলাম, তাহাতে এবং তিনবার সংসর্গের কথায় পাঠক বুঝিলেন যে, এই রূপকের প্রকৃত অর্থই উপরে লিখিত হইল।

† সর্পমাংসাৎ পশু ব্যাঘৌ, গোভূবাচস্ত্বিড়া ইলা ইত্যমরঃ।

‡ কখন কখন এই নাম "আয়ুঃ" লিখিত হইয়াছে।

মিত্র ও বরুণ তাঁহাদিগের ঐরূপ মনোভাব জ্ঞাপন করিলে ইনি প্রত্যাখ্যান করেন। তাহাতে তাঁহাদের শাপে ইনি মনুষ্যভোগ্যা 'অর্থাৎ পুরূরবার পত্নী' হন।

এই সকল কথার আলোচনায় আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারি যে, যজুর্ব্বেদসংহিতার ৫ অধ্যায়ের সেই মন্ত্রগুলি সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। তাহার পর ঋগ্বেদ-সংহিতার দশম মণ্ডলের ৯৫ সূক্ত। তার পর মহাভারত। তার পর পদ্মাদি পুরাণ।

আমরা যে সকল গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়া কৃষ্ণচরিত্র বুঝিতে চেষ্টা করিব, তাহার পৌর্ব্বাপর্য্য এই নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া নির্দ্ধারিত করা যাইতে পারে। দুই একটা উদাহরণ দ্বারা ইহা বুঝাইতেছি।

প্রথম উদাহরণস্বরূপ পূতনাবধবৃত্তান্ত দেওয়া যাউক।

ইহার প্রথমাবস্থা কোন গ্রন্থে নাই, কেবল অভিধানেই আছে, যেমন বিষ্ ধাতু হইতে বিষ্ণু। পরে দেখি, পূতনা যথার্থতঃ সূতিকাগারস্থ শিশুর রোগ। কিন্তু পূতনা শকুনিকেও বলে; অতএব মহাভারতে পূতনা শকুনি। বিষ্ণুপুরাণে আর এক সোপান উঠিল; রূপকে পরিণত হইল। পূতনা "বালঘাতিনী" অর্থাৎ বালহত্যা যাহার ব্যবসায়; "অতিভীষণা"; তাহার কলেবর "মহৎ"; নন্দ দেখিয়া ত্রাসযুক্ত ও বিস্মিত হইলেন। তথায় এখনও সে মানবী।* হরিবংশে দুইটা কথাই মিলান হইল। পূতনা মানবী বটে, কংসের ধাত্রী। কিন্তু সে কামরূপিণী পক্ষিণী হইয়া ব্রজে আসিল। রূপকত্ব আর নাই; এখন আখ্যান বা ইতিহাস। তৃতীয়াবস্থা এইখানে প্রথম প্রবেশ করিল। পরিশেষে ভাগবতে ইহার চূড়ান্ত হইল। পূতনা রোগও নয়, পক্ষিণীও নয়, মানবীও নহে। সে ঘোররূপা রাক্ষসী। তাহার শরীর ছয় ক্রোশ বিস্তৃত হইয়া পতিত হইয়াছিল, দাঁতগুলা এক একটা লাঙ্গলদণ্ডের মত, নাকের গর্ত্ত গিরিকন্দরের তুল্য, স্তন দুইটা গণ্ড-শৈল অর্থাৎ ছোট রকমের পাহাড়, চক্ষু অন্ধকূপের তুল্য। পেটটা জলশূন্য হ্রদের সমান, ইত্যাদি ইত্যাদি। একটা পীড়া ক্রমশঃ এতবড় রাক্ষসীতে পরিণত হইল, দেখিয়া পাঠক আনন্দলাভ করিবেন, আমরা ভরসা করি; কিন্তু মনে রাখেন যেন, ইহা চতুর্থ অবস্থা।

---

* কোন অনুবাদকার অনুবাদে "রাক্ষসী" কথাটা বসাইয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণের মূলে এমন কথা নাই।

ইহাতে পাই, অগ্রে মহাভারত; তার পর বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চম অংশ, তার পর হরিবংশ, তার পর ভাগবত।

আর একটা উদাহরণ লইয়া দেখা যাউক। কাল শব্দের পর ইয় প্রত্যয় করিলে 'কালিয়' শব্দ পাওয়া যায়। কালিয়ের নাম মহাভারতে নাই। বিষ্ণুপুরাণে কালিয়বৃত্তান্ত পাই। পড়িয়া জানিতে পারা যায় যে, ইহা কাল এবং কালভয়নিবারণ কৃষ্ণপাদপদ্মসম্বন্ধীয় একটি রূপক। সাপের একটিমাত্র ফণা থাকে, কিন্তু বিষ্ণুপুরাণে "মধ্যম ফণার" কথা আছে। মধ্যম বলিলে তিনটি বুঝায়। বুঝিলাম যে, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানাভিমুখী কালিয়ের তিনটি ফণা। কিন্তু হরিবংশকার রূপকের প্রকৃত তাৎপর্য্য নাই বুঝিতে পারুন, বা তাহাতে নূতন অর্থ দিবার অভিপ্রায় রাখুন, তিনি দুইটি ফণা বাড়াইয়া দিলেন। ভাগবতকার তাহাতে সন্তুষ্ট নহেন—একেবারে সহস্র ফণা করিয়া দিলেন।

এখন বলিতে পারি কি না যে, আগে মহাভারত, পরে বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চম অংশ, পরে হরিবংশ, পরে ভাগবত?

এখন আর উদাহরণ বাড়াইবার প্রয়োজন নাই; কৃষ্ণচরিত্র লিখিতে লিখিতে অনেক উদাহরণ আপনি আসিয়া পড়িবে। স্থূল কথা এই যে, যে গ্রন্থে অমৌলিক, অনৈসর্গিক উপন্যাসভাগ যত বাড়িয়াছে, সেই গ্রন্থ তত আধুনিক। এই নিয়মানুসারে, আলোচ্য গ্রন্থ সকলের পৌর্ব্বাপর্য্য এইরূপ অবধারিত হয়।

প্রথম। মহাভারতের প্রথম স্তর।

দ্বিতীয়। বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চম অংশ।

তৃতীয়। হরিবংশ।

চতুর্থ। শ্রীমদ্ভাগবত।

ইহা ভিন্ন আর কোন গ্রন্থের ব্যবহার বিধেয় নহে। মহাভারতের দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তর অমৌলিক বলিয়া অব্যবহার্য্য, কিন্তু তাহার অমৌলিকতা প্রমাণ করিবার জন্য, ঐ সকল অংশের কোথাও কোথাও সমালোচনা করিব। ব্রহ্মপুরাণ ব্যবহারের প্রয়োজন নাই; কেন না, বিষ্ণুপুরাণে যাহা আছে, ব্রহ্মপুরাণেও তাহা আছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ পরিত্যাজ্য। কেন না, মৌলিক ব্রহ্মবৈবর্ত্ত লোপপ্রাপ্ত হইয়াছে, তথাপি শ্রীরাধার বৃত্তান্ত জন্য একবার ব্রহ্মবৈবর্ত্ত ব্যবহার করিতে হইবে। অন্যান্য পুরাণে কৃষ্ণকথা অতি সংক্ষিপ্ত, এ জন্য সে সকলের ব্যবহার নিষ্ফল। বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চমাংশ ভিন্ন চতুর্থাংশও কদাচিৎ ব্যবহার করার প্রয়োজন হইবে—যথা স্যমন্তক মণি, সত্যভামা ও জাম্ববতী-বৃত্তান্ত।

পুরাণ সকলের প্রক্ষিপ্তবিচার দুর্ঘট। মহাভারতে যে সকল লক্ষণ পাইয়াছি, তাহা হরিবংশে ও পুরাণে লক্ষ্য করা ভার। কিন্তু মহাভারত সম্বন্ধে আর যে দুইটা * নিয়ম করিয়াছি যে, যাহা অনৈসর্গিক তাহা অনৈতিহাসিক ও অতিপ্রকৃত বলিয়া পরিত্যাগ করিব; আর যাহা নৈসর্গিক, তাহাও যদি মিথ্যার লক্ষণাক্রান্ত হয়, তবে তাহাও পরিত্যাগ করিব; এই দুইটি নিয়ম পুরাণ সম্বন্ধেও খাটিবে।

একণে আমরা কৃষ্ণচরিত্রকথনে প্রবৃত্ত।

* ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

দ্বিতীয় খণ্ড

বৃন্দাবন

"যো মোহয়তি ভূতানি স্নেহপাশানুবন্ধনৈঃ।
সর্গস্য রক্ষণার্থায় তস্মৈ মোহাত্মনে নমঃ।"

শান্তিপর্ব্ব ৪৭ অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ

যদুবংশ

প্রথম খণ্ডে আমরা পুরূরবার পুত্র আয়ুর কথা বলিয়াছি। আয়ু যজুর্ব্বেদে যজ্ঞের ঘৃতমাত্র। কিন্তু ঋগ্বেদসংহিতার ১০ম মণ্ডলে তিনি ঐতিহাসিক রাজা। ১০ম মণ্ডলের ৪৯ স্থক্তের ঋষি বৈকুণ্ঠ ইন্দ্র। ইন্দ্র বলিতেছেন, "আমি বেশকে আয়ুর বশীভূত করিয়া দিয়াছি।"

আয়ুর পুত্র নহুষ। নহুষের পুত্র যযাতি। এই নহুষ ও যযাতির নামও ঋগ্বেদসংহিতায় আছে। যযাতির পাঁচ পুত্র ইতিহাস পুরাণে কথিত আছে। জ্যেষ্ঠ যদু ও কনিষ্ঠ পুরু। আর তিন জনের নাম তুর্ব্বসু, দ্রুহ্য, অণু। ইহার মধ্যে পুরু, যদু এবং তুর্ব্বসুর নাম ঋগ্বেদসংহিতায় আছে (১০ম ৪৮।৪৯ স্থক্ত)। কিন্তু ইহারা যে যযাতির পুত্র বা পরস্পরের ভাই, এমন কথা ঋগ্বেদসংহিতায় নাই।

কথিত আছে, যযাতির জ্যেষ্ঠ চারি পুত্র তাঁহার আজ্ঞাপালন না করায় তিনি ঐ চারি পুত্রকে অভিশপ্ত করিয়া কনিষ্ঠ পুরুকে রাজ্যাভিষিক্ত করেন। এই পুরুর বংশে দুষ্মন্ত, ভরত, কুরু এবং অজমীঢ় ইত্যাদি ভূপতিরা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। দুর্য্যোধন যুধিষ্ঠিরাদি কৌরবেরা এই পুরুর বংশ এবং কৃষ্ণ প্রভৃতি যাদবেরা যদুর বংশ। অন্ততঃ পুরাণে ইতিহাসে সচরাচর ইহাই পাওয়া যায় যে, যযাতিপুত্র যদু হইতে মথুরাবাসী যাদবদিগের উৎপত্তি।

কিন্তু হরিবংশে আর এক কথা পাওয়া যায়, হরিবংশের হরিবংশপর্ব্বে যে যদুবংশকথন আছে, তাহাতে যযাতিপুত্র যদুরই বংশকথন। কিন্তু বিষ্ণুপর্ব্বে ভিন্ন প্রকার আছে। তথায় আছে যে, হর্য্যশ্ব নামে একজন ইক্ষাকুবংশীয় অযোধ্যার রাজা ছিলেন। তিনি মধুবনাধিপতি মধুর কন্যা মধুমতীকে বিবাহ করেন। এই মধুবনই মথুরা। হর্য্যশ্ব অযোধ্যা হইতে কোন কারণে বিদূরিত হইলে, শ্বশুরবাড়ী আসিয়া বাস করেন। ইঁহারই পুত্র যদু। হর্য্যশ্বের লোকান্তরে ইনি রাজা হয়েন। যদুর পুত্র মাধব, মাধবের পুত্র সত্বত, সত্বতের পুত্র ভীম। মধুর পুত্র লবণকে রামের ভ্রাতা শত্রুঘ্ন বিজিত করিয়া তাহার রাজ্য হস্তগত করিয়া মথুরানগর নির্ম্মাণ করেন। হরিবংশে বলে, রাঘবেরা মথুরা ত্যাগ করিয়া গেলে, ভীম তাহা পুনর্ব্বার অধিকার করেন, এবং এই যদুসম্ভূত বংশই মথুরবাসী যাদবগণ।

ঋগ্বেদসংহিতার দশম মণ্ডলের ৬২ স্থক্তে যদু ও তুর্বা (তুর্ব্বসু) এই দুই জনের নাম আছে (১০ম ঋক্), কিন্তু তথায় ইঁহাদিগকে দাসজাতীয় রাজা বলা হইয়াছে।

কিন্তু ঐ মণ্ডলের ৪৯ স্থক্তে ইন্দ্র বলিতেছেন, "তুর্ব্বস ও যদু দুই ব্যক্তিকে আমি বলবান্ বলিয়া খ্যাত্যাপন্ন করিয়াছি (৮ ঋক্)।" ঐ স্থক্তের ৩ ঋকে আছে, "আমি দস্যুজাতিকে 'আর্য্য' এই নাম হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছি।"* তবে দাসজাতীয় রাজাকে যে তিনি খ্যাত্যাপন্ন করিয়াছিলেন, ইহাতে কি বুঝিতে পারা যায়, এই যদু আর্য্য না অনার্য্য? ইহা ঠিক বুঝা গেল না।

পুনশ্চ, প্রথম মণ্ডলের ৩৬ স্থক্তে ১৮ ঋকের অর্থ এইরূপ,—"অগ্নির দ্বারা তুর্ব্বস, যদু ও উগ্রদেবকে দূর হইতে আমরা আহ্বান করি।" অনার্য্য রাজ সম্বন্ধে আর্য্য ঋষির এরূপ উক্তি সম্ভব কি?

যাহা হউক, তিনজন যদুর কথা পাই।

(১) যযাতির পুত্র।

(২) ইক্ষাকুবংশীয়।

(৩) অনার্য্য রাজা।

---

* এই কয়টি ঋকের অনুবাদ রমেশ বাবুর অনুবাদ হইতে উদ্ধৃত করা গেল।

কৃষ্ণ কোন্ যদুর বংশে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, তাহা মীমাংসা করা দুর্ঘট। যখন তাঁহাদের মথুরায় ভিন্ন পাই না, এবং ঐ মথুরা ইক্ষাকুবংশীয়দিগের নির্মিত, তখন এই যাদবেরা ইক্ষাকুবংশীয় নহে, ইহা জোর করিয়া বলা যায় না।

যে যদুবংশেই কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করুন, তদ্বংশে মধু, সত্বত, বৃষ্ণি, অন্ধক, কুকুর ও ভোজ প্রভৃতি রাজগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই বৃষ্ণি, অন্ধক, কুকুর ও ভোজবংশীয়েরা একত্র মথুরায় বাস করিতেন। কৃষ্ণ বৃষ্ণিবংশীয়, কংস ও দেবকী ভোজবংশীয়। কংস ও দেবকীর এক পিতামহ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কৃষ্ণের জন্ম

কংসের পিতা উগ্রসেন যাদবদিগের অধিপতি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। কৃষ্ণের পিতা বসুদেব, দেবকীর স্বামী।

বসুদেব দেবকীকে বিবাহ করিয়া যখন গৃহে আনিতেছিলেন, তখন কংস প্রীতিপূর্ব্বক তাঁহাদের রথের সারথ্য গ্রহণ করিয়া, তাঁহাদিগকে লইয়া যাইতেছিলেন। এমন সময়ে দৈববাণী হইল যে, ঐ দেবকীর অষ্টমগর্ভজাত পুত্র কংসকে বধ করিবে। তখন আপদের শেষ করিবার জন্য কংস দেবকীকে বধ করিতে উদ্যত হইলেন। বসুদেব তাঁহাকে শান্ত করিয়া অঙ্গীকার করিলেন যে, তাঁহাদের যতগুলি পুত্র হইবে, তিনি স্বয়ং সকলকে কংসহস্তে সমর্পণ করিবেন। ইহাতে আপাততঃ দেবকীর প্রাণরক্ষা হইল, কিন্তু কংস বসুদেব ও দেবকীকে অবরুদ্ধ করিলেন এবং তাঁহাদের প্রথম ছয় সন্তান বধ করিলেন। সপ্তমগর্ভস্থ সন্তান গর্ভেই বিনষ্ট হইয়াছিল। পুরাণে কথিত হইয়াছে, বিষ্ণুর আজ্ঞানুসারে যোগনিদ্রা সেই গর্ভ আকর্ষণ করিয়া বসুদেবের অন্য পত্নীর গর্ভে স্থাপিত করিয়াছিলেন।

সেই অন্য পত্নী রোহিণী। মথুরার অদূরে ঘোষপল্লীতে নন্দ নামে গোপব্যবসায়ীর বাস। তিনি বসুদেবের আত্মীয়। রোহিণীকে বসুদেব সেই নন্দের গৃহে রাখিয়া গিয়াছেন। সেইখানে রোহিণী পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন। এই পুত্র, বলরাম।

দেবকীর অষ্টম গর্ভে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইলেন। এবং যথাকালে রাত্রিতে ভূমিষ্ঠ হইলেন। বসুদেব তাঁহাকে সেই রাত্রিতেই নন্দালয়ে লইয়া গেলেন। সেই রাত্রিতেই নন্দপত্নী যশোদা একটি কন্যা প্রসব করিয়াছিলেন। পুরাণে কথিত হইয়াছে যে, ইনি সেই বৈষ্ণবী-শক্তি যোগনিদ্রা। ইনি যশোদাকে মুগ্ধ করিয়া রাখিলেন, ইত্যবসরে বসুদেব পুত্রটিকে সূতিকাগারে রাখিয়া কন্যাটি লইয়া স্বভবনে আসিলেন। সেই কন্যাকে তিনি কংসকে আপন কন্যা বলিয়া সমর্পণ করিলেন। কংস তাহাকে বিনষ্ট করিতে পারিলেন না। যোগনিদ্রা আকাশ-পথে চলিয়া গেলেন, এবং বলিয়া গেলেন যে, কংসের নিধনকারী কোন স্থানে জন্মিয়াছেন। কংস তার পর ভগিনীকে কারামুক্ত করিল। কৃষ্ণ নন্দালয়ে রহিলেন।

এ সকল অনৈসর্গিক ব্যাপার; আমরা পূর্ব্বকৃত নিয়মানুসারে ত্যাগ করিতে বাধ্য। তবে ইহার মধ্যে একটু ঐতিহাসিক তত্ত্বও পাওয়া যায়। কৃষ্ণ মথুরায় যদুবংশে, দেবকীর গর্ভে, বসুদেবের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অতি শৈশবে তাঁহাকে তাঁহার পিতা নন্দালয়ে * রাখিয়া আসিয়াছিলেন। নন্দালয়ে পুত্রকে লুকাইয়া রাখার জন্য তাঁহাকে কংসনাশ-বিষয়িণী দৈববাণীর বা কংসের প্রাণভয়ের আশ্রয় লইতে হয় নাই। ভাগবত পুরাণে এবং মহাভারতীয় কৃষ্ণোক্তিতে আছে যে, কংস এই সময়ে অতিশয় দুরাচার হইয়া উঠিয়াছিল। সে ঔরঙ্গজেবের মত, আপনার পিতা উগ্রসেনকে পদচ্যুত করিয়া আপনি রাজ্যাধিকার করিয়াছিল। যাদবদিগের উপর এরূপ পীড়ন আরম্ভ করিয়াছিল যে, অনেক যাদব ভয়ে মথুরা হইতে পলায়ন করিয়া অন্য দেশে গিয়া বাস করিতেছিলেন। বসুদেবও আপনার অন্যা পত্নী রোহিণীকে ও তাঁহার পুত্রকে নন্দালয়ে রাখিলেন। এখন কৃষ্ণকেও কংসভয়ে সেই নন্দালয়ে লুকাইয়া রাখিলেন। ইহা সম্ভব এবং ঐতিহাসিক বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

---

* কৃষ্ণচরিত্রের প্রথম সংস্করণে আমি কৃষ্ণের নন্দালয়ে বাসের কথা অবিশ্বাস করিয়াছিলাম এবং তাহার পোষকতায় মহাভারত হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছিলাম। সেই সকল কথা আমি পুনশ্চ উপযুক্ত স্থানে উদ্ধৃত করিব। একণে আমার ইহাই বক্তব্য যে, একণে পুনর্ব্বার বিশেষ বিচার করিয়া সে মত কিয়দংশ পরিত্যাগ করিয়াছি। আপনার ভ্রান্তি স্বীকার করিতে আমার আপত্তি নাই—ক্ষুদ্রবুদ্ধি ব্যক্তির ভ্রান্তি সচরাচরই ঘটিয়া থাকে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শৈশব

কৃষ্ণের শৈশব সম্বন্ধে কতকগুলি বিশেষ অনৈসর্গিক কথা পুরাণে কথিত হইয়াছে। একে একে তাহার পরিচয় দিতেছি।

১। পূতনাবধ। পূতনা কংসপ্রেরিতা রাক্ষসী। সে পরমরূপবতীর বেশ ধারণ করিয়া নন্দালয়ে কৃষ্ণবধার্থ প্রবেশ করিল। তাহার স্তনে বিষ বিলেপিত ছিল। সে কৃষ্ণকে স্তন্যপান করাইতে লাগিল। কৃষ্ণ তাহাকে এরূপ নিপীড়িত করিয়া স্তন্যপান করিলেন যে, পূতনার প্রাণ বহির্গত হইল। সে তখন নিজ রূপ ধারণ করিয়া ছয় ক্রোশ ভূমি ব্যাপিয়া নিপতিত হইল।

মহাভারতেও শিশুপালবধ-পর্ব্বাধ্যায়ে পূতনাবধের প্রসঙ্গ আছে। শিশুপাল পূতনাকে শকুনি বলিতেছেন। শকুনি বলিলে গৃধ্র, চীল এবং শ্যামাপক্ষীকেও বুঝায়। বলবান্ শিশুর একটা ক্ষুদ্র পক্ষী বধ করা বিচিত্র নহে।

কিন্তু পূতনার আর একটা অর্থ আছে। আমরা যাহাকে "পেঁচোয় পাওয়া" বলি, সুতিকাগারস্থ শিশুর সেই রোগের নাম পূতনা। সকলেই জানে যে, শিশু বলের সহিত স্তন্যপান করিতে পারিলে এ রোগ আর থাকে না, বোধ হয়, ইহাই পূতনাবধ।

২। শকটবিপর্য্যয়। যশোদা, কৃষ্ণকে একখানা শকটের নীচে শুয়াইয়া রাখিয়াছিলেন। কৃষ্ণের পদাঘাতে শকট উলটাইয়া পড়িয়াছিল। ঋগ্বেদসংহিতায় ইন্দ্রকৃত উষার শকটভঞ্জনের একটা কথা আছে। এই কৃষ্ণকৃত শকটভঞ্জন সে প্রাচীন রূপকের নূতন সংস্কারমাত্র হইতে পারে। অনেকগুলি বৈদিক উপাখ্যান কৃষ্ণলীলান্তর্গত হইয়াছে, এমন বিবেচনা করিবার কারণ আছে।

৩। তাহার পর মাতৃক্রোড়ে কৃষ্ণের বিশ্বম্ভরমূর্ত্তিধারণ এবং স্বীয় ব্যাদিতানন মধ্যে যশোদাকে বিশ্বরূপ দেখান। এটা প্রথম ভাগবতে দেখিতে পাই। ভাগবতকারেরই রচিত উপন্যাস বোধ হয়।

৪। তৃণাবর্ত্ত। তৃণাবর্ত্ত নামে অসুর কৃষ্ণকে একদা আকাশমার্গে তুলিয়া লইয়া গিয়াছিল। ইহার যেরূপ বর্ণনা দেখা যায়, তাহাতে বোধ হয়, ইহা চক্রবায়ু মাত্র। চক্রবায়ুর রূপ ধরিয়াই অসুর আসিয়াছিল, ভাগবতে এইরূপ কথিত হইয়াছে এই উপাখ্যানও প্রথম ভাগবতেই দেখিতে পাই। সুতরাং ইহাও অমৌলিক সন্দেহ নাই। চক্রবায়ুতে ছেলে তুলিয়া ফেলাও বিচিত্র নহে।

৫। কৃষ্ণ একদা মৃত্তিকা ভোজন করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ সে কথা অস্বীকার করায় যশোদা তাঁহার মুখের ভিতর দেখিতে চাহিলেন। কৃষ্ণ হাঁ করিয়া বদনমধ্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দেখাইলেন। এটিও কেবল ভাগবতীয় উপন্যাস।

৬। ভাগবতকার আরও বলেন, কৃষ্ণ হাঁটিয়া বেড়াইতে শিখিলে তিনি গোপীদিগের গৃহে অত্যন্ত দৌরাত্ম্য করিতেন। অন্যান্য দৌরাত্ম্যমধ্যে ননী মাখন চুরি করিয়া খাইতেন। বিষ্ণুপুরাণেও এ কথা নাই মহাভারতেও নাই।

হরিবংশে ননী মাখন চুরির কথা প্রসঙ্গক্রমে আছে ভাগবতে ইহার বাড়াবাড়ি। যে শিশুর ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞান জন্মিবার সময় হয় নাই, সে খাদ্য চুরি করিলে কোন দোষ হইল না। যদি বল যে, কৃষ্ণকে তোমরা ঈশ্বরাবতার বল; তাঁহার কোন বয়সেই জ্ঞানের অভাব থাকিতে পারে না। তাহার উত্তরে কৃষ্ণোপাসকেরা বলিতে পারেন যে, ঈশ্বরের চুরি নাই। জগৎই যাঁহার—সর, ঘৃত, নবনীত, মাখন যাঁহার সৃষ্ট—তিনি কার ধন লইয়া চোর হইলেন? সবই ত তাঁহার। আর যদি বল, তিনি মানবধর্ম্মাবলম্বী—মানবধর্ম্মে চুরি অবশ্য পাপ, তাহার উত্তর এই যে, মানবধর্ম্মাবলম্বী শিশুর পাপ নাই, কেন না, শিশুর ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞান নাই। কিন্তু এ সকল বিচারে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই —কেন না কথাটাই অমূলক। যদি মৌলিক কথা হয়, তবে ভাগবতকার এ কথা যে ভাবে বলিয়াছেন, তাহা বড় মনোহর।

ভাগবতকার বলিয়াছেন যে, ননী মাখন ভগবান্ নিজের জন্য বড় চুরি করিতেন না; বানরদিগকে খাওয়াইতেন। বানরদিগকে খাওয়াইতে না পাইলে শুইয়া পড়িয়া কাঁদিতেন। ভাগবতকার বলিতে পারেন যে, কৃষ্ণ সর্ব্বভূতে সমদর্শী; গোপীরা যথেষ্ট ক্ষীর, নবনীত খায়,—বানরেরা পায় না, এজন্য গোপীদিগের লইয়া বানরদিগকে দেন। তিনি সর্ব্বভূতের ঈশ্বর, গোপী ও বানর তাঁহার নিকট ননীমাখনের তুল্যাধিকারী।

এই শিশু সর্ব্বজনের জন্য সন্তাপরবশ, সর্ব্বজনের দুঃখমোচনে উদ্যুক্ত। তির্য্যক্‌জাতি বানরদিগের জন্য তাঁহার কাতরতায় ভাগবতকার এই পরিচয় দিয়াছেন। আর এক দুঃখিনী ফলবিক্রেত্রীর কথা বলিয়াছেন। কৃষ্ণের নিকট সে ফল লইয়া আসিলে কৃষ্ণ অঞ্জলি ভরিয়া তাহাকে রত্ন দিলেন। কথাগুলির ভাগবত ব্যতীত প্রমাণ কিছুই নাই; কিন্তু আমরা পরে দেখিব, পরহিতই কৃষ্ণের জীবনের ব্রত।

৭। যমলার্জ্জুনভঙ্গ। একদা কৃষ্ণ বড় "দুরন্তপনা" করিয়াছিলেন বলিয়া, যশোদা তাঁহার পেটে দড়ি বাঁধিয়া একটা উদূখলে বাঁধিয়া রাখিলেন। কৃষ্ণ উদূখল টানিয়া লইয়া চলিলেন। যমলার্জ্জুন নামে দুইটা গাছ ছিল। কৃষ্ণ তাহার মধ্য দিয়া চলিলেন। উদূখল গাছের মূলে বাধিয়া গেল। কৃষ্ণ তথাপি চলিলেন। গাছ দুইটা ভাঙ্গিয়া গেল।

এ কথা বিষ্ণুপুরাণে এবং মহাভারতে শিশুপালের তিরস্কারবাক্যে আছে। কিন্তু ব্যাপারটা কি? অর্জ্জুন বলে কুরচি গাছকে; যমলার্জ্জুন অর্থে জোড়া কুরচি গাছ। কুরচি গাছ সচরাচর বড় হয় না এবং অনেক গাছ ছোট দেখা যায়। যদি চারাগাছ হয়, তাহা হইলে বলবান্ শিশুর বলে ঐরূপ অবস্থায় তাহা ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে।

কিন্তু ভাগবতকার পূর্ব্বপ্রচলিত কথার উপর অতিরঞ্জন চেষ্টা করিতে ত্রুটি করেন নাই। গাছ দুইটি কুবেরপুত্র; শাসননিবন্ধন গাছ হইয়াছিল, কৃষ্ণস্পর্শে মুক্ত হইয়া স্বধামে গমন করিল। কৃষ্ণকে বন্ধন করিবার কালে গোকুলে যত দড়ি ছিল, সব যোড়া দিয়াও কচি ছেলের পেট বাঁধা গেল না। শেষে কৃষ্ণ দয়া করিয়া বাঁধা দিলেন।

বিষ্ণুর একটি নাম দামোদর। বহিরিন্দ্রিয়নিগ্রহকে দম বলে। উদ্ উপর, ঋ গমনে, এজন্য উদর অর্থে উৎকৃষ্ট গতি, দম দ্বারা যিনি উচ্চস্থান পাইয়াছেন, তিনিই দামোদর। বেদে আছে বিষ্ণু তপস্যা করিয়া বিষ্ণুত্ব লাভ করিয়াছেন, নহিলে তিনি ইন্দ্রের কনিষ্ঠ মাত্র। শঙ্করাচার্য্য দামোদর শব্দের এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বলেন, "দমাদিসাধনেন উদরা উৎকৃষ্টা গতির্যা তয়া গম্যত ইতি দামোদরঃ।" মহাভারতেও আছে, "দমাদ্দামোদরং বিদুঃ।"

কিন্তু দামন্ শব্দে গোরুর দড়িও বুঝায়। যাহার উদর গোরুর দড়িতে বাঁধা হইয়াছিল, সে-ও দামোদর। গোরুর দড়ির কথাটা উঠিবার আগে দামোদর নামটা প্রচলিত ছিল। নামটি পাইয়া ভাগবতকার দড়ি বাঁধার উপন্যাসটি গড়িয়াছেন, এই বোধ হয় না কি?

এক্ষণে নন্দাদি গোপগণ পূর্ব্ববাসস্থান ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে চলিলেন। কৃষ্ণ নানাবিধ বিপদে পড়িয়াছিলেন, এইরূপ বিবেচনা করিয়াই তাঁহারা বৃন্দাবনে গেলেন, এইরূপ পুরাণে লিখিত আছে। বৃন্দাবন অধিকতর সুখের স্থান, এজন্যও হইতে পারে। হরিবংশে পাওয়া যায়, এই সময়ে ঘোষনিবাসে বড় বৃকের ভয় হইয়াছিল। গোপেরা তাই সেই স্থান ত্যাগ করিয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কৈশোরলীলা

এই বৃন্দাবন কাব্যজগতে অতুল্য সৃষ্টি। হরিৎপুষ্পশোভিত পুলিনশালিনী কলনাদিনী কালিন্দীকূলে কোকিল-ময়ূরধ্বনিতকুঞ্জবন-পরিপূর্ণা গোপবালকগণের শৃঙ্গবেণুর মধুররবে শব্দময়ী, অসংখ্য কুসুমামোদসুবাসিতা, নানাভরণভূষিতা, বিশালায়তলোচনা ব্রজসুন্দরীগণসমলঙ্কৃতা বৃন্দাবনস্থলী, স্মৃতিমাত্র হৃদয় উৎফুল্ল হয়। কিন্তু কাব্যরস আস্বাদন জন্য কালবিলম্ব করিবার আমাদের সময় নাই। আমরা আরও গুরুতর তত্ত্বের অন্বেষণে নিযুক্ত।

ভাগবতকার বলেন, বৃন্দাবনে আসার পর কৃষ্ণ ক্রমশঃ তিনটি অসুর বধ করিলেন,—১ বৎসাসুর, ২ বকাসুর, ৩ অঘাসুর। প্রথমটি বৎসরূপী, দ্বিতীয়টি পক্ষিরূপী, তৃতীয়টি সর্পরূপী। বলবান্ বালক, ঐ সকল জন্তু গোপালগণের অনিষ্টকারী হইলে, তাহাদিগকে বধ করা বিচিত্র নহে। কিন্তু ইহার একটিও কথা বিষ্ণুপুরাণে বা মহাভারতে, এমন কি হরিবংশেও পাওয়া যায় না। সুতরাং অলৌকিক বলিয়া তিনটি অসুরের কথাই আমাদের পরিত্যাজ্য।

এই বৎসাসুর, বকাসুর এবং অঘাসুরবধোপাখ্যানমধ্যে সেরূপ তত্ত্ব খুঁজিলে না পাওয়া যায়, এমত নহে। বদ্ ধাতু হইতে বৎস। বন্‌ক ধাতু হইতে বক এবং অঘ্ ধাতু হইতে অঘ। বদ্ ধাতু প্রকাশে, বন্‌ক কৌটিল্যে এবং অঘ্ পাপে। যাহারা প্রকাশ্যবাদী বা নিন্দক, তাহারা বৎস, কুটিল শত্রুপক্ষ বক এবং পাপীরা অঘ। কৃষ্ণ অপ্রাপ্ত কৈশোরেই এই বিবিধ শত্রু পরাস্ত করিলেন। যজুর্ব্বেদের মাধ্যন্দিনী শাখার একাদশ অধ্যায়ে অগ্নিচয়নমন্ত্রের ৮০ কণ্ডিকায় যে মন্ত্র, তাহাতেও এইরূপ শত্রুাদিগের নিপাতনের প্রার্থনা দেখা যায়। মন্ত্রটি এই;—

"হে অগ্নে। যাহারা আমাদের অরাতি, যাহারা দ্বেষী, যাহারা নিন্দক এবং যাহারা জিঘাংসু, এই চারিপ্রকার শত্রুকেই ভস্মসাৎ কর।" *

এই মন্ত্রে বেশীর ভাগ অরাতি, অর্থাৎ যাহারা ধন দেয় না (ভাষায় জুয়াচোর), তাহাদের নিপাতেরও কথা আছে। কিন্তু ভাগবতকার রূপকরচনাকালে এই মন্ত্রটি যে স্মরণ করিয়াছিলেন, এমত বোধ হয়। অথবা ইহা বলিলেই যথেষ্ট হয় যে, ঐ রূপকের মূল ঐ মন্ত্রে আছে।

---

* সামশ্রমীকৃত অনুবাদ।

তারপরে ভাগবতে আছে যে, ব্রহ্মা কৃষ্ণকে পরীক্ষা করিবার জন্য একদা মায়া দ্বারা সমস্ত গোপাল ও গোবৎসগণকে হরণ করিলেন। কৃষ্ণ আর এক সেট্ রাখাল ও গোবৎসের সৃষ্টি করিয়া পূর্ব্ববৎ বিহার করিতে লাগিলেন। কথাটার তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্মাও কৃষ্ণের মহিমা বুঝিতে অক্ষম। তার পর এক দিন কৃষ্ণ দাবানলের আগুন সকলই পান করিলেন। শৈবদিগের নীলকণ্ঠের বিষপানের উপন্যাস আছে। বৈষ্ণব-চূড়ামণি তাহার উত্তরে কৃষ্ণের অগ্নিপানের কথা বলিলেন।

এই বিখ্যাত কালিয়দমনের কথা বলিবার স্থান। কালিয়দমনের কথাপ্রসঙ্গমাত্র মহাভারতে নাই। হরিবংশে ও বিষ্ণুপুরাণে আছে। ভাগবতে বিশিষ্টরূপে সম্প্রসারিত হইয়াছে। ইহা উপন্যাসমাত্র—অনৈসর্গিকতায় পরিপূর্ণ। কেবল উপন্যাস নহে—রূপক। রূপকও অতি মনোহর।

উপন্যাসটি এই। যমুনার এক হ্রদে বা আবর্ত্তে কালিয় নামে এক বিষধর সর্প সপরিবারে বাস করিত। তাহার বহু ফণা। বিষ্ণুপুরাণের মতে তিনটি, * হরিবংশের মতে পাঁচটি, ভাগবতে সহস্র। তাহার অনেক স্ত্রী, পুত্র, পৌত্র ছিল। তাহাদিগের বিষে সেই আবর্ত্তের জল এমন বিষময় হইয়া উঠিয়াছিল যে, তজ্জন্য নিকটে কেহ তিষ্ঠিতে পারিত না। অনেক ব্রজবালক ও গোবৎস সেই জলপান করিয়া প্রাণ হারাইত। সেই বিষের জ্বালায়, তীরে কোন তৃণলতা বৃক্ষাদিও বাঁচিত না। পক্ষিগণও সেই আবর্ত্তের উপর দিয়া উড়িয়া গেলে বিষে জর্জ্জরিত হইয়া জলমধ্যে পতিত হইত। এই মহাসর্পের দমন করিয়া বৃন্দাবনস্থ জীবগণের রক্ষাবিধান শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রেত হইল। তিনি উল্লম্ফন পূর্ব্বক হ্রদমধ্যে নিপাতিত হইলেন। কালিয় তাঁহাকে আক্রমণ করিল। তাহার ফণার উপর আরোহণ করিয়া, বংশীধর গোপবালক, নৃত্য করিতে লাগিলেন। ভুজঙ্গ সেই নৃত্যে নিপীড়িত হইয়া রুধিরবমনপূর্ব্বক মুমূর্ষু হইল। তখন তাহার বনিতাগণ কৃষ্ণকে মনুষ্যভাষায় স্তব করিতে লাগিল। ভাগবতকার তাহাদিগের মুখে যে স্তব বসাইয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া ভুজঙ্গমাঙ্গনাগণকে দর্শনশাস্ত্রে সুপণ্ডিতা বলিয়া বোধ হয়। বিষ্ণুপুরাণে তাহাদের মুখনির্গত স্তব বড় মধুর; পড়িয়া বোধ হয়, মনুষ্যপত্নীগণকে কেহ গরলোদ্গারিণী মনে করেন, করুন, নাগপত্নীগণ সুধাবর্ষিণী বটে। শেষ কালিয়, নিজেও কৃষ্ণস্তুত আরম্ভ করিল। শ্রীকৃষ্ণ সন্তুষ্ট হইয়া কালিয়কে পরিত্যাগ করিয়া, যমুনা পরিত্যাগপূর্ব্বক সমুদ্রে গিয়া বাস করিতে তাহাকে আদেশ করিলেন। কালিয় সপরিবারে পলাইল। যমুনা প্রসন্নসলিলা হইলেন।

এই গেল উপন্যাস। ইহার ভিতর যে রূপক আছে, তাহা এই:—এই কলবাহিনী কৃষ্ণসলিলা কালিন্দী অন্ধকারময়ী ঘোরনাদিনী কালস্রোতস্বতী। ইহার অতি ভয়ঙ্কর আবর্ত্ত আছে। আমরা যে সকলকে দুঃসময় ও বিপৎকাল মনে করি, তাহাই কালস্রোতের আবর্ত্ত। অতি ভীষণ বিষময় মনুষ্যশত্রু সকল এখানে লুক্কায়িতভাবে বাস করে। ভুজঙ্গের ন্যায় তাহাদের নিভৃত বাস, ভুজঙ্গের ন্যায় তাহাদের কুটিল গতি এবং ভুজঙ্গের ন্যায় অমোঘ বিষ। আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক এবং আধিদৈবিক এই ত্রিবিধবিশেষে এই ভুজঙ্গের তিন ফণা। আর যদি মনে করা যায় যে, আমাদের ইন্দ্রিয়বৃত্তিই সকল অনর্থের মূল, তাহা হইলে পঞ্চেন্দ্রিয়-ভেদে ইহার পাঁচটি ফণা এবং আমাদের অমঙ্গলের অসংখ্য কারণ আছে, ইহা ভাবিলে, ইহার সহস্র ফণা। আমরা ঘোর বিপদাবর্ত্তে এই ভুজঙ্গমের বশীভূত হইলে জগদীশ্বরের পাদপদ্ম ব্যতীত আমাদের উদ্ধারের উপায়ান্তর নাই। কৃপাপরবশ হইলে তিনি এই বিষধরকে পদদলিত করিয়া মনোহর মূর্ত্তিবিকাশপূর্ব্বক অভয়বংশী বাদন করেন, শুনিতে পাইলে জীব আশান্বিত হইয়া সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করে। করালনাদিনী কালতরঙ্গিনী প্রসন্নসলিলা হয়। এই কৃষ্ণসলিলা ভীমনাদিনী কালস্রোতস্বতীর আবর্ত্তমধ্যে অমঙ্গল-ভুজঙ্গমের মস্তকারূঢ় এই অভয়বংশীধর মূর্ত্তি, পুরাণকারের অপূর্ব্ব সৃষ্টি! যে গড়িয়া পূজা করিবে, কে তাহাকে পৌত্তলিক বলিয়া উপহাস করিতে সাহস করিবে?

আমরা ধেনুকাসুর (গর্দ্দভ) এবং প্রলম্বাসুরের বধবৃত্তান্ত কিছু বলিব না, কেন না, উহা বলরামকৃত—কৃষ্ণকৃত নহে। বস্ত্রহরণ সম্বন্ধে যাহা বক্তব্য, তাহা আমরা অন্য পরিচ্ছেদে বলিব, এখন কেবল গিরিযজ্ঞ-বৃত্তান্ত বলিয়া এ পরিচ্ছেদের উপসংহার করিব।

বৃন্দাবনে গোবর্দ্ধন নামে এক পর্ব্বত ছিল, এখনও আছে। গোঁসাই ঠাকুরেরা এক্ষণে যেখানে বৃন্দাবন স্থাপিত করিয়াছেন, সে এক দেশে, আর গিরিগোবর্দ্ধন আর একদেশে। কিন্তু পুরাণাদিতে পড়ি, উহা বৃন্দাবনের সীমান্তস্থিত। ঐ পর্ব্বত এক্ষণে যে ভাবে আছে, তাহা দেখিয়া বোধ হয় যে, উহা কোন কালে কোন প্রাকৃতিক বিপ্লবে উৎক্ষিপ্ত হইয়া পুনঃসংস্থাপিত হইয়াছিল। বোধ হয়, অনেক সহস্র বৎসর ঐ ক্ষুদ্র পর্ব্বত ঐ অবস্থাতেই আছে এবং ইহার উপর সংস্থাপিত হইয়া উপন্যাস রচিত হইয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণ ঐ গিরি

* "মধ্যমং ফণং" ইহাতে তিনটি বুঝায়।

তুলিয়া সপ্তাহ ধারণ করিয়া পুনর্ব্বার সংস্থাপন করিয়াছিলেন।

উপন্যাসটা এই :—বর্ষান্তে নন্দাদি গোপগণ বৎসর বৎসর একটা ইন্দ্রযজ্ঞ করিতেন। তাহার আয়োজন হইতেছিল। দেখিয়া কৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কেন ইহা হইতেছে? তাহাতে নন্দ বলিলেন, ইন্দ্র বৃষ্টি করেন, বৃষ্টিতে শস্য জন্মে, শস্য খাইয়া আমরা ও গোপগণ জীবনধারণ করি এবং গো-সকল দুগ্ধবতী হয়। অতএব ইন্দ্রের পূজা করা কর্ত্তব্য। কৃষ্ণ বলিলেন, আমরা কৃষী নহি। গাভীগণই আমাদের অবলম্বন, অতএব গাভীগণের পূজা অর্থাৎ তাহাদিগকে উত্তম ভোজন করানই আমাদের বিধেয়। আর আমরা এই গিরির আশ্রিত, ইহার পূজা করুন; ব্রাহ্মণ ও ক্ষুধার্ত্তগণকে উত্তমরূপে ভোজন করান। তাহাই হইল। অনেক দীনদরিদ্র, ক্ষুধার্ত্ত এবং ব্রাহ্মণগণ (তাঁহারা দরিদ্রের মধ্যে) ভোজন করিলেন। গাভীগণ খুব খাইল। গোবর্দ্ধনও মূর্ত্তিমান হইয়া রাশি রাশি অন্নব্যঞ্জন খাইলেন। কথিত হইয়াছে যে, কৃষ্ণ নিজেই এই মূর্ত্তিমান গিরি সাজিয়া খাইয়াছিলেন।

ইন্দ্রযজ্ঞ হইল না। এখন পাঠক জানিতে পারেন যে, আমাদিগের পুরাণেতিহাসোক্ত দেবতা ও ব্রাহ্মণসকল ভারী বদ্‌রাগী। ইন্দ্র বড় রাগ করিলেন। মেঘগণকে আজ্ঞা দিলেন,—বৃষ্টি করিয়া বৃন্দাবন ভাসাইয়া দাও। মেঘ সকল তাহাই করিল। বৃন্দাবন ভাসিয়া যায়। গোবৎস ও ব্রজবাসিগণের দুঃখের আর সীমা রহিল না। তখন শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধন উপাড়িয়া বৃন্দাবনের উপর ধরিলেন। সপ্তাহ বৃষ্টি হইল, সপ্তাহ তিনি পর্ব্বত এক হাতে তুলিয়া ধরিয়া রাখিলেন। বৃন্দাবন রক্ষা পাইল। ইন্দ্র হার মানিয়া কৃষ্ণের সঙ্গে সম্বন্ধ ও সন্ধিস্থাপন করিলেন।

মহাভারতে শিশুপালবাক্যে এই গিরিযজ্ঞের কিঞ্চিৎ প্রসঙ্গ আছে। শিশুপাল বলিতেছে যে, কৃষ্ণ যে বল্মীকতুল্য গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়াছিল, তাই কি একটা বিচিত্র কথা? কৃষ্ণের প্রভূত অন্নব্যঞ্জন ভোজন সম্বন্ধেও একটু ব্যঙ্গ আছে। এই পর্য্যন্ত। কিন্তু গোবর্দ্ধন আজিও বিদ্যমান,—বল্মীক নয়, পর্ব্বত বটে। কৃষ্ণ কি পর্ব্বত সাত দিন এক হাতে ধরিয়া রাখিয়াছিলেন? যাঁহারা তাঁহাকে ঈশ্বরাবতার বলেন, তাঁহারা বলিতে পারেন, ঈশ্বরের অসাধ্য কি? স্বীকার করি—কিন্তু সেই সঙ্গে জিজ্ঞাসাও করি, ঈশ্বরাবতারের পর্ব্বতধারণের প্রয়োজন কি? যাঁহার ইচ্ছা ব্যতীত মেঘ এক ফোঁটাও বৃষ্টি করিতে সমর্থ হয় না, সাত দিন পাহাড় ধরিয়া বৃষ্টি হইতে বৃন্দাবন রক্ষা করিবার তাঁহার প্রয়োজন কি? যাঁহার ইচ্ছামাত্রে সমস্ত মেঘ বিদূরিত, বৃষ্টি উপশান্ত এবং আকাশ নির্ম্মল হইতে পারিত, তাঁহার পর্ব্বত তুলিয়া ধরিয়া সাত দিন খাড়া থাকিবার প্রয়োজন কি?

ইহার উত্তরে কেহ বলিতে পারেন, ইহা ভগবানের লীলা। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা, আমরা ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝিব কি? ইহাও সত্য, কিন্তু আগে বুঝিব যে, ইনি ভগবান্, তাহার পর গিরিধারণ তাঁহার ইচ্ছাবিস্তারিত লীলা বলিয়া স্বীকার করিব। ইনি ভগবান্, ইহা বুঝিব কি প্রকারে? ইঁহার কার্য্য দেখিয়া। যে কার্য্যের অভিপ্রায় বা সুসঙ্গতি বুঝিতে পারিলাম না, সেই কার্য্যের কর্ত্তা ঈশ্বর, এরূপ সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায় কি? না বুঝিয়া কোন সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া যায় কি? যদি তাহা না যায়, তবে অনৈসর্গিক পরিত্যাগের যে নিয়ম আমরা সংস্থাপন করিয়াছি, তাহারই অনুবর্ত্তী হইয়া এই গিরিধারণ-বৃত্তান্তও উপন্যাসমধ্যে গণনা করাই বিধেয়। তবে এতটুকু সত্য থাকিতে পারে যে, কৃষ্ণ গোপগণকে ইন্দ্রযজ্ঞ হইতে বিরত করিয়া গিরিযজ্ঞে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন। তার পর বাকি অনৈসর্গিক ব্যাপারটা গোবর্দ্ধনের উৎখাত ও পুনঃস্থাপিত অবস্থা অনুসারে গঠিত হইয়াছে।

এরূপ কার্য্যের একটা নিগূঢ় তাৎপর্য্যও দেখা যায়। যেমন বুঝিয়াছি, তেমনই বুঝাইতেছি।

এই জগতের একই ঈশ্বর। ঈশ্বর ভিন্ন দেবতা নাই। ইন্দ্র বলিয়া কোন দেবতা নাই। ইন্দ্ ধাতু বর্ষণে, তাহাকে পর রক্ প্রত্যয় করিলে ইন্দ্র শব্দ পাওয়া যায়। অর্থ হইল যিনি বর্ষণ করেন। বর্ষণ করে কে? যিনি সর্ব্বকর্ত্তা, সর্ব্বত্র বিধাতা, তিনিই বৃষ্টি করেন—বৃষ্টির জন্য এক জন পৃথক বিধাতা কল্পনা করা বা বিশ্বাস করা যায় না। তবে ইন্দ্রের জন্য যজ্ঞ বা সাধারণ যজ্ঞে ইন্দ্রের ভাগ প্রচলিত ছিল বটে। এরূপ ইন্দ্রপূজার একটা অর্থও আছে। ঈশ্বর অনন্তপ্রকৃতি, তাঁর গুণসকল অনন্ত, কার্য্য অনন্ত, শক্তিসকলও সংখ্যায় অনন্ত। এরূপ অনন্তের উপাসনা কি প্রকারে করিব? অনন্তের ধ্যান কি হয়? যাহাদের হয় না, তাহারা তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন শক্তির পৃথক্ পৃথক্ উপাসনা করে। এরূপ শক্তি সকলের বিকাশস্থল জড়জগতে বড় জাজ্বল্যমান। সকল জড়পদার্থে তাঁহার শক্তির পরিচয় পাই। তৎসাহায্যে অনন্তের ধ্যান সুসাধ্য হয়। এই জন্য প্রাচীন আর্য্যগণ তাঁহার জগৎ-প্রসবিতৃত্ব স্মরণ করিয়া সূর্য্যে, তাঁহার সর্ব্বাবরকতা স্মরণ করিয়া বরুণে, তাঁহার সর্ব্বতেজের আধারভূতি স্মরণ করিয়া অগ্নিতে, তাঁহাকে জগৎপ্রাণ স্মরণ করিয়া বায়ুতে এবং তদ্রূপে অন্যান্য

জড়পদার্থে তাঁহার আরাধনা করিতেন।* ইন্দ্রে এইরূপ তাঁহার বর্ষণকারিণী শক্তির উপাসনা করিতেন। কালে লোকে উপাসনার অর্থ ভুলিয়া গেল, কিন্তু উপাসনার আকারটা বলবান্ রহিল। কালে এইরূপই ঘটিয়া থাকে; ব্রাহ্মণের ত্রিসন্ধ্যা সম্বন্ধে তাহাই ঘটিয়াছে; ভগবদ্গীতায় এবং মহাভারতের অন্যত্র দেখিব যে, কৃষ্ণ ধর্ম্মের এই মৃতদেহের সংকারে প্রবৃত্ত —তৎপরিবর্ত্তে অতি উচ্চ ঈশ্বরোপাসনাতে লোককে প্রবৃত্ত করিতে যত্নবান্। যাহা পরিণত বয়সে প্রচারিত করিয়াছিলেন, এই গিরিযজ্ঞ তাহার প্রবর্ত্তনায় তাঁহার প্রথম উদ্যম। জগদীশ্বর সর্ব্বভূতে আছেন; মেঘেও যেমন আছেন, পর্ব্বতে ও গোবৎসেও সেইরূপ আছেন। যদি মেঘের বা আকাশের পূজা করিলে তাঁহার পূজা করা হয়, তবে পর্ব্বত বা গোগণের পূজা করিলেও তাঁহারই পূজা করা হইবে। বরং আকাশাদি জড়-পদার্থের পূজা অপেক্ষা দরিদ্রদিগের এবং গোবৎসের সপরিতোষ ভোজন করান অধিকতর ধর্ম্মানুমত। গিরিযজ্ঞের তাৎপর্য্যটা এইরূপ বুঝি।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ব্রজগোপী—বিষ্ণুপুরাণ

কৃষ্ণদ্বেষীদিগের নিকট যে কথা কৃষ্ণচরিত্রের প্রধান কলঙ্ক, এবং আধুনিক কৃষ্ণ-উপাসকদিগের নিকট যাহা কৃষ্ণভক্তির কেন্দ্রস্বরূপ, আমি এক্ষণে সেই তত্ত্বে উপস্থিত। কৃষ্ণের সহিত ব্রজগোপীদিগের সম্বন্ধের কথা বলিতেছি। কৃষ্ণচরিত্র সমালোচনায় এই তত্ত্ব অতিশয় গুরুতর। এই জন্য এ কথা আমরা অতিশয় বিস্তারের সহিত কহিতে বাধ্য হইব।

মহাভারতে ব্রজগোপীদিগের কথা কিছুই নাই। সভাপর্ব্বে শিশুপালবধ-পর্ব্বাধ্যায়ে শিশুপালকৃত সবিস্তার কৃষ্ণনিন্দা আছে। যদি মহাভারতপ্রণয়ন কালে ব্রজগোপীগণঘটিত কৃষ্ণের এই কলঙ্ক থাকিত, তাহা হইলে, শিশুপাল অথবা যিনি শিশুপালবধবৃত্তান্ত প্রণীত করিয়াছেন, তিনি কখনই কৃষ্ণনিন্দাকালে তাহা পরিত্যাগ করিতেন না। অতএব নিশ্চিত যে, আদিম মহাভারতপ্রণয়নকালে এ কথা চলিত ছিল না— তাহার পরে গঠিত হইয়াছে।

মহাভারতে কেবল ঐ সভাপর্ব্বে দ্রৌপদীবস্ত্রহরণ-কালে দ্রৌপদীকৃত কৃষ্ণস্তবে "গোপীজনপ্রিয়" শব্দটা আছে, যথা—

"আকৃষ্যমাণে বসনে দ্রৌপদ্যা চিন্তিতো হরিঃ।
গোবিন্দ দ্বারকাবাসিন্ কৃষ্ণ গোপীজনপ্রিয়। ॥"

বৃন্দাবনে গোপীদিগের বাস। গোপ থাকিলেই গোপী থাকিবে। কৃষ্ণ অতিশয় সুন্দর, মাধুর্য্যময় এবং ক্রীড়াশীল বালক ছিলেন, এজন্য তিনি গোপগোপী সকলেরই প্রিয় ছিলেন। হরিবংশে আছে যে, শ্রীকৃষ্ণ বালিকা, যুবতী, বৃদ্ধা সকলেরই প্রিয়পাত্র ছিলেন এবং যমলার্জ্জুনভঙ্গ প্রকৃতি উৎপাতকালে শিশু কৃষ্ণকে বিপন্ন দেখিয়া গোপরমণীগণ রোদন করিত, এরূপ লেখা আছে। অতএব এই গোপীজনপ্রিয় শব্দে সুন্দর শিশুর প্রতি স্ত্রীজনসুলভ স্নেহ ভিন্ন আর কিছুই বুঝায় না।

আমরা পূর্ব্বে যে নিয়ম করিয়াছি, তদনুসারে মহাভারতের পর বিষ্ণুপুরাণ দেখিতে হয় এবং পূর্ব্বে যেমন দেখিয়াছি, এখনও তেমনই দেখিব যে, বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ এবং ভাগবত পুরাণে উপন্যাসের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। এই ব্রজগোপীতত্ত্ব মহাভারতে নাই, বিষ্ণুপুরাণে পবিত্রভাবে আছে, হরিবংশে প্রথম কিঞ্চিৎ বিলাসিতা প্রবেশ করিয়াছে, তার পর ভাগবতে আদিরসের অপেক্ষাকৃত বিস্তার হইয়াছে, শেষ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে তাহার স্রোত বহিয়াছে।

এই সকল কথা সবিস্তারে বুঝাইবার জন্য আমরা বিষ্ণুপুরাণে যতটুকু গোপীদিগের কথা আছে, তাহা সমস্ত উদ্ধৃত করিতেছি। দুই একটা শব্দ এরূপ আছে যে, তাহারই দুই রকম অর্থ হইতে পারে, এ জন্য আমি মূল সংস্কৃত উদ্ধৃত করিয়া পশ্চাৎ তাহা অনুবাদিত করিলাম।

"কৃষ্ণস্ত বিমলং ব্যোম শরচ্চন্দ্রস্য চন্দ্রিকাম্।
তথা কুমুদিনীং ফুল্লামামোদিতদিগন্তরাম্ ॥ ১৪ ॥
বনরাজিং তথা কূজদ্ভৃঙ্গমালাং মনোরমাম্।
বিলোক্য সহ গোপীভির্ম্মনশ্চক্রে রতিং প্রতি ॥ ১৫ ॥
সহ রামেণ মধুরমতীব বনিতাপ্রিয়ম্।
জগৌ কলপদং সৌরির্নানাতন্ত্রীকৃতব্রতম্ ॥ ১৬ ॥
রম্যং গীতধ্বনিং শ্রুত্বা সন্ত্যজ্যাবসথাংস্তদা।
আজগ্মুস্ত্বরিতা গোপ্যো যত্রাস্তে মধুসূদনঃ ॥ ১৭ ॥

---

* যখন আমি প্রথম "প্রচার" নামক পত্রে এই মত প্রকাশিত করি, তখন অনেকে অনেক কথা বলিয়াছিলেন। অনেকে ভাবিয়াছিলেন, আমি একটা নূতন মত প্রচার করিতেছি। তাঁহারা জানেন না যে, এ আমার মত নহে, স্বয়ং নিরুক্তকার যাস্কের মত। আমি যাস্কের বাক্য নিয়ে উদ্ধৃত করিতেছি—

"মাহাত্ম্যাদ্ দেবতায়া এক আত্মা বহুধা স্তূয়তে একস্যাত্মনোঽন্যে দেবাঃ প্রত্যঙ্গানি ভবন্তি। * * * আত্মা এব এষাং রথো ভবতি, আত্মা অশ্বাঃ, আত্মা আয়ুধম্, আত্মা ইষবঃ, আত্মা সর্ব্বদেবস্য।"

শনৈঃ শনৈর্জগৌ গোপী কাচিৎ তস্য লয়ানুগম্।
দত্তাবধানা কাচিত্তু তমেব মনসা স্মরন্ ॥ ১৮ ॥
কাচিৎ কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি প্রোক্তা লজ্জামুপাগতা।
যযৌ চ কাচিৎ প্রেমান্ধা তৎপার্শ্বমবিলজ্জিতা ॥ ১৯
কাচিদাবসথস্যান্তঃস্থিতা দৃষ্ট্বা বহির্গুরুন্।
তন্ময়ত্বেন গোবিন্দং দধ্যৌ মীলিতলোচনা ॥ ২০ ॥
তচ্চিন্তাবিপুলাহ্লাদ-ক্ষীণপুণ্যচয়া তথা।
তদপ্রাপ্তিমহাদুঃখবিলীনাশেষপাতকা ॥ ২১ ॥
চিন্তয়ন্তী জগৎসূতিং পরব্রহ্মস্বরূপিণম্।
নিরুচ্ছ্বাসতয়া মুক্তিং গতান্যা গোপকন্যকা ॥ ২২ ॥
গোপীপরিবৃতো রাত্রিং শরচ্চন্দ্রমনোরমাম্।
মানয়ামাস গোবিন্দো রাসারম্ভরসোৎসুকঃ ॥ ২৩ ॥
গোপ্যশ্চ বৃন্দশঃ কৃষ্ণচেষ্টাস্বায়ত্তমূর্ত্তয়ঃ।
অন্যদেশং গতে কৃষ্ণে চেরুর্বৃন্দাবনান্তরম্ ॥ ২৪ ॥
কৃষ্ণে নিরুদ্ধহৃদয়া ইদমূচুঃ পরস্পরম্।
কৃষ্ণোঽহমেতল্ললিতং ব্রজাম্যালোক্যতাং গতিঃ।
অন্যা ব্রবীতি কৃষ্ণস্য মম গীতির্নিশম্যতাম্ ॥ ২৫ ॥
দুষ্ট কালিয়! তিষ্ঠাত্র কৃষ্ণোঽহমিতি চাপরা।
বাহুমাস্ফোট্য কৃষ্ণস্য লীলাসর্ব্বস্বমাদদে ॥ ২৬ ॥
অন্যা ব্রবীতি ভো গোপা নিঃশঙ্কৈঃ স্থীয়তামিহ।
অলং বৃষ্টিভয়েনাত্র ধৃতো গোবর্দ্ধনো ময়া ॥ ২৭ ॥
ধেনুকোঽয়ং ময়া ক্ষিপ্তো বিচরন্তু যথেচ্ছয়া।
গোপী ব্রবীতি বৈ চান্যা কৃষ্ণলীলানুকারিণী ॥ ২৮ ॥
এবং নানা প্রকারাসু কৃষ্ণচেষ্টাসু তাস্তদা।
গোপ্যো ব্যগ্রাঃ সমঞ্চেরূ রম্যং বৃন্দাবনং বনম্ ॥ ২৯
বিলোক্যৈকা ভুবং প্রাহ গোপী গোপবরাঙ্গনা।
পুলকাঞ্চিতসর্ব্বাঙ্গী বিকাশিনয়নোৎপলা ॥ ৩০ ॥
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাব্জাঙ্ক-রেখাবন্ত্যালি! পশ্যত।
পদান্যেতানি কৃষ্ণস্য লীলালঙ্কৃতগামিনঃ ॥ ৩১ ॥
কাপি তেন সমং যাতা কৃতপুণ্যা মদালসা।
পদানি তস্যাশ্চৈতানি ঘনান্যল্পতনূনি চ ॥ ৩২ ॥
পুষ্পাবচয়মত্রোচ্চৈশ্চক্রে দামোদরো ধ্রুবম্।
যেনাগ্রাক্রান্তিমাত্রাণি পদান্যত্র মহাত্মনঃ ॥ ৩৩ ॥
অত্রোপবিশ্য সা তেন কাপি পুষ্পৈরলঙ্কৃতা।
অন্যজন্মনি সর্ব্বাত্মা বিষ্ণুরভ্যর্চ্চিতো যয়া ॥ ৩৪ ॥
পুষ্পবন্ধনসম্মান-কৃতমানামপাস্য তাম্।
নন্দগোপসুতো যাতো মার্গেণানেন পশ্যত ॥ ৩৫ ॥
অনুযানেঽসমর্থান্যা নিতম্বভারমন্থরা।
যা গন্তব্যে দ্রুতং যাতি নিম্নপাদাগ্রসংস্থিতিঃ ॥ ৩৬ ॥
হস্তন্যস্তাগ্রহস্তেয়ং তেন যাতি তথা সখি।
অনায়ত্তপদন্যাসা লক্ষ্যতে পদপদ্ধতিঃ ॥ ৩৭ ॥
হস্তসংস্পর্শমাত্রেণ ধূর্ত্তেনৈষা বিমানিতা।
নৈরাশ্যমন্দগামিন্যা নিবৃত্তিং লক্ষ্যতে পদম্ ॥ ৩৮ ॥
নূনমুক্তা ত্বরামীতি পুনরেষ্যামি তেঽন্তিকম্।
তেন কৃষ্ণেন যেনৈষা ত্বরিতা পদপদ্ধতিঃ ॥ ৩৯ ॥
প্রবিষ্টো গহনং কৃষ্ণঃ পদমত্র ন লক্ষ্যতে।
নিবর্ত্তধ্বং শশাঙ্কস্য নৈতদ্দীধিতিগোচরে ॥ ৪০ ॥
নিবৃত্তাস্তাস্ততো গোপ্যো নিরাশাঃ কৃষ্ণদর্শনে।
যমুনাতীরমাগত্য জগুস্তচ্চরিতং তদা ॥ ৪১ ॥
ততো দদৃশুরায়ান্তং বিকাশি-মুখপঙ্কজম্।
গোপ্যস্ত্রৈলোক্যগোপ্তারং কৃষ্ণমক্লিষ্টচেষ্টিতম্ ॥ ৪২ ॥
কাচিদালোক্য গোবিন্দমায়ান্তমতিহর্ষিতা।
কৃষ্ণ! কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি প্রাহ নান্যদুদৈরয়ৎ ॥ ৪৩ ॥
কাচিদ্ ভ্রূভঙ্গুরং কৃত্বা ললাটফলকং হরিম্।
বিলোক্য নেত্রভৃঙ্গাভ্যাং পপৌ তন্মুখপঙ্কজম্ ॥ ৪৪ ॥
কাচিদালোক্য গোবিন্দং নিমীলিত-বিলোচনা।
তস্যৈব রূপং ধ্যায়ন্তী যোগারূঢ়েব চাবভৌ ॥ ৪৫ ॥
ততঃ কাচিৎ প্রিয়ালাপৈঃ কাশ্চিদ্ ভ্রূভঙ্গ-বীক্ষণৈঃ।
নিন্যেঽনুনয়মন্যাশ্চ করস্পর্শেন মাধবঃ ॥ ৪৬ ॥
তাভিঃ প্রসন্নচিত্তাভির্গোপীভিঃ সহ সাদরম্।
ররাম রাসগোষ্ঠীভিরুদার-চরিতো হরিঃ ॥ ৪৭ ॥
রাসমণ্ডলবন্ধোঽপি কৃষ্ণ পার্শ্বমনুজ্ঝতা।
গোপীজনেন নৈবাভূদেকস্থানস্থিরাত্মনা ॥ ৪৮ ॥
হস্তে প্রগৃহ্য চৈকৈকাং গোপিকাং রাসমণ্ডলীম্।
চকার তৎকরস্পর্শ-নিমীলিতদৃশাং হরিঃ ॥ ৪৯ ॥
ততঃ স ববৃতে রাসশ্চলদ্বলয়নিস্বনঃ।
অনুযাতশরৎকাব্য-গেয়গীতিরনুক্রমাৎ ॥ ৫০ ॥
কৃষ্ণঃ শরচ্চন্দ্রমসং কৌমুদীং কুমুদাকরম্।
জগৌ গোপীজনস্ত্বেকং কৃষ্ণনাম পুনঃ পুনঃ ॥ ৫১ ॥
পরিবর্ত্তশ্রমেণৈকা চলদ্বলয়লাপিনীম্।
দদৌ বাহুলতাং স্কন্ধে গোপী মধুনিঘাতিনঃ ॥ ৫২ ॥
কাচিৎ প্রবিলসদ্বাহুঃ পরিরভ্য চুচুম্ব তম্।
গোপী গীতস্তুতিব্যাজ নিপুণা মধুসূদনম্ ॥ ৫৩ ॥
গোপী-কপোল-সংশ্লেষমভিপত্য হরের্ভুজৌ।
পুলকোদ্গমশস্যায় স্বেদাম্বু ঘনতাং গতৌ ॥ ৫৪ ॥
রাসগেয়ং জগৌ কৃষ্ণো যাবৎ তারতরধ্বনিঃ।
সাধু কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি তাবদ্ বা দ্বিগুণং জগুঃ ॥ ৫৫ ॥
গতে তু গমনং চক্রুর্বলেন সংমুখং যযুঃ।
প্রতিলোমানুলোমাভ্যাং ভেজুর্গোপাঙ্গনা হরিম্ ॥ ৫৬ ॥
স তথা সহ গোপীভি ররাম মধুসূদনঃ।
যথাব্দকোটিপ্রমিতঃ ক্ষণস্তেন বিনাভবৎ ॥ ৫৭ ॥
তা বার্য্যমাণাঃ পতিভিঃ পিতৃভির্ভ্রাতৃভিস্তথা।
কৃষ্ণং গোপাঙ্গনা রাত্রৌ রময়ন্তি রতিপ্রিয়াঃ ॥ ৫৮ ॥
সোঽপি কৈশোরকবয়ো মানয়ন্ মধুসূদনঃ।
রেমে তাভিরমেয়াত্মা ক্ষপাসু ক্ষপিতাহিতঃ ॥ ৫৯ ॥

বিষ্ণুপুরাণম্, পঞ্চমাংশঃ ১৩ অঃ।

"নির্ম্মলাকাশ, শরচ্চন্দ্রের চন্দ্রিকা, ফুল্ল কুমুদিনী, দিক্‌সকল গন্ধামোদিত, ভৃঙ্গমালাশব্দে বনরাজি মনোরম, দেখিয়া কৃষ্ণ গোপীদিগের সহিত ক্রীড়া করিতে মানস করিলেন। বলরামের সহিত সৌরি অতীব মধুর স্ত্রীজনপ্রিয় নানাতন্ত্রীসম্মিলিত অস্ফুটপদ সঙ্গীত গান করিলেন। রম্য গীতধ্বনি শুনিয়া তখন গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক যথা মধুসূদন আছেন, সেইখানে গোপীগণ ত্বরান্বিতা হইয়া আসিল। কোন গোপী তাঁহার লয়ানুগমনপূর্ব্বক ধীরে ধীরে গায়িতে লাগিল। কেহ বা কৃষ্ণকে মনোমধ্যে স্মরণপূর্ব্বক তাঁহাতে একমনা হইল। কেহ বা কৃষ্ণ কৃষ্ণ ব'লয়া লজ্জিতা হইল; কেহ বা লজ্জাহীনা ও প্রেমান্ধা হইয়া তাঁহার পার্শ্বে আসিল। কেহ বা গৃহমধ্যে থাকিয়া বাহিরে গুরুজনকে দেখিয়া নিমীলিতলোচনা হইয়া গোবিন্দকে তন্ময়ত্বের সহিত ধ্যান করিতে লাগিল। অন্য গোপকন্যা কৃষ্ণচিন্তাজনিত বিপুলাহ্লাদে ক্ষীণপুণ্যা হইয়া এবং কৃষ্ণকে অপ্রাপ্তিহেতু যে মহাদুঃখ, তদ্দ্বারা তাহার অশেষ পাতক বিলীন হইলে, পরব্রহ্মস্বরূপ জগৎকারণকে চিন্তা করিয়া পরোক্ষার্থজ্ঞান হেতু মুক্তিলাভ করিল। গোবিন্দ শরচ্চন্দ্র-মনোরম রাত্রিতে গোপীজন কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া রাসারম্ভরসে * সমুৎসুক হইলেন। কৃষ্ণ অন্যত্র চলিয়া গেলে গোপীগণ কৃষ্ণচেষ্টার অনুকারিণী হইয়া দলে দলে বৃন্দাবনমধ্যে ফিরিয়া বেড়াইতে লাগিল; এবং কৃষ্ণে নিরুদ্ধহৃদয়া হইয়া পরস্পরকে এইরূপ বলিতে লাগিল, 'আমি কৃষ্ণ, এই ললিত গতিতে গমন করিতেছি, তোমরা আমার গমন অবলোকন কর।' অন্যা বলিল, 'আমি কৃষ্ণ, আমার গান শ্রবণ কর।' অপরা বলিল, 'দুষ্ট কালিয়! ওইখানে থাক, আমি কৃষ্ণ' এবং বাহু আস্ফোটনপূর্ব্বক কৃষ্ণলীলার অনুকরণ করিল। আর কেহ বলিল, 'হে গোপগণ! তোমরা নির্ভয়ে এইখানে থাক, বৃথা বৃষ্টির ভয় করিও না, আমি এইখানে গোবর্দ্ধন ধরিয়া আছি।' অন্যা কৃষ্ণলীলানুকারিণী গোপী বলিল, এই ধেনুককে আমি নিক্ষিপ্ত করিয়াছি, তোমরা যদৃচ্ছাক্রমে বিচরণ কর।' এইরূপে সেই সকল গোপী তৎকালে নানাপ্রকার কৃষ্ণ-চেষ্টানুবর্ত্তিনী হইয়া ব্যগ্রভাবে রম্য বৃন্দাবন-বনে সঞ্চরণ করিতে লাগিল। এক গোপবরাঙ্গনা গোপী ভূমি দেখিয়া সর্ব্বাঙ্গপুলকরোমাঞ্চিত হইয়া এবং নয়নোৎপল বিকাশিত করিয়া বলিতে লাগিল, 'হে সখি, দেখ, এই ধ্বজবজ্রাঙ্কুশরেখাবন্ত পদচিহ্নসকল লীলালঙ্কৃতগামী কৃষ্ণের।' কোন পুণ্যবতী মদালসা তাঁহার সঙ্গে গিয়াছে; তাহারই এই সকল ঘন এবং ক্ষুদ্র পদচিহ্নগুলি। সেই মহাত্মার (কৃষ্ণের) পদচিহ্নের অগ্রভাগ মাত্র দেখা যাইতেছে, অতএব নিশ্চিত দামোদর এইখানে উচ্চ পুষ্প সকল অবচিত করিয়াছেন। তিনি কোন গোপীকে এইখানে বসিয়া পুষ্প দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন; সে জন্মান্তরে সর্ব্বাত্মা বিষ্ণুকে অর্চ্চিত করিয়া থাকিবে। পুষ্পবন্ধনসম্মানে সে গর্ব্বিতা হইয়া থাকিবে, তাই তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া নন্দ-গোপসুত এই পথে গমন করিয়াছেন দেখ। আর এই পদাগ্রচিহ্ন সকলের নিয়তা দেখিয়া (বোধ হইতেছে) নিতম্বভারমন্থরা কেহ তাঁহার সঙ্গে গমনে অসমর্থা হইয়া গন্তব্যে দ্রুত-গমনের চেষ্টা করিয়াছিল। হে সখি, আর এইখানে পদচিহ্ন সকল দেখিয়া বোধ হইতেছে যে, সেই অনায়ত্তপদন্যাসা গোপীকে তিনি হস্তে গ্রহণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। সে হস্তসংস্পর্শ পরেই সেই ধূর্ত্ত দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়াছিল। কেন না, এ পদচিহ্ন দ্বারা দেখা যাইতেছে যে, সে নৈরাশ্যহেতু মন্দগামিনী হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছিল। আর সেই কৃষ্ণ নিশ্চিত ইহাকে বলিয়াছিলেন যে, শীঘ্রই গিয়া আমি তোমার নিকট পুনর্ব্বার আসিতেছি। সেই জন্য ইহার পদপদ্ধতি আবার ত্বরিত হইয়াছে। এখন গহনে কৃষ্ণ প্রবেশ করিয়াছেন বোধহয়, কেন না, আর পদচিহ্ন দেখা যায় না। এখানে আর চন্দ্রকিরণ প্রবেশ করে না। আইস, ফিরিয়া যাই।"

"অনন্তর গোপীগণ দেখিল, বিকাশিতমুখপঙ্কজ ত্রৈলোক্যের রক্ষাকর্ত্তা অক্লিষ্টকর্ম্মা কৃষ্ণ আসিলেন। কেহ গোবিন্দকে আগত দেখিয়া অত্যন্ত হর্ষিত হইয়া কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিতে লাগিল, আর কিছুই বলিতে পারিল না। কোন গোপী ললাটফলকে ভ্রূভঙ্গ করিয়া হরিকে দেখিয়া তাঁহার মুখপঙ্কজ নেত্রভৃঙ্গদ্বয় দ্বারা পান করিতে লাগল। কেহ গোবিন্দকে দেখিয়া নিমীলিতলোচনে যোগারূঢ়ার ন্যায় শোভিত হইয়া তাঁহার রূপ ধ্যান করিতে লাগিল। অনন্তর মাধব তাহাদিগকে অনুনয়নীয় বিবেচনায় কাহাকে বা প্রিয়ালাপ দ্বারা, কাহাকে বা ভ্রূভঙ্গবীক্ষণ দ্বারা, কাহাকে বা করস্পর্শ দ্বারা সান্ত্বনা করিলেন। পরে উদারচরিত হরিপ্রসন্নচিত্তা গোপীদিগের সহিত সাদরে রাসমণ্ডলমধ্যে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহারা কৃষ্ণের পার্শ্ব ছাড়ে না, এক স্থানে স্থির থাকে। এজন্য সেই গোপীদিগের সহিত রাস-মণ্ডলবন্ধও হইল না। পরে একে একে গোপীদিগকে হস্ত দ্বারা গ্রহণ করিলে, তাহারা তাঁহার করস্পর্শে নিমীলিতচক্ষু হইলে, কৃষ্ণ রাসমণ্ডল প্রস্তুত করিলেন। অতঃপর

* রাস অর্থে নৃত্যবিশেষ :—"অন্যোন্যব্যতিষক্তহস্তানাং স্ত্রীপুংসাং গায়তাং মণ্ডলীরূপেণ ভ্রমতাং নৃত্যবিনোদঃ রাসো নাম ইতি শ্রীধরঃ।

গোপীদিগের চঞ্চলবলয়-শব্দিত এবং গোপীগণগীত শরৎ-কাব্যগানের দ্বারা অনুযাত রাসক্রীড়ায় তিনি প্রবৃত্ত হইলেন। কৃষ্ণ শরচ্চন্দ্র ও কৌমুদী ও কুমুদগন্ধবায়ুর গান করিলেন। গোপীগণ পুনঃ পুনঃ এক কৃষ্ণনামই গায়িতে লাগিল। এক গোপী নর্ত্তনজনিত শ্রমে শ্রান্ত হইয়া চঞ্চল বলয়ধ্বনিবিশিষ্ট বাহুলতা মধুসূদনের স্কন্ধে স্থাপিত করিল। কপটতায় নিপুণা কোন গোপী কৃষ্ণ-গীতের স্তুতিচ্ছলে বাহু দ্বারা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া মধুসূদনকে চুম্বিত করিল। কৃষ্ণের ভুজদ্বয় কোন গোপীর কপোলসংশ্লেষ প্রাপ্ত হইয়া পুলকোদ্গমরূপ শস্যোৎপাদনের জন্য স্বেদাম্বুমেঘত্ব প্রাপ্ত হইল। তার-তরধ্বনিতে কৃষ্ণ যাবৎকাল রাসগীত গায়িতে লাগিলেন, তাবৎকাল গোপীগণ 'সাধু কৃষ্ণ, 'সাধু কৃষ্ণ' বলিয়া দ্বিগুণ গায়িল। কৃষ্ণ গেলে তাহারা গমন করিতে লাগিল, কৃষ্ণ আবর্ত্তন করিলে তাহারা সম্মুখে আসিতে লাগিল, এইরূপ প্রতিলোম-অনুলোমগতি দ্বারা গোপাঙ্গনাগণ হরিকে ভজনা করিল। মধুসূদন গোপীদিগের সহিত সেইখানে ক্রীড়া করিলেন। তাহারা তাঁহাকে বিনা, ক্ষণমাত্রকে কোটি বৎসর মনে করিতে লাগিল। ক্রীড়ানুরাগিণী গোপাঙ্গনাগণ পতির দ্বারা, পিতার দ্বারা, ভ্রাতার দ্বারা নিবারিত হইয়াও রাত্রিকালে কৃষ্ণের সহিত ক্রীড়া করিল। শত্রুধ্বংসকারী অমেয়াত্মা মধুসূদনও আপনাকে কিশোরবয়স্ক জানিয়া রাত্রে তাহাদিগের সহিত ক্রীড়া করিলেন।"

এই অনুবাদ সম্বন্ধে একটি কথা বক্তব্য এই যে, 'রম্‌' ধাতুনিষ্পন্ন শব্দের অর্থে আমি ক্রীড়ার্থে 'রম্‌' ধাতু বুঝিয়াছি। যথা "রতিপ্রিয়া" অর্থে আমি ক্রীড়ানুরাগিণী বুঝিয়াছি। আদৌ "রম্‌" ধাতু ক্রীড়ার্থেই ব্যবহৃত। উহার যে অর্থান্তর আছে, তাহা ক্রীড়ার্থ হইতে পশ্চাৎ নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'রতি' ও 'রতিপ্রিয়' শব্দ এই অর্থে যে কৃষ্ণলীলায় সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহার অনেক উদাহরণ আছে। পাঠক হরিবংশের সপ্তষষ্টিতম, পুস্তকান্তরে অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়ে এইরূপ প্রয়োগ দেখিবেন। * তথায় ক্রীড়াশীল গোপালগণকে 'রতিপ্রিয়' গোপাল বলা হইয়াছে। আর এই অর্থই এখানে সঙ্গত, কেন না, 'রাস' একটি ক্রীড়াবিশেষ। অদ্যাপি ভারতবর্ষের কোন কোন স্থানে ঐরূপ ক্রীড়া বা নৃত্য প্রচলিত আছে। রাসের অর্থ কি, তাহা শ্রীধরস্বামী বুঝাইতেছেন। তিনি বলেন—

"অন্যোন্যব্যতিষক্তহস্তানাং স্ত্রীপুংসাং গায়তাং
মণ্ডলীরূপেণ ভ্রমতাং নৃত্যবিনোদঃ রাসো নাম।"

অর্থাৎ স্ত্রীপুরুষে পরস্পরের হাত ধরিয়া গায়িতে গায়িতে এবং মণ্ডলীরূপে ভ্রমণ করিতে করিতে যে নৃত্য করে, তাহার নাম রাস। বালক-বালিকায় এরূপ নৃত্য করে, আমরা দেখিয়াছি এবং যাহারা বাল্য অতিক্রম করিয়াছে, তাহারাও দেশবিশেষে এরূপ নৃত্য করে শুনিয়াছি। ইহাতে আদিরসের নামগন্ধও নাই।

'রাস' একটা খেলা, এবং 'রতি' শব্দে খেলা। অতএব রাসবর্ণনে 'রতি' শব্দ ব্যবহৃত হইলে অনুবাদকালে তৎপ্রতিশব্দস্বরূপ 'ক্রীড়া' শব্দই ব্যবহার করিতে হয়।

এই রাসলীলাবৃত্তান্ত কিয়ৎ পরিমাণে দুর্ব্বোধ্য। ইহার ভিতরে যে গূঢ় তাৎপর্য্য আছে, তাহা আমি গ্রন্থান্তরে পরিস্ফুট করিয়াছি। কিন্তু এখানে এ তত্ত্ব অসম্পূর্ণ রাখা অনুচিত, এজন্য যাহা বলিয়াছি, তাহা পুনরুক্ত করিতে বাধ্য হইতেছি।

আমি "ধর্ম্মতত্ত্ব" গ্রন্থে বলিয়াছি যে, মনুষ্যত্বই মনুষ্যের ধর্ম্ম। সেই মনুষ্যত্ব বা ধর্ম্মের উপাদান আমাদের বৃত্তিগুলির অনুশীলন, প্রস্ফুরণ ও চরিতার্থতা। সেই বৃত্তিগুলিকে শারীরিকী, জ্ঞানার্জ্জনী, কার্য্যকারিণী এবং চিত্তরঞ্জিনী—এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছি। যে সকল বৃত্তির দ্বারা সৌন্দর্য্যাদির পর্য্যালোচনা করিয়া আমরা নির্ম্মল এবং অতুলনীয় আনন্দ অনুভূত করি, সেই সকলের নাম দিয়াছি চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি। তাহার সম্যক্ অনুশীলনে সচ্চিদানন্দময় জগৎ এবং জগন্ময় সচ্চিদানন্দের সম্পূর্ণ স্বরূপানুভূতি হইতে পারে। চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির অনুশীলন অভাবে ধর্ম্মের হানি হয়। যিনি আদর্শমনুষ্য, তাঁহার কোন বৃত্তিই অনুনুশীলিত বা স্ফূর্ত্তিহীন থাকিবার সম্ভাবনা নাই। এই রাসলীলা কৃষ্ণ এবং গোপীগণকৃত সেই চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি অনুশীলনের উদাহরণ।

কৃষ্ণ পক্ষে ইহা উপভোগ মাত্র, কিন্তু গোপীপক্ষে ইহা ঈশ্বরোপাসনা। এক দিকে অনন্তসুন্দরের সৌন্দর্য্য-বিকাশ, আর এক দিকে অনন্তসুন্দরের উপাসনা।

---

* "স তত্র বয়সা তুল্যৈর্বৎসপালৈঃ সহানঘঃ।
রেমে বৈ দিবসং কৃষ্ণঃ পুরা স্বর্গগতো যথা॥
তং ক্রীড়মানং গোপালাঃ কৃষ্ণং ভাণ্ডীরবাসিনম্।
রময়ন্তি স্ম বহবো বন্যৈঃ ক্রীড়নকৈস্তদা॥
অন্যে স্ম পরিগায়ন্তি গোপা মুদিতমানসাঃ।
গোপালাঃ কৃষ্ণমেবান্যে গায়ন্তি স্ম রতিপ্রিয়াঃ।"

এই তিন শ্লোকে 'রম্‌' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন শব্দ তিন বার ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা "রেমে", "রময়ন্তি", "রতিপ্রিয়া" তিন বারই ক্রীড়ার্থে, অর্থান্তর কোন মতেই ঘটান যায় না। কেন না, গোপালদিগের কথা হইতেছে।

চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির চরম অনুশীলন সেই বৃত্তিগুলিকে ঈশ্বরমুখী করা। প্রাচীন ভারতে স্ত্রীগণের জ্ঞানমার্গ নিষিদ্ধ; কেন না, বেদাদির অধ্যয়ন নিষিদ্ধ। স্ত্রীলোকের পক্ষে কর্ম্মমার্গ কষ্টসাধ্য; কিন্তু ভক্তিতে তাহাদের বিশেষ অধিকার। ভক্তি কথিত হইয়াছে—"পরানুরক্তিরীশ্বরে"। অনুরাগ নানা কারণে জন্মিতে পারে। কিন্তু সৌন্দর্য্যের মোহঘটিত যে অনুরাগ, তাহা মনুষ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্। অতএব অনন্তসুন্দরের সৌন্দর্য্যের বিকাশ ও তাহার আরাধনাই স্ত্রীজাতির জীবনসার্থকতার মুখ্য পায়। এই তত্ত্বাত্মক রূপকই রাসলীলা। জড়প্রকৃতির সমস্ত সৌন্দর্য্য তাহাতে বর্ত্তমান। শরৎকালের পূর্ণচন্দ্র শরৎপ্রবাহপরিপূর্ণা শ্যামসলিলা যমুনা, প্রস্ফুটিতকুসুমসুবাসিত কুঞ্জবিহঙ্গম-কূজিত বৃন্দাবন-বনস্থলী এবং তন্মধ্যে অনন্তসুন্দরের সশরীরে বিকাশ তাহার সহায় বিশ্ববিমোহিনী কৃষ্ণগীতি। এইরূপ সর্ব্বপ্রকার চিত্তরঞ্জনের দ্বারা গোপীগণের ভক্তি উদ্রিক্তা হইলে, তাহারা কৃষ্ণানুরাগিণী হইয়া আপনাদিগকেই কৃষ্ণ বলিয়া জানিতে লাগিল, কৃষ্ণের কথিতব্য কথা কহিতে লাগিল এবং কেবল জগদীশ্বরের সৌন্দর্য্যের অনুরাগিনী হইয়া জীবাত্মা-পরমাত্মায় যে অভেদ জ্ঞান, যাহা যোগীর যোগের এবং জ্ঞানীর জ্ঞানের চরমোদ্দেশ্য, তাহা প্রাপ্ত হইয়া ঈশ্বরে বিলীন হইল।

ইহাও আমাকে স্বীকার করিতে হয়, যুবক-যুবতী একত্র হইয়া নৃত্যগীত করা আমাদিগের আধুনিক সমাজে নিন্দনীয়। অন্যান্য সমাজে যথা ইউরোপে—নিন্দনীয় নহে। বোধ হয়, যখন বিষ্ণুপুরাণ প্রণীত হইয়াছিল, তখনও সমাজের এইরূপ অবস্থা ছিল এবং পুরাণকারেরও মনে মনে বিশ্বাস ছিল যে, কার্য্যটা নিন্দনীয়। সেই জন্যই তিনি লিখিয়া থাকিবেন যে,—

"তা বার্য্যমাণাঃ পতিভিঃ পিতৃভির্ভ্রাতৃভিস্তথা।"

এবং সেই জন্যই অধ্যায়শেষে কৃষ্ণের দোষক্ষালন জন্য লিখিয়াছেন ;—

"তদ্ভর্তৃষু তথা তাসু সর্ব্বভূতেষু চেশ্বরঃ।
আত্মস্বরূপরূপোঽসৌ ব্যাপ্য বায়ুরিব স্থিতঃ॥
যথা সমস্তভূতেষু নভোঽগ্নিঃ পৃথিবী জলম্।
বায়ুশ্চাত্মা তথৈবাসৌ ব্যাপ্য সর্ব্বমবস্থিতঃ॥"

তিনি তাহাদিগের ভর্ত্তৃগণে এবং তাহাদিগেতে ও সর্ব্বভূতেতে, ঈশ্বর ও আত্মস্বরূপরূপে সকলেই বায়ুর ন্যায় ব্যাপিয়া আছেন। যেমন সমগ্র ভূতে আকাশ, অগ্নি, পৃথিবী, জল এবং বায়ু, তেমনই তিনিও সর্ব্বভূতে আছেন।

এইরূপ দোষক্ষালনের কোন প্রয়োজন ছিল না। যুবক-যুবতীর একত্রে নৃত্য করায় স্বর্ত্তঃ কোন দোষ ঘটে না, কেবল এই সমাজে সামাজিক দোষ ঘটে এবং কৃষ্ণের সময়ে বোধ হয়, সে সামাজিক দোষও ছিল না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ব্রজগোপী

হরিবংশ

বিষ্ণুপুরাণ হইতে পূর্ব্বপরিচ্ছেদে যাহা উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা পঞ্চম অংশের ত্রয়োদশ অধ্যায় হইতে। ঐ অধ্যায় ব্যতীত ব্রজগোপীদিগের কথা বিষ্ণুপুরাণে আর কোথাও নাই। কেবল কৃষ্ণ মথুরাগমনকালে তাঁহাদের খেদোক্তি আছে।

সেইরূপ হরিবংশেও ব্রজগোপীদিগের কথা বিষ্ণু-পর্ব্বের ৭৭ অধ্যায়, গ্রন্থান্তরে ৭৬ অধ্যায় ভিন্ন আর কোথাও নাই। যাহা আছে, সে সমস্তই উদ্ধৃত করিতেছি। কিন্তু উদ্ধৃত করিবার আগে বক্তব্য যে, "রাস" শব্দ হরিবংশে ব্যবহৃত হয় নাই। তৎপরিবর্ত্তে "হল্লীষ" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। এই অধ্যায়ের নাম "হল্লীষক্রীড়নম্।" যথা—ইতি শ্রীমহাভারতে খিলেষু হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি হল্লীষক্রীড়নে সপ্তসপ্তত্যধ্যায়ঃ। হেমচন্দ্রাভিধানে 'হল্লীষ' অর্থ এইরূপ লিখিত হইয়াছে,—

"মণ্ডলেন তু যন্নৃত্যং স্ত্রীণাং হল্লীষকন্তু তৎ।"

বাচস্পত্যে তারানাথ লিখিয়াছেন—

"স্ত্রীণাং মণ্ডলিকাকারনৃত্যে।"

অতএব 'হল্লীষ' এবং 'রাস' একই কথা—নৃত্যবিশেষ।

এক্ষণে হরিবংশের কথা তুলিতেছি—

"কৃষ্ণস্তু যৌবনং দৃষ্ট্বা নিশি চন্দ্রমসো নবং।
শারদীঞ্চ নিশাং রম্যাং মনশ্চক্রে রতিং প্রতি॥
স করীষাঙ্গরাগাসু ব্রজরথ্যাসু বীর্য্যবান্।
বৃষাণাং জাতদর্পাণাং যুদ্ধানি সমযোজয়ৎ॥
গোপালাংশ্চ বলোদগ্রান্ যোধয়ামাস বীর্য্যবান্।
বনে স বীরো গাশ্চৈব জগ্রাহ গ্রাহবদ্বিভুঃ॥
যুবতীর্গোপকন্যাশ্চ রাত্রৌ সঙ্কাল্য কালবিৎ।
কৈশোরকং মানয়ন্ বৈ সহ তাভির্মুমোদ হ॥
তাস্তস্য বদনং কান্তং কান্তা গোপস্ত্রিয়ো নিশি।
পিবন্তি নয়নাক্ষেপৈর্গাঙ্গতং শশিনং যথা॥
হরিতালার্দ্রপীতেন সকৌষেয়েণ বাসসা।
বসানো ভদ্রবসনং কৃষ্ণঃ কান্ততরোঽভবৎ॥
স বদ্ধাঙ্গদনির্ব্যূহশ্চিত্রয়া বনমালয়া।
শোভমানো হি গোবিন্দঃ শোভয়ামাস তং ব্রজম্॥

নাম দামোদরেত্যেবং গোপকন্যাস্তদাঽব্রুবন্।
বিচিত্রং চরিতং ঘোষে দৃষ্ট্বা তত্তস্য ভাষতঃ॥
তাস্তং পয়োধরোত্তানৈরুরোভিঃ সমপীড়য়ন্।
ভ্রামিতাক্ষৈশ্চ বদনৈর্নিরৈক্ষন্ত বরাঙ্গনাঃ॥
তা বার্য্যমাণাঃ পিতৃভির্ভ্রাতৃভির্মাতৃভিস্তথা।
কৃষ্ণং গোপাঙ্গনা রাত্রৌ মৃগয়ন্তে রতিপ্রিয়াঃ॥
তাস্তু পংক্তীকৃতাঃ সর্ব্বা রময়ন্তি মনোরমম।
গায়ন্ত্যঃ কৃষ্ণচরিতং দ্বন্দ্বশো গোপকন্যকাঃ॥
কৃষ্ণলীলানুকারিণ্যঃ কৃষ্ণপ্রণিহিতেক্ষণাঃ।
কৃষ্ণস্য গতিগামিন্যস্তরুণাস্তা বরাঙ্গনাঃ॥
বনেষু তালহস্তাগ্রৈঃ কুট্টয়ন্ত্যস্তথাঽপরাঃ।
চেরুর্বৈ চরিতং তস্য কৃষ্ণস্য ব্রজযোষিতঃ॥
তাস্তস্য নৃত্যং গীতঞ্চ বিলাসস্মিতবীক্ষিতম।
মুদিতাশ্চানুকুর্ব্বন্ত্যঃ ক্রীড়ন্ত্যো ব্রজযোষিতঃ॥
ভাবনিস্যন্দমধুরং গায়ন্ত্যস্তা বরাঙ্গনাঃ।
ব্রজং গতাঃ সুখং চেরুর্দামোদরপরায়ণাঃ॥
করীষপাংশুদিগ্ধাঙ্গ্যস্তাঃ কৃষ্ণমনুবব্রিরে।
রময়ন্ত্যো যথা নাগং সম্প্রমত্তং করেণবঃ॥
অন্যা ভাববিকচৈর্নেত্রৈঃ প্রহসিতাননাঃ।
পিবন্ত্যতৃপ্তা বনিতাঃ কৃষ্ণং কৃষ্ণমৃগেক্ষণাঃ॥
মুখমস্যাব্জসঙ্কাশং তৃষিতা গোপকন্যকাঃ।
রত্যন্তরগতা রাত্রৌ পিবন্তি রতিলালসাঃ॥
হাহেতি কুর্ব্বতস্তস্য প্রহৃষ্টাস্তা বরাঙ্গনাঃ।
জগৃহুর্নিঃসৃতাং বাণীং সাম্না দামোদরেরিতাম॥
তাসাং গ্রথিতসীমন্তা রতিশ্রান্ত্যাকুলীকৃতাঃ।
চারু বিস্রংসিরে কেশাঃ কুচাগ্রে গোপযোষিতাম॥
এবং স কৃষ্ণো গোপীনাং চক্রবালৈরলঙ্কৃতঃ।
শারদীষু সচন্দ্রাসু নিশাসু মুমুদে সুখী॥"

হরিবংশে ৭৭ অধ্যায়ঃ।

"কৃষ্ণ রাত্রে চন্দ্রমার নবযৌবন (বিকাশ) দেখিয়া এবং রম্য শারদীয় নিশা দেখিয়া ক্রীড়াভিলাষী হইলেন। কখনও ব্রজের শুষ্কগোময়াকীর্ণ রাজপথে জাতদর্প বৃষগণকে বীর্য্যবান্ কৃষ্ণ যুদ্ধে সংযুক্ত করিতেন, কখনও বলদৃপ্ত গোপালগণকে যুদ্ধ করাইতেন, এবং কুম্ভীরের ন্যায় গোপগণকে বনমধ্যে গ্রহণ করিতেন। কালজ্ঞ কৃষ্ণ আপনার কিশোরবয়সের সম্মানার্থ যুবতী গোপকন্যাগণের জন্য কাল নির্ণীত করিয়া রাত্রে তাহাদিগের সহিত আনন্দানুভব করিলেন। সেই গোপসুন্দরীগণ নয়নাক্ষেপ দ্বারা ধরাগত চন্দ্রের মত তাঁহার সুন্দর মুখমণ্ডল পান করিল। সুবসন কৃষ্ণ, হরিতালার্দ্র পীতকৌষেয় বসন পরিহিত হইয়া কান্ততর হইলেন। অঙ্গদসমূহ ধারণপূর্ব্বক বিচিত্র বনমাল্য দ্বারা শোভিত হইয়া গোবিন্দ সেই ব্রজ শোভিত করিতে লাগিলেন। সেই বাক্যালাপী কৃষ্ণের বিচিত্র চরিত্র দেখিয়া ঘোষমধ্যে গোপকন্যাগণ তখন তাঁহাকে দামোদর বলিত; পয়োধরস্থিতিহেতু ঊর্দ্ধমুখ হৃদয়ের দ্বারা নিপীড়িত করিয়া সেই বরাঙ্গনাগণ ভ্রামিতচক্ষুঃ বদনের দ্বারা তাঁহাকে দেখিতে লাগিল। ক্রীড়ানুরাগিণী গোপাঙ্গনাগণ পিতা, ভ্রাতা ও মাতা কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াও রাত্রে কৃষ্ণের নিকট গমন করিল। তাহারা সকলে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া সাজিয়া, মনোহর ক্রীড়া করিল; এবং যুগে যুগে কৃষ্ণচরিত গান করিল। বরাঙ্গনা তরুণীগণ কৃষ্ণলীলানুকারিণী, কৃষ্ণে প্রণিহিতলোচনা, এবং কৃষ্ণের গমনানুগামিনী হইল। কোন কোন ব্রজবালা হস্তাগ্রে তালকুট্টনপূর্ব্বক কৃষ্ণচরিত আচরিত করিতে লাগিল। ব্রজযোষিদগণ কৃষ্ণের নৃত্য, গীত, বিলাসস্মিতবীক্ষণ অনুকরণপূর্ব্বক, সানন্দে ক্রীড়া করিতে লাগিল। কৃষ্ণপরায়ণা বরাঙ্গনাগণ ভাবনিস্যন্দ-মধুর গান করত ব্রজে গিয়া সুখে বিচরণ করিতে লাগিল। সম্প্রমত্ত হস্তীকে করেণুগণ যেরূপ ক্রীড়া করায়, শুষ্ক গোময় দ্বারা দিগ্ধাঙ্গ সেই গোপীগণ সেইরূপ কৃষ্ণের অনুবর্ত্তন করিল। সহাস্যবদনা কৃষ্ণমৃগলোচনা অন্যা বনিতাগণ ভাবোৎফুল্ল লোচনের দ্বারা কৃষ্ণকে অতৃপ্ত হইয়া পান করিতে লাগিল। ক্রীড়ালালসাতৃষিতা গোপকন্যাগণ রাত্রিতে অনন্তক্রীড়াসক্ত হইয়া অজসঙ্কাশ কৃষ্ণমুখমণ্ডল পান করিতে লাগিল। কৃষ্ণ হা হা ইতি শব্দ করিয়া গান করিলে, কৃষ্ণমুখনিঃসৃত সেই বাক্য, বরাঙ্গনাগণ আহ্লাদিত হইয়া গ্রহণ করিল। সেই গোপযোষিদগণের ক্রীড়াশ্রান্তিপ্রযুক্ত আকুলীকৃত সীমন্তগ্রথিত কেশদাম কুচাগ্রে বিস্রস্ত হইতে লাগিল। চক্রবালালঙ্কৃত শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ সচন্দ্র শারদী নিশাতে সুখে গোপীদিগের সহিত আনন্দ করিতে লাগিলেন।"

বিষ্ণুপুরাণ হইতে রাসলীলাতত্ত্ব অনুবাদ কালে 'রম' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন শব্দ সকলের যেরূপ ক্রীড়ার্থে অনুবাদ করিয়াছি, এই অনুবাদেও সেই সকল কারণে ঐ সকল শব্দের ক্রীড়ার্থ প্রতিশব্দ ব্যবহার করিয়াছি। জোর করিয়া বলা যাইতে পারে যে, অন্য কোনরূপ প্রতিশব্দ ব্যবহার হইতেই পারে না। যথা—

"তাস্তু পংক্তীকৃতাঃ সর্ব্বা রময়ন্তি মনোরমম্।"

এখানে ক্রীড়ার্থে ভিন্ন রত্যর্থে 'রময়ন্তি' শব্দ কোন রকমেই বুঝায় না। যাঁহারা অন্যরূপ অনুবাদ করিয়াছেন, তাঁহারা পূর্ব্বপ্রচলিত কুসংস্কার বশতঃই করিয়াছেন।

এই হল্লীষক্রীড়াবর্ণনা, বিষ্ণুপুরাণকৃত রাসবর্ণনার অনুগামী। এমন কি, একটি শ্লোক উভয় গ্রন্থে প্রায় একই। যথা বিষ্ণুপুরাণে আছে—

"তা বার্য্যমাণাঃ পতিভিঃ পিতৃভির্ভ্রাতৃভিস্তথা।
কৃষ্ণং গোপাঙ্গনা রাত্রৌ মৃগয়ন্তে রতিপ্রিয়াঃ।"

হরিবংশে আছে—

"তা বার্য্যমাণাঃ পিতৃভির্ভ্রাতৃভির্মাতৃভিস্তথা।
কৃষ্ণং গোপাঙ্গনা রাত্রৌ রময়ন্তি রতিপ্রিয়াঃ॥"

তবে বিষ্ণুপুরাণের অপেক্ষা হরিবংশের বর্ণনা সংক্ষিপ্ত। অন্যান্য বিষয়ে সচরাচর সেরূপ দেখা যায় না। সচরাচর দেখা যায়, বিষ্ণুপুরাণে যাহা সংক্ষিপ্ত, হরিবংশে তাহা বিস্তৃত এবং নানাপ্রকার নূতন উপন্যাস ও অলঙ্কারে অলঙ্কৃত। হরিবংশে রাসলীলার এইরূপ সংক্ষেপবর্ণনার একটু কারণও আছে। উভয় গ্রন্থ সবিস্তারে তুলনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, কবিত্বে, গাম্ভীর্য্যে, পাণ্ডিত্যে এবং ঔদার্য্যে হরিবংশকার বিষ্ণুপুরাণকারের অপেক্ষা অনেক লঘু। তিনি বিষ্ণুপুরাণের রাসবর্ণনার নিগূঢ় তাৎপর্য্য এবং গোপীগণকৃত ভক্তিযোগ দ্বারা একাত্মতাপ্রাপ্তি বুঝিতে পারেন নাই। তাহা না বুঝিতে পারিয়াই যেখানে বিষ্ণুপুরাণকার লিখিয়াছেন,—

"কাচিৎ প্রবিলসদ্‌বাহুঃ পরিরভ্য চুচুম্ব তম্।"

সেখানে হরিবংশকার লিখিয়াছেন,—

"তাস্তং পয়োধরোত্তানৈরুরোভিঃ সমপীড়য়ন্।"
ইত্যাদি।

প্রভেদটুকু এই যে, বিষ্ণুপুরাণের চপলা বালিকা আনন্দে চঞ্চলা, আর হরিবংশের এই গোপীগণ বিলাসিনীর ভাব প্রকাশ করিতেছে। হরিবংশকারের অনেক স্থলে বিলাসপ্রিয়তার মাত্রাধিক্য দেখা যায়।

আর আর কথা বিষ্ণুপুরাণের রাসলীলা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, হরিবংশের এই হল্লীষক্রীড়া সম্বন্ধেও বর্ত্তে।

উপরিলিখিত শ্লোকগুলি ভিন্ন হরিবংশে ব্রজগোপীদের সম্বন্ধে আর কিছুই নাই।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ব্রজগোপী—ভাগবত

বস্ত্রহরণ

শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রজগোপীদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধ কেবল রাসনৃত্যে পর্য্যাপ্ত হয় নাই। ভাগবতকার গোপীদিগের সহিত কৃষ্ণলীলায় বিশেষ বিস্তার করিয়াছেন। সময়ে সময়ে তাহা আধুনিক রুচির বিরুদ্ধ। কিন্তু সেই সকল বর্ণনায় বাহ্যতঃ এখনকার রুচিবিগর্হিত হইলেও, অভ্যন্তরে অতি পবিত্র ভক্তিতত্ত্ব নিহিত আছে। হরিবংশকারের ন্যায় ভাগবতকার বিলাসপ্রিয়তাদোষে দূষিত নহেন। তাঁহার অভিপ্রায় অতিশয় নিগূঢ় এবং অতিশয় বিশুদ্ধ।

দশম স্কন্ধে ২১ অধ্যায়ে প্রথমতঃ গোপীদিগের পূর্ব্বরাগ বর্ণিত হইয়াছে। তাহারা শ্রীকৃষ্ণের বেণুরব শ্রবণ করিয়া মোহিত হইয়া পরস্পরের নিকট কৃষ্ণানুরাগ ব্যক্ত করিতেছে। সেই পূর্ব্বানুরাগবর্ণনায় কবি অসাধারণ কবিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। তার পর তাহা স্পষ্টীকৃত করিবার জন্য একটি উপন্যাস রচনা করিয়াছেন; সেই উপন্যাস "বস্ত্রহরণ" বলিয়া প্রসিদ্ধ। বস্ত্রহরণের কোন কথা মহাভারতে, বিষ্ণুপুরাণে বা হরিবংশে নাই, সুতরাং উহা ভাগবতকারের কল্পনাপ্রসূত বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। বৃত্তান্তটা আধুনিক রুচিবিরুদ্ধ হইলেও আমরা তাহা পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না। কেন না, ভাগবতব্যাখ্যাত রাসলীলাকথনে আমরা প্রবৃত্ত এবং সেই রাসলীলার সঙ্গে ইহার বিশেষ সম্বন্ধ।

কৃষ্ণানুরাগবিবশা ব্রজগোপীগণ কৃষ্ণকে পতিভাবে পাইবার জন্য কাত্যায়নীব্রত করিল। ব্রতের নিয়ম এক মাস। এই এক মাস তাহারা দলবদ্ধ হইয়া আসিয়া প্রত্যূষে যমুনাসলিলে অবগাহন করিত। স্ত্রীলোকদিগের জলাবগাহনবিষয়ে একটি কুৎসিত প্রথা এখনও ভারতবর্ষের অনেক প্রদেশে প্রচলিত আছে। স্ত্রীলোকেরা অবগাহনকালে নদীতীরে বস্ত্রগুলি ত্যাগ করিয়া বিবস্ত্রা হইয়া জলমগ্না হয়। সেই প্রথানুসারে সেই ব্রজাঙ্গনাগণ কূলে বসন রক্ষা করিয়া বিবস্ত্রা হইয়া অবগাহন করিত। মাসান্তে যে দিন ব্রত সম্পূর্ণ হইবে, সে দিনও তাহারা ঐরূপ করিল। তাহাদের কর্ম্মফল (উভয়ার্থে) দিবার জন্য সেই দিন শ্রীকৃষ্ণ সেইখানে উপস্থিত হইলেন। তিনি পরিত্যক্ত বস্ত্রগুলি সংগ্রহ করিয়া তীরস্থ কদম্ববৃক্ষে আরোহণ করিলেন।

গোপীগণ বড় বিপন্না হইল। তাহারা বিনা বস্ত্রে উঠিতে পারে না; এ দিকে প্রাতঃসমীরণে জলমধ্যে শীতে প্রাণ যায়। তাহারা কণ্ঠ পর্য্যন্ত নিমগ্ন হইয়া শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে কৃষ্ণের নিকট বস্ত্রভিক্ষা করিতে লাগিল। কৃষ্ণ সহজে বস্ত্র দেন না।—গোপীদিগের "কর্ম্মফল" দিবার ইচ্ছা আছে। তার পর যাহা ঘটিল, তাহা আমরা স্ত্রীলোক, বালক প্রভৃতির বোধগম্য বাঙ্গালা ভাষায় কোনমতেই প্রকাশ করিতে পারি না। অতএব মূল সংস্কৃতই বিনানুবাদে উদ্ধৃত করিলাম।

ব্রজগোপীগণ কৃষ্ণকে বলিতে লাগিল,—

"মানয়ং ভো কৃথাস্ত্বাং তু নন্দগোপসুতং প্রিয়ম্।
জানীমোঽঙ্গ ব্রজশ্লাঘ্যং দেহি বাসাংসি বেপিতাঃ।

শ্যামসুন্দর তে দাস্যং করবাম তবোদিতম্।
দেহি বাসাংসি ধর্মজ্ঞ নোচেদ্রাজ্ঞে ব্রুবামহে॥

শ্রীভগবানুবাচ

ভবত্যো যদি মে দাস্যো ময়োক্তঞ্চ করিষ্যথ।
অত্রাগত্য স্ববাসাংসি প্রতীচ্ছত শুচিস্মিতাঃ।
নোচেন্নাহং প্রদাস্যে কিং ক্রুদ্ধো রাজা করিষ্যতি॥
ততো জলাশয়াৎ সর্ব্বা দারিকা শীতবেপিতাঃ।
পাণিভ্যাং * * আচ্ছাদ্য প্রোত্তেরুঃ শীতকর্ষিতা॥
ভগবানাহ তা বীক্ষ্য শুদ্ধভাবপ্রসাদিতঃ।
স্কন্ধে নিধায় বাসাংসি প্রীতঃ প্রোবাচ সস্মিতম্॥

যূয়ং বিবস্ত্রা যদপো ধৃতব্রতা
ব্যগাহতৈতত্তদু দেবহেলনম্।
বদ্ধাঞ্জলিং মূর্দ্ধ্ন্যপনুত্তয়েঽংহসঃ
কৃত্বা নমো * বসনং প্রগৃহ্যতাম্॥
ইত্যচ্যুতেনাভিহিতং ব্রজাবলা
মত্বা বিবস্ত্রাপ্লবনং ব্রতচ্যুতিম্।
তৎপূর্ত্তিকামাস্তদশেষকর্ম্মণাং
সাক্ষাৎকৃতং নেমুরবদ্যমৃগ্ যতঃ॥

তাস্তথাবনতা দৃষ্ট্বা ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
বাসাংসি তাভ্যঃ প্রায়চ্ছৎ করুণস্তেন তোষিতঃ॥"

শ্রীমদ্ভাগবতম্, ১০ম স্কন্ধ, ২২ অধ্যায়ঃ।

অন্তর্নিহিত ভক্তিতত্ত্বটা এই। ঈশ্বরকে ভক্তি দ্বারা পাইবার প্রধান সাধনা, ঈশ্বরে সর্ব্বার্পণ। ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্।"

গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণে সর্ব্বার্পণ করিল। স্ত্রীলোক যখন সকল পরিত্যাগ করিতে পারে, তখনও লজ্জা ত্যাগ করিতে পারে না। ধন, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, ভাগ্য—সব যায়, তথাপি স্ত্রীলোকের লজ্জা যায় না। লজ্জা স্ত্রীলোকের শেষ রত্ন। যে স্ত্রীলোক অপরের জন্য লজ্জা পরিত্যাগ করিল, সে তাহাকে সব দিল। এই স্ত্রীগণ শ্রীকৃষ্ণে লজ্জাও অর্পিত করিল। এ কামাতুরার লজ্জার্পণ নহে—লজ্জাবিবশার লজ্জার্পণ। অতএব তাহারা ঈশ্বরে সর্ব্বস্বার্পণ করিল। কৃষ্ণও তাহা ভক্ত্যুপহার বলিয়া গ্রহণ করিলেন। তিনি বলিলেন, "আমাতে যাহাদের বুদ্ধি আরোপিত হইয়াছে, তাহাদের কামনা কামার্থে কল্পিত হয় না। যব ভর্জিত এবং কাথিত হইলে, বীজত্বে সমর্থ হয় না।" অর্থাৎ যাহারা কৃষ্ণকামিনী, তাহাদিগের কামাবশেষ হয়। আরও বলিলেন, তোমরা যে জন্য ব্রত করিয়াছ, আমি তাহা রাত্রে সিদ্ধ করিব।"

এখন গোপীগণ কৃষ্ণকে পতিস্বরূপ পাইবার জন্যই ব্রত করিয়াছিল। অতএব কৃষ্ণ তাহাদের কামনা পূরণ করিতে স্বীকৃত হইয়া, তাহাদের পতিত্ব স্বীকার করিলেন। কাজেই বড় নৈতিক গোলযোগ উপস্থিত। এই গোপাঙ্গনাগণ পরপত্নী, তাহাদের পতিত্ব স্বীকার করায়, পরদারা-ভিমর্ষণ স্বীকার করা হইল। কৃষ্ণে এ পাপারোপণ কেন?

ইহার উত্তর আমার পক্ষে অতি সহজ। আমি ভূরি ভূরি প্রমাণের দ্বারা বুঝাইয়াছি যে, এ সকল পুরাণকার-কল্পিত উপন্যাসমাত্র, ইহার কিছুমাত্র সত্যতা নাই। কিন্তু পুরাণকারের পক্ষে উত্তর তত সহজ নহে। তিনিও পরিক্ষিতের প্রশ্নানুসারে শুকমুখে এক একটা উত্তর দিয়াছেন। যথাস্থানে তাহার কথা বলিব। কিন্তু আমাকেও এখানে বলিতে হইবে যে, হিন্দুধর্ম্মের ভক্তিবাদানুসারে কৃষ্ণকে এই গোপীগণপতিত্ব অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। ভগবদ্গীতায় কৃষ্ণ নিজে বলিয়াছেন,—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।"

"যে যে ভাবে আমাকে ভজনা করে, আমি তাহাকে সেইভাবে অনুগ্রহ করি।" অর্থাৎ যে আমার নিকটে বিষয়ভোগ কামনা করে, তাহাকে আমি তাহাই দিই। যে মোক্ষ কামনা করে, তাহাকে মোক্ষ দিই। বিষ্ণুপুরাণে আছে, দেবমাতা দিতি কৃষ্ণকে (বিষ্ণুকে) বলিতেছেন যে, আমি তোমাকে পুত্রভাবে কামনা করিয়াছিলাম, এজন্য তোমাকে পুত্রভাবেই পাইয়াছি। এই ভাগবতেই আছে যে, বসুদেব-দেবকী জগদীশ্বরকে পুত্রভাবে কামনা করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহাকে পুত্রভাবে পাইয়াছেন। অতএব গোপীগণ তাঁহাকে পতিভাবে পাইবার জন্য যথোপযুক্ত সাধনা করিয়াছিল বলিয়া কৃষ্ণকে তাহারা পতিভাবে পাইল।

যদি তাই হইল, তবে তাহাদের অধর্ম্ম কি? ঈশ্বরপ্রাপ্তিতে অধর্ম্ম আবার কি? পাপের দ্বারা, পুণ্যময়, পুণ্যের আদিভূতস্বরূপ জগদীশ্বরকে কি পাওয়া যায়? পাপ-পুণ্য কি? যাহার দ্বারা জগদীশ্বরের সন্নিধি উপস্থিত হইতে পারি, তাহাই পুণ্য—তাহাই ধর্ম্ম; তাহার বিপরীত যাহা, তাহাই পাপ, তাহাই অধর্ম্ম।

পুরাণকার এই এই তত্ত্ব বিশদ করিবার জন্য পাপসংস্পর্শের পথমাত্র রাখেন নাই। তিনি ২৯ অধ্যায়ে বলিয়াছেন, যাহারা পতিভাবে কৃষ্ণকে কামনা না করিয়া উপপতিভাবে তাঁহাকে কামনা করিয়াছিল, তাহারা তাঁহাকে স্বশরীরে পাইল না। তাহাদের

স্নেহের বশীভূতবুদ্ধি হইয়া আসিয়া থাকিবে। সকল প্রাণীই আমার প্রতি এইরূপ প্রীতি করিয়া থাকে। কিন্তু হে কল্যাণীগণ! পতির অকপট শুশ্রূষা এবং বন্ধুগণের ও সন্তানগণের অনুপোষণ, ইহাই স্ত্রীলোকদিগের প্রধান ধর্ম। পতি দুঃশীলই হউক, দুর্ভগই হউক, জড় হউক, রোগী বা অধনী হউক, যে স্ত্রীগণ অপাতকী হইয়া উভয় লোকের মঙ্গলকামনা করে, তাহাদিগের দ্বারা সে পতি পরিত্যাজ্য নয়। কুলস্ত্রীদিগের ঔপপত্য অস্বর্গ্য, অযশস্কর, অতি তুচ্ছ, ভয়াবহ এবং সর্ব্বত্র নিন্দিত। শ্রবণে, দর্শনে, ধ্যানে, অনুকীর্ত্তনে মদ্ভাবোদয় হইতে পারে, কিন্তু সন্নিকর্ষে নহে। অতএব তোমরা ঘরে ফিরিয়া যাও।"

কৃষ্ণের মুখে এই উক্তি সন্নিবিষ্ট করিয়া পুরাণকার দেখাইতেছেন যে, পাতিব্রত্যধর্ম্মের মহাত্ম্যের অনভিজ্ঞতা অথবা তৎপ্রতি অবজ্ঞা বশতঃ তিনি কৃষ্ণ-গোপীর ইন্দ্রিয়সম্বন্ধীয় বর্ণনে প্রবৃত্ত নহেন। তাঁহার অভিপ্রায় পূর্ব্বে বুঝাইয়াছি। কৃষ্ণ ব্রাহ্মণকন্যাদিগকেও ঐরূপ কথা বলিয়াছিলেন। শুনিয়া তাহারা ফিরিয়া গিয়াছিল। কিন্তু গোপীগণ ফিরিল না। তাহারা কাঁদিতে লাগিল। তাহারা বলিল, "এমন কথা বলিও না, তোমার পাদমূলে সর্ব্ববিষয় পরিত্যাগ করিয়াছি। আদিপুরুষদেব যেমন মুমুক্ষুকে পরিত্যাগ করেন না, তেমনই আমরা দুরবগ্রহ হইলেও, আমাদিগকে ত্যাগ করিও না। তুমি ধর্ম্মজ্ঞ, পতি, অপত্য, সুহৃৎ প্রভৃতির অনুবৃত্তি স্ত্রীলোকদিগের স্বধর্ম্ম বলিয়া যে উপদেশ দিতেছ, তাহা তোমাতেই বর্ত্তিত হউক। কেন না, তুমি ঈশ্বর। তুমি দেহধারীদিগের প্রিয়বন্ধু এবং আত্মা। হে আত্মন্! যাহারা কুশলী, তাহারা নিত্যপ্রিয় যে তুমি, সেই তোমাতেই রতি (আত্মরতি) করিয়া থাকে। দুঃখদায়ক পতিসুতাদির দ্বারা কি হইবে?" ইত্যাদি। এই সকল বাক্যে পুরাণকার বুঝাইয়াছেন যে, গোপীগণ কৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া ভজনা করিয়াছিল, এবং ঈশ্বরার্থেই স্বামিত্যাগ করিয়াছিল। তার পর আরও কতকগুলি কথা আছে, যাহা দ্বারা কবি বুঝাইতেছেন যে, কৃষ্ণের অনন্ত সৌন্দর্য্যে মুগ্ধা হইয়াই গোপীগণ কৃষ্ণানুসারিণী। তাহার পরে পুরাণকার বলিতেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আত্মারাম, অর্থাৎ আপনাতে ভিন্ন তাঁহার রতি বিরতি আর কিছুতেই নাই। তথাপি এই গোপীগণের বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া তিনি তাহাদিগের সহিত ক্রীড়া করিলেন। এবং তাহাদিগের সহিত গান করতঃ যমুনাপুলিনে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, ভাগবতোক্ত রাসলীলায় ইন্দ্রিয়সম্বন্ধ কিছু নাই। যদি এ কথা প্রকৃত হইত, তাহা হইলে আমি এ রাসলীলার অর্থ যেরূপ করিয়াছি, তাহা কোন রকমেই খাটিত না। কিন্তু এই কথা যে প্রকৃত নহে, ইহার প্রমাণার্থ এই স্থান হইতে একটা শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি:—

"বাহুপ্রসারপরিরম্ভ করালকোরু-
নীবীস্তনালভননর্ম্মনখাগ্রপাতৈঃ।
ক্ষ্বেল্যাবলোকহসিতৈর্ব্রজসুন্দরীণা-
মুত্তম্ভয়ন্ রতিপতিং রময়াঞ্চকার ॥ ৪১ ॥"

অন্যান্য স্থান হইতে আরও দুই চারিটা এরূপ প্রমাণ উদ্ধৃত করিব। এ সকলের বাঙ্গালা অনুবাদ দেওয়া অবিধেয় হইবে।

তার পর কৃষ্ণসঙ্গ লাভ করিয়া ব্রজগোপীগণ অত্যন্ত মানিনী হইলেন। তাঁহাদিগের সৌভাগ্যমদ দেখিয়া তদুপশমনার্থ শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলেন। এই গেল ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

ত্রিংশ অধ্যায়ে গোপীগণকৃত কৃষ্ণান্বেষণবৃত্তান্ত আছে। তাহা মূলতঃ বিষ্ণুপুরাণের অনুকরণ। তবে ভাগবতকার কাব্য আরও ঘোরাল করিয়াছেন। অতএব এই অধ্যায় সম্বন্ধে আর অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। একত্রিংশ অধ্যায়ে গোপীগণ কৃষ্ণ-বিষয়ক গান করিতে করিতে তাঁহাকে ডাকিতেছেন। ইহাতে ভক্তিরস এবং আদিরস দুইই আছে। বুঝাইবার কথা বেশী কিছু নাই। দ্বাত্রিংশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ পুনরাবির্ভূত হইলেন। এইখানে গোপীদিগের ইন্দ্রিয়-প্রণোদিত ব্যবহারের প্রমাণার্থ একটি কবিতা উদ্ধৃত করিব।

"কাচিদঞ্জলিনাগৃহ্লাৎ তন্বী তাম্বূলচর্ব্বিতম্।
একা তদঙ্ঘ্রি কমলং সন্তপ্তা স্তনয়োর্ম্যধাৎ ॥"

এই অধ্যায়ের শেষে কৃষ্ণ ও গোপীগণের মধ্যে কিছু আধ্যাত্মিক কথোপকথন আছে। আমরা এখানে তাহা উদ্ধৃত করা আবশ্যক বিবেচনা করিতেছি না। তাহার পর ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়ে রাসক্রীড়া ও বিহারবর্ণন। রাসক্রীড়া বিষ্ণুপুরাণোক্ত রাসক্রীড়ার ন্যায় নৃত্যগীত মাত্র। তবে গোপীগণ এখানে শ্রীকৃষ্ণকে পতিভাবে প্রাপ্ত হইয়াছিল, এ জন্য কিঞ্চিন্মাত্র ইন্দ্রিয়সম্বন্ধও আছে। যথা,—

কস্যাশ্চিন্নাট্যবিক্ষিপ্তকুণ্ডলত্বিষমণ্ডিতম্।
গণ্ডং গণ্ডে সংদধত্যাঃ প্রাদাত্তাম্বূলচর্ব্বিতম্ ॥১৩॥
নৃত্যন্তী গায়তী কাচিৎ কূজন্নূপুরমেখলা।
পার্শ্বস্থাচ্যুতহস্তাজং শ্রান্তাধাৎ স্তনয়োঃ শিবম্ ॥১৪॥

* * * *

"তাবৎকচগ্রহণব্যগ্রবাহুমেখিরিয়া:
কেশান্ দুকূলং কুচপট্টিকাং বা।
নাঞ্জঃ প্রতিব্যোঢ়ুমলং ব্রজস্ত্রিয়ো
বিস্রস্তমালাভরণাঃ কুরূদ্বহ ॥ ১৮ ॥"

এইরূপ কথা ভিন্ন বেশী আর কিছুই নাই। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকে পুরাণকার জিতেন্দ্রিয়স্বরূপ বর্ণিত করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি এবং তাহার প্রমাণও দিয়াছি।

দশম পরিচ্ছেদ

শ্রীরাধা

ভাগবতের এই রাসপঞ্চাধ্যায়ের মধ্যে 'রাধা' নাম কোথাও পাওয়া যায় না। বৈষ্ণবাচার্য্যদিগের অস্থিমজ্জার ভিতর রাধা নাম প্রবিষ্ট। তাঁহারা টীকা টিপ্পনীর ভিতর পুনঃ পুনঃ রাধাপ্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়াছেন, কিন্তু মূলে কোথাও রাধার নাম নাই। গোপীদিগের অনুরাগাধিক্যজনিত ঈর্ষ্যার প্রমাণস্বরূপ কবি লিখিয়াছেন যে, তাহারা পদচিহ্ন দেখিয়া অনুমান করিয়াছিল যে, কোন এক জন গোপীকে লইয়া কৃষ্ণ বিজনে প্রবেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাও গোপীদিগের ঈর্ষ্যাজনিত ভ্রমমাত্র। শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলেন, এই কথাই আছে, কাহাকেও লইয়া অন্তর্হিত হইলেন, এমন কথা নাই এবং রাধার নামগন্ধও নাই।

রাসপঞ্চাধ্যায়ে কেন, সমস্ত ভাগবতেও কোথাও রাধার নাম নাই। ভাগবতে কেন, বিষ্ণুপুরাণে, হরিবংশে বা মহাভারতে, কোথাও রাধার নাম নাই। অথচ এখনকার কৃষ্ণ-উপাসনার প্রধান অঙ্গ রাধা। রাধা ভিন্ন এখন কৃষ্ণনাম নাই। রাধা ভিন্ন এখন কৃষ্ণের মন্দির নাই বা মূর্ত্তি নাই। বৈষ্ণবদিগের অনেক রচনায় কৃষ্ণ অপেক্ষাও রাধা প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন। যদি মহাভারতে, হরিবংশে, বিষ্ণুপুরাণে বা ভাগবতে 'রাধা' নাই, তবে এ রাধা আসিলেন কোথা হইতে?

রাধাকে প্রথমে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে দেখিতে পাই। উইল্‌সন্ সাহেব বলেন যে, ইহা পুরাণগণের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ বলিয়াই বোধ হয়। ইহার রচনাপ্রণালী আজিকালিকার ভট্টাচার্য্যদিগের রচনার মত। ইহাতে ষষ্ঠী-মনসারও কথা আছে। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আদিম ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ বিলোপপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার প্রমাণও উদ্ধৃত করিয়াছি। যাহা এখন আছে, তাহাতে এক নূতন দেবতত্ত্ব সংস্থাপিত হইয়াছে। ইহাই পূর্ব্বাবধি প্রসিদ্ধ যে, কৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতার। ইনি বলেন, কৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতার হওয়া দূরে থাকুক, কৃষ্ণই বিষ্ণুকে সৃষ্টি করিয়াছেন। বিষ্ণু থাকেন বৈকুণ্ঠে, কৃষ্ণ থাকেন গোলোকে রাসমণ্ডলে,—বৈকুণ্ঠ তাহার অনেক নীচে। ইনি কেবল বিষ্ণুকে নহে, ব্রহ্মা, রুদ্র, লক্ষ্মী, দুর্গা প্রভৃতি সমস্ত দেবদেবী এবং জীবগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন। ইঁহার বাসস্থান গোলোকধামে বলিয়াছি। তথায় গো, গোপ ও গোপীগণ বাস করে। তাহারা দেবদেবীর উপর। সেই গোলোকধামের অধিষ্ঠাত্রী কৃষ্ণবিলাসিনী দেবীই রাধা। রাধার আগে রাসমণ্ডল, রাসমণ্ডলে ইনি রাধাকে সৃষ্টি করেন। রাসের রা এবং ধা ধাতুর ধা, ইহাতে রাধা নাম নিষ্পন্ন করিয়াছেন। * সেই গোপগোপীর বাসস্থান রাধাবিষ্ঠিত গোলোকধাম পূর্ব্বকবিদিগের বর্ণিত বৃন্দাবনের নকল জিনিষ। এখনকার কৃষ্ণযাত্রার যেমন চন্দ্রাবলী নামে রাধার প্রতিযোগিনী গোপী আছে, গোলোকধামেও সেইরূপ বিরজা নাম্নী রাধার প্রতিযোগিনী গোপী ছিল। মানভঞ্জন যাত্রার যেমন যাত্রাওয়ালারা কৃষ্ণকে চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে লইয়া যায়, ইনিও তেমনই কৃষ্ণকে গোলোকধামে বিরজার কুঞ্জে লইয়া গিয়াছেন। তাহাতে যাত্রার রাধিকার যেমন ঈর্ষ্যা ও কোপ উপস্থিত হয়, ব্রহ্মবৈবর্ত্তের রাধিকারও সেইরূপ ঈর্ষ্যা ও কোপ উপস্থিত হইয়াছিল। তাহাতে আর একটা মহা গোলযোগ ঘটিয়া যায়। রাধিকা কৃষ্ণকে বিরজার মন্দিরে ধরিবার জন্য রথে চড়িয়া বিরজার মন্দিরে গিয়া উপস্থিত। সেখানে বিরজার দ্বারবান্ ছিলেন শ্রীদাম বা শ্রীদামা। শ্রীদামা রাধিকাকে দ্বার ছাড়িয়া দিল না। এ দিকে রাধিকার ভয়ে বিরজা গলিয়া জল হইয়া নদীরূপ ধারণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে পুনর্জ্জীবন এবং পূর্ব্বরূপ প্রদান করিলেন। বিরজা গোলোকনাথের সহিত অবিরত আনন্দানুভব করিতে লাগিল। ক্রমশঃ তাহার সাতটি পুত্র জন্মিল; কিন্তু পুত্রগণ আনন্দানুভবের বিঘ্ন, এ জন্য মাতা তাহাদিগকে অভিশপ্ত করিলেন, তাঁহারা সাত সমুদ্র হইয়া রহিলেন। এ দিকে রাধা, কৃষ্ণ-বিরজাবৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া, কৃষ্ণকে অনেক ভর্ৎসনা করিলেন এবং অভিশাপ প্রদান করিলেন যে, তুমি

---

* রাসে সম্ভূয় গোলোকে, সা দধাব হরেঃ পুরঃ।
তেন রাধা সমাখ্যাতা পুরাবিদ্ভির্দ্বিজোত্তম॥
ব্রহ্মখণ্ডে ৫ অধ্যায়ঃ।

কিন্তু আবার স্থানান্তরে—

* * * রাকারো দানবাচকঃ
ধা নির্ব্বাণঞ্চ তদ্দাত্রী তেন রাধা প্রকীর্ত্তিতা।
শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ২৩ অধ্যায়ঃ।

গিয়া পৃথিবীতে বাস কর। এ দিকে কৃষ্ণকিঙ্কর শ্রীদামা রাধার এই দুর্ব্ব্যবহারে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকেও ভর্ৎসনা করিলেন। শুনিয়া রাধা শ্রীদামাকে তিরস্কার করিয়া শাপ দিলেন, তুমি গিয়া অসুর হইয়া জন্মগ্রহণ কর। শ্রীদামাও রাধাকে শাপ দিলেন, তুমিও গিয়া পৃথিবীতে মানুষী হইয়া রায়াণপত্নী (যাত্রার আয়ান ঘোষ) এবং কলঙ্কিনী হইয়া খ্যাতা হইবে।

শেষ দুই জনেই কৃষ্ণের নিকট আসিয়া কাঁদিয়া পড়িলেন। শ্রীদামাকে কৃষ্ণ বর দিয়া বলিলেন যে, তুমি অসুরেশ্বর হইবে, যুদ্ধে তোমাকে কেহ পরাভব করিতে পারিবে না। শেষে শঙ্করশূলস্পর্শে মুক্ত হইবে। রাধাকেও আশ্বাসিত করিয়া বলিলেন, 'তুমি যাও; আমিও যাইতেছি।' শেষ পৃথিবীর ভারাবতরণ জন্য তিনি পৃথিবীতে আসিয়া অবতীর্ণ হইলেন।

এ সকল কথা নূতন হইলেও এবং সর্ব্বশেষে প্রচারিত হইলেও, এই ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ বাঙ্গালার বৈষ্ণবধর্ম্মের উপর অতিশয় আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে। জয়দেবাদি বাঙ্গালী বৈষ্ণবকবিগণ, বাঙ্গালার জাতীয় সঙ্গীত, বাঙ্গালার যাত্রামহোৎসবাদির মূল ব্রহ্মবৈবর্ত্তে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তকারকথিত একটা বড় মূল কথা বাঙ্গলার বৈষ্ণবেরা গ্রহণ করেন নাই, অন্ততঃ সেটা বাঙ্গালীর বৈষ্ণবধর্ম্মে তাদৃশ পরিস্ফুট হয় নাই—রাধিকা রায়াণ-পত্নী বলিয়া পরিচিতা, কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্ত্তের মতে তিনি বিধিবিধানানুসারে কৃষ্ণের বিবাহিতা পত্নী। সেই বিবাহবৃত্তান্তটা সবিস্তারে বলিতেছি। বলিবার আগে গীতগোবিন্দের ম কবিতাটা পাঠকের স্মরণ করিয়া দিই।

"মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈ-
র্নক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাধে গৃহং প্রাপয়।
ইথং নন্দনিদেশতশ্চলিতয়োঃ প্রত্যধ্বকুঞ্জদ্রুমং
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনাকূলে রহঃকেলয়ঃ।"

অর্থ। হে রাধে! আকাশ মেঘে স্নিগ্ধ হইয়াছে, তমাল-দ্রুম সকলে বনভূমি অন্ধকার হইয়াছে, অতএব তুমিই ইহাকে গৃহে লইয়া যাও, নন্দ এইরূপ আদেশ করায়, পথিস্থ কুঞ্জদ্রুমাভিমুখে চলিত রাধামাধবের যমুনাকূলে বিজন-কেলিসকলের জয় হউক।

এ কথার অর্থ কি? টীকাকার কি অনুবাদকার কেহই বিশদ করিয়া বুঝাইতে পারেন না। এক জন অনুবাদকার বলিয়াছেন, "গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোকটি কিছু অস্পষ্ট; কবি নায়ক-নায়িকার কোন্ অবস্থা মনে করিয়া লিখিয়াছেন, ঠিক বলা যায় না। টীকাকারের মত ইহা রাধিকাসখীর উক্তি। তাহাতে ভাব এক প্রকার মধুর হয় বটে, কিন্তু শব্দার্থের কিছু অসঙ্গতি ঘটে।" বস্তুতঃ ইহা রাধিকাসখীর উক্তি নহে; জয়দেব গোস্বামী ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-লিখিত এই বিবাহের সূচনা স্মরণ করিয়াই এ শ্লোকটি রচনা করিয়াছেন। এক্ষণে আমি ঠিক এই কথাই ব্রহ্মবৈবর্ত্ত হইতে উদ্ধৃত করিতেছি; তবে বক্তব্য এই যে, রাধা শ্রীদামশাপানুসারে শ্রীকৃষ্ণের কয় বৎসর আগে পৃথিবীতে আসিতে বাধ্য হইয়াছিলেন বলিয়া রাধিকা কৃষ্ণের অপেক্ষা অনেক বড় ছিলেন। তিনি যখন যুবতী, শ্রীকৃষ্ণ তখন শিশু।

"একদা কৃষ্ণসহিতো নন্দো বৃন্দাবনং যযৌ।
তত্রোপবনভাণ্ডীরে চারয়ামাস গোকুলম্ ॥ ১ ॥
সরঃসু স্বাদুতোয়ঞ্চ পায়য়ামাস তৎ পপৌ।
উবাস বটমূলে চ বালং কৃত্বা স্ববক্ষসি ॥ ২ ॥
এতস্মিন্নন্তরে কৃষ্ণো মায়াবালকবিগ্রহঃ।
চকার মায়য়াকস্মান্মেঘাচ্ছন্নং নভো মুনে ॥ ৩ ॥
মেঘাবৃতং নভো দৃষ্ট্বা শ্যামলং কাননান্তরম্।
ঝঞ্ঝাবাতং মেঘশব্দং বজ্রশব্দঞ্চ দারুণম্ ॥ ৪ ॥
বৃষ্টিধারামতিস্থূলাং কম্পমানাংশ্চ পাদপান্।
দৃষ্ট্বৈবং পতিতস্কন্ধান্ নন্দো ভয়মবাপ হ ॥ ৫ ॥
কথং যাস্যামি গোবৎসং বিহায় স্বাশ্রমং প্রতি।
গৃহং যদি ন যাস্যামি ভবিতা বালকস্য কিম্ ॥ ৬ ॥
এবং নন্দে প্রবদতি রুরোদ শ্রীহরিস্তদা।
মায়াভিয়া ভয়েভ্যশ্চ পিতুঃ কণ্ঠং দধার সঃ ॥ ৭ ॥
এতস্মিন্নন্তরে রাধা জগাম কৃষ্ণসন্নিধিম্।"
ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণম্, শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ১৫ অধ্যায়ঃ।

অর্থ। "একদা কৃষ্ণসহিত নন্দ বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন। তথাকার ভাণ্ডীরবনে গোগণকে চরাইতেছিলেন। সরোবরে স্বাদুজল তাহাদিগকে পান করাইলেন এবং পান করিলেন; এবং বালককে বক্ষে লইয়া বটমূলে বসিলেন। হে মুনে! তার পর মায়াতে শিশুশরীরধারণকারী কৃষ্ণ অকস্মাৎ মায়ার দ্বারা আকাশ মেঘাচ্ছন্ন করিলেন। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন এবং কাননান্তর শ্যামল; ঝঞ্ঝাবাত, মেঘশব্দ, দারুণ বজ্রশব্দ, অতিস্থূল বৃষ্টিধারা, এবং বৃক্ষ সকল কম্পমান হইয়া পতিতস্কন্ধ হইতেছে, দেখিয়া নন্দ ভয় পাইলেন। 'গোবৎস ছাড়িয়া কিরূপেই বা আশ্রমে যাই? যদি গৃহে না যাই, তবে এই বালকেরই বা কি হইবে' নন্দ এইরূপ বলিতেছেন, শ্রীহরি তখন কাঁদিতে লাগিলেন; মহাভয়ে ভীতিযুক্ত হইয়া বাপের কণ্ঠ ধারণ করিলেন। এই সময়ে রাধা কৃষ্ণের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন।"

রাধার অপূর্ব্ব লাবণ্য দেখিয়া নন্দ বিস্মিত হইলেন, তিনি রাধাকে বলিলেন, "আমি গর্গমুখে জানিয়াছি, তুমি পদ্মার অধিক হরির প্রিয়া; আর ইনি পরম নির্গুণ

অচ্যুত মহাবিষ্ণু; তথাপি আমি মানব, বিষ্ণুমায়ায় মোহিত আছি। হে ভদ্রে! তোমার প্রাণনাথকে গ্রহণ কর; যথায় সুখী হও যাও, পশ্চাৎ মনোরথ পূর্ণ করিয়া আমার পুত্র আমাকে দিও।"

এই বলিয়া নন্দ রাধাকে কৃষ্ণ সমর্পণ করিলেন। রাধাও কৃষ্ণকে কোলে করিয়া লইয়া গেলেন। দূরে গেলে রাধা রাসমণ্ডল স্মরণ করিলেন; তখন মনোহর বিহারভূমি সৃষ্ট হইল। কৃষ্ণ সেইখানে নীত হইলে কিশোরমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। তিনি রাধাকে বলিলেন, "যদি গোলোকের কথা স্মরণ হয়, তবে যাহা স্বীকার করিয়াছি, তাহা পূর্ণ করিব।" তাঁহারা এইরূপ প্রেমালাপে নিযুক্ত ছিলেন, এমন সময়ে ব্রহ্মা সেখানে উপস্থিত হইলেন। তিনি রাধাকে অনেক স্তবস্তুতি করিলেন। পরিশেষে নিজে কন্যাকর্ত্তা হইয়া, যথাবিহিত বেদবিধি অনুসারে রাধিকাকে কৃষ্ণে সম্প্রদান করিলেন। তাঁহাদিগকে বিবাহবন্ধনে বদ্ধ করিয়া তিনি অন্তর্হিত হইলেন। রায়াণের সঙ্গে রাধিকার যথাশাস্ত্র বিবাহ হইয়াছিল কি না, যদি হইয়া থাকে, তবে পূর্ব্বে কি পরে হইয়াছিল, তাহা ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে পাইলাম না। রাধাকৃষ্ণের বিবাহের পর বিহারবর্ণন। বলা বাহুল্য যে, ব্রহ্মবৈবর্ত্তের রাসলীলাও ঐরূপ।

যাহা হউক, পাঠক দেখিবেন যে, ব্রহ্মবৈবর্ত্তকার সম্পূর্ণ নূতন বৈষ্ণবধর্ম্ম সৃষ্ট করিয়াছেন। সে বৈষ্ণবধর্ম্মের নামগন্ধমাত্র বিষ্ণু বা ভাগবত বা অন্য পুরাণে নাই। রাধাই এই নূতন বৈষ্ণবধর্ম্মের কেন্দ্রস্বরূপ। জয়দেব কবি, গীতগোবিন্দ কাব্যে এই নূতন বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বন করিয়াই, গোবিন্দগীতি রচনা করিয়াছেন। তাঁহার দৃষ্টান্তানুসারে বিদ্যাপতি চণ্ডিদাস প্রভৃতি বাঙ্গালার বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণসঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। এই ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াই শ্রীচৈতন্যদেব কান্তরসাশ্রিত অভিনব ভক্তিবাদ প্রচার করিয়াছেন। বলিতে গেলে, সকল কবি, সকল ঋষি, সকল পুরাণ, সকল শাস্ত্রের অপেক্ষা ব্রহ্মবৈবর্ত্তকারই বাঙ্গালীর জীবনের উপর অধিকতর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন। এখন দেখা যাউক, এই নূতন ধর্ম্মের তাৎপর্য্য কি এবং কোথা হইতে ইহা উৎপন্ন হইল।

ভারতবর্ষে যে সকল দর্শনশাস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহার মধ্যে ছয়টি দর্শনের প্রাধান্য সচরাচর স্বীকৃত হয়। কিন্তু ছয়টির মধ্যে দুইটির প্রাধান্য বেশী—বেদান্তের ও সাংখ্যের। সচরাচর ব্যাসপ্রণীত ব্রহ্মসূত্রে বেদান্তদর্শনের সৃষ্টি বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। বস্তুতঃ বেদান্তদর্শনের আদি ব্রহ্মসূত্রে নহে, উপনিষদে। উপনিষদ্‌কেও বেদান্ত বলে। উপনিষদুক্ত ব্রহ্মতত্ত্ব, সংক্ষেপতঃ ঈশ্বর ভিন্ন কিছুই নাই। এই জগৎ ও জীবগণ ঈশ্বরেরই অংশ। তিনি এক ছিলেন, সিসৃক্ষাপ্রযুক্ত বহু হইয়াছেন। তিনি পরমাত্মা। জীবাত্মা সেই পরমাত্মার অংশ; ঈশ্বরের মায়া হইতেই জীবাত্মতা প্রাপ্ত এবং সে মায়া হইতে মুক্ত হইলেই আবার ঈশ্বরে বিলীন হইবে। ইহা অদ্বৈতবাদে পরিপূর্ণ।

প্রাথমিক বৈষ্ণবধর্ম্মের ভিত্তি এই বৈদান্তিক ঈশ্বরবাদের উপর নির্ম্মিত। বিষ্ণু এবং বিষ্ণুর অবতার কৃষ্ণ, বৈদান্তিক ঈশ্বর। বিষ্ণুপুরাণে এবং ভাগবতে এবং তাদৃশ অন্যান্য গ্রন্থে যে সকল বিষ্ণুস্তোত্র বা কৃষ্ণস্তোত্র আছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে বা অসম্পূর্ণরূপে অদ্বৈতবাদাত্মক। কিন্তু এ বিষয়ের প্রধান উদাহরণ শান্তিপর্ব্বের ভীষ্মকৃত কৃষ্ণস্তোত্র।

কিন্তু অদ্বৈতবাদ এবং দ্বৈতবাদও অনেক রকম হইতে পারে। আধুনিক সময়ে শঙ্করাচার্য্য, রামানুজাচার্য্য, মধ্বাচার্য্য এবং বল্লভাচার্য্য—এই চারি জনে অদ্বৈতবাদের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা করিয়া অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ এবং বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদ—এই চারি প্রকার মত প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু প্রাচীনকালে এত ছিল না। প্রাচীনকালে ঈশ্বর এবং ঈশ্বরস্থিত জগতের সম্বন্ধ বিষয়ে দুই রকম ব্যাখ্যা দেখা যায়। প্রথম এই যে, ঈশ্বর ভিন্ন আর কিছুই নাই। ঈশ্বরই জগৎ, তদ্ভিন্ন জাগতিক কোন পদার্থ নাই। আর এক মত এই যে, জগৎ ঈশ্বর বা ঈশ্বর জগৎ নহেন, কিন্তু ঈশ্বরে জগৎ আছে—"সূত্রে মণিগণা ইব।" ঈশ্বরও জাগতিক সর্ব্বপদার্থে আছেন, কিন্তু ঈশ্বর তদতিরিক্ত। প্রাচীন বৈষ্ণবধর্ম্ম এই দ্বিতীয় মতেরই উপর নির্ভর করে।

দ্বিতীয় প্রধান দর্শনশাস্ত্র সাংখ্য। কপিলের সাংখ্য ঈশ্বরই স্বীকার করে না। কিন্তু পরবর্ত্তী সাংখ্যেরা ঈশ্বর স্বীকার করিয়াছেন। সাংখ্যের মূলকথা এই, জড়জগৎ বা জড়জগন্ময়ী শক্তি পরমাত্মা হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্। পরমাত্মা বা পুরুষ সম্পূর্ণরূপে নিঃসঙ্গ; তিনি কিছুই করেন না, এবং জগতের সঙ্গে তাঁর কোন সম্বন্ধ নাই। জড়জগৎ এবং জড়জগন্ময়ী শক্তিকে ইঁহারা 'প্রকৃতি' নাম দিয়াছেন। এই প্রকৃতিই সর্ব্বসৃষ্টিকারিণী, সর্ব্বপালিনী, সর্ব্বসংহারিণী এবং সর্ব্বসংহারিণী। এই প্রকৃতিপুরুষতত্ত্ব হইতে প্রকৃতিপ্রধান তান্ত্রিক ধর্ম্মের উৎপত্তি। এই তান্ত্রিকধর্ম্মে, প্রকৃতিপুরুষের একত্ব অথবা অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সম্পাদিত হওয়াতে প্রকৃতিপ্রধান বলিয়া এই ধর্ম্ম লোকরঞ্জন হইয়াছিল। যাহারা বৈষ্ণবদিগের অদ্বৈতবাদে অসন্তুষ্ট, তাহারা তান্ত্রিকধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। সেই তান্ত্রিকধর্ম্মের সাহায্যে এই বৈষ্ণব-

ধর্ম্মে সংস্কার করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মকে পুনরুজ্জ্বল করিবার জন্য ব্রহ্মবৈবর্ত্তকার এই অভিনব বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন অথবা বৈষ্ণবধর্ম্মের পুনঃ সংস্কার করিয়াছেন। তাঁহার সৃষ্টা রাধা সেই সাংখ্যদিগের মূলপ্রকৃতিস্থানীয়া। যদিও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের ব্রহ্মখণ্ডে আছে যে, কৃষ্ণ মূলপ্রকৃতিকে সৃষ্টি করিয়া, তার পর রাধাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তথাপি শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে দেখা যায় যে, কৃষ্ণ স্বয়ংই রাধাকে পুনঃ পুনঃ মূলপ্রকৃতি বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন। যথা—

"মমার্দ্ধাংশস্বরূপা ত্বং মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী ॥"
শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ১৫ অধ্যায়ঃ, ৬৭ শ্লোকঃ।

পরমাত্মার সঙ্গে প্রকৃতির বা কৃষ্ণের সঙ্গে রাধার কি সম্বন্ধ, তাহা পুরাণকার এইরূপে বুঝাইতেছেন। ইহা কৃষ্ণোক্তি।

"যথা ত্বঞ্চ তথাহঞ্চ ভেদো হি নাবয়োর্ধ্রুবম্ ॥৫৭॥
যথা ক্ষীরে চ ধাবল্যং যথাগ্নৌ দাহিকা সতি।
যথা পৃথিব্যাং গন্ধশ্চ তথাহং ত্বয়ি সন্ততম্ ॥ ৫৮ ॥
বিনা মৃদা ঘটং কর্ত্তুং বিনা স্বর্ণেন কুণ্ডলম্।
কুলালঃ স্বর্ণকারশ্চ ন হি শক্তঃ কদাচন ॥ ৫৯ ॥
তথা ত্বয়া বিনা সৃষ্টিং ন চ কর্ত্তুমহং ক্ষমঃ।
সৃষ্টেরাধারভূতা ত্বং বীজরূপোঽহমচ্যুতঃ ॥ ৬০ ॥

* * *

কৃষ্ণং বদন্তি মাং লোকাস্ত্বয়ৈব রহিতং যদা ॥
শ্রীকৃষ্ণঞ্চ তদা তে হি ত্বয়ৈব সহিতং পরম্ ॥ ৬২ ॥
ত্বঞ্চ শ্রীশ্চ সম্পত্তিস্ত্বমাধারস্বরূপিণী।
সর্ব্বশক্তিস্বরূপাসি সর্ব্বেষাঞ্চ মমাপি চ ॥ ৬৩ ॥
ত্বং স্ত্রী পুমানহং রাধে নেতি বেদেষু নির্ণয়ঃ।
ত্বঞ্চ সর্ব্বস্বরূপাসি সর্ব্বরূপোঽহমক্ষরে ॥ ৬৪ ॥
যদা তেজস্বরূপোঽহং তেজোরূপাসি ত্বং তদা।
ন শরীরী যদাহঞ্চ তদা ত্বমশরীরিণী ॥ ৬৫ ॥
সর্ব্ববীজস্বরূপোঽহং যদা যোগেন সুন্দরি।
ত্বঞ্চ শক্তিস্বরূপাসি সর্ব্বস্ত্রীরূপধারিণী ॥ ৬৬ ॥
শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ১৫ অধ্যায়ঃ।

"তুমি যেখানে, আমিও সেখানে, আমাদিগের মধ্যে কিঞ্চিত কোন ভেদ নাই। দুগ্ধে যেমন ধবলতা, অগ্নিতে যেমন দাহিকা, পৃথিবীতে যেমন গন্ধ, তেমনই আমি তোমাতে সর্ব্বদাই আছি। কুম্ভকার বিনা মৃত্তিকায় ঘট করিতে পারে না, স্বর্ণকার স্বর্ণ বিনা কুণ্ডল গড়িতে পারে না, তেমনি আমিও তোমা ব্যতীত সৃষ্টি করিতে পারি না। তুমি সৃষ্টির আধারভূতা, আমি অচ্যুত-বীজরূপী। আমি যখন তোমা ব্যতীত থাকি, তখন লোকে আমাকে কৃষ্ণ বলে। তোমার সহিত থাকিলে শ্রীকৃষ্ণ বলে। তুমি শ্রী, তুমি সম্পত্তি, তুমি আধাররূপিণী, সকলের এবং আমার সর্ব্বশক্তিস্বরূপা। হে রাধে! তুমি স্ত্রী, আমি পুরুষ, বেদও ইহা নির্ণয় করিতে পারে না। হে অক্ষরে! তুমি সর্ব্বস্বরূপা, আমি সর্ব্বরূপ। আমি যখন তেজঃস্বরূপ, তুমি তখন তেজোরূপা। আমি যখন শরীরী নই, তখন তুমিও অশরীরিণী। হে সুন্দরি! আমি যখন যোগ দ্বারা সর্ব্ববীজস্বরূপ হই, তখন তুমি শক্তিস্বরূপা সর্ব্বস্ত্রীরূপ-ধারিণী হও।"

পুনশ্চ,

"যথাহঞ্চ তথা ত্বঞ্চ যথা ধাবল্যদুগ্ধয়োঃ।
ভেদঃ কদাপি ন ভবেন্নিশ্চিতঞ্চ তথাবয়োঃ ॥ ৫৬ ॥

* * * *

ত্বৎকলাংশাংশকলয়া বিশ্বেষু সর্ব্বযোষিতঃ।
যা যোষিৎ সা চ ভবতী যঃ পুমান্ সোঽহমেব চ ॥৬৮॥
অহঞ্চ কলয়া বহ্নিস্ত্বং স্বাহা দাহিকা ক্রিয়া।
ত্বয়া সহ সমর্থোঽহং নালং দগ্ধুঞ্চ ত্বাং বিনা ॥৬৯॥
অহং দীপ্তিমতাং সূর্য্যঃ কলয়া ত্বং প্রভাত্মিকা।
সঙ্গতশ্চ ত্বয়া ভাসে ত্বাং বিনাহং ন দীপ্তিমান্ ॥৭০॥
অহঞ্চ কলয়া চন্দ্রস্ত্বঞ্চ শোভা চ রোহিণী।
মনোহরস্ত্বয়া সার্দ্ধং ত্বাং বিনা চ ন সুন্দরি! ॥৭১॥
অহমিন্দ্রশ্চ কলয়া স্বর্গলক্ষ্মীশ্চ ত্বং সতী।
ত্বয়া সার্দ্ধং দেবরাজো হতশ্রীশ্চ ত্বয়া বিনা ॥৭২॥
অহং ধর্ম্মশ্চ কলয়া ত্বঞ্চ মূর্ত্তিশ্চ ধর্ম্মিণী।
নাহং শক্তো ধর্ম্মকৃত্যে ত্বাঞ্চ ধর্ম্মক্রিয়াং বিনা ॥৭৩॥
অহং যজ্ঞশ্চ কলয়া ত্বঞ্চ স্বাংশেন দক্ষিণা।
ত্বয়া সার্দ্ধঞ্চ ফলদোঽপ্যসমর্থস্ত্বয়া বিনা ॥ ৭৪ ॥
কলয়া পিতৃলোকোঽহং স্বাংশেন ত্বং স্বধা সতী।
ত্বয়ালং কব্যদানে চ সদা নালং ত্বয়া বিনা ॥ ৭৫ ॥
ত্বঞ্চ সম্পৎস্বরূপাহমীশ্বরশ্চ ত্বয়া সহ।
লক্ষ্মীযুক্তস্ত্বয়া লক্ষ্ম্যা নিঃশ্রীকশ্চাপি ত্বাং বিনা ॥৭৬॥
অহং পুমাংস্ত্বং প্রকৃতির্ন স্রষ্টাহং ত্বয়া বিনা।
যথা নালং কুলালশ্চ ঘটং কর্ত্তুং মৃদা বিনা ॥৭৭॥
অহং শেষশ্চ কলয়া স্বাংশেন ত্বং বসুন্ধরা।
ত্বাং শস্যরত্নাধারাঞ্চ বিভর্মি মূর্দ্ধ্নি সুন্দরি ॥ ৭৮ ॥
ত্বঞ্চ শান্তিশ্চ কান্তিশ্চ মূর্ত্তির্মূর্ত্তিমতী সতি।
তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষমা লজ্জা ক্ষুধা তৃষ্ণা চ পরা দয়া ॥ ৭৯ ॥
নিদ্রা শুদ্ধা চ তন্দ্রা চ মূর্চ্ছা চ সন্নতিঃ ক্রিয়া।
মূর্ত্তিরূপা ভক্তিরূপা দেহিনাং দেহরূপিণী ॥ ৮০ ॥
মমাধারা সদা ত্বঞ্চ তবাধারোঽহং পরস্পরম্।

যথা ত্বঞ্চ তথাহঞ্চ সমৌ প্রকৃতিপুরুষৌ।
ন হি সৃষ্টির্ভবেদ্দেবি দ্বয়োরেকতরং বিনা॥ ৮১॥"

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ৬৭ অধ্যায়ঃ।*

"যেমন দুগ্ধে ধবলতা, তেমনই যেখানে আমি, সেইখানেই তুমি। তোমাতে আমাতে কখনও ভেদ হইবে না, ইহা নিশ্চিত। এই বিশ্বের সমস্ত স্ত্রী তোমার কলাংশের অংশকলা; যাহাই স্ত্রী, তাহাই তুমি; যাহাই পুরুষ, তাহাই আমি। কলা দ্বারা আমি বহ্নি, তুমি প্রিয়া দাহিকা স্বাহা; তুমি সঙ্গে থাকিলে, আমি দগ্ধ করিতে সমর্থ হই, তুমি না থাকিলে হই না। আমি দীপ্তিমান্‌দিগের মধ্যে সূর্য্য, তুমি কলাংশে প্রভা; তুমি সঙ্গে থাকিলে আমি দীপ্তিমান্ হই, তুমি না থাকিলে হই না। কলা দ্বারা আমি চন্দ্র, তুমি শোভা ও রোহিণী; তুমি সঙ্গে থাকিলে আমি মনোহর, হে সুন্দরি! তুমি না থাকিলে নই। হে সতি! আমি কলা দ্বারা ইন্দ্র, তুমি স্বর্গলক্ষ্মী; তুমি সঙ্গে থাকিলে আমি দেবরাজ, না থাকিলে আমি হতশ্রী। আমি কলা দ্বারা ধর্ম্ম, তুমি ধর্ম্মিণী মূর্ত্তি; ধর্ম্মক্রিয়ার স্বরূপা তুমি ব্যতীত আমি ধর্ম্মকার্য্যে ক্ষমবান্ হই না। কলা দ্বারা আমি যজ্ঞ, তুমি আপনার অংশে দক্ষিণা; তুমি সঙ্গে থাকিলে আমি ফলদ হই, তুমি না থাকিলে তাহাতে অসমর্থ। কলা দ্বারা আমি পিতৃলোক, হে সতি! তুমি আপনার অংশে স্বধা; তোমা ব্যতীত পিণ্ডদান বৃথা। তুমি সম্পৎস্বরূপা, তুমি সঙ্গে থাকিলেই আমি প্রভু; তুমি লক্ষ্মী, তোমার সহিত আমি লক্ষ্মীযুক্ত, তুমি ব্যতীত নিঃশ্রীক। আমি পুরুষ, তুমি প্রকৃতি; তোমা ব্যতীত আমি স্রষ্টা নহি; মৃত্তিকা ব্যতীত কুম্ভকার যেমন ঘট করিতে পারে না, তোমা ব্যতীত আমি তেমনই সৃষ্টি করিতে পারি না। আমি কলা দ্বারা শেষ, তুমি আপনার অংশে বসুন্ধরা; হে সুন্দরি! শস্যরত্নাধার স্বরূপ তোমাকে আমি মস্তকে বহন করি। হে সতি! তুমি শান্তি, কান্তি, মূর্ত্তি, মূর্ত্তিমতী, তুষ্টি, পুষ্টি, ক্ষমা, লজ্জা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা এবং তুমি পরা, দয়া, শ্রদ্ধা, নিদ্রা, তন্দ্রা, মূর্চ্ছা, সন্নতি, ক্রিয়া, মূর্ত্তিরূপা, ভক্তিরূপা এবং জীবের দুঃখরূপিণী। তুমি সদাই আমার আধার, আমি তোমার আত্মা; যেখানে তুমি, সেইখানে আমি, তুল্য প্রকৃতি পুরুষ, হে দেবি! দুইয়ের একের অভাবে সৃষ্টি হয় না।"

এইরূপ আরও অনেক কথা উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। ইহাতে যাহা পাই, তাহা ঠিক সাংখ্যের প্রকৃতিবাদ নহে। সাংখ্যের প্রকৃতি তন্ত্রে শক্তিতে পরিণত হইয়াছিল। প্রকৃতিবাদ এবং শক্তিবাদে প্রভেদ এই যে, প্রকৃতি পুরুষ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রকৃতির সঙ্গে পুরুষের সম্বন্ধ, সাংখ্যপ্রবচনকার স্ফাটিকপাত্রে জবাপুষ্পের ছায়ার উপমা দ্বারা বুঝাইয়াছেন। স্ফাটিকপাত্র এবং জবাপুষ্প পরস্পর হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক; তবে পুষ্পের ছায়া স্ফাটিকে পড়ে, এই পর্য্যন্ত ঘনিষ্ঠতা। কিন্তু শক্তির সঙ্গে আত্মার সম্বন্ধ এই যে, আত্মাই শক্তির আধার। যেমন আধার হইতে আধেয় ভিন্ন হইয়া থাকিতে পারে না, তেমনই আত্মা ও শক্তিতে পার্থক্য নাই। এই শক্তিবাদ যে কেবল তন্ত্রেই আছে, এমত নহে। বৈষ্ণব পৌরাণিকেরাও সাংখ্যের প্রকৃতিকে বৈষ্ণবী শক্তিতে পরিণত করিয়াছেন। বুঝাইবার জন্য বিষ্ণুপুরাণ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি:—

"নিত্যৈব সা জগন্মাতা বিষ্ণোঃ শ্রীরনপায়িনী।
যথা সর্ব্বগতো বিষ্ণুস্তথৈবেয়ং দ্বিজোত্তম!॥ ১৫॥
অর্থো বিষ্ণুরিয়ং বাণী নীতিরেষা নয়ো হরিঃ।
বোধো বিষ্ণুরিয়ং বুদ্ধির্ধর্ম্মোঽসৌ সৎক্রিয়া ত্বিয়ম্॥ ১৬॥
স্রষ্টা বিষ্ণুরিয়ং সৃষ্টিঃ শ্রীর্ভূমির্ভূধরো হরিঃ।
সন্তোষো ভগবান্ লক্ষ্মীস্তুষ্টির্মৈত্রেয়! শাশ্বতী॥ ১৭॥
ইচ্ছা শ্রীর্ভগবান্ কামো যজ্ঞোঽসৌ দক্ষিণা তু সা।
আজ্যাহুতিরসৌ দেবী পুরোডাশো জনার্দ্দনঃ॥ ১৮॥
পত্নীশালা মুনে! লক্ষ্মীঃ প্রাগ্বংশো মধুসূদনঃ।
চিতির্লক্ষ্মীর্হরির্যূপ ইধ্মা শ্রীর্ভগবান্ কুশঃ॥ ১৯॥
সামস্বরূপো ভগবান্ উদ্গীতিঃ কমলালয়া।
স্বাহা লক্ষ্মীর্জগন্নাথো বাসুদেবো হুতাশনঃ॥ ২০॥
শঙ্করো ভগবান্ শৌরির্ভূতির্গৌরী দ্বিজোত্তম!।
মৈত্রেয়! কেশবঃ সূর্য্যস্তৎপ্রভা কমলালয়া॥ ২১॥
বিষ্ণুঃ পিতৃগণঃ পদ্মা স্বধা শাশ্বততুষ্টিদা।
দ্যৌঃ শ্রীঃ সর্ব্বাত্মকো বিষ্ণুরবকাশোঽতিবিস্তরঃ॥ ২২॥
শশাঙ্কঃ শ্রীধরঃ কান্তিঃ শ্রীস্তস্যৈবানপায়িনী।
ধৃতির্লক্ষ্মীর্জগচ্চেষ্টা বায়ুঃ সর্ব্বত্রগো হরিঃ॥ ২৩॥
জলধির্দ্বিজ! গোবিন্দস্তদ্বেলা শ্রীর্মহামতে!।
লক্ষ্মীস্বরূপমিন্দ্রাণী দেবেন্দ্রো মধুসূদনঃ॥ ২৪॥
যমশ্চক্রধরঃ সাক্ষাদ্ ধূমোর্ণা কমলালয়া।
ঋদ্ধিঃ শ্রীঃ শ্রীধরো দেবঃ স্বয়মেব ধনেশ্বরঃ॥ ২৫॥
গৌরী লক্ষ্মীর্মহাভাগা কেশবো বরুণঃ স্বয়ম্।
শ্রীর্দেবসেনা বিপ্রেন্দ্র! দেবসেনাপতির্হরিঃ॥ ২৬॥
অবষ্টম্ভো গদাপাণিঃ শক্তির্লক্ষ্মীর্দ্বিজোত্তম!।
কাষ্ঠা লক্ষ্মীর্নিমেষোঽসৌ মুহূর্ত্তোঽসৌ কলা তু সা॥২৭॥

* বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত সংস্করণ হইতে ইহা উদ্ধৃত করা গেল। মূলে কিছু গোলযোগ আছে বোধ হয়।

জ্যোৎস্না লক্ষ্মীঃ প্রদীপোঽসৌ সর্ব্বঃ সর্ব্বেশ্বরো হরিঃ।
লতাভূতা জগন্মাতা শ্রীর্বিষ্ণুর্দ্রুমসংস্থিতিঃ ॥ ২৮ ॥
বিভাবরী শ্রীর্দিবসো দেবশ্চক্রগদাধরঃ।
বরপ্রদো বরো বিষ্ণুর্ব্বধূঃ পদ্মবনালয়া ॥ ২৯ ॥
নদস্বরূপো ভগবান্ শ্রীর্নদীরূপসংস্থিতিঃ।
ধ্বজশ্চ পুণ্ডরীকাক্ষঃ পতাকা কমলালয়া ॥ ৩০ ॥
তৃষ্ণা লক্ষ্মীর্জ্জগৎস্বামী লোভো নারায়ণঃ পরঃ।
রতিরাগৌ চ ধর্ম্মজ্ঞ। লক্ষ্মীর্গোবিন্দ এব চ ॥ ৩১ ॥
কিঞ্চাতিবহুনোক্তেন সংক্ষেপেনেদমুচ্যতে।
দেবতির্য্যঙ্মনুষ্যাদৌ পুংনাম্নি ভগবান হরিঃ।
স্ত্রীনাম্নি লক্ষ্মীর্মৈত্রেয়। নানয়োর্বিদ্যতে পরম্ ॥৩২॥

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রথমেঽংশে অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

"বিষ্ণুর শ্রী সেই জগন্মাতা অক্ষয় এবং নিত্য। হে দ্বিজোত্তম। বিষ্ণু সর্ব্বগত, ইনিও সেইরূপ। ইনি বাক্য, বিষ্ণু অর্থ; ইনি নীতি, হরি নয়; ইনি বুদ্ধি, বিষ্ণু বোধ; তিনি ধর্ম্ম, ইনি সংক্রিয়া; বিষ্ণু স্রষ্টা, ইনি সৃষ্টি; শ্রী ভূমি, হরি ভূধর; ভগবান্ সন্তোষ, হে মৈত্রেয়। লক্ষ্মী শাশ্বতী তুষ্টি; শ্রী ইচ্ছা, ভগবান্ কাম; তিনি যজ্ঞ, ইনি দক্ষিণা; জনার্দ্দন পুরোডাশ, দেবী আজ্যাহুতি। হে মুনে। লক্ষ্মী পত্নীশালা, মধুসূদন প্রাগ্বংশ; হরি যূপ, লক্ষ্মী চিতি; ভগবান্ কুশ, শ্রী ইধ্যা; ভগবান্ সাম, কমলালয়া উদ্গীতি; লক্ষ্মী স্বাহা, জগন্নাথ বাসুদেব অগ্নি; ভগবান্ শৌরি শঙ্কর, হে দ্বিজোত্তম। লক্ষ্মী গৌরী; হে মৈত্রেয়। কেশব সূর্য্য, কমলালয়া তাঁহার প্রভা; বিষ্ণু পিতৃগণ, পদ্মা নিত্যতুষ্টিদা স্বধা; শ্রী স্বর্গ, সর্ব্বাত্মক বিষ্ণু অতিবিস্তৃত আকাশ স্বরূপ; শ্রীধর চন্দ্র, শ্রী তাঁহার অক্ষয় কান্তি, লক্ষ্মী জগচ্চেষ্টা ধৃতি. বিষ্ণু সর্ব্বত্রগ বায়ু; হে দ্বিজ। গোবিন্দ জলধি, হে মহামতে। শ্রী তাঁহার বেলা; লক্ষ্মী ইন্দ্রাণী-স্বরূপা, মধুসূদন দেবেন্দ্র; চক্রধর সাক্ষাৎ যম, কমলালয়া ধূমোর্ণা; শ্রী ঋদ্ধি, শ্রীধর স্বয়ং দেব ধনেশ্বর; কেশব স্বয়ং বরুণ, মহাভাগা লক্ষ্মী গৌরী; হে বিপ্রেন্দ্র। শ্রী দেবসেনা, হরি দেবসেনাপতি, গদাধর পুরুষকার, হে দ্বিজোত্তম। লক্ষ্মী শক্তি; লক্ষ্মী কাষ্ঠা, ইনি নিমেষ; ইনি মুহূর্ত্ত, তিনি কলা; লক্ষ্মী আলোক, সর্ব্বেশ্বর হরি সর্ব্বপ্রদীপ; জগন্মাতা শ্রী লতাভূতা, বিষ্ণু দ্রুমরূপে সংস্থিত; শ্রী বিভাবরী, দেব চক্রগদাধর দিবস। বিষ্ণু বরপ্রদ বর, পদ্মবনালয়া বধূ; ভগবান্ নদ স্বরূপ, শ্রী নদীরূপা; পুণ্ডরীকাক্ষ ধ্বজ, কমলালয়া পতাকা; লক্ষ্মী তৃষ্ণা, জগৎস্বামী নারায়ণ পরম লোভ; হে ধর্ম্মজ্ঞ। লক্ষ্মী রতি, গোবিন্দ রাগ। অধিক উক্তির প্রয়োজন নাই, সংক্ষেপে বলিতেছি, দেবতির্য্যঙ্মনুষ্যাদিতে পুংনামবিশিষ্ট হরি, এবং স্ত্রীনামবিশিষ্টা লক্ষ্মী। হে মৈত্রেয়। এই দুই ভিন্ন আর কিছুই নাই।"

বেদান্তের যাহা মায়াবাদ, সাংখ্যে তাহা প্রকৃতিবাদ। প্রকৃতি হইতে শক্তিবাদ। এই কয়টি শ্লোকে শক্তিবাদ এবং অদ্বৈতবাদ মিলিত হইল। বোধ হয়, ইহাই স্মরণ রাখিয়া ব্রহ্মবৈবর্ত্তকার লিখিয়াছেন যে, কৃষ্ণ রাধাকে বলিতেছেন যে, তুমি না থাকিলে, আমি কৃষ্ণ এবং তুমি থাকিলে আমি শ্রীকৃষ্ণ। বিষ্ণুপুরাণকথিত এই শ্রী লইয়াই তিনি শ্রীকৃষ্ণ। পাঠক দেখিবেন, বিষ্ণুপুরাণে যাহা শ্রী সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে, ব্রহ্মবৈবর্ত্তে রাধা সম্বন্ধে ঠিক তাহাই কথিত হইয়াছে। রাধা সেই শ্রী। পরিচ্ছেদের উপর আমি শিরোনাম দিয়াছি, "শ্রীরাধা।" রাধা ঈশ্বরের শক্তি, উভয়ের বিধিসম্পাদিত পরিণয়, শক্তিমানের শক্তির স্ফূর্ত্তি; এবং শক্তিরই বিকাশ উভয়ের বিহার।

যে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ এক্ষণে বিদ্যমান আছে, তৎকথিত "রাধাতত্ত্ব" কি, তাহা বোধ করি, এতক্ষণে পাঠককে বুঝাইতে পারিলাম। কিন্তু আদিম ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে "রাধাতত্ত্ব" ছিল কি? বোধ হয় ছিল; কিন্তু এ প্রকার নহে। বর্ত্তমান ব্রহ্মবৈবর্ত্তে রাধা শব্দের ব্যুৎপত্তি অনেক প্রকার দেওয়া হইয়াছে। তাহার দুইটি পূর্ব্বে ফুটনোটে উদ্ধৃত করিয়াছি, আর একটি উদ্ধৃত করিতেছি:—

"রেফো হি কোটিজন্মাঘং কর্ম্মভোগং শুভাশুভম্।
আকারো গর্ভবাসঞ্চ মৃত্যুঞ্চ রোগমুৎসৃজেৎ ॥ ১০৬ ॥
ধকারো আয়ুষো হানিমাকারো ভববন্ধনম্।
শ্রবণস্মরণোক্তিভ্যঃ প্রণশ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ১০৭ ॥
রাকারো নিশ্চলাং ভক্তিং দাস্যং কৃষ্ণপদাম্বুজে।
সর্ব্বেপ্সিতং সদানন্দং সর্ব্বসিদ্ধ্যোঘমীশ্বরম্ ॥ ১০৮ ॥
ধকারঃ সহবাসঞ্চ তত্তুল্যকালমেব চ।
দদাতি সার্ষ্টিং সারূপ্যং তত্ত্বজ্ঞানং হরেঃ সমম্ ॥১০৯॥"

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণম্ শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ১৩অঃ।

ইহার একটিও রাধা শব্দের প্রকৃত ব্যুৎপত্তি নয়। রাধ্ ধাতু—আরাধনার্থে, পূজার্থে। যিনি কৃষ্ণের আরাধিকা, তিনিই রাধা বা রাধিকা। বর্ত্তমান ব্রহ্মবৈবর্ত্তে এ ব্যুৎপত্তি কোথাও নাই। যিনি এই রাধা শব্দের প্রকৃত ব্যুৎপত্তি গোপন করিয়া কতকগুলা অবৈয়াকরণিক কল কৌশল দ্বারা ভ্রান্তি জন্মাইবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং ভ্রান্তির প্রতিপোষণার্থ মিথ্যা করিয়া সামবেদের দোহাই দিয়াছেন, * তিনি কখনও

---

* রাধাশব্দস্য ব্যুৎপত্তিঃ সামবেদে নিরূপিতা—১৩অঃ ১৫৩

‡ রাধা বিশাখাপুষ্যে তু সিদ্ধতিষ্যৌ শ্রবিষ্ঠয়া।—অমরকোষ।

"রাধা" শব্দের সৃষ্টিকারক নহেন। যিনি রাধা শব্দের প্রকৃত ব্যুৎপত্তির অনুযায়িক হইয়া রাধারূপক রচনা করেন নাই, তিনি কখনও রাধার সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন। সেই জন্য বিবেচনা করি যে, আদিম ব্রহ্মবৈবর্ত্তেই রাধার প্রথম সৃষ্টি এবং সেখানে রাধা কৃষ্ণারাধিকা আদর্শরূপিণী গোপী ছিলেন, সন্দেহ নাই।

রাধা শব্দের আর একটি অর্থ আছে—বিশাখা নক্ষত্রের † একটি নাম রাধা। কৃত্তিকা হইতে বিশাখা চতুর্দশ নক্ষত্র। পূর্ব্বে কৃত্তিকা হইতে বৎসর গণনা হইত। কৃত্তিকা হইতে রাশি গণনা করিলে বিশাখা ঠিক মাঝে পড়ে। অতএব রাসমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তিনী হউন বা না হউন রাধা রাশিমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তিনী বটেন। এই "রাশিমণ্ডলমধ্যবর্ত্তিনী" রাধার সঙ্গে "রাসমণ্ডলের" রাধার কোন সম্বন্ধ আছে কি না, তাহা আসল ব্রহ্মবৈবর্ত্তের অভাবে স্থির করা অসাধ্য।

[অথর্ব্ববেদের উপনিষদ্ সকলের মধ্যে এক-খানির নাম গোপালতাপনী। কৃষ্ণের গোপমূর্ত্তির উপাসনা ইহার বিষয়। উহার রচনা দেখিয়া বোধ হয় যে, অধিকাংশ উপনিষদ্ অপেক্ষা উহা অনেক আধুনিক। ইহাতে কৃষ্ণ যে গোপগোপী-পরিবৃত, তাহা বলা হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে গোপ-গোপীর যে অর্থ করা হইয়াছে, তাহা প্রচলিত অর্থ হইতে ভিন্ন। গোপী অর্থে অবিদ্যা কলা। টীকাকার বলেন,—

গোপায়ন্তীতি গোপ্যঃ পালনশক্তয়ঃ। আর গোপীজনবল্লভ অর্থে গোপীনাং পালনশক্তীনাং জনঃ সমূহঃ তদ্বাচ্যা অবিদ্যা কলাশ্চ তাসাং বল্লভঃ স্বামী প্রেরক ঈশ্বরঃ।

উপনিষদে এইরূপ গোপীর অর্থ আছে, কিন্তু রাসলীলার কোন কথাই নাই। রাধার নামমাত্র নাই। একজন প্রধানা গোপীর কথা আছে, কিন্তু তিনি রাধা নহেন, তাঁহার নাম গান্ধর্ব্বী। তাঁহার প্রাধান্যও কামকেলিতে নহে—তত্ত্বজিজ্ঞাসায়। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে আর জয়দেবের কাব্যে ভিন্ন কোন প্রাচীন গ্রন্থে রাধা নাই।] *

একাদশ পরিচ্ছেদ

বৃন্দাবনলীলার পরিসমাপ্তি

ভাগবতে বৃন্দাবনলীলা সম্বন্ধীয় আর কয়েকটা কথা আছে।

১ম, নন্দ একদিন স্নান করিতে যমুনায় নামিলে, বরুণের অনুচর আসিয়া তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া বরুণালয়ে যায়। কৃষ্ণ সেখানে গিয়া নন্দকে লইয়া আসেন। শাদা কথায় নন্দ একদিন জলে ডুবিয়াছিলেন, কৃষ্ণ তাঁহাকে উদ্ধৃত করিয়াছিলেন।

২য়, একটা সাপ আসিয়া একদিন নন্দকে ধরিয়াছিল। কৃষ্ণ সে সর্পের মুখ হইতে নন্দকে মুক্ত করিয়া সর্পকে নিহত করিয়াছিলেন। সর্পটা বিদ্যাধর; কৃষ্ণস্পর্শে মুক্তিপ্রাপ্ত হইয়া স্বস্থানে গমন করে। শাদা কথায় কৃষ্ণ একদিন নন্দকে সর্পমুখ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন।

৩য়, শঙ্খচূড় নামে একটা অসুর আসিয়া ব্রজাঙ্গনাদিগকে ধরিয়া লইয়া যায়। কৃষ্ণবলরাম তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া ব্রজাঙ্গনাদিগকে মুক্ত করেন এবং শঙ্খচূড়কে বধ করেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে শঙ্খচূড়ের কথা ভিন্ন প্রকার আছে, তাহার কিয়দংশ পূর্ব্বে বলিয়াছি।

৪র্থ, এই তিনটা কথা বিষ্ণুপুরাণে, হরিবংশে বা মহাভারতে নাই। কিন্তু কৃষ্ণকৃত অরিষ্টাসুর ও কেশী অসুরের বধবৃত্তান্ত হরিবংশে ও বিষ্ণুপুরাণে আছে এবং মহাভারতে শিশুপালকৃত কৃষ্ণনিন্দায় তাহার প্রসঙ্গও আছে। অরিষ্ট বৃষরূপী এবং কেশী অশ্বরূপী। শিশুপাল ইহাদিগকে বৃষ ও অশ্ব বলিয়াই নির্দেশ করিতেছেন।

অতএব প্রথমোক্ত তিনটি বৃত্তান্ত ভাগবতকারপ্রণীত উপন্যাস বলিয়া উড়াইয়া দিলে অরিষ্টবধ ও কেশিবধকে সেরূপে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। বিশেষ এই কেশিবধ বৃত্তান্ত অথর্ব্বসংহিতায় আছে বলিয়াছি। সেখানে কেশীকে কৃষ্ণকেশী বলা হইয়াছে। কৃষ্ণকেশী অর্থে যার কাল চুল। ঋগ্বেদ সংহিতাতেও একটি কেশিসূক্ত আছে, (দশম মণ্ডল ১৩৬ সূক্ত) এই কেশী দেব কে, তাহা অনিশ্চিত। ইহার চতুর্থ ও পঞ্চম ঋক্ হইতে এমন বুঝা যায় যে, হয় ত মুনিই কেশী দেবতা। মুনিগণ লম্বা লম্বা চুল রাখিতেন। ঐ দুই ঋকে মুনিগণেরই প্রশংসা করা হইয়াছে। Muir সাহেবও সেইরূপ বুঝিয়াছেন। কিন্তু প্রথম ঋকে অন্যপ্রকার বুঝান হইয়াছে। প্রথম ঋক রমেশ বাবু এইরূপ বাঙ্গালা অনুবাদ করিয়াছেন :—

"কেশী নামক যে দেব, তিনি অগ্নিকে, তিনিই জলকে, তিনি ভূলোক ও দ্যুলোককে ধারণ করেন। সমস্ত সংসারকে কেশীই আলোকের দ্বারা দর্শনযোগ্য করেন। এই যে জ্যোতি, ইহার নাম কেশী।"

তাহা হইলে জগদ্ব্যাপক যে জ্যোতি, তাহাই কেশী এবং জগদাবরক যে জ্যোতি, তাহাই কৃষ্ণকেশী, কৃষ্ণ তাহারই নিধনকর্ত্তা, অর্থাৎ কৃষ্ণ জগদাবরক তমঃ প্রতিহত করিয়াছিলেন।

---

* [ ] চিহ্নিত অংশ ক্রোড়পত্র খ হইতে উদ্ধৃত।

এইখানে বৃন্দাবনলীলার পরিসমাপ্তি। এক্ষণে আলোচ্য যে, আমরা ইহার ভিতর পাইলাম কি? ঐতিহাসিক কথা কিছু পাইলাম না বলিলেই হয়। এই সকল পৌরাণিক কথা অতিপ্রকৃত উপন্যাসে পরিপূর্ণ। তাহার ভিতর ঐতিহাসিক তত্ত্ব অতি দুর্লভ। আমরা প্রধানতঃ ইহাই পাইয়াছি যে, কৃষ্ণ সম্বন্ধে যে সকল প্রবাদ আছে—চৌরবাদ এবং পরদারবাদ—সে সকলই অমূলক ও অলীক। ইহাই প্রতিপন্ন করিবার জন্য আমরা এত সবিস্তারে ব্রজলীলার সমালোচনা করিয়াছি। ঐতিহাসিক তত্ত্ব যদি কিছু পাইয়া থাকি, তবে সেটুকু এই,—অত্যাচারকারী কংসের ভয়ে বসুদেব আপন পত্নী রোহিণী এবং পুত্রদ্বয় রাম ও কৃষ্ণকে নন্দালয়ে গোপনে রাখিয়াছিলেন। কৃষ্ণ শৈশব ও কৈশোর সেইখানে অতিবাহিত করেন। তিনি শৈশবে রূপলাবণ্যে এবং শিশুসুলভ গুণসকলে সর্ব্বজনের প্রিয় হইয়াছিলেন। কৈশোরে তিনি অতিশয় বলশালী হইয়াছিলেন এবং বৃন্দাবনের অনিষ্টকারী পশু প্রভৃতি হনন করিয়া, গোপালগণকে সর্ব্বদা রক্ষা করিতেন। তিনি শৈশবাবধিই সর্ব্বজন এবং সর্ব্বজীবে কারুণ্যপরিপূর্ণ—সকলের উপকার করিতেন। গোপালগণ প্রতি এবং গোপবালিকাগণ প্রতি তিনি স্নেহশালী ছিলেন। সকলের সঙ্গে আমোদ আহ্লাদ করিতেন, এবং সকলকে সন্তুষ্ট রাখিতে চেষ্টা করিতেন এবং কৈশোরেই প্রকৃত ধর্ম্মতত্ত্বও তাঁহার হৃদয়ে উদ্ভাসিত হইয়াছিল। এতটুকু ঐতিহাসিক তত্ত্বও যে পাইয়াছি, ইহাও সাহস করিয়া বলিতে পারি না। তবে ইহাও বলিতে পারি যে, ইহার বেশী আর কিছু নয়।

তৃতীয় খণ্ড

মথুরা-দ্বারকা

"যস্তনোতি সতাং সেতুমৃতেনামৃতযোনিনা।
ধর্ম্মার্থব্যবহারাঙ্গৈস্তস্মৈ সত্যাত্মনে নমঃ॥"

শান্তিপর্ব্বণি, ৪৭ অধ্যায়ঃ

প্রথম পরিচ্ছেদ

কংসবধ

এ দিকে কংসের নিকট সংবাদ পৌঁছিল যে, বৃন্দাবনে কৃষ্ণ বলরাম অতি বলশালী হইয়াছেন। পূতনা হইতে অরিষ্ট পর্য্যন্ত কংসানুচর সকলকে নিহত করিয়াছেন। দেবর্ষি নারদ গিয়া কংসকে বলিলেন, কৃষ্ণ রাম বসুদেবের পুত্র। দেবকীর অষ্টমগর্ভজা বলিয়া যে কন্যাকে কংস নিহত করিয়াছিলেন, সে নন্দযশোদার কন্যা। বসুদেব সন্তান পরিবর্ত্তিত করিয়া কৃষ্ণকে নন্দালয়ে গোপনে রাখিয়াছেন। ইহা দেখিয়া কংস ভীত ও ক্রুদ্ধ হইয়া বসুদেবকে তিরস্কৃত করিলেন এবং তাঁহার বধে উদ্যত হইলেন এবং রাম কৃষ্ণকে আনিবার জন্য অক্রূরনামা একজন যাদবপ্রধানকে বৃন্দাবনে প্রেরণ করিলেন। এ দিকে কংস আপনার বিখ্যাত বলবান্ মল্লদিগের দ্বারা রাম-কৃষ্ণের বধসাধনের অভিপ্রায়ে ধনুর্ম্মহ নামে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। রাম-কৃষ্ণ অক্রূর কর্ত্তৃক তথায় আনীত হইয়া * রঙ্গভূমিতে প্রবেশ পূর্ব্বক কংসের শিক্ষিত হস্তী কুবলয়াপীড়কে ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ মল্ল চাণূর ও মুষ্টিককে নিহত করিলেন। ইহা দেখিয়া কংস নন্দকে লৌহময় নিগড়ে অবরুদ্ধ করিবার এবং বসুদেবকে বিনাশ করিবার জন্য আদেশ করিয়া কৃষ্ণ-বলরামকে তাড়াইয়া দিবার আজ্ঞা করিলেন। তখন যে মঞ্চে মল্লযুদ্ধ দেখিবার জন্য অন্যান্য যাদবের সহিত কংস উপবিষ্ট ছিলেন, কৃষ্ণ লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক তদুপরি আরোহণ করিয়া কংসকে ধরিলেন এবং তাহাকে কেশের দ্বারা আকর্ষণ করিয়া রঙ্গভূমে নিপাতিত ও তাঁহাকে নিহত করিলেন। পরে বসুদেব দেবকী প্রভৃতি গুরুজনকে যথাবিহিত বন্দনা করিয়া কংসের পিতা উগ্রসেনকে রাজ্যে অভিষেক করিলেন। নিজে রাজা হইলেন না।

হরিবংশ ও পুরাণ সকলে এইরূপ কংসবধ-বৃত্তান্ত কথিত হইয়াছে। কংসবধ ঐতিহাসিক ঘটনা বটে, কিন্তু তদ্বিষয়ক এই বিবরণ ঐতিহাসিকতাশূন্য। ইহাতে বিশ্বাস করিতে গেলে, অতিপ্রকৃত ব্যাপারে বিশ্বাস করিতে হয়। প্রথমতঃ দেবর্ষি নারদের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতে হয়। তার পর সেই দৈববাণীতে বিশ্বাস করিতে হয়। কেন না, কংসের ভয় সেই দৈববাণীস্মৃতি হইতে উৎপন্ন। তাহা ছাড়া দুইটি গোপবালক আসিয়া বিনা যুদ্ধে সভামধ্যে মথুরাধিপতিকে বিনষ্ট করিবে, ইহা ত সহজে বিশ্বাস করা যায় না। অতএব দেখা যাউক যে, সর্ব্বপ্রাচীন গ্রন্থ মহাভারতে এই বিষয় কি আছে। মহাভারতের সভাপর্ব্বে জরাসন্ধবধপর্ব্বাধ্যায়ে কৃষ্ণ নিজে নিজের পূর্ব্ববৃত্তান্ত যুধিষ্ঠিরের নিকট বলিতেছেন :—

* পথিমধ্যে কুব্জা-ঘটিত ব্যাপারটা আছে। বিষ্ণুপুরাণে নিন্দনীয় কথা কিছুই নাই। কুব্জা আপনাকে সুন্দরী হইতে দেখিয়া কৃষ্ণকে নিজ মন্দিরে যাইতে অনুরোধ করিলেন, কৃষ্ণ হাসিয়াই অস্থির। বিষ্ণুপুরাণে এই পর্য্যন্ত। কৃষ্ণের এ ব্যবহার মানবোচিত ও সজ্জনোচিত। কিন্তু ভাগবতকার ও ব্রহ্মবৈবর্ত্তকার তাহাতে সন্তুষ্ট নহেন, কুব্জার হঠাৎ ভক্তির হঠাৎ পুরস্কার দিয়াছেন, শেষ যাত্রায় কুব্জা পাটরাণী।

আমরা এইখান হইতে ভাগবতের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম। তাহার কারণ, ভাগবতে ঐতিহাসিক কথা কিছুই পাওয়া যায় না; যাহা পাওয়া যায়, তাহা বিষ্ণুপুরাণেও আছে। তদতিরিক্ত যাহা পাওয়া যায়, তাহা অতিপ্রকৃত উপন্যাসমাত্র। তবে ভাগবতকথিত বাল্যলীলা অতি প্রসিদ্ধ বলিয়া আমরা ভাগবতের সে অংশের পরিচয় দিতে বাধ্য হইয়াছি। এক্ষণে ভাগবতের নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে পারি।

"কিয়ৎকাল অতীত হইল, কংস * যাদবগণকে পরাভূত করিয়া সহদেবা ও অনুজা নামে বার্হদ্রথের দুই কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিল। ঐ দুরাত্মা স্বীয় বাহুবলে জ্ঞাতিবর্গকে পরাজয় করত সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান হইয়া উঠিল। ভোজবংশীয় বৃদ্ধ ক্ষত্রিয়গণ মূঢ়মতি কংসের দৌরাত্ম্যে সাতিশয় ব্যথিত হইয়া জ্ঞাতিবর্গকে পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত আমাকে অনুরোধ করিলেন। আমি তৎকালে অক্রূরকে আহুক-কন্যা প্রদান করিয়া জ্ঞাতিবর্গের হিতসাধনার্থ বলভদ্র-সমভিব্যাহারে কংস ও সুনামাকে সংহার করিলাম।"

ইহাতে কৃষ্ণ বলরাম বৃন্দাবন হইতে আনীত হওয়ার কথা কিছুমাত্র নাই। বরং এমন বুঝাইতেছে যে, কংসবধের পূর্ব্ব হইতেই কৃষ্ণ বলরাম মথুরাতে বাস করিতেন। কৃষ্ণ বলিতেছেন যে, বৃদ্ধ যাদবেরা জ্ঞাতিবর্গকে পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ পলাইয়া আত্মরক্ষা করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। কৃষ্ণ তাহা না করিয়া জ্ঞাতিদিগের মঙ্গলার্থ কংসকেই বধ করিলেন। ইহাতে বলরাম ভিন্ন আর কেহ তাঁহার সহায় ছিল কি না, ইহা প্রকাশ নাই। কিন্তু ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইতে পারিতেছে যে, অন্যান্য যাদবগণ প্রকাশ্যে তাঁহাদের সাহায্য করুন বা না করুন, কংসকে কেহ রক্ষা করিতে চেষ্টা করেন নাই। কংস তাঁহাদের সকলের উপর অত্যাচার করিত, এ জন্য বরং বোধ হয়, তাঁহারাই রাম-কৃষ্ণের বলাধিক্য দেখিয়া, তাঁহাদিগকে নেতৃত্বে সংস্থাপন করিয়া কংসের বধসাধন করিয়াছিলেন। এইটুকু ভিন্ন আর কিছু ঐতিহাসিক তত্ত্ব পাওয়া যায় না।

আর ঐতিহাসিক তত্ত্ব ইহা পাওয়া যায় যে, কৃষ্ণ কংসকে নিহত করিয়া কংসের পিতা উগ্রসেনকেই যাদবদিগের আধিপত্যে সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। কেন না, মহাভারতেও উগ্রসেনকে যাদবদিগের অধিপতিস্বরূপ বর্ণিত দেখিতে পাওয়া যায়। এ দেশের চিরপ্রচলিত রীতি ও নীতি এই যে, যে রাজাকে বধ করিতে পারে, সেই তাহার রাজ্যভাগী হয়। কংসের বিজেতা কৃষ্ণ অনায়াসেই মথুরার সিংহাসন অধিকৃত করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি তাহা করিলেন না, কেন না, ধর্ম্মতঃ সে রাজ্য উগ্রসেনের। উগ্রসেনকে পদচ্যুত করিয়াই কংস রাজা হইয়াছিল। ধর্ম্মই কৃষ্ণের নিকট প্রধান, তিনি শৈশবাবধিই ধর্ম্মাত্মা। অতএব যাহার রাজ্য তাহাকেই তিনি রাজ্য প্রদান করিলেন। তিনি ধর্ম্মানুরুদ্ধ হইয়াই কংসকে নিহত করিয়াছিলেন। আমরা পরে দেখিব যে, তিনি প্রকাশ্যে বলিতেছেন যে, যাহাতে পরহিত, তাহাই ধর্ম্ম। এখানে ঘোরতর অত্যাচারী কংসের বধে সমস্ত যাদবগণের হিতসাধন হয়, এই জন্য তিনি কংসকে বধ করিয়াছিলেন—ধর্ম্মার্থমাত্র। বধ করিয়া করুণহৃদয় আদর্শপুরুষ কংসের জন্য বিলাপ করিয়াছিলেন, এমন কথাও গ্রন্থে লিখিত আছে। এই কংসবধে আমরা প্রথমে প্রকৃত ইতিহাসের সাক্ষাৎ পাই এবং এই কংসবধেই দেখি যে, কৃষ্ণ পরম বলশালী, পরম কার্য্যদক্ষ, পরম ন্যায়পর, ধর্ম্মাত্মা, পরহিতে রত এবং পরের জন্য কাতর। এইখান হইতেই দেখিতে পাই যে, তিনি আদর্শ মনুষ্য।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শিক্ষা

পুরাণে কথিত হইয়াছে যে, কংসবধের পর কৃষ্ণ-বলরাম কাশীতে সান্দীপনি ঋষির নিকট শিক্ষার্থ গমন করিলেন এবং চতুঃষষ্টিদিবসমধ্যে শস্ত্রবিদ্যায় সুশিক্ষিত হইয়া গুরুদক্ষিণাপ্রদানান্তে মথুরায় প্রত্যাগমন করিলেন।

কৃষ্ণের শিক্ষা সম্বন্ধে ইহা ছাড়া আর কিছু পুরাণেতিহাসে পাওয়া যায় না। নন্দালয়ে তাঁহার কোনও প্রকার শিক্ষা হওয়ার কোন প্রসঙ্গ কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। অথচ নন্দ জাতিতে বৈশ্য ছিলেন, বৈশ্যদিগের বেদে অধিকার ছিল। বৈশ্যালয়ে তাঁহাদিগের কোন প্রকার বিদ্যাশিক্ষা না হওয়া বিচিত্র বটে। বোধ হয়, শিক্ষার সময় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই তিনি নন্দালয় হইতে মথুরায় পুনরানীত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বপরিচ্ছেদে মহাভারত হইতে যে কৃষ্ণবাক্য উদ্ধৃত করা গিয়াছে, তাহা হইতে এরূপ অনুমানই সঙ্গত যে, কংসবধের অনেক পূর্ব্ব হইতেই তিনি মথুরায় বাস করিতেছিলেন এবং মহাভারতের সভাপর্ব্বে শিশুপালকৃত কৃষ্ণনিন্দায় দেখা যায়, শিশুপাল তাঁহাকে কংসের অন্নভোজী বলিতেছে—

"যস্য চানেন ধর্ম্মজ্ঞ ভুক্তমন্নং বলীয়সঃ।
স চানেন হতঃ কংস ইত্যেতন্ন মহাদ্ভুতম্।"

মহাভারতম্, সভাপর্ব্ব, ৪০ অধ্যায়ঃ।

---

* কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের অনুবাদ এখানে উদ্ধৃত করিলাম, কিন্তু বলিতে বাধ্য, এই অনুবাদে আছে "দানবরাজ কংস।"* মূলে তাহা নাই, যথা—

"কস্যচিত্ত্বথ কালস্য কংসো নির্ম্মথ্য যাদবান্।"

সুতরাং "দানবরাজ" শব্দ তুলিয়া দিয়াছি।

অতএব বোধ হয়, শিক্ষার সময় উপস্থিত হইতে না হইতেই কৃষ্ণ মথুরায় আনীত হইয়াছিলেন। বৃন্দাবনের গোপীদিগের সঙ্গে গ্রথিত কৈশোরলীলা যে উপন্যাসমাত্র, ইহা তাহার অন্যতর প্রমাণ।

মথুরাবাসকালেও তাঁহার কিরূপ শিক্ষা হইয়াছিল, তাহার কোন বিশিষ্ট বিবরণ নাই। কেবল সান্দীপনি মুনির নিকট চতুঃষষ্টি দিবস অস্ত্রশিক্ষার কথাই আছে। যাঁহারা কৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া জানেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিতে পারেন, সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের আবার শিক্ষার প্রয়োজন কি? তাহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, তবে চতুঃষষ্টি দিবস সান্দীপনি-গৃহে শিক্ষারই বা প্রয়োজন কি? ফলতঃ, কৃষ্ণ ঈশ্বরের অবতার হইলেও মানবধর্ম্মাবলম্বী এবং মানুষী শক্তি দ্বারাই সকল কার্য্য সম্পন্ন করেন, এ কথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি এবং এক্ষণেও তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ দেখাইব। মানুষী শক্তি দ্বারা কর্ম্ম করিতে গেলে, শিক্ষা দ্বারা সেই মানুষী শক্তিকে অনুশীলিত এবং স্ফুরিত করিতে হয়। যদি মানুষী শক্তি স্বতঃস্ফুরিত হইয়া সর্ব্বকার্য্যসাধনক্ষম হয়, তাহা হইলে সে ঐশী শক্তি—মানুষী শক্তি নহে। কৃষ্ণের যে মানুষী শিক্ষা হইয়াছিল, তাহা এই সান্দীপনিবৃত্তান্ত ভিন্ন আরও প্রমাণ আছে। তিনি সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। মহাভারতের সভাপর্ব্বে অর্ঘাভিহরণ পর্ব্বাধ্যায়ে কৃষ্ণের পূজ্যতা বিষয়ে ভীষ্ম একটি হেতু এই নির্দ্দেশ করিতেছেন যে, কৃষ্ণ নিখিল বেদবেদাঙ্গ পারদর্শী। তাদৃশ বেদবেদাঙ্গজ্ঞানসম্পন্ন দ্বিতীয় ব্যক্তি দুর্লভ।

"বেদবেদাঙ্গবিজ্ঞানং বলং চাপ্যধিকং তথা।
নৃণাং লোকে হি কোঽন্যোঽস্তি বিশিষ্টঃ কেশবাদৃতে॥"
মহাভারতম্, সভাপর্ব্ব, ৩৮ অধ্যায়ঃ।

মহাভারতে কৃষ্ণের বেদজ্ঞতা সম্বন্ধে এইরূপ আরও ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। এই বেদজ্ঞতা তাঁহার স্বতঃলব্ধও নহে। ছান্দোগ্য উপনিষদে প্রমাণ পাইয়াছি যে, তিনি আঙ্গিরসবংশীয় ঘোর ঋষির নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

সে সময়ে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়দিগের উচ্চশিক্ষার উচ্চাংশকে তপস্যা বলিত। শ্রেষ্ঠ রাজর্ষিগণ কোন সময়ে না কোন সময়ে তপস্যা করিয়াছিলেন, এইরূপ কথা প্রায় পাওয়া যায়। আমরা এক্ষণে তপস্যা অর্থে যাহা বুঝি, বেদের অনেক স্থানেই দেখা যায় যে, তপস্যার প্রকৃত অর্থ তাহা নহে। আমরা বুঝি, তপস্যা বনে বসিয়া, চক্ষু বুজিয়া, নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া, পানাহার ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের ধ্যান করা। কিন্তু দেবতাদিগের মধ্যে কেহ কেহ এবং মহাদেবও তপস্যা করিয়াছিলেন, ইহাও কোন কোন গ্রন্থে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ শতপথব্রাহ্মণে আছে যে, স্বয়ং পরব্রহ্ম সিসৃক্ষু হইলে তপস্যা দ্বারাই সৃষ্টি করিলেন, যথা—

"সোঽকাময়ত। বহুঃস্যাং প্রজায়েয়েতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বমসৃজত।"*

অর্থ—"তিনি ইচ্ছা করিলেন, আমি প্রজাসৃষ্টির জন্য বহু হইব। তিনি তপস্যা করিলেন। তপস্যা করিয়া এই সকল সৃষ্টি করিয়াছিলেন।"

এ সকল স্থানে তপস্যা অর্থে এই রকমই বুঝিতে হয় যে, চিত্তসমাহিত করিয়া আপনার শক্তি সকলের অনুশীলন ও স্ফূরণ করা। মহাভারতে কথিত আছে যে, কৃষ্ণ দশ বৎসর হিমালয় পর্ব্বতে তপস্যা করিয়াছিলেন। মহাভারতে ঐষিকপর্ব্বে লিখিত আছে যে, অশ্বত্থামাপ্রযুক্ত ব্রহ্মশিরা অস্ত্র দ্বারা উত্তরার গর্ভপাতের সম্ভাবনা হইলে, কৃষ্ণ সেই মৃত শিশুকে পুনরুজ্জীবিত করিতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছিলেন এবং তখন অশ্বত্থামাকে বলিয়াছিলেন যে, তুমি আমার তপোবল দেখিবে।

আদর্শমনুষ্যের শিক্ষা আদর্শ শিক্ষাই হইবে। ফলও সেইরূপ দেখি। কিন্তু সেই প্রাচীনকালের আদর্শ শিক্ষা কিরূপ ছিল, তাহা কিছু জানিতে পারা গেল না, ইহা বড় দুঃখের বিষয়

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জরাসন্ধ

সকল সময়েই দেখা যায় যে, ভারতবর্ষে, অন্ততঃ ভারতবর্ষের উত্তরার্দ্ধে এক এক জন সম্রাট্ ছিলেন, তাঁহার প্রাধান্য অন্য রাজগণ স্বীকার করিত। কেহ বা করদ, কেহ বা আজ্ঞানুবর্ত্তী, এবং যুদ্ধকালে সকলেই সহায় হইত। ঐতিহাসিক সময়ে চন্দ্রগুপ্ত, বিক্রমাদিত্য, অশোক, মহাপ্রতাপশালী গুপ্তবংশীয়েরা, হর্ষবর্দ্ধন, শিলাদিত্য এবং আধুনিক সময় পাঠান ও মোগল—ইহারা এইরূপ সম্রাট্ ছিলেন। হিন্দুরাজ্যকালে অধিকাংশ সময়ই এই আধিপত্য মগধাধিপতিরই ছিল। আমরা যে সময়ের বর্ণনায় উপস্থিত, সে সময়ে মগধাধিপতি উত্তর ভারতের সম্রাট্। এই সম্রাট্ বিখ্যাত জরাসন্ধ। তাঁহার বল ও প্রতাপ মহাভারতে, হরিবংশে ও পুরাণসকলে অতিশয় বিস্তারের সহিত

* ২ বল্লী ৬ অনুবাক।

বর্ণিত হইয়াছে। কথিত হইয়াছে যে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে সমস্ত ক্ষত্রিয়গণ একত্র হইয়াছিল। কিন্তু কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধেও উভয় পক্ষের মোটে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা উপস্থিত ছিল, লেখা আছে। এক জরাসন্ধের বিংশতি অক্ষৌহিণী সেনা ছিল, লিখিত হইয়াছে।

কংস এই জরাসন্ধের জামাতা। কংস তাঁহার দুই কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। কংসবধের পর তাঁহার বিধবা কন্যাগণ জরাসন্ধের নিকটে গিয়া পতিহন্তার দমনার্থ রোদন করেন। জরাসন্ধ কৃষ্ণের বধার্থ মহাসৈন্য লইয়া আসিয়া মথুরা অবরোধ করেন। জরাসন্ধের অসংখ্য সৈন্যের তুলনায় যাদবদিগের সৈন্য অতি অল্প। তথাপি কৃষ্ণের সেনাপতিত্বগুণে যাদবেরা জরাসন্ধকে বিমুখ করিয়াছিলেন। কিন্তু জরাসন্ধের বলক্ষয় করা তাঁহাদের অসাধ্য। কেন না, জরাসন্ধের সৈন্য অগণ্য। অতএব জরাসন্ধ পুনঃ পুনঃ আসিয়া মথুরা অবরোধ করিতে লাগিল। যদিও সে পুনঃ পুনঃ বিমুখীকৃত হইল, তথাপি এই পুনঃ পুনঃ আক্রমণে যাদবদিগের গুরুতর অশুভ উৎপাদনের সম্ভাবনা হইল। যাদবদিগের ক্ষুদ্র সৈন্য পুনঃ পুনঃ যুদ্ধে ক্ষয় হইতে লাগিল, তাঁহারা সৈন্যশূন্য হইবার উপক্রম হইলেন। কিন্তু সমুদ্রে জোয়ার ভাটার ন্যায় জরাসন্ধের অগাধ সৈন্যের ক্ষয়বৃদ্ধি কিছু জানিতে পারা গেল না। এইরূপ সপ্তদশ বার আক্রান্ত হওয়ার পর যাদবেরা কৃষ্ণের পরামর্শানুসারে মথুরা ত্যাগ করিয়া দুরাক্রম্য প্রদেশে দুর্গনির্ম্মাণ পূর্ব্বক বাস করিবার অভিপ্রায় করিলেন। অতএব সাগরদ্বীপ দ্বারকায় যাদবদিগের জন্য পুরী নির্ম্মাণ হইতে লাগিল এবং দুরারোহ রৈবতক পর্ব্বতে দ্বারকারক্ষার্থ দুর্গশ্রেণী সংস্থাপিত হইল। কিন্তু তাঁহারা দ্বারকা যাইবার পূর্ব্বেই জরাসন্ধ অষ্টাদশ বার মথুরা আক্রমণ করিতে আসিলেন।

এই সময়ে জরাসন্ধের উত্তেজনায় আর এক প্রবল শত্রু কৃষ্ণকে আক্রমণ করিবার জন্য উপস্থিত হইল। অনেক গ্রন্থেই দেখা যায় যে, প্রাচীন কালে ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে যবনদিগের রাজত্ব ছিল। একণকার পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, প্রাচীন গ্রীকদিগকেই ভারতবর্ষীয়েরা যবন বলিতেন। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত বিশুদ্ধ কি না, তদ্বিষয়ে অনেক সন্দেহ আছে। বোধ হয়, শক, হূণ, গ্রীক প্রভৃতি অহিন্দু সভ্য জাতিমাত্রকেই যবন বলিতেন। যাহাই হউক, ঐ সময়ে কালযবন নামে এক জন যবনরাজা ভারতবর্ষে অতি প্রবলপ্রতাপ হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি আসিয়া সসৈন্যে মথুরা অবরোধ করিলেন। কিন্তু পরমসমররহস্যবিৎ কৃষ্ণ তাঁহার সহিত সসৈন্যে যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিলেন না। কেন না, ক্ষুদ্র যাদবসেনা তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে বিমুখ করিলেও সংখ্যায় বড় অল্প হইয়া যাইবে। হতাবশিষ্ট যাহা থাকিবে, তাহারা জরাসন্ধকে বিমুখ করিতে সক্ষম হইতে না পারে। আর ইহাও পশ্চাৎ দেখিব যে, সর্ব্বভূতে দয়াময় কৃষ্ণ প্রাণিহত্যাপক্ষে ধর্ম্ম প্রয়োজন ব্যতীত অনুরাগ প্রকাশ করেন না। যুদ্ধ অনেক সময়েই ধর্ম্মানুমোদিত, সে সময় যুদ্ধে অপ্রবৃত্ত হইলে, ধর্ম্মের হানি হয়, গীতায় কৃষ্ণ এই মতই প্রকাশ করিয়াছেন এবং এখানেও কালযবন এবং জরাসন্ধের সহিত যুদ্ধ ধর্ম্মযুদ্ধ। আত্মরক্ষার্থ এবং স্বজনরক্ষার্থ, প্রজাগণের রক্ষার্থ যুদ্ধ না করা ঘোরতর অধর্ম্ম। কিন্তু যদি যুদ্ধ করিতেই হইল, তবে যত অল্প মনুষ্যের প্রাণহানি করিয়া কার্য্য সম্পন্ন করা যায়, ধার্ম্মিকের তাহাই কর্ত্তব্য। আমরা মহাভারতের সভাপর্ব্বে জরাসন্ধবধপর্ব্বাধ্যায়ে দেখিব যে, যাহাতে অন্য কোন মনুষ্যের জীবন-হানি না হইয়া জরাসন্ধ-বধ সম্পন্ন হয়, কৃষ্ণ তাহার সদুপায় উদ্ভূত করিয়াছিলেন। কালযবনের যুদ্ধেও তাহাই করিলেন। তিনি সসৈন্যে কালযবনের সম্মুখীন না হইয়া কালযবনের বধার্থ কৌশল অবলম্বন করিলেন। একাকী কালযবনের শিবিরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। কালযবন তাঁহাকে চিনিতে পারিল। কৃষ্ণকে ধরিবার জন্য হাত বাড়াইল, কৃষ্ণ ধরা না দিয়া পলায়ন করিলেন। কালযবন তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হইল। কৃষ্ণ যেমন যেদে বা যুদ্ধবিদ্যায় সুপণ্ডিত, শারীরিক ব্যায়ামেও তদ্রূপ সুপারগ। আদর্শমনুষ্যের এইরূপ হওয়া উচিত, আমি "ধর্ম্মতত্ত্বে" দেখাইয়াছি। অতএব কালযবন কৃষ্ণকে ধরিতে পারিলেন না। কৃষ্ণ কালযবন কর্ত্তৃক অনুসৃত হইয়া এক গিরিগুহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কথিত আছে, সেখানে মুচুকুন্দ নামে এক ঋষি নিদ্রিত ছিলেন। কালযবন গুহান্ধকারমধ্যে কৃষ্ণকে দেখিতে না পাইয়া সেই ঋষিকেই কৃষ্ণভ্রমে পদাঘাত করিল। পদাঘাতে উন্নিদ্র হইয়া ঋষি কালযবনের প্রতি দৃষ্টিপা করিবামাত্র কালযবন ভস্মীভূত হইয়া গেল।

এই অতিপ্রকৃত ব্যাপারটাকে আমরা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহি। স্থূল কথা এই বুঝি যে, কৃষ্ণ কৌশলাবলম্বন পূর্ব্বক কালযবনকে তাহার সৈন্য হইতে দূরে লইয়া গিয়া, গোপন স্থানে তাহার সঙ্গে দ্বৈরথ্য যুদ্ধ করিয়া তাহাকে নিহত করিয়াছিলেন। কালযবন নিহত হইলে, তাহার সৈন্য সকল ভঙ্গ দিয়া মথুরা পরিত্যাগ করিয়া গেল। তাহার পর জরাসন্ধের অষ্টাদশ আক্রমণ,—সেবারও জরাসন্ধ বিমুখ হইল।

উপরে যেরূপ বিবরণ লিখিত হইল, তাহা হরিবংশে ও বিষ্ণুপুরাণে আছে। মহাভারতে জরাসন্ধের যেরূপ পরিচয় কৃষ্ণ স্বয়ং যুধিষ্ঠিরের কাছে দিয়াছেন,

তাহাতে এই অষ্টাদশ বার যুদ্ধের কোন কথাই নাই জরাসন্ধের সঙ্গে যে যাদবদিগের যুদ্ধ হইয়াছিল, এমন কথাও স্পষ্টতঃ নাই। যাহা আছে, তাহাতে কেবল এইটুকু বুঝা যায় যে, জরাসন্ধ মথুরা একবার আক্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু হংস নামক তাঁহার অনুগত কোন বীর বলদেব কর্তৃক নিহত হওয়ায় জরাসন্ধ দুঃখিতমনে স্বস্থানে প্রস্থান করিয়াছিলেন। সেই স্থান আমরা উদ্ধৃত করিতেছি :—

"কিয়ৎকাল অতীত হইল, কংস যাদবগণকে পরাভূত করিয়া সহদেবা ও অনুজা নামে বার্হদ্রথের দুই কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিল। ঐ দুরাত্মা স্বীয় বাহুবলে জ্ঞাতিবর্গকে পরাজয় করত সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান হইয়া উঠিল। ভোজবংশীয় বৃদ্ধ ক্ষত্রিয়গণ মূঢ়মতি কংসের দৌরাত্ম্যে সাতিশয় ব্যথিত হইয়া জ্ঞাতিবর্গকে পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত আমাকে অনুরোধ করিলেন। আমি তৎকালে অক্রূরকে আহুককন্যা প্রদান করিয়া জ্ঞাতিবর্গের হিতসাধনার্থ বলভদ্র সমভিব্যাহারে কংস ও সুনামাকে সংহার করিলাম। তাহাতে কংসভয় নিবারিত হইল বটে, কিন্তু কিছু দিন পরেই জরাসন্ধ প্রবল-পরাক্রান্ত হইয়া উঠিল। তখন আমরা জ্ঞাতিবন্ধুগণের সহিত একত্র হইয়া পরামর্শ করিলাম যে, যদি আমরা শত্রুনাশক মহাস্ত্র দ্বারা তিন শত বৎসর অবিশ্রামে জরাসন্ধের সৈন্য বধ করি, তথাপি নিঃশেষিত করিতে পারিব না। দেবতুল্য তেজস্বী মহাবলপরাক্রান্ত হংস ও ডিম্বক নামক দুই বীর তাহার অনুগত আছে; উহারা অস্ত্রাঘাতে কদাচ নিহত হইবে না। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, ঐ দুই বীর এবং জরাসন্ধ এই তিন জন একত্র হইলে ত্রিভুবন বিজয় করিতে পারে। হে ধর্ম্মরাজ! এই পরামর্শ কেবল আমাদিগের অভিমত হইল, এমত নহে, অন্যান্য ভূপতিগণও উহাতে অনুমোদন করিবেন।

হংস নামে সুবিখ্যাত এক নরপতি ছিলেন বলদেব তাঁহাকে সংগ্রামে সংহার করেন। ডিম্বক লোকমুখে হংস মরিয়াছে, এই কথা শ্রবণ করিয়া নামসাদৃশ্যপ্রযুক্ত তাহার সহচর হংস নিধন প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া স্থির করিল। পরে হংস বিনা আমার জীবনধারণে প্রয়োজন নাই, এই বিবেচনা করত যমুনায় নিমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। এ দিকে তৎসহচর হংস পরম প্রণয়াস্পদ ডিম্বককে আপন মিথ্যা মৃত্যুসংবাদ শ্রবণে প্রাণত্যাগ করিতে শ্রবণ করিয়া বৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়া যমুনাজলে আত্মসমর্পণ করিল। জরাসন্ধ এই দুই বীরপুরুষের নিধনবার্ত্তা শ্রবণে যৎপরোনাস্তি দুঃখিত ও শূন্যমনা হইয়া স্বনগরে প্রস্থান করিলেন। জরাসন্ধ বিমনা হইয়া স্বপুরে গমন করিলে পর আমরা পরমাহ্লাদে মথুরায় বাস করিতে লাগিলাম।

কিয়দ্দিনানন্তর পতিবিয়োগদুঃখিনী জরাসন্ধনন্দিনী স্বীয় পিতার সমীপে আগমনপূর্ব্বক 'আমার পতিহন্তাকে সংহার কর' বলিয়া বারংবার তাঁহাকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। আমরা পূর্ব্বেই জরাসন্ধের বলবিক্রমের বিষয় স্থির করিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহা স্মরণ করতঃ সাতিশয় উৎকণ্ঠিত হইলাম। তখন আমরা আমাদের বিপুল ধনসম্পত্তি বিভাগ করতঃ সকলে কিছু কিছু লইয়া প্রস্থান করিব, এই স্থির করিয়া স্বস্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক পশ্চিমদিকে পলায়ন করিলাম। ঐ পশ্চিমদেশে রৈবতোপশোভিত পরমরমণীয় কুশস্থলীনাম্নী পুরীতে বাস করিতেছি—তথায় এরূপ দুর্গসংস্কার করিয়াছি যে, সেখানে থাকিয়া বৃষ্ণিবংশীয় মহারথদিগের কথা দূরে থাকুক, স্ত্রীলোকেরাও অনায়াসে যুদ্ধ করিতে পারে। হে রাজন্! এক্ষণে আমরা অকুতোভয়ে ঐ নগরীমধ্যে বাস করিতেছি। মাধবগণ সমস্ত মগধদেশব্যাপী সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রৈবতক পর্ব্বত দেখিয়া পরম আহ্লাদিত হইলেন। হে কুরুকুলপ্রদীপ! আমরা সামর্থ্যযুক্ত হইয়াও জরাসন্ধের উপদ্রব-ভয়ে পর্ব্বত আশ্রয় করিয়াছি। ঐ পর্ব্বত দৈর্ঘ্যে তিন যোজন, প্রস্থে এক যোজনের অধিক এবং একবিংশতি শৃঙ্গযুক্ত। উহাতে এক এক যোজনের পর শত শত দ্বার এবং অত্যুৎকৃষ্ট উন্নত তোরণ সকল আছে। যুদ্ধদুর্ম্মদ মহাবলপরাক্রান্ত ক্ষত্রিয়গণ উহাতে সর্ব্বদা বাস করিতেছেন। হে রাজন্ আমাদের কুলে অষ্টাদশ সহস্র ভ্রাতা আছে। আহুকের এক শত পুত্র, তাহারা সকলেই অমরতুল্য। চারুদেষ্ণ ও তাঁহার ভ্রাতা, চক্রদেব, সাত্যকি, আমি, বলভদ্র, যুদ্ধবিশারদ শাম্ব—আমরা এই সাত জন রথী; কৃতবর্ম্মা, অনাধৃষ্টি, সমীক, সমিতিঞ্জয়, কঙ্ক, শঙ্কু ও কুন্তি এই সাত জন মহারথ, এবং অন্ধকভোজের দুই বৃদ্ধ পুত্র ও রাজা এই মহাবলপরাক্রান্ত দৃঢ়কলেবর দশ জন মহাবীর,—ইঁহারা সকলেই জরাসন্ধাধিকৃত মধ্যম দেশ স্মরণ করিয়া যদুবংশীয়দিগের সহিত মিলিত হইয়াছেন।"

এই জরাসন্ধ-বধপর্ব্বাধ্যায় প্রধানতঃ মৌলিক মহাভারতের অংশ বলিয়া আমার বিশ্বাস। দু-একটা কথা প্রক্ষিপ্ত থাকিতে পারে, কিন্তু অধিকাংশই মৌলিক। যদি তাহা সত্য হয়, তাহা হইলে কৃষ্ণের সহিত জরাসন্ধের বিরোধ বিষয়ে উপরিউক্ত বৃত্তান্তই প্রামাণিক বলিয়া আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে। কেন না, পূর্ব্বে বুঝাইয়াছি যে, হরিবংশ এবং পুরাণ সকলের অপেক্ষা মহাভারতের মৌলিকাংশ অনেক প্রাচীন। যদি এ কথা যথার্থ হয়, তবে জরাসন্ধকৃত

অষ্টাদশবার মথুরা আক্রমণ এবং অষ্টাদশবার তাহার পরাভব, এ সমস্তই মিথ্যা গল্প। প্রকৃত বৃত্তান্ত এই হইতে পারে যে, একবারমাত্র সে মথুরা আক্রমণে আসিয়াছিল এবং নিষ্ফল হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিল। দ্বিতীয়বার আক্রমণের সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু কৃষ্ণ দেখিলেন যে, চতুর্দ্দিকে সমতল ভূমির মধ্যবর্ত্তী মথুরা নগরীতে বাস করিয়া জরাসন্ধের অসংখ্যসৈন্যকৃত পুনঃ পুনঃ অবরোধ নিষ্ফল করা অসম্ভব। অতএব যেখানে দুর্গনির্ম্মাণ-পূর্ব্বক দুর্গাশ্রয়ে ক্ষুদ্র সেনা রক্ষা করিয়া জরাসন্ধকে বিমুখ করিতে পারিবেন, সেইখানে রাজধানী তুলিয়া লইয়া গেলেন। দেখিয়া জরাসন্ধ আর সে দিকে ঘেঁসিলেন না। জয়-পরাজয়ের কথা ইহাতে কিছুই নাই। ইহাতে কেবল ইহাই বুঝা যায় যে, যুদ্ধকৌশলে কৃষ্ণ পারদর্শী, তিনি পরম রাজনীতিজ্ঞ এবং অনর্থক মনুষ্যহত্যার নিতান্ত বিরোধী। আদর্শমনুষ্যের সমস্ত গুণ তাঁহাতে ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইতেছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কৃষ্ণের বিবাহ

কৃষ্ণের প্রথমা ভার্য্যা রুক্মিণী। ইনি বিদর্ভরাজ্যের অধিপতি ভীষ্মকের কন্যা। তিনি অতিশয় রূপবতী এবং গুণবতী শুনিয়া কৃষ্ণ ভীষ্মকের নিকট রুক্মিণীকে বিবাহার্থ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। রুক্মিণীও কৃষ্ণের অনুরক্তা হইয়াছিলেন। কিন্তু ভীষ্মক কৃষ্ণশত্রু জরাসন্ধের পরামর্শে রুক্মিণীকে কৃষ্ণে সমর্পণ করিতে অসম্মত হইলেন। তিনি কৃষ্ণদ্বেষক শিশুপালের সঙ্গে রুক্মিণীর বিবাহ স্থির করিয়া দিনাবধারণপূর্ব্বক সমস্ত রাজগণকে নিমন্ত্রণ করিলেন। যাদবগণের নিমন্ত্রণ হইল না। কৃষ্ণ স্থির করিলেন, যাদবদিগকে সঙ্গে লইয়া ভীষ্মকের রাজধানীতে যাইবেন এবং রুক্মিণীকে তাঁহার বন্ধুবর্গের অসম্মতিতেও গ্রহণ করিয়া বিবাহ করিবেন।

কৃষ্ণ তাহাই করিলেন। বিবাহের দিনে রুক্মিণী দেবারাধনা করিয়া দেবমন্দির হইতে বাহির হইলে পর কৃষ্ণ তাঁহাকে লইয়া রথে তুলিলেন। ভীষ্মক ও তাঁহার পুত্রগণ এবং জরাসন্ধ প্রভৃতি ভীষ্মকের মিত্ররাজগণ কৃষ্ণের আগমনসংবাদ শুনিয়াই এইরূপ একটা কাণ্ড উপস্থিত হইবে বুঝিয়াছিলেন। অতএব তাঁহারা প্রস্তুত ছিলেন। সৈন্য লইয়া সকলে কৃষ্ণের পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। কিন্তু কেহই কৃষ্ণকে ও যাদবগণকে পরাভূত করিতে পারিলেন না। কৃষ্ণ রুক্মিণীকে দ্বারকায় লইয়া গিয়া যথাশাস্ত্র বিবাহ করিলেন।

ইহাকে 'হরণ' বলে। হরণ অর্থে কন্যার প্রতি কোনরূপ অত্যাচার বুঝায় না। কন্যার যদি পাত্র অভিমত হয় এবং সে বিবাহে সে সম্মত থাকে, তবে তাহার প্রতি কি অত্যাচার? রুক্মিণীহরণেও সে দোষ ঘটে নাই, কেন না, রুক্মিণী কৃষ্ণে অনুরক্তা এবং পরে দেখাইব যে, কৃষ্ণানুমোদিত অর্জ্জুনকৃত সুভদ্রাহরণেও সে দোষ ঘটে নাই। তবে এরূপ কন্যাহরণে কোন প্রকার দোষ আছে কি না, তাহার বিশেষ বিচার আবশ্যক, এ কথা আমরা স্বীকার করি, আমরা সে বিচার সুভদ্রাহরণের সময় করিব। কেন না, কৃষ্ণ নিজেই সে বিচার সেই সময় করিয়াছেন। অতএব এক্ষণে সে বিষয়ে কোন কথা বলিব না।

তবে ইহার ভিতর আর একটা কথা আছে। সে কালে ক্ষত্রিয়রাজগণের বিবাহের দুইটি পদ্ধতি প্রশস্ত ছিল ;—এক স্বয়ংবর বিবাহ, আর এক হরণ। কখনও কখনও এক বিবাহে দুই রকম ঘটিয়া যাইত, যথা—কাশিরাজকন্যা অম্বিকাদির বিবাহে। ঐ বিবাহে স্বয়ংবর হয়। কিন্তু আদর্শক্ষত্রিয় দেবব্রত ভীষ্ম স্বয়ংবর না মানিয়া, তিনটি কন্যাই কাড়িয়া লইয়া গেলেন। আর কন্যার স্বয়ংবর হউক, আর হরণই হউক, কন্যা এক জন লাভ করিলে, উদ্ধতস্বভাব রণপ্রিয় ক্ষত্রিয়গণ একটা যুদ্ধবিগ্রহ উপস্থিত করিতেন। ইতিহাসে দ্রৌপদী-স্বয়ংবরে এবং কাব্যে ইন্দুমতী-স্বয়ংবরে দেখিতে পাই যে, কন্যা হৃতা হয় নাই, তথাপি যুদ্ধ উপস্থিত মহাভারতের মৌলিক অংশে রুক্মিণী যে হৃতা হইয়াছিলেন, এমন কথাটা পাওয়া যায় না। শিশুপালবধপর্ব্বাধ্যায়ে কৃষ্ণ বলিতেছেন,—

> "রুক্মিণ্যামস্য মূঢ়স্য প্রার্থনাসীন্মুমূর্ষতঃ।
> ন চ তাং প্রাপ্তবান্ মূঢ়ঃ শূদ্রো বেদশ্রুতীমিব॥"
> শিশুপালবধপর্ব্বাধ্যায়ে, ৪৫ অধ্যায়, ১৫ শ্লোকঃ।

শিশুপাল উত্তর করিলেন :—

> "মৎপূর্ব্বাং রুক্মিণীং কৃষ্ণ সংসৎসু পরিকীর্ত্তয়ন্।
> বিশেষতঃ পার্থিবেষু ব্রীড়াং ন কুরুষে কথম্॥
> মন্যমানো হি কঃ সৎসু পুরুষঃ পরিকীর্ত্তয়েৎ।
> অন্যপূর্ব্বাং স্ত্রিয়ং জাতু ত্বদন্যো মধুসূদন॥"
> শিশুপালবধপর্ব্বাধ্যায়ে ৪৫ অধ্যায়ে,
> ১৮ ১৯ শ্লোকঃ

ইহাতে এমন কিছুই নাই যে, তাহা হইতে বুঝিতে পারিব যে, রুক্মিণী হৃতা হইয়াছিলেন, বা তজ্জন্য কো[ন] যুদ্ধ হইয়াছিল। তার পর উদ্যোগপর্ব্বে আর এ[ক] স্থানে আছে,—

যো রুক্মিণীমেকরথেন ভোজান্
উৎসাদ্য রাজ্ঞঃ সমরে প্রসহ্য।
উবাহভার্য্যাং যশসা জ্বলন্তীং
যস্যাং জজ্ঞে রৌক্মিণেয়ো মহাত্মা॥"

ইহাতে যুদ্ধের কথা আছে, কিন্তু হরণের কথা নাই। আর এক স্থানে রুক্মিণীহরণবৃত্তান্ত আছে। উদ্যোগপর্ব্বে সৈন্যনির্যাণসময়ে রুক্মিণীর ভ্রাতা রুক্মী পাণ্ডবদিগের শিবিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তদুপলক্ষে কথিত হইতেছে:—

"বাহুবলগর্ব্বিত রুক্মী পূর্ব্বে ধীমান্ বাসুদেবের রুক্মিণীহরণ সহ্য করিতে না পারিয়া, 'আমি কৃষ্ণকে বিনষ্ট না করিয়া কদাচ প্রতিনিবৃত্ত হইব না,' এইরূপ প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক প্রবৃদ্ধ ভাগীরথীর ন্যায় বেগবতী বিচিত্র আয়ুধধারিণী চতুরঙ্গিণী সেনা সমভিব্যাহারে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইয়াছিলেন। পরে তাঁহার সন্নিহিত হইবামাত্র পরাজিত ও লজ্জিত হইয়া প্রতিগমন করিলেন। কিন্তু যে স্থানে বাসুদেব কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন, তথায় ভোজকট নামক প্রভূত সৈন্য ও গজবাজিসম্পন্ন সুবিখ্যাত এক নগর সংস্থাপন করিয়াছিলেন। এক্ষণে সেই নগর হইতে ভোজরাজ রুক্মী এক অক্ষৌহিণী সেনা সমভিব্যাহারে সত্বরে পাণ্ডবগণের নিকট আগমন করিলেন এবং পাণ্ডবগণের অজ্ঞাতসারে কৃষ্ণের প্রিয়ানুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত কবচ, ধনু, তলবার, খড়্গ ও শরাসন ধারণ করিয়া আদিত্যসঙ্কাশ ধ্বজের সহিত পাণ্ডবসৈন্যমণ্ডলীমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।"

এই কথা উদ্যোগপর্ব্বে ১৫৭ অধ্যায়ে আছে। ঐ অধ্যায়ের নাম রুক্মিপ্রত্যাখ্যান। মহাভারতের যে পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়ের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, তাহাতে লিখিত আছে যে, উদ্যোগপর্ব্বে ১৮৬ অধ্যায় এবং ৬৬৯৮ শ্লোক আছে।

"উদ্যোগপর্ব্বনির্দ্দিষ্টং সন্ধিবিগ্রহমিশ্রিতম্।
অধ্যায়ানাং শতং প্রোক্তং ষড়শীতির্মহর্ষিণা॥
শ্লোকানাং ষট্ সহস্রাণি তাবন্ত্যেব শতানি চ।
শ্লোকাশ্চ নবতিঃ প্রোক্তাস্তথৈবাষ্টৌ মহাত্মনা॥"
মহাভারতম্, আদিপর্ব্ব।

এক্ষণে মহাভারতে ১৯৭ অধ্যায় পাওয়া যায়। অতএব ১১ অধ্যায় পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায় সঙ্কলিত হওয়ার পরে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে উদ্যোগপর্ব্বে ৭৬৫৭ শ্লোক পাওয়া যায়। অতএব প্রায় এক হাজার শ্লোক প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। প্রক্ষিপ্ত এই একাদশ অধ্যায় ও হাজার শ্লোক কোন্গুলি? প্রথমেই দেখিতে হয় যে, উদ্যোগপর্ব্বান্তর্গত কোন্ বৃত্তান্তগুলি পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়ে ধৃত হয় নাই। এই রুক্মিসমাগম বা রুক্মিপ্রত্যাখ্যান পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়ে ধৃত হয় নাই। অতএব ঐ ১৫৭ অধ্যায় প্রক্ষিপ্ত একাদশ অধ্যায়ের মধ্যে একটি, ইহা বিচারসঙ্গত। এই রুক্মিপ্রত্যাখ্যান-পর্ব্বাধ্যায়ের সঙ্গে মহাভারতের কোন সম্বন্ধ নাই। রুক্মী সসৈন্যে আসিলেন এবং অর্জ্জুন কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলেন, পশ্চাৎ দুর্য্যোধন কর্ত্তৃকও পরিত্যক্ত হইলেন, পশ্চাৎ স্বস্থানে চলিয়া গেলেন, ইহা ভিন্ন মহাভারতের সঙ্গে তাঁহার আর কোন সম্বন্ধ নাই। এই দুইটি লক্ষণ একত্র করিয়া বিচার করিয়া দেখিলে অবশ্য বুঝিতে হইবে যে, ১৫৭ অধ্যায় প্রক্ষিপ্ত। কাজেই রুক্মিণীহরণ বৃত্তান্ত মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত। ইহার অন্যতর প্রমাণ এই যে, বিষ্ণুপুরাণে আছে যে, মহাভারতের যুদ্ধের পূর্ব্বেই রুক্মী বলরাম কর্ত্তৃক অক্ষক্রীড়াজনিত বিবাদে নিহত হইয়াছিলেন। রুক্মিণীকে শিশুপাল কামনা করিয়াছিলেন, ইহা সত্য এবং তিনি রুক্মিণীকে বিবাহ করিতে পান নাই—কৃষ্ণ তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, ইহাও সত্য। বিবাহের পর একটা যুদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু 'হরণ' কথাটা মৌলিক মহাভারতে কোথাও নাই। হরিবংশে ও পুরাণে আছে।

শিশুপাল ভীষ্মকে তিরস্কারের সময় কাশিরাজের কন্যাহরণ জন্য তাঁহাকে গালি দিয়াছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণকে তিরস্কারের সময় রুক্মিণীহরণের কোন কথাও তুলেন নাই। অতএব বোধ হয় না যে, রুক্মিণী হৃতা হইয়াছিলেন। পূর্ব্বোদ্ধৃত কথোপকথনে ইহাই সত্য বোধ হয় যে, শিশুপাল রুক্মিণীকে প্রার্থনা করিয়াছিলেন; কিন্তু ভীষ্মক রুক্মিণীকে কৃষ্ণকেই সম্প্রদান করিয়াছিলেন। তার পর তাঁহার পুত্র রুক্মী শিশুপালের পক্ষ হইয়া বিবাদ উপস্থিত করিয়াছিলেন। রুক্মী অতিশয় কলহপ্রিয় ছিলেন। অনিরুদ্ধের বিবাহকালে দ্যূতোপলক্ষে বলরামের সঙ্গে কলহ উপস্থিত করিয়া নিজেই নিহত হইয়াছিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

নরকবধাদি

কথিত হইয়াছে, নরকাসুর নামে পৃথিবীর এক পুত্র ছিল। প্রাগ্জ্যোতিষে তাহার রাজধানী। সে অত্যন্ত দুর্ব্বিনীত ছিল। ইন্দ্র স্বয়ং দ্বারকায় আসিয়া তাহার নামে কৃষ্ণের নিকট নালিশ করিলেন। অন্যান্য দুষ্কর্ম্মের মধ্যে নরক, ইন্দ্র, বিষ্ণু প্রভৃতি আদিত্যদিগের মাতা অদিতির কুণ্ডল চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছিল। কৃষ্ণ ইন্দ্রের নিকট নরকবধে

প্রতিশ্রুত হইয়া প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে গিয়া নরককে বধ করিলেন। নরকের ষোল হাজার কন্যা ছিল, তাহাদিগের সকলকে লইয়া আসিয়া বিবাহ করিলেন। নরকমাতা পৃথিবী নরকাপহৃত দিতিকুণ্ডল আনিয়া কৃষ্ণকে উপহার দিলেন এবং বলিয়া গেলেন যে, কৃষ্ণ যখন বরাহ অবতার হইয়াছিলেন, তখন পৃথিবীর উদ্ধার জন্য বরাহের যে স্পর্শ, সেই স্পর্শে পৃথিবী গর্ভবতী হইয়া নরককে প্রসব করিয়াছিলেন।

সমস্তই অতিপ্রকৃত এবং সমস্তই অতি মিথ্যা। বিষ্ণু বরাহ-রূপ ধারণ করেন নাই, প্রজাপতি পৃথিবীর উদ্ধারের জন্য বরাহ-রূপ ধারণ করিয়াছিলেন, ইহাই বেদে আছে। কৃষ্ণের সময় নরক প্রাগ্‌জ্যোতিষের রাজা ছিলেন না—ভগদত্ত প্রাগ্‌জ্যোতিষের রাজা ছিলেন। তিনি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জ্জুনহস্তে নিহত হন। ফলতঃ ইন্দ্রের দ্বারকাগমন, পৃথিবীর গর্ভাধান এবং এক জনের ষোড়শ সহস্র কন্যা ইত্যাদি সকলই অতিপ্রকৃত উপন্যাসমাত্র। কৃষ্ণের ষোড়শ সহস্র মহিষী থাকাও এই উপন্যাসের অংশমাত্র এবং মিথ্যা গল্প, ইহা পাঠককে আর বলিতে হইবে না।

এই নরকাসুর বধ হইতে বিষ্ণুপুরাণের মতে পারিজাত-হরণের সূত্রপাত। কৃষ্ণ দিতির কুণ্ডল লইয়া দিতিকে দিবার জন্য সত্যভামাসমভিব্যাহারে ইন্দ্রালয়ে গমন করিলেন। সেখানে সত্যভামা পারিজাত কামনা করায়, পারিজাতবৃক্ষ লইয়া ইন্দ্রের সঙ্গে কৃষ্ণের যুদ্ধ বাধিল। ইন্দ্র পরাস্ত হইলেন। হরিবংশে ইহা ভিন্নপ্রকারে লিখিত আছে। কিন্তু যখন আমরা বিষ্ণুপুরাণকে হরিবংশের পূর্ব্বগামী গ্রন্থ বিবেচনা করি, তখন এখানে বিষ্ণুপুরাণেরই অনুবর্ত্তী হইলাম। উভয়গ্রন্থ-কথিত বৃত্তান্তই অত্যদ্ভুত ও অতিপ্রকৃত। যখন আমরা ইন্দ্র, ইন্দ্রালয় এবং পারিজাতের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই অবিশ্বাসী, তখন এই সমস্ত পারিজাতহরণবৃত্তান্তই আমাদের পরিহার্য্য।

ইহার পর বাণাসুরবধবৃত্তান্ত। তাহাও ঐরূপ অতিপ্রকৃত অদ্ভুত ব্যাপারপরিপূর্ণ, এজন্য তাহাও আমরা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য। তাহার পর পৌণ্ড্র বাসুদেববধ এবং বারাণসীদাহ। ইহার কতকটা ঐতিহাসিকতা আছে বোধ হয়। পৌণ্ড্র জাতির কথা ঐতিহাসিক সময়েও বিবিধ দেশী বিদেশী গ্রন্থে পাওয়া যায়। রামায়ণে তাহাদিগকে দাক্ষিণাত্যে দেখা যায়, কিন্তু মহাভারতের সময়ে তাহারা আধুনিক বাঙ্গালার পশ্চিমভাগবাসী। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পৌণ্ড্রা উপস্থিত ছিল, মহাভারতে তাহারা অনার্য্যজাতির মধ্যে গণিত হইয়াছে। দশকুমারচরিতেও তাহাদিগের কথা আছে এবং একজন চৈনিক পরিব্রাজক তাহাদিগকে বাঙ্গালাদেশে স্থাপিত দেখিয়া গিয়াছেন। তিনি তাহাদিগের রাজধানী পৌণ্ড্রবর্দ্ধনেও গিয়াছিলেন। কৃষ্ণের সময়ে যিনি পৌণ্ড্রদিগের রাজা ছিলেন, তাঁহারও নাম বাসুদেব। বাসুদেব শব্দের অনেক অর্থ হয়। যিনি বসুদেবের পুত্র, তিনি বাসুদেব এবং যিনি সর্ব্বনিবাস অর্থাৎ সর্ব্বভূতের বাসস্থান, তিনিও বাসুদেব। * অতএব যিনি ঈশ্বরের অবতার, তিনিই প্রকৃত বাসুদেব নামের অধিকারী। এই পৌণ্ড্রক বাসুদেব প্রচার করিলেন যে, দ্বারকানিবাসী বাসুদেব জাল বাসুদেব; তিনি নিজেই প্রকৃত বাসুদেব—ঈশ্বরাবতার। তিনি কৃষ্ণকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, তুমি আমার নিকটে আসিয়া শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মাদি যে সকল চিহ্নে আমারই প্রকৃত অধিকার, তাহা আমাকে দিবে। কৃষ্ণ "তথাস্তু" বলিয়া পৌণ্ড্ররাজ্যে গমন করিলেন এবং চক্রাদি অস্ত্র পৌণ্ড্রকের প্রতি ক্ষিপ্ত করিয়া তাহাকে নিহত করিলেন। বারাণসীর অধিবাসিগণ পৌণ্ড্রকের পক্ষ হইয়াছিল এবং পৌণ্ড্রকের মৃত্যুর পরেও কৃষ্ণের সঙ্গে শত্রুতা করিয়া যুদ্ধ করিতেছিল। এজন্য তিনি বারাণসী আক্রমণ করিয়া শত্রুগণকে নিহত করিলেন এবং বারাণসী দগ্ধ করিলেন

এ স্থলে শত্রুকে নিহত করা অধর্ম্ম নহে; কিন্তু নগরদাহ ধর্ম্মানুমোদিত নহে। পরম ধর্ম্মাত্মা কৃষ্ণের দ্বারা এরূপ কার্য্য কেন হইয়াছিল, তাহার বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ কিছু পাওয়া যায় না। বিষ্ণুপুরাণে লেখা আছে যে, কাশিরাজ কৃষ্ণহস্তে নিহত হইলে, তাঁহার পুত্র মহাদেবের তপস্যা করিয়া কৃষ্ণের বধের নিমিত্ত "কৃত্যা উৎপন্ন হউক" এই বর প্রার্থনা করিলেন। কৃত্যা অভিচারকে বলে। অর্থাৎ যজ্ঞ হইতে শরীর-বিশিষ্টা অমোঘ কোন শক্তি উৎপন্ন হইয়া শত্রুর বধসাধন করে। মহাদেব প্রার্থিত বর দিলেন। কৃত্যা উৎপন্ন হইয়া ভীষণ মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক কৃষ্ণের বধার্থ ধাবমান হইল। কৃষ্ণ সুদর্শনচক্রকে আজ্ঞা করিলেন যে, তুমি এই কৃত্যাকে সংহার কর। বৈষ্ণবচক্রের প্রভাবে মাহেশ্বরী কৃত্যা বিধ্বস্তপ্রভাবা হইয়া পলায়ন করিল। চক্রও পশ্চাদ্ধাবিত হইল। কৃত্যা বারাণসীর নগরমধ্যে প্রবেশ করিল। চক্রানলে সমস্ত পুরী দগ্ধ হইয়া গেল। ইহা অতিশয় অনৈসর্গিক ও অবিশ্বাস-যোগ্য ব্যাপার। হরিবংশে পৌণ্ড্রকবধের কথা আছে কিন্তু বারাণসীদাহের কথা নাই। কিন্তু ইহার কিঞ্চিৎ প্রসঙ্গ মহাভারতে আছে। অতএব বারাণসীদাহ

* "বসুঃ সর্ব্বনিবাসশ্চ বিশ্বানি যস্য লোমসু স চ দেবঃ পরং ব্রহ্ম বাসুদেব ইতি স্মৃতঃ।"

অনৈতিহাসিক বলিয়া পরিত্যাগ করিতে পারিলাম না। তবে কি জন্য বারাণসীদাহ করিতে কৃষ্ণ বাধ্য হইয়াছিলেন, তাহার বিশ্বাসযোগ্য কারণ কিছু জানা যায় না।

যে সকল যুদ্ধের কথা বলা গেল, তদ্ভিন্ন উদ্যোগপর্ব্বে ৪৭ অধ্যায়ে অর্জ্জুনবাক্যে কৃষ্ণকৃত গান্ধারজয়, পাণ্ড্যজয়, কলিঙ্গজয়, শাল্বজয় এবং একলব্যের সংহারের প্রসঙ্গ আছে। ইহার মধ্যে শাল্বজয়-বৃত্তান্ত মহাভারতের বনপর্ব্বে আছে। ইহা ভিন্ন আর কয়টির কোন বিস্তারিত বিবরণ আমি কোন গ্রন্থে পাইলাম না। বোধহয়, হরিবংশ ও পুরাণ সকল সংগ্রহের পূর্ব্বে এই সকল যুদ্ধবিষয়ক কিংবদন্তী বিলুপ্ত হইয়াছিল। হরিবংশে ও ভাগবতে অনেক নূতন কথা আছে, কিন্তু মহাভারতে বা বিষ্ণুপুরাণে তাহার কোন প্রসঙ্গ নাই বলিয়া, আমি সে সকল পরিত্যাগ করিলাম।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

দ্বারকাবাস—স্যমন্তক

দ্বারকায় কৃষ্ণ রাজা ছিলেন না। যত দূর বুঝিতে পারা যায়, তাহাতে বোধ হয় যে, ইউরোপীয় ইতিহাসে যাহাকে Oligarchy বলে, যাদবেরা দ্বারকায় তাহাই ছিলেন। অর্থাৎ তাঁহারা সমাজের অধিনায়ক ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা পরস্পর সকলে সমানস্পর্দ্ধী। বয়োজ্যেষ্ঠকে আপনাদিগের মধ্যে প্রধান বিবেচনা করিতেন, সেই জন্য উগ্রসেনের রাজা নাম। কিন্তু এরূপ প্রধান ব্যক্তির কার্য্যতঃ বড় কর্ত্তৃত্ব থাকিত না। যে বুদ্ধিবিক্রমে প্রধান, নেতৃত্ব তাহার ঘটিত। কৃষ্ণ যাদবদিগের মধ্যে বলবীর্য্যবুদ্ধিবিক্রমে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এই জন্যই তিনি যাদবদিগের নেতৃস্বরূপ ছিলেন। তাঁহার অগ্রজ বলরাম এবং কৃতবর্ম্মা প্রভৃতি অন্যান্য বয়োজ্যেষ্ঠ যাদবগণও তাঁহার বশীভূত ছিলেন। কৃষ্ণও সর্ব্বদা তাঁহাদিগের মঙ্গলকামনা করিতেন। কৃষ্ণ হইতেই তাঁহাদিগের রক্ষা সাধিত হইত এবং কৃষ্ণ বহুরাজ্যবিজেতা হইয়াও জ্ঞাতিবর্গকে না দিয়া আপনি কোন ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতেন না। তিনি সকলের প্রতি তুল্যপ্রীতিসম্পন্ন ছিলেন। সকলেরই হিতসাধন করিতেন। জ্ঞাতিদিগের প্রতি আদর্শ মনুষ্যের যেরূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য, তাহা তিনি করিতেন। কিন্তু জ্ঞাতিভাব চিরকালই সমান। তাঁহার বলবিক্রমের ভয়ে জ্ঞাতিরা তাঁহার বশীভূত ছিল বটে, কিন্তু তাঁহার প্রতি দ্বেষশূন্য ছিল না। এ বিষয়ে কৃষ্ণ স্বয়ং যাহা নারদের কাছে বলিয়াছেন, ভীষ্ম তাহা নারদের মুখে শুনিয়া যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন। কথাগুলি সত্য হউক, মিথ্যা হউক, লোকশিক্ষার্থে আমরা তাহা মহাভারতের শান্তিপর্ব্ব হইতে উদ্ধৃত করিতেছি,—

“জ্ঞাতিদিগকে ঐশ্বর্য্যের অর্দ্ধাংশ প্রদান ও তাহাদিগের কটুবাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাদিগের দাসের ন্যায় অবস্থান করিতেছি। বহ্নিলাভার্থী ব্যক্তি যেমন অরণিকাষ্ঠকে মথিত করিয়া থাকে, তদ্রূপ জ্ঞাতিবর্গের দুর্ব্বাক্য নিরন্তর আমার হৃদয় দগ্ধ করিতেছে। বলদেব বল, গদ সুকুমারতা এবং আমার আত্মজ প্রদ্যুম্ন সৌন্দর্য্যপ্রভাবে জনসমাজে অদ্বিতীয় বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন। আর অন্ধক ও বৃষ্ণিবংশীয়েরাও মহাবলপরাক্রান্ত, উৎসাহসম্পন্ন ও অধ্যবসায়শালী; তাঁহারা যাহার সহায়তা না করেন, সে বিনষ্ট হয় এবং যাহার সহায়তা করেন, সে অনায়াসে অসামান্য ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া থাকে। ঐ সকল ব্যক্তি আমার পক্ষ থাকিতেও আমি অসহায় হইয়া কালযাপন করিতেছি। আহুক ও অক্রূর আমার পরম সুহৃৎ, কিন্তু ঐ দুই জনের মধ্যে এক জনকে স্নেহ করিলে অন্যের ক্রোধোদ্দীপন হয়; সুতরাং আমি কাহারই প্রতি স্নেহ প্রকাশ করি না। আর নিতান্ত সৌহার্দ্দবশতঃ উঁহাদিগকে পরিত্যাগ করাও সুকঠিন। অতঃপর আমি এই স্থির করিলাম যে, আহুক ও অক্রূর যাহার পক্ষ, তাহার দুঃখের পরিসীমা নাই, আর তাঁহারা যাহার পক্ষ নহেন, তাহা অপেক্ষাও দুঃখী আর কেহই নাই। যাহা হউক, এক্ষণে আমি দ্যূতকারী সহোদরদ্বয়ের মাতার ন্যায়, উভয়েরই জয় প্রার্থনা করিতেছি। হে নারদ! আমি ঐ দুই মিত্রকে আয়ত্ত করিবার নিমিত্ত এইরূপ কষ্ট পাইতেছি।”

এই কথার উদাহরণস্বরূপ স্যমন্তক মণির বৃত্তান্ত পাঠককে উপহার দিতে ইচ্ছা করি। স্যমন্তক মণির বৃত্তান্ত অতিপ্রকৃত-পরিপূর্ণ। অতিপ্রকৃত অংশ বাদ দিলে যেটুকু থাকিবে, তাহাও কতদূর সত্য, বলা যায় না। যাই হউক, স্থূল বৃত্তান্ত পাঠককে শুনাইতেছি।

সত্রাজিৎ নামে একজন যাদব দ্বারকায় বাস করিতেন। তিনি একটি অতি উজ্জ্বল সর্ব্বজনলোভনীয় মণি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মণির নাম স্যমন্তক। কৃষ্ণ সেই মণি দেখিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, ইহা যাদবাধিপতি উগ্রসেনেরই যোগ্য। কিন্তু জ্ঞাতিবিরোধ ভয়ে সত্রাজিতের নিকট মণি প্রার্থনা করেন নাই, কিন্তু সত্রাজিৎ মনে ভয় করিলেন যে, কৃষ্ণ এই মণি চাহিবেন। চাহিলে তিনি রাখিতে পারিবেন না, এই ভয়ে মণি তিনি নিজে ধারণ না করিয়া আপনার

ভ্রাতা প্রসেনকে দিয়াছিলেন। প্রসেন সেই মণি ধারণ করিয়া এক দিন মৃগয়ায় গিয়াছিলেন। বনমধ্যে একটা সিংহ তাঁহাকে হত করিয়া সেই মণি মুখে করিয়া লইয়া চলিয়া যায়। জাম্ববান্ সিংহকে হত করিয়া সেই মণি গ্রহণ করে। জাম্ববান্ একটা ভল্লুক। কথিত আছে যে, সে অপর যুগে রামের বানর-সেনার মধ্যে থাকিয়া রামের পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিল।

এ দিকে প্রসেন নিহত এবং মণি অন্তর্হিত জানিতে পারিয়া দ্বারকাবাসী লোকে এইরূপ সন্দেহ করিল যে, কৃষ্ণের যখন এই মণি লইবার ইচ্ছা ছিল, তখন তিনিই প্রসেনকে মারিয়া মণি গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। এইরূপ লোকাপবাদ কৃষ্ণের অসহ্য হওয়ায় তিনি মণির সন্ধানে বহির্গত হইলেন। যেখানে প্রসেনের মৃতদেহ দেখিলেন, সেইখানে সিংহের পদচিহ্ন দেখিতে পাইলেন, তাহা সকলকে দেখাইয়া আপনার কলঙ্ক অপনীত করিলেন। পরে সিংহের পদচিহ্নানুসরণ করিয়া ভল্লুকের পদচিহ্ন দেখিতে পাইলেন। সেই পদচিহ্ন ধরিয়া গর্ত্তের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় জাম্ববানের পুত্র-পালিকা ধাত্রীর হস্তে সেই স্যমন্তক মণি দেখিতে পাইলেন। পরে জাম্ববানের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তাহাকে পরাভব করিলেন। তখন জাম্ববান্ তাঁহাকে স্যমন্তক মণি দিল এবং আপনার কন্যা জাম্ববতীকে কৃষ্ণে সম্প্রদান করিল। কৃষ্ণ মণি লইয়া দ্বারকায় আসিয়া মণি সত্রাজিৎকে প্রত্যর্পণ করিলেন। তিনি পরস্ব কামনা করিতেন না। কিন্তু সত্রাজিৎ কৃষ্ণের উপর অভূতপূর্ব্ব কলঙ্ক আরোপিত করিয়াছিলেন, এই ভয়ে ভীত হইয়া কৃষ্ণের তুষ্টি-সাধনার্থ আপনার কন্যা সত্যভামাকে কৃষ্ণে সম্প্রদান করিলেন। সত্যভামা সর্ব্বজনপ্রার্থনীয়া রূপবতী কন্যা ছিলেন। এজন্য তিন জন প্রধান যাদব, অর্থাৎ শতধন্বা, মহাবীর কৃতবর্ম্মা এবং কৃষ্ণের পরম ভক্ত ও সুহৃৎ অক্রূর ঐ কন্যাকে কামনা করিয়াছিলেন। এক্ষণে সত্যভামা কৃষ্ণে সম্প্রদত্তা হওয়ায় তাঁহারা আপনাদিগকে অত্যন্ত অপমানিত বিবেচনা করিলেন এবং সত্রাজিৎকে বধের জন্য ষড়যন্ত্র করিলেন। অক্রূর ও কৃতবর্ম্মা শতধন্বাকে পরামর্শ দিলেন যে, তুমি সত্রাজিৎকে বধ করিয়া তাহার মণি চুরি কর। কৃষ্ণ তোমাদের যদি বিরুদ্ধাচরণ করেন, তাহা হইলে আমরা তোমার সাহায্য করিব। শতধন্বা সম্মত হইয়া, কদাচিৎ কৃষ্ণ বারণাবতে গমন করিলে, সত্রাজিৎকে নিদ্রিত অবস্থায় বিনাশ করিয়া মণি চুরি করিলেন।

সত্যভামা পিতৃবধে শোকাতুরা হইয়া কৃষ্ণের নিকট নালিশ করিলেন। কৃষ্ণ তখন দ্বারকায় প্রত্যাগমন করিয়া বলরামকে সঙ্গে লইয়া শতধন্বার বধে উদ্যোগী হইলেন; শুনিয়া শতধন্বা কৃতবর্ম্মা ও অক্রূরের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। তাঁহারা কৃষ্ণ বলরামের সহিত শত্রুতা করিতে অস্বীকৃত হইলেন। তখন শতধন্বা অগত্যা অক্রূরকে মণি দিয়া দ্রুতগামী ঘোটকে আরোহণপূর্ব্বক পলায়ন করিলেন। কৃষ্ণ বলরাম রথে যাইতেছিলেন, রথ ঘোটককে ধরিতে পারিল না। শতধন্বার অশ্বিনীও পথক্লান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। শতধন্বা তখন পাদচারে পলায়ন করিতে লাগিল। ন্যায়যুদ্ধপরায়ণ কৃষ্ণ তখন রথে বলরামকে রাখিয়া স্বয়ং পাদচারে শতধন্বার পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। কৃষ্ণ দুই ক্রোশ গিয়া শতধন্বার মস্তকচ্ছেদন করিলেন। কিন্তু মণি তাঁহার নিকট পাইলেন না। ফিরিয়া আসিয়া বলরামকে এই কথা বলিলে, বলরাম তাঁহার কথা বিশ্বাস করিলেন না। ভাবিলেন, মণির ভাগে বলরামকে বঞ্চিত করিবার জন্য কৃষ্ণ মিথ্যা কথা বলিতেছেন। বলরাম বলিলেন, "ধিক্ তোমায়! তুমি এমন অর্থলোভী! এই পথ আছে, তুমি দ্বারকায় চলিয়া যাও, আমি আর দ্বারকায় যাইব না।" এই বলিয়া তিনি কৃষ্ণকে ত্যাগ করিয়া বিদেহ নগরে গিয়া তিন বৎসর বাস করিলেন। এ দিকে অক্রূরও দ্বারকা ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। পরে যাদবগণ তাঁহাকে অভয় দিয়া পুনর্ব্বার দ্বারকায় আনাইলেন। কৃষ্ণ তখন এক দিন সমস্ত যাদবগণকে সমবেত করিয়া অক্রূরকে বলিলেন যে, স্যমন্তকমণি তোমার নিকট আছে, আমরা তাহা জানি। সে মণি তোমারই থাক, কিন্তু সকলকে একবার দেখাও। অক্রূর ভাবিলেন, আমি যদি অস্বীকার করি, তাহা হইলে সন্ধান করিলে, আমার নিকট এখনই মণি বাহির হইবে। অতএব তিনি অস্বীকার না করিয়া মণি বাহির করিলেন। তাহা দেখিয়া বলরাম এবং সত্যভামা সেই মণি লইবার জন্য অতিশয় ব্যস্ত হইলেন। কিন্তু সত্যপ্রতিজ্ঞ কৃষ্ণ সেই মণি বলরাম বা সত্যভামা কাহাকেও দিলেন না, আপনিও লইলেন না, অক্রূরকেই প্রত্যর্পণ করিলেন।*

এই স্যমন্তকমণিবৃত্তান্তেও কৃষ্ণের ন্যায়পরতা, স্বার্থশূন্যতা, সত্যপ্রতিজ্ঞতা এবং কার্য্যদক্ষতা অতি পরিস্ফুট। কিন্তু উপন্যাসটা সত্যমূলক বলিয়া বোধ হয় না।

---

* এইরূপ বিষ্ণুপুরাণে আছে। হরিবংশ বলেন, কৃষ্ণ আপনিই মণি ধারণ করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

কৃষ্ণের বহু বিবাহ

এই স্যমন্তক মণির কথায় কৃষ্ণের বহু বিবাহের কথা আপনা হইতেই আসিয়া পড়িতেছে। তিনি রুক্মিণীকে পূর্ব্বে বিবাহ করিয়াছিলেন, এক্ষণে এক স্যমন্তকমণির প্রভাবে আর দুটি ভার্য্যা, জাম্ববতী এবং সত্যভামা লাভ করিলেন। ইহাই বিষ্ণুপুরাণ বলেন। হরিবংশ এক পৈঠা উপর গিয়া থাকেন,—তিনি বলেন, দুইটি না, চারিটি। সত্রাজিতের তিনটি কন্যা ছিল,—সত্যভামা, প্রস্বাপিনী এবং ব্রতিনী। তিনটিই তিনি শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করিলেন। কিন্তু দুই চারিটায় কিছু আসিয়া যায় না—মোট সংখ্যা না কি ষোল হাজারের উপর। এইরূপ লোকপ্রবাদ। বিষ্ণুপুরাণে ৪ অংশে আছে, "ভগবতোঽপ্যত্র মর্ত্তলোকেঽবতীর্ণস্য ষোড়শ-সহস্রাণ্যেকোত্তরশতানি স্ত্রীণামভবন্।" * কৃষ্ণের ষোল হাজার এক শত এক স্ত্রী। কিন্তু ঐ পুরাণের ৫ অংশের ২৮ অধ্যায়ে প্রধানাদিগের নাম করিয়া পুরাণকার বলিতেছেন, রুক্মিণী ভিন্ন "অন্যাশ্চ ভার্য্যাঃ কৃষ্ণস্য বভূবুঃ সপ্ত শোভনাঃ।" তার পর "ষোড়শাসন্ সহস্রাণি স্ত্রীণামন্যানি চক্রিণঃ।" তাহা হইলে দাঁড়াইল, ষোল হাজার সাত জন। ইহার মধ্যে ষোল হাজার নরক-কন্যা। সেটা আষাঢ়ে গল্প বলিয়া আমি ইতিপূর্ব্বেই বাদ দিয়াছি।

গল্পটা কত বড় আষাঢ়ে, আর এক রকম করিয়া বুঝাই। বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থ অংশের ঐ পঞ্চদশ অধ্যায়ে আছে যে, এই সকল স্ত্রীর গর্ভে কৃষ্ণের এক লক্ষ আশী হাজার পুত্র জন্মে। বিষ্ণুপুরাণেই কথিত হইয়াছে যে, কৃষ্ণ এক শত পঁচিশ বৎসর ভূতলে ছিলেন। হিসাব করিলে কৃষ্ণের বৎসরে ১৪৪০টি পুত্র ও প্রতিদিন চারিটি পুত্র জন্মিত। এ স্থলে এইরূপ কল্পনা করিতে হয় যে, কেবল কৃষ্ণের ইচ্ছায় কৃষ্ণমহিষীরা পুত্রবতী হইতেন।

এই নরকাসুরের ষোল হাজার কন্যার আষাঢ়ে গল্প ছাড়িয়া দিই। কিন্তু তদ্ভিন্ন আরও আট জন "প্রধানা" মহিষীর কথা পাওয়া যাইতেছে। এক জন রুক্মিণী। বিষ্ণুপুরাণকার বলিয়াছেন, আর সাত জন। কিন্তু ৫ অংশের ২৮ অধ্যায়ে নাম দিতেছেন আট জনের, যথা—

> "কালিন্দী মিত্রবিন্দা চ সত্যা নাগ্নজিতী তথা।
> দেবী জাম্ববতী চাপি রোহিণী কামরূপিণী॥
> মদ্ররাজসুতা চান্যা সুশীলা শীলমণ্ডনা।
> সাত্রাজিতী সত্যভামা লক্ষ্মণা চারুহাসিনী॥"

১। কালিন্দী। ২। মিত্রবিন্দা। ৩। নগ্নজিৎকন্যা সত্যা। ৪। জাম্ববতী। ৫। রোহিণী (ইনি কামরূপিণী)। ৬। মদ্ররাজসুতা সুশীলা ৭। সত্রাজিৎকন্যা সত্যভামা। ৮। লক্ষ্মণা।

রুক্মিণী লইয়া নয় জন হইল। আবার ৩২ অধ্যায়ে আর এক প্রকার। কৃষ্ণের পুত্রগণের নামকীর্ত্তন হইতেছে:—

> "প্রদ্যুম্নাদ্যা হরেঃ পুত্রা রুক্মিণ্যাঃ কথিতাস্তব।
> ভানুং ভৈমরিকঞ্চৈব সত্যভামা ব্যজায়ত॥ ১॥
> দীপ্তিমান্ তাম্রপক্ষাদ্যা রোহিণ্যাং তনয়া হরেঃ।
> বভূবুর্জাম্ববত্যাঞ্চ শাম্বাদ্যা বাহুশালিনঃ॥ ২॥
> তনয়া ভদ্রবিন্দাদ্যা নাগ্নজিত্যাং মহাবলাঃ।
> সংগ্রামজিৎপ্রধানাস্তু শৈব্যায়ান্ত্বভবন্ সুতাঃ॥ ৩॥
> বৃকাদ্যাস্তু সুতা মাদ্র্যাং গাত্রবৎপ্রমুখান্ সুতান্।
> অবাপ লক্ষ্মণাঃ পুত্রাঃ কালিন্দ্যাঞ্চ শ্রুতাদয়ঃ॥ ৪॥

এই তালিকায় পাওয়া গেল, রুক্মিণী ছাড়া,—

১। সত্যভামা (৭)। ২। রোহিণী (৫) ৩। জাম্ববতী (৪)। ৪। নাগ্নজিতী (৩)। ৫। শৈব্যা। ৬। মাদ্রী (৬)। ৭। লক্ষ্মণ (৮)। ৮। কালিন্দী (১)।

কিন্তু ৪র্থ অংশের ১৫ অধ্যায়ে আছে, "তাসাঞ্চ রুক্মিণী-সত্যভামা-জাম্ববতী-জালহাসিনী-প্রমুখা অষ্টৌ পত্ন্যঃ প্রধানাঃ।" এখানে আবার সব নাম পাওয়া গেল না, নূতন নাম "জালহাসিনী" একটা পাওয়া গেল। এই গেল বিষ্ণুপুরাণে। হরিবংশে আরও গোলযোগ।

হরিবংশে আছে;—

> "মহিষীঃ সপ্ত কল্যাণীস্ততোঽন্যা মধুসূদনঃ।
> উপযেমে মহাবাহুর্গুণোপেতাঃ কুলোদ্গতাঃ।
> কালিন্দীং মিত্রবিন্দাঞ্চ সত্যাং নাগ্নজিতীং তথা।
> সুতাং জাম্ববতশ্চাপি রোহিণীং কামরূপিণীম্।
> মদ্ররাজসুতাঞ্চাপি সুশীলাং ভদ্রলোচনাম্।
> সাত্রাজিতীং সত্যভামাং লক্ষ্মণাং জালহাসিনীম্।
> শৈব্যস্য চ সুতাং তন্বীং রূপেণাপ্সরসাং সমাম্॥"
>
> ১৫ অধ্যায়ঃ, ৬৭ শ্লোকঃ।

এখানে পাওয়া যাইতেছে যে, লক্ষ্মণাই জালহাসিনী। তাহা ধরিয়াও পাই—

১। কালিন্দী। ২। মিত্রবিন্দা। ৩। সত্যা। ৪। জাম্ববৎসুতা। ৫। রোহিণী। ৬। মাদ্রী সুশীলা। ৭। সত্রাজিৎকন্যা সত্যভামা। ৮। জালহাসিনী লক্ষ্মণা। ৯। শৈব্যা।

ক্রমে শ্রীবৃদ্ধি—রুক্মিণী ছাড়া নয় জন হইল।

* বিষ্ণুপুরাণ ৪ অং, ১৫ অঃ, ১৯।

এই গেল ১১৮ অধ্যায়ের তালিকা। হরিবংশে আবার ১৬২ অধ্যায়ে আর একটি তালিকা আছে, যথা—

"অষ্টৌ মহিষ্যঃ পুত্রিণ্য ইতি প্রধানতঃ স্মৃতাঃ।
সর্ব্বা বীরপ্রজাশ্চৈব তাস্বপত্যানি মে শৃণু॥
রুক্মিণী সত্যভামা চ দেবী নাগ্নজিতী তথা।
সুদত্তা চ তথা শৈব্যা লক্ষণা জালহাসিনী॥
মিত্রবিন্দা চ কালিন্দী জাম্ববত্যথ পৌরবী।
সুভীমা চ তথা মাদ্রী * * * *"

ইহাতে পাওয়া গেল, রুক্মিণী ছাড়া—

(১) সত্যভামা। (২) নাগ্নজিতী। (৩) সুদত্তা। (৪) শৈব্যা। (৫) লক্ষণা জালহাসিনী। (৬) মিত্রবিন্দা। (৭) কালিন্দী। (৮) জাম্ববতী। (৯) পৌরবী। (১০) সুভীমা। (১১) মাদ্রী।

হরিবংশকার ঋষি ঠাকুর, আট জন বলিয়া রুক্মিণী-সমেত বার জনের নাম দিলেন। তাহাতেও ক্ষান্ত নহেন। ইঁহাদের একে একে সন্তানগণের নামকীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন আবার বাহির হইল—

(১২) সুদেবা। (১৩) উপাসঙ্গ। (১৪) কৌশিকী (১৫) সুতসোমা। (১৬) যৌধিষ্ঠিরী।*

এ ছাড়া পূর্ব্বে সত্রাজিতের আর দুই কন্যা ব্রতিনী এবং প্রস্বাপিনীর কথা বলিয়াছেন।

এ ছাড়া মহাভারতে নূতন দুইটি নাম পাওয়া যায়—গান্ধারী ও হৈমবতী। † সকল নামগুলি একত্র করিলে, প্রধানা মহিষী কতগুলি হয়, দেখা যাউক। মহাভারতে আছে—

(১) রুক্মিণী। (২) সত্যভামা। (৩) গান্ধারী। (৪) শৈব্যা। (৫) হৈমবতী। (৬) জাম্ববতী।

মহাভারতে আর নাম নাই, কিন্তু "অন্যা" শব্দটা আছে। তার পর বিষ্ণুপুরাণের ২৮ অধ্যায়ে, ১, ২, ৩ ছাড়া এই কয়টা নাম পাওয়া যায়:—

(৭) কালিন্দী। (৮) মিত্রবিন্দা। (৯) সত্যা নাগ্নজিতী। (১০) রোহিণী। (১১) মাদ্রী। (১২) লক্ষণা জালহাসিনী।

বিষ্ণুপুরাণের ৩২ অধ্যায়ে তদতিরিক্ত পাওয়া যায়, শৈব্যা। তাঁহার নাম উপরে লেখা আছে। তার পর হরিবংশের প্রথম তালিকায় ১১৮ অধ্যায়ে, ইহা ছাড়া নূতন নাম নাই, কিন্তু ১৬২ অধ্যায়ে নূতন পাওয়া যায়;—

(১৩) সুদত্তা। (১৪) পৌরবী। (১৫) সুভীমা। এবং ঐ অধ্যায়ে সন্তানগণনায় পাই,—

(১৬) সুদেবা। (১৭) উপাসঙ্গ। (১৮) কৌশিকী। (১৯) সুতসোমা। (২০) যৌধিষ্ঠিরী। এবং সত্যভামার বিবাহকালে কৃষ্ণে সম্প্রদত্তা,—(২১) ব্রতিনী। (২১) প্রস্বাপিনী।

আটজনের জায়গায় ২২ জন পাওয়া গেল। উপন্যাসকারদিগের খুব হাত চলিয়াছিল, এ কথা স্পষ্ট। ইহার মধ্যে ১৩ হইতে ২২ কেবল হরিবংশে আছে। এই জন্য ঐ ১০ জনকে ত্যাগ করা যাইতে পারে। তবু থাকে ১২ জন। গান্ধারী ও হৈমবতীর নাম মহাভারতের মৌসলপর্ব্ব ভিন্ন আর কোথাও পাওয়া যায় না। মৌসলপর্ব্ব যে মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত, তাহা পরে দেখাইব। এ জন্য এই দুই নামও পরিত্যাগ করা যাইতে পারে। বাকি থাকে ১০ জন।

জাম্ববতীর নাম বিষ্ণুপুরাণের ২৮ অধ্যায়ে এইরূপ লেখা আছে—

"দেবী জাম্ববতী চাপি রোহিণী কামরূপিণী।"

হরিবংশে এইরূপ,—

"সুতা জাম্ববতশ্চাপি রোহিণী কামরূপিণী।"

ইহার অর্থে যদি বুঝা যায়, জাম্ববৎসুতাই রোহিণী তাহা হইলে অর্থ অসঙ্গত হয় না, বরং সেই অর্থই সঙ্গত বোধ হয়। অতএব জাম্ববতী ও রোহিণী একই। বাকি থাকিল ৮ জন।

সত্যভামা ও সত্যাও এক। তাহার প্রমাণ উদ্ধৃত করিতেছি।

সত্রাজিৎবধের কথার উত্তরে—

"কৃষ্ণ সত্যভামামমর্ষতাম্রলোচনঃ প্রাহ, সত্যে! মমৈষাবহাসনা।"

অর্থাৎ কৃষ্ণ ক্রোধারক্তলোচনে সত্যভামাকে বলিলেন, "সত্যে! ইহা আমারই অবহাসনা।"

পুনশ্চ পঞ্চমাংশের ৩০ অধ্যায়ে, পারিজাতহরণে কৃষ্ণ সত্যভামাকে বলিতেছেন—

"সত্যে! যথা ত্বমিত্যুক্তং ত্বয়া কৃষ্ণাসকৃৎপ্রিয়ম্।"

আবশ্যক হইলে, আরও ভূরি ভূরি প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। ইহা যথেষ্ট।

[লক্ষণাহরণ ভিন্ন যদুবংশধ্বংসেও শাম্বের নায়কতা দেখা যায়। তিনিই পেটে মুষল জড়াইয়া মেয়ে সাজিয়াছিলেন। আমি এই গ্রন্থের সপ্তম খণ্ডে

---

* ইঁহারাও প্রধানা অষ্টের ভিতর গণিত হইয়াছেন। 'তাসামপত্যান্যষ্টানাং ভগবান্ প্রব্রবীতু মে।' ইহার উত্তরে এ সকল মহিষীর অপত্য কথিত হইতেছে।

† রুক্মিণী ত্বথ গান্ধারী শৈব্যা হৈমবতীত্যপি।
দেবী জাম্ববতী চৈব বিবিশুর্জাতবেদসম্॥
মৌষলপর্ব্ব ৭ অধ্যায়ঃ।

বলিয়াছি যে, এই মৌষলপর্ব্ব প্রক্ষিপ্ত। মুষলঘটিত বৃত্তান্তটা অতিপ্রকৃত, এ জন্য পরিত্যাজ্য। জাম্ববতীর বিবাহের পর সুভদ্রার বিবাহ—অনেক পরে; সুভদ্রার পৌত্র পরিক্ষিৎ যখন ৩৬ বৎসরের, তখন যদুবংশধ্বংস। সুতরাং যদুবংশধ্বংসের সময় শাম্ব প্রাচীন। প্রাচীন ব্যক্তির গর্ভিণী সাজিয়া ঋষিদের ঠকাইতে যাওয়া অসম্ভব।] *

অতএব এই দশজনের মধ্যে 'সত্যা' সত্যভামারই নাম বলিয়া পরিত্যাগ করিতে হইল। এখন আট জন পাই। যথা—

১। রুক্মিণী। ২। সত্যভামা। ৩। জাম্ববতী। ৪। শৈব্যা। ৫। কালিন্দী। ৬। মিত্রবিন্দা। ৭। মাদ্রী। ৮। চারুহাসিনী লক্ষণা।

ইহার মধ্যে পাঁচজন—শৈব্যা, কালিন্দী, মিত্রবিন্দা, লক্ষণা ও মাদ্রী সুশীলা—ইঁহারা তালিকার মধ্যে আছেন মাত্র। ইঁহাদের কখনও কার্য্যক্ষেত্রে দেখিতে পাই না। ইঁহাদের কবে বিবাহ হইল, কেন বিবাহ হইল, কেহ কিছু বলে না। কৃষ্ণজীবনে ইঁহাদের কোন সংস্পর্শ নাই। ইঁহাদের পুত্রের তালিকা কৃষ্ণপুত্রের তালিকার মধ্যে বিষ্ণুপুরাণকার লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগকে কখনও কর্ম্মক্ষেত্রে দেখি না। ইঁহারা কাহার কন্যা, কোন্ দেশসম্ভূতা, তাহার কোন কথা কোথাও নাই। কেবল সুশীলা মদ্ররাজকন্যা, ইহাই আছে। কৃষ্ণের সমসাময়িক মদ্ররাজ, নকুল-সহদেবের মাতুল কুরুক্ষেত্রের বিখ্যাত রথী—শল্য। তিনি ও কৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে সপ্তদশ দিন পরস্পরের শত্রুসেনামধ্যে অবস্থিত। অনেকবার তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইয়াছে। কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় অনেক কথা শল্যকে বলিতে হইয়াছে। শল্য সম্বন্ধীয় অনেক কথা কৃষ্ণকে বলিতে হইয়াছে। কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় অনেক কথা শল্যকে শুনিতে হইয়াছে। শল্য সম্বন্ধীয় অনেক কথা কৃষ্ণকেও শুনিতে হইয়াছে। এক পলক জন্য কিছুতেই প্রকাশ নাই যে, কৃষ্ণ শল্যের জামাতা বা ভগিনীপতি বা তাদৃশ কোন সম্বন্ধবিশিষ্ট। সম্বন্ধের মধ্যে এইটুকু পাই যে, শল্য কর্ণকে বলিয়াছেন, "অর্জ্জুন ও বাসুদেবকে এখনই বিনাশ কর।" কৃষ্ণও যুধিষ্ঠিরকে শল্যবধে নিযুক্ত করিয়া তাহার যমস্বরূপ হইলেন। কৃষ্ণ যে মাদ্রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন, ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়াই বোধ হয়। শৈব্যা, কালিন্দী, মিত্রবিন্দা এবং লক্ষণার কুলশীল, দেশ এবং বিবাহবৃত্তান্ত কিছুই কেহ জানে না। তাঁহারাও কাব্যের অলঙ্কার, সে বিষয়ে আমার সংশয় হয় না।

কেন না, কেবল মাদ্রী নয়, জাম্ববতী, রোহিণী ও সত্যভামাকেও ঐরূপ দেখি। জাম্ববতীর সঙ্গে কালিন্দী প্রভৃতির প্রভেদ এই যে, তাঁহার পুত্র শাম্বের নাম আর পাঁচজন যাদবের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে দেখা যায়। কিন্তু শাম্ব কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ, কেবল এক লক্ষণাহরণে। লক্ষণা দুর্য্যোধনের কন্যা। মহাভারত যেমন পাণ্ডবদিগের জীবনবৃত্ত, তেমনি কৌরবদিগেরও জীবনবৃত্ত। লক্ষণাহরণে যদি কিছু সত্য থাকিত, তবে মহাভারতে লক্ষণাহরণ থাকিত। তাহা নাই। জাম্ববতী নিজে ভল্লুককন্যা ভল্লুকী। ভল্লুকী কৃষ্ণভার্য্যা বা কোন মানুষের ভার্য্যা হইতে পারে না। এই জন্য রোহিণীকে কামরূপিণী বলা হইয়াছে। কামরূপিণী কেন না, ভল্লুকী হইয়াও মানবরূপিণী হইতে পারিতেন। কামরূপিণী ভল্লুকীতে আমি বিশ্বাসবান্ নহি এবং কৃষ্ণ ভল্লুককন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন, তাহাও বিশ্বাস করিতে পারি না।

সত্যভামার পুত্র ছিল শুনি, কিন্তু তাঁহারা কখনও কোন কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত নহেন। তাঁহার প্রতি সন্দেহের এই প্রথম কারণ। তবে সত্যভামা নিজে রুক্মিণীর ন্যায় মধ্যে মধ্যে কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত বটে। তাঁহার বিবাহবৃত্তান্তও সবিস্তারে আলোচনা করা গিয়াছে।

মহাভারতের বনপর্ব্বের মার্কণ্ডেয়সমস্যাপর্ব্বাধ্যায়ে সত্যভামাকে পাওয়া যায়। ঐ পর্ব্বাধ্যায় প্রক্ষিপ্ত, মহাভারতের বনপর্ব্বের সমালোচনাকালে পাঠক তাহা দেখিতে পাইবেন। এখানে দ্রৌপদী-সত্যভামাসংবাদ বলিয়া একটি ক্ষুদ্র পর্ব্বাধ্যায় আছে। তাহাও প্রক্ষিপ্ত। মহাভারতীয় কথার সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। উহা স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কিরূপ আচরণ কর্ত্তব্য, তৎসম্বন্ধীয় একটি প্রবন্ধমাত্র। প্রবন্ধটার লক্ষণ আধুনিক।

তার পর উদ্যোগপর্ব্বেও সত্যভামাকে দেখিতে পাই—যানসন্ধি-পর্ব্বাধ্যায়ে। সে স্থানও প্রক্ষিপ্ত, যানসন্ধি-পর্ব্বাধ্যায়ের সমালোচনাকালে দেখাইব। কৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে বরণ হইয়া উপপ্লব্য নগরে আসিয়াছিলেন—যুদ্ধযাত্রায় সত্যভামাকে সঙ্গে আনিবার সম্ভাবনা ছিল না, এবং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যে সত্যভামা সঙ্গে ছিলেন না, তাহা মহাভারত পড়িলেই জানা যায়। যুদ্ধপর্ব্ব সকলে এবং তৎপরবর্ত্তী পর্ব্ব সকলে কোথাও আর সত্যভামার কথা নাই।

কেবল কৃষ্ণের মানবলীলাসম্বরণের পর মৌসলপর্ব্বে সত্যভামার নাম আছে। কিন্তু মৌসলপর্ব্বও প্রক্ষিপ্ত, তাহাও পরে দেখাইব।

ফলতঃ মহাভারতের যে সকল অংশ নিঃসন্দেহ মৌলিক বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে, তাহার

* [ ] চিহ্নিত অংশ ক্রোড়পত্র (গ) হইতে উদ্ধৃত।

কোথাও সত্যভামার নাম নাই। প্রক্ষিপ্ত অংশ সকলেই আছে। সত্যভামা সম্বন্ধীয় সন্দেহের এই দ্বিতীয় কারণ।

তার পর বিষ্ণুপুরাণ। বিষ্ণুপুরাণে ইঁহার বিবাহ-বৃত্তান্ত স্যমন্তক মণির উপাখ্যানমধ্যে আছে। যে আষাঢ়ে গল্পে কৃষ্ণের সঙ্গে ভল্লুকসুতার পরিণয়, ইহার সঙ্গে পরিণয় সেই আষাঢ়ে গল্পে। তার পর কথিত হইয়াছে যে, এই বিবাহের জন্য দ্বেষবিশিষ্ট হইয়া শতধন্বা সত্যভামার পিতা সত্রাজিৎকে মারিয়াছিলেন। কৃষ্ণ তখন বারণাবতে, জতুগৃহদাহপ্রবাদ জন্য পাণ্ডবদিগের অন্বেষণে গিয়াছিলেন। সেইখানে সত্যভামা তাঁহার নিকট নালিশ করিয়া পাঠাইলেন। কথাটা মিথ্যা। কৃষ্ণ কখনও বারণাবতে যান নাই—গেলে মহাভারতে থাকিত। তাহা নাই। এই সকল কথা সন্দেহের তৃতীয় কারণ।

তার পর, বিষ্ণুপুরাণে সত্যভামাকে কেবল পারিজাতহরণবৃত্তান্তে পাই। সেটা অনৈসর্গিক অলীক ব্যাপার; প্রকৃত ও বিশ্বাসযোগ্য ঘটনায় তাঁহাকে বিষ্ণুপুরাণে কোথাও পাই না। সন্দেহের এই চতুর্থ কারণ।

মহাভারতে আদিপর্ব্বে সম্ভবপর্ব্বাধ্যায়ের সপ্তষষ্টি অধ্যায়ের নাম 'অংশাবতারণ।' মহাভারতের নায়ক-নায়িকাগণ কে কোন্ দেব দেবী অসুর রাক্ষসের অংশে জন্মিয়াছিল, তাহাই ইহাতে লিখিত হইয়াছে। শেষভাগে লিখিত আছে যে, কৃষ্ণ নারায়ণের অংশ, বলরাম শেষনাগের অংশ, প্রদ্যুম্ন সনৎকুমারের অংশ, দ্রৌপদী শচীর অংশ, কুন্তী ও মাদ্রী সিদ্ধি ও ধৃতির অংশ। কৃষ্ণমহিষীগণ সম্বন্ধে লেখা আছে যে, কৃষ্ণের ষোড়শ সহস্র মহিষী অপ্সরোগণের অংশ এবং রুক্মিণী লক্ষ্মীদেবীর অংশ। আর কোনও কৃষ্ণমহিষীর নাম নাই। সন্দেহের এই পঞ্চম কারণ। সন্দেহের এ কারণ কেবল সত্যভামার সম্বন্ধে নাই। রুক্মিণী ভিন্ন কৃষ্ণের সকল প্রধানা মহিষীদিগের প্রতি বর্ত্তে। নরকের ষোড়শ সহস্র কন্যার অনৈসর্গিক কথাটা ছাড়িয়া দিলে, রুক্মিণী ভিন্ন কৃষ্ণের আর কোনও মহিষী ছিল না, ইহাই মহাভারতের এই অংশ দ্বারা প্রমাণিত হয়।

ভল্লুকদৌহিত্র শাম্ব সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহা বাদ দিলে, রুক্মিণী ভিন্ন আর কোনও কৃষ্ণমহিষীর পুত্রপৌত্র কাহাকেও কোন কর্ম্মক্ষেত্রে দেখা যায় না। রুক্মিণীবংশই রাজা হইল—আর কাহারও বংশের কেহ কোথাও রহিল না।

এই সকল কারণে আমার খুব সন্দেহ যে, কৃষ্ণের একাধিক মহিষী ছিল না। এমন হইতেও পারে, ছিল। তখনকার এই রীতিই ছিল। পঞ্চপাণ্ডবের সকলেরই একাধিক মহিষী ছিল। আদর্শ ধার্ম্মিক ভীষ্ম কনিষ্ঠ ভ্রাতার জন্য কাশিরাজের তিনটি কন্যা হরণ করিয়া আনিয়াছিলেন। একাধিক বিবাহ যে কৃষ্ণের অনভিমত, এ কথাটাও কোথাও নাই; আমিও বিচারে কোথাও পাই নাই যে, পুরুষের একাধিক বিবাহ সকল অবস্থাতেই অধর্ম্ম। ইহা নিশ্চিত বটে যে, সচরাচর অকারণে পুরুষের একাধিক বিবাহ অধর্ম্ম। কিন্তু সকল অবস্থাতে নহে। যাহার পত্নী কুষ্ঠগ্রস্ত বা এরূপ রুগ্ন যে, সে কোনমতেই সংসারধর্ম্মের সহায়তা করিতে পারে না, তাহার দারান্তর পরিগ্রহ পাপ, এমন কথা আমি বুঝিতে পারি না। যাহার স্ত্রী ধর্ম্মভ্রষ্টা কুলকলঙ্কিনী, সে যে কেন আদালতে না গিয়া, দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিতে পারিবে না, তাহা আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আসে না। আদালতে যে গৌরববৃদ্ধি হয়, তাহার উদাহরণ আমরা সভ্যতর সমাজে দেখিতে পাইতেছি। যাহার উত্তরাধিকারীর প্রয়োজন, কিন্তু স্ত্রী বন্ধ্যা, সে যে কেন দারান্তর গ্রহণ করিবে না, তাহা বুঝিতে পারি না। ইউরোপ য়িহুদার নিকট শিখিয়াছিল যে, কোন অবস্থাতেই দারান্তর গ্রহণ করিতে নাই। যদি ইউরোপের এ কুশিক্ষা না হইত, তাহা হইলে বোনাপার্টকে জোসেফাইনের বর্জ্জনরূপ অতি ঘোর নারকী পাতকে পতিত হইতে হইত না। অষ্টম হেন্‌রীকে কথায় কথায় পত্নীহত্যা করিতে হইত না। ইউরোপে আজি কালি সভ্যতার উজ্জ্বলালোকে এই কারণে অনেক পত্নীহত্যা পতিহত্যা হইতেছে। আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বিশ্বাস, যাহাই বিলাতী, তাহাই চমৎকার, পবিত্র, দোষশূন্য, ঊর্দ্ধাধঃ চতুর্দ্দশ পুরুষের উদ্ধারের কারণ। আমার বিশ্বাস, আমরা যেমন বিলাতের কাছে অনেক শিখিতে পারি, বিলাতও আমাদের কাছে অনেক শিখিতে পারে। তাহার মধ্যে এই বিবাহতত্ত্ব একটা কথা।

কৃষ্ণ একাধিক বিবাহ করিয়াছিলেন কি না, সে বিষয়ে কোন গণনীয় প্রমাণ নাই, ইহা দেখিয়াছি। যদি করিয়া থাকেন, তবে কেন করিয়াছিলেন, তাহারও কোন বিশ্বাসযোগ্য ইতিবৃত্ত নাই। যে যে তাঁহাকে স্যমন্তকমণি উপহার দিল, সে সঙ্গে সঙ্গে অমনি একটি কন্যা উপহার দিল, ইহা পিতামহীর উপকথা। আর নরকরাজার ষোল হাজার মেয়ে, ইহা প্রপিতামহীর উপকথা। আমরা শুনিয়া খুসী—বিশ্বাস করিতে পারি না।

চতুর্থ খণ্ড

ইন্দ্রপ্রস্থ

"অকুণ্ঠং সর্ব্বকার্য্যেষু ধর্ম্মকার্য্যার্থমুদ্যতম্।
বৈকুণ্ঠস্য চ যদ্রূপং তস্মৈ কার্য্যাত্মনে নমঃ॥"

শান্তিপর্ব্বণি ৪৭ অধ্যায়ঃ।

প্রথম পরিচ্ছেদ

দ্রৌপদীস্বয়ংবর

মহাভারতে কৃষ্ণকথা যাহা আছে, তাহার কোন্ অংশ মৌলিক এবং বিশ্বাসযোগ্য, তাহার নির্ব্বাচন জন্য প্রথম খণ্ডে যে সকল নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছি, এক্ষণে আমি পাঠককে সেই সকল স্মরণ করিতে অনুরোধ করি।

মহাভারতে কৃষ্ণকে প্রথম দ্রৌপদীস্বয়ংবরে দেখিতে পাই। আমার বিবেচনায় এই অংশের মৌলিকতায় সন্দিহান হইবার কারণ নাই। লাসেন্ সাহেব, দ্রৌপদীকে পাঞ্চালের পঞ্চজাতির একীকরণ স্বরূপ পাঞ্চালী বলিয়া, দ্রৌপদীর মানবীত্ব উড়াইয়া দিয়াছেন, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। আমিও বিশ্বাস করি না যে, যজ্ঞের অগ্নি হইতে দ্রুপদ কন্যা পাইয়াছিলেন, অথবা সেই কন্যার পাঁচটি স্বামী ছিল। তবে দ্রুপদের ঔরসকন্যা থাকা অসম্ভব নহে, এবং তাহার স্বয়ংবরে অর্জ্জুন লক্ষ্যভেদ করিয়াছিলেন, ইহা অবিশ্বাস করিবারও কারণ নাই। তার পর, তাঁহার পাঁচ স্বামী হইয়াছিল কি এক স্বামী হইয়াছিল, সে কথার মীমাংসায় আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। *

কৃষ্ণকে মহাভারতে প্রথম দ্রৌপদীস্বয়ংবরে দেখি। সেখানে তাঁহার দেবত্ব কিছুই নাই। অন্যান্য ক্ষত্রিয়দিগের ন্যায় তিনি ও অন্যান্য যাদবেরা নিমন্ত্রিত হইয়া পাঞ্চালে আসিয়াছিলেন। তবে অন্যান্য ক্ষত্রিয়েরা দ্রৌপদীর আকাঙ্ক্ষায় লক্ষ্যভেদে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু যাদবেরা কেহই সে চেষ্টা করে নাই।

পাণ্ডবেরা এই সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু নিমন্ত্রিত হইয়া নহে। দুর্য্যোধন তাঁহাদিগের প্রাণহানি করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহারা আত্মরক্ষার্থে ছদ্মবেশে বনে বনে ভ্রমণ করিতেছিলেন। এক্ষণে দ্রৌপদীস্বয়ংবরের কথা শুনিয়া ছদ্মবেশে এখানে উপস্থিত।

এই সমবেত ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-মণ্ডলমধ্যে কেবল কৃষ্ণই ছদ্মবেশে পাণ্ডবদিগকে চিনিয়াছিলেন। ইহা যে তিনি দৈবশক্তির প্রভাবে জানিতে পারিয়াছিলেন এমন ইঙ্গিতমাত্র নাই। মনুষ্যবুদ্ধিতেই তাহা বুঝিয়াছিলেন, তাঁহার উক্তিতেই ইহা প্রকাশ। তিনি বলদেবকে বলিতেছেন, "মহাশয়! যিনি এই বিস্তীর্ণ শরাসন আকর্ষণ করিতেছেন, ইনিই অর্জ্জুন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আর যিনি বাহুবলে বৃক্ষ উৎপাটনপূর্ব্বক নির্ভয়ে রাজমণ্ডলে প্রবিষ্ট হইতেছেন, ইঁহার নাম বৃকোদর।" ইত্যাদি। ইহার পরে সাক্ষাৎ হইলে যখন তাঁহাকে যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "কি প্রকারে তুমি আমাদিগকে চিনিলে?" তাহাতে তিনি উত্তর করিয়াছিলেন, "ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি কি লুকান থাকে?" পাণ্ডবদিগকে সেই ছদ্মবেশে চিনিতে পারা অতি কঠিন; আর কেহ যে চিনিতে পারে নাই, তাহা বিস্ময়কর নহে; কৃষ্ণ যে চিনিতে পারিয়াছিলেন—স্বাভাবিক মানুষবুদ্ধিতেই চিনিয়াছিলেন—ইহাতে কেবল ইহাই বুঝায় যে, অন্যান্য মনুষ্যাপেক্ষা তিনি তীক্ষ্ণবুদ্ধি ছিলেন। মহাভারতকার এ কথাটা কোথাও পরিষ্কার করিয়া বলেন নাই; কিন্তু কৃষ্ণের কার্য্যে সর্ব্বত্র দেখিতে পাই যে, তিনি মনুষ্য-

---

* পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, মহাভারতের পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়ে কথিত হইয়াছে যে, অনুক্রমণিকাধ্যায়ে ব্যাসদেব ১৫০ শ্লোকে মহাভারতের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত রচিত করিয়াছেন। ঐ অনুক্রমণিকার সংক্ষিপ্ত বিবরণে দ্রৌপদীস্বয়ংবরের কথা আছে; কিন্তু পঞ্চপাণ্ডবের সঙ্গে যে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল, এমন কথা নাই। অর্জ্জুনই তাঁহাকে লাভ করিয়াছিলেন, এই কথাই আছে।

"সমবায়ে ততো রাজ্ঞাং কন্যাং ভর্ত্তৃস্বয়ংবরাম্।
প্রাপ্তবানর্জ্জুনঃ কৃষ্ণাং কৃত্বা কর্ম্ম সুদুষ্করম্॥" ১২৫।

বুদ্ধিতে কার্য্য করেন বটে, কিন্তু তিনি সর্ব্বাপেক্ষা তীক্ষ্ণবুদ্ধি মনুষ্য। এই বুদ্ধিতে কোথাও ছিদ্র দেখা যায় না। অন্যান্য বৃত্তির ন্যায় তিনি বুদ্ধিতেও আদর্শ মনুষ্য।

অনন্তর অর্জ্জুন লক্ষ্য বিঁধিলে সমাগত রাজাদিগের সঙ্গে তাঁহার বড় বিবাদ বাধিল। অর্জ্জুন ভিক্ষুক-ব্রাহ্মণবেশধারী। একজন ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ বড় বড় রাজাদিগের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়া যাইবে, ইহা তাঁহাদিগের সহ্য হইল না। তাঁহারা অর্জ্জুনের উপর আক্রমণ করিলেন। যতদূর যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে অর্জ্জুনই জয়ী হইয়াছিলেন। এ বিবাদ কৃষ্ণের কথায় নিবারণ হইয়াছিল। মহাভারতে এইটুকু কৃষ্ণের প্রথম কাজ। তিনি কি প্রকারে বিবাদ মিটাইয়াছিলেন, সেই কথাটা বলাই আমার উদ্দেশ্য। বিবাদ মিটাইবার অনেক উপায় ছিল। তিনি বিখ্যাত বীরপুরুষ এবং বলদেব, সাত্যকি প্রভৃতি অদ্বিতীয় বীরেরা তাঁহার সহায় ছিল। অর্জ্জুন তাঁহার আত্মীয়—পিতৃস্বসার পুত্র। তিনি যাদবদিগকে লইয়া সমরক্ষেত্রে অর্জ্জুনের সাহায্যে নামিলে, তখনই বিবাদ মিটিয়া যাইতে পারিত। ভীম তাহাই করিয়াছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণ আদর্শ ধার্ম্মিক, যাহা বিনা যুদ্ধে সম্পন্ন হইতে পারে, তাহার জন্য তিনি কখনও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন নাই। মহাভারতের কোন স্থানেই ইহা নাই যে, কৃষ্ণ ধর্ম্মার্থ ভিন্ন অন্য কারণে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আত্মরক্ষার্থ ও পরের রক্ষার্থ যুদ্ধ ধর্ম্ম, আত্মরক্ষার্থ বা পরের রক্ষার্থ যুদ্ধ না করা পরম অধর্ম্ম। আমরা বাঙ্গালী জাতি, আজি সাত শত বৎসর সেই অধর্ম্মের ফলভোগ করিতেছি। কৃষ্ণ কখনও অন্য কারণে যুদ্ধ করেন নাই। আর ধর্ম্মস্থাপন জন্য তাঁহার যুদ্ধে আপত্তি ছিল না। যেখানে যুদ্ধ ভিন্ন ধর্ম্মের উন্নতি নাই, সেখানেও যুদ্ধ না করাই অধর্ম্ম। কেবল কাশীরাম দাস বা কথক ঠাকুরদের কথিত মহাভারতে যাঁহাদের অধিকার, তাঁহাদের বিশ্বাস, কৃষ্ণই সকল যুদ্ধের মূল। কিন্তু মূল মহাভারত বুদ্ধিপূর্ব্বক পড়িলে এরূপ বিশ্বাস থাকে না। তখন বুঝিতে পারা যায় যে, ধর্ম্মার্থ ভিন্ন কৃষ্ণ কখনও কাহাকেও যুদ্ধে প্রবৃত্তি দেন নাই। নিজেও ধর্ম্মার্থ ভিন্ন যুদ্ধ করেন নাই।

এখানেও কৃষ্ণ যুদ্ধের কথা মনেও আনিলেন না। তিনি বিবদমান ভূপালবৃন্দকে বলিলেন, "ভূপালবৃন্দ! ইঁহারাই রাজকুমারীকে ধর্ম্মত: লাভ করিয়াছিলেন, তোমরা ক্ষান্ত হও, আর যুদ্ধে প্রয়োজন নাই।" 'ধর্ম্মত:'! ধর্ম্মের কথাটা ত এতক্ষণ কাহারও মনে পড়ে নাই। সে কালের অনেক ক্ষত্রিয় রাজা ধর্ম্মভীত ছিলেন; রুচিপূর্ব্বক কখনও অধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেন না। কিন্তু এ সময়ে রাগান্ধ হইয়া ধর্ম্মের কথাটা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু যিনি প্রকৃত ধর্ম্মাত্মা, ধর্ম্মবৃদ্ধিই যাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য, তিনি এ বিষয়ের ধর্ম্ম কোন্ পক্ষে, তাহা ভুলেন নাই। ধর্ম্মবিস্মৃতদিগের ধর্ম্মস্মরণ করিয়া দেওয়া, ধর্ম্মানভিজ্ঞদিগকে ধর্ম্ম বুঝাইয়া দেওয়াই তাঁহার কাজ।

ভূপালবৃন্দকে কৃষ্ণ বলিলেন, "ইঁহারাই রাজকুমারীকে ধর্ম্মত: লাভ করিয়াছিলেন, অতএব আর যুদ্ধে প্রয়োজন নাই।" শুনিয়া রাজারা নিরস্ত হইলেন, যুদ্ধ ফুরাইল। পাণ্ডবেরা আশ্রমে গেলেন।

এক্ষণে ইহা বুঝা যায় যে, যদি একজন বাজে লোক দৃপ্ত রাজগণকে ধর্ম্মের কথাটা স্মরণ করিয়া দিত, তাহা হইলে দৃপ্ত রাজগণ কখনও যুদ্ধ হইতে বিরত হইতেন না। যিনি ধর্ম্মের কথাটা স্মরণ করিয়া দিলেন, তিনি মহাবলশালী এবং গৌরবান্বিত। তিনি জ্ঞান, ধর্ম্ম ও বাহুবলে সকলের প্রধান হইয়াছিলেন। সকল বৃত্তিগুলিই সম্পূর্ণরূপে অনুশীলিত করিয়াছিলেন, তাহারই ফল এই প্রাধান্য। সকল বৃত্তিগুলি অনুশীলিত না হইলে, কেহই তাদৃশ ফলদায়িনী হয় না। এইরূপ কৃষ্ণচরিত্রের পরিস্ফুট হইতেছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কৃষ্ণ-যুধিষ্ঠির-সংবাদ

অর্জ্জুন লক্ষ্য বিঁধিয়া, রাজগণের সহিত যুদ্ধ সমাপন করিয়া ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে আশ্রমে গমন করিলেন। রাজগণও স্ব স্ব স্থানে গমন করিতে লাগিলেন। এক্ষণে কৃষ্ণের কি করা কর্ত্তব্য ছিল? দ্রৌপদীর স্বয়ংবর ফুরাইল, উৎসব যাহা ছিল, তাহা ফুরাইল কৃষ্ণের পাঞ্চালে থাকিবার আর কোন প্রয়োজন ছিল না। এক্ষণে স্বস্থানে ফিরিয়া গেলেই হইত। অন্যান্য রাজগণ তাহাই করিলেন। কিন্তু কৃষ্ণ তাহা না করিয়া, বলদেবকে সঙ্গে লইয়া যেখানে ভার্গবকর্ম্মশালায় ভিক্ষুকবেশধারী পাণ্ডবগণ বাস করিতেছেন, সেইখানে গিয়া যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন।

সেখানে তাঁহার কিছু কাজ ছিল না—যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে তাঁহার পূর্ব্বে কখনও সাক্ষাৎ বা আলাপ ছিল না, কেন না মহাভারতকার লিখিয়াছেন যে, "বাসুদেব যুধিষ্ঠিরের নিকট অভিগমন ও চরণবন্দনপূর্ব্বক আপনার পরিচয় প্রদান করিলেন।" বলদেবও ঐরূপ করিলেন। যখন আপনার পরিচয় প্রদান করিতে হইল, তখন অবশ্য ইহা বুঝিতে হইবে যে, পূর্ব্বে পরস্পরের সহিত তাঁহাদিগের সাক্ষাৎ বা আলাপ ছিল না। কৃষ্ণ-

পাণ্ডবে এই প্রথম সাক্ষাৎ। কেবল পিতৃষ্বসার পুত্র বলিয়াই কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে খুঁজিয়া লইয়া তাঁহাদিগের সহিত আলাপ করিয়াছিলেন। কাজটা সাধারণ লৌকিক-ব্যবহার-অনুমোদিত হয় নাই। লোকের প্রথা আছে বটে যে, পিসিত মাসিত ভাই যদি একটা বা বড়লোক হয়, তবে উপযাচক হইয়া তাহাদের সঙ্গে আলাপ করিয়া আইসে। কিন্তু পাণ্ডবেরা তখন সামান্য ভিক্ষুকমাত্র; তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কৃষ্ণের কোন অভীষ্টই সিদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। আলাপ করিয়া কৃষ্ণও যে কোন লৌকিক অভীষ্ট সিদ্ধ করিলেন, এমন দেখা যায় না। তিনি কেবল বিনয়পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে সদালাপ করিয়া, তাঁহার মঙ্গল কামনা করিয়া ফিরিয়া আসিলেন এবং তার পর পাণ্ডবদিগের বিবাহসমাপ্তি পর্য্যন্ত পাঞ্চালে আপন শিবিরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। বিবাহ সমাপ্ত হইয়া গেলে তিনি "কৃতদার পাণ্ডবদিগের যৌতুকস্বরূপ বিচিত্র বৈদূর্য্যমণি, সুবর্ণের আবরণ, নানাদেশীয় মহার্ঘ বসন, রমণীয় শয্যা, বিবিধ গৃহসামগ্রী, বহুসংখ্যক দাসদাসী, সুশিক্ষিত গজবৃন্দ, উৎকৃষ্ট ঘোটকাবলী, অসংখ্য রথ এবং কোটি কোটি রজতকাঞ্চন শ্রেণীবদ্ধ করিয়া প্রেরণ করিলেন।" এ সকল পাণ্ডবদিগের তখন ছিল না; কেন না, তখন তাঁহারা ভিক্ষুক এবং দুরবস্থাপন্ন। অথচ এ সকলে তখন তাঁহাদের বিশেষ প্রয়োজন, কেন না, তাঁহারা রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া গৃহী হইয়াছেন। সুতরাং যুধিষ্ঠির "কৃষ্ণপ্রেরিত দ্রব্যসামগ্রী সকল আহ্লাদপূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন।" কিন্তু কৃষ্ণ তাঁহাদিগের সঙ্গে আর সাক্ষাৎ না করিয়া স্বস্থানে গমন করিলেন। তার পর তিনি পাণ্ডবদিগকে আর খোঁজেন নাই। পাণ্ডবেরা রাজ্যার্দ্ধ প্রাপ্ত হইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে নগরনির্ম্মাণপূর্ব্বক বাস করিতে লাগিলেন। যে প্রকারে পুনরায় পাণ্ডবদিগের সহিত তাঁহার মিলন হইল, তাহা পরে বলিব।

বিস্ময়ের বিষয় এই যে, যিনি এইরূপ নিঃস্বার্থ আচরণ করিতেন, যিনি দুরবস্থাগ্রস্তমাত্রেরই হিতানুসন্ধান করা নিজ জীবনের ব্রতস্বরূপ করিয়াছিলেন, পাশ্চাত্য মূর্খেরা, এবং তাঁহাদের শিষ্যগণ সেই কৃষ্ণকে দুষ্কর্ম্মানুরত, দুরভিসন্ধিযুক্ত, ক্রূর এবং পাপাচার বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ঐতিহাসিক তত্ত্বের বিশ্লেষণের শক্তি বা তাহাতে শ্রদ্ধা এবং যত্ন না থাকিলে, এইরূপ ঘটাই সম্ভব। মূল কথা এই, তিনি আদর্শ মনুষ্য, তাঁহার অন্যান্য সদ্বৃত্তির ন্যায় প্রীতিবৃত্তি পূর্ণবিকশিত ও স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হওয়াই সম্ভব। শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের প্রতি যে ব্যবহার করিলেন, তাহা অনেকেরই পূর্ব্ববর্ণিত অধ্যায়ে করা সম্ভব। যুধিষ্ঠির কুটুম্ব; যদি কৃষ্ণের সঙ্গে পূর্ব্ব হইতে তাঁহার আলাপ, প্রণয় এবং আত্মীয়তা থাকিত, তাহা হইলে তিনি যে ব্যবহার করিলেন, তাহা কেবল ভদ্রজনোচিত বলিয়াই কাজ হইতে পারিতাম। বেশী বলিবার অধিকার থাকিত না। কিন্তু যিনি অপরিচিত এবং দরিদ্র ও হীনাবস্থাপন্ন কুটুম্বকে খুঁজিয়া লইয়া আপনার কার্য্য ক্ষতি করিয়া তাঁহার উপকার করেন, তাঁহার প্রীতি আদর্শপ্রীতি। কৃষ্ণের এই কার্য্যটি ক্ষুদ্র কার্য্য বটে, কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যেই মনুষ্যের চরিত্রের যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়। একটা মহৎ কার্য্য বদমায়েসও চেষ্টাচরিত্র করিয়া করিতে পারে, এবং করিয়াও থাকে। কিন্তু যাঁহার ছোট কাজগুলি ধর্ম্মাত্মতার পরিচায়ক, তিনি যথার্থ ধর্ম্মাত্মা। তাই, আমরা মহাভারত আলোচনায় * কৃষ্ণকৃত ছোট বড় সকল কার্য্যের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, আমরা এ প্রণালীতে কখনও কৃষ্ণকে বুঝিবার চেষ্টা করি নাই। তাহা না করিয়া কৃষ্ণচরিত্রের মধ্যে কেবল "অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ" এই কথাটি লিখিয়া রাখিয়াছি অর্থাৎ যাহা সত্য এবং ঐতিহাসিক, তাহার কোন অনুসন্ধান না করিয়া, যাহা মিথ্যা এবং কল্পিত, তাহারই উপর নির্ভর করিয়া আছি। "অশ্বত্থামা হত ইতি গজ †" কথার ব্যাপারটা যে মিথ্যা, তাহা দ্রোণবধপর্ব্বাধ্যায়-সমালোচনাকালে আমরা প্রমাণীকৃত করিব।

এই বৈবাহিক পর্ব্বে কৃষ্ণসম্বন্ধে একটা বড় তামাসার কথা ব্যাসোক্ত বলিয়া কথিত হইয়াছে। তাহা আমাদিগের সমালোচ্য বিষয়ের অন্তর্গত না হইলেও, তাহার কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা আবশ্যক বিবেচনা করিলাম। দ্রুপদরাজ, কন্যার পঞ্চস্বামী হইবে শুনিয়া তাহাতে আপত্তি করিতেছেন। ব্যাস তাঁহার আপত্তি খণ্ডন করিতেছেন। খণ্ডনোপলক্ষে তিনি দ্রুপদকে একটি উপাখ্যান শ্রবণ করান। উপন্যাসটি বড় অদ্ভুত ব্যাপার। উহার স্থূল তাৎপর্য্য এই যে, ইন্দ্র একদা গঙ্গাজলে একটি রোরুদ্যমানা সুন্দরী দর্শন করেন। তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, "তুমি কেন কাঁদিতেছ?" তাহাতে সুন্দরী উত্তর করে যে, "আইস, দেখাইতেছি।" এই বলিয়া সে ইন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া

* হরিবংশ ও পুরাণ সকলে বিশ্বাসযোগ্য কথা পাওয়া যায় না বলিয়া পূর্ব্বে ইহা পারি নাই।

† পরে দেখিব, "অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ" এই বুলিটাই মহাভারতে নাই। ইহা কথক ঠাকুরের সংস্কৃত।

দেখাইয়া দিল যে, এক যুবা এক যুবতীর সঙ্গে পাশক্রীড়া করিতেছে। তাহারা ইন্দ্রের যথোচিত সম্মান না করায় ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইলেন; কিন্তু যে যুবা পাশক্রীড়া করিতেছিলেন, তিনি স্বয়ং মহাদেব। ইন্দ্রকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া তিনিও ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ইন্দ্রকে এক গর্ত্তের ভিতর প্রবেশ করিতে বলিলেন। ইন্দ্র গর্ত্তের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সেখানে তাঁহার মত আর চারিটি ইন্দ্র আছেন। শেষ মহাদেব পাঁচজন ইন্দ্রকে ডাকিয়া বলিলেন যে, "তোমরা গিয়া পৃথিবীতে মনুষ্য হও।" সেই ইন্দ্রেরাই আবার মহাদেবের কাছে প্রার্থনা করিলেন যে, "ইন্দ্রাদি পঞ্চদেব গিয়া আমাদিগকে কোন মানুষীর গর্ভে উৎপন্ন করুন।!!" সেই পাঁচজন ইন্দ্র ইন্দ্রাদির ঔরসে পঞ্চপাণ্ডব হইলেন। বিনাপরাধে মেয়েটাকে মহাদেব হুকুম দিলেন যে, "তুমি গিয়া ইহাদের পত্নী হও।" সে দ্রৌপদী হইল। সে যে কেন কাঁদিয়াছিল, তাহার আর কোন খবর নাই। অধিকতর রহস্যের বিষয় এই যে, নারায়ণ এই কথা শুনিবামাত্রই আপনার মাথা হইতে দুইগাছি চুল উপড়াইয়া ফেলিয়া দিলেন। একগাছি কাঁচা, একগাছি পাকা। পাকা-গাছটি বলরাম হইলেন, কাঁচা-গাছটি কৃষ্ণ হইলেন!!!

বুদ্ধিমান পাঠককে বোধহয় বুঝাইতে হইবে না যে, এই উপাখ্যানটি আমরা যাহাকে মহাভারতের তৃতীয় স্তর বলিয়াছি, তদন্তর্গত। অর্থাৎ ইহা মূল মহাভারতের কোন অংশ নহে। প্রথমতঃ উপাখ্যানটির রচনা এবং গঠন এখনকার বাঙ্গালার সর্ব্বনিম্নশ্রেণীর উপন্যাসলেখকদিগের প্রণীত উপন্যাসের রচনা ও গঠন অপেক্ষাও নিকৃষ্ট। মহাভারতে প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের প্রতিভাশালী কবিগণ এরূপ উপাখ্যান সৃষ্টির মহাপাপে পাপী হইতে পারেন না। দ্বিতীয়তঃ মহাভারতের অন্যান্য অংশের সঙ্গে ইহার কোন প্রয়োজনীয় সম্বন্ধ নাই। এই উপাখ্যানটির সমুদয় অংশ উঠাইয়া দিলে, মহাভারতের কোন কথাই অস্পষ্ট, অথবা কোন প্রয়োজনই অসিদ্ধ থাকিবে না। দ্রুপদরাজের আপত্তিখণ্ডন জন্য ইহার কোন প্রয়োজন নাই, কেন না, ঐ আপত্তি ব্যাসোক্ত দ্বিতীয় একটি উপাখ্যানের দ্বারা খণ্ডিত হইয়াছে। দ্বিতীয় উপাখ্যান ঐ অধ্যায়েই আছে। তাহা সংক্ষিপ্ত ও সরল এবং আদিম মহাভারতের অন্তর্গত হইলে হইতে পারে। প্রথমোক্ত উপাখ্যানটি ইহার বিরোধী। দুইটিতে দ্রৌপদীর পূর্ব্বজন্মের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার পরিচয় আছে। সুতরাং একটি যে প্রক্ষিপ্ত, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই; এবং যাহা উপরে বলিয়াছি, তাহাতে প্রথমোক্ত উপাখ্যানটিই প্রক্ষিপ্ত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হয়। তৃতীয়তঃ, এই প্রথমোক্ত উপাখ্যান মহাভারতের অন্যান্য অংশের বিরোধী। মহাভারতের সর্ব্বত্রই কথিত আছে, ইন্দ্র এক। এখানে ইন্দ্র পাঁচ। মহাভারতের সর্ব্বত্রই কথিত আছে যে, পাণ্ডবেরা ধর্ম্ম, বায়ু, ইন্দ্র এবং অশ্বিনীকুমারদিগের ঔরসপুত্র মাত্র। এখানে সকলেই এক এক জন ইন্দ্র। এই বিরোধের সামঞ্জস্যের জন্য উপাখ্যানরচনাকারী গর্দ্দভ লিখিয়াছেন যে, ইন্দ্রেরা মহাদেবের নিকট প্রার্থনা করিলেন, "ইন্দ্রাদিই আসিয়া আমাদিগকে মানুষীর গর্ভে উৎপন্ন করুন।" জগদ্বিজয়ী গ্রন্থ মহাভারত এরূপ গর্দ্দভের লেখনীপ্রসূত নহে, ইহা নিশ্চিত।

এই অশ্রদ্ধেয় উপাখ্যানটির এ স্থলে উল্লেখ করার আমাদিগের প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, কি প্রণালী অবলম্বন করিয়া আমরা মহাভারতের তিনটি স্তর ভাগ করিতেছি ও করিব, তাহা উদাহরণ দ্বারা পাঠককে বুঝাই। তা ছাড়া একটা ঐতিহাসিক তত্ত্বও ইহা দ্বারা স্পষ্টীকৃত হয়। যে বিষ্ণু বেদে সূর্য্যের মূর্ত্তিবিশেষ মাত্র, পুরাণেতিহাসের উচ্চস্তরে যিনি সর্ব্বব্যাপক ঈশ্বর, তিনি কি প্রকারে পরবর্ত্তী হতভাগ্য লেখকদিগের হস্তে দাড়ি গোঁপ, কাঁচা চুল, পাকা চুল প্রভৃতি ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইলেন, এই সকল প্রক্ষিপ্ত উপাখ্যানের দ্বারা তাহা বুঝা যায়। এই সকল প্রক্ষিপ্ত উপাখ্যানে হিন্দুধর্ম্মের অবনতির ইতিহাস পড়িতে পাই। তাই এই স্থানে ইহার উল্লেখ করিলাম। কোন কৃষ্ণদ্বেষী শৈব দ্বারা এই উপাখ্যান রচিত হইয়া মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, এমন বিবেচনাও করা যাইতে পারে। কেন না, এখানে মহাদেবই সর্ব্বনিয়ন্তা এবং কৃষ্ণ নারায়ণের একটি কেশমাত্র। মহাভারতের আলোচনায় কৃষ্ণবাদী এবং শৈবদিগের মধ্যে এইরূপ অনেক বিবাদের চিহ্ন দেখিতে পাই। এবং যে সকল অংশে সে চিহ্ন পাই, তাহার অধিকাংশই প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বোধ করিবার কারণ পাই। যদি এ কথা যথার্থ হয়, তবে ইহাই উপলব্ধি করিতে হইবে যে, এই বিবাদ আদিম মহাভারত প্রচারের অনেক পরে উপস্থিত হইয়াছিল, অর্থাৎ যখন শিবোপাসনা ও কৃষ্ণোপাসনা উভয়ই প্রবল হয়, তখন বিবাদও ঘোরতর হইয়াছিল, মহাভারতপ্রচারের সময়ে বা তাহার পরবর্ত্তী প্রথম কালে এতদুভয়ের মধ্যে কোন উপাসনাই প্রবল ছিল না। সে সময়টা বেদের দেবতার প্রবলতার সময়। যত উভয়েই প্রবল হইল, তত বিবাদ বাধিল—তত মহাভারতের কলেবর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। উভয় পক্ষেরই অভিপ্রায়, মহাভারতের দোহাই দিয়া আপনার দেবতাকে বড় করেন। এই জন্য শৈবেরা শিবমাহাত্ম্যসূচক রচনা সকল মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত

করিতে লাগিলেন। * তদুত্তরে বৈষ্ণবেরা বিষ্ণু বা কৃষ্ণমাহাত্ম্যসূচক সেইরূপ রচনা সকল গুঁজিয়া দিতে লাগিলেন। অনুশাসনপর্ব্বে এই কথার কতকগুলি উত্তম উদাহরণ পাওয়া যায়। ইচ্ছা করিলে, পাঠক পড়িয়া দেখিবেন। প্রায় সকলগুলিতে একটু একটু গর্দ্ভের গাত্রসৌরভ আছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সুভদ্রাহরণ

দ্রৌপদীস্বয়ংবরের পর সুভদ্রাহরণে কৃষ্ণের সাক্ষাৎ পাই। সুভদ্রার বিবাহে কৃষ্ণ যাহা করিয়াছিলেন, ঊনবিংশ শতাব্দীর নীতিজ্ঞেরা তাহা বড় পছন্দ করিবেন না। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর নীতিশাস্ত্রের উপর একটা জগদীশ্বরের নীতিশাস্ত্র আছে—তাহা সকল দেশে খাটিয়া থাকে। কৃষ্ণ যাহা করিয়াছিলেন, তাহা আমরা সেই চিরস্থায়ী অভ্রান্ত জাগতিক নীতির দ্বারাই পরীক্ষা করিব। এদেশে অনেকেই একবর্ম্মির গজের মাপে লাখেরাজ বা জোত জমা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; জমীদারেরা এখনকার ছোট সরকারী গজে মাপিয়া তাহাদিগের অনেক ভূমি কাড়িয়া লইয়াছে। তেমনই ঊনবিংশ শতাব্দীর যে ছোট মাপকাঠি হইয়াছে, তাহার জ্বালায় আমরা ঐতিহাসিক পৈতৃক সম্পত্তি সকলই হারাইতেছি, ইহা অনেকবার বলিয়াছি। আমরা এক্ষণে সেই একবর্ম্মির গজ চালাইব।

কৃষ্ণভক্তেরা বলিতে পারেন, এরূপ একটা বিচারে প্রবৃত্ত হইবার আগে, স্থির কর যে, এই সুভদ্রাহরণ-বৃত্তান্ত মূল মহাভারতের অন্তর্গত, কি প্রক্ষিপ্ত। যদি ইহা প্রক্ষিপ্ত এবং আধুনিক বলিয়া বোধ করিবার কোন কারণ থাকে, তবে সেই কথা বলিলেই সব মিটিল—এত বাগাড়ম্বরের প্রয়োজন নাই। অতএব আমরা বলিতে বাধ্য যে, সুভদ্রাহরণ যে মূল মহাভারতের অংশ, ইহা যে প্রথম স্তরের অন্তর্গত, তদ্বিষয়ে আমাদের কোন সংশয় নাই। ইহার প্রসঙ্গ অনুক্রমণিকাধ্যায়ে এবং পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়ে আছে। ইহার রচনাও অতি উচ্চ শ্রেণীর কবির রচনা। দ্বিতীয় স্তরের রচনাও সচরাচর অতি সুন্দর। তবে প্রথম স্তর ও দ্বিতীয় স্তরে রচনাগত একটা প্রভেদ এই যে, প্রথম স্তরের রচনা সরল ও স্বাভাবিক, দ্বিতীয় স্তরের রচনায় অলঙ্কার ও অত্যুক্তির বাহুল্য। সুভদ্রাহরণের রচনাও সরল ও স্বাভাবিক, অলঙ্কার ও অত্যুক্তির তেমন বাহুল্য নাই। সুতরাং ইহা প্রথম স্তরগত—দ্বিতীয় স্তরের নহে। আর আসল কথা এই যে, সুভদ্রাহরণ মহাভারত হইতে তুলিয়া লইলে মহাভারত অসম্পূর্ণ হয়। সুভদ্রা হইতে অভিমন্যু, অভিমন্যু হইতে পরিক্ষিৎ, পরিক্ষিৎ হইতে জনমেজয়। ভদ্রার্জ্জুনের বংশই বহু শতাব্দী ধরিয়া ভারতে সাম্রাজ্য শাসিত করিয়াছিলেন—দ্রৌপদীর বংশ নহে। বরং দ্রৌপদী-স্বয়ংবর বাদ দেওয়া যায়, তবু সুভদ্রা নয়।

দ্রৌপদীর ন্যায় সুভদ্রাকে সাহেবেরা উড়াইয়া দিয়াছেন। লাসেন্‌ বলেন,—যাদবসম্প্রীতিরূপ যে মঙ্গল, তাহাই সুভদ্রা। বেবর সাহেবের আপত্তি ইহার অপেক্ষা গুরুতর। তিনি কেন কৃষ্ণভগিনী সুভদ্রার মানবীত্ব অস্বীকৃত করেন, তজ্জন্য যজুর্ব্বেদের মাধ্যন্দিনী শাখা ২৩ অধ্যায়ের ১৮ কণ্ডিকার ৪র্থ মন্ত্রটি উদ্ধৃত করিতে হইতেছে।

"হে অম্বে! হে অম্বিকে! হে অম্বালিকে! দেখ, এই অশ্ব এক্ষণে চিরকালের জন্য নিদ্রিত হইয়াছে, আমি কাম্পিলবাসিনী সুভদ্রা হইয়াও স্বয়ং ইহার সমীপে (পতিত্বে বরণ করণার্থ) সমাগত হইয়াছি, এ বিষয়ে আমাকে কেহই নিয়োগ করে নাই।" *

ইহাতে বেবর সাহেব সিদ্ধান্ত করিতেছেন,—

"Kampila is a town in the country of the Panchalas. Subhadra, therefore, would seem to be the wife of the king of that district." &c

সায়নাচার্য্য কাম্পিলবাসিনীর এইরূপ অর্থ করেন—"কাম্পিলশব্দেন শ্লাঘ্যোবস্ত্রবিশেষ উচ্যতে।" কিন্তু বেবর সাহেবের বিশ্বাস যে, তিনি সায়ণাচার্য্যের অপেক্ষা সংস্কৃত বুঝেন ভাল, অতএব তিনি এ ব্যাখ্যা গ্রাহ্য করেন না। তাহা নাই করুন, কিন্তু কাম্পিল-বাসিনী কোন স্ত্রীর নাম সুভদ্রা ছিল বলিয়া কৃষ্ণ-ভগিনীর নাম কেন সুভদ্রা হইতে পারে না, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। যে রাজাই অশ্বমেধ যজ্ঞ করুন, তাঁহারই মহিষীকে এই মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে, তাঁহাকেই বলিতে হইবে, "আমি কাম্পিলবাসিনী সুভদ্রা।" সুভদ্রা শব্দে সামশ্রমী মহাশয় এই অর্থ করেন,—কল্যাণী অর্থাৎ সৌভাগ্যবতী। মহীধর বলেন—কাম্পিলনগরীর মহিলাগণ অতিশয় রূপ-লাবণ্যবতী। অতএব এই মন্ত্রের অর্থ এই যে,

---

* সেইগুলি অবলম্বন করিয়া মুর প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কৃষ্ণকে শৈব বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

* শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সামশ্রমী কৃত অনুবাদ।

"আমি সৌভাগ্যবতী ও রূপলাবণ্যবতী হইয়াও অশ্বের নিকট সমাগত হইয়াছি।" অতএব বুঝিতে পারি না যে, এই মন্ত্রের বলে কৃষ্ণভগিনী অর্জ্জুনপত্নী সুভদ্রার পরিবর্ত্তে কেন একজন পাকালী সুভদ্রাকে কল্পনা করিতে হইবে। যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার বহু পূর্ব্ববর্ত্তী রাজগণও অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। ইহাই মহাভারতে ও প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায়। অতএব ইহাই সম্ভব যে, অশ্বমেধ যজ্ঞের এই যজুর্মন্ত্র কৃষ্ণ-পাণ্ডবের অপেক্ষা প্রাচীন। এখন যেমন লোকে আধুনিক লেখকদিগের কাব্যগ্রন্থ হইতে পুত্রকন্তার নামকরণ করিতেছে, * তেমনই সে কালেও বেদ হইতে লোকের পুত্রকন্তার নাম রাখাও অসম্ভব নহে। এই মন্ত্র হইতে কাশিরাজ আপনার তিনটি কন্তার নাম অম্বা, অম্বিকা, অম্বালিকা রাখিয়া থাকিবেন, এইরূপেই কৃষ্ণভগিনী সুভদ্রারও নামকরণ হইয়া থাকিবে। এই মন্ত্রে এমন কিছু দেখি না যে, তজ্জন্ত কৃষ্ণভগিনী সুভদ্রা কেহ ছিলেন না, এমন কথা অনুমান করা যায়। অতএব আমরা সুভদ্রাহরণের বিচারে প্রবৃত্ত হইব।

এক্ষণে সুভদ্রাহরণের নৈতিক বিচারে প্রবৃত্ত হইবার আগে পাঠকের নিকট একটা অনুরোধ আছে। তিনি কাশীদাসের গ্রন্থে অথবা কথকের নিকট, অথবা পিতামহীর মুখে, অথবা বাঙ্গালা নাটকাদিতে সে সুভদ্রাহরণ পড়িয়াছেন বা শুনিয়াছেন, তাহা অনুগ্রহপূর্ব্বক ভুলিয়া যাউন। অর্জ্জুনকে দেখিয়া সুভদ্রা অনঙ্গশরে ব্যথিত হইয়া উন্মত্ত হইলেন। সত্যভামা মধ্যবর্ত্তিনী দূতী হইলেন, অর্জ্জুন সুভদ্রাকে হরণ করিয়া লইয়া গেলে যাদবসেনার সঙ্গে তাঁর ঘোরতর যুদ্ধ হইল, সুভদ্রা তাঁহার সারথি হইয়া গগনমার্গে তাঁহার রথ চালাইতে লাগিলেন—সে সকল কথা ভুলিয়া যাউন। এ সকল অতি মনোহর কাহিনী বটে, কিন্তু মূল মহাভারতে ইহার কিছুই নাই। ইহা কাশীরাম দাসের গ্রন্থেই প্রথমে দেখিতে পাই, কিন্তু এ সকল তাঁহার সৃষ্টি কি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কথকদিগের সৃষ্টি, তাহা বলা যায় না। সংস্কৃত মহাভারতে যে প্রকার সুভদ্রাহরণ কথিত হইয়াছে, তাহার মূলমর্ম্ম বলিতেছি।

দ্রৌপদীর বিবাহের পর পাণ্ডবেরা ইন্দ্রপ্রস্থে সুখে রাজ্য করিতেছিলেন। কোন কারণে অর্জ্জুন দ্বাদশ বৎসরের জন্ত ইন্দ্রপ্রস্থ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিদেশে ভ্রমণ করেন। অন্তান্ত দেশ পর্য্যটনান্তর শেষে তিনি দ্বারকায় উপস্থিত হয়েন। তথায় যাদবেরা তাঁহার বিশেষ সমাদর ও সৎকার করেন। অর্জ্জুন কিছুদিন সেখানে অবস্থিতি করেন। একদা যাদবেরা রৈবতক পর্ব্বতে একটা মহান্ উৎসব আরম্ভ করেন। সেখানে যদুবীরেরা ও যদুকুলাঙ্গনাগণ সকলেই উপস্থিত হইয়া আমোদ-আহ্লাদ করেন। অন্তান্ত স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে ভদ্রাও উপস্থিত ছিলেন। তিনি কুমারী ও বালিকা। অর্জ্জুন তাঁহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। কৃষ্ণ তাহা জানিতে পারিয়া অর্জ্জুনকে বলিলেন, "সখে! বনচর হইয়াও অনঙ্গশরে চঞ্চল হইলে?" অর্জ্জুন অপরাধ স্বীকার করিয়া, সুভদ্রা যাহাতে তাঁহার মহিষী হন, তদ্বিষয়ে কৃষ্ণের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। কৃষ্ণ যে পরামর্শ দিলেন, তাহা এই :—

"হে অর্জ্জুন! স্বয়ংবরই ক্ষত্রিয়দিগের বিধেয়, কিন্তু স্ত্রীলোকের প্রবৃত্তির কথা কিছুই বলা যায় না, সুতরাং তদ্বিষয়ে আমার সংশয় জন্মিতেছে। আর ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরা কহেন, বিবাহোদ্দেশে বলপূর্ব্বক হরণ করাও মহাবীর ক্ষত্রিয়দিগের প্রশংসনীয়। অতএব স্বয়ংবরকাল উপস্থিত হইলে, তুমি আমার ভগিনীকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া লইয়া যাইবে; কারণ স্বয়ংবরকালে সে কাহার প্রতি অনুরক্ত হইবে, কে বলিতে পারে?"

এই পরামর্শের অনুবর্ত্তী হইয়া অর্জ্জুন প্রথমতঃ যুধিষ্ঠির ও কুন্তীর অনুমতি আনিতে দূত প্রেরণ করেন। তাঁহাদিগের অনুমতি পাইলে, একদা সুভদ্রা যখন রৈবতক পর্ব্বতকে প্রদক্ষিণ করিয়া দ্বারকাভিমুখে যাত্রা করিতেছিলেন, তখন তাঁহাকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া রথে তুলিয়া অর্জ্জুন প্রস্থান করিলেন। এখন আজি কালিকার দিনে যদি কেহ বিবাহোদ্দেশে কাহারও মেয়ে বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইয়া প্রস্থান করে, তবে সে সমাজে নিন্দিত ও রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইবার যোগ্য সন্দেহ নাই। এবং এখনকার দিনে কেহ যদি অপর কাহাকে বলে, "মহাশয়! যখন আমার ভগিনীকে বিবাহ করিতে আপনার ইচ্ছা হইয়াছে, তখন আপনি উহাকে কাড়িয়া লইয়া পলায়ন করুন, ইহা আমার পরামর্শ," তবে সে ব্যক্তিও জনসমাজে নিন্দনীয় হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। অতএব প্রচলিত নীতিশাস্ত্রানুসারে (সে নীতিশাস্ত্রের কিছুমাত্র দোষ দিতেছি না) কৃষ্ণার্জ্জুন উভয়েই অতিশয় নিন্দনীয় কার্য্য করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। লোকের চক্ষে ধূলা দিয়া কৃষ্ণকে বাঁচান যদি আমার উদ্দেশ্ত হইত, তবে সুভদ্রাহরণপর্ব্বাধ্যায় প্রক্ষিপ্ত বলিয়া কিংবা এমনই একটা কিছু জুয়াচুরি করিয়া, এ কথাটা বাদ দিয়া যাইতাম। কিন্তু সে সকল পথ আমার অবলম্বনীয় নহে। সত্য ভিন্ন মিথ্যা প্রশংসায় কাহারও মহিমা বাড়িতে পারে না এবং ধর্ম্মের অবনতি ভিন্ন উন্নতি হয় না।

* যথা—প্রমীলা, মৃণালিনী ইত্যাদি।

কিন্তু কথাটা তলাইয়া বুঝিতে হইবে। কেহ কাহারও মেয়ে কাড়িয়া লইয়া গিয়া বিবাহ করিলে সেটা দোষ বলিয়া গণিতে হয় কেন? তিন কারণে। প্রথমত: অপহৃতা কন্যার উপর অত্যাচার হয়। দ্বিতীয়ত: কন্যার পিতা, মাতা ও বন্ধুবর্গের উপর অত্যাচার। তৃতীয়ত: সমাজের উপর অত্যাচার। সমাজরক্ষার মূলসূত্র এই যে, কেহ কাহারও উপর অবৈধ বলপ্রয়োগ করিতে পারিবে না। কেহ কাহারও উপর অবৈধ বলপ্রয়োগ করিলেই সমাজের স্থিতির উপর আঘাত করা হইল। বিবাহার্থিকৃত কন্যাহরণকে নিন্দনীয় কার্য্য বিবেচনা করিবার এই তিনটি গুরুতর কারণ বটে, কিন্তু তদ্ভিন্ন আর চতুর্থ কারণ কিছুই নাই।

এখন দেখা যাউক, কৃষ্ণের এই কাজে এই তিন জনের মধ্যে কে কতদূর অত্যাচার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রথমত: কন্যার উপর কতদূর অত্যাচার হইয়াছিল, দেখা যাক। কৃষ্ণ তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা এবং বংশের শ্রেষ্ঠ। যাহাতে সুভদ্রার সর্ব্বতোভাবে মঙ্গল হয়, তাহাই তাঁহার কর্ত্তব্য, তাহাই তাঁহার ধর্ম্ম—ঊনবিংশ শতাব্দীর ভাষায় তাহাই তাঁহার "Duty"। এখন স্ত্রীলোকের পক্ষে প্রধান মঙ্গল—সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল বলিলেও হয়—সৎপাত্রস্থা হওয়া। অতএব সুভদ্রার প্রতি কৃষ্ণের প্রধান "ডিউটি"—তিনি যাহাতে সৎপাত্রস্থা হয়েন, তাহাই করা। এখন অর্জ্জুনের ন্যায় সৎপাত্র কৃষ্ণের পরিচিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে ছিল না, ইহা বোধ হয়, মহাভারতের পাঠকদিগের নিকট কষ্ট পাইয়া প্রমাণ করিতে হইবে না। অতএব তিনি যাহাতে অর্জ্জুনের পত্নী হইবেন, ইহাই সুভদ্রার মঙ্গলার্থ কৃষ্ণের করা কর্ত্তব্য। তাঁহার যে উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতেই তিনি দেখাইয়াছেন, বলপূর্ব্বক হরণ ভিন্ন অন্য কোন প্রকারে এই কর্ত্তব্যসাধন হইতে পারিত কি না তাহা সন্দেহস্থল। যেখানে ভাবিফল চিরজীবনের মঙ্গল, সেখানে যে পথে সন্দেহ, সে পথে যাইতে নাই; যে পথে মঙ্গলসিদ্ধি নিশ্চিত সেই পথেই যাইতে হয়। অতএব কৃষ্ণ, সুভদ্রার চিরজীবনের পরম শুভ সুনিশ্চিত করিয়া দিয়া, তাহার প্রতি পরমধর্ম্মানুমত কার্য্যই করিয়াছিলেন—তাহার প্রতি কোন অত্যাচার করেন নাই।

এ কথার প্রতি দুইটি আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে। প্রথম আপত্তি এই যে, আমার যে কাজে ইচ্ছা নাই, সে কাজ আমার পক্ষে মঙ্গলকর হইলেও আমার উপর বলপ্রয়োগ করিয়া সে কার্য্যে প্রবৃত্ত করিবার কাহারও অধিকার নাই। পুরোহিত মহাশয় মনে করেন যে, আমি যদি আমার সর্ব্বস্ব ব্রাহ্মণকে দান করি, তবে আমার পরম মঙ্গল হইবে। কিন্তু তাঁহার এমন কোন অধিকার নাই যে, আমাকে মারপিট করিয়া সর্ব্বস্ব ব্রাহ্মণকে দান করান। শুভ উদ্দেশ্যের সাধন জন্য নিন্দনীয় উপায় অবলম্বন করাও নিন্দনীয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর ভাষায় ইহার অনুবাদ এই যে, "The end does not sanctify the means."

এ কথার দুইটি উত্তর আছে। প্রথম উত্তর এই যে, সুভদ্রার যে অর্জ্জুনের প্রতি অনিচ্ছা বা বিরক্তি ছিল, এমত কিছুই প্রকাশ নাই। ইচ্ছা অনিচ্ছা কিছুই প্রকাশ নাই। প্রকাশ থাকিবার সম্ভাবনা বড় অল্প। হিন্দুর ঘরের কন্যা—কুমারী এবং বালিকা—পাত্রবিশেষের প্রতি ইচ্ছা বা অনিচ্ছা বড় প্রকাশ করে না। বাস্তবিক তাহাদের মনেও বোধ হয়, পাত্রবিশেষের প্রতি ইচ্ছা অনিচ্ছা বড় জন্মেও না, তবে ধেড়ে মেয়ে ঘরে পুষিয়া রাখিলে জন্মিতে পারে। এখন, যদি কোন কাজে আমার ইচ্ছা বা অনিচ্ছা কিছুই নাই থাকে, যদি সেই কাজ আমার পক্ষে পরম মঙ্গলকর হয়, আর কেবল বিশেষ প্রবৃত্তির অভাবে বা লজ্জা বশত: আমি সে কার্য্য স্বয়ং করিতেছি না এমন হয়, আর যদি আমার উপর একটু বলপ্রয়োগের ভাণ করিলে সে পরম মঙ্গলকর কার্য্য সুসিদ্ধ হয়, তবে সে বলপ্রয়োগ কি অধর্ম্ম? মনে কর, একজন বড় ঘরের ছেলে দুরবস্থায় পড়িয়াছে, তোমার কাছে একটি চাকরি পাইলে খাইয়া বাঁচে, কিন্তু বড় ঘর বলিয়া তাহাতে তেমন ইচ্ছা নাই, কিন্তু তুমি তাহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া চাকরিতে বসাইয়া দিলে আপত্তি করিবে না, বরং সপরিবারে খাইয়া বাঁচিবে। সে স্থলে তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া গিয়া দুটো ধমক দিয়া তাহাকে দফতরখানাতে বসাইয়া দেওয়া কি তোমার অধর্ম্মাচরণ বা পীড়ন করা হইবে? সুভদ্রার অবস্থাও ঠিক তাই। হিন্দুর ঘরের কুমারী মেয়ে, বুঝাইয়া বলিলে, কি "এসো গো" বলিয়া ডাকিলে বরের সঙ্গে যাইবে না। কাজেই ধরিয়া লইয়া যাওয়ার ভাণ ভিন্ন তাহার মঙ্গলসাধনের উপায়ান্তর ছিল না।

"আমার যে কাজে ইচ্ছা নাই, সে কাজ আমার পক্ষে পরম মঙ্গলকর হইলেও আমার প্রতি বলপ্রয়োগ করিয়া সে কাজে প্রবৃত্ত করিবার কাহারও অধিকার নাই।" এই আপত্তির দুইটি উত্তর আছে, আমরা বলিয়াছি। প্রথম উত্তর, উপরে বুঝাইলাম। প্রথম উত্তরে আমরা ঐ আপত্তির কথাটা যথার্থ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়া উত্তর দিয়াছি। দ্বিতীয় উত্তর এই যে, কথাটা সকল সময়ে যথার্থ নয়। যে কার্য্যে আমার পরম মঙ্গল, সে কার্য্যে আমার অনিচ্ছা

থাকিলেও বলপ্রয়োগ করিয়া আমাকে তাহাতে প্রবৃত্ত করিতে যে কাহারও অধিকার নাই, এ কথা সকল সময়ে খাটে না। যে রোগীর রোগপ্রভাবে প্রাণ যায়, কিন্তু ঔষধে রোগীর স্বভাবসুলভ বিরাগবশতঃ সে ঔষধ খাইবে না, তাহাকে বলপূর্ব্বক ঔষধ খাওয়াইতে চিকিৎসকের এবং বন্ধুবর্গের অধিকার আছে। সাংঘাতিক বিস্ফোটক সে ইচ্ছাপূর্ব্বক কাটাইবে না,—জোর করিয়া কাটিবার ডাক্তারের অধিকার আছে। ছেলে লেখাপড়া শিখিবে না, জোর করিয়া লেখাপড়া শিখাইবার অধিকার শিক্ষক ও পিতামাতা প্রভৃতির আছে। এই বিবাহের কথাতেই দেখ, অপ্রাপ্তবয়ঃ কুমার কি কুমারী যদি অনুচিত বিবাহে উদ্যত হয়, বলপূর্ব্বক তাহাকে নিবৃত্ত করিতে কি পিতামাতার অধিকার নাই? আজিও সভ্য ইউরোপীয় জাতিদিগের মধ্যে কন্যার বিবাহে জোর করিয়া সৎপাত্রে কন্যাদান করার প্রথা আছে। যদি পনের বৎসরের কোন হিন্দুর মেয়ে কোন সুপাত্রে আপত্তি উপস্থিত করে, তবে কোন্ পিতামাতা জোর করিয়া তাহাকে সৎপাত্রস্থ করিতে আপত্তি করিবেন? জোর করিয়া বালিকা কন্যা সৎপাত্রস্থ করিলে, তিনি কি নিন্দনীয় হইবেন? যদি না হন, তবে সুভদ্রাহরণে কৃষ্ণের অনুমতি নিন্দনীয় কেন?

এই গেল প্রথম আপত্তির দুই উত্তর। এখন দ্বিতীয় আপত্তির বিচারে প্রবৃত্ত হই।

দ্বিতীয় আপত্তি এই হইতে পারে যে, ভাল, স্বীকার করা গেল যে, কৃষ্ণ সুভদ্রার মঙ্গল কামনা করিয়াই, এই পরামর্শ দিয়াছিলেন—কিন্তু বলপূর্ব্বক হরণ ভিন্ন কি তাঁহাকে অর্জ্জুনমহিষী করিবার অন্য উপায় ছিল না? স্বয়ংবরে যেন ভয় ছিল, যেন মূঢ়মতি বালিকা কেবল মুখ দেখিয়া ভুলিয়া গিয়া কোন অপাত্রে বরমাল্য দেওয়ার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু উপায়ান্তর কি ছিল না? কৃষ্ণ কি অর্জ্জুন, বসুদেব প্রভৃতি কর্ত্তৃপক্ষের কাছে কথা পাড়িয়া, রীতিমত সম্বন্ধ স্থির করিয়া, তাঁহাদিগকে বিবাহে সম্মত করিয়া কন্যা সম্প্রদান করাইতে পারিতেন। যাদবেরা কৃষ্ণের বশীভূত; কেহই তাঁহার কথায় অমত করিত না এবং অর্জ্জুনও সুপাত্র, কেহই আপত্তি করিত না। তবে না হইল কেন?

এখনকার দিন কাল হইলে এ কাজ সহজে হইত। কিন্তু ভদ্রার্জ্জুনের বিবাহ চারি হাজার বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল, তখনকার বিবাহপ্রথা এখনকার বিবাহপ্রথার মত ছিল না। সেই বিবাহপ্রথা না বুঝিলে কৃষ্ণের আদর্শ বুদ্ধি ও আদর্শ প্রীতি আমরা সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিব না।

মনুতে আছে, বিবাহ অষ্টবিধ, (১) ব্রাহ্ম, (২) দৈব, (৩) আর্ষ, (৪) প্রাজাপত্য, (৫) আসুর, (৬) গান্ধর্ব্ব, (৭) রাক্ষস ও (৮) পৈশাচ। এই ক্রমাম্বয়টা পাঠক মনে রাখিবেন।

এই অষ্টপ্রকার বিবাহে সকল বর্ণের অধিকার নাই। ক্ষত্রিয়ের কোন্ কোন্ বিবাহে অধিকার, দেখা যাউক। তৃতীয় অধ্যায়ের ২৩ শ্লোকে কথিত হইয়াছে,—

"ষড়ানুপূর্ব্ব্যা বিপ্রস্য ক্ষত্রস্য চতুরোঽবরান্।"

ইহার টীকায় কুল্লুকভট্ট লেখেন, "ক্ষত্রিয়স্য অবরানুপরিতনানাসুরাদীংশ্চতুরঃ।" তবেই ক্ষত্রিয়ের পক্ষে, কেবল আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ, এই চারি প্রকার বিবাহ বৈধ। আর সকল অবৈধ।

কিন্তু ২৫ শ্লোকে আছে—

"পৈশাচশ্চাসুরশ্চৈব ন কর্ত্তব্যৌ কদাচন।"

পৈশাচ ও আসুর বিবাহ সকলেরই অকর্ত্তব্য। অতএব ক্ষত্রিয় পক্ষে কেবল গান্ধর্ব্ব ও রাক্ষস এই দ্বিবিধ বিবাহই বিহিত রহিল।

তন্মধ্যে, বরকন্যার উভয়ের পরস্পর অনুরাগ সহকারে যে বিবাহ হয়, তাহাই গান্ধর্ব্ব বিবাহ। এখানে সুভদ্রার অনুরাগ অভাবে সে বিবাহ অসম্ভব, এবং সেই বিবাহ "কামসম্ভব", সুতরাং পরম নীতিজ্ঞ কৃষ্ণার্জ্জুনের তাহা কখনও অনুমোদিত হইতে পারে না। অতএব রাক্ষস বিবাহ ভিন্ন অন্য কোন প্রকার বিবাহ শাস্ত্রানুসারে ধর্ম্ম্য নহে ও ক্ষত্রিয়ের পক্ষে প্রশস্ত নহে। অন্য প্রকার বিবাহেরও সম্ভাবনা এখানে ছিল না। বলপূর্ব্বক কন্যাকে হরণ করিয়া বিবাহ করাকে রাক্ষস বিবাহ বলে। বস্তুতঃ শাস্ত্রানুসারে এই রাক্ষস বিবাহই ক্ষত্রিয়ের পক্ষে একমাত্র প্রশস্ত বিবাহ। মনুর ৩ অঃ ২৪ শ্লোকে আছে—

"চতুরো ব্রাহ্মণস্যাদ্যান্ প্রশস্তান্ কবয়ো বিদুঃ।
রাক্ষসং ক্ষত্রিয়স্যৈকমাসুরং বৈশ্যশূদ্রয়োঃ॥"

যে বিবাহ ধর্ম্ম্য ও প্রশস্ত, আপনার ভগিনীর ও ভগিনীপতির গৌরবার্থ ও নিজ কুলের গৌরবার্থ, কৃষ্ণ সেই বিবাহের পরামর্শ দিতে বাধ্য ছিলেন। অতএব কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যে পরামর্শ দিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার পরম শাস্ত্রজ্ঞতা, নীতিজ্ঞতা, অভ্রান্ত বুদ্ধি এবং সর্ব্বপক্ষের মান সম্ভ্রম রক্ষার অভিপ্রায় ও হিতেচ্ছাই দেখা যায়।

কেহ কেহ বলিতে পারেন, এখানে মনুর দোহাই দিলে চলিবে না। মহাভারতের যুদ্ধের সময় মনুসংহিতা ছিল, ইহার প্রমাণ কি? কথা ন্যায্য বটে, তত প্রাচীন কালে মনুসংহিতা সঙ্কলিত হইয়াছিল কি না, সে বিষয়ে বাদপ্রতিবাদ হইতে পারে। তবে মনুসংহিতা পূর্ব্বপ্রচলিত রীতিনীতির সঙ্কলন মাত্র,

ইহা পণ্ডিতদিগের মত। যদি তাহা হয়, তবে যুধিষ্ঠিরের রাজত্ব কালে ঐরূপ বিবাহপদ্ধতি প্রচলিত ছিল, ইহা বিবেচনা করা যাইতে পারে। নাই থাকুক—মহাভারতেই এ বিষয়ে কি আছে, তাহাই দেখা যাউক। এই সুভদ্রাহরণ-পর্ব্বাধ্যায়েই সে বিষয়ে কি প্রমাণ পাওয়া যায়, দেখা যাউক। বড় বেশী খুঁজিতে হইবে না। আমরা পাঠকদিগের নিকট যে উত্তর দিতেছি, কৃষ্ণ নিজেই সেই উত্তর বলদেবকে দিয়াছিলেন। অর্জ্জুন সুভদ্রাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে শুনিয়া যাদবেরা ক্রুদ্ধ হইয়া রণসজ্জা করিতেছিলেন। বলদেব বলিলেন, অত গণ্ডগোল করিবার আগে, কৃষ্ণ কি বলেন শুনা যাউক। তিনি চুপ করিয়া আছেন। তখন বলদেব কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া, অর্জ্জুন তাঁহাদের বংশের অপমান করিয়াছে, বলিয়া রাগ প্রকাশ করিলেন এবং কৃষ্ণের অভিপ্রায় কি, জিজ্ঞাসা করিলেন। কৃষ্ণ উত্তর করিলেন—

"অর্জ্জুন আমাদিগের কুলের অবমাননা করেন নাই, বরং সমধিক সম্মান রক্ষাই করিয়াছেন। তিনি তোমাদিগকে অর্থলুব্ধ মনে করেন না বলিয়া অর্থ দ্বারা সুভদ্রাকে গ্রহণ করিতে চেষ্টাও করেন নাই। স্বয়ংবরে কন্যা লাভ করা অতীব দুরূহ ব্যাপার, এই জন্যই তাহাতে সম্মত হন নাই, এবং পিতামাতার অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক প্রদত্তা কন্যার পাণিগ্রহণ করা তেজস্বী ক্ষত্রিয়ের প্রশংসনীয় নহে। অতএব আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, কুন্তীপুত্র ধনঞ্জয় উক্ত দোষ সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া বলপূর্ব্বক সুভদ্রাকে হরণ করিয়াছেন। এই সম্বন্ধ আমাদের কুলোচিত হইয়াছে। এবং কুল শীল বিদ্যা ও বুদ্ধিসম্পন্ন পার্থ বলপূর্ব্বক হরণ করিয়াছেন বলিয়া, সুভদ্রাও যশস্বিনী হইবেন সন্দেহ নাই।"

এখানে কৃষ্ণ ক্ষত্রিয়ের চারি প্রকার বিবাহের কথা বলিয়াছেন;—

১। অর্থ (বা শুল্ক) দিয়া যে বিবাহ করা যায় (আসুর)।

২। স্বয়ংবর।

৩। পিতা মাতা কর্ত্তৃক প্রদত্তা কন্যার সহিত বিবাহ (প্রাজাপত্য)।

৪। বলপূর্ব্বক হরণ (রাক্ষস)।

ইহার মধ্যে প্রথমটিতে কন্যাকুলের অকীর্ত্তি ও অধম, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। দ্বিতীয়ের ফল অনিশ্চিত। তৃতীয়, বরের অগৌরব। কাজেই চতুর্থই এখানে একমাত্র বিহিত বিবাহ। ইহা কৃষ্ণোক্তিতেই প্রকাশ আছে।*

ভরসা করি, এমন নির্ব্বোধ কেহই নাই যে, সিদ্ধান্ত করেন যে, আমি রাক্ষস বিবাহের পক্ষ সমর্থন করিতেছি। রাক্ষস বিবাহ অতি নিন্দনীয়, সে কথা বলিয়া স্থান নষ্ট করা নিষ্প্রয়োজন। তবে সে কালে যে ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে ইহা প্রশংসিত ছিল, কৃষ্ণ তাহার দায়ী নহেন। আমাদিগের মধ্যে অনেকের বিশ্বাস যে, "রিফর্ম্মরই" আদর্শ মনুষ্য এবং কৃষ্ণ যদি আদর্শ মনুষ্য, তবে মালাবারি ধরণের রিফর্ম্মর্ হওয়াই তাঁহার উচিত ছিল, এবং এই কুপ্রথার প্রশ্রয় না দিয়া দমন করা উচিত ছিল। কিন্তু আমরা মালাবারি ঢংটাকে আদর্শ-মনুষ্যের গুণের মধ্যে গণি না, সুতরাং এ কথার কোন উত্তর দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা করি না।

আমরা বলিয়াছি যে, বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া যে বিবাহ, তাহা তিন কারণে নিন্দনীয়; (১) কন্যার প্রতি অত্যাচার, (২) তাহার পিতৃকুলের প্রতি অত্যাচার, (৩) সমাজের প্রতি অত্যাচার। কন্যার প্রতি যে কোন অত্যাচার হয় নাই, বরং তাহার পরম মঙ্গলই সাধিত হইয়াছিল, তাহা দেখাইয়াছি। এক্ষণে তাঁহার পিতৃকুলের প্রতি কোন অত্যাচার হইয়াছে কি না, দেখা যাউক, কিন্তু আর স্থান নাই, সংক্ষেপে কথা শেষ করিতে হইবে। যাহা বলিয়াছি, তাহাতে সকল কথাই শেষ হইয়া আসিয়াছে।

কন্যাহরণে তৎপিতৃকুলের উপর দুই কারণে অত্যাচার ঘটে। (১) তাঁহাদিগের কন্যা অপাত্রের বা অনভিপ্রেত পাত্রের হস্তগত হয়। কিন্তু এখানে তাহা ঘটে নাই। অর্জ্জুন অপাত্রও নহে, অনভিপ্রেত পাত্রও নহে। (২) তাঁহাদিগের নিজের অপমান। কিন্তু পূর্ব্বে যাহা উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা দ্বারা প্রমাণীকৃত হইয়াছে যে, ইহাতে যাদবেরা অপমানিত হইয়াছেন বিবেচনা করিবার কোন কারণ ছিল না। এ কথা যাদবশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণই প্রতিপন্ন করিয়াছেন, এবং তাঁহার সে কথা ন্যায়সঙ্গত বিবেচনা করিয়া অপর যাদবেরা অর্জ্জুনকে ফিরাইয়া আনিয়া সমারোহ-পূর্ব্বক তাঁহার বিবাহকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাদের

* মহাভারতের অনুশাসন-পর্ব্বে যে বিবাহতত্ত্ব আছে, তাহার আমরা কোন উল্লেখ করিলাম না, কেন না, উহা প্রক্ষিপ্ত। সেখানে রাক্ষস বিবাহ ভীষ্ম কর্ত্তৃক নিন্দিত ও নিষিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু ভীষ্ম স্বয়ং কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা স্থির করিয়া, কাশিরাজের তিনটি কন্যা হরণ করিয়া আনিয়াছিলেন। সুতরাং ভীষ্ম রাক্ষস বিবাহকে নিন্দিত ও নিষিদ্ধ বলা সম্ভব নহে। ভীষ্মের চরিত্র এই যে, যাহা নিষিদ্ধ ও নিন্দিত, তাহা তিনি প্রাণান্তেও করিতেন না। যে কবি তাঁহার চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন, সে কবি কখনই তাঁহার মুখ দিয়া এ কথা বাহির করেন নাই।

প্রতি অত্যাচার হইয়াছিল, ইহা বলিবার আমাদের আর আবশ্যকতা নাই।

(৩) সমাজের প্রতি অত্যাচার। যে বলকে সমাজ অবৈধ বল বিবেচনা করে, সমাজমধ্যে কাহারও প্রতি সেই বল প্রযুক্ত হইলেই সমাজের প্রতি অত্যাচার হইল। কিন্তু যখন তাৎকালিক আর্য্যসমাজ ক্ষত্রিয়কৃত এই বলপ্রয়োগকে প্রশস্ত ও বিহিত বলিত, তখন সমাজের আর বলিবার অধিকার নাই যে, আমার প্রতি অত্যাচার হইল। যাহা সমাজসম্মত, তদ্দ্বারা সমাজের উপর কোন অত্যাচার হয় নাই।

আমরা এই তত্ত্ব এত সবিস্তারে লিখিলাম, তাহার কারণ আছে। সুভদ্রাহরণের জন্য কৃষ্ণদ্বেষীরা কৃষ্ণকে কখনও গালি দেন নাই। তজ্জন্য কৃষ্ণপক্ষসমর্থনের কোন আবশ্যকতা ছিল না। আমার দেখাইবার উদ্দেশ্য এই যে, বিলাত হইতে যে ছোট মাপ কাঠিটি আমরা ধার করিয়া আনিয়াছি, সে মাপ কাঠিতে মাপিলে, আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষাগত অতুল সম্পত্তি অধিকাংশই বাজেআপ্ত হইয়া যাইবে। আমাদিগের সেই একক্ষমি গজ বাহির করা চাই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

খাণ্ডবদাহ

সুভদ্রাহরণের পর খাণ্ডবদাহে কৃষ্ণের দর্শন পাই। পাণ্ডবেরা খাণ্ডবপ্রস্থে বাস করিতেন। তাঁহাদিগের রাজধানীর নিকট খাণ্ডব নামে এক বৃহৎ অরণ্য ছিল। কৃষ্ণার্জ্জুন, তাহা দগ্ধ করেন। তাহার বৃত্তান্তটা এই। গল্পটা বড় আষাঢ়ে রকম।

পূর্ব্বকালে শ্বেতকি নামে একজন রাজা ছিলেন। তিনি বড় যাজ্ঞিক ছিলেন। চিরকালই যজ্ঞ করেন। তাঁহার যজ্ঞ করিতে করিতে ঋত্বিক্ ব্রাহ্মণেরা হায়রাণ হইয়া গেল। তাহারা আর পারে না—সাফ জবাব দিয়া সরিয়া পড়িল। রাজা তাহাদিগকে পীড়াপীড়ি করিলেন—তাহারা বলিল, "এ রকম কাজ আমাদের দ্বারা হইতে পারে না, তুমি রুদ্রের কাছে যাও।" রাজা রুদ্রের কাছে গেলেন। রুদ্র বলিলেন, "আমরা যজ্ঞ করি না—এ কাজ ব্রাহ্মণের। দুর্ব্বাসা একজন ব্রাহ্মণ আছেন, তিনি আমারই অংশ—আমি তাঁহাকে বলিয়া দিতেছি।" রুদ্রের অনুরোধে দুর্ব্বাসা রাজার যজ্ঞ করিলেন। ঘোরতর যজ্ঞ—বারো বৎসর ধরিয়া ক্রমাগত অগ্নিতে ঘৃতধারা। ঘি খাইয়া অগ্নির Dyspepsia উপস্থিত। তিনি ব্রহ্মার কাছে গিয়া বলিলেন, "ঠাকুর! বড় বিপদ্—খাইয়া খাইয়া শরীরের বড় গ্লানি উপস্থিত হইয়াছে, এখন উপায় কি?" ব্রহ্মা যে রকম ডাক্তারি করিলেন, তাহা Similia Similibus Curanter হিসাবে। তিনি বলিলেন, "ভাল, খাইয়া যদি পীড়া হইয়া থাকে, তবে আরও খাও। খাণ্ডব বনটা খাইয়া ফেল—পীড়া আরাম হইবে।" শুনিয়া অগ্নি খাণ্ডববন খাইতে গেলেন; চারিদিকে হু হু করিয়া জ্বলিয়া উঠিলেন। কিন্তু বনে অনেক জীবজন্তু বাস করিত—হাতীরা শুঁড়ে করিয়া জল আনিল, সাপেরা ফণা করিয়া জল আনিল, এই রকম বনবাসী পশুপক্ষিগণ মিলিয়া আগুন নিবাইয়া দিল। আগুন সাতবার জ্বলিলেন, সাতবার তাহারা নিবাইল। অগ্নি তখন ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করিয়া কৃষ্ণার্জ্জুনের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইলেন।" বলিলেন, "আমি বড় পেটুক, বড় বেশী খাই, তোমরা আমাকে খাওয়াইতে পার?" তাঁহারা স্বীকৃত হইলেন। তখন তিনি আত্মপরিচয় দিয়া ছোট রকমের প্রার্থনাটি জানাইলেন—"খাণ্ডব বনটি খাব। খাইতে গিয়াছিলাম, কিন্তু ইন্দ্র আসিয়া বৃষ্টি করিয়া আমাকে নিবাইয়া দিয়াছে। খাইতে দেয় নাই।" তখন কৃষ্ণার্জ্জুন অস্ত্র ধরিয়া বন পোড়াইতে গেলেন, ইন্দ্র আসিয়া বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুনের বাণের চোটে বৃষ্টি বন্ধ হইয়া গেল। সেটা কি রকমে হয়, আমরা কলিকালের লোক, তাহা বুঝিতে পারি না। পারিলে, অতিবৃষ্টিতে ফসল রক্ষার একটি উপায় করা যাইতে পারিত। যাই হোক—ইন্দ্র চটিয়া, যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। সব দেবতা অস্ত্র লইয়া তাঁহার সহায় হইলেন। কিন্তু অর্জ্জুনকে আঁটিয়া উঠিবার যো নাই। ইন্দ্র পাহাড় ছুড়িয়া মারিলেন—অর্জ্জুন বাণের চোটে পাহাড় কাটিয়া ফেলিলেন। (বিদ্যাটা এখনকার দিনে জানা থাকিলে রেইলওয়ে টনেল্ করিবার বড় সুবিধা হইত)। শেষ ইন্দ্র বজ্রপ্রহারে উদ্যত—তখন দৈববাণী হইল যে, ইঁহারা নর-নারায়ণ, প্রাচীন ঋষি।* দৈববাণীটা বড় সুবিধা—কে বলিল, তার ঠিকানা নাই—কিন্তু বলিবার কথাটা প্রকাশ হইয়া পড়ে। দৈববাণী শুনিয়া দেবতারা প্রস্থান করিলেন। কৃষ্ণার্জ্জুন স্বচ্ছন্দে বন পোড়াইতে লাগিলেন। আগুনের ভয়ে পশুপক্ষী পলাইতেছিল, সকলকে তাঁহারা মারিয়া ফেলিলেন। তাহাদের মেদ মাংস খাইয়া অগ্নির মন্দাগ্নি ভাল হইল—ঘিয়ে বিষক্ষয় হইল—তিনি কৃষ্ণার্জ্জুনকে বর দিলেন।

---

* পাঠক দেখিয়াছেন, এক স্থানে কৃষ্ণ বিষ্ণুর কেশ; এখানে প্রাচীন ঋষি, আবার দেখিব, তিনি বিষ্ণুর অবতার। এ কথায় সামঞ্জস্যচেষ্টার বা খণ্ডনে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। কৃষ্ণচরিত্রই আমাদের সমালোচ্য।

পরাভূত দেবতারা আসিয়াও বর দিলেন। সকল পক্ষ খুসী হইয়া ঘরে গেলেন।

এরূপ আষাঢ়ে গল্পের উপর বুনিয়াদ খাড়া করিয়া ঐতিহাসিক সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলে, কেবল হাস্তাস্পদ হইতে হয়—অন্ত লাভ নাই। আর আমাদের যাহা সমালোচ্য—অর্থাৎ কৃষ্ণচরিত্র,—তাহার ভাল মন্দ কোন কথাই ইহাতে নাই। যদি ইহার কোন ঐতিহাসিক তাৎপর্য্য থাকে, তবে সেটুকু এই যে, পাণ্ডবদিগের রাজধানীর নিকটে একটা বড় বন ছিল, সেখানে অনেক হিংস্র পশু বাস করিত, কৃষ্ণার্জ্জুন তাহাতে আগুন লাগাইয়া, হিংস্র পশুদিগকে বিনষ্ট করিয়া জঙ্গল আবাদ করিবার যোগ্য করিয়াছিলেন। *কৃষ্ণার্জ্জুন যদি তাই করিয়াছিলেন, তাহাতে ঐতিহাসিক কীর্ত্তি বা অকীর্ত্তি কিছুই দেখি না। সুন্দরবনের আবাদকারীরা নিত্য তাহা করিয়া থাকে।

আমরা স্বীকার করি, এ ব্যাখ্যাটা নিতান্ত টালবয়স্ হুইলরি ধরণের হইল। কিন্তু আমরা যে এরূপ একটা তাৎপর্য্য সূচিত করিতে বাধ্য হইলাম, তাহার কারণ আছে। খাণ্ডবদাহটা অধিকাংশ তৃতীয় স্তরান্তর্গত হইতে পারে, কিন্তু স্থূল ঘটনার কোন সূচনা যে আদিম মহাভারতে নাই, এ কথা আমরা বলিতে প্রস্তুত নহি। পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়ে এবং অনুক্রমণিকাধ্যায়ে ইহার প্রসঙ্গ আছে। এই খাণ্ডবদাহ হইতে সভাপর্ব্বের উৎপত্তি। এই বনমধ্যে ময়দানব বাস করিত। সেও পুড়িয়া মরিবার উপক্রম হইয়াছিল। সে অর্জ্জুনের কাছে প্রাণভিক্ষা চাহিয়াছিল; অর্জ্জুনও শরণাগতকে রক্ষা করিয়াছিলেন। এই উপকারের প্রত্যুপকারের জন্য ময়দানব পাণ্ডবদিগের অত্যুৎকৃষ্ট সভা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। সেই সভা লইয়াই সভাপর্ব্বের কথা।

এখন, সভাপর্ব্ব অষ্টাদশ পর্ব্বের এক পর্ব্ব। মহাভারতের যুদ্ধের বীজ এইখানে। ইহা একেবারে বাদ দেওয়া যায় না। যদি তা না যায়, তবে ইহার মধ্যে কতটুকু ঐতিহাসিক তত্ত্ব নিহিত থাকিতে পারে, তাহা বিচার করিয়া দেখা উচিত। সভা এবং তদুপলক্ষে রাজসূয় যজ্ঞকে মৌলিক এবং ঐতিহাসিক বলিয়া গ্রহণ করার প্রতি কোনই আপত্তি দেখা যায় না। যদি সভা ঐতিহাসিক হইল, তবে তাহার নির্ম্মাতা এক জন অবশ্য থাকিবে। মনে কর, সেই কারিগর বা এঞ্জিনিয়ারের নাম ময়। হয় ত সে অনার্য্যবংশীয়—এ জন্য তাহাকে ময়দানব বলিত। এমন হইতে পারে যে, সে বিপন্ন হইয়া অর্জ্জুনের সাহায্যে জীবন লাভ করিয়াছিল, এবং কৃতজ্ঞতা বশতঃ এই ইঞ্জিনিয়রি কাজটুকু করিয়া দিয়াছিল। যদি ইহা প্রকৃত হয়, তবে সে যে কিরূপে বিপন্ন হইয়া অর্জ্জুনকৃত উপকার প্রাপ্ত হইয়াছিল, সে কথা কেবল খাণ্ডবদাহেই পাওয়া যায়। অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, এ সকলই কেবল অন্ধকারে ঢিল মারা। তবে অনেক প্রাচীন ঐতিহাসিক তত্ত্বই এইরূপ অন্ধকারেও ঢিল।

হয় ত, ময়দানবের কথাটা সমুদায়ই কবির সৃষ্টি। তা যাই হৌক, এই উপলক্ষে কবি যে ভাবে কৃষ্ণার্জ্জুনের চরিত্র সংস্থাপিত করিয়াছেন, তাহা বড় মনোহর। তাহা না লিখিয়া থাকা যায় না। ময়দানব প্রাণ পাইয়া অর্জ্জুনকে বলিলেন, "আপনি আমাকে পরিত্রাণ করিয়াছেন, অতএব আজ্ঞা করুন, আপনার কি প্রত্যুপকার করিব?" অর্জ্জুন কিছুই প্রত্যুপকার চাহিলেন না, কেবল প্রীতিভিক্ষা করিলেন। কিন্তু ময়দানব ছাড়ে না, কিছু কাজ না করিয়া যাইবে না। তখন অর্জ্জুন তাঁহাকে বলিলেন—

"হে কৃতজ্ঞ! তুমি আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়াছ বলিয়া আমার প্রত্যুপকার করিতে ইচ্ছা করিতেছ, এই নিমিত্ত তোমার দ্বারা কোন কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া লইতে ইচ্ছা হয় না।"

ইহাই নিষ্কাম ধর্ম্ম; খৃষ্টান্ ইউরোপে ইহা নাই। বাইবেলে যে ধর্ম্ম অনুজ্ঞাত হইয়াছে, স্বর্গ বা ঈশ্বরপ্রীতি তাহার কাম্য। আমরা এ সকল পরিত্যাগ করিয়া পাশ্চাত্য গ্রন্থ হইতে যে ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা করিতে যাই, আমাদের বিবেচনায় সেটা আমাদের দুর্ভাগ্য। অর্জ্জুনবাক্যের অপরার্দ্ধে এই নিষ্কাম ধর্ম্ম আরও স্পষ্ট হইতেছে। ময় যদি কিছু কাজ করিতে পারিলে মনে সুখী হয়, তবে সে সুখ হইতে অর্জ্জুন তাহাকে বঞ্চিত করিতে অনিচ্ছুক। অতএব তিনি বলিতে লাগিলেন,—

"তোমার অভিলাষ যে ব্যর্থ হয়, ইহাও আমার অভিপ্রেত নহে। অতএব কৃষ্ণের কোন কর্ম্ম কর, তাহা হইলেই আমার প্রত্যুপকার করা হইবে।"

অর্থাৎ তোমার দ্বারা যদি কাজ লইতেই হয়, তবে সেও পরের কাজ। আপনার কাজ লওয়া হইবে না।

তখন ময় কৃষ্ণকে অনুরোধ করিলেন—কিছু কাজ করিতে আদেশ কর। ময় "দানবকুলের বিশ্বকর্ম্মা"—বা চীফ্ এঞ্জিনিয়র। কৃষ্ণও তাঁহাকে আপনার কাজ করিতে আদেশ করিলেন না। বলিলেন,—"যুধিষ্ঠিরের একটি সভা নির্ম্মাণ কর। এমন সভা গড়িবে, মনুষ্য যেন তাহার অনুকরণ করিতে না পারে।"

ইহা কৃষ্ণের নিজের কাজ নহে—অথচ নিজের কাজ বটে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, কৃষ্ণ স্বজীবনে দুইটি কার্য্য উদ্দিষ্ট করিয়াছিলেন—ধর্ম্মপ্রচার এবং

ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন। ধর্ম্মপ্রচারের কথা এখনও বড় উঠে নাই। এই সভানির্ম্মাণ ধর্ম্মরাজ্যসংস্থাপনের প্রথম সূত্র। এইখানেই তাঁহার এই অভিসন্ধির প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়। যুধিষ্ঠিরের সভানির্ম্মাণ হইতে যে সকল ঘটনাবলী হইল, শেষে তাহা ধর্ম্মরাজ্যসংস্থাপনে পরিণত হইল। ধর্ম্মরাজ্যসংস্থাপন, জগতের কাজ; কিন্তু যখন তাহা কৃষ্ণের উদ্দেশ্য, তখন এ সভাসংস্থাপন তাঁহার নিজের কাজ।

গত অধ্যায়ে সমাজসংস্করণের কথাটা উঠিয়াছিল। আমরা বলিয়াছি যে, তিনি সমাজসংস্থাপক Social Reformer হইবার প্রয়াস পান নাই। দেশের নৈতিক এবং রাজনৈতিক পুনর্জ্জীবন (Moral and Political Regeneration) ধর্ম্মপ্রচার এবং ধর্ম্মরাজ্যসংস্থাপন, ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য। ইহা ঘটিলে সমাজ সংস্কার কোনমতেই ঘটিবে না। আদর্শ মনুষ্য তাহা জানিতেন,—জানিতেন, গাছের পাট না করিয়া কেবল একটা ডালে জল সেচিলে ফল ধরে না। আমরা তাহা জানি না—আমরা সমাজসংস্করণকে একটা পৃথক জিনিষ বলিয়া খাড়া করিয়া গণ্ডগোল উপস্থিত করি। আমাদের খ্যাতিপ্রিয়তাই ইহার এক কারণ, সমাজসংস্কারক হইয়া দাঁড়াইলে হঠাৎ খ্যাতি লাভ করা যায়—বিশেষ সংস্করণপদ্ধতিটা যদি ইংরেজী ধরণের হয়। আর যার কাজ নাই, হুজুগ তার বড় ভাল লাগে। সমাজসংস্করণ আর কিছুই হউক না হউক, একটা হুজুগ বটে। হুজুগ বড় আমোদের জিনিষ। এই সম্প্রদায়ের লোকদিগকে আমরা জিজ্ঞাসা করি, ধর্ম্মের উন্নতি ব্যতীত সমাজসংস্কার কিসের জোরে হইবে? রাজনৈতিক উন্নতির মূল ধর্ম্মের উন্নতি। অতএব সকলে মিলিয়া ধর্ম্মের উন্নতিতে মন দাও। তাহা হইলে আর সমাজসংস্করণের পৃথক চেষ্টা করিতে হইবে না। তা না করিলে, কিছুতেই সমাজসংস্কার হইবে না। তাই আদর্শ মনুষ্য, মালাবারি হইবার চেষ্টা করেন নাই।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কৃষ্ণের মানবিকতা

কৃষ্ণচরিত্রের এই সমালোচনায় আমি কৃষ্ণের কেবল মানুষী প্রকৃতিরই সমালোচনা করিতেছি। তিনি ঈশ্বর কি না, তাহা আমি কিছু বলিতেছি না। সে কথার সঙ্গে পাঠকের কোন সম্বন্ধ নাই। কেন না, আমার যদি সেই মত হয়, তবু আমি পাঠককে সে মত গ্রহণ করিতে বলিতেছি না। গ্রহণ করা না করা, পাঠকের নিজের বুদ্ধি ও চিত্তের উপর নির্ভর করে, অনুরোধ চলে না। স্বর্গ জেলখানা নহে—তাহার যে একটি বৈ ফটক নাই, এ কথা আমি মনে করি না। ধর্ম্ম এক বস্তু বটে, কিন্তু তাহার নিকটে পৌঁছিবার অনেক পথ আছে—কৃষ্ণভক্ত এবং খ্রীষ্টিয়ান উভয়েই সেখানে পৌঁছিতে পারে * অতএব কেহ কৃষ্ণধর্ম্ম গ্রহণ না করিলে আমি তাঁহাকে পতিত মনে করিব না এবং ভরসা করি যে, কৃষ্ণদ্বেষী বা প্রাচীন বৈষ্ণবের দল আমাকে নিরয়গামী বলিয়া ভাবিবেন না।

আমাদের এখন বলিবার কথা এই, আমরা তাঁহার মানুষী প্রকৃতির মাত্র সমালোচনা করিতেছি।* আমরা তাঁহাকে আদর্শ মনুষ্য বলিয়াছি। ইহাতে তাঁহার মনুষ্যাতীত কোন প্রকৃতি থাকিলেও তাহার বিকাশমাত্র প্রতিবিদ্ধ হইল। বলিয়াছি, এমন হইতে পারে যে, ঈশ্বর লোকশিক্ষার্থ আদর্শ মনুষ্যস্বরূপ লোকালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। যদি তাই হয়, তবে তিনি কেবল মানুষিক শক্তিতে, জগতে কেবল মানুষিক কার্য্য করিবেন। তিনি কখনও কোন লোকাতীত শক্তি দ্বারা কোন লৌকিক বা অলৌকিক কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন না। কেন না, মনুষ্যের কোন অলৌকিক শক্তি নাই। যিনি তাহার আশ্রয় করিয়া স্বকার্য্যসাধন করিলেন, তিনি আর মনুষ্যের আদর্শ হইতে পারিলেন না। যে শক্তি মনুষ্যের নাই, তাহার অনুকরণ মনুষ্য করিবে কি প্রকারে? †

---

* "ধর্ম্মের অসংখ্য দ্বার। যে কোন প্রকারে হউক, ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে উহা কদাপি নিষ্ফল হয় না।" মহাভারত শান্তিপর্ব্ব, ১৭৪ অঃ।

† "We forget that Christ incarnate was such as we are, and some of us are putting him where he can be no example to us at all. Let no fear of losing the dear great truth of the divinity of Jesus make you lose the dear great truth of the humanity of Jesus. He took upon himself our nature, as a man of the like passions, he fought that terrible fight in the wilderness year by year, as an innocent man, was he persecuted by narrow-hearted Jesws, and his was a humanity whose virtue was pressed by all the needs of the

অতএব, শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরের অবতার হইলেও তাঁহার কোন অলৌকিক শক্তির বিকাশ বা অমানুষী কার্য্যসিদ্ধি সম্ভবে না। মহাভারতের যে সকল অংশে কৃষ্ণের অলৌকিক শক্তির আরোপ আছে, তাহা অমূলক এবং প্রক্ষিপ্ত কি না, সে কথার বিচার আমরা যথাস্থানে করিব। এক্ষণে আমাদিগের বক্তব্য এই যে, কৃষ্ণ কোথাও আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া পরিচয় দেন না।* কোথাও এমন প্রকাশ করেন নাই যে, তাঁহার কোন প্রকার অমানুষিক শক্তি আছে। কেহ তাঁহাতে ঈশ্বরত্ব আরোপ করিলে, তখন তিনি সে কথার অনুমোদন করেন নাই, বা এমন কোন আচরণ করেন নাই, যাহাতে তাহাদের সেই বিশ্বাস দৃঢ়ীকৃত হইতে পারে। বরং এক স্থানে তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন, "আমি যথাসাধ্য পুরুষকার প্রকাশ করিতে পারি,† কিন্তু দৈবের অনুষ্ঠানে আমার কিছুমাত্র ক্ষমতা নাই।"

তিনি যত্নপূর্ব্বক মনুষ্যোচিত আচার ব্যবহারের অনুষ্ঠান করেন; যাহার মনে থাকে যে, আমি একটা দেবতা বলিয়া পরিচিত হইব, সে একটু মনুষ্যোচিত আচারের উপর চড়ে। কৃষ্ণে সে ভাব কোথাও লক্ষিত হয় না। এই সকল কথার উদাহরণস্বরূপ তিনি খাণ্ডবদাহের পর যুধিষ্ঠিরাদির নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া, যখন দ্বারকাযাত্রা করেন, তখন তিনি যেরূপ আচরণ করিয়াছিলেন, তাহার বর্ণনা উদ্ধৃত করিতেছি। উহা অত্যন্ত মানুষিক।

"বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভগবান্ বাসুদেব পরমপ্রীত পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক অভিপূজিত হইয়া কিয়দ্দিন খাণ্ডবপ্রস্থে বাস করিলেন। পরিশেষে পিতৃদর্শনে সাতিশয় উৎসুক হইয়া স্বভবনে গমন করিতে নিতান্ত অভিলাষী হইলেন। তিনি প্রথমতঃ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে আমন্ত্রণ করিয়া পশ্চাৎ স্বীয় পিতৃষ্বসা কুন্তী দেবীর চরণবন্দন করিলেন। তখন বাসুদেব, সাক্ষাৎকরণ-মানসে স্বীয় ভগিনী সুভদ্রার সমীপে উপস্থিত হইয়া, অর্থযুক্ত, যথার্থ হিতকর, অল্পাক্ষর ও অখণ্ডনীয় বাক্যে তাঁহাকে নানাপ্রকার বুঝাইলেন। ভদ্রভাষিণী ভদ্রাও তাঁহাকে জননী প্রভৃতি স্বজন-সমীপে বিজ্ঞাপনীয় বাক্য সমুদয় কহিয়া দিয়া বারংবার পূজা ও অভিবাদন করিলেন। বৃষ্ণিবংশাবতংস কৃষ্ণ তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া দ্রৌপদী ও ধৌম্যের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ধৌম্যকে যথাবিধি বন্দন ও দ্রৌপদীকে সম্ভাষণ ও আমন্ত্রণ করিয়া অর্জ্জুন সমভিব্যাহারে তথা হইতে যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন। তথায় ভগবান্ বাসুদেব পঞ্চপাণ্ডব কর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়া অমরগণ-পরিবৃত মহেন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

তৎপরে কৃষ্ণ যাত্রাকালোচিত কার্য্য করিবার মানসে স্নানান্তে অলঙ্কার পরিধান করিয়া মাল্যজপ, নমস্কার ও নানাবিধ গন্ধদ্রব্য দ্বারা দেব ও দ্বিজগণের পূজা সমাধা করিলেন। তিনি ক্রমে ক্রমে তৎকালোচিত সমস্ত কার্য্য সমাধা করিয়া স্বপুর গমনোদ্যোগে বহিঃকক্ষায় বিনির্গত হইলেন। স্বস্তিবাচক ব্রাহ্মণগণ দধিপাত্র, ফলপুষ্প ও অক্ষত প্রভৃতি মাঙ্গল্য বস্তু হস্তে করিয়া তথায় উপস্থিত ছিলেন। বাসুদেব তাঁহাদিগকে ধনদানপূর্ব্বক প্রদক্ষিণ করিলেন। পরে অত্যুৎকৃষ্ট তিথিনক্ষত্রযুক্ত মুহূর্ত্তে গদা, চক্র, অসি, শার্ঙ্গ প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রপরিবৃত গরুড়কেতন বায়ুবেগগামী কাঞ্চনময় রথে আরোহণ করিয়া স্বপুরে গমন করিতেছেন, এমন সময়ে মহারাজ যুধিষ্ঠির স্নেহপরতন্ত্র হইয়া সেই রথে আরোহণ পূর্ব্বক দারুক সারথিকে তৎস্থান হইতে স্থানান্তরে উপবেশন করাইয়া স্বয়ং সারথি হইয়া বল্গা গ্রহণ করিলেন। মহাবাহু অর্জ্জুনও তাহাতে আরোহণ করিয়া স্বর্ণদণ্ডবিরাজিত শ্বেতচামর গ্রহণ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে ব্যজন করতঃ প্রদক্ষিণ করিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত ভীমসেন, নকুল এবং সহদেব, ঋত্বিক্ ও পুরোহিতগণ সমভিব্যাহারে অনুগমন করিতে লাগিলেন। শত্রুবলান্তক বাসুদেব যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃগণ কর্ত্তৃক অনুগম্যমান হইয়া শিষ্যগণানুগত গুরুর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তিনি অর্জ্জুনকে আমন্ত্রণ ও গাঢ় আলিঙ্গন, যুধিষ্ঠির ও ভীমসেনকে পূজা এবং নকুল ও সহদেবকে সম্ভাষণ করিলেন। যুধিষ্ঠির, ভীমসেন ও অর্জ্জুন তাঁহাকে আলিঙ্গন এবং নকুল ও সহদেব তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। তৎপরে ক্রমে ক্রমে অর্দ্ধ

---

multitude and yet kept its richness of nature; a humanity which though given up to death on the cross, expressed all that is within the capacity of our humanity, and if we really follow him we shall be holy even as he is holy." —Sermon by Dr. Brookly, delivered at Trinity Church, Boston, March 25th, 1885.

শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে আমি ঠিক এই কথা বলি।

* যে দুই এক স্থানে এরূপ কথা আছে, সে সকল অংশ যে প্রক্ষিপ্ত, তাহাও যথাস্থানে আমরা প্রমাণীকৃত করিব।

† অহং হি তৎ করিষ্যামি পরং পুরুষকারতঃ।
দৈবং তু ন ময়া শক্যং কর্ম্ম কর্ত্তুং কথঞ্চন॥
উদ্যোগপর্ব্ব, ৭৮ অধ্যায়।

যোজন গমন করিয়া শত্রুনিসূদন কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে আমন্ত্রণ করত: 'প্রতিনিবৃত্ত হউন' বলিয়া তাঁহার পাদদ্বয় গ্রহণ করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির চরণপতিত পতিতপাবন কমললোচন কৃষ্ণকে উত্থাপিত করিয়া তাঁহার মস্তক-আঘ্রাণ পূর্ব্বক স্বভবনে গমন করিতে অনুমতি করিলেন। তখন ভগবান্ বাসুদেব পাণ্ডবগণের সহিত যথাবিধি প্রতিজ্ঞা করত: অতি কষ্টে তাঁহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া অমরাবতীপ্রস্থিত মহেন্দ্রের ন্যায় দ্বারাবতী প্রতিগমন করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণ যতক্ষণ কৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন, ততক্ষণ তাঁহারা নিমেষশূন্য নয়নে তাঁহাকে নিরীক্ষণ ও মনে মনে তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণকে দেখিয়া তাঁহাদিগের মন পরিতৃপ্ত না হইতে হইতেই তিনি তাঁহাদিগরে দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলেন। তখন পাণ্ডবগণ কৃষ্ণদর্শনে নিতান্ত নিরাশ হইয়া তদ্বিষয়িণী চিন্তা করিতে করিতে স্বপুরে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। দেবকীনন্দন কৃষ্ণও অনুগামী মহাবীর সাত্যক এবং দারুক সারথির সহিত বেগবান্ গরুড়ের ন্যায় সত্বরে দ্বারকাপুরে সমুপস্থিত হইলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে সুহৃজ্জনপরিবৃত হইয়া স্বপুরে প্রবেশ করিলেন, এবং ভ্রাতা, পুত্র ও বন্ধুদিগকে বিদায় দিয়া দ্রৌপদীর সহিত আমোদ-প্রমোদে কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এ দিকে কৃষ্ণও পরম আহ্লাদিতচিত্তে দ্বারকাপুরে প্রবেশ করিলেন। উগ্রসেন প্রভৃতি যদুশ্রেষ্ঠগণ তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন। বাসুদেব পুরপ্রবেশ করিয়া অগ্রে বৃদ্ধ পিতা আহুক ও যশস্বিনী মাতাকে পরে বলভদ্রকে অভিবাদন করিলেন। অনন্তর তিনি প্রদ্যুম্ন, শাম্ব, নিশঠ, চারুদেষ্ণ, গদ, অনিরুদ্ধ ও ভানুকে আলিঙ্গন করিয়া বৃদ্ধগণের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক রুক্মিণীর ভবনে উপস্থিত হইলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

জরাসন্ধবধের পরামর্শ

এ দিকে সভানির্ম্মাণ হইল। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ করিবার প্রস্তাব হইল। সকলেই সে বিষয়ে মত করিল, কিন্তু যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের মত ব্যতীত তাহাতে প্রবৃত্ত হইতে অনিচ্ছুক—কেন না, কৃষ্ণই নীতিজ্ঞ। অতএব তিনি কৃষ্ণকে আনিতে পাঠাইলেন। কৃষ্ণও সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র খাণ্ডবপ্রস্থে উপস্থিত হইলেন।

রাজসূয়ের অনুষ্ঠান সম্বন্ধে যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে বলিতেছেন;—

"আমি রাজসূয় যজ্ঞ করিতে অভিলাষ করিয়াছি। ঐ যজ্ঞ কেবল ইচ্ছা করিলেই সম্পন্ন হয়, এমত নহে। যেরূপে উহা সম্পন্ন হয়, তাহা তোমার সুবিদিত আছে। দেখ, যে ব্যক্তিতে সকলই সম্ভব, যে ব্যক্তি সর্ব্বত্রই পূজ্য, এবং যিনি সমুদয় পৃথিবীর ঈশ্বর, সেই ব্যক্তিই রাজসূয়ানুষ্ঠানের উপযুক্ত পাত্র।"

কৃষ্ণকে যুধিষ্ঠিরের এই কথাই জিজ্ঞাস্য। তাঁহার জিজ্ঞাস্য এই যে—"আমি কি সেইরূপ ব্যক্তি? আমাতে কি সকলই সম্ভব? আমি কি সর্ব্বত্র পূজ্য, এবং সমুদয় পৃথিবীর ঈশ্বর?" যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের ভুজবলে একজন বড় রাজা হইয়া উঠিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি এমন একটা লোক হইয়াছেন কি যে, রাজসূয়ের অনুষ্ঠান করেন? আমি কত বড় লোক, তাহার ঠিক মাপ কেহই আপনা আপনি পায় না। দাম্ভিক ও দুরাত্মগণ খুব বড় মাপ-কাটিতে আপনাকে মাপিয়া আপনার মহত্ত্ব সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়া সন্তুষ্টচিত্তে বসিয়া থাকে; কিন্তু যুধিষ্ঠিরের ন্যায় সাবধান ও বিনয়-সম্পন্ন ব্যক্তির তাহা সম্ভব নহে। তিনি মনে মনে বুঝিতেন বটে যে, আমি খুব বড় রাজা হইয়াছি, কিন্তু আপনার কৃত আত্মমানে তাঁহার বড় বিশ্বাস হইতেছে না। তিনি আপনার মন্ত্রিগণ ও ভীমার্জ্জুনাদি অনুজগণকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"কেমন, আমি রাজসূয় যজ্ঞ করিতে পারি কি?" তাঁহারা বলিয়াছেন,—"হাঁ, অবশ্য পার। তুমি তার যোগ্য পাত্র।" ধৌম্য-দ্বৈপায়নাদি ঋষিগণকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "কেমন, আমি কি রাজসূয় যজ্ঞ করিতে পারি?" তাঁহারাও বলিয়াছিলেন, "পার; তুমি রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠানের উপযুক্ত পাত্র।" তথাপি সাবধান * যুধিষ্ঠিরের মন নিশ্চিন্ত হইল না। অর্জ্জুন হউন, ব্যাস হউন,—যুধিষ্ঠিরের নিকট পরিচিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাঁহার কাছে এ কথার উত্তর না শুনিলে, যুধিষ্ঠিরের সন্দেহ যায় না। তাই "মহাবাহু সর্ব্বলোকোত্তম" কৃষ্ণের সহিত পরামর্শ করিতে স্থির করিলেন। ভাবিলেন, কৃষ্ণ সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বকৃৎ, তিনি অবশ্যই আমাকে সৎপরামর্শ দিবেন। তাই তিনি কৃষ্ণকে

---

* পাণ্ডব পাঁচ জনের চরিত্র বুদ্ধিমান্ সমালোচকে সমালোচনা করিলে দেখিতে পাইবেন যে, যুধিষ্ঠিরের প্রধান গুণ, তাঁহার সাবধানতা। ভীম দুঃসাহসী, "গোঁয়ার", অর্জ্জুন আপনার বাহুবলের গৌরব জানিয়া নির্ভর ও নিশ্চিন্ত, যুধিষ্ঠির সাবধান। এ জগতে সাবধানতাই অনেক স্থানে ধর্ম্ম বলিয়া পরিচিত হয়। কথাটা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইলেও, বড় গুরুতর কথা বলিয়াই এখানে ইহার উত্থাপন করিলাম। এই সাবধানতার সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের দ্যূতানুরাগ কতটুকু সঙ্গত, তাহা দেখাইবার এ স্থান নহে।

আনিতে লোক পাঠাইয়াছিলেন, এবং কৃষ্ণ আসিলে তাই তাঁহাকে পূর্ব্বোদ্ধৃত কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। কেন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তাহাও কৃষ্ণকে খুলিয়া বলিতেছেন।

"আমার অন্যান্য সুহৃদ্গণ আমাকে ঐ যজ্ঞ করিতে পরামর্শ দিয়াছেন, কিন্তু আমি তোমার পরামর্শ না লইয়া উহার অনুষ্ঠান করিতে নিশ্চয় করি নাই। হে কৃষ্ণ! কোন কোন ব্যক্তি বন্ধুতার নিমিত্ত দোষোদ্ঘোষণ করেন না। কেহ কেহ স্বার্থপর হইয়া প্রিয়বাক্য কহেন। কেহ বা যাহাতে আপনার হিত হয়, তাহাই প্রিয় বলিয়া বোধ করেন। হে মহাত্মন্! এই পৃথিবীর মধ্যে উক্ত প্রকার লোকই অধিক, সুতরাং তাহাদের পরামর্শ লইয়া কোন কার্য্য করা যায় না। তুমি উক্ত দোষরহিত ও কামক্রোধ-বিবর্জ্জিত; অতএব আমাকে যথার্থ পরামর্শ প্রদান কর।"

পাঠক দেখুন, কৃষ্ণের আত্মীয়গণ যাহারা প্রত্যহ তাঁহার কার্য্যকলাপ দেখিতেছেন, তাঁহারা কৃষ্ণকে কি ভাবিতেন।* আর এখন আমরা তাঁহাকে কি ভাবি। তাঁহারা জানিতেন, কৃষ্ণ কামক্রোধ-বিবর্জ্জিত, সর্ব্বাপেক্ষা সত্যবাদী, সর্ব্বদোষরহিত, সর্ব্বলোকোত্তম, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বকৃৎ,—আমরা জানি, তিনি লম্পট, ননীমাখনচোর, কুচক্রী, মিথ্যাবাদী, রিপুবশীভূত, এবং অন্যান্য দোষযুক্ত। যিনি ধর্ম্মের চরমাদর্শ বলিয়া প্রাচীন গ্রন্থে পরিচিত, তাঁহাকে যে জাতি এ পদে অবনত করিয়াছে, সে জাতির মধ্যে যে ধর্ম্মলোপ হইবে, বিচিত্র কি?

যুধিষ্ঠির যাহা ভাবিয়াছিলেন, ঠিক তাহাই ঘটিল। যে অপ্রিয় সত্য বাক্য আর কেহই যুধিষ্ঠিরকে বলে নাই, কৃষ্ণ তাহা বলিলেন। মিষ্ট কথার আবরণ দিয়া যুধিষ্ঠিরকে তিনি বলিলেন, "তুমি রাজসূয়ের অধিকারী নও, কেন না, সম্রাট্ ভিন্ন রাজসূয়ের অধিকার হয় না, তুমি সম্রাট্ নও। মগধাধিপতি জরাসন্ধ এখন সম্রাট্। তাঁহাকে জয় না করিলে তুমি রাজসূয়ের অধিকারী হইতে পার না ও সম্পন্ন করিতে পারিবে না।"

যাঁহারা কৃষ্ণকে স্বার্থপর ও কুচক্রী ভাবেন, তাঁহারা এই কথা শুনিয়া বলিবেন, "এ কৃষ্ণের মতই কথা হইল বটে। জরাসন্ধ কৃষ্ণের পূর্ব্বশত্রু, কৃষ্ণ নিজে তাঁহাকে আঁটিয়া উঠিতে পারেন নাই, এখন সুযোগ পাইয়া বলবান্ পাণ্ডবদিগের দ্বারা তাহার বধ-সাধন করিয়া আপনার ইষ্টসিদ্ধির চেষ্টায় এই পরামর্শটা দিলেন।"

কিন্তু আরও একটু কথা বাকী আছে। জরাসন্ধ সম্রাট্, কিন্তু তৈমুরলঙ্গ্ বা প্রথম নেপোলিয়ানের ন্যায় অত্যাচারকারী সম্রাট্। পৃথিবী তাহার অত্যাচারে প্রপীড়িত। জরাসন্ধ রাজসূয় যজ্ঞার্থ প্রতিজ্ঞা করিয়া, "বাহুবলে সমস্ত ভূপতিগণকে পরাজয় করিয়া, সিংহ যেমন পর্ব্বত-কন্দরমধ্যে করিগণকে বদ্ধ রাখে, সেইরূপ তাঁহাদিগকে গিরিদুর্গে বদ্ধ রাখিয়াছে।" রাজগণকে কারাবদ্ধ করিয়া রাখার আর এক ভয়ানক তাৎপর্য্য ছিল। জরাসন্ধের অভিপ্রায়, সেই সমানীত রাজগণকে যজ্ঞকালে সে মহাদেবের নিকট বলি দিবে। পূর্ব্বে যে যজ্ঞকালে কেহ কখনও নরবলি দিত, তাহা ইতিহাসজ্ঞ পাঠককে বলিতে হইবে না।* কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন,—

"হে ভরতকুলপ্রদীপ! বলি প্রদানার্থ সমানীত ভূপতিগণ প্রোক্ষিত ও প্রমৃষ্ট হইয়া পশুদিগের ন্যায় পশুপতির গৃহে বাস করতঃ অতি কষ্টে জীবন ধারণ করিতেছেন। দুরাত্মা জরাসন্ধ তাঁহাদিগকে অচিরাৎ ছেদন করিবে, এই নিমিত্ত আমি তাহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে উপদেশ দিতেছি, ঐ দুরাত্মা ষড়শীতি জন ভূপতিকে আনয়ন করিয়াছে, কেবল চতুর্দ্দশ জনের অপ্রতুল আছে; চতুর্দ্দশ জন আনীত হইলেই ঐ নৃশংস উহাদের সকলকে এককালে সংহার করিবে। হে ধর্ম্মাত্মন! এক্ষণে যে ব্যক্তি দুরাত্মা জরাসন্ধের ঐ ক্রূর কর্ম্মে বিঘ্ন উৎপাদন করিতে পারিবেন, তাঁহার যশোরাশি ভূমণ্ডলে দেদীপ্যমান হইবে, এবং যিনি উহাকে জয় করিতে পারিবেন, তিনি নিশ্চয় সাম্রাজ্য লাভ করিবেন।"

অতএব জরাসন্ধ বধের জন্য যুধিষ্ঠিরকে কৃষ্ণ যে পরামর্শ দিলেন, তাহার উদ্দেশ্য, কৃষ্ণের নিজের হিত নহে;—যুধিষ্ঠিরেরও যদিও তাহাতে ইষ্টসিদ্ধি আছে, তথাপি তাহাও প্রধানতঃ ঐ পরামর্শের উদ্দেশ্য নহে; উহার উদ্দেশ্য কারারুদ্ধ রাজমণ্ডলীর হিত—জরাসন্ধের অত্যাচার-প্রপীড়িত ভারতবর্ষের হিত—সাধারণ লোকের হিত। কৃষ্ণ নিজে তখন রৈবতকের দুর্গের আশ্রয়ে, জরাসন্ধের বাহুর অতীত এবং অজেয়; জরাসন্ধের বধে তাঁহার নিজের ইষ্টানিষ্ট কিছুই ছিল না। আর থাকিলেও, যাহাতে লোকহিত সাধিত

* যুধিষ্ঠিরের মুখ হইতে বাস্তবিক এই কথাগুলি বাহির হইয়াছিল, আর তাহাই কেহ লিখিয়া রাখিয়াছেন, এমত নহে। মৌলিক মহাভারতে তাঁহার কিরূপ চরিত্র প্রচারিত হইয়াছিল, ইহাই আমাদের আলোচ্য।

* কেহ কদাচিৎ দিত—সামাজিক প্রথা ছিল না। কৃষ্ণ এক স্থানে বলিতেছেন,—"আমরা কখন নরবলি দেখি নাই।" ধার্ম্মিক ব্যক্তিরা এ ভয়ানক প্রথার দিক্ দিয়া যাইতেন না।

হয়, সেই পরামর্শ দিতে তিনি ধর্ম্মতঃ বাধ্য—সে পরামর্শে নিজের কোন স্বার্থসিদ্ধি থাকিলেও সেই পরামর্শ দিতে বাধ্য। এই কার্য্যে লোকের হিত সাধিত হইবে বটে, কিন্তু ইহাতে আমারও কিছু স্বার্থসিদ্ধি আছে,—এমন পরামর্শ দিলে লোকে আমাকে স্বার্থপর মনে করিবে—অতএব আমি এমন পরামর্শ দিব না ;—যিনি এইরূপ ভাবেন, তিনিই যথার্থ স্বার্থপর এবং অধার্ম্মিক, কেন না তিনি আপনার মর্য্যাদাই ভাবিলেন, লোকের হিত ভাবিলেন না। যিনি সে কলঙ্ক সাদরে মস্তকে বহন করিয়া লোকের হিতসাধন করেন, তিনিই আদর্শ ধার্ম্মিক। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বত্রই আদর্শ ধার্ম্মিক।

যুধিষ্ঠির সাবধান ব্যক্তি, সহজে জরাসন্ধের সঙ্গে বিবাদে রাজি হইলেন না। কিন্তু ভীমের দৃপ্ত তেজস্বী ও অর্জ্জুনের তেজোগর্ভ বাক্যে, ও কৃষ্ণের পরামর্শে তাহাতে শেষে সম্মত হইলেন। ভীমার্জ্জুন ও কৃষ্ণ এই তিন জন জরাসন্ধ-জয়ে যাত্রা করিলেন। যাহার অগণিত সেনার ভয়ে প্রবলপরাক্রান্ত বৃষ্ণিবংশ রৈবতকে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিন জন মাত্র তাহাকে জয় করিতে যাত্রা করিলেন, এ কিরূপ পরামর্শ? এ পরামর্শ কৃষ্ণের, এবং এ পরামর্শ কৃষ্ণের আদর্শ চরিত্রানুযায়ী। জরাসন্ধ দুরাত্মা, এ জন্য সে দণ্ডনীয়, কিন্তু তাহার সৈনিকেরা কি অপরাধ করিয়াছে যে, তাহার সৈনিকদিগকে বধের জন্য সৈন্য লইয়া যাইতে হইবে? এরূপ সসৈন্য যুদ্ধে কেবল নিরপরাধীদিগের হত্যা, আর হয় ত অপরাধীরও নিষ্কৃতি ; কেন না জরাসন্ধের সৈন্যবল বেশী, পাণ্ডবসৈন্য তাহার সমকক্ষ না হইতে পারে। কিন্তু তখনকার ক্ষত্রিয়গণের এই ধর্ম্ম ছিল যে, দ্বৈরথ্য যুদ্ধে আহূত হইলে, কেহই বিমুখ হইতেন না।* অতএব কৃষ্ণের অভিসন্ধি এই যে, অনর্থক লোকক্ষয় না করিয়া, তাঁহারা তিন জন মাত্র জরাসন্ধের সম্মুখীন হইয়া তাহাকে দ্বৈরথ্য যুদ্ধে আহূত করিবেন—তিন জনের মধ্যে এক জনের সঙ্গে যুদ্ধে সে অবশ্য স্বীকৃত হইবে। তখন যাহার শারীরিক বল, সাহস ও শিক্ষা বেশী, সেই জিতিবে। এ বিষয়ে চারি জনেই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু যুদ্ধ সম্বন্ধে এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া তাঁহারা স্নাতক ব্রাহ্মণবেশে গমন করিলেন। এ ছদ্মবেশ কেন, তাহা বুঝা যায় না। এমন নহে যে, গোপনে জরাসন্ধকে ধরিয়া বধ করিবার তাঁহাদের সঙ্কল্প ছিল। তাঁহারা শত্রুভাবে, বারত্র ভেরী সকল ভগ্ন করিয়া, প্রাকার চৈত্য চূর্ণ করিয়া, জরাসন্ধসভায় প্রবেশ করিয়াছিলেন। অতএব গোপন উদ্দেশ্য নহে।

ছদ্মবেশ কৃষ্ণার্জ্জুনের অযোগ্য। ইহার পর আরও একটি কাণ্ড, তাহাও শোচনীয় ও কৃষ্ণার্জ্জুনের অযোগ্য বলিয়াই বোধ হয়। জরাসন্ধের সমীপবর্ত্তী হইলে ভীমার্জ্জুন "নিয়মস্থ" হইলেন। নিয়মস্থ হইলে কথা কহিতে নাই। তাঁহারা কোন কথাই কহিলেন না। সুতরাং জরাসন্ধের সঙ্গে কথা কহিবার ভার কৃষ্ণের উপর পড়িল। কৃষ্ণ বলিলেন, "ইঁহারা নিয়মস্থ, এক্ষণে কথা কহিবেন না ; পূর্ব্বরাত্র অতীত হইলে আপনার সহিত আলাপ করিবেন।" জরাসন্ধ কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণানন্তর তাঁহাদিগকে যজ্ঞালয়ে রাখিয়া স্বীয় গৃহে গমন করিলেন, এবং অর্দ্ধরাত্র সময়ে পুনরায় তাঁহাদের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন।

ইহাও একটা কল-কৌশল। কল-কৌশলটা বড় বিশুদ্ধ রকমের নয়—চাতুরী বটে। ধর্ম্মাত্মার ইহা যোগ্য নহে। এ কল-কৌশল ফিকির-ফন্দীর উদ্দেশ্যটা কি? যে কৃষ্ণার্জ্জুনকে এত দিন আমরা ধর্ম্মের আদর্শের মত দেখিয়া আসিতেছি, হঠাৎ তাঁহাদের এ অবনতি কেন? এ চাতুরীর কোন যদি উদ্দেশ্য থাকে, তাহা হইলেও বুঝিতে পারি যে, হাঁ, অভীষ্টসিদ্ধির জন্য, ইঁহারা এই খেলা খেলিতেছেন, কল-কৌশল করিয়া শত্রুনিপাত করিবেন বলিয়াই এ উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলে ইহাও বলিতে বাধ্য হইব যে, ইঁহারা ধর্ম্মাত্মা নহেন এবং কৃষ্ণচরিত্র আমরা যেরূপ বিশুদ্ধ মনে করিয়াছিলাম, সেরূপ নহে।

যাঁহারা জরাসন্ধবধ-বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত পাঠ করেন নাই, তাঁহারা মনে করিতে পারেন, কেন, এরূপ চাতুরীর উদ্দেশ্য ত পড়িয়াই রহিয়াছে। নিশীথকালে যখন জরাসন্ধকে নিঃসহায় অবস্থায় পাইবেন, তখন তাহাকে হঠাৎ আক্রমণ করিয়া বধ করাই এ চাতুরীর উদ্দেশ্য। তাই ইঁহারা যাহাতে নিশীথকালে তাহার সাক্ষাৎলাভ হয়, এমন একটা কৌশল করিলেন। বাস্তবিক, এরূপ কোন উদ্দেশ্য তাঁহাদের ছিল না, এবং এরূপ কোন কার্য্য তাঁহারা করেন নাই। নিশীথকালে তাঁহারা জরাসন্ধের সাক্ষাৎলাভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তখন জরাসন্ধকে আক্রমণ করেন নাই—আক্রমণ করিবার কোন চেষ্টাও করেন নাই। নিশীথকালে যুদ্ধ করেন নাই—দিনমানে যুদ্ধ হইয়াছিল। গোপনে যুদ্ধ করেন নাই—প্রকাশ্যে সমস্ত পৌরবর্গ ও মগধবাসীদিগের সমক্ষে যুদ্ধ হইয়াছিল। এমন এক দিন যুদ্ধ হয় নাই, চৌদ্দ দিন এমন যুদ্ধ হইয়াছিল। তিন জনে যুদ্ধ করেন নাই, এক জনে করিয়াছিলেন। হঠাৎ আক্রমণ করেন নাই—জরাসন্ধকে তজ্জন্য প্রস্তুত হইতে বিশেষ অবকাশ দিয়াছিলেন—এমন কি, পাছে যুদ্ধে আমি মারা পড়ি,

* কালযবন ক্ষত্রিয় ছিল না।

এই ভাবিয়া যুদ্ধের পূর্ব্বে জরাসন্ধ আপনার পুত্রকে রাজ্যে অভিষেক করিলেন, ততদূর পর্য্যন্ত অবকাশ দিয়াছিলেন। নিরস্ত্র হইয়া জরাসন্ধের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। লুকাচুরি কিছুই করেন নাই, জরাসন্ধ জিজ্ঞাসা করিবামাত্র কৃষ্ণ আপনাদিগের যথার্থ পরিচয় দিয়াছিলেন। যুদ্ধকালে জরাসন্ধের পুরোহিত যুদ্ধজাত অঙ্গের বেদনা উপশমের উপযোগী ঔষধ সকল লইয়া নিকটে রহিলেন, কৃষ্ণের পক্ষে সেরূপ কোন সাহায্য ছিল না, তথাপি "অন্যায় যুদ্ধ" বলিয়া তাঁহারা কোন আপত্তি করেন নাই। যুদ্ধকালে জরাসন্ধ ভীমকর্তৃক অতিশয় পীড্যমান হইলে, দয়াময় কৃষ্ণ ভীমকে তত পীড়ন করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। যাঁহাদের এইরূপ চরিত্র, এই কার্য্যে তাঁহারা কেন চাতুরী করিলেন? এ উদ্দেশ্যশূন্য চাতুরী কি সম্ভব? অতি নির্ব্বোধে, যে শঠতার কোন উদ্দেশ্য নাই, তাহা করিলে করিতে পারে; কিন্তু কৃষ্ণার্জ্জুন, আর যাহাই হউন, নির্ব্বোধ নহেন, ইহা শত্রুপক্ষও স্বীকার করেন। তবে এ চাতুরীর কথা কোথা হইতে আসিল? যাহার সঙ্গে এই সমস্ত জরাসন্ধপর্ব্বাধ্যায়ের অনৈক্য, সে কথা ইহার ভিতর কোথা হইতে আসিল? ইহা কি কেহ বসাইয়া দিয়াছে? এই কথাগুলি কি প্রক্ষিপ্ত? এই বৈ এ কথার আর কোন উত্তর নাই। কিন্তু সেই কথাটা আর একটু ভাল করিয়া বিচার করিয়া দেখা উচিত।

আমরা দেখিয়াছি যে, মহাভারতের কোন স্থানে কোন একটি অধ্যায়, কোন স্থানে কোন একটি পর্ব্বাধ্যায় প্রক্ষিপ্ত। যদি একটি অধ্যায় কি একটি পর্ব্বাধ্যায় প্রক্ষিপ্ত হইতে পারে, তবে একটি অধ্যায় কি একটি পর্ব্বাধ্যায়ের অংশবিশেষ বা কতক শ্লোক তাহাতে প্রক্ষিপ্ত হইতে পারে না কি? বিচিত্র কিছুই নহে। বরং প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ সকলেই এইরূপ ভূরি ভূরি হইয়াছে, ইহাই প্রসিদ্ধ কথা। এই জন্যই বেদাদির এত ভিন্ন ভিন্ন শাখা, রামায়ণাদি গ্রন্থের এত ভিন্ন ভিন্ন পাঠ, এমন কি শকুন্তলা, মেঘদূত প্রভৃতি আধুনিক (অপেক্ষাকৃত আধুনিক) গ্রন্থেরও এত বিবিধ পাঠ। সকল গ্রন্থেরই মৌলিক অংশের ভিতর এইরূপ এক একটা বা-দুই চারিটা প্রক্ষিপ্ত শ্লোক মধ্যে মধ্যে পাওয়া যায়—মহাভারতের মৌলিক অংশের ভিতর তাহা পাওয়া যাইবে, তাহার বৈচিত্র্য কি?

কিন্তু যে শ্লোকটা আমার মতের বিরোধী, সেইটাই যে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া আমি বাদ দিব, তাহা হইতে পারে না। কোন্‌টি প্রক্ষিপ্ত—কোন্‌টি প্রক্ষিপ্ত নহে, তাহার নিদর্শন দেখিয়া পরীক্ষা করা চাই। যেটাকে আমি প্রক্ষিপ্ত বলিয়া ত্যাগ করিব, আমাকে অবশ্য দেখাইয়া দিতে হইবে যে, প্রক্ষিপ্তের চিহ্ন উহাতে আছে, চিহ্ন দেখিয়া আমি উহাকে প্রক্ষিপ্ত বলিতেছি।

অতি প্রাচীন কালে যাহা প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহা ধরিবার উপায় আভ্যন্তরিক প্রমাণ ভিন্ন আর কিছুই নাই। আভ্যন্তরিক প্রমাণের মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ প্রমাণ—অসঙ্গতি, অনৈক্য। যদি দেখি যে, কোন পুথিতে এমন কোন কথা আছে যে, সে কথা গ্রন্থের আর সকল অংশের বিরোধী, তখন স্থির করিতে হইবে যে, হয় উহা গ্রন্থকারের বা লিপিকারের ভ্রমপ্রমাদবশতঃ ঘটিয়াছে, নয় উহা প্রক্ষিপ্ত। কোন্‌টি ভ্রমপ্রমাদ, আর কোন্‌টি প্রক্ষিপ্ত, তাহাও সহজে নিরূপণ করা যায়। যদি রামায়ণের কোন কাপিতে দেখি যে, লেখা আছে যে, রাম ঊর্ম্মিলাকে বিবাহ করিলেন, তখনই সিদ্ধান্ত করিব যে, এটা লিপিকারের ভ্রম-প্রমাদমাত্র। কিন্তু যদি দেখি যে, এমন লেখা আছে যে, রাম ঊর্ম্মিলাকে বিবাহ করায় লক্ষ্মণের সঙ্গে বিবাদ উপস্থিত হইল, তার পর রাম, লক্ষ্মণকে ঊর্ম্মিলা ছাড়িয়া দিয়া মিটমাট করিলেন,—তখন আর বলিতে পারিব না যে, এ লিপিকারের বা গ্রন্থকারের ভ্রমপ্রমাদ—তখন বলিতে হইবে যে, এটুকু কোন ভ্রাতৃসৌহার্দ-রসে রসিকের রচনা, ঐ পুথিতে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। এখন, আমি দেখাইয়াছি যে, জরাসন্ধবধপর্ব্বাধ্যায়ের যে কয়টা কথা আমাদের এখন বিচার্য্য, তাহা ঐ পর্ব্বাধ্যায়ের আর সকল অংশের সম্পূর্ণ বিরোধী। আর ইহাও স্পষ্ট যে, কথাগুলি এমন কথা নহে যে, তাহা লিপিকারের বা গ্রন্থকারের ভ্রমপ্রমাদ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা যায়। সুতরাং ঐ কথাগুলিকে প্রক্ষিপ্ত বলিবার আমাদের অধিকার আছে।

ইহাতেও পাঠক বলিতে পারেন যে, যে এই কথাগুলি প্রক্ষিপ্ত করিল, সেই বা এমন অসংলগ্ন কথা প্রক্ষিপ্ত করিল কেন? তাহারই বা উদ্দেশ্য কি? এ কথাটার মীমাংসা আছে। আমি পুনঃ পুনঃ বুঝাইয়াছি যে, মহাভারতের তিন স্তর দেখা যায়। তৃতীয় স্তর নানা ব্যক্তির গঠিত। কিন্তু আদিম স্তর, এক হাতের এবং দ্বিতীয় স্তরও এক হাতের। এই দুই জনেই শ্রেষ্ঠ কবি, কিন্তু তাঁহাদের রচনাপ্রণালী স্পষ্টতঃ ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির, দেখিলেই চেনা যায়। যিনি দ্বিতীয় স্তরের প্রণেতা, তাঁহার রচনায় কতকগুলি লক্ষণ আছে, যুদ্ধপর্ব্বগুলিতে তাঁহার বিশেষ হাত আছে—ঐ পর্ব্ব-গুলির অধিকাংশই তাঁহার প্রণীত, সেই সকল সমালোচন-কালে ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। এই কবির রচনার অন্যান্য লক্ষণের মধ্যে একটি বিশেষ লক্ষণ এই যে, ইনি কৃষ্ণকে চতুরচূড়ামণি সাজাইতে বড় ভালবাসেন। বুদ্ধির কৌশল, সকল গুণের অপেক্ষা

ইঁহার নিকট আদরণীয়। এরূপ লোক এ কালেও বড় দুর্লভ নয়। এখনও বোধ হয়, অনেক সুশিক্ষিত উচ্চ শ্রেণীর লোক আছেন যে, কৌশলবিদ্ বুদ্ধিমান্ চতুরই তাঁহাদের কাছে মনুষ্যত্বের আদর্শ। ইউরোপীয় সমাজে এই আদর্শ বড় প্রিয়—তাহা হইতে আধুনিক Diplomacy বিদ্যার সৃষ্টি। বিসমার্ক এক দিন জগতের প্রধান মনুষ্য ছিলেন। থেমিষ্টক্লিসের সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত যাঁহারা এই বিদ্যায় পটু, তাঁহারাই ইউরোপে মান্য—"Francis d' Assisi বা Imitation of Christ" গ্রন্থের প্রণেতাকে কে চিনে? মহাভারতের দ্বিতীয় কবিরও মনে সেইরূপ চরমাদর্শ ছিল। আবার কৃষ্ণের ঈশ্বরত্বে তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস। তাই তিনি পুরুষোত্তমকে কৌশলীর শ্রেষ্ঠ সাজাইয়াছেন। তিনি মিথ্যা কথার দ্বারা দ্রোণহত্যা সম্বন্ধে বিখ্যাত উপন্যাসের প্রণেতা। জয়দ্রথবধে সুদর্শনচক্রে রবি আচ্ছাদন, কর্ণার্জ্জুনের যুদ্ধে কর্ণের রথচক্র পৃথিবীতে পুতিয়া ফেলা, আর ঘোড়া বসাইয়া দেওয়া ইত্যাদি কৃষ্ণকৃত অদ্ভুত কৌশলের তিনিই রচয়িতা। এক্ষণে ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, জরাসন্ধবধ-পর্ব্বাধ্যায়ের এই অনর্থক এবং অসংলগ্ন কৌশলবিষয়ক প্রক্ষিপ্ত শ্লোকগুলির প্রণেতা তাঁহাকেই বিবেচনা হয়, এবং তাঁহাকে এ সকলের প্রণেতা বিবেচনা করিলে উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আর বড় অন্ধকার থাকে না। কৃষ্ণকে কৌশলময় বলিয়া প্রতিপন্ন করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। কেবল এইটুকুর উপর নির্ভর করিতে হইলে, হয় ত আমি এত কথা বলিতাম না। কিন্তু জরাসন্ধবধ-পর্ব্বাধ্যায়ে তাঁর হাত আরও দেখিব।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

কৃষ্ণ জরাসন্ধ-সংবাদ

নিশীথকালে যজ্ঞাগারে জরাসন্ধ স্নাতকবেশধারী তিন জনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদিগের পূজা করিলেন। এখানে কিছুই প্রকাশ নাই যে, তাঁহারা জরাসন্ধের পূজা গ্রহণ করিলেন কি না। আর এক স্থানে আছে। মূলের উপর আর এক জন কারিগরি করায় এই রকম গোলযোগ ঘটিয়াছে।

তৎপরে সৌজন্য বিনিময়ের পর জরাসন্ধ তাঁহাদিগকে বলিতে লাগিলেন, "হে বিপ্রগণ! আমি জানি স্নাতকব্রতচারী ব্রাহ্মণগণ সভাগমন সময় ভিন্ন কখনও মাল্য * বা চন্দন ধারণ করেন না। আপনারা কে? আপনাদের বস্ত্র রক্তবর্ণ; অঙ্গে পুষ্পমাল্য ও অনুলেপন সুশোভিত; ভুজে জ্যাচিহ্ন লক্ষিত হইতেছে; আকার দর্শনে ক্ষত্রতেজের স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে; কিন্তু আপনারা ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিতেছেন, অতএব সত্য বলুন, আপনারা কে? রাজসমক্ষে সত্যই প্রশংসনীয়। কি নিমিত্ত আপনারা দ্বার দিয়া প্রবেশ না করিয়া নির্ভয়ে চৈতক পর্ব্বতের শৃঙ্গ ভগ্ন করিয়া প্রবেশ করিলেন? ব্রাহ্মণেরা বাক্য দ্বারা বীর্য্য প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু আপনারা কার্য্য দ্বারা উহা প্রকাশ করিয়া নিতান্ত বিরুদ্ধানুষ্ঠান করিতেছেন। আরও আপনারা আমার কাছে আসিয়াছেন, আমিও বিধিপূর্ব্বক পূজা করিয়াছি, কিন্তু কি নিমিত্ত পূজা গ্রহণ করিলেন না? এক্ষণে কি নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছেন বলুন।"

তদুত্তরে কৃষ্ণ স্নিগ্ধগম্ভীরস্বরে (মৌলিক মহাভারতে কোথাও দেখি না যে, কৃষ্ণ চঞ্চল বা রুষ্ট হইয়া কোন কথা বলিলেন, তাঁহার সকল রিপুই বশীভূত) বলিলেন,—"হে রাজন্! তুমি আমাদিগকে স্নাতক ব্রাহ্মণ বলিয়া বোধ করিতেছ, কিন্তু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই তিন জাতিই স্নাতক-ব্রত গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইঁহাদের বিশেষ নিয়ম ও অবিশেষ নিয়ম উভয়ই আছে। ক্ষত্রিয় জাতি বিশেষ নিয়মী হইলে সম্পত্তিশালী হয়। পুষ্পধারী নিশ্চয়ই শ্রীমান্ হয় বলিয়া আমরা পুষ্পধারণ করিয়াছি। ক্ষত্রিয় বাহুবলেই বলবান্, বাগ্বীর্য্যশালী নহেন; এই নিমিত্ত তাঁহাদের প্রগল্ভ বাক্য প্রয়োগ করা নির্দ্ধারিত আছে।"

কথাগুলি শাস্ত্রোক্ত ও চতুরের কথা বটে, কিন্তু কৃষ্ণের যোগ্য কথা নহে, সত্যপ্রিয় ধর্ম্মাত্মার কথা নহে। কিন্তু যে ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছে, তাহাকে এইরূপ উত্তর কাজেই দিতে হয়। ছদ্মবেশটা যদি দ্বিতীয় স্তরের কবির সৃষ্টি হয়, তবে এ বাক্যগুলির জন্য তিনিই দায়ী। কৃষ্ণকে যে রকম চতুর-চূড়ামণি

---

* লিখিত আছে যে, মাল্য তাঁহারা এক জন মালাকারের নিকট বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইয়াছিলেন। যাঁহাদের এত ঐশ্বর্য্য যে, রাজসূয়ের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত, তাঁহাদের তিন ছড়া মালা কিনিবার যে কড়ি জুটিবে না, ইহা অতি অসম্ভব। যাঁহারা কপটদ্যূতাপহৃত রাজ্যই ধর্ম্মানুরোধে পরিত্যাগ করিলেন, তাঁহারা যে ডাকাতি করিয়া তিন ছড়া মালা সংগ্রহ করিবেন, উহা অতি অসম্ভব। এ সকল দ্বিতীয় স্তরের কবির হাত। দৃপ্ত ক্ষত্রতেজের বর্ণনায় এ সকল কথা বেশ সাজে।

সাজাইতে তিনি চেষ্টা করিয়াছেন, এই উত্তর তাহার অঙ্গ বটে। কিন্তু যাহাই হউক, দেখা যাইতেছে যে, ব্রাহ্মণ বলিয়া ছলনা করিবার কৃষ্ণের কোন উদ্দেশ্য ছিল না। ক্ষত্রিয় বলিয়া আপনাদিগকে তিনি স্পষ্টই স্বীকার করিতেছেন। কেবল তাহাই নহে, তাঁহারা শত্রুভাবে যুদ্ধার্থে আসিয়াছেন, তাহাও স্পষ্ট বলিতেছেন।

"বিধাতা ক্ষত্রিয়গণের বাহুতেই বল প্রদান করিয়াছেন। হে রাজন্! যদি তোমার আমাদের বাহুবল দেখিতে বাসনা থাকে, তবে অদ্যই দেখিতে পাইবে, সন্দেহ নাই। হে বৃহদ্রথনন্দন! বীর ব্যক্তিগণ শত্রুগৃহে অপ্রকাশ্যভাবে এবং সুহৃদ্গৃহে প্রকাশ্যভাবে প্রবেশ করিয়া থাকেন। হে রাজন্! আমরা স্বকার্য্য সাধনার্থ শত্রুগৃহে আগমন করিয়া তদ্দত্ত পূজা গ্রহণ করি নাই; এই আমাদের নিত্যব্রত।"

কোন গোল নাই—সব কথাগুলি স্পষ্ট। এইখানে অধ্যায় শেষ হইল, আর সঙ্গে সঙ্গে ছদ্মবেশের গোলযোগটা মিটিয়া গেল। দেখা গেল যে, ছদ্মবেশের কোন মানে নাই। তার পর, পর অধ্যায়ে কৃষ্ণ যে সকল কথা বলিতেছেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন প্রকার। তাঁহার যে উন্নত চরিত্র এ পর্য্যন্ত দেখিয়া আসিয়াছি, সে তাহারই যোগ্য। পূর্ব্ব অধ্যায়ে এবং পর অধ্যায়ে বর্ণিত কৃষ্ণচরিত্রে এত গুরুতর প্রভেদ যে, দুই হাতের বর্ণনা বলিয়া বিবেচনা করিবার আমাদের অধিকার আছে।

জরাসন্ধের গৃহকে কৃষ্ণ তাঁহাদের শত্রুগৃহ বলিয়া নির্দ্দেশ করাতে জরাসন্ধ বলিলেন, "আমি কোন সময়ে তোমাদের সহিত শত্রুতা বা তোমাদের অপকার করিয়াছি, তাহা আমার স্মরণ হয় না। তবে কি নিমিত্ত নিরপরাধে তোমরা আমাকে শত্রু জ্ঞান করিতেছ?"

উত্তরে, জরাসন্ধের সঙ্গে কৃষ্ণের যথার্থ যে শত্রুতা, তাহাই বলিলেন। তাঁহার নিজের সঙ্গে জরাসন্ধের যে বিবাদ, তাহার কিছুমাত্র উত্থাপনা করিলেন না। নিজের সঙ্গে বিবাদের জন্য কেহ তাঁহার শত্রু হইতে পারে না, কেন না তিনি সর্ব্বত্র সমদর্শী, শত্রুমিত্র সমান দেখেন। তিনি পাণ্ডবের সুহৃদ্ এবং কৌরবের শত্রু, এইরূপ লৌকিক বিশ্বাস। কিন্তু বাস্তবিক মৌলিক মহাভারতের সমালোচনে আমরা ক্রমশঃ দেখিব যে, তিনি ধর্ম্মের পক্ষ এবং অধর্ম্মের বিপক্ষ; তদ্ভিন্ন তাঁহার পক্ষাপক্ষ কিছুই নাই। কিন্তু সে কথা এখন থাক। আমরা এখানে দেখিব যে, কৃষ্ণ উপযাচক হইয়া জরাসন্ধকে আত্মপরিচয় দিলেন, কিন্তু নিজের সঙ্গে বিবাদের জন্য তাঁহাকে শত্রু বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন না। তবে যে মনুষ্যজাতির শত্রু, সে কৃষ্ণের শত্রু। কেন না আদর্শ পুরুষ সর্ব্বভূতে আপনাকে দেখেন, তদ্ভিন্ন তাঁহার অন্য প্রকার আত্মজ্ঞান নাই। তাই তিনি জরাসন্ধের প্রশ্নের উত্তরে, জরাসন্ধ তাঁহার যে অপকার করিয়া ছল, তাহার প্রসঙ্গমাত্র না করিয়া, সাধারণের যে অনিষ্ট করিয়াছে, কেবল তাহাই বলিলেন। বলিলেন যে, তুমি রাজগণকে মহাদেবের নিকট বলি দিবার জন্য বন্দী করিয়া রাখিয়াছ। তাই, যুধিষ্ঠিরের নিয়োগক্রমে, আমরা তোমার প্রতি সমুদ্যত হইয়াছি। শত্রুভাটা বুঝাইয়া দিবার জন্য কৃষ্ণ জরাসন্ধকে বলিতেছেন :—

"হে বৃহদ্রথনন্দন! আমাদিগকেও তৎকৃত পাপে পাপী হইতে হইবে, যেহেতু আমরা ধর্ম্মচারী এবং ধর্ম্মরক্ষণে সমর্থ।"

এই কথাটার প্রতি পাঠক বিশেষ মনোযোগী হইবেন, এই ভরসায় আমরা ইহা বড় অক্ষরে লিখিলাম। এখন পুরাতন বলিয়া বোধ হইলেও কথাটা অতিশয় গুরুতর। যে ধর্ম্মরক্ষণে ও পাপের দমনে সক্ষম হইয়াও তাহা না করে, সে সেই পাপের সহকারী। অতএব ইহলোকে সকলেরই সাধ্যমত পাপের নিবারণের চেষ্টা না করা অধর্ম্ম। "আমি ত কোন পাপ করিতেছি না, পরে করিতেছে, আমার তাতে দোষ কি?" যিনি এইরূপ মনে করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকেন, তিনিও পাপী। কিন্তু সচরাচর ধর্ম্মাত্মারাও তাই ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকেন। এই জন্য জগতে যে সকল নরোত্তম জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারা এই ধর্ম্মরক্ষা ও পাপনিবারণব্রত গ্রহণ করেন। শাক্যসিংহ, যীশুখ্রীষ্ট প্রভৃতি ইহার উদাহরণ। এই বাক্যই তাঁহাদের জীবনচরিতের মূলসূত্র। শ্রীকৃষ্ণেরও সেই ব্রত। এই মহাবাক্য স্মরণ না রাখিলে তাঁহার জীবনচরিত বুঝা যাইবে না। জরাসন্ধ, কংস, শিশুপালের বধ, মহাভারতের যুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষে কৃষ্ণকৃত সহায়তা, কৃষ্ণের এই সকল কার্য্য এই মূলসূত্রের সাহায্যেই বুঝা যায়। ইহাকেই পুরাণকারেরা "পৃথিবীর ভারহরণ" বলিয়াছেন। খ্রীষ্টকৃত হউক, বুদ্ধকৃত হউক, কৃষ্ণকৃত হউক, এই পাপ নিবারণ ব্রতের নাম ধর্ম্মপ্রচার। ধর্ম্মপ্রচার দুই প্রকারে হইতে পারে ও হইয়া থাকে; এক বাক্যতঃ অর্থাৎ ধর্ম্মসম্বন্ধীয় উপদেশ দ্বারা, দ্বিতীয়, কার্য্যতঃ অর্থাৎ আপনার কার্য্যসকলকে ধর্ম্মের আদর্শে পরিণত করণের দ্বারা। খ্রীষ্ট, শাক্যসিংহ ও শ্রীকৃষ্ণ এই দ্বিবিধ অনুষ্ঠানই করিয়াছিলেন। তবে শাক্যসিংহ ও খ্রীষ্টকৃত ধর্ম্মপ্রচার, উপদেশপ্রধান; কৃষ্ণকৃত ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যপ্রধান। ইহাতে কৃষ্ণেরই প্রাধান্য। কেন না, বাক্য সহজ, কার্য্য কঠিন এবং অধিকতর ফলোপধায়ক। যিনি কেবল

মানুষ, তাঁহার দ্বারা ইহা সুসম্পন্ন হইতে পারে কি না, সে কথা এক্ষণে আমাদের বিচার্য্য নহে।

এইখানে একটা কথার মীমাংসা করা ভাল। কৃষ্ণকৃত কংস-শিশুপালাদির বধের উল্লেখ করিলাম, এবং জরাসন্ধকে বধ করিবার জন্যই কৃষ্ণ আসিয়াছেন বলিয়াছি; কিন্তু পাপীকে বধ করা কি আদর্শ মনুষ্যের কাজ? যিনি সর্ব্বভূতে সমদর্শী, তিনি পাপাত্মাকেও আত্মবৎ দেখিয়া, তাহারও হিতাকাঙ্ক্ষী হইবেন না কেন? সত্য বটে, পাপীকে জগতে রাখিলে জগতের মঙ্গল নাই, কিন্তু তাহার বধসাধনই কি জগৎ উদ্ধারের একমাত্র উপায়? পাপীকে পাপ হইতে বিরত করিয়া, ধর্ম্মে প্রবৃত্তি দিয়া, জগতের এবং পাপীর উভয়ের মঙ্গল এককালে সিদ্ধ করা তাহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট উপায় নয় কি? আদর্শ পুরুষের তাহাই অবলম্বন করাই কি উচিত ছিল না? যীশু, শাক্যসিংহ ও চৈতন্য এইরূপে পাপীর উদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছিলেন।

এ কথার উত্তর দুইটি। প্রথম উত্তর এই যে, কৃষ্ণচরিত্রে এ ধর্ম্মেরও অভাব নাই। তবে ক্ষেত্রভেদে ফলভেদও ঘটিয়াছে। দুর্য্যোধন ও কর্ণ, যাহাতে নিহত না হইয়া ধর্ম্মপথ অবলম্বন পূর্ব্বক জীবনে ও রাজ্যে বজায় থাকে, সে চেষ্টা তিনি বিধিমতে করিয়াছিলেন, এবং সেই কার্য্য সম্বন্ধেই বলিয়াছিলেন, পুরুষকারের দ্বারা যাহা সাধ্য, তাহা আমি করিতে পারি, কিন্তু দৈব আমার আয়ত্ত নহে। কৃষ্ণ মানুষী শক্তির দ্বারা কার্য্য করিতেন, তজ্জন্য যাহা স্বভাবতঃ অসাধ্য, তাহাতে যত্ন করিয়াও কখনও কখনও নিষ্ফল হইতেন। শিশুপালেরও শত অপরাধ ক্ষমা করিয়াছিলেন। সেই ক্ষমার কথাটা অলৌকিক উপন্যাসে আবৃত হইয়া আছে। যথাস্থানে আমরা তাহার তাৎপর্য্য বুঝিতে চেষ্টা করিব। কংসবধের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

পাইলেট্‌কে খৃষ্টিয়ান করা, খৃষ্টের পক্ষে যতদূর সম্ভব ছিল, কংসকে ধর্ম্মপথে আনয়ন করা কৃষ্ণের পক্ষে ততদূর সম্ভব। জরাসন্ধ সম্বন্ধেও তাই বলা যাইতে পারে। তথাপি জরাসন্ধ সম্বন্ধে কৃষ্ণের সে বিষয়ে একটু কথোপকথন হইয়াছিল। জরাসন্ধ কৃষ্ণের নিকট ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণ করা দূরে থাকুক, সে কৃষ্ণকেই ধর্ম্মবিষয়ক একটি লেকচর শুনাইয়া দিল, যথা—

"দেখ, ধর্ম্ম বা অর্থের উপঘাত দ্বারাই মনঃপীড়া জন্মে; কিন্তু যে ব্যক্তি ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া ধর্ম্মজ্ঞ হইয়াও নিরপরাধে লোকের ধর্ম্মার্থে উপঘাত করে, তাহার ইহকালে অমঙ্গল ও পরকালে নরকে গমন হয়, সন্দেহ নাই।" ইত্যাদি।

এ সব স্থলে ধর্ম্মোপদেশে কিছু হয় না। জরাসন্ধকে সৎপথে আনিবার অন্য উপায় ছিল কি না, তাহা আমাদের বুদ্ধিতে আসে না। অতিমানুষকীর্ত্তি একটা প্রচার করিলে, যা হয়, একটা কাণ্ড হইতে পারিত। তেমন অন্যান্য ধর্ম্মপ্রচারকদিগের মধ্যে অনেক দেখি, কিন্তু কৃষ্ণচরিত্র অতিমানুষী শক্তির বিরোধী। শ্রীকৃষ্ণ ভূত ছাড়াইয়া, রোগ ভাল করিয়া, বা কোন প্রকার বুজ্‌রুকি ভেল্‌কির দ্বারা ধর্ম্মপ্রচার বা আপনার দেবত্ব স্থাপন করেন নাই।

তবে ইহা বুঝিতে পারি যে, জরাসন্ধের বধ কৃষ্ণের উদ্দেশ্য নহে; ধর্ম্মের রক্ষা অর্থাৎ নির্দ্দোষ অথচ প্রপীড়িত রাজগণের উদ্ধারই তাঁহার উদ্দেশ্য। তিনি জরাসন্ধকে অনেক বুঝাইয়া পরে বলিলেন, "আমি বসুদেবনন্দন কৃষ্ণ, আর এই দুই বীরপুরুষ পাণ্ডুতনয়। আমরা তোমাকে যুদ্ধে আহ্বান করিতেছি, এক্ষণে হয় সমস্ত ভূপতিগণকে পরিত্যাগ কর, না হয় যুদ্ধ করিয়া যমালয়ে গমন কর।" অতএব জরাসন্ধ রাজগণকে ছাড়িয়া দিলে, কৃষ্ণ তাহাকে নিষ্কৃতি দিতেন। জরাসন্ধ তাহাতে সম্মত না হইয়া যুদ্ধ করিতে চাহিলেন, সুতরাং যুদ্ধই হইল। জরাসন্ধ যুদ্ধ ভিন্ন কোনরূপ বিচারে যাথার্থ্য স্বীকার করিবার পাত্র ছিলেন না।

দ্বিতীয় উত্তর এই যে, যীশু ও বুদ্ধের জীবনীতে যতটা পতিতোদ্ধারের চেষ্টা দেখি, কৃষ্ণের জীবনে ততটা দেখি না, ইহা স্বীকার্য্য। যীশু বা শাক্যের ব্যবসায়ই ধর্ম্মপ্রচার। কৃষ্ণ ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছেন বটে, কিন্তু ধর্ম্মপ্রচার তাঁহার ব্যবসায় নহে; সেটা আদর্শ পুরুষের আদর্শ জীবন নির্ব্বাহের আনুষঙ্গিক ফল মাত্র। কথাটা এই রকম করিয়া বলাতে কেহই না মনে করেন যে, যীশুখ্রীষ্ট বা শাক্যসিংহের, বা ধর্ম্মপ্রচার ব্যবসায়ের কিছুমাত্র লাঘব করিতে ইচ্ছা করি। যীশু এবং শাক্য উভয়কেই আমি মনুষ্যশ্রেষ্ঠ বলিয়া ভক্তি করি এবং তাঁহাদের চরিত্র আলোচনা করিয়া তাহাতে জ্ঞানলাভ করিবার ভরসা করি। ধর্ম্মপ্রচারকের ব্যবসায় (ব্যবসায় অর্থে এখানে যে কর্ম্মের অনুষ্ঠানে আমরা সর্ব্বদা প্রবৃত্ত) আর সকল ব্যবসায় হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানি। কিন্তু যিনি আদর্শ মনুষ্য, তাঁহার সে ব্যবসায় হইতে পারে না। কারণ, যিনি আদর্শ মনুষ্য, মানুষের যত প্রকার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম আছে, সকলই তাঁহারই অনুষ্ঠেয়। কোন কর্ম্মই তাঁহার "ব্যবসায়" নহে, অর্থাৎ অন্য কোন কর্ম্মের অপেক্ষা প্রধানত্ব লাভ করিতে পারে না। যীশু বা শাক্যসিংহ আদর্শ পুরুষ নহেন, কিন্তু মনুষ্যশ্রেষ্ঠ। মনুষ্যের শ্রেষ্ঠ ব্যবসায় অবলম্বনই তাঁহাদের বিধেয়, এবং তাহা অবলম্বন করিয়া তাঁহারা লোকহিতসাধন করিয়া গিয়াছেন।

কথাটা যে আমার সকল শিক্ষিত পাঠক বুঝিয়াছেন, এমন আমার বোধ হয় না। বুঝিবার

একটা প্রতিবন্ধক আছে। আদর্শ পুরুষের কথা বলিতেছি। অনেক শিক্ষিত পাঠক "আদর্শ" শব্দটি "Ideal" শব্দের দ্বারা অনুবাদ করিবেন। অনুবাদও দুষ্ট হইবে না। এখন, একটা "Christian Ideal" আছে। খ্রীষ্টিয়ানের আদর্শ পুরুষ যীশু। আমরা বাল্যকাল হইতে খ্রীষ্টিয়ান জাতির সাহিত্য অধ্যয়ন করিয়া সেই আদর্শটি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি। আদর্শ পুরুষের কথা হইলেই সেই আদর্শের কথা মনে পড়ে। যে আদর্শ সেই আদর্শের সঙ্গে মিলে না, তাহাকে আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। খ্রীষ্ট পতিতোদ্ধারী; কোন দুরাত্মাকে তিনি প্রাণে নষ্ট করেন নাই, করিবার ক্ষমতাও রাখিতেন না। শাক্যসিংহে বা চৈতন্যে আমরা সেই গুণ দেখিতে পাই। এ জন্য ইঁহাদিগকে আমরা আদর্শ পুরুষ বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু কৃষ্ণ পতিতপাবন নাম ধরিয়াও, প্রধানতঃ পতিত-নিপাতী বলিয়াই ইতিহাসে পরিচিত। সুতরাং তাঁহাকে আদর্শ পুরুষ বলিয়াই আমরা হঠাৎ বুঝিতে পারি না। কিন্তু আমাদের একটা কথা বিচার করিয়া দেখা উচিত। এই Christian Ideal কি যথার্থ মনুষ্যত্বের আদর্শ? সকল জাতির জাতীয় আদর্শ কি সেইরূপই হইবে?

এই প্রশ্নে আর একটা প্রশ্ন উঠে—হিন্দুর আবার জাতীয় আদর্শ আছে না কি? Hindu Ideal আছে না কি? যদি থাকে, তবে কে? কথাটা শিক্ষিত হিন্দুমণ্ডলীমধ্যে জিজ্ঞাসা হইলে অনেকেরই মস্তককণ্ডূয়নে প্রবৃত্ত হইবার সম্ভাবনা। কেহ হয় ত জটাবল্কলধারী শুভ্রশ্মশ্রুগুম্ফবিভূষিত ব্যাস-বশিষ্ঠাদি ঋষিদিগকে ধরিয়া টানাটানি করিবেন, কেহ হয় ত বলিয়া বসিবেন, "ও ছাই ভস্ম নাই।" নাই বটে সত্য, থাকিলে আমাদের এমন দুর্দ্দশা হইবে কেন? কিন্তু এক দিন ছিল। তখন হিন্দু পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি। সে আদর্শ হিন্দু কে? ইহার উত্তর আমি যেরূপ বুঝিয়াছি, তাহা পূর্ব্বে বুঝাইয়াছি। রামচন্দ্রাদি ক্ষত্রিয়গণ সেই আদর্শ প্রতিমার নিকটবর্ত্তী, কিন্তু যথার্থ হিন্দু আদর্শ শ্রীকৃষ্ণ। তিনিই যথার্থ মনুষ্যত্বের আদর্শ—খ্রীষ্ট প্রভৃতিতে সেরূপ আদর্শের সম্পূর্ণতা পাইবার সম্ভাবনা নাই।

কেন, তাহা বলিতেছি। মনুষ্যত্ব কি, ধর্ম্মতত্ত্বে তাহা বুঝাইবার চেষ্টা পাইয়াছি। মনুষ্যের সকল বৃত্তিগুলির সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি ও সামঞ্জস্যে মনুষ্যত্ব। যাঁহাতে সে সকলের চরম স্ফূর্ত্তি ও সামঞ্জস্য পাইয়াছে, তিনিই আদর্শ মনুষ্য। খৃষ্টে তাহা নাই—শ্রীকৃষ্ণে তাহা আছে। যীশুকে যদি রোমক সম্রাট্ য়িহুদার শাসন-কর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত করিতেন, তবে কি তিনি সুশাসন করিতে পারিতেন? তাহা পারিতেন না—কেন না, রাজকার্য্যের জন্য যে সকল বৃত্তিগুলি প্রয়োজনীয়, তাহা তাঁহার অনুশীলিত হয় নাই। অথচ এরূপ ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তি রাজ্যের শাসনকর্ত্তা হইলে সমাজের অনন্ত মঙ্গল। পক্ষান্তরে শ্রীকৃষ্ণ যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নীতিজ্ঞ, তাহা প্রসিদ্ধ। শ্রেষ্ঠ নীতিজ্ঞ বলিয়া তিনি মহাভারতে ভূরি ভূরি বর্ণিত হইয়াছেন, এবং যুধিষ্ঠির বা উগ্রসেন শাসনকার্য্যে তাঁহার পরামর্শ ভিন্ন কোন গুরুতর কাজ করিতেন না। এইরূপে কৃষ্ণ নিজে রাজা না হইয়াও প্রজার অশেষ মঙ্গলসাধন করিয়াছিলেন—এই জরাসন্ধের বন্দীগণের মুক্তি তাহার এক উদাহরণ। পুনশ্চ, মনে কর, যদি য়িহুদায়া রোমকের অত্যাচারপীড়িত হইয়া, স্বাধীনতার জন্য উত্থিত হইয়া, যীশুকে সেনাপতিত্বে বরণ করিত, যীশু কি করিতেন? যুদ্ধে তাঁহার শক্তিও ছিল না, প্রবৃত্তিও ছিল না। "কাইসরের পাওনা কাইসরকে দাও" বলিয়া তিনি প্রস্থান করিতেন। কৃষ্ণও যুদ্ধে প্রবৃত্তিশূন্য—কিন্তু ধর্ম্মার্থ যুদ্ধও আছে। ধর্ম্মার্থ যুদ্ধ উপস্থিত হইলে অগত্যা প্রবৃত্ত হইতেন। যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে তিনি অজেয় ছিলেন। যীশু অশিক্ষিত, কৃষ্ণ সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ। অন্যান্য গুণ সম্বন্ধেও ঐরূপ। উভয়েই শ্রেষ্ঠ ধার্ম্মিক ও ধর্ম্মজ্ঞ। অতএব কৃষ্ণই যথার্থ আদর্শ মনুষ্য—"Christian Ideal" অপেক্ষা "Hindu Ideal" শ্রেষ্ঠ।

ঈদৃশ সর্ব্বগুণসম্পন্ন আদর্শ মনুষ্য কার্য্যবিশেষে জীবন সমর্পণ করিতে পারেন না। তাহা হইলে, ইতর কার্য্যগুলি অনুষ্ঠিত, অথবা অসামঞ্জস্যের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। লোকচরিত্র ভেদে, অবস্থাভেদে, শিক্ষাভেদে ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম ও ভিন্ন ভিন্ন সাধনের অধিকারী আদর্শ মনুষ্য, সকল শ্রেণীরই আদর্শ হওয়া উচিত। এই জন্য শ্রীকৃষ্ণের, শাক্যসিংহ, যীশু বা চৈতন্যের ন্যায় সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক ধর্ম্মপ্রচার, ব্যবসায়স্বরূপ অবলম্বন করা অসম্ভব! কৃষ্ণ সংসারী, গৃহী, রাজনীতিজ্ঞ, যোদ্ধা, দণ্ডপ্রণেতা, তপস্বী এবং প্রচারক; সংসারী ও গৃহীদিগের, রাজাদিগের, যোদ্ধাদিগের, রাজপুরুষদিগের, তপস্বীদিগের, ধর্ম্মবেত্তাদিগের, এবং একাধারে সর্ব্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের আদর্শ। জরাসন্ধাদির বধ আদর্শ রাজ-পুরুষ ও দণ্ডপ্রণেতার অবশ্য অনুষ্ঠেয়। ইহাই Hindu Ideal. অসম্পূর্ণ যে বৌদ্ধ বা খৃষ্টধর্ম্ম, তাহার আদর্শ-পুরুষকে আদর্শ স্থানে বসাইয়া, সম্পূর্ণ যে হিন্দুধর্ম্ম, তাহার আদর্শ পুরুষকে আমরা বুঝিতে পারিব না।

কিন্তু বুঝিবার বড় প্রয়োজন হইয়াছে, কেন না, ইহার ভিতর আর একটা বিস্ময়কর কথা আছে। কি খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ইউরোপে, কি হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ভারতবর্ষে,

আদর্শের ঠিক বিপরীত ফল ফলিয়াছে। খৃষ্টীয় আদর্শ পুরুষ বিনীত, নিরীহ, নির্ব্বিরোধী, সন্ন্যাসী; এখনকার খৃষ্টিয়ান ঠিক বিপরীত। ইউরোপ এখন ঐহিক সুখরত সশস্ত্র যোদ্ধৃবর্গের বিস্তীর্ণ শিবির মাত্র। হিন্দুধর্ম্মের আদর্শ পুরুষ সর্ব্বকর্ম্মকৃৎ—এখনকার হিন্দু সর্ব্বকর্ম্মে অকর্ম্মা। এরূপ ফলবৈপরীত্য ঘটিল কেন? উত্তর সহজ,—লোকের চিত্ত হইতে উভয় দেশেই সেই প্রাচীন আদর্শ লুপ্ত হইয়াছে। উভয় দেশেই এককালে সেই আদর্শ এক দিন প্রবল ছিল—প্রাচীন খৃষ্টিয়ানদিগের ধর্ম্মপরায়ণতা ও সহিষ্ণুতা, ও প্রাচীন হিন্দুরাজগণ ও রাজপুরুষগণের সর্ব্বগুণবত্তা তাহার প্রমাণ। যে দিন সে আদর্শ হিন্দুদিগের চিত্ত হইতে বিদূরিত হইল—যে দিন আমরা কৃষ্ণচরিত্র অবনত করিয়া লইলাম, সেই দিন হইতে আমাদিগের সামাজিক অবনতি। জয়দেব গোঁসাইয়ের কৃষ্ণের অনুকরণে সকলে ব্যস্ত—মহাভারতের কৃষ্ণকে কেহ স্মরণ করে না।

এখন আবার সেই আদর্শ পুরুষকে জাতীয় হৃদয়ে জাগরিত করিতে হইবে। ভরসা করি, এই কৃষ্ণচরিত্র ব্যাখ্যায় সে কার্য্যের কিছু আনুকূল্য হইতে পারিবে।

জরাসন্ধ-বধের ব্যাখ্যায় এ সকল কথা বলিবার তত প্রয়োজন ছিল না, প্রসঙ্গত এ তত্ত্ব উত্থাপিত হইয়াছে মাত্র। কিন্তু এ কথাগুলি একস্থানে না একস্থানে আমাকে বলিতে হইবে। আগে বলিয়া রাখায় লেখক পাঠক উভয়ের পথ সুগম হইবে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ভীম-জরাসন্ধের যুদ্ধ

আমরা এ পর্য্যন্ত কৃষ্ণচরিত্র যতদূর সমালোচনা করিয়াছি, তাহাতে মহাভারতের কৃষ্ণকে কোথাও বিষ্ণু বলিয়া পরিচিত হইতে দেখি নাই। কেহ তাঁহাকে বিষ্ণু বলিয়া সম্বোধন বা বিষ্ণুজ্ঞানে তাঁহার সঙ্গে কথোপকথন করে নাই। তাঁহাকেও এ পর্য্যন্ত মনুষ্যশক্তির অতিরিক্ত শক্তিতে কোন কার্য্য করিতে দেখি নাই। তিনি বিষ্ণুর অবতার হউন বা না হউন, কৃষ্ণচরিত্রের স্থূল মর্ম্ম মনুষ্যত্ব, দেবত্ব নহে, ইহা আমরা পুনঃ পুনঃ বুঝাইয়াছি।

কিন্তু ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, ইহার পরে মহাভারতের অনেক স্থানে তাঁহাকে বিষ্ণু বলিয়া সম্বোধিত এবং পরিচিত হইতে দেখি। অনেকে বিষ্ণু বলিয়া তাঁহার উপাসনা করিতেছে দেখি, এবং কদাচ কখনও তাঁহাকে লোকাতীতা বৈষ্ণবী শক্তিতে কার্য্য করিতেও দেখি; এ পর্য্যন্ত তাহা দেখি নাই, কিন্তু এখনই দেখিব। এই দুইটি ভাব পরস্পর বিরোধী কি না?

যদি কেহ বলেন যে, এই দুইটি ভাব পরস্পর বিরোধী নহে, কেন না, যখন দৈব শক্তির বা দেবত্বের কোন প্রকার বিকাশের কোন প্রয়োজন নাই, তখন কাব্যে বা ইতিহাসে কেবল মনুষ্যভাব প্রকটিত হয়, আর তাহার যখন প্রয়োজন আছে, তখন দৈবভাব প্রকটিত হয়; তাহা হইলে আমরা বলিব যে, এই উত্তর যথার্থ উত্তর হইল না। কেন না, নিষ্প্রয়োজনেই দৈবভাবের প্রকাশ অনেক সময়ে দেখা যায়। এই জরাসন্ধবধ হইতেই দুই একটা উদাহরণ দিতেছি।

জরাসন্ধ-বধের পর কৃষ্ণ ও ভীমার্জ্জুন জরাসন্ধের রথখানা লইয়া তাহাতে আরোহণপূর্ব্বক নিষ্ক্রান্ত হইলেন। দেবনির্ম্মিত রথ, তাহাতে কিছুরই অভাব নাই। তবু খানখাই কৃষ্ণ গরুড়কে স্মরণ করিলেন, স্মরণমাত্র গরুড় আসিয়া রথের চূড়ায় বসিলেন। গরুড় আসিয়া কোন কাজ করিলেন না, তাঁহাতে আর কোন প্রয়োজনও ছিল না। কথাটারও আর কোন প্রয়োজন দেখা যায় না, কেবল মাঝে হইতে কৃষ্ণের বিষ্ণুত্ব সূচিত হয়, জরাসন্ধকে বধ করিবার সময় কোন দৈব শক্তির প্রয়োজন হইল না, কিন্তু রথে চড়িবার বেলা হইল!

আবার যুদ্ধের পূর্ব্বে, অমনি একটা কথা আছে। জরাসন্ধ যুদ্ধে স্থিরসঙ্কল্প হইলে, কৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"হে রাজন্! আমাদের তিন জনের মধ্যে কাহার সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা হয় বল? কে যুদ্ধ করিতে সজ্জীভূত হইবে?" জরাসন্ধ ভীমের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। অথচ ইহার দুই ছত্র পূর্ব্বেই লেখা আছে যে, কৃষ্ণ জরাসন্ধকে যাদবগণের অবধ্য স্মরণ করিয়া ব্রহ্মার আদেশানুসারে স্বয়ং তাঁহার সংহারে প্রবৃত্ত হইলেন না।

ব্রহ্মার এই আদেশ কি, তাহা মহাভারতে কোথাও নাই, পরবর্ত্তী গ্রন্থে আছে। এখন পাঠকের বিশ্বাস হয় না কি যে, এইগুলি আদিম মহাভারতের মূলের উপর পরবর্ত্তী লেখকের কারিগরি? আর কৃষ্ণের বিষ্ণুত্ব ভিতরে ভিতরে খাড়া রাখা ইহার উদ্দেশ্য। আদিম স্তরের মূলে কৃষ্ণ বিষ্ণুতে কোনরূপ সম্বন্ধ স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া দেওয়া হয় নাই, কেন না, কৃষ্ণচরিত্র মনুষ্যচরিত্র, দেবচরিত্র নহে। যখন ইহাতে কৃষ্ণোপাসক দ্বিতীয় স্তরে কবির হাত পড়িল, তখন এটা বড় ভুল বলিয়া বোধ হইয়াছিল সন্দেহ

নাই। পরবর্ত্তী কবিকল্পনাটা তাঁহার জানা ছিল, তিনি অভাব পূরণ করিয়া দিলেন।

এইরূপ, যেখানে বন্ধনবিমুক্ত ক্ষত্রিয় রাজগণ কৃষ্ণকে ধর্ম্মরক্ষার জন্য ধন্যবাদ করিতেছেন, সেখানেও কোথাও কিছু নাই, খামখা তাঁহারা কৃষ্ণকে "বিষ্ণো!" বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন। এখন ইতিপূর্ব্বে কোথাও দেখা যায় না যে, তিনি বিষ্ণু বা তদর্থক অন্য নামে সম্বোধিত হইয়াছেন। যদি এমন দেখিতাম যে, ইতিপূর্ব্বে কৃষ্ণ এরূপ নামে মধ্যে মধ্যে অভিহিত হইয়া আসিতেছেন, তাহা হইলে বুঝিতাম যে, ইহাতে অসঙ্গত বা অনৈসর্গিক কিছুই নাই, লোকের এমন বিশ্বাস আছে বলিয়াই ইহা হইল। যদি এমন দেখিতাম যে, এই সময়ে কৃষ্ণ কোন অলৌকিক কাজ করিয়াছেন, তাহা দেবতা ভিন্ন মনুষ্যের সাধ্য নহে, তাহা হইলেও হঠাৎ এ "বিষ্ণো!" সম্বোধনের উপযোগিতা বুঝিতে পারিতাম। কিন্তু কৃষ্ণ তেমন কিছুই কাজ করেন নাই। তিনি জরাসন্ধকে বধ করেন নাই—সর্ব্বলোকসমক্ষে ভীম তাঁহাকে বধ করিয়াছিলেন। সে কার্য্যের প্রবর্ত্তক কৃষ্ণ বটে, কিন্তু কারাবাসী রাজগণ তাহার কিছুই জানেন না। অতএব কৃষ্ণে অকস্মাৎ রাজগণ-কর্ত্তৃক এই বিষ্ণুত্ব আরোপ কখনও ঐতিহাসিক বা মৌলিক হইতে পারে না। কিন্তু উহা ঐ গরুড় স্মরণ ও ব্রহ্মার আদেশ স্মরণের সঙ্গে অত্যন্ত সঙ্গত, জরাসন্ধ বধের আর কোন অংশের সঙ্গে সঙ্গত নহে। তিনটি কথা এক হাতের কারিগরি—আর তিনটা কথাই মূলাতিরিক্ত। বোধ হয় ইহা পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে।

যাঁহারা বলিবেন, তাহা হয় নাই, তাঁহাদিগের এ কৃষ্ণচরিত্র সমালোচনের অনুবর্ত্তী হইবার আর কোন ফল দেখি না। কেন না, এ সকল বিষয়ে অন্য কোন প্রকার প্রমাণ সংগ্রহের সম্ভাবনা নাই। আর এই সমালোচনায় যাঁহাদের এমন বিশ্বাস হইয়াছে যে, জরাসন্ধবধমধ্যে কৃষ্ণের এই বিষ্ণুত্ব-সূচনা পরবর্ত্তী কবিপ্রণীত ও প্রক্ষিপ্ত, তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করি, তবে কৃষ্ণের ছদ্মবেশ ও কপটাচার বিষয়ক যে কয়েকটি কথা এই জরাসন্ধ-বধপর্ব্বাধ্যায়ে আছে, তাহাও ঐরূপ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া পরিত্যাগ করিব না কেন? দুই বিষয়ই ঠিক একই প্রমাণের উপর নির্ভর করে।

বস্তুতঃ এই দুই বিষয় একত্র করিয়া দেখিলে বেশ বুঝা যাইবে যে, এই জরাসন্ধ-বধপর্ব্বাধ্যায়ে পরবর্ত্তী কবির বিলক্ষণ কারিগরি আছে এবং এই সকল অসঙ্গতি তাহারই ফল। দুই কবির যে হাত আছে, তাহার আর এক প্রমাণ দিতেছি।

জরাসন্ধের পূর্ব্ববৃত্তান্ত কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের কাছে বিবৃত করিলেন, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। সেই সঙ্গে কৃষ্ণের সহিত জরাসন্ধের কংসবধ-জনিত যে বিরোধ তাহারও পরিচয় দিলেন। তাহা হইতে কিছু উদ্ধৃত করিয়াছি। তাহার পরেই মহাভারতকার কি বলিতেছেন, শুনুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, নরপতি বৃহদ্রথ ভার্য্যাদ্বয় সমভিব্যাহারে তপোবনে বহুদিবস তপোঽনুষ্ঠান করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। তাঁহারা জরাসন্ধ ও চণ্ডকৌশিকোক্ত সমুদয় বর লাভ করিয়া নিষ্কণ্টকে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে ভগবান্ বাসুদেব কংস নরপতিকে সংহার করেন। কংসনিপাত নিবন্ধন কৃষ্ণের সহিত জরাসন্ধের ঘোরতর শত্রুতা জন্মিল।

এই সকলই ত কৃষ্ণ বলিয়াছেন—আরও সবিস্তারে বলিয়াছেন—আবার সে কথা কেন? প্রয়োজন আছে। মূল মহাভারতপ্রণেতা অদ্ভুতরসে বড় রসিক নহেন—কৃষ্ণ অলৌকিক ঘটনা কিছুই বলিলেন না। সে অভাব এখন পূরিত হইতে চলিল। বৈশম্পায়ন বলিতেছেন,—

"মহাবলপরাক্রান্ত জরাসন্ধ গিরিব্রজমধ্যে থাকিয়া কৃষ্ণের বধার্থে এক বৃহৎ গদা একোনশত বার ঘূর্ণায়মান করিয়া নিক্ষেপ করিল। গদা মথুরাস্থিত অদ্ভুতকর্ম্মা বাসুদেবের একোনশত যোজন অন্তরে পতিত হইল। পৌরগণ কৃষ্ণ সমীপে গদাপতনের বিষয় নিবেদন করিল। তদবধি সেই মথুরার সমীপবর্ত্তী স্থান গদাবসান নামে বিখ্যাত হইল।"

এখনও যদি কোন পাঠকের বিশ্বাস থাকে যে, বর্ত্তমান জরাসন্ধবধ-পর্ব্বাধ্যায়ের সমুদয় অংশই মূল মহাভারতের অন্তর্গত এবং এক ব্যক্তির প্রণীত এবং কৃষ্ণাদি যথার্থই ছদ্মবেশে গিরিব্রজে আসিয়াছিলেন, তবে তাঁহাকে অনুরোধ করি, হিন্দুদিগের পুরাণেতিহাস মধ্যে ঐতিহাসিক তত্ত্বের অনুসন্ধান পরিত্যাগ করিয়া অন্য শাস্ত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত হউন। এদিকে কিছু হইবে না।

অতঃপর, জরাসন্ধবধের অবশিষ্ট কথাগুলি বলিয়া এ পর্ব্বাধ্যায়ের উপসংহার করিব। সে সকল খুব সোজা কথা।

জরাসন্ধ যুদ্ধার্থ ভীমকে মনোনীত করিলে জরাসন্ধ "যশস্বী ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক কৃতস্বস্ত্যয়ন হইয়া ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে বর্ম্মকিরীট পরিত্যাগ পূর্ব্বক" যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। "তখন যাবতীয় পুরবাসী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, বনিতা ও বৃদ্ধগণ তাঁহাদের সংগ্রাম দেখিতে তথায় উপস্থিত হইলেন। যুদ্ধক্ষেত্র জনতা দ্বারা সমাকীর্ণ

হইল।" "চতুর্দ্দশ দিবস যুদ্ধ হইল।" (যদি সত্য হয়, বোধ হয়, তবে মধ্যে মধ্যে অবকাশমত যুদ্ধ হইত)। "চতুর্দ্দশ দিবসে বাসুদেব জরাসন্ধকে ক্লান্ত দেখিয়া ভীমকর্ম্মা ভীমসেনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে কৌন্তেয়! ক্লান্ত শত্রুকে পীড়ন করা উচিত নহে। অধিকতর পীড্যমান হইলে জীবন পরিত্যাগ করে। অতএব ইনি তোমার পীড়নীয় নহেন। হে ভরতর্ষভ! ইঁহার সহিত বাহুযুদ্ধ কর।" (অর্থাৎ যে শত্রুকে ধর্ম্মতঃ বধ করিতে হইবে, তাহাকেও পীড়ন কর্ত্তব্য নহে)। ভীম জরাসন্ধকে পীড়ন করিয়াই বধ করিলেন। ভীমের ধর্ম্মজ্ঞান কৃষ্ণের তুল্য হইতে পারে না।

তখন কৃষ্ণার্জ্জুন ও ভীম কারাবদ্ধ মহীপালগণকে বিমুক্ত করিলেন। তাহাই জরাসন্ধবধের একমাত্র উদ্দেশ্য। অতএব রাজগণকে মুক্ত করিয়া আর কিছুই করিলেন না, দেশে চলিয়া গেলেন। তাঁহারা Annexatinist ছিলেন না—পিতার অপরাধে পুত্রের রাজ্য অপহরণ করিতেন না, তাঁহারা জরাসন্ধপুত্র সহদেবকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। সহদেব কিছু নজর দিল, তাহা গ্রহণ করিলেন। কারামুক্ত রাজগণ কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এক্ষণে এই ভৃত্যদিগকে কি করিতে হইবে, অনুমতি করুন।"

কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে কহিলেন, "রাজা যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ করিতে অভিলাষ করিয়াছেন, আপনারা সেই সাম্রাজ্যচিকীর্ষু ধার্ম্মিকের সাহায্য করেন, ইহাই প্রার্থনা।"

যুধিষ্ঠিরকে কেন্দ্রস্থিত করিয়া ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন করা কৃষ্ণের এক্ষণে জীবনের উদ্দেশ্য। অতএব প্রতি পদে তিনি তাহার উদ্যোগ করিতেছেন।

এই জরাসন্ধবধে কৃষ্ণচরিত্রের বিশেষ মহিমা প্রকাশমান—কিন্তু পরবর্ত্তী লেখকদিগের দৌরাত্ম্যে ইহা বড় জটিল হইয়া পড়িয়াছে। ইহার পর শিশুপালবধ। সেখানে আরও গণ্ডগোল।

নবম পরিচ্ছেদ

অর্ঘাভিহরণ

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ আরম্ভ হইল। নানাদিদ্দেশ হইতে আগত রাজগণ, ঋষিগণ, এবং অন্যান্য শ্রেণীর লোকে রাজধানী পুরিয়া গেল। এই বৃহৎ কার্য্যের সুনির্ব্বাহ জন্য পাণ্ডবেরা আত্মীয়বর্গকে বিশেষ বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। দুঃশাসন ভোজ্য দ্রব্যের তত্ত্বাবধানে, সঞ্জয় পরিচর্য্যায়, কৃপাচার্য্য রত্নরক্ষায় ও দক্ষিণাদানে, দুর্য্যোধন উপায়ন-প্রতিগ্রহে, ইত্যাদিরূপে সকলকে নিযুক্ত করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কোন্ কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন? দুঃশাসনাদির নিয়োগের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের নিয়োগের কথাও লেখা আছে। তিনি ব্রাহ্মণগণের পাদপ্রক্ষালনে নিযুক্ত হইলেন।

কথাটা বুঝা গেল না। শ্রীকৃষ্ণ কেন এই ভৃত্যোপযোগী কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন? তাঁহার যোগ্য কি আর কোন ভাল কাজ ছিল না? না, ব্রাহ্মণের পা ধোয়ানই বড় মহৎ কাজ? তাঁহাকে আদর্শ পুরুষ বলিয়া গ্রহণ করিয়া কি পাচকব্রাহ্মণঠাকুরদিগের পাদপ্রক্ষালন করিয়া বেড়াইতে হইবে? যদি তাই হয়, তবে তিনি আদর্শ পুরুষ নহেন, ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিব।

কথাটার অনেক রকম ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। ব্রাহ্মণগণেরই প্রচারিত এবং এখনকার প্রচলিত ব্যাখ্যা এই যে, শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণগণের গৌরব বাড়াইবার জন্যই সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া এইটিতে আপনাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এ ব্যাখ্যা অতি অশ্রদ্ধেয় বলিয়া আমাদের বোধ হয়। শ্রীকৃষ্ণ অন্যান্য ক্ষত্রিয়দিগের ন্যায় ব্রাহ্মণকে যথাযোগ্য সম্মান করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে কোথাও ব্রাহ্মণের গৌরব প্রচারের জন্য বিশেষ ব্যস্ত দেখি না। বরং অনেক স্থানে তাঁহাকে বিপরীত পথ অবলম্বন করিতে দেখি। যদি বনপর্ব্বে দুর্ব্বাসার আতিথ্য বৃত্তান্তটা মৌলিক মহাভারতের অন্তর্গত বিবেচনা করা যায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, তিনি রকম সকম করিয়া ব্রাহ্মণঠাকুরদিগকে পাণ্ডবদিগের আশ্রম হইতে অর্দ্ধচন্দ্র প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি ঘোরতর সাম্যবাদী। গীতোক্ত ধর্ম্ম যদি কৃষ্ণোক্ত ধর্ম্ম হয়, তবে

"বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥" ৫।১৭

তাঁহার মতে ব্রাহ্মণে, হাতীতে, কুকুরে ও চণ্ডালে সমান দেখিতে হইবে। তাহা হইলে ইহা অসম্ভব যে, তিনি ব্রাহ্মণের গৌরব বৃদ্ধির জন্য তাঁহাদের পাদপ্রক্ষালনে নিযুক্ত হইবেন।

কেহ কেহ বলিতে পারেন, কৃষ্ণ যখন আদর্শ পুরুষ, তখন বিনয়ের আদর্শ দেখাইবার জন্যই এই ভৃত্যকার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। জিজ্ঞাস্য, তবে কেবল ব্রাহ্মণের পাদপ্রক্ষালনেই নিযুক্ত কেন? বয়োবৃদ্ধ ক্ষত্রিয়গণেরও পাদপ্রক্ষালনে নিযুক্ত নহেন কেন? আর ইহাও বক্তব্য যে, এইরূপ বিনয়কে আমরা আদর্শ বিনয় বলিতে পারি না। এটা বিনয়ের বড়াই।

অন্যে বলিতে পারেন যে, কৃষ্ণচরিত্র সময়োপযোগী। যে সময়ে ব্রাহ্মণগণের প্রতি ভক্তি বড় প্রবল ছিল,

কৃষ্ণ ধূর্ত, পসার করিবার জন্য এইরূপ অলৌকিক ব্রহ্মভক্তি দেখাইতেছিলেন।

আমি বলি, এই শ্লোকটি প্রক্ষিপ্ত। কেন না, আমরা এই শিশুপালবধপর্ব্বাধ্যায়ে অন্য অধ্যায়ে (চৌয়াল্লিশে) দেখিতে পাই যে, কৃষ্ণ ব্রাহ্মণগণের পাদপ্রক্ষালনে নিযুক্ত থাকিয়া, তিনি ক্ষত্রিয়োচিত ও বীরোচিত কার্য্যান্তরে নিযুক্ত ছিলেন। তথায় লিখিত আছে, "মহাবাহু বাসুদেব শঙ্খ, চক্র ও গদা ধারণপূর্ব্বক সমাপন পর্য্যন্ত ঐ যজ্ঞ রক্ষা করিয়াছিলেন।" হয় ত দুইটা কথাই প্রক্ষিপ্ত। আমরা এ পরিচ্ছেদে এ কথার বেশী আন্দোলন আবশ্যক বিবেচনা করি না। কথাটা তেমন গুরুতর কথা নয়। কৃষ্ণচরিত্র সম্বন্ধে মহাভারতীয় উক্তি অনেক সময়েই পরস্পর অসঙ্গত, ইহা দেখাইবার জন্যই এতটা বলিলাম। নানা হাতের কাজ বলিয়া এত অসঙ্গতি।

এই রাজসূয় যজ্ঞের মহাসভায় কৃষ্ণ কর্তৃক শিশুপাল নামে প্রবলপরাক্রান্ত মহারাজা নিহত হয়েন। পাণ্ডবদিগের সংশ্লেষমাত্রে থাকিয়া কৃষ্ণের এই একমাত্র অস্ত্রধারণ বলিলেও হয়। খাণ্ডবদাহের যুদ্ধটা আমরা বড় মৌলিক বলিয়া ধরি নাই, ইহা পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে।

শিশুপালবধ পর্ব্বাধ্যায়ে একটা গুরুতর ঐতিহাসিক তত্ত্ব নিহিত আছে। বলিতে গেলে, তেমন গুরুতর ঐতিহাসিক তত্ত্ব মহাভারতের আর কোথাও নাই। আমরা দেখিয়াছি যে, জরাসন্ধবধের পূর্ব্বে, কৃষ্ণ কোথাও মৌলিক মহাভারতে, দেবতা বা ঈশ্বরাবতার-স্বরূপ অভিহিত বা স্বীকৃত নহেন। জরাসন্ধবধে, সে কথাটা অমনি অস্ফুট রকম আছে। এই শিশুপালবধেই প্রথম কৃষ্ণের সমসাময়িক লোক কর্তৃক তিনি জগদীশ্বর বলিয়া স্বীকৃত। এখানে কুরুবংশের তাৎকালিক নেতা ভীষ্মই এ মতের প্রচারকর্তা।

এখন ঐতিহাসিক স্থূল প্রশ্নটা এই যে, যখন দেখিয়াছি যে, কৃষ্ণ তাঁহার জীবনের প্রথমাংশে ঈশ্বরাবতার বলিয়া স্বীকৃত নহেন, তখন জানিতে হইবে, কোন্ সময়ে তিনি প্রথম ঈশ্বর বলিয়া স্বীকৃত হইলেন? তাঁহার জীবিতকালেই কি ঈশ্বরাবতার বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিলেন? দেখিতে পাই বটে যে, এই শিশুপালবধে, এবং তৎপরবর্ত্তী মহাভারতের অন্যান্য অংশে তিনি ঈশ্বর বলিয়া স্বীকৃত হইতেছেন। কিন্তু এমন হইতে পারে যে, শিশুপালবধ পর্ব্বাধ্যায় এবং সেই সেই অংশ প্রক্ষিপ্ত। এ প্রশ্নের উত্তরে কোন্ পক্ষ অবলম্বনীয়?

এ কথার আমরা এক্ষণে কোন উত্তর দিব না। ভরসা করি ক্রমশঃ উত্তর আপনি পরিস্ফুট হইবে। তবে ইহা বক্তব্য যে, শিশুপালবধ-পর্ব্বাধ্যায়, যদি মৌলিক মহাভারতের অংশ হয়, তবে এমন বিবেচনা করা যাইতে পারে যে, এই সময়েই কৃষ্ণ ঈশ্বরত্বে প্রতিষ্ঠিত হইতেছিলেন। এবং এ বিষয়ে তাঁহার স্বপক্ষ বিপক্ষ দুই পক্ষ ছিল। তাঁহার পক্ষীয়দিগের প্রধান ভীষ্ম, এবং পাণ্ডবেরা। তাঁহার বিপক্ষদিগের একজন নেতা শিশুপাল। শিশুপালবধ-বৃত্তান্তের স্থূল মর্ম্ম এই যে, ভীষ্মাদি সেই সভামধ্যে কৃষ্ণের প্রাধান্য স্থাপনের চেষ্টা পান। শিশুপাল তাহার বিরোধী হন। তাহাতে তুমুল বিবাদের যোগাড় হইয়া উঠে। তখন কৃষ্ণ শিশুপালকে নিহত করেন, তাহাতে সব গোল মিটিয়া যায়। যজ্ঞের বিঘ্ন বিনষ্ট হইলে, যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে নির্ব্বাহ হয়।

এ সকল কথার ভিতর যথার্থ ঐতিহাসিকতা কিছুমাত্র আছে কি না, তাহার মীমাংসার পূর্ব্বে বুঝিতে হয় যে, এই শিশুপালবধ-পর্ব্বাধ্যায় মৌলিক কি না? এ কথাটার উত্তর বড় সহজ নহে। শিশুপালবধের সঙ্গে মহাভারতের স্থূল ঘটনাগুলির কোন বিশেষ সম্বন্ধ আছে, এমন কথা বলা যায় না। কিন্তু না থাকিলেই যে প্রক্ষিপ্ত বলিতে হইবে, এমন নহে। ইহা সত্য বটে যে, ইতিপূর্ব্বে অনেক স্থানে শিশুপাল নামে প্রবলপরাক্রান্ত এক জন রাজার কথা দেখিতে পাই। পরভাগে দেখি, তিনি নাই। মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। পাণ্ডবসভায় কৃষ্ণের হস্তে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল, ইহার বিরোধী কোন কথা পাই না। অনুক্রমণিকাধ্যায়ে এবং পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়ে শিশুপালবধের কথা আছে। আর রচনাপ্রণালী দেখিলেও শিশুপালবধ-পর্ব্বাধ্যায়কে মৌলিক মহাভারতের অংশ বলিয়াই বোধ হয় বটে। মৌলিক মহাভারতের আর কয়টি অংশের ন্যায়, নাটকাংশে ইহার বিশেষ উৎকর্ষ আছে। অতএব ইহাকে অমৌলিক বলিয়া একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না।

তা না পারি, কিন্তু ইহাও স্পষ্ট বোধ হয় যে, যেমন জরাসন্ধবধ-পর্ব্বাধ্যায়ে দুই হাতের কারিগরি দেখিয়াছি, ইহাতেও সেই রকম। বরং জরাসন্ধ-বধের অপেক্ষা সে বৈচিত্র্য শিশুপালবধে বেশী। অতএব আমি এই সিদ্ধান্ত করিতে বাধ্য যে, শিশুপালবধ স্থূলতঃ মৌলিক বটে, কিন্তু ইহাতে দ্বিতীয় স্তরের কবির বা অন্য পরবর্ত্তী লেখকের অনেক হাত আছে।

এক্ষণে শিশুপালবধবৃত্তান্ত সবিস্তারে বলিব।

আজিকার দিনেও আমাদিগের দেশে একটি প্রথা প্রচলিত আছে যে, কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাড়ীতে সভা হইলে সভাস্থ সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তিকে স্রক্চন্দন দেওয়া হইয়া থাকে। ইহাকে "মালাচন্দন" বলে। ইহা এখন পাত্রের গুণ দেখিয়া দেওয়া হয় না, বংশমর্য্যাদা দেখিয়া দেওয়া হয়। কুলীনের বাড়ীতে গোষ্ঠী-

পত্তিকেই মালাচন্দন দেওয়া হয়। কেন না, কুলীনের কাছে গোষ্ঠীপতিবংশই বড় মান্য। কৃষ্ণের সময়ে প্রথাটা একটু ভিন্ন প্রকার ছিল। সভায় সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তিকে অর্ঘ্য প্রদান করিতে হইত। বংশমর্য্যাদা দেখিয়া দেওয়া হইত না, পাত্রের নিজের গুণ দেখিয়া দেওয়া হইত।

যুধিষ্ঠিরের সভায় অর্ঘ্য দিতে হইবে—কে ইহার উপযুক্ত পাত্র? ভারতবর্ষীয় সমস্ত রাজগণ সভাস্থ হইয়াছেন, ইহার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কে? এই কথা বিচার্য্য। ভীষ্ম বলিলেন, "কৃষ্ণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইঁহাকে অর্ঘ্য প্রদান কর।"

প্রথম যখন এই কথা বলেন, তখন ভীষ্ম যে কৃষ্ণকে দেবতা বিবেচনাতেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থির করিয়াছিলেন, এমন ভাব কিছুই প্রকাশ নাই। কৃষ্ণ "তেজঃ, বল ও পরাক্রম বিষয়ে শ্রেষ্ঠ" বলিয়াই তাঁহাকে অর্ঘ্যদান করিতে বলিলেন। ক্ষত্রগুণে কৃষ্ণ ক্ষত্রিয়গণের শ্রেষ্ঠ, এই জন্যই অর্ঘ্য দিতে বলিলেন। এখানে দেখা যাইতেছে, ভীষ্ম কৃষ্ণের মনুষ্যচরিত্রই দেখিতেছেন।

এই কথানুসারে কৃষ্ণকে অর্ঘ্য প্রদত্ত হইল। তিনিও তাহা গ্রহণ করিলেন। ইহা শিশুপালের অসহ্য হইল। শিশুপাল এককালীন ভীষ্ম, কৃষ্ণ ও পাণ্ডবদিগকে তিরস্কার করিয়া যে বক্তৃতা করিলেন, বিলাতে পার্লিমেণ্ট মহাসভায় উহা উক্ত হইলে উচিত দরে বিকাইত। তাঁহার বক্তৃতার প্রথম ভাগে তিনি যাহা বলিলেন, তাহার বাগ্মিতা বড় বিশুদ্ধ অথচ তীব্র। কৃষ্ণ রাজা নহেন, তবে এত রাজা থাকিতে তিনি অর্ঘ্য পান কেন? যদি স্থবির বলিয়া তাঁহার পূজা করিয়া থাক, তবে তাঁর বাপ বসুদেবকে পূজা করিলে না কেন? তিনি তোমাদের আত্মীয় এবং প্রিয়চিকীর্ষু বলিয়া কি তাঁর পূজা করিয়াছ? শ্বশুর দ্রুপদ থাকিতে তাঁকে কেন? কৃষ্ণকে আচার্য্য * মনে করিয়াছ? দ্রোণাচার্য্য থাকিতে কৃষ্ণের অর্চ্চনা কেন? ঋত্বিক্ বলিয়া কি তাঁহাকে অর্ঘ্য দাও? বেদব্যাস থাকিতে কৃষ্ণ কেন? † ইত্যাদি।

মহারাজ শিশুপাল কথা কহিতে কহিতে অত্যন্ত বাষ্পীয় ভায় গরম হইয়া উঠিলেন, তখন লজিক ছাড়িয়া রেটরিকে উঠিলেন, বিচার ছাড়িয়া দিয়া গালি দিতে আরম্ভ করিলেন। পাণ্ডবদিগকে ছাড়িয়া কৃষ্ণকে ধরিলেন। অলঙ্কারশাস্ত্র বিলক্ষণ বুঝিতেন—প্রথমে "প্রিয়চিকীর্ষু" "অপ্রাপ্তলক্ষণ" ইত্যাদি চুটকিতে ধরিয়া, শেষ "ধর্ম্মভ্রষ্ট" "দুরাত্মা" প্রভৃতি বড় বড় গালিতে উঠিলেন। পরিশেষে Climax—কৃষ্ণ ঘৃতভোজী কুক্কুর, দারপরিগ্রহকারী ক্লীব ‡ ইত্যাদি গালির একশেষ করিলেন।

শুনিয়া, ক্ষমাগুণের পরমাধার, পরমযোগী আদর্শ পুরুষ কোন উত্তর করিলেন না। কৃষ্ণের এমন শক্তি ছিল যে, তদ্দণ্ডেই তিনি শিশুপালকে বিনষ্ট করিতে সক্ষম—পরবর্ত্তী ঘটনায় পাঠক তাহা জানিবেন। কৃষ্ণও কখন যে এরূপ পরুষবচনে তিরস্কৃত হইয়াছিলেন; এমন দেখা যায় না। তথাপি তিনি এ তিরস্কারে ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। ইউরোপীয়দিগের মত ডাকিয়া বলিলেন না, "শিশুপাল! ক্ষমা বড় ধর্ম্ম, আমি তোমায় ক্ষমা করিলাম।" নীরবে শত্রুকে ক্ষমা করিলেন।

কর্ম্মকর্ত্তা যুধিষ্ঠির আহূত রাজার ক্রোধ দেখিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে গেলেন—যজ্ঞবাড়ীর কর্ম্মকর্ত্তার যেমন দস্তুর। মধুরবাক্যে কৃষ্ণের কুৎসাকারীকে তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বুড়া ভীষ্ম লৌহনির্ম্মিত—তাঁহার সেটা বড় ভাল লাগিল না। বুড়া স্পষ্টই বলিল, "কৃষ্ণের অর্চ্চনা যাহার অনভিমত, এমন ব্যক্তিকে অনুনয় বা সান্ত্বনা করা অনুচিত।"

তখন কুরুবৃদ্ধ ভীষ্ম, সদর্থযুক্ত বাক্যপরম্পরায়, কেন তিনি কৃষ্ণের অর্চ্চনার পরামর্শ দিয়াছেন, তাহার কৈফিয়ৎ দিতে লাগিলেন। আমরা সেই বাক্যগুলির সারভাগ উদ্ধৃত করিতেছি, কিন্তু তাহার ভিতর একটা রহস্য আছে, আগে দেখাইয়া দিই। কতকগুলি বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, আর সকল মনুষ্যের বিশেষতঃ ক্ষত্রিয়ের যে সকল গুণ থাকে, সে সকল গুণে কৃষ্ণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই জন্য তিনি অর্ঘ্যের যোগ্য।—আর তারই মাঝে কতকগুলি কথা আছে, তাহাতে ভীষ্ম বলিতেছেন যে, কৃষ্ণ স্বয়ং জগদীশ্বর, এই জন্য কৃষ্ণ সকলের অর্চ্চনীয়। আমরা দুই রকম পৃথক্ পৃথক্ দেখাইতেছি, পাঠক তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে চেষ্টা করুন।

ভীষ্ম বলিলেন, "এই মহতী নৃপসভায় একজন মহীপালও দৃষ্ট হয় না, যাহাকে কৃষ্ণ তেজোবলে পরাজয় করেন নাই।"

এ গেল মনুষ্যত্ববাদ। তার পরেই দেবত্ববাদ—

"অচ্যুত কেবল আমাদিগের অর্চ্চনীয় এমত নহে, সেই মহাভুজ ত্রিলোকীর পূজনীয়। তিনি যুদ্ধে অসংখ্য ক্ষত্রিয়বর্গের পরাজয় করিয়াছেন, এবং অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড তাঁহাতেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।"

---

* কৃষ্ণ, অভিমন্যু, সাত্যকি প্রভৃতি মহারথের, এবং কদাপি স্বয়ং অর্জ্জুনেরও যুদ্ধবিদ্যার আচার্য্য।

† অতএব কৃষ্ণ বিখ্যাত বেদজ্ঞ, ইহা স্বীকৃত হইল।

‡ কৃষ্ণ অনপত্য নহেন—তবে ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তিরা জিতেন্দ্রিয়কে এইরূপ গালি দেয়।

পুনশ্চ মনুষ্যত্ব—

"কৃষ্ণ জন্মিয়া অবধি যে সকল কার্য্য করিয়াছেন, লোকে মৎসন্নিধানে পুনঃপুনঃ তৎসমুদায় কীর্ত্তন করিয়াছে; তিনি অত্যন্ত বালক হইলেও আমরা তাঁহার পরীক্ষা করিয়া থাকি। কৃষ্ণের শৌর্য্য, বীর্য্য, কীর্ত্তি ও বিজয় প্রভৃতি সমস্ত পরিজ্ঞাত হইয়া"—

পরে, সঙ্গে সঙ্গে দেবত্ববাদ—

"সেই ভূতসুখাবহ জগদর্চ্চিত অচ্যুতের পূজাবিধান করিয়াছি।"

পুনশ্চ, মনুষ্যত্ব, পরিষ্কার রকম—

"কৃষ্ণের পূজ্যতা বিষয়ে দুটি হেতু আছে; তিনি নিখিল বেদবেদাঙ্গপারদর্শী ও সমধিক বলশালী। **ফলতঃ মনুষ্যলোকে তাদৃশ বলবান্ এবং বেদ-বেদাঙ্গসম্পন্ন দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রত্যক্ষ হওয়া সুকঠিন।** দান, দাক্ষ্য, শ্রুত, শৌর্য্য, লজ্জা, কীর্ত্তি, বুদ্ধি, বিনয়, অনুপম শ্রী, ধৈর্য্য ও সন্তোষ প্রভৃতি সমুদায় গুণাবলি কৃষ্ণে নিয়ত বিরাজিত রহিয়াছে। অতএব সেই সর্ব্বগুণসম্পন্ন আচার্য্য, পিতা ও গুরুস্বরূপ পূজার্হ কৃষ্ণের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন তোমাদের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। তিনি ঋত্বিক, গুরু, সম্বন্ধী, স্নাতক, রাজা এবং প্রিয়পাত্র। এই নিমিত্ত অচ্যুত অর্চ্চিত হইয়াছেন *।"

পুনশ্চ দেবত্ববাদ—

"কৃষ্ণই এ চরাচর বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা, তিনি অব্যক্তপ্রকৃতি, সনাতন, কর্ত্তা, এবং সর্ব্বভূতের অধীশ্বর, সুতরাং পরম পূজনীয়, তাহাতে আর সন্দেহ কি? বুদ্ধি, মন, মহত্ত্ব, পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত সমুদায়ই একমাত্র কৃষ্ণে প্রতিষ্ঠিত আছে। চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, দিক্-বিদিক্ সমুদায়ই একমাত্র কৃষ্ণে প্রতিষ্ঠিত আছে।" ইত্যাদি।

ভীষ্ম বলিয়াছেন, কৃষ্ণের পূজার দুইটি কারণ। (১) তিনি বলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, (২) তাঁহার তুল্য বেদ-বেদাঙ্গপারদর্শী কেহ নহে। অদ্বিতীয় পরাক্রমের প্রমাণ এই গ্রন্থে অনেক দেওয়া গিয়াছে। কৃষ্ণের অদ্বিতীয় বেদজ্ঞতার প্রমাণ গীতা। যাহা আমরা ভগবদ্গীতা বলিয়া পাঠ করি, তাহা কৃষ্ণপ্রণীত নহে। উহা ব্যাসপ্রণীত বলিয়া খ্যাত—"বৈয়াসিক সংহিতা" নামে পরিচিত। উহার প্রণেতা ব্যাসই হউন আর যেই হউন, তিনি ঠিক কৃষ্ণের মুখের কথাগুলি নোট করিয়া রাখিয়া ঐ গ্রন্থ সঙ্কলন করেন নাই। উহাকে মৌলিক মহাভারতের অংশ বলিয়াও আমার বোধ হয় না। কিন্তু গীতা কৃষ্ণের ধর্ম্মমতের সঙ্কলন, ইহা আমার বিশ্বাস। তাঁহার মতাবলম্বী কোন মনীষী কর্ত্তৃক উহা এই আকারে সঙ্কলিত, এবং মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত হইয়া প্রচারিত হইয়াছে, ইহাই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। এখন বলিবার কথা এই যে, গীতোক্ত ধর্ম্ম যাঁহার প্রণীত, তিনি স্পষ্টতই অদ্বিতীয় বেদবিৎ পণ্ডিত ছিলেন। ধর্ম্ম সম্বন্ধে তিনি বেদকে সর্ব্বোচ্চ স্থানে বসাইতেন না—কখনও বেদের একটু একটু নিন্দা করিতেন। কিন্তু তথাপি অদ্বিতীয় বেদজ্ঞ ব্যতীত অন্যের দ্বারা গীতোক্ত ধর্ম্ম প্রণীত হয় নাই, ইহা যে গীতা ও বেদ উভয়ই অধ্যয়ন করে, সে অনায়াসেই বুঝিতে পারে।

যিনি এইরূপ পরাক্রমে ও পাণ্ডিত্যে, বীর্য্যে ও শিক্ষায়, কর্ম্মে ও জ্ঞানে, নীতিতে ও ধর্ম্মে, দয়ায় ও ক্ষমায় তুল্যরূপেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তিনিই আদর্শ পুরুষ।

দশম পরিচ্ছেদ

শিশুপালবধ

ভীষ্ম কথা সমাপ্ত করিয়া, শিশুপালকে নিতান্ত অবজ্ঞা করিয়া বলিলেন, "যদি কৃষ্ণের পূজা শিশুপালের নিতান্ত অসহ্য বোধ হইয়া থাকে, তবে তাঁহার যেরূপ অভিরুচি হয়, করুন।" অর্থাৎ "ভাল না লাগে, উঠিয়া যাও।"

পরে মহাভারত হইতে উদ্ধৃত করিতেছি:—

"কৃষ্ণ অর্চ্চিত হইলেন দেখিয়া সুনীথনামা এক মহাবলপরাক্রান্ত বীরপুরুষ ক্রোধে কম্পান্বিত-কলেবর ও আরক্তনেত্র হইয়া সকল রাজগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, 'আমি পূর্ব্বে সেনাপতি ছিলাম, সম্প্রতি যাদব ও পাণ্ডবকুলের সমূলোন্মূলন করিবার নিমিত্ত অদ্যই সমর-সাগরে অবগাহন করিব।' চেদিরাজ শিশুপাল, মহীপালগণের অবিচলিত উৎসাহ সন্দর্শনে, প্রোৎসাহিত হইয়া যজ্ঞের ব্যাঘাত জন্মাইবার নিমিত্ত তাঁহাদিগের সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন,—যাহাতে যুধিষ্ঠিরের অভিষেক এবং কৃষ্ণের পূজা না হয়, তাহা আমাদিগের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। রাজারা নির্ব্বেদ প্রযুক্ত ক্রোধপরবশ হইয়া মন্ত্রণা করিতেছেন দেখিয়া, কৃষ্ণ স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহারা যুদ্ধার্থ পরামর্শ করিতেছেন।"

রাজা যুধিষ্ঠির সাগরসদৃশ রাজমণ্ডলকে রোষপ্রচলিত দেখিয়া প্রাজ্ঞতম পিতামহ ভীষ্মকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, "হে পিতামহ! এই মহান্ রাজ-

---

* প্রথম অধ্যায়ে যাহা বলিয়াছি—অনুশীলনধর্ম্মের চরমাদর্শ শ্রীকৃষ্ণ ঐ ভীষ্মোক্তিতে তাহা পরিস্ফুট হইতেছে।

সমুদ্র সংক্ষোভিত হইয়া উঠিয়াছে, এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য হয়, অনুমতি করুন।"

শিশুপালবধের ইহাই যথার্থ কারণ। শিশুপালকে বধ না করিলে তিনি রাজগণের সহিত মিলিত হইয়া যজ্ঞ নষ্ট করিতেন।

শিশুপাল আবার ভীষ্মকে ও কৃষ্ণকে কতকগুলা গালিগালাজ করিলেন।

ভীষ্মকে ও কৃষ্ণকে এবারেও শিশুপাল বড় বেশী গালি দিলেন। "দুরাত্মা," "যাহাকে বালকেও ঘৃণা করে", "গোপাল", "দাস" ইত্যাদি। পরম যোগী শ্রীকৃষ্ণ পুনর্ব্বার তাঁহাকে ক্ষমা করিয়া নীরব হইয়া রহিলেন। কৃষ্ণ যেমন বলের আদর্শ, ক্ষমার তেমনই আদর্শ। ভীষ্ম প্রথমে কিছু বলিলেন না, কিন্তু ভীম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া শিশুপালকে আক্রমণ করিবার জন্য উত্থিত হইলেন। ভীষ্ম তাঁহাকে নিরস্ত করিয়া শিশুপালের পূর্ব্ববৃত্তান্ত তাঁহাকে শুনাইতে লাগিলেন। এই বৃত্তান্ত অত্যন্ত অসম্ভব, অনৈসর্গিক ও অবিশ্বাসযোগ্য। সে কথা এই—

শিশুপালের জন্মকালে তাঁহার তিনটি চক্ষু ও চারিটি হাত হইয়াছিল, এবং তিনি গর্দ্দভের মত চীৎকার করিয়াছিলেন। এরূপ দুর্লক্ষণযুক্ত পুত্রকে তাঁহার মাতাপিতা পরিত্যাগ করাই শ্রেয় বিবেচনা করিল। এমন সময়ে দৈববাণী হইল। সে কালে যাঁহারা আষাঢ়ে গল্প প্রস্তুত করিতেন, দৈববাণীর সাহায্য ভিন্ন তাঁহারা গল্প জমাইতে পারিতেন না। দৈববাণী বলিল, "বেশ ছেলে, ফেলিয়া দিও না, ভাল করিয়া প্রতিপালন কর; যমেও ইহার কিছু করিতে পারিবে না। তবে যিনি ইহাকে মারিবেন, তিনি জন্মিয়াছেন।" কাজেই বাপ মা জিজ্ঞাসা করিল, "বাছা দৈববাণী, কে মারিবে, নামটা বলিয়া দাও না?" এখন দৈববাণী যদি এত কথাই বলিলেন, তবে কৃষ্ণের নামটা বলিয়া দিলেই গোল মিটিত। কিন্তু তাহা হইলে গল্পের Plot interest হয় না। অতএব তিনি কেবল বলিলেন, "যার কোলে দিলে ছেলের বেশী হাত দুইটা খসিয়া যাইবে, আর বেশী চোখটা মিলাইয়া যাইবে, সেই ইহাকে মারিবে।"

কাজে কাজেই শিশুপালের বাপ দেশের লোক ধরিয়া কোলে ছেলে দিতে লাগিলেন। কাহারও কোলে গেলে ছেলের বেশী হাত বা চোখ ঘুচিল না। কৃষ্ণকে শিশুপালের সমবয়স্ক বলিয়াই বোধ হয়, কেন না, উভয়েই এক সময়ে রুক্মিণীকে বিবাহ করিবার উমেদার ছিলেন, এবং দৈববাণীর 'জন্মগ্রহণ করিয়াছেন' কথাতেও ঐরূপ বুঝায়। কিন্তু তথাপি কৃষ্ণ দ্বারকা হইতে চেদিদেশে গিয়া শিশুপালকে কোলে করিলেন। তখনই শিশুপালের দুইটা হাত খসিয়া গেল, আর একটা চোখ মিলাইয়া গেল।

শিশুপালের মা কৃষ্ণের পিসীমা। পিসীমা কৃষ্ণকে জবরদস্তী করিয়া ধরিলেন, "বাছা! আমার ছেলে মারিতে পারিবে না।" কৃষ্ণ স্বীকার করিলেন, শিশুপালের বধোচিত শত অপরাধ তিনি ক্ষমা করিবেন।

যাহা অনৈসর্গিক, তাহা আমরা বিশ্বাস করি না। বোধ করি, পাঠকেরাও করেন না। কোন ইতিহাসে অনৈসর্গিক ব্যাপার পাইলে তাহা লেখকের বা তাঁহার পূর্ব্বগামীদিগের কল্পনাপ্রসূত বলিয়া সকলেই স্বীকার করিবেন। ক্ষমাগুণের মাহাত্ম্য বুঝে না, এবং কৃষ্ণচরিত্রের মাহাত্ম্য বুঝে না, এমন কোন কবি কৃষ্ণের অদ্ভুত ক্ষমতাশীলতা বুঝিতে না পারিয়া, লোককে শিশুপালের প্রতি ক্ষমার কারণ বুঝাইবার জন্য এই অদ্ভুত উপন্যাস প্রস্তুত করিয়াছেন। কাণা কাণাকে বুঝায়,—হাতী কুলোর মত। অসুরবধের জন্য যে কৃষ্ণ অবতীর্ণ, তিনি যে অসুরের অপরাধ পাইয়া ক্ষমা করিবেন, ইহা অসঙ্গত বটে। কৃষ্ণকে অসুর-বধার্থ অবতীর্ণ মনে করিলে, এই ক্ষমাগুণও বুঝা যায় না। তাঁহার কোন গুণই বুঝা যায় না। কিন্তু তাঁহাকে আদর্শ পুরুষ বলিয়া ভাবিলে, মনুষ্যত্বের আদর্শের বিকাশ জন্যই অবতীর্ণ ইহা ভাবিলে, তাঁহার সকল কার্য্যই বিশদরূপে বুঝা যায়। কৃষ্ণচরিত্র স্বরূপ রত্নভাণ্ডার খুলিবার চাবি এই আদর্শ পুরুষতত্ত্ব।

শিশুপালের গোটাকতক কটূক্তি কৃষ্ণ সহ্য করিয়াছিলেন বলিয়াই যে, কৃষ্ণের ক্ষমাগুণের প্রশংসা করিতেছি, এমত নহে। শিশুপাল ইতিপূর্ব্বে কৃষ্ণের উপর অনেক অত্যাচার করিয়াছিল। কৃষ্ণ প্রাগ্‌-জ্যোতিষপুরে গমন করিলে, সে সময় পাইয়া দ্বারকা দগ্ধ করিয়া পলাইয়াছিল। কদাচিৎ ভোজরাজ রৈবতক-বিহারে গেলে সেই সময় আসিয়া শিশুপাল অনেক যাদবকে বিনষ্ট ও বদ্ধ করিয়াছিল। বসুদেবের অশ্বমেধের ঘোড়া চুরি করিয়াছিল। এটা তাৎকালিক ক্ষত্রিয়দিগের নিকট বড় গুরুতর অপরাধ বলিয়া গণ্য। এ সকলও কৃষ্ণ ক্ষমা করিয়াছিলেন। আর কেবল শিশুপালেরই যে তিনি বৈরাচরণ ক্ষমা করিয়াছিলেন, এমত নহে। জরাসন্ধও তাঁহাকে বিশেষরূপে পীড়িত করিয়াছিলেন। স্বতঃ হউক, পরতঃ হউক, কৃষ্ণ যে জরাসন্ধের নিপাতসাধনে সক্ষম, তাহা দেখাই-য়াছি। কিন্তু যত দিন না জরাসন্ধ রাজমণ্ডলীকে আবদ্ধ করিয়া পশুপতির নিকট বলি দিতে প্রস্তুত হইল, তত দিন তিনি তাহার প্রতি কোন প্রকার

বৈরাচরণ করিলেন না। এবং পাছে যুদ্ধ হইয়া লোকক্ষয় হয় বলিয়া, নিজে সরিয়া গিয়া রৈবতকে গড় বাঁধিয়া রহিলেন। সেইরূপ যত দিন শিশুপাল কেবল তাঁহারই শত্রুতা করিয়াছিল, তত দিন কৃষ্ণ তাহার কোন প্রকার অনিষ্ট করেন নাই। তার পর যখন সে পাণ্ডবের যজ্ঞের বিঘ্ন ও ধর্ম্মরাজ্যসংস্থাপনের বিঘ্ন করিতে উদ্যুক্ত হইল, কৃষ্ণ তখন তাহাকে বধ করিলেন। আদর্শ পুরুষের ক্ষমা, ক্ষমাপরায়ণতার আদর্শ; এ জন্য কেহ তাঁহার অনিষ্ট করিলে তিনি তাহার কোন প্রকার বৈরসাধন করিতেন না, কিন্তু আদর্শ পুরুষ দণ্ডপ্রণেতারও আদর্শ, এ জন্য কেহ সমাজের অনিষ্টসাধনে উদ্যত হইলে, তিনি তাহাকে দণ্ডিত করিতেন।

কৃষ্ণের ক্ষমাগুণের প্রসঙ্গ উঠিলে কর্ণ দুর্য্যোধন প্রতি তিনি যে ক্ষমা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ না করিয়া থাকা যায় না। সে উদ্যোগপর্ব্বের কথা, এখন বলিবার নয়। কর্ণ দুর্য্যোধন যে অবস্থায় তাঁহাকে বন্ধন করিবার উদ্যোগ করিয়াছিলে, সেই অবস্থায় আর কাহাকে কেহ বন্ধনের উদ্যোগ করিলে বোধ হয়, যীশু ভিন্ন অন্য কোন মনুষ্যই শত্রুকে মার্জ্জনা করিতেন না। কৃষ্ণ তাহাদের ক্ষমা করিলেন, পরে বন্ধুভাবে কর্ণের সঙ্গে কথোপকথন করিলেন, এবং মহাভারতের যুদ্ধে তাহাদের বিরুদ্ধে কখনও অস্ত্রধারণ করিলেন না।

ভীষ্মে ও শিশুপালে আরও কিছু বকাবকি হইল। ভীষ্ম বলিলেন, "শিশুপাল কৃষ্ণের তেজেই তেজস্বী, তিনি এখনই শিশুপালের তেজোহরণ করিবেন।" শিশুপাল জ্বলিয়া উঠিয়া ভীষ্মকে অনেক গালাগালি দিয়া শেষে বলিল, "তোমার জীবন এই ভূপালগণের অনুগ্রহাধীন, ইঁহারা মনে করিলেই তোমার প্রাণসংহার করিতে পারেন।" ভীষ্ম তখনকার ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা—তিনি বলিলেন, "আমি ইহাদিগকে তৃণতুল্য বোধ করি না।" শুনিয়া সমবেত রাজমণ্ডলী গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিল, "এই ভীষ্মকে পশুবৎ বধ কর অথবা প্রদীপ্ত হুতাশনে দগ্ধ কর।" ভীষ্ম উত্তর করিলেন,—"যা হয় কর, আমি এই তোমাদের মস্তকে পদার্পণ করিলাম।"

বুড়াকে জোরেও আঁটিবার যো নাই, বিচারেও আঁটিবার যো নাই। ভীষ্ম তখন রাজগণকে মীমাংসার সহজ উপায়টা দেখাইয়া দিলেন। তিনি যাহা বলিলেন, তাহার স্থূল মর্ম্ম এই;—"ভাল, কৃষ্ণের পূজা করিয়াছি বলিয়া তোমরা গোল করিতেছ; তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব মানিতেছ না। গোলে কাজ কি, তিনি ত সম্মুখেই আছেন—একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ না? যাহার মরণ-কণ্ডূতি থাকে, তিনি একবার কৃষ্ণকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়া দেখুন না?"

শুনিয়া কি শিশুপাল চুপ করিয়া থাকিতে পারে? শিশুপাল কৃষ্ণকে ডাকিয়া বলিল, "আইস, সংগ্রাম কর, তোমাকে যুদ্ধে আহ্বান করিতেছি।"

এখন, কৃষ্ণ প্রথম কথা কহিলেন। কিন্তু শিশুপালের সঙ্গে নহে। ক্ষত্রিয় হইয়া কৃষ্ণ যুদ্ধে আহূত হইয়াছেন, আর যুদ্ধেও বিমুখ হইবার পথ রহিল না। এবং যুদ্ধেরও ধর্ম্মতঃ প্রয়োজন ছিল। তখন সভায় সকলকে সম্বোধন করিয়া শিশুপালকৃত পূর্ব্বাপরাধ সকল একটি একটি করিয়া বিবৃত করিলেন। তার পর বলিলেন, "এত দিন ক্ষমা করিয়াছি। আজ ক্ষমা করিব না।"

এই কৃষ্ণোক্তি মধ্যে এমন কথা আছে যে, তিনি পিতৃষ্বসার অনুরোধেই তাহার এত অপরাধ ক্ষমা করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বেই যাহা বলিয়াছি, তাহা স্মরণ করিয়া হয় ত পাঠক জিজ্ঞাসা করিবেন, এ কথাটিও প্রক্ষিপ্ত? আমাদের উত্তর এই যে, ইহা প্রক্ষিপ্ত হইলেও হইতে পারে, কিন্তু প্রক্ষিপ্ত বিবেচনা করিবার কোন প্রয়োজন দেখি না। ইহাতে অনৈসর্গিকতা কিছুই নাই, বরং ইহা বিশেষরূপে স্বাভাবিক ও সম্ভব। ছেলে দুরন্ত, কৃষ্ণদ্বেষী; কৃষ্ণও বলবান্, মনে করিলে শিশুপালকে মাছির মত টিপিয়া মারিতে পারেন, এমন অবস্থায় পিসী যে ভ্রাতুষ্পুত্রকে অনুরোধ করিবেন, ইহা খুব সম্ভব। ক্ষমাপরায়ণ কৃষ্ণ শিশুপালকে নিজগুণেই ক্ষমা করিলেও পিসীর অনুরোধ স্মরণ রাখিবেন, ইহাও খুব সম্ভব। আর পিতৃষ্বসার পুত্রকে বধ করা আপাততঃ নিন্দনীয় কার্য্য, কৃষ্ণ পিসীর খাতিরে কিছুই বলিলেন না, এ কথাটা উঠিতেও পারিত। সে কথার একটা কৈফিয়ৎ দেওয়া চাই। এ জন্য কৃষ্ণের এই উক্তি খুব সুসঙ্গত।

তার পরেই আবার একটা অনৈসর্গিক কাণ্ড উপস্থিত। শ্রীকৃষ্ণ, শিশুপালের বধ জন্য আপনার চক্রাস্ত্র স্মরণ করিলেন। স্মরণ করিবামাত্র চক্র তাঁহার হাতে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন কৃষ্ণ চক্রের দ্বারা শিশুপালের মাথা কাটিয়া ফেলিলেন।

বোধ করি, এ অনৈসর্গিক ব্যাপার কোন পাঠকেই ঐতিহাসিক ঘটনা বলিয়া গ্রহণ করিবেন না। যিনি বলিবেন, কৃষ্ণ ঈশ্বরাবতার, ঈশ্বরে সকলই সম্ভবে, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি, যদি চক্রের দ্বারা শিশুপালকে বধ করিতে হইবে, তবে, সে জন্য কৃষ্ণের মনুষ্যশরীর ধারণের কি প্রয়োজন ছিল? চক্র ত চেতনাবিশিষ্ট জীবের ন্যায় আজ্ঞামত যাতায়াত করিতে পারে দেখা যাইতেছে, তবে বৈকুণ্ঠ হইতেই বিষ্ণু

তাহাকে শিশুপালের শিরশ্ছেদ জন্য পাঠাইতে পারেন নাই কেন? এ সকল কাজের জন্য মনুষ্যশরীর গ্রহণের প্রয়োজন কি? ঈশ্বর কি আপনার নৈসর্গিক নিয়মে বা কেবল ইচ্ছা মাত্র একটা মনুষ্যের মৃত্যু ঘটাইতে পারেন না, যে তজ্জন্য তাঁহাকে মনুষ্যদেহ ধারণ করিতে হইবে? এবং মনুষ্যদেহ ধারণ করিলেও কি তিনি এমনই হীনবল হইবেন যে, স্বীয় মানুষী শক্তিতে একটা মানুষের সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারিবেন না—ঐশী শক্তির দ্বারা দৈব অস্ত্রকে স্মরণ করিয়া আনিতে হইবে? ঈশ্বর যদি এরূপ অল্প শক্তিমান্ হন, তবে মানুষের সঙ্গে তাঁহার তফাৎ বড় অল্প। আমরাও কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব অস্বীকার করি না—কিন্তু আমাদের মতে কৃষ্ণ মানুষী শক্তি ভিন্ন অন্য শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতেন না, এবং মানুষী শক্তির দ্বারাই সকল কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। এই অনৈসর্গিক চক্রাস্ত্র-স্মরণবৃত্তান্ত যে অলীক ও প্রক্ষিপ্ত, কৃষ্ণ যে মানুষ-যুদ্ধেই শিশুপালকে নিহত করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ মহাভারতেই আছে। উদ্যোগপর্ব্বে ধৃতরাষ্ট্র শিশুপালবধের ইতিহাস কহিতেছেন; যথা,—

"পূর্ব্বে রাজসূয় যজ্ঞে চেদিরাজ ও করূষক প্রভৃতি যে সমস্ত ভূপাল সর্ব্বপ্রকার উদ্যোগবিশিষ্ট হইয়া বহুসংখ্যক বীরপুরুষ সমভিব্যাহারে একত্র সমবেত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে চেদিরাজতনয় সূর্য্যের ন্যায় প্রতাপশালী, শ্রেষ্ঠ, ধনুর্দ্ধর, ও যুদ্ধে অজেয়। ভগবান্ কৃষ্ণ ক্ষণকাল মধ্যে তাঁহারে পরাজয় করিয়া ক্ষত্রিয়গণের উৎসাহ ভঙ্গ করিয়াছিলেন। এবং করূষরাজপ্রমুখ নরেন্দ্রবর্গ যে শিশুপালের সম্মানবর্দ্ধন করিয়াছিলেন, তাঁহারা সিংহস্বরূপ কৃষ্ণকে রথারূঢ় নিরীক্ষণ করিয়া চেদিপতিরে পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্ষুদ্র মৃগের ন্যায় পলায়ন করিলেন, তিনি তখন অবলীলাক্রমে শিশুপালের প্রাণসংহার পূর্ব্বক পাণ্ডবগণের যশ ও মান বর্দ্ধন করিলেন।"

এখানে ত চক্রের কোন কথা দেখিতে পাই না। দেখিতে পাই, কৃষ্ণকে রথারূঢ় হইয়া রীতিমত মানুষিক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল। এবং তিনি মানুষযুদ্ধেই শিশুপাল ও তাহার অনুচরবর্গকে পরাভূত করিয়াছিলেন। যেখানে এক গ্রন্থে একই ঘটনার দুই প্রকার বর্ণনা দেখিতে পাই—একটি নৈসর্গিক, অপরটি অনৈসর্গিক, সেখানে অনৈসর্গিক বর্ণনাকে অগ্রাহ্য করিয়া নৈসর্গিককে ঐতিহাসিক বলিয়া গ্রহণ করাই বিধেয়। যিনি পুরাণেতিহাসের মধ্যে সত্যের অনুসন্ধান করিবেন, তিনি যেন এই সোজা কথাটা স্মরণ রাখেন। নহিলে সকল পরিশ্রমই বিফল হইবে।

শিশুপালবধের আমরা যে সমালোচনা করিলাম, তাহাতে উক্ত ঘটনার মূল ঐতিহাসিক তত্ত্ব আমরা এইরূপ দেখিতেছি। রাজসূয়ের মহাসভায় সকল ক্ষত্রিয়ের অপেক্ষা কৃষ্ণের শ্রেষ্ঠতা স্বীকৃত হয়। ইহাতে শিশুপাল প্রভৃতি কতকগুলি ক্ষত্রিয় রুষ্ট হইয়া যজ্ঞ নষ্ট করিবার জন্য যুদ্ধ উপস্থিত করে। কৃষ্ণ তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে পরাজিত করেন এবং শিশুপালকে নিহত করেন। পরে যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে সমাপিত হয়।

আমরা দেখিয়াছি, কৃষ্ণ যুদ্ধে সচরাচর বিদ্বেষ-বিশিষ্ট। তবে অর্জ্জুনাদি যুদ্ধক্ষম পাণ্ডবেরা থাকিতে, তিনি যজ্ঞঘ্নদিগের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন কেন? রাজসূয়ে যে কার্য্যের ভার কৃষ্ণের উপর ছিল, তাহা স্মরণ করিলেই পাঠক কথার উত্তর পাইবেন। যজ্ঞরক্ষার ভার কৃষ্ণের উপর ছিল, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। যে কাজের ভার যাহার উপর থাকে, তাহা তাহার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম (Duty)। আপনার অনুষ্ঠেয় কর্ম্মের সাধন জন্যই কৃষ্ণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া শিশুপালকে বধ করিয়াছিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

পাণ্ডবের বনবাস

রাজসূয় যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে কৃষ্ণ দ্বারকায় ফিরিয়া গেলেন। সভাপর্ব্বে আর তাঁহাকে দেখিতে পাই নাই। তবে একস্থানে তাঁহার নাম হইয়াছে।

দ্যূতক্রীড়ায় যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে হারিলেন। তার পর দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ, এবং সভামধ্যে বস্ত্রহরণ। মহাভারতের এই ভাগের মত, কাব্যাংশে উৎকৃষ্ট রচনা জগতের সাহিত্যে বড় দুর্লভ। কিন্তু কাব্য আমাদের এখন সমালোচনীয় নহে—ঐতিহাসিক মূল্য কিছু আছে কি না, পরীক্ষা করিতে হইবে। যখন দুঃশাসন সভামধ্যে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ করিতে প্রবৃত্ত, নিরুপায় দ্রৌপদী তখন কৃষ্ণকে মনে মনে চিন্তা করিয়াছিলেন। সে অংশ উদ্ধৃত করিয়াছি:—

"গোবিন্দ দ্বারকাবাসিন্ কৃষ্ণ গোপীজনপ্রিয়!" এবং সে সম্বন্ধে আমাদিগের যাহা বলিবার, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

তার পর বনপর্ব্ব। বনপর্ব্বে তিনবার মাত্র কৃষ্ণের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। প্রথম, পাণ্ডবেরা বনে গিয়াছেন শুনিয়া বৃষ্ণিভোজেরা সকলে তাঁহাদিগকে দেখিতে আসিয়াছিল—কৃষ্ণও সেই সঙ্গে আসিয়াছিলেন। ইহা সম্ভব। কিন্তু যে অংশে এই বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে, তাহা মহাভারতের প্রথম স্তরগতও নহে, দ্বিতীয়

স্তরগতও নহে। রচনায় সাদৃশ্য কিছুমাত্র নাই। চরিত্রগত সঙ্গতি কিছুমাত্র নাই। কৃষ্ণকে আর কোথাও রাগিতে দেখা যায় না, কিন্তু এখানে যুধিষ্ঠিরের কাছে আসিয়া কৃষ্ণ চটিয়া লাল। কারণ কিছুই নাই, কেহ শত্রু উপস্থিত নাই, কেহ কিছু বলে নাই, কেবল দুর্য্যোধন প্রভৃতিকে মারিয়া ফেলিতে হইবে, এই বলিয়াই এত রাগ যে, যুধিষ্ঠির বহুতর স্তব স্তুতি মিনতি করিয়া তাঁহাকে থামাইলেন। যে কবি লিখিয়াছেন যে, কৃষ্ণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, মহাভারতের যুদ্ধে তিনি অস্ত্রধারণ করিবেন না. এ কথা সে কবির লেখা নয়, ইহা নিশ্চিত। তার পর এখনকার হোঁৎকাদিগের মত কৃষ্ণ বলিয়া বসিলেন, "আমি থাকিলে এতটা হয়!—আমি বাড়ী ছিলাম না।" তখন যুধিষ্ঠির, কৃষ্ণ কোথায় গিয়াছিলেন, সেই পরিচয় লইতে লাগিলেন। তাহাতে শাল্ববধের কথাটা উঠিল। তাহার সঙ্গে কৃষ্ণ যুদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই পরিচয় দিলেন। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। সৌভ নামে তাহার রাজধানী। সেই রাজধানী আকাশময় উড়িয়া উড়িয়া বেড়ায়; শাল্ব তাহার উপর থাকিয়া যুদ্ধ করে। সেই অবস্থায় কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ হইল। যুদ্ধের সময়ে কৃষ্ণের বড় কাঁদাকাটি। শাল্ব একটা মায়া বসুদেব গড়িয়া তাহাকে কৃষ্ণের সম্মুখে বধ করিল দেখিয়া কৃষ্ণ কাঁদিয়া মূর্চ্ছিত। এ জগদীশ্বরের চিত্র নহে, কোন মানুষিক ব্যাপারের চিত্রও নহে। অনুক্রমণিকাধ্যায়ে এবং পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়ে এই সকল ব্যাপারের কোন প্রসঙ্গও নাই। ভরসা করি, কোন পাঠক এ সকল উপন্যাসের সমালোচনার প্রত্যাশা করেন না।

তার পর দুর্ব্বাসার সশিষ্য ভোজন। সে ঘোরতর অনৈসর্গিক ব্যাপার। অনুক্রমণিকাধ্যায়ে সে কথা থাকিলেও, তাহার কোন ঐতিহাসিক মূল্য নাই। সুতরাং তাহা আমাদের সমালোচনীয় নহে।

তার পর বনপর্ব্বের শেষের দিকে মার্কণ্ডেয়সমস্যা-পর্ব্বাধ্যায়ে আবার কৃষ্ণকে দেখিতে পাই। পাণ্ডবেরা কাম্যক বনে আসিয়াছেন শুনিয়া, কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে আবার দেখিতে আসিয়াছিলেন—এবার একা নহে, ঘোটঠাকুরাণীটি সঙ্গে। মার্কণ্ডেয়সমস্যা-পর্ব্বাধ্যায় একখানি বৃহৎ গ্রন্থ বলিলেও হয়। কিন্তু মহাভারতের সঙ্গে সম্বন্ধ আছে, এমন কথা ইহাতে কিছুই নাই৮ সমস্তটাই প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বোধ হয়। পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়ে মার্কণ্ডেয়সমস্যা-পর্ব্বাধ্যায়ের কথা আছে বটে, কিন্তু অনুক্রমণিকাধ্যায়ে নাই। মহাভারতের প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের রচনার সঙ্গে ইহার কোন সাদৃশ্যই নাই। কিন্তু ইহা মৌলিক মহাভারতের অংশ কি না, তাহা আমাদের বিচার করিবারও কোন প্রয়োজন রাখে না। কেন না, কৃষ্ণ এখানে কিছুই করেন নাই। আসিয়া যুধিষ্ঠির, দ্রৌপদী প্রভৃতিকে কিছু মিষ্ট কথা বলিলেন, উত্তরে কিছু মিষ্ট কথা শুনিলেন। তার পর কয়জনে মিলিয়া ঋষিঠাকুরের আষাঢ়ে গল্প সকল শুনিতে লাগিলেন।

মার্কণ্ডেয়ের কথা ফুরাইলে দ্রৌপদী-সত্যভামাতে কিছু কথা হইল। পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়ে দ্রৌপদী-সত্যভামার সংবাদ গণিত হইয়াছে, কিন্তু অনুক্রমণিকাধ্যায়ে ইহার কোন প্রসঙ্গ নাই। ইহা যে প্রক্ষিপ্ত, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

তার পর বিরাটপর্ব্ব। বিরাটপর্ব্বে কৃষ্ণ দেখা দেন নাই—কেবল শেষে উত্তরার বিবাহে আসিয়া উপস্থিত। আসিয়া যে সকল কথাবার্ত্তা বলিয়াছিলেন, তাহা উদ্যোগপর্ব্বে আছে। ক্রমশঃ সমালোচনা করিব।

পঞ্চম খণ্ড

উপপ্লব্য

"সর্ব্বভূতাত্মভূতায় ভূতাদিনিধনায় চ।
অক্রোধদ্রোহমোহায় তস্মৈ শান্তাত্মনে নমঃ॥"

শান্তিপর্ব্ব, ৪৭ অধ্যায়ঃ।

প্রথম পরিচ্ছেদ

মহাভারতের যুদ্ধের সেনোদ্যোগ

এক্ষণে উদ্যোগপর্ব্বের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

সমাজে অপরাধী আছে। মনুষ্যগণ পরস্পরের প্রতি অপরাধ সর্ব্বদাই করিতেছে। সেই অপরাধের দমন সমাজে একটি মুখ্য কার্য্য। রাজনীতি, রাজদণ্ড ব্যবস্থাশাস্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র, আইন, আদালত সকলেরই একটি মুখ্য উদ্দেশ্য তাই।

অপরাধীর পক্ষে কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, নীতিশাস্ত্রে তৎসম্বন্ধে দুইটি মত আছে। এক মত এই যে—দণ্ডের দ্বারা অর্থাৎ বলপ্রয়োগের দ্বারা দোষের দমন করিতে হইবে—আর একটি মত এই যে, অপরাধ ক্ষমা করিবে। বল এবং ক্ষমা দুইটি পরস্পর-বিরোধী —কাজেই দুইটি মত যথার্থ হইতে পারে না। অথচ দুইটির মধ্যে একটি যে একেবারে পরিহার্য্য, এমন হইতে পারে না। সকল অপরাধ ক্ষমা করিলে সমাজের ধ্বংস হয়, সকল অপরাধ দণ্ডিত করিলে মনুষ্য পশুত্ব প্রাপ্ত হয়। অতএব বল ও ক্ষমার সামঞ্জস্য নীতিশাস্ত্রের মধ্যে একটি অতি কঠিন তত্ত্ব। আধুনিক সুসভ্য ইউরোপ ইহার সামঞ্জস্যে অদ্যাপি পৌঁছিতে পারিলেন না। ইউরোপীয়দিগের খৃষ্টধর্ম্ম বলে, সকল অপরাধ ক্ষমা কর। ইউরোপে ধর্ম্ম অপেক্ষা রাজনীতি প্রবল, এ জন্য ক্ষমা ইউরোপে লুপ্তপ্রায়, এবং বলের প্রবল প্রতাপ।

বল ও ক্ষমার যথার্থ সামঞ্জস্য এই উদ্যোগপর্ব্বমধ্যে প্রধান তত্ত্ব। শ্রীকৃষ্ণই তাহার মীমাংসক, প্রধানতঃ শ্রীকৃষ্ণই উদ্যোগপর্ব্বের নায়ক। বল ও ক্ষমা উভয়ের প্রয়োগ সম্বন্ধে তিনি যেরূপ আদর্শ কার্য্যতঃ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি। যে তাঁহার নিজের অনিষ্ট করে, তিনি তাহাকে ক্ষমা করেন; এবং যে লোকের অনিষ্ট করে, তিনি বলপ্রয়োগ পূর্ব্বক তাহার প্রতি দণ্ডবিধান করেন। কিন্তু এমন অনেক স্থলে ঘটে, যেখানে ঠিক এই বিধানানুসারে কার্য্য চলে না, অথবা এই বিধানানুসারে বল কি ক্ষমা প্রযোজ্য, তাহার বিচার কঠিন হইয়া পড়ে। মনে কর, কেহ আমার সম্পত্তি কাড়িয়া লইয়াছে। আপনার সম্পত্তি উদ্ধার সামাজিক ধর্ম্ম। যদি সকলেই আপনার সম্পত্তি উদ্ধারে পরাঙ্মুখ হয়, তবে সমাজ অচিরেই বিধ্বস্ত হইয়া যায়। অতএব অপহৃত সম্পত্তির উদ্ধার করিতে হইবে। এখনকার দিনে সভ্যসমাজ সকলে—আইন আদালতের সাহায্যে আমরা আপন আপন সম্পত্তির উদ্ধার সাধন করিতে পারি। কিন্তু যদি এমন ঘটে যে, আইন-আদালতের সাহায্যে প্রাপ্য নহে, সেখানে বলপ্রয়োগও ধর্ম্মসঙ্গত কি না? বল ও ক্ষমার সামঞ্জস্য সম্বন্ধে এই সকল কূট তর্ক উঠিয়া থাকে। কার্য্যতঃ প্রায় এই দেখিতে পাই যে, যে বলবান্, সে বলপ্রয়োগের দিকেই যায়; যে দুর্ব্বল, সে ক্ষমার দিকেই যায়। কিন্তু যে বলবান্ অথচ ক্ষমাবান্, তাহার কি করা কর্ত্তব্য? অর্থাৎ আদর্শ পুরুষের এরূপ স্থলে কি কর্ত্তব্য? তাহার মীমাংসা উদ্যোগপর্ব্বের প্রারম্ভেই আমরা কৃষ্ণবাক্যে পাইতেছি।

ভরসা করি, পাঠকেরা সকলেই জানেন যে, পাণ্ডবেরা দ্যূতক্রীড়ায় শকুনির নিকট হারিয়া এই পণে বাধ্য হইয়াছিলেন যে, আপনাদিগের রাজ্য দুর্য্যোধনকে সম্প্রদান করিয়া দ্বাদশ বর্ষ বনবাস করিবেন। তৎপরে এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করিবেন; যদি অজ্ঞাতবাসের ঐ এক বৎসরের মধ্যে কেহ তাঁহাদিগের পরিচয় পায়, তবে তাঁহারা রাজ্য পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইবেন না, পুনর্ব্বার দ্বাদশবর্ষ জন্য বনগমন করিবেন। কিন্তু যদি কেহ পরিচয় না পায়, তবে তাঁহারা দুর্য্যোধনের নিকট আপনাদিগের রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন। এক্ষণে তাঁহারা দ্বাদশবর্ষ বনবাস সম্পূর্ণ করিয়া বিরাটরাজের পুরীমধ্যে এক বৎসর

অজ্ঞাতবাস সম্পন্ন করিয়াছেন, ঐ বৎসরের মধ্যে কেহ তাঁহাদিগের পরিচয় পায় নাই। অতএব তাঁহারা দুর্য্যোধনের নিকট আপনাদিগের রাজ্য পাইবার ন্যায়তঃ ও ধর্ম্মতঃ অধিকারী। কিন্তু দুর্য্যোধন রাজ্য ফিরাইয়া দিবে কি? না দিবারই সম্ভাবনা। যদি না দেয়, তবে কি করা কর্ত্তব্য? যুদ্ধ করিয়া তাঁহাদিগকে বধ করিয়া রাজ্যের পুনরুদ্ধার করা কর্ত্তব্য কি না?

অজ্ঞাতবাসের বৎসর অতীত হইলে পাণ্ডবেরা বিরাটরাজের নিকট পরিচিত হইলেন। বিরাটরাজ তাঁহাদিগের পরিচয় পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া আপনার কন্যা উত্তরাকে অর্জ্জুনপুত্র অভিমন্যুকে সম্প্রদান করিলেন। সেই বিবাহ দিতে অভিমন্যুর মাতুল কৃষ্ণ ও বলদেব ও অন্যান্য যাদবেরা আসিয়াছিলেন। এবং পাণ্ডবদিগের শ্বশুর দ্রুপদ এবং অন্যান্য কুটুম্বগণও আসিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলে বিরাটরাজের সভায় আসীন হইলে, পাণ্ডবরাজ্যের পুনরুদ্ধার প্রসঙ্গটা উত্থাপিত হইল। নৃপতিগণ "শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।" তখন শ্রীকৃষ্ণ রাজাদিগকে সম্বোধন করিয়া অবস্থা সকল বুঝাইয়া বলিলেন। যাহা যাহা ঘটিয়াছে, তাহা বুঝাইয়া তার পর বলিলেন, "এক্ষণে কৌরব ও পাণ্ডবগণের পক্ষে যাহা হিতকর, ধর্ম্ম্য, যশস্কর ও উপযুক্ত, আপনারা তাহাই চিন্তা করুন।"

কৃষ্ণ এমন কথা বলিলেন না যে, যাহাতে রাজ্যের পুনরুদ্ধার হয়, তাহারই চেষ্টা করুন। কেন না, হিত, ধর্ম্ম, যশ হইতে বিচ্ছিন্ন যে রাজ্য, তাহা তিনি কাহারও প্রার্থনীয় বিবেচনা করেন না। তাই পুনর্ব্বার বুঝাইয়া বলিতেছেন, "ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অধর্ম্মাগত সুরসাম্রাজ্যও কামনা করেন না, কিন্তু ধর্ম্মার্থ-সংযুক্ত একটি গ্রামের আধিপত্যেও অধিকতর অভিলাষী হইয়া থাকেন।" আমরা পূর্ব্বে বুঝাইয়াছি যে, আদর্শ মনুষ্য সন্ন্যাসী হইলে চলিবে না—বিষয়ী হইতে হইবে। বিষয়ীর এই প্রকৃত আদর্শ। অধর্ম্মাগত সুরসাম্রাজ্যও কামনা করিব না, কিন্তু ধর্ম্মতঃ আমি যাহার অধিকারী, তাহার এক তিলও বঞ্চককে ছাড়িব না; ছাড়িলে কেবল আমি একা দুঃখী হইব, এমন নহে, আমি দুঃখী না হইতেও পারি, কিন্তু সমাজ-বিধ্বংসের পথাবলম্বনরূপ পাপ আমাকে স্পর্শ করিবে।

তার পর কৃষ্ণ কৌরবদিগের লোভ ও শঠতা, যুধিষ্ঠিরের ধার্ম্মিকতা এবং ইহাদের পরস্পর সম্বন্ধ বিবেচনাপূর্ব্বক ইতিকর্ত্তব্যতা অবধারণ করিতে রাজগণকে অনুরোধ করিলেন। নিজের অভিপ্রায়ও কিছু ব্যক্ত করিলেন। বলিলেন, যাহাতে দুর্য্যোধন যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যার্দ্ধ প্রদান করেন—এইরূপ সন্ধির নিমিত্ত কোন ধার্ম্মিক পুরুষ দূত হইয়া তাঁহার নিকট গমন করুন। কৃষ্ণের অভিপ্রায় যুদ্ধ নহে, সন্ধি। তিনি এতদূর যুদ্ধের বিরুদ্ধে যে, অর্দ্ধরাজ্যমাত্র প্রাপ্তিতে সন্তুষ্ট থাকিয়া সন্ধিস্থাপন করিতে পরামর্শ দিলেন এবং শেষ যখন যুদ্ধ অলঙ্ঘনীয় হইয়া উঠিল, তখন তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তিনি সে যুদ্ধে স্বয়ং অস্ত্রধারণ করিয়া নরশোণিত-স্রোত বৃদ্ধি করিবেন না।

কৃষ্ণের বাক্যাবসানে বলদেব তাঁহার বাক্যের অনুমোদন করিলেন, যুধিষ্ঠিরকে দ্যূতক্রীড়ার জন্য কিছু নিন্দা করিলেন, এবং শেষে বলিলেন যে, সন্ধি দ্বারা সম্পাদিত অর্থই অর্থকর হইয়া থাকে, কিন্তু যে অর্থ সংগ্রাম দ্বারা উপার্জ্জিত, তাহা অর্থই নহে। সুরাপায়ী বলদেবের এই কথাগুলি সোণার অক্ষরে লিখিয়া ইউরোপের ঘরে ঘরে রাখিলে মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গল হইতে পারে।

বলদেবের কথা সমাপ্ত হইলে সাত্যকি গাত্রোত্থান করিয়া (পাঠক দেখিবেন, সে কালেও 'Parliamentary Procedure' ছিল) প্রতিবক্তৃতা করিলেন। সাত্যকি নিজে মহাবলবান্ বীরপুরুষ, তিনি কৃষ্ণের শিষ্য এবং মহাভারতের যুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষীয় বীরদিগের মধ্যে অর্জ্জুন ও অভিমন্যুর পরেই তাঁহার প্রশংসা দেখা যায়। কৃষ্ণ সন্ধির প্রস্তাব করায় সাত্যকি কিছু বলিতে সাহস করেন নাই, বলদেবের মুখে ঐ কথা শুনিয়া সাত্যকি ক্রুদ্ধ হইয়া বলদেবকে ক্লীব ও কাপুরুষ ইত্যাদি বাক্যে অপমানিত করিলেন। দ্যূতক্রীড়ার জন্য বলদেব যুধিষ্ঠিরকে যেটুকু দোষ দিয়াছিলেন, সাত্যকি তাহার প্রতিবাদ করিলেন এবং আপনার অভিপ্রায় এই প্রকাশ করিলেন যে, যদি কৌরবেরা পাণ্ডবদিগকে তাহাদের পৈত্রিক রাজ্য সমস্ত প্রত্যর্পণ না করেন, তবে কৌরবদিগকে সমূলে নির্ম্মূল করাই কর্ত্তব্য।

তার পর বৃদ্ধ দ্রুপদের বক্তৃতা। দ্রুপদও সাত্যকির মতাবলম্বী। তিনি যুদ্ধার্থ উদ্যোগ করিতে, সৈন্যসংগ্রহ করিতে এবং মিত্ররাজগণের নিকট দূত প্রেরণ করিতে পাণ্ডবগণকে পরামর্শ দিলেন। তবে তিনি এমনও বলিলেন যে, দুর্য্যোধনের নিকটেও দূত প্রেরণ করা হউক।

পরিশেষে কৃষ্ণ পুনর্ব্বার বক্তৃতা করিলেন। দ্রুপদ প্রাচীন এবং সম্বন্ধে গুরুতর, এই জন্য কৃষ্ণ স্পষ্টতঃ তাঁহার কথার বিরোধ করিলেন না। তিনি এমন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন যে, যুদ্ধ উপস্থিত হইলে তিনি স্বয়ং সে যুদ্ধে নির্লিপ্ত থাকিতে ইচ্ছা করেন। তিনি বলিলেন, "কুরু ও পাণ্ডবদিগের সহিত আমাদিগের তুল্যসম্বন্ধ, তাঁহারা কখনও মর্য্যাদালঙ্ঘন পূর্ব্বক

আমাদিগের সহিত অশিষ্ট ব্যবহার করেন নাই। আমরা বিবাহে নিমন্ত্রিত হইয়া এ স্থানে আগমন করিয়াছি, এবং আপনিও সেই নিমিত্ত আসিয়াছেন। এক্ষণে বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে, আমরা পরমাহ্লাদে নিজ নিজ গৃহে প্রতিগমন করিব।" গুরুজনকে ইহার পর আর কি ভর্ৎসনা করা যাইতে পারে? কৃষ্ণ আরও বলিলেন যে, "যদি দুর্য্যোধন সন্ধি না করে, তাহা হইলে অগ্রে অন্যান্য ব্যক্তিদিগের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া পশ্চাৎ আমাদিগকে আহ্বান করিবেন," অর্থাৎ "এ যুদ্ধে আসিতে আমাদিগের বড় ইচ্ছা নাই।" এই কথা বলিয়া কৃষ্ণ দ্বারকায় চলিয়া গেলেন।

আমরা দেখিলাম যে, কৃষ্ণ যুদ্ধে নিতান্ত বিপক্ষ। এমন কি, তজ্জন্য অর্দ্ধরাজ্য পরিত্যাগেও পাণ্ডবদিগকে পরামর্শ দিয়াছিলেন। আরও দেখিলাম যে, তিনি কৌরব-পাণ্ডবদিগের মধ্যে পক্ষপাতশূন্য, উভয়ের সহিত তাঁহার তুল্যসম্বন্ধ স্বীকার করেন। পরে যাহা ঘটিল, তাহাতে এই দুই কথারই আরও বলবৎ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

এদিকে উভয় পক্ষের যুদ্ধের উদ্যোগ হইতে লাগিল, সেনা সংগৃহীত হইতে লাগিল এবং রাজগণের নিকট দূত গমন করিতে লাগিল, কৃষ্ণকে যুদ্ধে বরণ করিবার জন্য অর্জ্জুন স্বয়ং দ্বারকায় গেলেন। দুর্য্যোধনও তাই করিলেন। দুই জনে এক দিনে এক সময়ে কৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাহার পর যাহা ঘটিল, মহাভারত হইতে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

"বাসুদেব তৎকালে শয়ান ও নিদ্রাভিভূত ছিলেন। প্রথমে রাজা দুর্য্যোধন তাঁহার শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহার মস্তকসমীপস্থ প্রশস্ত আসনে উপবেশন করিলেন। ইন্দ্রনন্দন পশ্চাৎ প্রবেশপূর্ব্বক বিনীত ও কৃতাঞ্জলি হইয়া যাদবপতির পদতলসমীপে সমাসীন হইলেন। অনন্তর বৃষ্ণিনন্দন জাগরিত হইয়া অগ্রে ধনঞ্জয়, পরে দুর্য্যোধনকে নয়নগোচর করিবামাত্র স্বাগত প্রশ্ন সহকারে সংকারপূর্ব্বক আগমন হেতু জিজ্ঞাসা করিলেন।

"দুর্য্যোধন সহাস্যবদনে কহিলেন, 'হে যাদব! এই উপস্থিত যুদ্ধে আপনাকে সাহায্য দান করিতে হইবে। যদিও আপনার সহিত আমাদের উভয়েরই সমান সম্বন্ধ ও তুল্যসৌহৃদ্য; তথাপি আমি অগ্রে আগমন করিয়াছি। সাধুগণ প্রথমাগত ব্যক্তির পক্ষই অবলম্বন করিয়া থাকেন; আপনি সাধুগণের শ্রেষ্ঠ ও মাননীয়; অতএব অদ্য সেই সদাচার প্রতিপালন করুন।"

"কৃষ্ণ কহিলেন, 'হে কুরুবীর! আপনি যে অগ্রে আগমন করিয়াছেন, এ বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সংশয় নাই; কিন্তু আমি কুন্তীকুমারকে অগ্রে নয়নগোচর করিয়াছি, এই নিমিত্ত আমি আপনাদের উভয়কেই সাহায্য করিব। কিন্তু ইহা প্রসিদ্ধ আছে, অগ্রে বালকেরই বরণ করিবে, অতএব অগ্রে কুন্তীকুমারের বরণ করাই উচিত।' এই বলিয়া ভগবান্ যদুনন্দন ধনঞ্জয়কে কহিলেন, 'হে কৌন্তেয়! অগ্রে তোমারই বরণ গ্রহণ করিব। আমার সমযোদ্ধা নারায়ণ নামে এক অর্ব্বুদ গোপ এক পক্ষের সৈনিক পদ গ্রহণ করুক। আর অন্য পক্ষে আমি সমর-পরাঙ্মুখ ও নিরস্ত্র হইয়া অবস্থান করি, ইহার মধ্যে যে পক্ষ তোমার হৃদ্যতর, তাহাই অবলম্বন কর।'

"ধনঞ্জয়, অরাতিমর্দ্দন জনার্দ্দন সমরে পরাঙ্মুখ হইবেন শ্রবণ করিয়াও তাঁহারে বরণ করিলেন। তখন রাজা দুর্য্যোধন অর্ব্বুদ নারায়ণী সেনা প্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণকে সমরে পরাঙ্মুখ বিবেচনা করতঃ প্রীতির পারাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলেন।"

উদ্যোগপর্ব্বের এই অংশ সমালোচন করিয়া আমরা এই কয়টি কথা বুঝিতে পারি।

প্রথম—যদিও কৃষ্ণের অভিপ্রায় যে, কাহারও আপনার ধর্ম্মার্থ-সংযুক্ত অধিকার পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে, তথাপি বলের অপেক্ষা ক্ষমা তাঁহার বিবেচনায় এতদূর উৎকৃষ্ট যে, বলপ্রয়োগ করার অপেক্ষা অর্দ্ধেক অধিকার পরিত্যাগ করাও ভাল।

দ্বিতীয়—কৃষ্ণ সর্ব্বত্র সমদর্শী। সাধারণ বিশ্বাস এই যে, তিনি পাণ্ডবদিগের পক্ষ এবং কৌরবদিগের বিপক্ষ। উপরে দেখা গেল যে, তিনি উভয়ের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে পক্ষপাতশূন্য।

তৃতীয়—তিনি স্বয়ং অদ্বিতীয় বীর হইয়াও যুদ্ধের প্রতি বিশেষ প্রকারে বিরাগযুক্ত। প্রথমে যাহাতে যুদ্ধ না হয়, এইরূপ পরামর্শ দিলেন, তার পর যখন যুদ্ধ নিতান্তই উপস্থিত হইল, এবং অগত্যা তাঁহাকে এক পক্ষে বরণ হইতে হইল, তখন তিনি অস্ত্রত্যাগে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া বরণ হইলেন। এরূপ মাহাত্ম্য আর কোন ক্ষত্রিয়েরই দেখা যায় না, জিতেন্দ্রিয় এবং সর্ব্বত্যাগী ভীষ্মেরও নহে।

আমরা দেখিব যে, যাহাতে যুদ্ধ না হয়, তজ্জন্য কৃষ্ণ ইহার পরেও অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যিনি সকল ক্ষত্রিয়ের মধ্যে যুদ্ধের প্রধান শত্রু, এবং যিনি একাই সর্ব্বত্র সমদর্শী, লোকে তাঁহাকেই এই যুদ্ধের প্রধান পরামর্শদাতা, অনুষ্ঠাতা, এবং পাণ্ডবপক্ষের প্রধান কুচক্রী বলিয়া স্থির করিয়াছে। কাজেই এত সবিস্তারে কৃষ্ণচরিত্র সমালোচনার প্রয়োজন হইয়াছে। তার পর নিরস্ত্র কৃষ্ণকে লইয়া অর্জ্জুন যুদ্ধের কোন্ কার্য্যে নিযুক্ত

করিবেন, ইহা চিন্তা করিয়া, কৃষ্ণকে তাঁহার সারথ্য করিতে অনুরোধ করিলেন। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সারথ্য অতি হেয় কার্য্য। যখন মদ্ররাজ শল্য কর্ণের সারথ্য করিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়াছিলেন, তখন তিনি বড় রাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু আদর্শ পুরুষ অহঙ্কারশূন্য। অতএব কৃষ্ণ অর্জ্জুনের সারথ্য তখনই স্বীকার করিলেন। তিনি সর্ব্বদোষশূন্য এবং সর্ব্বগুণান্বিত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সঞ্জয়যান

উভয় পক্ষে যুদ্ধের উদ্যোগ হইতে থাকুক। এ দিকে দ্রুপদের পরামর্শানুসারে যুধিষ্ঠিরাদি দ্রুপদের পুরোহিতকে ধৃতরাষ্ট্রের সভায় সন্ধিস্থাপনের মানসে প্রেরণ করিলেন, কিন্তু পুরোহিত মহাশয় কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। কেন না, বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্রবেধ্য ভূমিও প্রত্যর্পণ করা দুর্য্যোধনাদির অভিপ্রায় নহে। এ দিকে যুদ্ধে ভীমার্জ্জুন ও কৃষ্ণকে * ধৃতরাষ্ট্রের বড় ভয়; অতএব যাহাতে পাণ্ডবেরা যুদ্ধ না করে, এমন পরামর্শ দিবার জন্য ধৃতরাষ্ট্র আপনার অমাত্য সঞ্জয়কে পাণ্ডবদিগের নিকট প্রেরণ করিলেন। "তোমাদের রাজ্যও আমরা অধর্ম্ম করিয়া কাড়িয়া লইব, কিন্তু তোমরা তজ্জন্য যুদ্ধও করিও না, সে কাজটা ভাল নহে।" এরূপ অসঙ্গত কথা বিশেষ নির্লজ্জ ব্যক্তি নহিলে মুখ ফুটিয়া বলিতে পারে না। কিন্তু দূতের লজ্জা নাই। অতএব সঞ্জয় পাণ্ডবসভায় আসিয়া দীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন। বক্তৃতার স্থূল মর্ম্ম এই যে, "যুদ্ধ বড় গুরুতর অধর্ম্ম, তোমরা সেই অধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছ, অতএব তোমরা বড় অধার্ম্মিক।" যুধিষ্ঠির তদুত্তরে অনেক কথা বলিলেন, তন্মধ্যে আমাদের যেটুকু প্রয়োজনীয়, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।

"হে সঞ্জয়! এই পৃথিবীতে দেবগণেরও প্রার্থনীয় যে সমস্ত ধনসম্পত্তি আছে, তৎসমুদয় এবং প্রাজাপত্য, স্বর্গ, এবং ব্রহ্মলোক, এই সকলও অধর্ম্মতঃ লাভ করিতে আমার বাসনা নাই। যাহা হউক, মহাত্মা কৃষ্ণ ধর্ম্ম-প্রদাতা, নীতিসম্পন্ন ও ব্রাহ্মণগণের উপাসক। উনি কৌরব ও পাণ্ডব উভয় কুলেরই হিতৈষী এবং বহুসংখ্যক মহাবলপরাক্রান্ত ভূপতিগণকে শাসন করিয়া থাকেন। এক্ষণে উনিই বলুন যে, যদি আমি সন্ধিপথ পরিত্যাগ করি, তাহা হইলে নিন্দনীয় হই, আর যদি যুদ্ধে নিবৃত্ত হই, তাহা হইলে আমার স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করা হয়, এস্থলে কি কর্ত্তব্য? মহাপ্রভাব শিনির, নপ্তা এবং চেদি, অন্ধক, বৃষ্ণি, ভোজ, কুকুর ও সৃঞ্জয়-বংশীয়গণ বাসুদেবের বুদ্ধিপ্রভাবেই শত্রুদমনপূর্ব্বক সুহৃদগণকে আনন্দিত করিতেছেন। ইন্দ্রকল্প উগ্রসেন প্রভৃতি বীর সকল এবং মহাবলপরাক্রান্ত মনস্বী সত্য-পরায়ণ যাদবগণ কৃষ্ণ কর্ত্তৃক সতত্তই উপদিষ্ট হইয়া থাকেন। কৃষ্ণ ভ্রাতা ও কর্ত্তা বলিয়াই কাশীশ্বর বভ্রু উত্তম শ্রী প্রাপ্ত হইয়াছেন, গ্রীষ্মাবসানে জলধর যেমন প্রজাদিগকে বারিদান করে, তদ্রূপ বাসুদেব কাশীশ্বরকে সমুদয় অভিলষিত দ্রব্য প্রদান করিয়া থাকেন। কর্ম্মনিশ্চয়জ্ঞ কেশব ঈদৃশ গুণসম্পন্ন, ইনি আমাদের নিতান্ত প্রিয় ও সাধুতম, আমি কদাচ ইঁহার কথার অন্যথাচরণ করিব না।"

বাসুদেব কহিলেন, "হে সঞ্জয়! আমি নিরন্তর পাণ্ডবগণের অবিনাশ, সমৃদ্ধি ও হিত এবং সপুত্র রাজা ধৃতরাষ্ট্রের অভ্যুদয় বাসনা করিয়া থাকি। কৌরব ও পাণ্ডবগণের পরস্পর সন্ধি সংস্থাপন হয়, ইহা আমার অভিপ্রেত। আমি উঁহাদিগকে ইহা ব্যতীত আর কোন পরামর্শ প্রদান করি না। অন্যান্য পাণ্ডবগণের সমক্ষে রাজা যুধিষ্ঠিরের মুখেও অনেক বার সন্ধি-সংস্থাপনের কথা শুনিয়াছি; কিন্তু মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁহার পুত্রগণ সাতিশয় অর্থলোভী, পাণ্ডবগণের সহিত তাঁহার সন্ধিসংস্থাপন হওয়া নিতান্ত দুষ্কর, সুতরাং বিবাদ যে ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইবে, তাহার আশ্চর্য্য কি? হে সঞ্জয়! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও আমি কদাচ ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হই নাই, ইহা জানিয়া-শুনিয়াও

---

* বিপক্ষেরাও যে এক্ষণে কৃষ্ণের সর্ব্বপ্রাধান্য স্বীকার করিতেন, তাহার অনেক প্রমাণ উদ্যোগপর্ব্বে পাওয়া যায়। ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদিগের অন্যান্য সহায়ের নামোল্লেখ করিয়া পরিশেষে বলিয়াছিলেন, "বৃষ্ণিসিংহ কৃষ্ণ যাঁহাদিগের সহায়, তাঁহাদিগের প্রতাপ সহ্য করা কাহার সাধ্য?" (২১ অধ্যায়) পুনশ্চ বলিতেছেন, "সেই কৃষ্ণ এক্ষণে পাণ্ডবদিগকে রক্ষা করিতেছেন। কোন্ শত্রু বিজয়াভিলাষী হইয়া দ্বৈরথ যুদ্ধে তাঁহার সম্মুখীন হইবে? হে সঞ্জয়! কৃষ্ণ পাণ্ডবার্থ যেরূপ পরাক্রম প্রকাশ করেন, তাহা আমি শ্রবণ করিয়াছি। তাঁহার কার্য্য অনুক্ষণ স্মরণ করত আমি শান্তিলাভে বঞ্চিত হইয়াছি, কৃষ্ণ যাঁহাদিগের অগ্রণী, কোন্ ব্যক্তি তাঁহাদিগের প্রতাপ সহ্য করিতে সমর্থ হইবে? কৃষ্ণ অর্জ্জুনের সারথ্য স্বীকার করিয়াছেন শুনিয়া ভয়ে আমার হৃদয় কম্পিত হইতেছে।" আর একস্থানে ধৃতরাষ্ট্র বলিতেছেন, "কিন্তু কেশবও অধৃষ্য, লোকত্রয়ের অধিপতি এবং মহাত্মা। যিনি সর্ব্বলোকে একমাত্র বরেণ্য, কোন্ মনুষ্য তাঁহার সম্মুখে অবস্থান করিবে?" এইরূপ অনেক কথা আছে।

তুমি কি নিমিত্ত স্বকর্ম্মপরায়ণোৎকৃষ্ট, উৎসাহসম্পন্ন, স্বজনপরিপালক রাজা যুধিষ্ঠিরকে অধার্ম্মিক বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে ?"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। এই কথাটা কৃষ্ণচরিত্রে বড় প্রয়োজনীয়। আমরা বলিয়াছি, তাঁহার জীবনের কাজ দুইটি,—ধর্ম্মরাজ্য-সংস্থাপন এবং ধর্ম্ম-প্রচার। মহাভারতে তাঁহার কৃত ধর্ম্মরাজ্য-সংস্থাপন সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মের কথা প্রধানতঃ ভীষ্মপর্ব্বের অন্তর্গত গীতাপর্ব্বাধ্যায়েই আছে। এমন বিচার উঠিতে পারে যে, গীতায় যে ধর্ম্ম কথিত হইয়াছে, তাহা গীতাকার কৃষ্ণের মুখে বসাইয়াছেন বটে, কিন্তু সে ধর্ম্ম যে কৃষ্ণ-প্রচারিত কি গীতাকার-প্রণীত, তাহার স্থিরতা কি ? সৌভাগ্যক্রমে আমরা গীতাপর্ব্বাধ্যায় ভিন্ন মহাভারতের অন্যান্য অংশেও কৃষ্ণ-কৃত ধর্ম্মোপদেশ দেখিতে পাই। যদি আমরা দেখি যে, গীতায় যে অভিনব ধর্ম্ম ব্যাখ্যাত হইয়াছে, আর মহাভারতের অন্যান্য অংশে কৃষ্ণ যে ধর্ম্ম ব্যাখ্যাত করিতেছেন, ইহার মধ্যে একতা আছে, তাহা হইলে আমরা বলিতে পারি যে, এই ধর্ম্ম কৃষ্ণপ্রণীত এবং কৃষ্ণ-প্রচারিতই বটে। মহাভারতের ঐতিহাসিকতা যদি স্বীকার করি, আর যদি দেখি যে, মহাভারতকার যে ধর্ম্মব্যাখ্যা স্থানে স্থানে কৃষ্ণে আরোপ করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বত্র এক প্রকৃতির ধর্ম্ম, যদি পুনশ্চ দেখি যে, সেই ধর্ম্ম প্রচলিত ধর্ম্ম হইতে ভিন্ন প্রকৃতির ধর্ম্ম, তবে বলিব, এই ধর্ম্ম কৃষ্ণেরই প্রচারিত। আবার যদি দেখি যে, গীতায় যে ধর্ম্ম সবিস্তারে এবং পূর্ণতার সহিত ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহার সহিত ঐ কৃষ্ণপ্রচারিত ধর্ম্মের ঐক্য আছে, উহা তাহারই আংশিক ব্যাখ্যামাত্র, তবে বলিব যে, গীতোক্ত ধর্ম্ম যথার্থই কৃষ্ণপ্রণীত বটে।

এখন দেখা যাউক, কৃষ্ণ এখানে সঞ্জয়কে কি বলিতেছেন।

"শুচি ও কুটুম্বপরিপালক হইয়া বেদাধ্যয়ন করতঃ জীবনযাপন করিবে, এইরূপ শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট বিধি বিদ্যমান থাকিলেও, ব্রাহ্মণগণের নানাপ্রকার বুদ্ধি জন্মিয়া থাকে। কেহ কর্ম্ম বশতঃ, কেহ বা কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র বেদজ্ঞান দ্বারা মোক্ষলাভ হয়, এইরূপ স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু যেমন ভোজন না করিলে তৃপ্তিলাভ হয় না, তদ্রূপ কর্ম্মানুষ্ঠান না করিয়া কেবল বেদজ্ঞ হইলে ব্রাহ্মণগণের কদাচ মোক্ষলাভ হয় না। বেদগত বিদ্যা দ্বারা কর্ম্মসংসাধন হইয়া থাকে, তাহাই ফলবতী; যাহাতে কোন কর্ম্মানুষ্ঠানের বিধি নাই, সে বিদ্যা নিতান্ত নিষ্ফল। অতএব যেমন পিপাসার্ত ব্যক্তির জলপান করিবামাত্র পিপাসাশান্তি হয়, তদ্রূপ ইহকালে যে সকল কর্ম্মের ফল প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, তাহারই অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। হে সঞ্জয়! কর্ম্ম-বশতঃই এইরূপ বিধি বিহিত হইয়াছে, সুতরাং কর্ম্মই সর্ব্বপ্রধান। যে ব্যক্তি কর্ম্ম অপেক্ষা অন্য কোন বিষয়কে উৎকৃষ্ট বিবেচনা করিয়া থাকে, তাহার সমস্ত কর্ম্মই নিষ্ফল হয়।

"দেখ, দেবগণ কর্ম্মবলে প্রভাবসম্পন্ন হইয়াছেন; সমীরণ কর্ম্মবলে সতত সঞ্চরণ করিতেছেন; দিবাকর কর্ম্মবলে আলস্যশূন্য হইয়া অহোরাত্র পরিভ্রমণ করিতেছেন; চন্দ্রমা কর্ম্মবলে নক্ষত্রমণ্ডলী-পরিবৃত হইয়া মাসার্দ্ধ উদিত হইতেছেন; হুতাশন কর্ম্মবলে প্রজাগণের কর্ম্মসংসাধন করিয়া নিরবচ্ছিন্ন উত্তাপ প্রদান করিতেছেন; পৃথিবী কর্ম্মবলে নিতান্ত দুর্ভর ভার অনায়াসেই বহন করিতেছেন। স্রোতস্বতী-সকল কর্ম্মবলে প্রাণিগণের তৃপ্তিসাধন করিয়া সলিল-রাশি ধারণ করিতেছেন। অমিতবলশালী দেবরাজ ইন্দ্র দেবগণের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তিনি সেই কর্ম্ম-বলে দশ দিক্ ও নভোমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া বারিবর্ষণ করিয়া থাকেন এবং অপ্রমত্তচিত্তে ভোগা-ভিলাষ বিসর্জ্জন ও প্রিয় বস্তু সমুদয় পরিত্যাগ করিয়া শ্রেষ্ঠত্বলাভ এবং দম, ক্ষমা, সমতা, সত্য ও ধর্ম্ম প্রতি-পালনপূর্ব্বক দেবরাজ্য অধিকার করিয়াছেন। ভগবান্ বৃহস্পতি সমাহিত হইয়া ইন্দ্রিয়নিরোধ-পূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত তিনি দেবগণের আচার্য্যপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। রুদ্র, আদিত্য, যম, কুবের, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, অপ্সর, বিশ্বাবসু ও নক্ষত্রগণ কর্ম্ম-প্রভাবে বিরাজিত রহিয়াছেন; মহর্ষিগণ ব্রহ্মবিদ্যা, ব্রহ্মচর্য্য ও অন্যান্য ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিয়া শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন।"

কর্ম্মবাদ কৃষ্ণের পূর্ব্বেও প্রচলিত ছিল, কিন্তু সে প্রচলিত মতানুসারে বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডই কর্ম্ম। মনুষ্যজীবনে সমস্ত অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম, যাহাকে পাশ্চাত্ত্যেরা duty বলে—সে অর্থে সে প্রচলিত ধর্ম্মে "কর্ম্ম" শব্দ ব্যবহৃত হইত না। গীতাতেই আমরা দেখি, কর্ম্ম শব্দের পূর্ব্বপ্রচলিত অর্থ পরিবর্ত্তিত হইয়া, যাহা কর্ত্তব্য, যাহা অনুষ্ঠেয়, যাহা duty, সাধারণতঃ তাহাই কর্ম্ম নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। আর এইখানে হইতেছে। ভাষাগত বিশেষ প্রভেদ আছে—কিন্তু মর্ম্মার্থ এক। এখানে যিনি বক্তা, গীতাতেও তিনিই প্রকৃত বক্তা, এ কথা স্বীকার করা যাইতে পারে।

অনুষ্ঠেয় কর্ম্মের যথাবিহিত নির্ব্বাহের (অর্থাৎ ডিউটির সম্পাদনের) নামান্তর স্বধর্ম্মপালন। ইহার

প্রথমেই শ্রীকৃষ্ণ স্বধর্ম্মপালনে অর্জ্জুনকে উপদিষ্ট করিতেছেন। এখানেও কৃষ্ণ সেই স্বধর্ম্মপালনের উপদেশ দিতেছেন। যথা,—

"হে সঞ্জয়। তুমি কি নিমিত্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য প্রভৃতি সকল লোকের ধর্ম্ম সবিশেষ জ্ঞাত হইয়াও কৌরবগণের হিতসাধন-মানসে পাণ্ডবদিগের নিগ্রহ চেষ্টা করিতেছ? ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বেদজ্ঞ, অশ্বমেধ ও রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য। যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী এবং হস্ত্যশ্বরথচালনে সুনিপুণ। এক্ষণে যদি পাণ্ডবেরা কৌরবগণের প্রাণহিংসা না করিয়া ভীমসেনকে সান্ত্বনা করতঃ রাজ্যলাভের অন্ত কোন উপায় অবধারণ করিতে পারেন, তাহা হইলে ধর্ম্মরক্ষা ও পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান হয়। অথবা ইহারা যদি ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম প্রতিপালনপূর্ব্বক স্বকর্ম্ম সংসাধন করিয়া দুরদৃষ্টবশতঃ মৃত্যুমুখে নিপতিত হন, তাহাও প্রশস্ত। বোধ হয়, তুমি সন্ধিসংস্থাপনই শ্রেয়ঃসাধন বিবেচনা করিতেছ; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ক্ষত্রিয়দিগের যুদ্ধে ধর্ম্মরক্ষা হয়, কি যুদ্ধ না করিলে ধর্ম্মরক্ষা হয়? ইহার মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা করিবে, আমি তাহাই অনুষ্ঠান করিব।"

তার পর শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ব্বর্ণের ধর্ম্মকথনে প্রবৃত্ত হইলেন। গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রের যেরূপ ধর্ম্ম কথিত হইয়াছে—এখানেও ঠিক সেইরূপ। এইরূপ মহাভারতের অন্যত্রও ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায় যে, গীতোক্ত ধর্ম্ম এবং মহাভারতের অন্যত্র কথিত কৃষ্ণোক্ত ধর্ম্ম এক। অতএব গীতোক্ত ধর্ম্ম যে কৃষ্ণোক্ত ধর্ম্ম—সে ধর্ম্ম যে কেবল কৃষ্ণের নামে পরিচিত, এমন নহে—যথার্থই কৃষ্ণপ্রণীত ধর্ম্ম, ইহা একপ্রকার সিদ্ধ। কৃষ্ণ সঞ্জয়কে আরও অনেক কথা বলিলেন। তাহার দুই একটা কথা উদ্ধৃত করিব।

ইউরোপীয়দিগের বিবেচনায় পররাজ্যাপহরণ অপেক্ষা গৌরবের কর্ম্ম কিছুই নাই। উহার নাম "Conquest," "Glory", "Extention of Empire-" ইত্যাদি ইত্যাদি। যেমন ইংরেজিতে, ইউরোপীয় অন্যান্য ভাষাতেও ঠিক সেইরূপ পররাজ্যাপহরণের গুণানুবাদ। শুধু এক "Gloire" শব্দের মোহে মুগ্ধ হইয়া প্রুষিয়ার দ্বিতীয় ফ্রেড্রিক তিনবার ইউরোপে সমরানল জ্বালিয়া লক্ষ লক্ষ মনুষ্যের সর্ব্বনাশের কারণ হইয়াছিলেন। ঈদৃশ রুধিরপিপাসু রাক্ষস ভিন্ন অন্য ব্যক্তির সহজেই ইহা বোধ হয় যে, এইরূপ "Gloire" ও তস্করতাতে প্রভেদ আর কিছুই নাই—কেবল পররাজ্যাপহারক বড় চোর, অন্য চোর ছোট চোর। * কিন্তু এ কথাটা ব[illegible]যায়, কেন না, দিগ্বিজয়ের এমনই একটা মো[illegible] যে, আর্য্য ক্ষত্রিয়েরাও [illegible] অনেক সময়ে [illegible] ভুলিয়া যাই[illegible] [illegible] কেবল Diogenes ম[illegible] বলিয়াছিলেন, "তুমি একজন [illegible]" [illegible] ভারতবর্ষেও শ্রীকৃষ্ণ পররাজ্যলোলুপ রাজাদিগকে তাহাই বলিতেছেন,—তাঁহার মতে ছোট চোর লুকাইয়া চুরি করে, বড় চোর প্রকাশ্যে চুরি করে। তিনি বলিতেছেন—

"তস্কর দৃষ্ট বা অদৃষ্ট হইয়া হঠাৎ যে সর্ব্বস্ব অপহরণ করে, উভয়েই নিন্দনীয়। সুতরাং দুর্য্যোধনের কার্য্যও একপ্রকার তস্করকার্য্য বলিয়া প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে।"

এই তস্করদিগের হাত হইতে নিজস্ব রক্ষা করাকে কৃষ্ণ পরম ধর্ম্ম বিবেচনা করেন। আধুনিক নীতিজ্ঞদিগেরও সেই মত। ছোট চোরের হাত হইতে নিজস্ব রক্ষার ইংরেজী নাম Justice; বড় চোরের হাত হইতে নিজস্ব রক্ষার নাম Patriotism; উভয়েরই দেশীয় নাম স্বধর্ম্মপালন। কৃষ্ণ বলিতেছেন,—

"এই বিষয়ের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহাও শ্লাঘনীয়, তথাপি পৈতৃক রাজ্যের পুনরুদ্ধারণে বিমুখ হওয়া কোনক্রমেই উচিত নহে।"

কৃষ্ণ সঞ্জয়ের ধর্ম্মের ভণ্ডামি শুনিয়া সঞ্জয়কে কিছু সঙ্গত তিরস্কারও করিলেন। বলিলেন, "তুমি এক্ষণে রাজা যুধিষ্ঠিরকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতে অভিলাষী হইয়াছ, কিন্তু তৎকালে (যখন দুঃশাসন সভামধ্যে দ্রৌপদীর উপর অশ্রাব্য অত্যাচার করে) সভামধ্যে দুঃশাসনকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান কর নাই।" কৃষ্ণ সচরাচর প্রিয়বাদী, কিন্তু যথার্থ দোষকীর্ত্তনকালে বড় স্পষ্টবক্তা। সত্যই সর্ব্বকালে তাঁহার নিকট প্রিয়।

সঞ্জয়কে তিরস্কার করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ প্রকাশ করিলেন যে, উভয় পক্ষের হিতসাধনার্থ স্বয়ং হস্তিনানগরে গমন করিবেন। বলিলেন, "যাহাতে পাণ্ডবগণের অর্থহানি না হয় এবং কৌরবেরাও সন্ধিস্থাপনে সম্মত হন, এক্ষণে তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন করিতে হইবে। তাহা হইলে সুমহৎ পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান হয় এবং কৌরবগণও মৃত্যুপাশ হইতে বিমুক্ত হইতে পারেন।"

লোকের হিতার্থ, অসংখ্য মনুষ্যের প্রাণরক্ষার্থ, কৌরবেরও রক্ষার্থ কৃষ্ণ দুষ্কর কর্ম্মে স্বয়ং উপযাচক হইয়া প্রবৃত্ত হইলেন। মনুষ্যশক্তিতে দুষ্কর কর্ম্ম, কেন না, এক্ষণে পাণ্ডবেরা তাঁহাকে বরণ করিয়াছে; [illegible]

* তবে যেখানে কেবল পরোপকারার্থ পরের রাজ্য হস্তগত করা যায়, সেখানে না কি ভিন্ন কথা হইতে পারে। সেরূপ কার্য্যের বিচারে আমি সক্ষম নহি—কেন না, রাজনীতিজ্ঞ নহি।

কৌরবেরা তাঁহার সঙ্গে শত্রুবৎ ব্যাহার করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু লোকহিতার্থ তিনি নিরস্ত্র হইয়া শত্রুপুরীমধ্যে প্রবেশ করাই শ্রেয় বিবেচনা করিলেন।

——

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যানসন্ধি

এইখানে সঞ্জয়যান-পর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত। সঞ্জয়যান-পর্ব্বাধ্যায়ে শেষ ভাগে দেখা যায় যে, কৃষ্ণ হস্তিনা যাইতে প্রতিশ্রুত হইলেন, এবং বাস্তবিক তাহার পরেই তিনি হস্তিনায় গমন করিলেন বটে; কিন্তু সঞ্জয়যান-পর্ব্বাধ্যায় ও ভগবদ্‌যান-পর্ব্বাধ্যায়ের মধ্যে আর তিনটি পর্ব্বাধ্যায় আছে। "প্রজাগর," "সনৎসুজাত" এবং "যানসন্ধি।" প্রথম দুইটি প্রক্ষিপ্ত, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। উহাতে মহাভারতের কথাও কিছুই নাই—অতি উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম ও নীতিকথা আছে। কৃষ্ণের কোন কথাই নাই, সুতরাং ঐ দুই পর্ব্বাধ্যায়ে আমাদের কোন প্রয়োজনও নাই।

যানসন্ধি-পর্ব্বাধ্যায়ে সঞ্জয় হস্তিনায় ফিরিয়া আসিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে যাহা বলিলেন, এবং তচ্ছ্রবণে ধৃতরাষ্ট্র, দুর্য্যোধন এবং অন্যান্য কৌরবগণে যে বাদানুবাদ হইল, তাহাই কথিত আছে। বক্তৃতা সকল অতি দীর্ঘ, পুনরুক্তির অত্যন্ত বাহুল্যবিশিষ্ট এবং অনেক সময়ে নিষ্প্রয়োজনীয়। কৃষ্ণের প্রসঙ্গ, ইহার দুই স্থানে আছে।

প্রথম, অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ে। ধৃতরাষ্ট্র অতিবিস্তারে অর্জ্জুনবাক্য সঞ্জয়মুখে শুনিয়া, আবার হঠাৎ সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "বাসুদেব ও ধনঞ্জয় যাহা করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত উৎসুক হইয়াছি, অতএব তাহাই কীর্ত্তন কর।"

তদুত্তরে, সঞ্জয়, সভাতলে যে সকল কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহার কিছুই না বলিয়া, এক আষাঢ়ে গল্প আরম্ভ করিলেন। বলিলেন যে, তিনি পা টিপি পা টিপি,—অর্থাৎ চোরের মত, পাণ্ডবদিগের অন্তঃপুরমধ্যে অভিমন্যু প্রভৃতির অগম্য স্থানে গমন করিয়া, কৃষ্ণার্জ্জুনের সাক্ষাৎকার লাভ করেন। দেখেন, কৃষ্ণার্জ্জুন মদ খাইয়া উন্মত্ত। অর্জ্জুন, দ্রৌপদী ও সত্যভামার পায়ের উপর পা দিয়া বসিয়া আছেন। কথাবার্ত্তা নূতন কিছুই হইল না। কৃষ্ণ কেবল কিছু দম্ভের কথা বলিলেন; বলিলেন,—"আমি যখন সহায়, তখন অর্জ্জুন কর্ণকে মারিয়া ফেলিবে।"

তার পর অর্জ্জুন কি বলিলেন, সে কথা এখানে আর কিছু নাই, অথচ ধৃতরাষ্ট্র তাহা শুনিতে চাহিয়াছিলেন। অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের শেষে আছে, "অনন্তর মহাবীর কিরীটী তাঁহার (কৃষ্ণের) বাক্য সকল শুনিয়া লোমহর্ষণ বচন প্রয়োগ করিতে লাগিলেন।" এই কথায় পাঠকের এমন মনে হইবে যে, বুঝি ঊনষষ্টিতম অধ্যায়ে অর্জ্জুন যাহা বলিলেন, তাহাই কথিত হইতেছে। সে দিক্ দিয়া ঊনষষ্টিতম অধ্যায় যায় নাই। ঊনষষ্টিতম অধ্যায়ে ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনকে কিছু অনুযোগ করিয়া সন্ধিস্থাপন করিতে বলিলেন। ষষ্টিতম অধ্যায়ে দুর্য্যোধন প্রত্যুত্তরে বাপকে কিছু কড়া কড়া শুনাইয়া দিল। একষষ্টিতম অধ্যায়ে কর্ণ আসিয়া মাঝে পড়িয়া কিছু বক্তৃতা করিলেন। ভীষ্ম তাঁহাকে উত্তম মধ্যম রকম শুনাইলেন। কর্ণে ভীষ্মে বাধিয়া গেল। দ্বিষষ্টিতমে ভীষ্মের বক্তৃতা। চতুঃষষ্টিতমে বাপ বেটায় আবার বাধিল। পরে এত কালের পর আবার হঠাৎ ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করিলেন যে, অর্জ্জুন কিঁ বলিলেন? তখন সঞ্জয় সেই অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের ছিন্ন সূত্র যোড়া দিয়া অর্জ্জুনবাক্য বলিতে লাগিলেন। বোধ করি, কোন পাঠকেরই এখন সংশয় নাই যে, ৫৯।৬০।৬১।৬২।৬৩।৬৪ অধ্যায়গুলি প্রক্ষিপ্ত। এই কয় অধ্যায়ে মহাভারতের ক্রিয়া একপদও অগ্রসর হইতেছে না। এই অধ্যায়গুলি বড় স্পষ্টতঃ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া ইহার উল্লেখ করিলাম।

যে সকল কারণে এই ছয় অধ্যায়কে প্রক্ষিপ্ত বলা যাইতে পারে, অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়কেও সেই কারণে প্রক্ষিপ্ত বলা যাইতে পারে—পরবর্ত্তী এই অধ্যায়গুলি প্রক্ষিপ্তের উপর প্রক্ষিপ্ত। অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায় সম্বন্ধে আরও বলা যাইতে পারে যে, ইহা যে কেবল অপ্রাসঙ্গিক এবং অসংলগ্ন এমন নহে, পূর্ব্বোক্ত কৃষ্ণবাক্যের সম্পূর্ণ বিরোধী। এই সকল বৃত্তান্তের কিছুমাত্র প্রসঙ্গ অনুক্রমণিকাধ্যায়ে বা পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়ে নাই। বোধ হয়, কোন রসিক লেখক, অসুর নিপাতন শৌরি এবং সুরনিপাতিনী সুরা, উভয়েরই ভক্ত; একত্র উভয় উপাস্যকে দেখিবার জন্য অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়টি প্রক্ষিপ্ত করিয়াছেন।

যানসন্ধি-পর্ব্বাধ্যায়ে এই গেল কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় প্রথম প্রসঙ্গ। দ্বিতীয় প্রসঙ্গ, সপ্তষষ্টিতম হইতে সপ্ততিতম পর্য্যন্ত চারি অধ্যায়ে। এখানে সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের জিজ্ঞাসা মতে কৃষ্ণের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন। সঞ্জয় এখানে পূর্ব্বে যাঁহাকে মদ্যপানে উন্মত্ত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহাকেই জগদীশ্বর বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন। বোধ হয়, ইহাও প্রক্ষিপ্ত। প্রক্ষিপ্ত হউক না হউক, ইহাতে আমাদের কোন

প্রয়োজন নাই। যদি অন্য কারণে কৃষ্ণের ঈশ্বরত্বে আমাদের বিশ্বাস থাকে, তবে সঞ্জয়বাক্যে আমাদের প্রয়োজন কি? আর যদি সে বিশ্বাস না থাকে, তবে সঞ্জয়বাক্যে এমন কিছুই নাই যে, তাহার বলে আমাদিগের সে বিশ্বাস হইতে পারে। অতএব সঞ্জয়বাক্যের সমালোচনা আমাদের নিষ্প্রয়োজন। কৃষ্ণের মানুষচরিত্রের কোন কথাই তাহাতে আমরা পাই না। তাহাই আমাদের সমালোচ্য।

এইখানে যানসন্ধিপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শ্রীকৃষ্ণের হস্তিনাযাত্রার প্রস্তাব

শ্রীকৃষ্ণ, পূর্ব্বকৃত অঙ্গীকারানুসারে সন্ধিস্থাপনার্থ কৌরবদিগের নিকট যাইতে প্রস্তুত হইলেন। গমনকালে পাণ্ডবেরা ও দ্রৌপদী, সকলেই তাঁহাকে কিছু কিছু বলিলেন। শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদিগের কথার উত্তর দিলেন। এই সকল কথোপকথন অবশ্য ঐতিহাসিক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। তবে কবি ও ইতিহাসবেত্তা যে সকল কথা কৃষ্ণের মুখে বসাইয়াছেন, তাহার দ্বারা বুঝা যায় যে, কৃষ্ণের কিরূপ পরিচয় তিনি অবগত ছিলেন। ঐ সকল বক্তৃতা হইতে আমরা কিছু কিছু উদ্ধৃত করিব।

যুধিষ্ঠিরের কথার উত্তরে কৃষ্ণ এক স্থানে বলিতেছেন, "হে মহারাজ, ব্রহ্মচর্য্যাদি ক্ষত্রিয়ের পক্ষে বিধেয় নহে। সমুদয় আশ্রমীরা ক্ষত্রিয়ের ভৈক্ষ্যাচরণ নিষেধ করিয়া থাকেন. বিধাতা সংগ্রামে জয়লাভ বা প্রাণপরিত্যাগ ক্ষত্রিয়ের নিত্য ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; অতএব দীনতা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে নিতান্ত নিন্দনীয়। হে অরাতিনিপাতন যুধিষ্ঠির! আপনি দীনতা অবলম্বন করিলে, কখনই স্বীয় অংশ লাভ করিতে পারিবেন না। অতএব বিক্রম প্রকাশ করিয়া শত্রুগণকে বিনাশ করুন।"

গীতাতেও অর্জ্জুনকে কৃষ্ণ এইরূপ কথা বলিয়াছেন দেখা যায়। ইহা হইতে যে সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া যায়, তাহা পূর্ব্বে বুঝান গিয়াছে। পুনশ্চ ভীমের কথার উত্তরে বলিতেছেন, "মনুষ্য পুরুষকার পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল দৈব বা দৈব পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল পুরুষকার অবলম্বন করিয়া জীবন ধারণ করিতে পারে না। যে ব্যক্তি এইরূপ কৃতনিশ্চয় হইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, সে কর্ম্ম সিদ্ধ না হইলে ব্যথিত, বা কর্ম্ম সিদ্ধ হইলে সন্তুষ্ট হয় না।"

গীতাতেও এইরূপ উক্তি আছে।* অর্জ্জুনের কথার উত্তরে কৃষ্ণ বলিতেছেন, "উর্ব্বর ক্ষেত্রে যথানিয়মে হলচালন বীজবপনাদি করিলেও বর্ষা ব্যতীত কখনই ফলোৎপত্তি হয় না। পুরুষ যদি পুরুষকার সহকারে তাহাতে জলসেচন করে, তথাপি দৈবপ্রভাবে উহা শুষ্ক হইতে পারে। অতএব প্রাচীন মহাত্মগণ দৈব ও পুরুষকার উভয় একত্র মিলিত না হইলে কার্য্যসিদ্ধি হয় না বলিয়া স্থির করিয়াছেন। আমি যথাসাধ্য পুরুষকার প্রকাশ করিতে পারি; কিন্তু দৈব কর্ম্মের অনুষ্ঠানে আমার কিছুমাত্র ক্ষমতা নাই।"

এ কথার উল্লেখ আমরা পূর্ব্বে করিয়াছি। কৃষ্ণ এখানে দেবত্ব একেবারে অস্বীকার করিলেন। কেন না, তিনি মানুষী শক্তির দ্বারা কর্ম্মসাধনে প্রবৃত্ত। ঐশী শক্তির দ্বারা কর্ম্মসাধন ঈশ্বরের অভিপ্রেত হইলে, অবতারের কোন প্রয়োজন থাকে না।

অন্যান্য বক্তার কথা সমাপ্ত হইলে, দ্রৌপদী কৃষ্ণকে কিছু বলিলেন। তাঁহার বক্তৃতায় এমন একটা কথা আছে যে, স্ত্রীলোকের মুখে তাহা অতি বিস্ময়কর। তিনি বলিতেছেন—

"অবধ্য ব্যক্তিকে বধ করিলে যে পাপ হয়, বধ্য ব্যক্তিকে বধ না করিলেও সেই পাপ হইয়া থাকে।"

এই উক্তি স্ত্রীলোকের মুখে বিস্ময়কর হইলেও, স্বীকার করিতে হইবে যে, বহু বৎসর পূর্ব্বে 'বঙ্গদর্শনে' আমি দ্রৌপদীচরিত্রের যেরূপ পরিচয় দিয়াছিলাম, তাহার সঙ্গে এই বাক্যের অত্যন্ত সুসঙ্গতি আছে। আর স্ত্রীলোকের মুখে ভাল শুনাক্ বা না শুনাক্, ইহা যে প্রকৃত ধর্ম্ম এবং কৃষ্ণেরও যে এই মত, ইহাও আমি জরাসন্ধবধের সমালোচনাকালে ও অন্য সময়ে বুঝাইয়াছি।

দ্রৌপদীর এই বক্তৃতার উপসংহারকালে এক অপূর্ব্ব কবিত্বকৌশল আছে। তাহা উদ্ধৃত করা যাইতেছে:

"অসিতাপাঙ্গী দ্রুপদনন্দিনী এই কথা শুনিয়া কুটিলাগ্র, পরম রমণীয়, সর্ব্বগন্ধাধিবাসিত, সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন, মহাভুজগসদৃশ কেশকলাপ ধারণ করিয়া, অশ্রুপূর্ণলোচনে, দীননয়নে পুনরায় কৃষ্ণকে কহিতে লাগিলেন, 'হে জনার্দ্দন! দুরাত্মা দুঃশাসন আমার এই কেশ আকর্ষণ করিয়াছিল। শত্রুগণ সন্ধিস্থাপনের মত প্রকাশ করিলে তুমি সেই কেশকলাপ স্মরণ করিবে। ভীমার্জ্জুন দীনের ন্যায় সন্ধিস্থাপনে কৃতসংকল্প হইয়াছেন, তাহাতে আমার কিছুমাত্র ক্ষতি নাই, আমার বৃদ্ধ

---

* সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে।

পিতা মহারথ পুত্রগণ সমভিব্যাহারে শত্রুগণের সহিত সংগ্রাম করিবেন, আমার মহাবলপরাক্রান্ত পঞ্চ পুত্র অভিমন্যুকে পুরস্কৃত করিয়া কৌরবগণকে সংহার করিবে। দুরাত্মা দুঃশাসনের শ্যামল বাহু ছিন্ন, ধরাতলে নিপতিত ও পাংশুলুণ্ঠিত না দেখিলে আমার শান্তিলাভের সম্ভাবনা কোথায়? আমি হৃদয়ক্ষেত্রে প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় ক্রোধস্থাপন পূর্ব্বক ত্রয়োদশ বৎসর প্রতীক্ষা করিয়াছি। এক্ষণে সেই ত্রয়োদশ বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে, তথাপি তাহা উপশমিত হইবার কিছুমাত্র উপায় দেখিতেছি না; আজি আবার ধর্ম্মপথাবলম্বী বৃকোদরের বাক্যশল্যে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে।'

"নিবিড়নিতম্বিনী আয়তলোচনা কৃষ্ণা এই কথা কহিয়া বাষ্পগদ্গদস্বরে কম্পিতকলেবরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। দ্রবীভূত হুতাশনের ন্যায় অত্যুষ্ণ নেত্রজলে তাঁহার স্তনযুগল অভিষিক্ত হইতে লাগিল। তখন মহাবাহু বাসুদেব তাঁহারে সান্ত্বনা করতঃ কহিতে লাগিলেন, 'হে কৃষ্ণে! তুমি অতি অল্পদিনমধ্যেই কৌরব মহিলাগণকে রোদন করিতে দেখিবে। তুমি যেমন রোদন করিতেছ, কুরুকুলকামিনীরাও তাহাদের জ্ঞাতি-বান্ধবগণ নিহত হইলে এইরূপ রোদন করিবে। আমি যুধিষ্ঠিরের নিয়োগানুসারে ভীমার্জ্জুন-নকুল-সহদেব সমভিব্যাহারে কৌরবগণের বধসাধনে প্রবৃত্ত হইব। ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ কালপ্রেরিতের ন্যায় আমার বাক্যে অনাদর প্রকাশ করিলে, অচিরাৎ নিহত ও শৃগাল কুক্কুরের ভক্ষ্য হইয়া ধরাতলে শয়ন করিবে। যদি হিমবান্ প্রচলিত, মেদিনী উৎক্ষিপ্ত ও আকাশমণ্ডল নক্ষত্রসমূহের সহিত নিপতিত হয়, তথাপি আমার বাক্য মিথ্যা হইবে না। হে কৃষ্ণে! বাষ্প সংবরণ কর, আমি তোমারে যথার্থ কহিতেছি, তুমি অচিরকালমধ্যেই স্বীয় পতিগণকে শত্রুকুলসংহার করিয়া রাজ্যলাভ করিতে দেখিবে'।"

এই উক্তি শোণিতপিপাসুর হিংসাপ্রবৃত্তি জনিত বা ক্রুদ্ধের ক্রোধাভিব্যক্তি নহে। যিনি সর্ব্বত্রগামী সর্ব্বকালব্যাপী বুদ্ধির প্রভাবে ভবিষ্যতে যাহা হইবে, তাহা স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছিলেন, তাঁহার ভবিষ্যদুক্তি-মাত্র। কৃষ্ণ বিলক্ষণ জানিতেন যে, দুর্য্যোধন রাজ্যাংশ প্রত্যর্পণ পূর্ব্বক সন্ধি স্থাপন করিতে কদাপি সম্মত হইবে না। ইহা জানিয়াও যে তিনি সন্ধিস্থাপনার্থ কৌরবসভায় গমনের জন্য উদ্যোগী, তাহার কারণ এই যে, যাহা অনুষ্ঠেয়, তাহা সিদ্ধ হউক বা না হউক, করিতে হইবে। সিদ্ধি ও অসিদ্ধি তুল্য জ্ঞান করিতে হইবে। ইহাই তাঁহার স্বমুখবির্নিগত নিষ্কাম অনুষ্ঠেয় ধর্ম্ম। তিনি নিজেই অর্জ্জুনকে শিখাইয়াছেন যে,—

"সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে।"

সেই নীতির বশব হইয়া আদর্শবোগী ভবিষ্যৎ জানিয়াও সন্ধিস্থাপনের চেষ্টায় কৌরবসভায় চলিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

যাত্রা

যাত্রাকালে শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত ব্যবহারই মনুষ্যোপ-যোগী এবং কালোচিত। তিনি "রেবতী নক্ষত্রযুক্ত কার্ত্তিকমাসীয় দিনে মৈত্র মুহূর্ত্তে কৌরবসভায় গমন করিবার বাসনায় সুবিশ্বস্ত ব্রাহ্মণগণের মাঙ্গল্য পুণ্যনির্ঘোষ শ্রবণ ও প্রাতঃকৃত্য সমাপন পূর্ব্বক স্নান ও বসন ভূষণ পরিধান করিয়া সূর্য্য ও বহ্নির উপাসনা করিলেন; এবং বৃষলাঙ্গুল দর্শন, ব্রাহ্মণগণকে অভিবাদন, অগ্নি প্রদক্ষিণ ও কল্যাণকর দ্রব্য সকল সন্দর্শন পূর্ব্বক" যাত্রা করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ গীতায় যে ধর্ম্ম প্রচারিত করিয়াছেন, তাহাতে তৎকালে প্রবল কাম্যকর্ম্মপরায়ণ যে বৈদিক ধর্ম্ম, তাহার নিন্দাবাদ আছে। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি বেদপরায়ণ ব্রাহ্মণগণকে কখনও অবমাননা করিতেন না। তিনি আদর্শ মনুষ্য, এই জন্য তৎকালে ব্রাহ্মণদিগের প্রতি যে ব্যবহার উচিত ছিল, তিনি তাহাই করিতেন। তখনকার ব্রাহ্মণেরা বিদ্বান্, জ্ঞানবান, ধর্ম্মাত্মা এবং অস্বার্থপর হইয়া সমাজের মঙ্গলসাধনে নিরত ছিলেন, এ জন্য অন্য বর্ণের নিকট পূজা তাঁহাদের ন্যায্য প্রাপ্য। কৃষ্ণও সেই জন্য তাঁহাদিগকে উপযুক্তরূপ পূজা করিতেন। উদাহরণ-স্বরূপ পথিমধ্যে ঋষিগণের সমাগমের বর্ণনা উদ্ধৃত করিতেছি।

"মহাবাহু কেশব এইরূপে কিয়দ্দূর গমন করিয়া পথের উভয় পার্শ্বে ব্রহ্মতেজে জাজ্বল্যমান কতিপয় মহর্ষির সন্দর্শন করিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে দেখিবামাত্র অতিমাত্র ব্যগ্রতা সহকারে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া অভিবাদন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে মহর্ষিগণ! সমুদয় লোকের কুশল? ধর্ম্ম উত্তম-রূপে অনুষ্ঠিত হইতেছে? ক্ষত্রিয়াদি বর্ণত্রয় ব্রাহ্মণ-গণের শাসনে অবস্থান করিতেছে? আপনারা কোথায় সিদ্ধ হইয়াছেন? কোথায় যাইতে বাসনা করিতেছেন? আপনাদের প্রয়োজন কি? আমারে আপনাদের কোন্ কার্য্য অনুষ্ঠান করিতে হইবে? এবং আপনারা কি নিমিত্ত ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন?'

"তখন মহাভাগ জামদগ্ন্য কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, 'হে মধুসূদন! আমাদের মধ্যে কেহ কেহ দেবর্ষি, কেহ কেহ বহুশ্রুত ব্রাহ্মণ, কেহ কেহ রাজর্ষি এবং কেহ কেহ তপস্বী। আমরা অনেক বার দেবাসুরের সমাগম দেখিয়াছি; এক্ষণে সমুদয় ক্ষত্রিয়, সভাসদ্ ভূপতি ও আপনারে অবলোকন করিবার বাসনায় গমন করিতেছি। আমরা কৌরবসভামধ্যে আপনার মুখবিনির্গত ধর্ম্মার্থযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি। হে যাদবশ্রেষ্ঠ! ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর প্রভৃতি মহাত্মগণ এবং আপনি যে সত্য ও হিতকর বাক্য কহিবেন, আমরা সেই সকল বাক্যশ্রবণে নিতান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছি। এক্ষণে আপনি সত্বরে কুরুরাজ্যে গমন করুন; আমরা তথায় আপনারে সভামণ্ডপে দিব্য আসনে আসীন ও তেজঃপ্রদীপ্ত দেখিয়া পুনরায় আপনার সহিত কথোপকথন করিব'।"

এখানে ইহাও বক্তব্য যে, এই জামদগ্ন্য পরশুরাম কৃষ্ণের সমসাময়িক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। রামায়ণে আবার তিনি রামচন্দ্রের সমসাময়িক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। অথচ পুরাণে তিনি রাম কৃষ্ণ উভয়েরই পূর্ব্বগামী বিষ্ণুর অবতারান্তর বলিয়া খ্যাত। পুরাণের দশাবতারবাদ কতদূর সঙ্গত, তাহা আমরা গ্রন্থান্তরে বিচার করিব।

এই হস্তিনাযাত্রার বর্ণনায় জানা যায় যে, কৃষ্ণ নিজেও সাধারণ প্রজার নিকটেও পূজ্য ছিলেন। হস্তিনাযাত্রার বর্ণনা আরও কিছু উদ্ধৃত করিলাম।

"দেবকীনন্দন সর্ব্বশস্যপরিপূর্ণ অতি রম্য সুখাস্পদ পরম পবিত্র শালিভবন এবং অতি মনোহর ও হৃদয়-তোষণ বহুবিধ গ্রাম্যপশু সন্দর্শন করতঃ বিবিধ পুর ও রাজ্য অতিক্রম করিলেন। কুরুকুলসংরক্ষিত নিত্য-প্রহৃষ্ট অনুদ্বিগ্ন ব্যসনরহিত পুরবাসিগণ কৃষ্ণকে দর্শন করিবার মানসে উপপ্লব্য নগর হইতে পথিমধ্যে আগমন করিয়া তাঁহার রথ প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে মহাত্মা বাসুদেব সমাগত হইলে তাহারা বিধানা-নুসারে তাঁহার পূজা করিতে লাগিল।

"এ দিকে ভগবান্ মরীচিমালী স্বীয় কিরণজাল পরিত্যাগ করিয়া লোহিত কলেবর ধারণ করিলে, অরাতিনিপাতন মধুসূদন বৃকস্থলে সমুপস্থিত হইয়া সত্বরে রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক যথাবিধি শৌচসমা-পনান্তে রথাশ্বমোচনে আদেশ করিয়া সন্ধ্যার উপাসনা করিতে লাগিলেন। দারুক কৃষ্ণের আজ্ঞানুসারে অশ্বগণকে রথ হইতে মুক্ত করতঃ শাস্ত্রানুসারে তাহাদের পরিচর্য্যা ও গাত্র হইতে সমুদয় যোক্ত্রাদি মোচন করিয়া তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিল। মহাত্মা মধুসূদন সন্ধ্যা সমাপনান্তে স্বীয় সমভিব্যাহারী জনগণকে কহিলেন, 'হে পরিচারকবর্গ! অদ্য যুধিষ্ঠিরের কার্য্যা-নুরোধে এই স্থানে রজনী অতিবাহিত করিতে হইবে।' তখন পরিচারকগণ তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া ক্ষণকালমধ্যে পটমণ্ডপ নির্ম্মাণ ও বিবিধ সুমিষ্ট অন্নপান প্রস্তুত করিল। অনন্তর সেই গ্রামস্থ স্বধর্ম্মাবলম্বী আর্য্য কুলীন ব্রাহ্মণ সমুদয় অরাতিকুলকালান্তক মহাত্মা হৃষীকেশের সমীপে আগমন পূর্ব্বক বিধানানুসারে তাঁহারে পূজা ও আশীর্ব্বাদ করিয়া স্ব স্ব ভবনে আনয়ন করিতে বাসনা করিলেন। ভগবান্ মধুসূদন তাঁহাদের অভিপ্রায়ে সম্মত হইলেন এবং তাঁহাদিগকে অর্চনপূর্ব্বক তাঁহাদের ভবনে গমন করিয়া তাঁহাদিগের সমভি-ব্যাহারে পুনরায় স্বীয় পটমণ্ডপে আগমন করিলেন। পরে সেই সমুদয় ব্রাহ্মণগণের সমভিব্যবহারে সুমিষ্ট দ্রব্যজাত ভোজন করিয়া পরমসুখে যামিনী যাপন করিলেন।"

ইহা নিতান্তই মানুষচরিত্র, কিন্তু আদর্শ মনুষ্যের চরিত্র।

দেখা যাইতেছে যে, দেবতা বলিয়া কেহ তাঁহাকে পূজা করিতেছে, এমন কথা নাই। তবে শ্রেষ্ঠ মনুষ্য যেরূপ পূজা পাইবার সম্ভাবনা, তাহাই তিনি পাইতেছেন, এবং আদর্শ মনুষ্যের লোকের সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করা সম্ভব, তিনি তাহাই করিতেছেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

হস্তিনায় প্রথম দিবস

কৃষ্ণ আসিতেছেন শুনিয়া, বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্র তাঁহার অভ্যর্থনা ও সম্মানের জন্য বড় বেশী রকম উদ্যোগ আরম্ভ করিলেন। নানারত্ন-সমাকীর্ণ সভা সকল নির্ম্মাণ করাইলেন এবং তাঁহাকে উপঢৌকন দিবার জন্য অনেক হস্ত্যশ্ব, রথ, দাস "অজাতাপত্য শতসংখ্যক দাসী", মেষ, অশ্বতরী, মণি, মাণিক্য ইত্যাদি সংগ্রহ করিতে লাগিলেন।

বিদুর দেখিয়া শুনিয়া বলিলেন, "ভাল, ভাল। তুমি যেমন ধার্ম্মিক, তেমনই বুদ্ধিমান্, কিন্তু রত্নাদি দিয়া কৃষ্ণকে ঠকাইতে পারিবে না। তিনি যে জন্য আসিতেছেন, তাহা সম্পাদন কর; তাহা হইলেই তিনি সন্তুষ্ট হইবেন—অর্থপ্রলোভিত হইয়া তোমার বশ হইবেন না।"

ধৃতরাষ্ট্র ধূর্ত্ত, এবং বিদুর সরল; দুর্য্যোধন দুষ্ট। তিনি বলিলেন, "কৃষ্ণ পূজনীয় বটে, কিন্তু তাঁহার পূজা করা হইবে না। যুদ্ধ ত ছাড়িব না, তবে তাঁর সমাদরে কাজ কি? লোকে মনে করিবে, আমরা ভয়েই বা তাঁহার খোসামোদ করিতেছি। আমি তদপেক্ষা

সংপরামর্শ স্থির করিয়াছি। আমরা তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিব। পাণ্ডবের বল বুদ্ধি কৃষ্ণ; কৃষ্ণ আটক থাকিলে পাণ্ডবেরা আমার বশীভূত থাকিবে।"

এই কথা শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্রও পুত্রকে তিরস্কার করিতে বাধ্য হইলেন। কেন না, কৃষ্ণ দূত হইয়া আসিতেছেন। কৃষ্ণভক্ত ভীষ্ম দুর্য্যোধনকে কতকগুলা কটূক্তি করিয়া সভা হইতে উঠিয়া গেলেন।

নাগরিকেরা এবং কৌরবেরা বহু সম্মানের সহিত কৃষ্ণকে কুরুসভায় আনীত করিলেন। তাঁহার জন্য যে সকল সভা নির্ম্মিত ও রত্নরাজি রক্ষিত হইয়াছিল, তিনি তৎপ্রতি দৃষ্টিপাতও করিলেন না। তিনি ধৃতরাষ্ট্রভবনে গমন করিয়া কুরুসভায় উপবেশন পূর্ব্বক যে যেমন যোগ্য, তাহার সঙ্গে সেইরূপ সংসম্ভাষণ করিলেন। পরে সেই রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া, দীনবন্ধু এক দীনভবনে চলিলেন।

বিদুর, ধৃতরাষ্ট্রের এক রকম ভাই। উভয়েরই ব্যাসদেবের ঔরসে জন্ম। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র রাজা বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রজ পুত্র; বিদুর তাহা নহে। তিনি বিচিত্রবীর্য্যের দাসী এক বৈশ্যার গর্ভে জন্মিয়াছিলেন। তাঁহাকে বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রজ ধরিলেও তাঁহার জাতি নির্ণয় হয় না। কেন না ব্রাহ্মণের ঔরসে, ক্ষত্রিয়ের ক্ষেত্রে, বৈশ্যার গর্ভে তাঁহার জন্ম। * তিনি সামান্য ব্যক্তি, কিন্তু পরম ধার্ম্মিক। কৃষ্ণ রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করিয়া তাঁহার বাড়ীতে গিয়া, তাঁহার নিকট আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। সেইজন্য আজিও এ দেশে "বিদুরের খুদ" এই বাক্য প্রচলিত আছে। পাণ্ডবমাতা কুন্তী কৃষ্ণের পিতৃষসা সেইখানে বাস করিতেন। বনগমনকালে পাণ্ডবেরা তাঁহাকে সেইখানে রাখিয়াছিলেন। কৃষ্ণ কুন্তীকে প্রণাম করিতে গেলেন। কুন্তী পুত্রগণ ও পুত্রবধূর দুঃখের বিবরণ স্মরণ করিয়া কৃষ্ণের নিকট অনেক কাঁদাকাটা করিলেন। উত্তরে কৃষ্ণ যাহা তাঁহাকে বলিলেন, তাহা অমূল্য। যে ব্যক্তি মনুষ্য চরিত্রের সর্ব্বপ্রদেশ সম্পূর্ণরূপে অবগত হইয়াছে, সে ভিন্ন আর কেহই সে কথার অমূল্যত্ব বুঝিবে না। মূর্খের ত কথাই নাই। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, "পাণ্ডবগণ নিদ্রা, তন্দ্রা, ক্রোধ, হর্ষ, ক্ষুধা, পিপাসা, হিম, রৌদ্র পরাজয় করিয়া বীরোচিত সুখে নিরত রহিয়াছেন। তাঁহারা ইন্দ্রিয়সুখ পরিত্যাগ করিয়া বীরোচিত সুখে সন্তুষ্ট আছেন। সেই মহাবলপরাক্রান্ত মহোৎসাহসম্পন্ন বীরগণ কদাচ অল্পে সন্তুষ্ট হয়েন না। বীর ব্যক্তিরা হয় অতিশয় ক্লেশ, না হয় অত্যুৎকৃষ্ট সুখ সম্ভোগ করিয়া থাকেন; আর ইন্দ্রিয়সুখাভিলাষী ব্যক্তিগণ মধ্যাবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকে; কিন্তু উহা দুঃখের আকর, রাজ্যলাভ বা বনবাস সুখের নিদান।"

"রাজ্যলাভ বা বনবাস" * এ কথা ত আধুনিক

---

* মহাভারতীয় নায়কদিগের সকলেরই জাতি সম্বন্ধে এইরূপ গোলযোগ। পাণ্ডবদিগের সম্বন্ধে এইরূপ গোলযোগ। পাণ্ডবদিগের প্রপিতামহী সত্যবতী দাসকন্যা। ভীষ্মের মা'র জাতি লুকাইবার বোধ হয় বিশেষ প্রয়োজন ছিল, এ জন্য তিনি গঙ্গানন্দন। ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু ব্রাহ্মণের ঔরসে ক্ষত্রিয়ার গর্ভজাত। ব্যাস নিজে সেই ধীবরনন্দিনীর কানীন-পুত্র। অতএব পাণ্ডু ও ধৃতরাষ্ট্রের জাতি সম্বন্ধে এত গোলযোগ যে, এখনকার দিনে তাঁহারা সর্ব্বজাতির অপাংক্তেয় হইতেন। পাণ্ডুর পুত্রগণ কুন্তীর গর্ভজাত বটে, কিন্তু বাপের বেটা নহেন; পাণ্ডু নিজে পুত্রোৎপাদনে অক্ষম। তাঁহারা ইন্দ্রাদির ঔরসপুত্র বলিয়া পরিচিত। এ দিকে দ্রোণাচার্য্যের পিতা ভরদ্বাজ ঋষি, কিন্তু মা একটা কলসী: কলসীর গর্ভধারণ যাঁহাদের বিশ্বাস না হইবে, তাঁহারা দ্রোণের মাতৃকুল সম্বন্ধে বিশেষ সন্দিহান হইবেন। পাণ্ডবদিগের পিতা সম্বন্ধে যত গোলযোগ, কর্ণ সম্বন্ধেও তত—বেশীর ভাগ তিনি কানীন। দ্রৌপদী ও ধৃষ্টদ্যুম্নের বাপ বা কে, কেহ বলিতে পারে না; তাঁহারা যজ্ঞোদ্ভূত।

এ সময় কিন্তু বিবাহ সম্বন্ধে কোন গোলযোগ ছিল না। অনুলোম প্রতিলোম বিবাহের কথা বলিতেছি না। অনেক ঋষির ধর্ম্মপত্নীও ক্ষত্রিয়কন্যা ছিলেন, যথা—অগস্ত্যপত্নী লোপামুদ্রা, ঋষ্যশৃঙ্গের স্ত্রী শান্তা, ঋচীক-ভার্য্যা, জমদগ্নির ভার্য্যা (কেহ কেহ বলেন, পরশুরামের ভার্য্যা) রেণুকা ইত্যাদি। এমনও কথা আছে যে, পরশুরাম পৃথিবী ক্ষত্রিয়শূন্য করিলে ব্রাহ্মণদিগের ঔরসেই পরবর্ত্তী ক্ষত্রিয়েরা জন্মিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে, ব্রাহ্মণকন্যা দেবযানী ক্ষত্রিয় যযাতির ধর্ম্মপত্নী। আহারাদি সম্বন্ধে কোন বাঁধাবাঁধি ছিল না, তাহাও ইতিহাসে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য পরস্পরের অন্ন ভোজন করিতেন।

* মিল্টনের ক্ষুদ্রচেতা সয়তান বলিয়াছিল যে, স্বর্গে দাসত্বের অপেক্ষা বরং নরকে রাজত্ব শ্রেয়ঃ। আমি জানি যে, আমার এমন পাঠক অনেক আছেন, যাঁহারা এই ক্ষুদ্রোক্তির সঙ্গে উপরিলিখিত মহতী বাণীর কোন প্রভেদ দেখিবেন না, তাঁহাদিগের মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণরূপে আশাশূন্য। লঘুচেতা পরের প্রভুত্ব সহ্য করিতে পারে না, মহাত্মা কর্ত্তব্যানুরোধে তাহা পারেন, কিন্তু মহাত্মা জানেন যে, মহাদুঃখ বা মহাসুখ ব্যতীত তাঁহার বহুবিস্তারাকাঙ্ক্ষিণী চিত্তবৃত্তি সকল স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইতে পারে না।

হিন্দু বুঝে না, বুঝিলে এত দুঃখ থাকিত না। যে দিন বুঝিবে, সে দিন আর দুঃখ থাকিবে না। হিন্দু পুরাণেতিহাসে এমন কথা থাকিতে, আমরা কি না মেমসাহেবের লেখা নবেল পড়িয়া দিন কাটাই, না হয় সভা করিয়া পাঁচ জনে জুটিয়া পাখীর মত কিচিরমিচির করি!

কৃষ্ণ কুন্তীকে আরও বলিলেন, "আপনি তাহাদিগকে শত্রু বিনাশ করিয়া সকল লোকের আধিপত্য ও অতুল সম্পত্তি ভোগ করিতে দেখিবেন।"

অতএব কৃষ্ণ নিশ্চিত জানিতেন যে, সন্ধি হইবে না—যুদ্ধ হইবে। তথাপি সন্ধিস্থাপন জন্য হস্তিনায় আসিয়াছেন; কেন না, যে কর্ম্ম অনুষ্ঠেয়, তাহা সিদ্ধ হউক বা না হউক, তাহার অনুষ্ঠান করিতে হয়। ইহাকেই তিনি গীতায় কর্ম্মযোগ বলিয়া বুঝাইয়াছেন। যুদ্ধের অপেক্ষা সন্ধি মনুষ্যের হিতকর; এই জন্য সন্ধিস্থাপন অনুষ্ঠেয়। কিন্তু যখন যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া সন্ধিস্থাপন করিতে পারিলেন না, তখন কৃষ্ণই আবার যুদ্ধে বীতশ্রদ্ধ অর্জ্জুনের প্রধান উৎসাহদাতা ও সহায়। কেন না, যখন সন্ধি অসাধ্য, তখন যুদ্ধই অনুষ্ঠেয় ধর্ম্ম। অতএব যে কর্ম্মযোগ তিনি গীতায় উপদিষ্ট করিয়াছেন, তিনি নিজেই তাহাতে প্রধান যোগী। তাঁহার আদর্শ চরিত্র পুঙ্খানুপুঙ্খ সমালোচনে আমরা প্রকৃত মনুষ্যত্ব কি, তাহা বুঝিতে পারিব বলিয়াই এত প্রয়াস পাইতেছি।

কৃষ্ণ কুন্তীর নিকট হইতে বিদায় হইয়া পুনর্ব্বার কৌরবসভায় গমন করিলেন। সেখানে গেলে দুর্য্যোধন তাঁহাকে ভোজনের জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। তিনি তাহা গ্রহণ করিলেন না। দুর্য্যোধন ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কৃষ্ণ প্রথমে তাঁহাকে লৌকিক নীতিটা স্মরণ করাইয়া দিলেন। বলিলেন, "দূতগণ কার্য্যসমাধানান্তে ভোজন ও পূজা গ্রহণ করিয়া থাকে; অতএব আমি কৃতকার্য্য হইলেই আপনার পূজা গ্রহণ করিব।" দুর্য্যোধন তবুও ছাড়ে না; আবার পীড়াপীড়ি করিল। তখন কৃষ্ণ বলিলেন,—

"লোকে হয় প্রীতি পূর্ব্বক অথবা বিপন্ন হইয়া অন্যের অন্ন ভোজন করে। আপনি প্রীতিসহকারে আমারে ভোজন করাইতে বাসনা করেন নাই, আমিও বিপদ্গ্রস্ত হই নাই, তবে কি নিমিত্ত আপনার অন্ন ভোজন করিব?"

ভোজনের নিমন্ত্রণ গ্রহণ একটা সামান্য কর্ম্ম, কিন্তু আমাদের দৈনিক জীবন, সচরাচর কতকগুলা সামান্য কর্ম্মের সমবায় মাত্র। সামান্য কর্ম্মের জন্য একটা নীতি আছে অথবা থাকা উচিত। বৃহৎ কর্ম্ম সকলের নীতির যে ভিত্তি, ক্ষুদ্র কর্ম্ম সকলের নীতিরও সেই ভিত্তি। সে ভিত্তি ধর্ম্ম। তবে উন্নতচরিত্র মনুষ্যের সঙ্গে ক্ষুদ্রচেতার এই প্রভেদ যে, ক্ষুদ্রচেতা ধর্ম্মে পরাঙ্মুখ না হইলেও, সামান্য বিষয়ে নীতির অনুবর্ত্তী হইতে সক্ষম হয়েন না, কেন না, নীতির ভিত্তি তিনি অনুসন্ধান করেন না। আদর্শ মনুষ্য এই ক্ষুদ্র বিষয়েও নীতির ভিত্তি অনুসন্ধান করিলেন। দেখিলেন যে, নিমন্ত্রণ গ্রহণ সরলতা ও সত্যের বিরুদ্ধ হয়। অতএব দুর্য্যোধনকে সরল ও সত্য উত্তর দিলেন; স্পষ্ট কথা পরুষ হইলেও তাহা বলিতে সঙ্কুচিত হইলেন না। যেখানে অকপট ব্যবহার ধর্ম্মানুমত হয়, সেখানেও তাহা পরুষ বলিয়া আমরা পরাঙ্মুখ। এই ধর্ম্মবিরুদ্ধ লজ্জা অনেক সময়ে আমাদিগকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অধর্ম্মে বিপন্নও করে। কৃষ্ণ তার পর কুরুসভা হইতে উঠিয়া, বিদুরের ভবনে গমন করিলেন।

বিদুরের সঙ্গে রাত্রিতে তাঁহার অনেক কথোপকথন হইল। বিদুর তাঁহাকে বুঝাইলেন যে, তাঁহার হস্তিনায় আসা অনুচিত হইয়াছে; কেন না, দুর্য্যোধন কোনমতেই সন্ধিস্থাপন করিবে না। কৃষ্ণের উত্তর হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

"যিনি অশ্বকুঞ্জররথসমবেত বিপদাক্রান্ত সমুদায় পৃথিবী মৃত্যুপাশ হইতে বিমুক্ত করিতে সমর্থ হন, তাঁহার উৎকৃষ্ট ধর্ম্মলাভ হয়।"

ইউরোপের প্রতি রাজপ্রাসাদে এই কথাগুলি স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখা উচিত। সিমলার রাজপ্রাসাদেও বাদ পড়ে না। কৃষ্ণ পুনশ্চ বলিতেছেন,—

"যে ব্যক্তি ব্যসনগ্রস্ত বান্ধব মুক্ত করিবার নিমিত্ত যথাসাধ্য যত্নবান না হন, পণ্ডিতগণ তাঁহারে নৃশংস বলিয়া কীর্ত্তন করেন। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি মিত্রের কেশ পর্য্যন্ত ধারণ করিয়া অকার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিবেন। * * যদি তিনি (দুর্য্যোধন) আমার হিতকর বাক্য শ্রবণ করিয়াও আমার প্রতি শঙ্কা করেন, তাহাতে আমার কিছুমাত্র ক্ষতি নাই; প্রত্যুত, আত্মীয়গণকে সদুপদেশ প্রদান নিবন্ধন পরমসন্তোষ ও আনৃণ্য লাভ হইবে। যে ব্যক্তি জ্ঞাতিভেদ সময়ে সৎপরামর্শ প্রদান না করে, সে ব্যক্তি কখন আত্মীয় নহে।"

ইউরোপীয়দিগের বিশ্বাস, কৃষ্ণ কেবল পরস্ত্রীলুব্ধ পাপিষ্ঠ গোপ; এ দেশের লোকের কাহারও বা সেইরূপ বিশ্বাস, কাহারও বিশ্বাস যে, তিনি মনুষ্যহত্যার জন্য অবতীর্ণ; কাহারও বিশ্বাস, তিনি "চক্রী"—অর্থাৎ স্বাভিলাষসিদ্ধি জন্য কুচক্র উপস্থিত করেন। তিনি যে এ সকল নহেন—তিনি যে তৎপরিবর্ত্তে লোকহিতৈষীর শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ, ধর্ম্মোপদেষ্টার শ্রেষ্ঠ, আদর্শ মনুষ্য—ইহাই বুঝাইবার জন্য এই সকল উদ্ধৃত করিতেছি।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

হস্তিনায় দ্বিতীয় দিবস

পরদিন প্রাতে স্বয়ং দুর্য্যোধন ও শকুনি আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বিদুরভবন হইতে কৌরবসভায় লইয়া গেলেন। অতি মহতী সভা হইল। নারদাদি দেবর্ষি; এবং জমদগ্নি প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষি তথায় উপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণ পরম বাগ্মিতার সহিত দীর্ঘ বক্তৃতায় ধৃতরাষ্ট্রকে সন্ধিস্থাপনের প্রবৃত্তি দিতে লাগিলেন। ঋষিগণও সেইরূপ করিলেন। কিছুতে কিছু হইল না। ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, "আমার সাধ্য নহে, দুর্য্যোধনকে বল।" দুর্য্যোধনকে কৃষ্ণ, ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি অনেক প্রকার বুঝাইলেন। সন্ধিস্থাপন দূরে থাক, দুর্য্যোধন কৃষ্ণকে কড়া কড়া শুনাইয়া দিলেন। কৃষ্ণও তাহার উপযুক্ত উত্তর দিলেন। দুর্য্যোধনের দুশ্চরিত্র ও পাপাচরণ সকল বুঝাইয়া দিলেন। ক্রুদ্ধ হইয়া দুর্য্যোধন উঠিয়া গেলেন।

তখন কৃষ্ণ, যাহা সমস্ত পৃথিবীর রাজনীতির মূলসূত্র, তদনুসারে কার্য্য করিতে ধৃতরাষ্ট্রকে পরামর্শ দিলেন। রাজশাসনের মূলসূত্র এই যে, প্রজারক্ষার্থ দুষ্কৃতকারীকে দণ্ডিত করিবে। অর্থাৎ অনেকের হিতার্থ একের দণ্ড বিধেয়। সমাজের রক্ষার্থ হত্যাকারীর বধ বিহিত। যাহাকে বদ্ধ না করিলে, তাহার পাপাচরণে বহুসহস্র প্রাণীর প্রাণসংহার হইবে, তাহাকে বদ্ধ করাই জ্ঞানীর উপদেশ। ইউরোপীয় সমস্ত রাজা ও রাজমন্ত্রী পরামর্শ করিয়া এই জন্য খৃঃ ১৮১৫ অব্দে নাপোলেয়নকে যাবজ্জীবন আবদ্ধ করিয়াছিলেন। এই জন্য মহানীতিজ্ঞ কৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্রকে পরামর্শ দিলেন যে, দুর্য্যোধনকে বাঁধিয়া পাণ্ডবদিগের সহিত সন্ধি করুন। তিনি নিজে, সমস্ত যদুবংশের রক্ষার্থ, কংস মাতুল হইলেও তাহাকে বধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি সে উদাহরণও দিলেন। বলা বাহুল্য যে, এ পরামর্শ গৃহীত হইল না।

এদিকে দুর্য্যোধন রুষ্ট হইয়া কৃষ্ণকে আবদ্ধ করিবার জন্য কর্ণের সঙ্গে পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

সাত্যকি, কৃতবর্ম্মা প্রভৃতি কৃষ্ণের জ্ঞাতিবর্গ সভায় উপস্থিত ছিলেন। সাত্যকি কৃষ্ণের নিতান্ত অনুগত ও প্রিয়; অস্ত্রবিদ্যায় অর্জ্জুনের শিষ্য এবং প্রায় অর্জ্জুনতুল্য বীর। ইঙ্গিতজ্ঞ মহাবুদ্ধিমান্ সাত্যকি এই মন্ত্রণা জানিতে পারিলেন। তিনি অন্যতর যাদববীর কৃতবর্ম্মাকে সসৈন্যে পুরদ্বারে প্রস্তুত থাকিতে বলিয়া কৃষ্ণকে এই মন্ত্রণা জানাইলেন। এবং সভামধ্যে প্রকাশ্যে ইহা ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতিকে জানাইলেন। শুনিয়া বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন, "যেমন পতঙ্গগণ পাবকে পতিত হইয়া বিনষ্ট হয়, ইহাদের দশাও কি সেইরূপ হইবে না? সেইরূপ জনার্দ্দন ইচ্ছা করিলে যুদ্ধকালে সকলকেই শমনসদনে প্রেরণ করিবেন।" ইত্যাদি।

পরে কৃষ্ণ যাহা বলিলেন, তাহা যথার্থই আদর্শ পুরুষের উক্তি। তিনি বলশালী, সুতরাং ক্রোধশূন্য এবং ক্ষমাশীল। তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন, "শুনিতেছি, দুর্য্যোধন প্রভৃতি সকলে ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে বলপূর্ব্বক নিগৃহীত করিবেন। কিন্তু আপনি অনুমতি করিয়া দেখুন, আমি ইঁহাদিগকে আক্রমণ করি কি ইঁহারা আমাকে আক্রমণ করেন। আমার এরূপ সামর্থ্য আছে যে, আমি একাকী ইঁহাদিগের সকলকে নিগৃহীত করিতে পারি। কিন্তু আমি কোন প্রকারেই নিন্দিত পাপজনক কর্ম্ম করিব না। আপনার পুত্রেরাই পাণ্ডবগণের অর্থে লোলুপ হইয়া স্বার্থভ্রষ্ট হইবেন। বস্তুতঃ ইঁহারা আমাকে নিগৃহীত করিতে ইচ্ছা করিয়া যুধিষ্ঠিরকে কৃতকার্য্য করিতেছেন। আমি অদ্যই ইঁহাদিগকে ও ইঁহাদিগের অনুচরগণকে নিগ্রহণ করিয়া পাণ্ডবগণকে প্রদান করিতে পারি। তাহাতে আমাকে পাপভাগী হইতেও হয় না। কিন্তু আপনার সন্নিধানে ঈদৃশ ক্রোধ ও পাপবুদ্ধিজনিত গর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব না। আমি অনুজ্ঞা করিতেছি যে, দুর্নীতি-পরায়ণগণ দুর্য্যোধনের ইচ্ছানুসারে কার্য্য করুক।" *

এই কথার পর, ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনকে ডাকাইয়া আনাইলেন এবং তাঁহাকে অতিশয় কটূক্তি করিয়া ভর্ৎসনা করিলেন। বলিলেন, "তুমি অতি নৃশংস, পাপাত্মা ও নীচাশয়; এই নিমিত্তই অসাধ্য, অযশস্কর, সাধুবিগর্হিত, পাপাচরণে সমুৎসুক হইয়াছ। কুলপাংশুল মূঢ়ের ন্যায় দুরাত্মাদিগের সহিত মিলিত হইয়া নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ জনার্দ্দনকে নিগ্রহ করিতে ইচ্ছা করিতেছ। যেমন বালক চন্দ্রমাকে গ্রহণ করিতে উৎসুক হয়, তুমিও সেইরূপ ইন্দ্রাদি দেবগণের দুরাক্রম্য কেশবকে গ্রহণ করিবার বাসনা করিতেছ। দেব, মনুষ্য, গন্ধর্ব্ব, অসুর ও উরগগণ

---

* কালীপ্রসন্নসিংহের প্রকাশিত অনুবাদ প্রশংসিত, এ জন্য সচরাচর আমি মূলের সহিত অনুবাদ না মিলাইয়াই অনুবাদ উদ্ধৃত করিয়াছি। কিন্তু কৃষ্ণের এই উক্তিতে কিছু অসঙ্গতি ঐ অনুবাদে দেখা যায়। যথা, যে কার্য্যের জন্য পাপভাগী হইতে হয় না, এক স্থানে বলিয়াছেন, সেই কার্য্যকে কয় ছত্র পরে পাপবুদ্ধিজনিত বলিতেছেন। এ জন্য মূলের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিলাম। মূলে তত অসঙ্গতি দেখা যায় না। মূল উদ্ধৃত করিতেছি—

যাঁহার সংগ্রাম সহ্য করিতে সমর্থ হয় না, তুমি কি সেই কেশবের পরিচয় পাও নাই? বৎস! হস্ত দ্বারা কখন বায়ু গ্রহণ করা যায় না; পাণিতল দ্বারা কখন পাবক স্পর্শ করা যায় না; মস্তক দ্বারা কখন মেদিনী ধারণ করা যায় না; এবং বল দ্বারাও কখন কেশবকে গ্রহণ করা যায় না।" তার পর বিদুরও দুর্য্যোধনকে ঐরূপ ভর্ৎসনা করিলেন। বিদুরের বাক্যাবসানে, বাসুদেব উচ্চহাস্য করিলেন। পরে সাত্যকি ও কৃতবর্ম্মার হস্তধারণপূর্ব্বক কুরুসভা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। এই পর্য্যন্ত মহাভারতে আখ্যাত ভগবদ্‌যান-বৃত্তান্ত সুসঙ্গত ও স্বাভাবিক; কোন গোলযোগ নাই। অতিপ্রকৃত কিছুই নাই, ও অবিশ্বাসের কারণও কিছু নাই। কিন্তু অঙ্গুলি-কণ্ডূয়ন-নিপীড়িত প্রক্ষিপ্তকারীর জাতিগোষ্ঠী ইহা কদাচ সহ্য করিতে পারেন না। এমন একটা মহদ্ব্যাপারের ভিতর একটা অনৈসর্গিক অদ্ভুত কাণ্ড না প্রবিষ্ট করাইলে কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব রক্ষা হয় কৈ? বোধ করি, এইরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া তাঁহারা কৃষ্ণের হাস্য ও নিষ্ক্রান্তির মধ্যে একটা বিশ্বরূপ প্রকাশ প্রক্ষিপ্ত করিয়াছেন। এই মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বের ভগবদ্গীতা-পর্ব্বাধ্যায়ে (তাহা প্রক্ষিপ্ত হউক বা না হউক) আর একবার বিশ্বরূপ প্রদর্শন বর্ণিত আছে। সেই বিশ্বরূপ-বর্ণনায় আর এই বর্ণনায় কি বিস্ময়কর প্রভেদ! গীতার একাদশের বিশ্বরূপবর্ণনা প্রথম শ্রেণীর কবির রচনা; সাহিত্য-জগৎ খুঁজিয়া বেড়াইলে তেমন আর কিছু পাওয়া দুর্লভ। আর ভগবদ্‌যান-পর্ব্বাধ্যায়ে এই বিশ্বরূপবর্ণনা যাঁহার রচিত, কাব্যরচনা তাঁহার পক্ষে বিড়ম্বনামাত্র। ভগবদ্গীতায় একাদশে পড়ি যে, ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন, "তোমা ব্যতিরেকে আর কেহই ইহা পূর্ব্বে নিরীক্ষণ করে নাই।" কিন্তু তৎপূর্ব্বেই এখানে দুর্য্যোধনাদি কৌরবসভাস্থ সমস্ত লোকেই বিশ্বরূপ নিরীক্ষণ করিল! ভগবান্ গীতার একাদশে আরও বলিতেছেন, "তোমা ব্যতিরেকে মনুষ্যলোকে আর কেহই বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান, দান, ক্রিয়াকলাপ, লয় ও অতি কঠোর তপস্যা দ্বারা আমার ঈদৃশ রূপ অবলোকন করিতে সমর্থ হয় না।" কিন্তু কুকবির হাতে পড়িয়া, এখানে বিশ্বরূপ যার তার প্রত্যক্ষীভূত হইল। গীতায় আরও কথিত হইয়াছে, "অনন্যসাধারণ ভক্তি প্রদর্শন করিলেই আমারে এইরূপে জ্ঞাত হইতে পারে, এবং আমারে দর্শন ও আমাতে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়।" কিন্তু এখানে দুষ্কৃতকারী পাপাত্মা ভক্তিশূন্য শত্রুগণও তাহা নিরীক্ষণ করিল।

নিষ্প্রয়োজনে কোন কর্ম্ম মূর্খেও করে না, যিনি বিশ্বরূপী, তাঁহার ত কথাই নাই। এখানে বিশ্বরূপ প্রকাশের কিছুমাত্র প্রয়োজন হয় নাই। দুর্য্যোধনাদি বলপ্রয়োগের পরামর্শ করিতেছিল, বলপ্রয়োগের কোন উদ্যম করে নাই। পিতা ও পিতৃব্য কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়া দুর্য্যোধন নিরস্তর হইয়াছিল। বলপ্রকাশের কোন উদ্যম করিলেও সে বল নিশ্চিত ব্যর্থ হইত, ইহা কৃষ্ণের অগোচর ছিল না। তিনি স্বয়ং এতাদৃশ বলশালী যে, বল দ্বারা কেহ তাঁহার নিগ্রহ করিতে পারে না। ধৃতরাষ্ট্র ইহা বলিলেন, বিদুর বলিলেন, এবং কৃষ্ণ নিজেও বলিলেন। কৃষ্ণের নিজের বল আত্মরক্ষায় প্রচুর না হইলেও কোন শঙ্কা ছিল না, কেন না, সাত্যকি, কৃতবর্ম্মা প্রভৃতি, মহাবলপরাক্রান্ত বৃষ্ণি-বংশীয়েরা তাঁহার সাহায্য জন্য উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদিগের সৈন্যও রাজদ্বারে যোজিত ছিল। দুর্য্যোধনের সৈন্য উপস্থিত থাকার কথা কিছু দেখা যায় না। অতএব বল দ্বারা নিগ্রহের চেষ্টা ফলবতী হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। সম্ভাবনার অভাবেও ভীত হন, কৃষ্ণ এরূপ কাপুরুষ নহেন। যিনি বিশ্বরূপ, তাঁহার এরূপ ভয়ের সম্ভাবনা নাই। অতএব বিশ্বরূপ

"রাজন্নেতে যদি ক্রুদ্ধা মাং নিগৃহ্নীয়ুরোজসা।
এতে বা মামহং বৈ তাননুজানীহি পার্থিব॥
এতান্ হি সর্ব্বান্ সংরব্ধান্নিয়ন্তুমহমুৎসহে।
ন চাহং নিন্দিতং কর্ম্ম কুর্য্যাং পাপং কথঞ্চন॥
পাণ্ডবার্থে হি লুভ্যন্তঃ স্বার্থান্ হাস্যন্তি তে সুতাঃ।
এতে চেদেবমিচ্ছন্তি কৃতকার্য্যো যুধিষ্ঠিরঃ॥
অদ্যৈব হ্যহমেনাংশ্চ যে চৈনানম্বু ভারত।
নিগৃহ্য রাজন্ পার্থেভ্যো দদ্যাং কিং দুষ্কৃতং ভবেৎ॥
ইদন্তু ন প্রবর্ত্তেয়ং নিন্দিতং কর্ম্ম ভারত।
সন্নিধৌ তে মহারাজ ক্রোধজং পাপবুদ্ধিজম্॥
এবং দুর্য্যোধনো রাজন্ যথেচ্ছতি তথাস্তু তৎ।
অহন্তু সর্ব্বাননুজানামি তে নৃপ॥"

"কিং দুষ্কৃতং ভবেৎ" ইতি বাক্যের অর্থ ঠিক "পাপভাগী হইতে হয় না," এমত নহে। কথার ভাব ইহাই বুঝা যাইতেছে যে, "দুর্য্যোধন আমাকে বদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছে; আমি যদি তাহাকে এখন বাঁধিয়া লইয়া যাই, তাহা হইলে কি এমন মন্দ কাজ হয়?" দুর্য্যোধনকে বদ্ধ করা মন্দ কাজ হয় না, কেন না অনেকের হিতের জন্য এক জনকে পরিত্যাগ করা শ্রেয়ঃ বলিয়া কৃষ্ণ স্বয়ংই ধৃতরাষ্ট্রকে পরামর্শ দিয়াছেন যে, ইহাকে বদ্ধ কর। তবে কৃষ্ণ এক্ষণে স্বয়ং একান্ত ক্রোধবশতঃই তিনি ইহা করিতেছেন, ইহা বুঝাইব। কেন না, এতক্ষণ তিনি নিজে তাহাকে বদ্ধ করিবার অভিপ্রায় করেন নাই। ক্রোধ যাহাতে প্রবর্ত্তিত করে, তাহা পাপবুদ্ধিজনিত, সুতরাং আদর্শ পুরুষের পক্ষে নিন্দিত ও পরিহার্য্য কর্ম্ম।

প্রকাশের কোন কারণ ছিল না। এ অবস্থায় ক্ষুদ্র বা দাম্ভিক ব্যক্তি ভিন্ন শত্রুকে ভয় দেখাইবার চেষ্টা করে না। যিনি বিশ্বরূপ, তিনি ক্রোধশূন্য এবং দম্ভশূন্য।

অতএব, এখানে বিশ্বরূপের কথাটা কুকবির প্রণীত অলীক উপন্যাস বলিয়া ত্যাগ করাই বিধেয়। আমি পুনঃ পুনঃ দেখাইয়াছি, মানুষী শক্তি অবলম্বন করিয়া কৃষ্ণ কর্ম্ম করেন, ঐশী শক্তি দ্বারা নহে। এখানে তাহার ব্যতিক্রম হইয়াছিল, এরূপ বিবেচনা করিবার কোন কারণ নাই।

কুরুসভা হইতে কৃষ্ণ কুন্তীসম্ভাষণে গেলেন। সেখান হইতে তিনি উপপ্লব্য নগরে, যেখানে পাণ্ডবেরা অবস্থান করিতেছিলেন, তথায় যাত্রা করিলেন। যাত্রাকালে কর্ণকে আপনার রথে তুলিয়া লইলেন।

যাহারা কৃষ্ণকে নিগ্রহ করিবার জন্য পরামর্শ করিতেছিল, কর্ণ তাহার মধ্যে। তবে কর্ণকে কৃষ্ণ স্বরথে আরোহণ করাইয়া চলিলেন কেন, তাহা পর পরিচ্ছেদে বলিব। সে কথায় কৃষ্ণচরিত্র পরিস্ফুট হয়। সাম ও দণ্ডনীতিতে কৃষ্ণের নীতিজ্ঞতা দেখিয়াছি। এক্ষণে ভেদনীতিতে তাঁহার পারদর্শিতা দেখিব। সেই সঙ্গে ইহাও দেখিব যে, কৃষ্ণ আদর্শ পুরুষ বটে, কেন না তাঁহার দয়া, জীবের হিতকামনা, এবং বুদ্ধি সকলই লোকাতীত।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

কৃষ্ণকর্ণসংবাদ

কৃষ্ণ সর্ব্বভূতে দয়াময়। এই মহাযুদ্ধজনিত যে অসংখ্য প্রাণিক্ষয় হইবে, তাহাতে আর কোন ক্ষত্রিয় ব্যথিত নহে, কেবল কৃষ্ণই ব্যথিত। যখন প্রথম বিরাট নগরে যুদ্ধের প্রস্তাব হয়, তখন কৃষ্ণ যুদ্ধের বিরুদ্ধে মত দিয়াছিলেন। অর্জ্জুন তাঁহাকে যুদ্ধে বরণ করিতে গেলে, কৃষ্ণ এ যুদ্ধে অস্ত্র ধরিবেন না ও যুদ্ধ করিবেন না প্রতিজ্ঞা করিলেন। কিন্তু তাহাতেও যুদ্ধ বন্ধ হইল না। অতএব উপায়ান্তর না দেখিয়া অবসাশূন্য হইয়াও সন্ধিস্থাপনের জন্য ধৃতরাষ্ট্র-সভায় গেলেন। তাহাতেও কিছু হইল না। প্রাণিহত্যা নিবারণ হয় না। তখন রাজনীতিজ্ঞ কৃষ্ণ জনসমূহের রক্ষার্থ উপায়ান্তর উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হইলেন।

কর্ণ মহাবীরপুরুষ। তিনি অর্জ্জুনের সমকক্ষ রথী। তাঁহার বাহুবলেই দুর্য্যোধন আপনাকে বলবান্ মনে করেন। তাঁহার বলের উপর নির্ভর করিয়াই প্রধানতঃ তিনি পাণ্ডবদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত। কর্ণের সাহায্য না পাইলে তিনি কদাচ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন না। কর্ণকে তাঁহার শত্রুপক্ষের সাহায্যে প্রবৃত্ত দেখিলে অবশ্যই তিনি যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইবেন। যাহাতে তাহা ঘটে, তাহা করিবার জন্য কর্ণকে কৃষ্ণ আপনার রথে তুলিয়া লইলেন। বিরলে কর্ণের সঙ্গে কথোপকথন আবশ্যক।

কৃষ্ণের এই অভিপ্রায়সিদ্ধির উপযোগী অন্যের অজ্ঞাত সহজ উপায়ও ছিল।

কর্ণ অধিরথনামা সূতের পুত্র বলিয়া পরিচিত। বস্তুতঃ তিনি অধিরথের পুত্র নহেন—পালিত পুত্র মাত্র। তাহা তিনি জানিতেন না। তাঁহার নিজ জন্মবৃত্তান্ত তিনি অবগত ছিলেন না। তিনি সূতপত্নী রাধার গর্ভজাত না হইয়া কুন্তীর গর্ভজাত, সূর্য্যের ঔরসে তাঁহার জন্ম। তবে কুন্তীর কন্যাকালে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল বলিয়া কুন্তী, পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবার পরেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ তিনি যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণের সহোদর ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। এ কথা কুন্তী ভিন্ন আর কেহই জানিত না। আর কৃষ্ণ জানিতেন। তাঁহার অলৌকিক বুদ্ধির নিকটে সকল কথাই সহজে প্রতিভাত হইত। কুন্তী তাঁহার পিতৃস্বসা; ভোজরাজগৃহে এ ঘটনা হয়, অতএব কৃষ্ণ মনুষ্যবুদ্ধিতেই ইহা জানিতে পারা অসম্ভব নহে।

কৃষ্ণ এই কথা এক্ষণে রথারূঢ় কর্ণকে শুনাইলেন। বলিলেন, "শাস্ত্রজ্ঞেরা কহেন, যিনি যে কন্যার পাণিগ্রহণ করেন, তিনি সেই কন্যার সহোঢ় ও কানীন পুত্রের পিতা। হে কর্ণ! তুমিও তোমার জননীর কন্যাকালাবস্থায় সমুৎপন্ন হইয়াছ, তন্নিমিত্ত তুমি ধর্ম্মতঃ পুত্র; অতএব চল, ধর্ম্মশাস্ত্রের বিরুদ্ধেও *

---

* "বিরুদ্ধে" এই পদটি কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদে আছে, কিন্তু ইহা এখানে অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। আমার কাছে মূল মহাভারত যাহা আছে, তাহাতে দেখিলাম, "নিগ্রহাদ্ধর্মশাস্ত্রাণাম্" আছে। বোধ হয়, "নিগ্রহার্থধর্মশাস্ত্রাণাম্" হইবে। তাহা হইলে সঙ্গত হয়।

এই অংশ ছাপা হওয়ার পর জানিতে পারিলাম যে, ইহার অন্যতর পাঠও আছে, যথা—"নিগ্রহাদ্ধর্ম্মশাস্ত্রাণাম্" এ স্থলে নিগ্রহ অর্থে মর্য্যাদা, যথা—নিগ্রহো ভর্ৎসনেঽপি স্যাৎ মর্য্যাদায়াঞ্চ বন্ধনে।"

ইতি মেদিনী।

"নিগ্রহো ভর্ৎসনে প্রোক্তো মর্য্যাদায়াঞ্চ বন্ধনে।"

ইতি বিশ্বঃ।

"নিয়মেন বিধিনা গ্রহণং নিগ্রহঃ।"

ইতি চিন্তামণিঃ।

তুমি রাজ্যেশ্বর হইবে।” তিনি কর্ণকে বুঝাইয়া দিলেন যে, তিনি জ্যেষ্ঠ, এ জন্য তিনিই রাজা হইবেন, অপর পঞ্চপাণ্ডব তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া তাঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিবে।

কৃষ্ণের এই পরামর্শ সর্ব্বজনের ধর্ম্মবৃদ্ধিকর ও হিতকর। প্রথমতঃ কর্ণের পক্ষে হিতকর, কেন না তিনি রাজ্যেশ্বর হইবেন এবং তাঁহার পক্ষে ধর্ম্মানুমত, কেন না, ভ্রাতৃগণের প্রতি শত্রুভাব পরিত্যাগ করিয়া মিত্রভাব অবলম্বন করিবেন। ইহা দুর্য্যোধনাদির পক্ষেও পরম হিতকর। কেন না, যুদ্ধ হইলে তাঁহারা কেবল রাজ্যভ্রষ্ট নহে, সবংশে নিপাতপ্রাপ্ত হইবারই সম্ভাবনা। যুদ্ধ না হইলে তাঁহাদের প্রাণও বজায় থাকিবে, রাজ্যও বজায় থাকিবে, কেবল পাণ্ডবের ভাগ ফিরাইয়া দিতে হইবে। ইহাতে পাণ্ডবদিগেরও হিত ও ধর্ম্ম, কেন না, যুদ্ধরূপ নৃশংস ব্যাপারে প্রবৃত্ত না হইয়া, আত্মীয় স্বজন জ্ঞাতি বধ না করিয়াও স্বরাজ্য কর্ণের সহিত ভোগ করিবেন। আর এ পরামর্শের পরম ধর্ম্ম্যতা ও হিতকারিতা এই যে, ইহা দ্বারা অসংখ্য মনুষ্যগণের প্রাণরক্ষা হইতে পারিবে।

কর্ণ কৃষ্ণের কথার উপযোগিতা স্বীকার করিলেন। তিনিও বুঝিয়াছিলেন যে, এ যুদ্ধে দুর্য্যোধনাদির রক্ষা নাই। কিন্তু কৃষ্ণের কথায় সম্মত হইলে তাঁহাকে কোন কোন গুরুতর অপরাধে অপরাধী হইতে হয়। অধিরথ ও রাধা তাঁহাকে প্রতিপালন করিয়াছে। তাহাদের আশ্রয়ে থাকিয়া তিনি সূতবংশে বিবাহ করিয়াছেন, এবং সেই ভার্য্যা হইতে তাঁহার পুত্র পৌত্রাদি জন্মিয়াছে। তাঁহাদিগকে কোনমতেই কর্ণ পরিত্যাগ করিতে পারেন না। আর তিনি ত্রয়োদশ বৎসর দুর্য্যোধনের আশ্রয়ে থাকিয়া রাজ্যভোগ করিয়াছেন; দুর্য্যোধন তাঁহারই ভরসা করেন; এখন দুর্য্যোধনকে পরিত্যাগ করিয়া পাণ্ডবপক্ষে গেলে লোকে তাঁহাকে কৃতঘ্ন, পাণ্ডবদিগের ঐশ্বর্য্যলোলুপ বা তাঁহাদের ভয়ে ভীত কাপুরুষ বলিবে। এ জন্য কর্ণ কোনমতেই কৃষ্ণের কথায় সম্মত হইলেন না।

কৃষ্ণ বলিলেন, “যখন আমার কথা তোমার হৃদয়ঙ্গম হইল না, তখন নিশ্চয়ই এই বসুন্ধরার সংহার-দশা সমুপস্থিত হইয়াছে।”

কর্ণ উপযুক্ত উত্তর দিয়া কৃষ্ণকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বিষণ্ণভাবে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

কৃষ্ণচরিত্র বুঝিবার জন্য কর্ণচরিত্রের বিস্তারিত সমালোচনার প্রয়োজন নাই। এ জন্য আমি তৎসম্বন্ধে কিছু বলিলাম না। কর্ণচরিত্র অতি মহৎ ও মনোহর।

নবম পরিচ্ছেদ

উপসংহার

কৃষ্ণ উপপ্লব্য নগরে ফিরিয়া আসিলে, যুধিষ্ঠিরাদি জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি হস্তিনাপুরে কি করিয়াছিলে, বল।”

কৃষ্ণ নিজে যাহা বলিয়াছিলেন, এবং অন্যে যাহা বলিয়াছিল, তাই বলিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই সকল বক্তৃতার পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে যেরূপ বর্ণনা দেখিয়াছি, এখানে তাহার সহিত মিল নাই। কিছুর সঙ্গে কিছু মিলে না। মিলিলে দোষ পুনরুক্তি ঘটিত। তাহা হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য কোন মহাপুরুষ কিছু নূতন রকম বসাইয়া দিয়াছেন বোধ হয়।

এইখানে ভগবদ্‌যানপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত। তার পর সৈন্যনির্য্যাণপর্ব্বাধ্যায়। ইহাতে বিশেষ কথা কিছু নাই। কতকগুলা মৌলিক কথা আছে; কতকগুলা কথা অলৌকিক বলিয়া বোধ হয়; কৃষ্ণসম্বন্ধীয় কথা বড় অল্প। কৃষ্ণের ও অর্জ্জুনের পরামর্শানুসারে পাণ্ডবেরা ধৃষ্টদ্যুম্নকে সেনাপতি নিযুক্ত করিলেন, এবং বলরাম মদ খাইয়া আসিয়া কৃষ্ণকে কিছু মিষ্ট ভর্ৎসনা করিলেন, কেন না, তিনি কুরুপাণ্ডবকে সমান জ্ঞান করেন না। কুরুসভায় যাহা ঘটিয়াছিল, সে কথাও কিছু হইল। ইহা ভিন্ন আর কিছু নাই।

তাহার পর উলূকদূতাগমন-পর্ব্বাধ্যায়। এটি নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। ইহাতে আর কিছুই নাই, কেবল উভয়পক্ষের গালিগালাজ। দুর্য্যোধন শকুনি প্রভৃতির পরামর্শে উলূককে পাণ্ডবদিগের নিকট পাঠাইলেন। উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে, কেবল পাণ্ডব-দিগকে ও কৃষ্ণকে খুব গালিগালাজ করা। উলূক আসিয়া ছয় জনকেই খুব গালিগালাজ করিল। পাণ্ডবেরা উত্তরে খুবই গালিগালাজ করিলেন। কৃষ্ণ বড় কিছু বলিলেন না, তাঁহার ন্যায় রোষামর্ষশূন্য ব্যক্তি গালিগালাজ করে না। বরং একটা রাগারাগি বাড়া-বাড়ি যাহাতে না হয়, এই অভিপ্রায়ে পাণ্ডবেরা উত্তর করিবার আগেই তিনি উলূককে বিদায় করিবার চেষ্টা করিলেন। বলিলেন, “তুমি শীঘ্র গমন করিয়া দুর্য্যোধনকে কহিবে, পাণ্ডবেরা তোমার বাক্য শ্রবণ ও তাহার যথার্থ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। এক্ষণে তোমার যেরূপ অভিপ্রায়, তাহাই হইবে।” অথচ গালিগালাজটা কৃষ্ণার্জ্জুনের ভাগেই বেশী রকম হইয়াছিল।

কিন্তু উলূকের দুর্ব্বুদ্ধি, উলূক ছাড়ে না। আবার গালিগালাজ আরম্ভ করিল। না হইবে কেন? ইনি দুর্য্যোধনের সহোদর। তখন পাণ্ডবেরা একে একে উলূকের উত্তর দিলেন। উলূককে খুব সমেত আসল

ফিরাইয়া দিলেন। কৃষ্ণও একটা কথা বলিলেন। "আমি অর্জ্জুনের সারথ্য স্বীকার করিয়াছি বলিয়া যুদ্ধ করিব না, ইহা মনে স্থির করিয়া ভীত হইতেছ না; কিন্তু যেমন হুতাশনে তৃণসকল ভস্মসাৎ করে, তদ্রূপ আমিও চরমকালে ক্রোধভরে সমস্ত পার্থিবগণকে সংহার করিব সন্দেহ নাই।"

উলূকদূতাগমন-পর্ব্বাধ্যায়ে মহাভারতের কার্য্যের পক্ষে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। ইহাতে রচনার নৈপুণ্য বা কবিত্ব নাই। এবং কোন কোন স্থা মহাভারতের অন্যান্যাংশের সহিত বিরুদ্ধভাবাপন্ন অনুক্রমণিকাধ্যায়ে সঞ্জয় এবং কৃষ্ণের দৌত্যের কথ আছে, কিন্তু উলূকদূতের কথা নাই। এই সকল কারে ইহাকে আদিমভারতান্তর্গত বিবেচনা করি না।

ইহার পর রথাতিরথসংখ্যান, এবং তৎপর অম্বোপাখ্যানপর্ব্বাধ্যায়। এ সকলে কৃষ্ণবৃত্তান্ত কিছু নাই। এইখানে উদ্যোগপর্ব্ব সমাপ্ত।

লোকরহস্য

[তৃতীয় সংস্করণ হইতে]

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপন

লোকরহস্যের দ্বিতীয় সংস্করণে অর্দ্ধেক পুরাতন ও অর্দ্ধেক নূতন। সতেরটি প্রবন্ধে মধ্যে আটটি নূতন, আটটি পুরাতন; এবং একটি রামায়ণের সমালোচন পুরাতন হইলেও নূ করিয়া লিখিত হইয়াছে। সকলগুলি 'বঙ্গদর্শন' ও 'প্রচার' হইতে পুনর্মুদ্রিত।

লোকরহস্য

ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গুল

একদা, সুন্দরবনমধ্যে ব্যাঘ্রদিগের মহাসভা সমবেত হইয়াছিল। নিবিড় বনমধ্যে প্রশস্ত ভূমিখণ্ডে ভীমাকৃতি বহুতর ব্যাঘ্র লাঙ্গুলে ভর করিয়া, দংষ্ট্রাপ্রভায় অরণ্যপ্রদেশ আলোকময় করিয়া, সারি সারি উপবেশন করিয়াছিল। সকলে একমত হইয়া অমিতোদর নামে এক অতি প্রাচীন ব্যাঘ্রকে সভাপতি করিলেন। অমিতোদর মহাশয় লাঙ্গুলাসন গ্রহণ পূর্ব্বক, সভার কার্য্য আরম্ভ করিলেন। তিনি সভ্যদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন ;—

"অদ্য আমাদিগের কি শুভ দিন! অদ্য আমরা যত অরণ্যবাসী মাংসাভিলাষী ব্যাঘ্রকুলতিলক সকল পরস্পরের মঙ্গলসাধনার্থ এই অরণ্যমধ্যে একত্রিত হইয়াছি। আহা! কুৎসাকারী, খলস্বভাব অন্যান্য পশুবর্গে রটনা করিয়া থাকে যে, আমরা বড় অসামাজিক, একা একা বনেই বাস করিতে ভালবাসি, আমাদের মধ্যে ঐক্য নাই। কিন্তু অদ্য আমরা সমস্ত সুসভ্য ব্যাঘ্রমণ্ডলী একত্রিত হইয়া সেই অমূলক নিন্দাবাদের নিরাস করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এক্ষণে সভ্যতার যেরূপ দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, তাহাতে আমার সম্পূর্ণ আশা আছে যে, শীঘ্রই ব্যাঘ্রেরা সভ্যজাতির অগ্রগণ্য হইয়া উঠিবে। এক্ষণে বিধাতার নিকট প্রার্থনা করি যে, আপনারা দিন দিন এইরূপ জাতিহিতৈষিতা প্রকাশ পূর্ব্বক পরম সুখে নানাবিধ পশুহনন করিতে থাকুন।"

(সভামধ্যে লাঙ্গুলচট্‌চটারব।)

"এক্ষণে হে ভ্রাতৃবৃন্দ! আমরা যে প্রয়োজনসম্পাদনার্থ সমবেত হইয়াছি, তাহা সংক্ষেপে বিবৃত করি। আপনারা সকলেই অবগত আছেন যে, এই সুন্দরবনের ব্যাঘ্রসমাজে বিদ্যার চর্চ্চা ক্রমে লোপ পাইতেছে। আমাদিগের বিশেষ অভিলাষ হইয়াছে, আমরা বিদ্বান্ হইব, কেন না, আজি কালি সকলেই বিদ্বান্ হইতেছে। আমরাও হইব। বিদ্যার আলোচনার জন্য এই ব্যাঘ্রসমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে। এক্ষণে আমার বক্তব্য এই যে, আপনারা ইহার অনুমোদন করুন।"

সভাপতির এই বক্তৃতা সমাপ্ত হইলে, সভ্যগণ হাঁউমাউ শব্দে এই প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন। তখন যথারীতি কয়েকটি প্রস্তাব পঠিত এবং অনুমোদিত হইয়া সভ্যগণ কর্তৃক গৃহীত হইল। প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘ দীর্ঘ বক্তৃতা হইল, সে সকল ব্যাকরণশুদ্ধ এবং অলঙ্কারবিশিষ্ট বটে, তাহাতে শব্দবিন্যাসের ছটা বড় ভয়ঙ্কর ; বক্তৃতার চোটে সুন্দরবন কাঁপিয়া গেল।

পরে সভার অন্যান্য কার্য্য হইলে, সভাপতি বলিলেন, "আপনারা জানেন যে, এই সুন্দরবনে বৃহল্লাঙ্গুল নামে এক অতি পণ্ডিত-ব্যাঘ্র বাস করেন। অদ্য রাত্রে তিনি আমাদিগের অনুরোধে মনুষ্যচরিত্র সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিতে স্বীকার করিয়াছেন।"

মনুষ্যের নাম শুনিয়া কোন কোন নবীন সভ্য ক্ষুধা বোধ করিলেন। কিন্তু তৎকালে পবলিক ডিনরের সূচনা না দেখিয়া নীরব হইয়া রহিলেন। ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গুল মহাশয় সভাপতি কর্তৃক আহূত হইয়া গর্জ্জনপূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিলেন ; এবং পথিকের ভীতিবিধায়ক স্বরে নিম্নলিখিত প্রবন্ধটি পাঠ করিলেন,—

"সভাপতি মহাশয়! বাঘিনীগণ এবং ভদ্র ব্যাঘ্রগণ! মনুষ্য এক প্রকার দ্বিপদ জন্তু। তাহারা পক্ষবিশিষ্ট নহে, সুতরাং তাহাদিগকে পাখী বলা যায় না। বরং চতুষ্পদগণের সঙ্গে তাহাদের সাদৃশ্য আছে। চতুষ্পদগণের যে যে অঙ্গ আছে, মনুষ্যেরও সেইরূপ আছে। অতএব মনুষ্যদিগকে এক প্রকার চতুষ্পদ বলা যায়। প্রভেদ এই যে, চতুষ্পদের যেরূপ গঠনের পারিপাট্য, মানুষের তাদৃশ নাই। কেবল ঈদৃশ প্রভেদের জন্য আমাদিগের কর্তব্য নহে যে, আমরা মনুষ্যকে দ্বিপদ বলিয়া ঘৃণা করি।

চতুষ্পদমধ্যে বানরদিগের সঙ্গে মনুষ্যগণের বিশেষ সাদৃশ্য। পণ্ডিতেরা বলেন যে, কালক্রমে পশুদিগের অবয়বের উৎকর্ষ জন্মিতে থাকে ; এক অবয়বের পশু ক্রমে অন্য উৎকৃষ্টতর পশুর আকার প্রাপ্ত হয়। আমাদিগের ভরসা আছে যে, মনুষ্যপশুও কালপ্রভাবে লাঙ্গুলাদিবিশিষ্ট হইয়া ক্রমে বানর হইয়া উঠিবে।

মনুষ্য-পশু যে অত্যন্ত সুখাদ্য এবং সুভক্ষ্য, তাহা আপনারা বোধ হয়, সকলেই অবগত আছেন। (শুনিয়া সভ্যগণ সকলে আপন আপন মুখ চাটিলেন।) তাহারা সচরাচর অনায়াসেই মারা পড়ে। মৃগাদির ন্যায়

তাহারা দ্রুত পলায়নে সক্ষম নহে, অথচ মহিষাদির ন্যায় বলবান্ বা শৃঙ্গাদি-আয়ুধযুক্ত নহে। জগদীশ্বর এই জগৎ-সংসার ব্যাঘ্রজাতির সুখের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন সন্দেহ নাই। সেই জন্য ব্যাঘ্রের উপাদেয় ভোজ্য পশুকে পলায়নের বা আত্মরক্ষার ক্ষমতা পর্য্যন্ত দেন নাই। বাস্তবিক মনুষ্যজাতি যেরূপ অরক্ষিত—নখ-দন্ত শৃঙ্গাদি-বর্জ্জিত, গমনে মন্থর এবং কোমল-প্রকৃতি, তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয় যে, কি জন্য ঈশ্বর ইহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন। ব্যাঘ্রজাতির সেবা ভিন্ন ইহাদিগের জীবনের আর কোন উদ্দেশ্য দেখা যায় না।

এই সকল কারণে, বিশেষ তাহাদিগের মাংসের কোমলতা হেতু, আমরা মনুষ্যজাতি বড় ভালবাসি। দৃষ্টিমাত্রেই ধরিয়া খাই। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাহারাও বড় ব্যাঘ্রভক্ত। এই কথায় যদি আপনারা বিশ্বাস না করেন, তবে তাহার উদাহরণস্বরূপ আমার যাহা ঘটিয়াছিল, তদ্বৃত্তান্ত বলি। "আপনারা অবগত আছেন, আমি বহুকালাবধি দেশভ্রমণ করিয়া বহুদর্শী হইয়াছি। আমি যে দেশে প্রবাসে ছিলাম, সে দেশ এই ব্যাঘ্রভূমি সুন্দরবনের উত্তরে আছে। তথায় গো-মনুষ্যাদি ক্ষুদ্রাশয় অহিংস্র পশুগণই বাস করে। তথাকার মনুষ্য দ্বিবিধ; এক জাতি কৃষ্ণবর্ণ, এক জাতি শ্বেতবর্ণ। একদা আমি সেই দেশে বিষয়কর্ম্মোপলক্ষে গমন করিয়াছিলাম।"

শুনিয়া মহাদংষ্ট্রা নামে একজন উদ্ধতস্বভাব ব্যাঘ্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বিষয়কর্ম্মটা কি?"

বৃহল্লাঙ্গুল মহাশয় কহিলেন, "বিষয়কর্ম্ম, আহারান্বেষণ; এখন সভ্যলোকে আহারান্বেষণকে বিষয়কর্ম্ম বলে। ফলে সকলেই যে আহারান্বেষণকে বিষয়কর্ম্ম বলে, এমত নহে। সম্ভ্রান্ত লোকের আহারান্বেষণের নাম বিষয়কর্ম্ম, অসম্ভ্রান্তের আহারান্বেষণের নাম জুয়াচুরি, উঞ্ছবৃত্তি এবং ভিক্ষা। ধূর্ত্তের আহার অন্বেষণের নাম চুরি; বলবানের আহারান্বেষণ দস্যুতা, লোক-বিশেষে দস্যুতা শব্দ ব্যবহার হয় না; তৎপরিবর্ত্তে বীরত্ব বলিতে হয়। যে দস্যুর দণ্ডপ্রণেতা আছে, সেই দস্যুর কার্য্যের নাম দস্যুতা, যে দস্যুর দণ্ডপ্রণেতা নাই, তাহার দস্যুতার নাম বীরত্ব। আপনারা, যখন সভ্যসমাজে অধিষ্ঠিত হইবেন, তখন এই সকল নাম-বৈচিত্র্য স্মরণ রাখিবেন, নচেৎ লোকে অসভ্য বলিবে। বস্তুতঃ আমার বিবেচনায় এত বৈচিত্র্যের প্রয়োজন নাই; এক উদরপূজা নাম রাখিলেই বীরত্বাদি সকলই বুঝাইতে পারে।

সে যাহাই হউক, যাহা বলিতেছিলাম শ্রবণ করুন;—"মনুষ্যেরা বড় ব্যাঘ্রভক্ত। আমি একদা মনুষ্যবসতি মধ্যে বিষয়কর্ম্মোপলক্ষে গিয়াছিলাম। শুনিয়াছেন, কয়েক বৎসর হইল, এই সুন্দরবনে পোর্ট ক্যানিং কোম্পানী স্থাপিত হইয়াছিল।"

মহাদংষ্ট্রা পুনরায় বক্তৃতা বন্ধ করাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "পোর্ট ক্যানিং কোম্পানী কিরূপ জন্তু?"

বৃহল্লাঙ্গুল কহিলেন, "তাহা আমি সবিশেষ অবগত নহি। ঐ জন্তুর আকার, হস্তপদাদি কিরূপ, জিঘাংসাই বা কেমন ছিল, ঐ সকল আমরা অবগত নহি। শুনিয়াছি, ঐ পশু মনুষ্যের প্রতিষ্ঠিত; মনুষ্যদিগেরই হৃদয়শোণিত পান করিত এবং তাহাতে বড় মোটা হইয়া মরিয়া গিয়াছে। মনুষ্যজাতি অত্যন্ত অপরিণাম-দর্শী। আপন আপন বধোপায় সর্ব্বদাই আপনারাই সৃজন করিয়া থাকে। মনুষ্যেরা যে সকল অস্ত্রাদি ব্যবহার করিয়া থাকে, সেই সকল অস্ত্রই এ কথার প্রমাণ। মনুষ্যবধই ঐ সকল অস্ত্রের উদ্দেশ্য। শুনিয়াছি, কখন কখন সহস্র সহস্র মনুষ্য প্রান্তরমধ্যে সমবেত হইয়া ঐ সকল অস্ত্রাদির দ্বারা পরস্পর প্রহার করিয়া বধ করে। আমার বোধ হয়, মনুষ্যগণ পরস্পরের বিনাশার্থ এই 'পোর্ট ক্যানিং কোম্পানী' নামক রাক্ষসের সৃজন করিয়াছিল। সে যাহাই হউক, আপনারা স্থির হইয়া এই মনুষ্যবৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। মধ্যে মধ্যে রসভঙ্গ করিয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে বক্তৃতা হয় না। সভ্যজাতিদিগের এরূপ নিয়ম নহে। আমরা এক্ষণে সভ্য হইয়াছি, সকল কাজে সভ্যদিগের নিয়ম অনুসারে চলা ভাল।

আমি একদা সেই 'পোর্ট ক্যানিং কোম্পানীর' বাসস্থান মাতলায় বিষয়কর্ম্মোপলক্ষে গিয়াছিলাম। তথায় এক বংশমণ্ডপ-মধ্যে একটা কোমল মাংসযুক্ত নৃত্যশীল ছাগবৎস দৃষ্টি করিয়া তদাস্বাদনার্থ মণ্ডপ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম। ঐ মণ্ডপ ভৌতিক—পশ্চাৎ জানিয়াছি মনুষ্যেরা উহাকে ফাঁদ বলে। আমার প্রবেশমাত্র আপনা হইতে তাহার দ্বার রুদ্ধ হইল। কতক-গুলি মনুষ্য তৎপরে সেইখানে উপস্থিত হইল। তাহারা আমার দর্শন পাইয়া পরমানন্দিত হইল এবং আহ্লাদসূচক চীৎকার, হাস্য-পরিহাসাদি করিতে লাগিল। তাহারা যে আমার ভূয়সী প্রশংসা করিতে-ছিল, তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম। কেহ আমার রূপের, কেহ নখের, কেহ লাঙ্গুলের গুণগান করিতে লাগিল এবং অনেকে আমার উপর প্রীত হইয়া, পত্নীর সহোদরকে যে সম্বোধন করে, আমাকে সেই প্রিয় সম্বোধন করিল। পরে তাহারা ভক্তিভাবে আমাকে মণ্ডপ-সমেত স্কন্ধে বহন করিয়া, এক শকটের উপর উঠাইল। দুই অমলশ্বেতকান্তি বলদ ঐ শকট বহন করিতেছিল। তাহাদিগকে দেখিয়া আমার বড় ক্ষুধার উদ্রেক হইল। কিন্তু তৎকালে ভৌতিক মণ্ডপ

হইতে বাহির হইবার উপায় ছিল না, এ জন্য অর্দ্ধভুক্ত ছাগে তাহা পরিতৃপ্ত করিলাম। আমি সুখে শকটারোহণ করিয়া ছাগমাংস ভক্ষণ করিতে করিতে এক নগরবাসী শ্বেতবর্ণ মনুষ্যের আবাসে উপস্থিত হইলাম। সে আমার সম্মানার্থ স্বয়ং দ্বারদেশে আসিয়া আমার অভ্যর্থনা করিল এবং লৌহদণ্ডাদিভূষিত এক সুরম্য গৃহমধ্যে আমার অবস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিল। তথায় সজীব বা সদ্যোহত ছাগ-মেষ-গবাদির উপাদেয় মাংসশোণিতের দ্বারা আমার সেবা করিত, অন্যান্য দেশ-বিদেশীয় বহুতর মনুষ্য আমাকে দর্শন করিতে আসিত, আমিও বুঝিতে পারিতাম যে, উহারা আমাকে দেখিয়া চরিতার্থ হইত।

আমি বহুকাল ঐ লৌহজালাবৃত প্রকোষ্ঠে বাস করিলাম। ইচ্ছা ছিল না যে, সে সুখ ত্যাগ করিয়া আর ফিরিয়া আসি। কিন্তু স্বদেশ-বাৎসল্য প্রযুক্ত থাকিতে পারিলাম না। আহা! যখন এই জন্মভূমি আমার মনে পড়িত, তখন আমি হাউ হাউ করিয়া ডাকিতে থাকিতাম। হে মাতঃ সুন্দরবন! আমি কি তোমাকে কখন ভুলিতে পারিব? আহা! তোমাকে যখন মনে পড়িত, তখন আমি ছাগমাংস ত্যাগ করিতাম, মেষমাংস ত্যাগ করিতাম। (অর্থাৎ অস্থি এবং চর্ম্মমাত্র ত্যাগ করিতাম)—এবং সর্ব্বদা লাঙ্গুলাঘাতের দ্বারা আপনার অন্তঃকরণের চিন্তা লোককে জানাইতাম। হে জন্মভূমি! যত দিন আমি তোমাকে দেখি নাই, তত দিন ক্ষুধা না পাইলে খাই নাই, নিদ্রা না আসিলে নিদ্রা যাই নাই। দুঃখের অধিক পরিচয় আর কি দিব, পেটে যাহা ধরিত, তাহাই খাইতাম, তাহার উপর আর দুই চারি সের মাংস খাইতাম। আর খাইতাম না।"

তখন বৃহল্লাঙ্গুল মহাশয় জন্মভূমির প্রেমে অভিভূত হইয়া অনেকক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন। বোধ হইল, তিনি অশ্রুপাত করিতেছিলেন, এবং দুই এক বিন্দু স্বচ্ছ ধারাপতনের চিহ্ন ভূতলে দেখা গিয়াছিল। কিন্তু কতিপয় যুবা ব্যাঘ্র তর্ক করেন যে, সে বৃহল্লাঙ্গুলের অশ্রুপতনের চিহ্ন নহে। মনুষ্যালয়ের প্রচুর আহারের কথা স্মরণ হইয়া সেই ব্যাঘ্রের মুখে লাল পড়িয়াছিল।

লেক্‌চারার তখন ধৈর্য্য প্রাপ্ত হইয়া পুনরপি বলিতে আরম্ভ করিলেন, "কি প্রকারে আমি সেই স্থান ত্যাগ করিলাম, তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই। আমার অভিপ্রায় বুঝিয়াই হউক, আর ভুলক্রমেই হউক, আমার ভৃত্য একদিন আমার মন্দির-মার্জ্জনান্তে, দ্বার মুক্ত রাখিয়া গিয়াছিল। আমি সেই দ্বার দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়া উদ্যানরক্ষককে মুখে করিয়া লইয়া চলিয়া আসিলাম।

এই সকল বৃত্তান্ত সবিস্তারে বলার কারণ এই যে, আমি বহুকাল মনুষ্যালয়ে বাস করিয়া আসিয়াছি—মনুষ্যচরিত্র সবিশেষ অবগত আছি—শুনিয়া আপনারা আমার কথায় বিশেষ আস্থা করিবেন, সন্দেহ নাই। আমি যাহা দেখিয়াছি, তাহাই বলিব। অন্য পর্য্যটকদিগের ন্যায় অমূলক উপন্যাস আমরা চিরকাল শুনিয়া আসিতেছি, আমি সে সকল কথায় বিশ্বাস করি না। আমরা পূর্ব্বাপর শুনিয়া আসিতেছি যে, মনুষ্যেরা ক্ষুদ্রজীব হইয়াও পর্ব্বতাকার বিচিত্র গৃহ নির্ম্মাণ করে। ঐরূপ পর্ব্বতাকার গৃহে তাহারা বাস করে বটে, কিন্তু কখন তাহাদিগকে ঐরূপ গৃহ নির্ম্মাণ করিতে আমি চক্ষে দেখি নাই। সুতরাং তাহারা যে ঐরূপ গৃহ স্বয়ং নির্ম্মাণ করিয়া থাকে, ইহার প্রমাণাভাব। আমার বোধ হয়, তাহারা যে সকল গৃহে বাস করে, তাহা প্রকৃত পর্ব্বত বটে, স্বভাবের সৃষ্টি; তবে তাহা বহু গুহাবিশিষ্ট দেখিয়া বুদ্ধিজীবী মনুষ্যপশু তাহাতে আশ্রয় করিয়াছে।*

মনুষ্যজন্তু উভয়াহারী। তাহারা মাংসভোজী এবং ফলমূলও আহার করে। বড় বড় গাছ খাইতে পারে না। ছোট ছোট গাছ সমূলে আহার করে। মনুষ্যেরা ছোট গাছ এত ভালবাসে যে, আপনারা তাহা চাষ করিয়া ঘেরিয়া রাখে। ঐরূপ রক্ষিত ভূমিকে ক্ষেত বা বাগান বলে। এক মনুষ্যের বাগানে অন্য মনুষ্য চরিতে পায় না।

মনুষ্যেরা ফলমূল লতা-গুল্মাদি ভোজন করে বটে, কিন্তু ঘাস খায় কি না, বলিতে পারি না। কখন কোন মনুষ্যকে ঘাস খাইতে দেখি নাই। কিন্তু এ বিষয়ে আমার এক সংশয় আছে। শ্বেতবর্ণ মনুষ্যেরা এবং কৃষ্ণবর্ণ ধনবান্ মনুষ্যেরা বহুযত্নে আপন আপন উদ্যানে ঘাস তৈয়ার করে। আমার বিবেচনায় উহারা ঐ ঘাস খাইয়া থাকে। নহিলে ঘাসে তাহাদের এত যত্ন কেন? এরূপ আমি একজন কৃষ্ণবর্ণ মনুষ্যের মুখে শুনিয়াছিলাম। সে বলিতেছিল, দেশটা উচ্ছন্ন গেল—যত সাহেব সুবো বড়মানুষে ব'সে ব'সে ঘাস খাইতেছে। সুতরাং প্রধান মনুষ্যেরা যে ঘাস খায়, তাহা এক প্রকার নিশ্চয়।

---

* পাঠক মহাশয় বৃহল্লাঙ্গুলের ন্যায়শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি দেখিয়া বিস্মিত হইবেন না। এইরূপ তর্কে মোক্ষমূলর স্থির করিয়াছেন যে, প্রাচীন ভারতবর্ষীয়েরা লিখিতে জানিতেন না। এরূপ তর্কে জেমস মিল স্থির করিয়াছেন যে, প্রাচীন ভারতবর্ষীয়েরা অসভ্য জাতি এবং সংস্কৃত ভাষা অসভ্য ভাষা, বস্তুতঃ এই ব্যাঘ্রপণ্ডিতে এবং মনুষ্যপণ্ডিতে অনেক বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না।

কোন মনুষ্য বড় ক্রুদ্ধ হইলে বলিয়া থাকে, 'আমি কি ঘাস খাই ?' আমি জানি, মনুষ্যদিগের স্বভাব এই, তাহারা যে কাজ করে, অতি যত্নে তাহা গোপন করে। অতএব যেখানে তাহারা ঘাস খাওয়ার কথায় রাগ করে, তখন অবশ্য সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, তাহারা ঘাস খাইয়া থাকে।

মনুষ্যেরা পশু-পূজা করে। আমার মত প্রকার পূজা করিয়াছিল, তাহা বলিয়াছি। অশ্বদিগেরও উহারা ঐরূপ পূজা করিয়া থাকে; অশ্বদিগকে আশ্রয় দান করে, আহার যোগায়, গাত্র ধৌত ও মার্জ্জনাদি করিয়া দেয়। বোধ হয়, অশ্ব মনুষ্য হইতে শ্রেষ্ঠ পশু বলিয়াই মনুষ্যেরা তাহার পূজা করে।

মনুষ্যেরা ছাগ, মেষ, গবাদিও পালন করে। গো সম্বন্ধে তাহাদের এক আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখা গিয়াছে। তাহারা গোরুর দুগ্ধ পান করে; ইহাতে পূর্ব্বকালের ব্যাঘ্রপণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, মনুষ্যেরা কোন কালে গোরুর বৎস ছিল। আমি ততদূর বলি না, কিন্তু এই কারণেই বোধ করি, গোরুর সঙ্গে মানুষের বুদ্ধিগত সাদৃশ্য দেখা যায়।

সে যাহাই হউক, মানুষেরা আহারের সুবিধার জন্য গোরু, ছাগল এবং মেষ পালন করিয়া থাকে, ইহা এক সুরীতি, সন্দেহ নাই। আমি মানস করিয়াছি, প্রস্তাব করিব যে, আমরাও মানুষের গোহাল প্রস্তুত করিয়া মনুষ্য পালন করিব।

গো, অশ্ব, ছাগ ও মেষের কথা বলিলাম। ইহা ভিন্ন হস্তী, উষ্ট্র, গর্দ্দভ, কুক্কুর, বিড়াল, এমন কি, পক্ষী পর্য্যন্ত তাহাদের কাছে সেবা প্রাপ্ত হয়। অতএব মনুষ্যজাতিকে সকল পশুর ভৃত্য বলিলেও বলা যায়।

মনুষ্যালয়ে অনেক বানরও দেখিলাম। সে সকল বানর দ্বিবিধ;—এক সলাঙ্গুল, অপর লাঙ্গুলশূন্য। সলাঙ্গুল বানরেরা প্রায় ছাদের উপর, না হয় গাছের উপর থাকে। নীচেও অনেক বানর আছে বটে, কিন্তু অধিকাংশ বানরই উচ্চপদস্থ। বোধ হয়, বংশমর্য্যাদা বা জাতিগৌরব ইহার কারণ।

মনুষ্যচরিত্র অতি বিচিত্র। তাহাদের মধ্যে বিবাহের যে রীতি আছে, তাহা অত্যন্ত কৌতুকাবহ। অতিরিক্ত, তাহাদিগের রাজনীতিও অত্যন্ত মনোহর। ক্রমে ক্রমে তাহা বিবৃত করিতেছি।"

এই পর্য্যন্ত প্রবন্ধ পঠিত হইলে, সভাপতি অমিতোদর দূরে একটি হরিণ-শিশু দেখিতে পাইয়া চেয়ার হইতে লাফ দিয়া তদনুসরণে ধাবিত হইলেন। অমিতোদর এইরূপ দূরদর্শী বলিয়াই সভাপতি হইয়াছিলেন। সভাপতিকে অকস্মাৎ বিদ্যালোচনায় বিমুখ দেখিয়া, প্রবন্ধপাঠক কিছু ক্ষুণ্ণ হইলেন। তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া একজন বিজ্ঞ সভ্য তাঁহাকে কহিলেন, "আপনি ক্ষুব্ধ হইবেন না; সভাপতি মহাশয় বিষয়কর্ম্মোপলক্ষে দৌড়িয়াছেন। হরিণের পাল আসিয়াছে, আমি ঘ্রাণ পাইতেছি।"

এই কথা শুনিবামাত্র মহাবিজ্ঞ সভ্যেরা লাঙ্গুলোত্থিত করিয়া যিনি যে দিকে পারিলেন, সেই দিকে বিষয়-কর্ম্মের চেষ্টায় ধাবিত হইলেন। লেকচারারও এই বিদ্যার্থিদিগের দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইলেন। এরূপে সে দিন ব্যাঘ্রদিগের মহাসভা অকালে ভঙ্গ হইল।

পরে তাঁহারা অন্য এক দিন সকলে পরামর্শ করিয়া আহারান্তে সভার অধিবেশন করিলেন। সে দিন নির্ব্বিঘ্নে সভার কার্য্য সম্পন্ন হইয়া প্রবন্ধের অবশিষ্টাংশ পঠিত হইল। তাহার বিজ্ঞাপনী প্রাপ্ত হইলে আমরা প্রকাশ করিব।

দ্বিতীয় প্রবন্ধ

"সভাপতি মহাশয়, বাঘিনীগণ এবং ভদ্রব্যাঘ্রগণ!

আমি প্রথম বক্তৃতায় অঙ্গীকার করিয়াছিলাম যে, মানুষের বিবাহপ্রণালী এবং অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে কিছু বলিব। ভদ্রের অঙ্গীকারপালনই প্রধান ধর্ম্ম; অতএব আমি একেবারেই আমার বিষয়ে প্রবেশ করিলাম।

বিবাহ কাহাকে বলে, আপনারা সকলেই অবগত আছেন। সকলেই মধ্যে মধ্যে অবকাশমতে বিবাহ করিয়া থাকেন। কিন্তু মনুষ্যবিবাহে কিছু বৈচিত্র্য আছে। ব্যাঘ্র প্রভৃতি সভ্য পশুদিগের দারপরিগ্রহ কেবল প্রয়োজনাধীন, মনুষ্য-পশুর সেরূপ নহে—তাহাদের মধ্যে অনেকেই এককালীন জন্মের মত বিবাহ করিয়া রাখে।

মনুষ্যবিবাহ দ্বিবিধ—নিত্য এবং নৈমিত্তিক। তন্মধ্যে নিত্য অর্থাৎ পৌরোহিত বিবাহই মান্য। পুরো-হিতকে মধ্যবর্ত্তী করিয়া যে বিবাহ সম্পন্ন হইয়া থাকে, তাহাই পৌরোহিত বিবাহ।

মহামংষ্ট্রা। পুরোহিত কি ?

বৃহল্লাঙ্গুল।—অভিধানে লেখে, পুরোহিত চালকলা-ভোজী বঞ্চনাব্যবসায়ী মনুষ্যবিশেষ। কিন্তু এই ব্যাখ্যা দুষ্ট। কেন না, সকল পুরোহিত চালকলাভোজী নহে; অনেক পুরোহিত মদ্যমাংস খাইয়া থাকেন, অনেক পুরোহিত সর্ব্বভুক্। পক্ষান্তরে, চালকলা খাইলেই পুরোহিত হয় এমত নহে। বারাণসী নামক নগরে অনেকগুলিন ষাঁড় আছে—তাহারা চাল-কলা খাইয়া থাকে। তাহারা পুরোহিত নহে, তাহার কারণ,

তাহারা বঞ্চক নহে। বঞ্চকে যদি চাল-কলা খায়, তাহা হইলে পুরোহিত হয়।

পৌরোহিত বিবাহে এইরূপ এক জন পুরোহিত বরকন্যার মধ্যবর্ত্তী হইয়া বসে। বসিয়া কতকগুলা বকে। এই বক্তৃতাকে মন্ত্র বলে। তাহার অর্থ কি, আমি সবিশেষ অবগত নহি, কিন্তু আমি যেরূপ পণ্ডিত, তাহাতে ঐ সকল মন্ত্রের এক প্রকার অর্থ মনে মনে অনুভূত করিয়াছি। বোধ হয়, পুরোহিত বলে, "হে বরকন্যা! আমি আজ্ঞা করিতেছি, তোমরা বিবাহ কর। তোমরা বিবাহ করিলে আমি নিত্য চালকলা পাইব, অতএব তোমরা বিবাহ কর। এই কন্যার গর্ভাধানে, সীমন্তোন্নয়নে, সূতিকাগারে চালকলা পাইব—অতএব তোমরা বিবাহ কর। সন্তানের ষষ্ঠীপূজায়, অন্নপ্রাশনে, কর্ণবেধে, চূড়াকরণে বা উপনয়নে—অনেক চালকলা পাইব, অতএব তোমরা বিবাহ কর। তোমরা সংসারধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে, সর্ব্বদা ব্রত-নিয়মে, পূজা-পার্ব্বণে, যাগ-যজ্ঞে রত হইবে; সুতরাং আমি অনেক চাল-কলা পাইব, অতএব তোমরা বিবাহ কর। বিবাহ কর, কখন এ বিবাহ রহিত করিও না। যদি রহিত কর, তবে আমার চালকলার বিশেষ বিঘ্ন হইবে। তাহা হইলে এক এক চপেটাঘাতে তোমাদের মুণ্ডপাত করিব। আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের এইরূপ আজ্ঞা।"

বোধ হয়, এই শাসনের জন্যই পৌরোহিত বিবাহ কখন রহিত হয় না।

আমাদিগের মধ্যে যে বিবাহপ্রথা প্রচলিত আছে, তাহাকে নৈমিত্তিক বিবাহ বলা যায়। মনুষ্যমধ্যে এরূপ বিবাহও সচরাচর প্রচলিত। অনেক মনুষ্য এবং মানুষী, নিত্যনৈমিত্তিক উভয়বিধ বিবাহ করিয়া থাকে। কিন্তু নিত্য নৈমিত্তিক উভয়বিধ বিবাহে বিশেষ প্রভেদ এই যে, নিত্য বিবাহ কেহ গোপন করে না, নৈমিত্তিক বিবাহ সকলেই প্রাণপণে গোপন করে। যদি এক জন মনুষ্যের নৈমিত্তিক বিবাহের কথা জানিতে পারে, তাহা হইলে কখন কখন তাহাকে ধরিয়া প্রহার করে। আমার বিবেচনায় পুরোহিতেরাই এই অনর্থের মূল। নৈমিত্তিক বিবাহে তাহারা চাল-কলা পায় না—সুতরাং ইহার দমনই তাহাদের উদ্দেশ্য—তাহাদের শিক্ষামতে সকলেই নৈমিত্তিক বিবাহকারীকে ধরিয়া প্রহার করে। কিন্তু বিশেষ চমৎকার এই যে, অনেকেই গোপনে স্বয়ং নৈমিত্তিক বিবাহ করে, অথচ পরকে নৈমিত্তিক বিবাহ করিতে দেখিলে ধরিয়া প্রহার করে।

ইহাতে আমার বিবেচনা হইতেছে যে, অনেক মনুষ্যই নৈমিত্তিক বিবাহে সম্মত, তবে পুরোহিত প্রভৃতির ভয়ে মুখ ফুটিতে পারে না। আমি মনুষ্যালয়ে বাসকালীন জানিয়া আসিয়াছি, অনেক উচ্চশ্রেণীর মানুষের নৈমিত্তিক বিবাহে বিশেষ আদর। যাহারা আমাদিগের ন্যায় সুসভ্য, সুতরাং পশুবৃত্ত, তাঁহারাই এ বিষয়ে আমাদিগের অনুকরণ করিয়া থাকেন। আমার এমনও ভরসা আছে যে, কালে মনুষ্যজাতি আমাদিগের ন্যায় সুসভ্য হইলে, নৈমিত্তিক বিবাহ তাহাদের মধ্যে সমাজসম্মত হইবে। অনেক মনুষ্য-পণ্ডিত তৎপক্ষে প্রবৃত্তিদায়ক গ্রন্থাদি লিখিতেছেন। তাঁহারা বন্যজাতি-হিতৈষী সন্দেহ নাই। আমার বিবেচনায় সম্মানবর্দ্ধনার্থ তাঁহাদিগকে এই ব্যাঘ্রসমাজে অনরারি মেম্বর নিযুক্ত করিলে ভাল হয়। ভরসা করি, তাঁহারা সভাস্থ হইলে, আপনারা তাঁহাদিগকে জলযোগ করিবেন না। কেন না, তাঁহারা আমাদিগের ন্যায় নীতিজ্ঞ এবং লোকহিতৈষী।

মনুষ্যমধ্যে বিশেষ এক প্রকার নৈমিত্তিক বিবাহ প্রচলিত আছে, তাহাকে মৌদ্রিক বিবাহ বলা যাইতে পারে। এ প্রকার বিবাহ সম্পন্নার্থ মানুষ মুদ্রার দ্বারা কোন মানুষীর করতল সংস্পৃষ্ট করে। তাহা হইলেই মৌদ্রিক বিবাহ সম্পন্ন হয়।

মহাদংষ্ট্রা। মুদ্রা কি?

বৃহল্লাঙ্গুল। মুদ্রা মনুষ্যদিগের পূজ্য দেবতাবিশেষ, যদি আপনাদিগের কৌতূহল থাকে, তবে আমি সবিশেষ সেই মহাদেবীর গুণকীর্ত্তন করি। মনুষ্য যত দেবতার পূজা করে, তন্মধ্যে ইঁহার প্রতিই তাহাদের বিশেষ ভক্তি। ইনি সাকারা। স্বর্ণ, রৌপ্য এবং তাম্রে ইঁহার প্রতিমা নির্ম্মিত হয়। লৌহ, টিন, কাষ্ঠে ইঁহার মন্দির প্রস্তুত করে। রেশম, পশম, কার্পাস, চর্ম্ম প্রভৃতিতে ইঁহার সিংহাসন গঠিত হয়। মানুষগণ রাত্রিদিন ইঁহার ধ্যান করে এবং কিসে ইঁহার দর্শন প্রাপ্ত হইবে, সেই জন্য সর্ব্বদা শশব্যস্ত হইয়া বেড়ায়। যে বাটীতে টাকা আছে জানে, অহরহ সেই বাটীতে মনুষ্যের যাতায়াত করিতে থাকে,—এমন ভক্তি, কিছুতেই সে বাটী ছাড়ে না—মারিলেও যায় না। যে এই দেবীর পুরোহিত, অথবা যাহার গৃহে ইনি অধিষ্ঠান করেন, সেই ব্যক্তি মনুষ্যমধ্যে প্রধান হয়। অন্য মনুষ্যেরা সর্ব্বদাই তাহার নিকট যুক্তকরে স্তব-স্তুতি করিতে থাকে। যদি মুদ্রাদেবীর অধিকারী একবার তাহাদের প্রতি কটাক্ষ করে, তাহা হইলে তাঁহারা চরিতার্থ হয়েন।

দেবতাও বড় জাগ্রত। এমন কাজই নাই যে, এই দেবীর অনুগ্রহে সম্পন্ন হয় না। পৃথিবীতে এমন সামগ্রী নাই যে, এই দেবীর বরে পাওয়া যায় না। এমন দুষ্কর্ম্মই নাই যে, এই দেবীর উপাসনায় সম্পন্ন হয় না। এমন দোষই নাই যে, ইঁহার অনুকম্পায় ঢাকা পড়ে না। এমন গুণই নাই যে, তাঁহার অনুগ্রহ ব্যতীত গুণ বলিয়া মনুষ্যসমাজে প্রতিপন্ন হইতে পারে; যাহার

ঘরে ইনি নাই—তাহার আবার গুণ কি? যাহার ঘরে ইনি বিরাজ করেন, তাহার আবার দোষ কি? মনুষ্য-সমাজে মুদ্রামহাদেবীর অনুগৃহীত ব্যক্তিকেই ধার্ম্মিক বলে—মুদ্রাহীনতাকেই অধর্ম্ম বলে। মুদ্রা থাকিলেই বিদ্বান্ হইল। মুদ্রা যাহার নাই, তাহার বিদ্যা থাকিলেও, মনুষ্যশাস্ত্রানুসারে সে মূর্খ বলিয়া গণ্য হয়। আমরা যদি "বড় বাঘ" বলি, তবে অমিতোদর, মহাদংষ্ট্রা প্রভৃতি প্রকাণ্ডাকার মহাব্যাঘ্রগণকে বুঝাইবে। কিন্তু মনুষ্যালয়ে "বড় মানুষ" বলিলে সেরূপ অর্থ হয় না—আট হাত বা দশ হাত মানুষ বুঝায় না, যাহার ঘরে এই দেবী বাস করেন, তাহাকেই "বড় মানুষ" বলে। যাহার ঘরে এই দেবী স্থাপিতা নহেন, সে পাঁচ হাত লম্বা হইলেও তাহাকে "ছোট লোক" বলে।

মুদ্রাদেবীর এইরূপ নানাবিধ গুণগান শ্রবণ করিয়া আমি প্রথমে সঙ্কল্প করিয়াছিলাম যে, মনুষ্যালয় হইতেই ইঁহাকে আনিয়া ব্যাঘ্রালয়ে স্থাপন করিব। কিন্তু পশ্চাৎ যাহা শুনিলাম, তাহাতে বিরত হইলাম। শুনিলাম যে, মুদ্রাই মনুষ্যজাতির যত অনিষ্টের মূল। ব্যাঘ্রাদি প্রধান পশুরা কখন স্বজাতির হিংসা করে না, কিন্তু মনুষ্যেরা সর্ব্বদা আত্মজাতির হিংসা করিয়া থাকে। মুদ্রা-পূজাই ইহার কারণ। মুদ্রার লোভে সকল মনুষ্যই পরস্পরের অনিষ্ট চেষ্টায় রত। প্রথম বক্তৃতায় বলিয়াছিলাম যে, মনুষ্যেরা সহস্রে সহস্রে প্রান্তরমধ্যে সমবেত হইয়া পরস্পরে হত, আহত, পীড়িত, অবরুদ্ধ, অপমানিত, তিরস্কৃত করে। মনুষ্যলোকে বোধ হয়, এমন অনিষ্টই নাই যে, এই দেবীর অনুগ্রহ প্রেরিত নহে। ইহা আমি জানিতে পারিয়া মুদ্রাদেবীকে উদ্দেশে প্রণাম করিয়া তাঁহার পূজার অভিলাষ ত্যাগ করিলাম।

কিন্তু মনুষ্যেরা ইহা বুঝে না। প্রথম বক্তৃতাতেই বলিয়াছি যে, মনুষ্যেরা অত্যন্ত অপরিণামদর্শী—সর্ব্বদাই পরস্পরের অমঙ্গল চেষ্টা করে। অতএব তাহারা অবিরত রূপার চাকি ও তামার চাকি সংগ্রহের চেষ্টায় কুমারের চাকের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়ায়।

মনুষ্যদিগের বিবাহতত্ত্ব যেমন কৌতুকাবহ, অন্যান্য বিষয়ও তদ্রূপ। তবে পাছে দীর্ঘ বক্তৃতা করিলে আপনাদিগের বিষয়-কর্ম্মের সময় পুনরুপস্থিত হয়, এই জন্য অদ্য এইখানে সমাধা করিলাম। ভবিষ্যতে যদি অবকাশ হয়, তবে অন্যান্য বিষয়ে কিছু বলিব।"

এইরূপে বক্তৃতা সমাধা করিয়া পণ্ডিতবর ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গুল বিপুল লাঙ্গুলচটচটায় মধ্যে উপবেশন করিলেন। তখন দীর্ঘনখ নামে এক সুশিক্ষিত যুবা ব্যাঘ্র গাত্রোত্থান করিয়া, হাউমাউ শব্দে বিতর্ক আরম্ভ করিলেন।

দীর্ঘনখ মহাশয় গর্জ্জনান্তে বলিলেন, "হে ভদ্র ব্যাঘ্রগণ! আমি অদ্য বক্তার সবক্তৃতার জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিবার প্রস্তাব করি। কিন্তু ইহা বলাও কর্ত্তব্য যে, বক্তৃতাটি নিতান্ত মন্দ, মিথ্যাকথাপরিপূর্ণ, বক্তা অতি গণ্ডমূর্খ।"

অমিতোদর। আপনি শান্ত হউন। সভ্য-জাতীয়েরা অতি স্পষ্ট করিয়া গালি দেয় না। প্রচ্ছন্নভাবে আপনি আরও গুরুতর গালি দিতে পারেন।

দীর্ঘনখ। "যে আজ্ঞা। বক্তা অতি সত্যবাদী, তিনি যাহা বলিলেন, তাহার মধ্যে অধিকাংশ কথা অপ্রাকৃত হইলেও, দু একটা সত্য কথা পাওয়া যায়। তিনি অতি সুপণ্ডিত ব্যক্তি। অনেকেই মনে করিতে পারেন যে, এই বক্তৃতার মধ্যে বক্তব্য কিছুই নাই। কিন্তু আমরা যাহা পাইলাম, তাহার জন্য কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। তবে বক্তৃতার সকল কথায় সম্মতি প্রকাশ করিতে পারি না। বিশেষ আদৌ মনুষ্যমধ্যে বিবাহ কাহাকে বলে, বক্তা তাহাই অবগত নহে। ব্যাঘ্র-জাতির কুলরক্ষার্থ যদি কোন বাঘ বাঘিনীকে আপন সহচরী করে, (সহচরী, সঙ্গে চরে) তাহাকেই আমরা বিবাহ বলি, মানুষের বিবাহ সেরূপ নহে। মানুষ স্বভাবতঃ দুর্ব্বল এবং প্রভুভক্ত, সুতরাং প্রত্যেক মনুষ্যের এক একটি প্রভু চাহি। সকল মনুষ্যই এক একজন স্ত্রীলোককে আপন প্রভু বলিয়া নিযুক্ত করে। ইহাকেই তাহারা বিবাহ বলে। যখন তাহারা কাহাকে সাক্ষী রাখিয়া প্রভু নিয়োগ করে, তখন সে বিবাহকে পৌরোহিত বিবাহ বলা যায়। সাক্ষীর নাম পুরোহিত। বৃহল্লাঙ্গুল মহাশয় বিবাহমন্ত্রের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা অযথার্থ। সে মন্ত্র এইরূপ;—

পুরোহিত। বল, আমাকে কি বিষয়ে সাক্ষী হইতে হইবে?

বর। আপনি সাক্ষী থাকুন, আমি এই স্ত্রী-লোকটিকে জন্মের মত আমার প্রভুত্বে নিযুক্ত করিলাম।

পুরো। আর কি?

বর। আর আমি জন্মের মত ইঁহার শ্রীচরণের গোলাম হইলাম। আহার যোগানের ভার আমার উপর;—খাইবার ভার উঁহার উপর।

পুরো। (কন্যার প্রতি) তুমি কি বল?

কন্যা। আমি ইচ্ছাক্রমে এই ভৃত্যটিকে গ্রহণ করিলাম। যত দিন ইচ্ছা হইবে, চরণসেবা করিতে দিব। যে দিন ইচ্ছা না হইবে, সে দিন নাতি মারিয়া তাড়াইয়া দিব।

পুরো। শুভমস্তু।

এইরূপ আরও অনেক ভুল আছে, যথা—মুদ্রাকে বক্তা মনুষ্যপূজিত দেবতা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন

কিন্তু বাস্তবিক উহা দেবতা নহে। মুদ্রা একপ্রকার বিষচক্র। মনুষ্যেরা অত্যন্ত বিষপ্রিয়; এই জন্য সচরাচর মুদ্রাসংগ্রহ জন্য যত্নবান্। মনুষ্যগণকে মুদ্রাভক্ত জানিয়া আমি পূর্ব্বে বিবেচনা করিয়াছিলাম যে, 'না জানি, মুদ্রা কেমনই উপাদেয় সামগ্রী; আমাকে এক দিন খাইয়া দেখিতে হইবে।' একদা বিদ্যাধরী নদীর তীরে একটা মনুষ্যকে হত করিয়া ভোজন করিবার সময়ে তাহার বস্ত্রমধ্যে কয়েকটি মুদ্রা পাইলাম। পাইবামাত্র উদরসাৎ করিলাম। পরদিবস আমার উদরের পীড়া উপস্থিত হইল। সুতরাং মুদ্রা যে এক-প্রকার বিষ, তাহাতে সংশয় কি?"

দীর্ঘনখ এইরূপ বক্তৃতা করিলে পর অন্যান্য ব্যাঘ্র মহাশয়েরা উঠিয়া বক্তৃতা করিলেন। পরে সভাপতি অমিতোদর বলিতে লাগিলেন ;—

"এক্ষণে রাত্রি অধিক হইয়াছে, বিষয়-কর্ম্মের সময় উপস্থিত। বিশেষ, হরিণের পাল কখন্ আইসে, তাহার স্থিরতা কি? অতএব দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া কালহরণ কর্ত্তব্য নহে। বক্তৃতা অতি উত্তম হইয়াছে—এবং বৃহল্লাঙ্গুল মহাশয়ের নিকট আমরা বড় বাধিত হইলাম। এক কথা এই বলিতে চাহি যে, আপনারা দুই দিন যে বক্তৃতা শুনিলেন, তাহাতে অবশ্য বুঝিয়া থাকিবেন যে, মনুষ্য অতি অসভ্য পশু। আমরা অতি সভ্য পশু। সুতরাং আমাদের কর্ত্তব্য হইতেছে যে, আমরা মনুষ্যগণকে আমাদের ন্যায় সভ্য করি। বোধ করি, মনুষ্যদিগকে সভ্য করিবার জন্যই জগদীশ্বর আমাদিগকে এই সুন্দরবনভূমিতে প্রেরণ করিয়াছেন। বিশেষ মনুষ্যেরা সভ্য হইলে তাহাদের মাংস আরও কিছু সুস্বাদ হইতে পারে এবং তাহারা আরও সহজে ধরা দিতে পারে। কেন না, সভ্য হইলেই তাহারা বুঝিতে পারিবে যে, ব্যাঘ্রদিগের আহারার্থ শরীর দান করাই মনুষ্যের কর্ত্তব্য। এইরূপ সভ্যতাই আমরা শিখাইতে চাই। অতএব আপনারা এ বিষয়ে মনোযোগী হউন। ব্যাঘ্রদিগের কর্ত্তব্য যে, মনুষ্যদিগকে অগ্রে সভ্য করিয়া পশ্চাৎ ভোজন করেন।"

সভাপতি মহাশয় এইরূপে বক্তৃতা সমাপন করিয়া লাঙ্গুলচট্‌চটার মধ্যে উপবেশন করিলেন, তখন সভা-পতিকে ধন্যবাদপ্রদানানন্তর ব্যাঘ্রদিগের মহাসভা ভঙ্গ হইল। তাঁহারা যে যথায় পারিলেন, বিষয়কর্ম্মে প্রয়াণ করিলেন।

যে ভূমিখণ্ডে সভার অধিষ্ঠান হইয়াছিল, তাহার চারিপার্শ্বে কতকগুলিন বড় বড় গাছ ছিল। কতক-গুলিন বানর তদুপরি আরোহণ করিয়া, বৃক্ষপত্রমধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া, ব্যাঘ্রদিগের বক্তৃতা শুনিতেছিল। ব্যাঘ্রেরা সভাভূমি ত্যাগ করিয়া গেলে একটী বানর মুখ বাহির করিয়া অন্য বানরকে ডাকিয়া কহিল, "কটি ভায়া, ডালে আছ?"

দ্বিতীয় বানর বলিল, "আজ্ঞে, আছি।"

প্রথম। আইস, আমরা এই ব্যাঘ্রদিগের বক্তৃতার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হই।

দ্বি, বা। কেন?

প্র, বা। এই বাঘেরা আমাদিগের চিরশত্রু। আইস, কিছু নিন্দা করিয়া শত্রুতা সাধা যাউক।

দ্বি, বা। অবশ্য কর্ত্তব্য। কাজটা আমাদিগের জাতির উচিত বটে।

প্র, বা। আচ্ছা, তবে দেখ. বাঘেরা কেহ নিকটে নাই ত?

দ্বি, বা। না। তথাপি আপনি একটু প্রচ্ছন্ন থাকিয়া বলুন।

প্র, বা। সেই কথাই ভাল। নহিলে কি জানি, কোন্ দিন কোন্ বাঘের সম্মুখে পড়িব, আর ভোজন করিয়া ফেলিবে।

দ্বি, বা। বলুন, কি দোষ?

প্র, বা। প্রথম, ব্যাকরণ অশুদ্ধ। আমরা বানরজাতি ব্যাকরণে বড় পণ্ডিত। ইহাদের ব্যাকরণ আমাদের বাঁদুরে ব্যাকরণের মত নহে।

দ্বি, বা। তার পর?

প্র, বা। ইহাদের ভাষা বড় মন্দ।

দ্বি, বা। হাঁ, উহারা বাঁদুরে কথা কয় না।

প্র, বা। ঐ যে অমিতোদর বলিল, ব্যাঘ্রদিগের কর্ত্তব্য, অগ্রে মনুষ্যদিগকে সভ্য করিয়া পশ্চাৎ ভোজন করেন, ইহা না বলিয়া যদি বলিত, অগ্রে মনুষ্যদিগকে ভোজন করিয়া পশ্চাৎ সভ্য করেন, তাহা হইলে সঙ্গত হইত।

দ্বি, বা। সন্দেহ কি—নহিলে আমাদের বানর বলিবে কেন?

প্র, বা। কি প্রকারে বক্তৃতা হয়, কি কি বলিতে হয়, তাহা উহারা জানে না। বক্তৃতায় কিছু কিচ্‌মিচ্ করিতে হয়, কিছু লম্ফঝম্প করিতে হয়, দুই এক বার মুখ ভেঙ্গাইতে হয়, দুই এক বার কদলী ভোজন করিতে হয়; উহাদের কর্ত্তব্য, আমাদের কাছে কিছু শিক্ষা লয়।

দ্বি, বা। আমাদিগের কাছে শিক্ষা পাইলে উহারা বানর হইত, ব্যাঘ্র হইত না।

এমত সময়ে আরও কয়েকটা বানর সাহস পাইয়া উঠিল। এক বানর বলিল, "আমার বিবেচনায় বক্তৃতার মহদ্দোষ এই যে, বৃহল্লাঙ্গুল আপনার জ্ঞান ও বুদ্ধির দ্বারা আবিষ্কৃত অনেকগুলিন নূতন কথা বলিয়াছেন। সে সকল কথা কোন গ্রন্থেই পাওয়া যায় না। যাহা পূর্ব্বলেখকদিগের চর্ব্বিতচর্ব্বণ নহে,

তাহা নিতান্ত দুষ্য। আমরা বানরজাতি, চিরকাল চর্বিতচর্বণ করিয়া বানরলোকের শ্রীবৃদ্ধি করিয়া আসিতেছি—ব্যাঘ্রাচার্য্য যে তাহা করেন নাই, ইহা মহাপাপ।"

তখন একটি রূপী বানর বলিয়া উঠিল, "আমি এই সকল বক্তৃতার মধ্যে হাজার-এক দোষ তালিকা করিয়া বাহির করিতে পারি। আমি হাজার-এক স্থানে বুঝিতে পারি নাই। যাহা আমার বিদ্যাবুদ্ধির অতীত, তাহা মহা দোষ বৈ আর কি?"

আর একটি বানর কহিল, "আমি বিশেষ কোন দোষ দেখাইতে পারি না। কিন্তু আমি বায়ার রকম মুখভঙ্গী করিতে পারি এবং অশ্লীল গালি-গালাজ দিয়া আপন সভ্যতা এবং রসিকতা প্রচার করিতে পারি।"

এইরূপে বানরেরা ব্যাঘ্রদিগের নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত রহিল। দেখিয়া এক স্থূলোদর বানর বলিল যে, "আমরা যেরূপ নিন্দাবাদ করিলাম, তাহাতে বৃহল্লাঙ্গুল বাসায় গিয়া মরিয়া থাকিবে। আইস, আমরা কদলী ভোজন করি।"

ইংরেজস্তোত্র

(মহাভারত হইতে অনুবাদিত)

হে ইংরেজ! আমি তোমাকে প্রণাম করি। ১॥

তুমি নানাগুণে বিভূষিত, সুন্দর কান্তিবিশিষ্ট, বহুল সম্পদযুক্ত; অতএব হে ইংরেজ! আমি তোমাকে প্রণাম করি। ২॥

তুমি হর্ত্তা—শত্রুদলের; তুমি কর্ত্তা—আইন আদির: তুমি বিধাতা—চাকরি প্রভৃতির। অতএব হে ইংরেজ! আমি তোমাকে প্রণাম করি। ৩॥

তুমি সমরে দিব্যাস্ত্রধারী, শীকারে বল্লমধারী, বিচারাগারে অর্দ্ধ ইঞ্চি-পরিমিত ব্যাসবিশিষ্ট বেত্রধারী, আহারে কাঁটা-চামচেধারী; অতএব হে ইংরেজ! আমি তোমাকে প্রণাম করি। ৪॥

তুমি এক রূপে রাজপুরীমধ্যে অধিষ্ঠান করিয়া রাজ্য কর; আর এক রূপে পণ্যবীথিকামধ্যে বাণিজ্য কর; আর এক রূপে কাছাড়ে চা'র চাষ কর; অতএব হে ত্রিমূর্ত্তে! আমি তোমাকে প্রণাম করি। ৫॥

তোমার সত্ত্বগুণ তোমার প্রণীত গ্রন্থাদিতে প্রকাশ; তোমার রজোগুণ তোমার কৃত যুদ্ধাদিতে প্রকাশ; তোমার তমোগুণ তোমার প্রণীত ভারতবর্ষীয় সংবাদ পত্রাদিতে প্রকাশ—অতএব হে ত্রিগুণাত্মক! আমি তোমাকে প্রণাম করি। ৬॥

তুমি আছ, এই জন্যই তুমি সৎ; তোমার শত্রুরা রণক্ষেত্রে চিৎ এবং তুমি উমেদারবর্গের আনন্দ; অতএব হে সচ্চিদানন্দ! তোমাকে আমি প্রণাম করি। ৭॥

তুমি ব্রহ্মা, কেন না, তুমি প্রজাপতি; তুমি বিষ্ণু, কেন না, কমলা তোমার প্রতিই কৃপা করেন এবং তুমি মহেশ্বর, কেন না, তোমার গৃহিণী গৌরী। অতএব হে ইংরেজ! আমি তোমাকে প্রণাম করি। ৮॥

তুমি ইন্দ্র, কামান তোমার বজ্র; তুমি চন্দ্র, ইন্‌কম টেক্‌স তোমার কলঙ্ক; তুমি বায়ু, রেইলওয়ে তোমার গমন; তুমি বরুণ, সমুদ্র তোমার রাজ্য; অতএব হে ইংরেজ! আমি তোমাকে প্রণাম করি। ৯॥

তুমিই দিবাকর, তোমার আলোকে আমাদের অজ্ঞানান্ধকার দূর হইতেছে; তুমি অগ্নি, কেন না, সব খাও; তুমিই যম, বিশেষ আমলাবর্গের। ১০॥

তুমিই বেদ, আর ঋক্‌যজুরাদি মানি না; তুমি স্মৃতি—মন্বাদি ভুলিয়া গিয়াছি; তুমি দর্শন, ন্যায়, মীমাংসা প্রভৃতি তোমারই হাত। অতএব হে ইংরেজ! আমি তোমাকে প্রণাম করি। ১১॥

হে শ্বেতকান্ত! তোমার অমল-ধবল দ্বিরদ-রদ-শুভ্র মহাশ্মশ্রুশোভিত মুখমণ্ডল দেখিয়া আমার বাসনা হইয়াছে, আমি তোমার স্তব করিব; অতএব হে ইংরেজ! আমি তোমাকে প্রণাম করি। ১২॥

তোমার হরিতকপিশ, পিঙ্গললোহিত, কৃষ্ণশুভ্রাদি নানা বর্ণশোভিত, অতিযত্নরক্ষিত, ভল্লুকমেদোমার্জ্জিত কুন্তলাবলি দেখিয়া আমার বাসনা হইয়াছে, আমি তোমার স্তব করিব; অতএব হে ইংরেজ! আমি তোমাকে প্রণাম করি। ১৩॥

তুমি কলিকালে গৌরাঙ্গাবতার, তাহার সন্দেহ নাই। হ্যাট তোমার সেই গোপবেশের চূড়া, পেণ্ট্‌লন সেই ধড়া আর হুইপ সেই মোহন মুরলী—অতএব হে গোপীবল্লভ! আমি তোমাকে প্রণাম করি। ১৪॥

হে বরদ! আমাকে বর দাও। আমি শাম্‌লা মাথায় বাঁধিয়া তোমার পিছু পিছু বেড়াইব—আমি তোমাকে প্রণাম করি। ১৫॥

হে শুভঙ্কর! আমার শুভ কর। আমি তোমার খোসামোদ করিব, তোমার প্রিয় কথা কহিব, তোমার মনরাখা কাজ করিব—আমায় বড় কর, আমি তোমাকে প্রণাম করি। ১৬॥

হে মানদ! আমায় টাইটল্ দাও, খেতাব দাও, খেলাত দাও;—আমাকে তোমার প্রসাদ দাও—আমি তোমাকে প্রণাম করি। ১৭॥

হে ভক্তবৎসল! আমি তোমার পাত্রাবশেষ ভোজন করিতে ইচ্ছা করি—তোমার করস্পর্শে লোকমণ্ডলে মহামান্যাস্পদ হইতে বাসনা করি,—তোমার স্বহস্তলিখিত

৩ ধারা। যে স্বামীর উপর যে স্ত্রীলোকের সম্পত্তি বলিয়া স্বত্ব আছে, সেই স্ত্রীলোক সেই স্বামীর পত্নী বা স্ত্রী।

EXPLANATION.

The right of property includes the right of flagellation.

অর্থের কথা

সম্পত্তি বলিয়া যাহার উপর স্বত্বাধিকার থাকে, তাহার মারপিট করিবারও স্বত্বাধিকার থাকিবে।

4. "The married state" is a state of penance into which men voluntarily enter for sins committed in a previous life.

৪ ধারা। পূর্ব্বজন্মকৃত পাপের জন্য পুরুষদের প্রায়শ্চিত্তবিশেষকে বিবাহ বলে।

CHAPTER III

OF PUNISHMENTS.

5. The punishments to which offenders are liable under the provisions of this Code are :

তৃতীয় অধ্যায়,—দণ্ডের কথা

৫ ধারা। এই আইনের বিধানমতে অপরাধীদিগের নিম্নলিখিত দণ্ড হইতে পারে :—

FIRST, IMPRISONMENTS

Which may be either within the four walls of a bed room, or within the four walls of a house.

প্রথম। কয়েদ।

অর্থাৎ শয্যাগৃহের চারি ভিত্তির মধ্যে কয়েদ। অথবা বাটীর চারি ভিত্তির মধ্যে কয়েদ।

Imprisonment is of two descriptions, namely.

কয়েদ দুই প্রকার।

(1) Rigorous, that is, accompanied by hard words.

(১) কঠিন তিরস্কারের সহিত।

(2) Simple.

(২) বিনা তিরস্কার।

SECONDLY, Transportation, that is to another bed-room.

দ্বিতীয়। শয্যান্তর প্রেরণ বা শয্যাগৃহান্তর প্রেরণ।

THIRDLY, Matrimonial servitude.

তৃতীয়। পত্নীর দাসত্ব।

FOURTHLY, Forfeiture of pocket-money.

চতুর্থ। সম্পত্তিদণ্ড, অর্থাৎ পিন্‌খরচের টাকা বন্ধ।

6. "Capital punishment" under this Code, means that the wife shall run away to her paternal roof, or to some other friendly house, with the intention of not returning in a hurry,

৬ ধারা। এই আইনে "প্রাণদণ্ড" অর্থে বুঝাইবে যে, স্ত্রী বাপের বাড়ী কি ভাইয়ের বাড়ী চলিয়া যাইবেন, শীঘ্র আসিতে চাহিবেন না।

7. The following punishments are also provided for minor offences :

৭ ধারা। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপরাধের জন্য নিম্নলিখিত দণ্ড হইতে পারে।

FIRST, Contemptuos silence on the part of the wife.

প্রথম। মান।

SECONDLY, Frown.

দ্বিতীয়। ভ্রূকুটি।

THIRDLY, Tears and lamentation.

তৃতীয়। অশ্রুবর্ষণ বা উচ্চৈঃস্বরে রোদন।

FOURTHLY, Scolding and abuse,

চতুর্থ। গালি, তিরস্কার।

CHAPTER IV.

GENERAL EXCEPTIONS

8. Nothing is an offence which is done by a wife.

চতুর্থ অধ্যায়,—সাধারণ বর্জ্জিত কথা

৮ ধারা। স্ত্রীকৃত কোন ক্রিয়া অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে না।

9. Nothing is an offence which is done by a husband in obedience to the commands of a wife.

৯ ধারা। স্ত্রীর আজ্ঞানুসারে স্বামিকৃত কোন ক্রিয়া অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে না।

10. No person in the married state shall be entitled to plead any other circumstances as grounds of exemption from the provisions of the Matrimonial Penal Code.

১০। ইহা ভিন্ন অন্য কোন প্রকার ওজর করিয়া কোন বিবাহিত পুরুষ বলিতে পারিবেন না যে, আমি দাম্পত্য দণ্ডবিধির আইনানুসারে দণ্ডনীয় নই।

CHAPTER V.

OF ABETMENT

11. A person abets the doing of a matrimonial offence who

পঞ্চম অধ্যায়,—অপরাধের সহায়তার বিধি

১১ ধারা। যে কোন ব্যক্তি—

FIRST, Instigates, persuades, induces or encourages a husband to commit that offence,

প্রথম। অন্য ব্যক্তিকে কোন দাম্পত্য অপরাধ করিতে প্রবৃত্তি দেয়, বা উৎসাহিত বা উদ্যুক্ত করে;

SECONDLY, Joins him in the commission of that offence, or keeps him company during its commission.

দ্বিতীয়। বা তৎসঙ্গে সেই অপরাধে লিপ্ত হয় বা সেই অপরাধ করার সময়ে তাহার সঙ্গে থাকে;

তবে বলা যায় যে, ঐ অপরাধের সহায়তা করিয়াছে।

EXPLANATION

A man not in the married state or even a woman, may be abettor.

অর্থের কথা

অবিবাহিত পুরুষ বা কোন স্ত্রীলোকেও দাম্পত্য অপরাধের সহায়তা করিতে পারে।

ILLUSTRATIONS

(a) A the husband of B, and C, an unmarried man, drink together. Drinking is a matrimonial offence, C has abetted A.

উদাহরণ

(ক) রাম, কামিনীর স্বামী, যদু অবিবাহিত পুরুষ। উভয়ে একত্রে মদ্যপান করিল। মদ্যপান একটি দাম্পত্য অপরাধ। যদু, রামের সহায়তা করিয়াছে।

(b) A the mother of B, the husband of C, persuades B to spend money in other ways than those which C approves.

As spending money in such ways is a matrimouial offence, A has abetted B,

(খ) হরমণি, রামের মা। রাম কামিনীর স্বামী। কামিনী যেরূপে টাকা খরচ করিতে বলে, সেরূপে খরচ না করিয়া, রাম হরমণির পরামর্শে অন্য প্রকার খরচ করিল। স্ত্রীর অনভিমত খরচ করা একটি দাম্পত্য অপরাধ। হরমণি তাহার সহায়তা করিয়াছে।

12. When a man in the married state abets another man in the married state in a matrimonial offence, the abettor is liable to the same punishment as the principal. Provided that he can be so punished only by a competent court.

১২ ধারা। যদি কোন বিবাহিত পুরুষ কোন দাম্পত্য অপরাধের জন্য বিবাহিত পুরুষের সহায়তা করে, তবে সে আসল অপরাধীর সঙ্গে সমান দণ্ডনীয়। কিন্তু তাহার দণ্ড উপযুক্ত আদালত নহিলে হইবে না।

EXPLANATION

A competent court means the wife having right of property in the offending husband.

অর্থের কথা

ঐ ব্যক্তি যে স্ত্রীর সম্পত্তি, সেই স্ত্রীকেই উপযুক্ত আদালত বলা যায়।

13. Abettors who are females or male offenders not in the married state are liable to be punished only with scolding, abuse, frowns, tears and lamentations.

১৩ ধারা। স্ত্রীলোক বা অবিবাহিত পুরুষ দাম্পত্য অপরাধের সহায়তা করিলে, তিরস্কার, ভ্রূকুটি, এবং অশ্রুবর্ষণ ও রোদনের দ্বারা দণ্ডনীয় মাত্র।

CHAPTER VI.

OF OFFENCES AGAINST THE STATE

14. The "State" shall in this Code mean the married state only.

ষষ্ঠ অধ্যায়,—স্ত্রী-বিদ্রোহিতার অপরাধ

১৪ ধারা। (অনুবাদক অক্ষম)

এবং দুর্ম্মুখের মুখে সীতার অপবাদ শুনিয়া বলিলেন—

"সতাং কেনাপি কার্য্যেণ লোকস্যারাধনং ব্রতম্।
যৎ পূজিতং হি তাতেন মাঞ্চ প্রাণাংশ্চ মুঞ্চতা ॥" (২)

ভবভূতির রামচন্দ্র এই বিষম ভ্রমে ভ্রান্ত হইয়া কুলধর্ম্ম এবং রাজধর্ম্ম পালনার্থ ভার্য্যাকে পবিত্রা জানিয়াও ত্যাগ করিলেন। রামায়ণের রামচন্দ্র সেরূপ নহেন। তিনিও জানিতেন যে, সীতা পবিত্রা—

"অন্তরাত্মা চ মে বেত্তি সীতাং শুদ্ধাং যশস্বিনীম্।"

তিনি কেবল রাজকুলসুলভ অকীর্ত্তিশঙ্কা বশতঃ পবিত্রা পতিমাত্রজীবিতা পত্নীকে ত্যাগ করিলেন। "আমি রাজা শ্রীরামচন্দ্র ইক্ষ্বাকুবংশীয়, লোকে আমার মহিষীর অপবাদ করে! আমি অকীর্ত্তি সহিব না। যে স্ত্রীর লোকাপবাদ, আমি তাহাকে ত্যাগ করিব।" এইরূপে রামায়ণের রামচন্দ্রের গর্ব্বিত চিত্তভাব।

বাস্তবিক সর্ব্বত্রই, রামায়ণের রামচন্দ্র হইতে ভবভূতির রামচন্দ্র অধিকতর কোমলপ্রকৃতি। ইহার এক কারণ এই, উভয় চরিত্র গ্রন্থরচনার সময়োপযোগী। রামায়ণ প্রাচীন গ্রন্থ। কেহ কেহ বলেন যে, উত্তরাকাণ্ড বাল্মীকিপ্রণীত নহে। তাহা হউক বা না হউক, ইহা যে প্রাচীন রচনা, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। তখন আর্য্যজাতি বীরজাতি ছিলেন, আর্য্যরাজগণ বীর-স্বভাবসম্পন্ন ছিলেন। রামায়ণে রাম মহাবীর, তাঁহার চরিত্র গাম্ভীর্য্য এবং ধৈর্য্যপরিপূর্ণ। ভবভূতি যৎকালে কবি, তখন ভারতবর্ষীয়েরা আর সে চরিত্রের নহেন। ভোগাকাঙ্ক্ষা অলসাদির দ্বারা তাঁহাদের চরিত্র কোমল-প্রকৃতি হইয়াছিল। ভবভূতির রামচন্দ্রও সেইরূপ। তাঁহার চরিত্রে বীরলক্ষণ কিছুই নাই! গাম্ভীর্য্য এবং ধৈর্য্যের বিশেষ অভাব। তাঁহার অধীরতা দেখিয়া কখন কখন কাপুরুষ বলিয়া ঘৃণা হয়। সীতার অপবাদ শুনিয়া ভবভূতির রামচন্দ্র যে প্রকার বালিকাসুলভ বিলাপ করিলেন, তাহাই ইহার উদাহরণস্থল। তিনি শুনিয়াই মূর্চ্ছিত হইলেন। তাহার পর দুর্ম্মুখের কাছে অনেক কাঁদাকাটা করিলেন। অনেক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন। তন্মধ্যে অনেক সকরুণ কথা আছে বটে, কিন্তু এত বাগাড়ম্বরে করুণরসের একটু বিঘ্ন হয়। এত বালিকার মত কাঁদিলে রামচন্দ্রের প্রতি কাপুরুষ বলিয়া ঘৃণা হয়। উদাহরণ—

"হা দেবি দেবযজনসম্ভবে! হা স্বজন্মানুগ্রহ-পবিত্রিত-বসুন্ধরে! হা পাবক-বশিষ্ঠারুন্ধতী-প্রশস্ত-শীলশালিনি! হা রামময়জীবিতে! হা মহারণ্যবাস-প্রিয়সখি! হা প্রিয়স্তোক-বাদিনি! কথমেবং-বিধায়া-স্তবায়মীদৃশঃ পরিণামঃ?" (১)

এইরূপ স্থলে রামায়ণের রামচন্দ্র কি করিয়াছেন? কত কাঁদিয়াছেন?—কিছুই না। মহাবীর-প্রকৃতি শ্রীরাম সভামধ্যে সীতাপবাদের কথা শুনিলেন। শুনিয়া সভাসদ্‌গণকে কেবল এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, সকলে কি এইরূপ বলে?" সকলে তাহাই বলিল। তখন ধীরপ্রকৃতি রাজা আর কাহাকেও কিছু না বলিয়া সভা হইতে উঠিয়া গেলেন। মূর্চ্ছাও গেলেন না, মাথাও কুটিলেন না—ভূমেও গড়াপড়ি দিলেন না। পরে নিভৃত হইয়া, কাতরতাশূন্য ভাষায় ভ্রাতৃবর্গকে ডাকাইলেন। ভ্রাতৃগণ আসিলে পর্ব্বতবৎ অবিচলিত থাকিয়া, তাঁহাদিগকে আপন অভিপ্রায় জানাইলেন। বলিলেন, "আমি সীতাকে পবিত্রা জানি—সেই জন্যই গ্রহণ করিয়াছিলাম—কিন্তু এক্ষণে এই লোকাপবাদ! অতএব আমি সীতাকে ত্যাগ করিব।" স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া লক্ষ্মণের প্রতি রাজাজ্ঞা প্রচার করিলেন, "তুমিই সীতাকে বনে দিয়া আইস।" যেমন অন্যান্য নিত্যনৈমিত্তিক রাজকার্য্যে রাজানুচরকে রাজা নিযুক্ত করেন, সেইরূপ লক্ষ্মণকে সীতার বিসর্জ্জনে নিযুক্ত করিলেন। চক্ষে জল, কিন্তু একটিও শোকসূচক কথা ব্যবহার করিলেন না। "মর্ম্মাণি কৃন্তন্তি" ইত্যাদি বাক্য সীতাবিয়োগাশঙ্কায় নহে—অপবাদ সম্বন্ধে। তথাপি তাঁহার এই কয়টি কথায় কত দুঃখই আমরা অনুভূত করিতে পারি। এই স্থল উত্তরাকাণ্ড হইতে উদ্ধৃত এবং অনুবাদিত করিলাম।

---

(২) লোকের আরাধনা করা সাধু ব্যক্তিদিগের পক্ষে সর্ব্বতোভাবেই বিধেয় এবং এইটি তাঁহাদিগের পক্ষে মহৎ ব্রতস্বরূপ। কারণ, পিতা আমাকে এবং প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াও তাহা প্রতিপালন করিয়াছিলেন।"—নৃসিংহ বাবুর অনুবাদ।

(১) "হা দেবি- যজ্ঞভূমিসম্ভবে! হা জন্মগ্রহণ-পবিত্রিতবসুন্ধরে! হা নিমি এবং জনকবংশের আনন্দদায়িনি! হা অগ্নি, বশিষ্ঠদেব এবং অরুন্ধতী সদৃশ প্রশংসনীয়চরিতে! হা রামময়জীবিতে! হা মিতবাদিনি! এইরূপ হইয়াও শেষে তোমার অদৃষ্টে এই ঘটিল!"—নৃসিংহ বাবুর অনুবাদ।

"তস্যৈবং ভাষিতং শ্রুত্বা রাঘবং পরমার্ত্তবৎ।
উবাচ সুহৃদঃ সর্ব্বান্ কথমেতদ্বদন্তু মাম্॥
সর্ব্বে তু শিরসা ভূমাবভিবাদ্য প্রণম্য চ।
প্রত্যূচু রাঘবং দীনমেবমেতন্ন সংশয়ঃ॥
শ্রুত্বা তু বাক্যং কাকুৎস্থঃ সর্ব্বেষাং সমুদীরিতম্।
বিসর্জ্জয়ামাস তদা বয়স্যান্ শত্রুসূদনঃ॥
বিসৃজ্য তু সুহৃদ্বর্গং বুদ্ধ্যা নিশ্চিত্য রাঘবঃ।
সমীপে দ্বাস্থমাসীনমিদং বচনমব্রবীৎ॥
শীঘ্রমানয় সৌমিত্রিং লক্ষ্মণং শুভলক্ষণম্।
ভরতং চ মহাভাগং শত্রুঘ্নং চাপরাজিতম্॥

* * * *

তে তু দৃষ্ট্বা মুখং তস্য সগ্রহং শশিনং যথা।
সন্ধ্যাগতমিবাদিত্যং প্রভয়া-পরিবর্জ্জিতম্॥
বাষ্পপূর্ণে চ নয়নে দৃষ্ট্বা রামস্য ধীমতঃ।
হতশোভং যথা পদ্মং মুখং বীক্ষ্য চ তস্য তে॥
ততোঽভিবাদ্য ত্বরিতাঃ পাদৌ রামস্য মূর্দ্ধভিঃ।
তস্থুঃ সমাহিতাঃ সর্ব্বে রামস্ত্বশ্রূণ্যবর্জ্জয়ৎ॥
তান্ পরিষ্বজ্য বাহুভ্যামুত্থাপ্য চ মহাবলঃ।
আসনেষ্বাসতেত্যুক্ত্বা ততো বাক্যং জগাদ হ॥
ভবন্তো মম সর্ব্বস্বং ভবন্তো জীবিতং মম।
ভবদ্ভিশ্চ কৃতং রাজ্যং পালয়ামি নরেশ্বরাঃ॥
ভবন্তঃ কৃতশাস্ত্রার্থা বুদ্ধ্যা চ পরিনিষ্ঠিতাঃ।
সংভূয় চ মদর্থোঽয়মন্বেষ্টব্যো নরেশ্বরাঃ॥
তদা বদতি কাকুৎস্থে অবধানপরায়ণঃ।
উদ্বিগ্নমনসঃ সর্ব্বে কিন্নু রাজাভিধাস্যতি॥
তেষাং সমুপবিষ্টানাং সর্ব্বেষাং দীনচেতসাম্।
উবাচ বাক্যং কাকুৎস্থো মুখেন পরিশুষ্যতা॥
সর্ব্বে শৃণুত ভদ্রং বো মা কুরুধ্বং মনোঽন্যথা।
পৌরাণাং মম সীতায়া যাদৃশী বর্ত্ততে কথা॥
পৌরাপবাদঃ সুমহান্ তথা জনপদস্য চ।
বর্ত্ততে ময়ি বীভৎসা মম মর্ম্মাণি কৃন্ততি॥
অহং কিল কুলে জাত ইক্ষ্বাকূণাং মহাত্মনাম্।
সীতাপি সৎকুলে জাতা জনকানাং মহাত্মনাম্॥

* * * *

অন্তরাত্মা চ মে বেত্তি সীতাং শুদ্ধাং যশস্বিনীম্।
ততো গৃহীত্বা বৈদেহীমযোধ্যামহমাগতঃ॥
অয়ং তু মে মহান্ বাদঃ শোকশ্চ হৃদি বর্ত্ততে।
পৌরাপবাদঃ সুমহাংস্তথা জনপদস্য চ॥
অকীর্ত্তির্যস্য গীয়েত লোকে ভূতস্য কস্যচিৎ।
পতত্যেবাধমাঁল্লোকান্ যাবচ্ছব্দঃ প্রকীর্ত্ত্যতে॥
অকীর্ত্তির্নিন্দ্যতে দেবৈঃ কীর্ত্তির্লোকেষু পূজ্যতে।
কীর্ত্ত্যর্থং তু সমারম্ভঃ সর্ব্বেষাং সুমহাত্মনাম্॥
অপ্যহং জীবিতং জহ্যাং যুষ্মান্ বা পুরুষর্ষভাঃ।
তস্মাদ্ভবন্তঃ পশ্যন্তু পতিতং শোকসাগরে॥
ন হি পশ্যাম্যহং ভূতে কিঞ্চিদ্দুঃখমতোঽধিকম্।
শ্বস্ত্বং প্রভাতে সৌমিত্রে সুমন্ত্রাধিষ্ঠিতং রথম্॥
আরুহ্য সীতামারোপ্য বিষয়ান্তে সমুৎসৃজ।
গঙ্গায়াস্তু পরে পারে বাল্মীকেস্তু মহাত্মনঃ॥
আশ্রমো দিব্যসঙ্কাশস্তমসাতীরমাশ্রিতঃ।
তত্রৈনাং বিজনে দেশে বিসৃজ্য রঘুনন্দন॥
শীঘ্রমাগচ্ছ সৌমিত্রে কুরুষ বচনং মম।
ন চাস্মিন্ প্রতিবক্তব্যং সীতাং প্রতি কথঞ্চন॥
তস্মাত্ত্বং গচ্ছ সৌমিত্রে নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
অপ্রীতির্হি পরা মহ্যং ত্বয্যেতৎ প্রতিবারিতে॥
শাপিতা হি ময়া যূয়ং পাদাভ্যাং জীবনেন চ।
যে মাং বাক্যান্তরে ব্রূয়ুরনুনেতুং কথঞ্চন॥
অহিতা নাম তে নিত্যং মদভীষ্টবিঘাতনাৎ।
মানয়ন্তু ভবন্তো মাং যদি মচ্ছাসনে স্থিতাঃ॥
ইতোঽদ্য নীয়তাং সীতাং কুরুষ বচনং মম॥" (১)

এই রচনা অতি মনোমোহিনী। রামায়ণের রাম ক্ষত্রিয়, মহোজ্জ্বল-কুলসম্ভূত, মহাতেজস্বী।

---

(১) অনুবাদ। তাঁহার এইমত কথা শুনিয়া রাম পরম দুঃখিতের ন্যায় সুহৃদ্ সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, এইরূপ কি আমাকে বলে?" সকলে ভূমিতে মস্তক নত করিয়া অভিবাদন ও প্রণাম করিয়া দুঃখিত রাঘবকে প্রত্যুত্তরে কহিলেন, "এইরূপ বটে—সংশয় নাই।" তখন শত্রুদমন রামচন্দ্র সকলের এই কথা শুনিয়া বয়স্যবর্গকে বিদায় দিলেন। বন্ধুবর্গকে বিদায় দিয়া বুদ্ধির দ্বারা অবধারিত করিয়া সমীপে আসীন দৌবারিককে এই কথা বলিলেন যে, শুভলক্ষণ সুমিত্রা-নন্দন লক্ষ্মণকে ও মহাভাগ ভরতকে ও অপরাজিত শত্রুঘ্নকে শীঘ্র আন। * * * তাঁহারা রামের মুখ রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায় এবং সন্ধ্যাকালীন আদিত্যের ন্যায় প্রভাহীন দেখিলেন। ধীমান্ রামচন্দ্রের নয়নযুগল বাষ্পপূর্ণ এবং মুখ হতশোভ পদ্মের ন্যায় দেখিলেন। তাঁহারা ত্বরিত তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া এবং তাঁহার পদযুগল মস্তকে ধারণ করিয়া সকলে সমাহিত হইয়া রহিলেন। রাম অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। পরে বাহুদ্বয়ের দ্বারা তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন ও উত্থাপনপূর্ব্বক মহাবল রামচন্দ্র তাঁহাদিগকে "আসনে উপবেশন কর" এই বলিয়া কহিতে লাগিলেন, "হে নরেশ্বরগণ, আমার সর্ব্বস্ব তোমরা, তোমরা আমার জীবন; তোমাদের কৃত রাজ্য আমি পালন করি। তোমরা শাস্ত্রার্থ অবগত এবং তোমাদের বুদ্ধি পরিমার্জ্জিত করিয়াছ। হে নরেশ্বরগণ, তোমরা মিলিত হইয়া, যাহা বলি, তাহার

তিনি পৌরাপবাদ শ্রবণে, ক্ষুধিত সিংহের ন্যায় রোষে দুঃখে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন।

ভবভূতির রামচন্দ্র তৎপরিবর্ত্তে স্ত্রীলোকের মত পা ছড়াইয়া কাঁদিতে বসিলেন। তাঁহার ক্রন্দনের কিয়দংশ পূর্ব্বেই উদ্ধৃত করিয়াছি। রামায়ণের সঙ্গে তুলনা করিবার জন্য অবশিষ্টাংশও উদ্ধৃত করিলাম।

"রাম। হা—কষ্টমতিবীভৎস-কর্ম্মা নৃশংসোঽস্মি সংবৃত্তঃ।

শৈশবাৎ প্রভৃতি পোষিতাং প্রিয়াং
সৌহৃদাদপৃথগাশ্রয়ামিমাম্।
ছদ্মনা পরিদদামি মৃত্যবে
শৌনিকো গৃহ-শকুন্তিকামিব॥
তৎ কিমস্পর্শনীয়ঃ দেবীং দূষয়ামি।"
[সীতায়াঃ শিরঃ স্বৈরমুন্নময্য বাহুমাকর্ষন্]

অপূর্ব্ব-কর্ম্ম-চাণ্ডালময়ি মুগ্ধে বিমুঞ্চ মাম্।
শ্রিতাসি চন্দন-ভ্রান্ত্যা দুর্ব্বিপাকং বিষদ্রুমম্॥

[উত্থায়] হন্ত! বিপর্য্যস্তঃ সম্প্রতি জীবলোকঃ, পর্য্যবসিতং জীবিত-প্রয়োজনং রামস্য, শূন্যমধুনা জীর্ণারণ্যং জগৎ, অসারঃ সংসারঃ, কষ্ট-প্রায়ং শরীরং, অশরণোঽস্মি, কিং করোমি, কা গতিঃ। অথবা—

দুঃখসংবেদনায়ৈব রামে চৈতন্যমাহিতম্।
মর্ম্মোপঘাতিভিঃ প্রাণৈর্ব্বজ্র-কীলায়িতং স্থিরৈঃ॥

হা অম্ব অরুন্ধতি, হা ভগবন্তৌ বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রৌ, হা ভগবন্ পাবক, হা দেবি ভূত-ধাত্রি, হা তাত জনক, হা তাত, হা মাতরঃ, হা পরমোপকারিন্ লঙ্কাধিপতে বিভীষণ, হা প্রিয়সখে সুগ্রীব, হা সৌম্য হনূমন্, হা সখি ত্রিজটে, মুষিতাঃ স্থ পরিভূতাঃ স্থ রামহতকেন। অথবা কস্ত তেষামহমিদানী-মাহ্বানে।

তে হি মন্যে মহাত্মানঃ কৃতঘ্নেন দুরাত্মনা।
ময়া গৃহীতনামানঃ স্পৃশ্যন্ত ইব পাপ্মনা॥

যোঽহম্—

বিস্রম্ভাদুরসি নিপত্য লব্ধনিদ্রা-
মুন্মুচ্য প্রিয়গৃহিণীং গৃহস্য শোভাম্।
আতঙ্কস্ফুরিতকঠোরগর্ভগুর্ব্বীং
ক্রব্যাদ্ভ্যো বলিমিব নির্ঘৃণঃ ক্ষিপামি॥

অনুসন্ধান কর।" রামচন্দ্র এই কথা বলিলে অবধান-পরায়ণ ভ্রাতৃগণ, রাজা কি বলেন, এই ভাবিয়া উদ্বিগ্ন-চিত্ত হইয়া রহিলেন।

তখন সেই দীনচেতা উপবিষ্ট ভ্রাতৃগণকে পরিশুষ্ক-মুখে রামচন্দ্র বলিতে লাগিলেন, "তোমাদিগের মঙ্গল হউক। আমার সীতার সম্বন্ধে পৌরজনমধ্যে যেরূপ কথা বর্ত্তিয়াছে, তাহা শুন—অন্যথা করিও না। জনপদে এবং পৌরজনমধ্যে আমার সুমহান্ অপবাদরূপ বীভৎস কথা রটিয়াছে, আমার তাহাতে মর্ম্মচ্ছেদ করিতেছে। আমি মহাত্মা ইক্ষ্বাকুদিগের কুলে জন্মিয়াছি, সীতাও মহাত্মা জনকরাজের সৎকুলে জন্মিয়াছেন। আমার অন্তরাত্মাও জানে যে, যশস্বিনী সীতা শুদ্ধচরিত্রা।

তখন আমি বৈদেহীকে গ্রহণ করিয়া অযোধ্যায় আসিলাম। এক্ষণে এই মহান্ অপবাদে আমার হৃদয়ে শোক বর্ত্তিতেছে। পৌরজনমধ্যে এবং জনপদে সুমহান্ অপবাদ হইয়াছে। লোকে যাহার অকীর্ত্তি-গান করে, যাবৎ সেই কীর্ত্তি লোকে প্রকীর্ত্তিত হইবে, তাবৎ সে অধম লোকে পতিত থাকিবে। দেবতারা অকীর্ত্তির নিন্দা করেন এবং কীর্ত্তিই সকল লোকে পূজিত হয়। সকল মহাত্মা ব্যক্তিদের যত্ন কীর্ত্তিরই জন্য। হে পুরুষর্ষভগণ, আমি অপবাদ ভয়ে ভীত হইয়া, জীবন ত্যাগ করিতে পারি, সীতার ত কথাই নাই।

অতএব তোমরা দেখ, আমি কি শোকসাগরে পতিত হইয়াছি। আমি ইহার অধিক দুঃখ জগতে আর দেখি না। অতএব হে সৌমিত্রে! তুমি কল্য প্রভাতে সুমন্ত্রাধিষ্ঠিত রথে সীতাকে আরোপণ করিয়া, স্বয়ং আরোহণ করিয়া তাঁহাকে দেশান্তরে ত্যাগ করিয়া আইস। গঙ্গার অপর-পারে তমসা নদীর তীরে মহাত্মা বাল্মীকি মুনির স্বর্গ-তুল্য আশ্রম। হে রঘুনন্দন! সেই বিজন দেশে তুমি ইহাকে ত্যাগ করিয়া শীঘ্র আইস,— আমার বচন রক্ষা কর,—সীতা পরিত্যাগ বিষয়ে তুমি ইহার প্রতিবাদ কিছুই করিও না, অতএব হে সৌমিত্রে! যাও—এ বিষয়ে আর কিছু বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। তুমি যদি এবিষয়ে বারণ কর, তবে আমার পরম অপ্রীতিকর হইবে। আমি চরণের স্পর্শে এবং জীবনের দ্বারা তোমাদিগকে শপথ করাইতেছি যে, যে আমাকে ইহাতে অনুনয় করিবার জন্য কোনরূপ কোন কথা বলিবে, আমার অভীষ্টহানি হেতুক তাহার শত্রুখ্যাতি নিত্য বর্ত্তিবে। যদি আমার আজ্ঞাবহ থাকিয়া তোমরা আমাকে সম্মান করিতে চাও, তোমরা তবে আমার বচন রক্ষা কর, অদ্য সীতাকে লইয়া যাও।

[সীতায়াঃ পাদৌ শিরসি কৃত্বা] দেবি, দেবি অয়ং পশ্চিমস্তে রামস্য শিরসা পাদপঙ্কজস্পর্শঃ।

[ইতি রোদিতি।] (১)

ইহার অনেকগুলি কথা সকরুণ বটে, কিন্তু ইহা আর্য্যবীর্য্যপ্রতিম মহারাজ রামচন্দ্রের মুখ হইতে নির্গত না হইয়া, আধুনিক কোন বাঙ্গালী বাবুর মুখ হইতে নির্গত হইলেই উপযুক্ত হইত। কিন্তু ইহাতেও কোন মান্য আধুনিক লেখকের মন উঠে নাই। তিনি স্বপ্রণীত বাঙ্গালা গ্রন্থে আরও কিছু বাড়াবাড়ি করিয়াছেন, তাহা পাঠকালে রামের কান্না পড়িয়া আমাদের মনে হইয়াছিল যে, বাঙ্গালীর মেয়েরা স্বামী বা পুত্রকে বিদেশে চাকরী করিতে পাঠাইয়া এইরূপ করিয়া কাঁদে বটে।

ভবভূতির পক্ষে ইহা বক্তব্য যে, উত্তরচরিত নাটক। নাটকের উদ্দেশ্য হৃচ্চিত্র; রামায়ণ প্রভৃতি উপাখ্যানে কাব্যের উদ্দেশ্য ভিন্নপ্রকার। সে উদ্দেশ্য কার্য্যপরম্পরার সরল বিবৃতি। কে কি করিল, তাহাই উপাখ্যান-কাব্যে লেখকেরা প্রতীয়মান করিতে চাহেন। সে সকল কার্য্য করিবার সময়ে কে কি ভাবিল, তাহা স্পষ্টীকৃত করিবার প্রয়োজন তাদৃশ বলবৎ নহে, কিন্তু নাটকে সেই প্রয়োজনই বলবৎ। নাটককারের নিকট আমরা নায়কের হৃদয়ের প্রকৃত চিত্র চাহি। সুতরাং তাঁহাকে চিত্তভাব অধিকতর স্পষ্টীকৃত করিতে হয়। অনেক বাগাড়ম্বর আবশ্যক হয়। কিন্তু তথাপি উত্তরচরিতের প্রথমাঙ্কে রামবিলাপ মনোহর নহে। সে কথাগুলি বীরবাক্য নহে—নবপ্রেমমুগ্ধ অসারবান্ যুবকের কথা।

প্রথমাঙ্কে ও দ্বিতীয়াঙ্কের মধ্যে দ্বাদশ বৎসর কাল ব্যবধান। উত্তরচরিতের একটি দোষ এই যে, নাটকবর্ণিত ক্রিয়া সকলের পরস্পর কালগত নৈকট্য নাই। এই সম্বন্ধে উইণ্টর্স টেল নামক সেক্ষপীয়রকৃত বিখ্যাত নাটকের সঙ্গে ইহার বিশেষ সাদৃশ্য আছে।

এই দ্বাদশ বৎসরমধ্যে সীতা যমজসন্তান প্রসব করিয়া স্বয়ং পাতালে অবস্থান করিলেন, তাঁহার

---

(১) হায়! কি কষ্ট! নিষ্ঠুরের মত কি ঘৃণাজনক কর্ম্মই করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। বাল্যাবস্থা হইতে যাঁহাকে প্রিয়তমা বলিয়া প্রতিপালিত করিয়াছি, যিনি, গাঢ় প্রণয় বশতঃ কোনরূপেই আপনাকে আমা হইতে ভিন্ন বোধ করেন না, আজি আমি সেই প্রিয়াকে মাংসবিক্রয়ী যেমন গৃহপালিতা পক্ষিণীকে অনায়াসে বধ করে, সেইরূপ ছলক্রমে করাল কালগ্রাসে নিপাতিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। অতএব পাতকী, সুতরাং অস্পৃশ্য আমি দেবীকে আর কেন কলঙ্কিত করি? [ক্রমে ক্রমে সীতার মস্তক আপনার বক্ষঃস্থল হইতে নামাইয়া বাহু আকর্ষণ পূর্ব্বক] অয়ি মুগ্ধে! এ অভাগাকে পরিত্যাগ কর। আমি অদৃষ্টচর এবং অশ্রুতপূর্ব্ব পাপকর্ম্ম করিয়া চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি। হায়! তুমি চন্দনবৃক্ষভ্রমে এই ভয়ানক বিষবৃক্ষকে (কি কুক্ষণেই) আশ্রয় করিয়াছিলে! (উঠিয়া) হায়, এক্ষণে জীবলোক উচ্ছিন্ন হইল। রামেরও আর জীবিত থাকিবার প্রয়োজন নাই। এক্ষণে পৃথিবী শূন্য এবং জীর্ণ অরণ্য সদৃশ নীরস বোধ হইতেছে। সংসার অসার হইয়াছে। জীবন কেবলমাত্র ক্লেশের নিদানস্বরূপ বোধ হইতেছে। হায়! এত দিনে আশ্রয়-বিহীন হইলাম। এখন কি করি, (কোথায় যাই,) কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। (চিন্তা করিয়া) উঃ, আমার এখন কি গতি হইবে? অথবা সে চিন্তায় আর কি হইবে? যাবজ্জীবন দুঃখভোগ করিবার নিমিত্তই (হতভাগ্য) রামের দেহে প্রাণবায়ুর সঞ্চার হইয়াছিল, নতুবা নিজ জীবন পর্য্যন্ত কেন বজ্রের ন্যায় মর্ম্মভেদ করিতে থাকিবে? হা মাতঃ অরুন্ধতি! হা ভগবন্ বশিষ্ঠদেব! হা মহাত্মন্ বিশ্বামিত্র! হা ভগবন্ অগ্নে! হা নিখিল-ভূতধারী ভগবতি বসুন্ধরে! হা তাত জনক! হা পিতঃ দশরথ! হা কৌশল্যা প্রভৃতি মাতৃগণ! হা পরমোপকারিন্ লঙ্কাধিপতি বিভীষণ! হা প্রিয়বন্ধো সুগ্রীব! হা সৌম্য হনূমন্! হা সখি ত্রিজটে! আজি হতভাগ্য পাপিষ্ঠ রাম তোমাদের সর্ব্বনাশ, সর্ব্বস্বাপহরণ এবং অবমাননা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। (চিন্তা করিয়া) অথবা এই হতভাগ্য এখন তাহাদের নামোল্লেখ করিবারও উপযুক্ত নহে। কারণ, এই পাপাত্মা কৃতঘ্ন পামর কেবলমাত্র সেই সকল মহাত্মা-দিগের নাম গ্রহণ করিলেও তাঁহারা পাপস্পৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা;—যেহেতুক, আমি দৃঢ়বিশ্বাস বশতঃ বক্ষঃস্থলে নিদ্রিতা প্রেয়সীকে স্বপ্নাবস্থায় উদ্বেগ বশতঃ ঈষৎ কম্পিত গর্ভভরে মন্থরা দেখিয়াও অনায়াসেই উন্মোচন পূর্ব্বক নির্দ্দয়হৃদয়ে মাংসাশী রাক্ষসদিগকে উপহারের ন্যায় নিক্ষেপ করিতে সমর্থ হইয়াছি। (সীতার চরণদ্বয় মস্তক দ্বারা গ্রহণপূর্ব্বক) দেবি! দেবি! রামের দ্বারা তোমার পাদপঙ্কজের এই শেষ স্পর্শ হইল। (এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন)

পুত্রেরা বাল্মীকির আশ্রমে প্রতিপালিত এবং সুশিক্ষিত হইতে লাগিল। রামচন্দ্রের পূর্ব্বপ্রদত্ত বরে দিব্যাস্ত্র তাহাদের স্বতঃ সিদ্ধ হইল। এ দিকে রামচন্দ্র অশ্বমেধযজ্ঞানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণের পুত্র চন্দ্রকেতু সৈন্য লইয়া যজ্ঞের অশ্বরক্ষণে প্রেরিত হইলেন। কোন দিন রামচন্দ্র দৈবাদেশে জানিলেন যে, শম্বুক নামক কোন নীচজাতীয় ব্যক্তি তাঁহার রাজ্যমধ্যে তপশ্চরণ করিতেছে। ইহাতে রাজ্যমধ্যে অকাল-মৃত্যু উপস্থিত হইতেছে। রামচন্দ্র ঐ শূদ্র তপস্বীর শিরশ্ছেদ-মানসে সশস্ত্রে তাহার অনুসন্ধানে নানা দেশ পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। শম্বুক পঞ্চবটীর বনে তপঃ করিতেছিল।

দ্বিতীয়াঙ্কের বিষ্কম্ভকে মুনিপত্নী আত্রেয়ী এবং বনদেবতা বাসন্তীর প্রমুখাৎ এই সকল বৃত্তান্ত প্রকাশ হইয়াছে। যেমন প্রথমাঙ্কের পূর্ব্বে প্রস্তাবনা, সেইরূপ অন্যান্য অঙ্কের একটি একটি বিষ্কম্ভক আছে। এগুলি অতি মনোহর। কখন বিদুষী ঋষিপত্নী, কখন প্রেমময়ী বনদেবী, কখন তমসা, মুরলা নদী, কখন বিদ্যাধর-বিদ্যাধরী, এইরূপে সৌন্দর্য্যময়ী সৃষ্টির দ্বারা ভবভূতি বিষ্কম্ভক সকল অতি রমণীয় করিয়াছেন। দ্বিতীয়াঙ্কের আরম্ভই সুন্দর। যথা;—

"অধ্বগবেশা তাপসী। অয়ে! বনদেবতেয়ং ফল-কুসুমপল্লবার্ঘ্যেণ মামুপতিষ্ঠতে।" (১)

শিক্ষা সম্বন্ধে আত্রেয়ীর কথা বড় সুন্দর—

"বিতরতি গুরুঃ প্রাজ্ঞে বিদ্যাং যথৈব তথা জড়ে,
ন চ খলু তয়োর্জ্ঞানে শক্তিং করোত্যপহন্তি বা।
ভবতি চ তয়োর্ভূয়ান্ ভেদঃ ফলং প্রতি তদ্‌যথা,
প্রভবতি শুচির্ব্বিম্বোদ্‌গ্রাহে মণির্ন মৃদাং চয়ঃ॥" (২)

হরেস্ হেমান্ উইল্‌সন্ বলেন যে, উত্তরচরিতে কতকগুলি এত সুন্দর ভাব আছে যে, তদপেক্ষা সুন্দর ভাব কোন ভাষাতেই নাই। উপরে উদ্ধৃত কবিতা এই কথার উদাহরণস্বরূপ তিনি উল্লেখ করিয়াছেন।

রামচন্দ্র শম্বুকের সন্ধান করিতে করিতে পঞ্চবটীর বনে শম্বুককে পাইলেন এবং খড়্গ দ্বারা তাহাকে প্রহার করিলেন। শম্বুক দিব্য পুরুষ রামের প্রহারে শাপমুক্ত হইয়া রামকে প্রণিপাত করিল এবং জনস্থানাদি রামচন্দ্রের পূর্ব্বপরিচিত স্থান-সকল দেখাইতে লাগিল। উভয়ের কথোপকথনে বনবর্ণনা অতি মনোহর।

"স্নিগ্ধশ্যামাঃ ক্বচিদপরতো ভীষণাভোগরুক্ষাঃ
স্থানে স্থানে মুখরককুভো ঝাঙ্কৃতৈর্নির্ঝরাণাম্।
এতে তীর্থাশ্রমগিরিসরিদ্‌গর্ত্তকান্তারমিশ্রাঃ
সংদৃশ্যন্তে পরিচিতভুবো দণ্ডকারণ্যভাগাঃ॥"

"এতানি খলু সর্ব্বভূতলোমহর্ষণানি উন্মত্তচণ্ড-শ্বাপদকুলসঙ্কুলগিরিগহ্বরাণি জনস্থানপর্য্যন্তদীর্ঘা-রণ্যানি দক্ষিণাং দিশমভিবর্ত্তন্তে।

তথাহি—

নিষ্কূজস্তিমিতাঃ ক্বচিৎ ক্বচিদপি প্রোচ্চণ্ডসত্ত্বস্বনাঃ,
স্বেচ্ছাসুপ্তগভীরঘোষভুজগশ্বাসপ্রদীপ্তাগ্নয়ঃ।
সীমানঃ প্রদরোদরেষু বিলসৎস্বল্পাম্ভসো যা স্বয়ং
তৃষ্যদ্ভিঃ প্রতিসূর্য্যকৈরজগরস্বেদদ্রবঃ পীয়তে॥

অথৈতানি মদকলময়ূরকণ্ঠকোমলচ্ছবিভিরব-কীর্ণানি পর্ব্বতৈরবিরলনিবিষ্টনীলবহুলচ্ছায়তরুষণ্ড-মণ্ডিতানি অসম্ভ্রান্তবিবিধমৃগযূথানি পশ্যন্তু মহানুভাবঃ প্রশান্তগম্ভীরাণি মধ্যমারণ্যকানি।

ইহ সমদশকুন্তাক্রান্তবাণীরবীরুৎ-
প্রসবসুরভিশীতস্বচ্ছতোয়া বহন্তি।
ফলভরপরিণামশ্যামজম্বুনিকুঞ্জ-
স্খলনমুখরভূরিস্রোতসো নির্ঝরিণ্যাঃ॥

অপিচ—

দধতি কুহরভাজামত্র ভল্লূকযূনা-
মনুরসিত গুরূণি স্ত্যানমম্বূকৃতানি।

শিশিরকটুকষায়ঃ স্ত্যায়তে শল্লকীনা-
মিভদলিতবিকীর্ণগ্রন্থিনিষ্যন্দগন্ধঃ॥" (১)

প্রবন্ধের অসহ্য দৈর্ঘ্যশঙ্কায় আর অধিক উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না।

---

(১) অহো! এই বনদেবতা ফলপুষ্পপল্লবার্ঘ্যের দ্বারা আমার অভ্যর্থনা করিতেছেন।

(২) গুরু বুদ্ধিমান্‌কে যেমন শিক্ষা দেন, জড়কেও তদ্রূপ করিয়া দিয়া থাকেন। কাহারও জ্ঞানের বিশেষ সাহায্য বা ক্ষতি করেন না। কিন্তু তথাপি তাহাদের মধ্যে ফলের তারতম্য ঘটে। কেবল নির্ম্মল মণিই প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিতে পারে; মৃত্তিকা তাহা পারে না।

(১) এই যে পরিচিতভূমি দণ্ডকারণ্যভাগ দেখা যাইতেছে। কোথাও স্নিগ্ধশ্যাম, কোথাও ভয়ঙ্কর রুক্ষদৃশ্য, কোথাও বা নির্ঝরগণের ঝরঝর শব্দে দিক্ সকল শব্দিত হইতেছে, কোথাও পুণ্যতীর্থ, কোথাও

শম্বুকবিদায়ের পর পুনরাগমনপূর্ব্বক রামকে জানাইলেন যে, অগস্ত্য রামাগমন শুনিয়া তাঁহাকে আশ্রমে আমন্ত্রিত করিতেছেন শুনিয়া রাম তথায় চলিলেন। গমনকালীন ক্রৌঞ্চাবত পর্ব্বতাদির বর্ণনা অতি মনোহর। আমরা সচরাচর অনুপ্রাসালঙ্কারের বর্ণনা করি না, কিন্তু এরূপ অনুপ্রাসের উপর বিরক্ত হওয়া যায় না।

"গুঞ্জৎকুঞ্জকুটীরকৌশিকঘটাঘুৎকারবৎকীচক-
স্তম্বাডম্বরমূকমৌকুলিকুলঃ ক্রৌঞ্চাবতোঽয়ং গিরিঃ।
এতস্মিন্ প্রচলাকিনাং প্রচলতামুদ্বেজিতাঃ কূজিতৈ
-রুদ্বেল্লন্তি পুরাণরোহিতকস্কন্ধেষু কুম্ভীনসাঃ॥
এতে তে কুহরেষু গদ্গদনদদ্গোদাবরীবারয়ো
মেঘালঙ্কৃতমৌলিনীলশিখরাঃ ক্ষৌণীভৃতো দক্ষিণাঃ।

অন্যোঽন্যপ্রতিঘাতসঙ্কুলচলৎকল্লোলকোলাহলৈ-
রুত্তালাস্ত ইমে গভীরপয়সঃ পুণ্যাঃ সরিৎসঙ্গমাঃ॥" (১)

তৃতীয়াঙ্ক অতি মনোহর। সত্য বটে যে, এই উৎকৃষ্ট নাটকে ক্রিয়াপারম্পর্য্য বড় মনোহর নহে এবং তৃতীয়াঙ্ক সেই দোষে বিশেষ দুষ্ট। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম অঙ্ক যেরূপ বিস্তৃত, তদনুরূপ বহুল ক্রিয়া-পরম্পরা নায়ক-নায়িকাগণ কর্তৃক সম্পন্ন হয় নাই। যিনি ম্যাক্‌বেথ পাঠ করিয়াছেন, তিনি জানেন যে, নাটকের বর্ণিত ক্রিয়াসকলের বাহুল্য, পারম্পর্য্য এবং শীঘ্র সম্পাদন কি প্রকার চিত্তকে মন্ত্রমুগ্ধ করে, কার্য্যগত এই গুণ নাটকের একটি প্রধান গুণ। উত্তরচরিতে তাহার বিরল প্রচার, বিশেষতঃ প্রথম ও তৃতীয়াঙ্কে। তথাপি ইহাতে কবি যে অপূর্ব্ব কবিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, সেই গুণে আমরা সে সকল দোষ বিস্মৃত হই।

দ্বিতীয়াঙ্কের বিষ্কম্ভক যেমন মধুর, তৃতীয়াঙ্কের বিষ্কম্ভক ততোঽধিক। গোদাবরীসংমিলিতা তমসা ও মুরলা নাম্নী দুইটি নদী রূপ ধারণ করিয়া রাম-সীতা-বিষয়িণী কথা কহিতেছে।

অদ্য দ্বাদশ বৎসর হইল, রামচন্দ্র সীতাকে বিসর্জ্জন করিয়াছেন। প্রথম-বিরহে তাঁহার যে গুরুতর শোক উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। কাল সহকারে সে শোকের লাঘব জন্মিবার সম্ভাবনা ছিল; কিন্তু তাহা ঘটে নাই, সর্ব্বসন্তাপ-হর্ত্তা কাল সন্তাপের সমতা সাধিতে পারে নাই।

অনির্ভিন্নগভীরত্বাদন্তর্গূঢ়ঘনব্যথঃ।
পুটপাকপ্রতীকাশো রামস্য করুণো রসঃ॥ (২)

এইরূপ মর্ম্মমধ্যে রুদ্ধসন্তাপে দগ্ধ হইয়া রাম পরিক্ষীণশরীরে রাজকর্ম্মানুষ্ঠান করিতেন। রাজকর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিলে সেই কষ্টের তাদৃশ বাহ্য প্রকাশ পায় না; কিন্তু আজি পঞ্চবটীতে আসিয়া রামের ধৈর্য্যাবলম্বনের উপায় নাই। এ আবার সেই জনস্থান, পদে পদে সীতাসহবাসের চিহ্ন-পরিপূর্ণ। এই জনস্থানে কত কাল, কত সুখে

মুনিগণের আশ্রমপদ, কোথাও পর্ব্বত, কোথাও নদী এবং মধ্যে মধ্যে অরণ্য।

এই যে জনস্থান পর্য্যন্ত দীর্ঘ অরণ্যসকল দক্ষিণ-দিকে চলিতেছে। এ সকল সর্ব্বলোকলোমহর্ষণ— অত্র গিরিগহ্বর উন্মত্ত প্রচণ্ড হিংস্র পশুগণে সমাকুল। কোথাও বা একেবারে নিঃশব্দ, কোথাও পশুদিগের প্রচণ্ডগর্জ্জন-পরিপূর্ণ, কোথাও বা স্বেচ্ছানুপ্ত গভীর-গর্জ্জনকারী ভুজঙ্গের নিশ্বাসে অগ্নি প্রজ্বলিত। কোথাও গর্ত্তে অল্প জল দেখা যাইতেছে, তৃষিত কৃকলাসেরা অজগরের ঘর্ম্মবিন্দু পান করিতেছে।

* * * দেখুন, এই মধ্যমারণ্যসকল কেমন প্রশান্ত-গম্ভীর। মদকলময়ূরের কণ্ঠের ন্যায় কোমলচ্ছবি পর্ব্বতে অবকীর্ণ, ঘননিবিষ্ট নীলপ্রধান কান্তি, অনতিপ্রৌঢ় বৃক্ষসমূহে শোভিত এবং ভয়শূন্য বিবিধ মৃগযূথে পরিপূর্ণ। স্বচ্ছতোয়া নির্ঝরিণীসকল বহুস্রোতে বহিতেছে, আনন্দিত পক্ষিসকল তত্রস্থ বেতসলতার উপর বসিতেছে, তাহাতে বেতসের কুসুম বৃন্তচ্যুত হইয়া সেই জলে পড়িয়া জলকে সুগন্ধ এবং সুশীতল করিতেছে, স্রোতঃ-পরিপক্বফলময় শ্যামজম্বুবনান্তে স্খলিত হওয়াতে শব্দিত হইতেছে, গিরিবিবরবাসী যুবা ভল্লুকদিগের থুৎকারশব্দ প্রতিধ্বনিতে গম্ভীর হইতেছে এবং গজগণের দ্বারা ভগ্ন শল্লকীবৃক্ষের বিক্ষিপ্ত গ্রন্থি হইতে শীতল কটু-কষায় সুগন্ধ বাহির হইতেছে।

(১) এই পর্ব্বত ক্রৌঞ্চাবত। এখানে অব্যক্তনাদী কুঞ্জকুটীরবাসী পেচককুলের ঘুৎকার শব্দিত বায়ুযোগ-ধ্বনিত বংশবিশেষের গুচ্ছে ভীত হইয়া কাকেরা নিঃশব্দে আছে এবং ইহাতে সর্পেরা চঞ্চল ময়ূরগণের কেকারবে ভীত হইয়া পুরাতন বটবৃক্ষের স্কন্ধে লুকাইয়া আছে। আর এই সকল দক্ষিণপর্ব্বত। পর্ব্বতকুহরে গোদাবরীবারিরাশি গদ্‌গদ নিনাদ করিতেছে, শিরোদেশ মেঘমালায় অলঙ্কৃত হইয়া নীল শোভা ধারণ করিয়াছে; আর এই গভীর জলশালিনী পবিত্রা নদীগণের সঙ্গম পরস্পরের প্রতিঘাত সঙ্কুল চঞ্চল তরঙ্গকোলাহলে দুর্দ্ধর্ষ হইয়া রহিয়াছে।

(২) অবিচলিত গভীরত্ব হেতুক হৃদয়মধ্যে রুদ্ধ, এই জন্য গূঢ়ব্যথ রামের সন্তাপ মুখবদ্ধ পাত্রমধ্যে পুট-পাকের সন্তাপের ন্যায় বাহিরে প্রকাশ পায় না।

সীতার সহিত বাস করিয়াছিলেন, তাহা পদে পদে মনে পড়িতেছে। রামের সেই দ্বাদশবৎসরের রুদ্ধ শোকপ্রবাহ ছুটিয়াছে—সে প্রবাহবলে এই গোদাবরীস্রোতঃস্খলিত শিলাচয়ের ন্যায় রামের হৃদয়-পাষাণ আজি কোথায় যাইবে, কে বলিতে পারে?

জনস্থানবাহিনী করুণাদ্রাবিতা নদীগুলি দেখিল যে, আজি বড় বিপদ্‌। তখন মুরলা কলকল করিয়া গোদাবরীকে বলিতে চলিল, "ভগবতি! সাবধান থাকিও। আজি রামের বড় বিপদ্‌। দেখিও, রাম যদি মূর্চ্ছা যান, তবে তোমার জল-কণাপূর্ণ শীতল তরঙ্গের বাতাসে মৃদু মৃদু তাঁহার মূর্চ্ছাভঙ্গ করিও।" রঘুকুলদেবতা ভাগীরথী এই শোকতপনাতপসন্তাপ হইতে রামকে রক্ষা করিবার জন্য এক সর্ব্বসন্তাপ-সংহারিণী ছায়াকে জনস্থানে পাঠাইলেন। সেই ছায়ার স্নিগ্ধতায় অদ্যাপি ভারতবর্ষ মুগ্ধ রহিয়াছে। সেই ছায়া হইতে কবি তৃতীয়াঙ্কের নাম রাখিয়াছিলেন, "ছায়া।"—এই ছায়া, সেই বহুকাল-বিস্মৃতা, পাতালপ্রবিষ্টা, শীর্ণদেহমাত্রাবশিষ্টা, হতভাগিনী রামমোহিনী সীতার ছায়া।

সীতা লবকুশকে প্রসব করিলে পর, ভাগীরথী এবং পৃথিবী বালক দুটিকে বাল্মীকির তপোবনে রাখিয়া সীতাকে পাতালে লইয়া গিয়া রাখিয়াছিলেন। অদ্য কুশলবের জন্মতিথি—সীতাকে স্বহস্ত-রচিত কুসুমাঞ্জলি দিয়া পতিকুলাদিপুরুষ সূর্য্যদেবের পূজা করিতে ভাগীরথী এই জনস্থানে পাঠাইলেন এবং আপন দৈবশক্তিপ্রভাবে রঘুকুল-বধূকে অদর্শনীয়া করিলেন। ছায়ারূপিণী সীতা সকলকে দেখিতে পাইতেছিলেন, সীতাকে কেহ দেখিতে পাইতেছিল না।

সীতা তখন জানেন না যে, রাম জনস্থানে আসিয়াছেন। সীতাও আসিয়া জনস্থানে প্রবেশ করিলেন। তখন তাঁহার আকৃতি কিরূপ? তাঁহার মুখ "পরিপাণ্ডুদুর্ব্বল-কপোলসুন্দর"—কবরী বিলোল—শারদাতপসন্তপ্ত কেতকীকুসুমান্তর্গত পত্রের ন্যায়, বন্ধনবিচ্যুত কিসলয়ের মত, সীতা সেই অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। জনস্থানে তাঁহার গভীর প্রেম। পূর্ব্বসুখের স্থান দেখিয়া বিস্মৃতি জন্মিল—আবার সেই দিন মনে পড়িল। যখন সীতা রামসহবাসে এই বনে থাকিতেন, তখন জনস্থান-বনদেবতা বাসন্তীর সহিত তাঁহার সখীত্ব হইয়াছিল। তখন সীতা একটি করিশাবককে স্বহস্তে শল্লকীর পল্লবাগ্র-ভাগ ভোজন করাইয়া পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন করিয়াছিলেন। এখন সেই করিশাবকও ছিল। এইমাত্র সে বধূসঙ্গে জলপানে গিয়াছে। এক মত্ত যূথপতি আসিয়া অকস্মাৎ তৎপ্রতি আক্রমণ করিল। সীতা তাহা দেখেন নাই। কিন্তু অন্তরস্থিতা বাসন্তী দেখিতে পাইয়াছিলেন। বাসন্তী তখন উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন, সর্ব্বনাশ হইল, সীতার পালিত করিকরভকে মারিয়া ফেলিল। রব সীতার কর্ণে গেল। সেই জনস্থান, সেই পঞ্চবটী! সেই বাসন্তী। সেই করিকরভ! সীতার ভ্রান্তি জন্মিল। পুত্রীকৃত হস্তি-শাবকের বিপদে বিহ্বলচিত্ত হইয়া তিনি ডাকিলেন, "আর্য্য-পুত্র! আমার পুত্রকে বাঁচাও!" কি ভ্রম! আর্য্যপুত্র? কোথায় আর্য্যপুত্র? আজি বার বৎসর সে নাম নাই! অমনি সীতা মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। তমসা তাঁহাকে আশ্বস্ত করিতে লাগিলেন। এ দিকে রামচন্দ্র লোপামুদ্রার আহ্বানানুসারে অগস্ত্যাশ্রমে যাইতেছিলেন। পঞ্চবটীবিচরণ করিবার মানসে সেইখানে বিমান রাখিতে বলিলেন। রামের কণ্ঠস্বর মূর্চ্ছিতা সীতার কানে গেল। অমনি সীতার মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল। সীতা ভয়ে, অহ্লাদে উঠিয়া বসিলেন। বলিলেন, "এ কি এ? জলভরা মেঘের স্তনিতগম্ভীর মহাশব্দের মত কে কথা কহিল? আমার কর্ণবিবর যে ভরিয়া গেল! আজি কে আমা হেন মন্দভাগিনীকে সহসা আহ্লাদিত করিল?" দেখিয়া তমসার চক্ষু জলে ভরিয়া গেল। তমসা বলিলেন, "কেন বাছা, একটা অপরিস্ফুট শব্দ শুনিয়া মেঘের ডাকে ময়ূরীর মত চমকিয়া উঠিলি?" সীতা বলিলেন, "কি বলিলে ভগবতি? অপরিস্ফুট? আমি যে স্বরেই চিনেছি, আমার সেই আর্য্যপুত্র কথা কহিতেছেন।" তমসা তখন দেখিলেন, আর লুকান বৃথা—বলিলেন, "শুনিয়াছি, মহারাজ রামচন্দ্র কোন শূদ্র তাপসের দণ্ড জন্য এই জনস্থানে আসিয়াছেন।" শুনিয়া সীতা কি বলিলেন? বারো বৎসরের পরে স্বামী নিকটে, নয়নের পুত্তলির অধিক প্রিয়, হৃদয়ের শোণিতেরও অধিক প্রিয়, সেই স্বামী আজি বারো বৎসরের পর নিকটে, শুনিয়া সীতা কি বলিলেন? শুনিয়া সীতা কিছুই আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন না—"কৈ স্বামী—কোথায় সে প্রাণাধিক?" বলিয়া দেখিবার জন্য তমসাকে উৎপীড়িত করিলেন না, কেবল বলিলেন—

"দিঠ্‌ঠিআ অপরিহীণরাঅধম্মো ক্খু সো রাআ"
—"সৌভাগ্যক্রমে সে রাজার রাজধর্ম্ম-পালনে ত্রুটি হইতেছে না।"

যে কোন ভাষায় যে কোন নাটকে যাহা কিছু আছে, এতদংশ সৌন্দর্য্যে তাহার তুল্য সন্দেহ নাই। "দিঠ্‌ঠিআ অপরিহীণরাঅধম্মো কৃখু সো রাআ।" এইরূপ বাক্য কেবল সেক্ষপীয়রেই পাওয়া যায়। রাম আসিয়াছেন শুনিয়া সীতা আহ্লাদের কথা কিছুই বলিলেন না; কেবল বলিলেন, "সৌভাগ্য-ক্রমে সে রাজার রাজধর্ম্ম পালনে ক্রটি হইতেছে না।"—কিন্তু দূর হইতে রামের সেই বিরহক্লিষ্ট প্রভাত-চন্দ্রমণ্ডলবৎ আকার দেখিয়া "সখি, আমায় ধর" বলিয়া তমসাকে ধরিয়া বসিয়া পড়িলেন। এ দিকে রাম পঞ্চবটী দেখিতে দেখিতে সীতাবিরহপ্রদীপ্তানলে পুড়িতে পুড়িতে "সীতে সীতে!" বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন; দেখিয়া সীতাও উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিয়া তমসার পদপ্রান্তে পতিত হইয়া ডাকিলেন, "ভগবতি তমসে! রক্ষা কর! রক্ষা কর! আমার স্বামীকে বাঁচাও!"

তমসা বলিলেন, "তুমিই বাঁচাও। তোমার স্পর্শে উঁনি বাঁচিতে পারেন।" শুনিয়া সীতা বলিলেন, "যা হউক, তা হউক, আমি তাহাই করিব।" (১) এই বলিয়া সীতা রামকে স্পর্শ করিলেন। রাম চেতনা প্রাপ্ত হইলেন।

পরে সীতার পূর্ব্বকালের প্রিয়সখী বনদেবতা বাসন্তী সীতার পুত্রীকৃত করিশাবকের সহায়ান্বেষণ করিতে করিতে সেইখানে উপস্থিত হইলেন। রামের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হওয়ায়, রাম করি-শিশুর রক্ষার্থ গেলেন। সে হস্তিশিশু স্বয়ং শত্রুজয় করিয়া করিণীর সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিল। তদ্বর্ণনা অতি মধুর।

"যেনোদ্গচ্ছদ্‌বিসকিসলয়স্নিগ্ধদন্তাঙ্কুরেণ
ব্যাকৃষ্টস্তে সুতনু লবলীপল্লবঃ কর্ণপূরাৎ।
সোঽয়ং পুত্রস্তব মদমুচাং বারণানাং বিজেতা
যৎ কল্যাণং বয়সি তরুণে ভাজনং তস্য জাতঃ॥

সখি বাসন্তি! পশ্য পশ্য কান্তানুবৃত্তিচাতুর্য্যমপি শিক্ষিতং বৎসেন।

লীলোৎখাতমৃণালকাণ্ডকবলচ্ছেদেষু সম্পাদিতাঃ
পুষ্পৎপুষ্করবাসিতস্য পয়সো গণ্ডূষসংক্রান্তয়ঃ।
সেকঃ শীকরিণা করেণ বিহিতঃ কামং বিরামে পুন-
র্যৎস্নেহাদনরালনালনলিনীপত্রাতপত্রং ধৃতম্॥" (১)

এ দিকে পুত্রীকৃত করী দেখিয়া সীতার গর্ভজ-পুত্রদিগকে মনে পড়িল। কেবল স্বামিদর্শনে বঞ্চিতা নহেন, পুত্রমুখ-দর্শনেও বঞ্চিতা। সেই মাতৃ-মুখনির্গত পুত্রস্মৃতিবাক্য উদ্ধৃত করিতেছি;—

"মম পুত্তকাণং ইসিবিরলকোমলধবলদসণুজ্জল-কবোলং অণুবদ্ধমুদ্ধকাঅলিবিহসিদং নিবদ্ধকাঅসি-হণ্ডঅং অমলমুহপুণ্ডরীঅজুঅলং ণ পরিচুম্বিদং অজ্জ-উত্তেণ।" (২)

(১) (যা হউক, তা হউক) এই কথার কত অর্থগাম্ভীর্য্য। বিদ্যাসাগর মহাশয় এই বাক্যের টীকায় লিখিয়াছেন যে, আমার পাণিস্পর্শে আর্য্যপুত্র বাঁচিবেন কি না, জানি না, কিন্তু ভগবতী বলিতেছেন বলিয়া আমি স্পর্শ করিব। ইহাতে এই বুঝিতে হইতেছে যে পাণিস্পর্শ সফল হইবে কি না, এই সন্দেহেই সীতা বলিলেন, "যা হউক, তা হউক।" কিন্তু আমাদিগের ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে বোধ হয় যে, সে সন্দেহে সীতা বলেন নাই যে, "যা হবার হউক।" সীতা ভাবিয়াছিলেন, "রামকে স্পর্শ করিবার আমার কি অধিকার? রাম আমাকে ত্যাগ করিয়াছেন, তিনি আমাকে বিনাপরাধে বিসর্জ্জন করিয়াছেন—বিসর্জ্জন করিবার সময়ে একবার আমাকে ডাকিয়াও বলেন নাই যে, আমি তোমাকে ত্যাগ করিলাম—আজি বারো বৎসর আমাকে ত্যাগ করিয়া সম্বন্ধ রহিত করিয়াছেন, আজি আবার তাঁহার প্রিয়পত্নীর মত তাঁহার গাত্রস্পর্শ করিব কোন্ সাহসে? কিন্তু তিনি ত মৃতপ্রায়! যা হউক, তা হউক, আমি তাঁহাকে স্পর্শ করিব।" তাই ভাবিয়া সীতাস্পর্শে রাম চেতনা প্রাপ্ত হইলে, সীতা বলিলেন, "ভঅবদি তমসে! ওসরহ্মযইদাব মং পেক্‌খিস্‌সদি তদো অপব্‌ভণুণ্ণাদসণিধাণেণ অহিঅদরং মম মহারাজো কুবিস্‌সদি।" তবু "মম মহারাজো।"

(১) যে নবোদ্গত মৃণাল-পল্লবের ন্যায় কোমল দন্ত দ্বারা তোমার কর্ণদেশ হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লবলীপল্লব টানিয়া লইত, সেই তোমার পুত্র মদমত্ত বারণগণকে জয় করিল, সুতরাং এখনই সেই যুবাবয়সের কল্যাণ-ভাজন হইয়াছে। * * সখি বাসন্তি দেখ, বাছা কেমন নিজকান্তার মনোরঞ্জন-নৈপুণ্যও শিখিয়াছে। খেলা করিতে করিতে মৃণালকাণ্ড উৎপাটিত করিয়া তাহার গ্রাসের অংশে সুগন্ধি পদ্মসুবাসিত জলের গণ্ডূষ মিশাইয়া দিতেছে এবং শুণ্ডের দ্বারা পর্য্যাপ্ত জলকণায় তাহাকে সিক্ত করিয়া স্নেহে অবক্রদণ্ড নলিনীপত্রের আতপত্র ধরিতেছে।

(২) আমার সেই পুত্রটির অমলমুখপদ্মযুগল, যাহাতে কপোলদেশ ঈষদ্বিরল এবং কোমল ধবল দশনে উজ্জ্বল, যাহাতে মুহুমধুর হাসির অব্যক্তধ্বনি অবিরল লাগিয়া রহিয়াছে, যাহাতে কাকপক্ষ নিবদ্ধ আছে, তাহা আর্য্যপুত্র কর্ত্তৃক পরিচুম্বিত হইল না।

সেই গোদাবরীতীরশীতল পঞ্চবটীবনে রাম বাসন্তীর আহ্বানে উপবেশন করিলেন। দূরে গিরিগহ্বরগত গোদাবরীর বারিরাশির গদ্গদনিনাদ শুনা যাইতেছে। সম্মুখে পরস্পর প্রতিঘাত-সঙ্কুল-উত্তাল-তরঙ্গ সরিৎসঙ্গম দেখা যাইতেছে। দক্ষিণে শ্যামচ্ছবি অনন্ত কাননশ্রেণী চলিয়া গিয়াছে। চারিদিকে সীতার পূর্ব্বসহবাসচিহ্নসকল বিদ্যমান রহিয়াছে। তথায় একটি কদলীবনমধ্যবর্ত্তী শিলাতলে পূর্ব্বপ্রবাস-কালে রাম সীতার সঙ্গে শয়ন করিতেন। সেইখানে বসিয়া সীতা হরিণশিশুগণকে তৃণ খাওয়াইতেন, এখনও হরিণেরা সেই প্রেমে সেইখানে ফিরিয়া বেড়াইতেছে। বাসন্তী সেইখানে রামকে বসিতে বলিলেন। রাম সেখানে না বসিয়া অন্যত্র উপবেশন করিলেন। সীতা পূর্ব্বে পঞ্চবটীবাসকালে একটি ময়ূরশিশু প্রতিপালন করিয়াছিলেন। একটি কদম্ব-বৃক্ষ সীতা স্বহস্তে রোপণ করিয়া স্বয়ং বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। রাম দেখিলেন যে, সেই কদম্ববৃক্ষে দুই একটি নবকুসুমোদ্গম হইয়াছে। তদুপরি আরোহণ করিয়া সীতাপালিত সেই ময়ূরটি নৃত্যান্তে ময়ূরীসঙ্গে রব করিতেছিল। বাসন্তী রামকে সেই ময়ূরটি দেখাইলেন। দেখিয়া রামের মনে পড়িল, সীতা তাহাকে করতালি দিয়া নাচাইতেন, নাচাইবার সময়ে তালের সহিত সীতার চক্ষুও পল্লব-মধ্যে ঘুরিত। এইরূপে বাসন্তী রামকে পূর্ব্বস্মৃতিপীড়িত করিয়া—সখীনির্ব্বাসনজনিত রাগেই এইরূপ পীড়িত করিয়া প্রথমে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ! কুমার লক্ষণ ভাল আছেন ত?" কিন্তু সে কথা রামের কানে গেল না। তিনি সীতাকরকমল-বিকীর্ণ জলে পরিবর্দ্ধিত বৃক্ষ, সীতাকরকমলবিকীর্ণ নীবারে পুষ্ট পক্ষী, সীতাকরকমল-বিকীর্ণ তৃণে প্রতিপালিত হরিণগণকে দেখিতেছিলেন। বাসন্তী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ! কুমার লক্ষ্মণ কেমন আছেন?" এবার রাম কথা শুনিতে পাইলেন, কিন্তু ভাবিলেন, বাসন্তী মহারাজ বলিয়া সম্বোধন করিলেন কেন? এ ত নিষ্প্রণয়! আর কেবল কুমার লক্ষ্মণের কথাই জিজ্ঞাসিলেন। তবে বাসন্তী সীতাবিসর্জ্জনবৃত্তান্ত জানেন। রাম প্রকাশ্যে কেবল বলিলেন, "কুমারের কুশল।" এই বলিয়া নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন। বাসন্তী তখন মুক্তকণ্ঠা হইয়া কহিলেন, "দেব, এত কঠিন হইলেন কি প্রকারে?

ত্বং জীবিতং ত্বমসি মে হৃদয়ং দ্বিতীয়ং
ত্বং কৌমুদী নয়নয়োরমৃতং ত্বমঙ্গে,—

তুমি আমার জীবন, তুমি আমার দ্বিতীয় হৃদয়, তুমি নয়নের কৌমুদী, অঙ্গে তুমি আমার অমৃত, এইরূপে শত শত প্রিয় সম্বোধনে যাহাকে ভুলাইতে, তাহাকে"—বলিতে বলিতে সীতা-স্মৃতিমুগ্ধা বাসন্তী আর বলিতে পারিলেন না; অচেতন হইলেন। রাম তাঁহাকে আশ্বস্তা করিলেন। চেতনা পাইয়া বাসন্তী কহিলেন, "আপনি কেমন করিয়া এ কাজ করিলেন?"

রাম। লোকে বুঝে না বলিয়া।
বাসন্তী। কেন বুঝে না?
রাম। তাহারাই জানে।

তখন বাসন্তী আর সহিতে পারিলেন না। বলিলেন, "নিষ্ঠুর! দেখিতেছি, কেবল যশ তোমার অত্যন্ত প্রিয়।"

এই কথোপকথনের সমুচিত প্রশংসা করা দুঃসাধ্য। সীতাবিসর্জ্জন জন্য বাসন্তী রাম প্রতি ক্রোধযুক্তা হইয়াছিলেন, তিনি মানসিক যন্ত্রণারূপ সেই অপরাধের দণ্ড প্রণীত করিলেন। সহজেই রামের শোকসাগর উছলিয়া উঠিল। রামের যে একমাত্র শোকোপশমের উপায় ছিল,—আত্মপ্রসাদ, তাহাও বিনষ্ট করিলেন। রাম জানিতেন যে, তিনি প্রজারঞ্জনরূপ কুলধর্ম্মের রক্ষার্থই সীতা-বিসর্জ্জনরূপ মর্ম্মচ্ছেদী কার্য্য করিয়াছেন। মর্ম্মচ্ছেদ হউক, ধর্ম্মরক্ষা হইয়াছে। বাসন্তী দেখিলেন যে, ধর্ম্মরক্ষা কেবল স্বার্থপরতার পৃথক একটি নামমাত্র। সে কুলধর্ম্মরক্ষার বাসনা কেবল রূপান্তরিত যশোলিপ্সামাত্র। কেবল যশোলাভের স্বার্থপর বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া রাম এই কাজ করিয়াছেন। বাসন্তী আরও দেখিলেন যে, যে যশের আকাঙ্ক্ষায় তিনি এই নিষ্ঠুর কার্য্য করিয়াছিলেন, সে আকাঙ্ক্ষাও ফলবতী হয় নাই। তিনি এই প্রকার যশের লাভলালসায় পত্নীবধরূপ গুরুতর অপযশের ভাগী হইয়াছেন। বনমধ্যে সীতার কি হইল, তাহার স্থিরতা কি? ইহার অপেক্ষা গুরুতর অপযশ আর কি হইতে পারে?

তখন রামের শোকপ্রবাহ আবার অসংবরণীয়-বেগে ছুটিল। সীতার সেই জ্যোৎস্নাময়ী মৃদুগন্ধ মৃণালকর দেহলতিকা কোন হিংস্র পশু কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়াছে, সন্দেহ নাই। ভাবিয়া রাম "সীতে! সীতে!" বলিয়া সেই অরণ্যমধ্যে রোদন করিতে

লাগিলেন। কখনও বা যে কলঙ্কঘুৎসাকারক পৌরজনের কথায় সীতাবিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহাদিগের উদ্দেশে বলিতে লাগিলেন, "আমি অনেক সহ্য করিয়াছি; আমার প্রতি প্রসন্ন হও।" বাসন্তী ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে বলিলেন। রাম বলিলেন, "সখি, আবার ধৈর্য্যের কথা কি বল? আজি দ্বাদশ বৎসর সীতাশূন্য জগৎ—সীতা নাম পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়াছে—তথাপি বাঁচিয়া আছি,—আবার ধৈর্য্য কাহাকে বলে?" রামের অত্যন্ত যন্ত্রণা দেখিয়া বাসন্তী তাঁহাকে জনস্থানে অন্যান্য প্রদেশ দেখিতে অনুরোধ করিলেন। রাম উঠিয়া পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু বাসন্তীর মনে সখীবিসর্জ্জনদুঃখ জ্বলিতেছিল—কিছুতেই ভুলিলেন না। বাসন্তী দেখিলেন—

"অস্মিন্নেব লতাগৃহে ত্বমভবস্তন্মার্গদত্তেক্ষণঃ
সা হংসৈঃ কৃতকৌতুকা চিরমভূদ্গোদাবরীসৈকতে।
আয়ান্ত্যা পরিদুর্ম্মনায়িতমিব ত্বাং বীক্ষ্য বদ্ধস্তয়া
কাতর্য্যাদরবিন্দকুট্মলনিভো মুগ্ধপ্রণামাঞ্জলিঃ॥" (১)

আর রাম সহ্য করিতে পারিলেন না। ভ্রান্তি জন্মিতে লাগিল। তখন উচ্চৈঃস্বরে রাম ডাকিতে লাগিলেন, "চণ্ডি জানকি, এই যে চারিদিকে তোমাকে দেখিতেছি—কেন দয়া কর না? আমার বুক ফাটিতেছে, দেহবন্ধন ছিঁড়িতেছে, জগৎ শূন্য দেখিতেছি; নিরন্তর অন্তর জ্বলিতেছে, আমার বিকল অন্তরাত্মা অবসন্ন হইয়া অন্ধকারে ডুবিতেছে, মোহ আমাকে চারিদিক্ হইতে আচ্ছন্ন করিতেছে, আমি মন্দভাগ্য—এখন কি করিব?" বলিতে বলিতে রাম মূর্চ্ছিত হইলেন।

ছায়ারূপিণী সীতা তমসার সঙ্গে আদ্যোপান্ত নিকটে ছিলেন। বাসন্তী রামকে পীড়িত করিতেছেন দেখিয়া সীতা পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে তিরস্কার করিতেছিলেন—কতবার রামের রোদন শুনিয়া আপনি মর্ম্মপীড়িত হইতেছিলেন, আবার সীতা রামচন্দ্রের দুঃখের কারণ হইলেন বলিয়া, কত কাতরোক্তি করিতেছিলেন। আবার রামকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া সীতা কাঁদিয়া উঠিলেন, "আর্য্যপুত্র! তুমি যে সকল জীবলোকের মঙ্গলাধার! তুমি এ মন্দভাগিনীকে মনে করিয়া বার বার সংশয়িতজীবন হইতেছ? আমি যে মলেম!" এই বলিয়া সীতাও মূর্চ্ছিতপ্রায়। তমসা এবং বাসন্তী তাঁহাকে উঠাইলেন। সীতা সসম্ভ্রমে রামের ললাট স্পর্শ করিলেন। কি স্পর্শসুখ! রাম যদি মৃৎপিণ্ড হইয়া থাকিতেন, তাহা হইলেও তাঁহার চেতনা হইত। আনন্দ-নিমীলিত-লোচনে স্পর্শসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন, তাঁহার শরীরধাতু অন্তরে বাহিরে অমৃতময় প্রলেপে যেন লিপ্ত হইল—জ্ঞানলাভ করিলেও আনন্দেতে আর এক প্রকার মোহ তাঁহাকে অভিভূত করিল। রাম বাসন্তীকে বলিলেন, "সখি বাসন্তি! অদৃষ্ট প্রসন্ন হইল।"

বাসন্তী। কিসে?

রাম। আর কি সখি! সীতাকে পাইয়াছি।

বাসন্তী। কৈ তিনি?

রাম। এই যে আমার সম্মুখেই রহিয়াছেন।

বাসন্তী। আমি একে প্রিয়সখীর দুঃখে জ্বলিতেছি, তাহাতে আবার এমনতর মর্ম্মভেদী প্রলাপবাক্যে এ হতভাগিনীকে কেন জ্বালাইতেছেন?

রাম বলিলেন, "সখি, প্রলাপ কৈ? বিবাহকালে বৈবাহিক মঙ্গলসূত্রযুক্ত যে হাত আমি ধরিয়াছিলাম—আর যে হাতের অমৃতশীতল স্বেচ্ছালব্ধ সুখস্পর্শে চিনিতে পারিতেছি, এ ত সেই হাত! সেই তুহিন সদৃশ বর্ষাশীকরতুল্য শীতল, কোমল লবলীবৃক্ষের নবাঙ্কুর তুল্য হস্তই আমি পাইয়াছি!"

এই বলিয়া রাম তাঁহার ললাটস্থ অদৃশ্য সীতাহস্ত গ্রহণ করিলেন। সীতা ইতিপূর্ব্বেই রামের আনন্দমোহ দেখিয়া অপসৃত হইবেন, বিবেচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই চিরসন্তাবসৌম্যশীতল স্বামিস্পর্শে তিনিও মুগ্ধ হইলেন; অতি যত্নে সেই রামললাটস্থিত হস্তকে ধরিয়া রাখিলেও সে হস্ত কাঁপিতে লাগিল, ঘামিতে লাগিল এবং জড়বৎ অবশ হইয়া আসিতে লাগিল। যখন রাম সীতার হস্তের চিরপরিচিত অমৃতশীতল সুখস্পর্শের কথা বলিলেন, তখন সীতা মনে মনে বলিলেন, "আর্য্যপুত্র, আজও তুমি সেই আর্য্যপুত্র আছ।" শেষে যখন রাম সীতার করগ্রহণ করিলেন, তখন সীতা দেখিলেন, স্পর্শমোহে প্রমাদ ঘটিল। কিন্তু রাম সে হাত ধরিয়া

(১) সীতা গোদাবরী-সৈকতে হংস লইয়া কৌতুক করিতে করিতে বিলম্ব করিতেন, তখন তুমি এই লতাগৃহে থাকিয়া তাহার পথ চাহিয়া রহিতে। সীতা আসিয়া তোমাকে বিশেষ দুর্ম্মনায়মান দেখিয়া, তোমাকে প্রণাম করিবার জন্য পদ্মকলিকা তুল্য অঙ্গুলী দ্বারা কি সুন্দর অঞ্জলি বদ্ধ করিতেন।

রাখিতে পারিলেন না। আনন্দে তাঁহার ইন্দ্রিয় সকল অবশ হইয়াছিল, তিনি বাসন্তীকে বলিলেন, "সখি সখি, তুমি একবার ধর।" সীতা সেই অবকাশে হাত ছাড়াইয়া লইলেন। স্পর্শসুখজনিত স্বেদরোমাঞ্চকম্পিত-কলেবরা হইয়া পবনকম্পিত নবজলকণাসিক্ত স্ফুটকোরক কদম্বের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। মনে করিলেন, "কি লজ্জা, তমসা দেখিয়া কি মনে করিতেছেন। ভাবিতেছেন, এই ইহাকে ত্যাগ করিয়াছেন, আবার ইহার প্রতি এই অনুরাগ।"

রাম ক্রমে জানিতে পারিলেন যে, কৈ, কোথা সীতা—সীতা ত নাই। তখন রামের শোক-প্রবাহ দ্বিগুণ ছুটিল। রোদন করিয়া ক্রমে শান্ত হইয়া বাসন্তীকে বলিলেন, "আর কতক্ষণ তোমাকে কাঁদাইব? আমি এখন যাই।" শুনিয়া সীতা উদ্বেগের সহিত তমসাকে অবলম্বন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "ভগবতি তমসে! আর্য্যপুত্র যে চলিলেন!" তমসা বলিলেন, "চল, আমরাও যাই!" সীতা বলিলেন, "ভগবতি, ক্ষমা কর। আমি ক্ষণকাল এই দুর্লভ জনকে দেখিয়া লই!" কিন্তু বলিতে বলিতে এক বজ্র-তুল্য কঠিন কথা সীতার কানে গেল। রাম বাসন্তীর নিকট বলিতেছেন, "অশ্বমেধের জন্য আমার এই সহধর্ম্মিণী আছে—সহধর্ম্মিণী!" সীতা কম্পিত কলেবরা হইয়া মনে মনে বলিলেন, "আর্য্যপুত্র! কে সে?" এই অবসরে রামও কথা সমাপ্ত করিলেন; "সে সীতার হিরণ্ময়ী প্রতিকৃতি।" শুনিয়া সীতার চক্ষে জল পড়িতে লাগিল, বলিলেন "আর্য্যপুত্র! এখন তুমি তুমি হইলে। এত দিনে আমার পরিত্যাগলজ্জাশল্য বিমোচন করিলে।" রাম বলিতেছেন, "তাঁহারই দ্বারা আমার বাষ্পদিগ্ধ চক্ষুর বিনোদন করি।" শুনিয়া সীতা বলিলেন, "তুমি যার এত আদর কর, সেই ধন্য, তোমায় যে বিনোদন করে, সেই ধন্য। সে জীবলোকের আশানিবন্ধন হইয়াছে।"

রাম চলিলেন। দেখিয়া সীতা করযোড়ে "ণমো ণমো অপুব্বপুণ্ণজণিদদংসণাণং অজ্জউত্তচরণ-কমলাণং" এই বলিয়া প্রণাম করিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তমসা তাঁহাকে আশ্বস্ত করিলেন। সীতা বলিলেন, "আমার এ মেঘান্তরে ক্ষণকাল জন্য পূর্ণিমাচন্দ্র দেখা মাত্র।"

তৃতীয়াঙ্কের সার মর্ম্ম এই—এই অঙ্কের অনেক দোষ আছে। ইহা নাটকের পক্ষে নিতান্ত অনাবশ্যক। নাটকের যাহা কার্য্য, বিসর্জ্জনান্তে রামসীতার পুনর্ম্মিলন, তাহার সঙ্গে ইহার কোন সংস্রব নাই। এই অঙ্ক পরিত্যক্ত হইলে নাটকের কার্য্যের কোন হানি হয় না। সচরাচর এরূপ একটি সুদীর্ঘ নাটকাঙ্ক নাটকমধ্যে সন্নিবেশিত হওয়ায় বিশেষ রসভঙ্গের কারণ হয়। যাহা কিছু নাটকে প্রতিকৃত হইবে, তাহা উপ-সংহৃতির উদ্‌যোজক হওয়া উচিত। এই অঙ্ক কোন অংশে তদ্রূপ নহে। বিশেষ ইহাতে রামবিলাপের দৈর্ঘ্য এবং পৌনঃপুন্য অসহ্য। তাহাতে রচনা-কৌশলের বিপর্য্যয় হইয়াছে। কিন্তু সকলেই মুক্তকণ্ঠে বলিবেন যে, অন্য অনেক নাটক একেবারে বিলুপ্ত হয়, বরং তাহাও স্বীকর্ত্তব্য, তথাপি উত্তরচরিতের এই তৃতীয়াঙ্ক ত্যাগ করা যাইতে পারে না। কাব্যাংশে ইহার তুল্য রচনা অতি দুর্লভ।

উত্তরচরিত-সমালোচন ক্রমে এত দীর্ঘায়ত হইয়া উঠিতেছে যে, আর ইহাতে অধিক স্থান নিয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে। অতএব অবশিষ্ট অঙ্কের সমালোচনা অতিসংক্ষেপে করিব।

এ দিকে বাল্মীকি প্রচার করিলেন যে, তিনি এক অভিনব নাটক রচনা করিয়াছেন। তদভিনয়-দর্শন জন্য সকল লোককে নিমন্ত্রিত করিলেন। তদ্দর্শনার্থ বশিষ্ঠ, অরুন্ধতী, কৌশল্যা, জনক প্রভৃতি বাল্মীকির আশ্রমে আসিয়া সমবেত হইলেন। তথায় লবের সুন্দর কান্তি এবং রামের সহিত সাদৃশ্য দেখিয়া কৌশল্যা অত্যন্ত ঔৎসুক্য-পরবশ হইয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিলেন। দুহিতৃবিয়োগে জনকের শোকক্লিষ্ট দশা, কৌশল্যার সহিত তাঁহার আলাপ, লবের সহিত কৌশল্যার আলাপ ইত্যাদি অতি মনোহর, কিন্তু সে সকল উদ্ধৃত করিবার অবকাশ নাই।

চন্দ্রকেতু অশ্বমেধের অশ্বরক্ষক সৈন্য লইয়া বাল্মীকির আশ্রমসন্নিধানে উপনীত হইলেন। তাহার অবর্ত্তমানে সৈন্যদিগের সহিত লবের বচসা হওয়ায় অশ্ব হরণ করিলেন এবং যুদ্ধে চন্দ্রকেতুর সৈন্যদিগকে পরাস্ত করিলেন। চন্দ্রকেতু আসিয়া তাহাদিগের রক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন, চন্দ্রকেতু এবং লব পরস্পরের প্রতি বিপক্ষতাচরণকালে এতদূর উভয়ে উভয়ের প্রতি সৌজন্য ও সদ্ব্যবহার করিলেন যে, নাটকের এতদংশ পড়িয়া বোধ হয় যে, ইহা সভ্যতার চূড়াপদবাচ্য কোন ইউরোপীয় জাতি কর্ত্তৃক প্রণীত হইয়াছে। ভবভূতির সময়ে ভারত-বর্ষীয়েরা সামাজিক ব্যবহার সম্বন্ধে বিশেষ

উৎকর্ষলাভ করিয়াছিলেন, ইহা তাহার এক প্রমাণ।

আকাশে যেরূপ নক্ষত্র ছড়ান, ভবভূতির রচনামধ্যে সেইরূপ কবিত্বরত্ন ছড়ান আছে। চতুর্থ এবং পঞ্চম অঙ্ক হইতে এই সকল রত্ন আহরণ করিতে পারিলাম না, তথাপি পঞ্চম হইতে দুই একটি উদাহরণ না দিয়া থাকিতে পারা যায় না। লব চন্দ্রকেতুর সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন, এমন সময় চন্দ্রকেতু তাঁহাকে যুদ্ধে আহ্বান করাতে, তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া চন্দ্রকেতুর দিকে ধাবমান হইলেন।

"স্তনয়িত্নুরবাদিভাবলীনামবমর্দাদিব দৃপ্ত-সিংহ-শাবঃ।" (১)

তিনি চন্দ্রকেতুর দিকে আসিতেছেন। পরাজিত সৈন্যগণ তখন তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হইতেছে—

দর্পেণ কৌতুকবতা ময়ি বদ্ধলক্ষ্যঃ
পশ্চাদ্ বলৈরনুসৃতোঽয়মুদীর্ণধন্বা।
দ্বেধাসমুদ্ধতমরুত্তরলস্য ধত্তে
মেঘস্য মাঘবতচাপধরস্য লক্ষ্মীম্॥" (২)

নিঃসহায় পদচারী বালকের প্রতি বহু সেনা ধাবমান দেখিয়া চন্দ্রকেতু তাহাদিগকে নিবারণ করিলেন, দেখিয়া লব ভাবিলেন, "কথমনুকম্পতে মাম্?" ভারতবর্ষীয় কোন গ্রন্থে এরূপ বাক্য প্রযুক্ত আছে, এ কথা অনেক ইউরোপীয় সহজে বিশ্বাস করিবেন না।

লবকর্তৃক জৃম্ভকাস্ত্র-প্রয়োগবর্ণনা অস্বাভাবিক, অতিপ্রাকৃত এবং অস্পষ্ট হইলেও আমরা তাহা উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না,—

"পাতালোদরকুঞ্জপুঞ্জিততমঃশ্যামৈর্নভো জৃম্ভকৈ-
রুত্তপ্তস্ফুরদারকূটকপিলজ্যোতির্জ্বলদ্দীপ্তিভিঃ।
কল্পাক্ষেপকঠোরভৈরবমরুদ্ব্যস্তৈরবস্তীর্য্যতে
নীলস্নেহতড়িৎকড়ারকুহরৈর্বিন্ধ্যাদ্রিকূটৈরিব॥" (৩)

লবের সহিত রামের রূপসাদৃশ্য দেখিয়া সুমন্ত্রের মনে একবার আশা জন্মিয়াই, সীতা নাই, এই কথা মনে পড়াতে সে আশা তখনই নিবারিত হইল। ভাবিলেন, "লতায়াং পূর্ব্বলূনায়াং প্রসূনস্যাগমঃ কুতঃ!" বৃদ্ধ সুমন্ত্রের মুখে এই বাক্য শুনিয়া, সহৃদয় পাঠকের রোমিও-সম্বন্ধে বৃদ্ধ মন্টাগুর মুখে কীটদংশিত কুসুমকোরকের উপমা মনে পড়িবে।

ষষ্ঠাঙ্কের বিষ্কম্ভকটি বিশেষ মনোহর। বিদ্যাধর-মিথুন গগনমার্গে থাকিয়া লব-চন্দ্রকেতুর যুদ্ধ দেখিতেছিলেন। যুদ্ধ তাঁহাদিগের কথোপকথনে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় লিখিয়াছেন যে, "ভবভূতির কাব্যের মধ্যে মধ্যে সংস্কৃতে এবং প্রাকৃতে এমত দীর্ঘসমাসঘটিত রচনা আছে, তাহাতে অর্থবোধ ও রসগ্রহণসম্বন্ধে ব্যাঘাত ঘটিয়া উঠে।" ভবভূতির অসাধারণ দোষ-নির্ব্বাচন-কালে বিদ্যাসাগর মহাশয় এই কথা বলিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বে যাহা উদ্ধৃত করিয়াছি, তন্মধ্যে এইরূপ দীর্ঘসমাসের অনেক উদাহরণ পাওয়া যাইবে। এই বিষ্কম্ভকমধ্যে এইরূপ দীর্ঘসমাসের বিশেষ আধিক্য। আমরা কয়েকটি উদ্ধৃত করিতেছি, যথা পুষ্পবৃষ্টি,—

"অবিরল-ললিত-বিকচ-কনক-কমল-কমনীয়-সন্ততিঃ অমর-তরু-তরুণমণিমুকুল-নিকরমকরন্দ-সুন্দরঃ পুষ্পনিপাতঃ।"

পুনশ্চ, বাণসৃষ্ট অগ্নি,—

"উচ্চণ্ড-বজ্রখণ্ড-বিস্ফোট-পটুতর-স্ফুলিঙ্গ-বিকৃতিঃ উত্তালতুমুললেলিহান-জ্বালা-সম্ভার-ভৈরবো ভগবান্ উষর্বুধঃ।"

পুনশ্চ বারুণাস্ত্রসৃষ্ট মেঘ,—

"অবিরল-বিলোলধূমন্তবিজ্জুল্লতাবিলাস-মণ্ডিদেহিং মত্তমোরকণ্ঠসামলেহিং জলহরেহিং।"

এবং তৎকালে সৃষ্টির অবস্থা—

"প্রবলতাবলীক্ষোভগম্ভীরগুণ-গুণায়মান-মেদুরান্ধকার-নিবন্ধ-নিবদ্ধং একবার-বিশ্বগ্রসন-বিকচ-বিকরাল-কালকণ্ঠ-কণ্ঠ-কন্দর-বিবর্ত্তমানমিব যুগান্তযোগ-নিদ্রা-নিরুদ্ধ-সর্ব্বদ্বার-নারায়ণোদর-নিবিষ্টমিব ভূতজাতং প্রবেপতে।"

---

(১) যেমন মেঘের শব্দ শুনিয়া দৃপ্ত সিংহশিশুও হস্তিবিনাশ হইতে নিবৃত্ত হয়, সেইরূপ।

(২) সকৌতুক দর্পে আমার প্রতি বদ্ধলক্ষ্য হইয়া, ধনু উত্থিত করিয়া, সৈন্যের দ্বারা পশ্চাৎ অপহৃত হইয়া ইনি দুই দিক্ হইতে বায়ুসঞ্চালিত এবং ইন্দ্রধনুঃশোভিত মেঘের মত দেখাইতেছেন।

(৩) পাতালাভ্যন্তরবর্ত্তী কুঞ্জমধ্যে রাশীকৃত অন্ধকারের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ এবং উত্তপ্ত, প্রদীপ্ত পিত্তলের পিঙ্গলবৎ জ্যোতির্বিশিষ্ট জৃম্ভকাস্ত্রগুলি দ্বারা আকাশমণ্ডল ব্রহ্মাণ্ড-প্রলয়কালীন দুর্নিবার ভৈরববায়ুর দ্বারা বিক্ষিপ্ত এবং মেঘমিলিত বিদ্যুৎকর্তৃক পিঙ্গলবর্ণ এবং গুহাযুক্ত বিন্ধ্যাদ্রি-শিখর ব্যাপ্ত দেখাইতেছে।

ঈদৃশ দীর্ঘসমাস যে রচনাদোষমধ্যে গণ্য, তাহা আমরা স্বীকার করি। যাহা কিছুতে অর্থবোধের বিঘ্ন হয়, তাহাই দোষ। ঈদৃশ সমাসে অর্থবোধের হানি, সুতরাং ইহা দোষ। নাটকে ইহা বিশেষ দোষ, তাহাও স্বীকার করি। কেন না, ইহাতে নাটকের অভিনয়োপযোগিতার হানি হয়, তথাপি এই সমাসগুলি কবিত্ব-পরিপূর্ণ, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

লব ও চন্দ্রকেতু যুদ্ধ করিতেছিলেন। এমন সময় রাম সেই স্থানে উপনীত হইলেন। তিনি উভয়কে যুদ্ধ হইতে নিরস্ত করিলেন। লব তাঁহাকে রাজা রামচন্দ্র বলিয়া জানিতে পারিয়া ভক্তিভাবে প্রণাম ও নম্রভাবে তাঁহার সহিত আলাপ করিলেন। কুশ যুদ্ধসংবাদ শুনিয়া সে স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং লব কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া রামের সহিত সেইরূপ ব্যবহার করিলেন। রাম উভয়কে সস্নেহে আলিঙ্গন এবং পিতৃযোগ্য প্রণয়-সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন। পরে সকলে বাল্মীকির আশ্রমে তৎপ্রণীত নাটকাভিনয় দেখিতে গেলেন।

তথায় রামানুজ্ঞাক্রমে লক্ষ্মণ দ্রষ্টৃবর্গকে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, পৌরগণ, জনপদবাসী প্রজা ও দেবাসুর এবং ইতর জীব স্থাবরজঙ্গম সকলে ঋষিপ্রভাববলে সমাগত হইয়া, লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইলেন। পরে অভিনয়ারম্ভ হইল। রাম ও লবকুশ দ্রষ্টৃবর্গ মধ্যে ছিলেন।

সীতাবিসর্জ্জন-বৃত্তান্তই এই অদ্ভুত নাটকের প্রথমাংশ। সীতা লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলে তাঁহার কাতরতা, গঙ্গাপ্রবাহে দেহসমর্পণ, তন্মধ্যে যমজসন্তান প্রসব, গঙ্গা এবং পৃথিবী কর্ত্তৃক তাঁহার শিশুদিগের রক্ষা ও তৎসঙ্গে সীতার প্রস্থান ইত্যাদি অভিনীত হইল। দেখিয়া রাম মূর্চ্ছিত হইলেন। তখন লক্ষ্মণ উচ্চৈঃস্বরে বাল্মীকিকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, "ভগবন্! রক্ষা করুন! আপনার কাব্যের কি মর্ম্ম?" নটদিগকে বলিলেন, "তোমরা অভিনয় বন্ধ কর।"

তখন সহসা দেবর্ষি কর্ত্তৃক অন্তরীক্ষ ব্যাপ্ত হইল; গঙ্গার বারিরাশি মথিত হইল। ভাগীরথী এবং পৃথিবীর সহিত জলমধ্য হইতে উঠিলেন—কে? স্বয়ং সীতা। দেখিয়া লক্ষ্মণ বিস্মিত এবং আহ্লাদিত হইয়া রামকে ডাকিলেন, "দেখুন, দেখুন!" কিন্তু রাম তখনও অচেতন। তখন সীতা অরুন্ধতী কর্ত্তৃক আদিষ্টা হইয়া রামকে স্পর্শ করিলেন। বলিলেন, "উঠ আর্য্যপুত্র!"

রাম চেতনা প্রাপ্ত হইলেন। পরে যাহা ঘটিল, বলা বাহুল্য। সেই সর্ব্বলোকসমারোহসমক্ষে সীতার সতীত্ব দেবগণ কর্ত্তৃক স্বীকৃত হইল। দেববাক্যে প্রজাগণ বুঝিল। সীতা লব-কুশকেও পাইলেন। রামও তাঁহাদিগকে পুত্র বলিয়া চিনিলেন। পরে সপুত্রা ভার্য্যা গৃহে লইয়া গিয়া সুখে রাজ্য করিতে লাগিলেন।

নাটকের ভিতর এই নাটকখানি যিনি অভিনীত দেখিবেন বা পাঠ করিবেন, তিনিই যে অশ্রুপাত করিবেন, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। কিন্তু আমরা এতদংশ উদ্ধৃত করিলাম না। এই উপসংহার অপেক্ষা রামায়ণের উপসংহার অধিকতর মধুর এবং করুণরসপূর্ণ। আমরা পাঠকের প্রীত্যর্থ তাহাই উদ্ধৃত করিতে বাসনা করি। বাল্মীকি কর্ত্তৃক সীতা অযোধ্যায় আনীত হয়েন। যে সূচনায় ঋষি সীতাকে আনয়ন করেন, তদ্বিষয় বঙ্গীয় পাঠকমাত্রই 'সীতার বনবাস' পাঠ করিয়া অবগত আছেন। সতীত্ব সম্বন্ধে শপথ করিলে সীতাকে গ্রহণ করিবেন, রাম এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই কথা প্রচার হইলে পর, সীতা-শপথদর্শনার্থ বহুলোকের সমাগম হইল।

১০৭ সর্গ

তস্যাং রজন্যাং ব্যুষ্টায়াং যজ্ঞবাটং গতো নৃপঃ।
ঋষীন্ সর্ব্বান্ মহাতেজাঃ শব্দাপয়তি রাঘবঃ॥
বশিষ্ঠো বামদেবশ্চ জাবালিরথ কশ্যপঃ।
বিশ্বামিত্রো দীর্ঘতপা দুর্ব্বাসাশ্চ মহাতপাঃ॥
পুলস্ত্যোঽপি তথা শক্তির্ভার্গবশ্চৈব বামনঃ।
মার্কণ্ডেয়শ্চ দীর্ঘায়ুর্মৌদ্গল্যশ্চ মহাযশাঃ॥
গর্গশ্চ চ্যবনশ্চৈব শতানন্দশ্চ ধর্ম্মবিৎ।
ভরদ্বাজশ্চ তেজস্বী অগ্নিপুত্রশ্চ সুপ্রভঃ॥
নারদঃ পর্ব্বতশ্চৈব গৌতমশ্চ মহাযশাঃ।
এতে চান্যে চ বহবো মুনয়ঃ সংশিতব্রতাঃ॥
কৌতূহলসমাবিষ্টাঃ সর্ব্ব এব সমাগতাঃ।
রাক্ষসাশ্চ মহাবীর্য্যা বানরাশ্চ মহাবলাঃ॥
সর্ব্ব এব সমাজগ্মুর্মহাত্মানঃ কুতূহলাৎ।
ক্ষত্রিয়া যে চ শূদ্রাশ্চ বৈশ্যাশ্চৈব সহস্রশঃ॥
নানাদেশাগতাশ্চৈব ব্রাহ্মণাঃ সংশিতব্রতাঃ।
সীতাশপথবীক্ষার্থং সর্ব্ব এব সমাগতাঃ॥

তদা সমাগতং সর্ব্বমশ্বভূতমিবাচলম্।
শ্রুত্বা মুনিবরস্তূর্ণং সসীতঃ সমুপাগমৎ ॥
তমৃষিং পৃষ্ঠতঃ সীতা অন্বগচ্ছদবাঙ্মুখা।
কৃতাঞ্জলির্বাষ্পাকুলা কৃত্বা রামং মনোগতম ॥
তাং দৃষ্ট্বা শ্রুতিমায়ান্তীং ব্রহ্মাণমনুগামিনীম্।
বাল্মীকেঃ পৃষ্ঠতঃ সীতাং সাধুবাদো মহানভূৎ ॥
ততো হলহলাশব্দঃ সর্ব্বেষামেবমাবভৌ।
দুঃখজন্মবিশালেন শোকেনাকুলিতাত্মনাম্ ॥
সাধু রামেতি কেচিত্তু সাধু সীতেতি চাপরে।
উভাবেব চ তত্রান্যে প্রেক্ষকাঃ সংপ্রচক্রমুঃ ॥
ততো মধ্যে জনৌঘস্য প্রবিশ্য মুনিপুঙ্গবঃ।
সীতাসহায়ো বাল্মীকিরিতি হোবাচ রাঘবম্ ॥
ইয়ং দাশরথে সীতা সুব্রতা ধর্ম্মচারিণী।
অপবাদাৎ পরিত্যক্তা মমাশ্রমসমীপতঃ ॥
লোকাপবাদভীতস্য তব রাম মহাব্রত।
প্রত্যয়ং দাস্যতে সীতা তামনুজ্ঞাতুমর্হসি ॥
ইমৌ তু জানকী-পুত্রাবুভৌ চ যমজাতকৌ।
সুতৌ তবৈব দুর্দ্ধর্ষৌ সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে ॥
প্রচেতসোঽহং দশমঃ পুত্রো রাঘবনন্দন।
ন স্মরাম্যনৃতং বাক্যমিমৌ তু তব পুত্রকৌ ॥
বহুবর্ষসহস্রাণি তপশ্চর্য্যা ময়া কৃতা।
নোপাশ্নীয়াং ফলং তস্য দুষ্টেয়ং যদি মৈথিলী ॥
মনসা কর্ম্মণা বাচা ভূতপূর্ব্বং ন কিল্বিষম।
তস্যাহং ফলমশ্নামি অপাপা মৈথিলী যদি ॥
অহং পঞ্চসু ভূতেষু মনঃ যষ্ঠেষু রাঘব।
বিচিন্ত্য সীতা শুদ্ধেতি জগ্রাহ বননির্ঝরে ॥
ইয়ং শুদ্ধসমাচারা অপাপা পতিদেবতা।
লোকাপবাদভীতস্য প্রত্যয়ং তব দাস্যতি ॥

তস্মাদয়ং নরবরাত্মজশুদ্ধভাবা
দিব্যেন দৃষ্টিবিষয়েণ ময়া প্রদিষ্টা।
লোকাপবাদকলুষীকৃতচেতসা যৎ
ত্যক্তা ত্বয়া প্রিয়তমা বিদিতাপি শুদ্ধা ॥

১১০ সর্গ।

বাল্মীকিনৈবমুক্তস্তু রাঘবঃ প্রত্যভাষত।
প্রাঞ্জলির্জ্জনতামধ্যে দৃষ্ট্বা তাং দেববর্ণিনীম্ ॥
এবমেতন্মহাভাগ যথা বদসি ধর্ম্মবিৎ।
প্রত্যয়স্তু মম ব্রহ্মংস্তব বাক্যৈরকল্মষৈঃ ॥
প্রত্যয়শ্চ পুরা দত্তো বৈদেহ্যা সুরসন্নিধৌ।
শপথশ্চ কৃতস্তত্র তেন বেশ্ম প্রবেশিতা ॥
লোকাপবাদো বলবান্ যেন ত্যক্তা হি মৈথিলী।
সেয়ং লোকভয়াদ্ ব্রহ্মন্নপাপেত্যভিজানতা ॥
পরিত্যক্তা ময়া সীতা তদ্ভবান্ ক্ষন্তুমর্হতি।
জানামি চেমৌ পুত্রৌ মে যমজাতৌ কুশীলবৌ ॥
শুদ্ধায়াং জগতো মধ্যে বৈদেহ্যাং প্রীতিরস্তু মে।
অভিপ্রায়স্তু বিজ্ঞায় রামস্য সুরসত্তমাঃ ॥
সীতায়াঃ শপথে তস্মিন্ সর্ব্ব এব সমাগতাঃ।
পিতামহং পুরস্কৃত্য সর্ব্ব এব সমাগতাঃ ॥
আদিত্যা বসবো রুদ্রা বিশ্বদেবা মরুদ্গণাঃ।
সাধ্যাশ্চ দেবাঃ সর্ব্বে তে সর্ব্বে চ পরমর্ষয়ঃ ॥
নাগাঃ সুপর্ণাঃ সিদ্ধাশ্চ তে সর্ব্বে হৃষ্টমানসাঃ।
দৃষ্ট্বা দেবানৃষীংশ্চৈব রাঘবঃ পুনরব্রবীৎ ॥
প্রত্যয়ো মে মুনিশ্রেষ্ঠ ঋষিবাক্যৈরকল্মষৈঃ।
শুদ্ধায়াং জগতো মধ্যে বৈদেহ্যাং প্রীতিরস্তু মে ॥
সীতাশপথসংভ্রান্তাঃ সর্ব্ব এব সমাগতাঃ।
ততো বায়ুঃ শুভঃ পুণ্যো দিব্যগন্ধো মনোরমঃ ॥
তং জনৌঘং সুরশ্রেষ্ঠা হ্লাদয়ামাস সর্ব্বতঃ।
তদদ্ভুতমিবাচিন্ত্যং নিরৈক্ষন্ত সমাহিতাং ॥
মানবাঃ সর্ব্বরাষ্ট্রেভ্যঃ পূর্ব্বং কৃতযুগে যথা।
সর্ব্বান্ সমাগতান্ দৃষ্ট্বা সীতা কাষায়বাসিনী ॥
অব্রবীৎ প্রাঞ্জলির্বাক্যমধোদৃষ্টিরবাঙ্মুখী।
যথাহং রাঘবাদন্যং মনসাপি ন চিন্তয়ে ॥
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি।
মনসা কর্ম্মণা বাচা যথা রামং সমর্চ্চয়ে ॥
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি।
যথৈতৎ সত্যমুক্তং মে বেদ্মি রামাৎ পরং ন চ ॥
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি।
তথা শপন্ত্যাং বৈদেহ্যাং প্রাদুরাসীত্তদদ্ভুতম্ ॥
ভূতলাদুত্থিতং দিব্যং সিংহাসনমনুত্তমম্।
ধ্রিয়মাণং শিরোভিস্তু নাগৈরমিতবিক্রমৈঃ ॥
দিব্যং দিব্যেন বপুষা দিব্যরত্নবিভূষিতৈঃ।
তস্মিংস্তু ধরণী দেবী বাহুভ্যাং গৃহ্য মৈথিলীম ॥
স্বাগতেনাভিবন্দ্যৈনামাসনে চোপবেশয়ৎ।
তামাসনগতাং দৃষ্ট্বা প্রবিশন্তীং রসাতলম্ ॥
পুষ্পবৃষ্টিরবিচ্ছিন্না দিব্যা সীতামবাকিরৎ।
সাধুকারশ্চ সুমহান্দেবানাং সহসোত্থিতঃ ॥
সাধু সাধ্বিতি বৈ সীতে যস্যাস্তে শীলমীদৃশম্।
এবং বহুবিধা বাচো অন্তরীক্ষগতাঃ সুরাঃ ॥
ব্যাজহ্রুহৃষ্টমনসো দৃষ্ট্বা সীতাপ্রবেশনম্।
যজ্ঞবাটগতাশ্চাপি মুনয়ঃ সর্ব্ব এব তে ॥
রাজানশ্চ নরব্যাঘ্রা বিস্ময়ান্নোপরেমিরে।
অন্তরীক্ষে চ ভূমৌ চ সর্ব্বে স্থাবরজঙ্গমাঃ ॥
দানবাশ্চ মহাকায়াঃ পাতালে পন্নগাধিপাঃ।
কেচিদ্ বিনেদুঃ সংহৃষ্টাঃ কেচিদ্ধ্যানপরায়ণাঃ ॥
কেচিদ্রামং নিরীক্ষন্তে কেচিৎ সীতামচেতনাঃ।

সীতাপ্রবেশনং দৃষ্ট্বা তেষামাসীৎ সমাগমঃ।
তন্মুহূর্ত্তমিবাত্যর্থং সমং সম্মোহিতং জগৎ ॥ (১)

আমরা উত্তরচরিত নাটকের প্রকৃত সমালোচনা করি নাই। পাঠকের সহিত আনুপূর্ব্বিক নাটক পাঠ করিয়া যেখানে যেখানে ভাল লাগিয়াছে, তাহাই দেখাইয়া দিয়াছি। গ্রন্থের প্রত্যেক অংশ পৃথক্ পৃথক্ করিয়া পাঠককে দেখাইয়াছি।

এরূপে গ্রন্থের প্রকৃত দোষ-গুণের ব্যাখ্যা হয় না। এক একখানি প্রস্তর পৃথক্ পৃথক্ করিয়া দেখিলে তাজমহলের গৌরব বুঝিতে পারা যায় না। একটি একটি বৃক্ষ পৃথক্ পৃথক্ করিয়া দেখিলে উদ্যানের শোভা অনুভূত করা যায় না। এক একটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বর্ণনা করিয়া মনুষ্য-মূর্ত্তির অনির্ব্বচনীয় শোভা বর্ণন করা যায় না।

---

(১) সেই রজনী অতিবাহিত হইল, মহাতেজা রাজা রামচন্দ্র যজ্ঞস্থলে গমনপূর্ব্বক ঋষিসকলকে আহ্বান করিলেন। অনন্তর বশিষ্ঠ, বামদেব, কশ্যপবংশোদ্ভব জাবালী, দীর্ঘতপা বিশ্বামিত্র, মহাতপা দুর্ব্বাসা, পুলস্ত্য, শক্তি, ভার্গব, বামন, দীর্ঘায়ু মার্কণ্ডেয়, মহাযশা মৌদ্গল্য, গর্গ, চ্যবন, ধর্ম্মজ্ঞ শতানন্দ, তেজস্বী ভরদ্বাজ, অগ্নিপুত্র সুপ্রভ, নারদ, পর্ব্বত ও মহাযশা গৌতম এবং অন্যান্য সংশিতব্রত মুনিগণ কৌতূহলাক্রান্ত সকলেই সমাগত হইলেন। মহাবীর্য্য রাক্ষসগণ ও মহাবল বানরগণ, মহাত্মা ক্ষত্রিয়গণ এবং সহস্র সহস্র বৈশ্য ও শূদ্রগণ এবং নানাদেশাগত ব্রতধারী ব্রাহ্মণসকল কুতূহল বশতঃ সীতাশপথদর্শন জন্য সকলেই সমাগত হইলেন।

মহর্ষি বাল্মীকি, তৎকালে সমাগত জনমণ্ডলী কৌতুক-দর্শনার্থ পর্ব্বতবৎ নিশ্চলভাবে দণ্ডায়মান, ইহা শ্রবণ করিয়া সীতাসহ শীঘ্র আগমন করিলেন। সীতাও কৃতাঞ্জলী বাষ্পাকুলনয়না এবং অধোমুখী হইয়া মনোমধ্যে রামকে চিন্তা করিতে করিতে সেই ঋষির পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মের অনুগামিনী শ্রুতির ন্যায় বাল্মীকির পশ্চাদ্বর্ত্তিনী সেই সীতাকে দেখিবামাত্র সেই স্থলে অতি মহৎ সাধুবাদ হইতে লাগিল। তৎপর দুঃখজ অতি মহৎ শোক হেতু ব্যথিতান্তঃকরণ জনসকলের বিপুল হলহলা শব্দ উত্থিত হইল। দর্শকবৃন্দমধ্যে কতকগুলি সাধু রাম, কতকগুলি সাধু জানকী ও কতক গুলি উভয়েই সাধু, এই প্রকার কহিতে লাগিল।

তদনন্তর মুনিশ্রেষ্ঠ বাল্মীকি সীতার সহিত জনবৃন্দ-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া রামকে এইরূপ বলিতে লাগিলেন, "হে দাশরথে! ধর্ম্মচারিণী সুব্রতা এই সীতা লোকাপবাদ হেতু আমার আশ্রমসমীপে পরিত্যক্তা হইয়াছিলেন। হে মহাব্রত রাম! ইনি এক্ষণে লোকাপবাদভীত তোমার নিকট প্রত্যয় প্রদান করিবেন, তুমি অনুজ্ঞা কর। এই দুর্দ্ধর্ষ যমজ জানকী-পুত্র তোমারই পুত্র, ইহা আমি তোমাকে সত্য বলিতেছি। হে রঘুনন্দন! আমি প্রচেতার দশম পুত্র, আমি মিথ্যা বাক্য স্মরণও করি না, ইহারা তোমারই পুত্র। আমি বহু সহস্র বৎসর তপস্যা করিয়াছি। যদি এই জানকী দুষ্টচারিণী হয়েন, তাহা হইলে আমি যেন তাহার ফল প্রাপ্ত না হই। কায়মনে এবং কর্ম্ম দ্বারা আমি পূর্ব্বে কখনই পাপাচরণ করি নাই, যদি জানকী নিষ্পাপ হয়েন, তবে আমি যেন তাহার ফল ভোগ করিতে পারি। হে রাঘব! আমি পঞ্চ ভূত ও ষষ্ঠ-স্থানীয় মনেতে সীতাকে বিশুদ্ধা বিবেচনা করিয়াই বন-নির্ঝরে গ্রহণ করিয়াছিলাম। এই অপাপা পতি-পরায়ণা শুদ্ধচারিণী, লোকাপবাদভীতা তোমায় নিকট প্রত্যয় প্রদান করিবেন। হে রাজনন্দন! যে হেতু, তুমি তোমার এই প্রিয়তমাকে বিশুদ্ধা জানিয়াও লোকাপবাদভয়ে পরিত্যাগ করিয়াছিলে, তজ্জন্যই দিব্য-জ্ঞানে বিশুদ্ধা জানিয়াও এই শপথার্থ আদেশ করিয়াছি।"

রাম বাল্মীকি কর্ত্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া এবং সেই দেববর্ণিনী জানকীকে দেখিয়া কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক সেই জনতামধ্যে এইরূপ বলিতে লাগিলেন,—"হে ধর্ম্মজ্ঞ! হে মহাভাগ! আপনি যাহা বলিয়াছেন, তাহাই সত্য। হে ব্রহ্মন্, আপনার পবিত্র বাক্যতেই আমার প্রত্যয় হই-য়াছে এবং বৈদেহীও লঙ্কামধ্যে পূর্ব্বকালে দেবগণসমীপে প্রত্যয় প্রদান ও শপথ করিয়াছিলেন, তজ্জন্যই ইঁহাকে গৃহে প্রবিষ্ট করাইয়াছিলাম। হে ব্রহ্মন্! এই জানকীকে আমি পবিত্রা জানিয়াও শুদ্ধ লোকাপবাদভয়ে ত্যাগ করিয়াছি। আর যমজ কুশীলব আমারই পুত্র, আমি তাহা জানি। কিন্তু আপনি আমাকে ক্ষমা করিবেন। আমি যে কারণে জানকীকে ত্যাগ করিয়াছি, সেই লোকাপবাদ আমার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্। জগ-মধ্যে পবিত্রা জানকীতে আমার প্রীতি থাকুক।"

অনন্তর সীতা-শপথ বিষয়ে রামের অভিপ্রায় জানিয়া দেবগণ ব্রহ্মাকে পুরোবর্ত্তী করিয়া সেই স্থানে সমাগত হইলেন এবং আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, বিশ্বদেবগণ, বায়ুগণ, সকল সাধ্যগণ, দেবগণ, সকল পরমর্ষিগণ, নাগ-গণ, পক্ষিগণ সকলেই হৃষ্টান্তঃকরণ হইয়া সেই স্থলে আগমন করিলেন। রাম সমাগত সেই সকল দেবগণ ঋষিগণকে দেখিয়া পুনর্ব্বার বাল্মীকিকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন;—

"হে মুনিশ্রেষ্ঠ! পবিত্র ঋষিবাক্যে আমার প্রত্যয় আছে। জগতে বিশুদ্ধতাশালিনী সীতার প্রতি আমার প্রীতি থাকুক, কিন্তু সীতাশপথদর্শন জন্য কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সকলে সমাগত হইয়াছেন।"

কোটি কলস জলের আলোচনায় সাগর-মাহাত্ম্য অনুভূত করা যায় না। সেইরূপ কাব্যগ্রন্থের এই স্থান ভাল রচনা, এই স্থান মন্দ রচনা, এইরূপ তাহার সর্ব্বাংশের পর্য্যালোচনা করিলে, প্রকৃত গুণাগুণ বুঝিতে পারা যায় না। যেমন অট্টালিকার সৌন্দর্য্য বুঝিতে গেলে সমুদায় অট্টালিকাটি এককালে দেখিতে হইবে, সাগর-গৌরব অনুভূত করিতে হইলে তাহার অনন্ত বিস্তার এককালে চক্ষে গ্রহণ করিতে হইবে, কাব্যনাটক সমালোচনও সেইরূপ। মহাভারত এবং রামায়ণের অনেকাংশ এমন অপকৃষ্ট যে, তাহা কেহই পড়িতে পারে না। যে আণুবীক্ষণিক সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইবে, সে কখনই এই দুই ইতিহাসের বিশেষ প্রশংসা করিবে না। কিন্তু মোটের উপর দেখিতে গেলে বলিতে হইবে যে, এই দুই ইতিহাসের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কাব্য পৃথিবীতে আর নাই।

সুতরাং উত্তরচরিত সম্বন্ধে মোটের উপর দুই চারিটা কথা না বলিলে নয়। অধিক বলিবার স্থান নাই।

কবির প্রধান গুণ সৃষ্টিক্ষমতা। যে কবি সৃষ্টিক্ষম নহেন, তাঁহার রচনায় অনেক গুণ থাকিলেও বিশেষ প্রশংসা নাই। কালিদাসের ঋতুসংহার এবং টম্‌সনের তদ্বিষয়ক কাব্যে উৎকৃষ্ট বাহ্য-প্রকৃতির বর্ণনা আছে। উভয় গ্রন্থই আদ্যোপান্ত সুমধুর প্রসাদগুণবিশিষ্ট এবং স্বভাবানুকারী। তথাপি এই দুই কাব্য প্রধান কাব্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে না—কেন না, তদুভয়মধ্যে সৃষ্টিচাতুর্য্য কিছুই নাই।

সৃষ্টিক্ষমতামাত্রই প্রশংসনীয় নহে। অনেক ইংরেজি আখ্যায়িকা-লেখকের রচনামধ্যে নূতন সৃষ্টি আছে, তথাপি ঐ সকলকে অপকৃষ্ট গ্রন্থমধ্যে গণনা করিতে হয়। কেন না, সেই সকল সৃষ্টি স্বভাবানুকারিণী এবং সৌন্দর্য্যবিশিষ্টা নহে। অতএব কবির সৃষ্টি স্বভাবানুকারিণী এবং সৌন্দর্য্যবিশিষ্টা না হইলে কোন প্রশংসা নাই।

সৌন্দর্য্য এবং স্বভাবানুকারিতা, এই দুয়ের একটি গুণ থাকিলেই কবির সৃষ্টির কিছু প্রশংসা হইল বটে, কিন্তু উভয় গুণ না থাকিলে কবিকে প্রধান পদে অভিষিক্ত করা যায় না। আরব্য উপন্যাস বলিয়া যে বিখ্যাত আরব্য গ্রন্থের প্রচার হইয়াছে, তল্লেখকের সৃষ্টির মনোহারিত্ব আছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাতে স্বভাবানুকারিতা না থাকায় "আলেফ লয়লা" পৃথিবীর অত্যুৎকৃষ্ট কাব্যগ্রন্থমধ্যে গণ্য নহে।

কেবল স্বভাবানুকারিণী সৃষ্টিরও বিশেষ প্রশংসা নাই। যেমন জগতে দেখিয়া থাকি, কবির রচনা-মধ্যে তাহারই অবিকল প্রতিকৃতি দেখিলে কবির চিত্র-নৈপুণ্যের প্রশংসা করিতে হয়, কিন্তু তাহাতে

তখন দিব্যগন্ধবিশিষ্ট মনোহর এবং সর্ব্বপাপপুণ্য-সাক্ষী পবিত্র বায়ু প্রবাহিত হইয়া সেই জনবৃন্দকে আহ্লাদিত করিল। পূর্ব্বকালের সত্যযুগের ন্যায় সেই আশ্চর্য্য অচিন্তনীয় ব্যাপার, সকল রাষ্ট্র হইতে সমাগত জনমণ্ডলী সমাহিত হইয়া দেখিতে লাগিল। কাষায়-বস্ত্রপরিধানা সীতা সকলকে সমাগত দেখিয়া অধোমুখী, অধোদৃষ্টি এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া এইরূপ কহিতে লাগিলেন—"যদি আমি মনেতেও রাম ভিন্ন অন্য চিন্তা না করিয়া থাকি, তবে পৃথিবীদেবী আমাকে বিবর প্রদান করুন। যদি আমি কায়মনোবাক্যে রামার্চ্চন করিয়া থাকি, তবে পৃথিবী-দেবী আমাকে বিবর প্রদান করুন। 'আমি রাম ভিন্ন জানি না' আমার এই বাক্য যদি সত্য হয়, তবে পৃথিবী-দেবী আমাকে বিবর প্রদান করুন।"

বৈদেহী এইরূপ শপথ করিলে তখন অমিতবিক্রম দিব্যরত্নালঙ্কৃত নাগগণ কর্ত্তৃক মস্তকে বাহিত দিব্যকান্তি দিব্য সিংহাসন রসাতল হইতে সহসা অভির্ভূত হইল এবং সেই স্থলে পৃথিবীদেবী দিব্য বাহু দ্বারা সীতাকে গ্রহণ করিয়া এবং স্বাগত প্রশ্নে অভিনন্দন করিয়া সেই উত্তমাসনে উপবেশন করাইলেন। সিংহাসনারূঢ়া সেই সীতাকে রসাতলে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তদুপরি স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল এবং দেবগণের অতি বিপুল সাধুবাদ হঠাৎ উত্থিত হইল। সীতার রসাতল-প্রবেশ দেখিয়া অন্তরীক্ষগত দেবগণ হৃষ্টান্তঃকরণ হইয়া, "সীতা সাধু, যাহার এরূপ চরিত্র" ইত্যাদি নানা প্রকার কহিতে লাগিলেন। যজ্ঞস্থলগত সেই সকল মুনিগণ ও মনুষ্যশ্রেষ্ঠ রাজগণ এই অদ্ভুত ঘটনা হেতু বিস্ময় হইতে বিরত হইতে পারিলেন না। তৎকালে আকাশে, ভূতলে স্থাবর-জঙ্গম পদার্থ ও মহাকায় দানবগণ ও পাতালে নাগগণ সকলেই হৃষ্টান্তঃকরণ হইয়াছিলেন। তাঁহারা হৃষ্টমনে শব্দ করিতে লাগিলেন, কাহারাও বা ধ্যানস্থ হইলেন, কাহারাও বা রামকে দেখিতে লাগিলেন এবং কেহ কেহ বা নিঃসংজ্ঞ হইয়া সীতাকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। এইরূপে সমাগত সেই সকল ঋষি প্রভৃতির, সীতার রসাতল-প্রবেশ দেখিয়া, এই প্রকারে সমাগম হইয়াছিল এবং সেই মুহূর্ত্তে সমুদয় জগৎ সমকালেই মোহিত হইয়াছিল।

চিত্র-নৈপুণ্যের প্রশংসা, সৃষ্টি-চাতুর্য্যের প্রশংসা কি? আর তাহাতে কি উপকার হইল? যাহা বাহিরে দেখিতেছি, তাহাই গ্রন্থে দেখিলাম; তাহাতে আমার লাভ হইল কি? যথার্থ প্রতিকৃতি দেখিয়া আমোদ আছে বটে—কেবল স্বভাবসঙ্গত গুণবিশিষ্ট সৃষ্টিতে সেই আমোদমাত্র জন্মিয়া থাকে; কিন্তু আমোদ ভিন্ন অন্য লাভ যে কাব্যে নাই, সে কাব্য সামান্য বলিয়া গণিত হয়।

অনেকে এই কথা বিস্ময়কর বলিয়া বোধ করিবেন। কি এ দেশে, কি সুসভ্য ইউরোপীয় জাতিমধ্যে, অনেক পাঠকেরই এইরূপ সংস্কার যে, ক্ষণিক-চিত্তরঞ্জন ভিন্ন কাব্যের অন্য উদ্দেশ্য নাই। বস্তুতঃ অধিকাংশ কাব্যে (বিশেষতঃ গদ্যকাব্যে বা আধুনিক নবেলে) এই চিত্তরঞ্জন-প্রবৃত্তিই লক্ষিত হয়—তাহাতে চিত্তরঞ্জন ভিন্ন গ্রন্থকারের অন্য উদ্দেশ্য থাকে না এবং তাহাতে চিত্তরঞ্জনোপযোগিতা ভিন্ন আর কিছু থাকেও না। কিন্তু সে সকলকে উৎকৃষ্ট কাব্য বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে না।

যদি চিত্তরঞ্জনই কাব্যের উদ্দেশ্য হইল, তবে বেস্থামের তর্কে দোষ কি? (১) কাব্যেও চিত্তরঞ্জন হয়, শতরঞ্চ খেলায়ও চিত্তরঞ্জন হয়। বরং অনেকেরই ঐবান্‌হো অপেক্ষা একবাজী শতরঞ্চ খেলায় অধিক আমোদ হয়। তবে তাঁহাদের মধ্যে কাব্য হইতে শতরঞ্চ উৎকৃষ্ট বস্তু? এবং স্কট-কালিদাসাদি অপেক্ষা এক জন পাকা খেলোয়াড় বড় লোক? অনেকে বলিবেন যে, কাব্য-প্রদত্ত আনন্দ বিশুদ্ধ আনন্দ, সেই জন্য কাব্যেরই প্রাধান্য। শতরঞ্চের আমোদ অবিশুদ্ধ কিসে?

এইরূপ তর্ক যদি অযথার্থ না হয়, তবে চিত্তরঞ্জন ভিন্ন কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য আর কিছু অবশ্য আছেই আছে। সেটি কি?

অনেকে উত্তর দিবেন, "নীতিশিক্ষা।" যদি তাহা সত্য হয়, তবে "হিতোপদেশ" রঘুবংশ হইতে উৎকৃষ্ট কাব্য। কেন না, বোধ হয়, হিতোপদেশে রঘুবংশ হইতে নীতিবাহুল্য আছে। সেই হিসাবে কথামালা হইতে শকুন্তলা-কাব্যাংশে অপকৃষ্ট।

কেহই এ সকল কথা স্বীকার করিবেন না। তাহা না করিলেন, তবে কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য কি? কি জন্য শতরঞ্চ খেলা ফেলিয়া শকুন্তলা পড়িব?

কাব্যের উদ্দেশ্য নীতিজ্ঞান নহে। কিন্তু নীতিজ্ঞানের যে উদ্দেশ্য, কাব্যের সেই উদ্দেশ্য। কাব্যের গৌণ উদ্দেশ্য মনুষ্যের চিত্তোৎকর্ষসাধন—চিত্তশুদ্ধিজনন। কবিরা জগতের শিক্ষাদাতা—কিন্তু নীতিব্যাখ্যার দ্বারা তাঁহারা শিক্ষা দেন না। কথাচ্ছলেও শিক্ষা দেন না। তাঁহারা সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষ সৃজনের দ্বারা জগতের চিত্তশুদ্ধি-বিধান করেন। এই সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষের সৃষ্টি কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য, প্রথমোক্তটি গৌণ উদ্দেশ্য, শেষোক্তটি মুখ্য উদ্দেশ্য।

কথাটা পরিষ্কার হইল না। যদিও উত্তরচরিত-সমালোচনা পক্ষে এ কথা আর অধিক পরিষ্কার করিবার প্রয়োজন নাই, তথাপি প্রস্তাবের গৌরবানুরোধে আমরা তাহাতে প্রবৃত্ত হইলাম।

চোর চুরি করে। রাজা তাহাকে বলিলেন, "তুমি চুরি করিও না, আমি তাহা হইলে তোমাকে অবরুদ্ধ করিব।" চোর ভয়ে প্রকাশ্য চুরি হইতে নিবৃত্ত হইল, কিন্তু তাহার চিত্তশুদ্ধি জন্মিল না। সে যখনই বুঝিবে, চুরি করিলে রাজা জানিতে পারিবেন না, তখনই চুরি করিবে।

তাহাকে ধর্ম্মোপদেশক বলিলেন, "তুমি চুরি করিও না—চুরি, ঈশ্বরাজ্ঞাবিরুদ্ধ।" চোর বলিল, "তাহা হইতে পারে, কিন্তু ঈশ্বর যখন আমার আহারের অপ্রতুল করিয়াছেন, তখন আমি চুরি করিয়াই খাইব।" ধর্ম্মোপদেশক বলিলেন, "তুমি চুরি করিলে নরকে যাইবে।" চোর বলিল, "তদ্বিষয়ে প্রমাণাভাব।"

নীতিবেত্তা কহিতেছেন, "তুমি চুরি করিও না, কেন না, চুরিতে সকল লোকের অনিষ্ট, তাহা কাহারও কর্ত্তব্য নহে।" চোর বলিবে, "যদি সকল লোক আমার জন্য ভাবিত, আমি তাহা হইলে সকলের জন্য ভাবিতে পারিতাম। লোকে আমায় খেতে দিক, আমি চুরি করিব না। কিন্তু যেখানে লোকে আমায় কিছু দেয় না, সেখানে তাহাদের অনিষ্ট হয় হউক, আমি চুরি করিব।" কবি চোরকে কিছু বলিলেন না, চুরি করিতে নিষেধ করিলেন না। কিন্তু তিনি এক সর্ব্বজন-মনোহর, পবিত্র চরিত্র সৃজন করিলেন। সর্ব্বজন-মনোহর, তাহাতে চোরেরও মন মুগ্ধ হইবে। মনুষ্যের স্বভাব, যে যাহাতে মুগ্ধ হয়, পুনঃ পুনঃ চিত্ত প্রীত হইয়া তদালোচনা করে। তাহাতে আকাঙ্ক্ষা জন্মে—কেন না, লাভাকাঙ্ক্ষার নাম অনুরাগ। এইরূপে পবিত্রতার প্রতি চোরের

---

(১) বেস্থাম বলেন, আমোদ সমান হইলে কাব্যের এবং 'পুশ্‌পিন' খেলার একই দর।

অনুরাগ জন্মে। সুতরাং চুরি প্রভৃতি অপবিত্র কার্য্যে সে বীতরাগ হয়।

"আত্মপরায়ণতা মন্দ, তুমি আত্মপরায়ণ হইও না" এই নৈতিক উক্তি রামায়ণ নহে। কথাচ্ছলে এই নীতি প্রতিপন্ন করিবার জন্য রামায়ণের প্রণয়ন হয় নাই। কিন্তু রামায়ণ হইতে ভারতবর্ষের আত্মপরায়ণতা দোষ যতদূর পরিহার হইয়াছে, ততদূর কোন নীতিবেত্তা, ধর্ম্মবেত্তা, সমাজকর্ত্তা বা রাজা বা রাজকর্ম্মচারী কর্ত্তৃক হয় নাই। সুবিবেচক পাঠকের এতক্ষণ বোধ হইয়া থাকিবে যে, উদ্দেশ্য এবং সফলতা উভয় বিবেচনা করিলে রাজা, রাজনীতিবেত্তা, ব্যবস্থাপক, সমাজতত্ত্ববেত্তা, ধর্ম্মোপদেষ্টা, নীতিবেত্তা, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক সর্ব্বাপেক্ষাই কবির শ্রেষ্ঠত্ব। কবিত্ব পক্ষে যেরূপ মানসিক ক্ষমতা আবশ্যক, তাহা বিবেচনা করিলেও কবির সেইরূপ প্রাধান্য। কবিরা জগতের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাদাতা এবং উপকারকর্ত্তা এবং সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মানসিক শক্তিসম্পন্ন।

কি প্রকারে কাব্যকারেরা এই মহৎ কার্য্য সিদ্ধ করেন? যাহা সকলের চিত্তকে আকৃষ্ট করিবে, তাহার সৃষ্টি দ্বারা সকলের চিত্তকে আকৃষ্ট করে, সে কি? সৌন্দর্য্য। অতএব সৌন্দর্য্যসৃষ্টিই কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য। সৌন্দর্য্য অর্থে কেবল বাহ্যপ্রকৃতির বা শারীরিক সৌন্দর্য্য নহে। সকল প্রকারের সৌন্দর্য্য বুঝিতে হইবে। যাহা স্বভাবানুকারী নহে, তাহাতে কুসংস্কারবিশিষ্ট লোক ভিন্ন কাহারও মন মুগ্ধ হয় না। এ জন্য স্বভাবানুকারিতা ছাড়া সৌন্দর্য্য জন্মে না। তবে যে আমরা স্বভাবানুকারিতা এবং সৌন্দর্য্য দুটি পৃথক্ গুণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি, তাহার কারণ, সৌন্দর্য্যের অনেক অর্থ প্রচলিত আছে।

আর একটি কথা বুঝাইলেই হয়। এই জগৎ ত সৌন্দর্য্যময়—তাহার প্রকৃতিমাত্রই সৌন্দর্য্যময় হইবে। তবে কেন আমরা উপরে বলিয়াছি যে, যাহা প্রকৃতির প্রকৃতি মাত্র, সে সৃষ্টিতে কবির তাদৃশ গৌরব নাই? তাহার কারণ, সে কেবল প্রতিকৃতি—অনুলিপিমাত্র—তাহাকে সৃষ্টি বলা যায় না। যাহা সত্যের প্রতিকৃতি মাত্র নহে—তাহাই সৃষ্টি। যাহা স্বভাবানুকারী অথচ স্বভাবাতিরিক্ত, তাহাই কবির প্রশংসনীয় সৃষ্টি। তাহাতেই চিত্ত বিশেষরূপে আকৃষ্ট হয়। যাহা প্রকৃত, তাহাতে চিত্ত আকৃষ্ট হয় না। কেন না, তাহা অসম্পূর্ণ, দোষ-সংস্পৃষ্ট, পুরাতন এবং অনেক সময়ে অস্পষ্ট। কবির সৃষ্টি তাঁহার স্বেচ্ছাধীন; সুতরাং সম্পূর্ণ, দোষশূন্য, নবীন এবং স্পষ্ট হইতে পারে।

এইরূপ যে সৌন্দর্য্যসৃষ্টি কবির সর্ব্বপ্রধান গুণ—সেই অভিনব, স্বভাবাতিরিক্ত সৌন্দর্য্যসৃষ্টিগুণে ভারতবর্ষীয় কবিদিগের মধ্যে বাল্মীকি এবং মহাভারতকার প্রধান। এক এক কার্য্যে ঈদৃশ সৃষ্টি-বৈচিত্র্য প্রায় জগতে দুর্লভ।

এ সম্বন্ধে ভবভূতির স্থান কোথায়? তাহা তাঁহার তিনখানি নাটক পর্য্যালোচিত না করিলে অবধারিত করা যায় না। তাহা আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে। কেবল উত্তরচরিত দেখিয়া তাঁহাকে অতি উচ্চাসন দেওয়া যায় না। উত্তরচরিতে ভবভূতি অনেক দূর পর্য্যন্ত বাল্মীকির অনুবর্ত্তী হইতে বাধ্য হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহার সৃষ্টিমধ্যে নবীনত্বের অভাব এবং সৃষ্টি-চাতুর্য্যের প্রচার করিবার পথও পান নাই। চরিত্র-সৃষ্টিসম্বন্ধে ইহা বলা যাইতে পারে যে, রাম ও সীতা ভিন্ন কোন নায়ক-নায়িকার প্রাধান্য নাই। সীতা রামায়ণের সীতার প্রতিকৃতি মাত্র। রামের চরিত্র রামায়ণের রামের চরিত্রের উৎকৃষ্ট প্রতিকৃতিও নহে—ভবভূতির হস্তে সে মহচ্চিত্র যে বিকৃত হইয়া গিয়াছে, তাহা পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। সীতাও তাঁহার কাছে অপেক্ষাকৃত সামান্যিক স্ত্রীলোকের চরিত্র কতকদূর পাইয়াছেন। তাই বলিয়া এমত বলা যায় না যে, উত্তরচরিতে চরিত্রসৃষ্টি-চাতুর্য্য কিছুই লক্ষিত হয় না। বাসন্তী ভবভূতির অভিনব সৃষ্টি বটে এবং এ চরিত্র অত্যন্ত মনোহর। আমরা বাসন্তীর চরিত্রের সবিশেষ পরিচয় দিয়াছি, সুতরাং তৎসম্বন্ধে আর বিস্তারের আবশ্যক নাই। এই পরদুঃখকাতরহৃদয়া স্নেহময়ী বনচারিণী যে অবধি প্রথম দেখা দিলেন, সেই অবধি তাঁহার প্রতি পাঠকের প্রীতি-সঞ্চার হইতে থাকিল।

তদ্ভিন্ন চন্দ্রকেতু ও লবের চিত্রও প্রশংসনীয়। প্রাচীন কবিদিগের ন্যায় ভবভূতিও জড় পদার্থকে রূপবান্-করণে বিলক্ষণ সুচতুর। তমসা, মুরলা, গঙ্গা এবং পৃথিবী এই নাটকে মানবরূপিণী। সেই রূপগুলিন্ যে মনোহর হইয়াছে, পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

কবির চরিত্র, রূপ, অবস্থা, কার্য্যাদিতে পরিণত হয়। ইহার মধ্যে কোন একটি সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নহে, সকলের সংযোগে সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য। চরিত্র, রূপ, স্থান, অবস্থা, কার্য্য এ সকলের সমবায়ে যাহা

উত্তমাসনে উপবেশন করাইলেন।

দাঁড়াইল, তাহা যদি সুন্দর হইল, তবেই কবি সিদ্ধকাম হইলেন।

ভবভূতির চরিত্রসৃজনের পরিচয় দিয়াছি। অন্যান্য বিষয়ে তাঁহার সৃজন-কৌশলের পরিচয় ছায়া নামে উত্তরচরিতের তৃতীয়াঙ্কে। আমাদিগের পরিশ্রম যদি নিষ্ফল না হইয়া থাকে, তবে পাঠক সেই ছায়ার মোহিনী শক্তি অনুভূত করিয়াছেন। ঈদৃশ রমণীয় সৃষ্টি অতি দুর্লভ।

সৃষ্টি-কৌশল কবির প্রধান গুণ, কবির আর একটি বিশেষ গুণ রসোদ্ভাবন। রসোদ্ভাবন কাহাকে বলে, আমরা বুঝাইতে বাসনা করি, কিন্তু রস শব্দটি ব্যবহার করিয়া আমরা সে পথে কাঁটা দিয়াছি। এ দেশীয় প্রাচীন আলঙ্কারিকদিগের ব্যবহৃত শব্দগুলি এ কালে পরিহার্য্য; ব্যবহার করিলেই বিপদ ঘটে; আমরা সাধ্যানুসারে তাহা বর্জ্জন করিয়াছি, এই রস শব্দটি ব্যবহার করিয়া বিপদ ঘটিল। নয়টি বৈ রস নয়, কিন্তু মনুষ্য-চিত্তবৃত্তি অসংখ্য। রতি, শোক, ক্রোধ স্থায়িভাব; কিন্তু হর্ষ, অমর্ষ প্রভৃতি ব্যভিচারভাব। স্নেহ, প্রণয়, দয়া ইহাদের কোথাও স্থান নাই—না স্থায়ী না ব্যভিচারী—কিন্তু একটি কাব্যানুপযোগী কদর্য্য মানসিক বৃত্তি আদিরসের আকাশস্বরূপ স্থায়িভাবে প্রথমে স্থান পাইয়াছে। স্নেহ, প্রণয়, দয়াদি পরিবিজ্ঞাপক রস নাই, কিন্তু শান্তি একটি রস; সুতরাং এবংবিধ পারিভাষিক শব্দ লইয়া সমালোচনার কার্য্য সম্পন্ন হয় না। আমরা যাহা বলিতে চাহি, তাহা অন্য কথায় বুঝাইতেছি; আলঙ্কারিকদিগকে প্রণাম করি।

মনুষ্যের কার্য্যের মূল তাহাদিগের চিত্তবৃত্তি। সেই সকল চিত্তবৃত্তি অবস্থানুসারে অত্যন্ত বেগবতী হয়। সেই বেগের সমুচিত বর্ণনা দ্বারা সৌন্দর্য্যের সৃজন কাব্যের উদ্দেশ্য। অস্মদ্দেশীয় আলঙ্কারিকেরা সেই বেগবতী মনোবৃত্তিগণকে স্থায়িভাব নাম দিয়া এ শব্দের এরূপ পরিভাষা করিয়াছেন যে, প্রকৃত কথা বুঝা ভার। ইংরেজি আলঙ্কারিকেরা তাহাকে Passion বলেন। আমরা যাহা কাব্যগত প্রতিকৃতিকে রসোদ্ভাবন বলিলাম।

রসোদ্ভাবনে ভবভূতির ক্ষমতা অপরিসীম। যখন যে রস উদ্ভাবনের ইচ্ছা করিয়াছেন, তখনই তাহার চরম দেখাইয়াছেন। তাঁহার লেখনীমুখে স্নেহ উছলিতে থাকে, শোক দহিতে থাকে, দম্ভ ফুলিতে থাকে। ভবভূতির মোহিনী শক্তি-প্রভাবে আমরা দেখিতে পাই যে, রামের শরীর ভাঙিতেছে, মর্ম্ম ছিঁড়িতেছে, মস্তক ঘুরিতেছে, চেতনা লুপ্ত হইতেছে—দেখিতে পাই, সীতা কখন বিস্ময়-স্তিমিতা, কখন আনন্দোত্থিতা, কখন প্রেমাভিভূতা, কখন অভিমানকুণ্ঠিতা, কখন আত্মাবমাননাসঙ্কুচিতা, কখন অনুতাপবিবশা, কখন মহাশোকে ব্যাকুলা। কবি যখন যাহা দেখাইয়াছেন, একেবারে নায়ক-নায়িকার হৃদয় যেন বাহির করিয়া দেখাইয়াছেন। যখন সীতা বলিলেন, "অম্মহে জলভরিদমেহত্থণিদগম্ভীরমংসলো কুদো ণু এসো ভারদীণিগ্‌ঘোষো। ভরিঅমাণকণ্ণবিবরং মং বি মন্দভাইণীং ঝত্তি উম্মাবেদি।" তখন বোধ হইল, জগৎ-সংসার সীতার প্রেমে পরিপূর্ণ হইল; ফলে রসোদ্ভাবিনী শক্তিতে ভবভূতি পৃথিবীর প্রধান কবিদিগের সহিত তুলনীয়। এক মাত্র কথা বলিয়া মানব-মনোবৃত্তির সমুদ্রবৎ সীমাশূন্যতা চিত্রিত করা মহাকবির লক্ষণ। ভবভূতির রচনা সেই লক্ষণাক্রান্ত। পরিতাপের বিষয় এই যে, সে শক্তি থাকিতেও ভবভূতি রামবিলাপের এত বাহুল্য করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার যশের লাঘব হইয়াছে। আমাদিগের ইচ্ছা ছিল যে, এই রামবিলাপের সহিত আর কয়খানি প্রসিদ্ধ নাটকের কয়েকটি স্থান তুলিত করিয়া তারতম্য দেখাই, কিন্তু স্থানাভাবে পারিলাম না। সহৃদয় পাঠক, শকুন্তলার জন্য দুষ্মন্তের বিলাপ, দেস্‌দিমোনার জন্য ওথেলোর বিলাপ, এবং ইউরোপীয়দিগের নাটকে আলকেস্তিসের জন্য আদ্‌মিতসের বিলাপ, এই রামবিলাপের সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখিবেন।

বাহ্য-প্রকৃতির শোভায় প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ ভবভূতির আর একটি গুণ। সংসারে যেখানে যাহা সুদৃশ্য, সুগন্ধ বা সুখকর, ভবভূতি অনবরত তাহার সন্ধানে ফিরেন। মালাকার যেমন পুষ্পোদ্যান হইতে সুন্দর সুন্দর কুসুমগুলি তুলিয়া সভামণ্ডপ রঞ্জিত করে, ভবভূতি সেইরূপ সুন্দর বস্তু অবকীর্ণ করিয়া এই নাটকখানি শোভিত করিয়াছেন। যেখানে সুদৃশ্য বৃক্ষ, প্রফুল্ল কুসুম, সুশীতল সুবাসিত বারি, যেখানে নীল মেঘ, উত্তুঙ্গ পর্ব্বত, মৃদুনিনাদিনী নির্ঝরিণী, শ্যামল কানন, তরঙ্গসঙ্কুলা নদী—যেখানে সুন্দর বিহঙ্গ, ক্রীড়াশীল করিশাবক, সরলস্বভাব কুরঙ্গ, সেইখানে কবি দাঁড়াইয়া একবার তাহার সৌন্দর্য্য দেখাইয়াছেন। কবিদিগের মধ্যে এই গুণটি সেক্ষপীয়র ও কালিদাসের বিশেষ লক্ষণীয়। ভবভূতির এই গুণ বিশেষ প্রকাশমান।

ভবভূতির ভাষা অতি চমৎকারিণী। তাঁহার রচনা সমাসবহুলতা ও দুর্ব্বোধ্যতা দোষে কলঙ্কিতা বলিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্ত্তৃক নিন্দিত হইয়াছে। সে নিন্দা সমূলক হইলেও, সাধারণতঃ যে ভবভূতি-ব্যবহৃত সংস্কৃত ও প্রাকৃত অতি মনোহর, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। উইলসন বলিয়াছেন যে, কালিদাস ও ভবভূতির ভাষার ন্যায় মহতী ভাষা কোন দেশের লেখকেই দৃষ্ট হয় না।

উত্তরচরিতে যে সকল দোষ, তাহা আমরা যথাস্থানে বিবৃত করিয়াছি; পুনরুল্লেখের আবশ্যকতা নাই। আমরা এই নাটকের সমালোচনা সমাপন করিলাম। অন্যান্য দোষের মধ্যে দৈর্ঘ্য-দোষে এই সমালোচনা বিশেষ দূষিত হইয়াছে। এ জন্য আমরা কুণ্ঠিত নহি। যে দেশে তিন ছত্রে সচরাচর গ্রন্থ সমালোচনা সমাপ্ত করার প্রথা, সে দেশে একখানি প্রাচীন গ্রন্থের সমালোচন দীর্ঘ হইলে দোষটি মার্জ্জনাতীত হইবে না। যদি ইহার দ্বারা একজন পাঠকেরও কাব্যানুরাগ বর্দ্ধিত হয় বা তাঁহার কাব্যরসগ্রাহিণী শক্তির কিঞ্চিন্মাত্র সহায়তা হয়, তাহা হইলে আমরা এই দীর্ঘ প্রবন্ধ সফল বিবেচনা করিব।

গীতিকাব্য *

কাব্য কাহাকে বলে, তাহা অনেকে বুঝাইবার জন্য যত্ন করিয়াছেন, কিন্তু কাহারও যত্ন সফল হইয়াছে কি না সন্দেহ। ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, দুই ব্যক্তি কখনও এক প্রকার অর্থ করেন নাই। কিন্তু কাব্যের যথার্থ লক্ষণ সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও কাব্য একই পদার্থ সন্দেহ নাই। সেই পদার্থ কি, তাহা কেহ বুঝাইতে পারুন বা না পারুন, কাব্যপ্রিয় ব্যক্তিমাত্রেই এক প্রকার অনুভব করিতে পারেন।

কাব্যের লক্ষণ যাহাই হউক না কেন, আমাদিগের বিবেচনায় অনেকগুলিন গ্রন্থ, যাহার প্রতি সচরাচর কাব্য নাম প্রযুক্ত হয় না, তাহাও কাব্য। মহাভারত, রামায়ণ ইতিহাস বলিয়া খ্যাত হইলেও তাহা কাব্য, শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ বলিয়া খ্যাত হইলেও তাহা অংশবিশেষে কাব্য। স্কটের উপন্যাসগুলিকে আমরা কাব্য বলিয়া স্বীকার করি, নাটককে আমরা কাব্যমধ্যে গণ্য করি, তাহা বলাই বাহুল্য।

ভারতবর্ষীয় এবং পাশ্চাত্য আলঙ্কারিকেরা কাব্যকে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। তাহার মধ্যে অনেকগুলিন বিভাগ অনর্থক বলিয়া বোধ হয়। তাঁহাদিগের কথিত তিনটি শ্রেণী গ্রহণ করিলেই যথেষ্ট হয়; যথা—১ম দৃশ্যকাব্য, অর্থাৎ নাটকাদি; ২য় আখ্যানকাব্য অথবা মহাকাব্য; রঘুবংশের ন্যায় বংশাবলীর উপাখ্যান, রামায়ণের ন্যায় ব্যক্তিবিশেষের চরিত, শিশুপালের ন্যায় ঘটনা-বিশেষের বিবরণ—সকলই ইহার অন্তর্গত; বাসবদত্তা, কাদম্বরী প্রভৃতি গদ্যকাব্য ইহার অন্তর্গত এবং আধুনিক উপন্যাস সকল এই শ্রেণীভুক্ত। ৩য় খণ্ডকাব্য। যে কোন কাব্য প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত নহে, তাহাকেই আমরা খণ্ডকাব্য বলিলাম।

দেখা যাইতেছে যে, এই ত্রিবিধ কাব্যের রূপগত বিলক্ষণ বৈষম্য আছে। কিন্তু রূপগত বৈষম্য প্রকৃত নহে। দৃশ্যকাব্য সচরাচর কথোপকথনেই রচিত হয় এবং রঙ্গাঙ্গনে অভিনীত হইতে পারে, কিন্তু যাহাই কথোপকথনে গ্রথিত এবং অভিনয়োপযোগী, তাহাই যে নাটক বা তৎশ্রেণীস্থ, এমত নহে। এ দেশের লোকের সাধারণতঃ উপরি-উক্ত ভ্রান্তিমূলক সংস্কার আছে, এই জন্য নিত্য দেখা যায় যে, কথোপকথনে গ্রথিত অসংখ্য পুস্তক নাটক বলিয়া প্রচারিত, পঠিত এবং অভিনীত হইয়াছে। বাস্তবিক, তাহার মধ্যে অনেকগুলিন নাটক নহে। পাশ্চাত্য ভাষায় অনেকগুলিন উৎকৃষ্ট কাব্য আছে, যাহা নাটকের ন্যায় কথোপকথনে গ্রথিত, কিন্তু বস্তুতঃ নাটক নহে। "Comus" "Manfred," "Faust" ইহার উদাহরণ। অনেকে শকুন্তলা ও উত্তররাম-চরিতকেও নাটক বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, ইংরেজি ও গ্রীক ভাষা ভিন্ন কোন ভাষায় প্রকৃত নাটক নাই। পক্ষান্তরে, গেটে বলিয়াছেন যে, প্রকৃত নাটকের পক্ষে, কথোপকথনে গ্রন্থন বা অভিনয়ের উপযোগিতা নিতান্ত আবশ্যক নহে। আমাদিগের বিবেচনায় "Bride of Lammermoor"কে নাটক বলিলে অন্যায় হয় না; ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, আখ্যানকাব্যও নাটকাকারে প্রণীত হইতে পারে। অথবা গীতপরম্পরায় সন্নিবেশিত হইয়া গীতিকাব্যের রূপ ধারণ করিতে পারে। বাঙ্গালা ভাষায় শেষোক্ত বিষয়ের উদা-

* অবকাশরঞ্জিনী। কলিকাতা।

হরণের অভাব নাই। পক্ষান্তরে, দেখা গিয়াছে, অনেক খণ্ড-কাব্য মহাকাব্যের আকারে রচিত হইয়াছে। যদি কোন একটি সামান্য উপাখ্যানের সূত্রে গ্রথিত কাব্যমালাকে আখ্যানকাব্য বা মহাকাব্য নাম দেওয়া বিধেয় হয়, তবে, "Excursion" এবং "Childe Herold"কে ঐ নাম দিতে হয়, কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় ঐ কাব্য খণ্ডকাব্যের সংগ্রহ মাত্র।

খণ্ডকাব্যমধ্যে আমরা অনেক প্রকার কাব্যের স্থান করিয়াছি। তন্মধ্যে একপ্রকার কাব্য প্রাধান্য লাভ করিয়া ইউরোপে গীতিকাব্য (lyric) নামে খ্যাত হইয়াছে। অদ্য সেই শ্রেণীর কাব্যের কথাই আমাদিগের প্রয়োজন।

ইউরোপে কোন বস্তু একটি পৃথক্ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া, আমাদিগের দেশেও যে একটি পৃথক্ নাম দিতে হইবে, এমত নহে। যেখানে বস্তুগত কোন পার্থক্য নাই, সেখানে নামের পার্থক্য অনর্থক এবং অনিষ্টজনক; কিন্তু যেখানে বস্তুগুলি পৃথক্, সেখানে নামও পৃথক্ হওয়া আবশ্যক। যদি এমত কোনও বস্তু থাকে যে, তাহার জন্য গীতিকাব্য নামটি গ্রহণ করা আবশ্যক, তবে অবশ্য ইউরোপের নিকট আমাদিগকে ঋণী হইতে হইবে।

গীত মনুষ্যের এক প্রকার স্বভাবজাত। মনের ভাব কেবল কথায় ব্যক্ত হইতে পারে, কিন্তু কণ্ঠভঙ্গীতে তাহা স্পষ্টীকৃত হয়। 'আঃ' এই শব্দ কণ্ঠভঙ্গীর গুণে দুঃখবোধক হইতে পারে, বিরক্তিবাচক হইতে পারে এবং ব্যঙ্গোক্তিও হইতে পারে। "তোমাকে না দেখিয়া আমি মরিলাম," ইহা শুধু বলিলে দুঃখ বুঝাইতে পারে, কিন্তু উপযুক্ত স্বরভঙ্গীর সহিত বলিলে দুঃখ শতগুণ অধিক বুঝাইবে। এই স্বরবৈচিত্র্যের পরিণামই সঙ্গীত। সুতরাং মনের বেগ-প্রকাশের জন্য আগ্রহাতিশয্য প্রযুক্ত মনুষ্য সঙ্গীতপ্রিয় এবং তৎসাধনে স্বভাবতঃ যত্নশীল।

কিন্তু অর্থযুক্ত বাক্য ভিন্ন চিত্তভাব ব্যক্ত হয় না; অতএব সঙ্গীতের সঙ্গে বাক্যের সংযোগ আবশ্যক। সেই সংযোগোৎপন্ন পদকে গীত বলা যায়।

গীতের জন্য বাক্যবিন্যাস করিলে দেখা যায় যে, কোন নিয়মাধীন বাক্যবিন্যাস করিলেই গীতের পারিপাট্য হয়; সেই সকল নিয়মগুলির পরিজ্ঞানেই ছন্দের সৃষ্টি।

গীতের পারিপাট্য জন্য আবশ্যক দুইটি;—স্বরচাতুর্য্য এবং শব্দচাতুর্য্য। এই দুইটি পৃথক্ পৃথক্ দুটি ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। দুইটি ক্ষমতাই একজনের সচরাচর ঘটে না। যিনি সু-কবি, তিনিই সুগায়ক, ইহা অতি বিরল।

কাজে কাজেই একজন গীত রচনা করেন, আর একজন গান করে। এইরূপে গীত হইতে গীতিকাব্যের পার্থক্য জন্মে। গীত হওয়াই গীতি-কাব্যের আদিম উদ্দেশ্য; কিন্তু যখন দেখা গেল যে, গীত না হইলেও কেবল ছন্দোবিশিষ্ট রচনাই আনন্দদায়ক এবং সম্পূর্ণ চিত্তভাবব্যঞ্জক, তখন গীতোদ্দেশ্য দূরে রহিল, অনেক গীতিকাব্য রচিত হইতে লাগিল।

অতএব গীতের যে উদ্দেশ্য, যে কাব্যের সেই উদ্দেশ্য, তাহাই গীতিকাব্য। বক্তার ভাবোচ্ছ্বাসের পরিস্ফুটতামাত্র যাহার উদ্দেশ্য, সেই কাব্যই গীতিকাব্য।

বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিদিগের রচনা, ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরী, মাইকেল মধুসূদন দত্তের ব্রজাঙ্গনা কাব্য, হেমবাবুর কবিতাবলী—ইহাই বাঙ্গালা ভাষায় উৎকৃষ্ট গীতিকাব্য।* অবকাশরঞ্জিনী আর একখানি উৎকৃষ্ট গীতিকাব্য।

যখন হৃদয় কোন বিশেষ ভাবে আচ্ছন্ন হয়,—স্নেহ কি শোক, কি ভয়, কি যাহাই হউক, তাহার সমুদায়াংশ তখন ব্যক্ত হয় না, কতকটা ব্যক্ত হয়, কতকটা ব্যক্ত হয় না। যাহা ব্যক্ত হয়, তাহা ক্রিয়ার দ্বারা বা কথার দ্বারা। সেই ক্রিয়া এবং কথা নাটককারের সামগ্রী। যেটুকু অব্যক্ত থাকে, সেইটুকু গীতিকাব্যপ্রণেতার সামগ্রী। যে টুকু সচরাচর অদৃষ্ট, অদর্শনীয় এবং অন্যের অননুমেয় অথচ ভাবাপন্ন ব্যক্তির রুদ্ধ হৃদয় হইতে উচ্ছ্বসিত, তাহা তাঁহাকে ব্যক্ত করিতে হইবে। মহাকাব্যের বিশেষ গুণ এই যে, কবির উভয়বিধ অধিকার থাকে। বক্তব্য এবং অবক্তব্য উভয়ই তাঁহার আয়ত্ত। মহাকাব্য, নাটক এবং গীতিকাব্যে এই একটি প্রধান প্রভেদ বলিয়া বোধ হয়। অনেক নাটককর্ত্তা তাহা বুঝেন না, সুতরাং তাঁহাদিগের নায়কনায়িকার চরিত্র অপ্রাকৃত এবং বাগাড়ম্বরবিশিষ্ট হইয়া উঠে। সত্য বটে যে, গীতিকাব্য-লেখককেও বাক্যের দ্বারাই রসোদ্ভাবন করিতে হইবে; নাটককারেরও সেই বাক্য সহায়। কিন্তু যে বাক্য বক্তব্য,

* যখন এই প্রবন্ধ লিখিত হয়, তখন রবীন্দ্রবাবুর কাব্য সকল প্রকাশিত নাই।

নাটককার কেবল তাহাই বলাইতে পারেন। যাহা অবক্তব্য, তাহাতে গীতিকাব্যকারের অধিকার। উদাহরণ ভিন্ন ইহা অনেকে বুঝিতে পারিবেন না। কিন্তু এ বিষয়ের একটি উত্তম উদাহরণ উত্তরচরিত-সমালোচনায় উদ্ধৃত হইয়াছে। সীতাবিসর্জ্জনকালে ও তৎপরে রামের ব্যবহারে যে তারতম্য ভবভূতির নাটকে এবং বাল্মীকির রামায়ণে দেখা যায়, তাহার আলোচনা করিলে এই কথা হৃদয়ঙ্গম হইবে। রামের চিত্তে যখন যে ভাব উদয় হইয়াছে, ভবভূতি তৎক্ষণাৎ তাহা লেখনীমুখে ধৃত করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; বক্তব্য এবং অবক্তব্য উভয়ই তিনি স্বকৃত নাটকমধ্যগত করিয়াছেন, ইহাতে নাটকোচিত কার্য্য না করিয়া গীতিকাব্যকারের অধিকারে প্রবেশ করিয়াছেন। বাল্মীকি তাহা না করিয়া কেবল রামের কার্য্যগুলিই বর্ণিত করিয়াছেন এবং তত্তৎকার্য্য-সম্পাদনার্থ যতখানি ভাবব্যক্তি আবশ্যক, তাহাই ব্যক্ত করিয়াছেন। ভবভূতিকৃত ঐ রামবিলাপের সঙ্গে দেস্‌দিমোনাবধের পর ওথেলোর বিলাপের বিশেষ করিয়া তুলনা করিলেও এ কথা বুঝা যাইবে। সেক্ষপীয়র এমত কোন কথাই তৎকালে ওথেলোর মুখে ব্যক্ত করেন নাই, যাহা তৎকালীন কার্য্যার্থ বা অন্যের কথার উত্তরে ব্যক্ত করা প্রয়োজন হইতেছে না, বক্তব্যের অতিরিক্ত তিনি এক রেখাও যান নাই। তিনি ভবভূতির ন্যায় নায়কের হৃদয়ানুসন্ধান করিয়া ভিতর হইতে এক একটি ভাব টানিয়া আনিয়া একে একে গণনা করিয়া সারি দিয়া সাজান নাই। অথচ কে না বলিবে যে, রামের মুখে যে দুঃখ ভবভূতি ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহার সহস্রগুণ দুঃখ সেক্ষপীয়র ওথেলোর মুখে ব্যক্ত করিয়াছেন।

সহজেই অনুমেয় যে, যাহা বক্তব্য, তাহা পর-সম্বন্ধী বা কোন কার্য্যোদ্দিষ্ট, যাহা অবক্তব্য, তাহাতে আত্মচিত্তসম্বন্ধীয় উক্তিমাত্র তাহার উদ্দেশ্য। এরূপ কথা যে নাটকে একেবারে সন্নিবেশিত হইতে পারে না, এমত নহে, বরং অনেক সময়ে হওয়া আবশ্যক। কিন্তু ইহা কখন নাটকের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। নাটকের যাহা উদ্দেশ্য, তাহার আনুষঙ্গিকতা বশতঃ প্রয়োজনমত কদাচিৎ সন্নিবেশিত হয়।

প্রকৃত এবং অতিপ্রকৃত

কাব্যরসের সামগ্রী মনুষ্যের হৃদয়। যাহা মনুষ্যহৃদয়ের অংশ অথবা যাহা তাহার সঞ্চালক, তদ্ব্যতীত আর কিছুই কার্য্যোপযোগী নহে। কিন্তু কখনও কখনও মহাকবিরা, যাহা অতিমানুষ, তাহারও বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তন্মধ্যে অধিকাংশই মনুষ্যচরিত্রচিত্রের আনুষঙ্গিক মাত্র। মহাভারত, ইলিয়দ প্রভৃতি প্রাচীন কাব্যসকল এই প্রকার পার্থিব নায়ক-নায়িকার চিত্রানুষঙ্গিক দেব-চরিত্র-বর্ণনায় পরিপূর্ণ। দেবচরিত্র-বর্ণনায় রস-হানির বিশেষ কারণ এই যে, যাহা মনুষ্যচরিত্রানুকারী নহে, তাহার সঙ্গে মনুষ্য লেখক বা মনুষ্য পাঠকের সহৃদয়তা জন্মিতে পারে না। যদি আমরা কোথাও পড়ি যে, কোন মনুষ্য যমুনার এক বহুজল-বিশিষ্ট হ্রদমধ্যে নিমগ্ন হইয়া অজগর-সর্প কর্ত্তৃক জলমধ্যে আক্রান্ত হইয়াছে, তবে আমাদিগের মনে ভয়ের সঞ্চার হয়। আমাদিগের জানা আছে যে, এমন বিপদাপন্ন মনুষ্যেরই মৃত্যুর সম্ভাবনা, অতএব তাহার মৃত্যুর আশঙ্কায় আমরা ভীত ও দুঃখিত হই। কবির অভিপ্রেত রস অবতারিত হয়, তাঁহার যত্নের সফলতা হয়। কিন্তু যদি আমরা পূর্ব্ব হইতে জানিয়া থাকি যে, নিমগ্ন মনুষ্য বস্তুতঃ মনুষ্য নহে, দেবপ্রকৃত, জল বা সর্পের শক্তির অধীন নহে, ইচ্ছাময় এবং সর্ব্বশক্তিমান্, তখন আর আমাদের ভয় বা কুতূহল থাকে না, কেন না, আমরা আগেই জানি যে, এই অজেয় অবিনশ্বর পুরুষ এখনই কালিয়-দমন করিয়া জল হইতে পুনরুত্থান করিবেন।

এমত অবস্থাতেও যে পূর্ব্ব কবিগণ দৈব বা অতিমানুষ চরিত্র সৃষ্ট করিয়া লোক রঞ্জনে সক্ষম হইয়াছেন, তাহার একটি বিশেষ কারণ আছে। তাঁহারা দেবচরিত্রকে মনুষ্যচরিতানুকৃত করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, সুতরাং সেই সকলের সঙ্গে পাঠক বা শ্রোতার সহৃদয়তার অভাব হয় না। মনুষ্যগণ যে সকল রাগদ্বেষাদির বশীভূত, মনুষ্য যে সকল সুখের অভিলাষী, দুঃখের অপ্রিয়, মনুষ্য যে সকল আশায় লুব্ধ, সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ, অনুতাপে তপ্ত, এই মনুষ্য-প্রকৃত দেবতারাও তাই। শ্রীকৃষ্ণ জগদীশ্বরের আংশিক বা সম্পূর্ণ অবতারস্বরূপ কথিত হইলেও, মনুষ্যের ন্যায় মানবধর্ম্মাবলম্বী। মানবচরিত্রগত এমন একটি উৎকৃষ্ট মনোবৃত্তি নাই যে, তাহা ভাগবতকারকৃত শ্রীকৃষ্ণচরিত্রে অর্পিত নাই। এই

মানুষিক চরিত্রের উপর অতিমানুষ বল এবং বুদ্ধির সংযোগে চিত্রের কেবল মনোহারিত্ব-বৃদ্ধি হইয়াছে, কেন না, কবি মানুষিক বলবুদ্ধি, সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষ সৃজন করিয়াছেন। কাব্যে অতি-প্রকৃতের সংস্থানের উদ্দেশ্য এবং উপকার এই এবং তাহার নিয়ম এই যে, যাহা প্রকৃত, তাহা যে সকল নিয়মের অধীন, কবির সৃষ্ট অতিপ্রকৃতও সেই সকল নিয়মের অধীন হওয়া উচিত।

সংস্কৃতে এমন একখানি এবং ইংরেজিতে একখানি মহাকাব্য আছে যে, দৈব এবং অতিপ্রকৃত চরিত্র তাহার আনুষঙ্গিক বিষয় নহে, মূল বিষয়। আমরা কুমারসম্ভব এবং Paradise Lost নামক কাব্যের কথা বলিতেছি। মিল্‌টনের নায়ক দেব-প্রকৃত ঈশ্বর-বিদ্রোহী সয়তান এবং তাহার অনুচর-বর্গ। জগদীশ্বরের সহিত তাহাদিগের বিবাদ, জগদীশ্বর এবং তাঁহার অনুচরের সহিত তাহাদিগের যুদ্ধ। মিল্‌টন কোন পক্ষকেই সম্যক্‌প্রকারে মানব-প্রকৃতিবিশিষ্ট করেন নাই। সুতরাং তিনি কাব্য-রসের অত্যুৎকৃষ্ট অবতারণায় কৃতকার্য্য হইয়াও লোকমনোরঞ্জনে তাদৃশ কৃতকার্য্য হয়েন নাই। Paradise Lost অত্যুৎকৃষ্ট মহাকাব্য হইলেও, প্রায় কেহ তাহা আনুপূর্ব্বিক পাঠ করেন নাই। আনুপূর্ব্বিক পাঠ কষ্টকর হইয়া উঠে। মিল্‌টনের ন্যায় প্রথম শ্রেণীর কবির রচনা না হইয়া যদি মধ্যম শ্রেণীর কোন কবির রচনা হইত, তবে বোধ হয় কেহই পড়িত না। ইহার কারণ, মনুষ্যচরিত্রের অননুকারী দৈব-চরিত্রে মনুষ্যের সহৃদয়তা হয় না। এই কাব্যে যেখানে আদম ও ইবের কথা আছে, সেইখানেই অধিকতর সুখদায়ক; কিন্তু ইহারা এ কাব্যের প্রকৃত নায়ক-নায়িকা নহে,—ইহাদের উল্লেখ আনুষঙ্গিকমাত্র। আদম ও ইব প্রকৃত মনুষ্যপ্রকৃতি, তাহারা প্রথম মনুষ্য, পার্থিব সুখদুঃখের অনধীন, নিষ্পাপ, যে সকল শিক্ষার গুণে মনুষ্য, সে সকল শিক্ষা পায় নাই। অতএব এই কাব্যে প্রকৃত মনুষ্যচরিত্র বর্ণিত নাই।

কুমারসম্ভবে একটিও মনুষ্য নাই। যিনি প্রধান নায়ক, তিনি স্বয়ং পরমেশ্বর। নায়িকা পরমেশ্বরী। তদ্ভিন্ন পর্ব্বত, পর্ব্বতমহিষী, ঋষি, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, কাম, রতি ইত্যাদি দেবদেবী। বাস্তবিক এই কাব্যের তাৎপর্য্য অতিগূঢ়। সংসারে দুই সম্প্রদায়ের লোক সর্ব্বদা পরস্পরের সহিত বিবাদ করে দেখা যায়। এক ইন্দ্রিয়পরায়ণ ঐহিক সুখমাত্রাভিলাষী পারত্রিক-চিন্তাবিরত; দ্বিতীয় বিষয়বিরত সাংসারিক সুখমাত্রের বিদ্বেষী ঈশ্বর-চিন্তামগ্ন। এক সম্প্রদায় কেবল শারীরিক সুখ সার করেন, আর এক সম্প্রদায় শারীরিক সুখের অনুচিত বিদ্বেষ করেন। বস্তুতঃ উভয় সম্প্রদায়ই ভ্রান্ত। যাহারা ঈশ্বরবাদী, ঈশ্বরপ্রদত্ত ইন্দ্রিয় অমঙ্গলকর বা অশ্রদ্ধেয় মনে করা তাহাদের অকর্ত্তব্য। শারীরিক ভোগাতি-শয্যই দূষ্য, নচেৎ পরিমিত শারীরিক সুখ সংসারে নিয়ম, সংসার-রক্ষার কারণ, ঈশ্বরোদ্দিষ্ট এবং ধর্ম্মের পূর্ণতাজনক। এই শারীরিক এবং পারত্রিকের পরিণয় গীত করাই কুমারসম্ভব কাব্যের উদ্দেশ্য। পার্থিব পর্ব্বতোৎপন্না উমা শরীররূপিণী, তপশ্চারী মহাদেব পারত্রিক শান্তির প্রতিমা। শান্তির প্রাপণাকাঙ্ক্ষায় উমা প্রথমে মদনের সাহায্য করিয়াছিলেন, কিন্তু নিষ্ফল হইলেন। ইন্দ্রিয়সেবার দ্বারা শান্তি প্রাপ্ত হওয়া যায় না। পরিশেষে আপন চিত্ত বিশুদ্ধ করিয়া, ইন্দ্রিয়াসক্তি-সমলতা চিত্ত হইতে দূর করিয়া, যখন শান্তির প্রতি মনোনিবেশ করিলেন, তখন তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলেন। সাংসারিক সুখের জন্য আবশ্যক চিত্তশুদ্ধি থাকিলে, ঐহিক ও পারত্রিক পরস্পর বিরোধি নহে, পরস্পরে পরস্পরের সহায়।

এইরূপে কবি মনোবৃত্তি প্রভৃতি লইয়া নায়ক-নায়িকা গঠন করিয়া লোকপ্রীত্যর্থ লৌকিক দেবতাদিগের নামে তাহা পরিচিত করিয়াছেন, কিন্তু দেব-চরিত্র-প্রণয়নে তিনি মিল্টন অপেক্ষা অধিক কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন। কবিত্ব ধরিতে গেলে Paradise Lost হইতে কুমারসম্ভব অনেক উচ্চে। আমাদিগের বিবেচনায় কুমারসম্ভবের তৃতীয় সর্গের কবিত্বের ন্যায় কবিত্ব কোন ভাষায় কোন মহাকাব্যে আছে কি না সন্দেহ। কিন্তু কবিত্বের কথা ছাড়িয়া দিয়া কৌশলের কথা ধরিতে গেলে মিল্টন অপেক্ষা কালিদাসকে অধিক প্রশংসা করিতে হয়। Paradise Lost পাঠে শ্রম বোধ হয়, কুমারসম্ভব আদ্যোপান্ত পুনঃ পুনঃ পাঠ করিয়াও পরিতৃপ্তি জন্মে না। ইহার কারণ এই যে, কালিদাস কয়েকটি দেবচরিত্র মনুষ্যচরিত্রানুকৃত করিয়া অশেষ মাধুর্য্যবিশিষ্ট করিয়াছেন। উমা স্বয়ং আদ্যোপান্ত মানুষী, কোথাও তাঁহার দেবত্ব লক্ষিত হয় না। তাঁহার মাতা মেনকা মানুষী মাতার ন্যায়। "পদং সহেত ভ্রমরস্য পেলবম্" ইত্যাদি কবিতার্দ্ধের সঙ্গে ঘণ্টাগুর উচ্চারিত "like the bad bit by one navious worm" ইতি উপমার তুলনা করুন। দেখিবেন, উমার

মাতা এবং রোমিওর পিতা একই প্রকৃতি—হাড়ে হাড়ে মানব। মেনকা পাষাণরাণী, কিন্তু কুলবতী মানবীদিগের ন্যায় তাঁহার হৃদয় কুসুমসুকুমার।

বিদ্যাপতি ও জয়দেব

বাঙ্গালা সাহিত্যের আর যে দুঃখই থাকুক, উৎকৃষ্ট গীতিকাব্যের অভাব নাই। বরং অন্যান্য ভাষার অপেক্ষা বাঙ্গালায় এই জাতীয় কবিতার আধিক্য। অন্যান্য কবির কথা না ধরিলেও, একা বৈষ্ণব কবিগণই ইহার সমুদ্রবিশেষ। বাঙ্গালার প্রাচীন কবি জয়দেব গীতিকাব্যের প্রণেতা। পরবর্ত্তী বৈষ্ণব কবিদিগের মধ্যে বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস এবং চণ্ডিদাসই প্রসিদ্ধ, কিন্তু আরও কতকগুলিন এই সম্প্রদায়ের গীতিকাব্যপ্রণেতা আছেন। তাঁহাদের মধ্যে অন্যূন চারি পাঁচজন উৎকৃষ্ট কবি বলিয়াই গণ্য হইতে পারেন। ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরীকে এই শ্রেণীর কাব্য বলিতে হয়। রামপ্রসাদ সেন আর একজন প্রসিদ্ধ গীতিকবি। তৎপরে কতকগুলি "কবিওয়ালার" প্রাদুর্ভাব হয়, তন্মধ্যে কাহারও কাহারও গীত অতি সুন্দর। রাম বসু, হরু ঠাকুর, নিতাই দাসের এক একটি গীত এমত সুন্দর আছে যে, ভারতচন্দ্রের রচনার মধ্যে তত্তুল্য কিছুই নাই। কিন্তু কবিওয়ালাদিগের অধিকাংশ রচনা অশ্রদ্ধেয় ও অশ্রাব্য সন্দেহ নাই।

সকলই নিয়মের ফল। সাহিত্যও নিয়মের ফল। বিশেষ বিশেষ কারণ হইতে, বিশেষ বিশেষ নিয়মানুসারে বিশেষ বিশেষ ফলোৎপত্তি হয়। জল উপরিস্থ বায়ু এবং নিম্নস্থ পৃথিবীর অবস্থানুসারে কতকগুলি অলঙ্ঘ্য নিয়মের অধীন হইয়া, কোথাও বাষ্প, কোথাও শিশির, কোথাও হিমকণা বা বরফ, কোথাও কুজ্ঝটিকারূপে পরিণত হয়। তেমনি সাহিত্যও দেশভেদে, দেশের অবস্থাভেদে, অসংখ্য নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া রূপান্তরিত হয়। সেই সকল নিয়ম অত্যন্ত জটিল, দুর্জ্ঞেয়, সন্দেহ নাই; এ পর্য্যন্ত কেহ তাহার সবিশেষ তত্ত্ব নিরূপণ করিতে পারেন নাই। কোমৎ বিজ্ঞান সম্বন্ধে যেরূপ তত্ত্ব আবিষ্কৃত করিয়াছেন, সাহিত্য সম্বন্ধে কেহ তদ্রূপ করিতে পারেন নাই। তবে ইহা বলা যাইতে পারে যে, সাহিত্য দেশের অবস্থা এবং জাতীয় চরিত্রের প্রতিবিম্ব মাত্র। যে সকল নিয়মানুসারে দেশভেদে রাজবিপ্লবের প্রকারভেদ, সমাজবিপ্লবের প্রকারভেদ, ধর্ম্মবিপ্লবের প্রকারভেদ ঘটে, সাহিত্যের প্রকারভেদ সেই সকল কারণেই ঘটে। কোন কোন ইউরোপীয় গ্রন্থকার সাহিত্যের সঙ্গে সমাজের আভ্যন্তরিক সম্বন্ধ বুঝাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। বক্‌ল ভিন্ন কেহ বিশেষরূপে পরিশ্রম করেন নাই এবং হিতবাদ-মতপ্রিয় বক্‌লের সঙ্গে কাব্য-সাহিত্যের সম্বন্ধ কিছু অল্প। মনুষ্যচরিত হইতে ধর্ম্ম এবং নীতি মুছিয়া দিয়া, তিনি সমাজতত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত। বিদেশ সম্বন্ধে যাহা হউক, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এ তত্ত্ব কেহ কখন উত্থাপন করিয়াছিলেন, এমত আমাদের স্মরণ হয় না। সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে মোক্ষমূলরের গ্রন্থ বহুমূল্য বটে, কিন্তু প্রকৃত সাহিত্যের সঙ্গে সে গ্রন্থের সামান্য সম্বন্ধ।

ভারতবর্ষীয় সাহিত্যের প্রকৃত গতি কি? তাহা জানি না। কিন্তু তাহার গোটাকতক স্থূল স্থূল চিহ্ন পাওয়া যায়। প্রথম ভারতীয় আর্য্যগণ অনার্য্য আদিমবাসীদিগের সহিত বিবাদে ব্যস্ত। তখন ভারতবর্ষীয়েরা অনার্য্যকুলপ্রমথনকারী, ভীতিশূন্য দিগন্তবিচারী, বিজয়ী বীরজাতি। সেই জাতীয় চরিত্রের ফল রামায়ণ। তার পর ভারতবর্ষের অনার্য্য শত্রু সকল ক্রমে বিজিত এবং দূরপ্রস্থিত, ভারতবর্ষ আর্য্যগণের করস্থ, আয়ত্ত, ভোগ্য এবং মহাসমৃদ্ধিশালী। তখন আর্য্যগণ বাহ্য শত্রুর ভয় হইতে নিশ্চিন্ত, আভ্যন্তরিক সমৃদ্ধি-সম্পাদনে সচেষ্ট, হস্তগত অনন্তরত্নপ্রসবিনী ভারতভূমি অংশীকরণে ব্যস্ত। যাহা সকলে জয় করিয়াছে, তাহা কে ভোগ করিবে? এই প্রশ্নের ফল আভ্যন্তরিক বিবাদ। তখন আর্য্য পৌরুষ চরমে দাঁড়াইয়াছে—অন্য শত্রুর অভাবে সেই পৌরুষ পরস্পরের দমনার্থ প্রকাশিত হইয়াছে। এই সময়ের কাব্য মহাভারত। বল যাহার, ভারত তাহার হইল। বহু কালের রক্তবৃষ্টি শমিত হইল। স্থির হইয়া উন্নতপ্রকৃতি আর্য্যকুল শান্তিসুখে মন দিলেন। দেশের ধনবৃদ্ধি হইতে লাগিল। রোমক হইতে যবদ্বীপ ও চৈনিক পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের বাণিজ্য ছুটিতে লাগিল; প্রতি নদীকূলে সৌধমালাশোভিত মহানগরী সকল মস্তক উত্তোলন করিতে লাগিল। ভারতবর্ষীয়েরা সুখী হইলেন। সুখী এবং কৃতী। এই সুখ ও কৃতিত্বের ফল ভক্তি-শাস্ত্র ও দর্শন-শাস্ত্র। এ অবস্থা কাব্যে তাদৃশ পরিস্ফুট হয় নাই। কিন্তু লক্ষ্মী বা সরস্বতী কোথাও চিরস্থায়ী নহেন, উভয়েই চঞ্চলা।

ভারতবর্ষ ধর্ম-শৃঙ্খলে এরূপ নিবদ্ধ হইয়াছিল যে, সাহিত্যরসগ্রাহিণী শক্তিও তাহার বশীভূতা হইল। প্রকৃতাপ্রকৃত-বোধ বিলুপ্ত হইল। সাহিত্যও ধর্ম্মানুকারী হইল। কেবল তাহাই নহে, বিচার-শক্তি ধর্ম্মমোহে বিকৃত হইয়াছিল—প্রকৃত ত্যাগ করিয়া অপ্রকৃত কামনা করিতে লাগিল, ধর্ম্মই তৃষ্ণা, ধর্ম্মই আলোচনা, ধর্ম্মই সাহিত্যের বিষয়। এই ধর্ম্মমোহের ফল পুরাণ। কিন্তু যেমন একদিকে ধর্ম্মের স্রোতঃ বহিতে লাগিল, তেমনি আর দিকে বিলাসিতার স্রোতঃ বহিতে লাগিল। তাহারই ফল কালিদাসাদির কাব্য-নাটকাদি।

ভারতবর্ষীয়েরা শেষে আসিয়া একটি এমন প্রদেশ অধিকার করিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন যে, তথাকার জলবায়ুর গুণে তাঁহাদিগের স্বাভাবিক তেজ লুপ্ত হইতে লাগিল। তথাকার তাপ অসহ্য, বায়ু জলবাষ্পপূর্ণ, ভূমি নিম্না এবং উর্ব্বরা এবং তাহারই উৎপাদ্য অসার, তেজোহানিকারক ধান্য। সেখানে আসিয়া আর্য্যতেজ অন্তর্হিত হইতে লাগিল; আর্য্যপ্রকৃতি কোমলতাময়ী, আলস্যের বশবর্ত্তিনী এবং গৃহসুখাভিলাষিণী হইতে লাগিল। সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন যে, আমরা বাঙ্গালার পরিচয় দিতেছি। এই উচ্চাভিলাষশূন্য, অলস, নিশ্চেষ্ট, গৃহসুখপরায়ণ চরিত্রের অনুকরণে এক বিচিত্র গীতিকাব্য সৃষ্টি হইল, সেই গীতিকাব্যও উচ্চাভিলাষ-শূন্য, অলস, ভোগাসক্ত, গৃহসুখপরায়ণ, অতি সুমধুর, দম্পতিপ্রণয়ের শেষ পরিচয়। অন্য সকল প্রকারের সাহিত্যকে পশ্চাৎ ফেলিয়া, এই জাতিচরিত্রানুকারিণী গীতিকাব্য সাত আট শত বৎসর পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে জাতীয় সাহিত্যের পদে দাঁড়াইয়াছে। এই জন্য গীতিকাব্যের এত বাহুল্য।

বঙ্গীয় গীতিকাব্যলেখকদিগকে দুই দলে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এক দল প্রাকৃতিক শোভার মধ্যে মনুষ্যকে স্থাপিত করিয়া তৎপ্রতি দৃষ্টি করেন, আর এক দল বাহ্য প্রকৃতিকে দূরে রাখিয়া কেবল মনুষ্যহৃদয়কেই দৃষ্টি করেন। এক দল মানবহৃদয়ের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া বাহ্য প্রকৃতিকে দীপ্ত করিয়া তদালোকে অন্বেষ্য বস্তুকে দীপ্ত এবং প্রস্ফুট করেন; আর এক দল আপনাদিগের প্রতিভাতেই সকল উজ্জ্বল করেন, অথবা মানুষ-চরিত্রখনিতে যে রত্ন মিলে, তাহার দীপ্তির জন্য দীপের আবশ্যকতা নাই বিবেচনা করেন। প্রথম শ্রেণীর প্রধান জয়দেব, দ্বিতীয় শ্রেণীর মুখ্যপাত্র বিদ্যাপতিকে ধরিয়া লওয়া যাউক। জয়দেবাদির কবিতায় সতত মাধবী, যামিনী, মলয়-সমীর, ললিতলতা, কুবলয়, শ্রেণীদল, স্ফুটিত কুসুম, শরচ্চন্দ্র, মধুকরবৃন্দ, কোকিলকূজিত কুঞ্জ, নবজলধর এবং তৎসঙ্গে কামিনীর মুখমণ্ডল, ভ্রূবল্লী, বাহুলতা, বিম্বোষ্ঠ, সরসীরুহলোচন, অলসনিমেষে, এই সকলের চিত্র, বাতোন্মথিত তটিনীতরঙ্গবৎ সতত চাকচিক্য সম্পাদন করিতেছে। বাস্তবিক এই শ্রেণীর কবিদের কবিতায় বাহ্য-প্রকৃতির প্রাধান্য। বিদ্যাপতি যে শ্রেণীর কবি, তাঁহাদিগের কাব্যে বাহ্য প্রকৃতির সম্বন্ধ নাই, এমত নহে—বাহ্য প্রকৃতির সঙ্গে মানবহৃদয়ের নিত্য-সম্বন্ধ, সুতরাং কাব্যের নিত্য-সম্বন্ধ, কিন্তু তাঁহাদিগের কাব্যে বাহ্য প্রকৃতির অপেক্ষাকৃত অস্পষ্টতা লক্ষিত হয়, তৎপরিবর্ত্তে মনুষ্যহৃদয়ের গূঢ়তলচারী ভাবসকল প্রধান স্থান গ্রহণ করে। জয়দেবাদিতে বাহ্য প্রকৃতির প্রাধান্য, বিদ্যাপতি প্রভৃতিতে অন্তঃপ্রকৃতির রাজ্য। জয়দেব, বিদ্যাপতি উভয়েই রাধাকৃষ্ণের প্রণয়কথা গীত করেন। কিন্তু জয়দেব যে প্রণয় গীত করিয়াছেন, তাহা বহিরিন্দ্রিয়ের অনুগামী। বিদ্যাপতি প্রভৃতির কবিতা, বিশেষতঃ চণ্ডীদাসাদির কবিতা বহিরিন্দ্রিয়ের অতীত। তাহার কারণ কেবল এই বাহ্য প্রকৃতির শক্তি। স্থূলপ্রকৃতির সঙ্গে স্থূল-শরীরেরই নিকট-সম্বন্ধ; তাহার আধিক্যে কবিতা একটু ইন্দ্রিয়ানুসারিণী হইয়া পড়ে। বিদ্যাপতির দল মনুষ্যহৃদয়কে বহিঃপ্রকৃতি ছাড়া করিয়া, কেবল তৎপ্রতি দৃষ্টি করেন; সুতরাং তাঁহাদের কবিতা ইন্দ্রিয়ের সংস্রবশূন্য, বিলাসশূন্য, পবিত্র হইয়া উঠে। জয়দেবের গীত রাধাকৃষ্ণের বিলাসপূর্ণ,—বিদ্যাপতির গীত রাধাকৃষ্ণের প্রণয়-পূর্ণ। জয়দেব ভোগ—বিদ্যাপতি আকাঙ্ক্ষা ও স্মৃতি। জয়দেব সুখ—বিদ্যাপতি দুঃখ। জয়দেব বসন্ত—বিদ্যাপতি বর্ষা। জয়দেবের কবিতা উৎফুল্লকমলজালশোভিত, বিহঙ্গমাকুলস্বচ্ছবারি-বিশিষ্ট সুন্দর সরোবর—বিদ্যাপতির কবিতা দূরগামিনী বেগবতী তরঙ্গ-সঙ্কুলা নদী। জয়দেবের কবিতা স্বর্ণহার—বিদ্যাপতির কবিতা রুদ্রাক্ষমালা। জয়দেবের গান মুরজবীণ-সঙ্গিনী স্ত্রীকণ্ঠগীতি—বিদ্যাপতির গান সায়াহ্ন-সমীরণের নিশ্বাস।

আমরা জয়দেব ও বিদ্যাপতির সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাঁহাদিগকে এক এক ভিন্ন শ্রেণীর গীতি-কবির আদর্শস্বরূপ বিবেচনা করিয়া তাহা বলিয়াছি। যাহা জয়দেবের সম্বন্ধে বলিয়াছি, তাহা ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে বর্ত্তে, যাহা বিদ্যাপতি সম্বন্ধে বলিয়াছি, তাহা

গোবিন্দদাস, চণ্ডিদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিদিগের সম্বন্ধে বেশী খাটে, বিদ্যাপতির সম্বন্ধে তত খাটে না।

আধুনিক বাঙ্গালী গীতিকাব্যলেখকগণকে একটি তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে। তাঁহারা আধুনিক ইংরেজি গীতিকবিদিগের অনুগামী। আধুনিক ইংরেজি কবি ও আধুনিক বাঙ্গালী কবিগণ, সভ্যতা-বৃদ্ধির কারণে স্বতন্ত্র একটি পথে চলিয়াছেন, পূর্ব্বকবিগণ কেবল আপনাদিগকে চিনিতেন, আপনাদিগের নিকটবর্ত্তী যাহা তাহা চিনিতেন, যাহা আভ্যন্তরিক বা নিকটস্থ, তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ সন্ধান জানিতেন, তাহার অনুকরণীয় চিত্র সকল রাখিয়া গিয়াছেন। এক্ষণকার কবিগণ—জ্ঞানী, বৈজ্ঞানিক, ইতিহাসবেত্তা, আধ্যাত্মিকতত্ত্ববিৎ। নানা দেশ, নানা কাল, নানা বস্তু তাঁহাদিগের চিত্তমধ্যে স্থান পাইয়াছে। তাঁহাদিগের বুদ্ধি বহুবিষয়িণী বলিয়া তাঁহাদিগের কবিতা বহুবিষয়িণী হইয়াছে। তাঁহাদিগের বুদ্ধি দূরসম্বন্ধগ্রাহিণী বলিয়া তাঁহাদিগের কবিতাও দূরসম্বন্ধ প্রকাশিকা হইয়াছে। কিন্তু এই বিস্তৃতিগুণ হেতু প্রগাঢ়তা-গুণের লাঘব হইয়াছে। বিদ্যাপতি প্রভৃতির কবিতার বিষয় সঙ্কীর্ণ, কিন্তু কবিত্ব প্রগাঢ়, মধুসূদন বা হেমচন্দ্রের কবিতার বিষয় বিস্তৃত, কিন্তু কবিত্ব প্রগাঢ় নহে। জ্ঞান-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কবিত্বশক্তির হ্রাস হয় বলিয়া যে প্রবাদ আছে, ইহা তাহার একটি কারণ। যে জল সঙ্কীর্ণ কূপে গম্ভীর, তাহা তড়াগে ছড়াইলে আর গম্ভীর থাকে না।

কাব্যের অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতির মধ্যে যথার্থ সম্বন্ধ এই যে, উভয়ে উভয়ের প্রতিবিম্ব নিপতিত হয়, অর্থাৎ বহিঃপ্রকৃতি গুণে হৃদয়ের ভাবান্তর ঘটে এবং মনের অবস্থাবিশেষে বাহ্যদৃশ্য সুখকর বা দুঃখকর বোধ হয়—উভয়ে উভয়ের ছায়া পড়ে। যখন বহিঃপ্রকৃতি বর্ণনীয়, তখন বহিঃপ্রকৃতির ছায়া সমেত বর্ণনা তাহার উদ্দেশ্য। যিনি ইহা পারেন, তিনিই সুকবি। ইহার ব্যতিক্রমে এক দিকে ইন্দ্রিয়পরতা, অপর দিকে আধ্যাত্মিকতা দোষ জন্মে। এ স্থলে শারীরিক ভোগাসক্তিকেই ইন্দ্রিয়পরতা বলিতেছি না, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে আসক্তিকে ইন্দ্রিয়পরতা বলিতেছি। ইন্দ্রিয়পরতা-দোষের উদাহরণ জয়দেব। আধ্যাত্মিকতার উদাহরণ Wordsworth.

আর্য্যজাতির সূক্ষ্ম শিল্প *

এক দল মনুষ্য বলেন যে, এ সংসারে সুখ নাই, বনে চল, ভোগাভোগ সমাপ্ত করিয়া মুক্তি বা নির্ব্বাণ লাভ কর। আর এক দল বলেন, সংসার সুখময়, বঞ্চকের বঞ্চনা অগ্রাহ্য করিয়া খাও, দাও, ঘুমাও। যাঁহারা সুখাভিলাষী, তাঁহাদিগের মধ্যে নানা মত। কেহ বলেন, ধনে সুখ; কেহ বলেন, মনে সুখ; কেহ বলেন ধর্ম্মে, কেহ বলেন অধর্ম্মে; কাহারও সুখ কার্য্যে, কাহারও সুখ জ্ঞানে। কিন্তু প্রায় এমন মনুষ্য দেখা যায় না, যে সৌন্দর্য্যে সুখী নহে। তুমি সুন্দরী স্ত্রীর কামনা কর, সুন্দরী কন্যার মুখ দেখিয়া প্রীত হও, সুন্দর শিশুর প্রতি চাহিয়া বিমুগ্ধ হও, সুন্দরী পুত্রবধূর জন্য দেশ মাথায় কর। সুন্দর ফুলগুলি বাছিয়া শয্যায় রাখ; ঘর্ম্মাক্ত ললাটে যে অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছ, সুন্দর গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া, সুন্দর উপকরণে সাজাইতে তাহা ব্যয়িত করিয়া ঋণী হও; আপনি সুন্দর সাজিবে বলিয়া, সর্ব্বস্ব পণ করিয়া সুন্দর সজ্জা খুঁজিয়া বেড়াও—ঘটী-বাটী পিত্তল-কাঁসাও যাহাতে সুন্দর হয়, তাহার যত্ন কর। সুন্দর দেখিয়া পাখী পোষ, সুন্দর বৃক্ষে সুন্দর উদ্যান রচনা কর, সুন্দর মুখে সুন্দর হাসি দেখিবার জন্য সুন্দর কাঞ্চনরত্নে সুন্দরীকে সাজাও; সকলেই অহরহঃ সৌন্দর্য্য-তৃষ্ণায় পীড়িত, কিন্তু কেহ কখনও এ কথা মনে করেন নাই বলিয়াই এত বিস্তারে বলিতেছি।

এই সৌন্দর্য্যতৃষ্ণা যেরূপ বলবতী,—সেইরূপ প্রশংসনীয়া এবং পরিপোষণীয়া। মনুষ্যের যত প্রকার সুখ আছে, তন্মধ্যে এই সুখ সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, কেন না, প্রথমতঃ ইহা পবিত্র, নির্ম্মল, পাপসংস্পর্শশূন্য; সৌন্দর্য্যের উপভোগ কেবল মানসিক সুখ, ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে ইহার সংস্পর্শ নাই। সত্য বটে, সুন্দর বস্তু অনেক সময়ে ইন্দ্রিয়তৃপ্তির সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট, কিন্তু সৌন্দর্য্যজনিত সুখ ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি হইতে ভিন্ন। রত্নখচিত সুবর্ণজলপাত্রে জলপানে তোমার যেরূপ তৃষ্ণা-নিবারণ হইবে, কুগঠন মৃৎপাত্রেও তৃষ্ণানিবারণ সেইরূপ হইবে; স্বর্ণপাত্রে জলপান করায় যেটুকু অতিরিক্ত সুখ, তাহা সৌন্দর্য্য-জনিত মানসিক সুখ। আপনার স্বর্ণপাত্রে জল খাইতে অহঙ্কারজনিত সুখ তাহার সঙ্গে মিশে বটে,

---

* সূক্ষ্মশিল্পের উৎপত্তি ও আর্য্যজাতির শিল্পচাতুরী, শ্রীশ্যামাচরণ শ্রীমানি প্রণীত।

কিন্তু পরের স্বর্ণপাত্রে জলপান করিয়া তৃষ্ণানিবারণাতিরিক্ত যে সুখ, তাহা সৌন্দর্য্যজনিত মাত্র বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, তীব্রতায় এই সুখ সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর। যাঁহারা নৈসর্গিক শোভাদর্শনপ্রিয় বা কাব্যামোদী, তাঁহারা ইহার অনেক উদাহরণ মনে করিতে পারিবেন; সৌন্দর্য্যের উপভোগজনিত সুখ অনেক সময়ে তীব্রতায় অসহ্য হইয়া উঠে। তৃতীয়তঃ, অন্যান্য সুখ পৌনঃপুন্যে অপ্রীতিকর হইয়া উঠে, সৌন্দর্য্যজনিত সুখ চিরনূতন এবং চিরপ্রীতিকর।

অতএব যাঁহারা মনুষ্যজাতির এই সুখবর্দ্ধন করেন, তাঁহারা মনুষ্যজাতির উপকারকদিগের মধ্যে সর্ব্বোচ্চপদপ্রাপ্তির যোগ্য। যে ভিখারী খঞ্জনী বাজাইয়া, নেড়ার গীত গাহিয়া মুষ্টিভিক্ষা লইয়া যায়, তাহাকে কেহ মনুষ্যজাতির মহোপকারী বলিয়া স্বীকার করিবে না বটে, কিন্তু যে বাল্মীকি চিরকালের জন্য কোটি কোটি মনুষ্যের অক্ষয়সুখ এবং চিত্তোৎকর্ষের উপায় বিধান করিয়াছেন, তিনি যশের মন্দিরে নিউটন, হাবি ওয়াট বা জেনরের অপেক্ষা নিম্নস্থান পাইবার যোগ্য নহেন। অনেকে লেকি, মেকলে প্রভৃতি অসারগ্রাহী লেখকদিগের অনুবর্ত্তী হইয়া কবি অপেক্ষা পাদুকাকারকে উপকারী বলিয়া উচ্চাসনে বসান; এই গণ্ডমূর্খদলের মধ্যে আধুনিক অর্দ্ধশিক্ষিত কতকগুলি বাঙ্গালী বাবু অগ্রগণ্য। পক্ষান্তরে, ইংলণ্ডের রাজপুরুষ-চূড়ামণি গ্লাডষ্টোন, স্কটলণ্ডজাত মনুষ্যদিগের মধ্যে হিউম্, আদম স্মিথ, হণ্টর, কার্লাইল থাকিতে ওয়াল্টর স্কটকে সর্ব্বোপরি স্থান দিয়াছেন।

যেমন মনুষ্যের অন্যান্য অভাব-পূরণার্থ এক একটি শিল্পবিদ্যা আছে, তেমনই সৌন্দর্য্যাকাঙ্ক্ষা পূরণার্থও বিদ্যা আছে। সৌন্দর্য্যসৃজনের বিবিধ উপায় আছে। উপায়ভেদে সেই বিদ্যা পৃথক্ পৃথক্ রূপ ধারণ করিয়াছে।

আমরা যে সকল সুন্দর বস্তু দেখিয়া থাকি, তন্মধ্যে কতকগুলির কেবল বর্ণমাত্র আছে,—আর কিছুই নাই, যথা আকাশ।

আর কতকগুলির বর্ণ ভিন্ন আকারও আছে, যথা পুষ্প।

কতকগুলির বর্ণ ও আকার ভিন্ন গতিও আছে, যথা, উরগ।

কতকগুলির বর্ণ, আকার, গতি ভিন্ন রব আছে। যথা, কোকিল।

মনুষ্যের বর্ণ, আকার, গতি ও রব ব্যতীত অর্থযুক্ত বাক্য আছে।

অতএব সৌন্দর্য্য-সৃজনের জন্য এই কয়টি সামগ্রী বর্ণ, আকার, গতি, রব ও অর্থযুক্ত বাক্য।

যে সৌন্দর্য্যজননী বিদ্যার বর্ণ মাত্র অবলম্বন, তাহাকে চিত্রবিদ্যা কহে।

যে বিদ্যার অবলম্বন আকার, তাহা দ্বিবিধ। জড়ের আকৃতি সৌন্দর্য্য যে বিদ্যার উদ্দেশ্য, তাহার নাম স্থাপত্য। চেতন বা উদ্ভিদের সৌন্দর্য্য যে বিদ্যার উদ্দেশ্য, তাহার নাম ভাস্কর্য্য।

যে সৌন্দর্য্যজনিকা বিদ্যার সিদ্ধি গতির দ্বারা, তাহার নাম নৃত্য।

রব যাহার অবলম্বন, সে বিদ্যার নাম সঙ্গীত।

বাক্য যাহার অবলম্বন, তাহার নাম কাব্য।

কাব্য, সঙ্গীত, নৃত্য, ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য এবং চিত্র এই ছয়টি সৌন্দর্য্যজনিকা বিদ্যা। ইউরোপে এই সকল বিদ্যার যে জাতিবাচক নাম প্রচলিত আছে, তাহার অনুবাদ করিয়া "সূক্ষ্মশিল্প" নাম দেওয়া হইয়াছে।

সৌন্দর্য্যপ্রসূতি এই ছয়টি বিদ্যায় মনুষ্যজীবন ভূষিত ও সুখময় করে। ভাগ্যহীন বাঙ্গালীর কপালে এ সুখ নাই। সূক্ষ্মশিল্পের সঙ্গে তাহার বড় বিরোধ। তাহাতে বাঙ্গালীর বড় অনাদর, বড় ঘৃণা। বাঙ্গালী সুখী হইতে জানে না।

স্বীকার করি, সকল দোষটুকু বাঙ্গালীর নিজের নহে। কতকটা বাঙ্গালীর সামাজিক রীতির দোষ, পূর্ব্বপুরুষের ভদ্রাসন পরিত্যাগ করা হইবে না, তাতেই অসংখ্য সন্তানসন্ততি লইয়া গর্ত্ত-মধ্যে পিপীলিকার ন্যায় পিল্‌পিল্ করিতে হইবে,—সুতরাং স্থানাভাব বশতঃ পরিষ্কৃতি এবং সৌন্দর্য্যসাধন সম্ভবে না। কতকটা বাঙ্গালীর দারিদ্র্য জন্য। সৌন্দর্য্য অর্থসাধ্য—অনেকের সংসার চলে না। তাহার উপর সামাজিক রীত্যনুসারে, আগে পৌরস্ত্রীগণের অলঙ্কার, দোল-দুর্গোৎসবে ব্যয়, পিতৃশ্রাদ্ধ, মাতৃশ্রাদ্ধ, পুত্র-কন্যার বিবাহ দিতে অবস্থার অতিরিক্ত ব্যয় করিতে হইবে—সে সকল ব্যয় সম্পন্ন করিয়া, শূকরশালা তুল্য কদর্য্য স্থানে বাস করিতে হইবে, ইহাই সামাজিক রীতি। ইচ্ছা করিলেও সমাজশৃঙ্খলে বদ্ধ বাঙ্গালী সে রীতির বিপরীতাচরণ করিতে পারেন নাই। কতকটা হিন্দুধর্ম্মের দোষ, যে ধর্ম্মানুসারে উৎকৃষ্ট মর্ম্মর প্রস্তুত হর্ম্ম্যও গোময়-লেপনে পরিষ্কৃত করিতে হইবে, তাহার প্রসাদে সূক্ষ্মশিল্পের দুর্দ্দশারই সম্ভাবনা।

এ সকল স্বীকার করিলেও দোষক্ষালন হয় না। যে ফিরিঙ্গি কেরাণীগিরি করিয়া শত মুদ্রায় কোনমতে দিনপাত করে, তাহার সঙ্গে বৎসরে বিংশতি সহস্র মুদ্রার অধিকারী গ্রাম্য ভূস্বামীর গৃহপারিপাট্য বিষয়ে তুলনা কর। দেখিবে, এ প্রভেদটি অনেকটাই স্বাভাবিক। দুই চারি জন ধনাঢ্য বাবু ইংরেজদিগের অনুকরণ করিয়া, ইংরেজের ন্যায় গৃহাদির পারিপাট্য বিধান করিয়া থাকেন, এবং ভাস্কর্য্য ও চিত্রাদির দ্বারা গৃহ সজ্জিত করিয়া থাকেন। বাঙ্গালী নকলনবিশ ভাল, নকলে শৈথিল্য নাই। কিন্তু তাহাদিগের ভাস্কর্য্য এবং চিত্র সংগ্রহ দেখিলেই বোধ হয় যে, অনুকরণস্পৃহাতেই ঐ সকল সংগ্রহ ঘটিয়াছে—নচেৎ সৌন্দর্য্যে তাঁহাদিগের আন্তরিক অনুরাগ নাই। এখানে ভাল-মন্দের বিচার নাই, মহার্ঘ্য হইলেই হইল; সন্নিবেশের পারিপাট্য নাই, সংখ্যায় অধিক হইলেই হইল। ভাস্কর্য্য চিত্র দূরে থাকুক, কার্য্যসম্বন্ধেও বাঙ্গালীর উত্তমাধম-বিচারশক্তি দেখা যায় না। এ বিষয়ে সুশিক্ষিত অশিক্ষিত সমান——প্রভেদ অতি অল্প। নৃত্য-গীত—সে সকল বুঝি বাঙ্গালা হইতে উঠিয়া গেল। সৌন্দর্য্য-বিচারশক্তি, সৌন্দর্য্য-রসাস্বাদন-সুখ বুঝি বিধাতা বাঙ্গালীর কপালে লিখেন নাই।

দ্রৌপদী

কি প্রাচীন, কি আধুনিক হিন্দুকাব্য সকলের নায়িকাগণের চরিত্র এক ছাঁচে ঢালা দেখা যায়। পতিপরায়ণা, কোমল-প্রকৃতিসম্পন্না, লজ্জাশীলা, সহিষ্ণুতা-গুণের বিশেষ অধিকারিণী—ইনিই আর্য্যসাহিত্যের আদর্শস্থলাভিষিক্তা। এই গঠনে বৃদ্ধ বাল্মীকি বিশ্ববিমোহিনী জনকদুহিতাকে গড়িয়াছিলেন। সেই অবধি আর্য্যনায়িকা সেই আদর্শে গঠিত হইতেছে। শকুন্তলা, দময়ন্তী, রত্নাবলী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নায়িকাগণ—সীতার অনুকরণ মাত্র। অন্য কোন প্রকৃতির নায়িকা যে আর্য্যসাহিত্যে দেখা যায় না, এমত বলিতেছি না,—কিন্তু সীতানুবর্ত্তিনী নায়িকারই বাহুল্য। আজিও যিনি সস্তা ছাপাখানা পাইয়া নভেল-নাটকাদিতে বিদ্যা প্রকাশ করিতে চাহেন, তিনিই সীতা গড়িতে বসেন।

ইহার কারণও দুরনুমেয় নহে। প্রথমতঃ, সীতার চরিত্রটি বড় মধুর, দ্বিতীয়ঃ, এই প্রকার স্ত্রীচরিত্রই আর্য্যজাতির নিকট বিশেষ প্রশংসিত এবং তৃতীয়তঃ, আর্য্যস্ত্রীগণের এই জাতীয় উৎকর্ষই সচরাচর আয়ত্ত।

একা দ্রৌপদী সীতার ছায়াও স্পর্শ করেন নাই। এখানে মহাভারতকার অপূর্ব্ব নূতন সৃষ্টি প্রকাশিত করিয়াছেন। সীতার সহস্র অনুকরণ হইয়াছে। কিন্তু দ্রৌপদীর অনুকরণ হইল না।

সীতা সতী, পঞ্চপতিকা দ্রৌপদীকেও মহাভারতকার সতী বলিয়াই পরিচিতা করিয়াছেন। কেন না, কবির অভিপ্রায় এই যে, পতি এক হৌক পাঁচ হৌক, পতিমাত্র ভজনাই সতীত্ব। উভয়েই পত্নী ও রাজ্ঞীর কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে অক্ষুণ্ণমতি, ধর্ম্মনিষ্ঠ এবং গুরুজনের বাধ্য; কিন্তু এই পর্য্যন্ত সাদৃশ্য। সীতা রাজ্ঞী হইয়াও প্রধানতঃ কুলবধূ, দ্রৌপদী কুলবধূ হইয়াও প্রধানতঃ প্রচণ্ড তেজস্বিনী রাজ্ঞী। সীতায় স্ত্রীজাতির কোমল গুণগুলিও পরিস্ফুট, দ্রৌপদীতে স্ত্রী জাতির কঠিন গুণসকল প্রদীপ্ত। সীতা রামের যোগ্যা জায়া, দ্রৌপদী ভীমসেনেরই সুযোগ্যা বীরেন্দ্রাণী। সীতাকে হরণ করিতে রাবণের কোন কষ্ট হয় নাই, কিন্তু রক্ষোরাজ লঙ্কেশ যদি দ্রৌপদীহরণে আসিতেন, তবে বোধ হয়, কীচকের ন্যায় প্রাণ হারাইতেন, নয় জয়দ্রথের ন্যায় দ্রৌপদীর বাহুবলে ভূমে গড়াগড়ি দিতেন।

দ্রৌপদীচরিত্রের রীতিমত বিশ্লেষণ দুরূহ। কেন না, মহাভারত অনন্ত সাগর তুল্য, তাহার অজস্র তরঙ্গাভিঘাতে একটি নায়িকা বা নায়কের চরিত্র তৃণবৎ কোথায় যায়, তাহা পর্য্যবেক্ষণ কে করিতে পারে? তথাপি দুই এক স্থানে বিশ্লেষণে যত্ন করিতেছি।

দ্রৌপদীর স্বয়ংবর। দ্রুপদ রাজার পণ যে, যে সেই দুর্ব্বেধনীয় লক্ষ্য বিঁধিবে, সে-ই দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণ করিবে। কন্যা সভাস্থলে আনীতা, পৃথিবীর রাজগণ, বীরগণ, কবিগণ সমবেত। এই মহাসভার প্রচণ্ড-প্রতাপে কুমারী-কুসুম শুকাইয়া ওঠে, সেই বিশোষ্যমাণা কুমারীলাভার্থ দুর্য্যোধন, জরাসন্ধ, শিশুপাল প্রভৃতি ভুবনপ্রথিত মহাবীর সকল লক্ষ্য বিঁধিতে যত্ন করিতেছেন। একে একে সকলে বিফলে অক্ষম হইয়া ফিরিয়া আসিতেছেন। হায়! দ্রৌপদীর বিবাহ হয় না।

অন্যান্য রাজগণ-মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অঙ্গাধিপতি কর্ণ লক্ষ্য বিঁধিতে উঠিলেন। ক্ষুদ্র কাব্যকার এখানে কি করিতেন বলা যায় না—কেন না, এটি বিষম সঙ্কট। কাব্যের প্রয়োজন পাণ্ডবের সঙ্গে দ্রৌপদীর বিবাহ দেওয়াইতে হইবে। কর্ণ লক্ষ্য বিঁধিলে তাহা হয় না। ক্ষুদ্র কবি বোধ হয়, কর্ণকেও লক্ষ্য বিন্ধিতে অশক্ত বলিয়া পরিচিত করিতেন, কিন্তু মহাভারতের মহাকবি জাজ্বল্যমান দেখিতে পাইতেছেন যে, কর্ণের বীর্য্য তাঁহার প্রধান নায়ক অর্জ্জুনের বীর্য্যের মানদণ্ড। কর্ণ প্রতিদ্বন্দ্বী এবং অর্জ্জুনহস্তে পরাভূত বলিয়াই অর্জ্জুনের গৌরবের এত আধিক্য, কর্ণকে অন্যের সঙ্গে ক্ষুদ্রবীর্য্য করিলে অর্জ্জুনের গৌরব কোথা থাকে? এরূপ সঙ্কট, ক্ষুদ্র কবিকে বুঝাইয়া দিলে তিনি অবশ্য স্থির করিবেন যে, তবে এত হাঙ্গামায় কাজ নাই—

কর্ণকে না তুলিলেই ভাল হয়। কাব্যের যে সর্ব্বাঙ্গসম্পন্নতার ক্ষতি হয়, তাহা তিনি বুঝিবেন না—সকল রাজাই যেখানে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী-লোভে লক্ষ্য বিঁধিতে উঠিতেছেন, সেখানে মহাবলপরাক্রান্ত কর্ণই যে কেন একা উঠিবেন না, এ প্রশ্নের কোন উত্তর নাই।

মহাকবি আশ্চর্য্য কৌশলময় এবং তীক্ষ্ণদৃষ্টিশালী; তিনি অবলীলাক্রমে কর্ণকে লক্ষ্য-বিন্ধনে উত্থিত করিলেন। কর্ণের বীর্য্যের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিলেন এবং সেই অবসরে সেই উপলক্ষে সেই একই উপায়ে আর একটি গুরুতর উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ করিলেন। দ্রৌপদীর চরিত্র পাঠকের নিকট প্রকটিত করিলেন। যে দিন জয়দ্রথ দ্রৌপদী কর্ত্তৃক ভূতলশায়ী হইবে, যে দিন দুর্য্যোধনের সভাস্থলে দ্যূতজিতা অপমানিতা মহিষী স্বামী হইতেও স্বাতন্ত্র্য অবলম্বনে উন্মুখিনী হইবেন, সে দিন দ্রৌপদীর যে চরিত্র প্রকাশ পাইবে, অদ্য সেই চরিত্রের পরিচয় দিলেন। একটি ক্ষুদ্র কথায় এই সকল উদ্দেশ্য সফল হইল। বলিয়াছি, সেই প্রচণ্ড-প্রতাপসমন্বিতা মহাসভায় কুমারী-কুসুম শুকাইয়া উঠে। কিন্তু দ্রৌপদী কুমারী, সেই বিষম সভাতলে রাজমণ্ডলী, বীরমণ্ডলী, ঋষিমণ্ডলী-মধ্যে দ্রুপদরাজ-পিতার, ধৃষ্টদ্যুম্নতুল্য ভ্রাতার অপেক্ষা না করিয়া, কর্ণকে বিন্ধনোদ্যত দেখিয়া বলিলেন, "আমি সূতপুত্রকে বরণ করিব না।" এই কথা শ্রবণমাত্র কর্ণ সামর্ষ হাস্যে সূর্য্যসন্দর্শনপূর্ব্বক শরাসন পরিত্যাগ করিলেন।

এই কথায় যতটা চরিত্র পরিস্ফুট হইল, শত পৃষ্ঠা লিখিয়াও ততটা প্রকাশ করা দুঃসাধ্য। এ স্থলে কোন বিস্তারিত বর্ণনার প্রয়োজন হইল না, দ্রৌপদীকে তেজস্বিনী বা গর্ব্বিতা বলিয়া ব্যাখ্যাত করিবার আবশ্যকতা হইল না। অথচ রাজ-দুহিতার দুর্দ্দমনীয় গর্ব্ব নিঃসঙ্কোচে বিস্ফারিত হইল।

ইহার পর দ্যূতক্রীড়ায় বিজিতা দ্রৌপদীর চরিত্র অবলোকন কর। মহাগর্ব্বিত, তেজস্বী এবং বলধারী ভীমার্জ্জুন দ্যূতমুখে বিসর্জ্জিত হইয়াও কোন কথা কহেন নাই, শত্রুর দাসত্ব নিঃশব্দে স্বীকার করিলেন, এ স্থলে তাঁহাদিগের অনুগামিনী দাসীর কি করা কর্ত্তব্য? স্বামীকর্ত্তৃক দ্যূতমুখে সমর্পিত হইয়া স্বামীগণের দাসীত্ব স্বীকার করাই আর্য্যনারীর স্বভাবসিদ্ধ। দ্রৌপদী কি করিলেন? তিনি প্রাতিকামীর মুখে দ্যূতবার্ত্তা এবং দুর্য্যোধনের সভায় তাঁহার আহ্বান শুনিয়া বলিলেন,—"হে সূতনন্দন! তুমি সভায় গমন করিয়া যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি অগ্রে আমাকে কি আপনাকে দ্যূতমুখে বিসর্জ্জন করিয়াছেন? হে সূতাত্মজ! তুমি যুধিষ্ঠিরের নিকট এই বৃত্তান্ত জানিয়া এ স্থানে আগমনপূর্ব্বক আমাকে লইয়া যাইও। ধর্ম্মরাজ কিরূপে পরাজিত হইয়াছেন, জানিয়া আমি তথায় গমন করিব।" দ্রৌপদীর অভিপ্রায়, দাসত্ব স্বীকার করিবেন না।

দ্রৌপদীর চরিত্রের দুইটি লক্ষণ বিশেষ সুস্পষ্ট—এক ধর্ম্মাচরণ, দ্বিতীয় দর্প। দর্প ধর্ম্মের কিছু বিরোধী, কিন্তু এই দুইটি লক্ষণের একাধারে সমাবেশ অপ্রকৃত নহে। মহাভারতকার এই দুই লক্ষণ অনেক নায়কে একত্রে সমাবেশ করিয়াছেন। ভীমসেনে, অর্জ্জুনে, অশ্বত্থামায় এবং সচরাচর ক্ষত্রিয়ের চরিত্রে এতদুভয়কে মিশ্রিত করিয়াছেন। ভীমসেনে দর্প পূর্ণমাত্রায় এবং অর্জ্জুনে ও অশ্বত্থামায় অর্দ্ধমাত্রায় দেখা যায়। দর্প শব্দে এখানে আত্মশ্লাঘাপ্রিয়তা নির্দ্দেশ করিতেছি না, মানসিক তেজস্বিতাই আমাদের নির্দ্দেশ্য। এই তেজস্বিতা দ্রৌপদীতেও পূর্ণমাত্রায় ছিল। অর্জ্জুন এবং অভিমন্যুতে ইহা আত্মশক্তি-নিশ্চয়তায় পরিণত হইয়াছিল। ভীমসেনে ইহা ধর্ম্মবুদ্ধির কারণ হইয়াছিল; দ্রৌপদীতে ইহা ধর্ম্ম-বুদ্ধির কারণ হইয়াছে।

সভাতলে দ্রৌপদীর দর্প ও তেজস্বিতা আরও বর্দ্ধিত হইল। তিনি দুঃশাসনকে বলিলেন,

"যদি ইন্দ্রাদি দেবগণও তোর সহায় হয়, তথাপি রাজপুত্রেরা তোকে কখনই ক্ষমা করিবেন না।" স্বামীকুলকে উপলক্ষ করিয়া সর্ব্বসমীপে মুক্তকণ্ঠে বলিলেন,—"ভরতবংশীয়গণের ধর্ম্মে ধিক্! ক্ষত্রধর্ম্মজ্ঞগণের চরিত্র একেবারেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে।" ভীষ্মাদি গুরুজনকে মুখের উপর তিরস্কার করিয়া বলিলেন,—"বুঝিলাম, দ্রোণ, ভীষ্ম ও মহাত্মা বিদুরের কিছুমাত্র স্বত্ব নাই।" কিন্তু অবলার তেজ কতক্ষণ থাকে? মহাভারতের কবি মনুষ্যচরিত্রসাগরের তল পর্য্যন্ত নখদর্পণবৎ দেখিতে পাইতেন। যখন কর্ণ দ্রৌপদীকে বেশ্যা বলিল, দুঃশাসন তাঁহার পরিধেয় আকর্ষণ করিতে গেল, তখন আর দর্প রহিল না—ভয়াধিক্যে হৃদয় দ্রবীভূত হইল। তখন দ্রৌপদী ডাকিতে লাগিলেন, "হা নাথ! হা রমানাথ! হা ব্রজনাথ! হা দুঃখনাশন! আমি কৌরবসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি,—আমাকে উদ্ধার কর।" এ স্থলে কবিত্বের চরমোৎকর্ষ।

দ্রৌপদী স্ত্রীজাতি বলিয়া তাঁহার হৃদয়ে দর্প প্রবল, কিন্তু তাঁহার ধর্ম্মজ্ঞান অসামান্য। যখন তিনি দর্পিতা রাজমহিষী হইয়া না দাঁড়ান, তখন জনমণ্ডলে তাদৃশী ধর্ম্মানুরাগিণী আছে বোধ হয় না। এই প্রবল ধর্ম্মানুরাগই প্রবলতর দর্পের ম্লানদণ্ডের স্বরূপ। অসামান্য ধর্ম্মানুরাগ এবং তেজস্বিতার সহিত সেই ধর্ম্মানুরাগের রমণীয় সামঞ্জস্য ধৃতরাষ্ট্রের নিকট তাঁহার বরগ্রহণকালে অতি সুন্দর রূপে পরিস্ফুট হইয়াছে। সে স্থানটি এত সুন্দর যে, যিনি তাহা শতবার পাঠ করিয়াছেন, তিনি তাহা আর একবার পাঠ করিলেও অসুখী হইবেন না। এ জন্য আমরা সে স্থানটি উদ্ধৃত করিলাম।

হিতৈষী রাজা ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনকে এইরূপ তিরস্কার করিয়া সান্ত্বনাবাক্যে দ্রৌপদীকে কহিলেন, "হে দ্রুপদতনয়ে! তুমি আমার নিকট স্বীয় অভিলষিত বর প্রার্থনা কর, তুমি আমার সমুদয় বধূগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।"

দ্রৌপদী কহিলেন,—"হে ভরতকুলপ্রদীপ! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে এই বর প্রদান করুন যে, সর্ব্বধর্ম্মযুক্ত শ্রীমান্ যুধিষ্ঠির দাসত্ব হইতে মুক্ত হউন। আপনার পুত্রগণ যেন ঐ মনস্বীকে পুনরায় দাস না বলে, আর আমার পুত্র প্রতিবিন্ধ্য যেন দাসপুত্র না নয়। কেন না, প্রতিবিন্ধ্য রাজপুত্র, বিশেষতঃ ভূপতিগণ কর্ত্তৃক লালিত, উহার দাসপুত্রতা হওয়া নিতান্ত অবিধেয়।"

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে কল্যাণি! আমি তোমার অভিলাষানুরূপ এই বর প্রদান করিলাম। এক্ষণে তোমাকে আর এক বর প্রদান করিতে ইচ্ছা করি। তুমি একমাত্র বরের উপযুক্ত নহ।"

দ্রৌপদী কহিলেন, "হে মহারাজ! সরথ সশরাসন ভীম, ধনঞ্জয়, নকুল ও সহদেবের দাসত্ব-মোচন হউক!" ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে নন্দিনি! আমি তোমার প্রার্থনানুরূপ বর প্রদান করিলাম। এক্ষণে তৃতীয় বর প্রার্থনা কর। এই দুই বরদান দ্বারা তোমার যথার্থ সৎকার করা হয় নাই। তুমি ধর্ম্মচারিণী, আমার সমুদয় পুত্রবধূগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।"

দ্রৌপদী কহিলেন, "হে ভগবন্! লোভ ধর্ম্মনাশের হেতু, অতএব আমি আর বর প্রার্থনা করি না। আমি তৃতীয় বর লইবার উপযুক্ত নহি; যেহেতু, বৈশ্যের এক বর, ক্ষত্রিয়পত্নীর দুই বর, রাজার তিন বর ও ব্রাহ্মণের শত বর লওয়া কর্ত্তব্য। এক্ষণে আমার পতিগণ দাসত্বরূপ দারুণ পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইয়া পুনরায় উদ্ধৃত হইলেন, উঁহারা পুণ্য-কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা শ্রেয়োলাভ করিতে পারিবেন।"

এইরূপ ধর্ম্ম ও গর্ব্বের সুসামঞ্জস্যই দ্রৌপদীর রমণীয়তার প্রধান উপকরণ। যখন জয়দ্রথ তাঁহাকে হরণমানসে কাম্যকবনে একাকিনী প্রাপ্ত হয়েন, তখন প্রথমে দ্রৌপদী তাঁহাকে ধর্ম্মাচারসঙ্গত অতিথি-সমুচিত সৌজন্যে পরিতৃপ্ত করিতে বিলক্ষণ যত্ন করেন, পরে জয়দ্রথ আপনার দুরভিসন্ধি ব্যক্ত করায়, ব্যাঘ্রীর ন্যায় গর্জ্জন করিয়া আপনার তেজোরাশি প্রকাশ করেন। তাঁহার সে তেজোগর্ব্ব বচন-পরম্পরাপাঠে মন আনন্দ-সাগরে ভাসিতে থাকে। জয়দ্রথ তাহাতে নিরস্ত না হইয়া তাঁহাকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিতে গিয়া তাহার সমুচিত প্রতিফল প্রাপ্ত হয়েন, যিনি ভীমার্জ্জুনের পত্নী এবং ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগিনী, তাঁহার বাহুবলে ছিন্নমূল পাদপের ন্যায় মহাবীর সিন্ধুসৌবীরাধিপতি ভূতলে পতিত হয়েন।

পরিশেষে জয়দ্রথ যখন পুনর্ব্বার বলপ্রকাশ করিয়া তাঁহাকে রথে তুলেন, যখন দ্রৌপদী যে আচরণ করিলেন, তাহা নিতান্ত তেজস্বিনী বীর-নারীর কার্য্য। তিনি বৃথা বিলাপ ও চীৎকার কিছুই করিলেন না। অন্যান্য স্ত্রীলোকের ন্যায় একবারও অনবধান এবং বিলম্বকারী স্বামীগণের উদ্দেশে ভর্ৎসনা করিলেন না, কেবল কুল-পুরোহিত ধৌম্যের চরণে প্রণিপাতপূর্ব্বক জয়দ্রথের

রথে আরোহণ করিলেন। পরে যখন জয়দ্রথ দৃশ্যমান পাণ্ডবদিগের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, তখন তিনি জয়দ্রথের রথস্থা হইয়াও যেরূপ গর্ব্বিত বচনে ও নিঃশঙ্কচিত্তে অবলীলাক্রমে স্বামীদিগের পরিচয় দিতে লাগিলেন, তাহা পুনঃ পুনঃ পাঠের যোগ্য।

দ্রৌপদী

(দ্বিতীয় প্রস্তাব)

দশ বৎসর হইল, 'বঙ্গদর্শনে' আমি দ্রৌপদীচরিত্র সমালোচন করিয়াছিলাম। অন্যান্য আর্য্যনারী-চরিত্র হইতে দ্রৌপদী-চরিত্রের যে গুরুতর প্রভেদ, তাহা যথাসাধ্য দেখান গিয়াছে। কিন্তু দ্রৌপদীর চরিত্রের মধ্যগ্রন্থি যে তত্ত্ব, তাহার কোন কথা সে সময়ে বলা হয় নাই। বলিবার সময় তখন উপস্থিত হয় নাই। এখন বোধ হয়, সে কথাটা বলা যাইতে পারে।

সে তত্ত্বটার বহির্বিকাশ বড় দিপ্তীমান্—এক নারীর পঞ্চস্বামী, অথচ তাহাকে কুলটা বলিয়া বিবেচনা করিবার কোন উপায় দেখা যায় না। এমন অসামঞ্জস্যের সামঞ্জস্য কোথা হইতে হইল ?

আমাদিগের ইউরোপীয় শিক্ষকেরা ইহার বড় সোজা উত্তর দিয়া থাকেন। ভারতবর্ষীয়েরা বর্ব্বর জাতি, তাহাদিগের মধ্যে স্ত্রীলোকের বহুবিবাহ-পদ্ধতি পূর্ব্বকালে প্রচলিত ছিল, সেই কারণে পঞ্চপাণ্ডবের একই পত্নী। ইউরোপীয় আচার্য্যবর্গের আর কোন সাধ্য থাকুক আর না থাকুক, এ দেশ সম্বন্ধে সোজা কথাগুলা বলিতে বড় মজবুত।

ইউরোপীয়েরা এ দেশীয় প্রাচীন গ্রন্থসকল কিরূপে বুঝেন, তদ্বিষয়ে আমাকে সম্প্রতি কিছু অনুসন্ধান করিতে হইয়াছিল।

আমার এই বিশ্বাস হইয়াছে যে, সংস্কৃত সাহিত্যবিষয়ে তাঁহারা যাহা লিখিয়াছেন, তাঁহাদের কৃত বেদ, স্মৃতি, দর্শন, পুরাণ, ইতিহাস, কাব্য প্রভৃতির অনুবাদ, টীকা, সমালোচন পাঠ করার অপেক্ষা গুরুতর মহাপাতক সাহিত্য-জগতে আর কিছুই হইতে পারে না। আর মূর্খতা উপস্থিত করিবার এমন সহজ উপায়ও আর কিছুই নাই। এখনও অনেক বাঙ্গালী তাহা পাঠ করেন, তাঁহাদিগকে সতর্ক করিবার জন্য এ কথাটা কতক অপ্রাসঙ্গিক হইলেও আমি লিখিতে বাধ্য হইলাম।

সংস্কৃত গ্রন্থের সংখ্যা নাই বলিলেও হয়। যত অনুসন্ধান হইতেছে, তত নূতন নূতন গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইতেছে, সংস্কৃত গ্রন্থগুলির তুলনায় অন্ততঃ আকারে ইউরোপীয় গ্রন্থগুলিকে গ্রন্থ বলিতে ইচ্ছা করে না। যেমন হস্তীর তুলনায় টেরিয়র, যেমন বটবৃক্ষের তুলনায় উইলো কি সাইপ্রেস, যেমন গঙ্গাসিন্ধু-গোদাবরীর তুলনায় গ্রীক কবিদিগের প্রিয় পার্ব্বতী নির্ঝরিণী, মহাভারত বা রামায়ণের তুলনায় এক খানি ইউরোপীয় কাব্য সেই রূপ গ্রন্থ। বেদের সংহিতা ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ্ গৃহ্যসূত্র, শ্রৌত-সূত্র, ধর্ম্মসূত্র, দর্শন, এই সকলের ভাষ্য, তার টীকা, তার ভাষ্য, পুরাণ, ইতিহাস, স্মৃতি, কাব্য অলঙ্কার, ব্যাকরণ, গণিত, জ্যোতিষ, অভিধান ইত্যাদি নানাবিধ সংস্কৃত গ্রন্থে আজিও ভারতবর্ষ সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে। এই লিপিবদ্ধ অনুত্তরণীয় প্রাচীন তত্ত্ব-সমুদ্রমধ্যে কোথাও ঘুণাক্ষরে এমন কথা নাই যে, প্রাচীন আর্য্যদিগের মধ্যে স্ত্রীলোকের বহুবিবাহ ছিল। তথাপি পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা একা দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামীর কথা শুনিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন যে, প্রাচীন ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে স্ত্রীলোকদিগের বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল। এই জাতীয় একজন পণ্ডিত (Fergussonসাহেব) ভগ্ন অট্টালিকার প্রাচীরে গোটাকতক বিবস্ত্রা স্ত্রীমূর্ত্তি দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, প্রাচীন ভারতবর্ষে স্ত্রীলোকেরা কাপড় পরিত না—সীতা, সাবিত্রী, দ্রৌপদী, দময়ন্তী প্রভৃতি শ্বশুর-ভাশুরের সম্মুখে নগ্নাবস্থায় বিচরণ করিত। তাই বলিতেছিলাম, এই পণ্ডিতদিগের রচনা পাঠ করার অপেক্ষা মহাপাতক সাহিত্যসংসারে দুর্লভ।

দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামীর তাৎপর্য্য কি, এ কথার মীমাংসা করিবার আগে বিচার করিতে হয় যে, এ কথাটা আদৌ ঐতিহাসিক, না কেবল কবির কল্পনা মাত্র ? সত্য সত্যই দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী ছিল, না কবি এইরূপ সাজাইয়াছেন ? মহাভারতের যে ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে, তাহা প্রবন্ধান্তরে আমি স্বীকার করিয়াছি ও বুঝিয়াছি। মহাভারতের ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে বলিয়াই যে, উহার সকল কথাই ঐতিহাসিক, ইহা সিদ্ধ হয় না। যাহা স্পষ্টতঃ প্রক্ষিপ্ত, তাহা ঐতিহাসিক নহে—এ কথা ত স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু দ্রৌপদী-চরিত্র প্রক্ষিপ্ত বলা যায় না—দ্রৌপদীকে লইয়াই মৌলিক মহাভারত। তা হউক—কিন্তু মৌলিক মহাভারতে যত কথা আছে

সকলই যে ঐতিহাসিক এবং সত্য, ইহা বলাও দুঃসাহসের কাজ। যে সময়ে কবিই ইতিহাসবেত্তা, ইতিহাসবেত্তাও কবি, সে সময়ে কাব্যেও ইতিহাস-বিমিশ্রণ বড় সহজ। সত্য কথাকে কবির স্বকপোলকল্পিত ব্যাপারে রঞ্জিত করা বিচিত্র নহে। দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরের মহিষী ছিলেন, ইহা না হয় ঐতিহাসিক বলিয়া স্বীকার করা গেল—তিনি যে পঞ্চপাণ্ডবের মহিলা, ইহাও কি ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে?

এই দ্রৌপদীর বহুবিবাহ ভিন্ন ভারতবর্ষীয় গ্রন্থসমূহমধ্যে, ভারতবর্ষীয় আর্য্যদিগের মধ্যে স্ত্রীগণের বহু বিবাহের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। বিধবা হইলে স্ত্রীলোক অন্য বিবাহ করিত, এমত প্রমাণ পাওয়া যায়; কিন্তু এককালে কেহ একাধিক পতির ভার্য্যা ছিল, এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কখন দেখা গিয়াছে যে, কোন মনুষ্যের প্রতি হস্তে ছয়টি করিয়া দুই হস্তে দ্বাদশ অঙ্গুলী আছে; কখনও দেখা গিয়াছে যে, কোন মনুষ্য চক্ষুহীন হইয়া জন্মগ্রহণ করে। এমন একটি দৃষ্টান্ত দেখিয়া সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, মনুষ্যজাতির হাতের অঙ্গুলী বারটি, অথবা মনুষ্য অন্ধ হইয়া জন্মে। তেমনি কেবলই দ্রৌপদীর বহুবিবাহ দেখিয়া সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, পূর্ব্বে আর্য্যনারীগণ মধ্যে বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। আর মহাভারতেই প্রকাশ যে, এরূপ প্রথা ছিল না, কেন না, দ্রৌপদী সম্বন্ধে এমন অলৌকিক ব্যাপার কেন ঘটিল, তাহার কৈফিয়ৎ দিবার জন্য মহাভারতকার পূর্ব্বজন্মঘটিত নানাবিধ অসম্ভব উপন্যাস রচনা করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

এখন যাহা সমাজমধ্যে একেবারে কোথাও ছিল না, যাহা তাদৃশ সমাজে অত্যন্ত লোকনিন্দার কারণস্বরূপ হইত সন্দেহ নাই, তাহা পাণ্ডবদিগের ন্যায় লোকবিখ্যাত রাজবংশে ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল না। তবে কবির এমন একটা কথা, তত্ত্ববিশেষকে পরিস্ফুট করিবার জন্য গড়িয়া লওয়া বিচিত্র নহে।

গড়া কথার মত অনেকটা লক্ষণ আছে। দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামীর ঔরসে পঞ্চপুত্র ছিল। কাহারও ঔরসে দুইটি কি তিনটি হইল না। কাহারও ঔরসে কন্যা হইল না। কাহারও ঔরস নিষ্ফল গেল না। সেই পাঁচটি পুত্রের মধ্যে কেহ রাজ্যাধিকারী হইল না। সকলেই এক সময়ে অশ্বত্থামার হস্তে নিধন পাইল। কাহারও কোন কার্য্যকারিতা নাই, সকলেই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে একবার আসিয়া, একত্রে আসিয়া দল বাঁধিয়া যুদ্ধ করিয়া চলিয়া যায়। আর কিছু করে না। পক্ষান্তরে, অভিমন্যু, ঘটোৎকচ, বভ্রুবাহন কেমন জীবন্ত।

জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, যদি দ্রৌপদীর পঞ্চবিবাহ গড়া কথাই হইল, যদি দ্রৌপদী একা যুধিষ্ঠিরের ভার্য্যা ছিলেন, তবে কি আর চারি পাণ্ডব অবিবাহিত ছিলেন? ইহার উত্তর কঠিন বটে।

ভীম ও অর্জ্জুনের অন্য বিবাহ ছিল, ইহা আমরা জানি, কিন্তু নকুল-সহদেবের অন্য বিবাহ ছিল, এমন কথা মহাভারতে পাই না; পাই না বলিয়াই যে সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, তাঁহাদের অন্য বিবাহ ছিল না, এমন নহে। মহাভারত প্রধানতঃ প্রথম তিন পাণ্ডবের অর্থাৎ যুধিষ্ঠির ও ভীমার্জ্জুনের জীবনী; অন্য দুই পাণ্ডব তাঁহাদের ছায়ামাত্র—কেবল তাঁহাদের সঙ্গে থাকিয়া কাজ করে। তাহাদের অন্য বিবাহ থাকিলে সেটা প্রয়োজনীয় কথা নহে বলিয়া মহাভারতকার ছাড়িয়াও যাইতে পারেন। কথাটা তাদৃশ মারাত্মক নহে। দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী হওয়ার পক্ষে আমরা উপরে যে আপত্তি দেখাইয়াছি, তাহা অপেক্ষাকৃত অনেক গুরুতর।

এখন, যদি দ্রৌপদীর পঞ্চবিবাহ কবিরই কল্পনা বিবেচনা করা যায়, তবে কবি কি অভিপ্রায়ে এমন বিস্ময়করী কল্পনার অনুবর্ত্তী হইলেন? বিশেষ কোন গূঢ় অভিপ্রায় না থাকিলে এমন কুটিল পথে যাইবেন কেন? তাঁহার অভিপ্রায় কি? পাঠক যদি ইংরেজের মত বলেন, "Tut clear case of palyandy," তবে সব ফুরাইল। আর তা যদি না বলেন, তবে ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে হইবে।

সেই তত্ত্ব অনুসন্ধান করিবার আগে কোন বিজ্ঞ ও শ্রদ্ধাস্পদ লোকের একটি উক্তি আমি উদ্ধৃত করিব। কথাটা 'প্রচারে' প্রকাশিত কৃষ্ণচরিত্রকে লক্ষ্য করিয়া উক্ত হইয়াছে—

"শ্রীকৃষ্ণ মর্ত্ত্য-শরীর ধারণ পূর্ব্বক ইহলোকে বিচরণ করিয়াছিলেন," এ কথা আমরাও স্বীকার করি। কিন্তু মহাভারত-প্রণয়নের পূর্ব্বকাল হইতেও যে শ্রীকৃষ্ণকে একটি অতিমানুষ—ঐশীশক্তির আবির্ভাব বলিয়া লোকে বিশ্বাসিত হইয়াছিল, তাহাও প্রামাণিক বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং প্রথম হইতেই মহাভারত গ্রন্থেও যে সেই বোধের একটি অপূর্ব্ব প্রতিবিম্ব পড়িবে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; বস্তুতঃ তাহাই সম্ভবপর। তবে আমাদের বোধ হয়, মহাভারত-রচয়িতা কর্ম্মকাণ্ড, বেদব্যাখ্যা

প্রভৃতি তাঁহার বহুবিধ উদ্দেশ্যের মধ্যে অর্জ্জুন এবং ভদ্রাকে আদর্শ-নরনারী করিয়া বর্ণন করিয়াছেন এবং ঈশ্বরে অচল ভক্তি ও তজ্জাত ঈশ্বরের নেতৃত্বে প্রতীতিই যে আদর্শ পুরুষের প্রকৃত বল, তাহাও প্রদর্শনার্থ নরোত্তম কৃষ্ণকে একটি বিশেষ ঐশীশক্তিতে মূর্ত্তিমতী করিয়া দেখাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। সে ঐশীশক্তিটি কোন পার্থিব পাত্রে কোন দেশের কোন কবি কর্ত্তৃকই কখন ধৃত হয় নাই। আদিকবি বাল্মীকিও তাহা ধরিবার চেষ্টা করেন নাই—মহাভারতকার সেই কাজে অধ্যবসায় করিয়াছিলেন এবং তাহা যতদূর সম্পন্ন হইতে পারে, ততদূর সম্পন্ন করিয়াছিলেন বলিয়াই মহাভারত গ্রন্থখানি পঞ্চমবেদ বলিয়া গণ্য হইতেছে। ঐশী-শক্তির নাম নির্লিপ্ততা। শ্রীকৃষ্ণ মনুষ্যরূপী নির্লেপ। *

এই নির্লেপ বৈরাগ্য নহে, অথবা সাধারণে যাহাকে বৈরাগ্য বলে, তাহা নহে; আমি ইহার মর্ম্ম যত দূর বুঝি, গীতা হইতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তাহা বুঝাইতেছি,—

"রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥"

আসক্তি-বিদ্বেষরহিত এবং আত্মার বশীভূত ইন্দ্রিয় সকলের দ্বারা (ইন্দ্রিয়ের) বিষয় সকল উপভোগ করিয়া সংযতাত্মা পুরুষ শান্তিপ্রাপ্ত হয়েন।

অতএব নির্লিপ্তের পক্ষে ইন্দ্রিয়বিষয়ের উপভোগ-বর্জ্জন নিষ্প্রয়োজন এবং বর্জ্জনে সংলেপই বুঝায়; বর্জ্জনের প্রয়োজন আছে, ইহাতেই বুঝায় যে, ইন্দ্রিয়ে এখন আত্মা লিপ্ত আছে,—বর্জ্জন ভিন্ন বিচ্ছেদ এখনও অসাধ্য; কিন্তু যিনি ইন্দ্রিয়বিষয়ের উপভোগী থাকিয়াও তাহাতে অনুরাগশূন্য, যিনি সেই সকল ইন্দ্রিয়কে বিজিত করিয়া অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম-সম্পাদনার্থ বিষয়ের উপভোগ করেন, তিনিই নির্লিপ্ত। তাঁহার আত্মার সঙ্গে ভোগ্য বিষয় আর সংশ্লিষ্ট নহে। তিনি পাপ ও দুঃখের অতীত।

এইরূপ "নির্লেপ" বা "অনাসঙ্গ" পরিস্ফুট করিবার জন্য হিন্দুশাস্ত্রকারেরা একটা কৌশল অবলম্বন করিয়া থাকেন। নির্লিপ্ত বা অনাসক্তকে অধিক মাত্রায় ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ের দ্বারা পরিবেষ্টিত করেন। এই জন্য মহাভারতের পরবর্ত্তী পুরাণ-কারেরা শ্রীকৃষ্ণকে অসংখ্য বরাঙ্গনা-মধ্যবর্ত্তী করিয়াছেন। এই জন্য তান্ত্রিকদিগের সাধন-প্রণালীতে এত বেশী ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর আবির্ভাব। যে এই সকলমধ্যে যথেচ্ছ বিচরণ করিয়া তাহাতে অনাসক্ত রহিল, সে-ই নির্লিপ্ত। দ্রৌপদীর বহু স্বামীও এই জন্য। দ্রৌপদী স্ত্রীজাতির অনাসঙ্গ-ধর্ম্মের মূর্ত্তিস্বরূপিণী। তৎস্বরূপে তাঁহাকে স্থাপন করাই কবির উদ্দেশ্য। তাই গণিকার ন্যায় পঞ্চ পুরুষের সংসর্গযুক্ত হইয়াও দ্রৌপদী সাধ্বী, পাতি-ব্রাত্যের পরাকাষ্ঠা। পঞ্চপতি দ্রৌপদীর নিকট একপতি মাত্র, উপাসনার এক বস্তু এবং ধর্ম্মাচরণের একমাত্র অভিন্ন উপলক্ষ। যেমন প্রকৃত ধর্ম্মাত্মার নিকট বহু দেবতাও এক ঈশ্বরমাত্র—ঈশ্বরই জ্ঞানীর নিকট একমাত্র অভিন্ন উপাস্য, তেমনি পঞ্চস্বামী অনাসঙ্গযুক্তা দ্রৌপদীর নিকট একমাত্র ধর্ম্মাচরণের স্থল। তাঁহার পক্ষাপক্ষ, ভেদাভেদ, ইতরবিশেষ নাই, তিনি গৃহকর্ম্মে নিষ্কাম, নিশ্চল, নির্লিপ্ত হইয়া অনুষ্ঠেয় কর্ম্মে প্রবৃত্ত। ইহাই দ্রৌপদীচরিত্রে অসামঞ্জস্যের সামঞ্জস্য। তবে ঈদৃশ ধর্ম্ম অতি দুঃসাধনীয়। মহাভারতকার মহাপ্রাস্থানিক পর্ব্বে সেটুকুও বুঝাইয়াছেন; তথায় কথিত হইয়াছে যে, দ্রৌপদীর অর্জ্জুনের দিকে কিঞ্চিৎ পক্ষপাত ছিল বলিয়া তিনি সেই পাপফলে সশরীরে স্বর্গা-রোহণ করিতে পারিলেন না, সর্ব্বাগ্রেই পথিমধ্যে পতিতা হইলেন।

বোধ হয়, এখন বুঝিতে পারা যায় যে, দ্রৌপদীর পাঁচ স্বামীর ঔরসে কেবল এক একটি পুত্র কেন। হিন্দুশাস্ত্রানুসারে পুত্রোৎপাদন ধর্ম্ম, গৃহীর তাহাতে বিরতি অধর্ম্ম। পুত্র উৎপন্ন হইলে বিবাহ সফল হইল, না হইলে ধর্ম্ম অসম্পূর্ণ রহিল। কিন্তু ধর্ম্মের যে প্রয়োজন, এক পুত্রেই তাহা সিদ্ধ হয়। একাধিক পুত্রের উৎপাদন ধর্ম্মার্থে নিষ্প্রয়োজন—কেবল ইন্দ্রিয়তৃপ্তির ফল মাত্র, কিন্তু দ্রৌপদী ইন্দ্রিয়সুখে নির্লিপ্ত, ধর্ম্মের প্রয়োজন সিদ্ধ হইলে স্বামিগণের সঙ্গে তাঁহার ঐন্দ্রিক সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইল। স্বামীর ধর্ম্মার্থ দ্রৌপদী সকল স্বামীর ঔরসে এক এক পুত্র গর্ভে ধারণ করিলেন, তৎপরে নির্লেপ বশতঃ আর সন্তান গর্ভে ধারণ করিলেন না। কবির কল্পনার এই তাৎপর্য্য।

এই সকল কথার তাৎপর্য্য বোধ করি, কেহই এমন বুঝিবেন না যে, যে স্ত্রীলোক অনাসঙ্গধর্ম্ম গ্রহণ করিবে, সেই পাঁচ ছয়টি মনুষ্যকে স্বামিত্বে বরণ করিবে—তাহা নহিলে ধর্ম্মের সাধন হইবে

* এডুকেশন গেজেট, ১৭ই বৈশাখ, ১২৯২ সাল।

না। তাৎপর্য্য এইমাত্র যে, যাহার চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে, মহাপাতকে পড়িলেও পাপ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। দ্রৌপদীর অদৃষ্টে যাহা ঘটিয়াছিল, স্ত্রীলোকের পক্ষে তেমন মহাপাপ আর কিছুই নাই। কিন্তু দ্রৌপদীর চিত্তশুদ্ধি জন্মিয়াছিল বলিয়া তিনি সেই মহাপাপকেও ধর্ম্মে পরিণত করিয়াছিলেন।

আমি প্রথম প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে, দ্রৌপদী ধর্ম্মবলে অত্যন্ত দৃপ্তা; সে দর্প কখন কখন ধর্ম্মকেও অতিক্রম করে। সেই দর্পের সঙ্গে এই ইন্দ্রিয়জয়ের কোন অসামঞ্জস্য নাই। তবে তাঁহার নিষ্কাম ধর্ম্ম সর্ব্বাঙ্গীন সম্পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়াছিল কি না, সে স্বতন্ত্র কথা।

অনুকরণ *

জগদীশ্বর-কৃপায় উনবিংশ শতাব্দীতে আধুনিক বাঙ্গালী নামে এক অদ্ভুত জন্তু জগতে দেখা গিয়াছে। পশুতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, এই পশু বাহ্যতঃ মনুষ্যলক্ষণাক্রান্ত, হস্তে পদে পাঁচ পাঁচ অঙ্গুলী, লাঙ্গুল নাই এবং অস্থি ও মস্তিষ্ক "বাইমেনা" জাতির সদৃশ বটে। তবে অন্তঃস্বভাব সম্বন্ধে সেরূপ নিশ্চয়তা এখনও হয় নাই। কেহ কেহ বলেন, ইহারা অন্তঃসম্বন্ধেও মনুষ্য বটে, কেহ কেহ বলেন, ইহারা বাহিরে মনুষ্য এবং অন্তরে পশু। এই তত্ত্বের মীমাংসা জন্য শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু ১৭৯৪ শকের চৈত্র মাসে বক্তৃতা করেন। একণে তাহা মুদ্রিত করিয়াছেন। তিনি বক্তৃতায় পশুপক্ষই সমর্থন করিয়াছেন।

আমরা কোন্ মতাবলম্বী? আমরাও বাঙ্গালীর পশুত্ববাদী। আমরা ইংরেজি সংবাদপত্র হইতে এ পশুতত্ত্ব অভ্যাস করিয়াছি। কোন কোন তাম্রশ্মশ্রু ঋষির মত এই যে, যেমন বিধাতা ত্রিলোকের সুন্দরীগণের সৌন্দর্য্য তিল তিল সংগ্রহ করিয়া তিলোত্তমার সৃজন করিয়াছিলেন, সেইরূপ পশুবৃত্তির তিল তিল করিয়া সংগ্রহ পূর্ব্বক এই অপূর্ব্ব নব্য বাঙ্গালীচরিত্র সৃজন করিয়াছেন। শৃগাল হইতে শঠতা, কুকুর হইতে তোষামোদ ও ভিক্ষানুরাগ, মেষ হইতে ভীরুতা, বানর হইতে অনুকরণ-পটুতা এবং গর্দ্দভ হইতে গর্জ্জন—এই সকল একত্র করিয়া দিঙ্মণ্ডলউজ্জ্বলকারী ভারতবর্ষের ভরসার বিষয়ীভূত এবং ভট্ট মোক্ষমূলরের আদরের স্থল, নব্য বাঙ্গালীকে সমাজাকাশে উদিত করিয়াছেন। যেমন সুন্দরীমণ্ডলে তিলোত্তমা, গ্রন্থমধ্যে রিচার্ডসন্স সিলেক্সন্স, যেমন পোষাকের মধ্যে ফকিরের জামা, মদ্যের মধ্যে পঞ্চ, খাদ্যের মধ্যে খিচুড়ি, তেমনি এই মহাত্মাদিগের মতে মনুষ্যের মধ্যে নব্য-বাঙ্গালী। যেমন ক্ষীরোদসমুদ্র মন্থন করিলে চন্দ্র উঠিয়া জগৎ আলো করিয়াছিল—পশুচরিত্র-সাগর মন্থন করিয়া এই অনিন্দনীয় বাবুচাঁদ উঠিয়া ভারতবর্ষ আলো করিতেছেন। রাজনারায়ণ বাবুর ন্যায় যে সকল অমৃতলুব্ধ লোক রাহু হইয়া এই কলঙ্কশূন্য চাঁদকে গ্রাস করিতে চান, আমরা তাঁহাদের নিন্দা করি। বিশেষতঃ রাজনারায়ণ বাবুকে বলি যে, আপনিই এই গ্রন্থমধ্যে গোমাংসভোজন নিষেধ করিয়াছেন, তবে বাঙ্গালীর মুণ্ড খাইতে বসিয়াছেন কেন? গোরু হইতে বাঙ্গালী কিসে অপকৃষ্ট? গোরুও যেমন উপকারী, নব্যবাঙ্গালীও সেইরূপ। ইহারা সংবাদপত্ররূপ ভাণ্ড ভাণ্ড সুস্বাদু দুগ্ধ দিতেছে, চাকরিলাঙ্গল কাঁধে লইয়া জীবনক্ষেত্র কর্ষণ পূর্ব্বক ইংরেজচাষার ফসলের যোগাড় করিয়া দিতেছে, বিদ্যার ছালা পিঠে করিয়া কলেজ হইতে ছাপাখানায় আনিয়া ফেলিয়া চিনির বলদের নাম রাখিতেছে, সমাজ-সংস্কারের গাড়ীতে বিলাতী মাল বোঝাই দিয়া রসের বাজারে চোলাই করিতেছে এবং দেশহিতের ঘানিগাছে স্বার্থ-সর্ষপ পেষণ করিয়া যশের তৈল বাহির করিতেছে। এত গুণের গোরুকে কি বধ করিতে আছে?

কিন্তু যিনি বাঙ্গালীর যত নিন্দা করুন, বাঙ্গালী তত নিন্দনীয় নহে। রাজনারায়ণ বাবুও যত নিন্দা করিয়াছেন, বাঙ্গালী তত নিন্দনীয় নহে। অনেক স্বদেশবৎসল যে অভিপ্রায়ে বাঙ্গালীর নিন্দা করেন, রাজনারায়ণ বাবুও সেই অভিপ্রায়ে বাঙ্গালীর নিন্দা করিয়াছেন,—বাঙ্গালীর হিতার্থ। সে কালে আর এ কালে নিরপেক্ষভাবে তুলনা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে,—এ কালের দোষনির্ব্বাচনই তাঁহার উদ্দেশ্য। এ কালের গুণগুলির প্রতি তিনি বিশেষ দৃষ্টিনিক্ষেপ করেন নাই—করাও নিষ্প্রয়োজন, কেন না, আমরা আমাদিগের গুণের প্রতি পলকের জন্য সন্দেহযুক্ত নহি।

* সে কাল আর এ কাল। শ্রীরাজনারায়ণ বসু প্রণীত।

নব্য বাঙ্গালার অনেক দোষ। কিন্তু সকল দোষের মধ্যে অনুকরণানুরাগ সর্ববাদিসম্মত। কি ইংরেজ, কি বাঙ্গালী, সকলেই ইহার জন্য বাঙ্গালী জাতিকে অহরহঃ তিরস্কার করিতেছেন। তদ্বিষয়ে রাজনারায়ণ বাবু যাহা বলিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিবার আবশ্যকতা নাই—সে সকল কথা আজিকালি সকলেরই মুখে শুনিতে পাওয়া যায়।

আমরা সে সকল কথা স্বীকার করি এবং ইহাও স্বীকার করি যে, রাজনারায়ণ বাবু যাহা বলিয়াছেন, তাহার অনেকগুলি সঙ্গত; কিন্তু অনুকরণ সম্বন্ধে দুই একটি সাধারণ ভ্রম আছে।

অনুকরণমাত্র কি দূষ্য? তাহা কদাচ হইতে পারে না। অনুকরণ ভিন্ন প্রথম-শিক্ষার উপায় কিছুই নাই। যেমন শিশু বয়ঃপ্রাপ্তের বাক্যানুকরণ করিয়া কথা কহিতে শিখে, যেমন সে বয়ঃপ্রাপ্তের কার্য্য সকল দেখিয়া কার্য্য করিতে শিখে, অসভ্য এবং অশিক্ষিত জাতি সেইরূপ সভ্য এবং শিক্ষিত জাতির অনুকরণ করিয়া সকল বিষয়ে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়। অতএব বাঙ্গালী যে ইংরেজের অনুকরণ করিবে, ইহা সঙ্গত ও যুক্তিসিদ্ধ। সত্য বটে, আদিম সভ্য জাতি বিনা অনুকরণে স্বতঃশিক্ষিত এবং সভ্য হইয়াছিল, প্রাচীন ভারতীয় ও মিসরীয় সভ্যতা কাহারও অনুকরণলব্ধ নহে। কিন্তু যে আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতা সর্ব্বজাতীয় সভ্যতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তাহা কিসের ফল? তাহাও রোম ও যুনানী সভ্যতার অনুকরণের ফল। রোমক সভ্যতাও যুনানী সভ্যতার অনুকরণফল। যে পরিমাণে বাঙ্গালী ইংরেজের অনুকরণ করিতেছে, পুরাবৃত্তজ্ঞ জানেন যে, ইউরোপীয়েরা প্রথমাবস্থাতে তদপেক্ষা অল্পপরিমাণে যুনানীয়ের—বিশেষতঃ রোমকীয়ের অনুকরণ করেন নাই। প্রথমাবস্থাতে অনুকরণ করিয়াছিলেন বলিয়াই এখন এ উচ্চ সোপানে দাঁড়াইয়াছেন। শৈশবে পরের হাত ধরিয়া যে জলে নামিতে না শিখিয়াছে, সে কখনই সাঁতার দিতে শিখে নাই। কেন না, ইহজন্মে তাহার জলে নামাই হইল না। শিক্ষকের লিখিত আদর্শ দেখিয়া যে প্রথমে লিখিতে না শিখিয়াছে, সে কখনই লিখিতে শিখে নাই। বাঙ্গালী যে ইংরেজের অনুকরণ করিতেছে, ইহাই বাঙ্গালীর ভরসা।

তবে লোকের বিশ্বাস এই যে, অনুকরণের ফলে কখন প্রথম শ্রেণীর উৎকর্ষপ্রাপ্তি হয় না। কিসে জানিলে?

প্রথম সাহিত্য সম্বন্ধে দেখ, পৃথিবীর কতকগুলি প্রথম শ্রেণীর কাব্য কেবল অনুকরণমাত্র। ড্রাইডেন ও বোয়ালোর অনুকারী পোপ, পোপের অনুকারী জনসন্। এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লেখকদিগের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া আমরা এ কথা সপ্রমাণ করিতে চাহি না। বর্জ্জিলের মহাকাব্য হোমরের প্রসিদ্ধ মহাকাব্যের অনুকরণ। সমুদায় রোমক সাহিত্য যুনানীয় সাহিত্যের অনুকরণ। যে রোমক সাহিত্য বর্ত্তমান ইউরোপীয় সভ্যতার ভিত্তি, তাহা অনুকরণমাত্র। কিন্তু বিদেশীয় উদাহরণ দূরে থাকুক, আমাদিগের স্বদেশে দুইখানি মহাকাব্য আছে—তাহাকে মহাকাব্য বলে না, গৌরবার্থ ইতিহাস বলে—তাহা পৃথিবীর সকল কাব্যের শ্রেষ্ঠ। গুণে উভয়ে প্রায় তুল্য; অল্প তারতম্য। একখানি আর একখানির অনুকরণ।

মহাভারত যে রামায়ণের পরকালে প্রণীত, তাহা হুইলর সাহেব ভিন্ন বোধ হয় আর কেহই সহজ অবস্থায় অস্বীকার করিবেন না। অন্যান্য অনুকৃত এবং অনুকরণের নায়কসকলে যতটা প্রভেদ দেখা যায়, রামে ও যুধিষ্ঠিরে তাহার অপেক্ষা অধিক প্রভেদ নহে। রামায়ণে অমিতবলধারী, বীর, জিতেন্দ্রিয়, ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণ মহাভারতে অর্জ্জুনে পরিণত হইয়াছেন এবং ভরত-শত্রুঘ্ন নকুল-সহদেব হইয়াছেন। ভীম নূতন সৃষ্টি, তবে কুম্ভকর্ণের একটু ছায়ায় দাঁড়াইয়াছেন। রামায়ণের রাবণ, মহাভারতের দুর্য্যোধন; রামায়ণের বিভীষণ, মহাভারতের বিদুর; অভিমন্যু ইন্দ্রজিতের অস্থিমজ্জা লইয়া গঠিত হইয়াছে; এ দিকে রাম ভ্রাতা ও পত্নীসহিত বনবাসী, যুধিষ্ঠিরও ভ্রাতা ও পত্নীসহিত বনবাসী। উভয়েই রাজ্যচ্যুত; একজনের পত্নী অপহৃতা, আর একজনের পত্নী সভামধ্যে অপমানিতা; উভয় মহাকাব্যের সারভূত সমরানলে সেই অগ্নি জ্বলন্ত, একে স্পষ্টতঃ, অপরে অস্পষ্টতঃ। উভয় কাব্যের উপন্যাসভাগ এই যে, যুবরাজ রাজ্যচ্যুত হইয়া, ভ্রাতা ও পত্নীসহ বনবাসী, পরে সমরে প্রবৃত্ত, পরে সমর-বিজয়ী হইয়া পুনর্ব্বার স্বরাজ্যে স্থাপিত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাতেই সেই সাদৃশ্য আছে; কুশীলবের পালা মণিপুরে বভ্রুবাহন কর্ত্তৃক অভিনীত হইয়াছে; মিথিলায় ধনুর্ভঙ্গ, পাঞ্চালে মৎস্যবিন্ধনে পরিণত হইয়াছে; দশরথকৃত পাপে পাণ্ডুকৃত পাপে বিলক্ষণ ঐক্য আছে। মহাভারতকে রামায়ণের অনুকরণ বলিতে ইচ্ছা না হয়, না বলুন, কিন্তু অনুকরণীয় এবং অনুকৃতে

ইহার অপেক্ষা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ অতি বিরল। কিন্তু মহাভারত অনুকরণ হইয়াও কাব্যমধ্যে পৃথিবীতে অন্যত্র অতুল—একা রামায়ণই তাহার তুলনীয়। অতএব অনুকরণমাত্র হেয় নহে।

পরে সমাজ-সম্বন্ধে দেখ। যখন রোমকেরা যুনানীয় সভ্যতার পরিচয় পাইলেন, তখন তাঁহারা কায়মনোবাক্যে যুনানীদিগের অনুকরণে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহার ফল কিকিবোর বাগ্মিতা, তাসিতসের ইতিবৃত্ত গ্রন্থ, বর্জ্জিলের মহাকাব্য, প্লুতস ও টেবিন্সের নাটক, হরেস্ ও ওবিদের গীতি-কাব্য, পেপিনিয়নের ব্যবস্থা, সেনেকার ধর্ম্মনীতি, আন্তনৈন্যদিগের রাজধর্ম্ম, কুকালসের ভোগাসক্তি, জনসাধারণের ঐশ্বর্য্য এবং সম্রাট্‌গণের স্থাপত্য-কীর্ত্তি। আধুনিক ইউরোপীয়দিগের কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে; ইতালীয় ও ফরাসী-সাহিত্য,—গ্রীক ও রোমীয় সাহিত্যের অনুকরণ; ইউরোপীয় ব্যবস্থাশাস্ত্র—রোমক ব্যবস্থাশাস্ত্রের অনুকরণ; ইউরোপীয় শাসনপ্রণালী—রোমকীয়ের অনুকরণ; কোথাও সেই ইম্পিথিয়েটর, কোথাও সেই সেনেট, কোথাও সেই প্লেবের শ্রেণী; কোথাও ফোরম, কোথাও সেই মিউনিসিপিয়ম। আধুনিক ইউরোপীয় স্থাপত্য ও চিত্রবিদ্যাও যুনানী ও রোমকমূলবিশিষ্ট। এই সকলই প্রথমে অনুকরণমাত্রই ছিল, এক্ষণে অনুকরণাবস্থা পরিত্যাগ করিয়া পৃথগ্‌ভাবাপন্ন ও উন্নত হইয়াছে। প্রতিভা থাকিলে এরূপ ঘটে, প্রথম অনুকরণমাত্র হয়, পরে অভ্যাসে উৎকর্ষ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে শিশু প্রথমে লিখিতে শিখে, তাহাকে প্রথমে গুরুর হস্তাক্ষরের অনুকরণ করিতে হয়—পরিণামে তাহার হস্তাক্ষর স্বতন্ত্র হয় এবং প্রতিভা থাকিলে সে গুরুর অপেক্ষা ভাল লিখিয়াও থাকে।

তবে প্রতিভাশূন্যের অনুকরণ বড় কদর্য্য হয় বটে, যাহার যে বিষয়ে নৈসর্গিক শক্তি নাই, যে চির-কালই অনুকারী থাকে, তাহার স্বাতন্ত্র্য কখনও দেখা যায় না। ইউরোপীয় নাটক ইহার বিশিষ্ট উদাহরণ। ইউরোপীয় জাতিমাত্রেরই নাটক আদৌ যুনানী নাটকের অনুকরণ। কিন্তু প্রতিভার গুণে স্পেনীয় এবং ইংলণ্ডীয় নাটক শীঘ্রই স্বাতন্ত্র্য লাভ করিল—ইংলণ্ড এ বিষয়ে গ্রীসের সমকক্ষ হইল। এ দিকে এতদ্বিষয়ে, স্বাভাবিক শক্তিশূন্য রোমীয়, ইতালীয়, ফরাসী এবং জার্ম্মাণীয়গণ অনুকারীই রহিলেন। অনেকেই বলেন যে, শেষোক্ত জাতি-দ্বয়ের নাটকের অপেক্ষাকৃত অনুৎকর্ষ তাঁহাদিগের অনুচিকীর্ষার ফল। এটি ভ্রম। ইহা নৈসর্গিক ক্ষমতার অপ্রতুলেরই ফল। অনুচিকীর্ষাও সেই অপ্রতুলের ফল। অনুচিকীর্ষাও কার্য্য, কারণ নহে।

অনুকরণ যে গালি বলিয়া আজিকালি পরিচিত হইয়াছে, তাহার কারণ প্রতিভাশূন্য ব্যক্তির অনুকরণে প্রবৃত্তি। অক্ষম ব্যক্তির কৃত অনুকরণ অপেক্ষা ঘৃণাকর আর কিছুই নাই। একে মন্দ, তাহাতে অনুকরণ! নচেৎ অনুকরণমাত্র ঘৃণ্য নহে। বরং এরূপ অনুকরণই স্বভাবসিদ্ধ ইহাতে যে বাঙ্গালীর স্বভাবের কিছু বিশেষ দোষ আছে, এমন বোধ করিবার কারণ নির্দ্দেশ করা কঠিন। ইহা মানুষের স্বভাবসিদ্ধ দোষ বা গুণ। যখন উৎকৃষ্টে এবং অপকৃষ্টে একত্র হয়, তখন অপকৃষ্ট স্বভাবতঃ উৎকৃষ্টের সমান হইতে চাহে। সমান হইবার উপায় কি? উপায়, উৎকৃষ্ট যেরূপ করে, সেইরূপ কর, সেইরূপ হইবে। তাহাকেই অনুকরণ বলে। বাঙ্গালী দেখে, ইংরেজ সভ্যতায়, শিক্ষায়, বলে, ঐশ্বর্য্যে, সুখে, সর্ব্বাংশে বাঙ্গালী হইতে শ্রেষ্ঠ। বাঙ্গালী কেন না ইংরেজের মত হইতে চাহিবে? কিন্তু কি প্রকারে সেরূপ হইবে? বাঙ্গালী মনে করে, ইংরেজ যাহা যাহা করে, সেইরূপ সেইরূপ করিলে ইংরেজের মত সভ্য, শিক্ষিত, সম্পন্ন, সুখী হইবে। অন্য যে কোন জাতি হউক না কেন, ঐ অবস্থাপন্ন হইলে ঐরূপ করিত। বাঙ্গালীর স্বভাবের দোষে এ অনুকরণপ্রবৃত্তি নহে। অন্ততঃ বাঙ্গালার তিনটি প্রধান জাতি—ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, আর্য্য-বংশসম্ভূত; আর্য্যশোণিত তাহাদের শরীরে অদ্যাপি বহিতেছে; বাঙ্গালী কখনই বানরের ন্যায় কেবল অনুকরণের জন্যই অনুকরণপ্রিয় হইতে পারে না। এ অনুকরণ স্বাভাবিক এবং পরিণামে মঙ্গলপ্রদ হইতে পারে। যাঁহারা আমাদিগের কৃত ইংরেজের আহার ও পরিচ্ছদের অনুকরণ দেখিয়া রাগ করেন, তাঁহারা ইংরেজকৃত ফরাসীদের আহার-পরিচ্ছদের অনুকরণ দেখিয়া কি বলিলেন? এ বিষয়ে বাঙ্গালীর অপেক্ষা ইংরেজেরা অল্পাংশে অনুকারী? আমরা অনুকরণ করি জাতীয় প্রভুর; ইংরেজেরা অনুকরণ করেন—কাহার?

ইহা আমরা অবশ্য স্বীকার করি যে, বাঙ্গালী যে পরিমাণে অনুকরণে প্রবৃত্ত হয়, ততটা বাঞ্ছনীয় না হইতে পারে। বাঙ্গালীর মধ্যে প্রতিভাশূন্য অনুকারীরই বাহুল্য এবং তাহাদিগকে প্রায় গুণভাগের অনুকরণে প্রবৃত্ত না হইয়া দোষভাগের অনুকরণেই প্রবৃত্ত দেখা যায়। এইটি মহাদুঃখ।

বাঙ্গালী গুণের অনুকরণে তত পটু নহে; দোষের অনুকরণে ভূমণ্ডলে অদ্বিতীয়। এই জন্যই আমরা বাঙ্গালীর অনুকরণপ্রবৃত্তিকে গালি পাড়ি এবং এই জন্যই রাজনারায়ণ বাবু যাহা বলিয়াছেন, তাহার অনেকগুলিকে যথার্থ বলিয়া স্বীকার করিতেছি।

যেখানে অনুকারী প্রতিভাশালী, সেখানেও অনুকরণের দুইটি দোষ আছে। একটি বৈচিত্র্যের বিঘ্ন। এ সংসারে একটি প্রধান সুখ, বৈচিত্র্যঘটিত। জগতীতলস্থ সর্ব্বপদার্থ যদি একবর্ণের হইত, তবে জগৎ কি এত সুখদৃশ্য হইত? সকল শব্দ যদি একপ্রকার হইত—মনে কর, কোকিলের স্বরের ন্যায় রব ভিন্ন পৃথিবীতে অন্য কোন প্রকার শব্দ না থাকিত, তবে কি সে শব্দ সকলের কর্ণজ্বালাকর হইত না? আমরা সেরূপ স্বভাব পাইলে না হইতে পারিত। কিন্তু এক্ষণে আমরা যে প্রকৃতি লইয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তাহাতে বৈচিত্র্যই সুখ। অনুকরণে এই সুখের ধ্বংস হয়। ম্যাকবেথ উৎকৃষ্ট নাটক, কিন্তু পৃথিবীর সকল নাটক ম্যাকবেথের অনুকরণে লিখিত হইলে নাটকে আর কি সুখ থাকিত? সকল মহাকাব্য রঘুবংশের আদর্শে লিখিত হইলে, কে আর কাব্য পড়িত?

দ্বিতীয়, সকল বিষয়েই যত্নপৌনঃপুন্যে উৎকর্ষের সম্ভাবনা। কিন্তু পরবর্ত্তী কার্য্য পূর্ব্ববর্ত্তী কার্য্যের অনুকরণমাত্র হইলে, চেষ্টা কোন প্রকার নূতন পথে যায় না, সুতরাং কার্য্যের উন্নতি ঘটে না। তখন ধারাবাহিকতা প্রাপ্ত হইতে হয়। ইহা কি শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, কি সামাজিক কার্য্য, কি মানসিক অভ্যাস সকল সম্বন্ধেই সত্য।

মনুষ্যের শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি সকলেরই সমকালিক যথোচিত স্ফূর্ত্তি এবং উন্নতি মনুষ্যদেহধারণের প্রধান উদ্দেশ্য। তবে যাহাতে কতকগুলির অধিকতর পরিপুষ্টি এবং কতকগুলির প্রতি তাচ্ছিল্য জন্মে, তাহা মনুষ্যের অনিষ্টকর। মনুষ্য অনেক এবং একজন মনুষ্যের সুখও বহুবিধ। তত্তাবৎ-সাধনের জন্য বহুবিধ ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের কার্য্যের আবশ্যকতা। ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের কার্য্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির লোকের দ্বারা ভিন্ন সম্পন্ন হইতে পারে না। এক শ্রেণীর চরিত্রের লোকের দ্বারা বহু প্রকারের কার্য্য সাধিত হইতে পারে না, অতএব সংসারে চরিত্র-বৈচিত্র্য, কার্য্য বৈচিত্র্য এবং প্রবৃত্তির বৈচিত্র্য প্রয়োজন। তদ্ব্যতীত সমাজের সকল বিষয়ে মঙ্গল নাই। অনুকরণ-প্রবৃত্তিতে ইহাই ঘটে যে, অনুকারীর চরিত্র, তাহার প্রবৃত্তি এবং তাহার কার্য্য অনুকরণীয়ের ন্যায় হয়, পথান্তরে গমন করিতে পারে না। যখন সমাজস্থ সকলেই বা অধিকাংশ লোকে বা কার্য্যক্ষম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ একই আদর্শের অনুকারী হয়েন, তখন এই বৈচিত্র্য-হানি অতি গুরুতর হইয়া উঠে। মনুষ্য-চরিত্রের সর্ব্বাঙ্গীন স্ফূর্ত্তি ঘটে না, সর্ব্বপ্রকারের মনোবৃত্তি সকলের মধ্যে যথোচিত সামঞ্জস্য থাকে না, মনুষ্যের কপালে সকলপ্রকার সুখ ঘটে না—মনুষ্যত্ব অসম্পূর্ণ থাকে; সমাজ অসম্পূর্ণ থাকে, মনুষ্য-জীবন অসম্পূর্ণ থাকে।

আমরা যে কয়েকটি কথা বলিয়াছি, তাহাতে নিম্নলিখিত তত্ত্বসকলের উপলব্ধি হইতে পারে—

১। সামাজিক সভ্যতার আদি দুই প্রকার, কোন কোন সমাজ স্বতঃ সভ্য হয়, কোন কোন সমাজ অন্য সমাজ হইতে শিক্ষা লাভ করে। প্রথমোক্ত সভ্যতালাভ বহুকালসাপেক্ষ, দ্বিতীয়োক্ত আশু সম্পন্ন হয়।

২। যখন কোন অপেক্ষাকৃত অসভ্যজাতি সভ্যতর জাতির সংস্পর্শ লাভ করে, তখন দ্বিতীয় পথে সভ্যতা অতি দ্রুত গতিতে আসিতে থাকে। সে স্থলে সামাজিক গতি এইরূপ হয় যে, অপেক্ষাকৃত অসভ্য সমাজ সভ্যতর সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন অনুকরণে প্রবৃত্ত হয়। ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম।

৩। অতএব বঙ্গীয় সমাজের দৃশ্যমান অনুকরণ-প্রবৃত্তি অস্বাভাবিক বা বাঙ্গালীর চরিত্র-দোষজনিত নহে।

৪। অনুকরণমাত্রই অনিষ্টকারী নহে, কখন কখন তাহাতে গুরুতর সুফলও জন্মে; প্রথমাবস্থায় অনুকরণ, পরে স্বাতন্ত্র্য আপনিই আসে। বঙ্গীয় সমাজের অবস্থা বিবেচনা করিলে এই অনুকরণ-প্রবৃত্তি যে ভাল নহে, এমত নিশ্চয় বলা যাইতে পারে না, ইহাতে ভরসার স্থলও আছে।

৫। তবে অনুকরণে গুরুতর কুফলও আছে। উপযুক্ত কাল উত্তীর্ণ হইলেও অনুকরণপ্রবৃত্তি বলবতী থাকিলে অথবা অনুকরণের যথার্থ সময়ে অনুকরণ-প্রবৃত্তি অব্যবহিতরূপে স্ফূর্ত্তি পাইলে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইবে।

শকুন্তলা, মিরন্দা এবং দেসদিমোনা

প্রথম, শকুন্তলা ও মিরন্দা

উভয়েই ঋষিকন্যা, প্রস্পেরো ও বিশ্বামিত্র উভয়েই রাজর্ষি। উভয়ে ঋষিকন্যা বলিয়া অমানুষিক সাহায্যপ্রাপ্ত। মিরন্দা এরিয়ল-রক্ষিতা, শকুন্তলা অপ্সরোরক্ষিতা।

উভয়েই ঋষিপালিতা। দুইটিই বনলতা—দুইটিরই সৌন্দর্য্যে উদ্যানলতা পরাভূত। শকুন্তলাকে দেখিয়া রাজাবরোধবাসিগণের ম্লানীভূত রূপলাবণ্য দুষ্মন্তের স্মরণপথে আসিল :—

"শুদ্ধান্তদুর্লভমিদং বপুরাশ্রমবাসিনো যদি জনস্য,
দূরীকৃতাঃ খলু গুণৈরুদ্যানলতা বনলতাভিঃ॥"

ফর্দিনন্দও মিরন্দাকে দেখিয়া সেইরূপ ভাবিলেন,—

"Full many a lady
I have eyed with best regard
and many a time
The harmony of their toungues
hath into bondage
Brought my too diligent ear for
several virtues
Have I like several women—
but you so you
So perfect and so peerless, are
created of every creatures best !"

উভয়েই অরণ্যমধ্যে প্রতিপালিতা, সরলতার যে কিছু মোহমন্ত্র আছে, উভয়েই তাহাতে সিদ্ধ। কিন্তু মনুষ্যালয়ে বাস করিয়া, সুন্দর, সরল, বিশুদ্ধ রমণী-প্রকৃতি বিকৃতি প্রাপ্ত হয়—কে আমায় ভালবাসিবে, কে আমায় সুন্দর বলিবে, কেমন করিয়া পুরুষ জয় করিব, এই সকল কামনায়, নানা বিলাসবিভ্রমাদিতে, মেঘবিলুপ্ত চন্দ্রমাবৎ তাহার মাধুর্য্য কালিমা প্রাপ্ত হয়। শকুন্তলা এবং মিরন্দায় এই কালিমা নাই, কেন না, তাঁহারা লোকালয়ে প্রতিপালিতা নহেন। শকুন্তলা বল্কল পরিধান করিয়া ক্ষুদ্র কলসী হস্তে আলবালে জলসিঞ্চন করিয়া দিনপাত করিয়াছেন, সিঞ্চিত জলকণাবিধৌত নবমল্লিকার মত নিজেও শুভ্র, নিষ্কলঙ্ক, প্রফুল্ল, দিগন্তসুগন্ধবিকীর্ণকারিণী। তাঁহার ভগিনীস্নেহ নবমল্লিকার উপর, ভ্রাতৃস্নেহ সহকারের উপর, পুত্রস্নেহ মাতৃহীন হরিণশিশুর উপর; পতিগৃহ-গমনকালে ইহাদিগের কাছে বিদায় হইতে গিয়া শকুন্তলা অশ্রুমুখী, কাতরা, বিবশা। শকুন্তলার কথোপকথন তাহাদিগের সঙ্গে, কোন বৃক্ষের সঙ্গে ব্যঙ্গ, কোন বৃক্ষকে আদর, কোন লতায় পরিণয় সম্পাদন করিয়া শকুন্তলা সুখী। কিন্তু শকুন্তলা সরলা হইলেও অশিক্ষিতা নহেন। তাঁহার শিক্ষার চিহ্ন তাঁর লজ্জা। লজ্জা তাঁহার চরিত্রে বড় প্রবলা। তিনি কথায় কথায় দুষ্মন্তের সম্মুখে লজ্জাবনতমুখী হইয়া থাকেন—লজ্জার অনুরোধে আপনার হৃদ্গত প্রণয় সখীদের সম্মুখেও সহজে ব্যক্ত করিতে পারেন না। মিরন্দার সেরূপ নহে। মিরন্দা এত সরলা যে, তাহার লজ্জাও নাই। কোথা হইতে লজ্জা হইবে? তাহার জনক ভিন্ন অন্য পুরুষকে কখন দেখেই নাই। প্রথম ফর্দিনন্দকে দেখিয়া মিরন্দা বুঝিতে পারিল না যে, কি এ?

Lord! How it looks about!
Believe me sir! it carries a brave
form but it's a spirit.

সমাজ-প্রদত্ত যে সকল সংস্কার, শকুন্তলার তাহা সকলই আছে; মিরন্দার তাহা কিছুই নাই। পিতার সম্মুখে ফর্দিনন্দের রূপের প্রশংসায় কিছুমাত্র সঙ্কোচ নাই—অন্যে যেমন কোন চিত্রাদির প্রশংসা করে, এ তেমনি প্রশংসা,—

I might call him
A thing divine for no thing natural
I ever saw so noble.

অথচ স্বভাবদত্ত স্ত্রীচরিত্রের যে পবিত্রতা, যাহা লজ্জার মধ্যে লজ্জা, তা মিরন্দায় অভাব নাই, এ জন্য শকুন্তলার সরলতা অপেক্ষা মিরন্দার সরলতার নবীনত্ব এবং মাধুর্য্য অধিক। যখন পিতাকে ফর্দিনন্দের পীড়নে প্রবৃত্ত দেখিয়া মিরন্দা বলিতেছে,—

O dear father!
Make not rash a trail of him for
He's gentle and not fearful.

যখন পিতৃমুখে ফর্দিনন্দের রূপের নিন্দা শুনিয়া মিরন্দা বলিল,—

My affections
Are then most humble, I have no
ambitions
To see a goodlier man.

তখন আমরা বুঝিতে পারি যে, মিরন্দা সংস্কার-বিহীনা; কিন্তু মিরন্দা পরদুঃখকাতরা, মিরন্দা স্নেহ-

শালিনী, মিরন্দার লজ্জা নাই। কিন্তু লজ্জার সার ভাগ যে পবিত্রতা, তাহা আছে।

যখন রাজপুত্রের সঙ্গে মিরন্দার সাক্ষাৎ হইল, তখন তাহার হৃদয় প্রণয়সংস্পর্শশূন্য ছিল। কেন না, শৈশবের পর পিতা ও কালিবন ভিন্ন আর কোন পুরুষকে তিনি কখন দেখেন নাই। শকুন্তলাও যখন রাজাকে দেখেন, তখন তিনিও শূন্যহৃদয়, ঋষিগণ ভিন্ন পুরুষ দেখেন নাই। উভয়েই তপোবনমধ্যে—একস্থানে কণ্বের তপোবন—অপর স্থানে প্রস্পেরোর তপোবন—অনুরূপ নায়ককে দেখিবামাত্র প্রণয়শালিনী হইলেন। কিন্তু কবিদিগের আশ্চর্য্য কৌশল দেখ, তাঁহারা পরামর্শ করিয়া শকুন্তলা ও মিরন্দা-চরিত্র প্রণয়নে প্রবৃত্ত হয়েন নাই, অথচ একজনে দুইটি চিত্র প্রণীত করিলে যেরূপ হইত, ঠিক সেইরূপ হইয়াছে। যদি একজনে দুইটি চরিত্র প্রণয়ন করিতেন, তাহা হইলে কবি শকুন্তলার ও মিরন্দার প্রণয়-লক্ষণে কি প্রভেদ রাখিতেন? তিনি বুঝিতেন যে শকুন্তলা সমাজপ্রদত্ত সংস্কারসম্পন্না, লজ্জাশীলা, অতএব তাঁহার প্রণয় মুখে অব্যক্ত থাকিবে, কেবল লক্ষণেই ব্যক্ত হইবে; কিন্তু মিরন্দা সংস্কারশূন্যা, লৌকিক লজ্জা কি, তা জানে না, অতএব তাহার প্রণয়লক্ষণ বাক্যে অপেক্ষাকৃত পরিস্ফুট হইবে। পৃথক্ পৃথক্ কবি-প্রণীত চিত্রদ্বয়ের ঠিক তাহাই ঘটিয়াছে। দুষ্মন্তকে দেখিয়াই শকুন্তলা প্রণয়াসক্তা, কিন্তু দুষ্মন্তের কথা দূরে থাক, সখীদ্বয় যত দিন তাঁহাকে ক্লিষ্টা দেখিয়া, সকল কথা অনুভবে বুঝিয়া, পীড়াপীড়ি করিয়া কথা বাহির করিয়া না লইল, ততদিন তাহাদের সম্মুখেও শকুন্তলা এই নূতন বিকারের একটি কথাও বলেন নাই, কেবল লক্ষণেই সে ভাব ব্যক্ত—

"স্নিগ্ধং বীক্ষিতমন্যতোঽপি নয়নে যৎ প্রেরয়ন্ত্যা তয়া
যাতং যচ্চ নিতম্বয়োর্গুরুতয়া মন্দং বিলাসাদিব।
মা গা ইত্যুপরুদ্ধয়া যদপি তৎ সাসূয়মুক্তা সখী,
সর্ব্বং তৎ কিল মৎপরায়ণমহো! কামী স্বতাং
পশ্যতি।"

শকুন্তলা দুষ্মন্তকে ছাড়িয়া যাইতে গেলে গাছে তাঁহার বল্কল বাধিয়া যায়, পদে কুশাঙ্কুর বিঁধে। কিন্তু মিরন্দার সে সকলের প্রয়োজন নাই—মিরন্দা সে সকল জানেন না; প্রথম সন্দর্শনকালে মিরন্দা অসঙ্কুচিত-চিত্তে পিতৃসমক্ষে আপন প্রণয় ব্যক্ত করিলেন,—

—This
Is the third man I e'er saw, the first
That e'er I sighed for.

এবং পিতাকে ফর্দ্দিনন্দের পীড়নে উদ্যত দেখিয়া ফর্দ্দিনন্দকে আপনার প্রিয়জন বলিয়া পিতার দয়ার উদ্রেকের জন্য যত্ন করিলেন। প্রথম অবসরেই ফর্দ্দিনন্দকে আত্মসমর্পণ করিলেন।

দুষ্মন্তের সঙ্গে শকুন্তলার প্রথম প্রণয়সম্ভাষণ এক প্রকার লুকাচুরি খেলা। "সখি, রাজাকে ধরিয়া রাখিস্ কেন?"—"তবে, আমি উঠিয়া যাই"—"আমি গাছের আড়ালে লুকাই"—শকুন্তলার এ সকল "বাহানা" আছে, মিরন্দার সে সকল নাই। এ সকল লজ্জাশীলা কুলবালার বিহিত, কিন্তু মিরন্দা লজ্জাশীলা কুলবালা নহে—মিরন্দা বনের পাখী—প্রভাতারুণোদয়ে গাইয়া উঠিতে তাহার লজ্জা করে না, বৃক্ষের ফুল—সন্ধ্যার বাতাস পাইলে মুখ ফুটাইয়া ফুটিয়া উঠিতে তাহার লজ্জা করে না যে—

by my modesty.—
The jewel in my dower,—
I would not wish
Any companion in the world but you;
Nor can imagination form a shade,
Besides yourself, to like of.

পুনশ্চ—

Hence, bashful cunning;
And prompt me,
plain and holy innocence!
I am your wife, if you will marry me,
If not, I'll die your naid;
to be your fellow.
You may deny me,
but I'll be your servant,
Whether you will or no.

আমাদের ইচ্ছা ছিল যে, মিরন্দা-ফর্দ্দিনন্দের এই প্রথম প্রণয়ালাপ সমুদয় উদ্ধৃত করি, কিন্তু নিষ্প্রয়োজন। সকলেরই ঘরে সেক্ষপীয়র আছে, সকলেই মূল গ্রন্থ খুলিয়া দেখিতে পারিবেন, উদ্যানমধ্যে রোমিওজুলিয়েটের যে প্রণয়সম্ভাষণ জগতে বিখ্যাত এবং পূর্ব্বতন কলেজের ছাত্রমাত্রের কণ্ঠস্থ, ইহা কোন অংশে তদপেক্ষা ন্যূনবয় নহে। যে ভাবে জুলিয়েট বলিয়াছিলেন যে, "আমার দান সাগর-তুল্য অসীম, আমার ভালবাসা

সেই সাগর-তুল্য গভীর," মিরন্দাও সেই স্থলে সেই মহান্ চিত্তভাবে পরিপ্লুত। ইহার অনুরূপ অবস্থায় লতামণ্ডপে দুষ্মন্ত-শকুন্তলার যে আলাপ—শকুন্তলার চিরবদ্ধ হৃদয়কোরক প্রথম অভিমত সূর্য্য-সমীপে ফুটাইয়া হাসিল—সে আলাপে তত গৌরব নাই—মানব চরিত্রের কূলপ্রান্ত পর্য্যন্ত প্রধাবতী সেরূপ টলটল চঞ্চল বীচিমালা তাহার হৃদয়মধ্যে লক্ষিত হয় না। যাহা বলিয়াছি, তাই কেবল ছি ছি, কেবল যাই যাই, কেবল লুকাচুরি—একটু একটু চাতুরী আছে, যথা অর্দ্ধপথে "সুমরিঅ এদম্ হথাভংসিণো মিণালবলঅস্‌স কদে পড়িণবুত্তহ্মি।" ইত্যাদি। একটু অগ্রগামিনীত্ব আছে, যথা দুষ্মন্তের মুখে —"নমু কমলস্য মধুকরঃ সন্তুষ্যতি গন্ধমাত্রেণ।" এই কথা শুনিয়া শকুন্তলার জিজ্ঞাসা "অসন্তোষে উণ কিং করেদি ?"—এই সকল ছাড়া আর বড় কিছুই নাই। ইহা কবির দোষ নহে—বরং কবির গুণ। দুষ্মন্তের চরিত্রগৌরবে শকুন্তলা এখানে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। ফর্দ্দিনন্দ বা রোমিও ক্ষুদ্র ব্যক্তি, নায়িকার প্রায় সমবয়স্ক, প্রায় সমযোগ্য, অকৃত-কীর্ত্তি—অপ্রতিথযশাঃ, কিন্তু সসাগরা পৃথিবীপতি মহেন্দ্রসখ দুষ্মন্তের কাছে শকুন্তলা কে ? দুষ্মন্তমহা-বৃক্ষের বৃক্ষচ্ছায়া এখানে শকুন্তলা-কলিকাকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে—সে ভাল করিয়া মুখ খুলিয়া ফুটিতে পারিতেছে না। এ প্রণয় সম্ভাষণ নহে—রাজক্রীড়া, পৃথিবীপতি কুঞ্জবনে বসিয়া সাধ করিয়া প্রেমকরা-রূপ খেলা খেলিতে বসিয়াছেন। মত্তমাতঙ্গের ন্যায় শকুন্তলা-নলিনী-কোরককে শুণ্ডে তুলিয়া জলক্রীড়ার সাধ মিটাইতেছেন, নলিনী তাতে ফুটিবে কি ?

যিনি এ কথাগুলি স্মরণ না রাখিবেন, তিনি শকুন্তলা-চরিত্র বুঝিতে পারিবেন না, যে জল-নিষেকে মিরন্দা ও জুলিয়েট ফুটিল, সে জলনিষেকে শকুন্তলা ফুটিল না, প্রণয়াসক্তা শকুন্তলার বালিকার চাঞ্চল্য, বালিকার ভয়, বালিকার লজ্জা দেখিলাম, কিন্তু রমণীর গাম্ভীর্য্য, রমণীর স্নেহ কৈ ? ইহার কারণ কেহ কেহ বলিবেন, লোকাচারের ভিন্নতা, দেশভেদ। বস্তুতঃ তাহা নহে। দেশী কুলবধূ বলিয়া শকুন্তলা লজ্জায় ভাঙ্গিয়া পড়িল,—আর মিরন্দা বা জুলিয়েট বেহায়া বিলাতী মেয়ে বলিয়া মনের গ্রন্থি খুলিয়া দিল, এমত নহে। ক্ষুদ্রাশয় সমালোচকরাই বুঝান যে, দেশভেদে বা কালভেদে কেবল বাহ্যভেদ হয় মাত্র ; মনুষ্যহৃদয় সকল দেশেই সকল কালেই ভিতরে মনুষ্যহৃদয়ই থাকে। বরং বলিতে গেলে—তিন জনের মধ্যে শকুন্তলাকেই বেহায়া বলিতে হয় "অসন্তোষে উণ কিং করেদি ?" তাহার প্রমাণ। যে শকুন্তলা ইহার কয় মাস পরে পৌরবের সভাতলে দাঁড়াইয়া দুষ্মন্তকে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিল—"অনার্য্য, আপন হৃদয়ের অনুমানে সকলকে দেখ ?"—সে শকুন্তলা যে লতামণ্ডপে বালিকাই রহিল, তাহার কারণ কুলকন্যাসুলভ লজ্জা নহে। তাহার কারণ, দুষ্মন্তের চরিত্রের বিস্তার। যখন শকুন্তলা সভাতলে পরিত্যক্তা, তখন শকুন্তলা পত্নী, রাজমহিষী ; মাতৃপদে আরোহণোদ্যতা, সুতরাং তখন শকুন্তলা রমণী, এখানে তপোবনে—তপস্বিকন্যা, রাজ-প্রাসাদের অনুচিত অভিলাষিণী—এখানে শকুন্তলা কে ? করিশুণ্ডে পদ্মমাত্র। শকুন্তলার কবি যে টেম্পেষ্টের কবি হইতে হীনপ্রভ নহেন, ইহাই দেখাইবার জন্য এ স্থলে আয়াস স্বীকার করিলাম।

দ্বিতীয়—শকুন্তলা ও দেস্‌দিমোনা

শকুন্তলার সঙ্গে মিরন্দার তুলনা করা গেল, কিন্তু ইহাও দেখান গিয়াছে যে, শকুন্তলা ঠিক মিরন্দা নহে। কিন্তু মিরন্দার সহিত তুলনা করিলে শকুন্তলা-চরিত্রের এক ভাগ বুঝা যায়। শকুন্তলা-চরিত্রের আর এক ভাগ বুঝিতে বাকী আছে। দেস্‌দিমোনার সঙ্গে তুলনা করিয়া সে ভাগ বুঝাইবার ইচ্ছা আছে।

শকুন্তলা এবং দেস্‌দিমোনা, দুই জনে পরস্পর তুলনীয়া এবং অতুলনীয়া। তুলনীয়া, কেন না, উভয়েই গুরুজনের অপেক্ষা না করিয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। গৌতমী শকুন্তলা সম্বন্ধে দুষ্মন্তকে যাহা বলিয়াছেন, ওথেলোকে লক্ষ্য করিয়া দেস্‌দিমোনা সম্বন্ধে তাহা বলা যাইতে পারে।

"ণাবেক্‌খিদো গুরুঅণো ইমিএ ণ তুএবি
পুচ্ছিদো বন্ধু।
একম্ এক্ক চরিএ কিং ভণদু একং একস্‌স ॥"

তুলনীয়া, কেন না, উভয়েই বীরপুরুষ দেখিয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছেন—উভয়েই "দুরারোহিণী আশালতা" মহামহীরুহ অবলম্বন করিয়া উঠিয়া-ছিল। কিন্তু বীরমন্ত্রের যে মোহ, তাহা দেস্‌দিমোনায় পরিস্ফুট, শকুন্তলায় তাদৃশ নহে। ওথেলো কৃষ্ণকায়, সুতরাং সুপুরুষ বলিয়া ইতালীয়

ষষ্ঠ খণ্ড

কুরুক্ষেত্র

"যো নিষণ্ণো ভবেদ্রাত্রৌ দিবা ভবতি বিষ্ঠিতঃ।
ইষ্টানিষ্টস্য চ দ্রষ্টা তস্মৈ দ্রষ্টাত্মনে নমঃ॥"

শান্তিপর্ব্ব, ৪৭ অধ্যায়ঃ।

প্রথম পরিচ্ছেদ

ভীষ্মের যুদ্ধ

একণে কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবে। মহাভারতে চারিটি পর্ব্বে ইহা বর্ণিত হইয়াছে। দুর্য্যোধনের সেনাপতিগণের নামক্রমে ক্রমান্বয়ে এই চারিটি পর্ব্বের নাম হইয়াছে, ভীষ্মপর্ব্ব, দ্রোণপর্ব্ব, কর্ণপর্ব্ব ও শল্যপর্ব্ব।

এই যুদ্ধপর্ব্বগুলি মহাভারতের নিকৃষ্ট অংশমধ্যে গণ্য করা উচিত। পুনরুক্তি, অকারণ এবং অরুচিকর বর্ণনাবাহুল্য, অনৈসর্গিকতা, অত্যুক্তি এবং অসঙ্গতি দোষ এইগুলিতে বড় বেশী। ইহার অল্পভাগই আদিম-স্তরভুক্ত বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু কোন্ অংশ মৌলিক, আর কোন্ অংশ অমৌলিক, স্থির করা বড় দুষ্কর। যেখানে সবই কাঁটাবন, সেখানে পুষ্পচয়ন বড় দুঃসাধ্য। তবে যেখানে কৃষ্ণচরিত্র সম্বন্ধে কোন কথা পাওয়া যায়, সেই স্থান আমরা যথাসাধ্য বুঝিবার চেষ্টা করিব।

ভীষ্মপর্ব্বের প্রথম জম্বুখণ্ড-বিনির্ম্মাণ-পর্ব্বাধ্যায়। তাহার সঙ্গে যুদ্ধের কোন সম্বন্ধ নাই—মহাভারতেরও বড় অল্প। কৃষ্ণচরিত্রের কোন কথাই নাই। তার পর ভগবদ্গীতাপর্ব্বাধ্যায়। ইহার প্রথম চব্বিশ অধ্যায়ের পর গীতারম্ভ। এই চব্বিশ অধ্যায়মধ্যে কৃষ্ণসম্বন্ধীয় বিশেষ কোন কথা নাই। কৃষ্ণ যুদ্ধের পূর্ব্বে দুর্গাস্তব করিতে অর্জ্জুনকে পরামর্শ দিলে, অর্জ্জুন যুদ্ধারম্ভকালে দুর্গাস্তব পাঠ করিলেন। কোন গুরুতর কার্য্য আরম্ভ করিবার সময় আপন আপন বিশ্বাসানুযায়ী দেবতার আরাধনা করিয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য। তাহা হইলে ঈশ্বরের আরাধনা হইল। যাহা বলিয়া ডাকি না কেন, এক ভিন্ন ঈশ্বর নাই।

তার পর গীতা। ইহাই কৃষ্ণচরিত্রের প্রধান অংশ। এই গীতোক্ত অনুপম পবিত্র ধর্ম্ম প্রচারই কৃষ্ণের আদর্শ মনুষ্যত্বের বা দেবত্বের এক প্রধান পরিচয়।

কিন্তু এখানে আমি গীতা সম্বন্ধে কোন কথা বলিব না। তাহার কারণ এই যে, এই গীতোক্ত ধর্ম্ম একখানি পৃথক্ গ্রন্থে * কিছু কিছু বুঝাইয়াছি। পরে আর একখানি † লিখিতে নিযুক্ত আছি। গীতা সম্বন্ধে আমার মত এই দুই গ্রন্থে পাওয়া যাইবে। এখানে পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই।

ভগবদ্গীতাপর্ব্বাধ্যায়ের পর ভীষ্মবধ-পর্ব্বাধ্যায়। এইখানেই যুদ্ধারম্ভ। যুদ্ধে কৃষ্ণ অর্জ্জুনের সারথিমাত্র। সারথিদিগের অদৃষ্ট বড় মন্দ ছিল। মহাভারতে যে যুদ্ধের বর্ণনা আছে, তাহা কতকগুলি দ্বৈরথ যুদ্ধ মাত্র। রথিগণ যুদ্ধ করিবার সময়ে পরস্পরের অশ্ব ও সারথিকে বিনাশ করিবার চেষ্টা করিতেন। তাহার কারণ, অশ্ব বা সারথি নষ্ট হইলে আর রথ চলিবে না। রথ না চলিলে রথী বিপন্ন হয়েন, সারথিরা যোদ্ধা নহে—বিনাদোষে, বিনা যুদ্ধে নিহত হইত। কৃষ্ণকেও সে দুঃখের ভাগী হইতে হইয়াছিল। তিনি হত হয়েন নাই বটে, কিন্তু যুদ্ধের অষ্টাদশ দিবস মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বহুসংখ্যক বাণ দ্বারা বিদ্ধ হইয়া ক্ষত-বিক্ষত হইতেন। অন্যান্য সারথিগণ আত্মরক্ষায় অক্ষম, তাহারা বৈশ্য, জাতিতে ক্ষত্রিয় নহে। কৃষ্ণ আত্মরক্ষায় অতিশয় সক্ষম, তথাচ কর্ত্তব্যানুরোধে বসিয়া মার খাইতেন।

মহাভারতের যুদ্ধে তিনি অস্ত্রধারণ করিবেন না, প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, ইহা বলিয়াছি। কিন্তু এক দিন তিনি অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন মাত্র, কিন্তু প্রয়োগ করেন নাই। সে ঘটনাটা এইরূপ;—

ভীষ্ম দুর্য্যোধনের সেনাপতিত্বে নিযুক্ত হইয়া যুদ্ধ করেন। তিনি যুদ্ধে এরূপ নিপুণ যে, পাণ্ডবসেনায়

* ধর্ম্মতত্ত্ব। † শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বাঙ্গালা টীকা।

মধ্যে অর্জ্জুন ভিন্ন আর কেহই তাঁহার সমকক্ষ ছিল না। কিন্তু অর্জ্জুন তাঁহার সঙ্গে ভাল করিয়া স্বশক্তি অনুসারে যুদ্ধ করেন না। তাহার কারণ এই যে, ভীষ্ম সম্বন্ধে অর্জ্জুনের পিতামহ এবং বাল্যকালে পিতৃহীন পাণ্ডবগণকে ভীষ্মই পিতৃবৎ প্রতিপালন করিয়াছিলেন। ভীষ্ম এখন দুর্য্যোধনের অনুরোধে নিরপরাধ পাণ্ডবদিগের শত্রু হইয়া তাহাদের অনিষ্টার্থ তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছেন বলিয়া, যদিও ভীষ্ম ধর্ম্মতঃ অর্জ্জুনের বধ্য, তথাপি অর্জ্জুন পূর্ব্বকথা স্মরণ করিয়া কোনমতেই ভীষ্মের বধসাধনে সম্মত নহেন। এ জন্য ভীষ্মের সঙ্গে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে মৃদুযুদ্ধ করেন; পাছে ভীষ্ম নিপতিত হন, এ জন্য সর্ব্বদা সঙ্কুচিত। তাহাতে ভীষ্ম অপ্রতিহত বীর্য্যে বহুসংখ্যক পাণ্ডবসেনা বিনষ্ট করিতেন। ইহা দেখিয়া এক দিবসে ভীষ্মকে বধ করিবার মানসে কৃষ্ণ স্বয়ং চক্র হস্তে অর্জ্জুনের রথ হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক ভীষ্মের প্রতি পদব্রজে ধাবমান হইলেন।

দেখিয়া, কৃষ্ণভক্ত ভীষ্ম পরমাহ্লাদিত হইয়া বলিলেন,—

"এহ্যেহি দেবেশ জগন্নিবাস।
নমোঽস্ত তে শার্ঙ্গগদাসিপাণে।
প্রসহ্য মাং পাতয় লোকনাথ।
রথোত্তমাৎ ভূতশরণ্য। সংখ্যে॥"

"এসো এসো দেবেশ জগন্নিবাস। হে শার্ঙ্গগদাখড়্গধারিন্? তোমাকে নমস্কার। হে লোকনাথ ভূতশরণ্য। যুদ্ধে আমাকে অবিলম্বে রথোত্তম হইতে পাতিত কর।"

অর্জ্জুনও কৃষ্ণের পশ্চাদনুসরণ করিয়া, কৃষ্ণকে অনুনয় করিয়া, স্বয়ং সাধ্যানুসারে যুদ্ধ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া, ফিরাইয়া আনিলেন।

এই ঘটনা দুইবার বর্ণিত হইয়াছে, একবার তৃতীয় দিবসের যুদ্ধে, আর একবার নবম দিবসের যুদ্ধে। শ্লোকগুলি একই, সুতরাং এক দিবসেরই ঘটনা লিপিকারের ভ্রমপ্রমাদ বা ইচ্ছাবশতঃ দুইবার লিখিত হইয়া থাকিবে। সংস্কৃত গ্রন্থে সচরাচর এরূপ ঘটিয়া থাকে।

রচনা দেখিয়া বিচার করিলে এই বিবরণকে মহাভারতের প্রথমস্তরভুক্ত বিবেচনা করা যাইতে পারে। কবিত্ব প্রথম শ্রেণীর। ভাব ও ভাষা উদার এবং জটিলতাশূন্য। প্রথমস্তরের যতটুকু মৌলিকতা স্বীকার করা যাইতে পারে, এই ঘটনারও ততটুকু মৌলিকতা স্বীকার করা যাইতে পারে।

এই ঘটনাটা লইয়া কৃষ্ণভক্তেরা, কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা সম্বন্ধে একটা তর্ক তুলিয়া থাকেন। কাশীদাস ও কথকেরা এই প্রতিজ্ঞাভঙ্গ অবলম্বন করিয়া কৃষ্ণের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, ভীষ্ম যুদ্ধারম্ভকালে কৃষ্ণের সাক্ষাৎ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তুমি যেমন প্রতিজ্ঞা করিয়াছ যে, এ যুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবে না, আমিও প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তোমাকে অস্ত্রধারণ করাইব।

অতএব একণে ভক্তবৎসল কৃষ্ণ আপনার প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘিত করিয়া ভক্তের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলেন।

এই সুবুদ্ধিরচনার কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। ভীষ্মের এবম্বিধ প্রতিজ্ঞাও মূল মহাভারতে দেখা যায় না। কৃষ্ণেরও কোন প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘিত হয় নাই। তাঁহার প্রতিজ্ঞার মর্ম্ম এই যে—যুদ্ধ করিব না। দুর্য্যোধন ও অর্জ্জুন উভয়ে তাঁহাকে এককালে বরণাভিলাষী হইলে, তিনি উভয়ের সঙ্গে তুল্য ব্যবহার করিবার জন্য বলিলেন, "আমার তুল্য বলশালী আমার নারায়ণী সেনা এক জন গ্রহণ কর; আর এক জন আমাকে লও।" "অযুধ্যমানঃ সংগ্রামে ন্যস্তশস্ত্রোঽহমেকতঃ" এই পর্য্যন্ত প্রতিজ্ঞা। সে প্রতিজ্ঞা রক্ষিত হইয়াছিল। কৃষ্ণ যুদ্ধ করেন নাই। ভীষ্ম সম্বন্ধীয় এই ঘটনাটির উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে, কেবল সাধ্যানুসারে যুদ্ধে পরাঙ্মুখ অর্জ্জুনকে যুদ্ধে উত্তেজিত করা। ইহা সারথিরা করিতেন। উদ্দেশ্য সফল হইয়াছিল।

যুদ্ধের নবম দিবসের রাত্রিতেও কৃষ্ণ ঐরূপ অভিপ্রায়ে কথা কহিয়াছিলেন। ভীষ্মকে অপরাজিত দেখিয়া যুধিষ্ঠির নবম রাত্রিতে বন্ধুবান্ধবগণকে ডাকিয়া ভীষ্মবধের পরামর্শ করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ বলিলেন, "আমাকে অনুমতি দাও, আমি ভীষ্মকে বধ করিতেছি। অথবা অর্জ্জুনের উপরই এ ভার থাক; অর্জ্জুনও ইহাতে সক্ষম।" যুধিষ্ঠির এ কথায় সম্মত হইলেন না। কৃষ্ণ যে ভীষ্মবধ ইচ্ছা করিলেই করিতে পারিতেন, তাহা তিনি স্বীকার করিলেন। কিন্তু বলিলেন, "আত্মগৌরবের নিমিত্ত তোমাকে মিথ্যাবাদী করিতে চাহি না। তুমি অযুধ্যমান থাকিয়াই সাহায্য কর।" যুধিষ্ঠির অর্জ্জুন সম্বন্ধে কিছুই বলিলেন না। পরে কৃষ্ণের সম্মতি লইয়া, এবং অন্য পাণ্ডবগণ ও কৃষ্ণকে সঙ্গে করিয়া ভীষ্মের কাছে তাঁহার বধোপায় জানিতে গেলেন।

ভীষ্ম নিজের বধোপায় বলিয়া দিলেন। বস্তুতঃ সেইরূপ কার্য্য হইল। কার্য্যতঃ তাহার কিছু হইল না। কৃষ্ণ যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিল—অর্জ্জুনই ভীষ্মকে শরশয্যাশায়িত ও রথ হইতে নিপাতিত করিলেন। মূল মহাভারতের উপর দ্বিতীয়

স্তরের কবি, কলম চালাইয়া একটা সঙ্গতিশূন্য নিষ্প্রয়োজন কিন্তু আপাতমনোহর শিখণ্ডি সম্বন্ধীয় গল্প খাড়া করিয়াছেন। কৃষ্ণচরিত্রের সঙ্গে তাহার কোন সম্পর্ক নাই, এজন্য আমরা তাহার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জয়দ্রথ বধ

ভীষ্মের পর দ্রোণাচার্য্য সেনাপতি। দ্রোণপর্ব্বে প্রথমে কৃষ্ণকে বিশেষ কোন কর্ম্ম করিতে দেখা যায় না। তিনি নিপুণ সারথির ন্যায় কেবল সারথ্যই করেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তিনি যে কর্ত্তা ও নেতা, এ কথাটা সত্য নহে। মধ্যে মধ্যে অর্জ্জুন ও যুধিষ্ঠিরকে সদুপদেশ দেওয়া ভিন্ন তিনি আর কিছুই করেন নাই। দ্রোণাভিষেক-পর্ব্বাধ্যায়ের একাদশ অধ্যায়ে সঞ্জয়কৃত কৃষ্ণের বলবীর্য্য ও মহিমাকীর্ত্তন জন্য এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা পাওয়া যায়। তাহাতে কোন প্রয়োজন নাই। এই অধ্যায়টি প্রক্ষিপ্ত বলিয়াই বোধ হয়, এবং কৃষ্ণের বলবীর্য্য ও মহিমা কীর্ত্তনের মহাভারতে বা অন্যত্র কিছুই অভাব নাই। আমরা তাঁহার মানবচরিত্র সমালোচনা করিতে ইচ্ছুক; মানবচরিত্র কার্য্যে প্রকাশ; অতএব আমরা কেবল কৃষ্ণকৃত কার্য্যেরই অনুসন্ধান করিব।

দ্রোণ পর্ব্বে প্রথম ভগদত্তবধে কৃষ্ণের কোন কার্য্য দেখিতে পাই। ভগদত্ত মহাবীর; পাণ্ডবপক্ষীয় আর কেহ তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পারিল না; শেষ অর্জ্জুন আসিয়া তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ভগদত্ত অর্জ্জুনের সঙ্গে যুদ্ধে আপনাকে অশক্ত দেখিয়া, তাঁহার প্রতি বৈষ্ণবাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। অর্জ্জুন বা অপর কেহই অস্ত্রনিবারণে সমর্থ নহেন; অতএব কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে আচ্ছাদিত করিয়া আপনি বক্ষে ঐ অস্ত্র গ্রহণ করিলেন। তাঁহার বক্ষে অস্ত্র বৈজয়ন্তী মালা হইয়া বিলম্বিত হইল।

এই অস্ত্র একটা অনৈসর্গিক, অবোধগম্য ব্যাপার। যাহা অনৈসর্গিক, তাহাতে আমরা পাঠককে বিশ্বাস করিতে বলি না; এবং অনৈসর্গিকের উপর কোন সত্যও সংস্থাপিত হয় না। অতএব এ গল্পটা আমাদের পরিত্যাজ্য।

দ্রোণপর্ব্বে, অভিমন্যুবধের পরে কৃষ্ণকে প্রকৃতপক্ষে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ দেখিতে পাই। যেদিন সপ্তরথী বেড়িয়া অন্যায় পূর্ব্বক অভিমন্যুকে বধ করে, সেদিন কৃষ্ণার্জ্জুন সে রণক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন না। তাঁহারা কৃষ্ণের নারায়ণী সেনার সঙ্গে যুদ্ধে নিযুক্ত ছিলেন—ঐ সেনা কৃষ্ণ দুর্য্যোধনকে দিয়াছিলেন। একপক্ষে তিনি নিজে, অন্য পক্ষে তাঁহার সেনা—এইরূপে তিনি উভয় পক্ষের সঙ্গে সাম্য রক্ষা করিয়াছিলেন।

যুদ্ধান্তে ও দিবসান্তে শিবিরে ফিরিয়া আসিয়া কৃষ্ণার্জ্জুন অভিমন্যুবধ বৃত্তান্ত শুনিলেন। অর্জ্জুন অতিশয় শোককাতর হইলেন। * যোগেশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং শোকমোহের অতীত। তাঁহার প্রথম কার্য্য অর্জ্জুনকে সান্ত্বনা করা। তিনি যে সকল কথা বলিয়া অর্জ্জুনকে প্রবোধ দিলেন, তাহা তাঁহারই উপযুক্ত। গীতায় তিনি যে ধর্ম্ম প্রচারিত করিয়াছেন, সেই ধর্ম্মানুমোদিত মহাবাক্য দ্বারা অর্জ্জুনের শোকাপনয়ন করিলেন। ঋষিরা যুধিষ্ঠিরকে প্রবোধ দিতেছিলেন, এই বলিয়া যে, সকলেই মরিয়াছে ও সকলেই মরিয়া থাকে। তিনি তাহা বলিলেন না। তিনি বুঝাইলেন, "যুদ্ধোপজীবী ক্ষত্রিয়গণের এই পথ। যুদ্ধমৃত্যুই ক্ষত্রিয়গণের সনাতন ধর্ম্ম।"

কৃষ্ণ অভিমন্যুজননী সুভদ্রাকেও ঐ কথা বলিয়া প্রবোধ দিলেন। বলিলেন,—

"সৎকুলজাত ধৈর্য্যশালী ক্ষত্রিয়ের যেরূপে প্রাণ পরিত্যাগ করা উচিত, তোমার পুত্র সেইরূপে প্রাণত্যাগ করিয়াছে; অতএব শোক করিবার আবশ্যকতা নাই। মহারথ, বীর, পিতৃতুল্য-পরাক্রমশালী অভিমন্যু ভাগ্যক্রমেই বীরগণের অভিলষিত গতি প্রাপ্ত হইয়াছে। মহাবীর অভিমন্যু ভূরি শত্রু সংহার করিয়া পুণ্যজনিত সর্ব্বকামপ্রদ অক্ষয়লোকে গমন করিয়াছে। সাধুগণ তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, শাস্ত্র ও প্রজ্ঞা দ্বারা যেরূপ গতি অভিলাষ করেন, তোমার কুমারের সেইরূপ গতি লাভ হইয়াছে। হে সুভদ্রে! তুমি বীরজননী, বীরপত্নী, বীরনন্দিনী ও বীরবান্ধবা; অতএব তনয়ের নিমিত্ত তোমার শোকাকুল হওয়া উচিত নহে।"

এ সকলে মাতার শোকনিবারণ হয় না জানি। কিন্তু এ হতভাগ্য দেশে এরূপ কথাগুলা শুনি ও শোনাই, ইহা ইচ্ছা করে।

এ দিকে পুত্রশোকার্ত্ত অর্জ্জুন অতিশয় রোষপরবশ হইয়া এক নিদারুণ প্রতিজ্ঞায় আপনাকে আবদ্ধ করিলেন। তিনি যাহা শুনিলেন, তাহাতে বুঝিলেন যে, অভিমন্যুর মৃত্যুর প্রধান কারণ জয়দ্রথ। তিনি অতি কঠিন শপথ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, পরদিন সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে জয়দ্রথকে বধ করিবেন; না পারেন, আপনি অগ্নিপ্রবেশ পূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিবেন।

---

* এমনও পাঠক থাকিতে পারেন যে, তাঁহাকে বলিয়া দিতে হয় যে, অভিমন্যু অর্জ্জুনের পুত্র ও কৃষ্ণের ভাগিনেয়।

এই প্রতিজ্ঞায় উভয় শিবিরে বড় হুলস্থুল পড়িয়া গেল। পাণ্ডবসৈন্য অতিশয় কোলাহল করিতে লাগিল, এবং বাদিত্রবাদকগণ ভারি বাজনা বাজাইতে লাগিল। কৌরবেরা চমকিত হইয়া অনুসন্ধান দ্বারা প্রতিজ্ঞা জানিতে পারিয়া জয়দ্রথরক্ষার্থে মন্ত্রণা করিতে লাগিল।

কৃষ্ণ দেখিলেন, একটা বিষম ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছে। অর্জ্জুন বিবেচনা না করিয়া যে কঠিন প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছেন, তাহাতে উত্তীর্ণ হওয়া সুসাধ্য নহে। জয়দ্রথ নিজে মহারথী, সিন্ধুসৌবীর দেশের অধিপতি, বহুসেনার নায়ক, এবং দুর্য্যোধনের ভগিনীপতি। কৌরবপক্ষীয় অপরাজেয় যোদ্ধৃগণ তাঁহাকে সাধ্যানুসারে রক্ষা করিবেন। এ দিকে পাণ্ডবপক্ষের প্রধান পুরুষেরা সকলেই অভিমন্যুশোকে বিহ্বল—মন্ত্রণায় বিমুখ। অতএব কৃষ্ণ নিজেই নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি কৌরব-শিবিরে গুপ্তচর পাঠাইলেন। চর আসিয়া সেখানকার বৃত্তান্ত সব বলিল। কৌরবেরা প্রতিজ্ঞার কথা সব জানিয়াছে; দ্রোণাচার্য্য ব্যূহরচনা করিবেন; তৎপশ্চাৎ কর্ণাদি সমস্ত কৌরবপক্ষীয় বীরগণ একত্র হইয়া জয়দ্রথকে রক্ষা করিবেন। এই দুর্ভেদ্য ব্যূহ ভেদ করিয়া, সকল বীরগণকে একত্র পরাজিত করিয়া, মহাবীর জয়দ্রথকে নিহত করা অর্জ্জুনেরও অসাধ্য হইতে পারে। অসাধ্য হয়, তবে অর্জ্জুনের আত্মহত্যা নিশ্চিত।

অতএব কৃষ্ণ আপনার অনুষ্ঠেয় চিন্তা করিয়া তাহার ব্যবস্থা করিলেন। আপনার সারথি দারুককে ডাকিয়া কৃষ্ণের নিজের রথ, উত্তম অশ্বে যোজিত করিয়া, অস্ত্র-শস্ত্রে পরিপূর্ণ করিয়া প্রভাতে প্রস্তুত রাখিতে আজ্ঞা করিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় যে, যদি অর্জ্জুন এক দিনে ব্যূহ পার হইয়া সকল বীরগণকে পরাজয় করিতে না পারেন, তবে তিনি নিজেই যুদ্ধ করিয়া কৌরবনেতৃগণকে বধ করিয়া জয়দ্রথবধের পথ পরিষ্কার করিয়া দিবেন।

কৃষ্ণকে যুদ্ধ করিতে হয় নাই, অর্জ্জুন স্বীয় বাহুবলেই কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। কিন্তু যদি কৃষ্ণকে যুদ্ধ করিতে হইত, তাহা হইলেও "অযুধ্যমানঃ সংগ্রামে ন্যস্তশস্ত্রোঽহমেকতঃ" ইতি সত্য হইতে বিচ্যুতি ঘটিত না। কারণ, যে যুদ্ধ সম্বন্ধে এ প্রতিজ্ঞা ঘটিয়াছিল, সে যুদ্ধ এ নহে। কুরুপাণ্ডবের রাজ্য লইয়া যে যুদ্ধ, এ সে নহে। আজিকার এ অর্জ্জুনপ্রতিজ্ঞা-জনিত যুদ্ধ। এ যুদ্ধের উদ্দেশ্য ভিন্ন; এক দিকে জয়দ্রথের জীবন, অন্য দিকে অর্জ্জুনের জীবন লইয়া যুদ্ধ। যুদ্ধে অর্জ্জুনের পরাভব হইলে, তাঁহাকে অগ্নিপ্রবেশ করিয়া আত্মহত্যা করিতে হইবে। এ যুদ্ধ পূর্ব্বে উপস্থিত হয় নাই—সুতরাং "অযুধ্যমানঃ সংগ্রামে" ইতি প্রতিজ্ঞা ইহার পক্ষে বর্ত্তে না। অর্জ্জুন কৃষ্ণের সখা, শিষ্য এবং ভগিনীপতি; তাঁহার আত্মহত্যানিবারণ কৃষ্ণের অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম।

ইহার পর কৃষ্ণ ও অপর সকলে নিদ্রা গেলেন। এইখানে একটা আষাঢ়ে রকম স্বপ্নের গল্প আছে। স্বপ্নে আবার কৃষ্ণ অর্জ্জুনের কাছে আসিলেন, উভয়ে সেই রাত্রিতে হিমালয় গেলেন, মহাদেবের উপাসনা করিলেন, পাশুপত অস্ত্র পূর্ব্বেই (বনবাসকালে) অর্জ্জুন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু আবার চাহিলেন, ও পাইলেন। ইত্যাদি ইত্যাদি। এ সকল, সমালোচনার নিতান্ত অযোগ্য।

পরদিন সূর্য্যাস্তের প্রাক্কালে অর্জ্জুন জয়দ্রথকে নিহত করিলেন। তজ্জন্য কৃষ্ণের কোন সাহায্য প্রয়োজন হয় নাই। তথাপি কথিত হইয়াছে, কৃষ্ণ অপরাহ্নে যোগমায়া দ্বারা সূর্য্যকে আচ্ছন্ন করিলেন; জয়দ্রথ নিহত হইলে পরে সূর্য্যকে পুনঃ-প্রকাশিত করিলেন। কেন? সূর্য্যাস্ত হইয়াছে ভ্রমে, জয়দ্রথ অর্জ্জুনের সম্মুখে আসিবেন, এইরূপ ভ্রান্তির সৃষ্টির জন্য? এইরূপ ভ্রান্তিতে পড়িয়া জয়দ্রথ এবং তাঁহার রক্ষকগণ উল্লসিত এবং অনবহিত হইবেন, ইহাই কি অভিপ্রেত? এইখানে কাব্যের এক স্তরের উপর আর এক স্তর নিহিত হইয়াছে স্পষ্ট দেখা যায়। এক দিকে দেখা যায় যে, এরূপ ভ্রান্তিজননের কোন প্রয়োজন ছিল না। যোগমায়াবিকাশের পূর্ব্বেও অর্জ্জুন জয়দ্রথকে দেখিতে পাইতেছিলেন, এবং তিনি জয়দ্রথকে প্রহার করিতেছিলেন, জয়দ্রথও তাঁহাকে প্রহার করিতেছিল। সূর্য্যাবরণের পরেও ঠিক তাহাই হইতে লাগিল। সূর্য্যাবরণের পূর্ব্বেও অর্জ্জুনকে যেরূপ করিতে হইতেছিল, এখনও ঠিক সেইরূপ হইতে লাগিল। সমস্ত কৌরববীরগণকে পরাভূত না করিয়া, অর্জ্জুন জয়দ্রথকে নিহত করিতে পারিলেন না। আর এক দিকে এই সকল উক্তির বিরোধী, সূর্য্যাবরণকারিণী যোগমায়ার বিকাশ। এ ভ্রান্তিসৃষ্টির প্রয়োজন, পরপরিচ্ছেদে বুঝাইতেছি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় স্তরের কবি

আমরা এতদূর পর্য্যন্ত সোজাপথে, সুবিধামত চলিয়া আসিতেছিলাম। কিন্তু এখন হইতে ঘোরতর গোলযোগ। মহাভারত সমুদ্রবিশেষ, কিন্তু এতক্ষণ আমরা, তাহার স্থির বারিরাশিমধ্যে মধুর মৃদুগম্ভীর শব্দ

ভাসিতে ভাসিতে সুখে সৌযাত্রা করিতেছিলাম। এক্ষণে সহসা আমরা ঘোরবাত্যায় পড়িয়া তরঙ্গাভিঘাতে পুনঃ পুনঃ উৎক্ষিপ্ত নিক্ষিপ্ত হইব। কেন না, এখন আমরা বিশেষ প্রকারে মহাভারতের দ্বিতীয় স্তরের কবির হাতে পড়িলাম। তাঁহার হস্তে কৃষ্ণচরিত্র সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। যাহা উদার ছিল, তাহা এক্ষণে ক্ষুদ্র ও সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িতেছে; যাহা সরল, তাহা এক্ষণে কৌশলময়; যাহা সত্যময় ছিল, তাহা এক্ষণে অসত্য ও প্রবঞ্চনার আকর; যাহা ন্যায় ও ধর্ম্মের অনুমোদিত ছিল, তাহা এক্ষণে অন্যায় ও অধর্ম্মে কলুষিত। দ্বিতীয় স্তরের কবির হাতে কৃষ্ণচরিত্র এইরূপ বিকার প্রাপ্ত হইয়াছে।

কিন্তু কেন ইহা হইল? দ্বিতীয় স্তরের কবি নিতান্ত ক্ষুদ্র কবি নহেন, তাঁহার সৃষ্টিকৌশল জাজ্বল্যমান। তিনি ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞানশূন্য নহেন। তবে তিনি কৃষ্ণের এরূপ দশা ঘটাইয়াছেন কেন? তাহার অতি নিগূঢ় তাৎপর্য্য দেখা যায়।

প্রথমতঃ, আমরা পুনঃপুনঃ দেখিয়াছি ও দেখিব যে, কৃষ্ণ প্রথম স্তরের কবির হাতে ঈশ্বরাবতার বলিয়া পরিস্ফুট নহেন। তিনি নিজে ত সে কথা মুখেও আনেন না; পুনঃপুনঃ আপনার মানবী প্রকৃতিই প্রবাদিত ও পরিচিত করেন; এবং মানুষী শক্তি অবলম্বন করিয়া কার্য্য করেন। কবিও প্রায় সেই ভাবেই তাঁহাকে স্থাপিত করিয়াছেন। প্রথম স্তরে এমন সন্দেহও হয় যে, যখন ইহা প্রণীত হইয়াছিল, তখন হয় ত কৃষ্ণ ঈশ্বরাবতার বলিয়া সর্ব্বজনস্বীকৃত নহেন। তাঁহার নিজের মনেও সে ভাব সকল সময়ে বিরাজমান নহে। স্থূল কথা, মহাভারতের প্রথম স্তর কতকগুলি প্রাচীন কিংবদন্তীর সংগ্রহমাত্র এবং কাব্যালঙ্কারে কবি কর্ত্তৃক রঞ্জিত; এক আখ্যায়িকার সূত্রে যথাযথ সন্নিবেশপ্রাপ্ত। কিন্তু যখন দ্বিতীয় স্তর মহাভারতে প্রবিষ্ট হইল, তখন বোধ হয়, শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব সর্ব্বত্র স্বীকৃত। অতএব দ্বিতীয় স্তরের কবি তাঁহাকে ঈশ্বরাবতার স্বরূপই স্থিত ও নিযুক্ত করিয়াছেন। তাঁহার রচনায় কৃষ্ণও অনেকবার আপনার ঈশ্বরত্বের পরিচয় দিয়া থাকেন, এবং ঐশী শক্তি দ্বারা কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। কিন্তু ঈশ্বর পুণ্যময়, কবি তাহাও জানেন। তবে, একটা তত্ত্ব পরিস্ফুট করিবার জন্য তাঁহাকে বড় ব্যস্ত দেখি। ইউরোপীয়েরাও সেই তত্ত্ব লইয়া বড় ব্যস্ত। তাঁহারা বলেন, ভগবান্ দয়াময়, করুণাক্রমেই জীবসৃষ্টি করিয়াছেন; জীবের মঙ্গলই তাঁহার কামনা। তবে পৃথিবীতে দুঃখ কেন? তিনি পুণ্যময়, পুণ্যই তাঁহার অভিপ্রেত, তবে আবার পৃথিবীতে পাপ আসিল কোথা হইতে? খ্রীষ্টানের পক্ষে এ তত্ত্বের মীমাংসা বড় কষ্টকর, কিন্তু হিন্দুর পক্ষে তাহা সহজ। হিন্দুর মতে ঈশ্বরই জগৎ। তিনি নিজে সুখদুঃখ পাপপুণ্যের অতীত। আমরা যাহাকে সুখদুঃখ বলি, তাহা তাঁহার কাছে সুখদুঃখ নহে, আমরা যাহাকে পাপপুণ্য বলি, তাহা তাঁহার কাছে পাপপুণ্য নহে। তিনি লীলার জন্য এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। জগৎ তাঁহা হইতে ভিন্ন নহে—তাঁহারই অংশ। তিনি আপনার সত্তাকে অবিদ্যায় আবৃত করাতেই উহা সুখদুঃখ পাপপুণ্যের আধার হইয়াছে। অতএব সুখদুঃখ ও পাপপুণ্য তাঁহারই মায়াজনিত। তাঁহা হইতেই সুখদুঃখ ও পাপপুণ্য। দুঃখ যে পাও, তাঁহার মায়া, পাপ যে করি, তাঁহার মায়া। বিষ্ণুপুরাণে কবি কৃষ্ণপীড়িত কালিয় সর্পের মুখে এই কথা দিয়াছেন,—

"যথাহং ভবতা সৃষ্টো জাত্যা রূপেণ চেশ্বর।
স্বভাবেন চ সংযুক্তস্তথেদং চেষ্টিতং মম।"

অর্থাৎ "তুমি আমাকে সর্পজাতীয় করিয়াছ, তাই আমি হিংসা করি।" প্রহ্লাদ বিষ্ণুর স্তব করিবার সময় বলিতেছেন—

"বিদ্যাবিদ্যে ভবান্ সত্যমসত্যং ত্বং বিষামৃতে।"*

"তুমি বিদ্যা, তুমিই অবিদ্যা, তুমি সত্য, তুমিই অসত্য, তুমি বিষ, তুমিই অমৃত।" তিনি ভিন্ন জগতে কিছু নাই। ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, জ্ঞান, অজ্ঞান, সত্য, অসত্য, ন্যায়, অন্যায়, সুবুদ্ধি, দুর্ব্বুদ্ধি সব তাঁহা হইতে।

তিনি গীতায় স্বয়ং বলিতেছেন,—

"যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি।" ৭।১২

"যাহা সাত্ত্বিকভাব, রাজস বা তামস, সকলই আমা হইতে জানিবে। আমি তাহার বশ নহি, সে সকল আমার অধীন।" শান্তিপর্ব্বে ভীষ্ম যেখানে কৃষ্ণকে "সত্যাত্মনে নমঃ" "ধর্ম্মাত্মনে নমঃ" বলিয়া স্তব করিতেছেন, সেইখানেই "কামাত্মনে নমঃ" "ঘোরাত্মনে নমঃ" "ক্রৌর্য্যাত্মনে নমঃ" "দৃপ্তাত্মনে নমঃ" ইত্যাদি শব্দে নমস্কার করিতেছেন, এবং উপসংহারে বলিতেছেন, "সর্ব্বাত্মনে নমঃ।" প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র হইতে এরূপ বাক্য উদ্ধৃত করিয়া বহু শত পৃষ্ঠা পূরণ করা যাইতে পারে।

যদি তাই, তবে মানুষকে একটা গুরুতর কথা বুঝাইতে পারি। দুঃখ জগদীশ্বরপ্রেরিত, তিনি ভিন্ন ইহার অন্য কারণ নাই। যে পাপিষ্ঠ এ জন্য নিন্দিত এবং দণ্ডনীয়, তাহার সম্বন্ধে লোককে বুঝাইতে পারি,

* বিষ্ণুপুরাণ। ১ম অংশ, ১৯ অধ্যায়।

ইহার পাপবুদ্ধি জগদীশ্বর-প্রবর্ত্তিত, ইহার বিচারের তিনি কর্ত্তা, তোমরা কে ?

এই তত্ত্বের অবতারণায় দ্বিতীয় শ্রেণীর কবি, ভিতরে ভিতরে প্রবৃত্ত। শ্রেষ্ঠ কবিগণ, কখনই আধুনিক লেখকদিগের মত ভূমিকা করিয়া, ভূমিকায় সকল কথা বলিয়া দিয়া, কাব্যের অবতারণা করেন না। যত্নপূর্ব্বক তাঁহাদিগের মর্ম্মার্থ গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিতে হয়। সেক্ষপীয়রের এক একখানি নাটকের মর্ম্মার্থ গ্রহণ করিবার জন্য কত সহস্র কৃতবিদ্য প্রতিভাশালী ব্যক্তি কত ভাবিলেন, কত লিখিলেন, আমরা তাহা বুঝিবার জন্য কত মাথা ঘামাইলাম ; কিন্তু আমাদের এই অপূর্ব্ব মহাভারত গ্রন্থের একটা অধ্যায়ের প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করিবার জন্য আমরা কখনও এক দণ্ডের জন্য কোন চেষ্টা করিলাম না। যেমন হরিসংকীর্ত্তনকালে এক দিকে বৈষ্ণবেরা, খোলে ঘা পড়িতেই কাঁদিয়া পড়িয়া মাটিতে গড়াগড়ি দেন, আর এক দিকে নবশিক্ষিতেরা "Nuisance !" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে পশ্চাদ্ধাবিত হয়েন, তেমনই প্রাচীন হিন্দুগ্রন্থের নাম মাত্রে এক দল মাটিতে পড়িয়া গড়াগড়ি দেন—মকল কাবল ভূসি শুনিয়া ভক্তিরসে দেশ আপ্লুত করেন, আর এক দল সকলই মিথ্যা, উপধর্ম্ম, অশ্রাব্য, পরিহার্য্য, উপহাসাস্পদ বিবেচনা করেন। বুঝিবার চেষ্টা কাহারও নাই। শব্দার্থবোধ হইলেই তাঁহারা যথেষ্ট বুঝিলেন মনে করেন। দুঃখের উপর দুঃখ এই, কেহ বুঝাইলেও বুঝিতে ইচ্ছা করেন না।

ঈশ্বরই সব—ঈশ্বর হইতেই সমস্ত। তাঁহা হইতে জ্ঞান, তাঁহা হইতে জ্ঞানের অভাব বা ভ্রান্তি। তাঁহা হইতে বুদ্ধি, তাঁহা হইতে দুর্ব্বুদ্ধি, তাঁহা হইতে সত্য, আবার তাঁহা হইতে অসত্য। তাঁহা হইতে ন্যায়, এবং তাঁহা হইতে অন্যায়। মনুষ্যজীবনের প্রধান উপাদান এই জ্ঞান ও বুদ্ধি, সত্য ও ন্যায়, এবং তদভাবে ভ্রান্তি, দুর্ব্বুদ্ধি, অসত্য বা অন্যায় সবই ঈশ্বরপ্রেরিত। কিন্তু জ্ঞান, বুদ্ধি, সত্য এবং ন্যায় তাঁহা হইতে, ইহা বুঝাইবার প্রয়োজন নাই; হিন্দুর কাছে তাহা স্বতঃসিদ্ধ। তবে ভ্রান্তি, দুর্ব্বুদ্ধি প্রভৃতিও যে তাঁহা হইতে, তাহা মনুষ্যের হৃদয়ঙ্গম করিবার প্রয়োজন আছে। অন্ততঃ মহাভারতের দ্বিতীয় স্তরের কবি, এমন বিবেচনা করেন। আধুনিক জ্যোতির্ব্বিদেরা বলিয়া থাকেন, আমরা চন্দ্রের একপিঠই চিরকাল দেখি, অপর পৃষ্ঠ কখনও দেখিতে পাই না। এই কবি সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব জগৎরহস্যের অপরপৃষ্ঠ আমাদিগকে দেখাইতে চাহেন। তিনি জয়দ্রথবধে দেখাইতেছেন, ভ্রান্তি ঈশ্বরপ্রেরিত ; ঘটোৎকচবধে দেখাইবেন, দুর্ব্বুদ্ধিও তাঁহার প্রেরিত ; দ্রোণবধে দেখাইবেন, অসত্যও ঈশ্বর হইতে ; দুর্য্যোধনবধে দেখাইবেন, অন্যায়ও তাঁহা হইতে। আরও একটা কথা বাকি আছে। জ্ঞানবল, বুদ্ধিবল, সত্যবল, ন্যায়বল—বাহুবলের কাছে কেহ নহে। বিশেষতঃ রাজনীতিতে বাহুবলের প্রাধান্য। মহাভারত বিশিষ্ট প্রকারে রাজনৈতিক কাব্য অর্থাৎ ঐতিহাসিক কাব্য ; ইতিহাসের উপর নির্ম্মিত কাব্য। অতএব এ কাব্যে বাহুবলের স্থান, জ্ঞান-বুদ্ধ্যাদির উপরে। দ্বিতীয় স্তরের কবি দেখিতে পান যে, কেবল জ্ঞান, ভ্রান্তি, বুদ্ধি, দুর্ব্বুদ্ধি, সত্যাসত্য এবং ন্যায়ান্যায় ঐশিক নিয়োগাধীন, ইহা বলিলেই রাজনৈতিক তত্ত্বটা সম্পূর্ণ হইল না, বাহুবল ও বাহুবলের অভাবও তাই। তিনি ইহা স্পষ্টীকৃত করিবার জন্য মৌসলপর্ব্ব প্রণীত করিয়াছেন। তথায় কৃষ্ণের অভাবে স্বয়ং অর্জ্জুন লগুড়ধারী কৃষকগণের নিকট পরাভূত হইলেন।

আমি যাহাকে ঐশিক নিয়োগ বলিতেছি, অথবা দ্বিতীয় স্তরের কবি যাহা ঈশ্বরপ্রেরণা বলিয়া বুঝেন, ইউরোপীয়েরা তাহার স্থানে "Law" সংস্থাপিত করিয়াছেন। এই মহাভারতীয় কবিগণের বুদ্ধিতে "Law" কোন স্থান পাইয়াছিল কি না, আমি বলিতে পারি না। তবে ইহা বলিতে পারি, যাহা 'ল'-র উপরে, যাহা হইতে "Law", তাহা তাঁহারা ভালরূপে বুঝাইয়াছিলেন। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন, সকলই ঈশ্বরেচ্ছা। কৃষ্ণকে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতারিত করিয়া, এই কবি সেই ঈশ্বরেচ্ছা বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ঘটোৎকচবধ

জয়দ্রথবধে আর একটা কৃষ্ণ সম্বন্ধে অনৈসর্গিক কথা আছে। অর্জ্জুন জয়দ্রথের শিরশ্ছেদে উদ্যত হইলে, কৃষ্ণ বলিলেন, একটা উপদেশ দিই, শুন। ইহার পিতা পুত্রের জন্য তপস্যা করিয়া এই বর পাইয়াছে যে, যে জয়দ্রথের মাথা মাটিতে ফেলিবে, তাহারও মস্তক বিদীর্ণ হইয়া খণ্ড খণ্ড হইবে। অতএব তুমি উহার মাথা মাটিতে ফেলিও না। উহার মস্তক বাণে বাণে সঞ্চালিত করিয়া, যেখানে উহার পিতা সন্ধ্যা-বন্দনাদি করিতেছে, সেইখানে লইয়া গিয়া তাহার ক্রোড়ে নিক্ষিপ্ত কর। অর্জ্জুন তাহাই করিলেন। বুড়া সন্ধ্যা করিয়া উঠিবার সময় ছিন্ন মস্তক তাঁহার কোল হইতে মাটিতে পড়িয়া গেল। অমনি বুড়ার মাথা ফাটিয়া খণ্ড খণ্ড হইল।

অনৈসর্গিক বলিয়া কথাটা আমরা পরিত্যাগ করিতে পারি। তৎপরে ঘটোৎকচবধঘটিত বীভৎস কাণ্ড বর্ণিত করিতে আমি বাধ্য।

হিড়িম্ব নামে এক রাক্ষস ছিল, হিড়িম্বা নামে রাক্ষসী তাহার ভগিনী। ভীম কদাচিৎ রাক্ষসটাকে মারিয়া, রাক্ষসীটাকে বিবাহ করিলেন। বরকন্তা যে পরস্পরের অনুপযোগী, এমন কথা বলা যায় না। তার পর সেই রাক্ষসীর গর্ভে ভীমের এক পুত্র জন্মিল। তাহার নাম ঘটোৎকচ। সেটাও রাক্ষস। সে বড় বলবান্। এই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পিতৃপিতৃব্যের সাহায্যার্থ দল বল লইয়া আসিয়া যুদ্ধ করিতেছিল। আমি তাহার কিছু বুদ্ধিবিপর্য্যয় দেখিতে পাই—সে প্রতিযোদ্ধগণকে ভোজন না করিয়া তাহাদিগের সঙ্গে বাণাদি দ্বারা মানুষযুদ্ধ করিতেছিল। তাহার দুর্ভাগ্য বশতঃ দুর্য্যোধনের সেনার মধ্যে একটা রাক্ষসও ছিল। দুইটা রাক্ষসে খুব যুদ্ধ করে।

এখন, এই দিন, একটা ভয়ঙ্কর কাণ্ড উপস্থিত হইল। অন্ত দিন কেবল দিনেই যুদ্ধ হয়, আজ রাত্রিতেও আলো জ্বালিয়া যুদ্ধ। রাত্রিতে নিশাচরের বল বাড়ে; অতএব ঘটোৎকচ দুর্নিবার্য্য হইল। কৌরববীর কেহই তাহার সম্মুখীন হইতে পারিল না। কৌরবদিগের রাক্ষসটাও মারা গেল। কেবল কর্ণই একাকী ঘটোৎকচের সমকক্ষ হইয়া, রাক্ষসের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। শেষ কর্ণও আর সামলাইতে পারেন নাই। তাঁহার নিকট ইন্দ্রদত্তা এক-পুরুষঘাতিনী এক শক্তি ছিল। এই শক্তি সম্বন্ধে অদ্ভুতের অপেক্ষাও অদ্ভুত এক গল্প আছে—পাঠককে তৎপঠনে পীড়িত করিতে আমি অনিচ্ছুক। ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এই শক্তি কেহ কোন মতেই ব্যর্থ করিতে পারে না, এক জনের প্রতি প্রযুক্ত হইলে সে মরিবে, কিন্তু শক্তি আর ফিরিবে না; তাই একপুরুষঘাতিনী। কর্ণ এই অমোঘ শক্তি অর্জ্জুনবধার্থ তুলিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু আজ ঘটোৎকচের যুদ্ধে বিপন্ন হইয়া তাহারই প্রতি শক্তি প্রযুক্ত করিলেন। ঘটোৎকচ মরিল। মৃত্যুকালে বিন্ধ্যাচলের একপাদপরিমিত শরীর ধারণ করিল, এবং তাহার চাপে এক অক্ষৌহিণী সেনা মরিল।

এ সকল অপরাধে প্রাচীন হিন্দু কবিকে মার্জ্জনা করা যায়, কেন না বালক ও অশিক্ষিত স্ত্রীলোকের পক্ষে এ রকম গল্প বড় মনোহর। কিন্তু তিনি তার পর যাহা রচনা করিয়াছেন, তাহা বোধ হয় কেবল তাঁহার নিজেরই মনোহর। তিনি বলেন, ঘটোৎকচ মরিলে পাণ্ডবেরা শোককাতর হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন, কিন্তু কৃষ্ণ রথের উপর নাচিতে আরম্ভ করিলেন! তিনি আর গোপবালক নহেন, পৌত্র হইয়াছে; এবং হঠাৎ বায়ুরোগাক্রান্ত হওয়ার কথাও গ্রন্থকার বলেন না। কিন্তু তবু রথের উপর নাচ! কেবল নাচ নহে, সিংহনাদ ও বাহুর আস্ফোটন! অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি? এত নাচ কাচ কেন?" কৃষ্ণ বলিলেন, "কর্ণের নিকটে যে অমোঘ শক্তি ছিল, যা তোমার বধের জন্ত তুলিয়া রাখিয়াছিল, তাহা ঘটোৎকচের জন্ত পরিত্যক্ত হইয়াছে। একণে তোমার আর ভয় নাই; তুমি একণে কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পারিবে।" জয়দ্রথবধ উপলক্ষে দেখিয়াছি, কর্ণের সঙ্গে অর্জ্জুনের পুনঃপুনঃ যুদ্ধ হইয়াছে, এবং কর্ণ পরাভূত হইয়াছেন। তখন সেই ঐন্দ্রী শক্তির কোন কথাই কাহারও মনে হয় নাই; কবিরও নহে। কিন্তু তখন মনে করিলে জয়দ্রথবধ হয় না; কর্ণ জয়দ্রথের রক্ষক। সুতরাং তখন চুপে চাপে গেল। যাক—এই শক্তিঘটিত বৃত্তান্তটা অনৈসর্গিক, সুতরাং তাহা আমাদের আলোচনার অযোগ্য। যে কথাটা বলিবার জন্ত ঘটোৎকচবধের কথা তুলিলাম, তাহা এই। কৃষ্ণ অর্জ্জুনের প্রশ্নের উত্তর দিয়া বলিতেছেন,—

"যাহা হউক, হে ধনঞ্জয়! আমি তোমার হিতার্থ বিবিধ উপায় উদ্ভাবন পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে মহাবলপরাক্রান্ত জরাসন্ধ, শিশুপাল, নিষাদ একলব্য, হিড়িম্ব, কির্ম্মীর, বক, অলায়ুধ, উগ্রকর্ম্মা ঘটোৎকচ প্রভৃতি রাক্ষসের বধসাধন করিয়াছি।"

কথাটা সত্য নহে। কৃষ্ণ শিশুপালকে বধ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে অর্জ্জুনের হিতার্থ নহে, শিশুপাল তাঁহাকে সভামধ্যে অপমানিত ও যুদ্ধে আহূত করিয়াছিল, এই জন্ত, বা যজ্ঞের রক্ষার্থ। জরাসন্ধবধেরও কৃষ্ণ কর্ত্তা না হউন, প্রবর্ত্তক; কিন্তু সে অর্জ্জুনহিতার্থ নহে, কারারুদ্ধ রাজগণের মুক্তি জন্ত। কিন্তু বক, হিড়িম্ব, কির্ম্মীর প্রভৃতি রাক্ষসদিগের বধের এবং একলব্যের অঙ্গুষ্ঠচ্ছেদের সঙ্গে কৃষ্ণের কিছুমাত্র সম্বন্ধ ছিল না। তিনি তাহার কিছুই জানিতেন না, এবং ঘটনাকালে উপস্থিতও ছিলেন না। মহাভারতে এক স্থানে পাই বটে, কৃষ্ণ একলব্যকে বধ করিয়াছিলেন, কিন্তু ঐ অঙ্গুষ্ঠচ্ছেদের কথা তাহার বিরোধী। ঘটনাগুলি, অর্থাৎ একলব্যের অঙ্গুষ্ঠচ্ছেদ এবং রাক্ষসগণের বধ, প্রকৃত ঘটনাও নহে।

তবে, এ মিথ্যা বাক্য কৃষ্ণমুখে সাজাইবার উদ্দেশ্য কি?

এ সম্বন্ধে কেবল আর একটা কথা বলিব। ভক্তে বলিতে পারিবেন, কৃষ্ণ, ইচ্ছা দ্বারা সকলই করিতেছেন। তাঁহার ইচ্ছাতেই হিড়িম্বাদি বধ, এবং ঘটোৎকচের প্রতি কর্ণের শক্তি প্রযুক্ত হইয়াছিল। এ কথা সঙ্গত নহে। কৃষ্ণই বলিতেছেন যে, তিনি বিবিধ "উপায়

উদ্ভাবন" করিয়া ইহা করিয়াছেন। আর যদি ইচ্ছাময় সর্ব্বকর্ত্তা ইচ্ছা দ্বারা এ সকল কার্য্য সাধন করিবেন, তবে মনুষ্য-শরীর লইয়া অবতীর্ণ হইবার প্রয়োজন কি ছিল? আমরা পুনঃপুনঃ দেখিয়াছি যে, কৃষ্ণ ইচ্ছাশক্তি দ্বারা কোন কর্ম্ম করেন না; পুরুষকার অবলম্বন করেন। তিনি নিজেও তাহা বলিয়াছেন; সে কথা পূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি। দেখা গিয়াছে যে, তিনি ইচ্ছা করিয়াও, যত্ন করিয়া সন্ধি স্থাপন করিতে পারেন নাই, বা কর্ণকে যুধিষ্ঠিরের পক্ষে আনিতে পারেন নাই। আর যদি ইচ্ছা দ্বারা কর্ম্ম সম্পন্ন করিবেন, তবে ছাই ভস্ম জড়পদার্থ একটা শক্তি অস্ত্রের জন্য ইচ্ছাময়ের এত ভাবনা কেন?

ইহার ভিতরে আসল কথাটা, যাহা পূর্ব্বপরিচ্ছেদে বলিয়াছি। বুদ্ধি ঈশ্বরপ্রেরিত, দুর্ব্বুদ্ধিও ঈশ্বরপ্রেরিত, কবি এই কথা বলিতে চাহেন। কর্ণ অর্জ্জুনের জন্য ঐন্দ্রী শক্তি তুলিয়া রাখিয়াছিলেন, এখন যে ঘটোৎকচের উপর তাহা পরিত্যাগ করিলেন, ইহা কর্ণের দুর্ব্বুদ্ধি। কৃষ্ণ বলিতেছেন, সে আমি করাইয়াছি; অর্থাৎ দুর্ব্বুদ্ধি ঈশ্বরপ্রেরিত। শিশুপাল, দুর্ব্বুদ্ধিক্রমে সভাতলে কৃষ্ণের অসহ্য অপমান করিয়াছিলেন। জরাসন্ধ, সৈন্যসাহায্যে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে অজেয়; পাণ্ডবের কথা দূরে থাক্, কৃষ্ণসনাথ যাদবেরাও তাঁহাকে জয় করিতে পারেন নাই। কিন্তু শারীরিক বলে ভীম তাঁহার অপেক্ষা বলবান্; একাকী ভীমের সঙ্গে মল্লের মত বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া, তাদৃশ রাজরাজেশ্বর সম্রাটের পক্ষে দুর্ব্বুদ্ধি। কৃষ্ণোক্তির মর্ম্ম এই যে, সে দুর্ব্বুদ্ধিও আমার প্রেরিত। দ্রোণাচার্য্য অনার্য্য একলব্যের নিকট গুরুদক্ষিণা স্বরূপ তাহার দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ চাহিয়াছিলেন। ঐ অঙ্গুষ্ঠ গেলে বহুকষ্টলব্ধ একলব্যের ধনুর্বিদ্যা নিস্ফল হয়। কিন্তু একলব্য সে প্রার্থিত গুরুদক্ষিণা দিয়াছিলেন। ইহা একলব্যের দারুণ দুর্ব্বুদ্ধি। কৃষ্ণের কথার মর্ম্ম এই যে, সে দুর্ব্বুদ্ধি তাঁহার প্রেরিত—ঈশ্বরপ্রেরিত। রাক্ষসবধ সম্বন্ধেও ঐরূপ। এ সমস্তই দ্বিতীয় স্তর।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

দ্রোণবধ

প্রাচীন ভারতবর্ষে কেবল ক্ষত্রিয়েরাই যুদ্ধ করিতেন, এমন নহে। ব্রাহ্মণ ও বৈশ্য যোদ্ধার কথা মহাভারতেই আছে। দুর্য্যোধনের সেনানায়কদিগের মধ্যে তিন জন প্রধান বীর ব্রাহ্মণ;—দ্রোণ, তাঁহার শ্যালক কৃপ, এবং তাঁহার পুত্র অশ্বত্থামা। অন্যান্য বিদ্যার ন্যায়, ব্রাহ্মণেরা যুদ্ধবিদ্যারও আচার্য্য ছিলেন। দ্রোণ ও কৃপ এইরূপ যুদ্ধাচার্য্য। এই জন্য ইঁহাদিগকে দ্রোণাচার্য্য ও কৃপাচার্য্য বলিত।

এ দিকে, ব্রাহ্মণের সঙ্গে যুদ্ধে বিপদও বড় বেশী। কেন না, রণেও ব্রাহ্মণকে বধ করিলে, ব্রহ্মহত্যার পাতক ঘটে। অন্ততঃ মহাভারতকার এই কারণ ব্রাহ্মণ যোদ্ধৃগণকে লইয়া বড় বিপন্ন, ইহা স্পষ্ট দেখা যায়। এই জন্য কৃপ ও অশ্বত্থামা যুদ্ধে মরিল না। কৌরবপক্ষীয় সকলেই মরিল, কেবল তাঁহারা দুই জনে মরিলেন না; তাঁহারা অমর বলিয়া গ্রন্থকার নিষ্কৃতি পাইলেন। কিন্তু দ্রোণাচার্য্যকে না মারিলে চলে না, ভীষ্মের পর তিনি সর্ব্বপ্রধান যোদ্ধা; তিনি জীবিত থাকিতে পাণ্ডবেরা বিজয় লাভ করিতে পারেন না। কিন্তু এ কথাও গ্রন্থকার বলিতে অনিচ্ছুক যে, ধার্ম্মিক রাজগণের মধ্যে কেহ তাঁহাকে মারিয়া ব্রহ্মহত্যার ভাগী হইল। বিশেষতঃ দ্রোণাচার্য্যকে দ্বৈরথ্য যুদ্ধে পরাজিত করিতে পারে, পাণ্ডবপক্ষে এমন বীর অর্জ্জুন ভিন্ন আর কেহই নাই; কিন্তু দ্রোণাচার্য্য অর্জ্জুনের গুরু, এজন্য অর্জ্জুনের পক্ষে বিশেষরূপে অবধ্য। তাই গ্রন্থকার একটা কৌশল অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

পাণ্ডবভার্য্যা দ্রৌপদীর পিতা দ্রুপদ রাজার সঙ্গে দ্রোণের পূর্ব্বকালে বড় বিবাদ হইয়াছিল। দ্রুপদ দ্রোণের বিক্রমের সমকক্ষ হইতে পারেন নাই—অপদস্থ ও অপমানিত হইয়াছিলেন। এই জন্য তিনি দ্রোণবধার্থ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। যজ্ঞকুণ্ড হইতে দ্রোণবধকারী পুত্র উদ্ভূত হয়—নাম ধৃষ্টদ্যুম্ন। ধৃষ্টদ্যুম্ন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পাণ্ডবদিগের সেনাপতি। তিনিই দ্রোণবধ করিবেন, পাণ্ডবদিগের এই ভরসা। যিনি ব্রহ্মবধার্থ দৈবকর্ম্মজাত, ব্রহ্মবধ তাঁহার পক্ষে পাপ নয়।

কিন্তু মহাভারত এক হাতের নয়, নানা রচয়িতা নানা দিকে ঘটনাবলী যথেচ্ছা লইয়া গিয়াছেন। পনের দিবস যুদ্ধ হইল, ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণাচার্য্যের কিছুই করিতে পারিলেন না। তাঁহার নিকট পরাভূত হইলেন। অতএব দ্রোণ মরার ভরসা নাই—প্রত্যহ পাণ্ডবদিগের সৈন্যক্ষয় হইতে লাগিল। তখন দ্রোণবধার্থ একটা ঘোরতর পাপাচারের পরামর্শ পাণ্ডবপক্ষে স্থির হইল। এই মহাপাপমন্ত্রণার কলঙ্কটা কৃষ্ণের স্কন্ধে অর্পিত হইয়াছে। তিনি ইহার প্রবর্ত্তক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। কৃষ্ণ বলিতেছেন,—

"হে পাণ্ডবগণ! অন্যের কথা দূরে থাকুক, সাক্ষাৎ দেবরাজ ইন্দ্র দ্রোণাচার্য্যকে সংগ্রামে পরাজয় করিতে সমর্থ নহেন। কিন্তু উনি অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করিলে মনুষ্যেরাও তাঁহার বিনাশ করিতে পারে, অতএব

তোমরা ধর্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক উঁহাকে পরাজয় করিবার চেষ্টা কর।"

আর পাতা দশ বার পূর্ব্বে যাঁহার মুখে কবি এই বাক্য সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন,—

"আমি শপথ করিয়া বলিতেছি যে, যে স্থানে ব্রহ্ম, সত্য, দম, শৌচ, ধর্ম, শ্রী, লজ্জা, ক্ষমা, ধৈর্য্য অবস্থান করে, আমি সেইখানেই অবস্থান করি।"*

যিনি ভগবদ্গীতা-পর্ব্বাধ্যায়ে বলিয়াছেন যে, ধর্ম-সংরক্ষণের জন্যই যুগে যুগে অবতীর্ণ হই; যাঁহার চরিত্র, এ পর্য্যন্ত আদর্শ ধার্ম্মিকের চরিত্র বলিয়াই প্রতিভাত হইয়াছে, যাঁহার ধর্মে দার্ঢ্য শত্রুগণ কর্ত্তৃক স্বীকৃত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, † তিনি কি না ডাকিয়া বলিতেছেন, "তোমরা ধর্ম পরিত্যাগ কর।" তাই, বলিতেছিলাম, মহাভারত নানা হাতের রচনা; যাঁহার যেরূপ ইচ্ছা, তিনি সেইরূপ গড়িয়াছেন।

কৃষ্ণ বলিতে লাগিলেন,—

"আমার নিশ্চিত বোধ হইতেছে যে, অশ্বত্থামা নিহত হইয়াছেন, ইহা জানিতে পারিলে দ্রোণ আর যুদ্ধ করিবেন না। অতএব কোন ব্যক্তি উঁহার নিকট গমন পূর্ব্বক বলুন যে, অশ্বত্থামা সংগ্রামে বিনষ্ট হইয়াছেন।"

অর্জ্জুন মিথ্যা বলিতে অস্বীকৃত হইলেন, যুধিষ্ঠির কষ্টে তাহাতে সম্মত হইলেন। ভীম বিনা বাক্যব্যয়ে অশ্বত্থামা নামক একটা হস্তীকে মারিয়া আসিয়া দ্রোণাচার্য্যকে বলিলেন, "অশ্বত্থামা মরিয়াছেন।" ‡ দ্রোণ জানিতেন, তাঁহার পুত্র "অমিতবলবিক্রমশালী এবং শত্রুর অসহ্য"—অতএব ভীমের কথা বিশ্বাস করিলেন না। ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিহত করিবার চেষ্টায় মনোযোগী হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু পুনশ্চ আবার যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, অশ্বত্থামার মৃত্যুর কথা সত্য কি না? যুধিষ্ঠির কখনও অধর্ম করেন না, এবং অসত্য বলেন না, এ জন্য তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন, অশ্বত্থামা কুঞ্জর মরিয়াছে —কিন্তু 'কুঞ্জর' শব্দটা অব্যক্ত রহিল। §

তাহাতেই বা কি হইল? দ্রোণ প্রথমে বিমনায়মান হইলেন বটে, কিন্তু তৎপরে অতি ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মৃত্যুস্বরূপ ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহার আপনার সাধ্যের অতীত যুদ্ধ করিয়া নিরস্ত্র ও বিরত হইয়া দ্রোণহস্তে মরণাপন্ন হইলেন। তখন ভীম গিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে রক্ষা করিলেন, এবং দ্রোণাচার্য্যের রথ ধারণ করিয়া কতকগুলি কথা বলিলেন, তাহাই দ্রোণকে যুদ্ধে পরাঙ্মুখ করিবার পক্ষে যথেষ্ট। ভীম বলিলেন,—

"হে ব্রহ্মন্! যদি সবর্গে অসন্তুষ্ট শিক্ষিতাস্ত্র অধম ব্রাহ্মণগণ সমরে প্রবৃত্ত না হন, তাহা হইলে ক্ষত্রিয়গণের কখনই ক্ষয় হয় না। পণ্ডিতেরা প্রাণিগণের হিংসা না করাই প্রধান ধর্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। সেই ধর্ম প্রতিপালন করা ব্রাহ্মণের অবশ্য কর্ত্তব্য। আপনিই ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ; কিন্তু চণ্ডালের ন্যায় অজ্ঞানান্ধ হইয়া পুত্র ও কলত্রের উপকারার্থ অর্থলালসা নিবন্ধন বিবিধ ম্লেচ্ছজাতি ও অন্যান্য প্রাণিগণের প্রাণবিনাশ করিতেছেন। আপনি এক পুত্রের উপকারার্থ স্বধর্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বকার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া অসংখ্য জীবের জীবন নাশ করিয়া কি নিমিত্ত লজ্জিত হইতেছেন না?"

কথাগুলি সকলই সত্য। ইহার পর আর তিরস্কার কি আছে? ইহাতেও দুর্য্যোধনের ন্যায় দুরাত্মার মত ফিরিতে না পারে বটে, কিন্তু দ্রোণাচার্য্য ধর্মাত্মা, ইহাই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট; ইহার পর অশ্বত্থামার মৃত্যু কথাটা আর না তুলিলেও চলিত। কিন্তু তাহাও এখানে আবার পুনরুক্ত হইয়াছে।

এ কথার পর দ্রোণাচার্য্য অস্ত্র-শস্ত্র ত্যাগ করিলেন। তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহার মাথা কাটিয়া আনিলেন।

এক্ষণে বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। যে কার্য্যটা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা যদি যথার্থ ঘটিয়া থাকে, তবে যিনি যিনি ইহাতে লিপ্ত ছিলেন, তিনি তিনি মহাপাপে লিপ্ত। গ্রন্থকারও তাহা বুঝেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠিরের রথ ইতিপূর্ব্বে পৃথিবীর উপর চারি অঙ্গুলি ঊর্দ্ধে চলিত, এখন ভূমি স্পর্শ করিয়া চলিল। এই অপরাধে তাঁহার নরকদর্শন হইয়াছিল, ইহাও বলিয়াছেন। আমাদের মতে, এরূপ বিশ্বাস-ঘাতকতা এবং মিথ্যা প্রবঞ্চনার দ্বারা গুরুহত্যার উপযুক্ত দণ্ড নরকদর্শন মাত্র নহে;—অনন্ত নরকই ইহার উপযুক্ত।

কৃষ্ণ এই মহাপাপের প্রবর্ত্তক, এজন্য কৃষ্ণকে সেইরূপ অপরাধী বলিতে হয়। কিন্তু ইহার উত্তর এই প্রচলিত আছে যে, যিনি ঈশ্বর, স্বয়ং পাপপুণ্যের কর্ত্তা ও বিধাতা, পাপপুণ্যাই যাঁহার সৃষ্টি, তাঁহার আবার পাপপুণ্য কি? পাপপুণ্য তাঁহাকে স্পর্শিতে পারে

---

* ঘটোৎকচবধপর্ব্বাধ্যায়, ১৮২ অধ্যায়।

† ধৃতরাষ্ট্রবাক্য দেখ।

‡ গোপাল ভাঁড় এইরূপ "কৃষ্ণ পাইয়াছিল।"

§ "অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ"—এ কথাটা মহাভারতের নহে। বোধ হয়, কথকেরা তৈয়ার করিয়া থাকিবেন। মূল মহাভারতে ইহা নাই, মহাভারতে আছে—

তমতথ্যভয়ে মগ্নো জয়ে সক্তো যুধিষ্ঠিরঃ।
অব্যক্তমব্রবীদ্বাক্যং হতঃ কুঞ্জর ইত্যুত। ১৯১।

না। এ কথা সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া কি মনুষ্যদেহধারণকালে পাপ তাঁহার আচরণীয়? তিনি নিজে বলিয়াছেন যে, তিনি ধর্ম্মসংস্থাপনার্থ অবতীর্ণ—পাপাচরণ দ্বারা কি ধর্ম্মসংস্থাপন তাঁহার উদ্দেশ্য? তিনি স্বয়ং ত এরূপ বলেন না। তিনি গীতায় বলিয়াছেন,—

"জনকাদি কর্ম্ম দ্বারাই সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। জনগণকে স্বধর্ম্মে প্রবৃত্ত করিবার জন্য (দৃষ্টান্ত দ্বারা) তুমি কর্ম্ম কর। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যেরূপ করিয়া থাকেন, ইতর লোকেও তাই করে; শ্রেষ্ঠ যাহা মানেন, লোকে তাহারই অনুবর্ত্তিত হয়। হে পার্থ! ত্রিলোকে আমার কর্ত্তব্য কিছুই নাই। আমার প্রাপ্তব্য ও অপ্রাপ্তব্য কিছুই নাই; তথাপি আমি কর্ম্ম করি। (কেন না) আমি যদি কদাচিৎ অতন্দ্রিত হইয়া কর্ম্মানুবর্ত্তন না করি, তবে মনুষ্যগণ সর্ব্বতোভাবে আমার পথের অনুবর্ত্তী হইবে।"

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৩ অ:, ২০-২৩।

অতএব শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলিয়াছেন, মানবাবতারে স্বকার্য্যের দৃষ্টান্ত দ্বারা ধর্ম্মসংস্থাপন তাঁহার উদ্দেশ্যের মধ্যে। অতএব স্বকর্ম্মে মহাপাপের দৃষ্টান্ত তাঁহার অভিপ্রেত হইতে পারে না।

তবে এ কাণ্ডটা কি? তাহার মীমাংসা স্থির না করিয়া আমি কৃষ্ণচরিত্রপ্রণয়নে প্রবৃত্ত হই নাই। কেন না, বৃন্দাবনের গোপী ও "অশ্বত্থামা হত ইতি গজ:" ইহাই কৃষ্ণের প্রধান অপবাদ।

কাণ্ডটা কি? তাহার উত্তর, কাণ্ডটা সমস্তই অলৌকিক। যদি পাঠক মনোযোগ পূর্ব্বক আমার এই গ্রন্থখানি পড়িয়া থাকেন, তবে বুঝিয়া থাকিবেন যে, সমস্ত মহাভারত অর্থাৎ এক্ষণে যে গ্রন্থ মহাভারত নামে প্রচলিত, তাহা এক হাতের নহে। তাহার কিয়দংশ মৌলিক, আদিম মহাভারত, বা "প্রথম স্তর।" অপরাংশ অমৌলিক ও পরবর্ত্তী কবিগণ কর্ত্তৃক মূল গ্রন্থে প্রক্ষিপ্ত। কোন্ অংশ মৌলিক, আর কোন অংশ অমৌলিক, ইহা নিরূপণ করা কঠিন। নিরূপণ জন্য আমি কয়েকটি সঙ্কেত পাঠককে বলিয়া দিয়াছি, সেইগুলি এখন পাঠককে স্মরণ করিতে হইবে।

(১) তাহার মধ্যে একটি এই,—

"শ্রেষ্ঠ কবিদিগের বর্ণিত চরিত্রগুলির সর্ব্বাংশ সুসঙ্গত হয়। যদি কোথাও ব্যতিক্রম দেখা যায়, তবে সে অংশ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া সন্দেহ করা যাইতে পারে।

উদাহরণ দিবার জন্য বলিয়াছিলাম যে, যদি কোথাও ভীমের পরদারপরায়ণতা বা ভীমের ভীরুতা দেখি, তবে জানিব ঐ অংশ প্রক্ষিপ্ত। এখানে ঠিক তাই, এক মাত্রায় নহে, তিন মাত্রায় কেবল তাই। পরম ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরের চরিত্রের সঙ্গে এই নৃশংস বিশ্বাসঘাতকতা ও মিথ্যা প্রবঞ্চনা দ্বারা গুরুনিপাত যাদৃশ অসঙ্গত, তত অসঙ্গত আর কোন দুই বস্তুই হইতে পারে না। তার পর মহাতেজস্বী, বলগর্ব্বশালী, ভয়শূন্য ভীমের চরিত্রের সঙ্গেও ইহা তদ্রূপ অসঙ্গত। ভীম বাহুবল ভিন্ন আর কিছুই মানেন না—শত্রুর বিরুদ্ধে আর কিছু প্রয়োগ করেন না; রাজ্যার্থ নহে, প্রাণরক্ষার্থও নহে। স্থানান্তরে কথিত আছে, অশ্বত্থামা নারায়ণাস্ত্র নামে অনিবার্য্য দৈবাস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছিলেন—তাহাতে সমস্ত পৃথিবী নষ্ট হইতে পারে। দিব্যাস্ত্রবিৎ অর্জ্জুনও তাহার নিবারণে অক্ষম; সমস্ত পাণ্ডবসৈন্য বিনষ্ট হইতে লাগিল। ইহা হইতে পরিত্রাণ পাইবার একটি উপায় ছিল—এই দৈবাস্ত্র সমরবিমুখ ব্যক্তিকে স্পর্শ করে না। অতএব প্রাণরক্ষার্থ কৃষ্ণের আজ্ঞানুসারে সমস্ত পাণ্ডবসেনা ও সেনাপতিগণ রথ ও বাহন হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক বিমুখ হইয়া বসিলেন; কৃষ্ণের আজ্ঞায় অর্জ্জুনকেও তাহা করিতে হইল। কেবল ভীম কিছুতেই তাহা করিলেন না,—বলিলেন, "আমি শরনিকর-নিপাতে অশ্বত্থামার অস্ত্র নিবারণ করিতেছি। আমি এই সুবর্ণময়ী গুর্ব্বী গদা সমুদ্যত করিয়া দ্রোণপুত্রের নারায়ণাস্ত্র বিমর্দ্দিত করত অন্তকের ন্যায় রণস্থলে বিচরণ করিব। এই ভূমণ্ডলমধ্যে যেমন কোন জ্যোতিঃপদার্থই সূর্য্যের সদৃশ নহে, তদ্রূপ আমার তুল্য পরাক্রমশালী আর কোন মনুষ্যই নাই। আমার এই যে ঐরাবতশুণ্ডসদৃশ সুদৃঢ় ভুজদণ্ড অবলোকন করিতেছ, ইহা হিমালয় পর্ব্বতেরও নিপাতনে সমর্থ। আমি অযুতনাগতুল্য বলশালী; দেবলোকে পুরন্দর যেরূপ অপ্রতিদ্বন্দ্বী, নরলোকে আমিও তদ্রূপ। আজি আমি দ্রোণপুত্রের অস্ত্রনিবারণে প্রবৃত্ত হইতেছি, সকলে আমার বাহুবীর্য্য অবলোকন করুন। যদি কেহ এই নারায়ণাস্ত্রের প্রতিদ্বন্দ্বী বিদ্যমান না থাকে, তাহা হইলে আমি স্বয়ং সমস্ত কৌরব ও পাণ্ডব সমক্ষে এই অস্ত্রের প্রতিদ্বন্দ্বী হইব।" স্বীকার করি, বক্তাই বড় বেশী, গন্ধটাও নিতান্ত আষাঢ়ে। তা হৌক—সত্য বলিয়া কাহাকেও ইহা গ্রহণ করিতে হইতেছে না। কবিপ্রণীত চরিত্রচিত্রের সুসঙ্গতি লইয়া কথা কহিতেছি। নারায়ণাস্ত্রমোক্ষ মৌলিক না হইতে পারে, কিন্তু এই ছাঁচে মৌলিক মহাভারতে সর্ব্বত্রই ভীমের চরিত্র ঢালা। ইহার সঙ্গে ভীমের সেই শৃগালোপম দ্রোণপ্রবঞ্চনা কতটা সুসঙ্গত? এই ভীম কি স্ত্রীলোকেরও ঘৃণাস্পদ যে শত্রুবধোপায়, তাহা অবলম্বন করিতে পারে? দ্রোণাচার্য্যের অপেক্ষা নারায়ণাস্ত্র সহস্রগুণে ভয়ঙ্কর; যে নারায়ণাস্ত্রের সম্মুখে সিংহের ন্যায় দৃপ্ত, যাহাকে

বলপ্রয়োগ ব্যতীতও * নারায়ণাস্ত্রের সম্মুখ হইতে কেহ বিমুখ করিতে পারিল না, তাহাকে অর্জ্জুনের প্রতিযোদ্ধা মাত্র দ্রোণের ভয়ে শৃগালাধমের ন্যায় কার্য্যপ্রবৃত্ত বলিয়া যে কবি বর্ণনা করিয়াছেন, সে কবির কবিত্ব কোথায়? মহাভারতপ্রণয়ন কি তাঁহার সাধ্য?

তবে নিহত অশ্বত্থামাগজের এই গল্প, ভীমের চরিত্রের সঙ্গে অসঙ্গত, যুধিষ্ঠিরের চরিত্রের সঙ্গেও অসঙ্গত, ইহা দেখিয়াছি। কিন্তু ভীমের চরিত্রের সঙ্গে ও যুধিষ্ঠিরের চরিত্রের সঙ্গে ইহার যতটা অসঙ্গতি, কৃষ্ণচরিত্রের সঙ্গে ইহার অসঙ্গতি তদপেক্ষা অনেক বেশী। যদি আমরা যাহা বলিয়াছি, তাহা পাঠক বুঝিয়া থাকেন, তাহা হইলে এই অসঙ্গতির পরিমাণ বুঝিতে পারিবেন্। আলোকে অন্ধকারে যত অসঙ্গতি, কৃষ্ণে শ্বেতে, তাপে শৈত্যে, মধুরে কর্কশে, রোগে স্বাস্থ্যে, ভাবে অভাবে যতটা অসঙ্গতি, ইহাও তত। যখন মৌলিক চরিত্রের সঙ্গে—একটি নয়, তিনটি মৌলিক চরিত্রের সঙ্গে—এ গল্পের এত অসঙ্গতি, তখন ইহা অমৌলিক ও প্রক্ষিপ্ত এবং অন্য কবিপ্রণীত বলিয়া আমরা পরিত্যাগ করিতে পারি।

(২) আমার কথা শেষ হয় নাই। কোন্ অংশ মৌলিক, কোন অংশ অমৌলিক, ইহার নির্ব্বাচন জন্য যে কয়েকটি লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছি, তাহার একটির দ্বারা পরীক্ষা করিয়া এই হতগজ বৃত্তান্তটা অমৌলিক বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। আর একটির দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক। আর একটির সূত্র এই যে, দুইটি বিবরণ পরস্পরবিরোধী হইলে তাহার একটি প্রক্ষিপ্ত। এখন মহাভারতে ঐ অশ্বত্থামাগজের গল্পের সঙ্গে সঙ্গেই দ্রোণবধের আর একটি বৃত্তান্ত পাই। একটিই যথেষ্ট কারণ, কিন্তু দুইটি একত্র জড়ান হইয়াছে। আমরা সেই স্বতন্ত্র বিবরণটি পৃথক্ করিয়া মহাভারত হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। তাহা বুঝাইবার জন্য অগ্রে আমার বলা উচিত যে, দ্রোণ অধর্ম্মযুদ্ধ করিতেছিলেন। মহাভারতে কথিত অন্যান্য দৈবাস্ত্রের মধ্যে ব্রহ্মাস্ত্র একটি। আজি এ দেশের লোকে, যে উপায় যে কার্য্যসাধনে অব্যর্থ, তাহাকে সেই কার্য্যের "ব্রহ্মাস্ত্র" বলে। এই ব্রহ্মাস্ত্র অস্ত্রানভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের প্রতি প্রয়োগ নিষিদ্ধ ও অধর্ম্ম, ইহাই ঋষিদিগের মত। দ্রোণ ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা অস্ত্রানভিজ্ঞ সৈন্যগণকে বিনষ্ট করিতেছিলেন। এমন সময়ে,—"বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, ভরদ্বাজ, গৌতম, বশিষ্ঠ, অত্রি, ভৃগু, অঙ্গিরা, সিকত, প্রশ্নি, গর্গ, বালখিল্য, মরীচি ও অন্যান্য সূক্ষ্মতর সাগ্নিক ঋষিগণ আচার্য্যকে নিঃক্ষত্রিয় করিতে অবলোকন করিয়া তাঁহারে ব্রহ্মলোকে নীত করিবার বাসনায় সকলে শীঘ্র সমাগত হইয়া কহিতে লাগিলেন, "হে দ্রোণ! তুমি অধর্ম্মযুদ্ধ করিতেছ; অতএব এক্ষণে তোমার বিনাশসময় উপস্থিত হইয়াছে। তুমি আয়ুধ পরিত্যাগ করিয়া একবার আমাদিগকে নিরীক্ষণ কর। আর তোমার এইরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য নহে। তুমি বেদবেদাঙ্গবেত্তা এবং সত্যধর্ম্মপরায়ণ; অতএব এরূপ কার্য্য করা তোমার নিতান্ত অনুচিত; তুমি অবিমুক্ত হইয়া আয়ুধ পরিত্যাগপূর্ব্বক শাশ্বতপথে অবস্থান কর। অদ্য তোমার মর্ত্ত্যলোকনিবাসের কাল পরিপূর্ণ হইয়াছে। হে বিপ্র! অস্ত্রানভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে ব্রহ্মাস্ত্রে বিনাশ করিয়া নিতান্ত অসৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ; অতএব আয়ুধ অবিলম্বে পরিত্যাগ কর, আর ক্রূর কার্য্যের অনুষ্ঠান করা তোমার কর্ত্তব্য নহে।"

ইহাতেই দ্রোণাচার্য্য যুদ্ধে ক্ষান্ত হইলেন। যুধিষ্ঠিরের নিকট অশ্বত্থামার মৃত্যু শুনিয়াও যুদ্ধে ক্ষান্ত হন নাই, পূর্ব্বে বলিয়াছি। তার পরেও তিনি ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিনষ্ট করিবার উপক্রম করিলে, যদুবংশীয় সাত্যকি আসিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের রক্ষাসম্পাদন করিলেন। সাত্যকির সঙ্গে কেহই যুদ্ধ করিতে সক্ষম হইল না। দ্রোণও নিবারিত হইলেন। তখন যুধিষ্ঠির স্বপক্ষীয় বীরগণকে বলিলেন,—

"হে বীরগণ! তোমারা পরম যত্নসহকারে দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হও। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণাচার্য্যের বিনাশের নিমিত্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। অদ্য সমরক্ষেত্রে দ্রুপদনন্দনের কার্য্য সন্দর্শনে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, উনি ক্রুদ্ধ হইয়া দ্রোণকে নিপাতিত করিবেন। অতএব তোমরা মিলিত হইয়া দ্রোণের সহিত যুদ্ধারম্ভ কর।"

এই কথার পর পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহাভারত হইতে পুনশ্চ উদ্ধৃত করিতেছি,—

"মহারথ দ্রোণও মরণে কৃতনিশ্চয় হইয়া সমাগত বীরগণের প্রতি মহাবেগে গমন করিতে লাগিলেন। সত্যসন্ধ মহাবীর দ্রোণাচার্য্য মহারথগণের প্রতি ধাবমান হইলে মেদিনীমণ্ডল কম্পিত ও প্রচণ্ড বায়ু সেনাগণকে ভীত করত প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। মহতী উল্কা সূর্য্য হইতে নিঃসৃত হইয়া আলোক প্রকাশপূর্ব্বক সকলকে শঙ্কিত করিল। দ্রোণাচার্য্যের অস্ত্র সকল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। রথের ভীষণ নিস্বন ও অশ্বগণের অশ্রুপাত হইতে লাগিল। তৎকালে মহারথ দ্রোণ নিতান্ত নিস্তেজ হইলেন। তাঁহার বাম নয়ন ও বাম বাহু স্পন্দিত হইতে লাগিল। তিনি সম্মুখে

* অর্জ্জুন ও কৃষ্ণ ভীমকে বলপূর্ব্বক রথ হইতে টানিয়া ফেলিয়া দিয়া অস্ত্রশস্ত্র কাড়িয়া লইয়াছিলেন।

ধৃষ্টদ্যুম্নকে অবলোকন করিয়া নিতান্ত উন্মনা হইলেন এবং ব্রহ্মবাদী ঋষিগণের বাক্য স্মরণ করিয়া ধর্মযুদ্ধ অবলম্বনপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিলেন।”

পাঠক দেখিবেন যে, এইখানে দ্রোণের প্রাণত্যাগের অভিলাষের কারণপরম্পরার মধ্যে অশ্বত্থামার মৃত্যুসংবাদ পরিগণিত হয় নাই। বিচারকের পক্ষে এই প্রমাণ যথেষ্ট।

দ্রোণ তথাপি যুদ্ধ ছাড়িলেন না। মহাভারতকার দশ হাজার সৈন্যধ্বংসের কম কথা কন না, তিনি বলেন, তার পরেও দ্রোণাচার্য্য ত্রিশ হাজার সৈন্য বিনষ্ট করিলেন, এবং ধৃষ্টদ্যুম্নকে পুনর্ব্বার পরাভূত করিলেন। এবার ভীম ধৃষ্টদ্যুম্নকে রক্ষা করিলেন, এবং দ্রোণাচার্য্যের রথ ধরিয়া (ভীমের অভ্যাস রথগুলা ধরিয়া আছাড় মারিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলেন)* সেই পূর্ব্বোদ্ধৃত তীব্র তিরস্কার করিলেন। সেই তিরস্কারে দ্রোণ যথার্থ আয়ুধ ত্যাগ করিলেন,—

“এবং তৎপরে রথোপরি সমুদায় অস্ত্রশস্ত্র সন্নিবেশিত করিয়া যোগ অবলম্বন পূর্ব্বক সমস্ত জীবকে অভয়প্রদান করিলেন। ঐ সময় মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন রন্ধ্র প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় রথে ভীষণ সশরশরাসন অবস্থাপনপূর্ব্বক তরবারি ধারণপূর্ব্বক দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হইলেন। এইরূপে দ্রোণাচার্য্য ধৃষ্টদ্যুম্নের বশীভূত হইলে সমরাঙ্গনে মহান্ হাহাকার শব্দ সমুত্থিত হইল। এ দিকে জ্যোতির্ম্ময় মহাতপা দ্রোণাচার্য্য অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক শমভাব অবলম্বন করিয়া যোগসহকারে অনাদিপুরুষ বিষ্ণুর ধ্যান করিতে লাগিলেন। এবং মুখ ঈষৎ উন্নমিত, বক্ষঃস্থল বিষ্টম্ভিত ও নেত্রদ্বয় নিমীলিত করিয়া বিষয়াদি বাহ্য পরিত্যাগ ও সাত্ত্বিকভাব অবলম্বনপূর্ব্বক একাক্ষর বেদমন্ত্র ওঁকার ও পরাৎপর দেবদেবেশ বাসুদেবকে স্মরণ করত সাধুজনেরও দুর্লভ স্বর্গলোকে গমন করিলেন।”

তার পর ধৃষ্টদ্যুম্ন আসিয়া মৃতদেহের মস্তক কাটিয়া লইয়া গেলেন।

অতএব, দ্রোণের মৃত্যুর মহাভারতে দুইটি পৃথক্ পৃথক্ বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। দুইটি সম্পূর্ণরূপে যে পরস্পরের বিরোধী, তাহা নহে; একত্র গাঁথা যায়। একত্র গাঁথাও আছে,—তাল জোড় লাগে নাই, মোটা রকম রিপুকর্ম্ম, স্থানে স্থানে ফাঁক পড়িয়াছে। ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, এই দুইটি বিবরণের মধ্যে একটিই দ্রোণের মৃত্যুর পক্ষে যথেষ্ট, দুইটির প্রয়োজন নাই। এক জন কবি এইরূপ দুইটি ভিন্ন ভিন্ন বিবরণ যোড়া দিবার চেষ্টা করিবার সম্ভাবনা ছিল না। দুইটি ভিন্ন ভিন্ন স্তরের দুই জন কবির প্রণীত বলিয়াই কাজেই স্বীকার করিতে হয়। কোন্‌টি প্রক্ষিপ্ত? দ্রোণের প্রাণত্যাগেচ্ছার যে সকল কারণ মহাভারত হইতে উপরে উদ্ধৃত করিয়াছি, অশ্বত্থামার মৃত্যুসংবাদ তাহাতে ধরা হয় নাই। অতএব অশ্বত্থামার মৃত্যুঘটিত বৃত্তান্তটি প্রকৃত হওয়া অসম্ভব। কিন্তু যে সকল সূত্র পূর্ব্বে সংস্থাপিত করিয়াছি, তাহা স্মরণ করিলেই ইহার মীমাংসা হইবে।

আমরা বলিয়াছি যে, যখন দুইটি ভিন্ন ভিন্ন বা পরস্পরবিরোধী বিবরণের মধ্যে একটি প্রক্ষিপ্ত বলিয়া স্থির হইবে, তখন কোন্‌টি প্রক্ষিপ্ত, তাহা মীমাংসার জন্য দেখিতে হইবে, কোন্‌টি অন্য লক্ষণ দ্বারা পরস্পরবিরোধী বলিয়া বোধ হয়। যেটি অন্য লক্ষণেও ধরা পড়িবে, সেইটি প্রক্ষিপ্ত বলিয়া ত্যাগ করিবে।* আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, অশ্বত্থামাবধসংবাদ-বৃত্তান্ত কৃষ্ণ, ভীম ও যুধিষ্ঠিরের চরিত্রের সঙ্গে অত্যন্ত অসঙ্গত। আমরা পূর্ব্বে এই একটি লক্ষণ স্থির করিয়াছি যে, এরূপ অসঙ্গতি থাকিলে তাহা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া ধরিতে হইবে।‡ অতএব এই অশ্বত্থামাবধসংবাদ-বৃত্তান্ত প্রক্ষিপ্ত, তাহাতে সন্দেহ নাই।

(৩) আরও একটা কথা আছে। দেখিয়াছি যে, অশ্বত্থামার মৃত্যুসংবাদে দ্রোণ যুদ্ধে কিছুমাত্র শৈথিল্য করেন নাই। তবে কৃষ্ণ এ কথা বলাইলেন কেন? দ্রোণের যুদ্ধে নিবৃত্তির সম্ভাবনা আছে বলিয়া? সম্ভাবনা কোথা? দ্রোণ জানেন, অশ্বত্থামা অমর। সে কথা অনৈসর্গিক বলিয়া না হয় ছাড়িয়া দিলাম। সামান্য মানুষের, তোমার, আমার অথবা একটা কুলি-মজুরের যে বুদ্ধি, ততটুকু বুদ্ধিও কৃষ্ণের ছিল, যদি এরূপ স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও বুঝিতে পারা যাইবে যে, কৃষ্ণের এরূপ পরামর্শ দিবার সম্ভাবনা ছিল না। দ্রোণই হউন, আর যেই হউন, এরূপ সংবাদ শুনিয়া আত্মহত্যায় উদ্যত হইবার আগে, একবার স্বপক্ষীয় কাহাকেও কি জিজ্ঞাসা করিবেন না যে, অশ্বত্থামা মরিয়াছে কি? অশ্বত্থামার অনুসন্ধানে পাঠাইবেন না? তাহাই নিতান্ত সম্ভব। তাহা ঘটিলে জুয়াচুরি তখনই সমস্ত ফাঁসিয়া যাইবে।

অতএব উপন্যাসটি প্রথমতঃ প্রক্ষিপ্ত, দ্বিতীয়তঃ মিথ্যা। আমি এমন বলি না যে, ঋষিবাক্যে দ্রোণের অস্ত্র পরিত্যাগ করাই সত্য। ঋষিদের সেই রণক্ষেত্রে আগমন অনৈসর্গিক ব্যাপার, সুতরাং তাহাও অপ্রকৃত

---

* রথগুলা যদি একার মত হয়, তবে এখনকার লোকেও ইহা পারে।

* ইতিপূর্ব্বে কথিত সূত্র দেখ।

‡ ইতিপূর্ব্বে কথিত সূত্র দেখ।

বলিয়া পরিত্যাগ করিতে আমি বাধ্য। ইহার মধ্যে প্রকৃত বা বিশ্বাসযোগ্য কথা এই হইতে পারে যে, দ্রোণ অধর্ম্মাচরণ করিতেছিলেন—ভীমের তীব্র তিরস্কারে তাহা তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল। যুদ্ধে বিমুখ হওয়া তাঁহার সাধ্য নহে—অপটুতা এবং দুর্য্যোধনকে বিপৎকালে পরিত্যাগ এই উভয় দোষেই দূষিত হইতে হইবে। অতএব মৃত্যুই স্থির করিলেন। বোধ হয়, এতটুকু একটু কিংবদন্তী ছিল—তাহারই উপর মহাভারতের প্রথম স্তর নির্ম্মিত হইয়াছিল। হয় ত তাহাও যথার্থ ঘটনা নহে। বোধ হয়, যথার্থ ঘটনা এই পর্য্যন্ত যে, দ্রোণ যুদ্ধে দ্রুপদপুত্র কর্তৃক নিহত হইয়াছিলেন; পরে যাহা বলিতেছি, তাহাতে তাই বুঝায়; তার পর প্রবলপ্রতাপ পাঞ্চালবংশকে ব্রহ্মহত্যাকলঙ্ক হইতে উদ্ধৃত করিবার জন্য নানাবিধ উপন্যাস প্রস্তুত হইয়াছে।

(৪) এখন দেখা যাউক, অনুক্রমণিকাধ্যায়ে, এবং পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়ে কি আছে। অনুক্রমণিকাধ্যায়ে, ধৃতরাষ্ট্রবিলাপে এইমাত্র আছে যে—

> "যদাশ্রৌষং দ্রোণমাচার্য্যমেকং
> ধৃষ্টদ্যুম্নেনাত্যতিক্রম্য ধর্ম্মম্।
> রথোপস্থে প্রায়গতং বিশস্তং
> তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়॥"

অর্থ। হে সঞ্জয়! যখন শুনিলাম যে, এক আচার্য্য দ্রোণকে ধৃষ্টদ্যুম্ন ধর্ম্মাতিক্রমপূর্ব্বক প্রায়োপবিষ্ট অবস্থায় রথোপস্থে বধ করিয়াছে, তখন আর জয়ে সন্দেহ করি নাই।

অতএব এখানেও দেখা যাইতেছে যে, দ্রোণবধে ধৃষ্টদ্যুম্ন ভিন্ন আর কেহ অধর্ম্মাচরণ করে নাই। ধৃষ্টদ্যুম্নেরও পাপ এই যে, প্রায়োপবিষ্ট বৃদ্ধকে তিনি নিহত করিয়াছিলেন। দ্রোণের প্রায়োপবেশনের কারণ এখানে কিছু কথিত হয় নাই। যুধিষ্ঠিরবাক্যে বা ঋষিগণের বাক্যে বা ভীমের তিরস্কারে তাহা কিছু কথিত হয় নাই। পশ্চাৎ দেখিব, তিনি পরে শ্রান্ত হইয়াই নিহত হয়েন। আসন্নমৃত্যু ব্রাহ্মণের প্রায়োপবেশনের সেও উপযুক্ত কারণ।

(৫) পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়ে কোন কথাই নাই—"দ্রোণে যুধি নিপাতিতে" এ ছাড়া আর কিছুই নাই। সুতগজের কথাটা সত্য হইলে, তাহার প্রসঙ্গ অবশ্যই থাকিত। অভিমন্যুর অধর্ম্মযুদ্ধে মৃত্যুর কথা আছে—দ্রোণেরও অবশ্য থাকিত। গল্পটা তখন তৈয়ার হয় নাই, এ জন্য নাই।

(৬) তার পর, দ্রোণপর্ব্বের সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে দ্রোণযুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে। তাহাতেও এই জুয়াচুরির কোন প্রসঙ্গ নাই। কেবল আছে যে, ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণকে নিপাতিত করিলেন। এই অধ্যায়গুলি যখন প্রণীত হয়, তখনও গল্পটা তৈয়ার হয় নাই।

(৭) আশ্বমেধিক পর্ব্বে আছে যে, কৃষ্ণও দ্বারকায় প্রত্যাগমন করিলে, বসুদেব কৃষ্ণের নিকট যুদ্ধবৃত্তান্ত শুনিতে ইচ্ছা করিলেন। কৃষ্ণ তাঁহাকে যুদ্ধবৃত্তান্ত সংক্ষেপে শুনাইলেন। দ্রোণযুদ্ধ সম্বন্ধে কৃষ্ণ ইহাই বলিলেন যে, দ্রোণাচার্য্যে ও ধৃষ্টদ্যুম্নে পাঁচ দিন যুদ্ধ হয়। পরিশেষে দ্রোণ সমরশ্রমে একান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নহস্তে নিহত হইলেন। বোধ হয়, এইটুকুই সত্য, এবং যুবার সহিত যুদ্ধে বৃদ্ধের শ্রান্তিই দ্রোণের যুদ্ধবিরতির যথার্থ কারণ। আর সকলই কবিকল্পনা, বা উপন্যাস। নিতান্তই যে উপন্যাস, তাহার সাত রকম প্রমাণ দিলাম।

কিন্তু সেই উপন্যাসমধ্যে কৃষ্ণকে মিথ্যা প্রবঞ্চনার প্রবর্ত্তক বলিয়া স্থাপিত করিবার কারণ কি? কারণ পূর্ব্বে বুঝাইয়াছি। বুঝাইয়াছি যে, যেমন জ্ঞান ঈশ্বরদত্ত, অজ্ঞান বা ভ্রান্তিও তাই। জয়দ্রথবধে কবি তাহা দেখাইয়াছেন। ভ্রান্তিও ঈশ্বর-প্রেরিত। ঘটোৎকচবধে কবি দেখাইয়াছেন যে, যেমন বুদ্ধি ঈশ্বরপ্রেরিত, দুর্ব্বুদ্ধিও ঈশ্বরপ্রেরিত। আরও বুঝাইয়াছি যে, যেমন সত্যও ঈশ্বরের, অসত্যও তেমনই ঈশ্বরের। এই দ্রোণবধে কবি তাহাই দেখাইলেন।

ইহার পর নারায়ণাস্ত্রমোক্ষ-পর্ব্বাধ্যায়। সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। বিস্তারিতের প্রয়োজন নাই, কেন না, নারায়ণাস্ত্র বৃত্তান্তটা অনৈসর্গিক, সুতরাং পরিত্যাজ্য। তবে এই পর্ব্বাধ্যায়ে একটা রহস্যকথা আছে।

দ্রোণ নিহত হইলে, অর্জ্জুন গুরুর জন্য শোকে অত্যন্ত কাতর, মিথ্যা কথা বলিয়া গুরুবধসাধন জন্য তিনি যুধিষ্ঠিরকে খুব তিরস্কার করিলেন। এবং ধৃষ্টদ্যুম্নের নিন্দা করিলেন। যুধিষ্ঠির ভাল মানুষ, কিছু উত্তর করিলেন না, কিন্তু ভীম অর্জ্জুনকে কড়া রকম কিছু শুনাইলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন আরও কড়া রকম শুনাইলেন। তখন অর্জ্জুনশিষ্য যদুবংশীয় সাত্যকি অর্জ্জুনের পক্ষ হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে ভারি রকম গালিগালাজ দিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্নও সুদ সমেত ফিরাইয়া দিলেন। তখন দুইজনে পরস্পরের বধে উদ্যত। কৃষ্ণের ইঙ্গিতে ভীম ও সহদেব থামাইয়া দিলেন। বিবাদটা এই যে, মিথ্যাকথা বলিয়া দ্রোণের মৃত্যুসাধন করা কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য কি না, এই তত্ত্ব লইয়া দুই দল দুই পক্ষে যত কথা আছে, সব বলিলেন; কিন্তু কেহই কৃষ্ণকে ভালমন্দ কিছুই বলিলেন না। কেহই বলিলেন না যে,

কৃষ্ণের কথায় এরূপ হইয়াছে। কৃষ্ণের নামও কেহ করিলেন না। পাঁচ হাতের কাজ। না হইলে এমন ঘটে না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কৃষ্ণকথিত ধর্ম্মতত্ত্ব

যিনি অশ্বত্থামাবধসংবাদ-বৃত্তান্ত রচনা করিয়াছেন, তিনি অর্জ্জুনকে বড় উচ্চস্থানে স্থাপিত করিয়াছেন। কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির ও ভীমের অপেক্ষা তাঁহার ধার্ম্মিকতা অনেক বেশী, এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন। যাহার প্রস্তাবকর্ত্তা কৃষ্ণ এবং যাহা পরিশেষে ভীম ও যুধিষ্ঠির সম্পাদিত করিলেন, তাহা মিথ্যা কথা বলিয়া অর্জ্জুন তাহাতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না; বরং তজ্জন্য যুধিষ্ঠিরকে যথেষ্ট ভর্ৎসনা করিলেন। কিন্তু এক্ষণে যে বিবরণে আমাকে প্রবৃত্ত হইতে হইতেছে, তাহাতে অর্জ্জুন অতি মূঢ় ও পাষণ্ড বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছেন। এবং কৃষ্ণের নিকট ধর্ম্মোপদেশ পাইয়াই সৎপথ অবলম্বন করিতেছেন। বৃত্তান্তটা এই :—

দ্রোণের পর কর্ণ দুর্য্যোধনের সেনাপতি। তাঁহার যুদ্ধে পাণ্ডবসেনা অস্থির। যুধিষ্ঠির নিজ দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার সম্মুখীন হইয়াছিলেন। কর্ণ তাঁহাকে এরূপ সন্তাড়িত করিলেন যে, যুধিষ্ঠির ভয়ে রণক্ষেত্র হইতে পলাইয়া গিয়া শিবিরে লুক্কায়িত হইয়া বিছানায় শুইয়া পড়িলেন। এ দিকে অর্জ্জুন যুদ্ধে বিজয়ী হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে যুধিষ্ঠিরকে না দেখিয়া চিন্তিত হইয়া তাঁহার অন্বেষণে শিবিরে গেলেন। তখনও কর্ণ নিহত হয়েন নাই। যুধিষ্ঠির যখন শুনিলেন যে, অর্জ্জুন এখনও কর্ণবধ করেন নাই, তখন রাগিয়া বড় গরম হইলেন। কাপুরুষের স্বভাবই এই যে, আপনি যাহা না পারে, পরে তাহা করিয়া না দিলে বড় চটিয়া উঠে। সুতরাং যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকে খুব কঠিন গালিগালাজ করিলেন। শেষে বলিলেন যে, তুমি নিজে যখন যুদ্ধে ভীত হইয়া পলায়ন করিয়াছ, তখন তুমি কৃষ্ণকে গাণ্ডীব শরাসন প্রদান কর।

শুনিয়া অর্জ্জুন তরবারি লইয়া যুধিষ্ঠিরকে কাটিতে উঠিলেন। কৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তরবারি দিয়া কাহারে বধ করিবে?" অর্জ্জুন বলিলেন, "তুমি অন্যকে গাণ্ডীব * শরাসন সমর্পণ কর, এই কথা যিনি আমারে কহিবেন, আমি তাঁহার মস্তকচ্ছেদন করিব, এই আমার উপাংশুব্রত। এক্ষণে তোমার সমক্ষেই মহারাজ আমারে এই কথা কহিয়াছেন, অতএব আমি এই ধর্ম্মভীরু নরপতিরে নিহত করিয়া প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন ও সত্যের আনৃণ্য লাভ করত নিশ্চিন্ত হইব।"

কথাটা মূঢ় ও পাষণ্ডের মত হইল—অর্জ্জুনের মত নহে।

একে ত গাণ্ডীব অন্যকে দাও বলিলে কোন ব্যক্তিকে খুন করিতে হইবে, এ প্রতিজ্ঞাই মূঢ়তার কাজ। তার পর পূজ্যপাদ জ্যেষ্ঠাগ্রজ উত্তেজনার জন্য এরূপ কথা বলিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে বধ করিতে প্রবৃত্ত হওয়া অতিশয় পাষণ্ডের কাজ। তবে ইহার ভিতর গুরুতর কথা আছে; তাহার বিস্তারিত মীমাংসা কৃষ্ণ কর্ত্তৃক হইয়াছিল, এই জন্য এ কথার অবতারণায় আমি বাধ্য।

কথাটা এই। সত্য পরম ধর্ম্ম। যদি অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরকে বধ না করেন, তবে তাঁহাকে সত্যচ্যুত হইতে হয়। অর্জ্জুনের প্রশ্ন এই যে, সত্যরক্ষার্থ যুধিষ্ঠিরকে বধ করা তাঁহার কর্ত্তব্য কি না। অর্জ্জুন কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার মতে এক্ষণে কি করা কর্ত্তব্য?"

কৃষ্ণ যে উত্তর দিলেন, তাহা বুঝাইবার পূর্ব্বে, আমরা পাঠককে অনুরোধ করি যে, আপনিই ইহার উত্তর দিবার চেষ্টা করুন। বোধ করি, সকল পাঠকই একমত হইয়া উত্তর দিবেন যে, এরূপ সত্যের জন্য যুধিষ্ঠিরকে বধ করা অর্জ্জুনের কর্ত্তব্য নহে। কৃষ্ণ সেই উত্তর দিলেন। কিন্তু পাশ্চাত্য নীতিপণ্ডিত আধুনিক পাঠক যে কারণে এই উত্তর দিবেন, কৃষ্ণ সেই কারণে এ সকল উত্তর দিলেন না। তিনি প্রাচ্য নীতির বশবর্ত্তী হইয়াই এই উত্তর দিলেন। তাহার কারণ বুঝাইতে হইবে না,—বুঝাইতে হইবে না যে, শ্রীকৃষ্ণ ভারতবর্ষে অবতীর্ণ, ইংলণ্ডে নহে। তিনি ভারতবর্ষের নীতিতে সুপণ্ডিত, ইউরোপীয় নীতি তখন হয়ও নাই, এবং কৃষ্ণ তন্মার্গাবলম্বী হইলে অর্জ্জুনও তাহার কিছুই বুঝিতেন না।

কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বুঝাইবার জন্য যে সকল তত্ত্বের অবতারণা করিলেন, এক্ষণে তাহার স্থূল মর্ম্ম বলিতেছি—অন্তত, যে অংশ বিবাদের স্থল হইতে পারে, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।

তাহার প্রথম কথা "অহিংসা পরম ধর্ম্ম।" ইহাতে প্রথম আপত্তি হইতে পারে যে, সকল স্থানে অহিংসা ধর্ম্ম নহে। দ্বিতীয় আপত্তি এই হইতে পারে যে, কৃষ্ণ স্বয়ং গীতাপর্ব্বাধ্যায়ে অর্জ্জুনকে যে উপদেশ দিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন, এ উক্তি তাহার বিপরীত।

* পাঠককে বোধ করি বলিতে হইবে না, গাণ্ডীব অর্জ্জুনের ধনুকের নাম। উহা দেবদত্ত, অবিনশ্বর এবং শরাসন মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

যিনি অহিংসাতত্ত্বের যথার্থ মর্ম্ম না বুঝেন, তিনিই এরূপ আপত্তি করিবেন। অহিংসা পরম ধর্ম্ম, এ কথার এমন বুঝায় না যে, কোন অবস্থায় কোন প্রকারে প্রাণিহিংসা করিলে অধর্ম্ম হয়। প্রাণিহিংসা ব্যতীত আমরা ক্ষণমাত্র জীবনধারণ করিতে পারি না, ইহা ঐশিক নিয়ম। যে জল পান করি, তাহার সঙ্গে সহস্র সহস্র অণুবীক্ষণদৃশ্য জীব উদরস্থ করি; প্রতি নিশ্বাসে বহুসংখ্যক তাদৃশ জীব নাসাপথে প্রেরিত করি, প্রতি পদার্পণে সহস্র সহস্রকে দলিত করি। একটি শাকের পাতা বা একটি বেগুনের সঙ্গে অনেকগুলিকে রাঁধিয়া খাই। যদি বল এ সকল অজ্ঞানকৃত হিংসা, ইহাতে পাপ নাই, আমি তাহার উত্তরে বলি যে, জ্ঞানকৃত প্রাণিহিংসা ব্যতীতও আমাদের প্রাণরক্ষা নাই। যে বিষধর সর্প বা বৃশ্চিক আমার গৃহে বা আমার শয্যা-তলে আশ্রয় করিয়াছে, আমি তাহাকে বিনাশ না করিলে, সে আমাকে বিনাশ করিবে। যে ব্যাঘ্র আমাকে গ্রহণ করিবার জন্য লম্ফনোদ্যত, আমি তাহাকে বিনাশ না করিলে, সে আমাকে বিনাশ করিবে। যে শত্রু আমার বধসাধনে কৃতনিশ্চয় ও উদ্যতায়ুধ, আমি তাহাকে বিনাশ না করিলে, সে আমাকে বিনাশ করিবে। যে দস্যু ধৃতাস্ত্র হইয়া নিশীথে আমার গৃহপ্রবেশপূর্ব্বক সর্ব্বস্ব গ্রহণ করিতেছে, যদি বিনাশ ভিন্ন তাহাকে নিবারণের উপায় না থাকে, তবে তাহাকে বিনাশ করাই আমার পক্ষে ধর্ম্মানুমত। যে বিচারকের সম্মুখে হত্যাকারিকৃত হত্যা প্রমাণিত হইয়াছে, যদি তাহার বধদণ্ড রাজনিয়োগসম্মত হয়, তবে তিনি তাহার বধাজ্ঞা প্রচার করিতে ধর্ম্মতঃ বাধ্য। এবং যে রাজপুরুষের উপর বধার্হের বধের ভার আছে, সেও তাহাকে বধ করিতে বাধ্য। সেকেন্দর বা গজনভী মহম্মদ, আতিলা বা জঙ্গেজ, তৈমুর বা নাদের, দ্বিতীয় ফ্রেড্রিক্ বা নাপোলেয়ন পরস্ব ও পররাষ্ট্রাপহরণ জন্য যে অগণিত শিক্ষিত তস্কর লইয়া পররাজ্যপ্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহা লক্ষ লক্ষ হইলেও প্রত্যেকেই ধর্ম্মতঃ বধ্য। এখানে হিংসাই ধর্ম্ম।

পক্ষান্তরে, যে পাখিটি আকাশে উড়িয়া যাইতেছে, ভোজন জন্যই হউক বা খেলার জন্যই হউক, তাহার নিপাত অধর্ম্ম। যে মাছিটি মিষ্টবিন্দুর অন্বেষণে উড়িয়া বেড়াইতেছে, ক্রীড়াশীল বালক যে তাহাকে ধরিয়া টিপিয়া মারিল, তাহা অধর্ম্ম। যে মৃগ বা যে কুক্কুট তোমার আমার ন্যায় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য জগতে আসিয়াছে, উদরম্ভরী যে তাহাকে বধ করিয়া খায়, সে অধর্ম্ম। আমরা বায়ু-প্রবাহে তলচারী জীব, মৎস্য জলপ্রবাহের উপরিচর জীব; আমরা যে তাহাদের ধরিয়া খাই, সে অধর্ম্ম।

তবে অহিংসা পরম ধর্ম্ম, এ বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, ধর্ম্ম্য প্রয়োজন ব্যতীত যে হিংসা, তাহা হইতে বিরতিই পরম ধর্ম্ম। নচেৎ হিংসাকারীর নিবারণ জন্য হিংসা অধর্ম্ম নহে; বরং পরম ধর্ম্ম। এই কথা স্পষ্টীকৃত করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলাকের ইতিহাস শুনাইলেন। তাহার স্থূল তাৎপর্য্য এই যে, বলাক নামে ব্যাধ, প্রাণিগণের বিশেষ বিনাশ-হেতু এক শ্বাপদকে বিনাশ করিয়াছিল, করিবামাত্র তাহার উপর "আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি নিপতিত হইতে লাগিল; অপ্সরোদিগের অতি মনোরম গীতবাদ্য আরম্ভ হইল, এবং সেই ব্যাধকে স্বর্গে সমানীত করিবার নিমিত্ত বিমান সমুপস্থিত হইল।" ব্যাধের পুণ্য এই যে, সে হিংসাকারীর হিংসা করিয়াছিল।

অহিংসা পরম ধর্ম্ম, এই অর্থে বুঝিতে হইবে। তবে ধর্ম্ম্য প্রয়োজন ভিন্ন হিংসা করিবে না, এ কথায় একটা ভারি গোলযোগ হয় এবং জগতে চিরকাল হইয়া আসিতেছে। ধর্ম্ম্য প্রয়োজন কি? ধর্ম্ম কি? Inquisition কর্ত্তৃক মনুষ্যবধে ধর্ম্ম্য প্রয়োজন আছে বলিয়া কোটি কোটি মনুষ্য যমপুরে প্রেরিত হইয়াছিল। ধর্ম্মার্থই St. Bartholomew হত্যাকাণ্ড। ধর্ম্মাচরণ বিবেচনাতেই ক্রুসেদওয়ালাদিগের দ্বারা পৃথিবী নর-শোণিতপ্রবাহে পঙ্কিল হইয়াছিল। ধর্ম্মবিস্তারের জন্য মুসলমানেরা লক্ষ লক্ষ মনুষ্যহত্যা করিয়াছিল। বোধ হয়, ধর্ম্ম্য প্রয়োজন সম্বন্ধে ভ্রান্তিতে পড়িয়া মনুষ্য যত মনুষ্য নষ্ট করিয়াছে, তত মনুষ্য আর কোন কারণেই নষ্ট হয় নাই।

অর্জ্জুনেরও এখন সেই ভ্রান্তি উপস্থিত। তিনি মনে করিয়াছেন যে, সত্যরক্ষণধর্ম্মার্থ যুধিষ্ঠিরকে বধ করা কর্ত্তব্য। অতএব কেবল অহিংসা পরম ধর্ম্ম, এ কথা বলিলে তাঁহার ভ্রান্তির দূরীকরণ হয় না। এই জন্য কৃষ্ণের দ্বিতীয় কথা।

সে দ্বিতীয় কথা এই যে, **বরং মিথ্যা বাক্যও প্রয়োগ করা যাইতে পারে, কিন্তু কখনও প্রাণিহিংসা করা কর্ত্তব্য নহে।** * ইহার মূল তাৎপর্য্য এই যে, অহিংসা ও সত্য, এই দুইয়ের মধ্যে অহিংসা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। ইহার অর্থ এই:—নানাবিধ পুণ্যকর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য করা যায়; যথা—দান,

---

* যে বচনের উপর নির্ভর করিয়া কৃষ্ণকথিত এই ধর্ম্মতত্ত্ব সংস্থাপিত হইতেছে, তাহার মূল সংস্কৃত উদ্ধৃত করা কর্ত্তব্য।

"প্রাণিনামবধস্তাত সর্ব্বজ্যায়ান্ মতো মম।
অনৃতাং বা বদেদ্বাচং নতু হিংস্যাৎ কথঞ্চন॥"

পাঠক দেখিবেন, অহিংসা পরম ধর্ম্ম, এটা কৃষ্ণ

তপ, দেবভক্তি, সত্য, শৌচ, অহিংসা ইত্যাদি। ইহার মধ্যে সকলগুলি সমান নহে; ইতরবিশেষ হওয়াই সম্ভব। শৌচের মাহাত্ম্য, বা দানের মাহাত্ম্য কি সত্যের সঙ্গে বা অহিংসার সঙ্গে এক? যদি তাহা না হয়, যদি তারতম্য থাকে, তবে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কে? কৃষ্ণ বলেন, অহিংসা। সত্যের স্থান তাহার নীচে।

আমরা পাশ্চাত্যের শিষ্য। অনেক পাঠক এই কথায় শিহরিয়া উঠিবেন। পাশ্চাত্যেরা না কি বলিয়া থাকেন, কোনও অবস্থাতেই মিথ্যা বলা যাইতে পারে না। তা না হয় হইল; সে কথা এখন উঠিতেছে না। কিন্তু এমন কেহই বলিবেন না যে, পাশ্চাত্যদিগের মতে এক জন মিথ্যাবাদী একজন হত্যাকারীর অপেক্ষা গুরুতর পাপী, অথবা মিথ্যাবাদী ও হত্যাকারী তুল্য পাপী। তাঁহারা যে তাহা বলেন না, সমস্ত ইউরোপীয় দণ্ডবিধিশাস্ত্র তাহার প্রমাণ। যদি তাই হইল, তবে এখন কৃষ্ণের সঙ্গে পাশ্চাত্যের শিষ্যগণের মতভেদের এখানে কোন লক্ষণ দেখা যায় না। এখানে কেবল পাপের তারতম্যের কথা হইতেছে। কোন অধর্ম্মই কোন সময়ে করিতে নাই। নরহত্যাও করিতে নাই, মিথ্যা কথাও বলিতে নাই। কৃষ্ণের কথার ফল এই যে, যদি এমন অবস্থা কাহারও ঘটে যে, হয় তাহাকে মিথ্যা কথা বলিতে হইবে, নয় নরহত্যা করিতে হইবে, তবে সে বরং মিথ্যা কথা বলিবে, তথাপি নরহত্যা করিবে না। যদি এরূপ ধর্ম্মাত্মা নীতিজ্ঞ কেহ থাকেন এবং বলেন যে, বরং নরহত্যা করিবে, তথাপি মিথ্যা কথা বলিবে না, তবে আমাদের উত্তর এই যে, তাঁহার ধর্ম্ম তাঁহাতে থাক, এ নারকী ধর্ম্ম যেন ভারতবর্ষে বিরলপ্রচার হয়।

কৃষ্ণের এই মত। যদি অর্জ্জুন ইহার অনুবর্ত্তী হইবেন, তবে ভ্রাতৃবধ পাপ হইতে তাঁহাকে বিরত করিবার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট। কিন্তু অর্জ্জুন বলিতে পারেন, "এ ত গেল তোমার মত। কিন্তু লৌকিক ও প্রচলিত ধর্ম্ম কি? তোমার মতই যথার্থ হইতে পারে, কিন্তু ইহা যদি প্রচলিত ধর্ম্মানুমোদিত না হয়, তবে আমি জনসমাজে সত্যচ্যুত পাপাত্মা বলিয়া কলঙ্কিত হইব।" এজন্য কৃষ্ণ আপনার মত প্রকাশ করিয়া প্রচলিত ধর্ম্ম যাহা, তাহা বুঝাইতেছেন। তিনি বলিলেন, "হে ধনঞ্জয়, কুরুপিতামহ ভীষ্ম, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, বিদুর ও যশস্বিনী কুন্তী যে ধর্ম্মরহস্য কহিয়াছেন, আমি যথার্থরূপে তাহাই কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।" এই বলিয়া বলিলেন,—

"সাধু ব্যক্তিই সত্য কথা কহিয়া থাকেন, সত্য অপেক্ষা আর কিছুই শ্রেষ্ঠ নাই।* সত্যতত্ত্ব অতি দুর্জ্ঞেয়। সত্যবাক্য প্রয়োগ করাই অবশ্য কর্ত্তব্য।"

এই গেল স্থূলনীতি। তার পর বৰ্জ্জিততত্ত্ব বলিতেছেন,—

"কিন্তু যে স্থানে মিথ্যা সত্যস্বরূপ ও সত্য মিথ্যাস্বরূপ হয়, সে স্থলে মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করা দোষাবহ নহে।"

কিন্তু কখনও কি এমন হয়? এ কথাটা আবার উঠিবে; সেই সময়ে আমরা ইহার যথাসাধ্য বিচার করিব। তার পর কৃষ্ণ বলিতেছেন,

"বিবাহ, রতিক্রীড়া, প্রাণবিয়োগ ও সর্ব্বস্বাপহরণকালে এবং ব্রাহ্মণের নিমিত্ত মিথ্যা প্রয়োগ করিলেও পাতক হয় না।"

এখানে ঘোর বিবাদের স্থল, কিন্তু বিবাদ এখন থাক। কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদে উল্লিখিতরূপ আছে। উহা একটা শ্লোকের মাত্র অনুবাদ, কিন্তু মূলে ঐ বিষয়ে দুইটি শ্লোক আছে। দুইটি উদ্ধৃত করিতেছি।

১। প্রাণাত্যয়ে বিবাহে চ বক্তব্যমনৃতং ভবেৎ।
সর্ব্বস্বস্যাপহারে চ বক্তব্যমনৃতং ভবেৎ॥

২। বিবাহকালে রতিসম্প্রয়োগে
প্রাণাত্যয়ে সর্ব্বধনাপহারে।
বিপ্রস্য চার্থে হ্যনৃতং বদেত
পঞ্চানৃতান্যাহুরপাতকানি॥

এই দুইটি শ্লোকের একই অর্থ; কেবল প্রথম শ্লোকটিতে ব্রাহ্মণের কথা নাই, এই প্রভেদ। এখন পাঠকের মনে এই প্রশ্ন আপনি উদয় হইবে। একই অর্থবাচক দুইটি শ্লোকের প্রয়োজন কি?

ইহার উত্তর এই যে, এই দুইটিই অন্যত্র হইতে উদ্ধৃত —Quotation, কৃষ্ণের নিজোক্তি নহে। সংস্কৃত গ্রন্থে এমন স্থানে স্থানে দেখা যায় যে, অন্যত্র হইতে বচন ধৃত হয়, কিন্তু স্পষ্ট করিয়া বলা হয় না যে, এই বচন গ্রন্থান্তরের। এই মহাভারতীয় গীতাপর্ব্বাধ্যায়েই তাহার উদাহরণ গ্রন্থান্তরে দিয়াছি।

বাক্যের ঠিক অনুবাদ নহে। ঠিক অনুবাদ "আমার মতে প্রাণিগণের অহিংসা সর্ব্ব হইতে শ্রেষ্ঠ।" অর্থগত বিশেষ প্রভেদ নাই বলিয়া "অহিংসা পরমধর্ম্ম" ইতি পরিচিত বাক্যই ব্যবহার করিয়াছি।

* "ন সত্যাদ্বিদ্যতে পরম্।" ইতিপূর্ব্বে কৃষ্ণ বলিয়াছেন, প্রাণিনামবধস্তাত সর্ব্বজ্যায়ান্মতো মম।" এই দুইটি কথা পরস্পরবিরোধী। তাহার কারণ, একটি কৃষ্ণের মত, আর একটি ভীষ্মাদিকথিত প্রচলিত ধর্ম্মনীতি।

আমি আদালতের উপর নির্ভর করিয়া বলিতেছি না, এ বচন দুইটি অন্যত্র হইতে ধৃত। দ্বিতীয় শ্লোকটি, যথা—বিবাহকালে রতিসম্প্রযোগে ইত্যাদি—ইহা বশিষ্ঠের বচন। পাঠক বাশিষ্ঠের ১৬ অধ্যায়ে ৩৫ শ্লোকে তাহা দেখিবেন। ইহা মহাভারতের আদিপর্ব্বে, ৩৪১২ শ্লোকে, যেখানে কৃষ্ণের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই, সেখানেও কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া উদ্ধৃত হইয়াছে, যথা—

"ন নর্ম্মযুক্তং বচনং হিনস্তি
ন স্ত্রীষু রাজন্ ন বিবাহকালে।
প্রাণাত্যয়ে সর্ব্বধনাপহারে
পঞ্চানৃতান্যাহুরপাতকানি॥"

চারিটি ভিন্ন পাঁচটির কথা এখানে নাই, তথাপি বশিষ্ঠের সেই "পঞ্চানৃতান্যাহুরপাতকানি" আছে। প্রচলিত বচন সকল মুখে মুখে এইরূপ বিকৃত হইয়া যায়।

প্রথম শ্লোকটি পূর্ব্বগামী শ্লোকের সহিত লিখিতেছি ;

(ক) ভবেৎ সত্যমবক্তব্যং বক্তব্যমনৃতং ভবেৎ।

(খ) যত্রানৃতং ভবেৎ সত্যং সত্যঞ্চাপ্যনৃতং ভবেৎ॥

(গ) প্রাণাত্যয়ে বিবাহে চ বক্তব্যমনৃতং ভবেৎ।

(ঘ) সর্ব্বস্বস্যাপহারে চ বক্তব্যমনৃতং ভবেৎ॥

এক্ষণে মহাভারতের সভাপর্ব্ব হইতে একটি (১৩৮৪৪) শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি—কৃষ্ণের সহিত সেখানে কোন সম্বন্ধ নাই।

(চ) প্রাণান্তিকে বিবাহে চ বক্তব্যমনৃতং ভবেৎ।

(ছ) অনৃতেন ভবেৎ সত্যং সত্যেনৈবানৃতং ভবেৎ॥

পাঠক দেখিবেন, (গ) ও (চ) আর (খ) ও (ছ) একই। শব্দগুলিও প্রায় একই। অতএব ইহাও প্রচলিত পুরাতন বচন।

ইহা কৃষ্ণের মত নহে ; নিজের অনুমোদিত নীতি বলিয়াও তাহা বলিতেছেন না ; ভীষ্মাদির কাছে যাহা শুনিয়াছেন, তাহাই বলিতেছেন ; নিজের অনুমোদিত হউক বা না হউক, কেন তিনি ইহা অর্জ্জুনকে শুনাইতে বাধ্য, তাহা বলিয়াছি। সুতরাং কৃষ্ণচরিত্রে এ নীতির যাথার্থ্যাযাথার্থ্যবিচারে কোন প্রয়োজন হইতেছে না।

কিন্তু আসল কথা বাকি আছে। আসল কথা, কৃষ্ণের নিজের মতও এই যে, অবস্থাবিশেষে সত্য মিথ্যা হয় এবং মিথ্যা সত্য হয় ; এবং সে সকল স্থানে, মিথ্যাই প্রযোক্তব্য। এ কথা তিনি পরে বলিতেছেন।

প্রথমে বিচার্য্য, কখনও কি মিথ্যা সত্য হয়, এবং সত্য মিথ্যা হয় ? ইহার মূল উত্তর এই যে, যাহা ধর্ম্মানুমোদিত, তাহাই সত্য, আর যাহা অধর্ম্মের অনুমোদিত, তাহাই মিথ্যা। ধর্ম্মানুমোদিত মিথ্যা নাই ; এবং অধর্ম্মানুমোদিত সত্য নাই। তবে সত্যাসত্য মীমাংসা ধর্ম্মাধর্ম্ম মীমাংসার উপর নির্ভর করিতেছে। অতএব শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে ধর্ম্মতত্ত্ব নির্ণয় করিতেছেন। কথাগুলাতে গীতার উদারনীতির গম্ভীর শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। বলিতেছেন,—

"ধর্ম্ম ও অধর্ম্মতত্ত্ব নির্ণয়ের বিশেষ লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট আছে। কোন কোন স্থলে অনুমান দ্বারাও নিতান্ত দুর্ব্বোধ ধর্ম্মের নির্ণয় করিতে হয়।"

ইহার অপেক্ষা উদার ইউরোপেও কিছু নাই। তার পর—

"অনেকে শ্রুতিরে ধর্ম্মের প্রমাণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তাহাতে আমি দোষারোপ করি না ; কিন্তু অনেক স্থলে অনুমান দ্বারা ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট করিতে হয়।"

এই কথাটা লইয়া আজিও সভ্যজগতে বড় গোলমাল। যাঁহারা বলেন যে, যাহা দৈবোক্তি, বেদই হউক, বাইবেলই হউক, কোরাণই হউক,—তাহাতে যাহা আছে, তাহাই ধর্ম্ম—তাহার বাহিরে ধর্ম্ম কিছুই নাই—তাঁহারা আজও বড় বলবান্। তাঁহাদের মতে ধর্ম্ম দৈবোক্তিনির্দ্দিষ্ট, অনুমানের বিষয় নহে। এ কথা মনুষ্য জাতির উন্নতির পথে বড় দুরুত্তীর্য্য কণ্টক। আমাদের দেশের কথা দূরে থাকুক, ইউরোপেও আজিও এই মত উন্নতির পথ রোধ করিতেছে। আমাদের দেশের অবনতির ইহা একটি প্রধান কারণ। আজিও ভারতবর্ষের ধর্ম্মজ্ঞান বেদ ও মনুযাজ্ঞবল্ক্যাদি স্মৃতি দ্বারা নিরুদ্ধ ; অনুমানের পথ নিষিদ্ধ। অতি দূরদর্শী মনুষ্যাদর্শ শ্রীকৃষ্ণ লোকোন্নতির এই বিষম ব্যাঘাত সেই অতি প্রাচীনকালেও দেখিয়াছিলেন। এখন হিন্দু সমাজের ধর্ম্মজ্ঞান দেখিয়া বিষণ্ণমনে সেই শ্রীকৃষ্ণেরই শরণ লইতে ইচ্ছা করে।

কিন্তু অনুমানের একটা মূল চাহি। যেমন অগ্নি ভিন্ন ধূমোৎপত্তি হয় না, এই মূলের উপর অনুমান করি যে, সম্মুখস্থ ধূমবান্ পর্ব্বত বহ্নিমান্ও বটে, তেমনই এমন একটা লক্ষণ চাহি যে, তাহা দেখিলেই বুঝিতে পারিব যে, এই কর্ম্মটা ধর্ম্ম বটে। শ্রীকৃষ্ণ তাহার লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট করিতেছেন।

"ধর্ম্ম প্রাণিগণকে ধারণ করে বলিয়া ধর্ম্ম নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অতএব **যদ্দ্বারা প্রাণিগণের রক্ষা হয়, তাহাই ধর্ম্ম।**"

এই হইল কৃষ্ণকৃত ধর্ম্মের লক্ষণনির্দ্দেশ। কথাটায়, এখনকার Herbert, Spencer, Bentham, Mill ইতি সম্প্রদায়ের শিষ্যগণ কোন প্রকার অমত করিবেন না জানি। কিন্তু অনেকে বলিবেন, এ যে ঘোরতর হিতবাদ—বড় Utilitarian রকমের ধর্ম্ম। বড় Utilitarian রকম বটে, কিন্তু আমি প্রথাস্তরে বুঝাইয়াছি যে, ধর্ম্মতত্ত্ব হিতবাদ হইতে বিযুক্ত করা

যায় না ;—জগদীশ্বরের সার্ব্বভৌমিকত্ব এবং সর্ব্বময়তা হইতেই ইহাকে অনুমিত করিতে হয়। সঙ্কীর্ণ খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের সঙ্গে হিতবাদের বিরোধ হইতে পারে, কিন্তু যে হিন্দুধর্ম্মে বলে যে, ঈশ্বর সর্ব্বভূতে আছেন, হিতবাদ সে ধর্ম্মের প্রকৃত অংশ। এই কৃষ্ণবাক্যই যথার্থ ধর্ম্মলক্ষণ।

পূর্ব্বে বুঝাইয়াছি, যাহা ধর্ম্মানুমোদিত, তাহাই সত্য ; যাহা ধর্ম্মানুমোদিত নহে, তাহাই মিথ্যা। অতএব যাহা সর্ব্বলোকহিতকর তাহাই সত্য ; যাহা লোকের অহিতকর, তাহাই মিথ্যা। এই অর্থে, যাহা লৌকিক সত্য, তাহা ধর্ম্মতঃ মিথ্যা হইতে পারে। এবং যাহা লৌকিক মিথ্যা, তাহা ধর্ম্মতঃ সত্য হইতে পারে। এইরূপ স্থলে মিথ্যাও সত্যস্বরূপ এবং সত্যও মিথ্যাস্বরূপ হয়।

উদাহরণস্বরূপ কৃষ্ণ বলিতেছেন, "যদি কেহ কাহারে বিনাশ করিবার মানসে কাহারও নিকট তাহার অনুসন্ধান করে, তাহা হইলে **জিজ্ঞাসিত ব্যক্তির মৌনাবলম্বন করাই উচিত।** যদি একান্তই কথা কহিতে হয়, তবে সে স্থলে মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করাই কর্ত্তব্য। ঐরূপ স্থলে মিথ্যা সত্যস্বরূপ হয়।

এই প্রস্তাব উত্থাপিত করিবার পূর্ব্বেই, কৃষ্ণ, কৌশিকের উপাখ্যান অর্জ্জুনকে শুনাইয়া ভূমিকা করিয়াছিলেন। সে উপাখ্যান এই,—

"কৌশিক নামে এক বহুশ্রুত তপস্বীশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ গ্রামের অনতিদূরে নদীগণের সঙ্গমস্থানে বাস করিতেন। ঐ ব্রাহ্মণ সর্ব্বদা সত্যবাক্য প্রয়োগরূপ ব্রত অবলম্বন-পূর্ব্বক তৎকালে সত্যবাদী বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। একদা কতকগুলি লোক দস্যুভয়ে ভীত হইয়া বনমধ্যে প্রবেশ করিলে, দস্যুরাও ক্রোধভরে যত্ন সহকারে সেই বনে তাহাদিগকে অন্বেষণ করত সেই সত্যবাদী কৌশিকের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিল, 'হে ভগবন্! কতকগুলি ব্যক্তি এই দিকে আগমন করিয়াছিল, তাহারা কোন্ পথে গমন করিয়াছে, যদি আপনি তাহা অবগত থাকেন, তাহা হইলে সত্য করিয়া বলুন।' কৌশিক দস্যুগণ কর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া সত্যপালনার্থে তাহাদিগকে কহিলেন, 'কতকগুলি লোক এই বৃক্ষ, লতা ও বৃক্ষ পরিবেষ্টিত অটবীমধ্যে গমন করিয়াছে।' তখন সেই ক্রূরকর্ম্মা দস্যুগণ তাহাদের অনুসন্ধান পাইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ ও বিনাশ করিল। সূক্ষ্মধর্ম্মানভিজ্ঞ সত্যবাদী কৌশিকও সেই সত্যবাক্য জনিত পাপে লিপ্ত হইয়া ঘোর নরকে নিপতিত হইলেন।"

এ স্থলে ইহা অভিপ্রেত যে, কৌশিক অবগত হইয়াছিলেন যে, ইহারা দস্যু, পলায়িত ব্যক্তিগণের অনিষ্ট ইহাদের উদ্দেশ্য—নহিলে তাঁহার কোন পাপই নাই। যদি তাহা অবগত ছিলেন, তবে তিনি কৃষ্ণের মতে সত্যকথন দ্বারা পাপাচরণ করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে ঘোরতর মতভেদ। আমাদের প্রতীচ্য শিক্ষকদিগের নিকট শিখিয়াছি যে, সত্য নিত্য, কখনও মিথ্যা হয় না, এবং কোনও সময়ে মিথ্যা প্রযোক্তব্য নহে। সুতরাং কৃষ্ণের মত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট নিন্দিতই হইতে পারে। যাঁহারা ইহার নিন্দা করিবেন, (আমি ইহার সমর্থনও করিতেছি না) তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, কৌশিকের এ অবস্থায় কি করা উচিত ছিল? সহজ উত্তর,—মৌনাবলম্বন করা উচিত ছিল। সে কথা ত কৃষ্ণ নিজেই বলিয়াছেন —সে বিষয়ে মতভেদ নাই। যদি দস্যুরা মৌনী থাকিতে না দেয়? পীড়নাদির দ্বারা উত্তর গ্রহণ করে? কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, পীড়ন ও মৃত্যু স্বীকার করিয়াও কৌশিকের মৌনরক্ষা করা উচিত ছিল। তাহাতেও আমরা সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। তবে জিজ্ঞাস্য এই, ঈদৃশ ধর্ম্ম পৃথিবীতে সাধারণতঃ চলিবার সম্ভাবনা আছে কি না? ইহাতে সাংখ্যপ্রবচনকারের একটি সূত্র আমাদের মনে পড়িল। মহর্ষি কপিল বলিয়াছেন,— "নাশক্যোপদেশবিধিরুপদিষ্টেঽপ্যনুপদেশঃ।" * এরূপ ধর্ম্মপ্রচার চেষ্টা নিষ্ফল বলিয়া বোধ হয়। যদি সফল হয়, মানব জাতির পরম সৌভাগ্য।

কথাটা এখানে ঠিক তাহা নয়। কথাটা এই যে, যদি একান্তই কথা কহিতে হয়,—

'অবশ্যং কূজিতব্যে বা শঙ্কেরন্ বাপ্যকূজতঃ'

তাহা হইলে কি করিবে? সত্য বলিয়া জ্ঞানতঃ নরহত্যার সহায়তা করিবে? যিনি এইরূপ ধর্ম্মতত্ত্ব বুঝেন, তাঁহার ধর্ম্মবাদ যথার্থই হউক, অযথার্থই হউক, নিতান্ত নৃশংস বটে।

প্রতিবাদকারী বলিতে পারেন যে, কৃষ্ণোক্ত এই নীতির একটি ফল এমন হয় যে, হত্যাকারীর জীবন-রক্ষার্থ মিথ্যা শপথ করাও ধর্ম্ম। যিনি এরূপ আপত্তি করিবেন, তিনি এই সত্যতত্ত্ব কিছুই বুঝেন নাই। হত্যাকারীর দণ্ড মনুষ্যজীবন রক্ষার্থ নিতান্ত প্রয়োজনীয়, নহিলে যে যাহাকে পাইবে, মারিয়া ফেলিবে। অতএব হত্যাকারীর দণ্ডই ধর্ম্ম ; এবং তাহার রক্ষার্থ যে মিথ্যা বলে, সে অধর্ম্ম করে।

কৃষ্ণোক্ত এই সত্যতত্ত্ব নির্দোষ এবং মনুষ্যসাধারণের অবলম্বনীয় কি না, তাহা আমি এক্ষণে বলিতে প্রস্তুত নহি। তবে কৃষ্ণচরিত্র বুঝাইবার জন্য উহা পরিস্ফুট করিতে আমি বাধ্য। কিন্তু ইহাও বলিতে আমি বাধ্য

* প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

যে, পাশ্চাত্যেরা যে কারণে বলেন যে, সত্য সকল সময়েই সত্য, কোন অবস্থাতেই পরিহার্য্য নহে, তাহার মূলে একটা গুরুতর কথা আছে। কথাটা এই যে, ইহাই যদি ধর্ম্ম,—সত্য যেখানে মনুষ্যের হিতকারী, সেইখানেই ধর্ম্ম, আর যেখানে মনুষ্যের হিতকারী নয়, সেখানে অধর্ম্ম, ইহাই যদি ধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে মনুষ্যজীবন এবং মনুষ্যসমাজ অতিশয় বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে,—যে লোকহিত তোমার উদ্দেশ্য, তাহা ডুবিয়া যায়। অবস্থাবিশেষ উপস্থিত হইলে, সত্য অবলম্বনীয়, বা মিথ্যা অবলম্বনীয়, এ কথার মীমাংসা কে করিবে? যে সে মীমাংসা করিবে। যে সে মীমাংসা করিতে বসিলে মীমাংসা কখনও ধর্ম্মানুমোদিত হইতে পারে না। শিক্ষা, জ্ঞান, বুদ্ধি অনেকেরই অতি সামান্য; কাহারও সম্পূর্ণ নহে। বিচারশক্তি অধিকাংশেরই আদৌ অল্প, তার উপর ইন্দ্রিয়ের বেগ, স্নেহ মমতার বেগ, ভয়, লোভ, মোহ ইত্যাদির প্রকোপ। সত্য নিত্য পালনীয়, এরূপ ধর্ম্ম-ব্যবস্থা না থাকিলে মনুষ্যজাতি সত্যশূন্য হইবার সম্ভাবনা।

প্রাচীন হিন্দু ঋষিরা যে তাহা বুঝিতেন না, এমন নহে। বুঝিয়াই তাঁহারা বিশেষ করিয়া বিধান করিয়া দিয়াছেন, কোন্ কোন্ সময়ে মিথ্যা বলা যাইতে পারে। প্রাণাত্যয়ে ইত্যাদি সেই বিধি আমরা উদ্ধৃত করিয়াছি। মনু, গৌতম প্রভৃতি ঋষিদিগের মতও সেই প্রকার। তাঁহারা যে কয়টি বিশেষ বিধি বলিয়াছেন, তাহা ধর্ম্মানুমত কি না, তাহার বিচারে আমার প্রয়োজন নাই। কৃষ্ণকথিত সত্যতত্ত্ব পরিস্ফুট করাই আমার উদ্দেশ্য। কৃষ্ণও আধুনিক ইউরোপীয়-দিগের ন্যায় বুঝিয়াছিলেন যে, বিশেষ বিধি ব্যতীত এই সাধারণ বিধি কার্য্যে পরিণত করা সাধারণ লোকের পক্ষে অতি দুরূহ। কিন্তু তাঁহার বিবেচনায় প্রাণাত্যয়ে প্রভৃতি কয়েকটি বিশেষ অবস্থার নির্দ্দেশ করিলেই লোককে ধর্ম্মানুমত সত্যাচরণ বুঝান যায় না। তিনি তৎপরিবর্ত্তে কি জন্য এবং কিরূপ অবস্থায় সাধারণ বিধি উল্লঙ্ঘন করা উচিত, তাহাই বলিতেছেন। আমরা তাহা স্পষ্টীকৃত করিতেছি।

দান, তপ, শৌচ, আর্জ্জব, সত্য প্রভৃতি অনেকগুলি কার্য্যকে ধর্ম্ম বলা যায়। ইহার সকলগুলিই সাধারণতঃ ধর্ম্ম, আবার সকল গুলিই অবস্থা বিশেষে অধর্ম্ম। অনুপযুক্ত প্রয়োগ বা ব্যবহারই অধর্ম্ম। দান সম্বন্ধে উদাহরণ প্রয়োগ পূর্ব্বক বলিতেছেন, "সমর্থ হইলেও চৌরাদিকে ধন দান করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। পাপাত্মাদিগকে ধনদান করিলে অধর্ম্মাচরণ নিবন্ধন দাতাকেও নিতান্ত নিপীড়িত হইতে হয়।" সত্য সম্বন্ধেও সেইরূপ। শ্রীকৃষ্ণ তাহার যে দুইটি উদাহরণ দিয়াছেন, তাহার একটি উপরে উদ্ধৃত করিয়াছি, আর একটি এই;—

"যে স্থলে মিথ্যা শপথ দ্বারাও চৌরসংসর্গ হইতে মুক্তি লাভ হয়, সে স্থলে মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করাই শ্রেয়ঃ। সে মিথ্যা নিশ্চয়ই সত্যস্বরূপ হয়।"

ইহা ভিন্ন প্রচলিত ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে "প্রাণাত্যয়ে বিবাহে" ইত্যাদি কথা পুনরুক্ত হইয়াছে।

কৃষ্ণকথিত সত্যতত্ত্ব এইরূপ। ইহার স্থূল তাৎপর্য্য এইরূপ বুঝা গেল যে,—

১। যাহা ধর্ম্মানুমোদিত, তাহাই সত্য, যাহা ধর্ম্মবিরুদ্ধ, তাহা অসত্য।

২। যাহাতে লোকের হিত, তাহাই ধর্ম্ম।

৩। অতএব, যাহাতে লোকের হিত, তাহাই সত্য। যাহা তদ্বিরুদ্ধ, তাহা অসত্য।

৪। এইরূপ সত্য সর্ব্বদা সর্ব্বস্থানে প্রযোজ্য। কৃষ্ণভক্ত বলিতে পারেন যে, ইহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সত্যতত্ত্ব কোথাও কথিত হইয়াছে, এমন যদি দেখাইতে পার, তবে আমরা কৃষ্ণের মত পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি। যদি তাহা না পার, তবে ইহাই আদর্শ-মনুষ্যোচিত বাক্য বলিয়া স্বীকার কর।

উপসংহারে আমার ইহাও বক্তব্য যে, "যদ্দ্বারা লোকরক্ষা বা লোকহিত সাধিত হয়, তাহাই ধর্ম্ম। আমরা যদি ভক্তি সহকারে এই কৃষ্ণোক্তি হিন্দু-ধর্ম্মের মূলস্বরূপ গ্রহণ করিতে পারি, তাহা হইলে হিন্দুধর্ম্মের ও হিন্দুজাতির উন্নতির আর বিলম্ব থাকে না। তাহা হইলে যে উপধর্ম্মের ভস্মরাশিমধ্যে, পবিত্র এবং জগতে অতুল্য হিন্দুধর্ম্ম প্রোথিত হইয়া আছে, তাহা অনন্তকালে কোথায় উড়িয়া যায়। তাহা হইলে শাস্ত্রের দোহাই দিয়া কুক্রিয়া, অনর্থক সামর্থ্যব্যয় ও নিষ্ফল কালাতিপাত দেশ হইতে দূরীভূত হইয়া সৎকর্ম্ম ও সদনুষ্ঠানে হিন্দু-সমাজ প্রভাবান্বিত হইয়া উঠে। তাহা হইলে ভণ্ডামি, জাতি মারামারি, পরস্পরের বিদ্বেষ ও অনিষ্টচেষ্টা আর থাকে না। আমরা মহতী কৃষ্ণকথিতা নীতি পরিত্যাগ করিয়া, শূলপাণি ও রঘুনন্দনের পদানত—লোকহিত পরিত্যাগ করিয়া তিথিতত্ত্ব, মলমাসতত্ত্ব প্রভৃতি আটাইশ তত্ত্বের কচকচিতে মন্ত্রমুগ্ধ। আমাদের জাতীয় উন্নতি হইবে, ত কোন্ জাতি অধঃপাতে যাইবে? যদি এখনও আমাদের ভাগ্যোদয় হয়, তবে আমরা সমস্ত হিন্দু একত্র হইয়া "নমো ভগবতে বাসুদেবায়" বলিয়া কৃষ্ণপাদপদ্মে প্রণাম করিয়া তদুপদিষ্ট এই লোকহিতাত্মক ধর্ম্ম গ্রহণ করিব।* তাহা হইলে নিশ্চিতই আমরা জাতীয় উন্নতি সাধিত করিতে পারিব।

---

* বেন্থামের কথা ইংলণ্ড শুনিল—কৃষ্ণের কথা ভারতবর্ষ শুনিবে না?

সপ্তম পরিচ্ছেদ

কর্ণবধ

অর্জ্জুন কৃষ্ণের কথা বুঝিলেন, কিন্তু অর্জ্জুন ক্ষত্রিয়, প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবার জন্ত ব্যাকুল। অতএব যাহাতে দুই দিক্ রক্ষা হয়, কৃষ্ণকে তাহার উপায় অবধারণ করিতে বলিলেন।

কৃষ্ণ বলিলেন, অপমান মাননীয় ব্যক্তির মৃত্যুস্বরূপ। তুমি যুধিষ্ঠিরকে অপমানসূচক একটা কথা বল, তাহা হইলেই তাঁহাকে বধ করার তুল্য হইবে। অর্জ্জুন তখন যুধিষ্ঠিরকে অপমানসূচক বাক্যে ভর্ৎসিত করিলেন। কিন্তু কৃষ্ণকে আবার এক বিপদে ফেলিলেন। বলিলেন, "আমি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে অপমানিত করিয়া গুরুতর পাপ করিয়াছি, অতএব আত্মহত্যা করিব।" এই বলিয়া আবার অসি নিষ্কোষিত করিলেন। কৃষ্ণ তাঁহারও মৃত্যুর সোজা ব্যবস্থা করিলেন। বলিলেন, "আত্মশ্লাঘা সজ্জনের মৃত্যুস্বরূপ।" কথাটা কিছুমাত্র অন্তায় নহে। অর্জ্জুন তখন অনেক আত্মশ্লাঘা করিলেন। তখন সব গোল মিটিয়া গেল।

কৃষ্ণ অর্জ্জুনের সারথি, কিন্তু যেমন অর্জ্জুনের অশ্বের নিয়ন্তা, তেমনই এখন স্বয়ং অর্জ্জুনেরও নিয়ন্তা। কখনও অর্জ্জুনের আজ্ঞায় কৃষ্ণ রথ চালান, কখনও কৃষ্ণের আজ্ঞায় অর্জ্জুন চলেন। এখন কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কর্ণবধে নিযুক্ত করিলেন।

এই কর্ণবধ মহাভারতের একটি প্রধান ঘটনা। বহুকাল হইতে ইহার সূত্রপাত হইয়া আসিতেছে। কর্ণই অর্জ্জুনের প্রতিযোদ্ধা। ভীমার্জ্জুন নকুল সহদেব চারিজনে যুধিষ্ঠিরের জন্ত দিগ্বিজয় করিয়াছিলেন। কর্ণ একাই দুর্য্যোধনের জন্ত দিগ্বিজয় করিয়াছিল। অর্জ্জুন দ্রোণের শিষ্য, কর্ণ দ্রোণগুরু পরশুরামের শিষ্য। অর্জ্জুনের যেমন গাণ্ডীব ধনু ছিল, কর্ণের তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট বিজয় ধনু ছিল। অর্জ্জুনের কৃষ্ণ সারথি, মহাবীর শল্য কর্ণের সারথি। উভয়ে অনেক দিব্যাস্ত্রে শিক্ষিত। উভয়েই পরস্পরের বধের জন্ত বহুদিন হইতে প্রতিজ্ঞাত। অর্জ্জুন ভীষ্মদ্রোণবধে কিছুমাত্র যত্নশীল ছিলেন না, কর্ণবধে তাঁহার দৃঢ় যত্ন। কুন্তী যখন কর্ণকে কর্ণের জন্মবৃত্তান্ত অবগত করিয়া, তাঁহার নিকট আর পাঁচটি পুত্রের প্রাণভিক্ষা চাহিলেন, তখন কর্ণ যুধিষ্ঠির ভীম নকুল সহদেবের প্রাণভিক্ষা মাতাকে দিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই অর্জ্জুনের প্রাণভিক্ষা দিলেন না। তাঁহাকে বধ করিবেন, না হয় তাঁহার হস্তে নিহত হইবেন, ইহা নিশ্চিত জানাইলেন।

সেই মহাযুদ্ধে অন্ত অর্জ্জুনকে কৃষ্ণ লইয়া গেলেন। ইহারই জন্ত কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যুধিষ্ঠিরের শিবিরে লইয়া আসিলেন। ভীম অর্জ্জুনকে যুধিষ্ঠিরের সন্ধানে যাইতে বলিয়াছিলেন বটে, কিন্তু রণ শেষ না করিয়া অর্জ্জুনের আসিতে ইচ্ছা ছিল না। কৃষ্ণ জিদ করিয়া তাঁহাকে লইয়া আসিয়াছিলেন। ইহাই তাঁহার অভিপ্রেত যে, কর্ণ ক্রমাগত যুদ্ধ করিয়া পরিশ্রান্ত হউন, অর্জ্জুন ততক্ষণ বিশ্রামলাভ করিয়া পুনস্তেজস্বী হউন। এক্ষণে যুদ্ধে লইয়া যাইবার সময়ে অর্জ্জুনের আরও তেজোবৃদ্ধি জন্ত অর্জ্জুনের বীরত্বের প্রশংসা করিলেন, এবং তাঁহার পূর্ব্বকৃত দুষ্কর কার্য্য সকল স্মরণ করাইয়া দিলেন। দ্রৌপদীর অপমান, অভিমন্যুর অন্তায় যুদ্ধে হত্যা প্রভৃতি কর্ণকৃত পাণ্ডবপীড়নবৃত্তান্ত সকল স্মরণ করাইয়া দিলেন। এই বক্তৃতার মধ্য হইতে কোন অংশ উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই। কেবল ইহাই বক্তব্য, কৃষ্ণ বলিতেছেন, "পূর্ব্বে বিষ্ণু যেমন দানবগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন", "পূর্ব্বে দানবগণ বিষ্ণু কর্ত্তৃক নিহত হইলে" ইত্যাদি বাক্যে বুঝিতে পারি যে, কৃষ্ণ এখনও আপনাকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া পরিচয় দেন না। দেবত্বে কোন অধিকার প্রকাশ করেন না; ইহা প্রথম স্তরের একটি লক্ষণ। দ্বিতীয় স্তরে অন্তভাব।

পরে কর্ণার্জ্জুনের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তাহার বর্ণনায় আমার প্রয়োজন নাই। কথিত হইয়াছে যে, কর্ণের সর্পবাণ হইতে কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে রক্ষা করিয়াছিলেন। অর্জ্জুন উহার নিবারণ করিতে পারেন নাই। অতএব কৃষ্ণ পদাঘাতে অর্জ্জুনের রথ ভূমিতে কিঞ্চিৎ বসাইয়া দিলেন, অশ্বগণ জানু পাতিয়া পড়িয়া গেল। অর্জ্জুনের মস্তক বাঁচিয়া গেল; কেবল কিরীট কাটা পড়িল। অর্জ্জুন নিজে মস্তক অবনত করিলেও সেই ফল হইত। কথাটা সমালোচনার যোগ্য নহে। তবে কৃষ্ণের সারথ্যের প্রশংসা মহাভারতে পুনঃ পুনঃ দেখা যায়।

যুদ্ধের শেষভাগে কর্ণের রথচক্র মাটিতে বসিয়া গেল। কর্ণ তাহা তুলিবার জন্ত মাটিতে নামিলেন। যতক্ষণ রথচক্রের উদ্ধার না করেন, ততক্ষণের জন্ত অর্জ্জুনের কাছে তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। অর্জ্জুনও ক্ষমা করিয়াছিলেন দেখা যাইতেছে, কেন না, কর্ণ তাহার পর আবার রথে উঠিয়া পূর্ব্ববৎ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কর্ণের দুর্ভাগ্য যে, ক্ষমাপ্রার্থনা কালে তিনি অর্জ্জুনকে এমন কথা বলিয়াছিলেন যে, ধর্ম্মতঃ তিনি ঐ সময়ের জন্ত কর্ণকে ক্ষমা করিতে বাধ্য। কৃষ্ণ অধর্ম্মের শাস্তা। তিনি কর্ণকে তখন বলিলেন,—

"হে সূতপুত্র! তুমি ভাগ্যক্রমে এক্ষণে ধর্ম্ম স্মরণ করিতেছ। নীচাশয়েরা দুঃখে নিমগ্ন হইয়া প্রায়ই দৈবকে নিন্দা করিয়া থাকে; আপনাদিগের দুষ্কর্ম্মের প্রতি কিছুতেই দৃষ্টিপাত করে না। দেখ, দুর্য্যোধন,

দুঃশাসন ও শকুনি তোমার মতানুসারে একবস্ত্রা দ্রৌপদীরে যে সভায় আনয়ন করিয়াছিল, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় ছিল? যখন দুষ্ট শকুনি দুরভিসন্ধিপরতন্ত্র হইয়া তোমার অনুমোদনে অক্ষক্রীড়ায় নিতান্ত অনভিজ্ঞ রাজা যুধিষ্ঠিরকে পরাজয় করিয়াছিল, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় ছিল? যখন রাজা দুর্য্যোধন তোমার মতানুযায়ী হইয়া ভীমসেনকে বিষান্নভোজন করাইয়াছিল, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় ছিল? যখন তুমি বারণাবত নগরে জতুগৃহমধ্যে প্রসুপ্ত পাণ্ডবগণকে দগ্ধ করিবার নিমিত্ত অগ্নি প্রদান করিয়াছিলে, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় ছিল? যখন তুমি সভামধ্যে দুঃশাসনের বশীভূতা রজস্বলা দ্রৌপদীরে, 'হে কৃষ্ণে! পাণ্ডবগণ বিনষ্ট হইয়া শাশ্বত নরকে গমন করিয়াছে, এক্ষণে তুমি অন্য পতিরে বরণ কর,' এই কথা বলিয়া উপহাস করিয়াছিলে এবং অনার্য্য ব্যক্তিরা তাঁহাকে নিরপরাধে ক্লেশ প্রদান করিলে উপেক্ষা করিয়াছিলে, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় ছিল? যখন তুমি রাজ্যলোভে শকুনিকে আশ্রয় পূর্ব্বক পাণ্ডবগণকে দ্যূতক্রীড়া করিবার নিমিত্ত আহ্বান করিয়াছিলে, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় ছিল? যখন তুমি মহারথগণসমবেত হইয়া বালক অভিমন্যুরে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক বিনাশ করিয়াছিলে, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় ছিল? হে কর্ণ! তুমি যখন তত্তৎকালে অধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াছ, তখন আর এ সময় ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া তালুদেশ শুষ্ক করিলে কি হইবে! তুমি যে এখন ধর্ম্মপরায়ণ হইলেও জীবনসত্ত্বে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হইবে, ইহা কদাচ মনে করিও না। পূর্ব্বে নিষধদেশাধিপতি নল যেমন পুষ্কর দ্বারা দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া পুনরায় রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ধর্ম্মপরায়ণ পাণ্ডবগণও ভুজবলে সোমকদিগের সহিত শত্রুগণকে বিনাশ করত রাজ্যলাভ করিবেন। ধৃতরাষ্ট্র-তনয়গণ অবশ্যই ধর্ম্মসংরক্ষিত পাণ্ডবগণের হস্তে নিহত হইবে।"

কৃষ্ণের কথা শুনিয়া কর্ণ লজ্জায় মস্তক অবনত করিলেন। তাহার পর পূর্ব্বমত যুদ্ধ করিয়া অর্জ্জুনবাণে নিহত হইলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

দুর্য্যোধনবধ

কর্ণ মরিলে, দুর্য্যোধন শল্যকে সেনাপতি করিলেন। পূর্ব্বদিনের যুদ্ধে যুধিষ্ঠির ক্ষত্রিয় হইয়া কাপুরুষতা-কলঙ্ক সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এ কলঙ্ক অপনীত করা নিতান্ত আবশ্যক। সর্ব্বদর্শী কৃষ্ণ আজিকার প্রধান যুদ্ধে তাঁহাকে নিযুক্ত করিলেন। তিনিও সাহস করিয়া শল্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে বধ করিলেন।

এই দিন সমস্ত কৌরবসৈন্য পাণ্ডবগণ কর্তৃক নিহত হইল। দুই জন ব্রাহ্মণ—কৃপ ও অশ্বত্থামা, যদুবংশীয় কৃতবর্ম্মা এবং স্বয়ং দুর্য্যোধন, এই চারি জন মাত্র জীবিত রহিলেন। দুর্য্যোধন পলাইয়া গিয়া দ্বৈপায়ন হ্রদে ডুবিয়া রহিল। পাণ্ডবগণ খুঁজিয়া সেখানে তাহাকে ধরিল কিন্তু বিনা যুদ্ধে তাঁহাকে মারিল না।

যুধিষ্ঠিরের চিরকাল স্থূলবুদ্ধি, সেই স্থূলবুদ্ধির জন্যই পাণ্ডবদিগের এত কষ্ট। তিনি এই সময়ে সেই অপূর্ব্ব বুদ্ধি বিকাশ করিলেন। তিনি দুর্য্যোধনকে বলিলেন, "তুমি অভীষ্ট আয়ুধ গ্রহণ পূর্ব্বক আমাদের মধ্যে যে কোন বীরের সহিত সমাগত হইয়া যুদ্ধ কর। আমরা সকলে রণস্থলে অবস্থান পূর্ব্বক যুদ্ধব্যাপার নিরীক্ষণ করিব। আমি কহিতেছি যে, তুমি আমাদের মধ্যে একজনকে বিনাশ করিতে পারিলেই সমুদয় রাজ্য তোমার হইবে।" দুর্য্যোধন বলিলেন, "আমি গদাযুদ্ধ করিব।" কৃষ্ণ জানিতেন, গদাযুদ্ধে ভীম ব্যতীত কোন পাণ্ডবই দুর্য্যোধনের সমকক্ষ নহে। দুর্য্যোধন অন্য কোন পাণ্ডবকে যুদ্ধে আহুত করিলে পাণ্ডবদিগের আবার ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইবে। কেহ কিছু বলিলেন না, সকলেই বলদৃপ্ত; যুধিষ্ঠিরকে ভর্ৎসনার ভার কৃষ্ণই গ্রহণ করিলেন। সেই কার্য্য তিনি বিশিষ্ট প্রকারে নির্ব্বাহ করিলেন।

দুর্য্যোধন অতিশয় বলদৃপ্ত, সেই দর্পে যুধিষ্ঠিরের বুদ্ধির দোষ সংশোধন হইল। দুর্য্যোধন বলিলেন, "যাহার ইচ্ছা হয়, আমার সঙ্গে গদাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, সকলকেই বধ করিব।" তখন ভীমই গদা লইয়া যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন।

এখানে আবার মহাভারতের সুর বদল। আঠার দিন যুদ্ধ হইয়াছে, ভীম-দুর্য্যোধনে সর্ব্বদাই যুদ্ধ হইয়াছে, গদাযুদ্ধও অনেকবার হইয়াছে এবং বরাবরই দুর্য্যোধনই গদাযুদ্ধে ভীমের নিকট পরাজয় প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু আজ সুর উঠিল যে, ভীম গদাযুদ্ধে দুর্য্যোধনের তুল্য নহে। আজ ভীম পরাভূতপ্রায়। আসল কথাটা ভীমের সেই দারুণ প্রতিজ্ঞা। সভাপর্ব্বে যখন দ্যূতক্রীড়ার পর, দুর্য্যোধন দ্রৌপদীকে জিতিয়া লইল, তখন দুঃশাসন একবস্ত্রা রজস্বলা দ্রৌপদীকে কেশাকর্ষণ করিয়া সভামধ্যে আনিয়া বিবস্ত্রা করিতেছিলেন, তখন ভীম প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, আমি দুঃশাসনকে বধ করিয়া তাহার বুক চিরিয়া রক্ত খাইব। ভীম মহাশ্মশান তুল্য বিকট রণস্থলে দুঃশাসনকে নিহত করিয়া, রাক্ষসের মত তাহার

তপ্তশোণিত পান করিয়া সকলকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, 'আমি অমৃত পান করিলাম।' দুর্য্যোধন সেই সভামধ্যে "হাসিতে হাসিতে দ্রৌপদীর প্রতি দৃষ্টিপাত করত বসন উত্তোলন পূর্ব্বক সর্ব্বলক্ষণ-সম্পন্ন, বজ্রতুল্য দৃঢ়, কদলীদণ্ড ও করিশুণ্ডের তায় স্বীয় সব্য উরু তাঁহাকে দেখাইলেন।" তখন ভীম প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, "আমি মহাযুদ্ধে গদাঘাতে ঐ উরু যদি ভগ্ন না করি, তবে আমি যেন নরকে যাই।"

আজি সেই উরু গদাঘাতে ভাঙ্গিতে হইবে। কিন্তু একটা তাহার বিশেষ প্রতিবন্ধক—গদাযুদ্ধের নিয়ম এই যে, নাভির অধঃ গদাঘাত করিতে নাই—তাহা হইলে অন্যায় যুদ্ধ করা হয়। ন্যায়যুদ্ধে ভীম দুর্য্যোধনকে মারিতে পারিলেও প্রতিজ্ঞা রক্ষা হইবে না।

যে জ্যেষ্ঠতাতপুত্রের হৃদয়রুধির পান করিয়া নৃত্য করিয়াছে, সে রাক্ষসের কাছে মাথায় গদাঘাত ও উরুতে গদাঘাতে তফাৎ কি? যে বৃকোদর দ্রোণবধে মিথ্যাপ্রবঞ্চনার সময়ে প্রধান উদ্যোগী বলিয়া চিত্রিত হইয়াছেন, তিনি উরুতে গদাঘাতের জন্য অন্যের উপদেশসাপেক্ষ হইতে পারেন না। কিন্তু সেরূপ কিছু হইল না। ভীম উরুভঙ্গের প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া গেলেন। বলিয়াছি, দ্বিতীয় স্তরের কবি (এখানে তাঁহারই হাত দেখা যায়) চরিত্রের সুসঙ্গতি রক্ষণে সম্পূর্ণ অমনোযোগী। তিনি এখানে ভীমের চরিত্রের কিছুমাত্র সুসঙ্গতি রাখিলেন না; অর্জ্জুনেরও নহে। ভীম ভুলিয়া গেলেন যে, উরুভঙ্গ করিতে হইবে; আর যে পরমধার্ম্মিক অর্জ্জুন দ্রোণবধের সময় তাঁহার অস্ত্রগুরু, ধর্ম্মের আচার্য্য, সখা এবং পরমশ্রদ্ধার পাত্র কৃষ্ণের কথাতে মিথ্যা বলিতে স্বীকৃত হয়েন নাই, তিনি এক্ষণে স্বেচ্ছাক্রমে অন্যায় যুদ্ধে ভীমকে প্রবর্ত্তিত করিলেন। কিন্তু কথাটা কৃষ্ণ হইতে উৎপন্ন না হইলে কবির উদ্দেশ্য সফল হয় না। অতএব কথাটা এই প্রকারে উঠিল—

অর্জ্জুন ভীমদুর্য্যোধনের যুদ্ধ দেখিয়া কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ইহাদিগের মধ্যে গদাযুদ্ধে কে শ্রেষ্ঠ? কৃষ্ণ বলিলেন, ভীমের বল বেশী, কিন্তু দুর্য্যোধনের গদাযুদ্ধে যত্ন ও নৈপুণ্য অধিক। বিশেষ যাহারা প্রথমতঃ প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়া পুনরায় সমরে শত্রুগণের সম্মুখীন হয়, তাহাদিগকে জীবিতনিরপেক্ষ ও একাগ্রচিত্ত বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। জীবিতাশা-নিরপেক্ষ হইয়া সাহস সহকারে যুদ্ধ করিলে সংগ্রামে সে বীরকে কেহই পরাভব করিতে পারে না। অতএব যদি ভীম দুর্য্যোধনকে অন্যায় যুদ্ধে সংহার না করেন, তবে দুর্য্যোধন জয়ী হইয়া যুধিষ্ঠিরের কথামত পুনর্ব্বার রাজ্যলাভ করিবে।

কৃষ্ণের এইরূপ কথা শুনিয়া অর্জ্জুন স্বীয় "বামজানু আঘাত করত ভীমকে সঙ্কেত করিলেন।" তার পর ভীম দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ করিয়া তাহাকে নিপাতিত করিলেন। যেমন তার ঈশ্বরপ্রেরিত, অন্যায়ও তেমনই ঈশ্বরপ্রেরিত। ইহাই এখানে দ্বিতীয় স্তরের কবির উদ্দেশ্য।

যুদ্ধকালে সর্ব্বকমধ্যে বলরাম উপস্থিত ছিলেন। ভীম ও দুর্য্যোধন উভয়েই গদাযুদ্ধে তাঁহার শিষ্য। কিন্তু দুর্য্যোধনই প্রিয়তর। রেবতীবল্লভ সর্ব্বদাই দুর্য্যোধনের পক্ষপাতী। এক্ষণে দুর্য্যোধন ভীম কর্ত্তৃক অন্যায় যুদ্ধে নিপাতিত দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া লাঙ্গল উঠাইয়া তিনি ভীমের প্রতি ধাবমান হইলেন। বলা বাহুল্য যে, বলরামের স্কন্ধে সর্ব্বদাই লাঙ্গল, এই জন্য তাঁহার নাম হলধর। কেন তাঁহার এ বিড়ম্বনা, যদি কেহ এ কথা জিজ্ঞাসা করেন, তবে তাহার কিছু উত্তর দিতে পারিব না। যাই হউক, কৃষ্ণ বলরামকে অনুনয়-বিনয় করিয়া কোনরূপে শান্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। বলরাম কৃষ্ণের কথায় সন্তুষ্ট হইলেন না। রাগ করিয়া সে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

তার পর একটা বীভৎস ব্যাপার উপস্থিত হইল। ভীম নিপাতিত দুর্য্যোধনের মাথায় পদাঘাত করিতে-ছিলেন। যুধিষ্ঠির নিবারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ভীম তাহা শুনেন নাই। কৃষ্ণ তাঁহাকে এই কদর্য্য আচরণে নিযুক্ত দেখিয়া তাঁহাকে নিবারণ না করার জন্য যুধিষ্ঠিরকে তিরস্কার করিলেন। এ দিকে পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ দুর্য্যোধনের নিপাত জন্য ভীমের বিস্তর প্রশংসা ও দুর্য্যোধনের প্রতি কটূক্তি করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ তাহাতে বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—

"মৃতকল্প শত্রুর প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে।"

কৃষ্ণের এই সকল কথা কৃষ্ণের তায় আদর্শ পুরুষের উচিত। কিন্তু ইহার পর যাহা গ্রন্থমধ্যে পাই, তাহা অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার।

প্রথম আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে, কৃষ্ণ অন্যকে বলিলেন, "মৃতকল্প শত্রুর প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে।" কিন্তু ইহা বলিয়াই নিজে দুর্য্যোধনকে কটূক্তি করিতে লাগিলেন।

দুর্য্যোধনের উত্তর—দ্বিতীয় আশ্চর্য্য ব্যাপার। দুর্য্যোধন তখনও মরেন নাই, ভগ্নোরু হইয়া পড়িয়া ছিলেন। এক্ষণে কৃষ্ণের কটূক্তি শুনিয়া কৃষ্ণকে বলিতে লাগিলেন,—

"হে কংসদাসতনয়! ধনঞ্জয় তোমার বাক্যানুসারে বৃকোদরকে আমার উরু ভগ্ন করিতে সঙ্কেত করাতে ভীমসেন অধর্ম্মযুদ্ধে আমারে নিপাতিত করিয়াছে,

ইহাতে তুমি লজ্জিত হইতেছ না? তোমার অন্যায় উপায় দ্বারাই প্রতিদিন ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত সহস্র নরপতি নিহত হইয়াছেন। * তুমি শিখণ্ডীরে অগ্রসর করিয়া পিতামহকে নিপাতিত করিয়াছ। † অশ্বথামা নামে গজ নিহত হইলে, তুমিই কৌশলে আচার্য্যকে অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করাইয়াছিলে এবং সেই অবসরে দুরাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্ন তোমার সমক্ষে আচার্য্যকে নিহত করিতে উদ্যত হইলে তাহাকে নিষেধ কর নাই। ‡ কর্ণ অর্জ্জুনের বিনাশার্থ বহুদিন অতি যত্নসহকারে যে শক্তি রাখিয়াছিলেন, তুমি কৌশলক্রমে সেই শক্তি ঘটোৎকচের উপর নিক্ষেপ করাইয়া ব্যর্থ করাইয়াছ। ⁋ সাত্যকি তোমারই প্রবর্ত্তনা-পরতন্ত্র হইয়া ছিন্নহস্ত প্রায়োপবিষ্ট ভূরিশ্রবারে নিহত করিয়াছিলেন।*§ মহাবীর কর্ণ অর্জ্জুনবধে সমুদ্যত হইলে তুমি কৌশলক্রমে তাহার সর্পবাণ ব্যর্থ করিয়াছ। ॥ এবং পরিশেষে সূতপুত্রের রথচক্র ভূগর্ভে প্রবিষ্ট ও তিনি চক্রোদ্ধারের নিমিত্ত ব্যস্তসমস্ত হইলে তুমি কৌশলক্রমে অর্জ্জুন দ্বারা তাঁহার বিনাশসাধনে কৃতকার্য্য হইয়াছ। ʃ অতএব তোমার তুল্য পাপাত্মা, নির্দ্দয় ও নির্লজ্জ আর কে আছে? দেখ, তোমরা যদি ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও আমার সহিত ন্যায়যুদ্ধ করিতে, তাহা হইলে কদাপি জয়লাভে সমর্থ হইতে না। তোমার অনার্য্য উপায় প্রভাবেই আমরা স্বধর্ম্মানুগত পার্থিবগণের সহিত নিহত হইলাম।"

এই বাক্যপরম্পরা সম্বন্ধে আমি যে কয়েকটি ফুটনোট দিলাম, পাঠকের তৎপ্রতি মনোযোগ করিতে হইবে। বাক্যগুলি সম্পূর্ণ মিথ্যা। এইরূপ সম্পূর্ণ মিথ্যা তিরস্কার মহাভারতে আর কোথাও নাই। তাই বলিতেছিলাম যে, দুর্য্যোধনের উত্তর আশ্চর্য্য।

তৃতীয় আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে, কৃষ্ণ ইহার উত্তর করিলেন। পূর্ব্বে দেখিয়াছি, তিনি গম্ভীর প্রকৃতি ও ক্ষমাশীল, কাহারও কৃত তিরস্কারের উত্তর করেন না। সভামধ্যে শিশুপালকৃত অসহ্য নিন্দাবাদ বিনা বাক্যব্যয়ে সহ্য করিয়াছিলেন। বিশেষ দুর্য্যোধন এখন মুমূর্ষু, তাঁহার কথার উত্তরের কোন প্রয়োজন নাই; তাঁহাকে কোন প্রকারে কটূক্তি করা কৃষ্ণ নিজেই নিন্দনীয় বিবেচনা করেন। তথাপি কৃষ্ণ দুর্য্যোধনকৃত তিরস্কারের উত্তরও করিলেন এবং কটূক্তিও করিলেন। উত্তরে দুর্য্যোধনকৃত পাপাচার সকল বিবৃত করিয়া উপসংহারে বলিলেন, "বিস্তর অকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ, এক্ষণে তাহার ফলভোগ কর।"

উত্তরে দুর্য্যোধন বলিলেন, "আমি অধ্যয়ন, বিধিপূর্ব্বক দান, সসাগরা বসুন্ধরার শাসন, বিপক্ষগণের মস্তকোপরি অবস্থান, অন্য ভূপালের দুর্লভ দেবভোগ্য সুখসম্ভোগ ও অত্যুৎকৃষ্ট ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছি, পরিশেষে ধর্ম্মপরায়ণ ক্ষত্রিয়গণের প্রার্থনীয় সমরমৃত্যু প্রাপ্ত হইয়াছি। অতএব আমার তুল্য সৌভাগ্যশালী আর কে হইবে? এক্ষণে আমি ভ্রাতৃবর্গ ও বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত স্বর্গে চলিলাম, তোমরা শোকাকুলিতচিত্তে মৃতকল্প হইয়া এই পৃথিবীতে অবস্থান কর।"

এই উত্তর আশ্চর্য্য নহে। যে সর্ব্বস্ব পণ করিয়া হারিয়াছে, সে যদি দুর্য্যোধনের মত দাম্ভিক হয়, তবে সে যে জয়ী শত্রুকে বলিবে, আমিই জিতিয়াছি, তোমরা হারিয়াছ, ইহা আশ্চর্য্য নহে। দুর্য্যোধন এইরূপ কথা হ্রদে থাকিয়াও বলিয়াছিল। যুদ্ধে মরিলে যে স্বর্গলাভ হয়, তাহা সকল ক্ষত্রিয়ই বলিত। উত্তর আশ্চর্য্য নহে, কিন্তু উত্তরের ফল সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য। এই কথা বলিবামাত্র "আকাশ হইতে সুগন্ধি পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। গন্ধর্ব্বগণ সুমধুর বাদিত্রবাদন ও অপ্সরা সকল রাজা দুর্য্যোধনের যশোগান করিতে আরম্ভ করিলেন। সিদ্ধগণ তাঁহারে সাধুবাদ প্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন। সুগন্ধসম্পন্ন সুখস্পর্শ সমীরণ মন্দ মন্দ সঞ্চারিত হইতে লাগিল। দিঙ্মণ্ডল ও নভোমণ্ডল সুনির্ম্মল হইল। তখন বাসুদেব-প্রমুখ পাণ্ডবগণ দুর্য্যোধনের সেই সম্মানসূচক অদ্ভুত ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া সাতিশয় লজ্জিত হইলেন। এবং তাঁহারা ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, ভূরিশ্রবারে অধর্ম্মযুদ্ধে বিনাশ করিয়াছেন, এই কথা শ্রবণ করিয়া শোকপ্রকাশ করিতে লাগিলেন।"

---

* এরূপ বিবেচনা করিবার কারণ মহাভারতে কোথাও নাই। কোন স্তরেই না।

† কৃষ্ণ ইহার বিন্দুবিসর্গেও ছিলেন না, মহাভারতে কোথাও এমন কথা নাই।

‡ শত্রুকে বধ করিতে কেন নিষেধ করিবেন?

⁋ কৃষ্ণ তজ্জন্য কোন যত্ন বা কৌশল করেন নাই। মহাভারতে ইহাই আছে যে, কৌরবগণের অনুরোধানুসারেই কর্ণ ঘটোৎকচের প্রতি শক্তি প্রয়োগ করিলেন।

§ কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। এমন কথা মহাভারতে কোথাও নাই। সাত্যকি ভূরিশ্রবাকে নিহত করিয়াছিলেন বটে, কৃষ্ণ বরং ছিন্নবাহু ভূরিশ্রবাকে নিহত করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন।

॥ সে কৌশল, নিজপদবলে রথচক্র ভূপ্রোথিত করা। উপায় অতি ন্যায্য এবং সারথির ধর্ম্ম রথীর রক্ষা।

ʃ কি কৌশল? মহাভারতে এ সম্বন্ধে কৃষ্ণকৃত কোন কৌশলের কথা নাই। যুদ্ধে অর্জ্জুন কর্ণকে নিহত করিয়াছিলেন, ইহাই আছে।

যিনি মহাভারতের সর্ব্বপাপাত্মার অধম পাপাত্মা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, তাঁহার এরূপ অদ্ভুত সম্মান ও সাধুবাদ, আর যাঁহারা সকল ধর্ম্মাত্মার শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মাত্মা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, তাঁহাদের এই অধর্ম্মাচরণ জন্য লজ্জা, মহাভারতে আশ্চর্য্য। সিদ্ধগণ, অপ্সরোগণ, দেবগণ মিলিয়া প্রকটিত করিতেছেন,—দুরাত্মা দুর্য্যোধন ধর্ম্মাত্মা, আর কৃষ্ণ-পাণ্ডব মহাপাপিষ্ঠ। ইহা মহাভারতে আশ্চর্য্য, কেন না, ইহা সমস্ত মহাভারতের বিরোধী; সিদ্ধগণাদি দূরে থাক, কোন মনুষ্য দ্বারা এরূপ সাধুবাদ মহাভারতে আশ্চর্য্য বলিয়া বিবেচ্য, কেন না, মহাভারতের উদ্দেশ্যই দুর্য্যোধনের অধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-পাণ্ডবদিগের ধর্ম্মকীর্ত্তন। রসের উপর রসের কথা, তাঁহারা দুর্য্যোধনমুখে শুনিলেন যে, তাঁহারা ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও ভূরিশ্রবাকে অধর্ম্মযুদ্ধে বধ করিয়াছেন; অমনি শোকপ্রকাশ করিতে লাগিলেন। এত কাল তাহার কিছু জানিতেন না, এখন পরম শত্রুর মুখে জানিয়া, ভদ্রলোকের মত শোকপ্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা জানিতেন যে, ভীষ্ম বা কর্ণকে তাঁহারা কোন প্রকার অধর্ম্ম করিয়া মারেন নাই, কিন্তু পরম শত্রু দুর্য্যোধন বলিতেছে, তোমরা অধর্ম্ম করিয়া মারিয়াছ, কাজেই তাহাতে অবশ্য বিশ্বাস করিলেন; অমনি শোকপ্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা জানিতেন যে, ভূরিশ্রবাকে তাঁহারা কেহই বধ করেন নাই—সাত্যকি করিয়াছিলেন, সাত্যকিকে বরং কৃষ্ণ, অর্জ্জুন ও ভীম নিষেধ করিয়াছিলেন, তথাপি যখন পরমশত্রু দুর্য্যোধন বলিতেছে, তোমরাই মারিয়াছ, আর তোমরাই অধর্ম্মাচরণ করিয়াছ, তখন গোবেচারা পাণ্ডবেরা অবশ্য বিশ্বাস করিতে বাধ্য যে, তাঁহারাই মারিয়াছেন এবং তাঁহারাই অধর্ম্ম করিয়াছেন; কাজেই তাঁহারা ভদ্রলোকের মত কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। এ ছাই-ভস্ম মাথামুণ্ডের সমালোচনা বিড়ম্বনা মাত্র। তবে এ হতভাগ্য দেশের লোকের বিশ্বাস যে, যাহা কিছু পুঁথির ভিতর পাওয়া যায়, তাহাই ঋষিবাক্য, অভ্রান্ত, শিরোধার্য্য। কাজেই এ বিড়ম্বনা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আমাকে স্বীকার করিতে হইয়াছে।

আশ্চর্য্য কথাগুলা এখনও শেষ হয় নাই। কৃষ্ণ ত স্বকৃত অধর্ম্মাচরণ জন্য লজ্জিত হইলেন, আবার সেই সময়ে অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে পাণ্ডবদিগের কাছে সেই পাপাচরণ জন্য আত্মশ্লাঘা করিতে লাগিলেন।*

বলা বাহুল্য যে, দুর্য্যোধনকৃত তিরস্কারাদি বৃত্তান্ত সমস্তই অমৌলিক। দ্রোণবধাদি যে অমৌলিক, তাহা আমি পূর্ব্বে প্রমাণীকৃত করিয়াছি। যাহা অমৌলিক, তাহার প্রসঙ্গ যে অংশে আছে, তাহাও অবশ্য অমৌলিক। কেবল এতটুকু বলা আবশ্যক যে, এখানে দ্বিতীয় স্তরের কবিরও লেখনীচিহ্ন দেখা যায় না। এ তৃতীয় স্তরের বলিয়া বোধ করা যায়। দ্বিতীয় স্তরের কবি কৃষ্ণভক্ত, এই লেখক কৃষ্ণদ্বেষক। শৈবাদি অবৈষ্ণব বা বৈষ্ণবদ্বেষিগণও স্থানে স্থানে মহাভারতের কলেবর বাড়াইয়াছেন, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। তাঁহারা কেহ এখানে গ্রন্থকার, ইহাই সম্ভব। আবার এ কাজ কৃষ্ণভক্তের, ইহাও অসম্ভব নহে। নিন্দাচ্ছলে স্তুতি করা ভারতবর্ষীয় কবিদের একটা বিদ্যার মধ্যে। * এ তাও হইতে পারে।

---

* যথা—"ভীষ্ম-প্রমুখ মহারথগণ ও রাজা দুর্য্যোধন অসাধারণ সমরবিশারদ ছিলেন। তোমরা কদাচ তাঁহাদিগকে ধর্ম্মযুদ্ধে পরাজয় করিতে সমর্থ হইতে না। আমি কেবল তোমাদের হিতানুষ্ঠানপরতন্ত্র হইয়া অনেক উপায় উদ্ভাবন ও মায়াবল প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে নিপাতিত করিয়াছি। আমি যদি ঐরূপ কুটিল ব্যবহার না করিতাম, তাহা হইলে তোমাদিগের জয়লাভ, রাজ্যলাভ ও অর্থলাভ কখনই হইত না। দেখ, ভীষ্ম প্রভৃতি সেই চারি মহাত্মা ভূমণ্ডলে অতিরথ বলিয়া প্রথিত আছেন। লোকপালগণ সমবেত হইয়াও তাঁহাদিগকে ধর্ম্মযুদ্ধে নিহত করিতে সমর্থ হইতেন না। আর দেখ, সমরে অপরিশ্রান্ত গদাধারী এই দুর্য্যোধনকে দণ্ডধারী কৃতান্তও ধর্ম্মযুদ্ধে বিনষ্ট করিতে পারেন না; অতএব ভীম যে উহারে অসৎ উপায় অবলম্বন-পূর্ব্বক নিপাতিত করিয়াছেন, সে কথা আর আন্দোলন করিবার আবশ্যক নাই। এইরূপ প্রসিদ্ধ আছে যে, শত্রুসংখ্যা বৃদ্ধি হইলে তাহাদিগকে কূটযুদ্ধে বিনাশ করিবে। মহাত্মা সুরগণ কূটযুদ্ধের অনুষ্ঠান করিয়াই অসুরগণকে নিহত করিয়াছিলেন; তাঁহাদের অনুকরণ করা সকলেরই কর্ত্তব্য।" এমন নির্লজ্জ অধর্ম্ম আর কোথাও শুনা যায় না।

* একটা উদাহরণ না দিলে অনেক পাঠক বুঝিতে পারিবেন না; স্মর ভস্মীভূত হওয়ার পর বিলাপকালে রতির মুখে ভারতচন্দ্র বলিতেছেন:—

"একের কপালে রহে, আরের কপাল দহে
আগুনের কপালে আগুন।"

ইহা আগুনকে গালি বটে, কিন্তু একটু ভাষান্তর করিলেই স্তুতি। যথা,—

"হে অগ্নে! তুমি শঙ্করললাটবিহারী, লোকধ্বংসকারী; তোমার শিখা ছাগাবিশিষ্ট হউক।" পাঠক ভারতচন্দ্র-প্রণীত অন্নদামঙ্গলে দক্ষকৃত শিবনিন্দা দেখিবেন। গ্রন্থের কলেবর-বৃদ্ধিভয়ে তাহা উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না।

সে যাই হউক, ইহার পরেই আবার দেখিতে পাই যে, দুর্য্যোধন অশ্বত্থামার নিকট বলিতেছেন, "আমি অমিততেজা বাসুদেবের মাহাত্ম্য বিলক্ষণ অবগত আছি। তিনি আমাদের ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট করেন নাই। অতএব আমার জন্য শোক করিবার প্রয়োজন কি ?"

এমন বারোইয়ারী কাণ্ডের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া কি বিড়ম্বনা নয় ?

নবম পরিচ্ছেদ

যুদ্ধশেষ

অন্যায় যুদ্ধে দুর্য্যোধন হত হইয়াছে বলিয়া যুধিষ্ঠিরের ভয় হইল যে, তপঃ প্রভাবশালিনী গান্ধারী শুনিয়া পাণ্ডবদিগকে ভস্ম করিয়া ফেলিবেন। এ জন্য তিনি কৃষ্ণকে অনুরোধ করিলেন যে, তিনি হস্তিনায় গমন করিয়া ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীকে শান্ত করিয়া আসুন।

কথাটা প্রথম স্তরের নয়, কেন না, এখানে যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে বলিতেছেন, "তুমি অব্যয় এবং লোকের সৃষ্টি ও সংহারকর্ত্তা।" ইহার কিছু পূর্ব্বেই অর্জ্জুনের জিজ্ঞাসামতে কৃষ্ণ বলিলেন, "ব্রহ্মাস্ত্র প্রভাবে পূর্ব্বেই এই রথে অগ্নি সংলগ্ন হইয়াছিল। কেবল আমি উহাতে অধিষ্ঠান করিয়াছিলাম বলিয়া এ কাল পর্য্যন্ত দগ্ধ হয় নাই।" অর্থাৎ আমি দেবতা বা বিষ্ণু। ইহা দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্তর।

কৃষ্ণ হস্তিনায় গিয়া ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীকে কিছু বুঝাইলেন। উদ্ধৃত করা বা সমালোচনার যোগ্য কোন কথাই নাই।

তার পর, দুর্য্যোধন অশ্বত্থামাকে সেনাপতিত্বে বরণ করিলেন। কিন্তু তখন সেনার মধ্যে সেই অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মা। এই খানে শল্যপর্ব্ব শেষ।

তাহার পর সৌপ্তিক পর্ব্ব। সৌপ্তিকপর্ব্ব অতি ভীষণ ব্যাপারে পরিপূর্ণ। প্রথমাংশে অশ্বত্থামা চোরের মত নিশীথ কালে পাণ্ডবশিবিরে প্রবিষ্ট হইয়া নিদ্রাভিভূত ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, এবং সমস্ত পাঞ্চালগণকে, সেনা ও সেনাপতিগণকে বধ করিলেন। পঞ্চপাণ্ডব ও কৃষ্ণ ভিন্ন পাণ্ডবপক্ষে আর কেহ রহিল না।

বস্তুতঃ এই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ কুরুপাঞ্চালের যুদ্ধ। পাঞ্চালেরা নির্ব্বংশ হইলে যুদ্ধ শেষ হইল।

তাহার পরে, সৌপ্তিক পর্ব্বে একটা ঐষীক পর্ব্বাধ্যায় আছে। অশ্বত্থামা এই চৌর্য্যোচিত কার্য্য করিয়া পাণ্ডবদিগের ভয়ে বনে গিয়া লুক্কায়িত হইলেন। পাণ্ডবেরা পরদিন তাঁহার অন্বেষণে ধাবিত হইলেন। অশ্বত্থামা ধরা পড়িয়া আত্মরক্ষার্থ অতি ভয়ঙ্কর ব্রহ্মশিরা অস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। অর্জ্জুনও তন্নিবারণার্থ ব্রহ্মশিরা অস্ত্রের প্রতিপ্রয়োগ করিলেন। দুই অস্ত্রের তেজে ব্রহ্মাণ্ডধ্বংসের সম্ভাবনা দেখিয়া ঋষিরা মিটমাট করিয়া দিলেন। অশ্বত্থামা শিরস্থিত সহজমণি কাটিয়া দ্রৌপদীকে উপহার দিলেন। এ দিকে ব্রহ্মশিরা অস্ত্র পাণ্ডব-বধূ উত্তরার গর্ভ নষ্ট করিল।

এই সকল অনৈসর্গিক ব্যাপার আমরা ছাড়িয়া দিতে পারি। আমাদের সমালোচনার যোগ্য কৃষ্ণচরিত্র ঘটিত কোন কথাই সৌপ্তিকপর্ব্বে নাই।

তার পর স্ত্রীপর্ব্ব। স্ত্রীপর্ব্ব আরও ভীষণ। নিহত বীরবর্গের স্ত্রীগণের ইহাতে আর্ত্তনাদ। এমন ভীষণ আর্ত্তনাদ আর কখনও শুনা যায় না। কিন্তু কৃষ্ণসম্বন্ধীয় দুইটি কথা মাত্র আছে।

১। ধৃতরাষ্ট্র আলিঙ্গন কালে ভীমকে চূর্ণ করিবেন, কল্পনা করিয়াছিলেন ; কিন্তু কৃষ্ণ তাঁহার জন্য লৌহভীম সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন ; অন্ধরাজা তাহাই চূর্ণ করিলেন। অনৈসর্গিক বৃত্তান্ত আমাদের পরিহার্য্য। এ জন্য এ সম্বন্ধে আর কিছু বলিবার নাই।

২। গান্ধারী কৃষ্ণের নিকট অনেক বিলাপ করিয়া শেষ কৃষ্ণকেই অভিসম্পাত করিলেন। বলিলেন :—

"জনার্দ্দন ! যখন কৌরব ও পাণ্ডবগণ পরস্পরের ক্রোধানলে পরস্পর দগ্ধ হয়, তৎকালে তুমি কি নিমিত্ত তদ্বিষয়ে উপেক্ষা প্রদর্শন করিলে ? তোমার বহুসংখ্যক ভৃত্য ও সৈন্য বিদ্যমান আছে ; তুমি শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন, বাক্যবিশারদ ও অসাধারণ বল-বীর্য্যশালী, তথাপি তুমি ইচ্ছাপূর্ব্বক কৌরবগণের বিনাশে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছ। অতএব তোমারে অবশ্যই ইহার ফলভোগ করিতে হইবে। আমি পতিশুশ্রূষা দ্বারা যে কিছু তপঃসঞ্চয় করিয়াছি, সেই নিতান্ত দুর্লভ তপঃপ্রভাবে তোমারে অভিশাপ প্রদান করিতেছি যে, তুমি যেমন কৌরব ও পাণ্ডবগণের জ্ঞাতিবিনাশে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছ, তেমনি তোমার আপনার জ্ঞাতিবর্গও তোমা কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইবে। অতঃপর ষট্ত্রিংশৎ * বর্ষ সমুপস্থিত হইলে তুমি অমাত্য, জ্ঞাতি ও পুত্রহীন ও বনচারী হইয়া অতি কুৎসিত উপায় দ্বারা নিহত হইবে। তোমার কুলরমণীগণও ভরতবংশীয় মহিলাগণের ন্যায় পুত্রহীন ও বন্ধুবান্ধবহীন হইয়া বিলাপ ও পরিতাপ করিবে।"

কৃষ্ণ হাসিয়া উত্তর করিলেন, "দেবি ! আমা ব্যতিরেকে যদুবংশীয়দিগের বিনাশ করে, এমন আর

---

* "ষট্ত্রিংশৎ" বলেন কেন ?

কেহ নাই। আমি যে যদুবংশ ধ্বংস করিব, তাহা অনেক দিন অবধারণ করিয়া রাখিয়াছি। আমার যাহা অবশ্যকর্ত্তব্য, এক্ষণে আপনি তাহাই কহিলেন। যাদবেরা মনুষ্য বা দেবদানবগণেরও বধ্য নহে। সুতরাং তাহারা পরস্পর বিনষ্ট হইবে।

এইরূপে দ্বিতীয় স্তরের কবি মৌসলপর্ব্বের পূর্ব্ব-সূচনা করিয়া রাখিলেন। মৌসলপর্ব্ব যে দ্বিতীয় স্তরের, তাহারও পূর্ব্বসূচনা আমরাও করিয়া রাখিয়াছি।

দশম পরিচ্ছেদ

বিধিসংস্থাপন

এক্ষণে আমরা অতি দুস্তর কুরুক্ষেত্রযুদ্ধবিবরণ হইতে উত্তীর্ণ হইলাম। কৃষ্ণচরিত্র পুনর্ব্বার সুবিমল ও প্রভাসিত হইতে চলিল। কিন্তু শান্তি ও অনুশাসন-পর্ব্বে কৃষ্ণ ঈশ্বর বলিয়া স্পষ্টতঃ স্বীকৃত।

যুদ্ধান্তের অবশেষে, অগাধবুদ্ধি যুধিষ্ঠির আবার এক অগাধবুদ্ধির খেলা খেলিলেন। তিনি অর্জ্জুনকে বলিলেন, "এত জ্ঞাতি প্রভৃতি বধ করিয়া আমার মনে কোন সুখ নাই—আমি বনে যাইব, ভিক্ষা করিয়া খাইব।" অর্জ্জুন বড় রাগ করিলেন—যুধিষ্ঠিরকে অনেক বুঝাইলেন। তখন অর্জ্জুন ও যুধিষ্ঠিরে বড় ভারি বাদানুবাদ উপস্থিত হইল। শেষ ভীম, নকুল, সহদেব, দ্রৌপদী ও স্বয়ং কৃষ্ণ অনেক বুঝাইলেন; দুর্ব্বলচিত্ত যুধিষ্ঠির কিছুতেই বুঝেন না। ব্যাস, নারদ প্রভৃতি বুঝাইলেন। কিছুতেই না। শেষে কৃষ্ণের কথায় মহাসমারোহের সহিত হস্তিনা প্রবেশ করিলেন।

কৃষ্ণ তাঁহাকে রাজ্যাভিষিক্ত করাইলেন। যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের স্তব করিলেন। সে স্তব জগদীশ্বরের। যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের স্তব করিয়া নমস্কার করিলেন। কৃষ্ণ বয়ঃকনিষ্ঠ; যুধিষ্ঠির আর কখন তাঁহাকে স্তব বা নমস্কার করেন নাই।

এ দিকে কৌরবশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম, শরশয্যায় শয়ান, তীব্র যন্ত্রণায় কাতর, উত্তরায়ণের প্রতীক্ষায় শরীররক্ষা করিতেছেন। তিনি ঋষিগণ-পরিবৃত হইয়া সর্ব্বময়, সর্ব্বাধার, পরমপুরুষকে ধ্যান করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্তুতিবাক্যে চঞ্চলচিত্ত হইয়া কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরাদি সঙ্গে লইয়া ভীষ্মকে দর্শন দিতে চলিলেন। পথে যাইতে যাইতে যুধিষ্ঠির উপযাচক হইয়া পরশুরামের উপাখ্যান কৃষ্ণের নিকট শ্রবণ করিলেন।

কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে এইরূপ অনুমতি করিয়াছিলেন যে, ভীষ্মের নিকট জ্ঞানলাভ কর। ভীষ্ম সর্ব্বধর্ম্মবেত্তা; তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার জ্ঞান তাঁহার সঙ্গে যাইবে; তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে সেই জ্ঞান, জগতে প্রচারিত হয়, ইহা তাঁহার ইচ্ছা। এই জন্য তিনি যুধিষ্ঠিরকে তাঁহার নিকট জ্ঞানলাভাদি করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। ভীষ্মকে ও যুধিষ্ঠিরাদিকে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া অনুগৃহীত করিতে আদেশ করিলেন।

ভীষ্ম স্বীকৃত হইলেন না। বলিলেন, "ধর্ম্মকর্ম্ম সবই তোমা হইতে; তুমিই সব জান; তুমিই যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ প্রদান কর। আমি আপনি শরখচিত হইয়া মুমূর্ষু ও অত্যন্ত ক্লিষ্ট, আমার বুদ্ধিভ্রংশ হইতেছে, আমি পারিয়া উঠিব না।" তখন কৃষ্ণ বলিলেন, "আমার বরে তোমার শরাঘাত নিবন্ধন সমস্ত ক্লেশ বিদূরিত হইবে; তোমার অন্তঃকরণ জ্ঞানালোকে সমুজ্জ্বল হইবে, বুদ্ধি অব্যতিক্রান্ত থাকিবে। তোমার মন কেবল সত্ত্বগুণাশ্রয় করিবে। তুমি দিব্যচক্ষুঃ প্রভাবে ভূতভবিষ্যৎ সমস্ত দেখিবে।"

কৃষ্ণের কথায় সেইরূপ হইল। কিন্তু তথাপি ভীষ্ম আপত্তি করিলেন। কৃষ্ণকে বলিলেন, "তুমি স্বয়ং কেন যুধিষ্ঠিরকে হিতোপদেশ প্রদান করিলে না।"

উত্তরে কৃষ্ণ বলিলেন, "সমস্ত হিতাহিত কর্ম্ম আমা হইতে সম্ভূত। চন্দ্রের শীতাংশু-ঘোষণাও যেরূপ, আমার যশোলাভ সেইরূপ। আমার এখন ইচ্ছা, আপনাকে সমধিক যশস্বী করি। আমার সমুদয় বুদ্ধি সেই জন্য আপনাকে অর্পণ করিয়াছি।" ইত্যাদি।

তখন ভীষ্ম প্রফুল্লচিত্তে যুধিষ্ঠিরকে ধর্ম্মতত্ত্ব শুনাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজধর্ম্ম, আপদ্ধর্ম্ম এবং মোক্ষধর্ম্ম অতি সবিস্তারে শুনাইলেন। মোক্ষধর্ম্মের পর শান্তি-পর্ব্ব সমাপ্ত।

এই শান্তিপর্ব্বে তিন স্তরই দেখা যায়। প্রথম স্তরই ইহার কঙ্কাল ও তার পর যিনি যেমন ধর্ম্ম বুঝিয়াছেন, তিনিই তাহা শান্তিপর্ব্বভুক্ত করিয়াছেন। ইহার মধ্যে আমাদের সমালোচনার যোগ্য একটা গুরুতর কথা আছে। কেবল ধার্ম্মিককে রাজা করিলেই ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপিত হইল না। আজ ধার্ম্মিক যুধিষ্ঠির রাজা ধর্ম্মাত্মা; কাল তাঁহার উত্তরাধিকারী পাপাত্মা হইতে পারেন। এই জন্য ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন করিয়া তাহার রক্ষার জন্য ধর্ম্মানুমত ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করাও চাই। রণজয় রাজ্য-স্থাপনের প্রথম কার্য্যমাত্র; তাহার শাসন জন্য বিধি-ব্যবস্থাই (Legislation) প্রধান কার্য্য। কৃষ্ণ সেই কার্য্যে ভীষ্মকে নিযুক্ত করিলেন। ভীষ্মকে নিযুক্ত করিলেন—তাহার বিশেষ কারণ ছিল, আদর্শ নীতিজ্ঞই তাহা লক্ষিত করিতে পারেন। কৃষ্ণ সেই সকল কারণ নিজেই ভীষ্মকে বুঝাইতেছেন।

"আপনি বয়োবৃদ্ধ এবং শাস্ত্রজ্ঞান এবং সদাচার-সম্পন্ন। রাজধর্ম্ম ও অপরাপর ধর্ম্ম কিছুই আপনার

অবিদিত নাই। জন্মাবধি আপনার কোনও দোষই লক্ষিত হয় নাই। মহর্ষিগণ আপনারে সর্ব্বধর্ম্মবেত্তা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। অতএব পিতার ন্যায় আপনিই এই ভূপালগণকে নীতি উপদেশ প্রদান করুন। আপনি প্রতিনিয়ত ঋষি ও দেবগণের উপাসনা করিয়াছেন। এক্ষণে এই ভূপতিগণ আপনার নিকট ধর্ম্মবৃত্তান্ত শ্রবণোৎসুক হইয়াছেন। অতএব আপনাকে অবশ্যই বিশেষরূপে সমস্ত ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতে হইবে। পণ্ডিতদিগের মতে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করা বিদ্বান্ ব্যক্তিরই কর্ত্তব্য।"

তার পর অনুশাসনপর্ব্ব। এখানেও হিতোপদেশ; যুধিষ্ঠির শ্রোতা, ভীষ্ম বক্তা। কতকগুলা বাজে কথা লইয়া এই অনুশাসনপর্ব্ব গ্রথিত হইয়াছে। সমুদয়ই বোধ হয় তৃতীয় স্তরের। তন্মধ্যে আমাদের প্রয়োজনীয় বিষয় কিছু নাই।

পরিশেষে ভীষ্ম স্বর্গারোহণ করিলেন। ইহাই কেবল প্রথম স্তরের।

একাদশ পরিচ্ছেদ

কামগীতা

ভীষ্মের স্বর্গারোহণের পর যুধিষ্ঠির আবার কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিলেন। বাহানা লইলেন, বনে যাইব। অনেকে অনেক প্রকার বুঝাইলেন। কিন্তু কৃষ্ণ এবার রোগের প্রকৃত ঔষধ প্রয়োগ করিলেন। সেরূপ রোগ-নির্ণয় করা আর কাহারও সাধ্য নহে। যুধিষ্ঠিরের প্রকৃত রোগ অহঙ্কার। ইংরেজি বিদ্যালয়ে শিখায় Pride শব্দ অহঙ্কার শব্দের প্রতিশব্দ। বস্তুতঃ তাহা নহে। অহঙ্কার ও মাৎসর্য্য পৃথক্ পৃথক্ বস্তু। "আমি এই সকল করিতেছি," "ইহা আমার," "এই আমার সুখ," "ইহা আমার দুঃখ" এইরূপ জ্ঞানই অহঙ্কার। এই-ই যুধিষ্ঠিরের দুঃখের কারণ। আমি এই পাপ করিয়াছি—আমার এই শোক উপস্থিত; আমি লইয়াই সব, অতএব আমি বনে যাইব, ইত্যাদি আত্মাভিমানই যুধিষ্ঠিরের এই কাঁদাকাটির মূলে আছে। সেই মূলে কুঠারাঘাত পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে উদ্ধৃত করা, এই ধর্ম্মবেত্তৃশ্রেষ্ঠের উদ্দেশ্য। এ জন্য তিনি পরুষবাক্যে যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, "আপনার এখনও শত্রু অবশিষ্ট আছে। আপনার শরীরের অভ্যন্তরে যে অহঙ্কাররূপ দুর্জ্জয় শত্রু রহিয়াছে, তাহা কি আপনি নিরীক্ষণ করিতেছেন না?" এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা অহঙ্কারকে বিনষ্ট করার সম্বন্ধে একটি রূপক যুধিষ্ঠিরকে শুনাইলেন। তার পর তিনি যুধিষ্ঠিরকে যে অত্যুৎকৃষ্ট জ্ঞানোপদেশ দিলেন, তাহা সবিস্তারে উদ্ধৃত করিতেছি। যে নিষ্কাম ধর্ম্ম আমরা গীতায় পড়ি, তাহা এখানেও আছে। এইরূপ অতি মহৎ ধর্ম্মোপদেশেই কৃষ্ণচরিত্র বিশেষ স্ফূর্ত্তি পায়।

"হে ধর্ম্মরাজ! ব্যাধি দুই প্রকার,—শারীরিক ও মানসিক। ঐ দুই প্রকার ব্যাধি পরস্পরের সাহায্যে পরস্পর সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। শরীরে যে ব্যাধি উপস্থিত হয়, তাহারে শারীরিক এবং মনোমধ্যে যে পীড়া উপস্থিত হয়, তাহারে মানসিক ব্যাধি কহে। কফ, পিত্ত ও বায়ু এই তিনটি শরীরের গুণ, যখন এই তিন গুণ সমভাবে অবস্থান করে, তখন শরীরকে সুস্থ এবং যখন ঐ গুণত্রয়ের মধ্যে বৈষম্য উপস্থিত হয়, তখনই শরীরকে অসুস্থ বলা যায়। পিত্তের আধিক্য হইলে কফের হ্রাস ও কফের আধিক্য হইলে পিত্তের হ্রাস হইয়া থাকে। শরীরের ন্যায় আত্মারও তিনটি গুণ আছে। ঐ তিনটি গুণের নাম সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। ঐ গুণত্রয় সমভাবে অবস্থান করিলে আত্মার স্বাস্থ্যলাভ হয়। ঐ গুণত্রয়ের মধ্যে একের আধিক্য হইলে অন্যের হ্রাস হয়। হর্ষ উপস্থিত হইলে শোক এবং শোক উপস্থিত হইলে হর্ষ তিরোহিত হইয়া যায়। দুঃখের সময় কি কেহ সুখানুভব করে এবং সুখের সময় কি তাহার দুঃখানুভব হয়? যাহা হউক, এক্ষণে সুখদুঃখ উভয়ই স্মরণ করা আপনার কর্ত্তব্য নহে। সুখদুঃখাতীত পরব্রহ্মকে স্মরণ করা আপনার বিধেয়। * * * পূর্ব্বে ভীষ্ম দ্রোণাদির সহিত আপনার যে ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল, এক্ষণে একমাত্র অহঙ্কারের সহিত তাহা অপেক্ষা অধিক ভীষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইয়াছে। ঐ যুদ্ধে অভিমুখীন হওয়া আপনার অবশ্যকর্ত্তব্য। যোগ ও তদুপযুক্ত কার্য্য সমুদয় অবলম্বন করিলেই এই যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিবেন। এই যুদ্ধে শরনিকর, ভৃত্য ও বন্ধুবর্গের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই; একমাত্র মনকে সহায় করিয়া ঐ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। ঐ যুদ্ধে জয়লাভ করিতে না পারিলে দুঃখের পরিসীমা থাকিবে না। অতএব আপনি আমার এই উপদেশানুসারে অচিরাৎ অহঙ্কারকে পরাজয়পূর্ব্বক শোক পরিত্যাগ করিয়া সুস্থচিত্তে পৈতৃকরাজ্য প্রতিপালন করুন।

"হে ধর্ম্মরাজ! কেবল রাজ্যাদি পরিত্যাগ করিয়া সিদ্ধিলাভ করা কদাপি সম্ভবপর নহে। ইন্দ্রিয়সমুদয়কে পরাজয় করিতে পারিলেও সিদ্ধিলাভ হয় কি না সন্দেহ। যাহারা রাজ্যাদি বিষয় সমুদায় পরিত্যাগ করিয়াও মনে মনে বিষয়ভোগের বাসনা করে, তাহাদিগের ধর্ম্ম ও সুখ তোমার শত্রুগণ লাভ করুক। মমতা সংসার-প্রাপ্তির ও নির্ম্মমতা ব্রহ্মলাভের কারণ বলিয়া নির্দ্দি

হইয়া থাকে। ঐ বিরুদ্ধধর্ম্মাবলম্বী মমতা ও নির্ম্মমতা লোকসমুদায়ের চিত্তে অলক্ষিতভাবে অবস্থানপূর্ব্বক পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ ও পরাজয় করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের অস্তিত্বের অবিনশ্বরতা নিবন্ধন জগতের অস্তিত্ব অবিনশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করেন, প্রাণি-গণের দেহনাশ করিলেও তাঁহারে হিংসাপাপে লিপ্ত হইতে হয় না; যে ব্যক্তি স্থাবর-জঙ্গমসংবলিত সমুদায় জগতের আধিপত্য লাভ করিয়াও মমতা পরিত্যাগ করিতে পারেন, তাঁহাকে কখনই সংসারপাশে বদ্ধ হইতে হয় না। আর যে ব্যক্তি অরণ্যে ফলমূলাদি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিয়াও বিষয়বাসনা পরিত্যাগ করিতে না পারে, তাহারে নিশ্চয়ই সংসারজালে জড়িত হইতে হয়। অতএব ইন্দ্রিয় ও বিষয় সমুদায় মায়াময় বলিয়া নিশ্চয় করা তোমার অবশ্যকর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি এই সমুদায়ের প্রতি কিছুমাত্র মমতা না করেন, তিনি নিশ্চয়ই সংসার হইতে মুক্তিলাভে সমর্থ হন। কাম-পরতন্ত্র মূঢ় ব্যক্তিরা কদাচ প্রশংসার আস্পদ হইতে পারে না। কামনা মন হইতে সমুৎপন্ন হয়; উহা সমুদয় প্রবৃত্তির মূল কারণ। যে সমুদায় মহাত্মা বহু জন্মের অভ্যাস বশতঃ কামনারে অধর্ম্মরূপে পরিজ্ঞাত হইয়া ফললাভের বাসনা সহকারে দান, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, ব্রত, যজ্ঞ, বিবিধ নিয়ম, ধ্যানমার্গ ও যোগমার্গ আশ্রয় না করেন, তাঁহারাই এককালে কামনারে পরাজয় করিতে সমর্থ হন। কামনিগ্রহই যথার্থ ধর্ম্ম ও মোক্ষের বীজস্বরূপ সন্দেহ নাই।

"অতঃপর পুরাবিৎ পণ্ডিতগণ যে কামগীতা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, আমি এক্ষণে তোমার নিকট তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। কামনা স্বয়ং কহিয়াছে যে, নির্ম্মমতা ও যোগাভ্যাস ভিন্ন কেহই আমারে পরাজয় করিতে সমর্থ হয় না। যে ব্যক্তি জপাদি কার্য্য দ্বারা আমারে জয় করিতে চেষ্টা করে, আমি তাহার মনে অভিমানরূপে আবির্ভূত হইয়া তাহার কার্য্য বিফল করিয়া থাকি। যে ব্যক্তি বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা আমারে পরাজিত করিতে চেষ্টা করে, আমি তাহার মনে জঙ্গমমধ্যগত জীবাত্মার ন্যায় বাক্যরূপে উদিত হই। যে ব্যক্তি বেদবেদান্ত সমালোচন দ্বারা আমারে শাসন করিতে যত্নবান্ হয়, আমি তাহার মনে স্থাবরান্তর্গত জীবাত্মার ন্যায় অব্যক্তরূপে অবস্থান করি। যে ব্যক্তি ধৈর্য্য দ্বারা আমারে জয় করিতে চেষ্টা করে, আমি কখনই তাহার মন হইতে অপনীত হই না। যে ব্যক্তি তপস্যা দ্বারা আমারে পরাজয় করিতে যত্ন করে, আমি তাহার তপস্যাতেই প্রাদুর্ভূত হই এবং যে ব্যক্তি মোক্ষার্থী হইয়া আমারে জয় করিতে বাসনা করে, আমি তাহাকে লক্ষ্য করিয়া নৃত্য ও উপহাস করিয়া থাকি। পণ্ডিতেরা আমারে সর্ব্বভূতের অবধ্য সনাতন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

"হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি আপনারে কামগীতা সবিস্তারে কীর্ত্তন করিলাম। অতএব কামনারে পরাজয় করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। আপনি বিধিপূর্ব্বক অশ্বমেধ ও অন্যান্য সুসমৃদ্ধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া কামনারে ধর্ম্মবিষয়ে নীত করুন। বারংবার বন্ধুবিয়োগে অভিভূত হওয়া আপনার নিতান্ত অনুচিত। আপনি অনুতাপ দ্বারা কখনই তাঁহাদিগের পুনর্দ্দর্শন লাভে সমর্থ হইবেন না। অতএব এক্ষণে মহাসমারোহে সুসমৃদ্ধ যজ্ঞ সমুদায়ের অনুষ্ঠান করুন, তাহা হইলেই ইহলোকে অতুল কীর্ত্তি ও পরলোকে উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে সমর্থ হইবেন।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

কৃষ্ণপ্রয়াণ

ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপিত হইল; ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে। পাণ্ডবদিগের সঙ্গে কৃষ্ণের জন্য এ গ্রন্থের সম্বন্ধ; মহাভারতে যে জন্য কৃষ্ণের দেখা পাই, তাহা সব ফুরাইল। এইখানে মহাভারত হইতে অন্তর্হিত হওয়া উচিত। কিন্তু রচনাকণ্ডূতিগ্রস্তেরা তত সহজে কৃষ্ণকে ছাড়িবার পাত্র নহেন। ইহার পরে অর্জ্জুনের মুখে তাঁহারা একটা অপ্রাসঙ্গিক, অদ্ভুত কথা তুলিলেন। তিনি বলিলেন, তুমি যুদ্ধকালে আমাকে যে ধর্ম্মোপদেশ দিয়াছিলে, সব ভুলিয়া গিয়াছি। আবার বল। কৃষ্ণ বলিলেন, কথা বড় মন্দ। আমার আর সে সব কথা মনে হইবে না। আমি তখন যোগযুক্ত হইয়াই সে সব উপদেশ দিয়াছিলাম। আর তুমিও বড় নির্ব্বোধ ও শ্রদ্ধাশূন্য; তোমায় আর কিছু বলিতে চাহি না, তথাপি এক পুরাতন ইতিহাস শুনাইতেছি।

কৃষ্ণ ঐ ইতিহাসোক্ত ব্যক্তিকে অবলম্বন করিয়া অর্জ্জুনকে আবার কিছু তত্ত্বজ্ঞান শুনাইলেন। পূর্ব্বে যাহা শুনাইয়াছিলেন, তাহা গীতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। এখন যাহা শুনাইলেন গ্রন্থকার তাহার নাম রাখিয়াছেন "অনুগীতা।" ইহার এক ভাগের নাম "ব্রাহ্মণগীতা।"

ভগবদ্গীতা, প্রজাগর, সনৎসুজাতীয়, মার্কণ্ডেয়সমস্যা, এই অনুগীতা প্রভৃতি অনেকগুলি ধর্ম্মসম্বন্ধীয় গ্রন্থ মহাভারতের মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়া, এক্ষণে মহাভারতের অংশ বলিয়া প্রচলিত। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ গীতা, কিন্তু অন্যগুলিতেও অনেক সারগর্ভ কথা পাওয়া যায়। অনুগীতাও উত্তম গ্রন্থ। "তাই মোক্ষ-

মূলর” ইহাকে তাঁহার “Sacred books of the East” নামক গ্রন্থাবলীমধ্যে স্থান দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলাঙ, একণে যিনি বোম্বাই হাইকোর্টের জজ, তিনি ইহা ইংরেজিতে অনুবাদিত করিয়াছেন। কিন্তু গ্রন্থ যেমনই হউক, ইহাতে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। গ্রন্থ যেমনই হউক, ইহা কৃষ্ণোক্তি নহে। গ্রন্থকার বা অপর কেহ যেরূপ অবতারণা করিয়া ইহাকে কৃষ্ণের মুখে উক্ত করিয়াছেন, তাহাতে বুঝা যায় যে, ইহা কৃষ্ণোক্তি নহে; জোড়া দাগ বড় স্পষ্ট, কষ্টেও জোড় লাগে নাই। গীতোক্ত ধর্ম্মের সঙ্গে অনুগীতোক্ত ধর্ম্মের এরূপ কোন সাদৃশ নাই যে, ইহাকে গীতাবেত্তার উক্তি বিবেচনা করা যায়। শ্রীযুক্ত কাশীনাথ ত্র্যম্বক নিজকৃত অনুবাদের যে দীর্ঘ উপক্রমণিকা লিখিয়াছেন, তাহাতে সন্তোষজনক প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন যে, অনুগীতা গীতার অনেক শতাব্দী পরে রচিত হইয়াছিল। সে প্রমাণের বিস্তারিত আলোচনায় আমাদের প্রয়োজন নাই। কৃষ্ণচরিত্রের কোন অংশই অনুগীতার উপর নির্ভর করে না। তবে অনুগীতা ও ব্রাহ্মণগীতা (বা ব্রহ্মগীতা) যে প্রকৃতপক্ষে প্রক্ষিপ্ত, তাহার প্রমাণার্থ ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়ে ইহার কিছুমাত্র প্রসঙ্গ নাই।

অর্জ্জুনকে উপদিষ্ট করিয়া কৃষ্ণ, অর্জ্জুন ও যুধিষ্ঠিরাদির নিকট বিদায়গ্রহণ পূর্ব্বক দ্বারকাযাত্রা করিলেন। এই বিদায় মানবপ্রকৃতিসুলভ স্নেহাভিব্যক্তিতে পরিপূর্ণ। কৃষ্ণের মানবিকতার পূর্ব্বে আমরা অনেক উদাহরণ দিয়াছি। অতএব ইহার সবিস্তার বর্ণন নিষ্প্রয়োজন।

পথিমধ্যে উতঙ্কমুনির সঙ্গে কৃষ্ণের সাক্ষাৎ বর্ণিত হইয়াছে। কৃষ্ণ যুদ্ধ নিবারণ করেন নাই বলিয়া, উতঙ্ক তাঁহাকে শাপ দিতে প্রস্তুত। কৃষ্ণ বলিলেন, “শাপ দিও না, দিলে তোমার তপঃক্ষয় হইবে। আমি সন্ধিস্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, আর আমি জগদীশ্বর।” তখন উতঙ্ক তাঁহাকে প্রণাম করিয়া স্তব করিলেন। কৃষ্ণের বিশ্বরূপ দেখিতে চাহিলেন, কৃষ্ণও বিশ্বরূপ দেখাইলেন। তার পর জোর করিয়া উতঙ্ককে অভিলষিত বরদান করিলেন। তার পর চণ্ডাল আসিল, কুকুর আসিল, চণ্ডাল উতঙ্ককে কুকুরের প্রস্রাব খাইতে বলিল, ইত্যাদি ইত্যাদি নানারূপ বীভৎস ব্যাপার আছে। এই উতঙ্ক-সমাগমবৃত্তান্ত মহাভারতের পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়ে নাই, সুতরাং ইহা মহাভারতের অংশ নহে। কাজেই এ সম্বন্ধে আমাদের কোন কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। স্পষ্টতঃ এখানে তৃতীয় স্তর দেখা যায়।

দ্বারকায় গিয়া কৃষ্ণ বন্ধুবান্ধবের সহিত মিলিত হইলে বসুদেব তাঁহার নিকট যুদ্ধবৃত্তান্ত শুনিতে ইচ্ছা করিলেন। কৃষ্ণ যুদ্ধবৃত্তান্ত পিতাকে যাহা শুনাইলেন, তাহা সংক্ষিপ্ত, অত্যুক্তিশূন্য এবং কোন প্রকার অনৈসর্গিক ঘটনার প্রসঙ্গদোষরহিত। অথচ সমস্ত স্থূল ঘটনা প্রকাশিত করিলেন। কেবল অভিমন্যুবধ গোপন করিলেন। কিন্তু সুভদ্রা তাঁহার সঙ্গে দ্বারকায় গিয়াছিলেন, সুভদ্রা অভিমন্যুবধের প্রসঙ্গ স্বয়ং উত্থাপন করিলেন। তখন কৃষ্ণ সে বৃত্তান্ত সবিস্তারে বলিলেন।

এ দিকে যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের বিদায়কালে তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, অশ্বমেধ যজ্ঞকালে পুনর্ব্বার আসিতে হইবে। সেই যজ্ঞের সময় উপস্থিত। অতএব তিনি যাদবগণ-পরিবৃত হইয়া পুনর্ব্বার হস্তিনায় গমন করিলেন।

কৃষ্ণ তথায় আসিলে, অভিমন্যুপত্নী উত্তরা একটি মৃতপুত্র প্রসব করিলেন। কৃষ্ণ তাহাকে পুনর্জ্জীবিত করিলেন। কিন্তু ইহা হইতে এমন সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, কৃষ্ণ ঐশী শক্তির প্রয়োগ দ্বারা এই কার্য্য সম্পাদন করিলেন। এখনকার অনেক ডাক্তার মৃতসন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে তাহাকে পুনর্জ্জীবিত করিতে পারেন, তাহা আমরা অনেকেই জানি। ইহা দ্বারা কেবল ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, যাহা তখনকার লোক আর কেহ জানিত না, কৃষ্ণ তাহা জানিতেন। তিনি আদর্শ মনুষ্য, এ জন্য সর্ব্বপ্রকার বিদ্যা ও জ্ঞান তাঁহার অধিকৃত হইয়াছিল।

তার পর নির্ব্বিঘ্নে যজ্ঞ সম্পন্ন হইল। কৃষ্ণও দ্বারকায় পুনরাগমন করিলেন। তার পর আর পাণ্ডবগণের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই।

সপ্তম খণ্ড

প্রভাস

"যোঽসৌ যুগসহস্রান্তে প্রদীপ্তার্চ্চির্বিভাবসুঃ।
সংভক্ষয়তি ভূতানি তস্মৈ ঘোরাত্মনে নমঃ॥"
শান্তিপর্ব্ব, ৪৭ অধ্যায়ঃ।

প্রথম পরিচ্ছেদ

যদুবংশধ্বংস

তার পর আশ্রমবাসিক পর্ব্ব। ইহার সঙ্গে কৃষ্ণের কোন সম্বন্ধ নাই। তার পর অতি ভয়াবহ মৌসলপর্ব্ব। ইহাতে সমস্ত যদুবংশের নিঃশেষ ধ্বংস ও কৃষ্ণবলরামের দেহত্যাগ কথিত হইয়াছে। যদুবংশীয়েরা পরস্পরকে নিহত করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ নিজে এই মহাভয়ানক ব্যাপার নিবারণের কোন উপায় করেন নাই—বরং অনেক যাদব তাঁহার হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইয়াছিল, এইরূপ কথিত হইয়াছে।

সে বৃত্তান্ত এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে। গান্ধারী-কথিত ষট্‌ত্রিংশৎ বৎসর অতীত হইয়াছে। যাদবেরা অত্যন্ত দুর্নীতিপরায়ণ হইয়া উঠিয়াছেন। একদা, বিশ্বামিত্র, কণ্ব ও নারদ—এই লোকবিশ্রুত ঋষিত্রয় দ্বারকায় উপস্থিত। দুর্বিনীত যাদবেরা কৃষ্ণপুত্র শাম্বকে মেয়ে সাজাইয়া ঋষিদিগের কাছে লইয়া গিয়া বলিলেন, ইনি গর্ভবতী, ইঁহার কি পুত্র হইবে? পুরাণেতিহাসে ঋষিগণ অতি ভয়ানক ক্রোধপরবশস্বরূপ বর্ণিত হইয়া থাকেন। কথায় কথায় তাঁহাদের অভিসম্পাতের ঘটা দেখিলে, তাঁহাদিগকে জিতেন্দ্রিয় ঈশ্বরপরায়ণ ঋষি না বলিয়া অতি নৃশংস নরপিশাচ বলিয়া গণ্য করিতে হয়। এখনকার দিনে যে কেহ ভদ্রলোক এমন একটা তামাসা হাসিয়া উড়াইয়া দিত; অন্ততঃ একটু তিরস্কার বাক্যই যথেষ্ট হয়। কিন্তু এই জিতেন্দ্রিয় মহর্ষিগণ একেবারে সমস্ত যদুবংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে বলিয়া অভিসম্পাত করিলেন। বলিলেন, লৌহময় মুষল প্রসব করিবে, আর সেই মুষল হইতে কৃষ্ণবলরাম ভিন্ন সমস্ত যদুবংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। কৃষ্ণ এ কথা অবগত হইলেন। তিনি বলিলেন, মুনিগণ যাহা বলিয়াছেন, তাহা অবশ্য হইবে। শাপ নিবারণের কোন উপায় করিলেন না।

অগত্যা শাম্ব, পুরুষই হউক আর যাই হউক, এক লোহার মুষল প্রসব করিল। যাদবগণের রাজা (কৃষ্ণ রাজা নহেন, উগ্রসেন রাজা বা প্রধান) ঐ মুষল চূর্ণ করিতে আজ্ঞা দিলেন। মুষল চূর্ণ হইল—চূর্ণ সকল সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইল। এদিকে যাদবগণ সমস্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন। তখন কৃষ্ণ তাঁহাদিগের "বিনাশবাসনায়" যাদবগণকে প্রভাসতীর্থে যাত্রা করিতে বলিলেন।

প্রভাসে আসিয়া, যাদবগণ সুরাপান করিয়া নানা-বিধ উৎসব করিতে লাগিল। শেষে পরস্পর কলহ আরম্ভ করিল। কুরুক্ষেত্রের মহারথী সাত্যকি প্রথম বিবাদ আরম্ভ করিলেন। তিনি কৃতবর্ম্মার সঙ্গে বিবাদ করিলে প্রদ্যুম্ন সাত্যকির পক্ষাবলম্বন করিলেন। সাত্যকি কৃতবর্ম্মার শিরশ্ছেদ করিলেন। তখন কৃতবর্ম্মার জাতি গোষ্ঠী (যাদবেরা, বৃষ্ণি, ভোজ, অন্ধক, কুকুর ইতি ভিন্ন ভিন্ন বংশীয়) সাত্যকি ও প্রদ্যুম্নকে নিহত করিল। তখন কৃষ্ণ এক মুষ্টি এরকা (শরগাছ) ক্রুদ্ধ হইয়া গ্রহণ করিলেন, এবং তদ্দ্বারা অনেক যাদব নিপাতিত করিলেন। গ্রন্থান্তরে আছে যে, এই শরগাছ মুষলচূর্ণ, যাহা রাজাজ্ঞানুসারে সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছিল। মহাভারতে সে কথাটা পাইলাম না, কিন্তু লিখিত আছে যে, কৃষ্ণ এরকামুষ্টি গ্রহণ করাতে তাহা মুষলরূপে পরিণত হইল, এবং ইহাও আছে যে, ঐ স্থানের সমুদায় এরকাই ব্রাহ্মণ-শাপে মুষলীভূত হইয়াছিল। যাদবগণ তখন ঐ সকল এরকা গ্রহণপূর্ব্বক পরস্পর নিহত করিতে লাগিল। এইরূপে সমস্ত যাদবগণ পরস্পরকে নিহত করিলেন। তখন দারুক (কৃষ্ণের সারথি) ও বভ্রু (যাদব) কৃষ্ণকে বলিলেন, "জনার্দ্দন! আপনি এক্ষণে অসংখ্য লোকের প্রাণসংহার করিলেন, অতঃপর চলুন, আমরা মহাত্মা বলভদ্রের নিকটে যাই।"

কৃষ্ণ দারুককে হস্তিনায় অর্জ্জুনের নিকট পাঠাইলেন। অর্জ্জুন আসিয়া যাদবদিগের কুলকামিনীগণকে হস্তিনায় লইয়া যাইবে, এইরূপ আজ্ঞা করিলেন। বলরামকে কৃষ্ণ যোগাসনে আসীন দেখিলেন। তাঁহার মুখ হইতে

একটি সহস্রমস্তক শ্বেত সর্প নির্গত হইয়া সাগর, নদী, বরুণ এবং বাসুকি প্রভৃতি অন্য সর্পগণ কর্তৃক স্তুত হইয়া সমুদ্রমধ্যে প্রবেশ করিল। বলরামের দেহ জীবনশূন্য হইল। তখন কৃষ্ণ স্বয়ং মর্ত্যলোকত্যাগ বাসনায় মহাযোগ অবলম্বন পূর্ব্বক ভূতলে শয়ন করিলেন। জরা নামে ব্যাধ মৃগভ্রমে তাঁহার পাদপদ্ম শর দ্বারা বিদ্ধ করিল। পরে আপনার ভ্রম জানিতে পারিয়া শঙ্কিত মনে কৃষ্ণের চরণে নিপতিত হইল। কৃষ্ণ তাহাকে আশ্বাসিত করিয়া আকাশমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন।

এ দিকে অর্জ্জুন দ্বারকায় আসিয়া রামকৃষ্ণাদির ঔর্দ্ধদেহিক কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া যাদবকুলকামিনীগণকে লইয়া হস্তিনায় চলিলেন। পথিমধ্যে দস্যুগণ লাঠি হাতে তাঁহাকে আক্রমণ করিল। যিনি পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন, এবং ভীষ্ম-কর্ণের নিহন্তা, তিনি লগুড়ধারী চাষা'দগকে পরাভূত করিতে পারিলেন না। গাণ্ডীব তুলিতে পারিলেন না। রুক্মিণী, সত্যভামা, হৈমবতী, জাম্ববতী প্রভৃতি কৃষ্ণের প্রাধানা মহিষীগণ ভিন্ন আর সকলকেই দস্যুগণ হরণ করিয়া লইয়া গেল।

এই সকল কথা কি মৌলিক? মুসল এরকার অনৈসর্গিক উপন্যাস, আমরা পূর্ব্ব নিয়মানুসারে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য। কিন্তু তাহা ত্যাগ করিলে যে প্রাকৃতিক স্থূল কথা কিছু বাকি থাকে, তাহা তত শীঘ্র ত্যাগ করা যায় না। যাদবেরা পানাসক্ত ও দুর্নীতিপরায়ণ হইয়াছিল, ইহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। তাহারা সকলে এক বংশীয় নহে; ভিন্ন ভিন্ন বংশীয় এবং অনেক সময়ে পরস্পর বিরুদ্ধাচারী। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে বার্ষ্ণেয় সাত্যকি ও কৃষ্ণ পাণ্ডবপক্ষে। কিন্তু অন্ধক ও ভোজবংশীয় কৃতবর্ম্মা দুর্য্যোধনের পক্ষে। তার পর, যাদবদিগের কেহ রাজা ছিল না, উগ্রসেনকে কখন রাজা বলা হইয়া থাকে, কিন্তু যাদবদিগের মধ্যে কেহই রাজা নহেন, ইহাই প্রসিদ্ধ। কৃষ্ণের গুণাধিক্য হেতু, তিনি যাদবগণের নেতা ছিলেন, কিন্তু তাঁহার অগ্রজ বলরামের সঙ্গে তাঁহার মতভেদ দেখা যায়, এবং শান্তিপর্ব্বে দেখিতে পাই, ভীষ্ম একটি কৃষ্ণনারদসংবাদ বলিতেছেন, তাহাতে কৃষ্ণ নারদের কাছে দুঃখ করিতেছেন যে, তিনি জ্ঞাতিগণের মনোরঞ্জনার্থ বহুতর যত্ন করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। এই সকল কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। অতএব যখন যাদবেরা পরস্পর বিদ্বেষবিশিষ্ট, স্ব স্ব প্রধান, অত্যন্ত বলদৃপ্ত, দুর্নীতিপরায়ণ এবং সুরাপাননিরত * তখন তাঁহারা যে পরস্পর বিবাদ করিয়া যদুকুলক্ষয় করিবেন এবং তন্নিবন্ধন কৃষ্ণ বলরামেরও যে ইচ্ছাধীন বা অনিচ্ছাধীন দেহান্ত হইবে, ইহা অনৈসর্গিক বা অসম্ভব নহে বোধ হয়, এরূপ একটা কিম্বদন্তী প্রচলিত ছিল, এবং তাহার উপর পুরাণকারগণ যদুবংশধ্বংস স্থাপিত করিয়াছেন। অতএব এ অংশের মৌলিকতার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। তবে কেবল দুই একটা কথা বলা আবশ্যক। লিখিত হইয়াছে যে, যদুবংশধ্বংস-নিবারণ জন্য কৃষ্ণ কিছুই করেন নাই, বরং তাহার আনুকূল্যই করিয়াছিলেন। ইহাও যদি সত্য হয়, তাহাতে কৃষ্ণচরিত্রে অসঙ্গতি বা অগৌরব কিছুই দেখি না। আদর্শ মনুষ্য, আদর্শ মনুষ্যের উপযুক্ত কাজই করিয়াছিলেন। তাঁহার আত্মীয় বা অনাত্মীয় কেহ নাই—আদর্শ পুরুষের ধর্ম্মই আত্মীয়। যদুবংশীয়েরা যখন অধার্ম্মিক হইয়া উঠিয়াছিল, তখন তাঁহাদের দণ্ড ও প্রয়োজনীয় স্থলে বিনাশ-সাধনই তাঁহার কর্ত্তব্য। যিনি জরাসন্ধ প্রভৃতিকে অধর্ম্মাত্মা বলিয়াই বিনষ্ট করিলেন, তিনি যাদবগণকে অধর্ম্মাত্মা দেখিয়া তাহাদের যদি বিনষ্ট না করেন, তবে তিনি ধর্ম্মের বন্ধু নহেন—আত্মীয়গণের বন্ধু, আপনার বন্ধু; ধর্ম্মের পক্ষপাতী নহেন—আপনার পক্ষপাতী, বংশের পক্ষপাতী। আদর্শ ধর্ম্মাত্মা তাহা হইতে পারেন না—কৃষ্ণ তাহা হয়েন নাই।

কৃষ্ণের দেহত্যাগের কারণটা কতক অনিশ্চিত রহিল। চারি প্রকার কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

প্রথম, টাল্‌বয়স্-হুইলরি সম্প্রদায় বলিতে পারেন, কৃষ্ণ জুলিয়াস কাইসরের মত দ্বেষবিশিষ্টবন্ধুগণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। এরূপ কথা কোন গ্রন্থেই নাই।

দ্বিতীয়, তিনি যোগাবলম্বন করিয়া দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদিগের শিষ্যগণ যোগাবলম্বনে দেহত্যাগের কথাটায় বিশ্বাস করিবেন না। আমি নিজে অবিশ্বাসের কারণ দেখি না। যাহারা যোগাভ্যাসকালে নিশ্বাস অবরুদ্ধ করা অভ্যাস করিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্বাস অবরুদ্ধ করিয়া আপনার মৃত্যু সম্পাদন করিতে পারেন না, এমন কথা আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি না। এরূপ ঘটনা বিশ্বস্তসূত্রে শুনাও গিয়া থাকে। অনেকে বলিতে পারেন, ইহা আত্মহত্যা, সুতরাং পাপ; সুতরাং আদর্শ মনুষ্যের অনাচরণীয়। আমি ঠিক তাহা বলিতে পারি না।

* যাদবেরা এমন মদ্যাসক্ত ছিলেন যে, কৃষ্ণ-বলরাম ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, দ্বারকায় যে সুরা প্রস্তুত করিবে, তাহাকে শূলে দিব। আমি পাশ্চাত্য রাজপুরুষগণকে এই নীতির অনুবর্তী হইতে বলিতে ইচ্ছা করি।

প্রাচীন বয়সে, জীবনের কার্য্য সমস্ত সম্পন্ন হইলে পরে ঈশ্বরে লীন হইবার জন্য, মনোমধ্যে তন্ময় হইয়া, খাসরোধকে আত্মহত্যা বলিব, না 'ঈশ্বরপ্রাপ্তি' বলিব? সেটা বিচারস্থল। আত্মহত্যা মহাপাপ স্বীকার করি, জীবনশেষে যোগবলে প্রাণত্যাগও কি তাই?

তৃতীয়, জরাব্যাধের শরাঘাত।

চতুর্থ, এই সময়ে কৃষ্ণের বয়স শত বর্ষের অধিক হইয়াছিল বলিয়া বিষ্ণুপুরাণে কথিত হইয়াছে। এ জরাব্যাধ, জরাব্যাধি নয় ত?

যাঁহারা কৃষ্ণকে মনুষ্যমাত্র বিবেচনা করিয়া তাঁহার ঈশ্বরত্ব স্বীকার করেন না, তাঁহারা এই চারিটি মতের যে কোনটি গ্রহণ করিতে পারেন। আমি কৃষ্ণকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া স্বীকার করি। অতএব আমি বলি, কৃষ্ণের ইচ্ছাই কৃষ্ণের দেহত্যাগের কারণ। আমার মত ইহা বটে যে, জগতে মনুষ্যত্বের আদর্শ প্রচার তাঁহার ইচ্ছা এবং সেই ইচ্ছা পূরণ জন্য তিনি মানুষীশক্তি দ্বারা সকল কর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন, কিন্তু তাহা বলিলেও ঈশ্বরাবতারের জন্মমৃত্যু তাঁহার ইচ্ছাধীন মাত্র বলিতে হইবে। অতএব আমি বলি, কৃষ্ণের ইচ্ছাই কৃষ্ণের দেহত্যাগের একমাত্র কারণ।

মৌসলপর্ব্ব মহাভারতের প্রথম স্তরের অন্তর্গত কি না, তাহার আমি বিচার করি নাই। বিশেষ প্রয়োজন নাই বলিয়া সমালোচনা করি নাই। বিশেষ প্রয়োজন নাই, কেন, তাহাও বলিয়াছি। স্থূল ঘটনাটা কতক সত্য বলিয়াই বোধ হয়। তবে তাহা হইলেও, ইহা মহাভারতের প্রথম স্তরের অন্তর্গত নহে বলিয়াই বোধ হয়। যাহা পুরাণ ও হরিবংশে আছে, কৃষ্ণজীবনঘটিত এমন আর কোন ঘটনাই মহাভারতে নাই। এইটিই কেবল পুরাণাদিতে আছে, হরিবংশেও আছে, মহাভারতেও আছে। পাণ্ডবদিগের সম্বন্ধে যাহা কিছু কৃষ্ণ করিয়াছিলেন, তাহা ভিন্ন আর কোন কৃষ্ণবৃত্তান্ত মহাভারতে নাই ও থাকিবার সম্ভাবনা নাই। এইটিই কেবল সে নিয়মবহির্ভূত। কৃষ্ণ এখানে ঈশ্বরাবতার, এটি দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্তরের চিহ্ন, পূর্ব্বে বলিয়াছি। এরূপ বিবেচনা করিবার অন্যান্য হেতুও নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, কিন্তু প্রয়োজনাভাব। তবে ইহা বলা কর্ত্তব্য যে, অনুক্রমণিকাধ্যায়ে মৌসলপর্ব্বের কোন প্রসঙ্গ নাই। পরিক্ষিতের জন্মবৃত্তান্তের পরবর্ত্তী কোন কথাই অনুক্রমণিকাধ্যায়ে নাই। আমার বিবেচনায় পরিক্ষিতের জন্মই আদিম মহাভারতের শেষ। তার পরবর্ত্তী যে সকল কথা, তাহা দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্তরের।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

উপসংহার

সমালোচকের কার্য্য প্রয়োজনানুসারে দ্বিবিধ;—এক প্রাচীন কুসংস্কারের নিরাস, অপর সত্যের সংগঠন। কৃষ্ণচরিত্রে প্রথমোক্ত কার্য্যই প্রধান; এ জন্য আমাদিগের সময় ও চেষ্টা সেই দিকেই বেশী গিয়াছে কৃষ্ণের চরিত্রে সত্যের নূতন সংগঠন করা অতি দুরূহ ব্যাপার, কেন না, মিথ্যা ও অতিপ্রকৃত উপন্যাসের ভস্মে অগ্নি এখানে এরূপ আচ্ছাদিত যে, তাহার সন্ধান পাওয়া ভার। যে উপাদানে গড়িয়া প্রকৃত কৃষ্ণচরিত্র পুনঃ সংস্থাপিত করিব, তাহা মিথ্যার সাগরে ডুবিয়া গিয়াছে। আমার যতদূর সাধ্য, ততদূর আমি গড়িলাম।

উপসংহারে দেখা কর্ত্তব্য যে, যতটুকু সত্য পুরাণেতিহাসে পাওয়া যায়, ততটুকুতে কৃষ্ণচরিত্র কিরূপ প্রতিপন্ন হইল।

দেখিয়াছি, বাল্যে কৃষ্ণ শারীরিক বলে আদর্শ বলবান্। তাঁহার অশিক্ষিত বলপ্রভাবে বৃন্দাবন হিংস্রজন্তু প্রভৃতি হইতে সুরক্ষিত হইত। তাঁহার অশিক্ষিত বলেও কংসের মল্ল প্রভৃতি নিহত হইয়াছিল। গোচারণকালে গোপালগণের সঙ্গে সর্ব্বদা ক্রীড়া ও ব্যায়ামাদিতে তিনি শারীরিক বলের স্ফূর্ত্তি জন্মাইয়াছিলেন। দেখিয়াছি, দ্রুতগমনে কালযবনও তাঁহাকে পারেন নাই। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তাঁহার রথসঞ্চালনবিদ্যার বিশেষ প্রশংসা দেখা যায়।

এই বল শিক্ষিত হইলে, তিনি সে সময়ের ক্ষত্রিয়সমাজে সর্ব্বপ্রধান অস্ত্রবিৎ বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। কেহ কখন তাঁহাকে পরাভূত করিতে পারে নাই। তিনি কংস, জরাসন্ধ, শিশুপাল প্রভৃতি সে সময়ের সর্ব্বপ্রধান যোদ্ধগণের সঙ্গে, এবং অন্যান্য বহুতর রাজগণের সঙ্গে,—কাশী, কলিঙ্গ, পৌণ্ড্রক, গান্ধার প্রভৃতি রাজদিগের সঙ্গে যুদ্ধে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, সকলকেই পরাভূত করিয়াছিলেন, কেহ কখনও তাঁহাকে পরাভূত করিতে পারে নাই। তাঁহার যুদ্ধশিষ্যেরা, যথা সাত্যকি ও অভিমন্যু যুদ্ধে প্রায় অপরাজেয় হইয়াছিলেন। স্বয়ং অর্জ্জুনও তাঁহার নিকট কোন কোন বিষয়ে যুদ্ধ সম্বন্ধে শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন।

কেবল শারীরিক বলের ও শিক্ষার উপর যে রণপটুতা নির্ভর করে, পুরাণেতিহাসে তাহারই প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সেরূপ রণপটুতা একজন সামান্য সৈনিকেরও থাকিতে পারে। সৈনাপত্যই যোদ্ধার প্রকৃত গুণ। সৈনাপত্যে সে সময়ের

যোদ্ধগণ পটু ছিলেন না। মহাভারতে বা পুরাণে কাহারও সে গুণের বড় পরিচয় পাই না, ভীষ্মের বা অর্জ্জুনেরও নহে। কৃষ্ণের সৈনাপত্যের বিশেষ কিছু পরিচয় পাওয়া যায়—জরাসন্ধযুদ্ধে। তাঁহার সৈনাপত্যগুণে ক্ষুদ্র যাদবসেনা জরাসন্ধের সংখ্যাতীত সেনা মথুরা হইতে বিমুখ করিয়াছিল। সেই অগণনীয়া সেনার জয়, যাদবসেনা দ্বারা অসাধ্য জানিয়া, মথুরা পরিত্যাগ, নূতন নগরীর নির্ম্মাণার্থ সাগরদ্বীপ দ্বারকার নির্ব্বাচন, এবং তাহার সম্মুখস্থ রৈবতক পর্ব্বতমালায় দুর্ভেদ্য দুর্গশ্রেণীর নির্ম্মাণ যে রণনীতিজ্ঞতার পরিচয়, সেরূপ পরিচয় পুরাণেতিহাসে কোন ক্ষত্রিয়েরই পাওয়া যায় না। পুরাণকার ঋষিদিগের ইহা অবোধগম্য—অতএব ইহাও এক অন্যতর প্রমাণ যে, কৃষ্ণেতিহাস তাঁহাদের কল্পনামাত্রপ্রসূত নহে।

শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তিসকলও চরমস্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত, তাহারও যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। তিনি অদ্বিতীয় বেদজ্ঞ, ইহাই ভীষ্ম তাঁহার অর্ঘ্যপ্রাপ্তির অন্যতর কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন। শিশুপাল সে কথার অন্য উত্তর দেন নাই, কেবল ইহাই বলিয়াছিলেন যে, তবে বেদব্যাস থাকিতে কৃষ্ণের পূজা কেন?

কৃষ্ণের জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তি সকল যে চরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছিল, কৃষ্ণপ্রচারিত ধর্ম্মই ইহার উজ্জ্বল প্রমাণ। এই ধর্ম্ম যে কেবল গীতাতেই পাওয়া যায়, এমত নহে, মহাভারতের অন্য স্থানেও পাওয়া যায়, ইহা দেখিয়াছি। কৃষ্ণকথিত ধর্ম্মের অপেক্ষা উন্নত, সর্ব্বলোকহিতকর, সর্ব্বজনের আচরণীয় ধর্ম্ম আর কখনও পৃথিবীতে প্রচারিত হয় নাই, ইহা গ্রন্থান্তরে বলিয়াছি। এই ধর্ম্মে যে জ্ঞানের পরিচয় দেয়, তাহা প্রায় মনুষ্যাতীত। কৃষ্ণ মানুষী শক্তি দ্বারা সকল কার্য্য সিদ্ধ করেন, ইহা আমি পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি, ও প্রমাণীকৃতও করিতেছি। কেবল এই গীতায়, শ্রীকৃষ্ণ, প্রায় অনন্তজ্ঞানের আশ্রয় লইয়াছেন।

সর্ব্বজনীন ধর্ম্ম হইতে অবতরণ করিয়া রাজধর্ম্মে বা রাজনীতি সম্বন্ধেও দেখিতে পাই যে, কৃষ্ণের জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তি সকল চরমস্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত। তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সম্রান্ত রাজনীতিজ্ঞ বলিয়াই, যুধিষ্ঠির ব্যাসদেবের পরামর্শ পাইয়াও কৃষ্ণের পরামর্শ ব্যতীত রাজসূয়যজ্ঞে হস্তার্পণ করিলেন না। অবাধ্য যাদবেরা এবং বাধ্য পাণ্ডবেরা তাঁহাকে না জিজ্ঞাসা করিয়া, কিছু করিতেন না। জরাসন্ধকে নিহত করিয়া, কারারুদ্ধ রাজগণকে মুক্ত করা, উন্নত রাজনীতির অতি উৎকৃষ্ট উদাহরণ—সাম্রাজ্যস্থাপনের অনায়াসসাধ্য অথচ পরম ধর্ম্ম্য উপায়। ধর্ম্মরাজ্যসংস্থাপনের পর ধর্ম্মরাজ্যশাসনের জন্য রাজধর্ম্মনিয়োগে ভীষ্ম দ্বারা রাজব্যবস্থা সংস্থাপন করান, রাজনীতিজ্ঞতার দ্বিতীয় অতি প্রশংসনীয় উদাহরণ। আরও অনেক উদাহরণ পাঠক পাইয়াছেন।

কৃষ্ণের বুদ্ধি, চরমস্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া, তাহা সর্ব্বব্যাপিনী, সর্ব্বদর্শিনী, সকল প্রকার উপায়ের উদ্ভাবিনী, ইহা আমরা পুনঃ পুনঃ দেখিয়াছি। মনুষ্যশরীর ধারণ করিয়া যতদূর সর্ব্বজ্ঞ হওয়া যায়, কৃষ্ণ ততদূর সর্ব্বজ্ঞ। অপূর্ব্ব অধ্যাত্মতত্ত্ব ও ধর্ম্মতত্ত্ব, যাহার উপর আজিও মনুষ্যবুদ্ধি আর যায় নাই, তাহা হইতে চিকিৎসাবিদ্যা ও সঙ্গীতবিদ্যা, এমন কি, অশ্বপরিচর্য্যা পর্য্যন্ত তাঁহার আয়ত্ত ছিল। উত্তরার মৃত পুত্রের পুনর্জ্জীবন একের উদাহরণ; বিখ্যাত বংশীবিদ্যা দ্বিতীয়ের, এবং জয়দ্রথবধের দিবসে অশ্বের শল্যোদ্ধার তৃতীয়ের উদাহরণ।

কৃষ্ণের কার্য্যকারিণী বৃত্তি সকলও চরমস্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত। তাঁহার সাহস, ক্ষিপ্রকারিতা, এবং সর্ব্বকর্ম্মে তৎপরতার অনেক পরিচয় দিয়াছি। তাঁহার ধর্ম্ম এবং সত্য যে অবিচলিত, এই গ্রন্থে তাহার প্রমাণ পরিপূর্ণ। সর্ব্বজনে দয়া ও প্রীতিই ইতিহাসে পরিস্ফুট হইয়াছে। বলদৃপ্তগণের অপেক্ষা বলবান্ হইয়াও লোকহিতার্থ তিনি শান্তির জন্য দৃঢ়যত্ন এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তিনি সর্ব্বলোকহিতৈষী; কেবল মনুষ্যের নহে—গোবৎসাদি তির্য্যগ্‌ যোনির প্রতিও তাঁহার দয়া। গিরিযজ্ঞে তাহা পরিস্ফুট। ভাগবতকারকথিত বাল্যকালে বানরদিগের জন্য নবনীত চুরির এবং ফলবিক্রেত্রীর কথা কতদূর কিংবদন্তীমূলক, বলা যায় না—কিন্তু যিনি গোবৎসের উত্তম ভোজন জন্য ইন্দ্রযজ্ঞ বন্ধ করাইলেন, ইহাও তাঁহার চরিত্রানুমোদিত। তিনি আত্মীয়-স্বজন, জ্ঞাতিগোষ্ঠির কিরূপ হিতৈষী, তাহা দেখিয়াছি। কিন্তু ইহাও দেখিয়াছি, আত্মীয় পাপাচারী হইলে তিনি তাহার শত্রু। তাঁহার অপরিসীম ক্ষমাগুণ দেখিয়াছি, আবার ইহাও দেখিয়াছি যে, সময় উপস্থিত দেখিলে, তিনি অয়োনির্ম্মিতহৃদয়ে অকুণ্ঠিতভাবে দণ্ডবিধান করেন। তিনি স্বজনপ্রিয়, কিন্তু লোকহিতার্থ স্বজনের বিনাশেও তিনি কুণ্ঠিত হইতেন না। কংস মাতুল; পাণ্ডবেরা যাহা, শিশুপালও তাহা,—পিতৃষ্বসার পুত্র; উভয়কেই দণ্ডিত করিলেন; তার পর, পরিশেষে স্বয়ং যাদবেরা সুরাপায়ী ও দুর্নীতিপরায়ণ হইলেও, তাহাদিগকেও রক্ষা করিলেন না।

এই সকল শ্রেষ্ঠ বৃত্তি কৃষ্ণে চরমস্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া, চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির অনুশীলনে তিনি পরাঙ্মুখ ছিলেন না, কেন না, তিনি আদর্শ মনুষ্য। যে জন্য বৃন্দাবনে ব্রজলীলা, পরিণত বয়সে সেই উদ্দেশ্যে সমুদ্র-

বিহার, যমুনাবিহার, নৈবতকবিহার। তাহার বিস্তারিত বর্ণনা আবশ্যক বিবেচনা করি নাই।

কেবল একটা কথা এখন বাকি আছে। 'ধর্ম্মতত্ত্বে' বলিয়াছি, ভক্তিই মনুষ্যের প্রধানা বৃত্তি। কৃষ্ণ আদর্শ মনুষ্য, মনুষ্যত্বের আদর্শ প্রচারের জন্য অবতীর্ণ—তাঁহার ভক্তির স্ফূর্তি দেখিলাম কৈ? কিন্তু যদি তিনি ঈশ্বর-অবতার হয়েন, তবে তাঁহার এই ভক্তির পাত্র কে? তিনি নিজে। * নিজের প্রতি যে ভক্তি, সে কেবল আপনাকে পরমাত্মা হইতে অভিন্ন করিলেই উপস্থিত হয়। ইহা জ্ঞানমার্গের চরম। ইহাকে আত্মরতি বলে। ছান্দোগ্য উপনিষদে উহা এইরূপ কথিত হইয়াছে—"এষ এবং পশ্যন্নেবং মন্বান এবং বিজানন্নাত্ম-রতিরাত্মক্রীড় আত্মমিথুন আত্মানন্দঃ স স্বরাড্ ভবতীতি।"

"যে ইহা দেখিয়া, ইহা ভাবিয়া, ইহা জানিয়া, আত্মায় রত হয়, আত্মাতেই ক্রীড়াশীল হয়, আত্মাই যাহার মিথুন (সহচর), আত্মাই যাহার আনন্দ, সে স্বরাজ।"

ইহাই গীতায় ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কৃষ্ণ আত্মারাম; আত্মা জগন্ময়; তিনি সেই জগতে প্রীতিবিশিষ্ট। পরমাত্মায় আত্মরতি আর কোন প্রকারে বুঝিতে পারি না। অন্ততঃ আমি বুঝাইতে পারি না।

উপসংহারে বক্তব্য, কৃষ্ণ, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বসময়ে সর্ব্ব-গুণের অভিব্যক্তিতে উজ্জ্বল। তিনি অপরাজেয়, অপরাজিত, বিশুদ্ধ, পুণ্যময়, প্রীতিময়, দয়াময়, অনুষ্ঠেয় কর্ম্মে অপরাঙ্মুখ—ধর্ম্মাত্মা, বেদজ্ঞ, নীতিজ্ঞ, ধর্ম্মজ্ঞ, লোকহিতৈষী, ন্যায়নিষ্ঠ, ক্ষমাশীল, নিরপেক্ষ, শাস্তা, নির্ম্মম, নিরহঙ্কার, যোগযুক্ত, তপস্বী। তিনি মানুষী শক্তি দ্বারা কর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন, কিন্তু তাঁহার চরিত্র অমানুষ। এই প্রকার মানুষী শক্তি দ্বারা অতিমানুষ চরিত্রের বিকাশ হইতে তাঁহার মনুষ্যত্ব বা ঈশ্বরত্ব অনুমতি করা বিধেয় কি না, তাহা পাঠক আপন বুদ্ধি বিবেচনা অনুসারে স্থির করিবেন। যিনি মীমাংসা করিবেন যে, কৃষ্ণ মনুষ্যমাত্র ছিলেন, তিনি অন্ততঃ Rhys Davids শাক্যসিংহ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, কৃষ্ণকে তাহাই বলিবেন;—"the wisest and greatest of the Hindus." আর যিনি বুঝিবেন যে, এই কৃষ্ণচরিত্রে ঈশ্বরের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি যুক্তকরে বিনীত ভাবে এই গ্রন্থ সমাপনকালে আমার সঙ্গে বলুন—

নাকারণাৎ কারণাদ্বা কারণাকারণান্ন চ।
শরীরগ্রহণং বাপি ধর্ম্মত্রাণায় তে পরম্॥

সমাপ্ত

* মহাভারতের যে সকল অংশে তাঁহাকে শিবো-পাসক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, তাহা প্রক্ষিপ্তের লক্ষণবিশিষ্ট।

বালার কাছে বিচার্য্য নহে; কিন্তু রূপের মোহ হইতে বীর্য্যের মোহ নারীহৃদয়ের উপর বলবত্তর। যে মহাকবি পঞ্চপতিকা দ্রৌপদীকে অর্জ্জুনে অধিকতর অনুরক্তা করিয়া, তাঁহার মধ্যরারে স্বর্গারোহণ-পথ রোধ করিয়াছেন, তিনি এ তত্ত্ব জানিতেন এবং যিনি দেস্‌দিমোনার সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিও ইহার গূঢ়তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন।

তুলনীয়া, কেন না, দুই নায়িকারই "দুরারোহিণী আশালতা" পরিশেষে ভগ্না হইয়াছিল—উভয়েই স্বামিকর্ত্তৃক বিসর্জ্জিতা হইয়াছিলেন। সংসার অনাদর-অত্যাচারপরিপূর্ণ। কিন্তু ইহাই অনেক সময় ঘটে যে, সংসারে যে আদরের যোগ্য, সেই বিশেষ প্রকারে অনাদর-অত্যাচারে প্রপীড়িত হয়। ইহা মনুষ্যের পক্ষে নিতান্ত অশুভ নহে, কেন না, মনুষ্য-প্রকৃতিতে যে সকল উচ্চাশয় মনোবৃত্তি আছে, এই সকল অবস্থাতেই তাহা সম্যক্‌প্রকারে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়। ইহা মনুষ্যলোকে সুশিক্ষার বীজ—কাব্যের প্রধান উপকরণ। দেস্‌দিমোনার অদৃষ্টদোষে বা গুণে সে সকল মনোবৃত্তি স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইবার অবস্থা ঘটিয়াছিল। শকুন্তলারও তাহাই ঘটিয়াছিল! অতএব দুই চরিত্র যে পরস্পর তুলনীয় হইবে, ইহার সকল আয়োজন আছে।

এবং দুই জনে তুলনীয়া, কেন না, উভয়েই পরম স্নেহশালিনী—উভয়েই সতী। স্নেহশালিনী এবং সতী ত যে সে। আজকাল রাম, শ্যাম, নিধু, বিধু, যদু, মাধু যে সকল নাটক, উপন্যাস, নবন্যাস, প্রেতন্যাস লিখিতেছেন, তাহার নায়িকামাত্রে স্নেহশালিনী সতী। কিন্তু এই সকল সতীদিগের কাছে একটা পোষা বিড়াল আসিলে, তাঁহারা স্বামীকে ভুলিয়া যান, আর পতিচিন্তামগ্না শকুন্তলা দুর্ব্বাসার ভয়ঙ্কর "অয়মহম্ভো!" শুনিতে পান নাই। সকলেই সতী, কিন্তু জগৎসংসারে অসতী নাই বলিয়া, স্ত্রীলোক অসতী হইতে পারে না বলিয়া দেস্‌দিমোনার যে দৃঢ়বিশ্বাস, তাহার মর্ম্মের ভিতর কে প্রবেশ করিবে? অত্যাচারে বিসর্জ্জনে, কলঙ্কেও যে ভক্তি অবিচলিত, তাহাই যদি সতীত্ব হয়, তবে শকুন্তলা অপেক্ষা দেস্‌দিমোনা গরীয়সী। স্বামিকর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইলে শকুন্তলা দলিত সর্পের ন্যায় মস্তক উন্নত করিয়া ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন। যখন রাজা শকুন্তলাকে অশিক্ষা সত্ত্বেও চাতুর্য্যপটু বলিয়া উপহাস করিলেন, তখন শকুন্তলা ক্রোধে, দম্ভে পূর্ব্বের বিনীত, লজ্জিত, দুঃখিতভাব পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন,—অনার্য্য! আপনার হৃদয়ের ভাবে সকলকে দেখ? যখন তদুত্তরে রাজা রাজার মত বলিলেন, "ভদ্রে! দুষ্মন্তের চরিত্র সবাই জানে," তখন শকুন্তলা ঘোর ব্যঙ্গে বলিলেন,—

"তুম্হে জ্জেব পমাণং জাণধ ধম্মথিদিঞ্চ লোঅস্স।
লজ্জাবিণিজ্জিদাও জাণন্তি ণ কিম্পি মহিলাও॥"

এ রাগ, অভিমান, ব্যঙ্গ দেস্‌দিমোনায় নাই। যখন ওথেলো দেস্‌দিমোনাকে সর্ব্বসমক্ষে প্রহার করিয়া দূরীভূত করিলেন, তখন দেস্‌দিমোনা কেবল বলিলেন, "আমি দাঁড়াইয়া আপনাকে আর বিরক্ত করিব না," বলিয়া যাইতেছিলেন, আবার ডাকিতেই "প্রভো!" বলিয়া নিকটে আসিলেন। যখন ওথেলো অকৃতাপরাধে তাহাকে কুলটা বলিয়া অপমানের একশেষ করিয়াছিলেন, তখনও দেস্‌দিমোনা "আমি নিরপরাধিনী, ঈশ্বর জানেন" ঈদৃশ উক্তি ভিন্ন আর কিছুই বলেন নাই। তাহার পরেও পতিস্নেহে বঞ্চিত হইয়া পৃথিবী শূন্য দেখিয়া ইয়াগোকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন,—

"Alas Iago!
What shall I do to win my lord again!
Good friend go to him, for by this light of heaven,
I know not how I lost him, here I kneel."

ইত্যাদি। যখন ওথেলো ভীষণ রাক্ষসের ন্যায় নিশীথশয্যাশায়িনী সুপ্ত সুন্দরীর সম্মুখে "বধ করিব!" বলিয়া দাঁড়াইলেন, তখন রাগ নাই—অভিমান নাই—অবিনয় বা অস্নেহ নাই—দেস্‌দিমোনা কেবল বলিলেন, "তবে ঈশ্বর আমায় রক্ষা করুন্।" যখন দেস্‌দিমোনা মরণভয়ে ভীত হইয়া এক দিনের জন্য, এক মুহূর্ত্ত জন্য জীবনভিক্ষা চাহিলেন, মূঢ় তাহাও শুনিল না, তখনও রাগ নাই, অভিমান নাই, অস্নেহ নাই। মৃত্যুকালেও যখন ইমিলিয়া আসিয়া তাহাকে মুমূর্ষু দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এ কার্য্য কে করিল? তখনও দেস্‌দিমোনা বলিলেন, "কেহ না, আমি নিজে। চলিলাম, আমার প্রভুকে আমার প্রণাম জানাইও। আমি চলিলাম!" তখনও দেস্‌দিমোনা লোকের কাছে প্রকাশ করিল না, আমার স্বামী আমাকে বিনাপরাধে বধ করিয়াছে।

তাই বলিতেছিলাম যে, শকুন্তলা দেস্‌দিমোনার সঙ্গে তুলনীয়া এবং তুলনীয়াও নহে। তুলনীয়া

নহে, কেন না, ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় বস্তুতে তুলনা হয় না। সেক্ষপীয়রের এই নাটক সাগরবৎ, কালিদাসের নাটক নন্দনকাননতুল্য। কাননে সাগরে তুলনা হয় না। যাহা সুন্দর, যাহা সুদৃশ্য, যাহা সুগন্ধ, যাহা সুরস, যাহা মনোহর, যাহা সুখকর, তাহাই এই নন্দনকাননে অপর্য্যাপ্ত, স্তূপীকৃত, রাশি রাশি, অপরিমেয়। আর যাহা গম্ভীর, দুস্তর, চঞ্চল, ভীমনাদী, তাহাই এই সাগরে। সাগরবৎ সেক্ষপীয়রের এই অনুপম নাটক হৃদয়োত্থিত বিলোল তরঙ্গমালায় সংক্ষুব্ধ; দুরন্ত রাগদ্বেষঈর্য্যাদিবাত্যায় সন্তাড়িত, ইহার প্রবল বেগ দুরন্ত কোলাহল, বিলোল উর্ম্মিমালা—আবার ইহার মধুরনীলিমা, ইহার অনন্ত আলোকচূর্ণপ্রক্ষেপ; ইহার জ্যোতিঃ, ইহার ছায়া, ইহার রত্নরাজি, ইহার মৃদুগতি—সাহিত্যসংসারে দুর্লভ।

তাই বলি, দেস্‌দিমোনা শকুন্তলার তুলনীয়া নহে। ভিন্ন-জাতীয় ভিন্ন-জাতীয়ে তুলনীয়া নহে। ভিন্ন-জাতীয়ে কেন বলিতেছি, তাহার কারণ আছে।

ভারতবর্ষে যাহাকে নাটক বলে, ইউরোপে ঠিক তাহাকেই নাটক বলে না। উভয় দেশীয় নাটক দৃশ্যকাব্য বটে, কিন্তু ইউরোপীয় সমালোচকেরা নাটকার্থে আর একটি অধিক বুঝান। তাঁহারা বলেন যে, এমন অনেক কাব্য আছে—যাহা দৃশ্য কাব্যের আকারে প্রণীত অথচ প্রকৃত নাটক নহে। নাটক নহে বলিয়া যে এ সকলকে নিকৃষ্ট কাব্য বলা যাইবে, এমত নহে—তন্মধ্যে অনেকগুলি অত্যুৎকৃষ্ট কাব্য, যথা গেটে-প্রণীত ফষ্ট এবং বাইরণ-প্রণীত মানফ্রেড—কিন্তু উৎকৃষ্ট হউক, নিকৃষ্ট হউক—ঐ সকল কাব্য নাটক নহে। সেক্ষপীয়রের টেম্পেষ্ট এবং কালিদাসকৃত শকুন্তলা সেই শ্রেণীর কাব্য. নাটকাকারে অত্যুৎকৃষ্ট উপাখ্যানকাব্য; কিন্তু নাটক নহে। নাটক নহে বলিলে এতদুভয়ের নিন্দা হইল না, কেন না, উপাখ্যান-কাব্য পৃথিবীতে অতি বিরল—অতুল্য বলিলে হয়। আমরা ভারতবর্ষে উভয়কেই নাটক বলিতে পারি, কেন না, ভারতীয় আলঙ্কারিকদিগের মতে নাটকের যে সকল লক্ষণ, তাহা সকলই এই দুই কাব্যে আছে। কিন্তু ইউরোপীয় সমালোচকদিগের মতে নাটকের যে সকল লক্ষণ, এই দুই নাটকে তাহা নাই। ওথেলো নাটকে তাহা প্রচুর পরিমাণে আছে। ওথেলো নাটক, শকুন্তলা এই হিসাবে উপাখ্যানকাব্য। ইহার ফল এই ঘটিয়াছে যে, দেস্‌দিমোনা-চরিত্র যত পরিস্ফুট হইয়াছে—মিরন্দা বা শকুন্তলা তেমন হয় নাই। দেস্‌দিমোনা সজীব, শকুন্তলা ও মিরন্দা ধ্যানপ্রাপ্ত। দেস্‌দিমোনার বাক্যেই তাহার কাতর, বিকৃত কণ্ঠস্বর আমরা শুনিতে পাই, চক্ষের জল ফোঁটা ফোঁটা গণ্ড বহিয়া বক্ষে পড়িতেছে দেখিতে পাই—ভূলগ্নজানু সুন্দরীর স্পন্দিত-তার লোচনের ঊর্দ্ধদৃষ্টি আমাদিগের হৃদয়মধ্যে প্রবেশ করে। শকুন্তলার আলোহিত চক্ষুরাদি আমরা দুষ্মন্তের মুখে না শুনিলে বুঝিতে পারি না—যথা—

"ন তির্য্যগবলোকিতং ভবতি চক্ষুরালোহিতং,
বচোঽপি পরুষাক্ষরং ন চ পদেষু সংগচ্ছতে।
হিমার্ত্ত ইব বেপতে সকল এব বিম্বাধরঃ
প্রকামবিনতে ভ্রুবৌ যুগপদেব ভেদং গতে॥"

শকুন্তলার দুঃখের বিস্তার দেখিতে পাই না, গতি দেখিতে পাই না, বেগ দেখিতে পাই না, সে সকল দেস্‌দিমোনায় অত্যন্ত পরিস্ফুট। শকুন্তলা চিত্রকরের চিত্র, দেস্‌দিমোনা ভাস্করের গঠিত সজীবপ্রায় গঠন। দেস্‌দিমোনার হৃদয় আমাদিগের সম্মুখে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত এবং সম্পূর্ণ বিস্তারিত, শকুন্তলার হৃদয় কেবল ইঙ্গিতে ব্যক্ত।

সুতরাং দেস্‌দিমোনার আলেখ্য অধিকতর প্রোজ্জ্বল বলিয়া দেস্‌দিমোনার কাছে শকুন্তলা দাঁড়াইতে পারে না। নতুবা ভিতরে দুই এক। শকুন্তলা অর্দ্ধেক মিরন্দা, অর্দ্ধেক দেস্‌দিমোনা। পরিণীতা শকুন্তলা দেস্‌দিমোনার অনুরূপিণী।

বাঙ্গালীর বাহুবল

বাঙ্গালীর এক্ষণে উন্নতির আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত প্রবল হইয়াছে। বাঙ্গালী উন্নতির জন্য ব্যস্ত, অনেকে তদ্বিষয়ে বিশেষ গুরুতর আশা করেন না, কেন না, বাঙ্গালীর বাহুবল নাই। বাহুবল ভিন্ন উন্নতি নাই, ইহা তাঁহাদিগের বিশ্বাস।

বাঙ্গালীর বাহুবল নাই, ইহা সত্য কথা। কখন হইবে কি না, এ কথার মীমাংসা প্রবন্ধান্তরে করা গিয়াছে। থাক্ বা না থাক্, ইহা জানা আছে যে, মৌর্য্যবংশীয় ও গুপ্তবংশীয় সম্রাটেরা হিমাচল হইতে নর্ম্মদা পর্য্যন্ত একচ্ছত্রে শাসিত করিয়াছিলেন। জানা আছে, দিগ্বিজয়ী গ্রীকজাতি শতদ্রু অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় নাই; জানা আছে, সেই বীরেরা আসিয়ার মধ্যে ভারতবাসীরই বীরত্বের প্রশংসা করিয়াছিলেন; জানা আছে যে, তাঁহারা চন্দ্রগুপ্ত

যারা ভারতভূমি হইতে উন্মূলিত হইয়াছিলেন; জানা আছে, হর্ষবর্দ্ধনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বহুশত করপ্রদ রাজা অনুসরণ করিতেন; জানা আছে, দিগ্বিজয়ী আরবেরা তিনশত বৎসরে পশ্চিম-ভারতবর্ষ অধিকার করিতে পারে নাই। এইরূপ আরও অনেক কথা জানা গিয়াছে। ভারতবর্ষীয়দের বীর্য্যবত্তার অনেক চিহ্ন অদ্যাপি ভারতভূমে আছে।

বাঙ্গালীর পূর্ব্ববীরত্ব—পূর্ব্বগৌরবের কি জানা আছে? কেবল ইহাই জানি যে, যখন পশ্চিমভারতে বেদ সৃষ্ট ও অধীত হইতেছিল, উপনিষদ্‌সকল প্রণীত হইতেছিল, অযোধ্যার ন্যায় সর্ব্বসম্পৎশালিনী নগরী সকল স্থাপিত এবং অলঙ্কৃত হইতেছিল—বাঙ্গালা তখন অনার্য্যভূমি, আর্য্যগণের বাসের অযোগ্যা বলিয়া পরিত্যক্ত। (১) কেবল ইহাই জানি যে, যখন উত্তর-ভারতে সমস্ত আর্য্যবীরগণ একত্র হইয়া কুরুক্ষেত্রজিত রাজ্যখণ্ডসকল বিভাগ করিতেছিলেন, যখন পশ্চিমে মন্বাদি কর্ত্তৃক অমর অক্ষয় ধর্ম্মশাস্ত্র সকল প্রণীত হইতেছিল, তখন বঙ্গদেশে পৌণ্ড্র প্রভৃতি অনার্য্যজাতির বাস। প্রাচীনকাল দূরে থাকুক, যখন মধ্যকালে চৈনিক পরিব্রাজক হোয়েন্থ সাঙ বঙ্গদেশ পর্য্যটনে আসেন, তখন দেখিয়াছিলেন যে, এই প্রদেশ গৌরবশূন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত। বঙ্গদেশের পূর্ব্বগৌরব কোথায়?

তবে ইহার পরে শুনা যায় যে, পালবংশীয় ও সেনবংশীয় রাজগণ বৃহৎ রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন এবং গৌড়নগরী বড় সমৃদ্ধিশালিনী হইয়াছিল। কিন্তু এমন কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না যে, তাঁহারা এই বাহুবলশূন্য বাঙ্গালী জাতি এবং তাঁহাদিগের প্রতিবাসী তদ্রূপ দুর্ব্বল অনার্য্য জাতিগণ ভিন্ন অন্য কাহাকে আপন অধিকারভুক্ত করিয়াছিলেন। এইমাত্র প্রমাণ আছে বটে যে, মুঙ্গের পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের অধিকারভুক্ত ছিল। অন্যত্র তাঁহাদিগের অধিকারবিস্তার সম্বন্ধে তিনটিমাত্র কথা আছে, তিনটিই অমূলক।

প্রথম। কিংবদন্তী আছে যে, দিল্লীতে বল্লালসেনের অধিকার ছিল। এ কথা একখানি দেশী গ্রন্থে লিখিত থাকিলেও নিতান্ত অমূলক এবং জেনেরেল কনিঙহাম সাহেব তাহার অমূলকতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বঙ্গেশ্বর বল্লালসেনের অধিকার দিল্লী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইলে এইরূপ বৃহৎ ব্যাপার ঘটিত যে, অবশ্য একখানি সামান্য গ্রন্থে উল্লেখ ভিন্ন তাহার অন্য প্রমাণ কিছু পাওয়া যাইত। বঙ্গ হইতে দিল্লী পর্য্যন্ত যে বহুবিস্তৃত প্রদেশ, তথায় বঙ্গপ্রভুত্বের কোন কিংবদন্তী, কোন উল্লেখ, কোন চিহ্ন অবশ্য থাকিত। কিছু নাই।

দ্বিতীয়। ১৭৯৪ সালে গৌড়েশ্বর মহীপালরাজের একখানা শাসন কাশীতে পাওয়া গিয়াছিল। তাহা হইতে কেহ কেহ অনুমান করেন, কাশী-প্রদেশ মহীপালের রাজ্যভুক্ত ছিল, এক্ষণে সে মত পরিত্যক্ত হইতেছে (১)।

তৃতীয়। লক্ষ্মণসেনের দুই একখানি তাম্র-শাসনে তাঁহাকে প্রায় সর্ব্বদেশজেতা বলিয়া বর্ণনা করা আছে। পড়িলেই বুঝা যায় যে, সে সকল কথা চাটুকার কবির কল্পনা মাত্র।

অতএব পূর্ব্বকালে বাঙ্গালীরা যে বাহুবলশালী ছিলেন, এমন প্রমাণ নাই। পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষস্থ অন্যান্য জাতি যে বাহুবলশালী ছিলেন, এমত প্রমাণ অনেক আছে, কিন্তু বাঙ্গালীদিগের বাহুবলের কোন প্রমাণ নাই। হোয়েন্থ সাঙ সমতট রাজ্য-বাসীদিগের যে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা পড়িয়া বোধ হয়, পূর্ব্বে বাঙ্গালীরা এইরূপ খর্ব্বাকৃতি ও দুর্ব্বলগঠন ছিল।

বাঙ্গালীদিগের বাহুবল কখন ছিল না, কিন্তু কখন হইবে কি?

বৈজ্ঞানিক ভবিষ্যৎ উক্তির নিয়ম এই যে, যেরূপ যে অবস্থায় হইয়াছে, সেই অবস্থায় সেইরূপ আবার হইবে। যে যে কারণে বাঙ্গালী চিরকাল দুর্ব্বল, সেই সেই কারণ যত দিন বর্ত্তমান থাকিবে, তত দিন বাঙ্গালীরা বাহুবলশূন্য থাকিবে। সে সকল কারণ কি?

আধুনিক বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকদিগের মতে সকলই বাহ্যপ্রাকৃতিক ফল। বাঙ্গালীর দুর্ব্বলতাও বাহ্যপ্রকৃতির ফল। ভূমি, জল, বায়ু এবং দেশাচারের ফলে বাঙ্গালীরা দুর্ব্বল, ইহাই প্রচলিত মত। সেই সকল মতগুলির সংক্ষেপতঃ উল্লেখ করিতেছি।

কেহ কেহ বলেন, এ দেশের ভূমি অত্যন্ত উর্ব্বরা—অল্প পরিশ্রমেই শস্যোৎপাদন হইতে পারে। সুতরাং বাঙ্গালীকে অধিক পরিশ্রম করিতে হয় না। পরিশ্রম অধিক না করিলে শরীরে

(১) বঙ্গদর্শনের দ্বিতীয় খণ্ড "বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার" দেখ।

(1) See introduction to—Sherring's Sacred City of the Hindus, by F. E. Hall. P.xxx. Vol,2.

বলাধান হয় না। বঙ্গভূমির উর্ব্বরতা বঙ্গবাসীর দুর্ব্বলতার কারণ।

তাঁহারা আরও বলেন যে, ভূমি উর্ব্বরা হইলে আর আহারের জন্য মৃগয়া পশুহননাদির আবশ্যকতা হয় না। পশুহনন—ব্যবসায়, বল, সাহস ও পরিশ্রমের কার্য্য মানুষকে সর্ব্বদা পরিশ্রমে নিরত রাখে এবং তাহাতে ঐ সকল গুণ অভ্যস্ত এবং স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়।

দেখা যাইতেছে যে, বঙ্গদেশ ভিন্ন আরও উর্ব্বর দেশ আছে। ইউরোপ ও আমেরিকার অনেক অংশ বঙ্গদেশাপেক্ষায় উর্ব্বরতায় ন্যূন নহে। সে সকল দেশের লোক দুর্ব্বল নহে।

অনেকে বলেন, জলবায়ুর দোষে বাঙ্গালীরা দুর্ব্বল। যে দেশের বায়ু আর্দ্র অথচ তাপযুক্ত, সে দেশের লোক দুর্ব্বল কেন হয়, তাহা শারীরতত্ত্ববিদেরা ভাল করিয়া বুঝান নাই। বায়ুর আর্দ্রতা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত টীকা পাঠ করিলে সংশয় দূর হইতে পারে। (১) আর যাঁহারা আরব প্রভৃতি জাতির বীর্য্য জানেন, তাঁহারা তাপকে দৌর্ব্বল্যের কারণ বলিয়া স্বীকার করিবেন।

অনেকে মোটামোটি বলেন যে, জলসিক্ত তাপ-বায়ু অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর, তন্নিবন্ধন বাঙ্গালীরা নিত্য রুগ্ন এবং তাহাই বাঙ্গালীর দুর্ব্বলতার কারণ।

অনেকে বলেন, অন্নই অনর্থের মূল, এ দেশের ভূমির প্রধান উৎপাদ্য চাউল এবং এ দেশের লোকের খাদ্য ভাত। ভাত অতি অসার খাদ্য, তাহাতেই বাঙ্গালীর শরীর গঠে না। এ জন্য 'ভেতো বাঙ্গালী' বলিয়া বাঙ্গালীর কলঙ্ক হইয়াছে।

শারীরতত্ত্ববিদেরা বলেন যে, খাদ্যের রাসায়নিক বিশ্লেষণ সম্পাদন করিলে দেখা যায় যে, তাহাতে ষ্টার্চ্চ, গ্লুটেন প্রভৃতি কয়েকটি সামগ্রী আছে। গ্লুটেন নাইট্রজেনপ্রধান সামগ্রী। তাহাতেই শরীরের পুষ্টি। মাংসপেশী প্রভৃতি পুষ্টির জন্য এই সামগ্রী বিশেষ প্রয়োজন। ভাতে ইহা অতি অল্প পরিমাণে থাকে। এই জন্য মাংসভোজী এবং গোধূমভোজীদিগের শরীর অধিক বলবান্—"ভেতো" জাতির শরীর দুর্ব্বল। ময়দায় গ্লুটেন শত ভাগে দশভাগ থাকে; (১) মাংসে Masculian ১৯ ভাগ; (২) এবং ভাতে ৭ কি ৮ ভাগ মাত্র থাকে; (৩) সুতরাং বাঙ্গালী দুর্ব্বল হইবে বৈ কি?

কেহ কেহ বলেন, বাল্যবিবাহই বাঙ্গালীর পরম শত্রু—বাল্যবিবাহের কারণেই বাঙ্গালীর শরীর দুর্ব্বল। যে সন্তানের মাতা-পিতা অপ্রাপ্তবয়ঃ, তাহাদের শরীর ও বল চিরকাল অসম্পূর্ণ থাকিবে এবং যাহারা অল্পবয়স হইতে ইন্দ্রিয়সুখে নিরত, তাহারা বলবান্ হইবার সম্ভাবনা কি?

বাঙ্গালী মনুষ্যেরই কি, বাঙ্গালী পশুরই কি, দুর্ব্বলতা যে জলবায়ু বা মৃত্তিকার গুণ, তাহা সহজেই বুঝা যায়। কিন্তু জলের বা বায়ুর বা মৃত্তিকার কোন্ দোষের এই কুফল, তাহা কোন পণ্ডিতে অবধারিত করেন নাই!

কিন্তু এই দুর্ব্বলতার যে সকল কারণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে বা উল্লিখিত হইল, তাহাতে এমত ভরসা করা যায় না যে, অল্পকালে সে দুর্ব্বলতা দূর হইবে। তবে ইহাও বলা যাইতে পারে যে, এমন কোন

(1) The high humidity of the atmosphere in Bengal and more especially in its eastern districts has become proverbial, and if the term be used in reference to the quantity of vapour in the air as measured by tension the popular belief is intensified by co-observations. But if used in the more usual sense of relative humidity, that is, as referring to the percentage of vapour in the air in proportion to that which would saturate it, the average annual humidity of a large part of Bengal is sensibly lower than that of England.

The quantity of vapour in the air of Calcutta, relative to the dry air, in the average of the year, about twice as great, as in that of London, but the relative humidity of former equals that of the latter only in the three first months of the rains, which are among the dried months of an European climate...Bengal Administration Report —1872-73. Statistical Summary, page 56.

(1) Johnston's Chemistry Common Life...vol. 1. P. 100.

(2) Ibid, P. 123.

(3) Ibid. P. 101.

নিশ্চয়তা নাই যে, কোন কালে এসকল কারণ অপনীত হইতে পারেনা। বাল্যবিবাহই যদি এ দুর্ব্বলতার কারণ হয়, তবে এমন ভরসা করা যাইতে পারে যে, সামাজিক রীতির পরিবর্ত্তনে এ কুপ্রথা সমাজ হইতে দূর হইবে; এবং বাঙ্গালীর শরীরে বলসঞ্চার হইবে। যদি চাউল এ অনিষ্টের কারণ হয়, তবে এমন ভরসা করা যাইতে পারে যে, গোধূমাদির চাষ দেশে বৃদ্ধি করাইলে, বাঙ্গালী ময়দা খাইলে বলিষ্ঠ হইবে! এমন কি, কালে জলবায়ুরও পরিবর্ত্তন হইতে পারে। এক্ষণে মনুষ্য-বাসের অযোগ্য যে সুন্দরবন, তাহা এককালে বহু জনাকীর্ণ ছিল, এমত প্রমাণ আছে। ভূতত্ত্ববিদেরা বলেন যে, ইউরোপীয় অনেক প্রদেশ এক্ষণকার অপেক্ষা উষ্ণতর ছিল এবং তথায় সিংহ, হস্তী প্রভৃতি উষ্ণদেশবাসী জীবের আবাস ছিল। আবার এককালে সেই সকল প্রদেশ হিমশিলায় নিমগ্ন ছিল। সে সকল যুগান্তরের কথা- সহস্র সহস্র যুগে সে সকল পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে। কিন্তু ঐতিহাসিক কালের মধ্যেও জলবায়ু-শীতাতপের পরিবর্ত্তনের অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। পূর্ব্বকালে রোম নগরীর নিম্নে টেবর নদের মধ্যে বরফ জমিয়া যাইত এবং এক সময়ে ক্রমাগত চল্লিশ দিন তাহাতে বরফ জমিয়াছিল। কৃষ্ণসাগরে Euixnesea অবিদ নামক কবির জীবনকালে প্রতিবৎসর শীত ঋতুতে বরফ জমিয়া যাইত। রীণ এবং রণ নামক নদীদ্বয়ের উপরে তৎসময়ে বরফ এরূপ গাঢ় জমিত যে, তাহার উপর দিয়া বোঝাই গাড়ী চলিত। এক্ষণে রোমে বা কৃষ্ণসাগরে বা উক্ত নদীদ্বয়ে বরফের নামমাত্র নাই। কেহ কেহ বলেন, কৃষি-কার্য্যের আধিক্যে বন কাটায়, মৃত্তিকা ভগ্ন করায় এবং বিল শুষ্ক করায় এ সকল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। যদি কৃষিকার্য্যের আধিক্যে শীতপ্রদেশ উষ্ণ হয়, তবে উষ্ণপ্রদেশ শীতল হইবার কারণ কি? গ্রীণলণ্ড এককালে এরূপ তাপযুক্ত প্রদেশ ছিল যে, ইহাতে উদ্ভিদের বিশেষ আধিক্য এবং শোভা ছিল এবং সেই জন্য উহার নাম গ্রীণলণ্ড হইয়াছিল। এক্ষণে সেই গ্রীণলণ্ড সর্ব্বদা এবং সর্ব্বত্র হিমশিলায় মণ্ডিত। এই দ্বীপের পূর্ব্ব উপকূলে বহুসংখ্য ঐশ্বর্য্যশালী উপনিবেশ ছিল—এক্ষণে সেই উপকূলে কেবল বরফের রাশি এবং সে সকল উপনিবেশের চিহ্নমাত্র নাই। লাব্রাডর এক্ষণে শৈত্যাধিক্যের জন্য বিখ্যাত —কিন্তু যখন সহস্র খৃষ্টাব্দে আর্ম্মাণেরা তথায় গমন করেন, তখন ইহারও শীতের অল্পতা দেখিয়া তাঁহারা প্রীত হইয়াছিলেন এবং ইহাতে দ্রাক্ষা জন্মিত বলিয়া ইহার দ্রাক্ষাভূমি নাম দিয়াছেন। (১)

এ সকল পরিবর্ত্তনের অতি দূর-সম্ভাবনা। না ঘটিবারই সম্ভাবনা। বাঙ্গালীর শারীরিক বল চিরকাল এইরূপ থাকিবে, ইহা এক প্রকার সিদ্ধ, কেন না, দুর্ব্বলতার নিবার্য্য কারণ দেখা যায় না।

তবে কি বাঙ্গালীর ভরসা নাই? এ প্রশ্নে আমাদের দুইটি উত্তর আছে।

প্রথম উত্তর। শারীরিক বলই অদ্যাপি পৃথিবী শাসন করিতেছে বটে, কিন্তু শারীরিক বল পশুর গুণ, মনুষ্য অদ্যাপি অনেকাংশে পশু প্রকৃতিসম্পন্ন, এ জন্য শারীরিক বলের আজিও এতটা প্রাদুর্ভাব। শারীরিক বল উন্নতি নহে। উন্নতির উপায় মাত্র। এ জগতে বাহুবল ভিন্ন কি উন্নতির উপায় নাই?

বাহুবলকে উন্নতির উপায়ও বলিতে পারি না। বাহুবলে কাহারও উন্নতি হয় না। যে তাতার ইউরোপ আসিয়া জয় করিয়াছিল, সে কখনও উন্নতাবস্থায় পদার্পণ করিল না। তবে বাহুবল উন্নতির পক্ষে এই জন্য আবশ্যক যে, যে সকল কারণে উন্নতির হানি হয়, সে সকল উপদ্রব হইতে আত্মরক্ষা করা চাই। সেই জন্য বাহুবলের প্রয়োজন। কিন্তু যেখানে সে প্রয়োজন নাই, সেখানে বাহুবল ব্যতীতও উন্নতি ঘটে।

দ্বিতীয় উত্তরে, আমরা যাহা বলিতেছি, বাঙ্গালার সর্ব্বত্র, সর্ব্বনগরে, সর্ব্বগ্রামে, সকল বাঙ্গালীর হৃদয়ে তাহা লিখিত হওয়া উচিত। বাঙ্গালী শারীরিক বলে দুর্ব্বল—তাহাদের বাহুবল হইবার সম্ভাবনা নাই—তবে কি বাঙ্গালীর ভরসা নাই? এ প্রশ্নে আমাদিগের উত্তর এই যে, শারীরিক বল বাহুবল নহে।

মনুষ্যের শারীরিক বল অতি তুচ্ছ, তথাপি হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি মনুষ্যের বাহুবলে শাসিত হইতেছে। মনুষ্যে মনুষ্যে তুলনা করিয়া দেখ। যে সকল পার্ব্বত্য বন্যজাতি হিমালয়ের পশ্চিম-ভাগে বাস করে, পৃথিবীতে তাহাদের ন্যায় শারীরিক বলবান্ কে? এক এক জন মেওয়া-ওয়ালার চপেটাঘাতে অনেক সেলর গোরাকে ঘূর্ণ্যমান হইয়া আঙ্গুর পেস্তার আশা পরিত্যাগ করিতে দেখা গিয়াছে। তবে গোরা সমুদ্র পার হইয়া আসিয়া ভারত অধিকার করিল,—কাবুলীর

(1) The Scientific American.

সঙ্গে ভারতের কেবল ফলবিক্রয়ের সম্বন্ধ রহিল কেন? অনেক ভারতীয় জাতি হইতে ইংরেজেরা শারীরিক বলে লঘু। শারীরিক বলে শীকেরা ইংরেজ অপেক্ষা বলিষ্ঠ। তথাপি শীক ইংরেজের পদানত। শারীরিক বল বাহুবল নহে।

উদ্যম, ঐক্য, সাহস এবং অধ্যবসায়—এই চারিটি একত্র করিয়া শারীরিক বল ব্যবহার করার যে ফল, তাহাই বাহুবল। যে জাতির উদ্যম, ঐক্য, সাহস এবং অধ্যবসায় আছে—তাহাদের শারীরিক বল যেমন হউক না কেন, তাহাদের বাহুবল আছে। এই চারিটি বাঙ্গালীর কোন কালে নাই, এ জন্য বাঙ্গালীর বাহুবল নাই।

কিন্তু সামাজিক গতির বলে এ চারিটি বাঙ্গালী-চরিত্রে সমবেত হওয়ার অসম্ভাবনা কিছুই নাই।

বেগবৎ অভিলাষ হৃদয়মধ্যে থাকিলে উদ্যম জন্মে না। যখন অভিলাষ এরূপ বেগ লাভ করে যে, তাহার অপূর্ণাবস্থা বিশেষ ক্লেশকর হয়, তখন অভিলষিতের প্রাপ্তির জন্য উদ্যম জন্মে। অভিলাষের অপূর্ত্তি জন্য যে ক্লেশ, তাহার এমন প্রবলতা চাহি যে, নিশ্চেষ্টতা এবং আলস্যের যে সুখ, তাহা তদভাবে সুখ বলিয়া বোধ হয় না। এরূপ বেগযুক্ত কোন অভিলাষ বাঙ্গালীর হৃদয়ে স্থান পাইলে উদ্যম জন্মিবে। ঐতিহাসিক কালমধ্যে এরূপ কোন বেগযুক্ত অভিলাষ বাঙ্গালী হৃদয়ে স্থান কখন পায় নাই।

যখন বাঙ্গালীর হৃদয়ে সেই এক অভিলাষ জাগরিত হইতে থাকিবে, যখন বাঙ্গালীমাত্রেরই হৃদয়ে সেই অভিলাষের বেগ এরূপ গুরুতর হইবে যে, সকল বাঙ্গালীই তজ্জন্য আলস্য, সুখ তুচ্ছ বোধ করিবে, তখন উদ্যমের সঙ্গে ঐক্য মিলিত হইবে।

সাহসের জন্য আর একটু চাই। চাই যে, সেই জাতীয় সুখের অভিলাষ আরও প্রবলতর হইবে। এত প্রবল হইবে যে, তজ্জন্য প্রাণ-বিসর্জ্জনও শ্রেয়োবোধ হইবে। তখন সাহস হইবে।

যদি এই বেগবৎ অভিলাষ কিছুকাল স্থায়ী হয়, তবে, অধ্যবসায় জন্মিবে।

অতএব যদি কখন (১) বাঙ্গালীর কোন জাতীয় সুখের অভিলাষ প্রবল হয়, (২) যদি বাঙ্গালীমাত্রেরই হৃদয়ে সেই অভিলাষ প্রবল হয়, (৩) যদি সেই প্রবলতা এরূপ হয় যে, তদর্থে লোক প্রাণপণ করিতে প্রস্তুত হয়, (৪) যদি সেই অভিলাষের বল স্থায়ী হয়, তবে বাঙ্গালীর অবশ্য বাহুবল হইবে।

বাঙ্গালীর এরূপ মানসিক অবস্থা যে কখন ঘটিবে না, এ কথা বলিতে পারা যায় না। যে কোন সময়ে ঘটিতে পারে।

ভালবাসার অত্যাচার

লোকের বিশ্বাস আছে যে, কেবল শত্রু অথবা স্নেহ-দয়াদাক্ষিণ্যশূন্য ব্যক্তিই আমাদিগের উপর অত্যাচার করিয়া থাকেন। কিন্তু তদপেক্ষা গুরুতর অত্যাচারী যে আর এক শ্রেণীর লোক আছে, তাহা সকল সময়ে আমাদের মনে পড়ে না। যে ভালবাসে, সেই অত্যাচার করে। ভালবাসিলেই অত্যাচার করিবার অধিকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমি যদি তোমাকে ভালবাসি, তবে তোমাকে আমার মতাবলম্বী হইতে হইবে, আমার কথা শুনিতে হইবে, তোমার ইষ্ট হউক, অনিষ্ট হউক, আমার মতাবলম্বী হইতে হইবে। অবশ্য ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, যে ভালবাসে, সে যে কার্য্যে তোমার অমঙ্গল, জানিয়া শুনিয়া তাহাতে তোমাকে অনুরোধ করিবে না। কিন্তু কোন্ কার্য্য মঙ্গলজনক, কোন্ কার্য্য অমঙ্গলজনক, তাহার মীমাংসা কঠিন, অনেক সময়েই দুই জনের মত এক হয় না। এমত অবস্থায় যিনি কার্য্যকর্ত্তা এবং তাহার ফলভোগী, তাঁহার সম্পূর্ণ অধিকার আছে যে, তিনি আত্মমতানুসারেই কার্য্য করেন এবং তাঁহার মতের বিপরীত কার্য্য করাইতে রাজা ভিন্ন কেহই অধিকারী নহেন। রাজাই কেবল অধিকারী এই জন্য যে, তিনি সমাজের হিতাহিত-বেত্তাস্বরূপ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, কেবল তাঁহারই সদসদ্বিবেচনা অভ্রান্ত বলিয়া তাঁহাকে আমাদিগের প্রবৃত্তি দমনের অধিকার দিয়াছি। যে অধিকার তাঁহাকে দিয়াছি, সে অধিকার অনুসারে তিনি কার্য্য করাতে কাহারও প্রতি অত্যাচার হয় না এবং সকল সময়ে এবং সকল বিষয়ে আমাদিগের প্রবৃত্তিদমন করিবার তাঁহারও অধিকার নাই, যে যে কার্য্যে অন্যের অনিষ্ট ঘটিবে বিবেচনা করেন, তৎপ্রতি প্রবৃত্তির নিবারণে তাঁহার অধিকার; যাহাতে কেবল আপনারই অনিষ্ট ঘটিবে বিবেচনা করেন, সে প্রবৃত্তি নিবারণে তিনি অধিকারী

নহেন।* যাহাতে কেবল আমার নিজের অনিষ্ট, তাহা হইতে বিরত হইবার পরামর্শ দিবার জন্য মনুষ্যমাত্রেই অধিকারী, রাজাও পরামর্শ দিতে পারেন এবং যে আমাকে ভালবাসে, সেও পারে; কিন্তু পরামর্শ ভিন্ন আমাকে তদ্বিপরীত পথে বাধ্য করিতে কেহই অধিকারী নহেন। সমাজস্থ সকলেরই অধিকার আছে যে, সকল কার্য্যেই পরের অনিষ্ট না করিয়া আপনাপন প্রবৃত্তি মত সম্পাদন করে। পরের অনিষ্ট ঘটিলেই ইহা স্বেচ্ছাচারিতা, পরের অনিষ্ট না ঘটিলেই ইহা স্বানুবর্ত্তিতা। যে এই স্বানুবর্ত্তিতার বিঘ্ন করে, যে পরের অনিষ্ট না ঘটিবার স্থানেও আমার মতের বিরুদ্ধে আপন মত প্রবল করিয়া তদনুসারে কার্য্য করায়, সে-ই অত্যাচারী। রাজা ও সমাজ ও প্রণয়ী—এই তিন জনে এরূপ অত্যাচার করিয়া থাকেন।

রাজার অত্যাচার-নিবারণের উপায় বহুকাল উদ্ভূত হইয়াছে। সমাজের অত্যাচার-নিবারণ জন্য কোন কোন পূর্ব্বপণ্ডিত ধৃতাস্ত্র হইয়াছেন এবং তদ্বিষয়ে জন ষ্টুয়ার্ট মিলের যত্ন ও বিচারদক্ষতা তাঁহার মাহাত্ম্যের পরিচয় দিবে। কিন্তু ভালবাসার অত্যাচার নিবারণের জন্য যে কেহ কখন যত্নশীল হইয়াছেন, এমত আমাদিগের স্মরণ হয় না। কবিগণ সর্ব্ব-তত্ত্বদর্শী এবং অনন্ত জ্ঞানবিশিষ্ট, তাঁহাদের কাছে কিছুই বাদ পড়ে না। কৈকেয়ীর অত্যাচারে দশরথকৃত রামের নির্ব্বাসনে, দ্যূতাসক্ত যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক ভ্রাতৃগণের নির্ব্বাসনে এবং অন্যান্য শত শত স্থানে কবিগণ এই মহতী নীতি প্রতিপাদিতা করিয়াছেন। কিন্তু কবিরা নীতিবেত্তা নহেন, নীতিবেত্তারা এ বিষয়ে প্রকাশ্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই। যিনিই লৌকিক ব্যাপার সকল মনোভিনিবেশপূর্ব্বক পর্য্যবেক্ষণ করিবেন, তিনিই এ তত্ত্বের সমালোচনা যে বিশেষ প্রয়োজনীয়, তদ্বিষয়ে নিঃসংশয় হইবেন। কেন না, এ অত্যাচারে প্রবৃত্ত অত্যাচারী অনেক। পিতা মাতা, ভ্রাতা-ভগিনী, পুত্র-কন্যা, ভার্য্যা-স্বামী, আত্মীয়-কুটুম্ব, ভৃত্য যে-ই ভালবাসে, সেই একটু অত্যাচার করে এবং অনিষ্ট করে। তুমি সুলক্ষণান্বিতা, সদ্বংশজা, সচ্চরিত্রা কন্যা দেখিয়া তাহার পাণিগ্রহণ করিবে বাসনা করিয়াছ, এমত সময়ে তোমার পিতা আসিয়া বলিলেন—অমুক বিষয়াপন্ন লোক, তাহার কন্যার সঙ্গেই তোমার বিবাহ দিব। তুমি যদি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া থাক, তবে তুমি এ বিষয়ে পিতার আজ্ঞা-পালনে বাধ্য নহ, কিন্তু পিতৃপ্রেমে বশীভূত হইয়া সেই কালকূটরূপিণী ধনিকন্যা বিবাহ করিতে হইল। মনে কর, কেহ দারিদ্র্যপীড়িত, দৈবানুকম্পায় উত্তম পদস্থ হইয়া দূরদেশে যাইয়া দারিদ্র্য-মোচনের উদ্‌যোগ করিতেছে, এমন সময় মাতা তাহাকে দূরদেশে রাখিতে পারিবেন না বলিয়া কাঁদিয়া পড়িলেন, তাহাকে যাইতে দিলেন না, সে মাতৃ-প্রেমে বদ্ধ হইয়া নিরস্ত হইল। মাতার ভালবাসার অত্যাচারে সে আপনাকে চিরদারিদ্র্যে সমর্পণ করিল। কৃতী সহোদরের উপার্জ্জিত অর্থ, অকর্ম্মা অপদার্থ সহোদর নষ্ট করে, এটি নিতান্তই ভালবাসার অত্যাচার এবং হিন্দুসমাজে সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষ-গোচর হইয়া থাকে। ভার্য্যার ভালবাসার অত্যাচারের কোন উদাহরণ নব বঙ্গবাসীদিগের কাছে প্রযুক্ত করা আবশ্যক কি? আর স্বামীর অত্যাচার-সম্বন্ধে ধর্ম্মতঃ একটু বলা কর্ত্তব্য যে, কতকগুলি ভালবাসার অত্যাচার বটে, কিন্তু অনেক গুলিই বাহুবলের অত্যাচার।

যাহা হউক, মনুষ্য-জীবন ভালবাসার অত্যাচারে পরিপূর্ণ। চিরকাল মনুষ্য অত্যাচারপীড়িত। প্রথমাবস্থায় বাহুবলের অত্যাচার, অসভ্যজাতি-দিগের মধ্যে যে বলিষ্ঠ, সেই পরপীড়ন করে। কালে এই অত্যাচার রাজার অত্যাচার এবং অর্থের অত্যাচারে পরিণত হয়। কোন সমাজে কখন একেবারে লুপ্ত হয় নাই। দ্বিতীয়াবস্থায় ধর্ম্মের অত্যাচার, তৃতীয়াবস্থায় সামাজিক অত্যাচার এবং সকল অবস্থাতেই ভালবাসার অত্যাচার। এই চতুর্ব্বিধ পীড়নের মধ্যে প্রণয়ের পীড়ন কাহারও পীড়ন অপেক্ষা হীনবল বা অল্পানিষ্টকারী নহে। বরং ইহা বলা যাইতে পারে যে, রাজা, সমাজ বা ধর্ম্ম-বেত্তা কেহই প্রণয়ীর অপেক্ষা বলবান্ নহেন বা কেহ তেমন সদাসর্ব্বক্ষণ সকল কাজে আসিয়াই হস্তক্ষেপণ করেন না—সুতরাং প্রণয়ের পীড়ন যে সর্ব্বাপেক্ষা অনিষ্টকারী, ইহা বলা যাইতে পারে। আর অন্য অত্যাচারীকে নিবারণ করা যায়, অন্য অত্যাচারের সীমা আছে। কেন না, অন্যান্য অত্যাচারকারীর বিরোধী হওয়া যায়। প্রজা প্রজা-

* যদি রাজার এমন অধিকার আছে, স্বীকার করা যায়, তবে স্বীকার করিতে হয় যে, যে চিকিৎসা করিবে না বা যে অল্পবয়সে বা বুড়া বয়সে বিবাহ করিবে, রাজা তাহার দণ্ড করিতে অধিকারী। আর রাজার যদি এরূপ অধিকার স্বীকার করা না যায়, তবে চড়ক বন্ধ, সতীদাহ বন্ধ প্রভৃতি আইনের সমর্থন করা যায় না।

পীড়ক রাজাকে রাজ্যচ্যুত করে, কখনও মস্তকচ্যুত করে; লোকপীড়ক সমাজকে পরিত্যাগ করা যায়, কিন্তু ধর্ম্মের পীড়নে এবং স্নেহের পীড়নে নিষ্কৃতি নাই—কেন না, ইহাদের বিরোধী হইতে প্রবৃত্তি জন্মে না। হরিদাস বাবাজী পাঁটার বাটি দেখিলে কখন লাল ফেলিয়া থাকেন বটে, কিন্তু কখন গোস্বামীর মাংস ভোজনের ঔচিত্য বিচার করিতে ইচ্ছা করেন না—কেন না, জানেন, ইহলোকে যতই কষ্ট পান না কেন, বাবাজী পরলোকে গোলোক প্রাপ্ত হইবেন।

মনুষ্য যে সকল অত্যাচারের অধীন, সে সকলের ভিত্তিমূল মনুষ্যের প্রয়োজন। জড় পদার্থকে আয়ত্ত না করিতে পারিলে মনুষ্যজীবন নির্ব্বাহ হয় না, এ জন্য বাহুবলের প্রয়োজন এবং সেই জন্যই বাহুবলের অত্যাচারও আছে। বাহুবলের ফলবৃদ্ধি করিবার জন্য সমাজের প্রয়োজন এবং সমাজের অত্যাচারও সঙ্গে সঙ্গে। যেমন পরস্পরের সমাজবন্ধনে বদ্ধ না হইলে মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য সুসম্পন্ন হয় না, তেমনি পরস্পরের আন্তরিক-বন্ধনে বদ্ধ না হইলে মনুষ্যজীবনের সুনির্ব্বাহ হয় না। অতএব সমাজের যেরূপ প্রয়োজন, প্রণয়েরও তদ্রূপ বা ততোধিক প্রয়োজন এবং বাহুবলের বা সমাজের অত্যাচার আছে বলিয়াই যেমন বাহুবল বা সমাজ মনুষ্যের ত্যজ্য বা অনাদরণীয় হইতে পারে না, প্রণয়ের অত্যাচার আছে বলিয়াই তাহাও ত্যজ্য বা অনাদরণীয় হইতে পারে না। অপিচ, যেমন বাহুবল সমাজবলকে অত্যাচারী দেখিয়া তাহাকে পরিত্যক্ত বা অনাদৃত না করিয়া মনুষ্য, ধর্ম্মের দ্বারা তাহার শমতার চেষ্টা পাইয়াছে, প্রণয়ের অত্যাচারও সেইরূপ ধর্ম্মের দ্বারা শমিত করিতে যত্ন করা কর্ত্তব্য; ধর্ম্মের অত্যাচার আছে বটে এবং ধর্ম্মের অত্যাচার শমতার জন্য যদি আরও কোন শক্তি প্রযুক্ত হয়, তাহারও অত্যাচার ঘটিবে। কেন না, অত্যাচারশক্তি স্বাভাবিক। যদি ধর্ম্মের অত্যাচার-শমতার সক্ষম কোন শক্তি থাকে, তবে জ্ঞান সেই শক্তি। কিন্তু জ্ঞানেরও অত্যাচার আছে। তাহার উদাহরণ হিতবাদ এবং প্রত্যক্ষবাদ। এতদুভয়ের বেগে মনুষ্যহৃদয়সাগরে অনন্ত ভাগ চড়া পড়িয়া যাইতেছে। বোধ হয়, জ্ঞান ব্যতীত জ্ঞানের অত্যাচার শাসনের জন্য কোন শক্তি যে মনুষ্য কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইবে, এক্ষণে এমন বিবেচনা হয় না।

সেইরূপ ইহাও বলা যাইতে পারে যে, প্রণয়ের দ্বারাই প্রণয়ের অত্যাচার শমিত হওয়াই সম্ভব। এ কথা যথার্থ স্বীকার করি। স্নেহ যদি স্বার্থ-পরতাপূর্ণ হয়, তবে তাহাও ঘটিতে পারে। কিন্তু সাধারণ মনুষ্যের প্রবৃত্তি এইরূপ যে, স্বার্থপরতা-শূন্য স্নেহ দুর্লভ। এই কথার প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণ না করিয়া অনেকেই মনে মনে ইহার প্রতিবাদ করিতে পারেন; তাঁহারা বলিতে পারেন যে, যে মাতা স্নেহ-বশতঃ পুত্রকে অর্থান্বেষণে যাইতে দিল না, সে কি স্বার্থপর? বরং যদি স্বার্থপর হইত, তাহা হইলে পুত্রকে অর্থান্বেষণে দূর-দেশে যাইতে নিষেধ করিত না, কেন না, পুত্র অর্থোপার্জ্জন করিলে কোন্ না মাতা তাহার ভাগিনী হইবেন? অতএব ঐরূপ দর্শনমাত্র আকাঙ্ক্ষী স্নেহকেই অনেকে অস্বার্থপর স্নেহ মনে করেন। বাস্তবিক সে কথা সত্য নহে—এ স্নেহ অস্বার্থপর নহে। যাঁহারা ইহা অস্বার্থপর মনে করেন, তাঁহারা অর্থপরতাকে স্বার্থপরতা মনে করেন, যে মনে ধনের কামনা করে না, তাহাকে স্বার্থপরতাশূন্য মনে করেন। ধনলাভ ভিন্ন পৃথিবীতে যে অন্যান্য সুখ আছে এবং তন্মধ্যে কোন কোন সুখের আকাঙ্ক্ষা হইতে অধিকতর বেগবতী, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারেন না। যে মাতা অর্থের মায়া পরিত্যাগ করিয়া পুত্র-মুখ-দর্শন-সুখের বাসনায় পুত্রকে দারিদ্র্যে সমর্পণ করিল, সে আত্মসুখ খুঁজিল। সে অর্থ-জনিত সুখ চায় না, কিন্তু পুত্রসন্দর্শনজনিত সুখ চায়। সে সুখ মাতার, পুত্রের নহে, মাতৃদর্শনজনিত পুত্রের যদি সুখ থাকে, থাক্—সে স্বতন্ত্র, পুত্রের প্রবৃত্তিদায়ক, মাতার নহে, মাতা এখানে আপনার একটি সুখ খুঁজিল—নিত্য পুত্রমুখদর্শন; তাহার অভিলাষিণী হইয়া পুত্রকে দারিদ্র্যদুঃখে দুঃখী করিতে চাহিল। এখানে মাতা স্বার্থপর, কেন না, আপনার সুখের অভিপ্রায়ে অন্যকে দুঃখী করিল।

মনুষ্যের স্নেহ অধিকাংশই এইরূপ প্রণয়ী, প্রণয়ভাজন উভয়েরই চিত্তসুখকর, কিন্তু অস্বার্থপর, পশুবৃত্ত। কেবল প্রণয়ী অন্য সুখাপেক্ষা প্রণয়-সুখের অভিলাষী, এই জন্য লোকে এইরূপ স্নেহকে স্বার্থপর বলে। কিন্তু স্নেহের যে সুখ, সে স্নেহ-যুক্তের; স্নেহযুক্ত আপন সুখের আকাঙ্ক্ষা বলিয়া সাধারণ মনুষ্য-স্নেহকে স্বার্থপর-বৃত্তি বলিতে হইবে।

কিন্তু স্বার্থসাধন জন্য স্নেহ মনুষ্য-হৃদয়-স্থাপিত নহে। মনুষ্যের যতগুলি বৃত্তি আছে, বোধ হয়,

সর্ব্বাপেক্ষা এইটি পবিত্র ও মঙ্গলকর। মনুষ্যের চরিত্র এপর্য্যন্ত তাদৃশ উৎকর্ষ লাভ করে নাই বলিয়াই মনুষ্যস্নেহ অদ্যাপি পশুবৎ। পশুবৎ, কেন না, পশুদিগেরও বৎসস্নেহ, দাম্পত্য-প্রণয় এবং বাৎসল্য ব্যতীত পরস্পর অন্তর্বিধ প্রণয় আছে। প্রণয়টি মানুষের অপেক্ষা ক্ষুদ্র পরিমাণ নহে।

স্নেহের যথার্থ স্বরূপই অস্বার্থপরতা; যে মাতা পুত্রের সুখের কামনায় পুত্রমুখদর্শন পরিত্যাগ করিলেন, তিনি যথার্থ স্নেহবতী; যে প্রণয়ী প্রণয়ের পাত্রের মঙ্গলার্থ আপনার প্রণয়জনিত সুখভোগ ত্যাগ করিতে পারিল, সে-ই প্রণয়ী।

যত দিন না সাধারণ মনুষ্যের প্রেম এইরূপ বিশুদ্ধতা প্রাপ্ত হইবে, ততদিন মানুষের ভালবাসা হইতে স্বার্থপরতা-কলঙ্ক ঘুচিবে না এবং স্নেহের যথার্থ স্ফূর্ত্তি ঘটিবে না। যেখানে ভালবাসা এইরূপ বিশুদ্ধি প্রাপ্ত হইবে, বা যাহার হৃদয়ে হইয়াছে, সেইখানে ভালবাসা দ্বারায় ভালবাসার অত্যাচার নিবারণ হইতে পারে এবং হইয়াও থাকে। এরূপ বিশুদ্ধ-প্রণয়বিশিষ্ট মনুষ্য দুর্লভ নহে। কিন্তু এ প্রবন্ধে তাঁহাদিগের কথা বলিতেছি না—তাঁহারা অত্যাচারীও নহেন। অন্যত্র ধর্ম্মের শাসনে প্রণয় শাসিত করাই ভালবাসার অত্যাচার নিবারণের একমাত্র উপায়। সে ধর্ম্ম কি?

ধর্ম্মের যিনি যে ব্যাখ্যা করুন্ না, ধর্ম্ম এক। দুইটি মাত্র মূলসূত্রে সমস্ত মনুষ্যের নীতিশাস্ত্র কথিত হইতে পারে। তাহার মধ্যে একটি আত্মসম্বন্ধীয়, দ্বিতীয়টি পর-সম্বন্ধীয়। যাহা আত্মসম্বন্ধীয়, তাহাকে আত্মসংস্কারনীতির মূল বলা যাইতে পারে এবং আত্মচিত্তের স্ফূর্ত্তি এবং নির্ম্মলতা রক্ষাই তাহার উদ্দেশ্য। দ্বিতীয়টি পরসম্বন্ধীয় বলিয়াই তাহাকে যথার্থ ধর্ম্মনীতির মূল বলা যাইতে পারে। "পরের অনিষ্ট করিও না, সাধ্যানুসারে পরের মঙ্গল করিও," এই মহতী উক্তি জগতীয় তাবদ্ধর্ম্মশাস্ত্রের এক মাত্র মূল এবং এক মাত্র পরিণাম। অন্য যে কোন নৈতিক উক্তি বল না কেন, তাহার আদি ও চরম ইহাতেই বিলীন হইবে, আত্মসংস্কারনীতির সকল তত্ত্বের সহিত এই মহানীতিতত্ত্বের ঐক্য আছে এবং পরহিত-নীতি এবং আত্মসংস্কারনীতি একই তত্ত্বের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা মাত্র। পরহিতরতি এবং পরের অহিতে বিরতি, ইহাই সমগ্র নীতিশাস্ত্রে সার উপদেশ।

অতএব এই ধর্ম্মনীতির মূলসূত্রাবলম্বন করিলেই ভালবাসার অত্যাচার নিবারণ হইবে। যখন স্নেহশালী ব্যক্তি স্নেহের পাত্রের কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে উদ্যত হয়েন, তখন তাঁহার মনে দৃঢ়সংকল্প করা উচিত যে, আমি কেবল আপন সুখের জন্য হস্তক্ষেপ করিব না, আপনার ভাবিয়া যাহার প্রতি স্নেহ করি, তাহার কোন প্রকার অনিষ্ট করিব না। আমার যতটুকু কষ্ট সহ্য করিতে হয়, করিব, তথাপি তাহার কোন প্রকার অহিতে তাহাকে প্রবৃত্ত করিব না।

এ কথা শুনিতে অতি ক্ষুদ্র এবং পুরাতন জনশ্রুতির পুনরুক্তি বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু ইহার প্রয়োগ সকল সময়ে তত সহজ হইবে না। উদাহরণ-স্বরূপ দশরথকৃত রামনির্ব্বাসন মীমাংসার্থ গ্রহণ করিব, তদ্দ্বারা এই সামান্য নিয়মের প্রয়োগের কঠিনতা অনেকের হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিবে। এ স্থলে কৈকেয়ী এবং দশরথ উভয়েই ভালবাসার অত্যাচারে প্রবৃত্ত। কৈকেয়ী দশরথের উপরে। দশরথ রামের উপরে। ইহার মধ্যে কৈকেয়ীর কার্য্য স্বার্থপর এবং নৃশংস বলিয়া চির-পরিচিত। কৈকেয়ীর কার্য্য স্বার্থপর ও নৃশংস বটে, তবে তৎপ্রতি যতটা কটূক্তি হইয়া আসিতেছে, ততটা বিহিত কি না, বলা যায় না। কৈকেয়ী আপনার কোন ইষ্টকামনা করে নাই; আপনার পুত্রের শুভকামনা করিয়াছিল। সত্য বটে, পুত্রের মঙ্গলেই মাতার মঙ্গল; কিন্তু যে বঙ্গীয় পিতামাতা স্বীয় জাতিপাতের ভয়ে পুত্রকে শিক্ষার্থ ইংলণ্ডে যাইতে দেন না, কৈকেয়ীর কার্য্য তদপেক্ষা যে শতগুণে অস্বার্থপর, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই।

সে কথা যাউক, কৈকেয়ীর দোষগুণ-বিচারে আমরা প্রবৃত্ত নহি। দশরথ সত্যপালনার্থ রামকে বন-প্রেরণ করিয়া ভরতকে রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন, তাহাতে তাঁহার নিজের প্রাণবিয়োগ হইল, তিনি সত্যপালনার্থ আত্মপ্রাণ-বিয়োগ এবং প্রাণাধিক পুত্রের বিরহ স্বীকার করিলেন, ইহাতে ভারতবর্ষীয় সাহিত্য ও ইতিহাস তাঁহার যশঃকীর্ত্তনে পরিপূর্ণ। কিন্তু উৎকৃষ্ট ধর্ম্মনীতির বিচারে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, দশরথ পুত্রকে স্বাধিকারচ্যুত এবং নির্ব্বাসিত করিয়া সত্য পালন করায়, ঘোরতর অধর্ম্ম করিয়াছিলেন।

জিজ্ঞাসা করি, সত্যমাত্র কি পালনীয়? যদি সতী কুলবতী কুচরিত্র পুরুষের কাছে ধর্ম্মত্যাগে প্রতিশ্রুতা হয়, তবে সে সত্য কি পালনীয়? যদি

কেহ দস্যুর প্ররোচনায় সুহৃদকে বিনা দোষে বধ করিতে সত্য করে, তবে সে সত্য কি পালনীয়? যে কেহ ঘোরতর মহাপাতক করিতে সত্য করে, তাহার সত্য কি পালনীয়?

যেখানে সত্যলঙ্ঘনাপেক্ষা সত্য রক্ষায় অধিক অনিষ্ট, সেখানে সত্য রাখিবে, না সত্য ভঙ্গ করিবে? অনেকে বলিবেন, সেখানেও সত্য পালনীয়, কেন না, সত্য নিত্যধর্ম, অবস্থাভেদে তাহা পুণ্যত্ব পাপত্ব প্রাপ্ত হয় না। যদি পাপপুণ্যের এমন নিয়ম কর যে, যখন কর্ম্মকর্ত্তার বিবেচনায় ইষ্টকারক, তাহাই কর্ত্তব্য, যাহা তাঁহার তাৎকালিক বিবেচনায় অনিষ্টকারক, তাহা অকর্ত্তব্য, তবে পুণ্যপাপের প্রভেদ থাকে না—লোকে পুণ্য বলিয়া ঘোরতর মহাপাতকে প্রবৃত্ত হইতে পারে। আমরা এ তত্ত্বের মীমাংসা এ স্থলে করিব না, কেন না, হিতবাদীরা ইহার এক প্রকার মীমাংসা করিয়া রাখিয়াছেন। স্থূল কথায় উত্তর দিব।

যখন এরূপ মীমাংসার গোলযোগ হইবে, তখন ধর্ম্মনীতির যে মূলসূত্র সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহা দ্বারা পরীক্ষা কর।

সত্য কি সর্ব্বত্র পালনীয়? এ কথার মীমাংসা করিবার আগে জিজ্ঞাস্য, সত্য পালনীয় কেন? সত্য পালনের একটি মূল ধর্ম্মনীতিতে, একটি মূল আত্মসংস্কারনীতিতে। আমরা আত্মসংস্কারনীতিকে ধর্ম্মনীতির অংশ বলিয়া পরিগণিত করিতে অস্বীকার করিয়াছি, ধর্ম্মনীতির মূলই দেখিব। বিশেষ উভয়ের ফল একই। ধর্ম্মনীতির মূলসূত্র,—পরের অনিষ্ট যাহাতে হয়, তাহা অকর্ত্তব্য। সত্যভঙ্গে পরের অনিষ্ট হয়, এ জন্য সত্য পালনীয়। কিন্তু যখন এরূপ ঘটে যে, সত্যপালনে পরের গুরুতর অনিষ্ট, সত্যভঙ্গে ততদূর নহে, তখন সত্য পালনীয় নহে। দশরথের সত্য-পালনে রামের গুরুতর অনিষ্ট, সত্যভঙ্গে কৈকেয়ীর তাদৃশ কোন অনিষ্ট নাই। দৃষ্টান্তজনিত জনসমাজের যে অনিষ্ট, তাহা রামের স্বাধিকারচ্যুতিতেই গুরুতর। উহা দস্যুতার রূপান্তর। অতএব এমন স্থলে দশরথ সত্যপালন করিয়াই মহাপাপ করিয়াছিলেন।

এখানে দশরথ স্বার্থপরতাশূন্য নহেন। সত্য, জগতে তাঁহার কলঙ্ক ঘোষিত হইবে, এই ভয়েই তিনি রামকে অধিকারচ্যুত এবং বহিষ্কৃত করিলেন, অতএব যশোরক্ষারূপ স্বার্থের বশীভূত হইয়া রামের অনিষ্ট করিলেন। সত্য বটে, তিনি আপনার প্রাণহানিও স্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার কাছে প্রাণাপেক্ষা যশ প্রিয়, অতএব আপনার ইষ্ট খুঁজিয়াছিলেন। এ জন্য তিনি স্বার্থপর। স্বার্থপরতাদোষযুক্ত যে অনিষ্ট, তাহা ঘোরতর পাপ।

অস্বার্থপর প্রেম এবং ধর্ম্ম ইহাদের একই গতি, একই চরম। উভয়ের সাধ্য অন্যের মঙ্গল। বস্তুতঃ প্রেম এবং ধর্ম্ম একই পদার্থ। সর্ব্বসংসার প্রেমের বিষয়ীভূত হইলেই ধর্ম্মনাম প্রাপ্ত হয় এবং ধর্ম্ম যত দিন না সার্ব্বজনীন প্রেমস্বরূপ হয়, তত দিন সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। কিন্তু মনুষ্যগণ কার্য্যতঃ স্নেহকে ধর্ম্ম হইতে পৃথগ্‌ভূত রাখিয়াছে, এ জন্য ভালবাসার অত্যাচারনিবারণ জন্য ধর্ম্মের দ্বারা স্নেহের শাসন আবশ্যক।

জ্ঞান

ভারতবর্ষে দর্শন কাহাকে বলে? ইহার উত্তর দিতে গেলে প্রথমে বুঝিতে হইবে যে, ইউরোপে যে অর্থে "ফিলসফি" শব্দ ব্যবহৃত হয়, দর্শন সে অর্থে ব্যবহৃত হয় না। বাস্তবিক ফিলসফি শব্দের অর্থের স্থিরতা নাই—কখন ইহার অর্থ অধ্যাত্মতত্ত্ব, কখন ইহার অর্থ ধর্ম্মনীতি, কখন ইহার অর্থ বিচারবিদ্যা। ইহার একটিও ব্যাখ্যার অনুরূপ নহে। ফিলসফির উদ্দেশ্য জ্ঞানবিশেষ, তদতিরিক্ত অন্য উদ্দেশ্য নাই। দর্শনেরও উদ্দেশ্য জ্ঞান বটে, কিন্তু সে জ্ঞানেরও উদ্দেশ্য নিঃশ্রেয়স, মুক্তি, নির্ব্বাণ বা তদ্বৎ নামান্তরবিশিষ্ট পারলৌকিক অবস্থা। ইউরোপীয় ফিলসফিতে জ্ঞানই সাধনীয়। দর্শনে জ্ঞান সাধনমাত্র। ইহা ভিন্ন আর একটি গুরুতর প্রভেদ আছে। ফিলসফির উদ্দেশ্য জ্ঞানবিশেষ—কখন আধ্যাত্মিক, কখন ভৌতিক, কখন নৈতিক বা সামাজিক জ্ঞান। কিন্তু সর্ব্বত্র পদার্থমাত্রেরই জ্ঞান দর্শনের উদ্দেশ্য। ফলতঃ সকল প্রকার জ্ঞানই দর্শনের অন্তর্গত।

সংসার দুঃখময়। প্রাকৃতিক বল সর্ব্বদা মনুষ্যসুখের প্রতিদ্বন্দ্বী। তুমি যাহা কিছু সুখভোগ কর, সে যাহা প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া লাভ কর। মনুষ্যজীবন প্রকৃতির সঙ্গে দীর্ঘ সমরমাত্র—কখন তুমি সমরজয়ী হইলে, তখনই কিঞ্চিৎ সুখলাভ করিলে। কিন্তু মনুষ্যবল হইতে প্রাকৃতিক বল অনেক গুণে গুরুতর। অতএব মনুষ্যের জয় কদাচিৎ—প্রকৃতির জয়ই প্রতিনিয়ত ঘটিয়া থাকে। তবে জীবন যন্ত্রণাময়। আর্য্যমতে ইহার আবার পৌনঃপুন্য

আছে। ইহজন্মে অনন্ত দুঃখ কোনরূপে কাটাইয়া, প্রাকৃতিক রণে শেষে পরাস্ত হইয়া, যদি জীব দেহ-ত্যাগ করিল—তথাপি ক্ষমা নাই—আবার জন্মগ্রহণ করিতে হইবে—আবার মরিতে হইবে—আবার জন্মিতে হইবে। আবার দুঃখ। এই অনন্ত দুঃখের কি নিবৃত্তি নাই? মনুষ্যের নিস্তার নাই?

ইহার দুই উত্তর আছে। এক উত্তর ইউরোপীয়, আর এক উত্তর ভারতবর্ষীয়। ইউরোপীয়েরা বলেন, প্রকৃতি জেয়। যাহাতে প্রকৃতিকে জয় করিতে পার, সেই চেষ্টা দেখ। এই জীবনরণে প্রকৃতিকে পরাস্ত করিবার জন্য আয়ুধ সংগ্রহ কর। সেই আয়ুধ প্রকৃতিকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি নিজেই বলিয়া দিবেন। প্রাকৃতিক তত্ত্ব অধ্যয়ন কর—প্রকৃতির গুপ্ত তত্ত্বসকল অবগত হইয়া তাহারই বলে তাহাকে বিজিত করিয়া মনুষ্যজীবন সুখময় কর। এই উত্তরের ফল ইউরোপীয় বিজ্ঞানশাস্ত্র।

ভারতবর্ষীয় উত্তর এই যে, প্রকৃতি অজেয়। যত দিন প্রকৃতির সম্বন্ধ থাকিবে, তত দিন দুঃখ থাকিবে। অতএব প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ-বিচ্ছেদই দুঃখনিবারণের একমাত্র উপায়। সেই সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ কেবল জ্ঞানের দ্বারাই হইতে পারে। এই উত্তরের ফল ভারতবর্ষীয় দর্শন। সেই জ্ঞান কি? আকাশকুসুম বলিলেও একটি জ্ঞান হয়—কেন না, আকাশ কি, আমারা জানি এবং কুসুম কি, তাহাও জানি, মনের শক্তির দ্বারা উভয়ের সংযোগ করিতে পারি, কিন্তু সে জ্ঞান দর্শনের উদ্দেশ্য নহে। তাহা ভ্রমজ্ঞান; যথার্থ জ্ঞানই দর্শনের উদ্দেশ্য। এই যথার্থ জ্ঞানকে প্রমাজ্ঞান বা প্রমাপ্রতীতি বলে। সেই যথার্থ জ্ঞান কি?

যাহা জানি, তাহাই জ্ঞান। যাহা জানি, তাহা ।ক প্রকারে জানিয়াছি?

কতকগুলি বিষয় ইন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎ-সংযোগে জানিতে পারি। ঐ গৃহ, ঐ বৃক্ষ, ঐ নদী, এই পর্ব্বত, আমার সম্মুখে রহিয়াছে, তাহা আমি চক্ষে দেখিতে পাইতেছি, এ জন্য আমি জানি যে, ঐ গৃহ, ঐ বৃক্ষ, ঐ নদী, এই পর্ব্বত আছে। অতএব জ্ঞাতব্য-পদার্থের সঙ্গে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সংযোগে আমাদিগের জ্ঞান লব্ধ হইল (১) ইহাকে চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষ বলে। এইরূপ গৃহমধ্যে থাকিয়া শুনিতে পাইলাম, মেঘ গর্জ্জিতেছে, পক্ষী ডাকিতেছে। এখানে মেঘের ডাক, পক্ষীর রব আমরা কর্ণের দ্বারা প্রত্যক্ষ করিলাম। ইহা শ্রাবণপ্রত্যক্ষ। এইরূপ চাক্ষুষ, শ্রাবণ, ঘ্রাণজ, ত্বাচ, এবং রাসন, পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাধ্য পাঁচ প্রত্যক্ষ। মনও একটি ইন্দ্রিয় বলিয়া আর্য্যদার্শনিকেরা গণিয়া থাকেন, অতএব তাঁহারা মানসপ্রত্যক্ষের কথা বলেন। মন বহিরিন্দ্রিয় নহে। অন্তরিন্দ্রিয়ের সঙ্গে বহি-র্বিষয়ের সংযোগ অসম্ভব। অতএব মানসপ্রত্যক্ষে বহির্বিষয় অবগত হওয়া যায় না, কিন্তু অন্তর্জ্ঞান, মানসপ্রত্যক্ষের দ্বারাই হইবে।

যে পদার্থ প্রত্যক্ষ হয়, তদ্বিষয়ে আমাদিগের জ্ঞান জন্মে এবং তদ্ব্যতিরিক্ত বিষয়ের জ্ঞানও সূচিত হয়। আমি রুদ্ধদ্বার গৃহমধ্যে শয়ন করিয়া আছি, এমন সময়ে মেঘের ধ্বনি শুনিলাম, ইহাতে শ্রাবণ-প্রত্যক্ষ হইল। কিন্তু সে প্রত্যক্ষ ধ্বনির, মেঘের নহে। মেঘ এখানে আমাদের প্রত্যক্ষের বিষয় নহে। অথচ আমরা জানিতে পারিলাম যে, আকাশে মেঘ আছে। ধ্বনির প্রত্যক্ষে মেঘের অস্তিত্ব জ্ঞান হইল কোথা হইতে? আমরা পূর্ব্বে পূর্ব্বে দেখিয়াছি, আকাশে মেঘ ব্যতীত কখন এরূপ ধ্বনি হয় নাই। এমন ঘটে নাই যে, মেঘ হয় নাই, অথচ এরূপ ধ্বনি শুনা গিয়াছে। অতএব রুদ্ধদ্বার গৃহমধ্যে থাকিয়াও আমরা বিনা প্রত্যক্ষে জানিলাম যে, আকাশে মেঘ হইয়াছে। ইহাকে অনুমিতি বলে। মেঘধ্বনি আমরা প্রত্যক্ষে জানিয়াছি, কিন্তু মেঘ অনুমিতির দ্বারা।

মনে কর, ঐ রুদ্ধদ্বার গৃহ অন্ধকার, এবং তুমি সেখানে একাকী আছ। এমত কালে তোমার দেহের সহিত মনুষ্যশরীরের স্পর্শ অনুভূত করিলে। তুমি তখন কিছু না দেখিয়া, কোন শব্দ না শুনিয়া, জানিতে পারিলে যে, গৃহমধ্যে মনুষ্য আসিয়াছে। সেই স্পর্শজ্ঞান ত্বাচ-প্রত্যক্ষ; কিন্তু গৃহমধ্যে মনুষ্য-জ্ঞান অনুমিতি। ঐ অন্ধকার গৃহমধ্যে তুমি যদি যূথিকাপুষ্পের গন্ধ পাও, তবে তুমি বুঝিবে যে, গৃহে পুষ্পাদি আছে। এখানে গন্ধই প্রত্যক্ষের বিষয়, পুষ্প অনুমিতির বিষয়।

মনুষ্য অল্প বিষয়েই স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিতে পারে, অধিকাংশ জ্ঞানই অনুমিতির উপর নির্ভর করে। অনুমিতি সংসার চালাইতেছে। আমাদিগের অনুমানশক্তি না থাকিলে আমরা প্রায়ই কোন কার্য্যই করিতে পারিতাম না। বিজ্ঞান-দর্শনাদি অনুমানের উপরেই নির্ম্মিত।

(১) গৃহ-পর্ব্বতাদি দূরে রহিয়াছে, আমাদিগের চক্ষে সংলগ্ন নহে, তবে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইল কি প্রকারে? দৃষ্টপদার্থে বিক্ষিপ্ত রশ্মির দ্বারা, ঐ রশ্মি আমাদিগের নয়নাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে দৃষ্ট হয়।

কিন্তু যেমন কোন মনুষ্যই সকল বিষয় স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিতে পারেন না, তেমনি কোন ব্যক্তি সকল তত্ত্ব স্বয়ং অনুমান করিয়া সিদ্ধ করিতে পারেন না। এমন অনেক বিষয় আছে যে, তাহা অনুমান করিয়া জানিতে গেলে যে পরিশ্রম আবশ্যক, তাহা একজন মনুষ্যের জীবনকালের মধ্যে সাধ্য নহে। এমন অনেক বিষয় আছে যে, তাহা অনুমানের দ্বারা সিদ্ধ করার জন্য যে বিদ্যা, বা যে জ্ঞান বা বুদ্ধি, বা যে অধ্যবসায় প্রয়োজনীয়, তাহা অধিকাংশ লোকেরই নাই। অতএব এমন অনেক নিতান্ত প্রয়োজনীয় বিষয় আছে যে, তাহা অনেকে স্বয়ং প্রত্যক্ষ বা অনুমানের দ্বারা জ্ঞাত হইতে পারেন না। এমন স্থলে আমরা কি করিয়া থাকি; যে স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছে বা যে স্বয়ং অনুমান করিয়াছে, তাহার কথা শুনিয়া বিশ্বাস করি। ইতালির উত্তরে যে আল্প নামে পর্ব্বতশ্রেণী আছে, তাহা তুমি স্বয়ং প্রত্যক্ষ কর নাই। কিন্তু যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহাদের প্রণীত পুস্তক পাঠ করিয়া তুমি সে জ্ঞান লাভ করিলে। পরমাণুমাত্র যে অন্য পরমাণুমাত্রের দ্বারা আকৃষ্ট হয়, ইহা প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে পারে না এবং তুমিও ইহা গণনার দ্বারা সিদ্ধ করিতে পার নাই, এজন্য তুমি নিউটনের কথায় বিশ্বাস করিয়া সে জ্ঞান লাভ করিলে।

ন্যায়-সাংখ্যাদি আর্য্যদর্শন-শাস্ত্রে ইহা একটি তৃতীয় প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। ইহার নাম শব্দ। তাঁহাদিগের বিবেচনায় বেদাদি এই প্রমাণের উপর নির্ভর করে। আপ্তবাক্য বা গুরূপদেশ স্থূলতঃ যে বিশ্বাসযোগ্য, তাহার উপদেশ—আর্য্যমতে ইহা একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ। তাহারই নাম শব্দ।

কিন্তু চার্ব্বাকাদি কোন কোন আর্য্য দার্শনিক ইহাকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন না। ইউরোপীয়েরাও ইহাকে স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন না।

দেখা যাইতেছে, সকলের কথায় বিশ্বাস অকর্ত্তব্য। যদি একজন বিখ্যাত মিথ্যাবাদী আসিয়া বলে যে, সে জলে অগ্নি জ্বলিতে দেখিয়া আসিয়াছে, তবে এ কথা কেহই বিশ্বাস করিবে না। তাহার উপদেশে বৃথা জ্ঞানের উৎপত্তি নাই। ব্যক্তিবিশেষের উপদেশই প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য। তবে সেই জ্ঞানলাভের পূর্ব্বে আদৌ মীমাংসা আবশ্যক যে, কে বিশ্বাসযোগ্য, কে নহে। কোন্ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া মন্বাদির কথা আপ্তবাক্য বলিয়া গ্রহণ করিব এবং রামুশ্যামুর কথা অগ্রাহ্য করিব? দেখা যাইতেছে যে, অনুমানের দ্বারা ইহা সিদ্ধ করিতে হইবে। মনুর সঙ্গে পল্লীর পাদরী সাহেবের মতভেদ; তুমি চিরকাল শুনিয়া আসিয়াছ যে, মনু অভ্রান্ত ঋষি এবং পাদরী সাহেব স্বার্থপর সামান্য মনুষ্য, এ জন্য তুমি অনুমান করিলে যে, মনুর কথা গ্রাহ্য, পাদরীর কথা অগ্রাহ্য। মনুর ন্যায় অভ্রান্ত ঋষি গোমাংস ভোজন নিষেধ করিয়াছেন বলিয়া তুমি অনুমান করিলে, গোমাংস অভক্ষ্য। অতএব শব্দকে একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ না বলিয়া অনুমানের অন্তর্গত বল না কেন?

শুধু তাহাই নহে। যে ব্যক্তির কতকগুলি উপদেশ গ্রাহ্য কর, তাহারই আর কতকগুলি অগ্রাহ্য করিয়া থাক। মাধ্যাকর্ষণ সম্বন্ধে নিউটনের যে মত, তাহা তুমি শিরোধার্য্য কর, কিন্তু আলোক সম্বন্ধে তাঁহার যে মত, তাহা পরিত্যাগ করিয়া, তুমি ক্ষুদ্রতর বুদ্ধিজীবী ইয়ঙ ও ফ্রেনেলের মত গ্রহণ কর, ইহার কারণ কি? ইহার কারণ সন্ধান করিলে, তবে অনুমিতিকেই পাওয়া যাইবে। অনুমানের দ্বারা তুমি জানিয়াছ যে, মাধ্যাকর্ষণ সম্বন্ধে নিউটনের যে মত, তাহা সত্য, আলোক সম্বন্ধে তাঁহার যে মত, তাহা অসত্য। যদি শব্দ একটি পৃথক্ প্রমাণ হইত, তবে তাঁহার সকল মতই তুমি গ্রাহ্য করিতে।

ভারতবর্ষে তাহাই ঘটিয়া থাকে। ভারতবর্ষে যাহার মত গ্রাহ্য বলিয়া স্থির হয়, তাহার সকল মতই গ্রাহ্য। ইহার কারণ শব্দ একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়া গণ্য—আপ্তবাক্য মাত্র গ্রাহ্য, ইহা আর্য্যশাস্ত্রের আজ্ঞা। এইরূপ বিশেষ বিচার ব্যতীত ঋষি ও পণ্ডিতদিগের মত মাত্রই গ্রহণ করা ভারতবর্ষের অবনতির একটি যে কারণ, ইহা বলা বাহুল্য, অতএব দার্শনিকদিগের এই একটি ক্ষুদ্র ভ্রান্তিতে সামান্য কুফল ফলে নাই।

প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং শব্দ ভিন্ন নৈয়ায়িকেরা উপমিতিকেও একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ বিবেচনা করেন। বিচার করিয়া দেখিলে সিদ্ধ হইবে যে, উপমিতি অনুমিতির প্রকারভেদ মাত্র এবং সেই জন্য সাংখ্যাদি দর্শনে উপমিতি স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়া গণ্য হয় নাই। অতএব উপমিতির বিস্তারিত উল্লেখ প্রয়োজনীয় বোধ হইল না। বস্তুতঃ প্রত্যক্ষ এবং অনুমানই জ্ঞানের মূল।

তাহার পর দেখিতে হইবে যে, অনুমানও প্রত্যক্ষমূলক। যে জাতীয় প্রত্যক্ষ কখন হয় নাই,

সে বিষয় অনুমান হয় না। তুমি যদি কখন পূর্ব্বে মেঘ না দেখিতে বা আর কেহ কখন না দেখিত, তবে তুমি রুদ্ধদ্বার গৃহমধ্যে মেঘগর্জ্জন শুনিয়া কখন মেঘানুমান করিতে পারিতে না। তুমি যদি কখন যূথিকা-গন্ধ প্রত্যক্ষ না করিতে, তবে অন্ধকার গৃহে থাকিয়া যূথিকাঘ্রাণ পাইয়া তুমি কখন অনুমান করিতে পারিতে না যে, গৃহমধ্যে যূথিকা আছে। এইরূপ অন্যান্য পদার্থ সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে। তবে অনেক সময়ে দেখা যাইবে যে, একটি অনুমানের মূল বহুতর বহুজাতীয় পূর্ব্ব-প্রত্যক্ষ। এক একটি বৈজ্ঞানিক নিয়ম সহস্র সহস্র জাতীয় প্রত্যক্ষের ফল।

অতএব প্রত্যক্ষই জ্ঞানের একমাত্র মূল—সকল প্রমাণের মূল। (১) অনেকে দেখিয়া বিস্মিত হইবেন যে, দর্শনশাস্ত্র দুই সহস্র বৎসরের পর ঘুরিয়া ঘুরিয়া আবার সেই চার্ব্বাকের মতে আসিয়া পড়িতেছে। ধন্য আর্য্যবুদ্ধি! যাহা এতকালে হ্যুম, মিল, বেন প্রভৃতির দ্বারা সংস্থাপিত হইয়াছে, দুই সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে বৃহস্পতি তাহা প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন। কেহ না ভাবেন যে, আমরা এমন বলিতেছি যে, প্রত্যক্ষ ভিন্ন প্রমাণ নাই—আমরা বলিতেছি যে, সকল প্রমাণের মূল প্রত্যক্ষ। বৃহস্পতি ঠিক তাহাই বলিয়াছিলেন কি না, তাঁহার গ্রন্থ-সকল লুপ্ত হওয়ায় নিশ্চয় করা কঠিন।

প্রত্যক্ষই জ্ঞানের একমাত্র মূল, কিন্তু এই তত্ত্বের মধ্যে ইউরোপীয় দার্শনিকদের মধ্যে একটি ঘোরতর বিবাদ আছে। কেহ কেহ বলেন যে, আমাদিগের এমন অনেক জ্ঞান আছে যে, তাহার মূল প্রত্যক্ষ পাওয়া যায় না। যথা—কাল, আকাশ ইত্যাদি।

কথাটি বুঝা কঠিন। আকাশ সম্বন্ধে একটি সহজ কথা গ্রহণ করা যাউক, যথা—দুইটি সমান্তরাল রেখা যতদূর টানা যাউক, কখন মিলিত হইবে না, ইহা আমরা নিশ্চিত জানি। কিন্তু এ জ্ঞান আমরা কোথা পাইলাম? প্রত্যক্ষবাদী বলিলেন, "প্রত্যক্ষের দ্বারা। আমরা যত সমান্তরাল রেখা দেখিয়াছি, তাহা কখন মিলিত হয় নাই।" তাহাতে বিপক্ষেরা প্রত্যুত্তর করেন যে, জগতে যত সমান্তরাল রেখা হইয়াছে, সকল তুমি দেখ নাই—তুমি যাহা দেখিয়াছ, তাহা মিলে নাই বটে, কিন্তু তুমি কি প্রকারে জানিলে যে, কোন কালে কোথায় এমন দুইটি সমান্তরাল রেখা হয় নাই বা হইবে না যে, তাহা টানিতে টানিতে এক স্থানে মিলিবে না? যাহা মনুষ্যে প্রত্যক্ষ হইয়াছে, তাহা হইতে তুমি কি প্রকারে অপ্রত্যক্ষীভূতের নিশ্চয় করিলে? অথচ আমরা জানিতেছি যে, তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা সত্য—কস্মিন্‌কালে কোথাও এমন দুইটি সমান্তরাল রেখা হইতে পারে না যে, তাহা মিলিবে। তবে প্রত্যক্ষ ব্যতীত তোমার আর কোন জ্ঞানমূল আছে, নহিলে তুমি এই প্রত্যক্ষের অতিরিক্ত জ্ঞান-টুকু কোথায় পাইলে?

এই কথা বলিয়া বিখ্যাত জার্ম্মাণ দার্শনিক কান্ত, লক ও হ্যুমের প্রত্যক্ষবাদে প্রতিবাদ করেন। এই অতিরিক্ত জ্ঞানের মূল তিনি এই নির্দ্দেশ করেন যে, যেখানে বহির্ব্বিষয়ের জ্ঞান আমাদিগের ইন্দ্রিয়ের দ্বারা হইয়া থাকে, সেখানে বহির্ব্বিষয়ের প্রকৃতি সম্বন্ধে কোন তত্ত্বের নিত্যত্ব আমাদের জ্ঞানের অতীত হইলেও, আমাদিগের ইন্দ্রিয়সকলের প্রকৃতির নিত্যত্ব আমাদিগের জ্ঞানের আয়ত্ত বটে, আমাদিগের ইন্দ্রিয়সকলের প্রকৃতি অনুসারে আমরা বহির্ব্বিষয় কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট অবস্থাপন্ন বলিয়া পরিজ্ঞাত হই। ইন্দ্রিয়ের প্রকৃতি সর্ব্বত্র একরূপ, এ জন্য আমরা কাল-আকাশাদির সমবায়ের নিত্যত্ব জানিতে পারি। এই জ্ঞান আমাদিগেরই আছে—এ জন্য কান্ত ইহাকে স্বতোলব্ধ বা আভ্যন্তরিক জ্ঞান বলেন।

পাঠক আবার দেখিবেন যে, আধুনিক ইউরোপীয় দর্শন ফিরিয়া ঘুরিয়া সেই প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে মিলিতেছে। যেমন চার্ব্বাকের প্রত্যক্ষবাদে মিল ও বেনের প্রত্যক্ষবাদের সাদৃশ্য দেখা গিয়াছে, তেমনি বেদান্তের মায়াবাদের সঙ্গে কান্তের এই প্রত্যক্ষ প্রতিবাদের দেখা যায়। আধ্যাত্মিক-তত্ত্বে প্রাচীন আর্য্যগণ কর্ত্তৃক সূচিত হয় নাই, এমন তত্ত্ব অল্পই ইউরোপে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

কান্তীয় আভ্যন্তরিক মতের প্রধানতম প্রতিদ্বন্দ্বী জন ষ্টুয়ার্ট মিল। তিনি কার্য্য-কারণ সম্বন্ধের নিত্যত্বের উপর নির্ভর করেন। তিনি বলেন যে, আমরা প্রত্যক্ষের দ্বারা একটি অকাট্য সংস্কার এই লাভ করিয়াছি যে, যেখানে কারণ বর্ত্তমান আছে, সেইখানেই তাহার কার্য্য বর্ত্তমান থাকিবে। যেখানে পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, ক বর্ত্তমান আছে, সেখানে দেখিয়াছি যে, খ আছে। পুনর্ব্বার যদি কোথাও ক দেখি, তবে আমরা জানিতে পারি, যে, খ-ও এখানে আছে, কেন না, আমরা প্রত্যক্ষের

(১) এই সকল মত আমি এক্ষণে পরিত্যাগ করিয়াছি।

দ্বারা জানিয়াছি, যেখানে কারণ থাকে, সেইখানেই তাহার কার্য্য থাকে। সমান্তরালতা কারণ, এবং সংমিলন-বিরহই তাহার কার্য্য, কেন না, আমরা যেখানে যেখানে সমান্তরালতা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, সেইখানে সেইখানে দেখিয়াছি, মিল হয় নাই; অতএব সমান্তরালতা, সংমিলন-বিরহের নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী। কাজেই আমরা জানিতেছি যে, যখন যেখানে দুইটি সমান্তরাল রেখা থাকিবে, সেইখানেই আর তাহাদিগের মিলন হইবে না। অতএব এ জ্ঞান প্রত্যক্ষমূলক।

শেষের মত হর্বট স্পেন্সেরের। তিনিও প্রত্যক্ষবাদী, কিন্তু তিনি বলেন যে, এই প্রত্যক্ষ-মূলক জ্ঞান সকলটুকু আমাদিগের নিজ প্রত্যক্ষজাত নহে, প্রত্যক্ষজাত সংস্কার পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমার পূর্ব্বপুরুষদিগের যে প্রত্যক্ষজাত সংস্কার, আমি তাহা কিয়দংশে প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি যে সেই সকল সংস্কার লইয়া জন্মিয়াছি, এমন নহে,—তাহা হইলে সদ্যঃপ্রসূত শিশুও সংস্কারবিশিষ্ট হইত; কিন্তু তাহার বীজ আমার শরীরে (মন শরীরের অন্তর্গত) আছে; প্রয়োজনমত সময়ে জ্ঞানে পরিণত হইবে। এইরূপ যাহা কান্তীয় মতে আভ্যন্তরিক বা সহজ জ্ঞান, স্পেন্সরের মতে তাহা পূর্ব্বপুরুষপরম্পরাগত প্রত্যক্ষজাত জ্ঞান। এই কথা আপাততঃ অপ্রামাণিক বোধ হইতে পারে, কিন্তু স্পেন্সর এরূপ দক্ষতায় ইহার সমর্থন করিয়াছেন যে, ইউরোপে এই মতই এক্ষণে প্রচলিত হইয়া উঠিতেছে। (১)

সাংখ্যদর্শন

প্রথম পরিচ্ছেদ

উপক্রমণিকা

এ দেশীয় প্রাচীন দর্শন সকলের মধ্যে বঙ্গদেশে ন্যায়ের প্রাধান্য। দেশীয় পণ্ডিতেরা সচরাচর সাংখ্যের প্রতি তাদৃশ মনোযোগ করেন না। কিন্তু ভারতবর্ষে সাংখ্য যে কীর্ত্তি করিয়াছে, তাহা দর্শন দূরে থাকুক, অন্য কোন শাস্ত্রের দ্বারা হইয়াছে কি না, সন্দেহ। বহুকাল হইল, এই দর্শনের প্রকাশ হয়। কিন্তু অদ্যাপি হিন্দুসমাজের হৃদয়মধ্যে ইহার নানা মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে। যিনি হিন্দুদিগের পুরাবৃত্ত অধ্যয়ন করিতে চাহেন, সাংখ্যদর্শন না বুঝিলে তাঁহার সম্যক্ জ্ঞান জন্মিবে না; কেন না, হিন্দুসমাজের পূর্ব্বকালীয় গতি অনেক দূর সাংখ্য-প্রদর্শিত পথে চলিয়াছিল। যিনি বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের চরিত্র বুঝিতে চাহেন, তিনি সাংখ্য অধ্যয়ন করুন, সেই চরিত্রের মূল সাংখ্যে অনেক দেখিতে পাইবেন। সংসার যে দুঃখময়, দুঃখনিবারণমাত্র আমাদিগের পুরুষার্থ, এ কথা যেমন হিন্দুজাতির হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করিয়াছে, এমন বোধ হয়, পৃথিবীর আর কোন জাতির মধ্যে হয় নাই। তাহার বীজ সাংখ্যদর্শনে। তন্নিবন্ধন ভারতবর্ষে যে পরিমাণে বৈরাগ্য বহুকাল হইতে প্রবল, তেমন আর কোন দেশেই নহে। সেই বৈরাগ্যপ্রাবল্যের ফল বর্ত্তমান হিন্দুচরিত্র। যে কার্য্যপরতন্ত্রতার অভাব আমাদিগের প্রধান লক্ষণ বলিয়া বিদেশীয়েরা নির্দ্দেশ করেন, তাহা সেই বৈরাগ্যের সাধারণতা মাত্র। যে অদৃষ্টবাদিত্ব আমাদিগের দ্বিতীয় প্রধান লক্ষণ, তাহা সাংখ্যজাত বৈরাগ্যের ভিন্নমূর্ত্তি মাত্র। এই বৈরাগ্যসাধারণতা এবং অদৃষ্টবাদিত্বের কৃপাতে ভারতবর্ষীয়দিগের অসীম বাহুবল সত্ত্বেও আর্য্যভূমি মুসলমানপদানত হইয়াছিল। সেই জন্য অদ্যাপি ভারতবর্ষ পরাধীন। সেই জন্যই বহু কাল হইতে এ দেশে সমাজোন্নতি মন্দ হইয়া শেষে অবরুদ্ধ হইয়াছিল।

আবার সাংখ্যের প্রকৃতি-পুরুষ লইয়া তন্ত্রের সৃষ্টি। সেই তান্ত্রিককাণ্ডে দেশ ব্যাপ্ত হইয়াছে। সেই তন্ত্রের কৃপায় বিক্রমপুরে বসিয়া নিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ঠাকুর অপরিমিত মদিরা উদরস্থ করিয়া, ধর্ম্মাচরণ করিলাম বলিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিতেছেন, সেই তন্ত্রের প্রভাবে প্রায় শত যোজন দূরে ভারত-বর্ষের পশ্চিমাংশে কানফোঁড়া যোগী উলঙ্গ হইয়া কদর্য্য উৎসব করিতেছে, সেই তন্ত্রের প্রসাদে আমরা দুর্গোৎসব করিয়া এই বাঙ্গালাদেশের ছয়

---

(১) অনেকে কোম্‌তের Positve Philosophy নামক দর্শনশাস্ত্রের নামানুবাদে প্রত্যক্ষবাদ লিখিয়া থাকে। আমাদের বিবেচনায় সেটি ভ্রম। যাহাকে "Impirical philosophy" বলে অর্থাৎ লক, হ্যুম, মিল ও বেনের মতকেই প্রত্যক্ষবাদ শব্দ বলা যায়। আমরা সেই অর্থে প্রত্যক্ষবাদ শব্দ ব্যবহার করিয়াছি।

কোটি লোক জীবন সার্থক করিতেছি। যখন গ্রামে, নগরে, মাঠে, জঙ্গলে শিবালয়, কালীর মন্দির দেখি, আমাদের সাংখ্য মনে পড়ে; যখন দুর্গা-কালী-জগদ্ধাত্রী-পূজার বাদ্য শুনি, আমাদের সাংখ্যদর্শন মনে পড়ে।

সহস্র বৎসরকাল বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষের প্রধান ধর্ম্ম ছিল। ভারতবর্ষের পুরাবৃত্তে যে সময়টি সর্ব্বাপেক্ষা বিচিত্র এবং সৌষ্ঠব-লক্ষণযুক্ত, সেই সময়টিতেই বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতভূমির প্রধান ধর্ম্ম ছিল। ভারতবর্ষ হইতে দূরীকৃত হইয়া সিংহলে, নেপালে, তিব্বতে, চীনে, ব্রহ্মে, শ্যামে এই ধর্ম্ম অদ্যাপি ব্যাপিয়া রহিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মের আদি এই সাংখ্যদর্শনে। বেদে অবজ্ঞা, নির্ব্বাণ এবং নিরীশ্বরতা, বৌদ্ধধর্ম্মে এই তিনটি নূতন; এই তিনটিই ঐ ধর্ম্মের কলেবর। উপস্থিত লেখক কর্ত্তৃক ১০৬ সংখ্যক কলিকাতা রিবিউতে "বৌদ্ধ-ধর্ম্ম এবং সাংখ্যদর্শন" ইতি প্রবন্ধে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে, এই তিনটিরই মূল সাংখ্যদর্শনে। নির্ব্বাণ সাংখ্যের মুক্তির পরিমাণ মাত্র।—বেদের অবজ্ঞা সাংখ্যে প্রকাশ্যে কোথাও নাই, বরং বৈদিকতার আড়ম্বর অনেক; কিন্তু সাংখ্যপ্রবচনকার বেদের দোহাই দিয়া শেষে বেদের মূলোচ্ছেদ করিয়াছেন।*

কথিত হইয়াছে যে, যত লোক বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী, তত সংখ্যক অন্য কোন ধর্ম্মাবলম্বী লোক পৃথিবীতে নাই। সাংখ্য সম্বন্ধে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীরা তৎপরবর্ত্তী। সুতরাং যে কেহ জিজ্ঞাসা করে, পৃথিবীতে অবতীর্ণ মনুষ্যমধ্যে কে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লোকের জীবনের উপর প্রভুত্ব করিয়াছেন, তখন আমরা প্রথমে শাক্যসিংহের, তৎপরে খৃষ্টের নাম করিব। কিন্তু শাক্যসিংহের সঙ্গে সঙ্গে কপিলেরও নাম করিতে হইবে।

অতএব স্পষ্টাক্ষরে বলা যাইতে পারে যে, পৃথিবীতে যে সকল দর্শনশাস্ত্র অবতীর্ণ হইয়াছে, সাংখ্যের ন্যায় কেহ বহু ফলোৎপাদক হয় নাই।

সাংখ্যের প্রথমোৎপত্তি কোন্ কালে হইয়াছিল, তাহা স্থির করা অতি কঠিন, সম্ভবতঃ উহা বৌদ্ধ-ধর্ম্মের পূর্ব্বে প্রচারিত হইয়াছিল। কিংবদন্তী আছে যে, কপিল উহার প্রণেতা। এ কিংবদন্তীর প্রতি অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। কিন্তু তিনি কে, কোন্ কালে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। কেবল ইহাই বলা যাইতে পারে যে, তাদৃশ বুদ্ধিশালী ব্যক্তি পৃথিবীতে অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। পাঠক স্মরণ রাখিবেন যে, আমরা "নিরীশ্বর সাংখ্যকেই" সাংখ্য বলিতেছি। পতঞ্জলি-প্রণীত যোগশাস্ত্রকে সেশ্বরসাংখ্য বলিয়া থাকে, এ প্রবন্ধে তাহার কোন কথা নাই।

সাংখ্যদর্শন অতি প্রাচীন হইলেও, বিশেষ প্রাচীন সাংখ্যগ্রন্থ দেখা যায় না। সাংখ্য-প্রবচনকে অনেকেই কাপিলসূত্র বলেন, কিন্তু তাহা কখনই কপিল-প্রণীত নহে। উহা যে বৌদ্ধ, ন্যায়, মীমাংসা প্রভৃতি দর্শনের প্রচারের পরে প্রণীত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ ঐ গ্রন্থমধ্যে আছে। ঐ সকল দর্শনের মত সাংখ্যপ্রবচনে খণ্ডন করা দেখা যায়। তদ্ভিন্ন সাংখ্যকারিকা, তত্ত্বসমাস, ভোজবার্ত্তিক, সাংখ্যসার, সাংখ্যপ্রদীপ, সাংখ্যতত্ত্বপ্রদীপ ইত্যাদি গ্রন্থ এবং এই সকল গ্রন্থের ভাষ্য, টীকা প্রভৃতি বহু গ্রন্থ অপেক্ষাকৃত অভিনব। কপিল, অর্থাৎ সাংখ্যদর্শনের প্রথম অধ্যাপকের যে মত, তাহাই আমাদিগের আদরণীয় ও সমালোচ্য এবং যাহা কাপিলসূত্র বলিয়া চলিত, তাহাই আমরা অবলম্বন করিয়া অতি সংক্ষেপে সাংখ্যদর্শনের স্থূল উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিবার যত্ন করিব। আমরা যাহা কিছু বলিতেছি, তাহাই যে সাংখ্যের মত, এমত বিবেচনা কেহ না করেন। যাহা কিছু বলিলে সাংখ্যের মত ভাল করিয়া বুঝা যায়, আমরা তাহাই বলিব।

কতকগুলি বিজ্ঞ লোক বলেন, এ সংসার সুখের সংসার। আমরা সুখের জন্য এ পৃথিবীতে প্রেরিত হইয়াছি। যাহা কিছু দেখি, জীবের সুখের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। জীবের সুখ-বিধান করিবার জন্যই সৃষ্টিকর্ত্তা জীবকে সৃষ্ট করিয়াছেন। সৃষ্ট জীবের মঙ্গলার্থ সৃষ্টি-মধ্যে কত কৌশল, কে না দেখিতে পায়?

আবার কতকগুলি লোক আছেন, তাঁহারাও বিজ্ঞ—তাঁহারা বলেন, সংসারে সুখ ত কই দেখি না—দুঃখেরই প্রাধান্য। সৃষ্টিকর্ত্তা কি অভিপ্রায়ে জীবের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা বলিতে পারি না—তাহা মনুষ্যবুদ্ধির বিচার্য্য নহে—কিন্তু সে অভিপ্রায় যাহাই হউক, সংসারে জীবের সুখের অপেক্ষা অসুখ অধিক। তুমি বলিবে, ঈশ্বর যে সকল নিয়ম অবধারিত করিয়া দিয়াছেন, সেগুলি রক্ষা করিয়া চলিলেই কোন দুঃখ নাই, নিয়মের লঙ্ঘনশ্লোনঃপুন্যেই এত দুঃখ। আমি বলি, যেখানে ঈশ্বর এমন

* বৌদ্ধধর্ম্ম যে সাংখ্যমূলক, তাহার প্রমাণ অবিস্তারে দিবার স্থান নহে।

সকল নিয়ম করিয়াছেন, তাহা অতি সহজেই লঙ্ঘন করা যায় এবং তাহা লঙ্ঘনের প্রবৃত্তিও অতি বলবতী করিয়া দিয়াছেন, তখন নিয়মলঙ্ঘন ব্যতীত নিয়মরক্ষা যে তাঁহার অভিপ্রায়, এ কথা কে বলিবে? মাদক-সেবন পরিণামে মনুষ্যের অত্যন্ত দুঃখদায়ক—তবে মাদকসেবনের প্রবৃত্তি মনুষ্যের হৃদয়ে রোপিত হইয়াছে কেন? এবং মাদকসেবন এত সুসাধ্য এবং আশু-সুখকর কেন? কতকগুলি নিয়ম এত সহজে লঙ্ঘনীয় যে, তাহা লঙ্ঘন করিবার সময় কিছুই জানিতে পারা যায় না। ডাক্তার আঙ্গস্ স্মিথের পরীক্ষায় সপ্রমাণ হইয়াছে যে, অনেক সময়ে মহৎ অনিষ্টকারী কার্ব্বনিক আসিড-প্রধান বায়ু নিঃশ্বাসে গ্রহণ করিলে আমাদের কোন কষ্ট হয় না। বসন্তাদি রোগের বিষবীজ কখন্ আমাদের শরীরে প্রবেশ করে, তাহা আমরা জানিতেও পারি না। অনেকগুলি নিয়ম এমন আছে যে, তাহার উল্লঙ্ঘনে আমরা সর্ব্বদা কষ্ট পাইতেছি, কিন্তু সে নিয়ম কি, তাহা আমাদিগের জানিবার শক্তি নাই। ওলাউঠা রোগ কেন জন্মে, তাহা আমরা এ পর্য্যন্ত জানিতে পারিলাম না। অথচ লক্ষ লক্ষ লোক প্রতি বৎসর ইহাতে কত দুঃখ পাইতেছে। যদি নিয়মটি লঙ্ঘনের ক্ষমতা দিয়া নিয়মটি জানিতে দেন নাই, তবে জীবের মঙ্গলকামনা কোথা? পণ্ডিত-পিতার পুত্র গণ্ডমূর্খ; তাহার মূর্খতার যন্ত্রণায় পিতা রাত্রিদিন যন্ত্রণা পাইতেছেন। মনে কর, শিক্ষার অভাবে সে মূর্খতা জন্মে নাই। পুত্রটি স্থূলবুদ্ধি হইয়াই ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল। কোন্ নিয়ম লঙ্ঘন করায় পুত্রের মস্তিষ্ক অসম্পূর্ণ, এ নিয়ম কি কখন মনুষ্যবুদ্ধির আয়ত্ত হইবে? মনে কর, ভবিষ্যতে হইবে। তবে যত দিন সে নিয়ম আবিষ্কৃত না হইল, তত দিন যে মনুষ্যজাতি দুঃখ পাইবে, ইহা সৃষ্টিকর্ত্তার অভিপ্রেত নহে, কেমন করিয়া বলিব? আবার, আমরা সকল নিয়মরক্ষা করিতে পারিলেও দুঃখ পাইব না, এমত দেখি না। একজন নিয়ম লঙ্ঘন করিতেছে, আর একজন দুঃখভোগ করিতেছে, আমার প্রিয়বন্ধু আপনার কর্ত্তব্যসাধনার্থ রণক্ষেত্রে গিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন, আমি তাঁহার বিরহযন্ত্রণা ভোগ করিলাম। আমার জন্মিবার পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে যে মন্দ আইন বা মন্দ রাজশাসন হইয়াছে, আমি তাহার ফলভোগ করিতেছি; কাহারও পিতামহ ব্যাধিগ্রস্ত ছিলেন, পৌত্র কোন নিয়ম লঙ্ঘন না করিয়াও ব্যাধিগ্রস্ত হইতে পারে।

আবার গোটাকত এমন গুরুতর বিষয় আছে যে, স্বাভাবিক নিয়মানুবর্ত্তী হওয়াতেও দুঃখ। লোক-সংখ্যাবৃদ্ধি-বিষয়ে মাল্থসের মত ইহার একটি প্রমাণ। এক্ষণে সুবিবেচকেরা সকলেই স্বীকার করেন যে, মনুষ্য সাধারণতঃ নৈসর্গিক নিয়মানুসারে আপন আপন স্বভাবের পরিতোষ করিলেই লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া মহৎ অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে।

অতএব সংসার কেবল দুঃখময়, ইহা বলিবার যথেষ্ট কারণ আছে। সাংখ্যকারও তাহাই বলেন। সেই কথাই সাংখ্যদর্শন ও বৌদ্ধধর্ম্মের মূল।

কিন্তু পৃথিবীতে যে কিছু সুখ আছে, তাহাও অস্বীকার্য্য নহে। সাংখ্যকার বলেন যে, সুখ অল্প। কদাচ কেহ সুখী, (৬অধ্যায়, ৭ সূত্র) এবং সুখ, দুঃখের সহিত এরূপ মিশ্রিত যে, বিবেচকেরা তাহা দুঃখ পক্ষে নিক্ষেপ করেন। (ঐ, ৮) দুঃখ হইতে তাদৃশ সুখাকাঙ্ক্ষা জন্মে না (ঐ, ৬), অতএব দুঃখেরই প্রাধান্য।

সুতরাং মনুষ্য-জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য দুঃখ-মোচন। এই জন্য সাংখ্য-প্রবচনের প্রথম সূত্র "অথ ত্রিবিধ-দুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ।"

এই পুরুষার্থ কি প্রকারে সিদ্ধ হয়, তাহারই পর্য্যালোচনা সাংখ্যদর্শনের উদ্দেশ্য। দুঃখে পড়িলেই লোকে তাহার একটা নিবারণের উপায় করে। ক্ষুধায় কষ্ট পাইতেছ, আহার কর। পুত্রশোক পাইতেছ, অন্য বিষয়ে চিত্ত নিবিষ্ট কর। কিন্তু সাংখ্যকার বলেন যে, এ সকল উপায়ে দুঃখনিবৃত্তি নাই; কেন না, আবার সেই সকল দুঃখের অনুবৃত্তি আছে। তুমি আহার করিলে, তাহাতে তোমার আজিকার ক্ষুধানিবৃত্তি হইল, কিন্তু আবার কালি ক্ষুধা পাইবে। বিষয়ান্তরে চিত্ত রত করিয়া তুমি এবার পুত্রশোক নিবারণ করিলে, কিন্তু আবার অন্য পুত্রের জন্য তোমাকে হয় ত সেইরূপ শোক পাইতে হইবে। পরন্তু এরূপ উপায় সর্ব্বত্র সম্ভবে না। তোমার হস্তপদ ছিন্ন হইলে আর লগ্ন হইবে না। যেখানে সম্ভবে, সেখানেও তাহা সদুপায় বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। অন্য বিষয়ে নিরত হইলেও পুত্রশোক বিস্মৃত হওয়া যায় না। (১ম অধ্যায়, ২ সূত্র)।

তবে এ সকল দুঃখনিবারণের উপায় নহে। আধুনিক বিজ্ঞানবিৎ কোম্তের শিষ্য বলিবেন, তবে আর দুঃখ-নিবারণের কি উপায় আছে? আমরা জানি যে, জলসেক করিলে অগ্নিনির্ব্বাণ হয়, কিন্তু শীতল ইন্ধন পুনর্জ্বলিত হইতে পারে

বলিয়া তুমি যদি জলকে অগ্নিনাশক না বল, তবে কথা ফুরাইল। তাহা হইলে দেহধ্বংস ভিন্ন আর জীবের দুঃখনিবৃত্তি নাই।

সাংখ্যকার তাহাও মানেন না; তিনি জন্মান্তর মানেন, এবং লোকান্তরে জন্মপৌনঃপুন্য আছে ভাবিয়া এবং জরামরণাদিজ দুঃখ সমান ভাবিয়া তাহাও দুঃখনিবারণের উপায় বলিয়া গণ্য করেন না, (৩য় অধ্যায়, ৫২—৫৩ সূত্র)। আত্মা বিশ্বকারণে বিলীন হইলেও তদবস্থাকে দুঃখনিবৃত্তি বলেন না; কেন না, যে জলমগ্ন, তাহার আবার উত্থান আছে। (ঐ, ৫৪)।

তবে দুঃখনিবারণ কাহাকে বলি? অপবর্গই দুঃখনিবৃত্তি।

অপবর্গই বা কি? "দ্বয়োরেকতরস্য বৌদাসীন্য-মপবর্গঃ।" (তৃতীয় অধ্যায়, ৬৫ সূত্র)। সেই অপবর্গ কি এবং কি প্রকারে তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা পর-পরিচ্ছেদে সবিশেষ বলিব। "অপবর্গ" ইত্যাদি প্রাচীন কথা শুনিয়া পাঠক ঘৃণা করিবেন না, যাহা প্রাচীন, তাহাই যে উপধর্ম্ম-কলঙ্কিত, বা সর্ব্বজনপরিজ্ঞাত, এমন মনে করিবেন না। বিবেচক দেখিবেন, সাংখ্যদর্শনে একটু সারও আছে, অসার বৃক্ষে এমন স্থায়ী ফল ফলিবে কেন?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিবেক

আমি যত দুঃখ ভোগ করি—কিন্তু আমি কে? বাহ্যপ্রকৃতি ভিন্ন আর কিছুই আমার ইন্দ্রিয়ের গোচর নহে। তুমি বলিতেছ, আমি বড় দুঃখ পাইতেছি—আমি বড় সুখী। কিন্তু একটি মনুষ্য-দেহ ভিন্ন "তুমি" বলিব, এমন কোন সামগ্রী দেখিতে পাই না। তোমার দেহ এবং দৈহিক প্রক্রিয়া, ইহাই কেবল আমার জ্ঞানগোচর, তবে কি তোমার দেহেরই এই সুখভোগ বলিব?

তোমার মৃত্যু হইলে, তোমার সেই দেহ পড়িয়া থাকিবে; কিন্তু তৎকালে তাহার সুখ ও দুঃখভোগের কোন লক্ষণ দেখা যাইবে না। আবার মনে কর, কেহ তোমাকে অপমান করিয়াছে, তাহাতে দেহের কোন বিকার নাই, তথাপি তুমি দুঃখী। তবে তোমার দেহ দুঃখভোগ করে না। যে দুঃখভোগ করে, সে স্বতন্ত্র। সেই তুমি, তোমার দেহ তুমি নহে।

এইরূপ সকল জীবের। অতএব দেখা যাইতেছে যে, এই জগতের কিয়দংশ অন্তরের মাত্র, ইন্দ্রিয়গোচর নহে এবং সুখদুঃখাদির ভোগকর্ত্তা। যে সুখ-দুঃখাদির ভোগকর্ত্তা, সে-ই আত্মা। সাংখ্যে তাঁহার নাম পুরুষ। পুরুষ ভিন্ন জগতে আর যাহা কিছু আছে, তাহা প্রকৃতি।

আধুনিক মনস্তত্ত্ববিদেরা কহেন যে, আমাদিগের সুখ দুঃখ মানসিক বিকারমাত্র। সেই সকল মানসিক বিকার কেবল মস্তিষ্কের ক্রিয়ামাত্র। তুমি আমার অঙ্গে কণ্টক বিদ্ধ করিলে, বিদ্ধস্থানস্থিত স্নায়ু তাহাতে বিচলিত হইল—সেই বিচলন মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত গেল। তাহাতে মস্তিষ্কের যে বিকৃতি হইল, তাহাই বেদনা। সাংখ্যমতাবলম্বীরা বলিতে পারেন, "মানি, তাহাই ব্যথা" কিন্তু "ব্যথা ভোগ করিল সেই আত্মা," এক্ষণকার অন্ত সম্প্রদায়ের মনস্তত্ত্ববিদেরাও প্রায় সেইরূপ বলেন। তাঁহারা বলেন, মস্তিষ্কের বিকারই সুখ-দুঃখ বটে, কিন্তু মস্তিষ্ক আত্মা নহে, ইহা আত্মার ইন্দ্রিয়মাত্র। এ-দেশীয় দার্শনিকেরা যাহাকে অন্তরিন্দ্রিয় বলেন, উঁহারা মস্তিষ্ককে তাহাই বলেন।

শরীরাদি ব্যতিরিক্ত পুরুষ। কিন্তু দুঃখ ত শারীরাদিক। শরীরাদিতে যে দুঃখের কারণ নাই, এমন দুঃখ নাই। যাহাকে মানসিক দুঃখ বলি, বাহ্য পদার্থই তাহার মূল। আমার বাক্যে তুমি অপমানিত হইলে, আমার বাক্য প্রাকৃতিক পদার্থ। তাহা শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা তুমি গ্রহণ করিলে, তাহাতে তোমার দুঃখ। অতএব প্রকৃতি ভিন্ন কোন দুঃখ নাই। কিন্তু প্রকৃতিঘটিত দুঃখ পুরুষকে বর্ত্তে কেন? "অসঙ্গোঽয়ম্পুরুষঃ।" পুরুষ একা, কাহারও সংসর্গ-বিশিষ্ট নহে। (১ অধ্যায় ১৫ সূত্র) অবস্থাদি সকল শরীরের, আত্মার নহে। (ঐ, ১৪ সূত্র) "ন বাহ্যান্তরয়োরুপরজ্যোপরঞ্জক ভাবোঽপি দেশ-ব্যবধানাৎ শ্রুঘ্নস্থপাটলিপুত্রস্থয়োরিব।" বাহ্য এবং আন্তরিকের মধ্যে উপরজ্য এবং উপরঞ্জকভাব নাই; কেন না, তাহা পরস্পরের সংলগ্ন নহে। দেশব্যবধান-বিশিষ্ট। যেমন একজন পাটলিপুত্রনগরে থাকে, আর একজন শ্রুঘ্ননগরে থাকে, ইহাদিগের পরস্পর ব্যবধান তদ্রূপ। তবে পুরুষের দুঃখ কেন?

প্রকৃতির সহিত সংযোগই পুরুষের দুঃখের কারণ। বাহ্যে আন্তরিকে দেশ-ব্যবধান আছে বটে, কিন্তু কোন প্রকার সংযোগ নাই, এমত নহে; যেমন স্ফটিকপাত্রের নিকট জবাকুসুম রাখিলে, পাত্র পুষ্পের বর্ণবিশিষ্ট হয় বলিয়া পুষ্প এবং পাত্রে এক

প্রকার সংযোগ আছে বলা যায়, এ সেইরূপ সংযোগ। পুষ্প এবং পাত্রমধ্যে ব্যবধান থাকিলেও পাত্রের বর্ণ বিকৃত হইতে পারে, ইহাও সেইরূপ। এ সংযোগ নিত্য নহে, দেখা যাইতেছে। সুতরাং তাহার উচ্ছেদ হইতে পারে; সেই সংযোগ উচ্ছেদ হইলেই দুঃখের কারণ অপনীত হইল। অতএব এই সংযোগের উচ্ছিত্তিই দুঃখনিবারণের উপায়। সুতরাং তাহাই পুরুষার্থ।

"যদ্বা তদ্বা তদুচ্ছিত্তিঃ পুরুষার্থস্তদুচ্ছিত্তিঃ পুরুষার্থঃ।" (৬, ৭০)

সাংখ্যের মত এই। যদি আত্মা শরীর হইতে পৃথক্ হয়, যদি আত্মাই সুখদুঃখভোগী হয়, যদি আত্মা দেহনাশের পরেও থাকে, যদি দেহ হইতে আত্মার সুখ-দুঃখাদি ভোগের সম্ভাবনা থাকে, তবে সাংখ্যদর্শনের এ সকল কথা যথার্থ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু এই "যদি"-গুলিন অনেক। আধুনিক পজিটিভিষ্ট এখনই বলিবেন,—

১ম। আত্মা শরীর হইতে পৃথক্ কিসে জানিতেছি? শরীরতত্ত্বে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, শরীর বা শরীরের অংশবিশেষই আত্মা।

২য়। আত্মাই যে সুখদুঃখভোগী, তাহারই প্রমাণ কি? প্রকৃতি সুখ-দুঃখভোগী নহে কেন?

৩য়। দেহ-নাশের পর যে আত্মা থাকিবে, তাহা ধর্ম্ম-পুস্তকে বলে, কিন্তু তদ্ভিন্ন অণুমাত্র প্রমাণ নাই। আত্মার নিত্যত্ব যদি মানিতে হয়, তবে ধর্ম্ম-পুস্তকের আজ্ঞানুসারে, দর্শনশাস্ত্রের আজ্ঞানুসারে মানিব না।

৪র্থ। দেহধ্বংসের পর আত্মা থাকিবে, তাহার যে আবার জরামরণাদি দুঃখের সম্ভাবনা আছে, তাহার কিছুমাত্র প্রমাণ নাই।

অতএব যাঁহারা আত্মার পার্থক্য ও নিত্যত্ব মানেন, তাঁহারাও সাংখ্য মানিবেন না এবং এ সকল মত যে এ কালে গ্রাহ্য হইবে, এমত বিবেচনায় আমরা সাংখ্যদর্শন বুঝাইতে প্রবৃত্ত হই নাই। কিন্তু এক্ষণে যাহা অগ্রাহ্য, দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে তাহা আশ্চর্য্য আবিক্রিয়া। সেই আশ্চর্য্য আবিক্রিয়া কি, ইহাই বুঝান আমাদিগের অভিপ্রায়।

প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগের উচ্ছিত্তিই অপবর্গ বা মোক্ষ। তাহা কি প্রকারে প্রাপ্ত হওয়া যায়?

সাংখ্যকার বলেন, বিবেকের দ্বারা। কিন্তু কোন্ প্রকার বিবেকের দ্বারা মোক্ষলাভ হয়? প্রকৃতিবিষয়ে যে অবিবেক, সকল অবিবেক তাহার অন্তর্গত। অতএব, প্রকৃতি-পুরুষ-সম্বন্ধীয় জ্ঞান দ্বারাই মোক্ষলাভ হয়।

অতএব জ্ঞানেই মুক্তি। প্রাশ্চাত্য সভ্যতার মূল কথা, "জ্ঞানেই শক্তি" Knowledge is Power, হিন্দু সভ্যতার মূল কথা "জ্ঞানেই মুক্তি।" দুই জাতি দুইটি পৃথক উদ্দেশ্যানুসন্ধানে এক পথেই যাত্রা করিলেন। পাশ্চাত্ত্যেরা শক্তি পাইয়াছেন—আমরা কি মুক্তি পাইয়াছি? বস্তুতঃ এক যাত্রায় পৃথক্ ফল হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ইউরোপীয়েরা শক্তির অনুসারী, ইহাই তাঁহাদিগের উন্নতির মূল। আমরা শক্তির প্রতি যত্নহীন, ইহাই আমাদিগের অবনতির মূল। ইউরোপীয়দিগের উদ্দেশ্য ঐহিক; তাঁহারা ইহকালে জয়ী। আমাদিগের উদ্দেশ্য পারত্রিক—তাই ইহকালে আমরা জয়ী হইলাম না। পরকালে হইব কি না, তদ্বিষয়ে মতভেদ আছে।

কিন্তু জ্ঞানেই মুক্তি, এ কথা সত্য হইলেও ইহার দ্বারা ভারতবর্ষের পরম লাভ হইয়াছে বলিতে হইবে। প্রাচীন বৈদিক ধর্ম্ম ক্রিয়াত্মক; প্রাচীন আর্য্যেরা প্রাকৃতিক শক্তির পূজা একমাত্র মঙ্গলোপায় বলিয়া জানিতেন। প্রাকৃতিক শক্তিসকল অতি প্রবল, স্থির, অশাসনীয়, কখন মহামঙ্গলকর, কখন মহৎ অমঙ্গলের কারণ দেখিয়া প্রথম জ্ঞানীরা তাঁহাদিগকেই ইন্দ্র, বরুণ, মরুৎ, অগ্নি প্রভৃতি দেবতা কল্পনা করিয়া তাঁহাদিগের স্তুতি এবং উপাসনা করেন। ক্রমে তাঁহাদিগের প্রীত্যর্থ যাগযজ্ঞাদির বড় প্রবলতা হইল। অবশেষে সেই সকল যাগযজ্ঞাদিই মনুষ্যের প্রধান কার্য্য এবং পারত্রিক সুখের একমাত্র উপায় বলিয়া লোকের একমাত্র অনুষ্ঠেয় হইয়া পড়িল। শাস্ত্র সকল কেবল তৎসমুদায়ের আলোচনার্থ সৃষ্ট হইল—প্রকৃত জ্ঞানের প্রতি আর্য্যজাতির তাদৃশ মনোযোগ হইল না। বেদের সংহিতা ব্রাহ্মণ; উপনিষৎ, আরণ্যক এবং সূত্রগ্রন্থ সকল কেবল ক্রিয়াকলাপের কথায় পরিপূর্ণ। যে কিছু প্রকৃত জ্ঞানের চর্চ্চা হইত, তাহা কেবল বেদের আনুষঙ্গিক বলিয়াই সে সকল শাস্ত্র বেদাঙ্গ বলিয়া খ্যাত হইল। জ্ঞান এইরূপে ক্রিয়ার দাসত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ হওয়াতে তাহার উন্নতি হইল না। কর্ম্মজন্য মোক্ষ, এই বিশ্বাস ভারতভূমে অপ্রতিহত থাকাতেই এরূপ ঘটিয়াছে। প্রকৃত জ্ঞানের আলোচনার অভাবে বেদভক্তি আরও প্রবলা হইল। মনুষ্যচিত্তের স্বাধীনতা একেবারে লুপ্ত হইতে লাগিল। মনুষ্য বিবেকশূন্য, মন্ত্রমুগ্ধ, শৃঙ্খলবদ্ধ পশুবৎ হইয়া উঠিল।

সাংখ্যকার বলিলেন, কর্ম্ম অর্থাৎ হোম-যাগাদির অনুষ্ঠান পুরুষার্থ নহে। জ্ঞানই পুরুষার্থ। জ্ঞানই মুক্তি। কর্ম্মপীড়িত ভারতবর্ষ সে কথা শুনিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অতি প্রাচীনকাল হইতে দর্শনশাস্ত্রের উদ্দেশ্য, জগতের আদি কি, তাহা নিরূপিত হয়। আধুনিক ইউরোপীয় দার্শনিকেরা সে তত্ত্ব নিরূপণীয় নহে বলিয়া এক প্রকার ত্যাগ করিয়াছেন।

জগতের আদি-সম্বন্ধে প্রথম প্রশ্ন এই যে, জগৎ সৃষ্ট, কি নিত্য। অনাদিকাল এইরূপ আছে, না, কেহ তাহার সৃজন করিয়াছেন?

অধিকাংশ লোকের মত এই যে, জগৎ সৃষ্ট, জগৎকর্ত্তা একজন আছেন। সামান্য ঘটপটাদি একটি কর্ত্তা ব্যতীত হয় না; তবে এই অসীম জগতের কর্ত্তা নাই, ইহা কি সম্ভব?

আর এক সম্প্রদায়ের লোক আছেন, তাঁহারা বলেন যে, এই জগৎ যে সৃষ্ট বা ইহার কেহ কর্ত্তা আছেন, তাহা বিবেচনা করিবার কারণ নাই। ইঁহাদের সচরাচর নাস্তিক বলে, কিন্তু নাস্তিক বলিলেই মূঢ় বুঝায় না। তাঁহারা বিচারের দ্বারা আপন পক্ষ সমর্থন করিতে চেষ্টা করেন। সেই বিচার অত্যন্ত দুরূহ এবং এ স্থলে তাহার পরিচয় দিবার কোন প্রয়োজন নাই। তবে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব একটি পৃথক্ তত্ত্ব, সৃষ্টি-প্রক্রিয়া আর একটি পৃথক্ তত্ত্ব। ঈশ্বরবাদীও বলিতে পারেন যে, "আমি ঈশ্বর মানি, কিন্তু সৃষ্টি-ক্রিয়া না। ঈশ্বর জগতের নিয়ন্তা, তাঁহার কৃত নিয়ম দেখিতেছি, নিয়মাতিরিক্ত সৃষ্টির কথা আমি বলিতে পারি না।"

একালকার কোন কোন খৃষ্টিয়ান এই মতাবলম্বী; ইহার মধ্যে কোন্ মত অযথার্থ, কোন্ মত যথার্থ, তাহা আমরা কিছুই বলিতেছি না। যাহার যাহা বিশ্বাস, তদ্বিরুদ্ধে আমাদের কিছুই বক্তব্য নাই। আমাদের বলিবার কেবল এই উদ্দেশ্য যে, সাংখ্যকারকে এই মতাবলম্বী বলিয়া বোধ হয়। সাংখ্যকার ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানেন, না, তাহা পশ্চাৎ বলিব। কিন্তু তিনি "সর্ব্ববিৎ সর্ব্বকর্ত্তা পুরুষ" মানেন, এইরূপ পুরুষ মানিয়াও তাঁহাকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলেন না। সৃষ্টিই মানেন না। এই জগৎ প্রাকৃতিক ক্রিয়ামাত্র বলিয়া স্বীকার করেন।

(ক)র কারণ (খ), (খ)র কারণ (গ), (গ)র কারণ (ঘ), এইরূপ কারণ-পরম্পরা অনুসন্ধান করিতে করিতে অবশ্য এক স্থানে অন্ত পাওয়া যাইবে; কেন না, কারণশ্রেণী কখন অনন্ত হইতে পারে না। আমি যে ফলটি ভোজন করিতেছি, ইহা অমুক বৃক্ষে জন্মিয়াছে, সেই বৃক্ষ একটি বীজে জন্মিয়াছে, সেই বীজ অন্য বৃক্ষের ফলে জন্মিয়াছিল। সেই বৃক্ষও আর একটি বীজে জন্মিয়াছিল। এইরূপে অনন্তানুসন্ধান করিলেও অবশ্য একটি আদিম বীজ মানিতে হইবে। এইরূপ জগতে যাহা আদিম বীজ, যেখানে কারণানুসন্ধান বন্ধ হইবে, সাংখ্যকার সেই আদিম কারণকে মূল-প্রকৃতি বলেন। (১৭৪)

জগদুৎপত্তি-সম্বন্ধে দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, মূল কারণ যাহাই হউক, সেই কারণ হইতে এই বিশ্ব-সংসার কি প্রকারে এই রূপাবয়বাদি প্রাপ্ত হইল? সাংখ্যকারের উত্তর এই,—

এই জাগতিক পদার্থ পঞ্চবিংশতি প্রকার—

১। পুরুষ।
২। প্রকৃতি।
৩। মহৎ।
৪। অহঙ্কার।
৫, ৬, ৭, ৮, ৯। পঞ্চতন্মাত্র।
১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০ একাদশেন্দ্রিয়।
২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫। স্থূলভূত।

ক্ষিতি, জল, তেজ, মরুৎ এবং আকাশ স্থূলভূত। পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়, পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং অন্তরিন্দ্রিয় এই একাদশ ইন্দ্রিয়। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ পাঁচটি তন্মাত্র। "আমি" জ্ঞান অহঙ্কার। মহৎ মন।*

স্থূলভূত হইতে পঞ্চতন্মাত্রের জ্ঞান। আমরা শুনিতে পাই, এ জন্য শব্দ আছে। আমরা দেখিতে পাই, এ জন্য দৃশ্য অর্থাৎ রূপ আছে, ইত্যাদি।

অতএব শব্দস্পর্শাদির অস্তিত্ব নিশ্চিত, কিন্তু শব্দ আমি শুনি, রূপ আমি দেখি, তবে "আমিও" আছি। অতএব তন্মাত্র হইতে অহঙ্কারের অস্তিত্ব অনুভূত হইল। আমি কেন আছি বলি? আমার মনে ইচ্ছা উদয় হইয়াছে, সেই জন্য। তবে মনও আছে egitors sun অতএব অহঙ্কার হইতে মনের অস্তিত্ব স্থিরীকৃত হইল।

---

* Mind নহে consciousness.

মনের সুখ-দুঃখ আছে। সুখ-দুঃখের কারণ আছে। অতএব মূল কারণ প্রকৃতি আছে।

সাংখ্যকার বলেন, প্রকৃতি হইতে মহৎ, মহৎ হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র এবং একাদশেন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র হইতে স্থূলভূত।

এ তত্ত্বের আর বিস্তারের আবশ্যক নাই। এ কালে ইহা বড় সঙ্গত বা অর্থযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু অস্মদ্দেশীয় পুরাণ সকলে যে সৃষ্টিক্রিয়া বর্ণিত আছে, তাহা এই সাংখ্যের মতে ব্রহ্মাণ্ডের কথায় সংযোগ মাত্র।

বেদে কোথাও সাংখ্যদর্শনানুযায়ী সৃষ্টি কথিত হয় নাই। ঋগ্বেদে, অথর্ব্ববেদে, শতপথ-ব্রাহ্মণে সৃষ্টিকথন আছে, কিন্তু তাহাতে মহদাদির উল্লেখ নাই। মনুতেও সৃষ্টিকথন আছে, তাহাতেও নাই, রামায়ণেও ঐরূপ। কেবল পুরাণে আছে, অতএব বেদ, মনু, রামায়ণের পরে ও অন্ততঃ বিষ্ণু ভাগবত এবং লিঙ্গপুরাণের পূর্ব্বে সাংখ্যদর্শনের সৃষ্টি। মহাভারতেও সাংখ্যের উল্লেখ আছে, কিন্তু মহাভারতের কোন্ অংশ নূতন, কোন্ অংশ পুরাতন, তাহা নিশ্চিত করা ভার। কুমারসম্ভবের দ্বিতীয় সর্গে যে ব্রহ্মস্তোত্র আছে, তাহা সাংখ্যানুকারী।

সাংখ্যপ্রবচনে বিষ্ণু-হরি-রুদ্রাদির উল্লেখ নাই। পুরাণে আছে। পৌরাণিকেরা নিরীশ্বর সাংখ্যকে আপনার মনোমত গড়িয়া লইয়াছেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নিরীশ্বরতা

সাংখ্যদর্শন নিরীশ্বর বলিয়া খ্যাত, কিন্তু কেহ কেহ বলেন যে, সাংখ্য নিরীশ্বর নহে। ডাক্তার হল একজন এই মতাবলম্বী। মোক্ষমূলর এই মতাবলম্বী ছিলেন, কিন্তু এক্ষণে তাঁহার মতপরিবর্ত্তনের লক্ষণ দেখা গিয়াছে। কুসুমাঞ্জলি-কর্ত্তা উদয়নাচার্য্য বলেন যে, সাংখ্যমতাবলম্বীরা আদি বিদ্বানের উপাসক। অতএব তাঁহার মতেও সাংখ্য নিরীশ্বর নহে। সাংখ্যপ্রবচনের ভাষ্যকার বিজ্ঞান-ভিক্ষুও বলেন যে, ঈশ্বর নাই, এ কথা বলা কাপিলসূত্রের উদ্দেশ্য নহে। অতএব সাংখ্যদর্শনকে কেন নিরীশ্বর বলা যায়, তাহা কিছু বিস্তারিত লেখা যাউক।

সাংখ্যপ্রবচনের প্রথমাধ্যায়ের বিখ্যাত ৯২ সূত্র এই কথার মূল। সে সূত্র, এই "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ।" প্রথম এই সূত্রটি বুঝাইব।

সূত্রকার প্রমাণের কথা বলিতেছিলেন। তিনি বলেন, প্রমাণ ত্রিবিধ;—প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং শব্দ। ৮০ সূত্রে প্রত্যক্ষের লক্ষণ বলিলেন, "যৎ সংবদ্ধং সত্তদাকারোল্লেখিবিজ্ঞানং তৎ প্রত্যক্ষম্।" অতএব যাহা সংবদ্ধ নহে, তাহা প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। এই লক্ষণপ্রতি দুইটি দোষ পড়ে। যোগিগণ যোগবলে অসংবদ্ধও প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। ৯০।৯১ সূত্রে সূত্রকার সে দোষ অপনীত করিলেন। দ্বিতীয় দোষ, ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ নিত্য, তৎসম্বন্ধে সংবদ্ধ কথাটি ব্যবহার হইতে পারে না। সূত্রকার তাহার এই উত্তর দেন যে, ঈশ্বর সিদ্ধ নহেন—ঈশ্বর আছেন, এমত কোন প্রমাণ নাই, অতএব তাঁহার প্রত্যক্ষসম্বন্ধে না বর্ত্তিলে এই লক্ষণ দুষ্ট হইল না। তাহাতে ভাষ্যকার বলেন যে, দেখ, ঈশ্বর অসিদ্ধ, ইহা উক্ত হইয়াছে, কিন্তু ঈশ্বর নাই, এমত কথা বলা হইল না।

না হউক, তথাপি এই দর্শনকে নিরীশ্বর বলিতে হইবে। এমন নাস্তিক বিরল, যে বলে যে, ঈশ্বর নাই। যে বলে যে, ঈশ্বর আছেন, এমত কোন প্রমাণ নাই, তাহাকেও নাস্তিক বলা যায়।

যাহার অস্তিত্বের প্রমাণ নাই, এবং যাহার অনস্তিত্বের প্রমাণ আছে, এই দুই পৃথক্ বিষয়। রক্তবর্ণ কাকের অস্তিত্বেরও কোন প্রমাণ নাই। কিন্তু তাহার অনস্তিত্বেরও কোন প্রমাণ নাই। কিন্তু গোলাকার চতুষ্কোণের অনস্তিত্বের প্রমাণ আছে। গোলাকার চতুষ্কোণ মানিব না, ইহা নিশ্চিত; কিন্তু রক্তবর্ণ কাক মানিব কি না? তাহার অনস্তিত্বের প্রমাণ নাই বটে, কিন্তু তাহার অস্তিত্বেরও প্রমাণ নাই। যেখানে অস্তিত্বের প্রমাণ নাই, সেখানে মানিব না। অনস্তিত্বের প্রমাণ নাই থাক্, যতক্ষণ অস্তিত্বের প্রমাণ না পাইব, ততক্ষণ মানিব না—অস্তিত্বের প্রমাণ পাইলে তখন মানিব। ইহাই প্রত্যয়ের প্রকৃত নিয়ম। ইহার ব্যত্যয়ে যে বিশ্বাস, তাহা ভ্রান্তি। "কোন পদার্থ আছে, এমত প্রমাণ নাই বটে—কিন্তু থাকিলে থাকিতে পারে" ইহা ভাবিয়া যে সেই পদার্থের অস্তিত্ব কল্পনা করে, সে ভ্রান্ত। অতএব নাস্তিকেরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইলেন। যাঁহারা কেবল ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণাভাববাদী—তাঁহারা বলেন, ঈশ্বর থাকিলে থাকিতে পারেন, কিন্তু আছেন, এমত প্রমাণ নাই।

অপর শ্রেণীর নাস্তিকেরা বলেন যে, ঈশ্বর আছেন, শুধু ইহাই প্রমাণাভাব, এমত নহে, ঈশ্বর যে নাই, তাহারও প্রমাণ আছে। আধুনিক ইউরোপীয়েরা কেহ কেহ এই মতাবলম্বী। একজন

ফরাসিস লেখক বলিয়াছেন, তোমরা বল, ঈশ্বর নিরাকার, অথচ চেতনাদি মানসিক বৃত্তিবিশিষ্ট। কিন্তু কোথায় দেখিয়াছ যে, চেতনাদি মানসিক বৃত্তিসকল শরীর হইতে বিযুক্ত? যদি তাহা কোথাও দেখ নাই, তবে হয় ঈশ্বর সাকার, নয় তিনি নাই। সাকার ঈশ্বর এ কথা তোমরা মানিবে না, অতএব ঈশ্বর নাই, ইহা মানিতে হইবে। ইনি দ্বিতীয় শ্রেণীর নাস্তিক।

"ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ।" শুধু এই কথার উপরে নির্ভর করিলে সাংখ্যকারকে প্রথম শ্রেণীর নাস্তিক বলা যাইত। কিন্তু তিনি অন্যান্য প্রমাণের দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে যত্ন করিয়াছেন যে, ঈশ্বর নাই।

সে প্রমাণ কোথাও দুই একটি সূত্রের মধ্যে নাই। অনেকগুলি সূত্র একত্র করিয়া, সাংখ্যপ্রবচনে ঈশ্বরের অনস্তিত্বসম্বন্ধে যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহার মর্ম সবিস্তারে বুঝাইতেছি।

তিনি বলেন যে, ঈশ্বর অসিদ্ধ (১, ৯২) প্রমাণ বলিয়াই অসিদ্ধ (প্রমাণাভাবাৎ ন তৎসিদ্ধিঃ। ৫, ১০)। সাংখ্যমতে প্রমাণ তিন প্রকার;— প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ। প্রত্যক্ষের ত কথাই নাই। কোন বস্তুর সঙ্গে যদি অন্য বস্তুর নিত্যসম্বন্ধ থাকে, তবে একটিকে দেখিলে আর একটিকে অনুমান করা যায়। কিন্তু কোন বস্তুর সঙ্গে ঈশ্বরের কোন নিত্যসম্বন্ধ দেখা যায় নাই। অতএব অনুমানের দ্বারা ঈশ্বরের সিদ্ধি হয় না। (সম্বন্ধাভাবান্নানুমানম্। ৫, ১১) যদি এই সূত্র পাঠক না বুঝিয়া থাকেন, তবে আর একটু বুঝাই। পর্ব্বতে ধূম দেখিয়া তুমি সিদ্ধান্ত কর যে, তথায় অগ্নি আছে। কেন এ সিদ্ধান্ত কর? তুমি যেখানে যেখানে ধূম দেখিয়াছ, সেইখানে সেইখানে অগ্নি দেখিয়াছ বলিয়া অর্থাৎ অগ্নির সহিত ধূমের নিত্যসম্বন্ধ আছে বলিয়া।

যদি তোমায় জিজ্ঞাসা করি, তোমার প্রপিতামহের প্রপিতামহের কয়টি হাত ছিল, তুমি বলিবে দুইটি। তুমি তাঁহাকে কখন দেখ নাই—তবে কি প্রকারে জানিলে তাঁহার দুইটি হাত ছিল? বলিবে, মনুষ্যমাত্রেরই দুই হাত, এই জন্য, মনুষ্যত্বের সহিত দ্বিভুজতার নিত্যসম্বন্ধ আছে, এই জন্য।

এই নিত্যসম্বন্ধ বা ব্যাপ্তিই অনুমানের একমাত্র কারণ। যেখানে এ সম্বন্ধ নাই, সেখানে পদার্থান্তর অনুমিত হইতে পারে না। এক্ষণে জগতে কিসের সঙ্গে ঈশ্বরের নিত্যসম্বন্ধ আছে যে, তাহা হইতে ঈশ্বরানুমান করা যাইতে পারে? সাংখ্যকার বলেন, কিছুরই সঙ্গে না।

তৃতীয় প্রমাণ, শব্দ। আপ্তবাক্য শব্দ। বেদেই আপ্তোপদেশ। সাংখ্যকার বলেন, "বেদে ঈশ্বরের কোন প্রসঙ্গ নাই, বরং বেদে ইহাই আছে যে, সৃষ্টি প্রকৃতিরই ক্রিয়া, ঈশ্বরকৃত নহে। (শ্রুতিরপি প্রধানকার্য্যত্বস্য। ৫, ১২) কিন্তু যিনি বেদ পাঠ করিবেন, তিনি দেখিবেন, এ অতি অসঙ্গত কথা। এই আশঙ্কায় সাংখ্যকার বলেন যে, বেদে ঈশ্বরের যে উল্লেখ আছে, তাহা হয় মুক্তাত্মার প্রশংসা, নয় প্রামাণ্য দেবতার (সিদ্ধস্য) উপাসনা (মুক্তাত্মনঃ প্রশংসা উপাস্তসিদ্ধস্য বা ১, ৯৫)।

ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ নাই, এইরূপে দেখাইয়াছেন। ঈশ্বরের অনস্তিত্ব সম্বন্ধে যে প্রমাণ দেখাইয়াছেন, নিম্নে তাহার সম্প্রসারণ করা গেল।

ঈশ্বর কাহাকে বলে? যিনি সৃষ্টিকর্তা এবং পাপপুণ্যের ফলবিধাতা। যিনি সৃষ্টিকর্তা, তিনি মুক্ত না বদ্ধ? যদি মুক্ত হয়েন, তবে তাঁহার সৃজনের প্রবৃত্তি হইবে কেন? আর যিনি মুক্ত নহেন, বদ্ধ—তাঁহার পক্ষে অনন্ত জ্ঞান ও শক্তি সম্ভবে না। অতএব একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন, ইহা অসম্ভব। "মুক্তবদ্ধয়োরন্যতরাভাবান্ন তৎসিদ্ধিঃ (১, ৯৩) উভয়থাপ্যসৎকরত্বম্ (১, ৯৪)।

সৃষ্টিকর্তৃত্ব সম্বন্ধে এই। পাপপুণ্যের দণ্ডবিধাতৃত্ব সম্বন্ধে মীমাংসা করেন যে, যদি ঈশ্বর কর্মফলের বিধাতা হয়েন, তবে তিনি অবশ্য কর্ম্মানুযায়ী ফলনিষ্পত্তি করিবেন, পুণ্যের শুভ ফল, পাপের অশুভ ফল অবশ্য প্রদান করিবেন। যদি তিনি তাহা না করেন, স্বেচ্ছামত ফলনিষ্পত্তি করেন, তবে কি প্রকারে ফলবিধান করিতে পারেন? যদি সুবিচার করিয়া ফলবিধান না করেন, তবে আত্মোপকারের জন্য করাই সম্ভব। তাহা হইলে তিনি সামান্য লৌকিক রাজার ন্যায় আত্মোপকারী এবং সুখদুঃখের অধীন। যদি তাহা না হইয়া কর্ম্মানুযায়ীই ফলনিষ্পত্তি করেন, তবে কেন কর্ম্মকেই ফলবিধাতা বল না? ফলনিষ্পত্তির জন্য আবার কর্ম্মের উপর ঈশ্বরানুমানের প্রয়োজন কি?

অতএব সাংখ্যকার দ্বিতীয় শ্রেণীর ঘোরতর নাস্তিক। অথচ তিনি বেদ মানেন।

ঈশ্বর না মানিয়াও কেন বেদ মানেন, তাহা আমরা পর-পরিচ্ছেদে দেখাইব। সাংখ্যের এই নিরীশ্বরতা বৌদ্ধধর্ম্মের পূর্ব্বসূচনা বলিয়া বোধ হয়।

ঈশ্বরতত্ত্ব-সম্বন্ধে সাংখ্যদর্শনের একটি কথা বাকি রহিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অনেকে বলেন, কাপিলদর্শন নিরীশ্বর নহে। এ কথা বলিবার

কিছু একটু কারণ আছে। তৃ, অ ৫৭ সূত্রে সূত্রকার বলেন, "ঈদৃশেশ্বরসিদ্ধিঃ সিদ্ধা।" সে কি প্রকারে ঈশ্বর? "স হি সর্ব্ববিৎ সর্ব্বকর্ত্তা" ৩, ৫৬। তবে সাংখ্য নিরীশ্বর কই?

বাস্তবিক এ কথা ঈশ্বর-সম্বন্ধে উক্ত হয় নাই। সাংখ্যকার বলেন, জ্ঞানেই মুক্তি, আর কিছুতেই মুক্তি নাই। পুণ্যে অথবা সত্ত্ববিশাল ঊর্দ্ধলোকেও মুক্তি নাই, কেন না, তথা হইতে পুনর্জ্জন্ম আছে এবং জরা-মরণাদি দুঃখ আছে। শেষ এমনও বলেন যে, জগৎ কারণে লয় প্রাপ্ত হইলেও মুক্তি নাই, কেন না, তাহা হইতে জলমগ্নের পুনরুত্থানের ন্যায় পুনরুত্থান আছে (৩, ৫৪)। সেই লয়প্রাপ্ত আত্মসম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন যে, "তিনি সর্ব্ববিৎ এবং সর্ব্বকর্ত্তা।" ইহাকে যদি ঈশ্বর বলিতে চাও, ঈদৃশেশ্বর সিদ্ধ। কিন্তু ইনি জগৎস্রষ্টা বা বিধাতা নহেন। "সর্ব্বকর্ত্তা" অর্থে সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বসৃষ্টিকারক নহেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বেদ

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, সাংখ্য-প্রবচনকার ঈশ্বর মানেন না, বেদ মানেন। বোধ হয়, পৃথিবীতে আর কোন দর্শন বা অন্য শাস্ত্র নাই, যাহাতে ধর্ম্ম-পুস্তকের প্রামাণ্য স্বীকার করে, অথচ ধর্ম্ম-পুস্তকের বিষয়ীভূত এবং প্রণেতা জগদীশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। এই বেদভক্তি ভারতবর্ষে অতিশয় বিস্ময়কর পদার্থ। আমরা এ বিষয়টি কিঞ্চিৎ সবিস্তারে লিখিতে ইচ্ছা করি।

মনু বলেন, বেদ শব্দ হইতে সকলের নাম, কর্ম্ম এবং অবস্থা নির্ম্মিত হইয়াছিল। বেদ পিতৃদেবতা এবং মনুষ্যের চক্ষু, অশক্য, অপ্রমেয়; যাহা বেদ হইতে ভিন্ন, তাহা পরকালে নিষ্ফল, বেদ ভিন্ন গ্রন্থ মিথ্যা। ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, গন্ধ, চতুর্ব্বর্ণ, ত্রিলোক, চতুরাশ্রম, সকলই বেদ হইতে প্রকাশ, বেদ মনুষ্যের পরম সাধন; যে বেদজ্ঞ, সেই সৈনাপত্য, রাজ্য, দণ্ডনেতৃত্ব এবং সর্ব্বলোকাধিপত্যের যোগ্য। যে বেদজ্ঞ, সে যে আশ্রমেই থাকুক না কেন, সে-ই ব্রহ্মে লীন হওয়ার যোগ্য। যাহারা ধর্ম্মজিজ্ঞাসু, বেদই তাহাদের পক্ষে পরম প্রমাণ। বেদ অজ্ঞের শরণ, জ্ঞানীদিগেরও শরণ। যাহারা স্বর্গ বা আনন্ত্য কামনা করে, ইহাই তাহাদিগের শরণ। যে ব্রাহ্মণ তিনলোক হত্যা করে, যেখানে সেখানে খায়, তাহার যদি ঋগ্বেদ মনে থাকে, তবে তাহার পাপ হয় না। শতপথ-ব্রাহ্মণ বলেন, বেদান্তান্তর্গত সর্ব্বভূত। বেদ সকল ছন্দঃ, স্তোম, প্রাণ এবং দেবতাগণের আত্মা। বেদই আছে। বেদই অমৃত। যাহা সত্য, তাহাও বেদ।

বিষ্ণুপুরাণে আছে, দেবাদির রূপ, নাম, কর্ম্ম, প্রবর্ত্তন বেদশব্দ হইতে সৃষ্ট হইয়াছিল। অন্যত্র ঐ পুরাণে বিষ্ণুকে বেদময় ও ঋগ্‌যজুঃসামাত্মক বলা হইয়াছে।

মহাভারতের শান্তিপর্ব্বেও আছে যে, বেদশব্দ হইতে সর্ব্বভূতের রূপ-নাম-কর্ম্মাদির উৎপত্তি।

ঋক্‌সংহিতার ও তৈত্তিরীয়-সংহিতার মঙ্গলাচরণে সায়নাচার্য্য মাধবাচার্য্য লিখিয়াছেন, "বেদ হইতে অখিল-জগতের নির্ম্মাণ হইয়াছে।"

এইরূপ সর্ব্বত্র বেদের মাহাত্ম্য। কোন দেশে কোন ধর্ম্মগ্রন্থের, বাইবেল, কোরাণ প্রভৃতি কিছুরই ঈদৃশ মহিমা কীর্ত্তিত হয় নাই।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, যে বেদ এইরূপ সকলের পূর্ব্বগামী বা উৎপত্তির মূল, তাহা কোথা হইতে আসিল? এ বিষয়ে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন, বেদের কর্ত্তা কেহ নাই।—এ গ্রন্থ কাহারও প্রণীত নহে, ইহা নিত্য এবং অপৌরুষেয়। অন্যে বলেন যে, ইহা ঈশ্বর-প্রণীত, সুতরাং সৃষ্ট এবং পৌরুষেয়। কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রের কি আশ্চর্য্য বৈচিত্র্য! সকলেই বেদ মানেন, কিন্তু বেদের উৎপত্তি-সম্বন্ধে কোন দুইখানি শাস্ত্রীয় গ্রন্থের ঐক্য নাই। যথা—

(১) ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তে আছে, বেদপুরুষ যজ্ঞ হইতে উৎপন্ন।

(২) অথর্ব্ববেদে আছে, স্কম্ভ হইতে ঋগ্‌যজুঃসাম অপেক্ষিত হইয়াছিল।

(৩) অথর্ব্ববেদে অন্যত্র আছে যে, ইন্দ্র হইতে বেদের জন্ম।

(৪) ঐ বেদে অন্যত্র আছে, ঋগ্বেদ কাল হইতে উৎপন্ন।

(৫) ঐ বেদে অন্যত্র আছে, বেদ গায়ত্রী-মধ্যে নিহিত।

(৬) শতপথ-ব্রাহ্মণে আছে যে, অগ্নি হইতে ঋক্, বায়ু হইতে যজুষ্, সূর্য্য হইতে সাম বেদের উৎপত্তি, ছান্দোগ্য উপনিষদেও ঐরূপ আছে; এবং মনুতেও তদ্রূপ আছে।

(৭) শতপথ-ব্রাহ্মণের অন্যত্র আছে, বেদ প্রজাপতি কর্তৃক সৃষ্ট হইয়াছিল।

(৮) শতপথ-ব্রাহ্মণের সেই স্থানেই আছে যে, প্রজাপতি বেদসহিত জলমধ্যে প্রবেশ করেন। জল হইতে অণ্ডের উৎপত্তি হয়। অণ্ড হইতে প্রথমে তিন বেদের উৎপত্তি।

(৯) শতপথ-ব্রাহ্মণের অন্যত্র আছে যে, বেদ মহাভূতের (ব্রহ্মার) নিশ্বাস।

(১০) তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে আছে, প্রজাপতি সোমকে সৃষ্টি করিয়া তিনি বেদের সৃষ্টি করিয়াছেন।

(১১) বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে, প্রজাপতি বাক্ সৃষ্টি করিয়া তদ্দ্বারা বেদাদি সকল সৃষ্ট করিয়াছেন।

(১২) শতপথ-ব্রাহ্মণে পুনশ্চ আছে যে, মনঃসমুদ্র হইতে বাকরূপ শাবলের দ্বারা দেবতারা বেদ খুঁড়িয়া উঠাইয়াছিলেন।

(১৩) তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে আছে যে, "বেদ প্রজাপতির শ্মশ্রু।"

(১৪) উক্ত ব্রাহ্মণে পুনশ্চ আছে, বাগ্দেবী বেদমাতা।

(১৫) বিষ্ণুপুরাণে আছে, বেদ ব্রহ্মার মুখ হইতে উৎপন্ন। ভাগবতপুরাণে ও মার্কণ্ডেয়-পুরাণেও ঐরূপ।

(১৬) হরিবংশে আছে, গায়ত্রীসম্ভূত ব্রহ্মতেজোময় পুরুষের নেত্র হইতে ঋচ ও যজুর্, জিহ্বাগ্র হইতে সাম এবং মূর্দ্ধা হইতে অথর্ব্বের সৃজন হইয়াছিল।

(১৭) মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বে আছে যে, সরস্বতী এবং বেদ বিষ্ণু মন হইতে সৃজন করিয়াছিলেন। শান্তিপর্ব্বে সরস্বতীকে বেদমাতা বলা হইয়াছে।

(১৮) অথর্ব্ববেদান্তর্গত আয়ুর্ব্বেদে আছে যে, আয়ুর্ব্বেদ ব্রহ্মা মনে মনে জানিয়াছিলেন। আয়ুর্ব্বেদ অথর্ব্ববেদান্তর্গত বলিয়া অথর্ব্ববেদের ঐরূপ উৎপত্তি বুঝিতে হইবে।

বেদের মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, উপনিষদ্ এবং স্মৃতি, পুরাণ ও ইতিহাসে বেদোৎপত্তি-বিষয়ে এইরূপ আছে। দেখা যাইতেছে যে, এ সকলে বেদের সৃষ্টত্ব এবং পৌরুষেয়ত্ব প্রায় সর্ব্বত্র স্বীকৃত হইয়াছে—কদাচিৎ অপৌরুষেয়ত্বও কথিত হইয়াছে। কিন্তু পরবর্ত্তী টীকার ও দার্শনিকেরা প্রায় অপৌরুষেয়ত্ববাদী। তাঁহাদিগের মত নিম্নে লিখিত হইতেছে।

(১৯) সায়নাচার্য্য বেদার্থপ্রকাশ নামে ঋগ্বেদের টীকা করিয়াছেন। তাহাতে তিনি বলেন যে, বেদ অপৌরুষেয়। কিন্তু বেদ মনুষ্যকৃত নহে বলিয়াই অপৌরুষেয় বলেন।

(২০) সায়নাচার্য্যের ভ্রাতা মাধবাচার্য্যও "বেদার্থপ্রকাশ" নামে তৈত্তিরীয় যজুর্ব্বেদের টীকা করিয়াছেন। তিনি বলেন, বেদ নিত্য। তবে তিনি এই অর্থে নিত্য বলেন যে, কাল আকাশাদি যেমন নিত্য, সেইরূপ বেদ। ব্যবহারকালে কালিদাসাদি-বাক্যবৎ পুরুষবিরচিত নহে বলিয়া নিত্য এবং তিনি ব্রহ্মাকে বেদবক্তা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

(২১) মীমাংসকেরা বলেন, বেদ নিত্য এবং অপৌরুষেয়। শব্দ নিত্য বলিয়া বেদ নিত্য, শঙ্করাচার্য্য এই মতাবলম্বী।

(২২) নৈয়ায়িকেরা তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলেন, বেদ পৌরুষেয়।—মন্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদের ন্যায় জ্ঞানী ব্যক্তির কথা প্রামাণ্য বলিয়াই বেদও প্রামাণ্য বোধ হয়। গৌতমসূত্রের ভাবে বেদকে মনুষ্যপ্রণীত বলিয়াই নির্দ্দেশ করা তাঁহার ইচ্ছা কি না, নিশ্চিত বুঝা যায় না।

(২৩) বৈশেষিকেরা বলেন, বেদ ঈশ্বরপ্রণীত। কুসুমাঞ্জলিকর্ত্তা উদয়নাচার্য্যের এই মত।

এ সমস্ত শাস্ত্রের আলোচনা করিয়া দেখা যায় যে, কেহ বলেন, বেদ নিত্য অপৌরুষেয়; কেহ বলেন, বেদ সৃষ্ট এবং ঈশ্বর-প্রণীত। ইহা ভিন্ন তৃতীয় সিদ্ধান্ত হইতে পারে না; কিন্তু সাংখ্যপ্রবচনকারের মত সৃষ্টিছাড়া। তিনি প্রথমতঃ বলেন যে, বেদ কদাপি নিত্য হইতে পারে না, কেন না, বেদেই তাহার কার্য্যত্বের প্রমাণ আছে—যথা "স তপোঽতপ্যত তস্মাৎ তপস্তেপানা ত্রয়ো বেদা অজায়ন্ত" যেখানে বেদই বলে যে, এইরূপে বেদের জন্ম হইয়াছিল, সেখানে বেদ কদাপি নিত্য বা অপৌরুষেয় নহে, তাহা অবশ্যই পৌরুষেয় হইবে। কিন্তু সাংখ্যকারের মতে বেদ অপৌরুষেয় নহে, পৌরুষেয়ও নহে। পুরুষ অর্থাৎ ঈশ্বর নাই বলিয়া তাহা পৌরুষেয় নহে। সাংখ্যকার আরও বলেন যে, বেদ করিতে যোগ্য যে পুরুষ, তিনি হয়মুক্ত নয়, বদ্ধ। যিনি মুক্ত, তিনি প্রবৃত্তির অভাবে বেদ সৃজন করিবেন না; যিনি বদ্ধ, তিনি অসর্ব্বজ্ঞ বলিয়া তৎপক্ষে অক্ষম।

তবে পৌরুষেয় নহে, অপৌরুষেয়ও নহে। তাহা কি কখন হইতে পারে? সাংখ্যকার বলেন, হইতে

পারে, যথা অঙ্কুরাদি (৫,৮৪)। যাঁহারা হিন্দুদর্শন-শাস্ত্রের নাম শুনিলেই মনে করেন, তাহাতে সর্ব্বত্রই আশ্চর্য্য বুদ্ধির কৌশল, তাঁহাদিগের ভ্রমনিবারণার্থ এই কথার বিশেষ উল্লেখ করিলাম। সাংখ্যকারের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতাও বিচিত্রা, ভ্রান্তিও বিচিত্রা। সাংখ্যকার যে এমন হাস্যজনক ভ্রান্তিতে অনবধানতা প্রযুক্ত পতিত হইয়াছিলেন, আমরা এমন বিবেচনা করি না। আমাদিগের বিবেচনায় সাংখ্যকার অন্তরে বেদ মানিতেন না, কিন্তু তাৎকালিক সমাজে ব্রাহ্মণ এবং দার্শনিক কেহ সাহস করিয়া বেদ অবজ্ঞা করিতে পারিতেন না। এজন্য তিনি মৌখিক বেদভক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং যদি বেদ মানিতে হইল, তবে আবশ্যকমত প্রতিবাদীদিগকে নিরস্ত করিবার জন্য স্থানে স্থানে বেদের দোহাই দিয়াছেন। কিন্তু তিনি অন্তরে বেদ মানিতেন, বোধ হয় না। বেদ পৌরুষেয়ও নহে, অপৌরুষেয়ও নহে, এ কথা কেবল ব্যঙ্গ মাত্র। সূত্রকারের এ কথা বলিবার অভিপ্রায় বুঝা যায় যে, "দেখ, তোমরা যদি বেদকে সর্ব্বজ্ঞানযুক্ত বলিতে চাহ, তবে বেদ না পৌরুষেয়, না অপৌরুষেয় হইয়া উঠে। বেদ অপৌরুষেয় নহে, ইহার প্রমাণ বেদে আছে। তবে ইহা যদি পৌরুষেয় হয়, তবে ইহাও বলিতে হইবে যে, ইহা মনুষ্যকৃত, কেন না, সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ কেহ নাই, তাহা প্রতিপন্ন করা গিয়াছে।" যদি এ সকল সূত্রের এরূপ অর্থ করা যায়, তবে অদ্বিতীয় অদর্শী দার্শনিক সাংখ্যকারকে অল্পবুদ্ধি বলিতে হয়। তাহা কদাপি বলা যাইতে পারে না।

বেদ যদি পৌরুষেয় নহে, অপৌরুষেয়ও নহে, তবে বেদ মানিব কেন? সাংখ্যকার এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা করিয়াছিলেন। আজকালিকার কথা বলিতে গেলে বোধ হয়, এত গুরুতর প্রশ্ন ভারতবর্ষে আর কিছুই নাই। একদল বলিতেছেন, সনাতন ধর্ম্ম বেদমূলক, তোমরা এ সনাতন ধর্ম্মে ভিত্তিহীন কেন? তোমরা বেদ মান না কেন? আর একদল বলিতেছেন, আমরা বেদ মানিব কেন? সমুদয় ভারতবর্ষ এই দুই দলে বিভক্ত, এই দুই প্রশ্নের উত্তর লইয়া বিবাদ হইতেছে। ভারতবর্ষের ভাবী মঙ্গলামঙ্গল এই প্রশ্নের মীমাংসার উপর নির্ভর করে। হিন্দুগণ সকলেরই কি স্বধর্ম্মে থাকা উচিত? না সকলেরই স্বধর্ম্ম ত্যাগ করা উচিত? অর্থাৎ আমরা বেদ মানিব, না—মানিব না? যদি মানি, তবে কেন মানিব?

আর একবার এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছিল। যখন ধর্ম্মশাস্ত্রের অত্যাচারে পীড়িত হইয়া ভারতবর্ষ ত্রাহি ত্রাহি করিয়া ডাকিতেছিল, তখন শাক্যসিংহ বুদ্ধদেব বলিয়াছিলেন, "তোমরা বেদ মানিবে কেন? বেদ মানিও না।" এই কথা শুনিয়া বেদবিৎ বেদভক্ত দার্শনিকমণ্ডলী এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলেন। জৈমিনি, বাদরায়ণ, গৌতম, কণাদ, কপিল যাঁহার যেমন ধারণা, তিনি তেমনই উত্তর দিয়াছিলেন। অতএব প্রাচীন দর্শনশাস্ত্রে এই প্রশ্নের উত্তর থাকাতে দুইটি কথা জানা যাইতেছে। প্রথম, আজিকালি ইংরেজী শিক্ষার দোষেই লোকে বেদের অলঙ্ঘনীয়তার প্রতি নূতন সন্দেহ করিতেছে, এমন নহে। এ অনেক দিন হইতে। প্রাচীন দার্শনিকদিগের পরে শঙ্করাচার্য্য, মাধবাচার্য্য, সায়নাচার্য্য প্রভৃতি নব্যেরাও ঐ প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন। দ্বিতীয়, দেখা যায় যে, এ প্রশ্ন বৌদ্ধেরা প্রথম উত্থাপিত করে, প্রাচীন দার্শনিকেরা প্রথম তাহার উত্তর দান করেন। অতএব বৌদ্ধ ও দর্শনশাস্ত্রের উৎপত্তি সমকালিক বলা যাইতে পারে।

বেদ মানিব কেন? এই প্রশ্নের বিচারসময়ে মহারথী মীমাংসক জৈমিনি; তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী নৈয়ায়িক গৌতম। নৈয়ায়িকেরা বেদ মানেন না, এমন নহে। কিন্তু যে সকল কারণে মীমাংসকেরা বেদ মানেন, নৈয়ায়িকেরা তাহা অগ্রাহ্য করেন। মীমাংসকেরা বলেন, বেদ নিত্য এবং অপৌরুষেয়। নৈয়ায়িকেরা বলেন, বেদ আপ্তবাক্যমাত্র। নৈয়ায়িকেরা মীমাংসকের মতখণ্ডন জন্য যে সকল আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, মাধবাচার্য্যপ্রণীত সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহ হইতে তাহার সারমর্ম্ম নিয়ে সংক্ষেপে লেখা গেল।

মীমাংসকেরা বলেন যে, সম্প্রদায়াবিচ্ছেদে বেদকর্ত্তা অস্মর্য্যমাণ, সকল কথা লোকপরম্পরাশ্রুত হইয়া আসিতেছে, কিন্তু কাহারও স্মরণ নাই যে, কেহ বেদ করিয়াছেন। ইহাতে নৈয়ায়িকেরা আপত্তি করেন যে, প্রলয়কালে সম্প্রদায় বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল। এক্ষণে যে বেদ প্রণয়ন স্মরণ নাই, ইহাতে এমত প্রমাণ হইতেছে না যে, প্রলয়পূর্ব্বে বেদ প্রণীত হয় নাই। আর ইহাও তোমরা প্রমাণ করিতে পারিবে না যে, বেদকর্ত্তা কাহা কর্ত্তৃক কখন স্মৃত ছিলেন না। নৈয়ায়িকেরা আরও বলেন যে, বেদবাক্য-সকল যেমন কালিদাসাদি-বাক্য, তেমনি বাক্য, অতএব বেদবাক্যও পৌরুষেয় বাক্য।

বাক্যত্ব হেতু মন্বাদির বাক্যের ন্যায় বেদবাক্যকেও পৌরুষেয় বলিতে হইবে। আর মীমাংসকেরা বলিয়া থাকেন যে, যে ই বেদাধ্যয়ন করে, তাহার পূর্ব্বে তাঁহার গুরু অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাঁহার পূর্ব্বে তাঁহার গুরু; এইরূপ যেখানে অনন্ত পারম্পর্য্য আছে, সেখানে বেদ অনাদি। নৈয়ায়িক বলেন যে, মহাভারতাদি সম্বন্ধেও ঐরূপ বলা যাইতে পারে। যদি বল যে, মহাভারতের কর্ত্তা যে ব্যাস, ইহা সর্ব্বমান্য, তবে বেদ-সম্বন্ধেও বলা যাইতে পারে যে, "ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে। ছন্দাংসি জজ্ঞিরে। তস্মাৎ যজুস্তস্মাদজায়ত।" ইতি পুরুষসূক্তে বেদকর্ত্তাও নির্দ্দিষ্ট আছেন। আর মীমাংসকেরা বলেন যে, শব্দ নিত্য, এ জন্য বেদ নিত্য। কিন্তু শব্দ নিত্য নহে, কেন না, শব্দ সামান্যত্ববশতঃ ঘটবৎ অস্মদাদির বাহ্যেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য। মীমাংসকেরা উত্তর করেন যে, গকারাদির শব্দ শুনিতে পাইলেই আমাদিগের প্রত্যভিজ্ঞান জন্মে যে, ইহা গকার, অতএব শব্দ নিত্য। নৈয়ায়িক বলেন যে, সে প্রত্যভিজ্ঞান সামান্যবিষয়ত্ববশতঃ। যেমন ছিন্ন, তৎপরে পুনর্জ্জাত কেশ এবং দলিত কুন্দ। মীমাংসকেরা আরও বলিয়া থাকেন যে, বেদ অপৌরুষেয়, তাহার এক কারণ যে, পরমেশ্বর অশরীরী, তাঁহার তাল্বাদি বর্ণোচ্চারণস্থান নাই। নৈয়ায়িকেরা উত্তর করেন যে, পরমেশ্বর স্বভাবতঃ অশরীরী হইলেও ভক্তানুগ্রহার্থ তাঁহার শরীরগ্রহণ অসম্ভব নহে।

মীমাংসকেরা এ সকল কথার উত্তর দিয়াছেন, কিন্তু তাহার বিবরণ লিখিতে গেলে, প্রবন্ধ বড় দীর্ঘ এবং কটমট হইয়া উঠে। ফলে বেদ মানিব কেন? এই তর্কের তিনটি মাত্র উত্তর প্রাচীন দর্শনশাস্ত্র হইতে পাওয়া যায়;—

প্রথম, বেদ নিত্য এবং অপৌরুষেয়, সুতরাং ইহা মান্য। কিন্তু বেদেই আছে যে, ইহা অপৌরুষেয় নহে। যথা "ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে" ইত্যাদি।

দ্বিতীয়, বেদ ঈশ্বর-প্রণীত, এই জন্য মান্য। প্রতিবাদীরা বলিবেন যে, বেদ যে ঈশ্বর প্রণীত, তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ নাই। বেদে আছে, বেদ ঈশ্বরসম্ভূত, কিন্তু যেখানে তাঁহারা বেদ মানিতেছেন না, তখন তাঁহারা বেদের কোন কথা মানিবেন না। এ বিষয়ে যে বাদানুবাদ হইতে পারে, তাহা সহজেই অনুমেয়, এবং তাহা সবিস্তারে লিখিবার আবশ্যকতা নাই; যাঁহারা ঈশ্বর মানেন না, তাঁহারা বেদ ঈশ্বর প্রণীত বলিয়া স্বীকার করিবেন না, তাহা বলা বাহুল্য।

তৃতীয়, বেদের নিজ শক্তির অভিব্যক্তির দ্বারাই বেদের প্রামাণ্য সিদ্ধ হইতেছে। সাংখ্যকার এই উত্তর দিয়াছেন। সায়নাচার্য্য বেদার্থ-প্রকাশে এবং শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে ঐরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে কেবল ইহাই বক্তব্য যে, যদি বেদের এরূপ শক্তি থাকে, তবে বেদ অবশ্য মান্য। কিন্তু সে শক্তি আছে কি না, এই এক স্বতন্ত্র বিচার আবশ্যক হইতেছে। অনেকে বলিবেন যে, আমরা এরূপ শক্তি দেখিতেছি না। বেদের অগৌরব হিন্দু শাস্ত্রেও আছে। বেদ মানিতে হইবে কি না, তাহা সকলেই আপনাপন বিবেচনামত মীমাংসা করিবেন, কিন্তু আমরা পক্ষপাতশূন্য হইয়া যেখানে লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি এবং যখন বেদের গৌরব-নির্ব্বাচনাত্মক তত্ত্ব লিখিয়াছি, তখন হিন্দুশাস্ত্রের কোথায় কোথায় বেদের অগৌরব আছে, তাহাও আমাদিগকে নির্দ্দেশ করিতে হয়।

১। মুণ্ডকোপনিষদের আরম্ভে, "দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি যস্ম যদ্ ব্রহ্মবিদো বদন্তি পরা চৈবাপরা চ। তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ, শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।"

অর্থাৎ বেদাদি শ্রেষ্ঠতর বিদ্যা।

২। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়, ২।৪২, বেদপরায়ণদিগের নিন্দা আছে, যথা—

"যামিমাং পুষ্পিতাং বাচম্প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ॥
কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি॥
ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে।
ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন॥"

৩। ভাগবতপুরাণে নারদ বলিতেছেন যে, পরমেশ্বর যাহাকে অনুগ্রহ করেন, সে বেদ ত্যাগ করে। ৪।২৯, ৪৫।

"শব্দব্রহ্মণি দুষ্পারে চরন্ত উরুবিস্তরে।
মন্ত্রলিঙ্গৈর্ব্যবচ্ছিন্নং ভজন্তো ন বিদুঃ পরম্॥
যদা যস্যানুগৃহ্ণাতি ভগবানাত্মভাবিতঃ।
স জহাতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্ঠিতাম্॥"

৫। কঠোপনিষদে আছে যে, বেদের দ্বারা আত্মা লভ্য হয় না, যথা—

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যা ন মেধয়া বহুনা
শ্রুতেন।"

শাস্ত্রানুসন্ধান করিলে এরূপ কথা আরও পাওয়া যায়। পাঠক দেখিবেন, বেদ মানিব কেন?—এ প্রশ্নের আমরা কোন উত্তর দিই নাই, দিবারও আমাদের ইচ্ছা নাই। যাঁহারা সক্ষম, তাঁহারা সে মীমাংসা করিবেন। আমরা পূর্ব্বগামী পণ্ডিত-দিগের প্রদর্শিত পথে পরিভ্রমণ করিয়া যাহা দেখিয়াছি, তাহাই পাঠকের নিকট নিবেদিত হইল। *

ভারত-কলঙ্ক

ভারতবর্ষ পরাধীন কেন?

ভারতবর্ষ এতকাল পরাধীন কেন? এ প্রশ্নের উত্তরে সকলে বলিয়া থাকেন, ভারতবর্ষীয়েরা হীনবল, এই জন্য 'Effeminate Hindoos' ইউরোপীয়দিগের মুখাগ্রে সর্ব্বদাই আছে। ইহাই ভারতের কলঙ্ক। কিন্তু আবার ইউরোপীয়দিগের মুখেই ভারতবর্ষীয় সিপাহীদিগের বল ও সাহসের প্রশংসা শুনা যায়। সেই স্ত্রীস্বভাব হিন্দুদিগের বাহুবলেই কাবুল জিত হইল। বলিতে গেলে সেই স্ত্রীস্বভাব হিন্দুদিগের সাহায্যেই তাঁহারা ভারতবর্ষ জয় করিয়াছেন। তাঁহারা স্বীকার করুন বা না করুন, সেই স্ত্রীস্বভাব হিন্দুদিগের কাছে—মহারাষ্ট্রী এবং শিখের কাছে—অনেক রণক্ষেত্রে তাঁহারা পরাস্ত হইয়াছেন।

আধুনিক হিন্দুদিগের বলবীর্য্য এখন যাহাই হউক,—প্রাচীন হিন্দুদিগের অপেক্ষা যে তাহা ন্যূন, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। শত শত বৎসরের অধীনতায় তাহার হ্রাস অবশ্য ঘটিয়া থাকিবে। প্রাচীন ভারতবর্ষীয়গণ পরজাতি কর্ত্তৃক বিজিত হইবার পূর্ব্বে যে বিশেষ বলশালী ছিলেন, এমত বিবেচনা করিবার অনেক কারণ আছে,—দুর্ব্বল বলিয়া তাঁহারা পরাধীন হয়েন নাই।

আমরা স্বীকার করি যে, এই পক্ষ সমর্থন করা সহজ নহে এবং এতদ্বিষয়ে পর্য্যাপ্ত প্রমাণপ্রাপ্তি দুঃসাধ্য। এই তর্ক কেবল পুরাবৃত্ত অবলম্বন করিয়া মীমাংসা করা সম্ভব—কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে অন্যান্য জাতীয়দিগের ন্যায় ভারতবর্ষীয়েরা আপনাদিগের কীর্ত্তিকলাপ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই। প্রাচীন ভারতবর্ষীয় পুরাবৃত্ত নাই। সুতরাং ভারতবর্ষীয়-দিগের যে শ্লাঘনীয় সমর-কীর্ত্তি ছিল, তাহাও লোপ হইয়াছে। যে গ্রন্থগুলি "পুরাণ" বলিয়া খ্যাত আছে, তাহাতে প্রকৃত পুরাবৃত্ত কিছু নাই। যাহা কিছু আছে, তাহা অনৈসর্গিক এবং অতিমানুষ উপন্যাসে এরূপ আচ্ছন্ন যে, প্রকৃত ঘটনা কি—তাহা কোন-রূপেই নিশ্চিত হয় না।

ভাগ্যক্রমে ভিন্নদেশীয় ইতিহাসবেত্তাদিগের গ্রন্থে দুই স্থানে প্রাচীন ভারতবর্ষীয়দিগের যুদ্ধাদির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম, মাকিদনীয় আলেকজণ্ডর বা সেকন্দর দিগ্বিজয়ে যাত্রা করিয়া ভারতবর্ষে আসিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। রচনাকুশল যবন লেখকেরা তাহা পরিকীর্ত্তিত করিয়াছেন। দ্বিতীয়, মুসলমানেরা ভারতবর্ষ-জয়ার্থ যে সকল উদ্যম করিয়াছিলেন, তাহা মুসলমান ইতিবৃত্ত-লেখকেরা বিবরিত করিয়াছেন। কিন্তু প্রথমেই বক্তব্য যে, এরূপ সাক্ষীর পক্ষপাতিত্বের গুরুতর সম্ভাবনা—মনুষ্য চিত্রকর বলিয়াই চিত্রে সিংহ পরাজিত-স্বরূপ লিখিত হয়। যে সকল ইতিহাস-বেত্তা আত্মজাতির লাঘব স্বীকার করিয়া সত্যের অনুরোধে শত্রুপক্ষের যশঃকীর্ত্তন করেন, তাঁহারা অতি অল্পসংখ্যক। অপেক্ষাকৃত মূঢ় আত্মগরিমা-পরায়ণ মুসলমানদিগের কথা দূরে থাকুক, কৃতবিদ্য সত্যনিষ্ঠাভিমানী ইউরোপীয় ইতিহাসবেত্তারা এই দোষে এরূপ কলঙ্কিত যে, তাহাদের রচনা পাঠ করিতে কখন কখন ঘৃণা করে। এই জন্য দেশীয় এবং বিপক্ষদেশীয় উভয়বিধ ইতিহাসবেত্তাদিগের লিপির সাহায্য না পাইলে, কোন ঘটনারই যাথার্থ্য নির্ণীত হয় না। কেবল আত্মগরিমাপরবশ, পরধর্ম্ম-দ্বেষী, সত্যভীত মুসলমান লেখকদিগের কথার উপর নির্ভর করিয়া, প্রাচীন ভারতবর্ষীয়দিগের রণনৈপুণ্য মীমাংসা করা যাইতে পারে না। সে যাহা হউক, নিম্নলিখিত দুইটি কথা মুসলমান পুরাবৃত্ত হইতেই বিচারের দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে।

প্রথম, আরব-দেশীয়েরা এক প্রকার দিগ্বিজয়ী। যখন যে দেশ আক্রমণ করিয়াছে, তখনই তাহারা সেই দেশ জয় করিয়া পৃথিবীতে অতুল সাম্রাজ্য

---

* এই প্রবন্ধে বেদ পুরাণাদি হইতে যাহা উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা মূর সাহেব-কৃত বিখ্যাত সংগ্রহ হইতে নীত হইয়াছে।

স্থাপন করিয়াছিল। তাহারা কেবল দুই দেশ হইতে পরাভূত হইয়া বহিষ্কৃত হয়; পশ্চিমে ফ্রান্স—পূর্ব্বে ভারতবর্ষ। আরবেরা মিশর ও সিরিয়া দেশ মহম্মদের মৃত্যুর পর ছয় বৎসরের মধ্যে, পারস্য দশ বৎসরে, আফ্রিকা ও স্পেন এক এক বৎসরে, কাবুল অষ্টাদশ বৎসরে, তুর্কস্থান আট বৎসরে সম্পূর্ণরূপে অধিকৃত করে। কিন্তু তাহারা ভারতবর্ষ জয়ের জন্য তিনশত বৎসর পর্য্যন্ত যত্ন করিয়াও ভারতবর্ষ হস্তগত করিতে পারে নাই। মহম্মদ বিন কাসিম সিন্ধুদেশ অধিকৃত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি রাজপুতানা হইতে পরাভূত হইয়া বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার মৃত্যুর কিছুকাল পরে সিন্ধু রাজপুতগণ কর্তৃক পুনরধিকৃত হইয়াছিল। ভারতজয়ে দিগ্বিজয়ী আরব্যদিগের সাধ্য হয় নাই। এলফিনষ্টোন বলেন যে, হিন্দুদিগের দেশীয় ধর্ম্মের প্রতি দৃঢ়ানুরাগই এই অজেয়তার কারণ। আমরা বলি, রণনৈপুণ্য—যোধশক্তি। হিন্দুদিগের আত্মধর্ম্মানুরাগ অদ্যাপিও বলবৎ। তবে কেন হিন্দুরা সাত শত বৎসর পরাজিত—পদানত?

দ্বিতীয়, যখন কোন প্রাচীন দেশের নৈকট্যে নবাভ্যুদয়বিশিষ্ট এবং বিজয়াভিলাষী জাতি অবস্থিতি করে, তখন প্রাচীন জাতি প্রায় নবীনের প্রভুত্বাধীন হইয়া যায়—এইরূপ সর্ব্বান্তকারী বিজয়াভিলাষী জাতি প্রাচীন ইউরোপে রোমকেরা, আসিয়ায় আরব্য ও তুরকীয়েরা। যে যে জাতি ইহাদিগের সংস্রবে আসিয়াছে, তাহারাই পরাভূত হইয়া ইহাদিগের অধীন হইয়াছে। কিন্তু তন্মধ্যে হিন্দুরা যতদূর দুর্জ্জেয় হইয়াছিল, এতাদৃশ আর কোন জাতিই হয় নাই। আরব্যগণ কর্তৃক অতি অল্পকালমধ্যে মিশর, উত্তর-আফ্রিকা, স্পেন, পারস্য, তুরস্ক এবং কাবুল-রাজ্য উচ্ছিন্ন হইয়াছিল—তাহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। তদপেক্ষা সুবিখ্যাত কতিপয় সাম্রাজ্যের উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। রোমকেরা প্রথম ২০০ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে গ্রীস আক্রমণ করে। তদবধি ৫২ বৎসরমধ্যে ঐ রাজ্য একেবারে নিঃশেষে বিজিত হয়। সুবিখ্যাত কার্থেজ রাজ্য ২৬৪ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে প্রথম রোমকদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়। ১৪৬ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে অর্থাৎ এক শত বিশ বৎসরমধ্যে সেই রাজ্য রোমকগণ কর্তৃক ধ্বংসিত হয়। পূর্ব্ব-রোমক বা গ্রীকসাম্রাজ্য চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমভাগে তুরকীগণ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে, অর্থাৎ, পঞ্চাশৎ বৎসরমধ্যে তুরকী দ্বিতীয় মহম্মদের হস্তে বিলুপ্ত হয়। পশ্চিম রোমক, যাহার নাম অদ্যাপি জগতে বীরদর্পের পতাকাস্বরূপ, তাহাই ২৮৬ খৃষ্টাব্দে উত্তরীয় বর্ব্বরজাতি কর্তৃক প্রথম আক্রান্ত হইয়া ৪৭৬ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ প্রথম বর্ব্বর-বিপ্লবের ১৯০ বৎসরমধ্যে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। ভারতবর্ষ ৬৬৪ খৃষ্টাব্দে আরব্য মুসলমানগণ কর্তৃক প্রথম আক্রান্ত হয়। তদন হইতে পাঁচ শত উনত্রিশ বৎসর পরে শাহাবুদ্দিন ঘোরী কর্তৃক উত্তরভারত অধিকৃত হয়। শাহাবুদ্দিন বা তাঁহার অনুচরেরা আরব্যজাতীয় ছিলেন না। আরবেরা যেরূপ বিফলপ্রযত্ন হইয়াছিল, গজনী-নগরাধিষ্ঠাতা তুরকীয়েরাও তদ্রূপ। যাহারা পৃথীরাজ, জয়চন্দ্র এবং সেনরাজা প্রভৃতি হইতে উত্তরভারত-রাজ্য অপহরণ করে, তাহারা পাঠান বা আফগান। আরব্যদিগের প্রথম ভারতাক্রমণের ৫২৯ বৎসর ও তুরকীদিগের প্রথম ভারতাক্রমণের ২১৩ বৎসর পরে তৎস্থানীয় পাঠানেরা ভারতরাজ্যাধিকার করিয়াছিল; পাঠানেরা কখনই আরব্য বা তুরকী-বংশীয়দিগের ন্যায় সমৃদ্ধিসম্পন্ন বা প্রতাপান্বিত নহে। তাহারা কেবল পূর্ব্বগত আরব্য ও তুরকীদিগের সূচিত কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিল। * আরব্য, তুরকী এবং পাঠান, এই তিন জাতির যত্নপারম্পর্য্যে সার্দ্ধ পাঁচ শত বৎসরে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লুপ্ত হয়।

মুসলমান সাক্ষীরা এইরূপ বলে। ইহাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, ইহাদের নিকট হিন্দুরা যখন পরিচিত হইয়াছিলেন, তখন হিন্দুদিগের সুসময় প্রায় অতীত হইয়াছিল—রাজলক্ষ্মী ক্রমে ক্রমে মলিনা হইয়া আসিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় অব্দের পূর্ব্বগত হিন্দুরা অধিকতর বলবান্ ছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সেই সময়ে গ্রীকদিগের সহিত পরিচয়। তাহারা ভূয়োভূয়ঃ ভারতবর্ষীয়দিগের সাহস ও রণনৈপুণ্যের প্রশংসা করিয়াছে; মাকিদনীয় বিপ্লব-বর্ণন-কালে তাহারা এইরূপ পুনঃ পুনঃ নির্দ্দেশ করিয়াছে যে, আসিয়া প্রদেশে এইরূপ রণপণ্ডিত দ্বিতীয় জাতি তাহারা দেখে নাই এবং হিন্দুগণ কর্তৃক যেরূপ গ্রীকসৈন্যহানি হইয়াছিল, এইরূপ অন্য কোন জাতি কর্তৃক হয় নাই। প্রাচীন ভারতবর্ষীয়দিগের রণদক্ষতা-সম্বন্ধে যদি কাহারও সংশয় থাকে, তবে তিনি ভারতবর্ষের বৃত্তান্তলেখক গ্রীকদিগের গ্রন্থ পাঠ করিবেন। *

---

* পশ্চিমাংশে আরব্য ও তুরকীয়েরা কিছু ভূমি অধিকার করিয়াছিল মাত্র।

ভারতভূমি সর্ব্বরত্নপ্রসবিনী, পররাজগণের নিতান্ত লোভের পাত্রী। সেই জন্য সর্ব্বকালে নানা জাতি আসিয়া উত্তর-পশ্চিমে পার্ব্বত্যদ্বারে প্রবেশলাভপূর্ব্বক ভারতাধিকারে চেষ্টা পাইয়াছে। পারসীক, যোন, বাহ্লীক, শক, হূণ, আরব্য, তুরকী, সকলেই আসিয়াছে এবং সিন্ধুপারে বা তত্তুল্য তীরে স্বল্পপ্রদেশ অত্যল্প দিনের জন্য অধিকৃত করিয়া পরে বহিষ্কৃত হইয়াছে। পঞ্চদশ শতাব্দীকাল পর্য্যন্ত আর্য্যেরা সকল জাতিকে শীঘ্র বা বিলম্বে দূরীকৃত করিয়া আত্মদেশ রক্ষা করিয়াছিল। পঞ্চদশ শত বৎসর পর্য্যন্ত প্রবল জাতি-মাত্রেরই আক্রমণ-স্থলীভূত হইয়া এত কাল যে স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিয়াছে, এরূপ অন্য কোন জাতি পৃথিবীতে নাই এবং কখনও ছিল কি না সন্দেহ। অতি দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত যে হিন্দুদিগের সমৃদ্ধি অক্ষয় হইয়াছিল, তাহাদিগের বাহুবলই ইহার কারণ, সন্দেহ নাই। অন্য কারণ দেখা যায় না।

এই সকল প্রমাণ সত্ত্বেও সর্ব্বদা শুনা যায় যে, হিন্দুরা চিরকাল রণে অপারগ। অদূরদর্শীদিগের নিকট ভারতবর্ষের এই চিরকলঙ্কের তিনটি কারণ আছে।

প্রথম,—হিন্দুর ইতিবৃত্ত নাই,—আপনার গুণগান আপনি না গাইলে কে গায়? লোকের ধর্ম্ম এই যে, যে আপনাকে মহাপুরুষ বলিয়া পরিচিত করে, কেহ তাহাকে মনুষ্যের মধ্যে গণ্য করে না। কোন্ জাতির সুখ্যাতি কবে অপর জাতি কর্ত্তৃক প্রচারিত হইয়াছে? রোমকদিগের রণপাণ্ডিত্যের প্রমাণ—রোমকলিখিত ইতিহাস। গ্রীকদিগের যোদ্ধৃগুণের পরিচয়—গ্রীকলিখিত গ্রন্থ। মুসলমানেরা যে মহারণকুশল, ইহাও কেবল মুসলমানের কথাতেই বিশ্বাস করিয়া জানিতে পারিতেছি। কেবল সে গুণে হিন্দুদিগের গৌরব নাই। কেন না, সে কথার হিন্দু সাক্ষী নাই।

দ্বিতীয় কারণ, যে সকল জাতি পররাজ্যাপহারী, প্রায় তাহারাই রণপণ্ডিত বলিয়া অপর জাতির নিকট পরিচিত হইয়াছে। যাহারা আত্মরক্ষামাত্রে সন্তুষ্ট হইয়া, পররাজ্য-লাভের কখন ইচ্ছা করে নাই, তাহারা কখনই বীর গৌরব লাভ করে নাই। ভালমিষ্ঠা এবং বীরগৌরব একাধারে সচরাচর ঘটে না। অদ্যাপি এ দেশীয় ভাষায় "ভালমানুষ" শব্দের অর্থ ভীরুস্বভাবের বোধ—অকর্ম্মা। "হরি নিতান্ত ভালমানুষ।" অর্থ—'হরি নিতান্ত অপদার্থ।

হিন্দুরাজগণ যে একেবারে পররাজ্যে লোভশূন্য ছিলেন, এমত আমরা বলি না। তাঁহারা পরস্পরকে আক্রমণ করিতে কখন ত্রুটি করিতেন না, কিন্তু ভারতবর্ষ হিন্দুরাজ্য-কালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত ছিল। ভারতবর্ষ এতাদৃশ বিস্তৃত প্রদেশ যে, ক্ষুদ্র খণ্ডাধিকারী রাজগণ কখন কেহ তাহার বাহিরে দেশজয়ে যাইবার বাসনা করিতেন না; কোন হিন্দুরাজা কস্মিন্‌কালে সমগ্র ভারত সাম্রাজ্যভুক্ত করিতে পারেন নাই। দ্বিতীয়তঃ, হিন্দুরা যবন, ম্লেচ্ছ প্রভৃতি অপর ধর্ম্মাবলম্বী জাতি-গণকে বিশেষ ঘৃণা করিতেন, তাহাদের উপর প্রভুত্ব করিবার কোন প্রয়াস করিতেন, এমত সম্ভাবনা নহে; বরং তদ্দেশজয়ে যাত্রা করিলে আপন জাতি-ধর্ম্মবিনাশের শঙ্কা করিবার সম্ভাবনা। অতএব সমর্থ হইলেও হিন্দুর ভারতবর্ষের বাহিরে বিজয়াকাঙ্ক্ষায় যাইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। সত্য বটে, এখনকার কাবুলরাজ্যের অধিকাংশ পূর্ব্বকালে হিন্দুরাজ্যভুক্ত ছিল, কিন্তু সে প্রদেশ তৎকালে ভারতবর্ষের একাংশ বলিয়া গণ্য হইত।

প্রাচীন হিন্দুদিগের এ কলঙ্কের তৃতীয় কারণ—হিন্দুরা বহু দিন হইতে পরাধীন। যে জাতি বহুকাল পরাধীন, তাহাদিগের আবার গৌরব কি? কিন্তু এক্ষণকার হিন্দুদিগের বীর্য্যলাঘব প্রাচীন হিন্দুদিগের অবমাননার উপযুক্ত কারণ নহে। প্রায় অনেক দেশেই দেখা যায় যে, প্রাচীন এবং আধুনিক লোকের মধ্যে চরিত্রগত সাদৃশ্য অধিক নহে। ইটালী ও গ্রীক ভারতবর্ষের ন্যায় এই কথার উদাহরণস্থল। মধ্যকালিক ইটালীয় এবং বর্ত্তমান গ্রীকদিগের চরিত্র হইতে প্রাচীন রোমক ও গ্রীকদিগকে কাপুরুষ বলিয়া সিদ্ধ করা যাদৃশ অন্যায়, আধুনিক ভারতবর্ষীয়দিগের পরাধীনতা হইতে প্রাচীনদিগের বললাঘব সিদ্ধ করা তাদৃশ অন্যায়।

আমরা এমতও বলি না যে, আধুনিক ভারত-বর্ষীয়েরা নিতান্ত কাপুরুষ এবং সেই জন্য এতকাল পরাধীন। এ পরাধীনতার অন্য কারণ আছে। আমরা তাহার দুইটি কারণ সবিস্তারে এ স্থলে নির্দ্দিষ্ট করি।

প্রথম, ভারতবর্ষীয়েরা স্বভাবতঃই স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা-রহিত। স্বদেশীয়, স্বজাতীয় লোকে আমাদিগকে শাসিত করুক, পরজাতীয়দিগের শাসনাধীন হইব না, এরূপ অভিপ্রায় ভারতবর্ষীয়-দিগের মনে আইসে না। স্বজাতীয়ের রাজশাসন

মঙ্গলকর বা সুখের আকর, পরজাতীয়ের রাজদণ্ড পীড়াদায়ক বা অগৌরবের কারণ, এ কথা তাহাদের বড় হৃদয়সঙ্গত নহে। পরতন্ত্রতা অপেক্ষা স্বতন্ত্রতা ভাল, এরূপ একটা তাহাদিগের বোধ থাকিতে পারে, কিন্তু সেটি বোধ মাত্র—সে জ্ঞান আকাঙ্ক্ষায় পরিণত নহে। অনেক বস্তু আমাদিগের ভাল বলিয়া জ্ঞান থাকিতে পারে, কিন্তু সে জ্ঞানে তৎপ্রতি সকল স্থানে আকাঙ্ক্ষা জন্মে না। কে না হরিশ্চন্দ্রের দাতৃত্ব বা কার্শিয়সের দেশবাৎসল্যের প্রশংসা করে? কিন্তু তাহার মধ্যে কয়জন হরিশ্চন্দ্রের ন্যায় সর্ব্বত্যাগী বা কার্শিয়সের ন্যায় আত্মঘাতী হইতে প্রস্তুত? প্রাচীন বা আধুনিক ইউরোপীয় জাতীয়দিগের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য-প্রিয়তা বলবতী আকাঙ্ক্ষায় পরিণত। তাঁহাদিগের বিশ্বাস যে, স্বতন্ত্রতাত্যাগের অগ্রে প্রাণ এবং সর্ব্বত্যাগ কর্ত্তব্য। হিন্দুদিগের মধ্যে তাহা নহে। তাঁহাদিগের বিবেচনা, "যে ইচ্ছা রাজা হউক, আমাদের কি? স্বজাতীয় রাজা, পরজাতীয় রাজা, উভয় সমান। স্বজাতীয় হউক, পরজাতীয় হউক, সুশাসন করিলে দুই সমান। স্বজাতীয় রাজা সুশাসন করিবে, পরজাতীয় রাজা সুশাসন করিবে না, তাহার স্থিরতা কি? যদি তাহার স্থিরতা নাই, তবে কেন স্বজাতীয় রাজার জন্য প্রাণ দিব? রাজ্য রাজার সম্পত্তি, তিনি রাখিতে পারেন রাখুন। কেহই আমাদিগের ষষ্ঠ ভাগ ছাড়িবে না; কেহই চোরকে পুরস্কৃত করিবে না। যে রাজা হউক, আমরা কাহারও জন্য অঙ্গুলী ক্ষত করিব না।" *

আমরা একণে স্বাতন্ত্র্যপর ইংরেজদিগের নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া এই সকল কথায় ভ্রম দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু ইহা অস্বাভাবিক নহে এবং ইহার ভ্রান্তি সহজে অনুমেয়ও নহে। স্বভাবতঃ কোন জাতি অনন্তকাল হইতেই স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় স্বভাবতঃ কোন জাতি সুসভ্য হইয়াও তৎপ্রতি আস্থাশূন্য। এই সংসারে অনেকগুলিন স্পৃহণীয় বস্তু আছে, তন্মধ্যে সকলেই সকল বস্তুর জন্য যত্নবান্ হয় না। ধন এবং যশঃ উভয়েই গ্রহণীয়। কিন্তু আমরা সচরাচর দেখিতে পাই, এক ব্যক্তি ধনসঞ্চয়েই রত, যশের প্রতি অনাদর। রাম ধনসঞ্চয়ে একব্রত হইয়া কার্পণ্য, নীচাশয়তা প্রভৃতি দোষে যশোহানি করিতেছে; যদু অমিত ধনরাশি নষ্ট করিয়া দাতৃত্বাদি গুণে যশঃসঞ্চয় করিতেছে। রাম ভ্রান্ত কি যদু ভ্রান্ত, তাহার মীমাংসা মিতান্ত সহজ নহে। অন্ততঃ ইহা স্থির যে, উভয়-মধ্যে কাহারও কার্য্য স্বভাববিরুদ্ধ নহে; সেইরূপ গ্রীকেরা স্বাধীনতায় প্রিয়, হিন্দুরা স্বাধীনতাপ্রিয় নহে, শান্তি সুখের অভিলাষী; ইহা কেবল জাতিগত স্বভাব-বৈচিত্র্যের ফল, বিস্ময়ের বিষয় নহে।

কিন্তু অনেকে এ কথা মনে করেন না। হিন্দুরা যে পরাধীন, স্বাধীনতালাভের জন্য উৎসুক নহে, ইহাতে তাঁহারা অনুমান করেন যে, হিন্দুরা দুর্ব্বল, রণভীরু, স্বাধীনতালাভে অক্ষম। এ কথা তাঁহাদের মনে পড়ে না যে, হিন্দুরা সাধারণতঃ স্বাধীনতালাভে অভিলাষী বা যত্নবান্ নহে। অভিলাষী বা যত্নবান্ হইলেই লাভ করিতে পারে।

স্বাতন্ত্র্যে অনাস্থা কেবল আধুনিক হিন্দুদিগের স্বভাব, এমত আমরা বলি না; ইহা হিন্দুজাতির চিরস্বভাব বোধ হয়। যিনি এমত বিবেচনা করেন যে, হিন্দুরা সাত শত বৎসর স্বাতন্ত্র্যহীন হইয়া একণে তদ্বিষয়ে আকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়াছে, তিনি অযথার্থ অনুমান করেন। সংস্কৃত সাহিত্যাদিতে কোথাও এমন কিছু পাওয়া যায় না যে, তাহা হইতে পূর্ব্বতন হিন্দুগণকে স্বাধীনতা-প্রয়াসী বলিয়া সিদ্ধ করা যাইতে পারে। পুরাণোপপুরাণ-কাব্য-নাটকাদিতে কোথাও স্বাধীনতার গুণগান নাই। মিবার ভিন্ন কোথাও দেখা যায় না যে, কোন হিন্দু-সমাজ স্বাতন্ত্র্যের আকাঙ্ক্ষায় কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে। রাজার রাজ্য-সম্পত্তি রক্ষার, যশ, বীরের বীরত্বে ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধ-প্রয়াস, এ সকলের ভূরি ভূরি উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু

---

* আমরা এমত বলি না যে, ভারতবর্ষে কখন কোন স্বাতন্ত্র্যানুরক্ত জাতি ছিল না। মিবাররাজপুত-দিগের অপূর্ব্ব কাহিনী যাঁহারা টডের গ্রন্থে অবগত হইয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, ঐ রাজপুতগণ হইতে স্বাতন্ত্র্যোন্মত্ত কখন পৃথিবীতে দেখা দেয় নাই। সেই স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তার ফলও চমৎকার। মিবার ক্ষুদ্ররাজ্য হইয়াও ছয় শত বৎসর পর্য্যন্ত মুসলমান-সাম্রাজ্যের মধ্যস্থলে স্বাধীন হিন্দুরাজপতাকা উড়াইয়াছে। আকবর বাদশাহের বাহুবলও মিবারধ্বংসে সমর্থ হয় নাই। অদ্যাপি উদয়পুরের রাজবংশ পৃথিবীমধ্যে প্রাচীন রাজবংশ বলিয়া বিখ্যাত। কিন্তু একণে আর সে দিন নাই। সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই। আমরা যাহা বলিয়াছি, তাহা সাধারণ হিন্দু-সম্বন্ধে যথার্থ।

স্বাতন্ত্র্যলাভাকাঙ্ক্ষা সে সকলের মধ্যগত নহে। স্বাতন্ত্র্য, স্বাধীনতা, এ সকল নূতন কথা।

ভারতবর্ষীয়দিগের এইরূপ স্বভাবসিদ্ধ স্বাতন্ত্র্যে অনাস্থার কারণানুসন্ধান করিলে তাহাও দুর্জ্ঞেয় নহে। ভারতবর্ষের ভূমির উর্ব্বরাশক্তি এবং বায়ুর তাপাতিশয্য প্রভৃতি ইহার গৌণ কারণ। ভূমি উর্ব্বরা, দেশ সর্ব্বসামগ্রী-পরিপূর্ণ, অল্পায়াসে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ হয়। লোককে অধিক পরিশ্রম করিতে হয় না. এ জন্য অবকাশ যথেষ্ট হইলে সহজেই মনের গতি আভ্যন্তরিক হয়; ধ্যানের বাহুল্য ও চিন্তার বাহুল্য হয়। তাহার এক ফল কবিত্ব, অগত্তত্ত্বে পাণ্ডিত্য। এই জন্য হিন্দুরা অল্পকালে অদ্বিতীয় কবি এবং দার্শনিক হইয়াছিলেন। কিন্তু মনের আভ্যন্তরিক গতির দ্বিতীয় ফল বাহ্যসুখে অনাস্থা। বাহ্যসুখে অনাস্থা হইলে সুতরাং নিশ্চেষ্টতা জন্মিবে। স্বাতন্ত্র্যে অনাস্থা এই স্বাভাবিক নিশ্চেষ্টতার এক অংশমাত্র। আর্য্য ধর্ম্মতত্ত্বে, আর্য্য দর্শনশাস্ত্রে এই অচেষ্টা-পরতা সর্ব্বত্র বিদ্যমান। কি বৈদিক, কি বৌদ্ধ, কি পৌরাণিক ধর্ম্ম, সকলেই এই নিশ্চেষ্টতারই সংবর্দ্ধনা-পরিপূর্ণ। বেদ হইতে বেদান্তসাংখ্যাদি দর্শনের উৎপত্তি; তদনুসারে লয় বা ভোগকাঙ্ক্ষিই মোক্ষ; নিষ্কামত্বই পুণ্য। বৌদ্ধধর্ম্মের সার,—নির্ব্বাণই মুক্তি।

একণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, হিন্দুজাতি যদি চিরকাল স্বাতন্ত্র্যে হতাদর, তবে মুসলমানকৃত জয়ের পূর্ব্বে সার্দ্ধসহস্র বৎসর তাহারা কেন যত্ন করিয়া পুনঃ পুনঃ পরজাতি বিমুখপূর্ব্বক স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিল? পরজাতিগণ সহজে কখন বিমুখ হয় নাই, অনেক কষ্টে হইয়া থাকিবে। যে সুখের প্রতি আস্থা নাই, সে সুখের জন্য হিন্দুসমাজ কেন এত কষ্ট স্বীকার করিয়াছিল?

উত্তর, হিন্দুসমাজ যে কখন শক, যবন প্রভৃতিকে বিমুখীকরণ জন্য বিশেষ যত্নবান্ হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ কোথাও নাই। হিন্দুরাজগণ আপনার রাজ্য-সম্পত্তি রক্ষার জন্য যত্ন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের সংগৃহীত সেনা যুদ্ধ করিত; যখন পারিত, শত্রু বিমুখ করিত, তাহাতেই দেশের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা হইত; তদ্ভিন্ন যে "আমাদের দেশে ভিন্ন জাতীয় রাজা হইতে দিব না" বলিয়া সাধারণ জনগণ কখন উৎসাহযুক্ত বা উদ্যমশালী হইয়াছিল, ইহার প্রমাণ কোথাও নাই। বরং তদ্বিপরীতই প্রকৃত বলিয়া বিবেচনা হয়। যখনই সমরলক্ষ্মীর কোপদৃষ্টি-প্রভাবেই হিন্দু রাজা বা হিন্দু সেনাপতি রণে হত হইয়াছে, তখনই হিন্দুসেনা রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিয়াছে, আর যুদ্ধে সমবেত হয় নাই। কেন না, আর কাহার জন্য যুদ্ধ করিবে? যখনই রাজা নিধনপ্রাপ্ত, বা অন্য কারণে রাজ্যরক্ষায় নিশ্চেষ্ট হইয়াছেন, তখনই হিন্দুযুদ্ধ সমাধা হইয়াছে। আর কেহ তাহার স্থানীয় হইয়া স্বাতন্ত্র্য-পালনের উপায় করে নাই; সাধারণ সমাজ হইতে অরক্ষিত রাজ্যরক্ষার কোন উদ্যম হয় নাই। যখন বিধির বিপাকে যবন বা পারসীক, শক বা বাহ্লীক, কোন প্রদেশখণ্ডের রাজাকে রণে পরাজিত করিয়া তাঁহার সিংহাসনে বসিয়াছে, প্রজাগণ তখনই তাহাকে পূর্ব্বপ্রভুর তুল্য সমাদর করিয়াছে, রাজ্যাপহরণে কোন আপত্তি করে নাই। তিন সহস্র বৎসরের অধিক কাল ধরিয়া আর্য্যের সঙ্গে আর্য্যজাতীয়, আর্য্যজাতীয়ের সঙ্গে ভিন্নজাতীয়,—ভিন্ন জাতীয়ের সঙ্গে ভিন্ন জাতীয়, মগধের সঙ্গে কান্যকুব্জ, কান্যকুব্জের সঙ্গে দিল্লী, দিল্লীর সঙ্গে লাহোর, হিন্দুর সঙ্গে পাঠান, পাঠানের সঙ্গে মোগল, মোগলের সঙ্গে ইংরেজ, সকলের সঙ্গে সকলে বিবাদ করিয়া চিরপ্রজ্বলিত সমরানলে দেশ দগ্ধ করিয়াছে। কিন্তু সে সকল কেবল রাজায় রাজায় যুদ্ধ; সাধারণ হিন্দুসমাজ কখন কাহারও হইয়া কাহারও সহিত যুদ্ধ করে নাই। হিন্দুরাজগণ অথবা হিন্দুস্থানের রাজগণ ভূয়োভূয়ঃ ভিন্নজাতি কর্ত্তৃক জিত হইয়াছে, কিন্তু সাধারণ হিন্দুসমাজ যে কখন কোন পরজাতি কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছে, এমত বলা যাইতে পারে না; কেন না, সাধারণ হিন্দুসমাজ কখন কোন পরজাতির সঙ্গে যুদ্ধ করে নাই।

এই বিচারে হিন্দুজাতির দীর্ঘকালগত পরাধীনতার দ্বিতীয় কারণ আসিয়া পড়িল। সে কারণ, —হিন্দুসমাজের অনৈক্য, সমাজমধ্যে জাতিপ্রতিষ্ঠার অভাব, জাতি-হিতৈষিতার অভাব, অথবা অন্য যাহাই বলুন। আমরা সবিস্তারে তাহাই বুঝাইতেছি।

আমি হিন্দু, তুমি হিন্দু, রাম হিন্দু, যদু হিন্দু, আরও লক্ষ লক্ষ হিন্দু আছে। এই লক্ষ লক্ষ হিন্দুমাত্রেরই যাহাতে মঙ্গল, তাহাতেই আমার মঙ্গল। যাহাতে তাহাদের মঙ্গল নাই, আমারও তাহাতে মঙ্গল নাই। অতএব সকল হিন্দুর যাহাতে মঙ্গল হয়, তাহাই আমার কর্ত্তব্য। যাহাতে কোন হিন্দুর অমঙ্গল হয়, তাহা আমার অকর্ত্তব্য। যেমন আমার এইরূপ কর্ত্তব্য, আর এইরূপ অকর্ত্তব্য, তোমারও তদ্রূপ, রামেরও তদ্রূপ, যদুরও তদ্রূপ, সকল হিন্দুরই তদ্রূপ। সকল হিন্দুরই যদি একরূপ

ব্যা হইল, তবে সকল হিন্দুর কর্ত্তব্য যে একপরা-মর্শী, একমতাবলম্বী, একত্র মিলিত হইয়া কার্য্য করে। এই জ্ঞান জাতিপ্রতিষ্ঠার প্রথম ভাগ; অর্দ্ধাংশ মাত্র।

হিন্দুজাতি ভিন্ন পৃথিবীতে অন্য অনেক জাতি আছে। তাহাদের মঙ্গলমাত্রেই আমাদের মঙ্গল হওয়া সম্ভব নহে। অনেক স্থানে তাহাদের মঙ্গলে আমাদের অমঙ্গল, যেখানে তাহাদের মঙ্গলে আমাদের অমঙ্গল, সেখানে তাহাদের মঙ্গল যাহাতে না হয়, আমরা তাহাই করিব। ইহাতে পরজাতি পীড়ন করিতে হয়, করিব। অপিচ, যেমন তাহাদের মঙ্গলে আমাদের অমঙ্গল ঘটিতে পারে, তেমনি তাহাদের অমঙ্গলে আমাদের মঙ্গল হইতে পারে। হয় হউক, আমরা সে জন্য আত্মজাতির মঙ্গলসাধনে বিরত হইব না; পরজাতির অমঙ্গলসাধন করিয়া আত্মমঙ্গল সাধিত হয়, তাহাও করিব। জাতি-প্রতিষ্ঠার এই দ্বিতীয় ভাগ।

দেখা যাইতেছে যে, এইরূপ মনোবৃত্তি নিষ্পাপ পরিশুদ্ধ ভাব বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। ইহার গুরুতর দোষাবহ বিকার আছে। সেই বিকারে জাতিসাধারণের এরূপ ভ্রান্তি জন্মে যে, পর-জাতির মঙ্গলমাত্রেই স্বজাতির অমঙ্গল। পরজাতির অমঙ্গলমাত্রেই স্বজাতির মঙ্গল বলিয়া বোধ হয়। এই কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া ইউরোপীয়েরা অনেক দুঃখভোগ করিয়াছে। অনর্থক ইহার জন্য অনেকবার সমরানলে ইউরোপ দগ্ধ করিয়াছে।

স্বজাতি-প্রতিষ্ঠা ভালই হউক, আর মন্দই হউক, যে জাতিমধ্যে ইহা বলবতী হয়, সে জাতি অন্য-জাতি অপেক্ষা প্রবলতা লাভ করে। আজিকালি এই জ্ঞান ইউরোপে বিশেষ প্রধান এবং ইহার প্রভাবে তথায় অনেক রাজবিপ্লব ঘটিতেছে। ইহার প্রভাবে ইটালী একরাজ্যভুক্ত হইয়াছে। ইহার প্রভাবে বিষম প্রতাপশালী নূতন জর্ম্মান্-সাম্রাজ্য স্থাপিত হইয়াছে। আরও কি হইবে বলা যায় না।

এমত বলি না যে, ভারতবর্ষে এই জাতিপ্রতিষ্ঠা কস্মিন্‌কালেও ছিল না। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, আর্য্য-জাতীয়েরা চিরকাল ভারতবাসী নহে। অন্যত্র হইতে ভারতবর্ষে আসিয়া তদ্দেশ অধিকার করিয়াছিল। প্রথম আর্য্যজয়ের সময়ে বেদাদির সৃষ্টি হয় এবং সেই সময়কেই পণ্ডিতেরা বৈদিক কাল কহেন। বৈদিক কালে এবং তাহার অব্যবহিত পরেই জাতিপ্রতিষ্ঠা যে আর্য্যগণের মধ্যে বিশেষ বলবতী ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ বৈদিক মন্ত্রাদিমধ্যে পাওয়া যায়। তাৎকালিক সমাজনিয়ন্তা ব্রাহ্মণেরা যেরূপে সমাজ বিধিবদ্ধ করিয়াছিল, তাহাও ঐ জ্ঞানের পরিচয়স্থল। আর্য্য বর্ণে এবং শূদ্রে যে বিষম বৈলক্ষণ্য বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাও ইহার ফল। কিন্তু আর্য্যবংশ বিস্তৃত হইয়া পড়িলে আর সে জাতিপ্রতিষ্ঠা রহিল না। ক্রমে আর্য্যবংশীয়েরা বিস্তৃত ভারতবর্ষের নানা প্রদেশ অধিকৃত করিয়া স্থানে স্থানে এক এক খণ্ড সমাজ সংস্থাপন করিল। ভারতবর্ষ এইরূপ বহু-সংখ্যক খণ্ড সমাজে বিভক্ত হইল। সমাজভেদ, ভাষার ভেদ, আচার-ব্যবহারের ভেদ, নানা ভেদ, শেষে জাতিভেদে পরিণত হইল। বাহ্লীক হইতে পৌণ্ড্র পর্য্যন্ত, কাশ্মীর হইতে চোল ও পাণ্ড্য পর্য্যন্ত সমস্ত ভারতভূমি মধুচক্রের ন্যায় নানা জাতি, নানা সমাজে পরিপূর্ণ হইল। পরিশেষে, কপিলবাস্তুর রাজকুমার শাক্যসিংহের হস্তে এক অভিনব ধর্ম্মের সৃষ্টি হইলে, অন্যান্য প্রভেদের উপর ধর্ম্মভেদ জন্মিল। ভিন্ন দেশ, ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন রাজ্য, ভিন্ন ধর্ম্ম,—আর একজাতীয়ত্ব কোথায় থাকে? সাগরমধ্যস্থ মীন-দলবৎ ভারতবর্ষীয়েরা একতাশূন্য হইল। পরে আবার মুসলমান আসিল। মুসলমানদিগের বংশবৃদ্ধি হইতে লাগিল। কালে সাগরোর্ম্মির উপরে সাগরোর্ম্মিবৎ নূতন নূতন মুসলমানসম্প্রদায় পাশ্চাত্য পর্ব্বত-পার হইতে আসিতে লাগিল। দেশীয় লোক সহস্রে সহস্রে রাজানুকম্পার লোভে বা রাজপীড়নে মুসলমান হইতে লাগিল। অতএব ভারতবর্ষবাসি-গণ মুসলমান হিন্দু মিশ্রিত হইল। হিন্দু, মুসলমান, মোগল, পাঠান, রাজপুত, মহারাষ্ট্র একত্র বাস করিতে লাগিল। তখন জাতির ঐক্য কোথায়? ঐক্যজ্ঞান কিসে থাকিবে?

ভারতবর্ষে নানা জাতি। বাসস্থানের প্রভেদ, ভাষার প্রভেদ, বংশের প্রভেদ, ধর্ম্মের প্রভেদে নানা জাতি। বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী, তৈলঙ্গী, মহারাষ্ট্রী, রাজপুত, জাট, হিন্দু, মুসলমান ইহার মধ্যে কে কাহার সঙ্গে একতাযুক্ত হইবে? ধর্ম্মগত ঐক্য থাকিলে বংশগত ঐক্য নাই, বংশগত ঐক্য থাকিলে ভাষাগত ঐক্য নাই, ভাষাগত ঐক্য থাকিলে নিবাসগত ঐক্য নাই। রাজপুত, জাট একধর্ম্মা-বলম্বী হইলে ভিন্নবংশীয় বলিয়া ভিন্ন জাতি, বাঙ্গালী বেহারী একবংশীয় হইলে ভাষাভেদে ভিন্ন জাতি; মৈথিলী, কনোজী একভাষী হইলে ভাষাভেদে ভিন্নজাতি। কেবল ইহাই নহে।

ভারতবর্ষের এমনই অদৃষ্ট, যেখানে কোন প্রদেশীয় লোক সর্ব্বাংশে এক, যাহাদের এক ধর্ম্ম, এক ভাষা, এক জাতি, এক দেশ—তাহাদের মধ্যেও জাতির একতাজ্ঞান নাই। বাঙ্গালীর মধ্যে বাঙ্গালীজাতির একতাবোধ নাই। শিখের মধ্যে শিখজাতির একতাবোধ নাই। ইহারও বিশেষ কারণ আছে। বহুকাল পর্য্যন্ত বহুসংখ্যক ভিন্নজাতি এক বৃহৎ সাম্রাজ্যভুক্ত হইলে ক্রমে জাতিজ্ঞান লোপ হইতে থাকে। ভিন্ন ভিন্ন নদীর মুখনির্গত জলরাশি যেমন সমুদ্রে আসিয়া পড়িলে আর তন্মধ্যে ভেদজ্ঞান করা যায় না, বৃহৎ সাম্রাজ্যভুক্ত ভিন্ন-জাতিগণের সেইরূপ ঘটে। তাহাদিগের পার্থক্য যায়, অথচ ঐক্য জন্মে না। রোমকসাম্রাজ্যমধ্যগত জাতিদিগের এইরূপ দশা ঘটিয়াছিল। হিন্দুদিগেরও তাহাই ঘটিয়াছে। জাতি-প্রতিষ্ঠা নানা কারণে ভারতবর্ষে অনেক দিন হইতে লোপ হইয়াছে। লোপ হইয়াছে বলিয়া কখন হিন্দুসমাজ কর্ত্তৃক কোন জাতীয় কার্য্য সমাধা হয় নাই। লোপ হইয়াছে বলিয়া সকল জাতীয় রাজাই হিন্দুরাজ্যে বিনা বিবাদে সমাজ কর্ত্তৃক অভিষিক্ত হইয়াছেন। এই জন্যই স্বাতন্ত্র্যরক্ষার কারণ হিন্দুসমাজ কখন তর্জ্জনীর বিক্ষেপও করে নাই।

ইতিহাস-কীর্ত্তিত কালমধ্যে কেবল দুইবার হিন্দুসমাজমধ্যে জাতি-প্রতিষ্ঠার উদয় হইয়াছিল। একবার মহারাষ্ট্রে শিবাজী এই মহামন্ত্র পাঠ করিয়াছিলেন। তাঁহার সিংহনাদে মহারাষ্ট্রীয়ে মহারাষ্ট্রীয়ে ভ্রাতৃভাব হইল। এই আশ্চর্য্য মন্ত্রের বলে অজিতপূর্ব্ব মোগল-সাম্রাজ্য মহারাষ্ট্রীয় কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইল। চিরজয়ী মুসলমান হিন্দু কর্ত্তৃক বিজিত হইল। সমুদয় ভারতবর্ষ মহারাষ্ট্রের পদানত হইল। অদ্যাপি মারহাট্টা ইংরেজের সঙ্গে ভারতবর্ষ ভাগে ভোগ করিতেছে।

দ্বিতীয়বারের ঐন্দ্রজালিক রণজিৎ সিংহ। ইন্দ্রজাল খালসা। জাতীয় বন্ধন দৃঢ় হইলে পাঠানদিগের স্বদেশেরও কিয়দংশ হিন্দুর হস্তগত হইল। শতদ্রুপারে সিংহনাদ শুনিয়া নির্ভীক ইংরেজও কম্পিত হইল। ভাগ্যক্রমে ঐন্দ্রজালিক মরিল। পটুতর ঐন্দ্রজালিক ডালহৌসির হস্তে খালসা ইন্দ্রজাল ভাঙ্গিল। কিন্তু রামনগর এবং চিলিয়ানওয়ালা ইতিহাসে লেখা রহিল।

যদি কদাচিৎ কোন প্রদেশখণ্ডে জাতিপ্রতিষ্ঠার উদয়ে এতদূর ঘটিয়াছিল, তবে সমুদায় ভারত একজাতীয় বন্ধনে বদ্ধ হইলে কি না হইতে পারিত?

ইংরেজ ভারতবর্ষের পরমোপকারী। ইংরেজ আর্য্যদিগকে নূতন কথা শিখাইতেছে। যাহা আমরা জানিতাম না, তাহা জানাইতেছে; যাহা কখন দেখি নাই, শুনি নাই, বুঝি নাই, তাহা দেখাইতেছে, শুনাইতেছে, বুঝাইতেছে; যে পথে কখন চলি নাই, সে পথে কেমন করিয়া চলিতে হয়, তাহা দেখাইয়া দিতেছে। সেই সকল শিক্ষার মধ্যে অনেক শিক্ষা অমূল্য। যে সকল অমূল্য রত্ন আমরা ইংরেজের চিত্তভাণ্ডার হইতে লাভ করিতেছি, তাহার মধ্যে দুইটির আমরা এই প্রবন্ধে উল্লেখ করিলাম—স্বাতন্ত্র্য-প্রিয়তা এবং জাতীয়-প্রতিষ্ঠা।* ইহা কাহাকে বলে, তাহা হিন্দু জানিত না।

—

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা

মানুষের এমত দুরবস্থা কখনও হইতে পারে না যে, তাহাতে শুভ কিছুই দেখা যায় না। আমাদিগের গুরুতর দুর্ভাগ্যেও কিছু না কিছু মঙ্গল খুঁজিয়া পাওয়া যায়। যে অশুভের মধ্যে শুভের অনুসন্ধান করিয়া তাহার আলোচনা করে, সেই বিজ্ঞ। দুঃখও যে কেবল দুঃখ নহে, দুঃখের দিনে এ কথার আলোচনায় কিছু সুখ আছে।

ভারতবর্ষ পূর্ব্বে স্বাধীন ছিল—এখন অনেক শত শত বৎসর হইতে পরাধীন। নব্য ভারতবর্ষীয়েরা ইহা ঘোরতর দুঃখ মনে করেন। আমাদিগের ইচ্ছা যে, সেই প্রাচীন স্বাধীনতার এবং আধুনিক পরাধীনতার একবার তুলনা করিয়া দেখি। দেখি যে, দুঃখই বা কি, সুখই বা কি।

কিন্তু স্বাধীনতা ও পরাধীনতা—এই সকল কথার তাৎপর্য্য কি, তাহা একবার বিবেচনা করা আবশ্যক হইতেছে। আমরা প্রাচীন ভারতবর্ষের তুলনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। তুলনার উদ্দেশ্য তারতম্য-নির্দ্দেশ। কিন্তু কোন্ বিষয়ের তারতম্য আমাদিগের অনুসন্ধানের বিষয়? প্রাচীন ভারত স্বাধীন, আধুনিক ভারত পরাধীন, এ কথা বলিয়া কি উপকার? আমাদিগের বিবেচনায় এরূপ তুলনায় একইমাত্র উদ্দেশ্য এই হওয়া আবশ্যক যে, প্রাচীন ভারতে মনুষ্য সুখী ছিল, কি আধুনিক ভারতবর্ষে অধিক সুখী?

* এই প্রবন্ধে জাতি শব্দে Nationality বা Nation বুঝিতে হইবে।

এতক্ষণে অনেকে আমাদিগের প্রতি খড়্গহস্ত হইয়াছেন। স্বাধীনতার যে সুখ, তাহাতে সংশয় কি? যে সংশয় করে, সে পাষণ্ড, নরাধম, ইত্যাদি স্বীকার করি; কিন্তু স্বাধীনতা পরাধীনতা অপেক্ষা কিসে ভাল, তাহা জিজ্ঞাসা করিলে ইহার সদুত্তর পাওয়া ভার।

বাঙ্গালী ইংরেজী পড়িয়া এ বিষয়ে দুই কথা শিখিয়াছেন—"Independence," "Liberty." তাহার অনুবাদে আমরা 'স্বাধীনতা' এবং 'স্বতন্ত্রতা' দুইটি কথা পাইয়াছি। অনেকেরই মনে বোধ আছে যে, দুইটি শব্দে এক পদার্থকে বুঝায়। স্বজাতির শাসনাধীন অবস্থাকেই ইহা বুঝায়, এটি সাধারণ প্রতীতি। রাজা যদি ভিন্ন দেশীয় হয়েন, তবে তাঁহার প্রজাগণ পরাধীন এবং সেই রাজ্য পরতন্ত্র। এই হেতু, এক্ষণে ইংরেজের শাসনাধীন ভারতবর্ষকে পরাধীন ও পরতন্ত্র বলা গিয়া থাকে। এই জন্য মোগলদিগের শাসিত ভারতবর্ষকে, বা সেরাজউদ্দৌলার শাসিত বাঙ্গালাকে পরাধীন বা পরতন্ত্র বলা গিয়া থাকে। এইরূপ সংস্কারের অমূলকতা বিবেচনা করা যাউক।

মহারাণী ভিক্‌টোরিয়াকে ইংরেজকন্যা বলা যাইতে পারে, কিন্তু তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ প্রথম বা দ্বিতীয় জর্জ্জ ইংরেজ ছিলেন না। তাঁহারা জর্ম্মান্‌, তৃতীয় উইলিয়ম ওলন্দাজ ছিলেন। বোনাপার্টি কর্সিকার ইতালিয় ছিলেন। স্পেনের ভূতপূর্ব্ব প্রাচীন বুর্বোবংশীয় রাজারা ফরাসী ছিলেন। রোমসাম্রাজ্যের সিংহাসনে অনেক বর্ব্বরজাতীয় সম্রাট্ আরোহণ করিয়াছিলেন। এইরূপ শত শত ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। দেখা যাইতেছে, এই সকল রাজ্যে তত্তদবস্থায় রাজা ভিন্ন জাতীয় ছিলেন। ঐ সকল রাজ্য তৎকালে পরাধীন বা পরতন্ত্র ছিল, বলা যাইতে পারে কি না? কেহই বলিবে না, বলা যাইতে পারে। যদি প্রথম জর্জ্জ-শাসিত ইংলণ্ডকে, বা ত্রেজান-শাসিত রোমকে পরাধীন বলা না গেল, তবে সাহজাঁহা-শাসিত ভারতবর্ষকে বা আলিবর্দ্দি-শাসিত বাঙ্গলাকে পরাধীন বলি কেন?

দেখা যাইতেছে যে, শাসনকর্ত্তা ভিন্নজাতীয় হইলেই রাজ্য পরতন্ত্র হইল না। পক্ষান্তরে, শাসনকর্ত্তা স্বজাতীয় হইলেই রাজ্য যে স্বতন্ত্র হয় না, তাহারও অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। ওয়াসিংটনের কৃত যুদ্ধের পূর্ব্বে আমেরিকার শাসনকর্তৃগণ স্বজাতীয় ছিল। উপনিবেশমাত্রেরই প্রথমাবস্থায় শাসনকর্ত্তা স্বজাতীয় হইয়া থাকে, কিন্তু সে অবস্থায় উপনিবেশ সকলকে কদাচ স্বতন্ত্র বলা যায় না।

তবে পরতন্ত্র কাহাকে বলি?

ইহা নিশ্চিত যে, ইংরেজের অধীন আধুনিক ভারত পরতন্ত্র রাজ্য বটে। রোমক-জিত ব্রিটেন হইতে সিরিয়া পর্য্যন্ত রাষ্ট্র সকল পরতন্ত্র ছিল বটে। আলজিয়ার্স বা জামেকা পরতন্ত্র রাজ্য বটে। কিসে এই সকল রাজ্য পরতন্ত্র? এ সকল এক একটি পৃথক্ রাজ্য নহে, ভিন্নদেশবাসী রাজার রাজ্যের অংশমাত্র। ভারতেশ্বরী ভারতবর্ষে থাকেন না। ভারতবর্ষের রাজা ভারতবর্ষে নাই, অন্যদেশে। যে দেশের রাজা অন্য দেশের সিংহসনারূঢ় এবং অন্য-দেশবাসী, সেই দেশ পরতন্ত্র।

দুইটি রাজ্যের এক রাজা হইলে তাহার একটি পরতন্ত্র, একটি স্বতন্ত্র। যে দেশে রাজা বাস করেন, সেইটি স্বতন্ত্র, যে দেশে বাস করেন না, সেইটি পরতন্ত্র।

এইরূপ পরিভাষায় কতকগুলি আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে। ইংলণ্ডের প্রথম জেমস স্কটলণ্ড ও ইংলণ্ড দুই রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া, স্কটলণ্ড ত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে বাস করিলেন। স্কটলণ্ড কি ইংলণ্ডকে রাজ্য দিয়া পরতন্ত্র হইল? বাবরশাহ ভারত জয় করিয়া দিল্লীতে সিংহাসন স্থাপন পূর্ব্বক তথা হইতে পৈতৃক রাজ্য শাসিত করিতে লাগিলেন—তাঁহার স্বদেশ কি ভারতবর্ষের অধীন হইল? প্রথম জর্জ্জ ইংলণ্ডেই সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া তথায় অধিষ্ঠান করিয়া পৈতৃক রাজ্য হানোবর শাসিত করিতে লাগিলেন;—হানোবর কি তখন পরতন্ত্র হইয়াছিল?

পরিভাষার অনুরোধে আমাদিগকে বলিতে হইবে যে, প্রথম জেমস বা প্রথম জর্জ্জ বা প্রথম মোগলের পূর্ব্বরাজ্যের পরতন্ত্রতা ঘটিয়াছিল। কিন্তু পারতন্ত্র্য ঘটিয়াছিল মাত্র, পরাধীনতা ঘটে নাই। আমরা "Independence" শব্দের পরিবর্ত্তে স্বতন্ত্রতা এবং "Liberty" শব্দের স্থানে স্বাধীনতা শব্দ এবং তত্তদভাবস্থানে তত্তদভাবসূচক শব্দ ব্যবহার করিতেছি।

তবে পারতন্ত্র্য এবং পরাধীনতায় প্রভেদ কি? অথবা, স্বাতন্ত্র্য এবং স্বাধীনতায় প্রভেদ কি?

ইংলণ্ডে রাজনৈতিক স্বাধীনতার একটি বিশেষ প্রয়োগ প্রচলিত আছে, আমরা সে অর্থ অবলম্বন করিতে বাধ্য নহি। কেন না, সে অর্থ এই

উপস্থিত বিচারের উপযোগী নহে। যে অর্থ ভারতবর্ষীয়েরা বুঝেন, আমরাও সেই অর্থ বুঝাইব।

বিভিন্নদেশীয় লোক কোন দেশে রাজা হইলে একটি অত্যাচার ঘটে। যাঁহারা রাজার স্বজাতি, দেশীয় লোকাপেক্ষা তাঁহাদের প্রাধান্য ঘটে। তাহাতে প্রজা পরজাতি-পীড়িত হয়। যেখানে দেশীয় প্রজা এবং রাজার স্বজাতীয় প্রজায় এরূপ তারতম্য, সেই দেশকে পরাধীন বলিব। যে রাজ্য পরজাতিপীড়নশূন্য, তাহা স্বাধীন।

অতএব পরতন্ত্র রাজ্যকেও কখন স্বাধীন বলা যাইতে পারে। যথা—প্রথম জর্জ্জের সময়ে হানোবর, মোগলদিগের সময়ে কাবুল। পক্ষান্তরে, কখন স্বতন্ত্র রাজ্যকেও পরাধীন বলা যাইতে পারে, যথা—র্ম্মানদিগের সময়ে ইংলণ্ড, ঔরঙ্গজেবের সময়ে ভারতবর্ষ; আমরা কুতব-উদ্দীনের অধীন উত্তরভারতবর্ষকে পরতন্ত্র ও পরাধীন বলি; আক্‌বরের শাসিত ভারতবর্ষকে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন বলি।

সে যাহাই হউক, প্রাচীন ভারত স্বতন্ত্র ও স্বাধীন; আধুনিক ভারতবর্ষ পরতন্ত্র ও পরাধীন। প্রথমে স্বাতন্ত্র্য পারতন্ত্র্য জন্য যে বৈষম্য ঘটিতেছে, তাহার আলোচনা করা যাউক—পশ্চাৎ স্বাধীনতা ও পরাধীনতার কথা বিবেচনা করা যাইবে। রাজা অন্যদেশবাসী হইলে দুইটি অনিষ্টপাতের সম্ভাবনা। প্রথম, রাজা দূরে থাকিলে সুশাসনের বিঘ্ন হয়। দ্বিতীয়, রাজা যে দেশে অধিষ্ঠান করেন, সেই দেশের প্রতি তাঁহার অধিক আদর হয়, তাহার মঙ্গলার্থ দূরস্থ রাজ্যের অমঙ্গলও করিয়া থাকেন। এই দুইটি দোষ যে আধুনিক ভারতবর্ষে ঘটিতেছে না, এমন নহে। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সিংহাসন দিল্লী বা কলিকাতায় স্থাপিত হইলে ভারতবর্ষের শাসনপ্রণালী উৎকৃষ্টতর হইত, তাহার সন্দেহ নাই; কেন না, যাহা রাজার নিকটবর্ত্তী, তাহার প্রতি রাজপুরুষদিগের অধিক মনোযোগ হয়। দ্বিতীয় দোষটিও ঘটিতেছে। ইংলণ্ডের গৌরবার্থ আবিসিনিয়ার যুদ্ধ হইল, ব্যয়ের দায়ী ভারতবর্ষ। "হোমচার্জ্জেস" বলিয়া যে ব্যয় বজেটভুক্ত হয়, তাহার মধ্যে অনেকগুলিই এইরূপ ইংলণ্ডের মঙ্গলের জন্য ভারতবর্ষের ক্ষতিস্বীকার। এইরূপ অনেক আছে।

রাজা দূরস্থিত বলিয়া আধুনিক ভারতবর্ষের সুশাসনের বিঘ্ন ঘটে বটে, কিন্তু তেমন রাজা স্বেচ্ছাচারী বলিয়া সুশাসনের যে সকল বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা, তাহা ঘটে না। কোন রাজা ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র—অন্তঃপুরেই বাস করেন, রাজ্য দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইল। কোন রাজা নিষ্ঠুর, কোন রাজা অর্থগৃধ্নু। প্রাচীন ভারতবর্ষে এ সকল গুরুতর ক্ষতি জন্মিত। আধুনিক ভারতবর্ষের দূরস্থিত রাজা বা রাজ্ঞীর কোন প্রকার দোষ ঘটিলে তাহার ফল ভারতবর্ষে ফলিবার সম্ভাবনা নাই।

দ্বিতীয়, যেমন আধুনিক ভারতবর্ষে ইংলণ্ডের মঙ্গলের জন্য ভারতবর্ষের মঙ্গল কখন কখন নষ্ট হয়, তেমনি প্রাচীন ভারতে রাজার আত্মসুখের জন্য রাজ্যের মঙ্গল নষ্ট হইত। পৃথ্বীরাজ জয়চন্দ্রের কন্যা হরণ করিয়া আত্মসুখবিধান করিলেন, তাহাতে উভয়ের মধ্যে সমরাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উভয়ের অপ্রীতি ও তেজোহানি ঘটিতে লাগিল। তন্নিবন্ধন উভয়েই মুসলমানের হস্তে পতিত হইলেন। আধুনিক ভারতবর্ষে দূরবাসী রাজার আত্মসুখের অনুরোধে কোন অনিষ্টপাতের সম্ভাবনা নাই।

কিন্তু এটি কেবল পরতন্ত্রতা-সম্বন্ধে উক্ত হইল, আমরা পরাধীনতা ও পরতন্ত্রতায় প্রভেদ করিয়াছি। ভারতবর্ষে ইংরেজের প্রাধান্য এবং দেশীয় প্রজাসকল তাঁহাদিগের নিকট অবনত, তাঁহাদিগের সুখের জন্য কিয়দংশে যে ভারতবাসী-দিগের লাঘব ঘটিয়া থাকে, তাহা এ দেশীয় কোন লোকই অস্বীকার করিবেন না। এরূপ জাতির উপর জাতির প্রাধান্য প্রাচীন ভারতে ছিল না। ছিল না বটে, কিন্তু তত্তুল্য বর্ণপীড়ন ছিল। ইহা কেহই অস্বীকার করিবেন না যে, চিরকালই ভারতবর্ষের সাধারণ প্রজা শূদ্র, উৎকৃষ্ট বর্ণত্রয় শূদ্রের তুলনায় অল্পসংখ্যক ছিলেন। সেই বর্ণ-ত্রয়ের মধ্যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় দেশের শাসনকর্ত্তা। কিন্তু এ সকল কথা একটু সবিস্তারে লেখা আবশ্যক হইল।

লোকের বিশ্বাস আছে যে, প্রাচীন ভারতে কেবল ক্ষত্রিয়েরাই রাজা ছিলেন। বাস্তবিক তাহা নহে, রাজকার্য্য দুই অংশে বিভক্ত ছিল; যুদ্ধাদির ভার ক্ষত্রিয়জাতির প্রতি ছিল; রাজব্যবস্থা-নির্ব্বাচন, বিচার ইত্যাদি কার্য্যের ভার ব্রাহ্মণের উপর ছিল। এক্ষণে যেমন সিবিল ও মিলিটরি এই দুই অংশে রাজকার্য্য বিভক্ত, তখনকার কর্ম-ভাগ কতকটা সেইরূপ ছিল। ব্রাহ্মণেরা সিবিল কর্ম্মচারী, ক্ষত্রিয়েরা মিলিটরি। এখনও যেমন

মিলিটরি অপেক্ষা সিবিল কর্ম্মচারীদিগের প্রাধান্য, তখনও সেইরূপ ছিল, রাজপুরুষদিগের মধ্যে ক্ষত্রিয়েরাই রাজা নাম ধারণ করিতেন, কিন্তু কার্য্যতঃ তাঁহাদিগের উপরেও ব্রাহ্মণের প্রাধান্য ছিল; প্রাচীন ভারতে ক্ষত্রিয়েরাই সর্ব্বদা রাজা ছিলেন, এমন নহে। বোধ হয়, আদ্যকালে ক্ষত্রিয়েরাই রাজা ছিলেন; কিন্তু বৌদ্ধকালে মৌর্য্য প্রভৃতি সঙ্করজাতীয় রাজবংশ দেখা যায়। চীনপরিব্রাজক হোয়েন্থ সাঙ সিন্ধুপারে ব্রাহ্মণ রাজা দেখিয়া গিয়াছিলেন। অন্যত্রও ব্রাহ্মণেরা রাজা নাম ধারণ করিয়াছিলেন। [illegible]কালে অধিকাংশ রাজাই রাজপুত। রাজপুতেরা ক্ষত্রিয়বংশসম্ভূত সঙ্করজাতি মাত্র। ক্ষত্রিয়দিগের প্রাধান্য প্রাচীন ভারতে চিরকাল অপ্রতিহত ছিল না, ব্রাহ্মণদিগের গৌরব এক দিনের জন্য লঘু হয় নাই। বেদদ্বেষী বৌদ্ধদিগের সময়েও রাজকার্য্য ব্রাহ্মণদিগের হস্ত হইতে অন্য হস্তে যায় নাই—কেন না, তাঁহারাই পণ্ডিত, সুশিক্ষিত এবং কার্য্যক্ষম। অতএব প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণেরাই প্রকৃতরূপে রাজপুরুষ-পদবাচ্য। সুবিজ্ঞ লেখক বাবু তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বেঙ্গল ম্যাগাজিনে একটি প্রবন্ধে যথার্থই লিখিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণেরাই প্রাচীন ভারতের ইংরেজ ছিলেন।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য যে, আধুনিক ভারতবর্ষে দেশী-বিলাতীতে যে বৈষম্য, তাহা প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণ-শূদ্রের বৈষম্যের অপেক্ষা কি গুরুতর?

রাজা ভিন্নজাতীয় হইলে যে জাতিপীড়া জন্মে, তাহা দুই প্রকারে ঘটে। এক রাজব্যবস্থাজনিত আইনে বিধি থাকে যে, রাজার স্বজাতীয়গণের পক্ষে এই এইরূপ ঘটিবেক, দেশীয় লোকের পক্ষে অন্য প্রকার ঘটিবেক। দ্বিতীয়, স্বজাতি-পক্ষপাতী রাজার ইচ্ছাজনিত রাজপ্রসাদ রাজা স্বজাতিকে দিয়া থাকেন এবং তিনি স্বজাতিপক্ষপাতী বলিয়া রাজ্যের কার্য্যে স্বজাতিকেই নিযুক্ত করিয়া থাকেন। ইংরেজশাসিত ভারতে এবং ব্রাহ্মণ-শাসিত ভারতে এই দুইটি দোষ কি প্রকারে বর্ত্তমান ছিল, দেখা যাউক।

১ম। ইংরেজদিগের কৃত রাজব্যবস্থানুসারে দেশী অপরাধীর জন্য এক বিচারালয়, বিলাতী অপরাধীর জন্য অন্য বিচারালয়। দেশী লোক ইংরেজ কর্ত্তৃক দণ্ডিত হইতে পারে, কিন্তু ইংরেজ দেশী বিচারক কর্ত্তৃক দণ্ডিত হইতে পারে না। ইহা ভিন্ন ব্যবস্থাগত বৈষম্য আর বড় নাই। কিন্তু ইহা অপেক্ষা কত গুরুতর বৈষম্য ব্রাহ্মণরাজ্যে দেখা যায়। ইংরেজের জন্য পৃথক্ বিচারালয় হউক, কিন্তু আইন পৃথক্ নহে। যেমন একজন দেশীয় লোক ইংরেজকে বধ করিলে বধার্হ, ইংরেজ দেশী লোককে বধ করিলে আইন অনুসারে সেইরূপ বধার্হ। কিন্তু ব্রাহ্মণরাজ্যে শূদ্রহন্তা ব্রাহ্মণের এবং ব্রাহ্মণহন্তা শূদ্রের দণ্ডের কত বৈষম্য! কে বলিবে, এ বিষয়ে প্রাচীন ভারতবর্ষ হইতে আধুনিক ভারতবর্ষ নিকৃষ্ট?

ইংরেজের রাজ্যে যেমন ইংরেজ দেশী লোক কর্ত্তৃক দণ্ডিত হইতে পারে না, প্রাচীন ভারতেও সেইরূপ ব্রাহ্মণ শূদ্র কর্ত্তৃক দণ্ডিত হইতে পারিত না। বাবু দ্বারকানাথ মিত্র প্রধানতম বিচারালয়ে বসিয়া আধুনিক ভারতবর্ষের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন,—"রামরাজ্যে" তিনি কোথা থাকিতেন?

২য়। ইংরেজের রাজ্যে রাজপ্রসাদ প্রায় ইংরেজেরই প্রাপ্য, কিন্তু কিয়ৎপরিমাণে দেশীয়েরাও উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত। ব্রাহ্মণরাজ্যে শূদ্রদিগের তত ঘটিত কি না সন্দেহ। কিন্তু যখন শূদ্র কখন কখন রাজসিংহাসনারোহণ করিতে সক্ষম হইয়াছিল, তখন অন্যান্য উচ্চপদও যে শূদ্রেরা সময়ে সময়ে অধিকৃত করিত, তাহার সন্দেহ নাই। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, আধুনিক ভারতে প্রাথমিক বিচার-কার্য্য প্রায় দেশীয় লোকের দ্বারাই হইয়া থাকে,—প্রাচীন ভারতের কি প্রাথমিক বিচারকার্য্য শূদ্রের দ্বারা হইত? আমরা প্রাচীন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এত অল্পই জানি যে, এ কথা স্থির বলিতে পারি না। অনেক বিচারকার্য্য গ্রাম্য সমাজের দ্বারা নির্ব্বাহ হইত বোধ হয়। কিন্তু সাধারণতঃ কি বিচার, কি সৈনাপত্য, কি অন্যান্য প্রধান পদ সকল যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের হস্তে ছিল, তাহা প্রাচীন গ্রন্থাদি পাঠে বোধ হয়।

অনেকেই বলিবেন, ইংরেজের প্রাধান্য এবং ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়ের প্রাধান্যে সাদৃশ্য-কল্পনা সুকল্পনা নহে। কেন না, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় শূদ্রপীড়ক হইলেও স্বজাতি—ইংরেজেরা ভিন্ন জাতি। ইহার এইরূপ উত্তর দিতে ইচ্ছা করে যে, যে পীড়িত হয়, তাহার পক্ষে স্বজাতির পীড়ন ও ভিন্ন জাতির পীড়ন উভয়ই সমান। স্বজাতীয়ের হস্তে পীড়া কিছু মিষ্ট, পরজাতীয়ের পীড়া কিছু তিক্ত লাগে, এমত বোধ হয় না। কিন্তু আমরা সে উত্তর দিতে চাহি না। যদি স্বজাতীয়ের কৃত পীড়ায় কাহারও প্রীতি থাকে, আমাদিগের আপত্তি নাই। আমাদিগের এইমাত্র

বলিবার উদ্দেশ্য যে, আধুনিক ভারতের জাতি-প্রাধান্যের স্থানে প্রাচীন ভারতে বর্ণপ্রাধান্য ছিল, অধিকাংশ লোকের পক্ষে উভয়ই সমান।

তবে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, পরাধীন ভারতবর্ষে উচ্চশ্রেণীর লোকে স্বীয় বুদ্ধি, শিক্ষা, বংশ এবং মর্য্যাদানুসারে প্রাধান্য লাভ করিতে পারেন না। যাহার বিদ্যা এবং বুদ্ধি আছে, তাহাকে যদি বুদ্ধি-সঞ্চালনের এবং বিদ্যার ফলোৎপত্তির স্থল না দেওয়া যায়, তবে তাহার প্রতি গুরুতর অত্যাচার করা হয়, আধুনিক ভারতবর্ষে এরূপ ঘটিতেছে। প্রাচীন ভারতবর্ষে বর্ণ-বৈষম্য-গুণে তাহাও ছিল, কিন্তু এ পরিমাণে ছিল না। আর এক্ষণে রাজকার্য্যাদি সকল ইংরেজের হস্তে। আমরা পরহস্তরক্ষিত বলিয়া নিজে কোন কার্য্য করিতে পারিতেছি না। তাহাতে আমাদিগের রাজ্যরক্ষা ও রাজ্যপালনবিদ্যা শিক্ষা হইতেছে না—জাতীয় গুণের স্ফূর্ত্তি হইতেছে না। অতএব স্বীকার করিতে হইবে, পরাধীনতা এ দিকে উন্নতি-রোধক। তেমন আমরা ইউরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞানে শিক্ষা লাভ করিতেছি। ইউরোপীয় জাতির অধীন না হইলে আমাদিগের কপালে এ সুখ ঘটিত না। অতএব আমাদিগের পরাধীনতার যেমন এক দিকে ক্ষতি, তেমন আর এক দিকে উন্নতি হইতেছে।

অতএব ইহাই বুঝা যায় যে, আধুনিকাপেক্ষা প্রাচীন ভারতবর্ষে উচ্চশ্রেণীর লোকের স্বাধীনতা-জনিত কিছু সুখ ছিল। কিন্তু অধিকাংশ লোকের পক্ষে প্রায় দুই তুল্য, বরং আধুনিক ভারতবর্ষ ভাল।

তুলনায় আমরা যাহা পাইলাম, তাহা সংক্ষেপে পুনরুক্তি করিতেছি, অনেকের বুঝিবার সুবিধা হইবে।

১। ভিন্নজাতীয় রাজা হইলেই রাজ্য পরতন্ত্র বা পরাধীন হইল না।

ভিন্নজাতীয় রাজার অধীন রাজ্যকে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন বলা যাইতে পারে।

২। স্বতন্ত্রতা, স্বাধীনতা, পরতন্ত্রতা ও পরাধীনতা—ইহার আমরা ভিন্ন ভিন্ন পারিভাষিক অর্থ নির্দ্দেশ করিয়াছি।

বিদেশনিবাসী রাজশাসিত রাজ্য পরতন্ত্র। যেখানে ভিন্নজাতির প্রাধান্য, সেই রাজ্য পরাধীন। অতএব কোন রাজ্য পরতন্ত্র অথচ পরাধীন নহে। কোন রাজ্য স্বতন্ত্র অথচ স্বাধীন নহে। কোন রাজ্য পরতন্ত্র এবং পরাধীন।

৩। কিন্তু তুলনায় উদ্দেশ্য উৎকর্ষাপকর্ষ। যে রাজ্যে লোক সুখী, তাহাই উৎকৃষ্ট, যে রাজ্যে লোক দুঃখী, তাহাই অপকৃষ্ট। স্বাতন্ত্র্যে ও পরাধীনতায় আধুনিক ভারতে প্রজা কি পরিমাণে দুঃখী, তাহাই বিবেচ্য।

৪। প্রথমতঃ স্বাতন্ত্র্য, পারতন্ত্র্য ইহার অন্তর্গত দুইটি তত্ত্ব। প্রথম, রাজা বিদেশস্থিত বলিয়া ভারতবর্ষের সুশাসনের বিঘ্ন হইতেছে কি না? স্বদেশের মঙ্গলার্থ শাসনকর্ত্তৃগণ এ দেশের অমঙ্গল ঘটাইয়া থাকেন কিনা? স্বীকার করিতে হইবে যে, তত্তৎকারণে সুশাসনের বিঘ্ন ঘটিতেছে বটে এবং ভারতবর্ষে অমঙ্গল ঘটিতেছে বটে।

কিন্তু রাজার চরিত্রদোষে যে সকল অনিষ্ট ঘটিত, আধুনিক ভারতবর্ষে তাহা ঘটে না। অতএব প্রাচীন বা আধুনিক ভারতবর্ষে এ সম্বন্ধে বিশেষ তারতম্য লক্ষিত হয় না।

৫। দ্বিতীয়তঃ স্বাধীনতা ও পরাধীনতা। আধুনিক ভারতবর্ষ প্রভুগণপীড়িত বটে, কিন্তু প্রাচীন ভারতবর্ষও ব্রাহ্মণপীড়িত ছিল। সে বিষয়ে বড় ইতর-বিশেষ নাই। তবে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের একটু সুখ ছিল।

৬ আধুনিক ভারতে জাতীয় শিক্ষা লোপ হইতেছে, কিন্তু বিজ্ঞান ও সাহিত্যচর্চ্চার অপূর্ব্ব স্ফূর্ত্তি হইতেছে।

অনেকে রাগ করিয়া বলিবেন, তবে কি স্বাধীনতা পরাধীনতা তুল্য? তবে পৃথিবীতে তাবজ্জাতি স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণ করে কেন? যাঁহারা এরূপ বলিবেন, তাঁহাদের নিকট আমাদের এই নিবেদন যে, আমরা সে তত্ত্বের মীমাংসায় প্রবৃত্ত নহি। আমরা পরাধীন জাতি—অনেক কাল পরাধীন থাকিব—সে মীমাংসায় আমাদের প্রয়োজন নাই। আমাদের কেবল ইহাই উদ্দেশ্য যে, প্রাচীন ভারতবর্ষের স্বাধীনতায় হেতু তন্নিবাসিগণ সাধারণতঃ আধুনিক ভারতীয় প্রজাদিগের অপেক্ষা সুখী ছিল কি না? আমরা এই মীমাংসা করিয়াছি যে, আধুনিক ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় অর্থাৎ উচ্চশ্রেণীর লোকের অবনতি ঘটিয়াছে, শূদ্র অর্থাৎ সাধারণ প্রজার একটু উন্নতি ঘটিয়াছে।

প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজনীতি

নারদ-বাক্য

মহাভারতের সভাপর্ব্বে দেবর্ষি নারদ যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্নচ্ছলে কতকগুলি রাজনৈতিক উপদেশ দিয়াছেন। প্রাচীন ভারতে রাজনীতি কতদূর উন্নতি প্রাপ্ত হইয়াছিল, উহা তাহার পরিচয়। মুসলমানদিগের অপেক্ষা হিন্দুরা যে রাজনীতিতে বিজ্ঞতর ছিলেন, উহা পাঠ করিলে সংশয় থাকে না। প্রাচীন রোমক এবং আধুনিক ইউরোপীয়গণ ভিন্ন আর কোন জাতি তাদৃশ উন্নতিলাভ করিতে পারেন নাই। ভারতবর্ষীয় রাজারা যে অন্যান্য সকল জাতির অপেক্ষা অধিককাল আপনাদিগের গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন, এই রাজনীতিজ্ঞতা তাহার এক কারণ। হিন্দুদিগের ইতিবৃত্ত নাই, এক একটি শাসনকর্ত্তার গুণগান করিয়া শত শত পৃষ্ঠা লিখিবার উপায় নাই। কিন্তু তাহাদিগের কৃতকার্য্যের যে কিছু পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতেই অনেক কথা বলা যাইতে পারে। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের সহিত পৃথিবীর যে কোন রাজপুরুষের তুলনা করা যায়। চন্দ্রগুপ্ত আলেক্জণ্ডরের বিজিত ভারতাংশের পুনরুদ্ধার করিয়া তক্ষশিলা হইতে তাম্রলিপ্ত পর্য্যন্ত সাম্রাজ্য সংস্থাপন করিয়া মহতী কীর্ত্তি স্থাপিত করিয়াছিলেন। ভুবনবিখ্যাত যবনরাজাধিরাজ সিলিউকসকে লাঘব স্বীকার করাইয়া তাঁহার কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। (হিন্দু হইয়া ঠিক বিবাহ করিয়াছিলেন, এমনও বোধ হয় না)। ইতিহাসে তিনজন সাম্রাজ্য-নির্ম্মাতা বিশেষ পরিচিত—শালমান, দ্বিতীয় ফ্রেডরিক, প্রথম পিটর। আলেক্জণ্ডর, নেপোলিয়ন, বা ক্রম্বেল সে শ্রেণীমধ্যে আসন পান নাই। কেন না, তাঁহাদিগের কীর্ত্তি তাঁহাদের মৃত্যু পর্য্যন্ত স্থায়ী বা তাহাও নহে। গজনবী মহম্মদের প্রায় সেইরূপ। আরবসাম্রাজ্য ও মোগলসাম্রাজ্য এক এক জনের নির্ম্মিত নহে। কিন্তু মগধসাম্রাজ্য একা চন্দ্রগুপ্তের নির্ম্মিত এবং পুরুষানুক্রমে স্থায়ী বটে। তিনি শালমান, ফ্রেডেরিক ও পিটরের সঙ্গে উচ্চাসনে বসিতে পারেন।

নারদের যে উপদেশ-বাক্যের কথার উল্লেখ করিয়াছি, তাহাতে এমত তত্ত্ব অনেক আছে যে, রাজনীতি-বিশারদ ইংরেজেরও তাহা গ্রহণ করিয়া তদনুসারে চলিলে, তাঁহাদিগের উপকার হয়। এমত কদাচ বক্তব্য নহে যে, হিন্দুরা এই সকল নৈতিক উক্তির অনুসারী হইয়া সর্ব্বত্র সর্ব্বপ্রকারে চলিতেন। কিন্তু ঈদৃশ নৈতিক তত্ত্ব যে তাঁহাদ্বারা উদ্ভূত হইয়াছিল, ইহা অল্প প্রশংসার কথা নহে। যেখানে উদ্ভূত হইয়াছিল, সেখানে কিয়দংশ কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে সংশয় করা অন্যায়।

প্রাচীন ভারতবর্ষে রাজনীতির কতদূর উন্নতি হইয়াছিল, তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলে ক্ষতি নাই। এ জন্য আমরা নারদবাক্য হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিব। এ কথা পাঠকেরা অনেকেই পড়িয়াছেন, তথাপি উহার পুনঃপাঠে কষ্ট বোধ হইবে, এমন বিবেচনা হয় না।

নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ! কৃষি, বাণিজ্য, দুর্গসংস্কার, সেতু-নির্ম্মাণ, অশ্বিবার-প্রবণ, পৌরকার্য্যদর্শন ও জনপদ-পর্য্যবেক্ষণ প্রভৃতি অষ্টবিধ রাজকার্য্য ত সম্যক্ প্রকারে সম্পাদিত হয়? নিঃশঙ্কচিত্ত কপট দূতগণ ত আপনার অমাত্যদিগের গূঢ়মন্ত্রণা সকল ভেদ করিতে পারে না? মিত্র, উদাসীন ও শত্রুদিগের অভিসন্ধি সমস্ত আপনি ত বুঝিয়া থাকেন? যথাকালে সন্ধিস্থাপনে ও বিগ্রহ-বিধানে প্রবৃত্ত হয়েন? উদাসীন ও মধ্যমের প্রতি ত মধ্যস্থভাব অবলম্বন করিয়া থাকেন? আত্মানুরূপ, বৃদ্ধ, বিশুদ্ধভাব, সম্বোধনক্ষম, সৎকুলজাত, অনুরক্ত ব্যক্তিগণ মন্ত্রিপদে ত অভিষিক্ত হইয়া থাকেন?"

সর জর্জ্জ কাম্বেল সাহেব "আত্মানুরূপ" ব্যক্তিকে স্বীয় মন্ত্রিত্বে বরণ করিয়াছেন বলিয়া দেশের লোক তাঁহার উপর রাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি বলিতে পারিতেন যে, নারদবাক্য আমার পক্ষে। আধুনিক ভারতীয় শাসনকর্ত্তাদিগের দুরদৃষ্ট এই যে, বৃদ্ধ মন্ত্রী তাঁহাদিগের কালে প্রায় ঘটে না; কিন্তু ইউরোপে নারদীয় বাক্য প্রতিপালিত হইয়া থাকে—বিস্মার্ক, গ্লাডষ্টোন, ডিস্রেলি, টিয়ার প্রভৃতি উদাহরণ। পরে—

"একাকী বা বহুজনাবৃত হইয়া ত মন্ত্রণা করেন না? মন্ত্র ত জনপদমধ্যে অপ্রচলিত থাকে?"

ইংরেজেরা এই নীতির বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করেন, কেবল অতিরিক্ত এই বলেন যে, "মন্ত্রণা-বিশেষ জনপদমধ্যে প্রচার হওয়াই ভাল। অতএব সেইগুলি বাছিয়া বাছিয়া গেজেটে ছাপাই।" পরে—

"অল্পায়াসসাধ্য মহোদয় বিষয় সকল ত শীঘ্রই সম্পন্ন করিয়া থাকেন?"

আমাদিগের অনুরোধ যে, প্রাচীন ঋষির এই বাক্য ইংরেজেরা স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ করিয়া কার্য্যালয়ে প্রকটিত করুন। তৎপরে—

"কুশীবলেরা আপনার পরোক্ষে প্রকৃত ব্যবহার করিয়া থাকে? কারণ, প্রভুর প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ না থাকিলে এরূপ হওয়া নিতান্ত অসম্ভব সন্দেহ নাই।"

বিলাতী শাসনকর্ত্তা কিংবা তাঁহাদিগের দেশী সমালোচক কেহই অদ্যাপি এ কথার সারবত্তা অনুভূত করিতে সক্ষম হইলেন না। তৎপরে—

"অনারব্ধ কার্য্যের পরীক্ষার্থ ধর্মজ্ঞ শাস্ত্রকোবিদ বিচক্ষণ পরীক্ষক সকল ত নিযুক্ত করিয়া থাকেন?"

ইংরেজেরা এই কথার সম্যক্ প্রকারে অনুবর্ত্তী। সকল কার্য্যের পূর্ব্বেই কমিটি নিযুক্ত হইয়া থাকে। সকল কার্য্য করিবার পূর্ব্বে ইংরেজেরা এক একটা কমিটী নিযুক্ত করেন কেন? এ কথা যিনি জিজ্ঞাসা করিবেন, তাঁহাকে দেয় উত্তর উল্লিখিত নারদবাক্যে আছে।

তার পর—

"সহস্র মূর্খ-বিনিময় দ্বারা একজন পণ্ডিতকে ত ক্রয় করিয়া থাকেন?"

আমরা এই কথাটির অনুমোদন করি না। মূর্খের দ্বারাই পৃথিবীর কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে—পণ্ডিত কোন্ কাজে লাগে? মিল পার্লামেণ্টে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না,—ওয়েষ্টমিনষ্টর কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলেন। লাপ্লাসকে বোনাপার্ট পণ্ডিত দেখিয়া উচ্চপদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন,—কিন্তু লাপ্লাস কার্য্যসম্পাদনে অক্ষম হইয়া দূরীভূত হইলেন। প্রবাদ আছে, একজন ভট্টাচার্য্য বন্ধ্যা ভার্য্যার বিনিময়ে দুগ্ধবতী গো লইয়া আসিয়াছিল। এইরূপ রাজপুরুষেরা অপ্রিয়বাদী, আত্মমতভক্ত পণ্ডিতের বিনিময়ে আজ্ঞাকারী মূর্খই গ্রহণ করিয়া থাকেন। নারদ বলিয়াছেন বটে যে, "কোন প্রকার বিপদ্ উপস্থিত হইলে পণ্ডিত ব্যক্তি অনায়াসে তাহার প্রতিবিধান করিতে সমর্থ হয়েন।" এ কথা সত্য বটে, অতএব বিপৎকালে পণ্ডিতের আশ্রয় লইবে। সুখের দিনে মূর্খ,—দুঃখের দিনে পণ্ডিত।

পরে নারদ বলিতেছেন, "দুর্গ সকল ত ধনধান্য উদকযন্ত্রে পরিপূর্ণ রাখিয়াছেন? তথায় শিল্পিগণ ও ধনুর্দ্ধর পুরুষ সকল ত সর্ব্বদা সতর্কতাপূর্ব্বক কালযাপন করেন?"

মিউটিনির পূর্ব্বে ইংরেজেরা যদি এই কথা স্মরণ রাখিতেন, তবে তাদৃশ বিপদ্ ঘটিত না। সার হেনরি লরেন্স এই কথা বুঝিতেন বলিয়া লক্ষ্ণৌর রেসিডেন্সির রক্ষা হইয়াছিল।

"প্রচণ্ড দণ্ডবিধান দ্বারা প্রজাদিগকে ত অত্যন্ত উত্তেজিত করেন না?"

ইউরোপীয়েরা অল্পকাল হইল, এ কথা শিখিয়াছেন; এক পয়সা চুরির জন্য প্রাণদণ্ড প্রভৃতি প্রচণ্ড দণ্ড অতি অল্পকাল হইল, ইংলণ্ড হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে।

"নির্দ্দিষ্ট সময়ে সেনাদিগের বেতনাদিপ্রদানে ত বিমুখ হয়েন না? তাহা হইলে সুচারুরূপে কার্য্যনির্ব্বাহ হওয়া দূরে থাকুক, প্রত্যুত তাহাদিগের দ্বারা পদে পদে অনিষ্টঘটনা ও বিদ্রোহের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা হইয়া উঠে।"

এই নীতির বিপরীতাচরণ কার্থেজ রাজ্য লোপের মূল। একা রোম কার্থেজ ধ্বংস করে নাই।

"সৎ-কুলজাত প্রধান প্রধান লোক ত আপনার প্রতি অনুরক্ত রহিয়াছে? তাহারা ত আপনার নিমিত্ত রণক্ষেত্রে প্রাণপরিত্যাগ করিতেও সম্মত আছে?"

এই নীতির অবজ্ঞায় ষ্টুয়ার্টবংশ নষ্ট হয়েন। ভারতবর্ষীয় ইংরেজ রাজপুরুষেরা ইহা বিলক্ষণ বুঝেন। বুঝিয়া কর্ণওয়ালিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়াছেন ও ক্যানিং ভারতীয় রাজগণকে পোষ্যপুত্র লইতে অনুমতি দিয়াছেন। লর্ড লিটন আর কিছু করিতে না পারিয়া উপাধি বিতরণ করিয়াছেন।

পরে, নারদ পেন্‌সন দেওয়ার পরামর্শ দিয়াছেন—

"মহারাজ! যাহারা কেবল আপনার উপকারের নিমিত্ত কালকবলে নিপতিত ও যৎপরোনাস্তি দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে, তাহাদিগের পুত্রকলত্র প্রভৃতিকে ত ভরণপোষণ করিতেছেন?"

ক্ষিপ্রকারিতার বিষয়ে—

"শত্রুকে ব্যসনাসক্ত দেখিয়া স্বীয় মন্ত্র, কোষ, ভৃত্য, ত্রিবিধ বল সম্যক্ বিবেচনা করিয়া, অবিলম্বে তাহাকে ত আক্রমণ করেন?"

অতি প্রধান রাজ্যাধ্যক্ষেরা এ তত্ত্ব সম্যক্ বুঝিয়াছিলেন। অবিলম্বে কাহাকে বলে প্রথম নেপোলিয়ান বুঝিতেন। তাঁহার রণজয় সেই বুদ্ধির ফল। তৃতীয় নেপোলিয়ান "অবিলম্বে" প্রুসীয়-

দিগকে আক্রমণ করিতে গিয়াছিলেন বটে, কিন্তু প্রথম নেপোলিয়ানের মত মন্ত্র, কোষ ও ভৃত্য ত্রিবিধ বলের সম্যক্ বিচার না করিয়াই আক্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি নারদবাক্য অবহেলা করিয়া নষ্ট হইলেন।

পরে সমদৃষ্টিপক্ষে—

"যেমন পিতা-মাতা সকল সন্তানকে সমান স্নেহ করেন, তদ্রূপ আপনিও ত সমদৃষ্টিতে সমুদ্রমেখলা সমুদয় পৃথিবী অবলোকন করিতেছেন?"

ইংরেজরা ভারতবর্ষে এই নারদীয় বাক্য মনোযোগপূর্ব্বক অধ্যয়ন করুন। নিম্নলিখিত কথাটি বুস্মার্কের যোগ্য।

"সৈন্যদিগের ব্যবসায় ও জয়লাভ-সামর্থ্য বুঝিয়া তাহাদিগকে ত অগ্রিম বেতন প্রদানপূর্ব্বক উপযুক্ত সময়ে যাত্রা করিয়া থাকেন?"

নিম্নলিখিত কথাটির আমরা অনুমোদন করি না। কিন্তু চতুর্দ্দশ লুই শুনিলে অনুমোদন করিতেন,—

"পরস্পরের ভেদ উপস্থিত করিবার নিমিত্ত শত্রুপক্ষীয় প্রধান প্রধান সৈন্যদিগকে ত যথাযোগ্য ধনদান করেন?"

নিম্নলিখিত কথাগুলি গ্রেগরী বা ইয়েগুস লয়লার যোগ্য—

"স্বয়ং জিতেন্দ্রিয় হইয়া আত্মপরাজয়পূর্ব্বক ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র প্রমত্ত বিপক্ষদিগকে ত পরাজয় করিতেছেন?"

পরে—"বিপক্ষের রাজ্য আক্রমণকালে আপন অধিকার ত দৃঢ়রূপে সুরক্ষিত করেন?"

পৃথিবীতে যত সৈনিক জন্মিয়াছেন, তন্মধ্যে হানিবল একজন অত্যুৎকৃষ্ট। কিন্তু তিনি এই কথা বিস্মৃত হওয়াতে সব হারাইয়াছিলেন। তিনি যখন ইতালিতে অনিবার্য্য, সিপিও তখন আফ্রিকাতে সৈন্য লইয়া গিয়া তাঁহার কৃত রণজয় সকল বিফল করিয়াছিলেন।

"এবং তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া পুনর্ব্বার স্ব স্ব পদে ত প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকেন?"

রোমকেরা ইহা করিতেন এবং ভারতবর্ষে ইংরেজেরা ইহা করেন, এই জন্য এতদুভয় সাম্রাজ্য ঈদৃশ বিস্তার লাভ করিয়াছে।

নিম্নলিখিত তিনটি বাক্যে সমুদয় রাজকার্য্য নিঃশেষে বর্ণিত হইয়াছে।

"আপনি ত আভ্যন্তরিক ও বাহ্য জনগণ হইতে আপনাকে, আত্মীয়লোক হইতে তাহাদিগকে এবং পরস্পর হইতে পরস্পরকে রক্ষা করিয়া থাকেন?"

তাহার পর বজেট ও এষ্টিমেটের কথা—

"আয়ব্যয়-নিযুক্ত গণক ও লেখকবর্গ আপনার আয়সকল পূর্ব্বাহ্নে ত নিরূপণ করিতেছেন?"

আমরা জানিতাম, এটি ভারতবর্ষে উইলসন সাহেবের সৃষ্টি; কিন্তু তাহা নহে।

পরে—

"রাজ্যস্থ কৃষকেরা ত সন্তুষ্টচিত্তে কালযাপন করিতেছে?"

এই কথা নারদ যেমন যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমরা তেমনি ভারতবর্ষীয়ের রাজপ্রতিনিধিকে জিজ্ঞাসা করি।

অনেকের বোধ আছে, "ইরিগেশন ডিপার্টমেণ্টটি" ভারতবর্ষে একটি নূতন কাণ্ড দেখাইতেছে। তাহা নহে। নারদ বলিতেছেন,—

"রাজ্যমধ্যে স্থানে স্থানে সলিলপূর্ণ বৃহৎ তড়াগ ও সরোবর সকল ত নিখাত হইয়াছে? কৃষিকার্য্য ত বৃষ্টিনিরপেক্ষ হইয়া সম্পন্ন হইতেছে?"

এ কথা ইংরেজদিগের মনে থাকিলে উড়িষ্যাদিতে দুর্ভিক্ষ ঘটিত না।

নিম্নলিখিত বাক্যটির প্রতি বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট মনোযোগ করিলে আমাদিগের বিবেচনায় ভাল হয়।

"কৃষকদিগের গৃহে বীজ ও অন্নাদির ত অসদ্ভাব নাই? আবশ্যক হইলে ত পাদিক বৃদ্ধিতে অনুগ্রহস্বরূপ শতসংখ্যক ঋণদান করিয়া থাকেন?"

এক্ষণে এই নিয়মের অভাবে এ দেশের কৃষকেরা মহাজনের নিকট বিক্রীত। মহাজনের নিকটও সকলে সকল সময়ে পায় না। অনেকেই অন্নাভাবে শীর্ণ, বীজাভাবে ভরসাশূন্য। যে পায়,—সেও দ্বিপাদ বৃদ্ধিতে, নহিলে পায় না। অনেকে বলিবেন যে; যে অর্থশাস্ত্র অনবগত, সে-ই রাজাকে মহাজনী করিতে পরামর্শ দিবে—রাজার ব্যবসায় সমাজের অনিষ্টকারক। অর্থশাস্ত্রঘটিত যে আপত্তি, তাহা আমরা অবগত এবং মহাভারতকারও অবগত ছিলেন। এই জন্যই নারদের ঐ বাক্যমধ্যে তিনটি গুরুতর নিয়ম সন্নিবিষ্ট আছে: প্রথম—"আবশ্যক হইলে" ঋণ দিতে বলিতেছেন—ইহার অর্থ যে যাহাকে না দিলে চলে না, তাহাকেই দিবেন। অতএব যে মহাজনের নিকট ঋণ পাইতে পারিবে, তাহাকে ঋণ দেওয়া এই কথায় প্রতিষিদ্ধ হইল। সুতরাং রাজা ব্যবসায়ী হইলেন না। যাহাকে রাজা

না দিলে সে দুর্দশাগ্রস্ত হইবে, তাহাকেই দিবেন। দ্বিতীয়তঃ "অনুগ্রহস্বরূপ" দিবেন—অর্থাৎ ব্যবসায়ীর ন্যায় লাভাকাঙ্ক্ষায় দিবেন না। তবে পাদিক বৃদ্ধির কথা কেন? এ নিয়ম না করিলে যে সে নিষ্প্রয়োজনেও ঋণ লইবার সম্ভাবনা—বঞ্চক জাতি সর্ব্বত্রই আছে। আর ঋণ দিলেই কতক আদায় হয়, কতক আদায় হয় না। যদি বৃদ্ধির নিয়ম না থাকে, তবে রাজাকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। ক্ষতি স্বীকার করিয়া রাজকোষ হইতে ঋণ দিতে হইলে রাজ্য চলা ভার। তৃতীয়তঃ, "শতসংখ্যক ঋণ দিবে—ইহার ঊর্দ্ধ দিবে না!" অর্থাৎ প্রজার জীবননির্ব্বাহার্থে যে পর্য্যন্ত প্রয়োজন, তাহাই রাজা ঋণস্বরূপ দিতে পারেন। ততোধিক ঋণদান ব্যবসায়ীর কাজ। এই তিনটি নিয়মের দ্বারা অর্থশাস্ত্রবেত্তাদিগের আপত্তির মীমাংসা হইতেছে। প্রাচীন হিন্দুরা অর্থশাস্ত্র বিলক্ষণ বুঝিতেন।

নিম্নোদ্ধৃত নীতি ইংরেজেরা এ পর্য্যন্ত শিখিলেন না। না শিখাতে তাঁহাদিগের ক্ষতি হইতেছে।—

"হে মহারাজ! যথাকালে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক বেশ-ভূষা সমাধান করিয়া, কালজ্ঞ মন্ত্রিগণে পরিবৃত হইয়া দর্শনার্থী প্রজাগণকে ত দর্শন প্রদান করেন?"

যে রাজাকে প্রজাগণ কখন দেখিতে পায় না—তাঁহার প্রতি প্রজাদিগের অনুরাগসঞ্চার হয় না; বিশেষতঃ, এ দেশের লোকের স্বভাব এই। আর রাজদর্শন প্রজাদিগের দুর্লভ হইলে, তাহাদের সকল প্রকার দুঃখ ও প্রকৃত অবস্থা রাজা বা রাজপুরুষেরা কখন কখন জানিতে পারেন না।

হিন্দু জাতিদিগের ন্যায় মুসলমানেরাও এ কথা বুঝিতেন। এখন যেখানে সংবৎসরে একটা দরবার বা "লেবী" হয়, সেখানে হিন্দু ও মুসলমানদিগের প্রাত্যহিক দরবার হইত।

পরে—

"দুর্ব্বল শত্রুকে ত বলপূর্ব্বক সাতিশয় পীড়িত করেন না?"

তাহা হইলে দুর্ব্বল শত্রুও বলবান্ হইয়া উঠে। এই দোষে স্পেনের দ্বিতীয় ফিলিপ "নিম্নদেশ" অর্থাৎ হল্যাণ্ড হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন। ইংলণ্ডও আমেরিকা উপনিবেশ হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন, তাহারও কারণ প্রায় একরূপ।

তৎপরে—

"দুষ্ট অহিতকারী কদর্য্য-স্বভাব দণ্ডার্হ তস্কর লোপ্ত সহ গৃহীত হইয়াও তাহাদিগের নিকটে ত ক্ষমা লাভ করিয়া থাকে না?"

যে দেশে জুরির বিচার আছে, সে দেশের রাজপুরুষদিগকে আমরাও এ কথা জিজ্ঞাসা করি।

নারদ যে চতুর্দ্দশ রাজদোষ কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহাও শ্রবণযোগ্য, যথা,—

"নাস্তিক্য, অনৃত, ক্রোধ, প্রমাদ, দীর্ঘসূত্রতা, জ্ঞানবান্ ব্যক্তিদিগের সাক্ষাৎকারত্যাগ, আলস্য, চিত্তচাপল্য, নিরন্তর অর্থচিন্তা, অনর্থক ব্যক্তির সহিত পরামর্শ, নিশ্চিত বিষয়ের অনারম্ভ, মন্ত্রণার অপরিরক্ষণ, মঙ্গলকার্য্যের অপ্রয়োগ ও প্রত্যুত্থান, এই চতুর্দ্দশ রাজদোষ।"

আর একটি বাক্যমাত্র উদ্ধৃত করিয়া আমরা নিরস্ত হইব—

"অন্ধ, মূক, পঙ্গু, বিকলাঙ্গ, বুদ্ধিহীন, প্রব্রজিত ব্যক্তিদিগকে ত পিতার ন্যায় প্রতিপালন করেন?"

এই প্রকার সারবান্ এবং এ কালের আদরণীয় কথা আরও অনেক আছে।

প্রাচীনা ও নবীনা

আমাদিগের সমাজসংস্কারকেরা নূতন কীর্ত্তিস্থাপনে যাদৃশ ব্যগ্র, সমাজের গতি পর্য্যবেক্ষণায় তাদৃশ মনোযোগী নহেন। "এই হইলে ভাল হয়, অতএব এই কর" ইহাই তাঁহাদিগের উক্তি, কিন্তু কি করিতে কি হইতেছে, তাহা কেহ দেখেন না। বাঙ্গালীরা যে ইংরেজি শিখে, ইহাতে সকলেরই উৎসাহ। কিন্তু ইহার ফল কি, তাহার সমালোচনা কেবল আজিকালি হইয়াছে। এক শ্রেণীর লোক বলেন, ইহার ফল মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দ্বারকানাথ মিত্র প্রভৃতি। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক বলেন, দুই একটি ফল সুপক্ক এবং সুমধুর বটে, কিন্তু অধিকাংশ তিক্ত ও বিষময়—উদাহরণ মাতালের দল এবং সাধারণ বাঙ্গালী লেখকের পাল। আবার দিনকত ধুম পড়িল, স্ত্রীলোকদিগের অবস্থা সংস্কার কর, স্ত্রীশিক্ষা দাও, বিধবা-বিবাহ দাও, স্ত্রীলোককে গৃহপিঞ্জর হইতে বাহির করিয়া উড়াইয়া দাও, বহুবিবাহ নিবারণ কর এবং অন্যান্য প্রকারে পাঁচী, রামী, মাধীকে বিলাতী মেম করিয়া তুল। ইহা করিতে পারিলে যে ভাল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু পাঁচী যদি কখন বিলাতী মেম হইতে

পারে, তবে আমাদিগের শালতরুও একদিন ওক-বৃক্ষে পরিণত হইবে, এমন ভরসা করা যাইতে পারে। যে রীতিগুলির চলন আপাততঃ অসম্ভব, সেগুলি চলিত হইল না। স্ত্রীশিক্ষা সম্ভব, এ জন্য তাহা এক প্রকার প্রচলিত হইয়া উঠিতেছে। পুস্তক হইতে এক্ষণে বাঙ্গালী স্ত্রীগণ যে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, তাহা অতি সামান্য। পরিবর্ত্তনশীল সমাজে অবস্থিতির জন্য অর্থাৎ শিক্ষিত এবং ইংরেজের অনুকরণকারী পিতা, ভ্রাতা, স্বামী প্রভৃতির সংসর্গে থাকায় তাহারা যে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, তাহা প্রবলতর। এই দ্বিবিধ শিক্ষার ফল কিরূপ দাঁড়াইতেছে? বাঙ্গালী যুবকের বাঙ্গালী চরিত্রে যেরূপ পরিবর্ত্তন দেখা যাইতেছে, যুবতীগণের চরিত্রের সেরূপ লক্ষণ কিছু দেখা যাইতেছে কি না? যদি দেখা যাইতেছে, সেগুলি ভাল না মন্দ? তাহার উৎসাহদান বিধেয়, না তাহা দমন আবশ্যক? এ সকল প্রশ্ন সাধারণ লেখকদিগকে আলোচনা করিতে আমরা প্রায় দেখিতে পাই না, অথচ, ইহার অপেক্ষা গুরুতর সামাজিক তত্ত্বও আর নাই। তাই বলিতেছিলাম যে, আমাদিগের সমাজ-সংস্কারকেরা নূতন কীর্ত্তি-স্থাপনে যাদৃশ ব্যগ্র, সমাজের বর্ত্তমান গতির আলোচনায় তাদৃশ মনোযোগী নহেন।

বিষয়টি অতি গুরুতর। সমাজের স্ত্রীজাতির যে বল, তাহা বর্ণিত করিবার প্রয়োজন নাই। মাতা বাল্যকালের শিক্ষাদাত্রী, স্ত্রী বয়ঃপ্রাপ্তের মন্ত্রী ইত্যাদি প্রাচীন কথা পুনরুক্ত করিবার প্রয়োজন নাই। সকলেই জানেন, স্ত্রীলোকের সম্মতি এবং সাহায্য ব্যতীত সংসারের কোন গুরুতর কার্য্য সম্পন্ন হয় না; গহনা গড়ান ও গোরু কেনা হইতে ফরাসিস্ রাজবিপ্লব এবং লুথরের ধর্ম্মবিপ্লব পর্য্যন্ত সকলই স্ত্রীসাহায্যসাপেক্ষ। ফরাসিস্ স্ত্রীগণ ফরাসিস্ রাজ্যবিপ্লবে মহারথী ছিলেন। জানবলীন হইতে ইংলণ্ড প্রটেষ্টাণ্টে—

…Gospel light first dawned
From Bullen's eyes…

ইহা বলা যাইতে পারে যে, আমাদের শুভাশুভের মূল আমাদের কর্ম্ম. কর্ম্মের মূল প্রবৃত্তি এবং অনেক স্থানে আমাদের প্রবৃত্তি সকলের মূল আমাদের গৃহিণীগণ। অতএব স্ত্রীজাতি আমাদের শুভাশুভের মূল। স্ত্রীজাতির মহত্ত্বকীর্ত্তনকালে এই সকল কথা বলা প্রাচীন প্রথা আছে। এ জন্য আমরাও এ কথা বলিলাম; কিন্তু এ কথাগুলি যাঁহারা ব্যবহার করেন, তাঁহাদিগের আন্তরিক ভাব এই যে, পুরুষই মনুষ্যজাতি; যাহা পুরুষের পক্ষে শুভাশুভের বিধান করিতে সমর্থ, তাহাই গুরুতর বিষয়। স্ত্রীগণ পুরুষের শুভাশুভ বিধায়িনী বলিয়াই তাঁহাদিগের উন্নতি বা অবনতির বিষয় গুরুতর বিষয়, বাস্তবিক আমরা সেরূপ কথা বলি না। আমাদিগের প্রধান কথা এই যে, স্ত্রীগণ সংখ্যায় পুরুষগণের তুল্য, বা অধিক; তাঁহারা সমাজের অর্দ্ধাংশ। তাঁহারা পুরুষগণের শুভাশুভ-বিধায়িনী হউন বা না হউন, তাঁহাদিগের উন্নতিতে সমাজের উন্নতি, যেমন পুরুষদিগের উন্নতিতে সমাজের উন্নতি, ঠিক সেই পরিমাণে স্ত্রীজাতির উন্নতিতে সমাজের উন্নতি; কেন না, স্ত্রীজাতি সমাজের অর্দ্ধেক ভাগ। স্ত্রী-পুরুষের সমান ভাগের সমষ্টিকে সমাজ বলে; উভয়ের সমান উন্নতিতে সমাজের উন্নতি। এক ভাগের উন্নতি সমাজ-সংস্করণের মুখ্য উদ্দেশ্য, তাহার উন্নতি-সহায় বলিয়াই অন্য ভাগের উন্নতি গৌণ উদ্দেশ্য। এ কথা নীতিবিরুদ্ধ।

কিন্তু সমাজের নিয়ন্তৃবর্গ সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে এই ভ্রমে পতিত। তাঁহারা বিধান করেন যে, স্ত্রীলোকেরা এইরূপ এইরূপ আচরণ করিবে—কেন করিবে? উত্তর, তাহা হইলে পুরুষের অমুক মঙ্গল ঘটিবে বা অমুক অমঙ্গল নিবারিত হইবে। সমাজবিধাতৃদিগের সর্ব্বত্র এইরূপ উক্তি; কোথাও এ উদ্দেশ্য স্পষ্ট, কোথাও অস্পষ্ট, কিন্তু সর্ব্বত্রই বিদ্যমান। এই জন্যই সর্ব্বত্র স্ত্রীজাতির সতীত্বের জন্য এত পীড়াপীড়ি, পুরুষের সেই ধর্ম্মের অভাব, কোথাও তত বড় গুরুতর দোষ বলিয়া গণনীয় নহে। বাস্তবিক নীতিশাস্ত্রের স্বাভাবিক মূল ধরিতে গেলে এমত কোন বিষয়ই পাওয়া যায় না, যদ্দ্বারা স্ত্রীকৃত ব্যভিচার পুরুষকৃত পরদারগ্রহণ অপেক্ষা গুরুতর দোষ বিবেচনা করা যায়। পাপ দুই-ই সমান; একপুরুষভাগিনী স্ত্রীতে পুরুষের যে স্বাভাবিক অধিকার, একস্ত্রীভাগী পুরুষে স্ত্রী-লোকের ঠিক সেই-ই স্বাভাবিক অধিকার, কিছুমাত্র নূতন নহে। তথাপি পুরুষেরা এ নিয়ম লঙ্ঘন করিলে তাহা বাবুগিরির মধ্যে গণ্য, স্ত্রীলোক এ দোষ করিলে সংসারের সকল সুখ তাহার পক্ষে বিলুপ্ত হয়; সে অধমের মধ্যে অধম বলিয়া গণ্য হয়, কুষ্ঠগ্রস্তের অধিক অস্পৃশ্য হয়। কেন? পুরুষের সুখের পক্ষে স্ত্রীর সতীত্ব আবশ্যক। স্ত্রী-জাতির সুখের পক্ষে পুরুষের ইন্দ্রিয়সংযম আবশ্যক। কিন্তু পুরুষই সমাজ, স্ত্রীলোক কেহ নহে। অতএব

স্ত্রীর পাতিব্রত্যচ্যুতি গুরুতর পাপ বলিয়াই সমাজে বিহিত হইল; পুরুষের পক্ষে নৈতিক বন্ধন শিথিল রহিল। সকল সমাজেই স্ত্রীজাতি পুরুষ অপেক্ষা অনুন্নত; পুরুষের আত্মপক্ষপাতিতাই ইহার কারণ। পুরুষ বলিষ্ঠ, সুতরাং পুরুষই কার্য্যকর্ত্তা; স্ত্রীজাতিকে কাজে কাজেই তাহাদিগের বাহুবলের অধীন হইয়া থাকিতে হয়। আত্মপক্ষপাতী পুরুষগণ যতদূর আত্মসুখের প্রয়োজন, ততদূর পর্য্যন্ত স্ত্রীগণের উন্নতির পক্ষে মনোযোগী; তাহার অতিরেক তিলার্দ্ধ নহে। এ কথা অন্যান্য সমাজের অপেক্ষা আমাদিগের দেশে, বিশেষ সত্য। প্রাচীন কালের কথা বলিতে চাহি না; তৎকালীন স্ত্রীজাতির চিরাধীনতার বিধি; কেবল অবস্থাবিশেষ ব্যতীত স্ত্রীগণের ধনাধিকারে নিষেধ; স্ত্রী ধনাধিকারিণী হইলেও স্ত্রীর দান-বিক্রয়-ক্ষমতার অভাব; সহমরণবিধি বহুকাল প্রচলিত, বিধবাবিবাহ নিষেধ, বিধবার পক্ষে প্রচলিত কঠিন নিয়ম সকল, স্ত্রীপুরুষে গুরুতর বৈষম্যের প্রমাণ। তৎপরে মধ্যকালেও স্ত্রীজাতির অবনতি আরও গুরুতর হইয়াছিল। পুরুষ প্রভু, স্ত্রী দাসী; স্ত্রী জল তুলে, রন্ধন করে, বাটনা বাটে, কুটনা কুটে। বরং বেতনভাগিনী দাসীরও কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা আছে, কিন্তু বনিতা দুহিতার তাহাও ছিল না। আজিকালি পুরুষের শিক্ষার গুণে হউক, স্ত্রীশিক্ষার গুণে হউক, বা ইংরেজের দৃষ্টান্তের গুণে হউক, অবস্থা-পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কিন্তু যেরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহার সর্ব্বাংশই কি উন্নতিসূচক? বঙ্গীয় যুবকদিগের যে অবস্থান্তর ঘটিতেছে, তাহার বিশেষ আন্দোলন শুনিতে পাই, কিন্তু বঙ্গীয় যুবতীগণের যে অবস্থান্তর ঘটিতেছে, তাহা কি উন্নতি?

এ প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্ব্বে পূর্ব্বকালে বঙ্গীয় যুবতী কি ছিলেন, এক্ষণে কি হইতেছেন, তাহা স্মরণ করা আবশ্যক। প্রাচীনার সহিত নবীনার তুলনা আবশ্যক। পূর্ব্বকালের যুবতীগণের নাম করিতে গেলে, আগে শাঁখা, শাড়ী, সিন্দূর-কৌটা মনে পড়িবে; বাঁকমলের মুটার হাত উপরে মনসা পেড়ে শাড়ীর রাঙাপাড় আসিয়া পড়িয়াছে; হাতে পৈঁছা, কঙ্কণ এবং শঙ্খ, (যাহার জুটিল, তাহার হাউটি নামে সোনার শঙ্খ)—মুষ্টিমধ্যে দৃঢ়তর সম্মার্জ্জনী বা রন্ধনের বেড়ী; কপালে কলাবউয়ের মত সিন্দুরের রেখা; নাকে চন্দ্রমণ্ডলের মত নথ; দাঁতে অমাবস্যার নিশি মিশি এবং মস্তকের ঠিক মধ্যভাগে পর্ব্বত-শৃঙ্গের ন্যায় তুঙ্গ কবরীশিখর। আমরা স্বীকার করি যে, সেকেলে মেয়ে যখন গাছকোমর বাঁধিয়া, ঝাঁটা হাতে খোঁপা খাড়া করিয়া, নথ নাড়িয়া দাঁড়াইত, তখন অনেক পুরুষদের হৃৎকম্প হইত। যাঁহারা এবংবিধা প্রাঙ্গণ-বিহারিণী রসবতীর সঙ্গে বাদানুবাদে সাহস করিতেন, তাঁহারা একটু সতর্ক হইয়া দূরে দাঁড়াইতেন। ইঁহারা কোন্দলে বিশেষ পরিপক্ক ছিলেন, পরস্পরের পৃষ্ঠত্বকের সঙ্গে তাঁহাদের হস্তের সম্মার্জ্জনীর বিশেষ সম্বন্ধ ছিল। তাঁহাদের ভাষাও যে বিশেষ প্রকার অভিধান-সম্মত ছিল, এমত বলিতে পারি না। কেন না, তাঁহারা "পোড়ারমুখো," "ভেক্‌রা" ইত্যাদি নিপাতনসাধ্য শব্দ আধুনিক প্রাণনাথ-প্রাণকান্তাদির স্থলে ব্যবহার করিতেন এবং "আবাগী," "শতেকখুয়ারি" প্রভৃতি আধুনিক "সখা," "ভগিনী" স্থানে প্রয়োগ করিতেন।

এক্ষণে যে "সুন্দরীকুল" চরণালক্তে বঙ্গভূমিকে উজ্জ্বল করিয়াছেন, তাঁহারা ভিন্নপ্রকৃতি। সে শাঁখা শাড়ী, সিন্দুর, মিশি, মল, মাদুলী কিছুই নাই; অনভিধানিত প্রিয়-সম্বোধন সকল সুন্দরীগণের রসনা ত্যাগ করিয়া বাঙ্গালা নাটকে আশ্রয় লইয়াছে। যেখানে আগে মোটা মনসা-পেড়ে শাড়ী মেয়ে-মোড়া গনিক্লাথ ছিল, এক্ষণে তাহার স্থানে শান্তিপুরে ডুরে ক্লপের জাহাজের পাল লইয়া সোহাগ-বাতাসে ফরফর করিয়া উড়িতেছে। হাতা, বেড়ী, ঝাঁটা, কলসীর পরিবর্ত্তে সূচসূতা, কার্পেট, কেতাব হইয়াছে, পরিধেয় হাঁটু ছাড়িয়া চরণে নামিয়াছে; কবরী মূর্দ্ধা ছাড়িয়া স্কন্ধে পড়িয়াছে এবং অঙ্গের সুবর্ণ পিণ্ডত্ব ছাড়িয়া অলঙ্কারে পরিণত হইতেছে। ধূলিকর্দ্দমরঞ্জিনীগণ, সাবানসুগন্ধাদির মহিমা বুঝিয়াছেন; কলকণ্ঠধ্বনি পাপিয়ার মত গগনপ্লাবী না হইয়া মার্জ্জারের মত অস্ফুট হইয়াছে। পতির নাম এক্ষণে ভেক্‌রা, সর্ব্বনেশে নহে; তৎস্থানে সম্বোধন পদ সব দীনবন্ধু বাবুর গ্রন্থ হইতে বাছিয়া বাছিয়া নীত হইয়া ব্যবহৃত হইতেছে। স্থূল কথা এই, প্রাচীনার অপেক্ষা নবীনার রুচি কিছু ভাল। স্ত্রীজাতির রুচির কিছু সংস্কার হইয়াছে।

কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে তাদৃশ উন্নতি হইয়াছে কি না, বলিতে পারি না। কয়েকটি বিষয়ে নবীনাগণকে আমরা নিন্দনীয় বিবেচনা করি। তাঁহাদিগের কোন প্রকার নিন্দা করা আমাদিগের ঘোরতর বেয়াদবি। তবে চন্দ্রের সঙ্গে তাঁহাদিগের সাদৃশ্য সম্পূর্ণ করিবার জন্য তাঁহাদিগের কিঞ্চিৎ কলঙ্ক-রটনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

১। তাঁহাদিগের প্রথম দোষ আলস্য। প্রাচীনা অত্যন্ত শ্রমশালিনী এবং গৃহকর্ম্মে সুপটু ছিলেন, নবীনা ঘোরতর বাবু, জলের উপর পদ্মের মত স্থিরভাবে বসিয়া স্বচ্ছ দর্পণে আপনার রূপের ছায়া আপনি দেখিয়া দিন কাটান, গৃহকর্ম্মের ভার প্রায় পরিচারিকার প্রতি সমর্পিত। ইহাতে অনেক অনিষ্ট জন্মিতেছে,—প্রথম, শারীরিক পরিশ্রমের অল্পতায় যুবতীগণের শরীর বলশূন্য, এবং রোগের আগার হইয়া উঠিতেছে। প্রাচীনাদিগের অর্থাৎ পূর্ব্বকালের যুবতীগণের শরীর স্বাস্থ্যজনিত অপূর্ব্ব-লাবণ্যবিশিষ্ট ছিল, এক্ষণে তাহা কেবল নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকের মধ্যে দেখা যায়। নবীনাদিগের প্রাত্যহিক রোগভোগে তাঁহাদিগের স্বামী, পুত্র প্রভৃতি সর্ব্বদা জ্বালাতন এবং অসুখী এবং সংসারও কাজে কাজেই বিশৃঙ্খলাযুক্ত এবং দুঃখময় হইয়া উঠে। গৃহিণী রুগ্নশয্যাশায়িনী হইলে গৃহের শ্রী থাকে না; অর্থের ধ্বংস হইতে থাকে; শিশুগণের প্রতি অযত্ন হয়, সুতরাং তাহাদের স্বাস্থ্যক্ষতি ও কুশিক্ষা হয় এবং গৃহমধ্যে সর্ব্বত্র দুর্নীতির প্রচার হয়। যাহারা ভালবাসে, তাহারাও নিত্য রুগ্নের সেবার দুঃখ সহ্য করিতে পারে না, সুতরাং দম্পতিপ্রীতিরও লাঘব হইতে থাকে এবং মাতার অকাল-মৃত্যুতে শিশুগণের এমন অনিষ্ট ঘটে যে, তাহাদিগের মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাহারা উহার ফলভোগ করে। সত্য বটে, ইংরেজজাতীয় স্ত্রীগণকে আলস্যপরবশ দেখিতে পাই, কিন্তু তাহারা অশ্বারোহণ, বায়ুসেবন ইত্যাদি অনেকগুলি স্বাস্থ্যরক্ষকক্রিয়া নিয়মিতরূপে সম্পাদন করে। আমাদিগের গৃহপিঞ্জরে বিহঙ্গিনী-গণের সে সকল কিছুই নাই।

দ্বিতীয়, স্ত্রীগণের আলস্যের আর একটি গুরুতর কুফল এই যে, সন্তান দুর্ব্বল এবং ক্ষীণজীবী হয়। শিশুদিগের নিত্য রোগ এবং অকালমৃত্যু অনেক সময়েই জননীর শ্রমে অনুরাগশূন্যতার ফল। অনেকে বলেন, আগে এত রোগ ছিল না, এখন নিত্য পীড়া; আগে লোকে দীর্ঘজীবী ছিল, এক্ষণে অল্পবয়সে মরে। অনেকের বিশ্বাস আছে, এ সকল কালমহিমা, কলিতে অনৈসর্গিক ব্যাপার ঘটিতেছে। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি জানেন যে, নৈসর্গিক নিয়ম কখন কালমাহাত্ম্যে পরিবর্ত্তিত হয় না; যদি আধুনিক বাঙ্গালীরা বহু রোগী এবং অল্পায়ু হইয়া থাকে; তবে তাহার অবশ্য নৈসর্গিক কারণ আছে সন্দেহ নাই। আধুনিক প্রসূতিগণের শ্রমে বিরতিই সেই সকল নৈসর্গিক কারণের মধ্যে অগ্রগণ্য. যে বঙ্গদেশের ভরসা লোকের শারীরিক বলোন্নতির উপর বর্ত্তিয়াছে, সেই বঙ্গদেশের জননী-গণের আলস্যবশ্যতার এরূপ বৃদ্ধি যে অতি শোচনীয় ব্যাপার, তাহার সন্দেহ নাই।

আলস্যের তৃতীয় কুফল এই যে, নবীনাগণ গৃহ-কর্ম্মে নিতান্ত অশিক্ষিতা এবং অপটু। কখনও সে সকল কাজ করেন না, এ জন্য শিখেনও না, ইহাতে অনেক অনিষ্ট ঘটে। প্রাচীনারা নিতান্ত ধনী না হইলে জল তুলিতেন, বাসন মাজিতেন, উঠান ঝাঁট দিতেন, রন্ধন তাঁহাদের জীবনের প্রধান কার্য্য ছিল। এ কিছু বাড়াবাড়ি; নবীনাদিগের এত দূর করিতে আমরা অনুরোধ করি না। যাহার যেমন অবস্থা, সে তদনুসারে কার্য্য করিলেই যথেষ্ট। কেবল কার্পেট তুলিয়া কাল কাটাইলে অতি ঘৃণিত-রূপে জীবন নির্ব্বাহ করা হয়, বিবেচনা করি। পরস্পরের সুখবর্দ্ধন জন্য সকলেরই জন্ম; যে স্ত্রী ভূমণ্ডলে আসিয়া শয্যায় গড়াইয়া দর্পণসম্মুখে কেশ-রঞ্জন করিয়া, কার্পেট তুলিয়া, সীতার বনবাস পড়িয়া এবং সন্তান প্রসব করিয়া কাল কাটাইলেন, আপনার ভিন্ন কাহারও সুখবৃদ্ধি করিলেন না, তিনি পশু-জাতির অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ভাল হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহার স্ত্রীজন্ম নিরর্থক। এই শ্রেণীর স্ত্রীলোকগণকে আমরা গলায় দড়ী দিয়া মরিতে পরামর্শ দিই; পৃথিবী তাহা হইলে অনেক নিরর্থক ভারবহন-যন্ত্রণা হইতে বিমুক্তা হয়েন।

গৃহিণী গৃহকর্ম্ম না জানিলে রুগ্নগৃহিণীর গৃহের মত সকলই বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে; অর্থে উপকার হয় না, অনর্থক ব্যয় হয়; দ্রব্য সামগ্রী লুট যায়; অর্দ্ধেক দাস-দাসী এবং অপর লোক চুরি করে। বহুব্যয়েও খাদ্যাদির অপ্রতুল ঘটে; ভাল সামগ্রীর খরচ দিয়া মন্দ সামগ্রী ব্যবহার করিতে হয়; ভাল সামগ্রী গৃহস্থের কপালে ঘটে না। পৌরজনে পৌরজনে অপ্রণয় এবং কলহ ঘটিয়া উঠে। অতিথি অভ্যাগতের উপযুক্ত সম্মান হয় না। সংসার কণ্টকময় হয়।

২। নবীনাদিগের দ্বিতীয় দোষ ধর্ম্ম সম্বন্ধে। আমরা এক্ষণকার বঙ্গাঙ্গনাগণকে অধার্ম্মিক বলিতেছি না,— বঙ্গীয় যুবকদিগের তুলনায় তাঁহারা ধর্ম্মভক্ত এবং বিশুদ্ধাত্মা বটেন, কিন্তু প্রাচীনাদিগের সম্প্র-দায়ের তুলনায় তাঁহারা ধর্ম্মে লঘু সন্দেহ নাই। বিশেষ যে সকল ধর্ম্ম গৃহস্থের ধর্ম্ম বলিয়া পরিচিত, সেইগুলিতে এখনকার যুবতীগণের লাঘব দেখিয়া কষ্ট হয়।

স্ত্রীলোকের প্রথম ধর্ম্ম পাতিব্রত্য। অদ্যাপি বঙ্গমহিলাগণ পৃথিবীতলে পাতিব্রত্য-ধর্ম্মে তুলনারহিত। কিন্তু যাহা ছিল, তাহা কি আছে? এ প্রশ্নের উত্তর শীঘ্র দেওয়া যায় না। প্রাচীনাগণের পাতিব্রত্য যেরূপ দৃঢ়গ্রন্থির দ্বারা হৃদয়ে নিবদ্ধ ছিল, পাতিব্রত্য যেরূপ তাঁহাদের অস্থিমজ্জাশোণিতে প্রবিষ্ট ছিল, নবীনাদিগেরও কি তাই? অনেকের বটে, কিন্তু অধিকাংশ কি তাই? নবীনাগণ পতিব্রতা বটে, কিন্তু যত লোকনিন্দা-ভয়ে, তত ধর্ম্মভয়ে নহে।

তাহার পর দানাদিতে প্রাচানাদিগের যেরূপ মনোনিবেশ ছিল, নবীনাদিগের সেরূপ দেখা যায় না। প্রাচীনাগণের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, দানে পরমার্থের কাজ হয়। যে দান করে, সে স্বর্গে যায়। এক্ষণকার যুবতীগণের স্বর্গে বিশ্বাস তত দৃঢ় নহে; তাহাদের পরলোকে স্বর্গপ্রাপ্তিকামনা তত বলবতী নহে। ইংরেজি সভ্যতার ফলে দেশে নানাবিধ সামগ্রীর প্রাচুর্য্য হওয়াতে সকলেরই অর্থের প্রয়োজন বাড়িয়াছে, স্ত্রীলোকদিগেরও বাড়িয়াছে; এ জন্য দানে তাদৃশ অনুরাগ আর নাই। তত দান করিলে আর কুলায় না। টাকায় যে সকল সুখ কেনা যায়, তাহার সংখ্যা এবং বৈচিত্র্য বাড়িয়াছে; দানের আধিক্য করিলে এখন অনেক বাঞ্ছনীয় সুখে বঞ্চিত হইতে হয়। সুতরাং স্ত্রীলোক (এবং পুরুষ) আর তত দানশীল নহে।

হিন্দুদিগের একটি প্রধান ধর্ম্ম অতিথিসৎকার। যে গৃহে আসে, তাহাকে আহারাদির দ্বারা পরিতুষ্ট করণপক্ষে এতদ্দেশীয় লোকের তুল্য কোন জাতি ছিল না। প্রাচীনাগণ এই গুণে বিশেষ গুণশালিনী ছিলেন। নবীনাদিগের মধ্যে সে ধর্ম্ম একবারে বিলুপ্ত হইতেছে। গৃহে অতিথি-অভ্যাগত আসিলে প্রাচীনারা কৃতার্থ হইতেন, নবীনাগণ বিরক্ত হয়েন। লোককে আহার করান প্রাচীনাদিগের প্রধান সুখ ছিল, নবীনাগণ ইহাকে ঘোরতর বিপদ মনে করেন। ধর্ম্মে যে নবীনাগণ প্রাচীনাদিগের অপেক্ষা নিকৃষ্ট, তাহার একটি বিশেষ কারণ অসম্পূর্ণ শিক্ষা। লেখা-পড়া বা অন্য প্রকারের শিক্ষা তাঁহারা যাহা কিঞ্চিৎ প্রাপ্ত হয়েন, তাহাতেই বুঝিতে পারেন যে, প্রাচীন ধর্ম্মের শাসন অমূলক। অতএব তাহাতে বিশ্বাস হারাইয়া ধর্ম্মের যে বন্ধন ছিল, তাহা হইতে বিযুক্ত হয়েন। তাহার স্থানে আর নূতন বন্ধন কিছুই প্রতিবদ্ধ হইতেছে না। আমরা লেখাপড়ার নিন্দা করিতেছি না। ধর্ম্ম ভিন্ন বিদ্যার অপেক্ষা মূল্যবান্ বস্তু যে পৃথিবীতে কিছুই নাই, ইহা আমরা ভুলিয়া যাইতেছি না। তবে বিদ্যার ফলে ইহা সর্ব্বত্র ঘটিয়া থাকে যে, তাহাতে চক্ষু ফুটে, মিথ্যাকে মিথ্যা বলিয়া বোধ হয়, সত্যকে সত্য বলিয়া জানা যায়। বিদ্যার ফলে লোকে প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্র-ঘটিত ধর্ম্মের মূলের অলীকত্ব দেখিতে পায়; প্রাকৃতিক যে সত্য ধর্ম্ম, তাহা সত্য বলিয়া চিনিতে পারে। অতএব বিদ্যায় ধর্ম্মের ক্ষতি নাই, বরং বৃদ্ধি আছে। সচরাচর পণ্ডিতে যাদৃশ ধর্ম্মিষ্ঠ, মূর্খে তাদৃশ পাপিষ্ঠ হয়। কিন্তু অল্প বিদ্যার দোষ এই যে, ধর্ম্মের মিথ্যা মূল তদ্দ্বারা উচ্ছিন্ন হয়, অথচ সত্য ধর্ম্মের প্রাকৃতিক মূল সংস্থাপিত হয় না। সেটুকু কিছু অধিক জ্ঞানের ফল। পরোপকার করিতে হইবে, এটি যথার্থ ধর্ম্মনীতি বটে। মূর্খেও ইহা জানে এবং মূর্খদিগের মধ্যে ধর্ম্মে যাহাদের মতি আছে, তাহারাও ইহার বশবর্ত্তী হয়। তাহার কারণ এই যে, এই নৈতিক আজ্ঞা প্রচলিত ধর্ম্মশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে; মূর্খের তাহাতে দৈবাজ্ঞা বলিয়া বিশ্বাস আছে। দৈববিধি লঙ্ঘন করিলে ইহলোকে ও পরলোকে ক্ষতি প্রাপ্ত হইতে হইবে বলিয়া মূর্খ সে নীতির বশবর্ত্তী; পণ্ডিতও সে নীতির বশবর্ত্তী, কিন্তু তিনি ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত বলিয়া তদুক্তির অনুসরণ করেন না। তিনি জানেন যে, ধর্ম্মের কতকগুলি প্রাকৃতিক নিয়ম আছে, তাহা অবশ্যপালনীয় এবং পরোপকারবিধি সেই সকল নিয়মের ফল। অতএব এ স্থলে ধর্ম্মের ক্ষতি হইল না। কিন্তু যদি কেহ ঈদৃশ পরিমাণে মাত্র বিদ্যার আলোচনা করে যে, তদ্দ্বারা প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশ্বাস বিনষ্ট হয়, অথচ যতদূর আলোচনায় প্রাকৃতিক ধর্ম্মে বিশ্বাস জন্মে, ততদূর না যায়, তবে তাহার পক্ষে ধর্ম্মের কোন মূল থাকে না। লোকনিন্দাভয়ই তাহাদিগের একমাত্র ধর্ম্মবন্ধন হইয়া উঠে। সে বন্ধন অতি দুর্ব্বল। আধুনিক অল্পশিক্ষিত যুবক-যুবতীগণ কিয়দংশে এই অবস্থাপন্ন, এ জন্য ধর্ম্মাংশে তাঁহারা প্রাচীনাদিগের সমকক্ষ নহেন। যাঁহারা স্ত্রীশিক্ষায় ব্যতিব্যস্ত, তাঁহাদিগকে আমরা জিজ্ঞাসা করি যে, আপনারা বালকদিগের হৃদয় হইতে প্রাচীন ধর্ম্মবন্ধন বিযুক্ত করিতেছেন, তাহার পরিবর্ত্তে কি সংস্থাপন করিতেছেন? *

* "নবীনা এবং প্রাচীনা" এই প্রবন্ধ 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হইলে পর, স্ত্রীলোকের পক্ষ হইতে যে উত্তর আছে, তাহা নিম্নলিখিত কৃত্রিম পত্র তিনখানিতে লিখিত হইয়াছিল।

তিন রকম

নং—১

বঙ্গদর্শনে "নবীনা এবং প্রাচীনা" কে লিখিল? যিনি লিখুন, তিনি মনে করিতেছেন, অবলা স্ত্রীজাতি কিছু কথা কহিবে না, অতএব যাহা ইচ্ছা, তাহা লিখি। জানেন না যে, সম্মার্জ্জনী স্ত্রীলোকের আয়ুধ।

ভাল, নবীন মহাশয়, আপনারা নবীনা-প্রাচীনার গুণ-দোষের তুলনা করিয়াছেন, নবীন ও প্রাচীনে গুণ-দোষের তুলনা হয় না? তুলনা করিলে দোষের ভাগ কোন্ দিকে ভারি হইবে?

প্রাচীনের অপেক্ষা নবীনের গুণের মধ্যে দেখি, তোমরা একটু ইংরেজি শিখিয়াছ; কিন্তু ইংরেজি শিখিয়া কাহারও কি উপকার করিয়াছ? ইংরেজি শিখিয়া কেরাণীগিরি শিখিয়াছ দেখিতে পাই। কিন্তু মনুষ্যত্ব? শুন, প্রাচীনে নবীনে প্রভেদ কি, বলি, প্রাচীনেরা পরোপকারী ছিলেন, তোমরা আত্মোপকারী। প্রাচীনেরা সত্যবাদী ছিলেন, তোমরা কেবল প্রিয়বাদী। প্রাচীনেরা ভক্তি করিতেন পিতামাতাকে, নবীনের ভক্তি করা পত্নীকে বা উপপত্নীকে। প্রাচীনেরা দেবতা-ব্রাহ্মণের পূজা করিতেন, তোমাদের দেবতা টেঁস ফিরিঙ্গী, তোমাদের ব্রাহ্মণ সোনার বেণে। সত্য বটে, তাঁহারা পৌত্তলিক ছিলেন, কিন্তু তোমরা বোতলিক। জগদীশ্বরীর স্থানে তোমরা অনেকেই ধান্যেশ্বরীকে স্থাপনা করিয়াছ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের স্থানে ব্রাণ্ডি, রম, জিন। বিয়র, সেরি, তোমাদের ষষ্ঠি-মনসার মধ্যে। বঙ্গীয় বাবুর ভ্রাতৃস্নেহ সম্বন্ধীর উপর বর্ত্তিয়াছে, অপত্যস্নেহ ঘোড়া-কুক্কুরের উপর বর্ত্তিয়াছে। পিতৃভক্তি অফিসের সাহেবের উপর বর্ত্তিয়াছে, আর মাতৃভক্তি পাচিকার উপরে। আমরা অতিথি-অভ্যাগত দেখিলে মহা বিপদ্ মনে করি বটে, তোমরা তাহাদিগকে গলা ধাকা দাও। আমরা অলস, তোমরা শুধু অলস নও—তোমরা বাবু! তবে ইংরেজ বাহাদুর নাকে দড়ী দিয়া তোমাদের ঘানিগাছে ঘুরায়, বল নাই বলিয়া ঘোর। আমরাও নাকে দড়ী দিয়া ঘুরাই, বুদ্ধি নাই বলিয়া ঘোর। আর আমরা লেখাপড়া শিখি নাই বলিয়া আমাদের ধর্ম্মের বন্ধন নাই, আর তোমাদের? তোমাদের ধর্ম্মের বন্ধন বড় দৃঢ়, কেন না, তোমাদের সে বন্ধনের দড়ী, এক দিকে শুঁড়ী, আর এক দিকে—বারস্ত্রী টানিয়া আঁটিয়া দিতেছে. তোমরা ধর্ম্ম-দড়ীতে মদের কলসী গলায় বাঁধিয়া প্রেম-সাগরে ঝাঁপ দিতেছ—গরীব "নবীনা" খুনের দায়ে ধরা পড়িতেছে। তোমাদের আবার ধর্ম্মের ভয় কি? তোমরা কি মান? ঠাকুর-দেবতা? যীশুখৃষ্ট? ধর্ম্ম মান? পাপ-পুণ্য মান? কিছু না—কেবল আমাদের এই আলতাপরা মলবেড়া শ্রীচরণ মান। সেও নাথির জ্বালায়।

শ্রীচণ্ডিকাসুন্দরী দেবী।

নং—২

সম্পাদক মহাশয়! আপনাদের শ্রীচরণে এ কিঙ্করীকুল কোন্ দোষে দোষী? আমরা কি জানি? আপনারা শিখাইবেন, আমরা শিখিব—আপনারা গুরু, আমরা শিষ্য—কিন্তু শিক্ষাদান এক, নিন্দা আর। বঙ্গদর্শনে "নবীনার" প্রতি এত কটূক্তি কেন?

আমাদের সহস্র দোষ আছে স্বীকার করি। একে স্ত্রীজাতি, তাতে বাঙ্গালীর মেয়ে; জাতিতে কাঠমল্লিকা, তাহাতে মরুভূমে জন্মিয়াছে—দোষ না থাকিবে কেন? তবে কতকগুলি দোষ আপনাদেরই গুণে জন্মিয়াছে। আপনাদের গুণে, দোষে নহে। আপনারা আমাদের এত ভাল না বাসিলে আমাদের এত দোষ ঘটিত না। আপনারা আমাদের এত সুখী করিয়াছেন, এ জন্য আমরা অলস। মাথার ফুলটি খসিয়া পড়িলে আপনারা তুলিয়া পরান। আপনারা জল হইয়া যে নলিনী হৃদয়ে ধারণ করেন, সে কেন স্বচ্ছ সলিলে আপনার রূপের ছায়া দেখিয়া দিন না কাটাইবে?

আমরা অতিথি-অভ্যাগতের প্রতি অমনোযোগী; তাহার কারণ, আমরা স্বামি-পুত্রের প্রতি অধিক মনোযোগী। আমাদের ক্ষুদ্র হৃদয়ে আপনারা এত স্থান গ্রহণ করিয়াছেন যে, অন্য ধর্ম্মের আর স্থান নাই।

আর—শেষ কথা, আমরা কি ধর্ম্মভীতা নহি? ছি! ধর্ম্মভীতা বলিয়াই আপনাদিগের আর কিছু বলিতে পারিলাম না। তোমরাই আমাদিগের ধর্ম্ম, তোমাদের ভয়ে ভীতা বলিয়াই অন্য ধর্ম্মের ভয় করি না। সকল ধর্ম্মকর্ম্ম আমরা স্বামিপুত্রে সমর্পণ করিয়াছি—অন্য ধর্ম্ম জানি না। লেখাপড়া শিখাইয়া আমাদিগকে কোন্ ধর্ম্মে বাঁধিলেন? যত শিখান না কেন—আমরা বাঙ্গালীর মেয়ে—সকল বন্ধন ছিঁড়িয়া পাতিব্রত্যবন্ধনে আপনা-আপনি বাঁধা পড়িব। যদি ইহাতে অধর্ম্ম হয়, সে আপ-

নাদের দোষ, আপনাদেরই গুণ। আর যদি আমার ন্যায় মুখরা বালিকার কথায় রাগ না করেন, তবে জিজ্ঞাসা করি, আপনারা গুরু, আমরা শিষ্য—আপনারা আমাদের কোন্ ধর্ম্ম শিখাইয়া থাকেন?

লেখাপড়া শিখিব? কেন? তোমাদের মুখচন্দ্র দেখিয়া যে সুখ, লেখাপড়ায় কি তত? তোমাদের সুখসাধনে যে ধর্ম্মশিক্ষা, লেখা-পড়ায় কি তত? দেখ, তোমাদের দেখিয়া আমরা আত্মবিসর্জ্জন শিখিয়াছি, লেখাপড়ায় কি তাহা শিখাইবে? আর লেখাপড়া শিখিব কখন? তোমাদের মুখ ভাবিতে দিন যায়, ছাই লেখাপড়া শিখিব কখন্?

ছি! দাসীদিগের নিন্দা!

শ্রীলক্ষ্মীমণি দাসী।

নং—৩

ভাল, কোন্ রসিকচূড়ামণি "প্রবীণা এবং নবীনা" লিখিলেন?

লেখক মহাশয়! তুমি যাহা বলিয়াছ, সব সত্য—একটি মিথ্যা নহে। আমরা অলস বটে, কিন্তু আমরা অলস না হইয়া কাজ করিয়া বেড়াইলে তোমাদের দশা কি হইত? এ বিজলী তোমাদের হৃদয়াকাশে স্থির না থাকিলে, কাহার প্রতি চাহিয়া এ দীর্ঘ দুঃখ-দারিদ্র্যের জীবন কাটাইতে? এ সৌদামিনী স্থির না থাকিলে, তোমরা এ সংসারান্ধকারে কোথায় আলো পাইতে? আমরা কাজ করিব? করিব, ক্ষতি কি, কিন্তু দেখো যেন আমাদের তিলেক না দেখিয়া, তোমরা তৈলশূন্য প্রদীপের মত হঠাৎ নিবিয়া বসিও না,—জলশূন্য মাছের মত বার বার পুচ্ছ আছড়াইতে থাকিও না, আর রাখালশূন্য বাছুরের মত হাম্বারবে তোমাদের গৃহগোহাল পরিপূর্ণ করিও না। আমরা কাজ করিতে যাইব, কিন্তু তোমরা চল-চল চঞ্চল রূপ-তরঙ্গ দেখিতে পাইবে না। এ চঞ্চল কণ্ঠধ্বনি ক্ষণেক না শুনিলে যে গীতিমুগ্ধ হরিণের, ন্যায় সংসারারণ্যে শব্দান্বেষণ করিয়া বেড়াইবে—কপাল-খানা! আবার বলে কি না কাজ করে না!

আমরা অতিথি-অভ্যাগতকে খাইতে দিই না, দিব কি, তোমরা যে ঘরে কিছু রাখ না, ইংরেজের আপিসের কি গুণ বলিতে পারি না—যাইবার সময় যাও যেন নন্দদুলাল—ফিরে এস যেন কুম্ভকর্ণ! নিজের নিজের উদর—এক একটি আধমণি বস্তা—আমরা যেই হিন্দুর মেয়ে, তাই তাহাতে কোন মতে ত্রিশ সের ঠাসিয়া দিই—তাহার উপর আবার অতিথি-অভ্যাগত!

ধর্ম্মের বন্ধনে বাঁধিবেন? ক্ষতি নাই, কিন্তু যে একাদশী-নিরামিষের বাঁধনে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন, তার উপর এ বন্ধনে আর কাজ কি? আপনারা একাদশীর ভার নিন, আমরা লেখাপড়া শিখিয়া ধর্ম্মের বন্ধন আঁটো করিয়া বাঁধিতে রাজি আছি, আমার মনে বড় সাধ, একবার আপনা-দিগের সঙ্গে অবস্থার বিনিময় করি। গালিগালাজ দিবার অগ্রে, একবার কত সুখ দুঃখ বুঝিয়া রাউন। আমরা মরিলে আপনারা একাদশী করিবেন, নিরা-মিষ খাইবেন, ঠেঁটি পরিবেন—আপনারা স্বর্গা-রোহণ করিলে আমরা দ্বিতীয় সংসার করিব, জীয়ন্তে আপনারা সন্তান প্রসব করিবেন। রন্ধনশালার তত্ত্বাবধারণ করিবেন। বাড়ীতে বিবাহ উপস্থিত হইলে গোঁপের উপর ঘোমটা টানিয়া, বরণডালা মাথায় করিয়া, স্ত্রী-আচার করিবেন, বাসরঘরে রসের হাসি হাসিয়া বাসর জাগিবেন, সুখের সীমা থাকিবে না, আমরা যৌবনে বহি হাতে করিয়া কলেজে যাইব—বয়সকালে ফিরিঙ্গী খোঁপার উপর পাগড়ী তেড়া বাঁধিয়া আফিসে যাইব—টৌনহলে নথ নাড়িয়া স্পীচ করিব, চশমার ভিতর হইতে এই চোখের বিলোল কটাক্ষে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করিব—সাধের ধর্ম্মের দড়ী গলায় বাঁধিয়া সংসার-গোয়ালে খোলবিচালি খাইব।—ক্ষতি কি! তোমরা বিনিময় করিবে? কিন্তু একটা কথা সাবধান করিয়া দিই, তোমরা যখন মানে বসিবে—আমরা যখন মান ভাঙ্গিতে বসিব—মুখখানি কাঁদো কাঁদো করিয়া, কর্ণভূষা একটু ঈষৎ রসের দোলনে দোলাইয়া, এই সম্ভ্রমর সরোজনয়নে একবার চোরা চাহনি চাহিয়া যখন গহনাপরা হাতখানি তোমাদের পায়ে দিব—তখন? তখন কি তোমরা আমাদের মত মানের মান রাখিতে পারিবে?

বড়াই ছাড়িয়া তাই কর, তোমরা অন্তঃপুরে এস—আমরা আপিসে যাই। যাহারা সাত শত বৎসর পরের জুতা মাথায় বহিতেছে, তাহারা আবার পুরুষ! বলিতে লজ্জা করে না?

শ্রীরসময়ী দাসী।

সম্পূর্ণ

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দিরের পুস্তকের তালিকা

সাহিত্য-সম্রাট—বন্দে মাতরম মন্ত্রের ঋষি

—বঙ্কিমচন্দ্রের—

গ্রন্থাবলী

উপন্যাস-গ্রন্থাবলী

প্রথম ভাগে :—১। রাজসিংহ ২।৷০, ২। বিষবৃক্ষ ১।৷০, ৩। যুগলাঙ্গুরীয় ৷৷০, ৪। মৃণালিনী ১৸০, ৫। রজনী ১।৷০।

এই ৭৸০ মূল্যের উপন্যাস-কোহিনুর মাত্র ২৲ টাকায়।

দ্বিতীয় ভাগে :—৬। দুর্গেশনন্দিনী ২৲, ৭। কৃষ্ণকান্তের উইল ১।৷০, ৮। রাধারাণী ১৲, ৯। সীতারাম ২৲, ১০। ইন্দিরা ১।৷০।

এই ৮৲ টাকা মূল্যের উপন্যাস-পারিজাত ২৲ টাকায়।

তৃতীয় ভাগে :—১১। আনন্দমঠ ২৲, ১২। চন্দ্রশেখর ২৲, ১৩। কপালকুণ্ডলা ১।৷০, ১৪। দেবী চৌধুরাণী ২৲।

এই ৭।৷০ টাকা মূল্যের উপন্যাসকৌস্তভ মাত্র ২৲ টাকায়।

সাহিত্য-গ্রন্থাবলী

১ম ভাগে :—১। কৃষ্ণচরিত্র ৩৲, ২। লোকরহস্য ১।৷০, ৩। বিবিধ প্রবন্ধ (১ম) ২৲৷৵

এই ৬।৷০ মূল্যের সাহিত্যগৌরব গ্রন্থরাজি ২৲ টাকায়। (যন্ত্রস্থ)

২য় ভাগে :—(সুপরিবর্দ্ধিত সংস্করণ) ১। ধর্মতত্ত্ব (১ম ভাগ অনুশীলন) ৩৲, ২। মুচিরাম গুড় ১।৷০, ৩। বিবিধ প্রবন্ধ (২য়) ২।৷০, ৪। বিজ্ঞান রহস্য ১।৷০।

এই ৮।৷০ টাকা মূল্যের চিন্তা-অর্ঘ্য মাত্র ২৲ টাকায়। (যন্ত্রস্থ)

৩য় ভাগে :—১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৩।৷০, ২। কমলাকান্ত ১।৷০, ৩। সাম্য ১৲, ৪। সাহিত্য প্রসঙ্গ ৷৷০, ৫। মানস ৷৷০, ৬। ললিতা ৷৷০।

এই ৭।৷০ টাকা মূল্যের সাহিত্য-সম্পদ ২৲ টাকায়।

মাইকেল মধুসূদনের গ্রন্থাবলী

১ম ভাগ—

১। মেঘনাদবধ কাব্য
২। বীরাঙ্গনা কাব্য
৩। পদ্মাবতী নাটক
৪। বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ (প্রহসন)
৫। একেই বলে কি সভ্যতা (প্রহসন)

পাঁচখানি বই একত্রে
মূল্য—আড়াই টাকা।

চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী
(পৃথক খণ্ডে)
মূল্য—বার আনা

২য় ভাগ—

১। কৃষ্ণকুমারী নাটক
২। শর্মিষ্ঠা নাটক
৩। তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য
৪। ব্রজাঙ্গনা কাব্য
৫। চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী
৬। বিবিধ কাব্য
৭। মায়া কানন
৮। হেক্টর বধ

আট খানি বই একত্রে মূল্য—দেড় টাকা

১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দিরের পুস্তকের তালিকা

আধুনিক রস-সাহিত্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তীর

নূতন প্রকাশিত প্রেমোন্মাদনাময় উপন্যাস

অথ বিবাহ ঘটিত

মূল্য ২৲

নব-যুগের কথা-সাহিত্যে শক্তিশালী লেখক

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

বিগত ছাত্র আন্দোলনের পটভূমিকায়
অভিনব কাহিনী

ঝড় ও ঝরা পাতা

মূল্য ২৷৷০

লব্ধপ্রতিষ্ঠ কথা-সাহিত্যিক

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের

নূতন উপন্যাস

চিহ্ন

মূল্য ৩৲

বঙ্গের সুসন্তান—বাংলা সাহিত্যের
উজ্জ্বলমণি

রমেশচন্দ্র দত্তের

মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের
বীরত্বপূর্ণ কাহিনী

মূল্য—২৲ টাকা

শিক্ষাপ্রদ গ্রন্থরাজি!

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার প্রশংসিত
নিজে নিজে ইংরেজী শিখিবার—
লিখিবার—সর্ব্বজন-সুপরিচিত
স্বনামপ্রসিদ্ধ একমাত্র চূড়ান্ত গ্রন্থ—
উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বিরচিত

রাজভাষা

২৫টি সংস্করণে ৩ লক্ষ ৪৫ হাজার খণ্ড প্রচারিত হইয়াছে। যে গ্রন্থের কল্যাণে আজ অসংখ্য ছাত্র ইংরেজী ভাষায় অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া—ইংরেজী ভাষা শিখিয়া অর্থার্জন করিতেছেন, সেই ভারতবিখ্যাত—কল্যাণময় গ্রন্থের নূতন পরিচয় কি দিব? সদ্যপ্রকাশিত পঞ্চবিংশ সংস্করণে আধুনিক শিক্ষা-প্রণালী সঙ্গতভাবে পরিবর্ত্তিত—দ্বিগুণ পরিবর্দ্ধিত। মূল্য ১৷০, হিন্দী ১৲, উর্দ্দু সংস্করণ ১৲ টাকা।

মহাকবি

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের

বৃত্র-সংহার কাব্য

দাম—২৲ টাকা।

নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের গ্রন্থাবলী—

১ম ও ২য় ভাগ	২৲

নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের গ্রন্থাবলী—

১ম ভাগ	১৷০
৩য় ভাগ	১৷০
৪র্থ ভাগ	১৷০
৫ম ভাগ	১৷০
৬ষ্ঠ ভাগ	১৷০

দামোদর মুখোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী—

১ম ভাগ	১৲
২য় ভাগ	১৲
৩য় ভাগ	১৲
৪র্থ ভাগ	১৲
৬ষ্ঠ ভাগ	১৲
৭ম ভাগ	১৲

১৬৬, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা